LENDING SECTION

—Under the rules of the Library, th boo

# দুলালের

## তালমিছরী

প্রস্তুত কারক:

দুলাল চন্দ্র ভড়

৪, দত্তপাড়া লেন · কলিকাতা-৬

ফোন: ৩৩-৫৬৭৩

# পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

# সুপার ৭৭৭

**পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন**

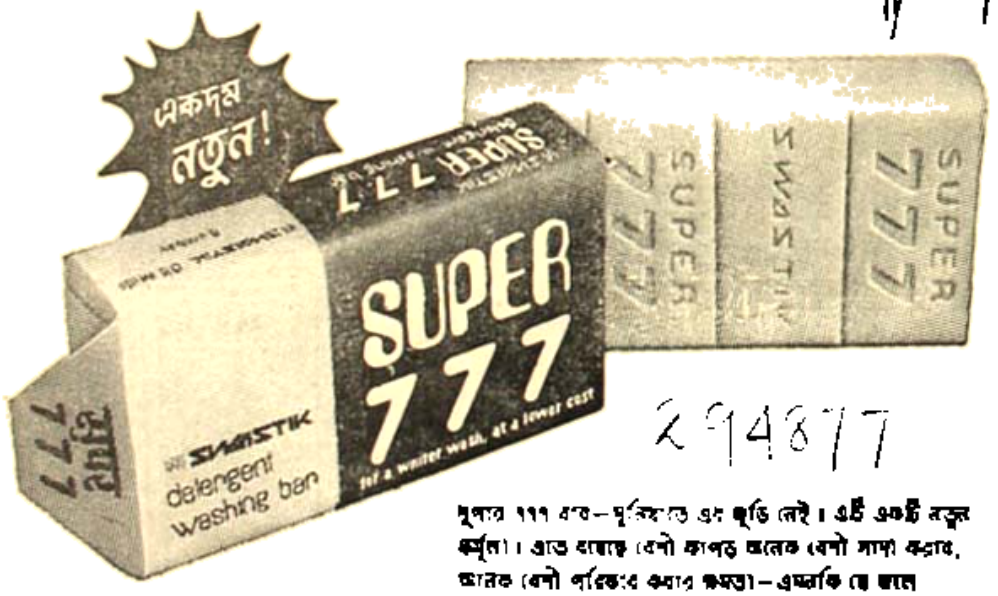


সুপার ৭৭৭ বার—ধুবিস্তারে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ধরনের। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দামে-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার!

SWASTIK SAU73 BEN

## ১০টি প্রবন্ধ লিখেছেন—


পৃষ্ঠা ৫—৩২

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
জনমেজয়
জনার্দন চক্রবর্তী
শশাঙ্কশেখর সান্যাল
বিনয় ঘোষ
সুধীরকুমার মিত্র
স্বামী প্রভানন্দ
ও
সুভাষ সমাজদার
ঊষারাণী সান্যাল
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়


## ৬টি কাহিনী লিখেছেন—


৩৩—৮১

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
অদ্রীশ বর্ধন
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
ও
মহাশ্বেতা দেবী
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
অসিত গুপ্ত


## ৩টি উপন্যাস লিখেছেন—


১১—১৬৩

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
আশাপূর্ণা দেবী
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ


## ৯টি বড় গল্প লিখেছেন—


১৬৫—২০০

বিমল কর
ধূর্জটিদেব গুহ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
সুমথনাথ ঘোষ
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
দিব্যেন্দু পালিত
প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী
ও
মানবেন্দ্র পাল
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

# জ্যোতিষ মহাচয়ন

## এম পি জুয়েলার্স এণ্ড কোং

প্রযোজিত

সর্বকালের সেরা জ্যোতিষ সংকলন

সম্পাদনা : শ্রীনরেশ চন্দ্র শর্মাচার্য

ও শ্রীরামেন্দ্র চেলবুধ্য

ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের সেরা বিশেষজ্ঞদের এক সঙ্গে দুর্লভ সংকলনের প্রকাশ সম্ভবে। ভারতীয় এবং বিদেশের প্রখ্যাত জ্যোতিষীরাও এই অভিনবত্বের সংকলনের তালি সাজানোর প্রত্যেকটি বছরে দুর্লভ প্রবন্ধ থাকবে আপনাদের বিশিষ্ট জ্যোতিষের পরামর্শদাতা, আপনার ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক ও সংকেত। বিশিষ্ট জ্যোতিষীরা এই বছরে বিশ্ব নামী সাহিত্যিক ও গবেষকদের প্রবন্ধ এবারে **জ্যোতিষ মহাচয়ন** এই অতিরিক্ত আকর্ষণ অনন্য প্রবন্ধ ইতিহাস থেকে সমকালীন সেই সব মনীষীদের ছবিগুলোকে, পত্রিকের আলোকচিত্র যারা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এছাড়া মনোরঞ্জনের চমৎকারের এই বিপুল সম্ভার অনেকেই প্রথমবার বিজ্ঞানের অবশ্যই সহজ হবে

অভিনবত্বের ও উপস্থাপনে **জ্যোতিষ মহাচয়ন** পূর্বের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়ন করেছে

আমাদের প্রথম পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সনে "জ্যোতিষ চয়ন" নামে একটি ছোট আকারে যার প্রকাশ নিয়ে। প্রকাশের পরে চাহিদার সঠিক পরিমাণ আন্দাজ করতে না পারায় আমরা পাঠকের মনে মনে সমস্তাদিক পাঠকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল

এবারের কপি সংরক্ষিত রাখতে এখনই ১০৲ টাকার মনি দিয়ে গ্রাহক হোন। গ্রাহকদের ১০৲ টাকার টিকিটটি ফেরত হবে **জ্যোতিষ মহাচয়ন** -এর আনুমানিক বিক্রয়মূল্য ২৫৲ থেকে ৩০৲ টাকার

বিশেষ বিজ্ঞপ্তির প্রবন্ধ পরিচয় পুস্তিকা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে ২০ পয়সার ডাক টিকিটের বিনিময়ে

যোগাযোগের ঠিকানা : বিমল কর চৌধুরী

এম পি জুয়েলার্স এণ্ড কোং

১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৩-৪৭৩১, ৩৫-৭১৯৮

প্রবন্ধ সংগ্রহের গৌরবময় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ

# এম পি জুয়েলার্স এণ্ড কোং

কর্তৃক প্রচারিত।

## ১৩টি ছোট গল্প লিখেছেন—২০১–২৭১

| | |
|---|---|
| যমুনেশ্বর | আবদুল জব্বার |
| দেবেশ দাশ | শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় |
| সুবোধকুমার মিত্র | মালা দেবী |
| হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | প্রাণতোষ ঘটক |
| কবিতা সিংহ | দীপক বক্সীগীর |
| শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় | ও |
| মায়া বসু | আইভি রাহা |

## ৩৫টি কবিতা লিখেছেন— ২৭০–২৮৭

প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুধীন্দ্র পত্রী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, লোকনাথ ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ দে, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিমল সেন, গোবিন্দ চক্রবর্তী, নীলেশ মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, রাজেন্দ্র বেলবরুয়া, স্বপনবুড়ো, শান্তনু দাস, সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রভাকর মাঝি, প্রফুল্লকুমার বসু, বেলুবর হাজরা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, কুমকুম দে, উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, পরমানন্দ সরস্বতী, সৌমেন সিকদার, গোপাল ভৌমিক, নবনীতা দেবসেন, পলাশ মিত্র ও লোচন পাঠক

## ৭টি রম্যরচনা লিখেছেন— ২৮১–৩১০

| | |
|---|---|
| প্রমথনাথ বিশী | তারাপদ ভট্টাচার্য |
| কুমারেশ ঘোষ | দিলীপকুমার সেনগুপ্ত |
| শ্রীবিরূপাক্ষ | ও |
| সবিতা সেনগুপ্ত | নির্মল সেনগুপ্ত |

:: এ ছাড়া আছে ::

এ মাসের গান ও অনুষ্ঠানসূচী

---

প্রচ্ছদ

ওঁ সরসাগরসম্ভারভেরালঙ্কৃতোরসে।
বরপালস্তনভরপ্রহরিবলিবর্তনে।
মৃদুলাস্যে সুবদনে চারুদেহলতান্বিতে।
হরকান্তকুরঙ্গেরক্ষণকুতুকিন্যুতে।
বিচিত্রশাটকনানাবর্ণচন্দ্রাবিভূষিতে।
জগদ্ঘোষেরজননি ত্রিলোকং বিশ্বিনং তথা।
নারায়ণীং নমস্তুভ্যং পাহি পাহি ভবার্ণবে।
বহ্নিজ্বালাকিরীটেশ্বরী কোটিসূর্যসমপ্রভে।
ভয়ানামুগ্রদংষ্ট্রাবিষ্ফোটেরৈরাকালসমাস্থিতে।
সর্বস্বরূপায়ে সর্বেশ্বরীরে সর্বশক্তিসমন্বিতে তথা
এবং শক্তিস্বরূপেশ্বরী ভয়েভ্যো নস্ত্রাহি দুর্গে নমঃ

শিল্পী : ইন্দ্র কুমার

---


সম্পাদক : সুচেতা বসু

প্রকাশক : এস. সিংহ রায় ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩।

মুদ্রক : সুবোধকুমার মিত্র বসু
ঈশ্বরী প্রেস লিমিটেড, ৫২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯।



এবার পূজায় সবার মুখেই একই কথা—একই নাম !!

# শৈললাল মনিলাল ষ্টোর্স

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (বসুমতী বিল্ডিং-এর পাশে)

কারণ

এদের প্রত্যেকটি শাড়ী প্রত্যেকটি পোষাক লোভনীয় ও মনোরম

এবং

ন্যূনতম দাম প্রত্যেকটি মালের উপর লেখা থাকে !

• গোয়ালিয়র, বম্বে ডাইং, বিন্নী ও মফতলালের স্যুটিং সার্টিং সুলভে।

• মনোমত স্যুট ও সার্ট এখানেই অর্ডার দিন।

ফোন : ৩৪-৮৬৫৭



ছবি তোলায় সহযোগিতা করেছেন : চন্দন ফোটো-টাইপ, বি আর্টিস্টস্, বেঙ্গল ফোটো-টাইপ এবং ঈশ্বরী প্রেস লিমিটেড।

ছবি এঁকেছেন। কলকাতার আর্ট-স্কুল কলেজ এবং আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস-এর

রবীন্দ্রনাথ রায় মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র চৌধুরী সুব্রত রুদ্র, দীপালি ভট্টাচার্য মনোজ সরকার, কৃষ্ণা বসু

এবং

সতীশ রায় ও অন্যান্য শিল্পীরা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই সংখ্যার সুষ্ঠুরূপ সম্পাদনার জন্যে আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি—এঁদের সকলের (সংক্ষিপ্ত নাম) ও শেখর চক্রবর্তী।

পরিবেশনায় ও মুখবন্ধে : রমাপ্রসাদ দোলুই, সুনীলরঞ্জন সেন, দিলীপকুমার সাহা ও লোচন পাঠক।

# প্রবন্ধ

# প্রবন্ধ

## সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় রাগ-রাগিণী—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ | ৭ |
| মহাপূজায় শাক্ত-বৈষ্ণবের মহামিলন<br>—জনার্দন চক্রবর্তী | ১৩ |
| কলকাতার দুর্গোৎসবে সাহেব আপ্যায়ন<br>—বিনয় ঘোষ | ১৪ |
| শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা—স্বামী প্রভানন্দ | ১৬ |
| সুবেদার মুকুন্দ রাম—সুভাষ সমাজদার | ১৭ |
| রোমান লিপিতে 'দুর্গেশনন্দিনী'<br>—প্রমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৮ |
| নেতাজীর অপ্রকাশিত পত্র—জনমেজয় | ২০ |
| নট ও নাট্যকার—শশাংকশেখর সান্যাল | ২৩ |
| রামমোহনের লেখা দলিল—সুধীরকুমার মিত্র | ২৭ |
| সেকালের বাজার দর—উষারাণী সান্যাল | ৩১ |


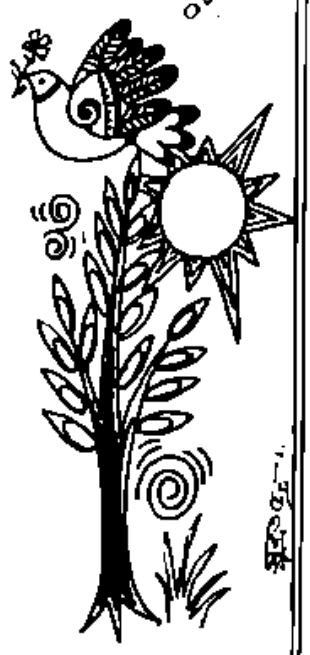

# বেতার জগৎ

৪৬ বর্ষ, ১১ সংখ্যা। 46th Year, Vol. 19

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ : ৩১ ভাদ্র, ১৮৯৭ শকাব্দ

22 September, 1975 : 31 Bhadra, 1897 Saka

# শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় রাগ-রাগিণী

## স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান ও দেবদেবীর পূজায় নৃত্য-গীত-বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। একেবারে আদিম ও অনুন্নত যুগে—যখন মানুষের জীবনযাপনপ্রণালী ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সহজ-সরল ছিল তখনও বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্য, গীত, বাদ্যের অনুশীলন ছিল—যদিও সেই অনুশীলনরীতি পরবর্তী উন্নত সমাজের মতো ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গ্রহণোপরাগ, হরপ্পা প্রভৃতি নগরীর ধ্বংসস্তূপ থেকে নাসাগ্রদৃষ্টি যোগমূর্তি, বিভিন্নভঙ্গিতে উপবিষ্টা ও দণ্ডায়মানা নারীমূর্তি ছাড়াও অনুন্নত ধরনের কতকগুলি মূন্ময় আকারে বাঁশি, মাদল ও মৃদঙ্গজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে একটি নৃত্যপরায়ণা নারী-মূর্তি পাওয়া গেছে—যেগুলি থেকে প্রমাণ হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমাজে চারুশিল্পের অনুশীলন ছিল। পরবর্তী যুগের প্রত্নসম্পদ প্রভৃতি সুপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপ থেকেও গীত-বাদ্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সুপ্রাচীন যুগের নৃত্য-গীতাদি দেবদেবীদের পূজার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হোত কি-না এবং ঐ নৃত্য-গীত-বাদ্যের রূপ ও প্রকরণ-পদ্ধতি কী ধরনের ছিল? বেদাদি বৈদিক সংহিতা, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যাদি বৈদিক যুগের নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিস্তৃত পরিচয় দান করে। বৌদ্ধসাহিত্য অবদান প্রভৃতি থেকেও আমরা জানতে পারি, সঙ্গীত, চিত্র ও চিত্রশিল্পের রচিত বাজারের ও খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকে বজ্রযানী বৌদ্ধ-সাধকদের সম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিক ভাবের রচিত চর্যা ও দোহাগীতিগুলি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও বিশেষ করে অবাধ-সাধনার বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হোত।

বৈদিক যুগে বিভিন্ন যজ্ঞদেবতাকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুত দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠ ও সামগান করার জন্য সামগ-ব্রাহ্মণেরা নিযুক্ত থাকতেন। গানের সঙ্গে বাদ্য ও নৃত্যেরও ব্যবস্থা থাকত। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান-সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন। "যজ্ঞের অগ্নিতে সেই সময়ে (বৈদিক কালে) সমস্ত দেব-দেবীদের আহ্বান করা হইত এবং যে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হইত সেই দেবতার নামে যজ্ঞীয় অগ্নির নামকরণ করা হইত।...বৈদিক যুগে মূর্তির প্রতিষ্ঠা ছিল না, হবা-বাহনী-অগ্নিশিখাই তখনকার যুগে প্রতিমার প্রচলন হইলে তখন সেই অগ্নিশিখার স্থানে দেবীর মস্তকের পরিবর্তে রক্ত হইয়া দাঁড়াইল।"

ইতিহাসে-রামায়ণে হৈমবতীরূপিণী অগ্নির উল্লেখ আছে। মুক্ত-কোপনিষদে (১।২।৪) কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরুচী প্রভৃতি সাতটি অগ্নিশিখার কথা আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণেও হর, সর্ব (বা শর্ব), পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব ও ঈশান এই শিবনামাঙ্কিত আটটি অগ্নির নাম পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণে শকতনয়া নামে একটি যজ্ঞ-বেদীর নামেরও উল্লেখ আছে এবং অন্যত্রও ঐ যজ্ঞবেদীকেই 'শকতনয়া' বলা হয়েছে। 'শকতনয়া' বা শকতনয়া দেবী দুর্গার নাম। দেবী দুর্গা মহা-শক্তিরূপিণী বিশ্বস্রষ্টাত্রি। প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে যেমন বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞানুষ্ঠান ছিল, তেমনি ছিল যজ্ঞান্তে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে হবি আহুতি দেওয়ার রীতি। ঐ সকল দেবদেবীর প্রীতি-সাধনের জন্য প্রথমাদি বৈদিক অনুষ্ঠান যান বা সামগান গাওয়া হোত। সামগানের সঙ্গে শিঙ্গোয়া, ঔদুম্বরী, শততন্ত্রীবীণ বাদ্য প্রভৃতি বাঁশি ও দুন্দুভি, দুন্দুভি, শঙ্খ প্রভৃতি চর্মবাদ্যের প্রচলন ছিল এবং যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণদের কুমারী কন্যাদের দ্বারাচালিত নৃত্য যজ্ঞকুণ্ডের চারদিকে ঘুরে ঘুরে করতো। সুতরাং বৈদিক যুগে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে আহূত দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে নৃত্য-গীত-বাদ্যের যে প্রচলন ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিকোত্তর যুগে যা গান্ধর্বগানের যুগে বিচিত্র প্রকারের জাতি, প্রস্তার, ভাষা, অন্তরভাষা প্রভৃতি গানের সঙ্গে গানের প্রচলন ছিল বিভিন্ন মাঙ্গলিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে, কিন্তু একথার মতো সেই সময়ে দুর্গাপূজা বা নির্দিষ্ট কোন শক্তিপূজার অনুষ্ঠান ছিল না, সুতরাং দেবীপূজার উদ্দেশ্যে রাগ-রাগিণীদের অনুশীলনেরও কোন প্রশ্ন ছিল না।

রামায়ণে দেবীপূজার প্রসঙ্গেই বলি, রামায়ণে দেবী দুর্গার নির্দিষ্ট রূপের কোন উল্লেখ নাই, তবে শাকম্ভরী, কাত্যায়নী প্রভৃতি দেবীনামের উল্লেখ পাই পৌরাণিক যুগে। অনেকে বলেন 'রাবণো জগর্জাথ রামমন্ত্রগ্রহায় চ অকালে বোধিতো দেবী.....' শ্লোকটি বাল্মিকী-রামায়ণের নয়, ঐ শ্লোকটি আদলে প্রক্ষিপ্ত। রামায়ণের চল-প্রত্নে প্রত্নতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিকদের অভিমতে রাম-চন্দ্র অকালে অর্থাৎ অসময়ে দেবীপূজা করেন নি[১] করেছিলেন সূর্যপূজা। তিনি বলেছেন। "According to the *Ramayana*, VI. 105, Rama worshipped Surya, the Sun-god, and not Durga, at the instance of the Sage Agasta ....." (vide *Indo-Aryan Races*, p. 113). কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বিষ্ণু পুরাণে ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীমাহাত্ম্যে দেবী দাক্ষায়ণীকে দুর্গা বলার পরম্পরায় শত্রুর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে পূজা করা হোত। শত্রুনাশিকাদেবী দেবী শাকম্ভরীই ক্রমে হয় পরবর্তীকালে শ্রীদুর্গা নামে পরিচিত হন। প্রাচীনকালের বিভিন্নস্থানে দুর্গাদেবীর উল্লেখ আছে, কিন্তু দেবী দুর্গা সেখানে কুমারী, মোহিনী বা স্বর্গ-বর্গী নন। তা ছাড়া মহাভারতে উল্লিখিত দুর্গা শিবশক্তি নন, কুমারী। তবে মহাভারত থেকে জানা যায়, শ্রীদুর্গা তখন আর্যজাতি-পূজিতাই ছিলেন।

তবে আর্যজাতির পাশাপাশি অনার্যজাতির ভেতরও শক্তিপূজার প্রচলন ছিল—যেমন ছিল আর্য-সঙ্গীতের পাশাপাশি অনার্যজাতির সঙ্গীত। দেখা যায়, বিন্ধ্যাচলের অধিবাসী অনার্য শবরজাতি শক্তি-পূজক ছিল ও শ্রীদুর্গা শবরজাতির নিজস্ব দেবী নয়ে পূজিতা ছিলেন। হরিবংশে ৩১ শ্লোকে ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে ৫০৩ শ্লোকে দেবী দুর্গা কিরাতিনী-নামে পরিচিত, তেলুগু অরণ্যচারী কিরাতজাতিও শক্তির উপাসক ছিল ও তাদের পূজিত দেবী কিরাতিনী। বলা হয়েছে—অষ্ট্রেরবর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা। সুতরাং দেখা যায়, শবর, বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্যজাতি যেমন সঙ্গীতপ্রিয় ছিল ও তাদের জাতীয় সুরের নাম ছিল শবরী বা সাবরী, পুলিন্দিকা প্রভৃতি, তেমনি তারা ছিল শক্তিপূজক ও তাদের উপাস্যা দেবী শবরী দুর্গাদেবী মহা-মায়ের ও নানা ঘরা রক্তমাংসাদি উপচারে তারা পূজা করতো। 'দুর্গোৎসব-বিবেক'-গ্রন্থে আচার্য রঘুনাথ কালিকাপুরাণ থেকে শবরজাতির শবরোৎসবের যাথার্থ দিয়েছেন। 'অভি-ধানচিন্তামণি'-র পরিশিষ্টে পণ্ডিত আবিড়া দেবিকা দুর্গা তথা পূজা পর্যায়ভুক্ত।

দুর্গাকল্পলতা অন্তর্হিতাম্বিকা দিবা-করাঃ ১০৭ সর্গ আছে—রামায়ণ রামায়ণাধ্যায়ে "।

[১] দেখা যায়, কবি কৃত্তিবাস তাঁর রচিত বাংলা রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক অকাল-বোধনের উল্লেখ করেছেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। "শিবারো বলেন...অকালে বোধন কৈলে, পূজ দেবী অম্বিকারী। রাবণে যে এতদিনে-পাবাণ।... পূজি দুর্গা মহাপাপী...বিহিত চণ্ডী পূজা আমা।" কিন্তু তাঁর রচিত লঙ্কার রামায়ণে (দেবকাণ্ড, ১০৫ সর্গ, পৃঃ ১১৮) আছে ব্রহ্মার সূর্যপূজার কথা। সূর্যবিজয়ের প্রীতিলাভ তাই রাম-চন্দ্র করে সূর্যপূজা করেন। পশ্চিমাঞ্চলে সম্প্রদায় দেবীপূজাপরায়ণ। পূজার বিসর্জন করার ভূমিকম্পের।

মেঘদূত দেবী দুর্গার 'কিরাতী' ও 'কিরাতিনী' নামের উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন সাহিত্যে, মহাকাব্যে ও এমন কি বাণিজ্যিক চমাসেও 'কিরাতিনী' নাম মহালক্ষ্মিদের শ্রীদুর্গার উপাসনা ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সম্পাদিত্রের অনার্যজাতির অনেক ধর্মানুষ্ঠান ও সংস্কৃতির সঙ্গে সুদূরা আর্যজাতির আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির মিল পাওয়া যায়। বিন্ধ্যাচলের অনার্য শবরজাতি যে শবরী-দুর্গার পূজা-অর্চনা করতো তাঁর প্রমাণ নাম ছিল 'পর্ণ-শবরী'। পর্ণ অর্থে পাতা (হলুদ-পত্র)। শবরজাতি দেবীর পরিধেয় বস্ত্র বা পত্রাচ্ছাদন তৈরী হতো হলুদপাতা দিয়ে। এই হলুদপাতা ও হলুদ যা হরিদ্রা আর্য-জাতিপূজিত শ্রীদুর্গাপূজার ব্যবহৃত সংস্কৃত হরিদ্রাপত্রের (হলুদপাতার) সেবা যায়, অর্থে-জাতি ও অনার্য-জাতির মধ্যে কেন একটা ঐক্য বা সাদৃশ্যের নির্দশন পাওয়া যায় এবং তারা পাশাপাশি বসবাসের ফলেই পরস্পরিক এক মৈত্রীভাব ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সম্পাদিতের বেলায়ও তাই।

পুলিন্দ দেবি, শবরজাতির মতো বিন্ধ্যপর্বতবাসী হোল বা আতীর (আভীর, আহির বা গোপেরা)-জাতিও হালে কৃষ্ণসহযোগে দেবী দুর্গার পূজা-অর্চনা করতো। শোনা যায়, শবর, আভীর, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য ও অনুন্নত জাতির দেবী-পূজায় নৃত্য-গীত-বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। ঐ ব্যবস্থা শুধু অনার্যদের মধ্যেই সীমিত ছিল না, সুসভ্য আর্যরাও তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং বিশেষ করে দেবদেবীর পূজানুষ্ঠানে নৃত্য-গীত-বাদ্যের অনুশীলন করতো। মনে হয়, ঐ অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যানুসারেই এখনো-পর্যন্ত ভারতের হিন্দু-জাতিতে প্রত্যেক ও ভেদবাদীন্ত করে রেখেছে।

বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় ১৮শ-১৭শ শতাব্দের ভারতীয় হিন্দুসমাজে দুর্গা-পূজার সম্পাদিতের অন্তর্নিবেশ ঘটে এবং কালিকাপুরাণের দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে নবপত্রিকার স্নানাভিষেকে যে সকল রাগ ব্যবহৃত দেখা যায়, সেগুলির বেশীর ভাগই দেশজাত ও জাতিজাত। ভারতীয় সম্পাদিতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখি, খ্রীষ্টীয় শতকের আরম্ভকালে বহু অনার্য জাতির জাতীয় সম্পাদিতের সূত্র যে আর্যসম্পাদিতের ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করেছিল খ্রীষ্টীয় ৫ম-৭ম শতকে রচিত সম্পাদিতশাস্ত্রী মতঙ্গ-রচিত 'বৃহদ্দেশী' (বৃহদ্-দেশী)-গ্রন্থই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। অচার্য মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে আর্য ও অনার্য এই উভয় সম্পাদিতেই পরিচয় দিয়েছেন এবং বলেছেন, ভারতীয় সম্পাদিত-সমাজে তখন অনার্য শ্রুতিবন্ধের অনুষ্ঠান হয়েছিল (খ্রীষ্টীয় শতকের শতকেই)। তখন থেকেই সেই সংস্কার-কর্ম চলতে থাকে প্রায় খ্রীষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতক পর্যন্ত, কেননা সম্পাদিত-রত্নাকরোক্ত সম্পাদিত পুরুষশ্রুতিতেও তার নিদর্শন মেলে। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ বলেছেন। "চতুঃস্বরা প্রকৃতি নামানী—শবর-পুলিন্দ-ভাষাযান-বন-কিরাত-বাহ্লীক-অন্ধ্র-দ্রাবিড়-কার্নাটিক্ প্রভৃতয়ঃ". অর্থাৎ চারস্বরযুক্ত সম্পাদি বা গান মার্গসঙ্গীতের অন্তর্গত ছিল না, আর ঐ চার স্বরযুক্ত গানের অনুশীলন ছিল একমাত্র শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, বাহ্লীক, অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনুন্নত অনার্যজাতির ভিতর। লক্ষ্য করার বিষয় যে, বঙ্গ বা বঙ্গ-বঙ্গ (আসাম, বিহার, বাঙ্গলাদেশ ও কলিঙ্গ বা উড়িষ্যা) তখন (খ্রীষ্টীয় ৫ম-৭ম শতকে) অনার্য দেশগুলোই গণ্য ছিল। যদিও এখনে তুলনার বিষয় নয়, তবুও উল্লেখযোগ্য যে, বৈদিক সামগান পাওয়া গেছে পাঁচটি স্বরে ও একমাত্র হৃদ ও সাত স্বরের ব্যবহার ছিল বেদের কৌথুমীয় শাখায় গানে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের অনার্যজাতির বিবরণ আছে এবং প্রাচীন বাঙ্গলাদেশের শবর, পুলিন্দ, কোল, চিল, সাওতাল, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজজাতিরা ভারতের ঐ আদিমবাসীদেরই বংশধর। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর *History of Ancient Bengal*, বিমলাচরণ লাহা *Some Ancient Indian Tribes*, নেলটের *The Wild Tribes in Ancient History* প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন বাঙ্গলার আদিম জাতিদের বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন। ভারতের বাইরে পূর্ব ও দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলিতে বিভিন্ন অনার্য ও অনুন্নত জাতির বসবাস কম ছিল না। একথাও সত্য যে, ঔন্নত ও সভ্য আর্যজাতির পাশা-পাশি বা কিছুটা পৃথকভাবে অনুন্নত অনার্যজাতিরা বাস করার জন্য তাদের ভাষা, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও ধর্ম এবং অনেকাংশে শিল্প-সংস্কৃতিরও মিশ্রণ ঘটেছিল দেখতে পাওয়া যায়।

ঐতরেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণে আভীর, আন্ধ্রী, শবর, পুলিন্দ, কিরাত, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির সংস্কৃতি ও কৃষ্টিবিস্তারের কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া আছে। প্রাচীন সম্পাদিতশাস্ত্রে শবরী (সাবরী, শ্রবরী), আন্ধ্রী, পুলিন্দী বা পুলিন্দিকা, আভীরী (আহিরী) প্রভৃতি সুর তথা গ্রামের উল্লেখ আছে দেখতে পাওয়া যায়। ভৈরব ও ভৈরবী বর্তমানে ভারতের আর্যসম্পাদিতের অন্তর্ভুক্ত রাগ ও রাগিণী, কিন্তু আসলে এরা জন্মলাভ করেছিল হিমালয়-অঞ্চলের আদিম 'ভীল্লবা'-জাতির জাতীয় সুর থেকে। টঙ্ক-রাগ বা রাগিণী এখন অভিজাত আর্যসম্পাদিতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আসলে সিন্ধুদেশের তাঁরে এই 'টঙ্ক'-নামধারী আদিম চৈত্রজাতির জাতীয় সুর থেকে টঙ্করাগ জন্মলাভ করেছিল। বোট্টরাগ এখন আর্যসমাজের রাগ এবং শাস্ত্রদের সঙ্গীতরত্নাকর রাগ নয়েছেন করেছেন, কিন্তু আসলে বোট্টরাগ পার্বত্য ভোটদেশের (তিব্বতের) জাতীয় সুর থেকে জন্মলাভ করেছে। অচার্য সারঙ্গদেবের (১১৭৫-১২৫০) 'সঙ্গীতরত্নাকর'-গ্রন্থে অনার্য ভীলবাল্লাতির জাতীয় গানের সুর থেকে ভৈরবরাগের সৃষ্টি-প্রসঙ্গে আভীর, শবর, চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির গানের সুর থেকে আভীরী বা আভীরী প্রভৃতি রাগের সৃষ্টির কথা বলেছেন। পরে ঐ সকল সৃষ্টী-কৃত রাগকে দেবদেবীদের পূজা-অর্চনায় উপযোগী ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, ভৈরবকে শিবমূর্তি-রূপে কল্পনা করে ধ্যান রচনা করা হয়েছে—'গন্ধারাখ্য পঞ্চমজাতিরাগক-শিবস্যেদং' প্রভৃতি; ভৈরবীকে শিব-পূজার রত পূজারিণী প্রভৃতি রূপে কল্পনা করা হয়েছে—'...বিকচকমল-পত্রিবর্তবতী মহেশায় প্রভৃতি,তেমনি টঙ্ক বা টঙ্করাগকে লক্ষ্মীপূজার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়েছে—'লক্ষ্মী-প্রীতিকরায়ম্' এবং পার্বত্য বোট্ট বা ভোট-রাগকে ভবানীপতি শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

দেশজাত ও জাতিজাত রাগ যেমন, গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার) থেকে জাত বা গৃহীত গান্ধার বা গান্ধারী-রাগ, কলিঙ্গদেশ থেকে কলিঙ্গড়া বা চলিত কথায় কলেড়া, পূর্বদেশ থেকে পূর্বগী ও দক্ষিণ-পূর্বগী প্রভৃতি রাগের উৎপত্তি, বঙ্গদেশ থেকে বাঙ্গালী বা বঙ্গালরাগ, গৌড়দেশ থেকে গৌড়ী, মহারাষ্ট্র থেকে মহারাষ্ট্রী, দক্ষিণদেশ থেকে দাক্ষি-ণাত্য, দ্রাবিড়দেশ বা দ্রাবিড়জাতি থেকে দ্রাবিড়ী, সিন্ধুদেশ থেকে সৈন্ধবী, সিন্ধু ও সিন্ধুড়া, বালদেশ থেকে বালশ্রী বা বালশ্রী রাগ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিদেশের ও বিদেশী জাতিদের গানের সুর-গুলিকেও ঔদারদৃষ্টিসম্পন্ন ভারতীয় সমাজ পরিত্যক্ত করে নিজের ভাণ্ডারে গ্রহণ করেছিল। যেমন শক অর্থাৎ সিথীয়ানজাতি থেকে শক-রাগ, শতভিষকরাগ, তুরুষ্ক থেকে তোড়ী বা তুরুষ্কতোড়ী, আরবদেশ থেকে হর্ষদেশক্রম, পারস্য থেকে পার্সীক প্রভৃতি রাগ ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজে প্রবেশ লাভ করে-ছিল। তুরুষ্ক-পরমেশ্বরাত সুর তোড়ীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তুরুষ্ক-তোড়ী নামে পরিচিত হয় ও পণ্ডিত সোমনাথ ১৭শ খ্রীষ্টাব্দে তার লক্ষণ রচনা করেছেন। "আরবনীতিনি-বোদা..." প্রভৃতি। মতঙ্গ বৃহদ্দেশী-গ্রন্থে সকল প্রকারের সৃষ্টিকৃত রাগ-রাগিণী-সম্বন্ধে বলেছেন, অধিকাংশ অনার্যজাতির সুরই গান্ধার জাতি-রাগ থেকে সৃষ্ট গ্রামরাগাদি থেকে জন্মলাভ করেছিল। যেমন তিনি বলেছেন,

বিন্ধ্যো গান্ধিনাত্যো দু
গান্ধারী তদন্তরম্।
খ্রীকণ্ঠীয়ে সৌরাষ্ট্রী
মালবশ্রী সৈন্ধবী তথা।
কালিন্দী চ পুলিন্দী চ
বিন্ধ্যবঙ্গোদ্ভবা নবা।

বিন্ধ্যবঙ্গোদ্ভাসকাল থেকে ঐ সকল দেশজ ও জাতিজ রাগরাগিণীর সৃষ্টি বা বিকাশ। আসল কথা এই যে, বিন্ধ্য-বঙ্গ-গ্রামরাগের সম্পর্কলোকে ঐ সকল অনার্যজাতির ও দেশজ রাগ-গুলিকে শুদ্ধ করে ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে গ্রহণ করা হয়েছিল ও তাতে ভারতীয় সঙ্গীত-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই সকল বিশুদ্ধীকৃত রাগগুলির কোনটি অভিজেকালবোধে, কতকগুলি দৃষ্টি ও নদী-উপাসনে, কতকগুলি বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, কতকগুলি মারণ-উচাটনাদি আভিচারিক কর্মে বা অনুষ্ঠানেও ব্যবহার করা হোতে। প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রী যাষ্টিক, কোহল, নারদ, ভরিল, ভরত, মতঙ্গ, পার্শ্বদেব প্রভৃতি দেশজ ও জাতিজ রাগরাগিণীর স্বরূপগঠন প্রয়োগপদ্ধতি ও প্রকাশ-শৈলীর কথা উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আর একটি নবজাগরণযুগের নিদর্শন পাওয়া যায়, কেননা তখন কেবলই ক্লিয়ালিষ্টিক স্বরগঠনের নয়, কিন্তু ভাইব্রিয়ালিষ্টিক দৃষ্টিতে রস ও ভাবের প্রয়োগে ও সঙ্গতগুণ রাগ-রাগিণীদের ভাবরস ও স্বরূপ ফুটাই গঠন করা হয়েছিল।[১] পণ্ডিত সোমনাথ সেই জাগরণযুগের পুরো-হিত ছিলেন।

রামায়ণের সংকলন-কাল মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০; সুতরাং সেই সুদূর অতীতকালেও জাতিজাত (রাগিণী, ভাষাতী, গান্ধারী প্রভৃতি) ও জাতিজাতের প্রচলন ছিল।

পণ্ডিত সোমনাথ (১৬৩১ খ্রীঃ) 'রাগবিবোধ'-গ্রন্থে অধিকাংশ ভার-তীয় রাগগুলিকে নামবর ও দেবতার সম্বন্ধে ভাগ করেছেন। তিনি বলে-ছেন,

শুদ্ধরাগাঃ শিবকরঃ পুণ্যা
রাগাস্তু বৈষ্ণবাঃ স্মৃতা।
নারায়ণ চ দেবস্তু
তস্য ভক্তোঽনেকস্তেষু পুনঃ।

গ্রামে শুদ্ধ নয়, সকল শব্দেই স্বর ও ব্যঞ্জন দুটি ধর্মের সমাবেশ থাকে। তার মধ্যে স্বরধর্মকে অনুরো-ঞ্জনাত্মক বলে ও ব্যঞ্জনধর্ম স্বরের সহায়ক। সেজন্য ভারতীয়রা উভয় ধর্মকে পার্বতী-পরমেশ্বরের রূপে

[১] জন্মাদন সাতটি জাতিরাগের রস, ভাব, ভাবরোস প্রভৃতির পরিচয় পাই।

# বেতারে এই পক্ষ

## অনুষ্ঠান পরিচয়

১—১৫ অক্টোবর, ১৯৭৫

### ॥ নাটক ॥

এ পক্ষের প্রথম নিবেদনেই বিজয়ন্তী উৎসব-এ মেতে উঠবে বাংলার অগণিত শ্রোতা। রচনা—সুবোধকুমার চক্রবর্তী, পরিবেশনা—কুশীলব শিল্পী ও সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রযোজনায় রয়েছেন সুপরিচিত নাট্যকার দেবকীকুমার বসু। বিষয় আছে, এটি শোনা যাবে ৫ অক্টোবর, রাত ৮টায়। পরের দিন বিকেল ৪টায় মাঝারি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনায় রয়েছেন সুপরিচিত নাট্যকার বেলারানী। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, শৈলেন চৌধুরী, সুবোধ গাঙ্গুলী, সুনীল দত্ত, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুধীর মুখোপাধ্যায়, সুধীর সরকার, সুধীর দত্ত, সুধীর ভট্টাচার্য, সুধীর বসু, সুধীর চক্রবর্তী

পণ্ডিত মহোদয় ঘটেশ্বরীদেবীর ধ্যান-মন্ত্র দিয়েছেন এইভাবে—

অক্ষরস্রক্‌সুশ্বিভ্রতেক্ষু, পদ্ম
শুক্লদ্যুতিং কুণ্ডলিনী প্রমত্তা।
সঙ্কেতপদ্মাং বিশদি প্রবেধে
ঘণ্টেশ্বরী ঘাতকিকেক্ষমুক্তা॥

নিম্নে উদ্ধৃতপাঠান্তরটিদেখা—

(২) কালিকাদেবীর ধ্যান—

কৃষ্টিলো কালিকে কালিকো
বিকটোহয়ং বিনীতোহয় কৌন্।
দর্শাহি বক্ত্রং চাঙ্গু পঙ্গু ছিন্নম্।
এতদেব নাকৃত পঠ ও নাকিকা বাঁওটা।

(৩) বিরাজ ধ্যান—

বিরাজ-রূপ বা রাজিনীর ধ্যানের উল্লেখ পণ্ডিত মহোদয় করেন নি, সূত্রাং 'মালিনীবা'-শব্দ থেকে এর ধ্যানমন্ত্র দেওয়া হোল—

শুভ্রাম্বরো গৌরবর্ণা সুকোন্তি
বীরেন্দ্রসংকুলমহেন্দ্রা।
অন্তরালের বৃহদ্ভৈপক্ষীমঙ্গে
বিরাজমান শব্দ চারুমূর্তিং॥

(৪) ভৈরবরূপের ধ্যান—

অরুণিমুখলাবতী পঞ্চবহারী
ত্রিনেত্রা রক্তবস্ত্রান্বিতা।
ধূম্রলিঙ্গাক্ষোহিতেষ্টাহিভিন-
বিকটো ভৈরবঃ সর্বদা॥

ভৈরবরূপের পরে 'প্রাণিরূপ' বলা হয়েছে বলেছেরে ভুল। ভৈরব শিব-রূপে কল্পিত, সূত্রাং দুর্গাপূজায় এর ব্যবহার অপরিহার্য। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতকে পণ্ডিত মহোদয় ভৈরব-রূপকে বলেছেন 'শুভ্রাম্বরো জরাঠি রৈব ভাবিবাধা'। ভৈরবের বিভিন্ন রূপের উল্লেখ আছে, যেমন শুদ্ধ-ভৈরব, সিদ্ধেশ-ভৈরব, নটভৈরব, আনন্দভৈরব, আহ্লাদভৈরব (বা আহ্লাদ-ভৈরব), ক্রোধভৈরব, বাঙ্গাল-ভৈরব, ক্ষেত্রভৈরব, টঙ্কভৈরব, প্রজাপতিভৈরব প্রভৃতি। দুর্গাপূজায় শুদ্ধভৈরবের ব্যবহার হয়।

(৫) ক্ষেমরূপের ধ্যান—

জটিলোয়ং দ্বিযোনিস্থঃ
সর্বাভরণভূষিতঃ।
গদাখড়্গধরঃ শ্রীমান্ ক্ষেমরূপঃ শিবঃ
স্মৃতঃ॥

ক্ষেমরূপ তন্ত্রশাস্ত্রী, ধ্যানমন্ত্র, আনন্দ-সন্তানানন্দ, সূত্রাং দেবীপূজায় এর ব্যবহার স্বাভাবিক।

(৬) ঘণ্টাকর্ণ বা ঘণ্টাকীর ধ্যান—

ভদ্রকর্ণী কর্ণে সকলমন্ত্র অধোরন্তী
পরিহর ভুল দোরী।
নীলাশ্বরা ঘণ্টাকর্ণী সুরেন্দ্র-
কুলমেঙ্গলকারিকা॥

পঞ্চমোক্তমন্ত্রে ও নীলাম্বরী এই ধ্যানী।

(৭) বসন্তরোগের ধ্যান—

কেলকিকিলকে এর তর্পণিতপ্রাণকৃত
শিবরূপ বহুধে।
অন্নপ্রকাশে কলকত্তা গৌরমন্ত্রেয়
ভগলাভক্ত॥

বসন্তের রূপও অনেক রকম। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে যে সকল বসন্তরোগ বা রাজিনীর প্রকোপ আছে তা লোকের ধ্যান ও রূপ-এর ১ম ভাগ প্রকটিত। দুর্গাপূজায় পুষ্পবসন্তেরই প্রবেশ।

(৮) ঘণ্টাকী বা ঘণ্টেশ্বরীর ধ্যান—

দুর্গাভক্তিতন্ত্রা বিহ্বলহরা লিপ্তকী
পটে পরিহর মুক্তা।
স্পর্শিতকুক্ষা সিতপদ্মা শিবর্ধাস্থিরা
ঘণ্টাকী॥

ছবিতেকী, ধ্যানোচিতেকপাদা ঘণ্টা-কীর নামিকা ভোবিতপতিকা। ছন্দ-মতে ঘণ্টাকী শ্রীরামের রাজিনী। ঘণ্টাকীর আর একটি নাম 'ঘণ্টাকী'—মহাবিদ্যাদেবী শাকম্ভরীদেবী শ্রীদুর্গার রূপের সম্পর্কিত। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতকে রামমোহন সেন ঘণ্টাকীকে 'নবীন যোগিনী' বলে ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ করেছেন। এই রূপ বা রাজিনী সাধকের মনে দুটি ভাবের সঞ্চার করেঃ (১) নির্বেদের বা বৈরাগ্যের ভাব ও (২) মিলন ও বিচ্ছেদের ভাব। দেবীর আগমনে মিলন ও আনন্দ এবং দশমীতে বিজয়াদশমীর বিচ্ছেদের বিরহ-বেদনা ভারতের ও বিশেষ করে বাঙ্গালাদেশের মানুষ-মাত্রই অনুভব করে।

অষ্টাটি রূপের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে কালিকাপুরাণের দুর্গাপূজা-পদ্ধতিতে লেখা হোয়েছে। তাছাড়া রামপদ্ধতি পাওয়া যায় মুখ্যতঃ দুর্গাপ্রতিমা ও তাঁরই প্রতীক নব-পত্রিকাকে লক্ষ্য করে। দশভুজা মুখ্যতঃ প্রতিমার প্রবর্তন করেন সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মনুসংহিতার টীকাকার কুলুকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালকে এক নবসৃষ্টির যুগ বলেন ঐতিহাসিকরা, তাঁরই সময়ে বিশেষ করে বৃন্দাবন ও মথুরা-অঞ্চলে স্বামী কৃষ্ণ-দাস (চৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ কৃষ্ণদাস নন), স্বামী হরিদাস ও অন্যান্য বিশিষ্ট বৈষ্ণব-সাধকরা 'ধ্রুবপদ' গীতরীতিতে গানরসী ছিলেন। মিঞা তানসেনের অভ্যুদয় সেই সময়ে। ঠিক ঐ সময়েই মোগল মনসবদার আবদুল রহিম খানখানা কবিত্বশক্তির কবি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সাধক গোস্বামী তুলসী-দাস প্রায় ঐ সময়েই 'রামচরিতমানস' রচনা করেন। মনে হয়, আবদুল রহিম খানখানা তাঁর একান্ত বন্ধু তুলসীদাসকে 'রামচরিতমানস'-রচনায় কিছু কিছু সাহায্য করেছিলেন।* রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড প্রভৃতি সাধকেরা সন্ধীত-জগতে ঐ সময়ে অমরত্ব-প্রদানের কথা প্রবাহিত করেছিলেন। প্রাচ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাচীন সাহিত্য তাঁর মথুরা-পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক *Archaeology of Mathura* গ্রন্থেলিখিত কবি ও পাঠানকলিজের জীবনের ও শিল্পসাধনার অনেক পরিচয় দিয়েছেন। খ্রীষ্টীয় ১৫শ-১৭শ শতকে রচিত বাঙ্গলার মঙ্গলকাব্যগুলি দেবী-মাহাত্ম্যের মহিমা-বর্ণনায় মুখরিত। বিশেষ করে স্মার্ত রঘুনন্দন শ্রদ্ধিতত্ত্ব-তত্ত্বে ও তাঁর বিখ্যাত দুর্গা-চন্দ্রিকাবলিনী-গ্রন্থে মুখ্যতঃ দশভুজা দেবীর উল্লেখ করেছেন। তবে দুর্গাপূজাকে চিরন্তনী-প্রতিমায় রূপায়িত করার বিশেষ কৃতিত্ব সম্ভবতঃ কবি নীলকণ্ঠ ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'সুরথতাঁ' টীকা-চরিতা ভাস্করনারায়ণ*। ঐতি-হাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ও স্বর্গত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় ভাস্করের বিচিত্র স্থানে ও বিশেষ করে প্রাচীন বাঙ্গলার ভাস্কর-ধারা ও উপাদিষ্ঠা বিচিত্র হস্তবিলিষ্টা দুর্গামূর্তির পরিচয় দিয়েছেন।

কালিকাপুরাণে দেখা যায়, দেবীকে সম্প্রদায়ের জলে স্নান করানোর পর মন্ত্রপূত আরও চারটি ঘটের জলে স্নান করানোর। নবপত্রিকা বা কলাবউকে গণপার স্নান করানোর পর পুজামণ্ডপে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। কালিকাপুরাণের কোন কোন সংস্করণে আছে : 'মহাস্নানের অষ্টাটি জলটৈ আনবে'। স্বর্গত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'পুরোহিতদর্পণ'-গ্রন্থে (১৩০৫, পৃ ৮০৩) আছে : 'পরে (চারটি ঘটের জলে স্নান করানোর পর) নবপত্রিকাদি-সহকারে দুর্গাদেবীকে (অর্থাৎ দেবীর প্রতীক-প্রতীক নব-পত্রিকাকে) পুজামণ্ডপে আনয়ন করিয়া প্রকৃত পূজার পূর্বে অষ্ট-কলসের মন্ত্রপূত জলের দ্বারা স্নান করাইবে।' বিধির পার্থক্য যেমনই হোক না কেন, নবপত্রিকাকে আটটি কলসের পবিত্র বারিতে স্নান করানো হয় মন্ত্রোচ্চারণ আটটি ঘটে ও বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণে। যেমন,

(১) 'মালবরাজ বিজয়াবাসায় কৃষ্ণা গঙ্গাজলপূরিত ঘটেন স্নাপয়ে।' গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করানোর মন্ত্র—

ওঁ সুরেন্দ্রমাতিরিক্তস্তু ইন্দ্র-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
যোগ-সঙ্গমসম্ভূতস্তেন আপোদন-
কলসেন তু॥

মন্ত্রের স্বরূপ—ক (অথর্ব) ও ঋ (অথাম), সম্পূর্ণজাতি॥ সা গা/ঝা গা/। পা/পা/গা/ঝা গা/ঝা সা/—প্রভৃতি।

(২) 'কালিতরাজ দুন্দুভিবাসায় কৃষ্ণা বৃষ্টিজলপূরিত-ঘটেন স্নাপয়ে।' বৃষ্টিজল দ্বারা স্নান করানোর মন্ত্র—

ওঁ মহতস্তাতিরিক্তস্তু ভবিষ্যন্তঃ
সুরেশ্বরাঃ।
মেঘাম্বুপরিপূর্ণেন ঘিতরীয়-
কলসেন তু॥

ঋষিছন্দের স্বরূপ—ক ঋ ঋ ঋ (উত্তর অথাম) ও সম্পূর্ণ জাতি॥ ঋা ঋা/ঋা ঋা/ঋ মা/ঋা ঋা/সা মা/ঋা সা/—প্রভৃতি।

(৩) 'বিজয়রাজা দুন্দুভিবাসায় কৃষ্ণা সরস্বতী-জলপূরিত ঘটেন স্নাপয়ে।' মন্ত্র—

ওঁ সরস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন
সুরোত্তমে।
বিজয়েরাজাভিষিক্তস্তু তৃতীয়-
কলসেন তু॥

বিজয়ের স্বরূপ—ঋ-বর্জিত, মাত্রাজাতি॥

সা ঋা/ঋা পা/-। গা/গা প/ঋা পা পা রা/—প্রভৃতি।

(৪) 'ঈশ্বরোরাজ ভীমবাসায় কৃষ্ণা সাগরোদকেন স্নাপয়ে।' মন্ত্র—

ওঁ শঙ্খাদ্যাভিরিক্তস্তু
লোকপাল্য সমাবৃতঃ।
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থ-
কলসেন তু॥

ঈশ্বরের স্বরূপ—ঋ ঋ ঋ (কোমল) -কাকলি, সম্পূর্ণ জাতি॥ ঋা ঋা/ঋা পা/সা সা/সা সা/ঋা সা/ঋা সা/—প্রভৃতি

(৫) 'কেশবরাজায় ইন্দ্রাজিবেকবাসায় বাসায় কৃষ্ণা স্নাপয়ে।' মন্ত্র—

ওঁ যাজিনা পরিপূর্ণেন পঞ্চমেন্দু-
সুধোদিনা।
পঞ্চমেনাভিষিক্তস্তু নামান্ত
কলসেন তু॥

স্বরূপ—ম ঋ (উত্তর মধ্যম), সম্পূর্ণ জাতি॥

সা মা/পা ঋা/পা পা/পঋা
মা/পমা পা/ঋমা/প্রভৃতি।

(৬) 'ঘণ্টাকী (বা ঘণ্টাকী) রাজায় পঞ্চরত্নবাসায় কৃষ্ণা নির্ঝরোদকপূরিত-ঘটেন স্নাপয়ে।' মন্ত্র—

ওঁ হিরণ্যেন মুকুটাদ্যাভিরিক্তস্তু
পর্বতঃ।
নির্ঝরোদকপূর্ণেন ষষ্ঠেন
কলসেন তু॥

ঘৈরাটীর স্বরূপ—ঋ ঋ ঋ কোমল—ঋ ঋ ঋ, সম্পূর্ণজাতি॥ পঋা মা/ঋা সা/সা সা/সা সা/-। পমা/ঋা সা/ঋা সা/-প্রভৃতি।

(৭) 'বসন্তরাজায় পঞ্চরত্নবাসায় কৃষ্ণা স্নাপয়ে।' মন্ত্র—

ওঁ সর্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলসেন
সুরেশ্বরীম্।
সপ্তমেনাভিষিক্তস্তু ঋষয়
সপ্তষষ্ঠকাঃ॥

বসন্তের স্বরূপ—উত্তর মধ্যম ও অথর কোমল—ঋ ঋ ঋ, পঞ্চম-বর্জিত, ষাড়বজাতি (বসন্ত বিচিত্র স্বরূপের বাকলেও এখানে ষাড়বজাতির বসন্তেরই প্রয়োগ করা হয়েছে)॥ সা মা/ঋা মা/ঋা গা/ঋামা নামা/ঋা মা/—প্রভৃতি।

(৮) 'ঘণ্টাকীরাজায় বিজয়াবাসায় কৃষ্ণা দুগ্ধজলপূরিত-ঘটেন স্নাপয়ে।' মন্ত্র—

ওঁ ঘৃতকুম্ভাভিষিক্তস্তু
কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্টকন্যাসমাযুক্তো দুগ্ধেনেবী
মহেশ্বরঃ॥

ঘণ্টাকীরাজের স্বরূপ—ঋষভ ও ধৈবত কোমল—ঋষভ, ঔড়বজাতি॥

গা ঋ/পা না/সা সা/সা/

সা না/র্কা সা/—প্রভৃতি।* বাদ্যশ্রী তথা বাদেশ্রী বা বসন্ত-রাগের প্রচলন একসময়ে বাঙলাদেশের সর্বত্র ছিল। তিরহুতে বাদ্যশ্রীর নাম তিরোতীয়া-বাদ্যশ্রী।

পাঁচটি স্বাদমন্ত্রে ব্যবহৃত পাঁচটি বাদ্য। (১) ঝিল্লরযাদ্য—ধাতুর কাংস্য ও শিঞ্জনিনির্মিত বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্টি।

(২) দুন্দুভিবাদ্য। বৈদিক সমাজে ভূমিদুন্দুভি, দুন্দুভি, পণব নামের প্রচলন ছিল। মাটিতে গর্ত করে পশুর চর্ম দিয়ে আচ্ছাদন করে ভূমি-দুন্দুভি তৈরী করা হোত। কাষ্ঠের যষ্টিকে কাঁপা করে একদিকে চামড়া ও একদিক বন্ধ করে দুন্দুভি তৈরী করা হোত।

(৩) তাঁতবাদ্য বলতে তৈরী বা চামড়ার ঢাক থেকে উৎপন্ন গভীর-শব্দ।

(৪) ইন্দ্রাভিঘেকবাদ্য — বাঁশীর সাহায্যে উৎপন্ন শব্দ।

(৫) শব্দবাদ্য—বিভিন্ন শব্দের শব্দ।

(৬) 'পঞ্চমবাদ্য' বলতে পাঁচটি বাদ্যের সম্মিলিত শব্দ। (১) ধাতুজ-শব্দ, (২) মানুষের কণ্ঠশব্দ, (৩) চর্ম-নির্মিত ঢক্কের শব্দ, (৪) বাঁশীর শব্দ, (৫) বাঁশী বা সানাইয়ের শব্দ। গ্রন্থের অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'সঙ্গীতবিজ্ঞান-প্রবেশিকা' (১১শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৪১, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩২০ পৃষ্ঠা) পত্রিকায় লিখে-ছেন: "প্রবন্ধচিন্তামণি প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে 'পঞ্চমহাশব্দ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। একমাত্র সপ্তাই যাতীত অন্য কোনও রাজা পঞ্চমহাশব্দের প্রয়োগের অধিকারী নহে।"

(২)

এবার দুর্গা রাগটি (রাগটি আধু-নিক, সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ১৮ শতকের শেষভাগে অথবা ১৯শ শতকের মাঝা-মাঝি সময়ে রচিত) দুর্গাস্তোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত না থাকলেও এর স্বরলিপি-সহ একটি গান এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ করি। দেখা যায়, আজ থেকে প্রায় ১৫৭ বছর পূর্বে ১২২৫ সনে স্বনামধন্য রামমোহন সেন 'সঙ্গীত-তরঙ্গ'-গ্রন্থে (১৬১ পৃষ্ঠায়) বাদশ্রী, জয়জয়ন্তী-দুর্গা — দুটোরই আলা-পানাদির উল্লেখ করেছেন। পুনরায় ঐ গ্রন্থের ১৭৪ পৃষ্ঠায় দুর্গারাগ (বা রাগিণী) কোন্ কোন্ রাগের মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন: "পরমেশতে দৌরী বাদশ্রী, ললিতাবতী (লীলাবতী?) এই চারি রাগে দুর্গা-রাগিণী মুদ্রিত"। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গ্রন্থের রামমোহন সেন পৃথক-ভাবে দুর্গা রাগিণীর কোন পরিচয় দেননি। তাই মনে হয়, ১৯শ শতকের সময়েও দুর্গা রাগ বা দুর্গা রাগিণী ভারতের ও বাঙলার সঙ্গীতসমাজে তেমন মর্যাদার আসন লাভ করেনি। আরও দেখা যায়, কাপ্তেন এন. এ. উইলার্ড তাঁর *Treatise on the Music of Hindoostan* গ্রন্থটি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপ্টিস্ট-মিশন প্রেসে মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন কলকাতা থেকে। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন লেডি মর্নিংটন, সি. বেণ্টিঙ্কের উদ্দেশ্যে। ঐ ইংরাজী গ্রন্থের ৫৮-৬২ পৃষ্ঠায় মিশ্র-রাগ-গুলির বেবনে পঞ্জিকা (তালিকা) তিনি দিয়েছেন (পৃঃ ৫১) সেখানে দুর্গারাগের নামোল্লেখ করে ঠিক 'সঙ্গীততরঙ্গ'-কার রামমোহন সেনের মতোই বলেছেন।

"Doorga. . . Maksree, Leela-vatee, Gouree and Sarang". কিন্তু সে যাই হোক, অদ্যাবধি কোন সঙ্গীতগ্রন্থেই (সংস্কৃত ও বাংলা) দুর্গারাগের স্বরূপ, তান ও গানের উল্লেখ পাওয়া যায় না—একমাত্র ২০শ শতকের সঙ্গীতগ্রন্থ ছাড়া।

দুর্গারাগ বা রাগিণীর পঞ্জিকা দিতে গিয়ে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'খ্রীমদ্ভাগবতসঙ্গীতম্'-গ্রন্থে চতুরাবাদ্যভট্ট বিষ্ণুনারায়ণ ভাত-খণ্ডেজী বলেছেন,

(১) অরোহে চারোহেহীন রি-প-হীনৈব লক্ষিতা।
গান্ধারোগ্রহ যতো বাদী
সাহচর্যে নিষাদকঃ।
গানং সন্ধীরিতং তজ্ঞৈঃ-
র্ষিতীক্ষ্ণপ্রহরে নিশি॥
সংগতি ধ-ম-রোদ্রাঙ্গা
বাদ্যশ্চিন্তবিলাসিনী।
গান্ধারঃ কোমলস্তত্র চ
চাষ্টশ্রুত্যন্তি তীব্রকঃ॥

এটি খাম্বাজ ঠাটের দুর্গা। বাদী-খাম্বাজ ও সংবাদী-নিষাদ, ধ-ন-সং-গতি। বাদ্যশ্চিন্তার জন্য, গান্ধার কোমল(ঋ) এবং বাকী স্বর তীব্র।

(২) বিলাবল ঠাটে দুর্গা রাগ ঔড়ব বা পাঁচস্বরত্ব ও সকল (পাঁচ)স্বরই শুদ্ধ। বাদী-ধৈবত, সংবাদী-গান্ধার, গান্ধার ও নিষাদ বর্জিত। অরোহণ —সা রা মা পা ধা/র্সা ও অবরোহণ— র্সা ধা পা মা রা/সা॥ বিলাবল ঠাটের দুর্গাকে দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে 'কীরবাণীরঞ্জনী' বলে। তবে দক্ষিণ-ভারতে 'শুদ্ধ সাবেরী' নামে একটি রাগেরও প্রচলন আছে—যার স্বর রূপ উত্তর-ভারতীয় পদ্ধতির দুর্গা রাগের (ঔড়বজাতির) মতো। তা ছাড়া দুর্গা ও কল্যাণের মিশ্রণে 'দুর্গা-কল্যাণ' নামে একটি আধুনিক রাগেরও প্রচলন আছে—যার রূপ— সা রা মা ধা পা ধা না—র্সা না ধা পা ধা মা গা, মা (শুদ্ধ) গা ধা সা। এর বাদী—ধৈবত ও সংবাদী—গান্ধার।

এখানে প্রচলিত বিলাবল ঠাটের দুর্গা রাগিণীতে রচিত দুটি গান, গান ও স্বরলিপি রচনা করে দেওয়া হোল॥

॥ দুর্গা রাগিণীর গান ॥

স্থায়ী—

(১) দেবীধ্যানেরতা শান্ত-মূর্তিত-
দুর্গিনী
চন্দনলাঞ্ছিতা কাঞ্চন-
চারুদেহা,
রক্তচকোরচিত্তা
হ্রাদিপদ্মোদ্ভব দুর্গা।

(২) চন্দনবরণী দুর্গা দেবীধ্যানে রত,
বেদনায় স্বর্গোদ্ভবে
ধারণপুলোকিত,
মহাদা-বদন, শান্তরসে
চিত্ত ভরা,
আশ্বিতে সবাই করে কল্যাণ
ধারা।

দুর্গা রাগিণীর গানদুটি বেবী দুর্গার সঙ্গে সম্পর্কিত করে রচনা করা হয়েছে।

দুর্গারাগের আরোহণ ও অবরোহণ সা রা মা পা ধা র্সা—র্সা ধা পা মা রা সা।

*রাগ ও রাগিণী দুটোর এক ও অভিন্ন, তবে নায়ক-নায়িকা-ভেদের পরিপ্রেক্ষিতে রাগকে পুরুষ ও রাগিণীকে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য প্রচলিত বর্গীকরণ দ্বারাও পুরুষ ও স্ত্রী-রাগরাগিণীকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব।

*লেখকের 'শ্রীদুর্গা'-গ্রন্থের পরিশিষ্টে রাগরাগিণীর সম্পর্কে স্বরলিপি দেওয়া আছে।

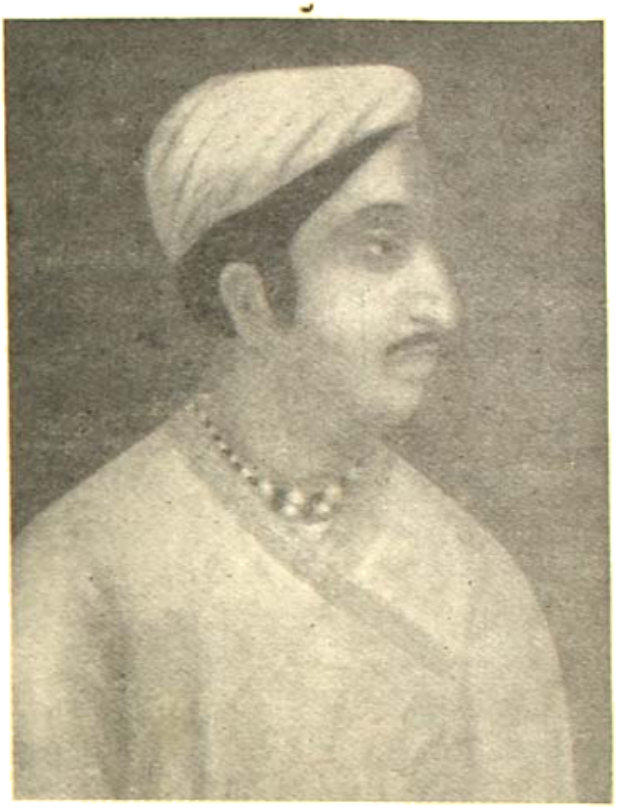

শিল্পী তানসেন

গান

কথা ও স্বরলিপি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

দুর্গে দুঃখহারিণী।
শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী
বিশ্বভয়হারিণী।
কিঙ্করনী শরণে
তুমি তারা ত্বরা।
সন্তাপহরণী ভবানী
জগজ্জনপ্রতিপালিনী॥
শূল-খড়্গধারিণী,
দৈত্যদর্পহারিণী
সর্বব্যাপিনী চণ্ডীকে,
মহামায়া মোহনাশিনী॥

পশ্চিম বাংলার উদীয়মানা লীলাকীর্তন গায়িকা কীর্তন রত্নাকর শ্রীরতন ঘোষের শিষ্যা শ্রীমতী সুবর্ণ সরকার। ধ্বান-বাসর ও যে কোন অনুষ্ঠানে সহশিল্পিবৃন্দ সহ কীর্তন পরিবেশন করেন।

৪৭ আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, ব্লক-সি ফ্ল্যাট-২২, কলি-৯
ফোন: ৫৪-৭৯৩২

দুর্গা—সুরফাক্‌তাল বা সুলতাল

স্থায়ী—

II (২ সা পা | ৩ পা -া | ০ ধা না I + পা ধা | ০ ধা -া | ২ মা. -া | ৩ -রা সা | ০ -া -া I
দু ০ | র্গে ০ | দু র্গ | হা রি | নী ০ | ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ I

I + সপা -া | ০ রা সা | ২ ধা মা | ৩ পা ধা | ০ ধা -া I + মা মা | ০ রা সা | ২ সা রসা |
দু০ ০ | র্গে ০ | দু র্গ | হা রি | নী ০ I ত ম্ | ত নি | ত ০ঋ |

| ৩ ঋধা ধা্ | ০ -া সা I + সা রা | ০ মা পা | ২ ধা পা | ৩ ধা র্সা | ০ সা -া I + ধা -া |
ঋা০ ০ | ত্তি নী I বি ণ | দ ন্ত | য় ০ | হা রি | নী ০ I ০ ০ |

| ০ ধা পমা II
০ ০০

অনুরূপ ১ম ও ২য়—

(১) II + পা মা | ০ পা পা | ২ র্সা ধা | ৩ র্সা র্সা | ০ র্সা -া I + র্সা র্সা | ০ র্রা র্রা | ২ র্মা র্রা | ৩ র্সা র্সা | ০ ধা পমা I
(২) শু ০ ল ম ভ্ প ধা রি নী ০ মৈ ০ ত্য দ ০ র্প ধা রি নী ০০

(১) I + পা -া | ০ ধা পা | ২ মা রসা | ৩ ঋধা ধা্ | ০ সা সা I + সা রা | ০ মা পা | ২ ধা পা | ৩ ধা র্রা | ০ র্সা -া I
(২) ম ০ র্ধ বা পি নী০ ছ০ ০ ত্তি কে ম হা মা ত্মা মো হ না শি নী ০

I + ধা -া | ০ ধা পমা II II
(১) ০ ০ | ০ ০০
(২) ০ ০ ০ ০০

কবি-সম্মেলন। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে মহিলামহল-এর অনুষ্ঠান

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত
বিশ্ববাণী
স্বামী সত্যজ্ঞানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক বাংলা মাসিক
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-র তত্ত্ব-ব্যাখ্যা ছাড়াও এতে পাবেন সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প, সঙ্গীত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক মনোজ্ঞ প্রবন্ধাদি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব অন্তরঙ্গ পার্ষদদের অপ্রকাশিত বা, দুষ্প্রাপ্য জীবন-কথা। বার্ষিক চাঁদা ৮ টাকা মাত্র। ডাকমাশুল ফ্রি। এ ছাড়াও নারীর মর্যাদা প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক অতিরিক্ত এবং প্রকাশ সাহিত্যিকদের রচনা-বলী হচ্ছে। মূল্য ৪·০০ টাকা।
বিশ্ববাণী নিলয়স্থ, ১১বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন—৫৫-১৮০৩।

# মহাপূজায় শাক্ত-বৈষ্ণবের মহামিলন

## জনার্দন চক্রবর্তী

বৈষ্ণবপ্রবর হরিহরাত্মবিলাসের বিদ্বদ্‌বরেণ্য টীকার শ্রীল সনাতন গোস্বামী দুর্গোৎসবকে মহাপূজা বলেছেন। 'ভগবত্তায় শ্রীদুর্গাদেবী মহাপূজা নবমীদিনে প্রহরে কর্তব্যোহর্চা।' শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর পরদিন নবমীর প্রহরে ভগবতী শ্রীদুর্গাদেবীর মহাপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। মহাপূজা, মহোৎসব ও মহাব্রত, তিনটি শব্দই বৈষ্ণবশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। কবি শ্রীমধুসূদন দুর্গাপূজাকে মহাব্রত বলেছেন। 'মহাশ্মশান বল্য আমি মহাব্রতে ব্রত। এসেছেন ত্রিযা উমা, বৎসরের পরে, ত্রাম্বকী-মর্দিনীরূপে ভকতের ঘরে।' আজও পল্লীবাংলার জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে এই পূজাকে বড়ো পূজা বলে থাকেন। আমাদের ভাষায় মৌচ-চাঁসুচা শব্দের যেমন একটি বৃহৎপত্তি পাঁচিয়ে দেয়ে ভূমিকা, তেমন বৃহদ্‌-আশ্মাকে বলা হয় দুর্গোৎসব।

সীতা উদ্ধারের জন্য আকুল হয়ে শ্রীরামচন্দ্র অকালে বোধন করে শক্তে দুর্গাদেবীর আরাধনা করেছিলেন। একটি নীলপদ্মের অভাবপূরণের জন্য সত্যসন্ধ সীতাপতি তাঁর নীলোৎপলতুল্য, আঁখি উপাড়ে করতে উদ্যত হয়েছিলেন। একথা আমাদের শুনিয়েছিলেন 'কীর্তিবাস কৃত্তিবাস কবি এ-বঙ্গের অলঙ্কার'। সর্বশক্তি-সমন্বিতার শক্তাকল্পে চন্দ্র-সেখর-মুখে নবমীপূজার নটবর মৌরিসেনার অদ্ভুত বৃত্তা করেছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবাচারিতকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস আমাদের শুনিয়েছেন, 'আমাশক্তি-বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।' শুধু তাই নয়, উমার সমন্বয়বুদ্ধি নিয়ে চৈতন্যভাগবতকার বলেছেন, 'লৌকিক বৈদিক যত কিছু ক্রিয়াদি। সভার সম্মতে হয় মুখে দড়বড়ি।' জীবনরসিক মহাকবীয় কবি মুকুন্দরাম সর্বমঙ্গলাজগন্মাতার নতুন মঙ্গল ছন্দে ঘোষণা করে গেয়েছেন, 'গাইব তোমার আগে, মৌকিপতকটি মাগে, চরণটী শ্রীকবিকঙ্কণ।' কবি-কঙ্কণ তাঁর মানস-মহিতা বাভিরামার প্রতি দুঃখের দিনের আকুলতার ত্রাহিত্রাণকারিণী অনন্য অম্বিকা-মায়ের উদ্দেশ্য স্মরণ করে চোখের জলে ভেসেছেন।

ত্রাম্বকী-তীরের হালিসহরের সাধক-কবির কণ্ঠে আগমনী-বিজয়ার মহাসঙ্গীত উঠেছিল। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের জাতীয়তার কবি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়-কন্দরে সে-সঙ্গীত প্রতিধ্বনি তুলেছিল। রাতিতে গঙ্গা-বক্ষে নৌকারোহীর কণ্ঠে প্রবাসী সঙ্গীত শুনে তাঁর বহু-অবাহন-বিক্ষিপ্ত অশান্ত চিত্ত শান্ত হয়েছিল। শ্যামা-জন্মবার স্বর্গস্পর্শিত কবি-সন্তান কাব্য-কবিতায় নতুন পুরাণ সৃষ্টি করে সীতা-ঈশ্বরের জন্য অধীর, মাতৃস্তনে বিভোর বাঁধ নৌবিহিকে দিয়ে প্রলোভন ও বিভীষিকা জয় এবং লঙ্কায় চণ্ডীর বেইলে শারদপূজা করিয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বৈরীপক্ষীয়া বীরাঙ্গনার জন্য এই কবি 'সতী'-সাক্ষাৎকার করে দার্জিলের চণ্ডীর সন্ধানদান ও শক্তি-ভক্তির রসঘনিত সঞ্চার করেছিলেন। পুরোহোলা - পুরোকিত - বাগিনীতে মাতৃস্তবাক করে ফলনকর্মের আড়ালে থেকে মন্ত্রদ্রষ্টা বাঙ্ময় স্বজাতির জন্য বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি প্রার্থনা করেছিলেন। কালসমুদ্রে নিমজ্জিতা কমলাকান্ত-প্রস্তুতি বঙ্গভূমির জন্য কমলাকান্তের একাত্মীকৃত বাঙ্ময় অজস্র অশ্রুপাত করেছিলেন।

রাজকৃষ্ণরায়ের অদ্ভুত পূজারী 'মা-মা' বলে মন্দির-পাষাণে মুখরবর্ষণ করে কত কেঁদেছিলেন। সেই কান্নায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নবীন ভারতের বিবেকবিক্ষুব্ধ নরকুল-চন্দ্রমা নরেন্দ্রনাথ, যিনি মধুসূদনের বিশ্বাস মনোলোকে কল্পিত রামায়ণীয় মন্দোদরীছায়ায় রাজিত লঙ্কেশ্বর রাবণের মর্মক বাস্তবায়িত করেছিলেন। পশ্চিমের সভ্যতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ছায়ায় লালিত, ভারতের অশিনদ্বয়ের প্রবর্তক বিপ্লবী নায়কোপম মাতৃস্তন্যে পুনর্নীকা লাভ করে বিবাজীবনের স্বপ্নসাধ জাগিয়ে তুলেছেন মানুষের অন্তরে। জাতীয়-ধারীর আসনে বেদপন্থী আনন্দের এটুকুন স্বাদ গ্রহণের আকুতি নিয়ে ব্রহ্মসন্ধী বিপ্লবকবি অরীয় ঘুরছে কাহানী থেকে ছন্দছায়িকার 'অন্ধকার-মুলে' 'জননীর অন্তঃচলাখানি' প্রভাক্ষ করলেন, তাঁর 'অন্তরতম-বাসী' শুনলেন এবং পূজারম্ভের চণ্ডী-পাঠ-রত ব্রাহ্মণের কণ্ঠে ধ্বনিত নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ সপ্তশতী-স্তবের অন্তর্বেদীর অন্তর্বেদনা বুঝলেন অপূর্ব গীতি-কম্পনে, তোমারে নমি যে সকল ভুবন ভরে, তোমারে নমি যে সকল জীবন কাঁপে, চন্দ্র-সূর্য-ধন কাঁপে নিখিল, ভকতিপাবন তোমারি পূজার হুপে।' বঙ্গার সুরে যাঁরা নজরুল ইসলামের কণ্ঠে আর্দ্র হয়ে শ্যামা-সঙ্গীত গাইল, 'কালু যে জবা কালু, কেন সাজানো পোলি শ্যামা-মায়ের চরণতলে?'

মায়ের পূজা কি একলা শাক্তরাই করেন? বিশ্ব-বৈষ্ণব বা অন্য ধর্মাবলম্বী কি এই মহোৎসবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান না? ভাগবত বলেছেন, জগৎপতিকে পতিলাভ করবার জন্য ব্রজে গোপকন্যারা কাত্যায়নী-ব্রত পালন করেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, মধুসূদনের কবি-ভাষার দুর্গোৎসব মহাব্রত। শাক্ত-বৈষ্ণবের সাধন-সমন্বয়ের আমরা একটি অদ্ভুত ইলিয়ট পাই মহাপ্রভুর আচরণে, যিনি 'আপনি আচরি ধর্ম' জগতকে শিখিয়েছিলেন। পূর্বাচলের ছলে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে সন্ন্যাসী-শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য যখন নেমাচ্ছুরা শচী-মন্দিরের পাষাণে মাথা রেখে তাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়ে অশ্রুপ্লাবিত মুখে আনন্দলাভ করেছিলেন। বাঙ্ময়ী জননীর স্তনাপীযুষধারিণী স্নেহের রুদ্রমূর্তি ধরে নীলাচলবাসী কৃষ্ণ-প্রেমিক সন্ন্যাসীকুলকে [illegible] চরণে প্রণাম করেছিলেন মুকুন্দরাম। বলেছেন তাঁর দুই সন্তান। জননী জগদ্ধাত্রী এই দুই সন্তানে।' সুস্পষ্ট তিনি বলেছিলেন একথা নীলাচলের অন্তরঙ্গ ভক্তপার্ষদদের। তাঁরা যখন দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে পুরে সন্ন্যাসীকে দর্শনের জন্যে শচী-জননীর পরিচয় করে অন্নপ্রসাদ দূরে পাঠাবার জন্য অনুনয় করেছিলেন।

এইবার আমরা মার্কণ্ডেয়ের চণ্ডীর আখ্যানিকার অবতারণে মনোনিবেশ করি। মহিষাসুর নিহত হয়েছেন। অসিতাঙ্গ রুরারি-রক্ত বিধৌত হয়েছে। সমর-ভূমি ছেড়ে চলে যাঁর নাম শক্র, তিনি দেবতা-সন্ধীদের নিয়ে ফিরে ও সকল সম্মানে ভরে মহিষমর্দিনী মায়ের গুণগান করলেন যাঁর মুখরে স্তুতি-সুচীচুতা জননী প্রসাদ-সুন্দরী হয়ে প্রতি-নত দেবতাদের বললেন, 'বিজয়ং বিজয়ং সুরে বলন্তোঽভিষিঞ্চন্তু।' সমাপ্তিমাঙ্গল্য প্রীতা সর্ববরেণ্যা সুপ্রতিষ্ঠিতা।' তোমাদের সকল দেবতার, যাঁর যা মনের বাঞ্ছা, এখন বর চাও। তোমাদের এই স্তবমন্ত্রী পূজায় খুশী হয়ে আমি প্রীতিভরে তোমাদের বরদান করব।

(৪২ পর ৩৬৮ পৃষ্ঠায়)

পণ্ডিত ভারতখণ্ড

# কলকাতার দুর্গোৎসবে সাহেব আপ্যায়ন

বিনয় ঘোষ

রাজা নবকৃষ্ণ

পলাশীর যুদ্ধের আগে থেকেই ভাগ্যান্বেষী বণিকরা গ্রামাঞ্চল থেকে কলকাতার আসতে আরম্ভ করেন। উদ্দেশ্য, যদি সাহেবদের সেবা করে কিঞ্চিৎ অর্থ রোজগার করা যায়। ইংরেজরা তখন প্রবল এদেশের শাসক হননি। তাঁরা কলকাতায় 'জমিদার' ছিলেন এবং মুখ্যত ব্যবসায়ীও ছিলেন। কলকাতাও তখন প্রকৃত 'শহর' হয়নি, গ্রামই ছিল বলা চলে। পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজরা জমিদার ও বণিক থেকে এদেশের 'রাজা' হলেন। তার পর থেকে ভাগ্যান্বেষী বণিকরা যাঁরা সাহেবসেবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদেরও ভাগ্য ফিরে গেল। যাঁরা ইংরেজদের মুন্সী দেওয়ান বেনিয়ান মুৎসুদ্দি সরকার ইত্যাদি হয়ে নানাবিধ কৃষিকার্য প্রভৃসেবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা একপুরুষের মধ্যেই প্রচুর অর্থোপার্জন করে, ইংরেজদের কাছ থেকে রাজা-মহারাজা খেতাবাদি পেয়ে, কলকাতার সমাজে শীর্ষস্থানীয় অভিজাতশ্রেণীভুক্তে পরিণমিত হয়েছিলেন। কলকাতার এই নবাগন্তুক বাঙালী হিন্দু রাজা-মহারাজারা যে ইংরেজদের সেবাস্পৃহার চেয়েও অনেক বেশি ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন, সেটা স্বাভাবিক। সেইজন্যই তাঁরা শুধু জাঁকজমক উৎসবপার্বণে নয়, আমোদপ্রমোদে বিষয়ে, এমনকি প্রাদ্ধে পর্যন্ত, সাহেব-মেমদের নিমন্ত্রণ করতেন এবং তাঁদের যথারীতি আদর-আপ্যায়নের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করতে আদৌ কুণ্ঠিত হতেন না। উপরন্তু পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে সাহেব-আপ্যায়ন না করতে পারলে তাঁরা তাঁদের সামাজিক স্টেটাস বা পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে বলে মনে করতেন। সেই কারণে বাংলার শ্রেষ্ঠ ধর্মোৎসব দুর্গোৎসবে সাহেব-আপ্যায়নের রীতি অত্যধিক মাত্রায় প্রচলিত হয়েছিল কলকাতার এই নবাগন্তুক হিন্দু অভিজাত মহলে। তার বিবরণ অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকাদিতে প্রচুর পাওয়া যায়। এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

অষ্টাদশশতাব্দীর কাহিনীর একজন রোমান্টিক নায়ক এবং কলকাতার আদি ইংরেজ 'জিমদারদের (অর্থাৎ জমিদার) অন্যতম হলওয়েল সাহেব তাঁর ইন্টারেস্টিং হিস্টরিকাল ইভেন্টস্ গ্রন্থে ১৭৬৬ সালে লিখে গেছেন।

> Doorga Pujah . . . is the grand general feast of the Gentoos, usually visited by all Europeans (by invitation) who are treated by the Proprietor of the feast with the fruits and flowers in seasons, and are entertained every evening whilst the feast lasts, with bands of singers and dancers.

দুর্গোৎসব জেন্টুদের, অর্থাৎ হিন্দু, ভদ্রলোকদের, বেশ বড়রকমের জমকাল উৎসব। সাধারণত সাহেবরাও এই উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন এবং গৃহকর্তারা তাঁদের নানারকমের ফুলফল দিয়ে আপ্যায়ন করেন। যে কদিন উৎসব চলে সেই কদিন প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁদের নর্তকী ও গাইয়েদের আসরে আনন্দ বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়।' এইজন্য হলওয়েল সাহেব দুর্গোৎসবকে 'ফ্যান্স ফিস্ট অফ দি জেন্টুস' বলেছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পরে ১৭৬৬ সালের কথা। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করার পর, ইংরেজ বীরপুরুষ লর্ড ক্লাইভকে মহারাজা নবকৃষ্ণ (যিনি ক্লাইভের মুন্সী ছিলেন) হাতীর পিঠে বসিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে গিয়ে তাঁর শোভাবাজারের রাজবাড়িতে মহাসমারোহে বিজয়োৎসবের অনুষ্ঠান করেন। একবার দুর্গোৎসবের সময় নবকৃষ্ণ তাঁর এক বন্ধুকে লেখেন। 'এবছর দুর্গোৎসবের সময় লর্ড ক্লাইভ অনুগ্রহ করে আমার বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করতে আসবেন। আপনি অবশ্যই আসবেন। ক্লাইভের সঙ্গে কোম্পানির অনেক পদস্থ সাহেবরাও থাকবেন।' মহারাজা নবকৃষ্ণ তখন সুতানটির, অর্থাৎ উত্তর কলকাতার তালুকদার। জমিদার হলওয়েলের চমকপ্রদ নবকৃষ্ণ কলকাতার 'জেন্টুদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

৮নং শালবাজার থেকে প্রকাশিত এবং বিখ্যাত মার্শম্যানের আপ্তজন কর্তৃক মুদ্রিত 'ক্যালকাটা ক্রনিকেল' পত্রিকা, ১৭৯২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর এক সংবাদে লিখছেন: 'এ বছর বাগের বাড়িতে জাঁকজমক করে দুর্গোপূজা হবে বলে খবর পাওয়া গেছে, তাঁরা হলেন মহারাজা নবকৃষ্ণ, গোকুল মিত্র, কেষ্টচাঁদ মিত্র, নারায়ণ মিত্র, রামহরি ঠাকুর, বারাণসী ঘোষ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও কলকাতার এই ধনিক বান্ধবের গৃহে, দুর্গোৎসব উপলক্ষে নাচগানের আসরে শহরের সাহেব-মেমরাও আমন্ত্রিত হবেন।'

কয়েকদিন পরে, ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে, এই পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ: 'এ বছরে দুর্গোৎসবের নাচগানের অনুষ্ঠানের মধ্যে মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়ির অনুষ্ঠান বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। অন্যত্র যথারীতি নর্তকী ও গাইয়েদের আসর বসেছে বটে এবং সাহেব-সুবোরা অবশ্যই আপ্যায়িতও হয়েছেন। কিন্তু মহারাজা সুখময়ের বাড়ির হল, তিনি বাইজীদের হিন্দী-স্থানী সঙ্গীতে ইংরেজি সুর মিশিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে পরিবেশন করেছিলেন।' বর্তমানে হিন্দী অথবা আধুনিক বাংলা গানে, বিশেষ করে সিনেমা সঙ্গীতে, দেশীয় সুরের সঙ্গে যে ইংরেজি-পাঁয়ান, আফ্রিকান, ল্যাটিন-আমেরিকান প্রভৃতি সুর মিশিয়ে নতুনত্ব আনার চেষ্টা চলেছে তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে সাহেব আপ্যায়নের কাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল দেখা যাচ্ছে। অতএব সুরের মধ্যে কোনো নতুনত্ব থাক বা নাই থাক, অথবা তা শ্রুতিমধুর হোক বা নাই হোক, এই চেষ্টার মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও দুর্গোৎসব উপলক্ষে সাহেব-মেমদের আপ্যায়নের এই রীতি বেশ কিছুকাল চলেছিল। এই শতাব্দীর প্রথম পর্বে ফ্রিমতী ফ্যানি পার্কস কলকাতা শহরে এসেছিলেন, এবং শহরের উৎসবপার্বণ ইত্যাদি বিষয়ে নানাকথা তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 'ওয়ান্ডারিংস অফ এ পিলগ্রিম' গ্রন্থে (লন্ডন, ১৮৫০) লিখে গেছেন। ১৮২০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে তিনি

কলকাতার দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে লিখেছেন:

We went to a nach at the house of a wealthy Baboo during the festival of the Doorga Pujah . . . In the rooms on one side of the area a handsome supper was laid out, in the European style, supplied by Messrs Gunter and Hooper, where ices and French wines were in plenty for the European guests. In the rooms on the other sides of the square, and in the area, were groups of nach women dancing and singing, and crowds of European and Native gentlemen sitting on sofas or on chairs listening to Hindostanee airs.

ফ্যানি লিখেছেন: দুর্গাপূজার সময় আমরা একজন বাবুর গৃহে নাচ দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে, একদিকের হলঘরে সান্ধ্য ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে ইয়োরোপীয়ান স্টাইলে, এবং মেসার্স গান্টার অ্যান্ড হুপার খাদ্য সরবরাহ করেছেন, তৎসহ পর্যাপ্ত পরিমাণে ফরাসী মদ্য ও মদ্যের ব্যবস্থাও আছে। অন্যান্য হলঘরে নাচওয়ালীদের নাচগান চলছে এবং বিদেশী সাহেবদের সঙ্গে এদেশীরাও সোফায় ও আরাম-কেদারায় বসে সেই হিন্দুস্থানী নাচ ও গান উপভোগ করছেন।'

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। বাংলা সাময়িকপত্রে এই সময়কার দুর্গোৎসবের বিবরণ থেকে তা বোঝা যায়। ১২৬১ সনের ২৪ আশ্বিনের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার একটি বিবরণ এখানে প্রকাশ করা হল।

'নগরে মহামায়া মহেশ্বরীর মহা-মহোৎসব অতি সমারোহপূর্বক নির্বাহ হইয়াছে, কলিকা পরিবারেরা অতি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, লোকারণ্যসমস্ত নৃপতিদিগের উত্তর নিকেতনে নৃত্য গীতাদির মহারঙ্গ হইয়াছিল, সাহেবেরা নির্মন্ত্রিত হইয়া সেই নাচের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন...কৃষ্ণনগর যাঁহারা মেহেরের বেলাত মোদের কুইনে বাঙ্গলা পর্ব পর্ব বলিয়া করেন তাঁহারা এই পূজোপলক্ষে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া বিলক্ষণরূপে উহা পূজন করিয়াছেন।'

'কোতুলপুকুর নিবাসী মিষ্টভাষী পরহিত তৎপর শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় স্বীয় কুলদেবতা সিংহবাহিনী দেবীর পূজার পালা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের ভদ্রাসন নিকেতনে অমর ভবনের ন্যায় সুসজ্জিকৃত করিয়াছিলেন, নাচের মজলিস বর্ণনে বর্ণক মাত্রেই চিত্তক্ষেত্র পুলকালোকের পরিকীর্ত্ত হইয়াছিল... যে দিবস ইয়োরোপিয়ানদের সভা হইয়াছিল সেই দিবস অনেকানেক সম্ভ্রান্ত সাহেব তথায় সমাগত হইয়াছিলেন।'

হিন্দুদের দুর্গোৎসবে সাহেবরা ক্রীস্টান হয়ে যোগদান করেন বলে মিশনারীরা তাঁদের সমালোচনা করতে থাকেন। এই মিশনারীদের উদ্দেশে প্রভাকর-সম্পাদক লিখেছেন:

'আমারদিগের মিশনরি সহযোগী ক্রীস্টান এডবোকেট সম্পাদক মহাশয় কোথায়? তিনি কি পূজার সময়ে নগরে ছিলেন না? প্রতি বৎসর লিখিয়া থাকেন যে হিন্দু পর্বাহে সাহেবদিগের গমন করা উচিত নহে, কিন্তু তাঁহার কথা কিছুই গ্রাহ্য হয় নাই, তাঁহার ঐ লেখা বরঞ্চ রোদনকর হইয়াছে, তাহাতে কেবল হিন্দুধর্মের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করা হইয়াছে, হিন্দু সাহেবগণ যাঁহারা...এতদ্দেশীয় ধনিলোকদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে চাহেন তাঁহারা পূজার নিমন্ত্রণ অমরপূর্বক গ্রহণ করেন, এমত সাহেবও হিন্দুর অনেক আছেন যাঁহারা নিমন্ত্রণের পত্র চাহিয়া লইয়া যান।'

দুর্গোৎসবে সাহেব আপ্যায়ন নিয়ে ক্রমে হিন্দুসমাজেও বিতর্ক দেখা দিতে থাকে। তার ফলে কলকাতার ধনিক বাবুরা উদ্যমের, অর্থাৎ পূজোদ্যোগের দিনগুলি বাদ দিয়ে, পঞ্চমীর পরে একদিন সাহেবদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। এরকম ব্যবস্থা সকলের ভাল লাগে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, বাঙালী ধনিক রাজা-মহারাজারা কেবল দুর্গোৎসবে নয়, অন্নপ্রাশনে বিবাহে পর্যন্ত শহরের গণ্যমান্য ইউরোপীয়দের নিমন্ত্রণ করে সাদরে আপ্যায়নের আয়োজন করছেন। তা না করলে তাঁরা মনে করতেন যে তাঁদের পারিবারিক আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদার হানি হবে। তখন সাহেবসমাজ নব্য-অভিজাতদের কাছে সামাজিক মর্যাদার প্রধান মানদণ্ড ছিল। সেসাহেবদের নতুন চেহারা তাঁদের এই মনোভাবকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি।

"রঞ্জন ভ্যারাইটি ব্যাগ" ও "রঞ্জন কুট অয়্যার"

আধুনিক সর্বপ্রকার "চামড়া" ও "রেক্সী সু-এর জন্য প্রসিদ্ধ।

রঞ্জন কুট অয়্যার

২১০/১এ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯ (গড়িয়াহাট অংশন)

'ভারতীর' পূজার গান

রথীন ঘোষ (কাউন্ট-রস-সাগর)

জয়ন্ত রায়

মনন সিংহ

গৌরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়

দিলীপ সরকার

শ্যামল সেন

সমীরেন্দ্র লাহিড়ী

সমর গুপ্ত

রেকর্ডের দোকানে আজই শুনুন এবং সম্পূর্ণ রেকর্ড তালিকা সংগ্রহ করুন।

ভারতী রেকর্ডস্ কলি-৪, ফোন: ৫৫-১০২৯

# শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা

## স্বামী প্রভানন্দ

দক্ষিণেশ্বর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় ছিল তিনি কৈবর্তের ঠাকুরবাড়ির পূজারি, একজন পাগলাটে ব্রাহ্মণ। রাজধানী কলকাতার ইংরেজী শিক্ষিতদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন মূর্খ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। হলধারীও কিছু লোকের মুখে মুখে কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে তিনি ঈশানচন্দ্রের পুত্রে, ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজন, পরমহংস; আবার দু-চারজন লোক জানতে পেরেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার। তবুও তিনি নিরক্ষর ছাড়া তো নয়। কিন্তু তাঁর জীবন ও বাণী বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মহাজ্ঞানী। তুখানীন্তনকালের শিক্ষিত-বুদ্ধিজনদের তাঁর জ্ঞানদীপ্তির আলোকে চকিত হয়েছিল, চমকিতেরা হয়েছিলেন বিস্মিত। দেখে বিস্মিত হতে হয় যে তাঁর জীবনের শেষপর্বে দেশের সেরা সেরা মানুষে তাঁকে ঘিরে ধরেছিলেন তাঁর কাছে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য।

মূর্খ, নিরক্ষর, গ্রাম্য ইত্যাদি অপবাদে অনেক সময় ভূষিত হলেও তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত শিক্ষক, লোকশিক্ষক, যুগ-প্রবর্তক ঋষি। সুপণ্ডিত বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: 'আমি একজন পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, সন্ন্যাসবিদ্বেষী, ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী, অহংবুদ্ধিপরায়ণ, শিক্ষিত তার্কিক, আর তিনি ঘোর মূর্খ অথচ ভক্তি-সৌন্দর্যের বাস্তবমূর্তি হিন্দুসন্ন্যাসী। যে আমি ডিসরেলী, ফসেট, স্টানলী, মায়ারসের প্রভৃতি বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিত ও ধর্মযাজকের বক্তৃতা শুনিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য বহুক্ষণ বসিয়া থাকি কেন?...কেন আমি বাক্যশূন্য হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে থাকি? শুধু আমি বলিয়া নয়, আমার ন্যায় অনেকেরই এইরূপ অবস্থা। অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়াছে ও পরীক্ষা করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সহিত কথা কহিতে লোকের ভিড় হইয়া থাকে।' বিশিষ্ট সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন। বিভ্রান্তিকর বিষয় নিয়ে তাঁর কথা শুনতে যাতায়াত করা, লেখক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মনেতা প্রভৃতি; এক কথায় তারা শুনতে তাঁরই কেবল শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তার কারণ, তাঁর কথার মত কথা অপর কাউকে বলতে তারা কখনও শোনে নি। তারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করত তাঁর কথার মধ্যে রয়েছে শক্তি, রয়েছে স্পষ্টতা, উদ্ভাস অথচ প্রশান্তি।'

তাঁর পরিচিতদের মধ্যে দেখতে পাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতাদের; দয়ানন্দ সরস্বতী, পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ, পদ্মলোচন, গৌরীপণ্ডিত, পদ্মপুর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতদের; ধর্মবিজ্ঞানে অনুরাগীদের মধ্যে গোস্বামীপুরীজী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদের; সাহিত্যসেবকদের মধ্যে মাইকেল, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখতে পাই মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজেন্দ্রদত্ত প্রভৃতি। যিনিই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনিই তাঁর মন্ত্রশুদ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, নবীন আলোকে নিজ নিজ জীবন-পথকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। বড়-দর্শনবিদ্, ঈশ্বরতুল্য বিদ্যাসাগর বিস্মিত হয়ে শুনেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন। 'আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই।' আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে বলেছিলেন : 'এঁকে দেখে জ্ঞান হলো যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ছেলেটা খান, এঁরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান।' বিভিন্ন বিষয়-জ্ঞানের এই ধরনের স্বীকৃতির আলোকে রসিক শ্রীরামকৃষ্ণের 'আমি মূর্খোত্তম' 'আমি তো মূর্খ' ইত্যাদি মন্তব্য তাঁর বিশ্বজনোচিত বিনয়কে নির্দেশ করে মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীপাঠকমাত্রই জানেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিরক্ষর অবস্থার অতিকল্পনাদোষে দুষ্ট। তিনি সাক্ষর ছিলেন এইমাত্র বললেও ভুল হবে, শিক্ষায় তুকতে আদর্শের নাগকাঠিতে বিচার করলে তাঁকে বলতে হবে শিক্ষিতোত্তম। তিনি যে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন তাই নয়, সমাজের মধ্যে সেই বিদ্যা সঞ্চারের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মৌলিকতা শিক্ষাজগতে একটি পরম বিস্ময়। লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিক্ষার্থী নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যথার্থই বলেছিলেন : 'When I think of that man, I feel like a fool, because I want to read books and he never did . . . he was his own book.'

শিক্ষালাভের প্রধান অবলম্বন মন। শিক্ষার্থীর মনের উপর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের। স্বামী বিবেকানন্দ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আরও বলেছিলেন : মনের বাহিরে জড় শক্তিসকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখান বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলাবাবুর লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে নিয়ে ভাঙত, পিটত, গড়ত, ভালমাত্রই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে সৃষ্টি করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখি না।' সেই কারণে শিক্ষা বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ অধিকার।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল সমগ্র জীবনকে নিয়ে। শিক্ষিতরা বিষয় নির্ধারিত হত বিভিন্ন শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী। দর্শনের ছাত্র তাঁর কাছে দর্শনতত্ত্ব শিখতেন, ধর্মসাধক তাঁর কাছে নিতেন সাধন-ভজনের উপদেশ-নির্দেশ, সংসারী জেনে নিতেন সহজ জীবনযাত্রার উপায়। শুধু কি তাই? আমরা দেখতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে, সঙ্গীতজ্ঞ সুরের তাৎপর্য সম্বন্ধে, চিত্রশিল্পী চিত্র সম্বন্ধে নিত্যনূতন ভাবালোক লাভ করেছেন। কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের সকল প্রকার শিক্ষাদানই ছিল জীবনকেন্দ্রিক—মানব জীবনের মূলে লক্ষ্যাভিমুখী।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। তিনি বলতেন যে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না-জানার নাম অজ্ঞান। ঈশ্বর মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি বা শুদ্ধমনের গোচর। ঈশ্বরই সত্য। জগৎসুদ্ধই টিকোলা-রাখিত নিত্যসত্য। তুচ্ছ অজ্ঞান থাকে না, তাই জ্ঞানজ্ঞান বন্ধন সৃষ্টি হয় না। কিন্তু জগজ্জিনা অপর সবকিছু বিষয়ের জ্ঞানে বন্ধন হয়। তাই পার্থিব জ্ঞান অজ্ঞানের নামান্তর। পরমচৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা বা বেদের বোধ করার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানে অনাদি অজ্ঞানের নাশ হয়, হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়; মানুষের সংসারবন্ধন খসে পড়ে, মানুষ চির-মুক্তি লাভ করে। তখন ঈশ্বর ভিন্ন পার্থিব জ্ঞানে প্রীতি জন্মালেও মানুষ সংসারবন্ধনে সে আর বাঁধা পড়ে না।

লেখাপড়া জানলাভের আগে না পরে, এই প্রশ্ন, শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপাগত শিক্ষার্থীদের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারত। কারণ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই তাদের জীবনের প্রথম অধ্যায়ে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই সব শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : 'এরা তবে আগে লেখাপড়া, তারপর

(বাকিটা ৩৫১ পৃষ্ঠায়)

# ধ্রুবাদুর মুকুন্দ দাস

## সুভাষ সমাজদার

"হ্যাঁ রে বজা আসে নি?" ক্লাস এইটের বরজার পোড়ার দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন হেড মাস্টার মশাই।

ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠল, না, স্যার—সে পড়া পোড়াতে গেছে।'

সে কি। স্কুলের পড়া ফাঁকি দিয়ে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

কিন্তু আর পাঁচজন শিক্ষকের মত বিরক্ত হয়ে কিন্তু একথা বললেন না বরিশালের সেই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের, ব্রজমোহন স্কুলের স্বনাম-ধন্য প্রধান আচার্য অশ্বিনীকুমার।

তাঁর নজরে পড়ল ক্লাসের বরজার বড় অক্ষরে লেখা সেই তিনটি শব্দ—সেই তিনটি মহানন্দ—"সত্য, প্রেম, পবিত্রতা" এই তিনটিই তো তাঁর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের আদর্শ। এ কথা লেখা আছে বিদ্যালয়ের প্রবেশ-দ্বারে, দেয়ালে-দেয়ালে প্রতি শ্রেণীর বরজায়, প্রতিটি হৃদয়ের অন্তরে। তাঁর মনে পড়ল্লুনিয়ে উঠল বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সঙ্গীত—

'আয় ভাই আয়, মাতি নব বলে
এই মহাব্রত সাধিব সকলে;
অথবা উৎসাহে বরন করিলে,
মরণ হইবে জীবন ধাম।
ব্রোঞ্জীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায়,
জানিব, গাহিব তাঁহারি নাম।'

বজার তো কোন দোষ নেই। এ গান তো তাঁরই রচনা। তিনি যে চেয়েছেন, তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সত্য, প্রেম, পবিত্রতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠুক। দিবানিশি মানুষ গড়ার কারিগরী করে চলেছেন তিনি। তাঁরই প্রিয় ছাত্র বজা নবযাত্রাদের মিছিলে যোগ দিয়ে শ্মশানে গেছে; কিন্তু, শোকার্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নিতান্ত প্রিয়জনের মত—সেই আনন্দে গর্বে তাঁর বুকখানা দুলে উঠল।

নদীর পাশে শ্মশানের চালা-ঘরে সবদেহ ঘিরে বসে আছে শ্মশান বান্ধবেরা। নদীর বুকে পড়ন্ত রোদের ছায়া পড়েছে বাঁকা হয়ে। সেই দিকে কেমন উদাসভাবে মত তাকিয়ে কীর্তন গান ধরেছে স্কুল পালানো ঘাটশ্রমিক ছেলে বজা।—

'কুলবতীকুলশী তুমি যে,
এখনো না বুঝে যে।'

তার আবেগ ভরা কণ্ঠে সেই উদাস-করা গানের সুরের মূর্ছনায় শ্মশানের বাতাস কেমন আচ্ছন্ন আর বিষন হয়ে পড়ল। মৃতের আত্মীয় পরিজনদের মনে শোকের ভারও যেন একটু একটু করে কমে এল আর তারা যেন কেমন একটা পরম প্রশান্তির ভেতরে তলিয়ে যেতে লাগল।

হ্যাঁ। এমনই যার, ছিল সামান্য চাকুরিজীবি মুকুন্দলাল সেন পুত্র অজেন্দ্রর দেহ কণ্ঠে। শুধু শ্মশান-যাত্রীদের শ্মশানে-মশানে কীর্তনীয়ানের দলে নয়—বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকে বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে উন্নত বরিশাল শহরে পাড়াপ্রতিবেশের আত্মজনী সম্পর্কে, আত্মীয়, একান্ত অভিনের প্রতিযোগিতায়, গ্রামে গ্রামান্তরে জাতীয়তাবাদী প্রচার করে, দরিদ্র বান্ধব সমিতির সক্রিয় সভ্য হিসেবে রোগীর শুশ্রূষায়, বিপন্ন ও আর্তের সেবায় অজেন্দ্রর ছিল পুরোভাগে। বি. এম. স্কুলের সেই আদর্শবাদী প্রধান শিক্ষকের মানুষ গড়ার সেই অবিশ্রান্ত সাধনার সকল পরিণতি তাঁর স্বপ্নের মূর্ত প্রতীক এই অজেন্দ্র।

সেটা ১৯০৬ সাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সারা দেশ হিকোতে উত্তাল। সেই ঝড়ো বাতাসে হুলোহলী পাখির মত ডানা মেলে কোথায় যেন উড়ে গেল অজেন্দ্র! বরিশাল শহরের আবেলবন্ধুবর্ধনিতায় চোখের মণি—সেই 'বজা' কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

বছর ঘুরল। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মহাত্মা অশ্বিনী-কুমারের হাতে পড়ল একখানা খবরের কাগজ। নাম 'সঞ্জীবনী'। প্রথম পৃষ্ঠার বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে বিচিত্র একটা সংবাদ—"বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী গায়ক মুকুন্দ দাসের মৃদঙ্গবাদ্যে মাতৃমন্ত্রে কণ্ঠরত হইয়া উঠিয়াছে। দেশকে জড় না ভাবিয়া বাংলার আরাধ্যা চৈতন্যময়ী কালী-দুর্গা মূর্তিতে ভাবিয়া সুরসংযোগে তিনি যে আহ্বান করিলেন, তাহাতে বাংলার ঘরে ঘরে পল্লীতে পল্লীতে জনসাধারণের হৃদয় মন এক অভিনব-রূপে মাতিয়া উঠিয়াছে..."

সংবাদের শেষ ছত্র পড়ে চমকে উঠলেন অশ্বিনীকুমার! বিস্ময়ে তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। শেষ লাইনে লিখেছে—চারণকবি মুকুন্দ দাস মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের সুযোগ্য শিষ্য! তাঁর আদর্শ, তাঁর মন্ত্র, তাঁর সাধনা যেন মুকুন্দের ভিতরে মূর্তি ধরিয়া উঠিয়াছে... 'আর পড়তে পারলেন না অশ্বিনীকুমার! মনে করবার চেষ্টা করলেন, কে এই মুকুন্দ দাস—কে তাঁর এই শিষ্য। কিন্তু চিনতে পারলেন না। মনে করিয়ে দিলেন এক ভক্ত, সহকর্মী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। বললেন, 'আপনার সেই ছাত্র, বজা—বজা—আমাদের অজেন্দ্র—'

—'বলো কি হে!' অশ্বিনীকুমারের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আমাদের সেই গানপাগলা বজাটা আবার মুকুন্দ দাসই বা কবে হলো, আর কৈবর্তই বা কবে হলো!'

অজেন্দ্রর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হীরালাল গুপ্তও পাশেই বসে ছিলেন। তিনি বললেন, 'সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি তো জানেন, বজা স্কুলের পাট চুকিয়ে দিয়ে পড়াশুনো ছেড়ে তার বাবার মুদীর দোকান চালাতো। সেই দোকানে একদিন এসে উপস্থিত হলো রামানন্দ হরিবোলানন্দ নামে এক অবধুত সন্ন্যাসী। বজার গান শুনে সন্ন্যাসী বললেন, মহাপ্রভু ভাটিতলের পরি-কল্পনার জন্যে যিনি কীর্তন শোনাবেন, তাঁর নাম ছিল মুকুন্দ—আজ থেকে তোরও নাম হোক মুকুন্দ। সেই থেকে আমাদের বজা মুকুন্দ দাস নাম ধরে গ্রামে গ্রামে নাকি স্বদেশী গান গেয়ে বেড়াচ্ছে—'

—'কী আশ্চর্য! আমি ওর কিন্তু-বিসর্গও জানি না।' যেন একটা নিশ্চিন্ত সুখস্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বললেন অশ্বিনীকুমার। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল এক যুবকের ছবি। বলিষ্ঠ, উন্নত দেহ। প্রশস্ত ললাট। বড় বড় দুটো চোখে কেমন সুদূর আর স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি!

চেতনায় বিশাল জনরাশি কেটে এগিয়ে চলেছে একটা গয়নার নৌকো। বাতাস অনুকূল। পালে হাওয়া বেয়েছে। বাঁচের শব্দ উঠছে—হুপ্—হুপ্—হুপ্— সেই নৌকোটাকে লক্ষ্য করে আর একটা নৌকোও তীর বেগে এগিয়ে আসছে। প্রথম নৌকোর একজন আরোহী দাঁড়ে বাঁধা ছেলে বলল দাঁড়াকে, 'জোরে—আরও জোরে—দেখছ না ওরা এসে গেল বলে—'

কিন্তু আশ্চর্য! সেই নৌকোরই দেখছা আলখাল্লা পরা আর একজন আরোহীর কোন দিকে দোষবার ভ্রুক্ষেপ নেই। বিশাল নদী যেখানে আকাশ ছুঁয়েছে সেদিকে তাকিয়ে উদাস গলায় গান ধরেছে—

'কত কি ভরসে রাখিছে সন্তানে,
মাতৃভূমি স্নেহময় আজ সমর ক্ষেত্রে,
তাইে তাইে তিমি তিমি ধা-ধা-ধা—

নৌকোটা গানের সঙ্গে নৌকোর পাটাতনের ওপরে বন্ধ উঠানের মত যেন প্রবল নৃত্যে শুরু করে দিল। মাঝি-মাল্লারা চমক-সকল দেখে ভয় পেল।

—'শুনছেন? ও কর্তা, পুলিসের নৌকা যে এসে পড়ল।'

গানে বাধা পেয়ে খেঁকিয়ে উঠল আরোহী। 'আরে যা যা। ওরা তো ৯ মাস থেকে পিছু নিয়েছে—জানিস না, ওরা আমার বিরুদ্ধে ছ'টেলটা ইনজাংশান জারী করেছে—তাই ছেলেমানুষের মত হো হো করে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই আবার বলল, 'পোলাপানের কারা-মাঝি খেয়া দেখেছিস যে কালী? আমি কেন জেলার গান গেয়ে যেই সে এলাকা ছাড়িয়ে আসাম, অমনি হতভাগারা সেই জেলার চুকে প্রতি-পার্টি করে ধরতে খুঁজছে। কিন্তু—'

শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়েন। মুকুন্দ দাস প্রসঙ্গে তাঁরই সহযোগী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেছেন, "১৩১৫ (১৯০৮ সন) বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ উত্তর সাহাবাজপুরের সাদপুর স্টেশনের নিকটবর্তী নদীতে মুকুন্দের গমনশীল নৌকার গতি পুলিস সাহেবের লঞ্চ কর্তৃক অব-রুদ্ধ হইল—১০৮ ধারার মকদ্দমা রুজু হইলে মুকুন্দ ধরিসালে আনীত হইলেন।"

কিন্তু তার আগে (১৩১৪ সালে) মুকুন্দ দাসের দেশাত্মবোধক পালা-গান 'মাতৃপূজা' বলিষ্ঠ কণ্ঠে রাজদ্রোহ ঘোষণা করেছে—

'বাবু বুঝবে কি আর মলে
ছিল ধন গোলাভরা, দেবে ইঁদুরে
করল সারা,
চোখের ঐ চশমা জোড়া দেখ না
বাবু খুলে।'

'দেবে ইঁদুরে' বলে বিদ্রূপ করার জন্য সেদিন ব্রটিশ সরকার ক্ষমা করে নি গ্রাম বাঁধকে। ক্যারান্ড, নির্বাসন ক্রিমিনাল—কতোর শমন-নীতির এক একটা উদ্যত খড়্গ নেমে এসেছিল তাঁর ওপরে।

কিন্তু সে বড় বিচিত্র কাহিনী—কেমন করে বরিশালের সেই আলেকালা পল্লীর এক দুর্বার ছেলে স্বদেশী যুগের চারণকবি মুকুন্দ দাস হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিসের প্রেরণায় আসরে দাঁড়িয়ে খুঁজে খুঁজে গান বেঁধে তাতে সুর সংযোগ করে গাইতো। পুঁথিগত বিদ্যে ছিল না চারণের সত্য; কিন্তু যা অনেকের থাকে না দেশমাতৃকার প্রতি গভীর অনুরাগ, সেই নিবিড় প্রেমই গানের কথা হয়ে স্বতোৎসারিত হয়েছে। বৈষ্ণব মুকুন্দ দেশজননীর মধ্যে মহাশক্তিকে প্রত্যক্ষ

(দেখুন ৩৫১ পৃষ্ঠায়)

# রোমান লিপিতে 'দুর্গেশনন্দিনী'

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি অধ্যাপক নিখিলকুমার বসুর আগ্রহাতিশয্যে একদা একটি আশ্চর্য পুস্তক আবিষ্কার করেছিলাম — আগাগোড়া রোমান হরফে মুদ্রিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী'। শুনেছি, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে বইটির আর আর এক কপি আছে।

বইটির শিরোনাম পৃষ্ঠা থেকে দেখা যায়, সেটি কলকাতায় ৮ হেস্টিংস স্ট্রীটে অবস্থিত ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মুদ্রণালয়ের মুদ্রিত ও থাকার শিক্ষক অ্যান্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। কিন্তু কোন্ বছর বা সংখ্যা প্রকাশনের মর্যাদায় নিয়ে-ছিলেন, সু' পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে তার কোন উল্লেখ না থাকলেও, তা থেকে কলকাতার সমকালীন শিক্ষিত সমাজে পূর্ববর্তী বেশ কয়েক দশক ধরে ভারতীয় বর্ণমালাগুলির বদলে রোমান বর্ণমালা প্রবর্তনের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সক্রিয় আন্দোলন চলছিল সে বিষয়ে নানা তথ্য জানা যায়।

অজানা উদ্যোক্তারা তাঁদের মুখ-বন্ধের শুরুতেই বলেছেন—তাঁরা এ কাজে হাত দিয়েছেন প্রধান দুটি উদ্দেশ্যে। প্রথমত, ভারতীয় কোন ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক আগে রোমান হরফে প্রকাশ করা যায় কিনা এবং দ্বিতীয়ত, সে ক্ষেত্রে ধ্বনিসঙ্কেত-চিহ্ন (আন্তর্জাতিক মার্কস্) কত কম ব্যবহার করলে চলতে পারে তা হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখা। প্রথমেই তাঁরা ব্যবহার্য ধ্বনিসঙ্কেত-চিহ্নের ন্যূনতম এক তালিকা তৈরি করে বাংলার মুদ্রিত এক কপি দুর্গেশনন্দিনী সমেত মুদ্রাকরদের হাতে দেন যাঁরা নাকি অন্য কোন হরফ দেখা বা নির্দেশ ছাড়াই এক মাসেরও কম সময়ে সমস্ত বইটি রোমান হরফে অক্ষরশোক করে ফেলতে সক্ষম হন। তাঁরা সে জন্য গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বলে-ছেন—এ দৃষ্টান্ত থেকে বেশ বোঝা যায়, ভারতীয় যে-কোন ভাষার প্রকাশিত পুস্তকের 'রোমানাইজেশন' কন্টকরও নয়, ব্যয়সাধ্যও নয়।

বাংলা বর্ণমালা রোমক বর্ণমালায় রূপান্তরিত করবার জন্য, বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘ নির্বিশেষে ব্যবহৃত 'হ্রস্ব', 'বিন্দু' ও চন্দ্রবিন্দু' এবং ফলাসহ একটি আকৃতি-চিহ্নের প্রয়োগমাত্রই যে কাজটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব এ বইটির পরিশিষ্টে প্রথম এক তালিকায় উদ্যোক্তারা প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তালিকাটি নিম্ন-রূপ:—

অ=a, আ=ā, ই=i, ঈ=ī, উ=u, ঊ=ū, ঋ=ri, এ=e, ঐ=ai, ও=o, ঔ=au, ক=k, খ=kh, গ=g, ঘ=gh, ঙ=n/ṅ[1], চ=c, ছ=ch, জ=j, ঝ=jh, ঞ=n/ñ[1], ট=ṭ, ঠ=ṭh, ড=ḍ, ঢ=ḍh, ণ=ṇ, ত=t, থ=th, দ=d, ধ=dh, ন=n, প=p, ফ=ph, ব=b, ভ=bh, ম=m, য=j/y[2], র=r, ল=l, শ=b/v[3], ষ=sh, স=sh, স=s, হ=h, ড়=ṛ, ঢ়=ṛh, য়=y, ৎ=h[4], ং=ṁ, ঃ=ṁ

উপরের চিহ্নিত সংখ্যাচিহ্নিত অক্ষর-গুলি সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। (১) ঙ=ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এই পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবহৃত হলে, তার রোমক প্রতিবর্ণ শুধু 'n' কিন্তু অন্যান্য ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে উপরে বিন্দু-সমেত 'ṅ' । (২) য=ঢ, ঃ, ঙ, ঞ এই চারটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকলে শুধু 'n' ; অন্যথায় প্রদর্শিত আকৃতি-চিহ্ন সমেত তার ব্যবহার হবে। এই একটিমাত্র বিরল ক্ষেত্রে এমন একটি ধ্বনি সংকেত-চিহ্নের প্রয়োজন যার সঙ্গে বাংলা-মুদ্রাকরেরা ইতিপূর্বেই পরিচিত নন। (৩) ব=ঢ 'j' ; উদ্যোগ (উদ্যোগ) বা অনুরূপ অক্ষর ক্ষেত্রে 'j' কিন্তু দ্বার, দ্বারা, প্রভৃতির বেলায় 'v' । (৪) চন্দ্রবিন্দু প্রভৃতি সমেত 'ব' যেখানে স্পষ্টতই উচ্চারিত, সেখানে 'b' ; কিন্তু দ্বার ধ্বনি প্রভৃতির বেলায় 'v' । (৫) ঃ= 'h' যদি অক্ষরের শেষে থাকে; কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানে থাকলে পরবর্তী রোমান ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে। 'n' -এর উপর চন্দ্র-বিন্দু সংকেত চিহ্ন, তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেও, শুধু সীমিত ক্ষেত্রেই তার ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেবে। অতএব সে বিষয়ে বিস্তারিত টীকা নিষ্প্রয়োজন। 'ক্ত'-র প্রয়োগের বেলাতেও একই কথা বলা যায়।

দুর্গেশনন্দিনীর রোমান রূপান্তর-কারীরা আরও বলেছেন—'জ্ঞ'-এর প্রতিবর্ণ 'jn' 'ক্ষ'-এর 'ksh' এবং 'ক্ষ্ণ'-এর 'kshn' ধরে নিলে তারা সহজেই রোমানীকৃত হতে পারে। অতএব, খুব মোটামুটির দৃষ্টিতে না দেখলে, বাংলা বর্ণমালার ইতি-পূর্বেই লভ্য 'হ্রস্ব', 'বিন্দু', চন্দ্র-বিন্দু', বিরল ক্ষেত্রে, প্রদর্শিত আকৃতি-চিহ্নের প্রয়োগে বাংলা লিপিকে অনায়াসেই মোটামুটি শুদ্ধ উচ্চারণের রোমান লিপিতে পরিণত করা সম্ভব।

আলোচ্য পুস্তকের উদ্যোক্তারা আরও দু'-একটি ছোট-খাট নিয়ম গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন। যথা, অক্ষরের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ যেখানে হসন্ত নয়, সেখানে রোমানী-করণের সময় 'a' ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। যেমন, অর্জুন= 'Arjun' কিন্তু = 'bill' 'Arjuna' অথবা 'bila' নয়। কিন্তু সমাসবদ্ধ বা হাইফেন দিয়ে সংযুক্ত যুগ্ম-অক্ষরের প্রথমটি যদি অকারান্ত হয়, তাহলে সেখানে 'a' ব্যবহার বিধেয়। যেমন 'শোকসন্তপ্ত= shokasantapta চন্দ্রকিরণ= chandrakiran যুগ্ম-শব্দ, jugma-shabda প্রভৃতি। আর একটি নিয়ম—'রেফ্'-এর ব্যবহার হলে, পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব পরিহার করতে হবে। যেমন, 'গর্জন'= garjan 'কর্তব্য'= kartabya ইত্যাদি। এ পুস্তক প্রকাশের বহু যুগ পরে বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক গঠিত বাংলা পরিভাষা সমিতিও এই একই কথা অনুমোদন করেছিলেন।

মুখবন্ধের এক স্থানে, পুস্তক-প্রকাশকরা প্রায় জবাবদিহির ভঙ্গিতে বলেছেন—যুক্তবর্ণ শ ও ষ-এর ক্ষেত্রে বিন্দু (.) ব্যবহার করে তাদের স্বকীয়তা দেখানো হয়নি বলে, কিছুকাল আগে প্রতিষ্ঠিত মোটা-মুটি 'রোমান অক্ষর সমাজ' যেন ভুল না বুঝেন। বর্গীয় 'জ' ও অন্তস্থ 'য'; বর্গীয় 'ব' ও অন্তস্থ 'ব'; তালব্য 'শ' ও মূর্ধন্য 'ষ'-এর ক্ষেত্রেও রোমান বর্ণান্তরের সময় কোন পার্থক্য করা হয়নি। 'রোমান অক্ষর সমাজ' নামক সমকালীন সংস্থাটি সম্পর্কে পরে বলছি। আপাতত এটুকু বলি যে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অন্যতম পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ছিলেন সে সংস্থার প্রাণস্বরূপ এবং 'রোমানাইজেশন'-এর সমর্থক হলেও সংস্কৃত বা বাংলা বাক্যবন্ধের সামান্যতম ক্ষেত্রেরও তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। শুধু তিনিই নন, তাঁর মতো অন্যপন্থী আরও অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত তখন একই অভিমত পোষণ করতেন। যেমন, কার্যত মাত্র তিন-চারটি ধ্বনি সংকেতচিহ্নের ব্যবহারে বাংলা লিপি যে রোমান লিপিতে রূপান্তরিত করা যায় এই দাবী সেকালের পণ্ডিত-মানিত বাংলা সাহিত্যসেবক এক অসম-সাহসিক প্রয়াস বলে গণ্য হবার যোগ্য।

এই পরিবেশে দুর্গেশনন্দিনীর লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে প্রকৃতির একটি কোমল দিকের প্রতিও দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। 'রোমানাইজড্' পুস্তকটির উদ্যোক্তারা যখন এ বিষয়ে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন তিনি প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন—যে সব অবাঙালী বাংলা বই পড়তে চান তাঁদের উচিত বাংলা ভাষা শিখে মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করা। বাংলা শব্দকে রোমান হরফে মুদ্রিত করলেই যে তার অর্থ তাঁদের বোধগম্য হবে এমন নয়। তা ছাড়া বাংলা ক্রিয়া-পদের নানান রূপ ও বাক্য সংগঠনের বিভিন্নরূপ রীতি সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা ঘুচাবারই যথাযথরূপ হয়ে থাকবে। বঙ্কিমচন্দ্র 'রোমান অক্ষর সমাজের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত করেননি যদিও এ বিষয়ে তাঁকে সাধাসাধি করা হয়েছিল। কিন্তু 'রোমানাইজড্' দুর্গেশনন্দিনীর উদ্যোক্তারা যখন তাঁকে বোঝান যে অন্য ভাষাভাষীদের কথা কিছুটা স্বতন্ত্র হলেও, আসাম, ওড়িষ্যা ও বিহারের বেশ কিছু অংশের অধি-বাসীরা ইতিপূর্বেই এত বেশী বাংলা শব্দের সঙ্গে পরিচিত যে, রোমান লিপিতে মুদ্রিত হই তাঁরা কিছুটা মোটামুটি বুঝতে পারবেন, তখন শুধুমাত্র সেই ঐকান্তিকতায় তিনি নাকি এক মুহূর্ত ভেবে নেন যে, শেষ অবধি দুর্গেশনন্দিনীর রূপান্তরের অনু-মতি দেন।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রযোজনায় নিজস্ব কোন সংস্থার পত্তন করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। কোন বাক্তিবিশেষের উদ্যোগে যে কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল সে কথাও বলা যায়

না। কেননা বইটির 'মুখবন্ধে' বা অন্যত্র এ সব প্রসঙ্গের কিছুমাত্র উল্লেখ নেই। তবে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আলোচ্য পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার অল্পকাল পরেই 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার ৭২-৭৩ খণ্ডে (একত্র বন্ধনে) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ প্রীশচন্দ্র মজুমদারের লিখিত 'এ ইউনিফর্ম্যাল অ্যালফাবেট অ্যান্ড ইট্স্ রোমনাইজেশন অব ইণ্ডিয়ান ল্যাংগোয়েজেস্' নামের এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি ২৪ পরগনা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর জে. এফ. রাউনকে 'রোমান অক্ষর সভা'র প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করেছেন। এই সভা 'রোমান অক্ষর সমাজ' থেকে পৃথক এক প্রতিষ্ঠান না শাখাসংগঠন, তা জানা যায় না। সভাপতি হিসাবে তাঁর পক্ষে বা বিপক্ষে বলারও কোন প্রমাণ নেই। তবে এসিয়াটিক সোসাইটির জনক উইলিয়াম জোন্স্-এর সময় থেকেই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত পুস্তক রোমান হরফে মুদ্রিত করবার প্রয়াসের সূত্রপাত হয় এবং এ সম্পর্কে তিনি ও তাঁর শিক্ষিতেরা যে নির্দেশ প্রস্তুত করে গেছেন, সমকালীন শিক্ষিত সমাজ তাকেই প্রামাণিক প্রমাণ বলে গণ্য করেন। কিন্তু এ বিষয়ে তর্কপরায়ণতা ও চুলচেরা বিচারের কিছুমাত্র অবসান ঘটে না। সে জন্য 'রোমান অক্ষর সমাজ' ও 'রোমান অক্ষর সভা' নামের দুটি পৃথক সংস্থার একসময়ে অস্তিত্বে থাকবার কিছু নেই। এ ছাড়া একক ব্যক্তি বা ছোট ছোট গোষ্ঠীও হয়ত এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে থাকবেন। সন্দেহ হয়, আলোচ্য পুস্তকটি শেষোক্ত সভার তরফ থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকবে যিনি (বা যাঁরা) হরফ বিষয়ক নানা প্রতিপক্ষের সুদীর্ঘ বিতর্কের বুকি এড়াবার জন্য আড়ালে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত এইচ. এইচ. উইলসনের বিখ্যাত 'গ্লসারি' থেকে আরও কিছু দামী প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি সে গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—জোন্স্ ও শিলাজিষ্ট ধ্বনি সংকেতচিহ্নগুলির প্রামাণিক বুনিয়াদ তৈরি করে দেবার পর

"In 1834, a vigorous effort was made in Bengal to establish what was termed the Romanizing system, or the substitution of Roman letters for the characters of the country in all printed books, and the project is still in operation to a limited extent. The different modes of writing the Oriental words in Roman letters were then fully and fairly considered and a system nearly identical with that of Sir William Jones was adopted. Again, in 1845, an intelligent and indigenous treatise on the mode of writing Oriental words having special reference to the present Glossary, by Mr. Crow, Deputy Collector, was published in Calcutta. . . . . Still more recently, the subject has been taken up by the Missionaries of England and America and some eminent German Oriental scholars and philologers and several conferences were held under the auspices of Chevalier Bunsen for the purpose of fixing a standard in Roman characters for the expression of foreign forms of speech, whether possessed of alphabets or without them. . . . . There is no lack, therefore, of careful and competent investigation of the subject; and although uniformity of practice has not been, and probably will not be, the result, yet and approximation has been made to it."

পূর্বধারণা ঊর্ধ্বতনের সমর্থনে এ কথা বলা চলে যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি (অন্তত ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ অবধি) বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজে 'রোমানাইজেশন' সম্পর্কে যে সব চিন্তাধারা কাজ করেছে এখনে তার একটি সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের পরেও 'রোমানাইজেশন' আন্দোলন যে কিছের বন্ধীভূত হয়নি তার অনেক প্রমাণ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত আলোচ্য পুস্তকটি। এ গ্রন্থ-প্রকাশের পিছনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তার কোনও বাংলা প্রচ্ছদ অনুরূপ বর্ণান্তর করিয়েছিলেন কিনা কিংবা 'রোমান অক্ষর সমাজ' অথবা 'রোমান অক্ষর সভা' পৃথকভাবে এরই কাজ করেছিলেন কিনা, এসব কথা থাকলে, কোন্ কোন্ পুস্তকের ক্ষেত্রে করেছিলেন, তা জানা যায় না। এমন কি, উইলিয়াম জোন্স্, শিলাজিষ্ট, জে. এফ. রাউন, পণ্ডিত অনুকূলচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও পরামর্শদাতা মণ্ডলী (যাঁদের নাম আগেই উল্লেখিত হয়েছে) ছাড়া এই ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অন্যান্য বিশিষ্টজনের নামধাম ও তাঁদের অবদান বিষয়ে কোনও সংবাদ আমি নানা চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারিনি। পাঠকদের মধ্যে কেউ এ বিষয়ে আলোকপাত করলে ভাল হয়।

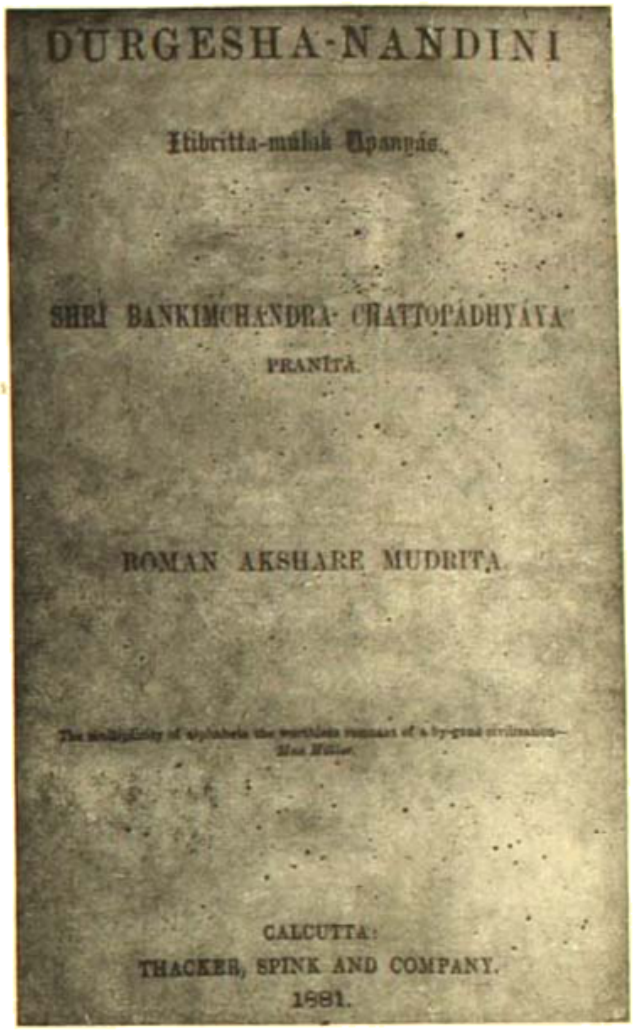
DURGESHA-NANDINI

Hibritta-mulak Upanyas.

SHRI BANKIMCHANDRA CHATTOPADHYAYA

PRANITA.

ROMAN AKSHARE MUDRITA.

CALCUTTA:
THACKER, SPINK AND COMPANY.
1881.

রোমান লিপিতে প্রকাশিত দুর্গেশনন্দিনীর বক্তব্যপ্রকরণে তাঁদের স্বীকৃতির প্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। যেহেতু বাংলার কোন্‌টি সমাসবদ্ধ পদ আর কোন্‌টি নয় সে নিয়ে মতপার্থক্য আছে সে জন্য, তাঁদের মতে, সমাসচিহ্ন দ্বারা জন্য সব বিতর্কিত ক্ষেত্রে, রোমান লিপি ব্যবহারের কালে হাইফেন ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। এ প্রস্তাবের সপক্ষে ব্যবহৃত শিরোনাম-পৃষ্ঠার ছবিটি থেকে পাঠক লক্ষ্য করবেন—দুর্গেশ-নন্দিনী ও ইতিবৃত্তমূলক' কথা দুটিকে সমাসবদ্ধ পদ হিসাবে গণ্য না করে হাইফেন-খণ্ডিত পদ রূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু মুদ্রিত প্রতিলিপি অবশ্যই পরিষ্কার না হওয়ায় আশঙ্কায়, তাদের মতো কয়েকটির উল্লেখ করছি। যথা, 'kiyat-kshan' (কিয়ৎক্ষণ), 'mukha-padma' (মুখপদ্ম), 'bhramara-krishna' (ভ্রমরকৃষ্ণ), 'shiro-desh' (শিরোদেশ), 'kaksha-madhye' (কক্ষমধ্যে) প্রভৃতি। অন্যদের বাঙালী পাঠকের কাছে হাইফেন-এর এ ধরনের অনাবশ্যক ব্যবহার খুবই দৃষ্টিকটু ঠেকবে। পক্ষান্তরে, অবাঙালী পাঠকেরা ভাববেন, এ সব সমাসবদ্ধ পদ বাংলায় বুঝি বা হাইফেন সহযোগেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উভয়ত এই ভ্রান্তির সম্ভাবনা আলোচ্য বইটির এক বড় রকমের ত্রুটি।

আলোচ্য গ্রন্থের একটি অতি প্রশংসনীয় দিক—বঙ্কিমের মূল বাংলা দুর্গেশনন্দিনীর কোনও সংস্করণে কোন ছবি না থাকলেও 'রোমানাইজড্' পুস্তকটিতে বেশ কয়েকটি 'উড্-কাট' ছবি সন্নিবেশিত হয়েছিল। সে রকম মাত্র একটি ছবি প্রকল্পের সঙ্গে ব্যবহার করা গেল। তাদের একটিতে এ

(শেষাংশ ৩৪২ পৃষ্ঠায়)

# নেতাজীর অপ্রকাশিত পত্র

1 Woodburn Park
Calcutta
13 11. 29

My dear Braja Bhusan Deb,

I am sorry to hear that you are ill. Your presence in Calcutta would have been a great help to us in the present crisis.

Mr Sengupta is determined to stand for the Presidentship of the B.P.C.C. He will also draw up a list of office bearers and members of the Executive Council. Their idea is to make a clean sweep of the present executive.

Mr Sengupta is at present the Mayor as well as the leader of the Council Party. In 1927 and 1928, I also offered him the Presidentship of the B.P.C.C., which he did not accept. He now is trying to forcibly oust me from the B.P.C.C. executive. I can say with a clean conscience that I have not only offered him back the triple crown, but I have also tried my very best to accommodate him in every possible manner. In fact, I have given in to him in every matter till quite recently

* ডিরেক্টর ইন্দিরার অনুমতিক্রমে, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রোড কলেজের সহকারী অধ্যাপক অনুপম গুহ এবং মিস সেনগুপ্ত, সেন্ট্রাল রিসার্চ ইন্সটিটিউশনের সৌজন্যে

2

I have failed to attract his sympathy and cooperation. At a time when I have been isolated from all the other leaders and am standing on the threshold of the prison house, Mr Sengupta by hounding me out of the B.P.C.C. will only be helping the Government by discrediting and disgracing me. I am surprised that the aspect of the question does not concern him in the least. All attempts at compromise, including the attempt of Pandit Motilal Nehru, have failed and a straight fight is inevitable.

The Ghoshia party have for a very long time been carrying on a systematic propaganda against Sir Kiran Sankar Roy, Nalini Ranjan Sarkar, Surendra Mohan Ghosh and myself. Dr Bidhan Chandra will have a great influence on the Murshidabad vote - but he tells me that he is prepared to vote for me but not for the present executive. Both Kiran Babu and I are sure to be convicted before the end of December — so you think

294877

3

in the present circumstances I feel that
- to fight by office. Will this not
amount to a virtual vote of no-confidence
in us ?

Please consider the
situation carefully and do what you think best.
The two parties are sharply divided but we hope
to win if we get the support of the 16th inst
that you we are now expecting.

I do not know the state of
your health. I wish you could come to
Calcutta are about the 15th of the latest.
Who, in your opinion, should be accepted from
Murshidabad District ?

With regards.

Mine in sd/ Subhas

Yours sincerely
Subhas Chandra Bose

---

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রাজবন্দিদের চিঠিটি বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বৃদ্ধিদীপ্তার সেবা আয়োজনের সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (প্রফুল্লদাদা) সমীপেষু করা। সেটি ইংরেজী ১১৪১ সাল। চিঠিটির থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানের তখন পুরো দিন থেকে বিশ্বাস হয়ে পড়েছিল। কলকাতার মানুষ বুঝতেন সভাষ এ ভূমি ছাড়া, যাইতে পুরো করেন যে তাহার কারণ সুভাষচন্দ্রের দাবি অবলম্বন বিশ্লেষক। তাই তাঁকে আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত করার বিভিন্ন ছবি তুলে প্রচারও তারা করে। এমনকি ১১২৮ সাল থেকেই তৎকালীন অন্তরীণ বাঁধার সভাধীনের বিভাজন থেকে এবং দেহরা থেকে সুভাষচন্দ্রকে দূরে রাখতে চায়। এই পরিপ্রেক্ষিতের চিঠিটি উল্লেখযোগ্য।

—সম্পাদক

## নট ও নাট্যকার

# মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

# ও

# ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

শশাঙ্কশেখর সান্যাল

মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

নব্বই বছর আগে ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসে নাটোরের জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত 'নাটোর' নামে ১৩৩২ সালের ৭ ফাল্গুন সংখ্যার মুখবন্ধ করেন।

'আমরা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম যে নিমতিতার অধিবাসীরা জেলার, প্রতিবেশ জমিদার মহেন্দ্রবাবু একদ্বারে ইহলোক পরিত্যাগ করে চলে গেছেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর মত নাট্যোদ্যম ও নাট্যশালার পরম হিতৈষী বন্ধু আর কেহ ছিল না। তিনি প্রচুর লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে নিমতিতায় একটী প্রকাণ্ড নাট্যশালা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে সাধারণে। তাঁর নিজের একটী সখের নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মহেন্দ্রবাবু অনেকবার অনেক নাটকে নিজে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অভিনয় করেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে তিনি সহায় না হলে শ্রীযুক্ত নিশিরকুমার ভাদুড়ীর পক্ষে নাট্যজগতে স্থায়ীরূপে কোনও নিজের স্থান করে নেওয়া সম্ভব হতো না। তিনি নিশিরবাবুর অভিনয়ের একান্ত অনুরাগী ছিলেন, তাই নাট্যশিল্পের অনেকখানি ভার তিনি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে চন্দ্রচূড় মহাশয়কে একটী প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চের অধিকারী করে অভিনয় করবার সুযোগ ও সুবিধা করে দিয়েছিলেন। মনমোহন নাট্যশালায়।

নিমতিতা গ্রাম ভাগীরথীর মহকুমার অবস্থিত। সুন্দর বসতবাটী ও বাগানের পাশ দিয়ে স্বচ্ছতোয়া ও খরস্রোতা গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে বালুময় মরুর রূপ ধরেছে।

ভাগীরথীর পুণ্যসলিলা স্রোতের পূর্ণতিকা থেকে প্রজাদিগের উদ্বৃত্তি : বাঙ্গলার অনেক উর্বরিত জমিদারের সমাজ অনুসরণ সহরের আড়ম্বরে আকৃষ্ট না হয়ে মহেন্দ্রবাবু পল্লী-প্রেমের মহত্ত্ব, সরল জীবনের মহত্ত্বই নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশিত করতে পেরেছেন। পল্লী-প্রেমের এই বিরাট বাড়ি মফস্বলে ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও কোনদিন পল্লী অঞ্চল ত্যাগ করে নগরবিলাসী হতে চাননি। নানাবিধ অনুষ্ঠানের

আবহে তিনি বেতারশ্রীর করে ঐতিহ্যের আনন্দ বিধান করতে চেয়েছিলেন।"

বাঙলা ১৩৫২ সালের ২১ মাঘ মাত্র ৬৭ বছর বয়সে (জন্ম : বাঙলা ১২৮৫) এই প্রতিভাবানের তিরোধান ঘটে। মুক্তাগাছার সবর মহারাজের থেকে লিজ নিয়ে তাঁর ভাই ও তাদের সরকারী সরকারী ভাড়া মুক্তাগাছা হাউস ছেড়ে এসেছেন। তখন তিনি প্রতিষ্ঠার নাটকের কারোপযোগী বিদ্যাবিনোদের) একও এগুলোচিত্র, অর্ধাবিত্ত, দ্বিজেন্দ্রলালবিহীন নাট্যকলার পাণ্ডুলিপি (যার অংশবিশেষ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল) অভিনয় চলিয়াছে আইডে চেয়েছেন। বাঁধিও টের পাইনি কখনো।

অভিনয়ের আসরে-বাসরে কবিয়াল বিলাসিনীদের সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর মহাদেবপ্রতিম প্রভাব পরস্পরের পারিবারিক সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। কবিয়েলপ্রসাদের অনেক গানের সুরশিল্পী নির্মাতিতার বাদ্যের বাদ্যিক সম্পাদনের দীর্ঘ সময়ে বাজানো। এখনকার সম্পাদকে কলকাতার নায়করা এসে অভিনয় করেছে। তার সঙ্গেই মহেন্দ্রবাবুর মনের পাশা স্ত্রী-ভূমিকার ভূমিকায় স্টীলোক বলে নিয়েও প্রকৃত প্রকাশ পেয়েছে। ফলে, মহেন্দ্রবাবুর নিজস্ব অভিনয়শৈলীও ছাড়াও তাঁর অনন্যকলীয় প্রকাশ-প্রতিভা। এই স্বীকৃতির নিদর্শন কবিয়েলপ্রসাদের বিখ্যাত নাটক 'অমরসিংহ রাজপুত'-এর টাইটেল লিখিত ঐকমত্য।

একবার নির্মাতিতা মঞ্চে আসর-পরিচয় অভিনয়। মহেন্দ্রবাবুর নিজস্ব দলের সিন্ধান্ত। পর পর দুই রাত্রি অভিনয়। ৫৫ রাত্রের আসরসীমার মহেন্দ্রবাবু, যার এক রাত্রের আসর-সীমায় শিশিরবাবু। দ্বিতীয় রাত্রের অভিনয় জন্যে রঙ্গমঞ্চের পাশ-প্রসিদ্ধের সামনে বাঁড়িয়ে নিজস্ব ঐকান্ত ভলিমায় শিশিরবাবু ঘোষণা করেন, "অভিনয়ের কোন কোন অংশে মহেন্দ্রবাবু আমার চেয়ে উৎকর্ষ অর্জন করেছেন।" দ্বিজেন্দ্রলাল অভিনয়ে একই ভাঁজনেতা (অভিনেতা নয়) আসর সুরেন, সমালোচনা করিছিল। বুদ্ধিদীপ্ত ও অন্যান্য অভিনয়ালিপ্ত সকলেরই পড়ার পরে ও অন্যান্য পরে মহেন্দ্রবাবুই সহজ করেছেন। বুদ্ধিদীপ্ত উচ্চ শ্রেণীর অভিনয়শিল্পী। নাম্বারিক চরিত্রে ছাপ রেখেছে। এখন তার বয়স ৭৭/৭৮। তার কাছে শোনেই সেই এক কথা "শিশিরবাবু ও মহেন্দ্রবাবুর প্রথমদিনের অভিনয়ে তিল দাঁড়িয়েছিল—একটি হেসে হাসিয়ে কুটিলতা, আর একটি কুটিলতা হাসিয়ে হেসে। তবে হাঁ তোমায় বলেছি মহেন্দ্রবাবু যেন আমাকে হাসিয়ে উঁচুদরীয়ে নীচে রেখে বহু টানুতে চলে গেছেন। আমি আজও তাঁর আর অবাক হই।" কবিয়েলবাবুও বলতেন "দুই আসরসীর দুইরূপ"।

শিশিরবাবু ছাড়া মহেন্দ্রবাবু প্রথাত নাটকের ও অভিনেতা জগদ্বন্ধুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও একই মঞ্চে অভিনয় করেছেন—মহেন্দ্রবাবুর সহরে, কাশিমবাজার মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্রীর প্রাসাদে ও কলকাতায়। প্রবেশ সিনেমা ও নাট্যবেদনায় মহেন্দ্রবাবুর অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্তি ছিল। কবিয়েলবাবু তাঁর লিখিত পাণ্ডুলিপি প্রায়ই মহেন্দ্রবাবুর নির্দেশে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। যথা 'তাঁতি', 'নরনারায়ণ', 'অন্ধ রাজের'। অন্ধ রাজের অভিনয় সময়ে কবিয়েলপ্রসাদ মহেন্দ্রনারায়ণকে যে চিঠি লিখেছিলেন—৮।১২।১৬ (৩৪৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে), তাহলেই বেশ বোঝা যায় মহেন্দ্রবাবুর দৃষ্টিকোণকে তিনি কত শ্রদ্ধা করতেন। উক্ত পত্র লিখিত অন্ধ কবিয়েলপ্রসাদের যেসব পত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনারী—তাঁর কন্যা, এবং 'নির্মাতিতা'—তাঁর জামাতা উপেনাথ।

মহেন্দ্রবাবু অভিনয়ের কৃপালাভের গান ও নাচ দেখাতেন। এছাড়া একবার তিনি অসাধারণ গায়কীও ছিলেন। কলকাতা মহেন্দ্রনারায়ণ চাঁদুরী সম্পাদনের বিশিষ্টজনের এক মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

নির্মাতিতার জন্মশতবর্ষ এখন কীর্তিনাশার পথরেখে। সেখানে অসাধারণ বাঁড়িয়ে বিশিষ্ট বিশিষ্টজনের দৃষ্টিপিছের পাশাপাশি আজ অতীতের স্মৃতিচারণ করি আর বলি, "কই যে আমরা অন্ধ কই!"

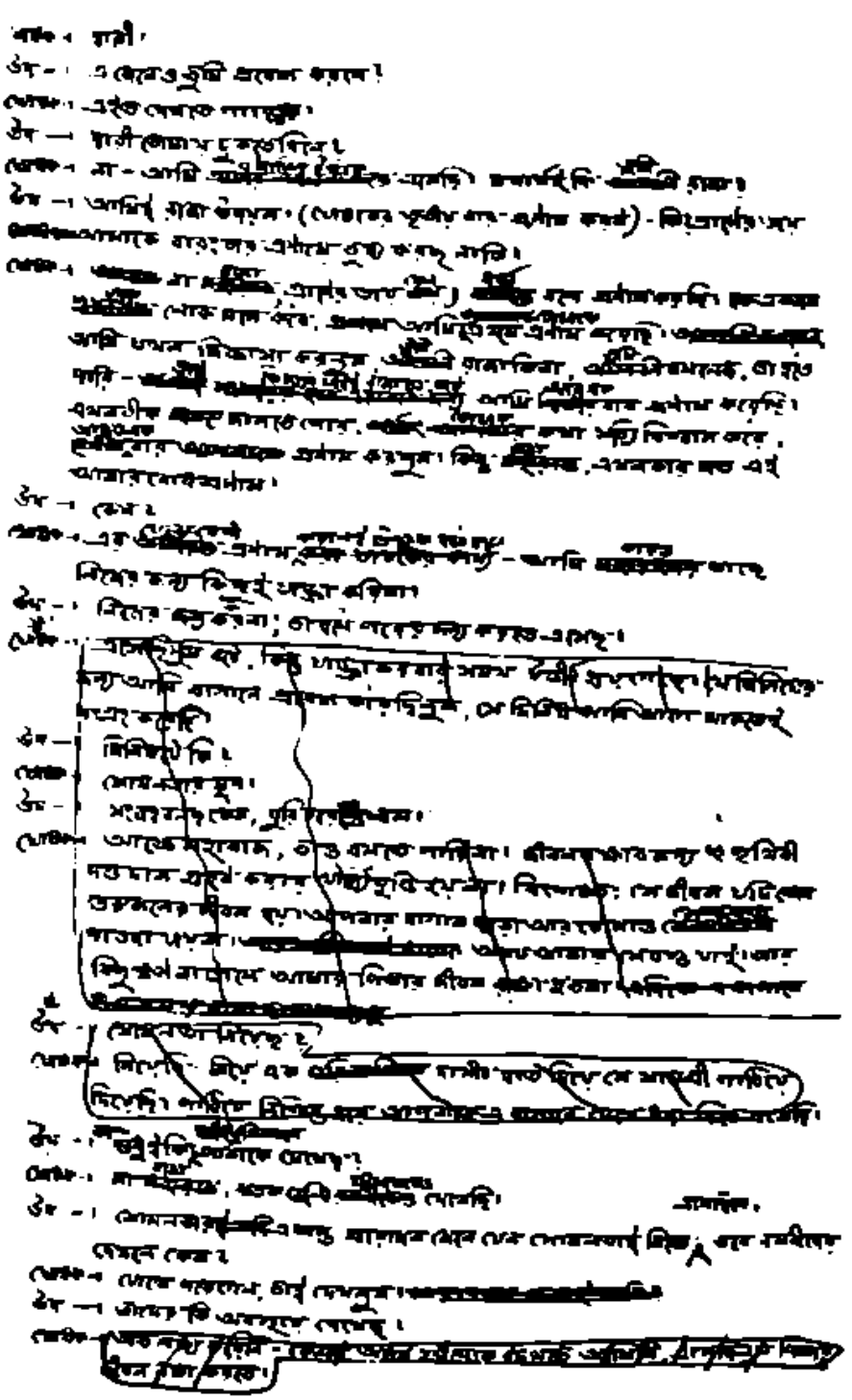

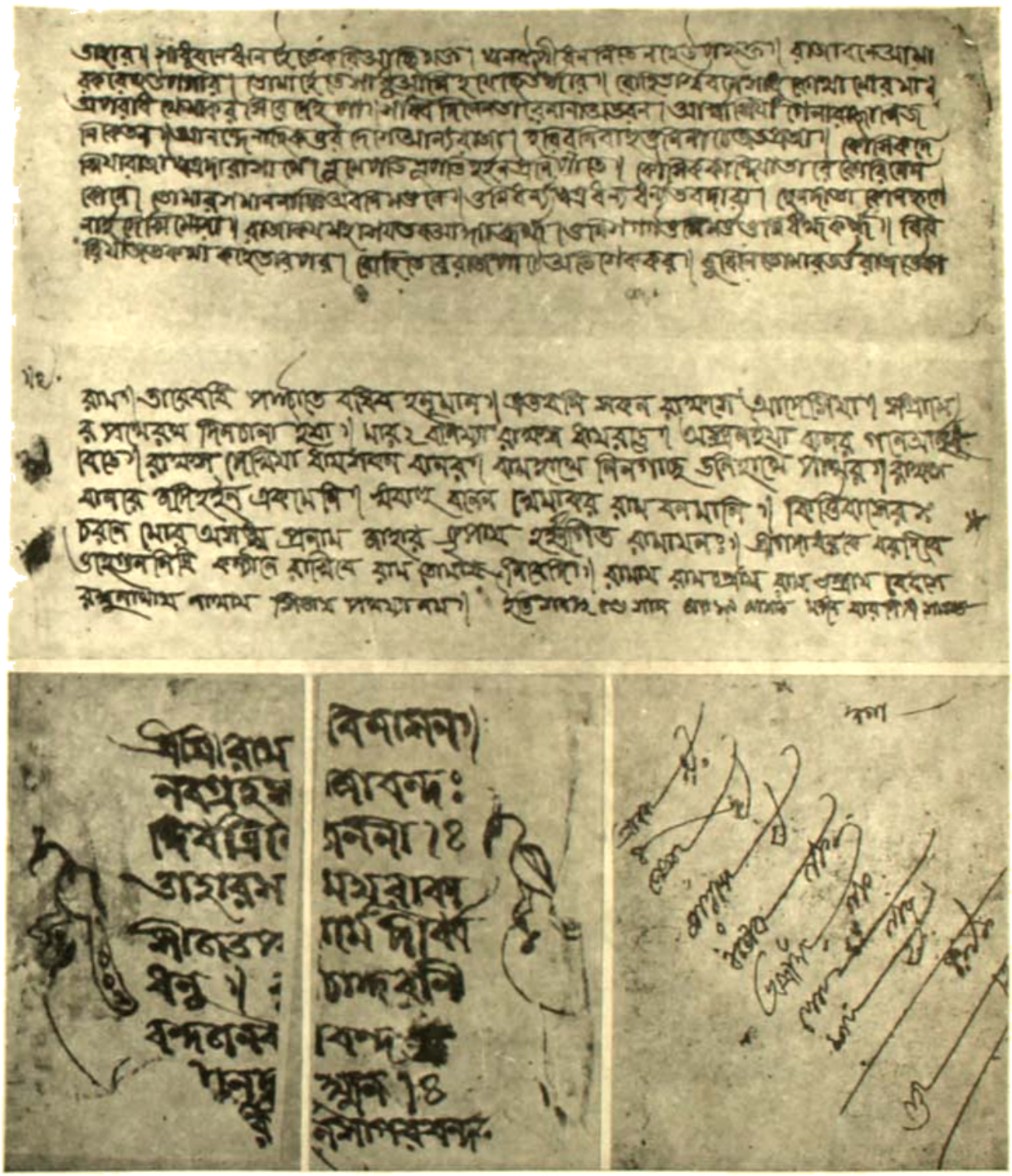

শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তাক্ষর (রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা)

উপরে : দুই রূপসজ্জায় চারণকবি মুকুন্দদাস (উদ্বোধনে মুকুন্দদাস)

"Osmán, jadi tumi jijnásá kara, tabe ámár uttar ei je, ei bandí ámár práneshvar!"

নীচে : "ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!" (রোমান হরফে মুদ্রিতলিপি)

(আগের দুই পৃষ্ঠায় 'ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের যে পাঠকের উদ্ধার ও অন্তর্ধানের প্রতিলিপিত হয়েছে, সেটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যানপথ

(কালী ও ঘোষকের প্রবেশ)

কালী। এই পথ দিয়ে যাও—ওই যে সুন্দর জলাশয় দেখছ—ঠিক ওর পূর্বধারে একটি আশ্চর্য ফুল দেখতে পাবে।

ঘোষক। গাছ তো কখন দেখিনি—চিনব কেমন করে?

কালী। সে গাছ আর চেনাতে হবে না। সে তোমাকে চিনতে পারবে। সে গাছ দুনিয়ায় নেই, শুধু এই বাগানে আছে।

ঘোষক। নাম কি বললে?

কালী। সোমলতা। তার রস খেলে মানুষের অমর হয়। আগে দেবতারা তাই পান করত। যদি আনতে পার, তবেই তোমার বাবা বাঁচবে। নইলে বাঁচবে না। আমি ওই পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবো। যাও, আর দেরি কর না। (ঘোষকের প্রস্থান) যাক্—এই জন্মের মুখে এবারে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলুম। বার বার তুমি হাত ফসকে বেরিয়ে গেছ। এবারেও যদি বাঁচ, তাহলে বুঝব তুমি অমর। কিন্তু মানুষে তোমাকে মারতে পারবে না। ঐ ঐ রাজা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—নজরে পড়ল—পড়ল—ঠিক হয়েছে। (প্রস্থান)

নেপথ্যে। রানী-রানী—শীঘ্র দেহ আবৃত কর। একজন অজ্ঞাত কুলশীল যুবাপুরুষ উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করেছে।

নেপথ্যে। সখী-সখী! শীঘ্র সকলে আমাকে বেষ্টন করে কুঞ্জকেরলে নিয়ে চল।

(অনুরোধার প্রবেশ)

অনু। একি দেখলুম! ওই আর তো দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেল? একি বিদ্যুৎবিকাশ! একি বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম! বাঁচিয়ে বাঁচিয়েই কি স্বপ্ন দেখলুম!—না দেখেছি, দেখেছি—নিশ্চয় দেখেছি—কে ও? (প্রস্থান)

(উদয়নের প্রবেশ)

উদ। তাই তো! এমন সাহসী! যে সময় রাণী সহচরীদের সঙ্গে সরোবরে জলকেলি করছেন, সেই সময়ে এই ব্যক্তি এ উদ্যানে প্রবেশ করল! সাহসী না উন্মত্ত? হয় উন্মত্ত, না হয় জানে না! জানুক আর নাই জানুক, পালাক আর নাই হক, যুবক তোমায় মৃত্যু আনবার্য। আর স্বয়ংরাও মৃত্যু অনিবার্য। কে তুমি? এইদিকে এস—

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘোষক। তুমি কে?

উদ। আমি এই উদ্যানের অধিকারী।

ঘোষক। তাহলে তুমি রাজা। (প্রণাম)

উদ। তা হতে পারি, কিন্তু তুমি কে?

ঘোষক। (পুনরায় প্রণাম) পরিচয় দিতে পারবো না।

উদ। তুমি কি এ বাগানের আইন জান না?

ঘোষক। আগে জানতুম না, বাগানে ঢুকতে দিয়ে জানতে পেরেছি।

উদ। কি জেনেছ?

ঘোষক। যে পুরুষ এ বাগানে প্রবেশ করবে, তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু যে এ সময়ে যে ঢুকবে, তার মৃত্যু। এ সময় রাণী তাঁর সহচরীদের সঙ্গে এখানে জলকেলি করেন।

উদ। কে তোমাকে বললে?

ঘোষক। স্বামী।

উদ। এ জেনেও তুমি প্রবেশ করলে?

ঘোষক। এই তো দেখতে পাচ্ছো।

উদ। স্বামী তোমায় ঢুকতে দিলে?

ঘোষক। না—আমি পাঁচিল টপকে এসেছি। যথার্থই কি তুমি রাজা?

উদ। আমিই রাজা উদয়ন। (ঘোষকের তৃতীয় বার প্রণামকরণ)—কি? প্রাণের ভয়ে আমাকে বারবার প্রণামে তুষ্ট করছ নাকি?

ঘোষক। না রাজা, প্রাণের ভয়ে কেন, স্বর্গজ্ঞানে প্রণাম করছি। একজন পুরুষলোক বলে বোধ হয়, আমি তোমাকে প্রথমে প্রণাম করেছি। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি রাজা কি না, তুমি বললে তা হতে পারি—কি জানি যদিই রাজা হও, তাই আমি আর একবার প্রণাম করেছি। এখন ঠিক জানতে পেরে, তোমার কথা সত্যি বিশ্বাস করে, আরও একবার প্রণাম করলুম, কিন্তু রাজা, একনারীর মত এই আমার শেষ প্রণাম।

উদ। কেন?

ঘোষক। এর চেয়ে বেশী প্রণাম করলেই ভিক্ষুক হতে হয়। আমি কারও কাছে নিজের জন্য কিছুই যাচ্ঞা করি না।

উদ। নিজের জন্য কর না, তা হলে পরের জন্য করতে এসেছ!

ঘোষক। পরই বা বলি কেন? বাবা কি আবার পর হয়। না রাজা ঠকে গেছি, নিজের জন্যেই করতে এসেছি।

উদ। জিনিসটে কি?

ঘোষক। সোমলতা। সে নাকি তোমার বাগানে ছাড়া দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যায় না। সে ফোল নাকি মানুষে অমর হয়?

উদ। এই তো শুনেছি।

ঘোষক। শুনেছ! তাহলে সোমলতা কি তোমার বাগানে নেই?

উদ। আমার বাগানে সোমলতা জন্মে, এ কথা তোমাকে কে বললে?

ঘোষক। বাবা শুনেছে—

উদ। কে তোমার বাবা বল।

ঘোষক। বুঝতে পারছি ভোলানাথ—যার বলার না রাজা।

উদ। শুধুই কি তুমি এখানে আমাকে দেখেছ?

ঘোষক। না রাজা, কতকগুলি স্ত্রীলোককেও দেখেছি।

উদ। সোমলতার একান্ত প্রয়োজন জেনে কেন সোমলতাই নিতে এসেছিলে, তবে রমণীদের দেখলে কেন?

ঘোষক। ছবের পড়ে গেল, তাই দেখলুম।

উদ। তাদের কি অবস্থায় দেখেছ?

ঘোষক। একজন ছাড়া আর সকলেই লাফাচ্ছে।

উদ। কেন, এই হ্রদে অনেক হংসের ডানায় আমার একটা জিনিস বাঁধা রয়েছে নিয়ে এস। (ঘোষকের দ্রুত প্রস্থান) আমি ওকে ক্ষমা করলুম। মনে করে হর্ষে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে। কিন্তু গাছের তলায় গিয়ে কস্তুরী যে কি, যখন দেখবে, তখনই আত্মস্বরূপে পরিণত হবে ওই দেখছে—দেখেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাত আর তোড়াদার অশ্বটাকে স্পর্শ করতে সাহস করছে না। হতভাগাকে ফেলে নিতে হল। বুঝতে পেরেছে, তার আয়ু শেষ। অতি ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। না জয় এঁকে কেন আসতে চায় না। বোধহয়—বোধহয় কেন নিশ্চয়ই পা কাঁপছে—পা কাঁপছে—তাই টিপে টিপে পা ফেলে আসছে। (ঘোষকের পুনঃ প্রবেশ ও অতি ধীর পদবিক্ষেপে উদয়নের নিকট আগমন) কি বুঝক, পা আর চলছে না যে! মৃত্যুভয় হয়েছে?

ঘোষক। (উদয় অবলম্বন করে) রাজা পিতার ঘর—পিতামহ ঘর—আমি এনেছি—আমি এনেছি।

উদ। তা ধরছি, কিন্তু বুঝক, মৃত্যুভয় হয়েছে?

ঘোষক। মৃত্যুভয় কেন হবে?

উদ। এ ফল কি জন্য তোমাকে দিয়ে আনালুম জান?

ঘোষক। জানি আমার মাথা কাটতে।

উদ। তবে ভয় হয়নি বলছ কেন?

ঘোষক। আমি যা করবার করেছি, তুমি যা করবার করবে। এ তো আহ্লাদের কথা—ভয় হবে কেন?

উদ। তবে আবার সময় দাঁড়িয়ে গেলে কেন?

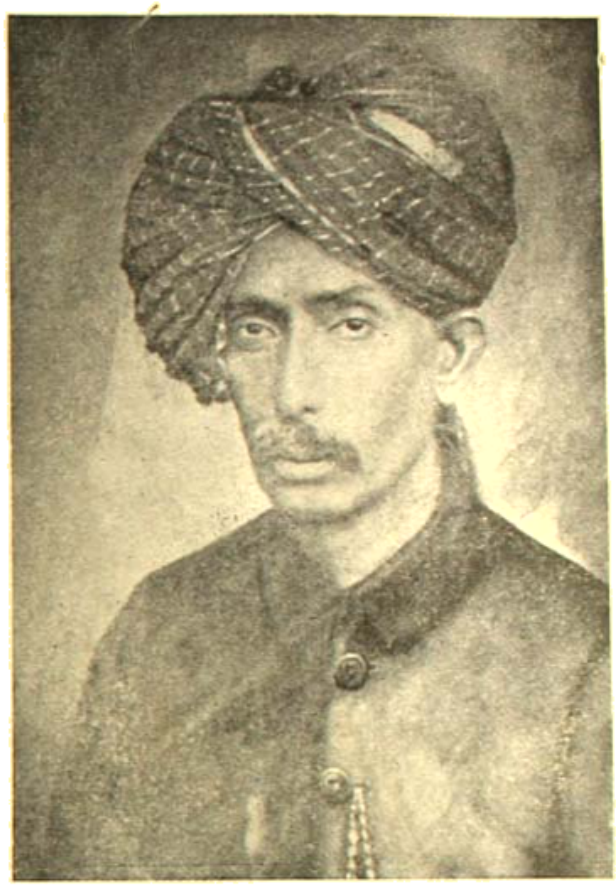

জাকবুল করিম খাঁ

আনোয়ার লাল

ঘোষক। প্রাতঃকালে বৃষ্টি হয়ে গেছে—পথের ধারে মরে যেখানটা নিচু, সেখানে এখনও জল আছে, তাই লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিলুম।

উজ। তবে আসবার সময় অমন গম্ভীর আসছিলে কেন?

ঘোষক। যাবার সময় আমি কুমার ছিলুম, আমার কোন ভাবনা ছিল না, কিন্তু আমার ওপর কোনও পুরুষের ভার দেওয়া ছিল না। আমার বন্ধুদের প্রশ্নে এইজন্য যাবার সময় আমি জলভরা স্থল-পদ্মগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেছি। কিন্তু আসবার সময় দেখি, আমার উপর বিয়ের ভার। তুমি পুরীকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেছো। না দিলে মহাপাপ। সেই শাস্তি দেবার একমাত্র ভার আমার হতে। যদি আমি অনাকাঙ্ক্ষিত চলতে পা হড়কে পড়ে যাই, যদি সেই পড়ার সঙ্গে এই অস্ত্র কোনও প্রকারে ছেলে বসে, কি আমার শরীরে কোনও রকমে প্রবেশ করে পরের অধেই আমার মৃত্যু হয়, তাহলে যে তোমার আদেশ নিষ্ফল হয়। হয়ত তোমার সন্দেহ হতে পারে, আমি ভয়ে আগে থাকতেই আত্মহত্যা করেছি। এইজন্য আসবার সময় অতি সন্তর্পণে আমি তোমার এই অস্ত্র নিয়ে এসেছি।

উজ। হুঁ—বুঝেছি।

ঘোষক। এইবারে কি করবে কর। অস্ত্র আমি নাথা তোমার কাছে উপস্থিত করি।

উজ। ঘোষক! এই অস্ত্র আমি তোমাকে উপহার দিলুম। তোমার নাম সাহসী বীরের হস্তেই এই অস্ত্রের ন্যস্ত শোভা পায়। আমার সমস্ত ক্রোধ বিন্দুর পরিণত হয়েছে।

ঘো। অস্ত্র তো স্বেচ্ছায়—সোমলতা যদি না খাই, তাহলে বাবার কি হবে?

উজ। এই অস্ত্র তুমি তোমার বাবাকে দিও। তাহলেই তাঁর কোন অমঙ্গল হয় না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জয় হোক (ঘোষককে দেখিয়া কম্পান্বিত কলেবরে তুমিতে পতন)।

উজ। কেন্ত দেখিস, ভয় নেই—কথে যায়।—তোমার পরিচয়?

ঘোষক। আমার জিজ্ঞেস করার বাকা! পরিচয় তো বিতে পারব না!

উজ। কেন জানবার প্রয়োজন নেই।

প্রহরী। মহারাজ! রাজকুলে এই বাধা এই বাগানে প্রবেশ করবার জন্য ভৈরবের মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিল। আমি দুজনকে দেখিয়ে ওকে নিরস্ত করেছি। ও তোমা বিয়ে কেমন করে প্রবেশ করল, কিছুই জানি না মহারাজ! দুজন বন্দুন, আমি হতভাগাকে শিক্ষক করে ফেলি।

উজ। শিক্ষক করতে হবে না—একে অতিরিক্ত কর্। তারপর সেনু—পিপাসির আর একজন প্রহরীকে আমার কাছে নিয়ে আয়।

(প্রহরীর প্রস্থান)

শোন ঘোষক, আমার এ উদ্যানে রাজও পর্যন্ত বিনাতির পুরুষ প্রবেশ করেনি। এটা রাজার বিলাস উদ্যান। এই জন্য তিনি এখানে নিঃ-সঙ্কোচে সাঁকাল সন্ধ্যে ভ্রমণ করেন। তুমি ভৈরবের এখানে প্রবেশ করেছো। যখন প্রবেশ করেছো, তখন সমস্ত দিবাভাগের মতন তোমাকে এই বাগানের এক ঘরে বন্দী রাখবো, রাত্রির প্রথম প্রহরের পূর্বে তুমি এ স্থান ত্যাগ করতে পারবে না।

(ঘোষককে লইয়া প্রহরীর পুনঃ-প্রবেশ)

যা, একে নিয়ে আমার এই বাগানের ঘরে সমস্তদিন আটকে রাখ্, রাত্রির প্রথম প্রহরে একে মুক্ত করবি।

(ঘোষককে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান)

বড়ই কঠিন সমস্যা। পিতাপুত্রের সম্বন্ধ আমি বুঝতে পারলুম না। তবে বুঝতে হবে। জোর করে বুঝব না—তা বুঝতে হলে এখনি চর নিযুক্ত করে বুঝতে পারি। তা করব না—তবে বুঝতে হবে। এ হেঁয়ালি কৌশলে বুঝতে পারলেই আনন্দ। (প্রস্থান)

## দ্বিতীয় দৃশ্য—উদ্যান

অন্দুরাবা (গীত নং ১)

সখীর প্রবেশ

সখী। তাই তো রাজকুমারী, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ঔঁকো চোর কেমন করে বাগানে প্রবেশ করলে?

অন্দু। মানুষ কি কখন এ বাগানে ঢুকতে পারে—দেবতা।

সখী। তাই তো কি হবে রাজকুমারী, আমাদের রাজাকে সে উপহার দেবে গেল!

অন্দু। দেবতার কাছে আবেদন কে দিয়ে রাখতে পারে?

সখী। দেবতা দেবতা কর না। রাজার কাছে আমাদের যে কি শাস্তি হবে তাই ভেবে আমরা আকুল হয়েছি।

অন্দু। তোদের শাস্তি কেন হবে?

সখী। কেন হবে? একটা পরপুরুষে আমাদের উপহার দেবলে। তুমি তো বেঁচে গেছ রাজকুমারী, তুমি বন্ধ তাল কর নি, স্পর্শও কর নি—তোমার কি! আমাদের কি হবে, রাজীর কি হবে? রাণী রাণী—রাজেশ্বরী—বুদ্ধ দেখা আর তাঁকে উপহার দেখেছে—কি হবে—কি হবে?

অন্দু। কি হবে! অমন করছিস্ কেন? তোদের কিছু শাস্তি হবে না। শাস্তি হয় তো আমার হবে।

সখী। তামাসা কর না রাজকুমারী—এ তামাসার সময় নয়—ওরে প্রলয় ঘনিয়ে আসছে।

অন্দু। কেন, দেখতে পাচ্ছি।

সখী। ওই রাজা আসছেন—মুখ তাঁর আরক্ত—রাজকুমারী, দেখে ভয় হচ্ছে—

অন্দু। যথার্থই রাজার মুখ গম্ভীর হয়েছে—দেখে বোধ হচ্ছে রাজা শাস্তিই দেবার জন্য বেগে আসছেন।

সখী। চলে এস—চলে এস—মোহাই রাজকুমারী। রাজা যদি আমাদের শাস্তি দেন, তুমি অন্তরস্থ রাণীর জন্য তাঁর পায়ে ধর। তুমি রাজার পরম প্রিয়। রাণী কিন্তু জানেন না—আমরাও জানি না।

অন্দু। আয় এখন আমরা এখান থেকে যাই। রাজাকে দেখে রাণীও এদিকে আসছেন। (উভয়ের প্রস্থান)

(উজয়ন ও শ্যামাবতীর প্রবেশ)

শ্যামা। কোন হতভাগা উদ্যানে প্রবেশ করেছিল মহারাজ?

উজ। হতভাগা নয় রাণী, সে ব্যক্তি ভাগ্যবান—কৌশাম্বীর রাজসভায় ভবিষ্যতের একটি রত্ন।

শ্যামা। বলেন কি?

উজ। তার কথা এর পরে বলব। এখন বল দেখি, তোমাদের মধ্যে কার দেহ অনাবৃত ছিল না।

শ্যামা। কি বলছেন — আমাদের সরম হচ্ছে। সে ব্যক্তি আমাদের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখেছে নাকি?

উজ। সে কথাও পরে বলব। এখন শীঘ্র বল তোমাদের মধ্যে নগ্ন দেহ ছিল না কার?

শ্যামা। আমরা সকলেই তো আবরণা হয়েছিলুম।

উজ। না, একজনের অঙ্গে বসন ছিল কে সে?

শ্যামা। হ্যাঁ! মনে পড়ছে বটে, আপনার ভগিনী অন্দুরাবা কেবল বসন পরিত্যাগ করে নি, এবং সরোবরেও অবগাহন করেনি।

উজ। বুঝতে পেরেছি—অন্দুরাবা!

(অন্দুরাবার প্রবেশ)

অন্দু। কি আদেশ মহারাজ?

উজ। ভগিনী আমি তোমাকে নির্বাসিত করব।

শ্যামা। নির্বাসন! সে কি! ভগিনীর সঙ্গে রহস্য! আপনার কি আজকাল মহারাজ! বালিকার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

উজ। রাজা বিনা কারণে এরূপ গুরু কথা নিয়ে রহস্য করেন না। মুখ শুকুলে চলবে না ভগিনী, তুমি রাজার কর্তব্য বিলক্ষণ জান।

শ্যামা। নির্বাসন! সে কি, বালিকা এমন কি অপরাধ করেছে?

উজ। এস, আর মুহূর্ত সময়ের জন্যও তুমি কৌশাম্বীর রাজগৃহে থাকবার অধিকারিণী নও।

শ্যামা। (উজয়নের পদ ধরিয়া) দেহাই মহারাজ, এ নিষ্ঠুর আদেশ করবেন না। অন্দুরাবা

(শেষাংশ ৩৪০ পৃষ্ঠায়)

# রামমোহনের লেখা দলিল

## সুধীরকুমার মিত্র

রাজা রামমোহন রায়ের বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম জীবনী-কার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮১ সালে প্রকাশিত তাঁর মহারাজা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-এ দুঃখ করে লিখেছেন। রামমোহনের ইংরেজী হস্তাক্ষর সকলেই না হউন, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই তাঁহার বাঙলা হস্তাক্ষর প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রকাশ করা তো দূরের কথা, অল্প লোকের ভাগ্যেই তাঁহার হস্তলিপি দেখা ঘটিয়াছে। "তাঁসহী" এই অপেক্ষাকৃত দেবনাগরী অক্ষরে তিনি লিখিতেন। রামমোহন সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষায় কথোপকথন লিখনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন আমরা দেখিতেছি। তাঁহার হস্তাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

রামমোহনের জীবনীকার তিনখানি তিন-চার লাইনের ক্ষুদ্র পত্র পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির "নবা-ভারত"-এ ১৩০০ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে প্রকাশিত "রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা হস্তাক্ষর" নামক প্রবন্ধটি ও সাক্ষরে তাঁর ছত্রে পরিশিষ্ট-রূপে সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছেন। চিঠি তিনখানি রামমোহনের জমিদারীর কর্মচারীদের দ্বারা লিখিত, কেবল পত্রগুলিতে আছে রামমোহনের স্বাক্ষর। নগেন্দ্রবাবু লিখেছেন। ঐ সকলের (পত্রের) ভাষার জন্য রামমোহনের কৃতিত্ব বা খাতির নাই। তাঁহার কর্মচারীদের মূর্তিমতী ভাষাদেবী এখানে সুশোভমানা। এই সূত্রে তৎকালে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা বিশেষত জমিদারী সেরেস্তার কেতা ও কায়দার পরিচয় পাঠকগণ বিদিত হইয়া কৌতুক ও কৌতূহল নিবৃত্তি অনুভব করিতে থাকুন।

নগেন্দ্রবাবু রামমোহনের একটি স্বাক্ষরও তাঁর গ্রন্থে মুদ্রিত করে গেছেন। রামমোহনের এই স্বাক্ষরের উপর দেবনাগরী ভাষার "প্রীসহী" এই কথাটি লিখে তারপর দ্বিতীয় লাইনে তিনি সাঁই করেছেন দেখা যায়। নমুনাস্বরূপ একখানি পত্র এখানে উদ্ধৃত হলো।

রামমোহনের স্বাক্ষরের দ্বিতীয় পত্রখানি এইরূপ:

শ্রীশ্রীরাম।
সন ১২০৫।
সং কুরসিদ্ধ।
শ্রীযদুনন্দন দত্ত সুচরিতেষু।

লিখনং কার্যঞ্চাগে। মহাশয় ছোট্টা মহাশয় এখান হইতে যখন ছাড়ি চিঠি লইয়া যাইতেছেন মাসিক চিঠি অবশ্য ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে যেন ওজর না আইসে। ইতি সন ১২০৫ সাল। তাং ১১ ফাল্গুন।

যে গ্রামের জমি খালাস দেওয়া হয়, পত্রের পর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা এইরূপ আছে। খাকিলপুরে ১, কেশবপুরে ১, খামলা ১, ও চিংড়াখি ১। মোট চারি মহল।

রামমোহন সম্বন্ধে ১৮৮১ সালের পর থেকে বহু তথ্য বা এ যাবৎ অনাবিষ্কৃত ছিল, তা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তাঁর বাঙলা হস্তাক্ষর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। সম্পূর্ণ সহায়সম্বলহীন অবস্থায় সরকারী দপ্তরখানা ও রামমোহনের সমসাময়িক সংবাদপত্রের ধূলোপড়া সংখ্যাগুলি ঘেঁটে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করলেন, রামমোহনের বাঙলালিপি তিনিও সন্ধান করতে পারেননি।

রামমোহনের বিষয়ে জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কয়েকখানি নূতন জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও রামমোহন সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্য বা তাঁর হস্তলিপি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমি "হুগলী জেলার ইতিহাস ও কলসমাজ"-এর উপাদান সংগ্রহ করার জন্য যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করি, তখন বহু, জমীদারি চিঠিপত্র, দলিল, সেকালের মুদ্রিত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা এবং বহু পুরাকীর্তি আমার গোচরীভূত হয়। তার মধ্যে উদ্ঘোষণীর —ব্যক্তিবিশেষের স্বহস্তে লিখিত উইল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্র, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তলিপি, গ্রাহেমে জন্মাষ্টমীব্রতের সেবার জন্য নবাবের ফারমান, রেজা খাঁ প্রদত্ত রিফকা সিংহেশ্বরী দেবীর জন্য প্রদত্ত তালুকের, ধর্মপুস্তক নয়ে প্রথম গদ্যগ্রন্থ, বাঙ্গবিদ্রূপ, দারজানতন্ত্র ও দুর্লভ সংবাদ।

রাধানগরে ১১৫৮ সালে রাজা রামমোহনের জন্মোৎসবে উপস্থিত হবার আমার সৌভাগ্য হয় এবং সেখানে রামমোহনের নিজের হাতে লেখা দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি 'একরার পত্রের' সন্ধান পাই। হুগলী জেলার ইতিহাস ও কলসমাজ গ্রন্থে সেটি সন্নিবদ্ধ করার জন্য সংগ্রহ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মূল্যবান দলিলটি এমন ভাল জায়গায় রেখেছিলাম যে ১৯৬২ সালে গ্রন্থটি প্রকাশের সময় দলিলটি খুঁজে না পাওয়ার জন্য তা সেখানে দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি গৃহ-সংস্কারের সময় একবার পত্রখানি পুনরুদ্ধার করি এবং সেই অমূল্য দলিলটি আজ প্রকাশ করতে সমর্থ হলাম।

রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করেন ১৫ নভেম্বর, ১৮৩০ সাল। তার ঠিক দু' মাস দু' দিন আগে অর্থাৎ ১৮৩০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে রামমোহন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজীবলোচন রায়ের কাছ থেকে ৮৮০০৲ টাকা নিয়ে অছিপত্র এই একরার বা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে তাতে স্বাক্ষর করেন। দলিলের বিষয়-বস্তু হচ্ছে। ১৮১৭ সালে রামমোহন হরলাল বসু চৌধুরীর নাট গোপাল-নগরের সম্পত্তি বন্ধক রেখে তাঁকে ৬০০০৲ টাকা ঋণ দেন। কিন্তু চৌধুরী সাহেব টাকা পরিশোধ করতে অসমর্থ হওয়ায় রামমোহন কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু করেন। চৌধুরী সাহেব আদালতে উপস্থিত না হওয়ায়, রামমোহন মামলায় জয়ী হন: কিন্তু চৌধুরী সাহেবের অক্ষমতার জন্য রামমোহন তাঁর টাকা আদায় করতে পারেন নি। অতঃপর পুনরায় রামমোহন উক্ত টাকার জন্য যখন নালিশ করেন, তখন তাঁর সুদে-আসলে পাওনা হয় ১৪,২০৮৲ টাকা। এবারও একতরফা মামলায় রামমোহনের পক্ষে ডিক্রী হয়। একরার পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত, উদ্ধৃত হলো:

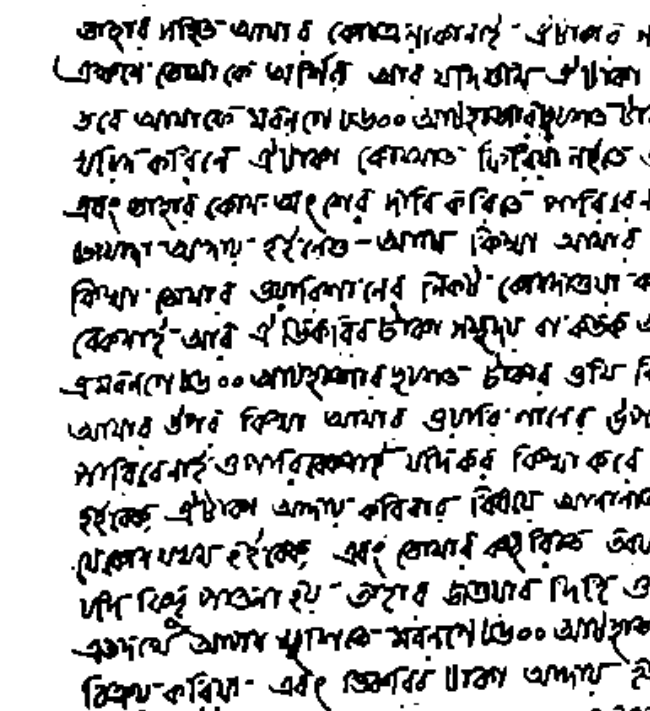

Witness to the signature of Rammohun Roy this 13 day of September 1830

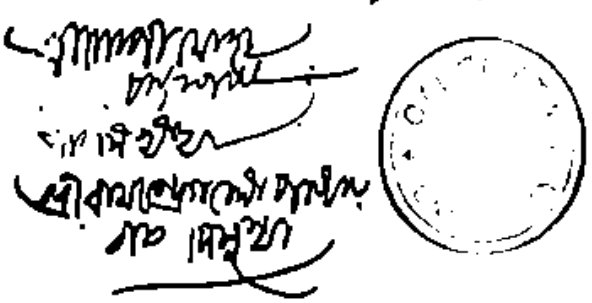

দাবি করিতে পারিবে নাই ও পারিবেক নাই যদি কল্য কিম্বা অদ্য তাহা বাটীল ও নামাঞ্জুর হইবেক ঐটাকা আমার করিবার বিষয়ে আদালতে মোকদ্দমা দরদেশ করিতে যে কোন লঙ্ঘন হইবেক. এবং তোমার বাবাত যদি কিছু পাওনা হয় তাহার জবাব ও নিলা বুঝি করিবে এতদর্থে আমার স্থানিতে ৮৮০০ আট হাজার ছয় শত টাকার ডিক্রির বিষয় করিবে এবং ডিক্রির টাকা আদায় হউক বা না হউক ঐ ৮৮০০ আট হাজার ছয় শত টাকা কম্মিন কালেও আমার নিকট অথবা আমার ওয়ারিসানের নিকট চাহিতে পারিবে নাই অর্থে ঐ টাকা আদায় খাটট যে কোন আদালতে করিতে হইবে তাহার জওয়াব দিহি বুঝি করিবে এই করারে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি ১২০৭ বাং শত সাইত্রিশ সাল তারিখ ২১ ভাদ্র মোতাবেক ১৮৩০ অষ্টাদশ শত সাল তারিখ—১৩ সেপ্টেম্বর— Witness to the Signature of Rammohan Roy this 13 day of September 1830

শ্রীগোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিলাত যাওয়ার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি যাবা মূলের চেয়ে ৫৬০৮ টাকা কম দিয়ে রামমোহন ১৪২০৮ টাকায় ডিক্রী প্রাপ্ত দেবোত্তর ধারকে ৮৮০০ টাকায় বিক্রয় করেন। আলোচ্য একরার পত্র প্রতিজ্ঞাপত্র তারই দলিল।

কোম্পানীর অফিসের স্ট্যাম্প কাগজে একরার পত্রটি লিখিত। স্ট্যাম্প কাগজের বাম উপরের দিকে (যেমন কার মতন অবস্থায় নয়) কোম্পানীর সীলে বাঙলায় 'বত্রিশ টাকা' মূল্যমান ইংরেজীতে Italics type এ 'Thirty two Rupees' ও তার উপরে "STAMP OFFICE" ও নীচে CALCUTTA এবং মাঝখানে বা দিকে '1829-30' লেখা আছে। সীলের নীচে ডানদিকে নাম বাঙলায় 'রাজকৃষ্ণ দেব' ও সাল তারিখ 'তেরশ সাতাশ সাল ১৮৩০ ইং ৮ সেপ্টেম্বর'। প্রতিজ্ঞাপত্রটি রামমোহনের নিজের হাতে লেখা নয়। তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন বাংলা ও ফার্সী ভাষায় লিখিত মূল দলিলে। প্রতিজ্ঞাপত্রটি রামমোহনের নিজের হাতে লেখা বলে অনেকে লিখেছেন। প্রতিজ্ঞাপত্রটি বাংলা এই তথ্যটি সর্বপ্রথম লেখা আমরা দেখি।

এই একরারনামা থেকে তখন বছর আগে রামমোহনের উদ্যোগে বাঙলা গদ্যসাহিত্য কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তা উপলব্ধি করা যায়। তিনি বাঙলা গদ্য রচনায় সংস্কৃত শব্দ বাহুল্য দিয়ে সাধারণ লোকের বোধগম্য করার যে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তার অনেক নিদর্শন এই দলিল তার প্রমাণ নিদর্শন। এই দলিলে 'বাবা' ব্যবহৃত হলেও পরি বা পূর্বপুরুষ তখনও বাঙলা গদ্যে প্রচলিত হয়নি দেখা যায়। গদ্যে পূর্বপুরুষের প্রচলন করেন বিদ্যাসাগর।

দলিলের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এই কথা লিখে তিনি লেখা শুরু করেছেন, কিন্তু এর আগে রামমোহনের যে তিনখানি পত্র নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উদ্ধার করেছেন তাতে সালসংবাদে 'খ্রীষ্টাব্দ' (১২০২ ও ১২০৫ সন) এবং 'খ্রীষ্টাব্দ' ১২০৩ সাল ব্যবহারের এই দুটি নমুনা নিয়ে তিনি পত্র শুরু করেছিলেন দেখা যায়। এই চিঠিগুলি থেকে রামমোহনের বর্ণানুক্রম পরিবর্তন ও বিকাশ লক্ষণীয়।

রামমোহনের স্বাক্ষরের সাক্ষী হিসাবে দুজন বন্ধুর নাম আছে। একজনের নাম শ্রীগোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও অন্য একজন হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। গোপীমোহন সম্বন্ধে কুলজীগ্রন্থে যে সব থেকে কিছু জানা যায়। তিনি লিখেছেন: প্রপুত্রে রামমোহন

অক্ষয় কুমার নাথ
বাড়ীর গাড়ীর
১নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩

চাকুরী ও ব্যবসা আরম্ভ যে করেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময় বর্ধমান ও কলিকাতায় দুই জায়গাতেই তাঁহার হিসাবনবীশ ও তহবিলদার ছিল। বর্ধমানে যে তাঁহার হিসাবপত্র রাখিত, তাহার নাম ভবানী ঘোষ ও কলিকাতা তহবিলদারের নাম গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রামমোহন বাহির হইতে যে টাকাকড়ি পাঠাইতেন, তহবিলদার গোপীমোহন তাঁহার নামে উহা কলিকাতার জমা করিয়া রাখিত।

রামমোহনের অবস্থার উন্নতির ইতিহাস কিরূপে হইয়াছিল, সে বিষয়ে কবিবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় টীকাকড়ি করিয়া লিখিয়াছেন। সে কথাটিরও এই একরকমের মধ্যে সমর্থন পাওয়া যায়।

রামমোহনের বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা বহুকাল থেকে ছিল। বিলাতে গিয়ে ইংরেজের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার সমন্বয় করে একটা পথনির্দেশ করার জন্য অন্তরে সে যেন বেশ অনুভব করতেন। কিন্তু সুযোগের অভাবে সেটা আর হয়ে উঠেনি। সুযোগ এবে ছিলেন দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ। সম্রাট চাননি তখনও তখনও ছিল তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। দিল্লীর সাথে কোম্পানির বেশ সম্ভাব বহু আগে থেকে সম্রাট কোম্পানীর কাছে একটি আবেদন করেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। তাই সম্রাট দ্বিতীয় আকবর রামমোহনকে রাজা উপাধি দিয়ে তাঁর দূত-স্বরূপ ইংলণ্ডের রাজার কাছে এবং পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কোম্পানী দূত হিসাবে রামমোহনকে পাঠাতে না চাওয়ায় রামমোহন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে প্রথম বাঙালী বিলাত যান এবং সেখানে গিয়ে তিনি দিল্লীশ্বরের দূত বলে ঘোষণা করেন এবং দিল্লীর সম্রাটের জন্য বার্ষিক তিন হাজার পাউণ্ড বৃত্তির ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। কিন্তু রাজা আর ভারতের মাটিতে ফিরতে পারেন নি। ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বৃষ্টলে তাঁর দেহান্ত হয়।

রাজার মৃত্যুর পর ১৮৩৬ সালের ১ এপ্রিল Curiosities of Bristol & Neighbourhood নামক পত্রের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় Mr. Mathews লেখেন: He (Rammohan) had for a length of time, ardently desired to visit Europe, and in particular, England; at last in the year 1830, he embarked for this country, having been engaged by the King of Delhi to make a representation of grievances to the British Government. Before his departure, the king conferred on him the title of Rajah, when giving him the appointment of Ambassador to this country. So well did he discharge his mission for his employer that he succeeded in obtaining an additional stipend of about £ 30,000 per annum for the King of Delhi, for which his own reward was to be between £ 3,000 and £ 4,000 per anum.

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ

আকাশবাণী বিরাকেন্দ্র, রবিবাসর ও ডি. জি. সেট

রবিবাসর বিরাকেন্দ্র আয়োজিত সুরোপাধ্যায়ের সৌজন্যে কলিকাতা প্রাপ্ত।

সিল্ক সেন্টারে
পূজার নূতন শাড়ীর
আকর্ষণীয়
সমারোহ
কলেজের মার্কেট • কল্ক কলিকাতা

# সেকালের বাজার দর

## ঊষারাণী সান্যাল

এক হাটে, ঘাটে, বাড়িতে সর্বত্র মূল্যবৃদ্ধির আলোচনা শোনি। ছোট, ছেলেরা বলে তারা সংসারের অনেক সামগ্রীর নাম জানে না। আমার মনটা কিন্তু তখন ১৯৩৪-এর দিকে ফিরে চলে যায়।

এখনকার ছেলেমেয়েরা বলবে গল্প-কথা; তাদের সাহেবদা খাঁয় আমলের কাহিনী এটা। তা কিন্তু নয়।

আমার বয়স তখন বছর চুরি। সেদিনটা কোন একটা ঘরের প্রথম দিন। সবেমাত্র চা করছি। আমার শ্বশুরমশাই এসে বললেন, 'আজ থেকে সংসার চালানোর দায়িত্ব তোমার।'

খানিকটা লজ্জা-সংকোচে হতচকিত হয়ে গেলাম। তারপর অস্ফুটে বললাম, 'বাবা, আমি যে কিছুই জানি না।'

তিনি অভয় দিলেন। বললেন, 'ভয় কি মা! আমি আছি। তোমার শ্বশুর-ঠাকুরমাকে এবার ছুটি দাও।'

বাড়ির জনকে নিয়ে আমার সংসার। তার উপর, উপরি লোক প্রায়ই দুই-একজন আসেন, থাকেন। আমি টাকার মাস চালাতে হবে।

স্বামী বললেন, 'মনে করবে ৮০ টাকা আমার এই মোট আয়। এরই মধ্যে তোমাকে ডাক্তার-বদ্যি, কলেজ-স্কুল, সামাজিক দায়-দায়িত্বের খরচ চালাতে হবে।'

স্বাভাবিকভাবেই আমার কাছে এক পয়সার মূল্য তখন অনেক। কাজেই পেন্সিল নিয়ে মাসের বাজেট করতে বসলাম। প্রথম বছর থেকেই আমার হিসাবের খাতা সযত্নে রাখা আছে। সেই খাতা দেখে ও আমার প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা থেকে সেদিনের হিসাব-গুলি তুলে ধরলাম।

তখন বর্ষাকাল অর্থাৎ নয়া পয়সা চালু হয়নি। এই মূল্যতালিকা তাই পুরনো টাকা পয়সার হিসেবে।

**জল ঘরে—**

মোটা চাল—১ টাকা ১৬ আনা
সরু চাল—২ টাকা
কামিনী ভোগ চাল—৪ টাকা
কয়লা—টাকায় ৮ মণ
(কুলি খরচ সমেত)

**সের দরে—**

দুধ—টাকায় ৮ সের
মোগার ডাল—৩ পয়সা
অড়হর ডাল—৩ পয়সা
খেসারীর ডাল—৩ পয়সা
মুগের ডাল—৪ পয়সা
নবন—২ পয়সা
সরষের তেল—৯ আনা
চরনা ঘি—১৪ আনা
পাওয়া ঘি—১ টাকা ৪ আনা
নারিকেল তেল—৪ পয়সা
কাটা মুই মাছ—৬ আনা
ছোট মাছ—সাড়ে ৩ আনা
কৈ, মাগুর—৪ আনা
মাংস—৮ আনা
ছানা—২ আনা
ভাল ছানা—টাকায় ২ থেকে ৩ সের
ক্ষীর—৪ আনা
ভাল ক্ষীর—১২ আনা
গুড়—৩ পয়সা
চিনি—সাড়ে ৪ আনা
মিছরি—৩ পয়সা
মধু—২ আনা
ঘৃত—২ আনা
কাপড় কাচা সোডা—২ পয়সা
আলু—১ পয়সার
টমাটো—১ বা ২ পয়সা
পেঁয়াজ—২ পয়সা
আদা—৪ পয়সা
ধনেপাতা—৪ পয়সা
পটল (গরমকালে)—১ পয়সার আড়াই সের (তবে বার মাস পাওয়া যেত না।
বেগুন (দাঁতে)—১ পয়সার আড়াই সের
পদ্মর খাদার খোল—৪ পয়সা আড়াই সের

একটা সাধারণ সংসার ১২ আনার মধ্যেই চলতো সারা মাস।

শাক—আধ পয়সা
কেরোসিন— এক বোতল—৪ পয়সা
রসগোল্লা—৬ আনা
বড় ডাবনেবু—একটা ২ পয়সা
ভিমের ডিমিলিশী—২ পয়সায় ৫টি
ভিমের কচুরী—২ পয়সায় ৫টি
ভিমের সিঙ্গারা—১ পয়সায় ১টি
ভিমের পরা (বড়)—১ পয়সায় ১টি
অন্যান্য মিষ্টির দাম ও সমানুপাতিক।
ভাল চা—১ পাউন্ড। ৮ আনা
কুলহেকশপ, বাদি কাগজ—১ ডিস্তা ২ পয়সা
কুলহেকশপ সাদা কাগজ—১ ডিস্তা ৪ পয়সা
ছবি পেন্সিল—২ পয়সায় ১টি
সাধারণ পেন্সিল—১ পয়সায় ১টি
জুতো (ছোট ছেলে-মেয়েদের)—১ জোড়া : ২ টাকা
চটী বা স্লীপার (ছোট)—১ জোড়া : ১ টাকারও কম
হারিকেন—১ পিস। ২ টাকা
কাঁসার বাসন—২ টাকা সের
জলচৌকী কম্বল—১খানা : ২ টাকা
তাকড় কাচা সাবান—৪ পয়সা
গায়ে মাখা ভাল সাবান—১ পয়সা
শিকাকাই সাবান—আধসের ৪ আনা
ধানের—১টি : ৬ আনা
শীতল পাটী—১টি : ৮ আনা
মার্কিন বিছানার চাদর—১টি : ১২ আনা (গ্রামাল সাইজ)
পোস্ট-কার্ড—১ পয়সা
খাম—২ পয়সা
মোগা—টাকায় ৩৫টি কাপড়
সাধারণ সাড়ী—১খানা : ১৪ আনা
সাধারণ ধুতি—১ খানা। ১২ আনা
গামছা—১খানা। ৩ আনা
শান্তিপুরী সাড়ী—১খানা : ৪ টাকা
ঢাকাই ধুতি—১খানা : ২ টাকা
মুর্শিদাবাদী রেশম সাড়ী—১খানি : ২২ থেকে ৩০ টাকা
মুর্শিদাবাদী রেশমের জোড় (ধুতি ও চাদর)—২৫ টাকা
কুলদরস—১ গজ। ৪ টাকা
রোয়া সিল্ক—১ টাকা ৪ আনা থেকে ২ টাকা গজ
মটকার ভাল সাড়ী—১খানা : ১১ টাকা
মটকার ধুতি—১খানি : ৮ থেকে ১০ টাকা
লং ক্লথ—৪ আনা গজ
মার্কিন—সাড়ে ৩ আনা গজ
ভাল জামার ছিট—৪ আনা গজ
নারিকেল—১ টাকার ১৬টি
ভাল আম—২ টাকায় ১০০টি
ভাল জিনু—৮ আনা ১০০টি
(আম ও জিনু ১১২তে ১০০ ধরা হত)
চালকুমড়া—১০টি : ১ পয়সা
এই অনুপাতে অন্যান্য তরি-তরকারি।
স্কুলের মাসিক মাইনা ১½ টাকা থেকে ২ টাকা
পাটের বস্তা (চিনির)। ১ টাকায় ৫টি
চিনির কার্টেজারো—১টি : ৬ আনা
সোনা—ভরি ২৪ টাকা। শুরু নয়।
রুপো—ভরি ৮ আনা

সোনা-রুপার দর থেকে অনুমান করা যাবে, বাজারগুলো ৬ শতাব্দীগুলির দাম কত ছিল।

### জহরতের গয়না-বিক্রয়ের জহরিজন (৩৯৮ পৃষ্ঠার পরের অংশ)

প্রস্তাবটা ন শোচাই ন কাঙ্ক্ষতি।' তাই বাসুদেব-প্রিয় জহরতালয়ে, পরম বৈষ্ণব, এঁর যাদুন শিখণ্ডী মোর-মর্দনে নৃত্য করে, তাদের অন্তরে তাতে কৃষ্ণকৃষ্টি হয়। উপস্থিতদের রাজকবি ইন্দ্রদমনে 'অহোঁদের কুরিতরুচিলা' মোগবে লাগাবী শ্রীকৃষ্ণ-বিষ্ণুকে স্মরণ করেছিলেন। চন্দ্রাবলীর জলোলোকের অধিবাসিনী শ্রীরাধা 'একবিংশি করি, মন্দর-মহুরী কণ্ঠ করে বিরাজিলা।'

'অধরে যত তার পটি গলবে, রাঙা অলেবব, কবি শিল্প, আদিকৃষ্ণ হেবের বচনে।' কবিবল্লভ মুকুন্দ-রামও এঁর বন্দনায় বলেছেন,'বেদান্ত-হরমনে কৃষ্ণ বলি বাখানে।' কৃষ্ণ-বৈবর্ত পুরাণ বলেন, ইনি জামদেব-বিয়োগন অতীব সুন্দর চক্ষু এবং শারদেন্দু বিনিন্দক সুন্দর মুখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবেরই তোলে ইনি 'কবিশিরা' হয়েছিলেন। পুরাণে আখ্যায়িকা আছে, মাতৃচরণকে এই মহাবৈষ্ণব সর্বতীর্থসার মনে করে ব্রহ্মা ভাটিবেরের সঙ্গে তীর্থ-পরিক্রমার প্রতিযোগিতা থেকে বিরত হয়েছিলেন। এঁর একটি নাম 'আখুপ' এঁর বাহন মূষিক। ইনি বিদ্যের বিনায়ক সিদ্ধির প্রথম প্রবর্তক নানা নয়ন স্মৃত। সকলের ইনি বিঘ্ন নাশ করেন ইনি স্মরণ করুন, ভক্তদের ভবিষ্যদ্রষ্টার প্রতিবাদিত সিদ্ধি সকলের মুখরুচে তোলাবিয়ে দেন সকল দেবতার পূজা হতে তিল তিল সারভূত করে স্বজাত-বৈষ্ণবের মতো শৈব-বিদর ও প্রতিকল্পতার প্রচার করেন। পুরাণে পার্বতীর প্রতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশী শ্রীকৃষ্ণের উক্তি পাওয়া যায় 'ন ছবেন্ বিষ্ণুভক্তিশ্চ বিষ্ণুনৈবেদ্য-বিনা। তস্মাৎ লোকশিক্ষার্থং ভক্তপ্রবর পূজয়ন্তু সর্বৈকাগ্রমনসা।' গণেশখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ বলে বলে সমাবেত ঋত্বিকদের উদ্দেশ্যে বিপ্রমিত্রবৃন্দাবনে-বর্ণিত: 'হে বিষ্ণুভক্ত, তুমি ছাড়া বিষ্ণুভক্তি হয় না। লোকশিক্ষার জন্য তোমাকে ভক্ত, তোমার তপ, তোমার পূজা। সমস্ত লোকের জন্য তুমি নিতে পার। তুমি নিরাকৃপা সনাতনী শ্রীকৃষ্ণ প্রতিবলেন গণেশখণ্ড ধরে এসে যে গণেশজননী, তোমার ছেলে স্বয়ম্ভুগ্রহণ করেন।' এই বলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন।

ভারতীয় জহরতের বহু-নিন্দিত বহুপালনা-বহু আয়না একেরই আরাধনা করি। গয়না-বৈষ্ণবের মহামিলনের মহোৎসবের আমাদের এই 'জহরতালয়', আমাদের দুর্লোকদের সবাই সর্বজনীন।


ভারতবর্ষে এই প্রথম!

পরমেশ চৌধুরীর 'মানুষের পূর্ণপুরুষ অন্য গ্রহের মানুষ'।

অন্য গ্রহ থেকে তাদের উপনিবেশস্থাপনে মহাকাশচারীরা এসেন এবং আসেও আসতেন। অনেক বছর আগে যারা আসতেন তাদেরই বংশধর আমরা। মানব সভ্যতা ও মানব জন্মের নতুন বিশ্লেষণ উন্মোচিত করবে এই গ্রন্থ। সব বয়সের নরনারীদের জন্যে এই গ্রন্থে সঞ্চিত রয়েছে অপার কৌতূহল, আনন্দ ও বিস্ময়।

দে বুক স্টোর্স, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

## ডেট কাপড় ধোয়ার কেক

অন্যান্য সাবানের তুলনায় ১½ গুণ বেশী কাপড় ধোয়—এ সে জল যে ধরণেরই হোক।

## ডেট কাপড় ধোয়ার পাউডার

সাদা কিম্বা নীল — যে কোন লাইফে পাবেন। কেবল ডেট গোলা জলে ডুবান আর ধুয়ে নিন। এটি আপনার হাতের পক্ষেও নিরাপদ।

## এন-ডেট

দাগ ধুয়ে পরিষ্কার করার এনজাইমযুক্ত পাউডার, রঙিন কিন্তু কাঠকর নয়।

# না কখনও ছিল,না পাবেন—এমন শুভ্রতা ডেটের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

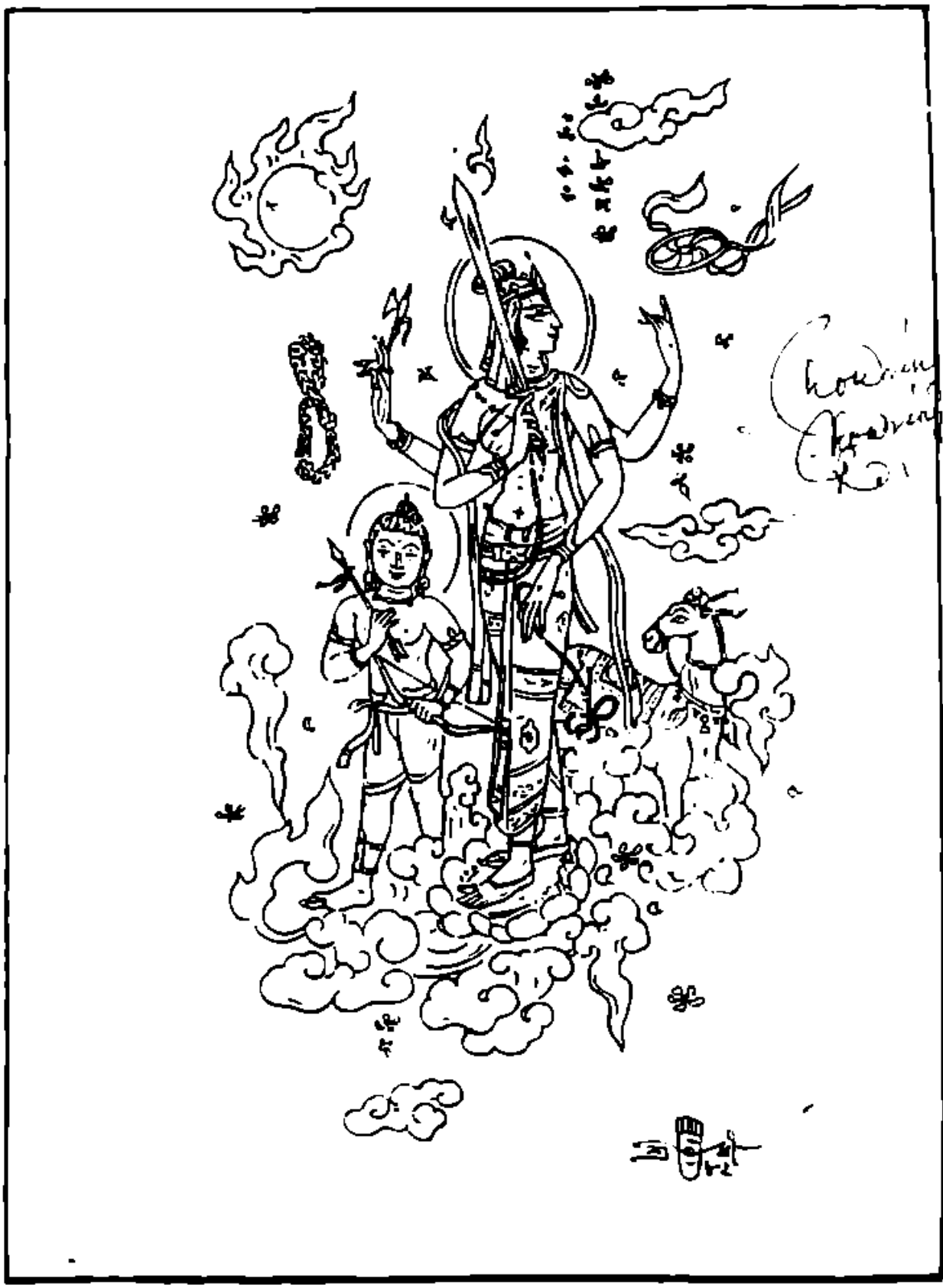

# কাহিনী

# পাক্ষিক

## সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ওরা তিনজন—নীহাররঞ্জন গুপ্ত | ... | ৩৫ |
| ভুলচাঁদ—শক্তি চট্টোপাধ্যায় | ... | ৪৬ |
| উর্বশী ও জনি—মহাশ্বেতা দেবী | ... | ৫৫ |
| অন্ধকারের রং—অসিত গুপ্ত | ... | ৬১ |
| ফকিরচাঁদের ফৌতিব্যবসা—অদ্রীশ বর্ধন | ... | ৭৫ |
| জীবন বড় ভারবাহী জন্তু—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৮১ |

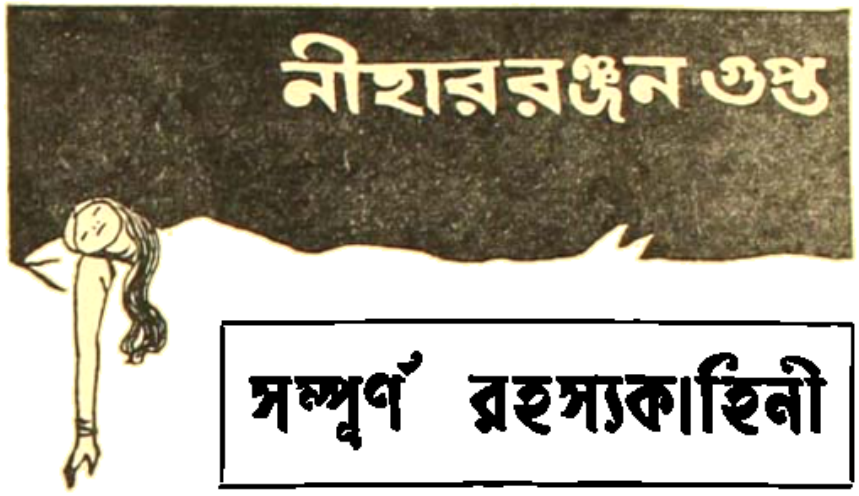


প্রমীলা নাকি আত্মহত্যা করেছে। প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে কথাটা শিবেনের যেমন অসম্ভব তেমনি যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। এই মাত্র গত পরশুই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে দেখা হয়েছিল প্রমীলার সঙ্গে শিবেনের।

সেই হাসিখুশি কৌতুকপ্রবণ প্রাণোচ্ছল প্রমীলা। ওই, সেদিনও ত দুঘণ্টার মধ্যে প্রায় একবারও শিবেনের মনে হয়নি ওর মনের মধ্যে কোথাও কোনপ্রকার দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা আছে। বরং ওর চিরদিন যেমন কথায়-কথায় ছেলে-মানুষি করা অভ্যাস, বিশেষ করে নির্মলের সঙ্গে, সেদিনও সন্ধ্যার প্রমীলা 'লেড-পুল' করছিল।

নির্মল যত গম্ভীর হয়ে ওঠে প্রমীলা যেন ততই ওকে বেশী করে জ্বালাতন করছিল আর নির্মলের বিরক্তিতে ওর চাপা হাসিটা যেন আরো বেশী প্রকট হয়ে উঠছিল।

অবশেষে এক সময় হঠাৎ উঠে পড়ে বলেছিল, 'আমি চললাম শিবেন।'

প্রমীলা সহসা সচকিত হয়ে উঠেছিল, 'সে কি! এই মধ্যে চললে মানে, না, না তা হয় নাকি। এখনো ত সন্ধ্যাই উৎরোলো না—বোস, বোস—আর এক কাপ কফি হোক and I shall stand. তারপর এক সঙ্গেই তোমরা যাবে। চাই কি ট্যাক্সীও নিতে পারি—'

'না। ধন্যবাদ।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্মল বলেছে।

প্রমীলা চাপা হাসি হাসতে হাসতেই বলে ওঠে, 'আবার ধন্যবাদের কি আছে— after all we are all friends here! Have another cup of coffee!

বোস—বোস—'

—না।'

প্রমীলাই তখন বলে উঠেছিল, 'শিবেন, নির্মল নিশ্চয়ই রাগ করেছে।' বলেই আবার সে তার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তার ফিরে আসে, 'তা সে তুমি যাই বলো নির্মল, ঐ সোল-কুমড়োর মত দেখতে মীনাক্ষীর পাশে তোমাকে just like a perpendicular— মনের পাতায় যখনই ছবিটা ভেসে ওঠে—' আর বলতে পারেনি প্রমীলা, মুখে হাত চাপা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসিতে যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল।

প্রমীলা মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসিটা রোধ করবার চেষ্টা করছে। মাথাটা একটু ঘুরিয়ে রেখে দুপাশ দিয়ে নেমে আসা লম্বা কিন্নরী দুটো দুলছে থেকে থেকে—আর নির্মল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে প্রমীলার দিকে।

প্রমীলা আবার বলে ওঠে, 'তার চাইতে একটা ডালমোসিলো—'

নির্মল মৃদু চাপা গলায় বলে ওঠে, 'Vulgar'.

প্রমীলা মুখ তুলে তাকায় নির্মলের দিকে। উচ্ছ্বসিত হাসির বেগটা রোধ করতে করতে বলে, 'ডালমার, ডালগারের কি যায়ছে। তুমি একটা ডালমোসিলোর সঙ্গে পরদম হয়ে প্রেম করতে পারো আর—তুমিত তবুও শান্তা শিবরমনা—মীনাক্ষী না হয় ডালমোসিলোই হলো! তা ছাড়া—'

—সবাইত সমান হয় না! অত অহংকার ভাল নয় প্রমীলা দেবী'—চাপা রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে নির্মল।

এতক্ষণ শিবেন একটা কথাও বলেনি, বরং ব্যাপারটা সাঁতা বলতে কি উপভোগই করছিল। কিন্তু হঠাৎ ব্যাপারটা যেন কেমন বাঁকা পথ ধরছে তার মনে হতেই সে প্রমীলাকেই বলে ওঠে, 'অঃ প্রমীলা যাবাবেতো—এই নির্মল, বোস—বোস—'

—না—'

কথাটা বলে নির্মল আর দাঁড়ায়নি। বের একটু, দ্রুতপদেই হলঘর থেকে অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল।

শিবেন তখন বলেছিল, 'সাঁতাই নির্মল ছেলে মিকেয়ে প্রমীলা। ও ব্রাক সাঁতাই বোধহয় জোকিং মুডে ছিল না।'

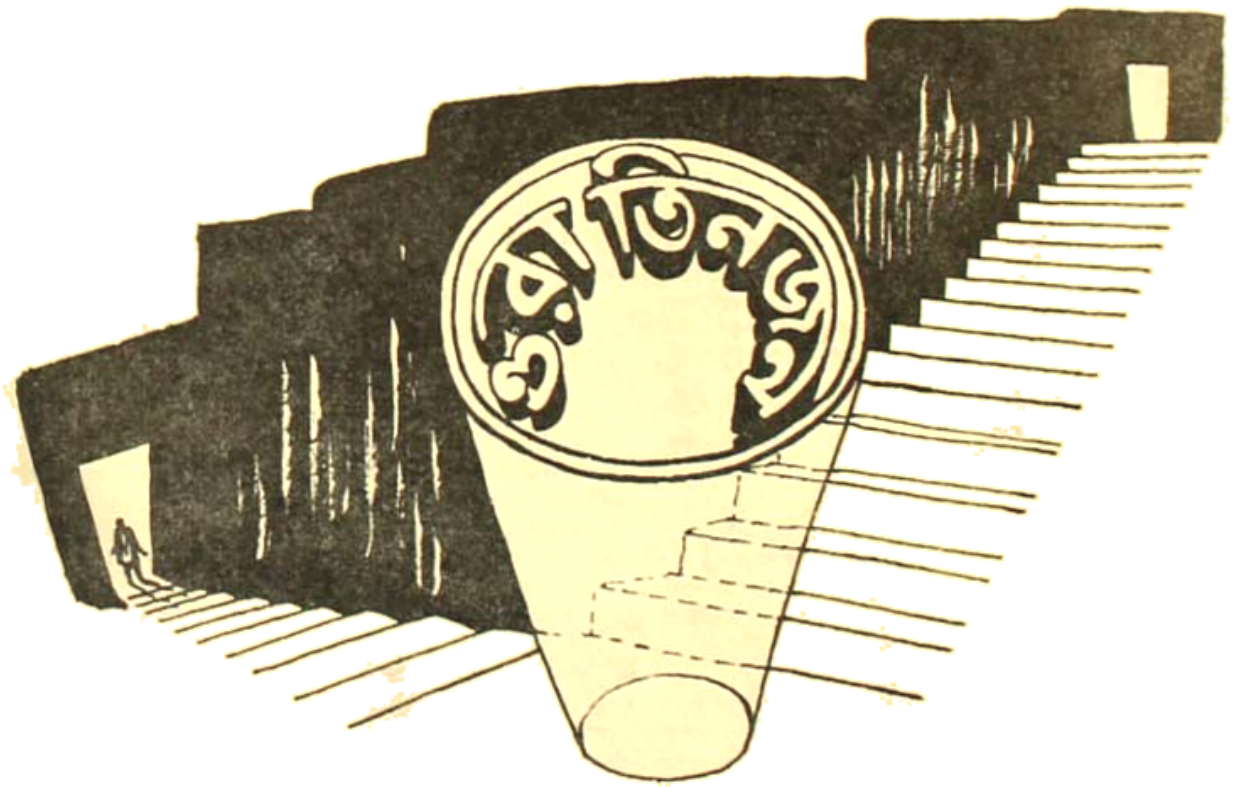

প্রমীলা হঠাৎ হাসছে।

—'কিন্তু সত্যিই কি ব্যাপার বলতো প্রমীলা?' শিবেন শুধায়।

—'কিসের কি ব্যাপার?'

—'ঐ রঙীনাক্ষী সম্পর্কে যা একটু আগে বলছিলে। সত্যি নাকি ব্যাপারটা?'

—'জানি না তবে—একটু যেন বেশীই ওরা আজকাল মাখামাখি করছে—'

—'তাই?'

—'নির্মল বলছে প্রেম—তবেই হয়েছে—'

—'কেন। হওয়া ও কথা কেন?'

—'হতেও পারে নির্মলকে কতটা জানে জানি না শিবেন। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, ওকে আমি খুব ভাল করেই চিনি। কিন্তু ওর না শিবেন। চল ওঠা যাক—'

প্রমীলা যেন প্রসঙ্গটার উপর একেবারে একটা দাঁড়ি টেনে দিয়ে উঠে পড়েছিল। দুজনে ভিড় হাউস থেকে বের হয়ে এসে বাস স্টপেজের কাছে বেশ কিছুক্ষণ যাবের অপেক্ষায় পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল—শিবেন বার্থও হাত উঁচিয়ে দিয়ে।

কিন্তু একটা কথাও ওরা অনেকক্ষণ হয়নি ওদের পরস্পরের মধ্যে যদিও প্রায় আধঘণ্টা ওরা পাশাপাশি বাস স্টপেজে দাঁড়িয়েছিল।

প্রমীলাকে কেমন যেন একটু অন্যমনস্কই ওর মনে হয়েছিল শেষের। তার কথাটা মনে পড়ছে শিবেনের।

হুঁ—

হুঁ মনে হয় শিবেনের সমস্ত ব্যাপারটাই আগাগোড়া একটা ঠাট্টা বা রসিকতা নয় ত। সত্যি সত্যি একটু অহং নির্মল কোন তার সম্পর্কে ঠাট্টা বা রসিকতা করছে না ত!

কিন্তু আবার মনে হয় তখন একটা আপার নিয়ে ঠাট্টা-রসিকতা। তা ছাড়া নির্মলের তখন প্রবৃত্তিই ত নয় —স্বাভাবিক একটু নিরিহাস টাইপের ছেলে।

কিন্তু সত্যি-সত্যি নির্মলেরই কোন ত।

হ্যাঁ—নির্মলই—নির্মলই তাকে কোন করেছিল—যদিও নির্মল তার নাম বলেনি, সে ত নাম জিজ্ঞাসা করেনি—এবং সত্য কথা বলতে কি, কে কোন করছে তাকে ঐ মুহূর্তে কথাটা তলিয়ে ভাববার মতোও বুদ্ধি তার মনের অবস্থা ছিল না।

তা না হোক—যদার অবশ্য নির্মলেরই—

নির্মলদের বাড়িতে কোন আছে—আগেও অনেকবার নির্মল তাকে কোন করেছে—নির্মলের ফোনের গলা তার চেনা—ভুল হবার কথাই ওঠে না।

না। নির্মল ছাড়া আর কেউ না—অন্য কেউ হতেই পারে না।

ফোনের কথা দুজনা ছেলে ছেড়েই হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়েছিল শিবেন।

—'হ্যালো—'

অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে এল, 'শিবেন?'

—'হ্যাঁ। কে?'

সঙ্গেই আবার নির্মলের গলা, 'শুনেছিস প্রমীলা সুইসাইড করেছে।'

—'কে, কে সুইসাইড করেছে?'

—'প্রমীলা। প্রমীলা চক্রবর্তী।'

একটা প্রচণ্ড আঘাত যেন প্রমীলা নামটা তার কর্ণকুহরে এসে আছড়ে পড়েছিল।

কয়েকটা বোবা বিহ্বল মুহূর্ত। হাতের মধ্যে ফোনের রিসিভারটা ধরা অবস্থা—শিবেন যেন একেবারে পাথর।

প্রমীলা সুইসাইড করেছে—কে—কে তাকে ভেঙ্গে বললো, নির্মল—নির্মলের গলাই যেন শুনে হলো—ওরা ত এক পাড়াতেই থাকে—খান তিনেক বাড়ির ব্যবধান দুজনার বাড়ির মধ্যে।

—'হ্যালো—হ্যালো — নির্মল—এই নির্মল—'

বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠে শিবেন ব্যস্তকণ্ঠে ডাকে কিন্তু ফোনের ওপাশে-থেকে তখন কেটে গিয়েছে!

ডায়েল টোন শোনা যাচ্ছে।

শিবেন স্থির হতে নির্মলের ফোন নম্বরটা ডায়েল করলো।

বেশ কিছুক্ষণ বাজবার পর অপর-প্রান্তে নির্মলের গলা শোনা গেল।

—'হ্যালো—'

—'নির্মল?'

—'হ্যাঁ—কে?'

—'আমি—আমি শিবেন — একটু আগে তুই কি বলছিলি?'

—'আমি?'

—'হ্যাঁ—তুইই ফোন করেছিলি।'

—'আমি ফোন করেছিলাম তোকে? কই না ত।'

—'তুই বলছি না আমাকে ফোন করে—এই মাত্র—'

—'কি বলেছি—'

—'প্রমীলা—মানে আমাদের প্রমীলা —সুইসাইড করেছে—'

—'Are you mad? আমি আমার কখন তোকে ফোন করে বলতে গেলাম যে প্রমীলা সুইসাইড করেছে—আর কোন দুঃখেই বা তোকে সুইসাইড করতে যাবে—স্বপ্ন দেখছিস নাকি?'

—'তবে কে—কে আমাকে ফোন করলো?'

—'কেউ করেনি—তুই বোধহয় একটু আগে স্বপ্ন দেখছিলি। দুঃস্বপ্নই দেখছিলি নিশ্চয়ই, কারণ সাড়ে সাতটার আগে তুই বিছানা ছেড়েই উঠিস না—' কথার শেষে একটা হাসির শব্দ করে এলো শিবেনের।

শিবেন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ওদিকে তখনও নির্মল ঠক্ করে ফোনটা রেখে দিয়েছে।

নির্মল সকালবেলা উঠে বাসী মুখেই এক কাপ চা নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসেছিল ঐ সময় শিবেনের ফোন এসেছিল। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে নির্মল আবার এসে চেয়ারে বসে সামনের টুলটার উপর থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিল।

ঘড়িতে ৮ টা ৩১ করে ছটা বাজল।

নির্মল চায়ের কাপের কানায় চুমুক দেয়—চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে ইতি-মধ্যেই। কয়েক চুমুকে চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে নির্মলকটা হতে ঘরের সামনে রাস্তার উপরে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

নির্মলদের দোতলার বারান্দা থেকে দুটো বাড়ির পরে প্রমীলাদের বাসা-বাড়ির দোতলার বারান্দাটা সামান্য দেখা যায়। রেলিংয়ের কিছুটা অংশ আর জানলার সঙ্গে লোহার চুকে থোলান ছোট ছোট মাটির টবে মানি প্লান্ট ও ফুলের গাছ দেখা যায়।

প্রমীলার বাবা নিরঞ্জন চক্রবর্তী কোন্ একটা ফার্মে যেন চাকরি করেন মাইনে বোধ হয় অই-নগ্ন ন পান। নির্মলরা যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে সেই সময় নিরঞ্জনবাবু এ পাড়ায় এসে ঐ বাড়ির দোতলা ও তিনতলাটা ভাড়া নেন। কয়েকই প্রমীলারা ঐ বাড়িতে বসবাস করছে তা প্রায় বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল।

আলাপ ছিল না নির্মলের সঙ্গে প্রমীলার—আলাপ হতোও না, কারণ চিরকিনই একটু মুখচোরা গোবেচারা টাইপের ছেলে নির্মল বরাবর। কিন্তু তবুও আলাপ হয়ে গেল একদিন কয়েক বছর পরে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে কলেজে পড়তে গিয়ে।

আলাপ হয়ে গেল—শিবেনের মাধ্যমে। শিবেন বলেছিল, 'এই নিমু—ঐ প্রমীলা চক্রবর্তীকে চিনিস? ঐ যে মেয়েটি—আমাদের সঙ্গেই এবারে এই কলেজে ঢুকেছে ফিজী কোর্সে — আমাদের সহপাঠিনী—'

—'না—'

—'সে কি রে, তোদের পাড়াতেই তো থাকে।'

—'তা হবে।'

—'মিস চক্রবর্তী—এই যে—এদিকে শিবেনের ডাকে প্রমীলা এগিয়ে এসে।

—'কিছু বলছিলেন শিবেনবাবু—'

—'হ্যাঁ—এই যে আমার এই বন্ধু নির্মল মল্লিককে চেনেন?'

প্রমীলা মৃদু হেসে বলেছিল, 'না —পরিচয় নেই। তবে উনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন জানি। উনি তো এবার সুটো লেটার পেয়েছেন, কেমিস্ট্রি আর ম্যাথমেটিক্স-এ—'

ঐ সময় নির্মল বলেছিল, 'আপনাকে তাই ঈর্ষা হচ্ছিল দেখে সর্বদা। আপনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন, না?'

—'হ্যাঁ—আপনাদের বাড়ির নম্বর ৪৭, আর আমরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকি সেটা ৫০ নম্বর।'

সেই আলাপের সূত্রপাত। ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা তারপর।

হঠাৎ চমক ভাঙল নির্মলের—একটা কলো গা-এর পুলিস ভ্যান প্রমীলাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে। এ সময়ে ওদের বাড়ির সামনে পুলিস ভ্যান কি ব্যাপার! নির্মলের মনের মধ্যে কেন তার অজান্তেই একটা বিদ্যুৎ চমক খেলে যায়।

একটু আগে শিবেনের ফোনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল। প্রমীলা সুইসাইড করেছে।

পুলিস ভ্যানটা থেকে একজন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিস অফিসার নামলেন। চকিতে সম্ভব অসম্ভব অনেক কথাই মনের মধ্যে আনাগোনা শুরু করে দেয় যেন নির্মলের তৎক্ষণে।

প্রমীলা সুইসাইড করেছে।

প্রমীলাদের বাড়িতে মানুষজন খুব বেশি নেই। প্রমীলার মা-বাবা, প্রমীলা ও তার দুই ভাই—সুবীরজন ও প্রিয়রঞ্জন।

সুবী ওর বড়। বি-কম পাস করার পর ওর বাবা নিরঞ্জনবাবুই তার অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। খুব আমুদে ও রসিক মানুষ সুবীরজন। আর প্রিয়রঞ্জন এবার হায়ার সেকেন্ডারী দেবে, প্রমীলাদের বাড়িতে নির্মলের অবশ্য যাওয়া-আসা আছে। প্রমীলাও মধ্যে মধ্যে তাদের বাড়িতে আসে।

দোতলা আর তিন তলাটা নিরঞ্জন-বাবু ভাড়া দিয়েছেন আর একতলার খান তিনেক দোকান ঘর। দোকান-গুলো এখনো খোলেনি—আর এত সকালে খোলবার কথাও নয়। কয়েকই পুলিস ভ্যান এসে থাকে তো—প্রমীলাদের ওপরেই এসেছে।

নির্মল তাড়াতাড়ি একটা শার্ট গায়ে চড়িয়ে পায়জামা পরা অবস্থাতেই পায়ে চপ্পলটা গলিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

মাত্র দুটো বাড়ির পরে—

রাস্তায় এখনো কোন লোকজন দেখা দেয়নি। একটা ছুটির গাড়ি মহম্মদবাড়া রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে—

॥ ২ ॥

প্রমীলাদের বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেল নির্মল।

বাধা দিল একজন পুলিস সার্জেন্ট।

—'কাকে চান?'

—'প্রমীলার সঙ্গে একবার দেখা করবো।'

—'প্রমীলা?'

—'হ্যাঁ—প্রমীলা চক্রবর্তী—আমরা ইউনিভার্সিটিতে এক সঙ্গে পড়ি—'

—'এক সঙ্গে পড়েন! তা আপনি বুঝি এই পাড়াতেই থাকেন?'

—'হ্যাঁ, এই তো দুটো বাড়ি পর। কিন্তু এ বাড়িতে কি হয়েছে!

—'একটি মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা —সুইসাইড করেছে।'

—'সুইসাইড করেছে!

কে। কে সুইসাইড করেছে, প্রমীলা?

বিস্ময়ের যেন অবিভূত—প্রশ্নটা আপনা হতেই বের হয়ে আসে নির্মলের কণ্ঠ হতে। এবং সে কিছু বলবার আগেই প্রমীলার বড় ভাই সুবীরঞ্জনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ঘরজার উপরেই দাঁড়িয়ে সুবীরঞ্জন। কেমন যেন বিহ্বল, বিভ্রান্ত।

—'এই যে নির্মল—প্রমীলা আত্ম-হত্যা করেছে—'

—'আত্মহত্যা করেছে! কখন—কবে?'

—'কাল রাত্রে—কেন আত্মহত্যা করলো জানো কিছু তোমরা? তোমরা জানে তার কুসুম বন্ধুরা—'

সুবীরঞ্জনের কথা শেষ হলো না—

—'ইনি কে?'

—হঠাৎ ঐ সময় পাশ থেকে থানা অফিসার চিত্তপ্রিয় মুখার্জীর গলার স্বর শুনে সুবীরঞ্জন ফিরে তাকাল। তখন ইতিমধ্যে চিত্তপ্রিয় মুখার্জী সদরে এসে দাঁড়িয়েছে জানতেও পারেনি ওরা।

চিত্তপ্রিয় মুখার্জী মাস কয়েক মাত্র হলো ঐ এলাকার থানার ইন্চার্জ হয়ে এসেছে। বয়স বেশী নয়—২১/২২ হবে।

—'ও, মানে আমার যেন প্রমীলার কুসুমরুক্ষ নির্মল—এ-পাড়াতেই থাকে।'

তখন চিত্তপ্রিয় মুখার্জী নির্মলকে জিজ্ঞাসা করলে।

—'তা কখন জানা গেল যে প্রমীলা সুইসাইড করেছে?, সুবীবাবু, আপনি তখন জানতে পারলেন বাসাটা?' প্রশ্নটা করে তাকাল নির্মল প্রমীলার দাদার মুখের দিকে।

জবাব দেয় চিত্তপ্রিয়। বলল, 'ব্যাপারটা একটু peculiar নির্মল-বাবু।'

—'Peculiar? কি রকম?'

—'কোন বিষের ক্রিয়াতেই মৃত্যু হয়েছে বোঝা যাচ্ছে—তবে এসব ক্ষেত্রে সাধারণত আত্মহত্যার মনে চিঠিপত্র লিখে যায়। সে রকম কিছুই পাওয়া যায় নি।'

—'কেন চিঠিপত্র প্রমীলা লিখে যায়নি?'

—'না। আর তার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না। ভেজান ছিল মাত্র।'

—'তখন জানা গেল কেমনভাবে?'

কথা বলল এবারে আবার সুবীরঞ্জনই। বলল, সবার আগে বাড়িতে ওই ওঠে। তারপর চা তৈরী করে নিয়ে যায় ও আমাকে দেয় এক-কাপ। আমি শেষ রাত্রের দিকে উঠে সামনের পার্কটায় বেড়াতে যাই। ফিরে আসি পাঁচটা নাগাদ—এসে দেখি এক চা তৈরী হতে আর বেশী দেরি নেই—প্রতিদিনই। কিন্তু আজ ফিরে এসে দেখি ওর ঘরের দরজা তখনো বন্ধ। সাড়ে পাঁচটায় ও যখন উঠলো না—তখন ওকে ডাকবার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকি—ডেকেছিলাম হয়তো একটু ঘুমে জড়িয়ে। অনেকক্ষণ ডাকি নাম ধরে ওর, কিন্তু সাড়া পেলাম না। তখন বাধ্য দিতে ফিরেই দরজা খুলে দেখি।'

ঘরের দরজা বাধা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুলে যেতে—সুবীরঞ্জন যেন একটু বিস্মিতই হয় কারণ প্রমীলা কখনো তার ঘরের দরজা খুলে শোয় না। তাকে ডেকে তখনও তোরের আলো ফোটে নি—ঘরের জানালা পথে কাপসা কাপসা আলো আসছে। সেই কাপসা আলোয় সুবীরঞ্জন দেখল—প্রমীলা খাটের উপর পড়ে রয়েছে কেমন আড়াআড়িভাবে। মাথাটা ঝুলছে খাটের বার থেকে, একটা হাতও ঝুলছে—বেণীটা দলার পাশ দিয়ে নেমে এসে ঝুলছে। বিশেষ ঐ ভঙ্গিমাটাই প্রমীলার সুবীরঞ্জনকে যেন চমকে দেয়। সে থমকে দাঁড়ায়।

তার মন যেন সঙ্গে সঙ্গে বলছিল কিছু একটা ঘটেছে। কিছু একটা অঘটন ঘটেছে মন বলছে মনুষ্যের স্বভাববশত ধর্ম দেখানে প্রথমটায় সম্ভাবনার কথাটাই চেষ্টা করে—তাই সুবীরঞ্জন আরো দু'পা এগিয়ে গিয়ে ডাকে, 'এই প্রমী, অমন করে পড়ে আছিস কেন রে?'

কিন্তু প্রমীলার দিক থেকে কোন সাড়া পায় না।

সুবীরঞ্জন এবারে এগিয়ে গিয়ে বোনের মাথাটা তুলতে গিয়ে তাড়া-তাড়ি ছেড়ে দেয়—সুবীরঞ্জনের আর ঘরে থাকতে সাহস হয় না। ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসে। নিজের ঘরে এসে কয়েকটা মুহূর্ত যেন বিহ্বল ঘরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরই সে তার তার বন্ধু অধিভাজকে ফোন করে। অধিভাজ ফোন পেয়েই আসে এবং প্রমীলাকে পরীক্ষা করে বলে 'Sorry! She is dead!'

Dead মানে মারা গেছে।

—'হ্যাঁ—মনে হচ্ছে a case of poisoning—

আত্মহত্যা—'

—'আত্মহত্যা — প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে!' সুবীরঞ্জন যেন কেমন বোকার মতই প্রশ্নটা করে।

—'হ্যাঁ—সুবী তুমি বরং এক কাজ করো—থানায় একটা ফোন করে দাও—'

—'কেন থানায় ফোন করবো কেন?'

—'বুঝতে পারছো না—a case of suicide— পুলিশকে না জানিয়ে ডেডবডির তো কোন ব্যবস্থা করতে পারবে না। তাছাড়া কোন জায়গাই তোমাকে death certificate দেবে না।'

অধিভাজই থানায় ফোন করে। থানা অফিসার চিত্তপ্রিয় মুখার্জী সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেন। থানা বেশী দূরে নয়।

তিনি এসে সব শুনে মৃতদেহ পরীক্ষা করে অধিভাজের সঙ্গে একমত হন।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে যায় সকাল ছটার মধ্যেই।

নির্মল সব শুনে স্তব্ধ হয়ে বাড়িয়ে থাকল। কিন্তু সে যে ফোনে প্রমীলার মৃত্যু সংবাদটা পেয়েছে ইতিপূর্বেই, সে কথা বলল না।

চিত্তপ্রিয় মুখার্জী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আঙুলি প্রশ্ন করলেন—তারপর তাকে মুক্তি দিলেন।

নির্মল ওখান থেকে বের হয়ে এলো। কিন্তু বাড়িতে গেল না—সকেটে পার্সটা আছে দেখে নিল। তারপর সোজা বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

সিনেমে—সিনেমের সঙ্গে দেখা হওয়া এখুনি তার একান্ত প্রয়োজন।

বাঁকানমুখো একটা ট্রামে উঠে বসল নির্মল। সিনেমা থাকে কালীঘাটের।

এদিকে চিত্তপ্রিয় মুখার্জী মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করবার জন্য তৎপর হলো।

সুবীরঞ্জন তার ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে মুহ্যমানের মত বসেছিল।

কি করবে—এখন তার কি কর্তব্য কিছুই যেন মাথায় উঠতে পারে না।

মা মারা ও ছোট ভাই পুরীতে বেড়াতে গিয়েছে। সে আর পুরাতন ভৃত্য রামচরণ বাড়িতে। রামচরণ ওদের বাড়িতে অনেক বছর আছে। সে বাইরের বারান্দার দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

নিরঞ্জনবাবু ছেলের কাছ থেকে ঠাকে কল পেয়ে ভুবনেশ্বরের প্লেন ধরে পরের দিনই কলকাতায় চলে এলেন। নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রী সবিতা দেবী যেন মুষড়ে ভেঙে পড়লেন।

দুই ছেলে এক মেয়ে—বিশেষ করে মেয়ে জন্মাবার পরই অফিসে পদোন্নতি হওয়ার প্রমীলাকে সন্তান-দের মধ্যে বোধহয় একটু বেশীই ভালবাসতেন নিরঞ্জনবাবু।

তা ছাড়া সন্তানদের মধ্যে লেখা-পড়ায় প্রমীলা বেশী ভাল ছিল বলে তার প্রতি নিরঞ্জনবাবুর একটু বেশী পক্ষপাতিত্বও ছিল বোধহয়। প্রমীলার কখনো কোন দোষই তাঁর চোখে পড়ত না। প্রমীলার সাত বছরের ছোট ভাই প্রিয়রঞ্জন তো তিনির একজন অন্ধ ভক্ত ছিল। তার বড় আদর-আবদার ছিল ঐ দিদির কাছেই। দুজনের মধ্যে যেমন ছিল ভাব তেমনি ভালবাসা।

অশ্রু চোখে আসে প্রিয়রঞ্জনের—সামনের বার হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দেবে। প্রিয়রঞ্জন দিদির আত্মহত্যার সংবাদে একেবারে যেন মুষড়ে পড়ে গিয়েছিল।

সমস্ত দিনটা সে বাড়ি থেকেই বেরুল না।

মৃতদেহ কর্ম থেকে সকলে পাওয়া গিয়েছিল। সুবীরঞ্জনই তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে দেয় কাজটুকু করার জন্য শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। প্রিয়রঞ্জনও যেতে চেয়েছিল—কিন্তু সে যায়নি। সে ঘরের মধ্যে ছিল খিল দিয়ে বসেছিল।

সন্ধ্যার দিকে ঘর থেকে বেরুল প্রিয়রঞ্জন—তারপর বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্যমনস্কভাবে রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একজনের কথা তার মনে হলো; কিরীটী রায়।

কিরীটী রায় ঐ সময় ওদের পাড়াতেই থাকতো—তখনো গড়িয়া-হাটায় বাড়ি করে কিরীটী উঠে যায়নি।

কিশোর বয়সের কৌতূহলে সে নিজে থেকে গিয়ে কিরীটীর সঙ্গে আলাপ করেছিল, এবং প্রায়ই কিরীটীর ওখানে সে যেতো।

বুদ্ধিদীপ্ত প্রিয়রঞ্জন ঐ কিশোর-টিকে কিরীটীর খুব ভাল লাগত। এবং স্থির তার বাড়িতে গেলে কিরীটী যদি ওদের ঘরে বসে কিরীটীর সঙ্গে আলাপ করতো প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে।

কিরীটীর কথা মনে হতেই প্রিয়-রঞ্জন কিরীটীর বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। সবে তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রিয়রঞ্জন—সাড়াশ্ব দিন অসুস্থ থাকায় গিয়েছে। কিরীটী হেতেলার নিজের বসবার ঘরে বসে কফির সঙ্গে গল্প করছিল। প্রিয়রঞ্জন এসে ঘরে ঢুকল।

কিরীটী ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলে ওঠে, 'এই যে প্রিয়বাবু, কতদিন বিনে দেখিনি যে?' কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হলো না—সে প্রিয়রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু, ছেলে বললে, 'কি ব্যাপার প্রিয়বাবু—তোমাকে যেন একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে! এতদিন আসোও নি।

—'আমি এখানে ছিলাম না কিরীটীবাবু।'

—'তোমার দিয়েছিলে?'

—'পুরী, তারপরই একটু, ছেলে বললে, 'জানেন কিরীটীবাবু—দিদি মারা গেছে—'

কৃত্রা বললে, মারা গেছে, কবে? কি হয়েছিল?'

—'গতকাল—পুলিশ বলছে আত্ম-হত্যা—কিন্তু—'

—'কিন্তু কি প্রিয়বাবু?' কিরীটী শুধোয়।

—'আমার মনে হয় আত্মহত্যা নয়—দিদি আত্মহত্যা করে নি—'

—'তবে?'

—'কেউ তাকে হত্যা করেছে বিষ দিয়ে—'

—'বিষ দিয়ে হত্যা করেছে?'

—'নিশ্চয়ই তাই—নচেৎ দিদি কি একটা চিঠিও লিখে রেখে যেতো না যে সে আত্মহত্যা করছে! আর দিদি আত্মহত্যা করবে আমি জানতেই পারি না।'

—'কেন?' কিরীটী প্রশ্নটা করে প্রিয়রঞ্জনের মুখের দিকে তাকান।

—'কেন করবে জানেন—আপনিই ত কত সময় বলেছেন, বিনা কারণে কেউ

কখনো আত্মহত্যা করে না।

॥ ৩ ॥

কিরীটী বললে, 'তবুও ঠিকই কিন্তু—'

—কি?'

—হয়তো এমন কেন কিছু ঘটেছিল—যাতে—তোমার দিদি—'

—না, কিরীটীবাবু, দিদি এতটুকু বেহেড়ী বা কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। তা ছাড়া দিদি কতো ভীরু অত দুর্বলেরাই আত্মহত্যা করে। আর কিছু ঘটার কথা বলছেন কি এমন তার ঘটতে পারে? ব্যাঙ্কর্পি—কোকেন—ছিল—আমুখে পড়ানো নিয়েই সর্বদা থাকতে দিদি আপনি তো জানেন।'

—ব্যাপারটা আসলে সব খুলে বলতো প্রিয়বাবু—'

প্রিয়রঞ্জন যা জানতো সব বলে গেল অতঃপর কিরীটীকে।

সব শুনে কিরীটী বললে, তোমার কথাই যদি সত্য বলে মেনে নিই প্রিয়বাবু যে তোমার দিদি আত্মহত্যা করে নি—কেউ তাকে কৌশলে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে—তাহলে অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের সামনে দেখা দেয়—'

—কি প্রশ্ন—

—প্রথমতঃ এই, যদি কেউ তাকে বিষ দিয়ে হত্যাই করে থাকে—সে বিষ তাকে প্রতি প্রয়োগ করা হলো কি করে? একজন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অজ্ঞানে তো তার বিষ প্রয়োগ করা চলে না—'

—তা হয়তো না—তবে যদি সে না জেনে সে-বিষ খেয়ে থাকে?'

—ঠিক—তা হতে পারে—তবে সে ক্ষেত্রে কিছু পানীয় বা খাদ্যবস্তুর সঙ্গেই নিশ্চয়ই সেই মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং সেই খাদ্য-বস্তু বা পানীয় প্রমীলা দেবী না জেনে খেয়েছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও একটা অসুবিধার আছে—'

—কি?'

—যে সেই বিষ খাদ্যবস্তু বা পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়েছিল, সেই ব্যক্তি তোমার দিদির নিশ্চয়ই বিশেষ পরিচিত একজন কেউ ছিল।'

—কি বলতে চান আপনি?'

—আচ্ছা প্রিয়বাবু—'

—বলুন!'

—তোমার দিদির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা বান্ধবীদের মধ্যে সকলকেই হয়তো তুমি চেনো। তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই তা হলে এমন কেউ ছিল যার প্রয়োজন হয়েছিল তার পথ থেকে তোমার দিদিকে সরানো বা কেউ তাদের জন্যে বিশেষের বশে ঐভাবে তোমার দিদিকে হত্যা করেছে—যদি অবিশ্যি হত্যাই হয়ে থাকে—মানে, তোমার কথাটাই সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় যদি—'

—দিদির বন্ধু-বান্ধবীদের সকলকে আমি চিনি না—তবে কয়েকজনকে জানি—যারা আমাদের বাসায় আসতো মধ্যে মধ্যে—'

—তাদের আমি অবিশ্যি কেন জান?'

—কেন?'

—কারণ তোমার কথাই যদি সত্য হয়, তোমার দিদির অজ্ঞাতেই কেউ তাকে বিষ প্রয়োগ করে থাকে, তা হলে সে ব্যক্তির যে কেবল তোমার দিদির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতাই ছিল তাই নয়, তোমাদের ওখানে তার আসা-যাওয়াটাও ছিলই উপরন্তু চট্ করে তার উপরে সন্দেহ পড়বারও কথা নয়।'

—কিরীটীবাবু, আমিও ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে ঐ কথাটাই ভাবছি—আর সেই কারণেই আপনার কাছে আমি এসেছি। আমার মন বলছে দিদিকে কেউ হত্যাই করেছে এবং দিদির হত্যাকারীকে যদি কেউ খুঁজে বের করতে পারে তো সে এক মাত্র আপনিই—কিরীটীবাবু আপনি একটু চেষ্টা করলেই জানতে পারা যাবে সত্যি ব্যাপারটা—'

—ঠিক আছে, প্রিয়বাবু। তুমি কাল এসো—আজকের রাতটা আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

প্রিয়রঞ্জন চলে যেতে কৃষ্ণা বললে, 'আহা বেচারী—দিদিকে ও খুব ভালবাসতো তো—বড় মুষড়ে পড়েছে।'

কিরীটী বললে, 'খুবই স্বাভাবিক কৃষ্ণা!' কথাটা বলে কিরীটী পাশ থেকে পাইপটা তুলে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করলে।

কৃষ্ণা উঠে পড়ল। রাত্রের খাবার সব ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে ঘরে এসে ঢুকে দেখে সোফাটার উপরে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রয়েছে কিরীটী। ঘর অন্ধকার।

ঘরের আলোটা সুইচ টিপে জেলে দিয়ে স্বামীকে ঐ অবস্থায় চোখ বুজে একদম নিশ্চিন্তভাবে বসে থাকতে দেখে কৃষ্ণা বললে, 'কি ব্যাপার —ঘুমোচ্ছো না—অমন চুপ-চাপ হয়ে আছো।'

—কে—কৃষ্ণা—বোস।

—মনে হচ্ছে যেন কিছু ভাবছো। প্রিয়বাবুর কথাই ভাবছিলে নাকি?'

—কয়েকটা কোন ভালমানুষ ও প্রিয়-রঞ্জনের দুর্ঘটনা ঘটলে তার অজ্ঞাতেই তার মনের মধ্যে অনেক সময় সত্য এসে উঁকি মেরে কৃষ্ণা—তাই ভাব-ছিলাম—'

—কি?'

—প্রিয়বাবুর মনের মধ্যে যে সন্দেহটা উঁকি দিয়ে গেছে সেটা হয়ত মিথ্যা নয়—কিরীটীর কথা শেষ হতে না। ঘরের কোণে কোনটা থেকে উঠলো।

কিরীটী উঠে গিয়ে ফোনের রিসি-ভারটা তুলে নিল, 'কিরীটী বলছি...'

—আমি চিত্রপ্রিয়, মিঃ রায়, ইন্সী-রার থানা থেকে বলছি...'

—কি ব্যাপার মুখার্জী?'

—আপনি নিরঞ্জনবাবুর ছোটছেলে চিত্ররঞ্জনকে চেনেন?'

—হ্যাঁ—ছেলেটি আমার এখানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে...কেন কি ব্যাপার বলুন তো?'

—একটু আগে সে এসেছিল থানায়—'

—কেন?'

—আপনি হয়তো শুনেছেন ওর মুখেই গত পরশু ওর দিদি প্রমীলা সুইসাইড করেছে বিষ খেয়ে—স্টামাক কনটেন্টের রিপোর্টও আজ পেয়েছি রাইট্রোস্যোনালিক এসিড্ বিষ পাওয়া গিয়েছে—তা চিত্ররঞ্জন আমাকে বল-ছিল, এটা নাকি আত্মহত্যা নয়, মার্ডার—আপনাকেও নাকি সে কথা সে বলেছে...'

—তাই বলছিল—'

—শামল! a simple case of suicide!'

—মুখার্জী?'

—বলুন—'

—তোমার case report আর postmortem report- টা আমাকে একবার দেখবে?'

—কেন দেখবো না—আপনি দেখতে চান কি? কিন্তু সত্যিই কি ব্যাপার বলুন তো—'

—ব্যাপারটার আমি কেন একটু interest পাচ্ছি। তুমি কি এখন থানায় থাকো? তোমে দেখা হবে!'

—হ্যাঁ—আছি। আসুন না।'

ঐ একাকার থানা অফিসার হরে আসার পরই চিত্রপ্রিয় কতকটা জোর দিয়ে কিরীটীর সঙ্গে আলাপ করে-ছিল এবং আলাপ করে সে খুশিই হয়েছিল। আলাপ হবার পর থেকে হরো পরামর্শের জন্যও চিত্রপ্রিয় কিরীটীর ওখানে গিয়েছে।

আধঘণ্টার মধ্যেই কিরীটী থানায় এলো।

কম্পাউণ্ড ফেন্সের ধারে চিত্রপ্রিয় কিরীটীর সামনে ফাইল খুলে দিল।

চিত্রপ্রিয় মুখার্জী খুব methodi-cal অফিসার। কোন কিছুর শুরুতে গেলে খুব খুঁটিয়ে শুরুত করাই তার স্বভাব।

প্রমীলা চক্রবর্তীর মৃত্যুর শুরুত করতে গিয়েও তার কোন অসুবিধা হয় নি।

মৃতদেহ ও অকুস্থানের খুঁটিনাটি বর্ণনা, কিছুই তার হিসেবে বাদ যায় নি। মৃতদেহের পোষাক থেকে বিভিন্ন এমনকি থেকে ব্লাউজও তুলে নিয়েছে।

ফটোগুলো দেখতে দেখতে এক সময় কিরীটী বললে, মুখার্জী, হঠাৎ তুমি মৃতদেহের এই ফটোগুলো তুলতে গেলে কেন? তোমার মনেও কি তাহলে সন্দেহটা কোন সময় জেগেছিল যে কেসটা suicide না হয়ে homicide ও হতে পারে?'

—বিশ্বাস করবো না মিঃ রায়, তা জেগেছিল।'

—কেন বলো তো, মৃতদেহের position দেখেই কি?'

—মৃতদেহের position দেখে তো বটেই—তা ছাড়াও আরো কিছু ছিল মিঃ রায়, যেমন ঐ সময় ঐ বাড়িতে প্রমীলা, তার বড় ভাই সুধী-রঞ্জনবাবু ও পুরনো চাকর ছোট্ট বজরেঙ্গ ছাড়া আর কেউ ছিল না—ঐ ঘটনার দিন বিকেল চারটে নাগাদ সে যখন বাড়ি আসে। সুধীবাবু পরদিন ভোর চারটে নাগাদ দোতলে যাবার সময় সদর দরজাটা খোলাই দেখতে পান—যদিও রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ সে বাড়ি এলে ঐ বাসচরণই তাকে দরজা খুলে দেয়—পরে বন্ধ করে দেয়। বিশেষ করে প্রমীলার ঘরের দরজাটা ও সদর দরজাটা খোলা থাকা এই ঘটনাই আমার মনে কিছুটা সন্দেহ জাগিয়ে-ছিল—'

—আর কিছু অসঙ্গতি তোমার মনে হয় নি, মুখার্জী?'

—না। কিন্তু কেন বলুন তো?'

—মানে পরের দিন সকালে সুধী-রঞ্জন তার বেয়ারাকে ডাকতে দিয়ে দেখে তার ঘরের দরজাটা খোলা—ভেজান রয়েছে। অথচ বরাবর রাত্রে শোবার সময় তার একটা অভ্যাস ছিল খুলোনো—'

—এমনও তো হতে পারে সে রাত্রে প্রমীলার ঘরের দরজাটা কোন কারণে বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল শোবার আগে—'

—না মুখার্জী, তা নয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাই বলে কেউ আত্ম-হত্যা করবার decision একবার নিলে, সে বাকী কাজটুকু বীরেদ্যমে করে—মানে সেই কাজটুকু সে করার একটা যেন trance-এর মধ্যেই করে যায়। কাজেই দরজা বন্ধ করবার কথাটা ভুলে যাওয়া প্রমীলার পক্ষে ঠিক যেন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।'

—তবে কি?'

—কি তবে?'

—মানে বলছিলাম ব্যাপারটা কি তবে আত্মহত্যা নয় বলেই আপনার মনে হচ্ছে?'

—হ্যাঁ মুখার্জী—বড় যন্ত্রণাদায়ী আমি ভাবছি—আমার মনে হচ্ছে যেন it was not a case of suicide—'

—মানে মার্ডার—কেউ তাকে হত্যা করেছে বিষ প্রয়োগে?'

—হ্যাঁ—

—কিন্তু—'

—জানি তুমি হয়ত বলবে—কি-ভাবে কখন তাহলে তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল—অবশ্যই সেটা হয়তো তোমরা জানতে পারবে আরো অনু-সন্ধান চালালে। তবে একটা কথা তুমি ভাল করেরো—পরীক্ষায় পুঁটিনাটি নোট করা, মৃতের বিভিন্ন এমনকি থেকে কয়েকটা ফটো তুলে রেখো। শোন মুখার্জী, তোমার কেস ডিসপোজটা একবার রাত্রির জন্য আমি

নিয়ে ছেড়ে চাই। তোমার কেন আপত্তি নেই তো?'

—না। আপত্তি কিসের। নিয়ে যান—'

॥ ৪ ॥

রাত্রে আহারাদির পর কিরীটী তার বসবার ঘরে একটা সোফার উপরে অর্ধ প্রবীলার কেস্ হিসেবটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিল দ্বিতীয়বার। প্রথম পড়ার সময় কিছুটা আনমনা-ভাবেই কেস হিসেবটা পড়ে মনে হয়েছিল, প্রিয়রঞ্জনের সন্দেহটা হয়ত অমূলক নয়—প্রবীলা আত্মহত্যা করে নি তাকে সম্ভবতঃ হত্যাই করা হয়েছে তীব্র হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড বিষ প্রয়োগে। এবং কথাটা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর সন্ধানেক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রবীলার পস্টমর্টেম রিপোর্টে এনালিসিস্ করে নাকি হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড বিষ পাওয়া গিয়েছে।

প্রবীলা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিল। কেমিস্ট্রিতে এম.এস-সি. পড়ছিল। এবং কিছু তার ছেলে বন্ধু ছিল। বিশেষ করে প্রবীলার দাদা সুবীরঞ্জনের জবানবন্দী থেকে তার যে তিনজন বন্ধুর নাম পাওয়া গিয়েছে যেমন—বিকাশ, নির্মল ও তপনজ্যোতি, তারাও এম.এস-সি.-র ছাত্র কেমেস্ট্রিতে।

প্রথমতঃ এ তিনজন প্রবীলার অনেক বছরের সহপাঠী। সেই সূত্রেই হয়তো ওদের পরস্পরের মধ্যে ভাব ও ঘনিষ্ঠতা কিছুটা বেড়ে উঠেছিল। এমনও তো হতে পারে, কিরীটীর মনে হয়, ঐ তিনজনের কারো সঙ্গে প্রবীলার ঘনিষ্ঠতা বিশেষ একটা পর্যায় পৌঁছেছিল। মৃত্যুর কোন সূত্র হয়তো সেখানেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—ঐ বিশেষ বিষটি ও তার প্রক্রিয়া ঐ তিনজনের অজানা থাকবার কথা নয়।

তৃতীয়তঃ — এদের তিনজনেরই প্রবীলাদের গৃহে গতিবিধি ছিল। সেদিক দিয়ে মনে হয় ওরা প্রবীলার গৃহে আসা-যাওয়া করলে—কোন রকম সন্দেহ সেখানে সহজে না আসারই কথা কারো মনে।

চতুর্থতঃ—প্রবীলার ঘরে ঢোকার জন্যে যদি কোন রকম সন্দেহ থাকত ওদের কারুকে ঘিরে (এবং সেটা একেবারে জলা একান্ত স্বাভাবিক) তা হলেই বা প্রবীলা হঠাৎ আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? বিশেষ করে, প্রিয়রঞ্জন তার বিয়ে সম্পর্কে যা বলেছে তাকে তাতে করে আত্মহত্যার সম্ভাবনা খুবই কম।

পঞ্চমতঃ—মৃতদেহের পরিচালন—ঘোষ ঘরের বন্ধন—ও পরের দিন সকালের ঘোষ সময় বন্ধনটা—বাড়িতে রাত্রি তিন জনের উপস্থিতি—সময় ব্যাপারটা কেন হত্যার বিরোধী অনুকূলে নির্দেশ করছে।

পরের দিন সকালেই কিরীটী ফিসেটটা ওদের হাতে দিয়ে থানায় চিন্তাচিত্তন, করে পাঠিয়ে দিল। কোথাও কেউ হলো না সারাটা দিন। সন্ধ্যার মুখে প্রিয়রঞ্জন এলো।

—এসো প্রিয়বাবু—'

—আপনি বলেছিলেন আজ আসতে।

—হ্যাঁ—বোস। তুমি ঠিকই বলেছিলে প্রিয়বাবু—ব্যাপারটা মনে হচ্ছে আত্মহত্যা নয়।'

—আপনি, মনে আপনারও তাহলে ধারণা যে আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়তাই করা হয়েছে তার হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড বিষ প্রয়োগে। এবং কথাটা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর সন্ধানেক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রবীলার পস্টমর্টেম এনালিসিস্ করে নাকি হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড বিষ পাওয়া গিয়েছে।

প্রবীলা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিল। কেমিস্ট্রিতে এম.এস-সি. পড়ছিল। এবং কিছু তার ছেলে বন্ধু ছিল। বিশেষ করে প্রবীলার দাদা সুবীরঞ্জনের জবানবন্দী থেকে তার যে তিনজন বন্ধুর নাম পাওয়া গিয়েছে যেমন—বিকাশ, নির্মল ও তপনজ্যোতি, তারাও এম.এস-সি.-র ছাত্র কেমেস্ট্রিতে।

প্রথমতঃ এ তিনজন প্রবীলার অনেক বছরের সহপাঠী। সেই সূত্রেই হয়তো ওদের পরস্পরের মধ্যে ভাব ও ঘনিষ্ঠতা কিছুটা বেড়ে উঠেছিল। এমনও তো হতে পারে, কিরীটীর মনে হয়, ঐ তিনজনের কারো সঙ্গে প্রবীলার ঘনিষ্ঠতা বিশেষ একটা পর্যায় পৌঁছেছিল। মৃত্যুর কোন সূত্র হয়তো সেখানেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—ঐ বিশেষ বিষটি ও তার প্রক্রিয়া ঐ তিনজনের অজানা থাকবার কথা নয়।

তৃতীয়তঃ — এদের তিনজনেরই প্রবীলাদের গৃহে গতিবিধি ছিল। সেদিক দিয়ে মনে হয় ওরা প্রবীলার গৃহে আসা-যাওয়া করলে—কোন রকম সন্দেহ সেখানে সহজে না আসারই কথা কারো মনে।

চতুর্থতঃ—প্রবীলার ঘরে ঢোকার জন্যে যদি কোন রকম সন্দেহ থাকত ওদের কারুকে ঘিরে (এবং সেটা একেবারে জলা একান্ত স্বাভাবিক) তা হলেই বা প্রবীলা হঠাৎ আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? বিশেষ করে, প্রিয়রঞ্জন তার বিয়ে সম্পর্কে যা বলেছে তাকে তাতে করে আত্মহত্যার সম্ভাবনা খুবই কম।

পঞ্চমতঃ—মৃতদেহের পরিচালন—ঘোষ ঘরের বন্ধন—ও পরের দিন সকালের ঘোষ সময় বন্ধনটা—বাড়িতে রাত্রি তিন জনের উপস্থিতি—সময় ব্যাপারটা কেন হত্যার বিরোধী অনুকূলে নির্দেশ করছে।

—বামাচরণকে ডাকতে পারো না।'

—আচ্ছা সে রাত্রে রোজের মতো সুবীরবাবু কখন বাড়ি ফেরেন প্রিয়বাবু?'

—রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফিরে আসেন—'

—ওকে কে সেকথা খুলে দিয়েছিল?'

—বামাচরণই—'

—সেদিন যে সকাল বেলা সমস্ত ব্যাপারটা ঘোলা ছিল সে সম্পর্কে বামাচরণ কিছু জানে?'

—বামাচরণ তো কিছু বলে নি সে সম্পর্কে।'

—বামাচরণ কিছু বলে নি?'

—না। আমিও জিজ্ঞাসা করি নি।'

—প্রিয়বাবু—'

—বলুন—'

—বামাচরণ এখন কি করছে?'

—ঘরে রয়েছে, শুয়ে আছে। জানেন কিরীটীবাবু, আপনার এখানে যখন আসছি পথে নির্মলদার সঙ্গে দেখা। নির্মলদা আমাকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন আমার মনে হয় পালিয়ে গেল—'

—কেন। পালিয়ে যাবে কেন?'

—মনে হলো তাই বললাম।'

'নির্মলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার—হয়তো অনেক প্রয়োজনীয় কথা তিনি আমাদের দিতে পারবেন—'

—যাবেন, দেখা করবেন? নির্মলদাকেও দেখে এলাম বাড়িতেই চুকলেন। এখন হয়তো বাড়িতেই আছেন। যাবেন তার বাড়িতে?'

—চলু—একবার দেখাই যাক—যদি দেখাটা হয়ে যায়। কিছু জানতে পারা যায়—'

নির্মলদের বাড়ির নীচের বৈঠকখানায় বসতে বলেছিল প্রিয়রঞ্জন। কিন্তু কিরীটী বললে, না, আমি নীচের বারান্দার অপেক্ষা করছি। তুমি যাও, পার তো নির্মলবাবুকে ডেকে নিয়ে এসো।'

প্রিয়রঞ্জন দোতলায় নির্মলের ঘরে গিয়ে কিরীটীর কথা বলতেই সে বললে, সে কি, বারান্দায় তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছো কেন? নীচের বৈঠকখানায় বসাতে পারলে না।'

—অনেকবার কিন্তু এলেন না। বললেই দাঁড়িয়ে রইলেন—'

—কিন্তু কি ব্যাপার বলো তো প্রিয়? উনি হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন?'

—তা ত জানি না—যাবার সময় বলছিলেন আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চান। তাই নিয়ে এসেছি—'

—হুঁ। আচ্ছা চলো। নির্মল একটা শার্ট গায়ে চাপিয়ে সাহচর্যে পা পালিয়ে নীচে নেমে এলো।

রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল কিরীটী। নির্মল বললে, শুনলাম প্রিয়র কাছে আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান—তাহলে—বাড়ির মধ্যে—'

—না নির্মলবাবু, বরং আপনার যদি আপত্তি না থাকে ত চলুন না—বড় রাস্তার ধারে পার্কটায় গিয়ে বসা যাক—'

—পার্কে? বেশ চলুন—'

তিনজনে পার্কে এসে একটা বেঞ্চিতে বসল।

রাত প্রায় পৌনে আটটা হবে। প্রীষ্মের রাত্রির পৌনে আটটা—সন্ধ্যা বললেও চলে। পার্কে তখনো অনেক লোক। যে বেঞ্চিটায় ওরা বসল সে জায়গাটা একটু অন্ধকার।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর নির্মলই বললে, কি বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান বলুন তো কিরীটীবাবু—' নির্মলের কণ্ঠস্বরে খানিকটা দ্বিধা ও খানিকটা উৎকণ্ঠা যেন প্রকাশ পায়।

—আচ্ছা নির্মলবাবু, প্রিয়রঞ্জনের বিধি প্রবীলা দেবী তো আপনার সহপাঠী ও বিশেষ পরিচিত ছিলেন—'

—হ্যাঁ—কিন্তু সে কথা কেন?'

—আচ্ছা তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা আপনার কি মনে হয়?'

—নিশ্চয়ই খুব্‌ছেন প্রবীলা আত্মহত্যা করেছে।'

—পুলিশের কিন্তু ধারণা তা নয়—'

—তাই নাকি!'

—হ্যাঁ—তাদের ধারণা কেসটা মার্ডার—মার্ডার নয় হোমিসাইড—হত্যা করা হয়েছে তাকে—'

—সেকি! এ আপনি কি বলছেন কিরীটীবাবু?'

—শুধু পুলিশের নয় আমারও তাই ধারণা প্রিয়বাবু ও আমারও ধারণা তাই—তাকে brutally murder করা হয়েছে।'

—না, না—absurd—হতেই পারে না—তাকে কে অমন হত্যা করতে যাবে! আর কেনই বা হত্যা করবে—it is fantastic!'

—কে হত্যা করতে পারে তাকে—আর কেনই বা হত্যা করেছে—সেটা যদিও এখনো পরিষ্কার জানা যায় নি—তাহলেও হত্যাকারীকে ধরে দিতেই হবে। যাক সে কথা। আপনার সঙ্গে তো তার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল—শুধু শুধু তাই নয় পুলিশ জানতে পেরেছে মৃত্যুর রাত্রে আপনি তার ওখানে রাত দশটা পর্যন্ত ছিলেন—'

—কে—কে বললে সে কথা? কার কাছ থেকে পুলিশ কথাটা জানল—'

—তারা জেনেছে। আর কথাটা যে মিথ্যা নয়—সে তো আপনিও স্বীকার করবেন—'

নির্মল একেবারে চুপ। অনেকটা মুহূর্তের জন্য একটা স্তব্ধতা।

—নির্মলবাবু, কিরীটী তার স্তব্ধতা আবার পুনরাবৃত্তি করলো, বোধ

...ঘটে কি করে ঘটতে পারে আপনি প্রমীলাকে দেখে হত্যা করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'...বুঝতে পারছেন?'

'...কিন্তু সে ঘটনা কিছু পরে ঘটেছে।'

'সে যাক, তবে তো প্রমীলাকে এখনো বিবাহিতা বলি?'

'হ্যাঁ, তাতো বলতেই হবে।'

'...এসেছিল। সে বার ...টো নাগাদ এসেছিল।'

'তখনকার, তখন ঠাকুর ছিল?'

'...ছিল।'

'...কোনদিন এমনটি হয়নি?'

'না।'

'...বন্ধ করতে প্রমীলা কি আপনার সঙ্গে একটা ঝগড়া করেছিল?'

'না, না তো!'

'তবে যে ঝগড়া বন্ধ করতে?'

প্রমীলা বোধহয় সেই একটু আগে দিয়ে ঝগড়া বন্ধ করে গেছে।'

কেন যেন মনে হলো না বলে সত্য কথাটা বন্ধ করে দিতে।

'যে তার হাতেছিল সে যদি দেখে—'

'...ছিল সত্য কথাটা আর বলে ফেলি। তাকে ঠেকানো যাবে না।'

'প্রমীলা কি বলেছিল?'

'...কোন নির্দিষ্ট কথা নয়। ...তু সে ধরনে ঠেস দিয়ে কথা বলে।'

'...কিছু বলেনি?'

'না।'

'...বলে তাকে অবশ্য সে ...ছিল। তাহলে কি আপনি মনে করেন প্রমীলা সেটা নিয়ে ঝগড়া করে নি?'

'মিসেসবসু, একটা কথা—প্রমীলার উপরে আপনার কেন এতোটা মায়া—'

'ভালবাসার কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'না। আমার কেন জানি মনে হয় সুধীরতাই তার প্রতি ছিল না—'

'...আপনার এর দুই সহপাঠী মিসেসবসু, ও তপনজ্যোতিবাবুর?'

'...বলতে পারবো না।'

'...আচ্ছা, প্রমীলা দেবীর হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনি সন্দেহ করেন?'

'না—তা ছাড়া তাকে হত্যা করা হয়েছে, কথাটা এখনো আমার কাছে রীতিমত অবিশ্বাস্য বলেই মনে হচ্ছে—'

'আর একটা কথা। সেদিন অত সকালে হঠাৎ আপনি প্রমীলাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন?'

'...একটু যেন চুপ করে থেকে নিজের মনেই কথা বলে ...ছিল একটু আগে।'

'...ও হ্যাঁ।'

'...ভালবাসা হয়তো নিজের অজান্তে আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। তাই ওর প্রতি আমি কোন ভুল করতে চাইনি। প্রমীলা আমাদের ...। সন্ধ্যে ৬টা সন্ধ্যের কাউকে যেতেই বলেনি।'

'...তা ঠিক তখন নিজের ...?'

'ঐ কথাই বলেছি। বলেছি ওকে ঘুমিয়ে যে অমন দেখেছি। কিন্তু যেন ঠিক ...ওকথা কেন আমি ভুলতে পারছিনা।'

'...আমার মনের মধ্যে ...ছিল।'

'...?'

'ঐ সময় বাইরে বেরোবার একে পড়েছিলাম। সকাল ...প্রমীলাদের বাড়ির সামনে একটা কালো ...। ঠিক ওখানে একটু আগে ...ছিলাম বলেই হয়তো ওকে ...ছিল। ...ছিলাম বলেই ...ছিল। ...ছিল বলেই ...ছিল। ...ছিল বলেই ...ছিল। ...ছিল

এবার বলি। সে রাত্রে আপনি কখন বাড়ি ফিরে আসেন?'

—'রাত সওয়া একটা নাগাদ—'

—'কি করে বুঝলেন যে তখন রাত সওয়া একটা?'

—'উপরে এসে যখন জামা কাপড় ছাড়ছি ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সওয়া একটা—'

—'রাত্রে কে আপনাকে দরজা খুলে দিয়েছিল?'

—'রামচরণদা।'

—'আপনার ফিরতে যত রাত হয়েছিল সে সেদিন?'

—'এক কথায় বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল—রামচরণ আর প্রমীলা বউদি-কেই আমি খুলে দিয়েছিলাম যে ফিরতে রাত হবে আমার।'

—'আপনিও তিন তলার ঘরে থাকেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বাঁ হাতি মোড়লদার প্রমীলা দেবীর ঘর। সে ঘরের দরজাটা তখন খোলা ছিল না বন্ধ ছিল—মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার?'

—'মনে আছে বৈকি। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, তবে জানালা-পথে আলো দেখা যাচ্ছিল। তাইতেই ভেবেছিলাম প্রমীলা বউদিরা তখনো জেগেই আছে।'

—'ডাকেন নি বোনকে বা সাড়া দেন নি?'

—'না। তারপরে আমি আর তাকে ডিস্টার্ব করিনি কারণ ইদানীং তো পরীক্ষার জন্য রাত জেগে পড়াশুনা করতো।'

—'পরের দিন সকালে কখন ওঠেন আপনি?'

—'বরাবরের মত ভোর চারটেয়। উঠে দৌড়তে যাই পার্কে—'

—'এবার মনে করে বলুন তো, ভোর রাত্রে যখন পার্কে দৌড়তে যান, তখন আপনার বোনের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল কি না।'

—'তাকাই নি দরজার দিকে—'

—'জানালা পথে ঘরের মত আলো দেখতে পেয়েছিলেন?'

—'ঠিক বলতে পারবো না। কারণ বোনঘরে জানালার দিকে তাকাই নি—'

—'এবার বলুন নীচের দরজাটা হা হা করে খোলা ছিল না ভেজান ছিল?'

—'খোলা এবং ভেজান ছিল—'

—'ভেজান ছিল?'

—'হ্যাঁ—'

—'তা দরজাটা খোলা আছে কেন কিছু মনে হয়নি আপনার?'

—'না—ভেবেছিলাম গতরাত্রে হয়ত আমি আসার পর রামচরণদা দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে ঘুমের ঘোরে। কারণ ও বরাবরই একটু বেশী ঘুম কাতুরে—'

—'তা আপনি যে অত সকালে বের হয়ে যেতেন—দরজাটা কে বন্ধ করতো?'

—'আমিই বাইরে থেকে একটা তালা লাগিয়ে যাই বরাবর—'

—'হুঁ। দরজাটা তাহলে আপনি ভেজানই দেখেছিলেন?'

—'হ্যাঁ—'

—'আর সকালে পার্ক থেকে ফিরে এসে প্রমীলা বেবী যা আসেন না বলে তাকে ডাকতে গিয়ে দেখেছিলেন তার ঘরের দরজাটা খোলা—ভেজানো ছিল—তাই না?'

হ্যাঁ—'

—'তাহলে প্রমীলা দেবীর শোবার ঘরের দরজা ও সদর দরজাটা—দুটোই খোলা ছিল? নির্মলবাবু রাত সওয়া একটা নাগাদ চলে গিয়েছিলেন—অর্বিন্দা যদি তিনি সত্যি কথা বলেন—'

—'নির্মল? নির্মল সে রাত্রে এসেছিল নাকি? হুঁ সে হতেও পারে। তো সেদিন সে বললে না।' সুবীরঞ্জন বললে।

—'পুলিসের কাছেই বোনঘরে যাননি—তা ছাড়া কেবল নির্মলই নয়, আরো একজন সে রাত্রে এসেছিল। রামচরণ তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল—'

—'কে সে?'

—'রামচরণও অর্বিন্দা সে কথা পুলিসের কাছে বলেনি। পরে বলেছে চিত্তরঞ্জনকে—সে নাকি প্রমীলা বেবীর দাদা এক বন্ধু—তপনজ্যোতি—'

কিরীটী একটু থেমে আবার বললে রামচরণের সেদিন ভুল হয়েছিল, তাই নির্মলবাবু যখন সে রাত্রে এখান থেকে চলে যান—আপনার বোনই নীচে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। কথা হচ্ছে এখন তাহলে সে রাত্রে তপনবাবু কখন চলে গিয়েছিল—আপনার রাত্রি সওয়া একটার ফিরবার আগে না পরে—তা ছাড়া এর আরো একটা কথা আছে সুবীরবাবু—'

—'কি?' সুবীরঞ্জন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

—'প্রমীলা বেবী রাত্রে যখন নীচের দরজা বন্ধ করতে আসে, তখন দুজনের কথাবার্তা রামচরণের কানে গিয়েছিল। তাতে করে তার মনে হয়েছিল প্রমীলার সঙ্গে সে সময় নির্মলবাবুই ছিল। শুধু গলাই শুনেছে, চোখে দেখেনি—সে যে নির্মলবাবুই এটা কেউ নয় তারও অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে কিছু নেই।'

চিত্তরঞ্জন ঐ সময় বললে, 'কিন্তু নির্মলদা তো বলছিলেন যে তিনিই—'

—'ঠিকই চিত্তবাবু—কিন্তু নির্মলবাবুর কথাটা যে সত্যি তারই বা প্রমাণ কি?'

চিত্তরঞ্জন বললে, 'কিন্তু মিথ্যে সে বলবে কেন?'

—'নিজেকে বাঁচাতে—'

—'তবে—তবে কিরীটীবাবু—আপনি কি মনে করেন?'

চিত্তরঞ্জনকে বাধা দিয়ে কিরীটী বললে, 'সেদিন রাত্রে তোমার বিদায় নেবার সময় যে দুজন ছিল চিত্তবাবু—একজন নিশ্চয় পাঁচটার এসেছিল সে নির্মলবাবু—আর দ্বিতীয় জন—'

'—তপনদা—'

—'হতেও পারে নাও হতে পারে—'

—'মানে?'

—'মানে, সে তপনজ্যোতিবাবুও হতে পারে বা অন্য কেউও হতে পারে, চিত্তবাবু—'

—'কিন্তু নির্মলদা তো বললেন সে, তপনদা—'

—'হয়ত একটা অজাট্য সত্য বলেই বা ভেবে নেবো কি করে? হয়ত এটা ঠিক ঐ দুজনার মধ্যেই একজন তোমার দিকের হয়ত কারুর বিরুদ্ধে—'

—'না, না—কি বলছেন আপনি, কিরীটীবাবু!'

—'চিত্তবাবু, এখনো তুমি ছেলেমানুষ তুমি বুঝবে না: বাদ্ দে কথা। রামচরণকে একবার ডাক তো এ ঘরে চিত্তবাবু—'

একটু পরে রামচরণকে চিত্তরঞ্জন ডেকে নিয়ে এলো ঘরে।

রোগা চাপা-দোহারা। গায়ের রং মিশমিশে কালো। মাথার চুল প্রায় ২/৩ অংশই পাকা—বয়স ষাট থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে হবে বলেই মনে হয়।

সুবীরঞ্জনই বললে, 'রামচরণদা, উনি যা জিজ্ঞাসা করেন তার জবাব দাও—'

রামচরণ বিনম্রভাবে একবার ছাঁত চোখে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

—'তোমার নাম রামচরণ?' কিরীটীর প্রশ্ন।

—'আজ্ঞে কর্তা, রামচরণ পাড়ুই—'

—'এ বাড়িতে তো তুমি অনেক দিন আছো?'

—'তা কর্তা চল্লিশ বছরেও বেশী—'

—'আচ্ছা রামচরণ, যে-রাত্রে তোমার দিদিমণি খুন হয়, সে-রাত্রে তোমার তো জাগবারই কথা ছিল?'

—'আজ্ঞে—আসছে শুক্কুর দিন থেকেই পরীক্ষা কর্তা আমার ভাল যাচ্ছিল না

পণ্ডিত রবিশঙ্কর

—অন্তরঙ্গতার একটা—'

—ঐ দিন বিকেলের দিকে এ পাড়ার নির্মলবাবু তোমার বিলিতির কাছে এসেছিল?'

—হাঁ—'

—আর কে এসেছিল সন্ধ্যার পর?'

—বিলিতির জন্য এত বন্ধু—তপনবাবু।'

—ঠিক তুমি চিনতে পেরেছিলে তাকে? কারণ পাশেরটার আলোটা ফিউজ হয়ে যাওয়াতে পাশেরটা প্রায়ই জ্বলে না। অন্ধকারে চিনলে কি করে? তখনতো তো তাকে দেখতেও পাওনি—'

—না—মনে মনে বুঝেছিল তপনবাবুই—'

—মনে বুঝেছিল—তার সঙ্গে আর কারা এসেছিল?'

—না—

—কথাও বলো নি?

—না।'

—কেন?'

—বিলিতির বলেছিল, তপনবাবুর অসুখের কথা আছে। তিনি এলে তাকে যেন উপরে পাঠিয়ে দিই। আমি ভেবেছিলাম তপনবাবুই বুঝি এসেছেন। তাঁকে আমি উপরে চলে যেতে বলি। তিনিও সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যান। আমি তখন আবার দরজাটা বন্ধ করে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ি—'

—আচ্ছা বনমালদা তোমার বিলিতির যখন আবার রাত নীচে এসেছিল তপনবাবু চলে যাবার সময়, তখন তুমি তোমার বিলিতির ও তপনবাবুরই গলা শুনেছিলে, তাই না?'

—হাঁ—'

—মনে গলা শুনে মনে হয়েছিল তোমার, তপনবাবু তাই তো?'

—হাঁ—'

—এবার বলো—তপনবাবু কখন এসেন? রাত তখন কটা হবে?'

—নির্মলবাবু আমার জেরায় কটা দুই পরে—'

—তার মানে তপনবাবু এসে-ছিলেন?'

—হাঁ—'

—আর তোমার বড় বাবাবাবু?'

—তারও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে বাড়ি ফিরেছেন—'

—হুঁ। তা নির্মলবাবু তখন ছিলেন?'

—ছিলেন কি না জানি না কারণ নির্মলবাবু যে ঘরে থাকে সে ঘরে আমি যাই না। টের পাইনি—ঘুমিয়ে ছিলাম। বনমালদার ডাকে ঘুম ভাঙলো—'

কিরীটী যেন কতকটা স্বগতোক্তির মতই বলে, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, রাত সাতটা থেকে আটটার মধ্যে কোন এক সময়েই তপনবাবু এসেছিল এ বাড়িতে। এখন কথা হচ্ছে, সে কখন চলে গেল। সে যা হোক সেই সময়েই না আরো পরে সুধীরবাবু আপনার পরে—'

—কি বলছেন কিরীটীবাবু?' সুধীরঞ্জন প্রশ্ন করল।

—ভাবছি নির্মলবাবু আপনার আসার অনেকই পরে ফিরেছিল সে ঘরে, না আপনি আসার পরে। আসে যদি গিয়ে থাকে তো কে সদর দরজাটা সে রাত্রে বন্ধ করেছিল। একমাত্র হতে পারে প্রমীলা দেবীই। আর তা যদি না হয়ে থাকে তো—ঠিক সময় থাকা চাই, তুমি কেউ পারো।'

বনমালদা চলে গেল।

কিরীটীও সে রাত্রের মত বিদায় নিল।

॥ ৬ ॥

সেই রাত্রেই আহারাদির পর বাইরের ঘরে পাইপ টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে একটা সোফায় বসে কিরীটী, আর তার মুখোমুখি অন্য সোফাটায় বসে কৃষ্ণা।

কৃষ্ণাই এক সময় প্রশ্ন করে, 'তখন থেকে কি এত ভাবছো?'

—ভাবছি কৃষ্ণা, সেদিন নির্মল ও তপন কেন এসেছিল প্রমীলার ওখানে?'

—হয়তো ভালবাসার টানে—'

—ভালবাসার টানে—কথাটা যে আমার মনে হয়নি কৃষ্ণা তা নয়—কিন্তু তাহলে ব্যাপারটা যেন একটু জটিল হয়ে দাঁড়ায়—'

—ভালবাসার ব্যাপারটা যে অনেক সময় সত্যিই জটিল হয়, তাতো তুমি জান।'

—জানি, কিন্তু একেত্রে তাহলে ত্রিকোন টানা-পোড়েন—তপনজ্যোতি, নির্মলচন্দ্র ও দিবেন্দ্রকুমার—তিন জনেই মনে হচ্ছে তাহলে ভালবাসত প্রিয়বাবুর বিলিটিকে। নচেৎ অতরাত্রে ঘটাঘাত সম্ভব নয়।'

—দিবেনবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

—না। যাব একটা কথা ভাবছি—'

—কি?'

—জান, নির্মলবাবুকে কেন করে বলতে কেমন হয় যে, তারা তিন বন্ধু কেন কাল সন্ধ্যার পর আমার এখানে আসার ব্যবস্থা করে—তাহলে করে ত্রয়োদশীটা সামনা সামনিই হতে পারে—তিন বন্ধুর উপস্থিতিতেই—'

—একটা ফয়সালা করতে চাও?'

—না, না—ফয়সালা না হলেও কিছু আলোকসম্পাতও তো ব্যাপারটার উপরে হতে পারে।'

—বেশ তো চেষ্টা করে দেখো। কিন্তু সত্যিই কি মনে করছো ওদের তিন জনের মধ্যেই কেউ একজন প্রমীলার হত্যাকারী?'

—একটা এই মুহূর্তে না ভাবলেও ওরা তিনজন আমার মনের ব্যবধানে যেন সর্বক্ষণ ঘোরাফেরা করছে। তা ছাড়া, কেন কেন আমার মনে হচ্ছে, তুমি অতি তুচ্ছ কারণে ত্রিপ্রবাবুর দিকে হয়ত প্রাচটা দিতে হয়েছে—'

—তুচ্ছ সে রাত অনেক হয়েছে এবারে শোবে চলো।' কৃষ্ণা বলল।

—তুমি যাও, আমি আসছি—'

কৃষ্ণা আর দাঁড়াল না।

কিরীটী একটু পরে উঠে এসে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়াল।

প্রমীলাকে যেই হত্যা করে থাকুক কিন্তু প্রয়োজন—হত্যার কোন বিশেষ কারণ সে সত্যিই খুঁজে পাচ্ছে না। প্রমীলা সম্পর্কে যতটুকু জানা গিয়েছে—মেয়েটি হাসিখুশি ও ঘরে বলে অনন্যসাধারণ ছিল।

যদি ঐ তিনজনের কারুর সঙ্গে তার ভালবাসার পড়েই থাকে বা ওরা তিন জনই যদি ঐ মেয়েটিকে ভালবেসে থাকে তার মধ্যে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু নেই।

তা ছাড়া নির্মলের সঙ্গে দেখাও হয়েছে, আর কথাও হয়েছে—কিন্তু তার কথাবার্তা থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়নি যাতে তার থেকে প্রমাণ হতে পারে যে নির্মল প্রমীলাকে ভালবাসতো, অবিশ্যি কিরীটীও সে ধরনের প্রশ্ন তাকে করেনি।

কাল যদি ওদের তিনজনকে একত্রে পাওয়া যায় তো কৌশলে সে কথাটা জানবার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু তা কি সম্ভব হবে?

নির্মলের কথায় ওরা কি এখানে আসবে?

তার চাইতে নির্মলের কাছ থেকে তপন ও দিবেনের ঠিকানা জোগাড় করে কাল সকালে তাদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে দেখা করাই বোধহয় বুদ্ধিসঙ্গত হবে।

॥ ৭ ॥

নির্মলের কাছ থেকে পরের দিন ঠিকানা সংগ্রহ করে নিল কিরীটী সকালেই ফোন করে।

একজন থাকে বেওয়ার স্ট্রীটে। অন্য জন তালতলায়।

প্রথমে কিরীটী সকাল নটা নাগাদ তপনের ওখানেই গেল বেওয়ার স্ট্রীটে। একটা পঁচতলা ছাই বাড়ির দোতলায় একটা ছাই। তপন তার মামামামীর কাছে থেকে পড়াশুনা করে। ব্যাবর ডিসিপ্লিন্ড ছেলেই।

বি এ-তিনে ফার্স্টক্লাস পেয়েছে হয়েছিল, এম এ-তে পড়াশুনাতেই নয়, খেলাধুলোতেও সে একজন চৌখস। নির্মলের কাছ থেকেই তার বন্ধু তপনের ঠিকানাটা পেয়েছিল কিরীটী।

তপন বাড়িতেই ছিল, এবং কলিং-বেলের শব্দে সে-ই এসে দরজা খুলে দেয়।

—আপনি—কাকে চান?'

—তপনবাবুকে, কিরীটী বলে।

—আমারই নাম তপন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু আপনাকে চিনতে না পারলেও মনে হচ্ছে যেন দেখা দেখা।'

—সে হতে পারে আমার ছবি দেখেছেন তাই—' কিরীটী মৃদু হেসে বলল।

—ছবি?'

—আমার নাম—কিরীটী রায়।'

—কি আশ্চর্য! নমস্কার—আসুন, আসুন কি সৌভাগ্য আমার। আসুন ভিতরে আসুন'—বলতে বলতে দরজার কপাট দুটো একেবারে টান টান করে খুলে দিয়ে সাদর আহ্বান জানাল।

কিরীটী দেখছিল তপনজ্যোতিকে। ২০/২১-এর মধ্যে বয়স হবে। নির্মল তার পরিচয় দিয়ে সামান্য অত্যুক্তিও করেনি। লম্বায় খুব বেশী না হলেও তার সুগঠিত দেহল হেহ সাঁতাই যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রথম দর্শনেই। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। মাথার কোঁকড়ান চুল কিছুটা এলোমেলো। যেমন সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় দুটি চোখ—তেমনি ললাট ও নুতনত্ব চিবুকে। চোখে কালো মোটা সোনালিরেঙ্গ ফ্রেমের চশমা।

পরনে পায়জামা পাঞ্জাবী। ঘরটা বোধহয় ড্রয়িং-রুম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। সোফা সেট পাতা, একদিকে একটা রেডিওগ্রাম—রেডিওগ্রামে তখন কার যেন সেতার বাজন চলছিল।

—আসুন, বসুন মিঃ রায়। আমার মামীমা-মামাকে আপনাকে দেখে খুব খুশি হতেন। কিন্তু আজ শনিবার মামীমা কালীঘাটে পুজো দিতে গেছেন—' তপনের মনটাল কথা বলে যায় তখন।

কিরীটী একটা সোফায় উপবেশন করার পর তপনজ্যোতি বলল, 'তারপর বলুন তো—হঠাৎ আমার কাছে কেন মিঃ রায়—'

—'কিছু খবরাখবর নেওয়ার জন্যই আপনার কাছে এসেছি তপনবাবু!' কিরীটী বলল।

—খবরাখবর, কি ব্যাপার!'

—আপনার সহপাঠিনী ও দীর্ঘ-দিনের পরিচিত প্রমীলা দেবী—'

—'প্রমীলা? সে—সে তো সুইসাইড করেছে—'

—হাঁ—তার মৃত্যুর সংবাদটা আমার অজানা নয়—'

চোখেমুখে খানিকটা বিস্ময় ও ঔৎসুক্য নিয়ে তখন চেয়ে আছে তপন কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী বলল, 'আপনি বোধহয় এখনো জানেন না তপনবাবু—প্রমীলার মৃত্যুর ব্যাপারটা পুলিশ ঠিক আত্মহত্যা বলে মনে করছে না।'

—তবে কি?'

—তাকে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে—'

—হত্যা!'

—হাঁ—তাকে খুন করা হয়েছে—'

—কিন্তু—তা কি করে হবে? কে তাকে হত্যা করবে?'

—সেই ব্যাপার অনুসন্ধানের জন্যই আপনার কাছে আমি এসেছি।'

—আমি ঠিক আপনাকে বুঝতে পারছি না মিঃ রায়—'

—কলাম তো আপনাকে এই মাত্র। পুলিশের ধারণা হয়েছে যে প্রমীলা দেবীকে কেউ হত্যা করেছে—'

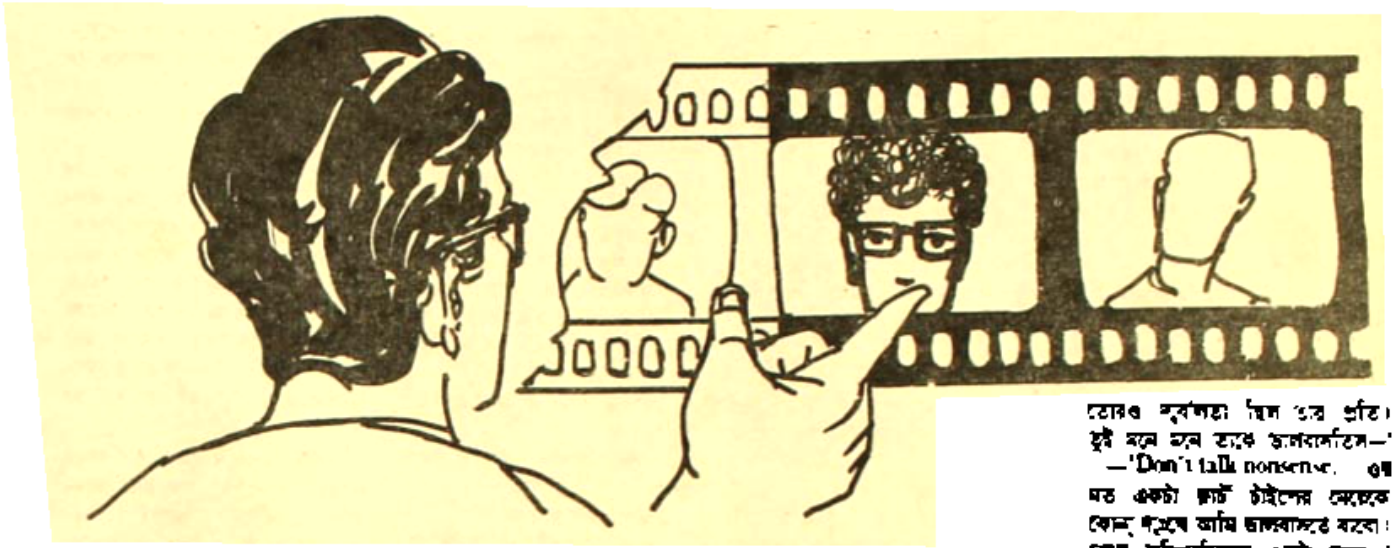

—তা যদি হচ্ছই তো আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?'

—'এসেছি যে আপনি হয়তো প্রমীলার মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন।'

তপনজ্যোতি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে কিরীটী বললে, 'প্রথমতঃ আপনি যে কেবল তার সহপাঠীই ছিলেন তাই নয়—আপনাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতাও ছিল—আর দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি প্রমীলাদের বাসায় গিয়েছিলেন।'

—'কে বললে সে কথা?'

—'নির্মলবাবু, আপনাদেরই আর এক সহপাঠী ও বন্ধু।'

তপনজ্যোতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম সেখানে।'

—'কখন গিয়েছিলেন এবং কখনই বা চলে এসেছিলেন?'

—'গিয়েছিলাম সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আর চলে আসি বোধকরি রাত তখন দশটা হবে।'

—'আপনি যখন চলে আসেন নির্মলবাবু কি তখনো সেখানে ছিলেন?'

—'হ্যাঁ—সে ছিল—'

—'আচ্ছা আপনি কি জানতেন যে ঐ সময় প্রমীলার মা বাবা কলকাতায় ছিলেন না?'

—'জানতাম—তাঁরা পুরী গিয়েছেন বেড়াতে।'

—'তা হলে সে রাত্রে প্রমীলাদের ওখানে গিয়েছিলেন কেন?'

—'প্রমীলাই যেতে বলেছিল অনেক দিন—'

—'কেন?'

—'কতকগুলো অঙ্ক বুঝে নেওয়ার জন্য। নির্মল আর প্রমীলাকে আমি অঙ্কগুলো বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসি।'

—'আপনাকে সে রাত্রে দরজাটা খুলে দিয়েছিল তাই না?'

—'হ্যাঁ—'

—'দরজা বন্ধ করেছিল কে, রাত দশটায় যখন আপনি চলে আসেন?'

—'প্রমীলা—সে-ই নাকি আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল।'

—'আপনি যখন যখন প্রমীলার ওখানে যেতেন। ওদের বাড়ির সকলের কাছে আপনি পরিচিত, না?'

—'হ্যাঁ—বেতাল মনে রাখে—'

—'আচ্ছা প্রমীলার মৃত্যু সংবাদটা আপনি কার কাছ থেকে পান এবং কখন?'

—'পরের দিন সকাল সাতটা নাগাদ নির্মল আমাকে ফোন করে কথাটা জানায়। বলে প্রমীলা সুইসাইড করেছে।'

—'আচ্ছা প্রমীলার সঙ্গে আপনার তো বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল?'

—'সহপাঠী হিসাবে যতটুকু সাধারণত থাকে তার বেশী কিছু নয়।'

—'প্রমীলার আপনার প্রতি মনোভাব কি রকম ছিল?'

—'বলতে পারবো না।'

—'প্রমীলা কাউকে ভালবাসত বলে আপনি কিছু জানেন?'

—'বোধহয় প্রমীলার মনে বিমলেশের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা ছিল—বিমলেশ প্রমীলাকে ভালবাসত—'

—'নির্মলবাবু, তার কোন দুর্বলতা ছিল প্রমীলার প্রতি?'

—'ঠিক জানি না, তবে মনে হত ছিল—'

কিরীটী আরও কি প্রশ্ন করতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু তা হলো না—কলিং বেলের শব্দ শোনা গেল।

তপনজ্যোতি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ২৫/২৬ বছরের এক যুবক ঘরে এসে ঢুকল।

—'হেলো তপন'—যুবকটি বলে কোন হঠাৎ ঘরে কিরীটীকে দেখে।

কিরীটী তাকিয়েছিল আগন্তুকের মুখের দিকে।

বোঝা গেল তপনের। সন্ধ্যের পরে ঘরে ঢুকেই কথাবার্তায়। তারপরই তাকিয়ে তাকিয়ে চুল এলোমেলো। পরনে দুটি গায়ারী—পায় চপ্পল। গায়ের রঙ কালোই বলা চলে। তবুও হলেও বেশ সুশ্রী।

—'কিরণ তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। ঘরে আলাপ করিয়ে দিই—ইনি মহামন্ত্রনী কিরীটী রায়। আর কিরীটীবাবু—আমাদের একটু আগে যার কথা হচ্ছিল এই সেই বিমলেশ নন্দী—'

ওরা পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করে।

তার পরই আবার তপন বললে, 'বিমল, উনি কি এসেছেন জানিস?'

—'কি?'

—'প্রমীলা নাকি সুইসাইড করেনি। কেউ তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে!'

—'প্রমীলাকে হত্যা করা হয়েছে বিষ দিয়ে! কি বলছিস তুই! না, না it is absurd!'

—'না না বিমলেনবাবু, কিরীটী বললে 'it's a fact.'

—'কিন্তু কেন—কেন তাকে কেউ হত্যা করতে যাবে?' বিমলেশ বললে।

—'সে প্রশ্নের আমরা পরে আসছি বিমলেনবাবু, তার আগে আপনি যদি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেন।'

—'কি প্রশ্ন—'

—'আপনি ভালবাসতেন প্রমীলাকে?'

—'প্রমীলাকে আমি ভালবাসতাম! হঠাৎ ঐ conclusion-এ আপনি এলেন কি করে? না কেউ এ কথাটা বলেছে?'

—'ভালবাসতেন না?'

—'না। কেন মিথ্যে না—'

—'আপনার কোন রকম দুর্বলতা তার প্রতি ছিল না?'

—'না।'

—'আর প্রমীলার?'

—'না। তার যদি কোন দুর্বলতা ছিল তো সেটা বোধহয় ঐ তপনের পরেই—'

—'কি বলছিস তুই বিমল? আমার প্রতি তার কোন দুর্বলতাই কোনদিন ছিল না—বরং তোরই প্রতি তার দুর্বলতা ছিল—'

—'বাজে বকিস না তপন।'

—'আর তুই অস্বীকার করলেই কি তোরও দুর্বলতা ছিল তার প্রতি। দুই মনে মনে তাকে ভালবাসতিস—'

—'Don't talk nonsense. ওর মত একটা ক্লার্ট টাইপের মেয়েকে কোন শৃঙ্খলে আমি ভালবাসতে যাবো। চঞ্চল অস্থিরচিত্তের একটা মেয়ে—' বিমলের কিছু বিদ্রূপের কণ্ঠ যেন কিছুটা আক্রান্ত করে পড়ে।

—'বিমলেনবাবু,' হঠাৎ কিরীটীর ডাকে দুই বন্ধুই ওর মুখের দিকে তাকাল। কিরীটী বললে, 'আচ্ছা সেদিন আপনিই তো ফোন করে নির্মলবাবুকে সংবাদটা দেন?'

—'ঠিক ঊনটা—it was নির্মল। সেই আমাকে ফোনে সংবাদটা দেয় প্রথমে—'

—'কিন্তু নির্মলবাবু তো নি আমি জানি।' কিরীটী শান্ত গলায় বললে।

—'নির্মল এখন ঘটই তদ্বাবধায়ক হচ্ছে I know. তার গলা আমার অবশ্যই চেনা it was নির্মল। বহু দু'খানা বাড়ির পরেই থাকে প্রমীলাদের—তাছাড়া পরে এও জেনেছি সে রাত্রে নির্মল প্রমীলার ওখানে অনেকক্ষণ ছিল—তাই না তপন?'

তপন মৃদু গলায় বললে, 'হ্যাঁ—'

—'আপনিও তো গিয়েছিলেন সে রাত্রে প্রমীলার ওখানে?' হঠাৎ কিরীটী বললে।

—'কে বলেছে? পর একমাস তার ওখানে আমি যাইনি, বিমল বললে।

—'মনে নি?'

—'না।'

—'বিমলেনবাবু—কলা একবার সন্ধ্যার দিকে আমার বাসায় যাবেন?'

—'কেন?'

—'আসুন না—কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে—'

—'বেশ যাবো। আচ্ছা চলি হে তপন।'

বিমলেশ বের হয়ে যেন যেন অনেকটা তাড়াহুড়ো করেই।

॥ ৮ ॥

প্রমীলার ঘটনা তদন্ত দেওয়াই ছিল। প্রমীলার মৃত্যুর পর সুবীরঞ্জনই ঘরের দরজায় একটা তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। বাড়ির কেউই অবিশ্যি ঘরটায় আর ঢুকতো না একমাত্র চিরঞ্জন ছাড়া—সে প্রায়ই ঐ ঘরটার মধ্যে ঢুকে চুপচাপ ছুটির দিন বসে থাকত।

প্রিয়রঞ্জন যে তার দিদিকে কত ভালবাসতো তারই পরিচয় পাওয়া গেল। প্রিয়রঞ্জন ঘরে ঢুকে বললে—'দিদি, তোমার জন্যে একটা ভারী সুন্দর জিনিষ এনেছি।'

—'কি রে?'

—'কিরীটীবাবু, দিদির বরটা একবার দেখতে চান—চাবিটা দাও—'

চাবির রিঙ থেকে চাবিটা নিয়ে সুবীরঞ্জন বললে, 'চল খুলে দিচ্ছি।'

দরজা খুলে তিনজন ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটা অন্ধকার। প্রিয়ই সুইচ টিপে ঘরের অন্ধকারটা ঘুচিয়ে দিল। পুলিশ সুরেনকে নিয়ে যাবার পর আর কেউ এই চারদিনে এ ঘরের কোন কিছুতে হাত দেয়নি। যেখানকার যা ঠিক তেমনিই রয়েছে। কিরীটী একবার ঘরের চারদিকে তাকাল। একটা সিঙ্গল খাট—বিছানার চাদরটা এলোমেলো হয়ে আছে। মাথার বালিশ দুটোও যথাস্থানে নেই। এক কোণে একটা ছাঁচের পালঙ্কওয়ালা আলমারী। ছোট একটা ড্রেসিং টেবিল, তার উপরে কিছু সাধারণ প্রসাধনের টুকিটাকি জিনিস—ছোট একটা ট্রেতে—আর এক কোণে একটি পড়ার টেবিল—বই খাতাপত্র চেয়ারসমেত পড়ানো। ছোট একটা কাঠের বেঞ্চ—ইইতে ঠাসা।

টেবিলের উপরের বই ও খাতাপত্রগুলো অনেকক্ষণ ধরে নেড়েচেড়ে উল্টেপাল্টে দেখলো কিরীটী। তারপর খাটের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখের উপর যেন ভেসে ওঠে চিরাপ্রিয়র হেলা ফটোর রঙীন—মৃতদেহের চাঁদমুখ।

বিছানার চাদর ও বালিশ তোষক উল্টে উল্টে দেখলো কিরীটী। বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে থেকে একটা ছোট শিশি পাওয়া গেল। শিশিটার মধ্যে কি একটা সাদামতো সামান্য তলে রয়েছে। শিশিটা কিরীটী পকেটে রেখে দিল। বাদামটো কিন্তু দুই তরফের তরফের চোখে পড়ে না।

—'প্রিয়বাবু—'

—'বলুন।' প্রিয়রঞ্জন কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

—'রামাচরণকে একবার ডাকতে পার?'

—'ডাকছি এখুনি।' প্রিয়রঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—'এই যে রামাচরণ। সে রাত্রে তুমি তোমার দিদিমণি ও নির্মলবাবুকে ঠান্ডা ছেলের পানা দিয়েছিলে না?'

—'আজ্ঞে—'

—'তারা দুজনেই ছেলের পানা খেয়েছিল?'

—'নির্মলবাবু তখুনি এক চুমুকে খেয়ে গ্লাসটা আমার হাতে ফেরত দিয়েছিল—'

—'আর দিদিমণি?'

—'দিদিমণি খুব ভালবাসতো ঠান্ডা ছেলের পানা—বড়কর্তা—অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে খেতো—'

—'সেদিন তুমি তার গ্লাসটা নিয়ে যাওনি?'

—'আজ্ঞে না।'

—'পুলিশ বোধহয় নিয়ে যায়?'

—'আজ্ঞে না। পরের দিন আমার স্পষ্ট মনে আছে—সকালে এই ঘরে ঢুকে গ্লাসটা আর দেখতে পাইনি।'

—'গ্লাসটা দেখনি?'

—'না।'

—'আচ্ছা রামাচরণ, সে রাত্রে—নির্মলবাবু ও তপনবাবু ছাড়া আর কাউকে এ বাড়িতে আসতে দেখনি বা শোননি?'

—'না আজ্ঞে—'

—'শিবেনবাবুর গলা তুমি চেনো?'

—'আজ্ঞে যে তিনজন ঐ শিবেনবাবু, নির্মলবাবু আর তপনবাবু এখানে আসতেন, তাদের প্রত্যেকের গলার স্বরই আমার চেনা।'

—'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে রামাচরণ, শিবেনবাবুর গলাটাই তুমি তপনবাবুর গলা বলে ভুল করেছিলে? তাছাড়া চোখেরও তখন জ্বর—মাথার যন্ত্রণা—'

—'আজ্ঞে না—তবে—'

—'কি তবে?'

—'সেদিন একটা কথা বলতে আপনাকে ভুল হয়ে গিয়েছে—ছোটবাবাবাবুকেও বলিনি—'

—'কি বলত?'

—'ডাক্তারবাবু বিদায় হবার পর আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেও মাথার যন্ত্রণার জন্য ঘুম আসেনি তখনো। প্রায় বেশ রাত হয়েছিল—কেউ দরজা খুলে বের হয়ে গেল। জুতোর শব্দ যেন একটা শুনেছিলাম।'

—'ঠিক বলছ রামাচরণ—বড়কর্তা পরের দিন সকালে সুবীরবাবু যে ছেলের পানাটা খেয়েছিলেন—সেটা যেন আমি কিছুতেই ফেলতে পারছিলাম না। এখন তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি—তৃতীয় আরো একজন কেউ সে রাত্রে এসেছিল—যে সবার পরে এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়—কিংবা যারা চলে গিয়েছিল তাদেরই মধ্যে কেউ আবার সে রাত্রে ফিরে এসেছিল—তৃতীয় কেউ তো নয় তাদেরই একজন হোক। সে তাহলে কখন এসেছিল—'

কিরীটী কতকটা যেন আপনমনেই কথাগুলো বলে।

পরের দিন সন্ধ্যায়। কিরীটীর বাড়ির বসবার ঘরে—

কিরীটী, তপনজ্যোতি, নির্মল, শিবেন, প্রিয়রঞ্জন ও সুবীরঞ্জন। কথা বলছিল কিরীটীই। 'তপনবাবু আপনি সে রাত্রে প্রমীলার ওখান থেকে বের হয়ে কোথায় যান?'

—'কেন আমার বাড়িতে—'

—'কখন পৌঁছান বাড়িতে?'

—'রাত এগারোটা নাগাদ হবে—'

—'কিসে ফিরেছিলেন—ট্যাক্সীতে না হেঁটে?'

—'হেঁটেই ফিরেছি—'

—'বরফা খুলে ফিরেছিলেন আপনার মামা—ডাক্তারবাবু?'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনি কিন্তু অন্যরকম বলেছেন আমার কাছে।'

—'কি বলেছেন?'

—'আপনার সে রাত্রে ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল—রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ আপনি বাড়ি ফিরে যান।'

—'বলেছে, মামা ঐ কথা বলেছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বাজে কথা। মামা মিথ্যে বলেছে—'

—'মিথ্যে বলবেন কেন?'

—'কারণ সে চায় না আমি তার ওখানে আর থাকি—'

—'কেন?'

—'আমাকেই যেকোন তার ছেলেটি লেখাপড়া কিছু শিখলো না—কারখানার সামান্য কাজ করে, আর আমি—দুদিন বাদে এম.এস-সি পাস করবো—সহ্য করতে পারছে না সে—'

কিরীটী শুধু হাসলো। তারপর নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'নির্মলবাবু আপনিও আমাকে সেদিন মিথ্যে বলেছেন।'

—'মিথ্যে বলেছি? কি মিথ্যে বলেছি আপনাকে?'

—'মিথ্যে বলেছেন এই যে রাত্রে আপনি চলে যাচ্ছেন বলে প্রমীলা খাননি তখন। দিয়েছেন সুবীরবাবু ফিরে আসবার পর কোন এক সময়—'

—'মোটেই না। আমি তখুনি সোজা বাড়ি চলে যাই।'

—'হুঁ। আপনি তাহলে হলফ করে বলছেন যে সবার পরজাটা আপনি খুলে রেখেই চলে গিয়েছিলেন সে রাত্রে?'

—'হ্যাঁ। তারপর হয়ত প্রমীলাই স্নান সেরে নীচে এসে দরজা বন্ধ করে দেয় কোন এক সময়।'

—'না। প্রমীলা যে তা দেয় নি সেটা আমিও কিন্তু হলফ করেই বলতে পারি নির্মলবাবু।'

—'তবে হয়ত—রামাচরণই—'

—'না, সেও নয়—তাহার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়—হত্যাকারীই সে রাত্রে আপনার চলে যাবার পর (যদি সত্যিই রাত সাড়ে বারটা নাগাদ আপনি চলে গিয়ে থাকেন) দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।'

—'হত্যাকারী?'

তিন বন্ধুই একসঙ্গে প্রশ্নটা করল।

—'হ্যাঁ, হত্যাকারী। তপনবাবু, শিবেনবাবু, নির্মলবাবু, আপনাদের মধ্যে একজন অন্তত জানেন সেই হত্যাকারী কে।'

—'আমরা একজন জানি'—তপন কথাটা বলে অন্য দুই বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল।

—'হ্যাঁ, জানেন। বলুন কে? শুনে, পুলিশ কিন্তু জানতে পেরেছে সে কে।'

—'কে! কে? কে?' তিনজনেরই প্রশ্ন।

—'শুনুন তাহলে আপনাকে কি হয়েছিল আমার বা অনুমান এবার আমি বলি।' কিরীটী বলতে লাগল। 'প্রমীলা সেদিন ফিরে আসে বাড়িতে বেলা চারটে নাগাদ—তারপর পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আসেন নির্মলবাবু প্রমীলার ওখানে—এবং সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে আসেন তপনবাবু—এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে।'

কিরীটী একটু থেমে আবার বলতে লাগল, 'তপনবাবু বলেছেন সেদিন নাকি প্রমীলার ডাকেই তিনি তার ওখানে যান। ডাকে ও নির্মলবাবুকে, কতকগুলো অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে। এবং অঙ্ক বুঝিয়ে দেবার পর রাত দশটায় তিনি চলে আসেন (তপনবাবুর জবানবন্দী—)। এবং নির্মলবাবু তারও আধঘণ্টা পরে আসেন (নির্মলবাবুর জবানবন্দী)। উভয়ের টাইম যদি সত্য বলে মেনে নিই, তাহলে ঐ আধঘণ্টা সময় প্রমীলার ঘরের মধ্যে ওরা দুজনই অর্থাৎ প্রমীলা ও তপনবাবু ছিলেন—তখনো সুবীরবাবু ফেরেন নি। কথা হচ্ছে ঐ সময় রামাচরণ যে এক গ্লাস ছেলের পানা প্রমীলার জন্য রেখে গিয়েছিল—সেই পানাটা প্রমীলার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল কিনা। অর্থাৎ গ্লাসটা শেষ হয়েছিল কিনা একমাত্র বলতে পারেন আমাদের নির্মলবাবুই। কি নির্মলবাবু, ছেলের পানাটা কি প্রমীলা খেয়ে ফেলেছিল?'

—'হ্যাঁ—মনে তখন চলে আসার পর কিছুক্ষণ বাদেই ছেলের পানাটা খেয়ে সে বাথরুমে স্নান করবার জন্য যায় আমি উঠে চলে আসি তাকে বলে।'

—'কিন্তু আমি যদি বলি নির্মলবাবু আপনি মিথ্যে বলছেন।'

—'মিথ্যে?'

—'হ্যাঁ মিথ্যে—তখনো গ্লাসটা নিঃশেষ করে নি প্রমীলা—ফেলেছিল হয়ত স্নান করে এসে শেষ করবে—'

—'আমার সামনে সে গ্লাসটা শেষ করেছিল—'

—'নির্মলবাবু, এই শিশিটা চিনতে পারেন?' বলে কিরীটী ছোট একটা শিশি পকেট থেকে বের করে তাদের সামনে তুলে ধরল, 'এটা প্রমীলার বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে।'

—'কিসের শিশি ওটা?' তপন ও শিবেন শুধায়।

—'এটায় পটাশই কিন্তু হত্যাকারীর আক্রোশের রূপ ধরে ছিল। এটায় মধ্যেই ছিল তীব্র বিষ পটাশিয়াম সায়ানাইড।'

হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে একটা মরণের ঘনই ঠান্ডা স্তব্ধতা।

সবই যেন বেমানান।

কিরীটী একটু ছেসে শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল, এটাই ওরেজার্ডকে চিহ্নিত করে ফেলে কে সে বন্ধু প্রমীলার হোয়ের সময়ে পাশের বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল তাকে হত্যা করবার জন্য। শুনুন আপনারা, এই সিলিং ফ্যানের অন্ধকারে ছাপ ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট তুলে নিয়েছে যেমন, তেমনি বেডরুম থেকে কোলাপ্সিবল আপনাদেরও অন্ধকারের ছাপ—এবং ওর অন্ধকারের ছাপের সঙ্গে ঐ সিলিং ফ্যানের অন্ধকারের ছাপ মিল আছে জানেন কি আপনারা?

হেসে সবাই চুপ

কিরীটী শান্ত গলায় পূর্ববৎ বলল, শিবেনবাবু, আপনার অন্ধকারের ছাপ—it was you!

—তাই বুঝি, হেসে ওঠে শিবেন। তা আমি তো সে বন্ধু প্রমীলাকে বাঁচাতে বাধা দিইনি—

—শিবেনবাবু—আর তখন নিয়ে ছিলেন ওকে। নির্মলবাবু চেপে ধরার সঙ্গে—সঙ্গে সঙ্গে থেকে পৌনে একটার মধ্যে কোন এক সময় আপনার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল।

—ননসেন্স! একবার টাইম সম্পর্কে আপনি বের করে ফেলেছেন তা প্রমীলা তো সঙ্গে বন্ধ করে দিয়েছিল নিজের ঘরে চলে আসার পর। আমি ওকালত কি করে?

'প্রমীলা আগে সঙ্গে বন্ধ করেনি। আমিই সঙ্গেটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এবং আপনার সময়ে সঙ্গে নয়, কারণ আপনাকে আপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রমীলার বিবসনের পর চুরুট সম্পর্কে।

—শুনুন শিবেনবাবু, আপনি যে বাধা দেন তা প্রমীলা জানে না ঠিকই। কিন্তু অত রাত্রে হঠাৎ আপনাকে দেখে সে ভয় খুশিই হয়েছিল তেমনি একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য হয়ত আপনাদের উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি চলছিল। অবিশ্যি এটাও আমার অনুমান। আপনি যখন ঘরে গিয়ে ঢোকেন, নির্মলবাবু তখন হাতে সবেই প্রমীলা সঙ্গেটা। তখন বন্ধ হয়েই ছিল। সেই ফাঁকে আপনি ওকে ফেলে হয়ে আসবে আগেই প্রমীলা বন্ধুত্ব থেকে বেরিয়ে আসে ভেবেই চলতেও পারেনি তার ওপর এটা ঠিক আসবের সালাইন মধ্যে নির্ভর হয়ে আছে এবং সে বিষ ঢেলে দিয়েছে পাশে তাই ভাবে আপনি ভুল বুঝেছেন করেছেন আপনি নির্দোষ বন্ধু। প্রমীলা তাকবসন আপনাকেই নির্মলবাবুকে নয়।

না, না। কিরকম করে ওঠে হয়ে নিয়ে, সে নির্মলকেই ভালবাসে।

—না। আপনাকে। প্রমীলার মত মেয়েরও আপনি চিনতে পারেন না শিবেনবাবু।

হঠাৎ ঐ মুহূর্তে শিবেন পকেট থেকে কি বের করে মুখে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে পড়ে গেল।

কিরীটী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় শিবেনের সামনে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওকে সতর্ক করে বলবার সময় পেল না—

সবার দিন ডিনারের আসর উঠলে কিরীটী বলছিল, প্রথমটায় নির্মলবাবুই আমার সন্দেহ করেছিলাম ঠিকই। পরে চৌধুরীদের বাগানটা ও সিলিংটা অন্ধকার হওয়া কারণে দিকে অনুমান ঠিক ঠেকায় এবং ঐ দুটো ব্যাপারেও ভুল না করলে তাকে ধরাও যেত না এত তাড়াতাড়ি।

—ভুল কেন বলছেন কিরীটীবাবু?

—ভুলই তো। প্রমীলার মত

সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সবই তো আমার সন্দেহ হয়, পরে সব ভেবেচিন্তে মনে হয়েছিল নির্মলবাবু ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু ঐ সিলিং ফ্যানে ওরেজার্ডের ছাপ ছিল না। ওটা ছিল আপনার। ঐ ফ্যানের ওপর ভর দিয়ে আপনি ঝুলে পড়েছিলেন। ঐ ফ্যানের ওপর ভর দিয়ে আপনি ঝুলে পড়েছিলেন। ঐ ফ্যানের ওপর ভর দিয়ে আপনি ঝুলে পড়েছিলেন।

শেষ—

# ভুল চাঁদ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

॥ প্রথম কিস্তি ॥

কিমি সুদ্ধু গাড়িটা এসে গরেকাটায় থামলো। পাহাড় থেকে সমতলে। ডাইনে বাঁয়ে চা বাগান নিজন। শাটিকেত। ঘুরঘুট্টি জঙ্গল। জোনাকির জলোর মতন টিপটাপ অলো এদিক সেদিক। জনমানবহীন অলো। আমরা ওপর থেকে নিচে নামছি। ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি। জলপাইগুড়ি যাচ্ছে। আমরা ঐ পর্যন্ত যেতে পারতাম। গেলেই জমতো ভালো। জায়গা চলে যেতো। আমরা কুপ কুপ করে বাসরের কাছটায় নেমে পড়লাম। এখানে কিছু কিছু দোকানপাট অছে। ছাউনিওলা থেকে কাঠচেরাই-এর একটানা আওয়াজ আসছে কানে।

—কেমনো মানে হচ্ছে না।' সন্ধ্যে বললো হঠাৎ।

—কীসের?'

—'এই, এখানে নেমে পড়ার।'

—'তখন কী করতে?'

—'অনেক কিছুই।'

—'আমার শরীর আজ বইছে না সন্ধ্যে। কাঁধের ওপর মাথাটা নেই। কটা রাত ঘুম ছাড়া গেছে, মনে করতে পারো?'

—'পারি।'

—'চুপ করো। এখানে কথা বলা বারণ। এখানে সবাই কথা কম বলে, খাকো নি?'

—'দেখেছি।'

—'তবে?'

এখানে মেহগিনি গাছ আছে। না ছেঁকে পালকে হয়। ঘুরঘুটের কুপেনি গাছ আছে। যে ঘুরঘুটের মালা। ফলগুলো সোনা জলমের মতন। ওপরটায় শাঁস। ভিতরে বালার কাঁড়। শাঁসের রং খাসেবাবুরের গায়ের মতন। যমুনা কেমন কালো, ঠিক তেমন। বাঁচড়ে ঐ শাঁস খায়। ঘুরঘুটে গড়নাড়ি যায় ঘুরে। যে ঘুটোচা খাকে, সেও প্রকৃতিক। ছুঁচ মাপনি গলে যায় ওর ভেতো।

●

ঘুরঘুটিকলোর প্রামে পরা লিকতো। হেসে। কলকাতো থাকতো পড়ার ঘুতোয়। জানলে, বেশ করতো চিটি লিকতো, চা চপ খেতো। বাম রাজনীতির দিকে ঝুকেছিলো একটু-আধটু। তেমনোটাতেই জুত হয়নি। বাপ ঘুরে এখনে টেনে এনে ব্যবসায় ঘুতে দিয়েছেন। করেছেন ভালোই। তাঁর বাড়ির ভিতর ঘুগল থাকে। বৌ অছে। ছেলেপলে নেই। হবে টবেও না বোধ হয়। তেরো বছরের বিয়ে। দুজনেই কছপ-কাপ। জেরে হাওয়ায় দুজনেই ওরে। আজ চলো। চুটিয়ে পরসা করছে। এখনে কয়খানা। সিকিমবাড়িতে দোকান,

জমিজমা, পরনো নম্বর বাড়ি। কল ইত্যারা নেয়। আসল গায়গোলায় উলার জন্য দিয়েছে। এখন তলা ফেলে তাড়ই। কিন্তু খুব্বুরে দেখে।

খুশলদের বাড়িটা আমাদের চেনা।

পরদিনও বৃষ্টি ধুয়ে যাওয়া হয়েছে। খুশল ছিলো না। কলকাতায় পিরোজিলো বৌ জমা দিতে। জমা দিয়ে তাড় ফেলার জন্য। এসেছে কিনা দেখতে আসা তাই। এলে ভালো, না এলেও অসুবিধে নেই। তখন ওর তারের কাছে দর্না দিতে হবে। মনকাড় চাই। মোদ্দা কথা। তা সে যে ভাবেই হোক। খুশল দিতে ছুটে জানে। দেবেই বা না কেন? কারুকে বিশ্বাস। পরা দেনা ফেলেছে। আমরা এখনো লেগে আছি। খুশল আমাদের দেবে না তো কাকে দেবে?

বলে, অর্থাৎ গত জমনে বলেছিলো, আমা একটা প্রেস-ফ্রেস কর। পার্বালশিং হাউস কর। আমি বিজনেসের দিকটা দেখবো।'

অর্থাৎ বাবসা।

কটাই তো। অসুবিধাটা কোথায়?

—বুলে। ও সব তুই কর। আমি লিখি। বক্তব্যর জন্যে পয়সা চেয়ে নেবো।'

—তাহলে একটা কাগজ-টাগজ কর তবে। এখন তো তোর কিছু করা উচিত।'

—উচিত তো বটেই। সমস্যা হলো একটা জিনিস আছে, ভুলে যাস কেন?'

—'তোর সাহসের অভাব! আশ্চর্য'

—বাজে বাবা। এখন ছোরাম বলা হো। কোথায় কোথায় যাওয়া হবে? এবং কী ভাবে। মনে রাখিস, তোর বাড়িতে এক সন্ধ্যানিত অতিথি এনেছি।'

—হিমানীর কথা বলছিস?'

—বয় তো কী? সদা ছিরে ধরে তোদের এফিকশনে চলে এসেছি—সোজা। ফিক ভুল করিনি।'

—নিশ্চয় বানাবো। সে তোকে ভাবতে হবে না। এসেছিস যে এতো ভালো লেগেছে কী বলছে। বউ হবে ভগবানলাক হয়ে থেকিস জন্মা।'

সত্যি কথা বলতে ছেলে খুশলের সঙ্গে এতোটা মাখামাখি আমার কোনোকিনই ছিলো না। হঠাৎই খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছি উজ্জ্বলের ফ্লাটের সামনে বহুবছর। জলপাড়া যাবার ইচ্ছে হিমানীর। আমি রাজে ছোঁয়া। ও ছেলে আবার যাবো নিশ্চয়। আর সেই জলপাড়া খুশলের এখন থেকে যাওয়া খুব সোজা।

খুশলের কাঠের দোতলা সাঁইই দেখবার মতন। চারিদিকে কাঠের বারান্দা। বারান্দার খুশলও অতিথি। টবেও সারবন্দী। একতলাতেও ঘর আছে। এফিকশন ফাকবাজোপন্যাসের মতো শালবাড়ী উড়ে নেই। ওদুলো কলের জন্তুর ভয়ে মানুষে তৈরি করেছে। মানুষের ভয় মানুষ পেতে জানে না।

খুশলের ছেলেমেয়ের সব কিছুই জমি থেকে ওঠে। চাষের চাল ডাল সবজি সংসৃষ্টি। ওরের ঘি দই ডিম মুরগি। শিলিগুড়ির পিসারি থেকে শুকনোরের মালে। শুকুর থেকে মাল। খুশল সুন্দর ধানীপানি হয়ে বসেছে। পরা ওকে উজ্জ্বল আদুলে পোড়হতো। সবই হয়েছে। কিন্তু, যার জন্যে এই সব, সমস্ত—সে এখনো আসেনি। হিমানী এখানে এসে মাঝে মাঝেই উদাস হয়ে পড়ছে। জলে জলে ওর পাওয়া শুরু হয়েছে ওর। হিমানী সঙ্কেতেই ওর পায়। জান্ত মাল আটকে পারে না। খুব্বুরে আকাশোলা দেখলে ঠক ঠক করে কাঁপে। সুনির্মল বলেছিলো, ওর পিঠে একটা নোটিস ঝুলিয়ে দিয়ে যে : কাচ, সাবধানে হাত দেবেন। পিঠের বলে বুক বলতে সুনির্মলের ভেবেছিলো। আমি বুঝেছি, তাও ওর লক্ষ্য এড়ায় নি। ও কথান্তরে খেলো সংগে সংগে। সুনির্মল আমাদের বন্ধু। অনেকদিনের বন্ধু। সব মেয়ের প্রতিই একটু দুর্বল।

আমরা বোমকরি পুজোর ঠিক আগে আগে যেছি। এদিকে গরম-কাল বলতে কিছুই নেই প্রায়। বছরে কটা দিনই বা একটু গা খুলে থাকা। বেশ শীত পড়েছে। অকাল ভাঁট চলছে রোদ্দুরে। মাটির হিম শুকতে তরা বেলা হয়ে যায়। ঘন্টাখানেক আলসা মোড়া চুলছি। লোকে কাজ করে, তাও বাঁচে সুখে। কোনো তাড়া নেই কোথাও। সবচেয়ে শব্দের চেয়ে প্রবান এখানে। পাখি ওড়ে, কিন্তু ওড়ার মতো করে নয়। ফুল ফোটে, মনে হয় সে ফুটতে সময় নিচ্ছে। সর্বত্র একটা ঢালোয়ালা মানুষের গায়ে চালের মতন ছড়িয়ে। পৃথিবীর অনেক চলনা এখানে হড়ানো ছিটোনো। এমন জায়গায় মানুষ বেড়াতেই আসে। মনে হয় ঠিক সলোর করতে নয়।

আমরা শালমুড়ি দিয়ে বারান্দার চেক চেয়ারে বসে যাচ্ছি। সামনেই একটা অর্কিডে সাদা প্রজাপতি। খুশল ওর নাম বললো, সম্ভবত পাখি। হতেও পারে। এখানের বন্য জিনিসের সঙ্গে পরিচয় জমাটা জড়ে দেওয়া যায়।

হিমানী হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমাদের একটা কাঠের বাড়ি বানিয়ে দিন না।'

—'তোমরা? এখানে? এখানে তো আপনার বাড়ি আছে।'

হিমানী লজ্জা পেয়ে বললো, 'না না এখানে নয়। এখানে তো আছেই। বলছিলাম, কলকাতায়—'

—'হুঁ হাঁ' খুশল বললো, 'হুঁ না হ্যাঁ নানা জায়গা। পরে আপনাকে বুঝিয়ে বলবো। তবে একটা কথা, এমন বাড়ি এখানেই হয়। শহরে বাজারে না হওয়াই ভালো।'

—'হলে কী সুন্দর হতো বলুন।'

—'হবার সময় সুন্দর থাকতো, বেশিদিন থাকতো না।'

—'কী বাড়িঘরদোরের আলোচনা করছো তোমরা এই সাত সকালে।'

—'তা কী করতে বলছো,' খুশল বললো, 'তোমার খাবার তো কিছু হবে না। আমি হিমানীকেই নিয়ে যেতে বলবো, সেঁচ তোমাদের কী না হয়।'

খুশল একটু পরা চাঁছির চারের তাগাদা দিল। তারপর বললো, 'এটা বৃষ্টিমারি রেনজের মধ্যে পড়ছে। ঐ যে পাঁচ রাস্তা দেখছো সামনে। ওটা দিয়ে মাইলখানেক গেলেই পাকাঁচ জঙ্গল। সেখানে বাঘ ভল্লুকে হাতি হরিণ সব পাবে। ঠিক এক মাইলের মাথায় কী আর পাবে? আমের দুচার মাইল জঙ্গলপথ ধরে যেতে হবে। যাবি নাকি?'

—নিশ্চয়। বন্দুক আছে তোর?'

হাসে খুশল। 'আছে, তবে আমি চালাতে পারি না। তার দরকারও নেই। অফেন্ট রেনজার আছে, বিট অফিসার আছে। আমরা গেলে ওদের সঙ্গেই যাবো। রেনজার আমার বন্ধু-মানুষ। সাহিত্য বাই আছে। তোর পদার জন্য।'

—'বলিস কি?'

—'হ্যাঁরে, ভদ্রলোক বেশ ভুটিয়ে ফেলেছিস একই মধ্যে।'

—'এই যদ্যে বলছিস? ছয়ের কম হলো। তা ছাড়া, কতো বন্ধুকের সাধনা দেখতে হবে তো? আলা জল খেয়ে লেগেছিলাম তো।'

হিমানী হাসে।

—'হাসলে কেন?'

—'এমনি।'

—'হিমানীকেও তো ঐ ছাইপাঁস খেয়িয়ে জব্দ করেছিস।'

—'তা, এক রকম, তাইই। তা ছাড়া আমার অয়েটা কি? না আছে বাপকোল পয়সা, না আছে এক বুহাজারি অনসবারি।'

হিমানী হঠাৎ বলে, 'আমি কিন্তু ওর লেখা একদম বুঝি না।'

—'ঐখানেই তো মজা। ছেলেরা বুঝি বোঝে, তা হলে তো কুঝিয়াল বলতে হবে।'

—'ওটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো না কি?' বলে খুশল।

—'একটু হলো। কী আর করা? তোর একটা গাড়িফাড়ি থাকলে তোমাও বেরিয়ে পড়া যেতো।'

—'কোথায় যাবি? গাড়ির অভাব কী? আমার ছিলো দুটো। টাক্কি করে দিয়েছি। আজকে বলে দিলে কাল থাকবে—তোমাদের জন্যে তৈরি। আজ একটা কাজ করা যায়।'

—'কী আজ?'

'ও জলপাড়ার থেকে বৃষ্টিমারির দিকে যাওয়া যেতে পারে। একটা ডাকবাংলো আছে। জায়গাটা অপূর্ব। যাবে?'

—'নিশ্চয়। এর আবার কথা কী? এক পায়ে খাড়া। তা ছাড়া, হরিণ-টরিণ দেখা যাবে।'

—'সেটা বোধহয় হবে না। তার জন্যে অনেকটা ভেতরে ঢুকতে হবে। তারপর হিমানী আছে। জলো দেখা যাক, রেনজারের জিপ পেলে ভেতরে ঢোকা যাবে। তবে থাকতে রাজি চেয়ো না। ঘুরেই আসা যাক।'

খুটো হিকমা জানলো খুশল। ওর বাড়িটা খুশল রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। কাঁচা রাস্তা। সুপুরিগাছের গলি। কী একটা ফুলের গন্ধ এসে নাকে লাগে। কী ফুল?

—'নেবু।'

—'নেবু ফুলের গন্ধ এমন হয়? হিমানী করে।

—'হ্যাঁ গো মশাই। কেলাড়াঙায় তো থাকলে না। নেবুর ফুল হয় সেটা কী জানতে?'

—'বকে বেকো না। তুমি যেন সব জানো।'

—'সব জানি না, তবে অনেক কিছু জানি।'

খুশলের বিকেল আসে বসে, ওকেটা সেরেনে।

দুচারটে নাটঘাট পার হলেই সত্যর খুশলে জঙ্গল শুরু হয়ে যেলো। ঘন গভীর জঙ্গল। শাল সেগুন, গরান, শিশু। বহু রকম গাছপালা। অধিকাংশেই নাম না জানা গাছ। গায়ে লতাপাতা জড়ানো। গাছের ওপর ঝুলে পড়েছে। বিকেল পড়তে পারলে উল দেওয়া যেতো। লাল টুকটুকে ফল ফুলছে। কোথাও হেলাফেলা ফল। এর জন্যে হকারি হয়। পাতা ছেড়ে মিষ্টি গন্ধ। নানা রকম পাখি ডাকছে। পোকামাকড় কিচিরমচির করছে। নানা রকম গন্ধ তলাপাতা পাকিয়ে চুকছে নাকে। মনে হয়ে একটা খুটো গন্ধের গাড়ি ওদের বিপরীত পথ ধরে যাচ্ছে। খালি বিকেল বিকেল, এরকম। আর কিছু নয়। হিমানী পকেটের ওপরে ভর চাঁড়িয়ে নিলো।

—'পাঁট করছে?'

—'একটু।'

—'ছয় নয় তো?'

—'একটু।'

—'তোমার?'

—'কিছু না, আমি তো বাঁচে পাগল বলিনী একলবিনী। আমার ভয়?'

—'কি মারাত্মক ওষুধ? খুলতে পারে না—'

—'কে?'

—'খুশলটুকুলপা।'

—'ও সমস্ত কালা, ভেতরও সরবে না।'

হিমানীর গলাটা কি নরম আর বহুবচনাড়া।

—'ছাঁট ছিঃ'

—'ওতো ভয় পেয়েছো?'

—'মোটেই না।'

রেনজার ঘরেতেই কোন এক মিটে গেছেন। তবি স্ত্রীও খুশলের

পরিচিত। তিনি চা খেতে খাঁড়া-পাঁড়ি করার ঘুঘলা বললো, 'আপনাকে ঘুরিয়ে এনে আপনার এখানে চা খাবো। বলা ছিলাম।'

ভদ্রমহিলা বেশ সপ্রতিভ। মিলি না কি যেন নাম বললেন। ওঘার কথায় বের হলো হিমানীদের কলেজের ছাত্রী তিনিও। ওর বছর চারেক আগে পাশ করেছেন। এম.এ. পড়ার আগেই বিয়ে হয়ে গেলো। তারপর স্বামীর সঙ্গে এই নির্বাসন।

—'ভালো লাগে চাই, বলুন তো?'

—'নাতাই।'

—'তবে আমি মানিয়ে নিয়েছি। নিজে হাতে সবকিছু বানান করি। ঘুরপি নিয়ে ঘাটি খুঁড়ি। কুমড়োটা লাউটার বিচি পুঁতি। ফুলের গাছে ফলের গাছ আমার পছন্দ। আর আছে সজনী।'

'সজনী ওর মেয়ে।' বললো ঘুঘল। বলে হাসলো।

এতে হাসির কী আছে খুঁজতে না পেরে হিমানী অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

—'ঘুঘলদা না তো। বৌদি বলুন না আপনার সুন্দরী মেয়ের কথা।'

—'আপনারা ঠাট্টা করেন। সত্যি বলছি, এমার মেয়ে হলেও সে আমার ওর মতন ভালোবাসতে পারতো না।'

—'ওকে কবিতা পড়াচ্ছেন বোজ?'

—'হবেরে।' হঠাৎ কেন মিলি।

—'আসলে ওরা আমার পোষা হরিণটাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। দেখবেন? ডাকছি।'

মহিলা, 'সজনী' 'সজনী' বলে খুবার হাঁক পাড়া মাত্র ঝরের ভেতর থেকে সুন্দর শিং-ওয়ালা সোনার বরণ সজনী বের হয়ে এসে তাঁর কোলের কাছে চলে এলো।

ঘুঘল জিগ্যেস করলো, 'কী মা পড়ালেনো হয়েছে? আজ কি ইস্কুল ছুটি?'

সজনী তার গভীর কালো চোখ তুলে তাকায়। কিছু বলে না। হিমানী বলে, 'কী মিষ্টি দেখতে!'

ঘুঘল বলে, 'বৌদি, ওর শরীরের কাপড়জামাগুলো একটু, কেড় করে হিমানীকে দেখান না। নিজের হাতে বানানো বৌদির। কাঁথা-সেলাই-টোকরও আছে।'

—'থাকবে না, বাব।'

—'জুতোটাই বা নেই। ওর খুরে-ভাতে আমরা পাট সেড়ে ফেরও খোঁজ আনিল রাজা।'

—'উপহার কী দিলি?'

—'ওইখানেই সব ঠাইট। পঞ্চমবনের পাতার মুড়ে পুষ্পের সিউলি ফুল এনেছিলেন।'

—'ওয়ান্ডারফুল।'

—'দেখুন তো ভাই হিমানী, আমার সজনী যেন হরিণ! যা পাবে তাই খাবে।'

—'যদা না থাকলেও বৌদির চলে। কিন্তু, সজনীকে ছাড়া—এ জনে বছরের বাড়িও যান না। ওঁরা দুই ঘুঘো ঘুড়ি এসে তাঁদের ফেরকে দেখে যান। হ্যাঁ, নাতনিকে ফেলে তুলে আদর করেন। না হলে তো—'

—'ছাতাই বন্ধ? না? আপনার চাও বন্ধ। আমি ওঁদের জন্যে দু' কাপ জল বসাচ্ছি। আমার মেয়ের নিন্দে!'

তাঁর মিষ্টি দেখতে মহিলাকেও। ঠিক হরিণীর মতনই মনে। এতো অল্প পরিচয়ে কথাটা বলতে পারা যায় না। তাই বলা হলো না। মনের মধ্যে একটা আফসোস থেকে গেলো। তাছা কিছু পাখি মাথার ভিতরে ঘুরপাক করতে থাকে, সিমুলে ভুলো বাতাসে যেমন—

'মানুষের মতো থেকে হরিণের
ঘরে করেছো
ভাবেন, হে মানুষটি, নির্জনে,
মনের গহনে একা
বাহিরে কিছুই নেই,
অন্তরে প্রতিদিন সব লেখা
সমস্ত সমস্ত, নইলে ঘরে ফেতে
নিরুদ্দম বিষাদে

ভিতরে কে কাঁদে? কেন কাঁদে?'

মনে মনে আর এগুলো যায় না। আর দরকারও নেই। দীর্ঘ মেয়েদিনির ওপরের মাথার রোশনুর পড়েছে। পাতার জাল বেন করে মাটিতে আলো-ছায়ার খেলাঘর পেতে দিয়েছে কেউ। শত ঘুঘোলো পাখুকের মতন ফল করে আছে এখানে ওখানে। হিমানী তুলে তুলে কোঁচড় ভর্তি করছে।

—'কী হবে ওগুলো দিয়ে?' ঘুঘল শুধোয়।

—'খেঁধ। হয়তো কিছুই হবে না। এমনিই।'

—'ওগুলো জঙ্গলিদের রান্না করে এখনকার লোক, অক্সেলের সিপাইদের বৌ ছেলেরা।'

হিমানী অস্ফুটে বলে, 'হরিণের মাংসও তো খেতে ভয়ংকর বলে শুনেছি ঠাকুরপো।'

ঘুঘল বেশ উঁচু গলায় হেসে ফেলে এবার। 'আরে রাজা, তোর বউ আমার ওপর মারাত্মক রেগেছে।'

—'কেন?' সবেগে ফিরে তাকালো। আবার প্রশ্ন করে বসলাম, 'কেন? রাগ করবে কেন?' যেন ঘুঘ থেকে কিছু না শুনে কেউ শুধুলো।

—'জিগ্যেস কর। ঐ হরিণের বাপারটার।'

—'ও।'

—'হিমানী, ওঁর সঙ্গে আমার খুব রসত্বের সম্পর্ক। অনেকদিনের।'

—'না না, আমি রাগ করবো কেন? মনে হচ্ছিলো, উনি খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন।'

—'একদম না। আগে খুব ভীষণ কষ্টে ছিলেন। আজ দু' বছরের মতো সজনীকে পেয়ে উনি বেঁচে গেছেন। ওঁর বাচ্চাকাচ্চা হলেও বাঁচবে না। কী যেন দোষ আছে ওঁর রক্তে। বেনারস ডেলেন্ডেলেই ফিরে যেতে-ছিলেন। উনি জানতেন না। এখন আস্তে..এ জেনেছেন। সজনী যে কী অবলম্বন আমরা বুঝতে পারবো না। আন্দাজ করি এ জনেই যে, মনে মনে থাকা। কখন কী হয়। চিন্তা প্রভুর এ জঙ্গলে। আর ওদের মতন হিংস্র নিষ্ঠুর পশু ভয়ংকরতে আর দ্বিতীয় নেই। গেরস্তের বাড়ির প্রতি ওদের ভীষণ টান। ওদের বাদুরেটা ছানাগুলো হাল খুবাঁচাটা—'

—'আর বলবেন না ঠাকুরপো।' হিমানী শিউরে ওঠে। ও কেন চিতল গাঁড়-চাপা সজনীকে দেখতে পেয়েছে তৎক্ষণাৎ।

—'বলা তো যায় না, কিসের করে এই জঙ্গলের রাজারে। উনি একা থাকেন। সজনী কোথায় যেতে না যেতে।'

—'আমি বুঝতে পারিনি ঠাকুরপো। অনেক কিছুই বুঝতে পারি না আমি। কিছু মনে করবেন না।'

—'বেশ তো! কী আপদ মনে করবো?...দেখুন দেখুন, রাজা কেমন একা একা হাঁটছে। আমরা যে সঙ্গে আছি ওর হুঁছতো মনেও নেই।'

—'উনি ঐ রকমই। মাঝে মাঝে কী যেন হয়। ওঁকেও আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কখনো-সখনো। ভয় হয়।'

—'অমন—'

—'অমন কী হিমানী?'

কণ্ঠস্বর কি বুঝেই গাঢ় হয়ে যায় অকস্মাৎ। হিমানী আবার চমকায়।

নিশ্চয় নয়, তা হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না। কান ভুল শুনেছে তার। মন ভালো নেই বলে—

চমকেই হেসে ফেলে। অমলিন হাসি। ঘুঘলও হাসে। তারপরই দুজনে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে, রাজা, রাজা?

প্রতিধ্বনিতে চতুর্দিক ভরে যায়। 'বাঁচাও' শব্দটা কে জুড়ে দিয়েছে। কোথাও কারুর যেন সন্দেহ বিলয়। তাকিয়ে দেখি আলো-ছায়ার খোপে খোপে পা দিয়ে, ডিঙিয়ে, উঁচো-পাচা ঝোড় দিতে দিতে আসছে হিমানী আর ঘুঘল। একজন কেন আসছে? ভয় পেয়েছে? ওদের দুজনেই কেমন যেন উত্তেজিত। হাঁফাচ্ছে।

—'কী হয়েছে তোমাদের?'

—'কিছু না।'

হিমানী বাপসড়া গলায় হঠাৎ বলে ওঠে, 'ওদিকে কী যেন, কেমন যেন, একটা কী, দেখলাম!...হ্যাঁ দুজনেই দেখলাম। এক সঙ্গে দুজনেই দেখলাম।'

তারপর হঠাৎই আমার কাঁধ ঝাঁকিয়ে কান্না। বুকের মধ্যে কম্পমান মুখ। 'তুমি কেন আমায় ছেড়ে একা একা—জানো তো একা থাকলেই ভয় করে আমার—'

হিমানীর মাথায় হাত দিলাম। কী পাগলের মতন করছো। জঙ্গলে অমন অনেক জিনিস দেখা যায়—সোনা যায়। কাছে গিয়ে দেখলে দেখতে কিছু না, সামান্য। মনের ভুল।'

—'কাঁহি সামান্য নয়। কাঁহি—'

—'ঠিক আছে, চলো। ঘুঘল, চলো বাড়ি ফিরি। এখন আর বাজো ভালো ভাবনা লাগবে না।'

—'চলুন।'

## ॥ দ্বিতীয় অঙ্কটা ॥

ভেতর-বাইরে ঘুটোই কেমন চমকল করছে। গলির মোড়ে মোড়ে কুত্তা ডাকছে। অদ্ভুত একটা খস্‌খস্ আওয়াজ হচ্ছে কোথায়। আকাশে আকাশ থেকে তারা খসে পড়লো। মুলীর ঘুটো বেড়া ভেঙে করে টেমির আলো পড়ছে গলির খোলা নর্দমার ধারে। কে যেন জামিতির কী একটা চেঁচিয়ে কণ্ঠস্থ করছে কাছাকাছি বাড়িতে। কুয়ো থেকে জল তুলছে কেউ। সুপুরিগাছের মাথায় হাওয়া। অড়ো রাস্তায় ট্রাকের টায়ার ফাটলো। কারেন্টারা বাড়িয়ে যুনো জানোয়ার তাড়াচ্ছে কাছাকাছি চা বাগানে। ওরাও কুলি বাওড়ার অন্ধকার জঙ্গলে কাঠি পড়ছে। কখিন সুদ্ধ পাখিরা কোথায় চলে গেলো।

ঘুঘলদের বাড়ির সবাই ঘুমন্ত। এই সন্ধেবেলায়! বাড়ির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না, ঘুঘল ফিরেছে। না ফিরলেও ক্ষতি নেই। ওর মর্কট ভাইটাকে দেখলেও হয়। মর্কট কেন। ও তো ভালো, বেশ ভালো। হঠাৎ মর্কট হয়ে যাবে কেন? দোষ কী তার? কিছু না। বরং যাবার সময় কিছুতেই ছাড়বে না। দরজার ঘুটো বাটিকুল হাতে বাড়ির ঘরে ঘরে খুঁজছিলো। দাদা নেই তো আমি কী করতে আছি। না ছেড়ে যাবেন না। ঘুটো মুখে ফিরে যান। না খেয়ে-দেয়ে চলে গেলেন শুনলে দাদা কিন্তু আমায় আস্ত রাখবে না।' ওর বউ, যে খুব বাচ্চা ফিরেছেই ব্যস্ত, সে সুদ্ধ নেমে এসে বলেছিলো, 'মাথা খান রাজাদা, এমনি করে যেতে পারবেন না।'

মাথা খাইনি। ভাতও খাইনি। ঘুঘলের ভাইকে ঘুঘলের মায়ের ঘরে নিয়ে বললুম, 'আজ ছেড়ো লাগবে এখন। অনেকদিন ভাত খাইনি। খেতে ভুলে গেছি।'

মর্কট হাসে। ভাইয়েই মর্কট হয়ে গেলো। বললো, 'এখন কী আর যোগাড় হয়েছে? বিকেলে খাওয়াবো-খন।'

—'তা হলে বিকেলেই আসবোখন। ঐ কথাই রইলো।'

—'কোথায় কী রান্নাবান্না। এভাবে ফেলে ছুটে করে ঘরে যাবেন একদিন। দাদাও তো যায়—'

তোমার দাদা পিপড়ে টিপে মেরেছে কেম্পন মনে খায়, ঐভাবে। না, বলিনি। বলেছিলাম, দরজার জানলা খুলেছেই তো এদিকে আসা। আকাশ যেখানে অনেকটা নিচু হয়ে এসেছে —সে রকম একটা পাহাড়ে ঘুরে

শুয়ে থাকবো। শুনেছি, খুব সস্তায় পাহাড় ঘিরছে এখিনে। এই পঞ্চাশ-ষাটেই হয়ে যাবে। বাকি টাকায় এটা থাকবো। সারা জীবনই তো ভাড়ে খেলাম। ভাড়ে হলোটা কী? এবার যা খাবো—ভাই পাঠাবো মনজার, সিরাজ সিরাজ নবীর মতন বইবে। সমুদ্রে যাবে না। সে পথ বন্ধ। বুঝলে? কী বুঝলে—তালমাত?'

বুদ্ধদের ভাইয়ের চোখ দুটো ভাঁটার মতন। শুনে, ভাঁটা ফাঁকার জোরদার। কথা না বাড়িয়ে অঙ্গুল দিয়ে দেখালাম, এসো। পা চালালাম। আগে ভাল, পিছে বাম। না মারছ।

চলেলাম। পিছনে দা পড়ে রইলো—কাঠের বাড়ি, বারান্দার মুখোশ, খড়-বাবরের মূর্তি, খড়খাড়ুর, ঝাউঝুড়ো সবার জন্যে হাত বিলাম। আমি। যাই বলতে নেই, তাই। তোমরা পিকের বসে পোড়ো জীবন পান সুপুরি চিবোও। আমি যাই। যাওন নাই, বলো আসি।

বুদ্ধদের ভাই বললো, 'রাস্তা তো একটাই। একদম এ-পাশ ও-পাশ করবেন না। নাক ধরাবর চলে যাবেন।'

—'জানি। জানি বলেই তো এসেছি এখানে। এ-পাশ ও-পাশ করবো না বলেই এসেছি।'

—'যাবেন যাবেন? যেতে পারেন চোরুবাচি পর্যন্ত। তারপর অবশ্য—'

—'একটা টার্ন করে যাও। তোমাদের ভাষার কথা বলে ঠিক ঠাক করে যাও। আমার কথা বুঝবে না—আমিও বোঝাতে যাবো না। নিজেকে বোঝাতেই আমার জন্ম শেষ। বুঝলে? কী বুঝলে—তালমাত?'

বুদ্ধদের ভাই মাথা নড়লো।

পরে এক ফাঁকে সাহেবকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'ইনি কে জানো? এঁর সঙ্গে তো পরিচয় হলো না?'

—'ইনি কে তা তো আমিই সঠিক জানি না। তবে, আমার সঙ্গে আছেন। থাকবেন। এঁর সঙ্গে পরিচয় হবার নয়। কারো হয়নি। এঁর নাম একটা আছে। বেশ ভারি ভর্তি নাম। সরলমুরার হিমেম বইতলা। আমি ডাকি সাহেব বলে। ওতেই উনি সাড়া দেন। সাড়া যদি কখার নয়। কাজে। তাহলে টার্ন—'

—'আজ্ঞে — আপনারা এখানে দাঁড়ান, আমি কথাবার্তা করে নিয়ে আসছি।'

—'আমরা, দাঁড়াবো?'

—'দাঁড়ান।'

—'তুমি দাঁড়াতে বলছো?'

—'তা হলে ঐ বেঞ্চিটায় বসুন।'

—'তুমি বলছোও বলছো? আমরা যে একটু শুতে চাই।'

—'শুতে? আজ্ঞে—' হেসে ফেললো বুদ্ধদের ভাই। ভাঁথান বুঝল নেই। ও আমাদের কী ভাবে নিজে কে জানে? 'এ তো বেশ স্বচ্ছন্দে নিচ্ছে। তাহলে, শুই?'

—'শোবেন?'

—'কেন তোমরা শোও না?'

—'শোবো না কেন? তবে, যখন তখন, যেখানে সেখানে—তা ছাড়া, দাদা যেন নাকডাকা লোক। শুনেছি বলেন, ওরা শুতে চাইলে আর তুই শুতে দিলি? আমার হয়েছে উভয় সংকট। একদিকে দাদার স্নেহশিক্ষ, অন্যদিকে আপনারা শুতে চাইছেন। বাড়িতে চলুন না, সোফার জন্যে ভবল খাট আছে।'

—'কাঠের বাড়ি আছে—এই সব তো জানবে? তা তো জানি হে, আছে। আমরা একটু, বাড়ির বাইরেই শুতে চাই। সেই যখন শুতেই হবে—'

ছাঁটাই ছটকিটির ওটা বুদ্ধদের ভাই, বুঝেছে বুঝেছে—ওরা এক জায়গায় বাড়িয়ে ছোট ছোট লাফ দিতে থাকে। পরমুহূর্তে ওকো লাফ দিয়ে বলে, 'বলুন, আমাকি। একটার হবে?'

—'হোক। কিন্তু, বলুন আনতে যাচ্ছো কেন। বলুন কে চায়?'

—'এ বলুন সে বলুন না।' এক-পাল হেসে বলে, 'মানে খামুন আর কি। দোকান খুলে দেবে।'

বুদ্ধদের ভাই চৌকিদুই, একটা ওকো নিয়ে যেন সিংহাসনে বসে উঠে আসছে, সেই ভাবে এসে বললো, 'বুঝিয়ে বলেছি — পঞ্চাশ দিতে লাগবে। ফেরত পঞ্চাশেনজার মিলবে পোর্টাসে ফিরে দেবেন।'

সাহেব বড়ো একটা দেখে ফিক-ফিকিয়ে হাসতে থাকে আর লজ্জা পায়।

—'হাসে যে!'

—'হাসে। কাঁদে না। ঐ বড়ো দেখে একমাত্রই হাসে। ওর কাবুকুবু লাগে ছিকে। তেষ্টা পায় আর কি।'

সাহেব হাত বাড়ালো।

—'দিয়ে যাও। ও হাতে রাখতে ভালোবাসে। একটু একটু ঐটার পা চাইবে এখন। তোমার চলবে নাকি একটু—'

—'আমার?' বলেই জিভ কাটে। 'কী যে বলেন! আপনারা দাদার মেহমান।'

—'তাতে কী হয়েছে। একটু, পেলাস করে যাও। যখন কিনেই দিলে।'

—'আমি? আমি তো কিনিনি। দাদার নামে হাতিয়ে নিয়েছি। দাদা তো নাকডাকা—'

একটু বলে অল্পক্ষণ দিলদরিয়া সাহেবো ওর হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলো হঠাৎ। 'ইয়ে ইয়ে' বলে একটা আওয়াজ বের করলো শরীরের ভেতর থেকে। আর বুদ্ধদের ভাই ঢো—ঢোঁ।

চৌকি চলতে শুরু করলো একটা জন্তুর কায়দায় ঝিয়ে। দু দুবার চলকে পড়লো ওকো একটা থেকে। ওটা তখন খুশী ছোই হয়ে এসেছে। বুদ্ধদের দু চোকে সুতো পার। সাহেবো হুড়ে হুড়ে পঁচিশ ওপর ফেললো। জন-জন ভাঙলুর। লম্বাটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভালের গন্ধে বসে।

পাইলট বললো, 'এই হাঁলি আপনার হাবভাও আইচ করা।'

কথা কিছু বলে না। কখনো চোখে একবারের গায়পালা, চা বাগান দেখে ফেতে থাকে। বুঝতে পারি, মেজাজ ঠিক। এখন না ঘাঁটানোই ভালো। আমিও প্রকৃতির প্রতি চোখ বুলিয়ে চেলে হেলে পড়েই। প্রকৃতির প্রতি আমাদের কর্তব্যের অন্ত শেষ নেই।

চৌকি ঘাসের শেষ বর্ডার চোরুবাচি পর্যন্ত পৌঁছুলো। জায়গাটা কমলা-লেবুর হাটের জন্যে বিখ্যাত। আশুং আর দোকানে দোকানে ছয়লাপ। পথের দুপাশের নাম্বা উঁচোনজাতো অঙ্গল দুটো জুড়ে কাঁচির চার ঠেকুনোর মাথার চটের বস্তা খুলে ফেলা। নিচে হকেরেরা' ঝাবার সাজানো। কতকগুলো দেখতে ঘুটের মতন। কতক আবার 'চালতাসির মতন নয়। মিষ্টান্ন বলতে চোকোপানা ক্ষীর। চমরীগাই-এর দুধ দিয়ে বানানো। নাকের কাছে তুললে অম-হোলদের ভাত উঠে আসে। বোটকা গন্ধ। বোটকা বাস রাস্তা খোল অব-ধিতে দুধ ফুটানীর গায়েও। অবশ্যই পোলাকে সরল লোকগুলো কোথাও উদু হয়ে বসে, কোথাও পোলা হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। আড়তে টেন করা হচ্ছে পঞ্চাশ। তার পাশে শিফনে কুপড়ি দিয়ে নারীপুরুষের দল। কারো পিঠে কাপড়ের দোলনায় ফুলফুলে শিশু। চোখে পিচুটি। পাল-দুটো জড়ে ফেটে পড়তে যাচ্ছে।

বাদুল শীত। বাতাসে আকাশ। হিশহিশ করে বইছে জোরালো বাতাস। বছরের প্রায় সব সময় এক-টানা এই রেজার বাতাস থাকে। সামনেই নীল পাহাড়। ফুটান পাহাড়। তার কোলেই ডায়না নদী। কথায় সেই ডায়নার ডাকে ভরপুর হয়ে থাকে সমস্ত ফুটানের আকাশ বাতাস। হাওয়া গা ফেটে বসে। চকচক করে শিল পড়ে আকলা ইটের মতো। আঁটি চোখে পড়ে না কিছুক্ষণ। ফেটো সার্দির মতো ঘাড় বন্ধকে ঢেকে যায়। সে সময় বাইরে থাকলেই ভিলের ঘরে যাবেন। মাথার পড়লে মাথা ফেটে চৌচির। বৃষ্টি পড়লেই শিল পড়ে এখানে। সে একটা দেখার মতো দৃশ্য, শোনার মতো অভিজ্ঞতা।

•

আমাদের চৌকি চলেছে এঁকে-বেঁকে, ঘাঁর চক্র। রাস্তা খারাপ। ঘুরে ঘুরে উঠতে হবে। ভেঙে ভেঙে। কদাচিৎ পাস হলেই চেক পোস্ট। পাইলট বললো, 'ফিরে যাবে।' বলে উঠে দাঁড়ালো। নম্বর লেখা হলো খাতায় খসখস করে। ফতবাও। চলেছে গাড়ি।

বুদ্ধদেব শর্মিকেত। বাড়ছলো দেখতে অনেকটা হলুদ গায়ের মতন। বাদকেট আছে। পাহাড় কেটে জুম চাষ চলছে পুরোদমে। কেটে কেটে গাছ। ওগুলো কী? জোয়ার গম জাতীয়। মেয়েগুলো যেন মাথায় ঠেকেছে, একটাই তাদের ইচ্ছে। এতো নিচ দিয়ে মেঘ ছুটে যায়? কনকনিয়ে ওঠে হাতপায়ের আঙুলের গাঁট। মুখে হাত বুলিয়ে মনে হচ্ছে নাকখান কিছুই নেই। খসখসে। ফেটেফুটে একাকার। ওরা কমলা ঘোলার রস ছিপে মুখে হাতে মাখে। আমরাও তাই করতে থাকলাম।

নীল পাহাড়টা এগিয়ে আসছে। কেমন বোঝা যায় মেঘে খসখসে চেহারা তার। বতদূর চোখ যায়—পাহাড় আর পাহাড়। আকাশের একটা সীমা পর্যন্ত পরদার মতন করে তুলেছে।

পেটো বাসস্টেন্ড ছিড়ছে শীলা খুলো। কারে সুরে কেনারি। পাহাড় কেটে ঠুকে চালান হয়ে যাচ্ছে খণ্ডগুলো। ডাইনামাইট ফেটে থেকে বোলডার চালান হচ্ছে। কোথায় কেন লুটে চলেছে মানুষ। কমলার ঝুড়ি পিঠে নামছে সারবন্দী পাহাড়ী। চোরুবাচি হাটে যাবে। অমজমের গাড়ি যুকে হেডে উঠছে হো উঠছেই। নিচে গভীর খাদ। ডায়নার খাঁ খাঁ করা বুক দেখা যাচ্ছে। পালা যুলো এখন আর নেই। ওটুকু সো আসর লাস্ত—তাই বুদ্ধের মেঘ ওখনে ওড়ে। একখানা পথ সরু, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। বাঁক বিস্তর। এখানে ওখানে সুন্দর সব খেলনা বাড়ি। গাড়িটা হঠাৎ একটা বিশাল চাতালে এসে ঘেরে ফেলো।

—'এটা কথা সার্দিভাজার নামবেন নাকি?'

নামা যায়। বাজার যানে সাঁতাই বেশ বড়ো ব্যাপার। মাঝখানে টানা দু দুটো আটচালা। চতুর্দিকে বাঁধানো দোকান। সব কিছু পাওয়া যায়। রেডিওর গান বাজছে। সেলুনে আছে। খাবারের দোকান ছাড় মাংস মুটি। মাছ নেই। একটা দোকানে ফুটবল ঝুলছে। সাংঘাতিক। পাহাড়ে ফুটবল খেলে কারা?

হঠাৎই তার কথা মনে পড়লো। কার কথা? সে—তার কথা। নামটা মনে নেই। মনে আছে। মনে ছিলো। চীৎকারে উঠে, সাহেবকে ছেড়ে ট্রেনে পাইলটকে বলি, 'চলেন'।

—'কোথায়?'

আঙুল পথের দিকে। অর্থাৎ কেরা। টেনশিলনা হতেছন। ছিনেমির হাত ধরে না ধরে। মনে মনে' —'মনে' করে। কী যেন আওড়াই। ঠাহর পাই না।

আবার আঙুল তুলে দেখাই। ওর পিঠে খোঁচা দিই। হোঁর কাঁকুনি দিয়ে চলতে থাকে। কাঁকুনিটা ইচ্ছা না অনিচ্ছা—বোঝার আগেই ভেতর করে নামে গাড়ি। কাঠের সেই সরু ফেটের সামনে গাড়িয়ে কী যেন বলি। ও জোরে করে। জোরে মনে হাত যোড় করে হাটি, মুড়ে বসা। আবার ওঠা। আবার বসা। তিনবার।

আমি ইলোরার সুবোধ, সাহেব আছেন?'

ও কী বেঁচে আছি না। ঘোড়ে এক ছুটে ভেতরে পালায়।

আর আসে না। সন্ধ্যে চোখিতে হাসে বসে। বসে বসে বিমোয়। ওর জিভ চুলকোচ্ছে হয়তো। টেবিলক্লথ নিয়ে ওপর আলোয়। সুবে চোখ ফেলে রেখেছে আমার ওপর।

টিলার ওপর ঐ একটিই বাগান-ঘেরা বাড়ি। বিশাল বাড়ি, সামনে বাগান। বাগানে ফুল ফুটে ছেয়ে আছে। ঘোলাপ। আমি ঐ সবুজ ঘন ঘেটের ওপর সুখানা হাত রেখে স্থির।

মাথার ঠিক ওপর দিয়ে কখানা মেঘ উড়ে গেলো। পাইনগাছের ভেতর দিয়ে কেয়ো হাওয়ার শব্দ উঠছে। একটি ইউক্যালিপটাস বাগানের ভেতর একা দাঁড়িয়ে।

একটি নারীর ছায়া পড়ে মেঘে আলোয় এগিয়ে। পিছনে সেই রক্ষী। মেয়েটির পরনে ও বিছা সুখে এই পরিবেশের সঙ্গে বিশেষভাবে মেলানো।

—'কাকে চাই? কোথা থেকে আসছেন?' শান্ত সুন্দর উচ্চারণ। মেয়েটি ইংরিজিতে বলে। একটা কালো ওড়না দিয়ে মাথা বুক ঢাকা।

আমি জিগ্যেস করি, 'মি. সি. আছেন?'

—'না, তিনি নেই আর।'

—'মানে?'

মেয়েটি করুণ হেসে, মাটির দিকে আঙুল দেখায়। মুখটি ঢেকে ফেলে।

আমি বিশ্বাস করতে পারি না। মাথাটা নিচু হয়ে আসে। আরো জোরে হাওয়া দিচ্ছে যেন। সারা শরীর কেঁপে ওঠে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ে তখন।

—'আজ তিন দিন হলো হঠাৎ উনি—' আর বলতে পারলো না—'দুঃখিত, আমার মাপ করবেন।'

ওরা ছিলো কার্সালিক। আগে সুইটজারল্যান্ড যখন সারাক্ষণ আপিসে ছিলেন, দু তিনবার এসেছিলাম। তখনই আলাপ। ক দিনেই বন্ধুত্ব গভীর হয়ে ওঠে। উনিও কবিতা লিখতেন। ছবি আঁকতেন। গার্হস্থ্যবিজ্ঞানে পড়াশুনো করেছেন। বোনকেও পড়িয়েছেন। নাম রেখেছিলেন এলোরা। কুলের সঙ্গে মিলিয়ে নাম। তখন এলেন বিদেশী।

—'আমায় চিনতে পারছো?'

আস্তে মাথা নাড়ে সে।

বলতে পারতাম, তাহলে? বলিনি, 'আমি হঠাৎ এসেছি। এমন খবর শোনার জন্যে মোটেই তৈরি ছিলাম না। আমার দুর্ভাগ্য।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিলো।

—'ভেতরে আসবেন না?'

—'আজ থাক, এখন থাক—বিশ্বাস হচ্ছে না। অমন একটা টাটকা তাজা প্রাণ হঠাৎ কী করে—'

এলেন বললো, 'আসবেন না?' তার গলায় সুন্দর কান্না আছে জমাট হয়ে। বলতে ও ভীষণ ভালোবাসতো।

—'আমিও তাহলে নয় এলেন। চেষ্টা করবো আসতে।' এখন একা থাকাটা বড় দরকার।

—'ঠিকানা কোথায়? সুবোধ তো নেই এখন।'

—'ছেড়ে যাবো। তুমি ভেবো না।'

—'ভাবছি। বাড়ি এতো ওলেট-পালোট। আপনার কষ্ট হলো খুব। হঠাৎ কী করে এলেন?'

—'জানি না। হয়তো আমার দরকার ছিলো। ও-ই আমায় টেনে এনেছে ভিসু, কে বলবে!'

—'হয়ে পরে। দাদা আপনাকে খুব প্রীতি করতো। ভালোবাসতো।'

এলেন আমার মুখের দিকে তাকায়। ঝড়ে ওর চুলের গুচ্ছ উড়ছে। চোখ কোলা কোলা। জলের দাগ চিলুকে।

—'আপনি আমার খুশি হয়েছি—সাঁতাই—কিন্তু—'

—'কিছু ভেবো না। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। তুমি ভালো থেকো।'

—'হ্যাঁ, আমি তো ভালোই আছি। ভালো নেই?' বলে, আর সহ্য করতে পারলো না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

কন্যা অতো সুন্দর। ঐ নীল পাহাড়ের মতন সুন্দর। ইউক্যালিপটাসের পাতার ফিস ফাস নড়ার মতো সুন্দর। ঘোলাপের ফুটে থাকার মতো সুন্দর। আর? আর কিছু নেই। এমনভাবে সুন্দর যেন এক্সেলিয়াই কাঁদতে পারে।

—'আমি যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি—হয়তো আসবো—'

ও অস্ফুট মাথা নাড়ে। অস্ফুটে গলায় বলে, 'সেপ্টেম্বর যদি আসতে পারেন।'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো ও ঘেটের পাশটায়। চোখ বুজে। ভেতরে ভরে খুঁজছে যেন। কিছু স্মৃতি, রুমালের আলো, উজ্জ্বল দিন। যার কোনোটাই খুঁজে পাবার নয়। বিশেষত এখন, যখন মেঘে আকাশ ভরে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়া ঝাঁপে জোর। ভাঙনায় বুকে জল নেই। খাঁ খাঁ করছে। হাওয়া খেলছে বৃষ্টি পাথর নিয়ে, একা একা।

•

প্রথমবার সুরো ছিলেন একা। আমিও একা। একদিন জলপাইগুড়ি থেকে চিঠি লিখলাম সুরোকে। 'আমি এখনে রঞ্জিত অধ্যাপকের বাড়ি আছি। ঠিকানা অমুক। আছি, যেন কিছুদিনই আছি। আপনি বলেছিলেন, চিঠি দিয়ে জানাতে, তাই জানালাম। এখন ব্যবস্থা আপনার।'

রঞ্জিত চিঠি ডাকে না দিয়ে চন্দ্রাবতীর হাত ছাইজারের হাতে দিয়ে দিলো। কলেজ ঘণ্টার মধ্যেই যা সুরোর হাতে পৌঁছুবে। ঐ যার মালিক রঞ্জিতের নৈশ বিহারের হার। চিঠি প্রায় অপেক্ষায় পৌঁছেছিলো। কেননা পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু শুয়ে নেয় নাড়াচ্ছি, রঞ্জিতের নাম ধরে কে ডাক দিলো বাইরে। একটু অবাক হোলকারি একটা গাড়ি থামার আওয়াজও শুনে থাকবো।

রঞ্জিত নেই। ওর বাড়ির কেউ নেই। বড় কলেজে পড়তে গেছে, ছেলে-মেয়েও ইস্কুলে। আমি একা। এই একা থাকার কয়েক ঘণ্টা আমায় নেশার মতন পেয়ে বসেছিলো কেমন। ভারি ভালো লাগতো। রঞ্জিত চাইতো ঐ সময়টায় আমি সম্ব্যবহার করি। অর্থাৎ লিখি। প্রতিদিনই ও বাবার মতন বলে যেতো, 'আজ কিন্তু ফিরেই তোর কিছু লেখা শুনতে চাই। একটু বিশ্রাম করবি, একটু-আধটু লিখবিও তো। লেখা শোনাতে পারলে আজ বেরুবো।'

কোথায়? তা সবাই জানে। রিয়র ধরে সোজা সৈলাবার বাড়ি। সেখান থেকে চা খেয়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খানিকটা আড্ডা মেরে, সোজা পুলিশ লাইন। দিঘির ধারে। দিঘি মানে সবার দিঘি। ঘাটের ব্যবস্থা। সুন্দর মৌরীর গন্ধ তাতে। কোনোদিন ওখানে খাওয়া, কোনোদিন নিয়ে এসে বাড়িতে বসে।

রঞ্জিতের বাসাটা ভারি সুন্দর। সামনে একটিলতে বারান্দা, তার লাগোয়া বাসরাম। তাতে চাটাইয়ের বেড়া। ভেতরে ছুটো ঘর। বারান্দার একপাশে ছোট পড়ার ঘর। কাঠ দিয়ে বানানো। ওর লেখাপড়ার টেবিল। এক আলমারি বই পত্রিকা। একটা আরাম বেদারা। ছুটো একটা টুল, ছেলের চেয়ার বারান্দায়। ঘরে ঘরে ঢোকে। ওর খুশবাস ঘরের আসবাবে কাঠের পার্টিশন। ওরের খাট নেই। আমার ক্যাম্পখাট যে ঘরে পাতা, শুলে আমি তার খোলে চলে যাই। ওকে বলে তার নিচে ঠেকনো হিসেবে একটা কাঠের টুল চুকিয়ে দিয়েছি। যদি ছিড়ে খুড়ে যায়, একটু আটকাতে পারে।

ঐ ঘরেই খাওয়া-দাওয়া। ওর বউ চন্দ্রার আঁক কষার টেবিল। ঘরের পেছনে রান্নাঘর, স্নানঘর। তার পাশে কুয়ো তলা। অনেক নারকোল সুপুরি গাছ, কাঁঠাল গাছ। পাশ ডাঙার মাল ফলেছে। তার ছায়াটা ভেতরে, ওতোটার তিন তলা জুড়ে। মোটা মান।

রাত্রিবেলা ঘরে রাজনীতি করতেন। এখন অবশ্য। অধ্যাপিত। ভাইবোনের, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত রঞ্জিতের বারান্দার ঠিক মাঝের ওপরকার কারুকার্য কোল ঘেঁষে তিনি বসেন। জলাপাড়ী সহকর্মীরা আসেন। গল্প-গুজবে দিন কাটে।

ঐ চাওয়া থেকে তিনি সবই লক্ষ করেন। কিছু বলেন না। সামনের আলু বাগানের দিকে চেয়ে থাকেন। পথে পরিচিত কেউ গেলে চিৎকার করে আলাপ করেন। ওঁকে এড়িয়ে কারুর যাবার উপায় নেই। উনি চাওয়ার ওপর কারুর পড়লে, যখন কেউ না থাকে। দিব্যনিদ্রা বরদাবাবা। তারপরই ওয়াক ওয়াক থু। তার টানের রোগ আছে। হাজারটা রকমারি শিকদানি আছে। তাতে করেন ফেলেন। রঞ্জিতের মাঝেমধ্যে তাঁকে শান্ত শান্ত করে। এক কোরা কাঁঠালও কোনোদিন হাতে পারেনি। উনি সব বাজারে পাঠান। তাতে বেশ ভালো মেলে। চরমের চাল। আলুও চমৎকার। সরকারি সেবকদল পান একটা। রঞ্জিতদের কাছে তাড়াও খুব একটা কম পান না। তবু, তিনি ঐ রকমই। রঞ্জিত দাদা দাদা করে। পরে বলে 'দাদা কিন্তু খুড়ো।' আমি এতো-বার দেখি, এতোকাল ছেকেছি, আমার সঙ্গে বাক্যালাপ নেই। আমার দাদাও বলতে হয়নি, শালাও না। আমার একটু আধটু ভয় ওঁর 'ওয়াক-থু'র জন্যে। হয়তো সামনের বাসরাটে অন্যমনস্ক। মনে হলো, উনি ওয়াক করলেন। আমিও ঘোড়ে কুমীরডাঙা। সুন্দর এইটুকুই আলার দিকে। তাও ছুটতে যখন পারি তখন তো ছুকেই ফেলো কয়াউ।

চন্দ্রা খুব ভালো। রঞ্জিতও ভালো। চন্দ্রার বাবা ছিলেন ডাকসাইটে মাতাল। সুতরাং ওর ভয় নেই। ওর ভয় যেখানে সেখানে আমাদের রঞ্জিত কিঞ্চিৎ দুর্বল। চন্দ্রা সবই জানে। মুখ বুজে সহ্য করে। ওর মতন সহ্য করতে আমি খুব কম মেয়েকে দেখেছি। চন্দ্রা আমাকে রাজাবাবু বলে। কেন বলে? কিছু একটা তো বলতেই হবে। বাবু শব্দটা আমার নিতান্ত অপ্রীতিকর মনে হয়। কিন্তু চন্দ্রা যখন বলে, তখন ভালো লাগে। ঐ ভালোলাগাটুকুর শিহরনে আমিও একটু দুর্বল। কোনো কারণ নেই। সব কারুর কারণ হয় না। যারা বলে, তারা বানিয়ে বলে। না জেনেশুনে বলে, সব কারুর পেছনে কারণ আছে। অসম্ভব!

রঞ্জিত আমায় ভালোবাসে। আমি ওকে ভালোবাসি না। আমার মতো ভালোবাসাটা একটু কম। কিন্তু ভালো লাগে, কিছু লয়সে না। এ জন্যেই চলে যাব তো ভেবেছিলাম। অসম্ভব হয় না।

সুরেশদের সাজেস আপিসের গাড়ি ইস্তাক দুবার জলপাইগুড়ি শহরে এসে-ছিলাম। মাঝেও ওঁর মুখে শুনে-ছিলাম। আমি তো সামনে দেখলাম। উনি লোক মারফত লিখে পাঠিয়েছেন, ফিরলে আমার গাড়ি শহর যাবে। তুমি তৈরি থেকো। তোমার তুলে নেবে। অসুবিধে নেই। আর তুমি যেখানে উঠেছো তিনিও যদি কয়েক ছুটি পান। তাঁকেও আমার সঙ্গে নেবস্থা জানিও। সঙ্গে নিয়ে এসো।

আমি একা আছি। বিছানাপত্তর অবশ্যই। শীত এখানে খুব। শীতের জামা-কাপড় একটু বেশি করে সঙ্গে নিও। আর কিছু লাগবে না। সঙ্গে কিছু কাজকর্ম। কলম দিতে পারবো না। ওটি সঙ্গে থাকা চাই। আমাদের এখানে, এই নির্বাসনে তোমার জন্যে অনেকেই সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। তাঁরা তোমার নামে চেনেন, এখন চোখে দেখার অপেক্ষা। এলো কিন্তু, আমায় ভিড় করো না। তোমাদের থেকে না হয় আমার বয়েস বছর কিনেক বেশি। সুতরাং—ভালোবাসা।

পত্রবাহককে বলে দিলাম। 'নিশ্চয়, তৈরি থাকবো। আপনি আসবেন। ঠান্ডা কেমন?'

—'চমৎকার।'

মানে, গরম জল খাওয়া, আগুনে জ্বালিয়ে বসা—সব তর্জমা করাই করতে হবে।

—'যদি পারেন, একটা অলস্টার নেবেন। গরম মোজা, মাথার টুপি, হাতে দস্তানা।'

—'আর কী রইলো?' বলে হেসে।

উনিও হাসতে হাসতে গাড়ির দিকে এগিয়ে যান।

দেখা যাক, কী অপেক্ষা করে আছে। এখন রঞ্জিতকে পাঠাতে পারলেই সুবিধে। সন্দী হিসেবে খুব ভালো ও। আলুকে।

আমার সামনে চুঁকিচুঁকি টেবিলের এক পাশে জড়ো করে রাখি। তারপর বেতের চেয়ার টেনে বারান্দায়।

তখন আমার নজরের গা ঘেঁষে 'রিপোর্টার এাট লারজ' এই বিচিত্র ভাষাটি বেড়ালছানার মতন কলরো। আমি ডার্জিলিং সিকিম ঘুরে সমতলে নেমেছিলাম। জলপাইগুড়ি আর শেষে ক্যান্টনমেন্টে ছিলামও কিছুদিন করে। উপেনদা ক্যান্টনমেন্টে দিন যাপন সম্পর্কে চুঁকিচুঁকি লেখা। তা ছেপেওছে হপ্তাদুয়েক। দু তিন কিস্তি ছাপাও হয়ে গেছে। মরুভূমি ফুলের বিষয়ে লিখেছি, অর্কিড বিষয়ে লিখেছি, লিখেছি নোনা-ফটকির ওপর, ভুটিয়া বস্তির এক আর্টিস্ট নিয়ে, চৌকিদার সম্পর্কে—অর্থাৎ যা যা আমার আকর্ষণ চায়, সব কিছুই কভার করেছি।

ছিলাম, আমার এক বড়োমাপের বন্ধু ছিলেন ক্যান্টনমেন্টে অফিসার—তাঁর বাদৌলতে।

আসল কাজ খুব বেশি নেই। একটা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে বিশেষ থাকবো। ঠিক চাকরি নয়। ও আমায় দেবেও না। স্পেশাল এ্যাসাইনমেন্ট। ওঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কয়েকটা ঠিকানাও দিয়ে এসেছিলেন—আত্মীয়ের মতন। যে যে সময় সেই সেই জায়গায় টাকা চলে যাবে। আমার ঘোরাফেরায় অসুবিধে হবে না। এক জায়গায় বেশি পাঠাবো আমার নিজের জন্যে পড়ে না। বিভিন্ন ঘাঁটিতে ঘুরতে চাই। কাজও সেইভাবে হয়েছিলো। ডার্জিলিং ঘাঁটিতে বড়ি পেতে আমি সবচেয়ে পড়িয়ে নামি। এর আগেই গ্যাংটক কালিম্পঙ ঘুরে এসেছি দু তিন দিনের জন্যে। এখন নিচে নামা।

ব্যাঙ্গালোর অফিস্ড আর চুঁকিচুঁকি নিয়ে সোজা জলপাইগুড়ি। রঞ্জিতের বাসায় কখনো আসিনি। ওর অফিসের ঠিকানা জানতাম। ডার্জিলিং থেকে ওকে একটা চিঠি ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। ওপর থেকে নিচে। নিশ্চয় সোজা গেছে ঘাটিতে পড়েছে। রঞ্জিতের পাত্তার কারে, যখন ক্লাস নিতে যাবার আগে ও দু একটা পাতার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলো, তখন। যে ভাবে সাইকেল পিওন কাজ ছেড়ে, কিংবা ঠেকান করে চেয়ের পড়ে উদ্ধৃত আয়নোলা। ঠিক সেইভাবে। রঞ্জিত চমকে ওঠে। তারপর চিৎকার করে স্যারে জানতে থাকে।

—'শুনেছো চন্দ্রা, রাজা আসছে কাল সকালে। তুমি রাজাকে দেখেছো?'

—'দেখেছি, দূর থেকে। একবার আলাপও হয়েছিলো। আমাদের কলেজের একটা ফাংশনে কথা দিয়েছিলাম। তাঁরল অসভ্য কিন্তু তোমার বন্ধু। উনি আসবেন বলেও এলেন না।'

—'হ্যাঁ, ও ঐ রকম করে। এখন সবাই ওর স্বভাব জেনে গেছে, তাই কেউ আর ঘাঁটাতে যায় না। আর করবেই বা কি? তোমাদের আকারও হল না। কোথাকার কোন্ বোকাস আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হচ্ছে, সেখানে ওকে জাজ ঠাওরাল, কিনো করে দিল সন্ধ্যাপতি, তখন অতিথি—সন্ধ্যে? আর আজকাল তো এটা একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে।'

—'তাহলে, ঐ সেটা বলা উচিত ছিলো।'

—'সেটা পারেনি। জলদি জানাতে ভেবেছে আর কি। নয় জলদে অনেক কথাই বলতে হয়। তাই বলে থাকে, নিশ্চয় যাবো।'

কাপেন কটার আপনাদের।

ঠিক ঘটায়। ছটা মানে ইংরেজ ঘটায়। উদ্যোক্তা গরবে বলে।

মনে?

মনে আমাদের কুল খুব সময়বর্তী।

তাই নাকি? ভেতরটা ঝিকমিকিয়ে হয়ে।

তাহলে তো ভালোকার। এ কজন মেম্বারে করে বলুন।

গাড়ি কটায় পাঠাবো?

হাতে বড়ি নেই। বড়ির পাশা ঘড়িটা আছে। তাতে চোখ বুলিয়ে বললাম, ঠিক সাড়ে পাঁচে পাঠাবেন। কথা রইলো।

বড়ি না দেখে বড়ির ঘাস দেখে বলা—একটু সন্দেহ জাগে। অনেকে যে অন্তর্যামী এটা জানে না ঐ উইকো উপেক্ষারা। বড়ি থাকলেই বড়ি ঘড়ি। চলে ফিরে বেড়ায়। আমার গরে সবাই কেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে। স্যারনি।

এবং সাড়ে পাঁচটার অনেক আগে স্বিতীয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে 'এলকিনে'। একটা বাদে বেরো। তখন বিশ্ব একেবারেই বেঠে গেছে। তাও স্বিতীয় দরজা দিয়ে চুপিসাড়ে ঢুকে খাটে ছিপাটখেপে বসে থাকা। কোন খবর নেওয়া—মানেরা নেছে?

কী যে বলেন? ছিপেপনে বলে।

কেন কবি পালা, তেল কী?

•

ছোটো একটা গাছাড়ি বাসান ভেঙে, তাই সুন্দর বাস থেকে নামা। স্টাতে রঞ্জিত আসেনি। নাকি এসে অপেক্ষা করে ফিরে গেছে? দূর পরোয়া নেই। শহরে ওকে খুঁজে বের করা কঠিন নয়। ফিকনর উঠে বললাম, 'আমুক কলেজ চেনো?' মাস্টারবাবুর নাম করে বলি, 'ঐ দুবলা পাতলা মাস্টার। একটু-আধটু খারাপ।' শেষ অংশে ফিকন যোগ।

জানতাম, কেউ না চিনলেও মাতাল-দের রিকশাওলারা ঠিক চেনে।

—'বুঝেছি বাবু। আর বলতে হবে নি।'

—'তাহলে, চলো।'

রিকন যেন উড়ে চলে এখন। পেট্রোলের বদলে জল তরল পদার্থে যেমন চালায়।

রঞ্জিত বললো, 'তোর চাকা কিন্তু একদো ঘুরসেনি।'

—'আসবে, বাবা আসবে। দু চারদিন থাকতে এসেছি, দুই বেন পাহাড়ে ছিলের কাছতে চাস, মনে হচ্ছে। তোর বউ লোক কেমন? খেতে-খেতে দেবে তো? মজাবাজার জানেন? তোদের আকৃতি দেখে মনে তো হয় না—তোরা খাওয়া-খাওয়া করিস। আমার কিন্তু খুব আবহাওয়ায় হবে না মাইরি। বেল উত্তম-অধম চাই।'

—'পাবি, পাবি।'

—'তোদের বিয়ে কবিন হলো?'

—'বলতে পারিস? তেরো বছর চলছে। আর পাত্তা যায়?'

—'চন্দ্রাকে ডাকবো?'

—'ডাক না। ওও তেমন চলছে বলে মনে হয় না। নিতান্ত নানকারি হয়ে পড়েছে বলেই—জানাশোনা।'

—'বুঝো তো যায়। আমার আমীর উনিশটা জীবন্ত। সেটা তিনেক তারা খেয়েছে। 'সাব্বারী' পদক পাওয়া উচিত।'

—'বাড়িয়ে বলছিস। হয় কখনো?'

—'এবার কলকাতা গ। একদিন মমাবাড়িতে নিয়ে যাবো তোদের। বাড়িটাও মামা তাই বেল বড়োসড়ো করে বানিয়েছেন। পাশাপাশি খোপে তো আর থাকতে পারে না!'

চন্দ্রা হসেন। 'আপনারা ক' ভাই-বোন?'

—'সে খবরে তোমার দরকার? আমরা তিনজন। প্রথম দিদি। একেবারে বয়েসের সাধনার এই মহা-পুরুষের জন্ম।'

—'মহাপুরুষই বটে। চন্দ্রা, চায়ের জল চাপিয়েছো? একটা মোটা খাবার-দাবার করো। নচ্ছারো ইনি থাকবেন বলে মনে হয় না। বিকেলেই রওনা দেবেন।'

চন্দ্রা ভেতরে ঢেলে বললাম, 'প্রোগ্রাম কী?'

—'চমৎকার অলেজ আছে না। স্বিতীয়ত বাজারের দিকে একবার যেতে হবে। তৃতীয়ত রঞ্জনের সঙ্গে একবার দেখা—সন্ধের জন্যে। রাম বলে আমার কলেজের বেয়ারা ছিলো। একটা বিয়ে করে, তাকে ছেড়ে অন্য সংসার পাতায় প্রিন্সিপাল তাড়িয়ে দেন। এখন ও সিনেমা হলের কাছে অড়ো কেন্টুরেন্টের খাস বেয়ারা। এখন কিছু নেই, যা ও পারে না। কলেজের থেকে ঢের বেশি রোজগার ওর এখন। কাপেন বাম। দুই জলপাইগুড়িতে এসে এসেছিস?'

—'কার কাছে আসবো? একবার কী একটা মিটিং মিটিং ছিলো। ধমাটিং—'

সন্ধের থেকে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো টুংপ্রান্ত। জলপাইগুড়ির বাস্ট থেকে যে হিমালয়শ্রেণী দেখা যায়, সেদিক থেকে এদিকে মেঘ দৌড়ে চলছে। গতিক ভালো নয়। বেশি বৃষ্টি হলে বৃষ্টি হিসেবে কাজল ঘাটার আওয়াজ হবে। বৃষ্টি থেমে গেলে আর শব্দ নেই।

রঞ্জিত প্রবেশ বললো, 'বেশিক্ষণ টেকবে না। শীতে এখানে বৃষ্টিকে বৃষ্টিকে জল হয়।'

—'এই তোমার বৃষ্টিকে বৃষ্টিকে?' হোক ভাই। ভেলে নিয়ে বারান্দায় বসুনে বসে কলকাতার গল্প শুনি।

কলকাতা কেমন আছে' সিঙ্গল মাল্টাজিনের মতন। আছুক কেমন আছে। হম্‌কের খবর কি? এই সব উত্তুরেলাল, ঘুটিনাটি।

কলকাতা ছেড়েছি অনেকদিন। ছেড়ে এলে ভুলতে বেশিক্ষণ লাগে না আমার। আমার প্রকৃতিতে পেছন ফেরা তেমন নেই। সামনে যাওয়া, যাওয়া আসে পাসে, কাছে দূরে। ভেতরে কিছুই তেমন করে বসে না। পিছলে পিছলে যায়। বলার আসলেটুই পাত্তা হয়নি যেন, মনে মনে মনে হয়। কবে আর পাতবো। নাকি, পাতাই হবে না?

বৃষ্টির ঝাপট কমামাত্রই বেরিয়ে পড়লাম। শীতের কনকনে হাওয়া দিচ্ছে একটা মনে মনে।

—'এখানকার ঠান্ডা কারি চেটোবাস রাজা। তুই এটা গরে চড়িয়ে নে—বলে, একটা তাম্রকের খোল ভেতরকে রঞ্জিত দিয়ে এলো।

—'এটা কে রে?'

—সত্য না, পরে দাখ না। স্বন্দুরমশাই আমেরিকা থেকে এনেছিলেন। আমার ধান করে দেছেন।'

—'ছেলের আর ওভারকোট? বুঢ়োই আছুমন। ছেবে চিন্তেই দিয়েছেন দেখছি। রসিক বটে।'

—'এই তুই আমার তিন-চারদিন আগে গেলেন। থাকলে খুব জমতো।' তারপর গলা নামিয়ে, চলা যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে বলে, 'আমাকে একদম কাঁকরা করে দিয়ে গেছেন। মাসখানেক ছিলেন। রোজ অতো সাপ্লাই আমি করবো কোত্থেকে? ওঁর তো আবার ভোর থেকে রাত পর্যন্ত বেঁচিনের নেই। সকালে কাঁচা জলে মুখ ধোয়াই বারণ।'

হাসে।

—'থাকল? কে বললে?'

—'কেন, ডাক্তারে। এতে নাকি ওঁর ব্যথা হবে।'

—'চমৎকার। এমন লিন্ধ পুরুষের সঙ্গেই দেখা হলো না? আফসোস থেকে গেলো রঞ্জিত। সত্যি বলছি।'

বৃষ্টি পড়ই যাচ্ছে। রিকশাতে ছেড়েও পাঁচা ভেজা। রামচন্দ্র ছিলেন না। আমরা ছেলেরা মিলে দু' কাপ করলা চিনিছাড়া কফি খেলাম। এখানে মেয়েরাও বেশ এক কাঁকে ছেলেছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। রঞ্জিতের কিছু হয়তো অন্যে তার মনে। তাতে ওর কিছু যায় আসে না। ও উদের ধার।

—'অবে, বিশুকেই লুকোচ্ছো কেন? এটা অবে কী?'

—'না মানে। উনি আছেন—'

—'উনি তো জানো?'

আমি ডিমিট কাটি ওর উত্তরে। বলবার মতো ও নয়।

বলে, 'ও হলো সেই—'

তারপরই সামলে প্রসঙ্গান্তর—কবে এসেছেন? যাবেন তো কিছুদিন? জলপাইগুড়ি কেমন লাগছে? খুব ভোরে কখন ওঠেন? দেখেন কখন? আমরা কিন্তু একটু ভিজে করতে বলবো আপনাকে। আপনি তো এখন টপ। হালা তাজ্জব। জীবনে আমি ইনকোয়ারিই দিই নি যে কারণে সেই সম্পর্ক কারণ, সবার। কোনোটার সঠিক উত্তর না দিয়ে মুখে-হাসি মুখে বসেছিলাম। শালা রামচন্দ্র আর কতো দেরি করবে? মনটা অবসাদিত। এরাও নিশ্চয় পরাজয়ী দেখে। মফস্বলের এই লোকের হাতে দেখলে আমার বুকে মেঘ গুরুগুরু করে ওঠে। মরাকাঠ ভয় পেয়ে, মনে মনে, ঠিক করি—কালই চম্পট দিতে হবে। ফিরে এসে টাকা পাঠিয়ে দেবো। আপিসের টাকা। এখেকে রঞ্জিতের ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছি। ফুটোন-ফুটোন বেদিকে খুশোর যায় পালাবো। পালাতে হবেই। এরা মিটিং-এর ডাল করছে নিশ্চিত। পৃথিবীর কোথাও মাইটি ভাতৃত্বহীন শান্তি নেই। ছিলো ছোট মার্জিলিং-এ। তখনকার সময় পথে হলে ভস্ত হল যাও। সাপ্লাই লাইন নাই। সার্জিনের সাহেবের কেটা রৈনিক রুটি বন্ধ। বড-এর ইচ্ছে ছেড়ে দিয়েছেন আজকাল। আগেও তেমন খুব একটা আসক্তি ছিল না। এখন খাওয়াতেই ভালোবাসেন। সাদু। আমার দেখে অনায়াসে এতো বড়ো চাকরি ছুকিয়ে দেবার কথা ভাবছেন। দেবেনও হয়তো।

—'এমনে মানুষে থাকে? কী ভুল করেছি তাই।'

—'কেন? অসুবিধেটা কী? বেশ তো সবার, সুন্দরী বউ, সুলক্ষণা কন্যা, মাস গেলে মোটা মাইনে, বাবুদের থেকে কাজলকন্যা—সবদিক চাকরিতেও দেবতারা এতোটা আশা করতে পারেন না।'

—'এক হিসেবে সত্যিই। কিন্তু, তোমার দেখে মনে হচ্ছে এ সমস্তই ভুল চাঁদের শিয়রে ছুটে বেড়ানো। হোস্টেলের বাকে আমার ওপর থেকে ফেলে এগিয়ে যাবো বলে মনে করে দৌড়ুতাম। মনে পড়ে?'

আমি দৌড়ুই নি সাদিনেল। আমি কখনো চাঁদের শিয়রে নেই। প্রতিযোগিতায় নেই। ইস্কুলে সবাই স্পোর্টসে নাম দিতো, দৌড়ুতো, লাফ মারতো, গরি টানাটানি করতো। আমার দেখতো হাসি। আমি হেসে ফেলতুম মনে মনেই, লুকোতে পারতুম না। সবাই ভাবতো মাথার ছিট আছে। আছে তো আছেই। পরীক্ষাতেও. তুমি তো জানো, আমি কোনদিনই হোমওয়ের মতো ভালো ছাত্র ছিলাম না। এক ঘণ্টার বেশি উত্তর লিখতে ভালো লাগতো না আমার কখনো। জানতাম এতেই হয়ে যাবে। আমি তো আর কেরানিকে হতে যাচ্ছি না। পাশ করে বেরোই নিশ্চিন্ত। আমি সুখেই আছি। দুঃখকে কখনো ডিঙতে দিই না। দুঃখকে বলি, একটু পাড়া বেড়াতে যাও। ওরা তোমার দেখে আদর করে বেশিক্ষণ রেখে। যাও। বললেই যায়, কথা শোনে। তুমিও এই অবেলাতে করো সাদিনেল। এই যারা বেরোচ্ছিলো, দৌড়ে তাদের কী লাভ হচ্ছে বলো। যারা লাফ মারতে শিখছিলো, তারা কি লাফিয়ে বাড়ির দোতলায় উঠছে? আমি নির্ভুল চাই। বিশ্বাস করি ভগবানকে। ভগবানেই ওরা আমার কিছু দেবে। ওরা কাঁকি দিতে জানে না। আমরাই কাঁকি পড়ি।

•

খবর পেয়ে ওরাও এলো। লাজুক্যা আর কেশব। লাজুক্যাও দেখেনে, ভালো দেখেন বলে মনটা, পড়ে দেখিনি। পরে নিশ্চয় পড়বে।

কেশব বললো, 'শুনলুম তোমা বেরিয়েছেন।'

—'তাই আলমার করে এখানে চলে এলি? এতো জল সময়ে খবর পেয়ে দেখি?.....বসুন লাজুমা, কেমন আছেন? আপনি তাঁকিল ঘুচ্ছাল থাকেন।'

—'কী বলবো? তার বললে গলা ছেড়ে গান গাওয়া ভুলো।'

—'তা সত্যি।'

রামচন্দ্র ইশারায় ডাকছে। সব ব্যবস্থা পাক্কা।

রঞ্জিত বললো, 'চলা যাই।' বলে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো রঞ্জিত। 'তোমরাও দেখতে ছেতে পারো কোথায় যাচ্ছি।'

—'কোথায়?' আমি অবান্তর প্রশ্নটা করলাম।

জানতাম উত্তর কী হবে। অন্তত আঁচ করেছিলাম।

রঞ্জিত বললো, 'আহামরে।'

ওরা বললো, 'আমরা তুমি যাও। আমরা আজ ফিরি।'

'আচ্ছা, পরে দেখা হবে। চলি—' রঞ্জিত শিস দিয়ে উঠলো, যেন সে খিদিরপুরের নাবিক। ঘরবার ছিলো না।

আমি একটা সামন্তসাদৃশক হাসি দিয়ে রিকশার উঠলুম গিয়ে। সোজা রাস্তা দুজনের কোনো কথা নেই। বুকেথে, রঞ্জিত পুকুরে ডুবে থাকতে দেখছে। আমি আসাঁহি পানার মতন। যে কূলে দিয়ে ঠেকে—আপত্তি নেই। কূলাকূলে ঠেকেছেই তো এসেছি।

অন্ধকার পথে রিকশা চলেছে। ডিসেম্বর কোল ছেকে জলবাতাস এসে লাগছে মুখে চোখে। দুপাশে বাগান। বড় বড় মেহগিনির প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো আবার। এ রিকশার সামনে টাকা নেই। আর টাকা থেকেও কোনো লাভ হতো না। এই জলবাতাস অনাকাঙ্ক্ষিত। ও রিকশাওলা সুদ্ধু আমাদের তিন-জনের শরীর চাপকড়তে লাগলো। চোখে কিছু পড়ে না। চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে গেছে। দেখার দরকারই বা কী? শুধু জানলা দরজা বন্ধ করতে হবে। রঞ্জিতের নিশ্চিন্ত সে সমস্ত খেয়াল রাখছে। আমাদের আমি ভেবে মরি কেন? দায় নেই।

রিকশা থামতে রঞ্জিত ডাকে বলে, 'তুইও আয়। একেবারে ভিজে গেছিস।'

ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে রিকশাওলা বললো, 'তাহলে রিকশো-টাকে ভেতরে নে আসি এট্টু।'

—'নিয়ে আয়।'

যেখানে পা দিলাম সেখানে একহাঁটু জল। অন্ধকার। কিছু ঠাহর হয় না। আগে রঞ্জিত চলেছে। পিছনে আমি। আমার পিছনে রিকশাওলা। মাঠ পার হচ্ছি বলে বোধ হলো। কয়েক ঘুরে কোথাও মানুষজনের চিহ্ন নেই। কোথায় চলেছি?

—'তোমা একটু দাঁড়া, আমি দেখে আসি। এক্ষুনি আসব।' বলে রঞ্জিত চলে গেল। আমরা দুজনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পোস্টঅফিসের মতন ভিজতে থাকলাম। মনে হলো, সোজা রাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। জলা রিকশাওলাটা বাবে। হাত বাড়িয়ে পরশ করি, 'আছিস তো রে?'

—'আছি বাবু। যাবো কই?'

তা সত্যি, কোথাই বা যাবে? বাবার উপায় নেই।

দূরে একটা আলোর মতন কী এগিয়ে আসছে। ট্রেন বাতি। এখানে?

—'এই যে এদিকে—লোজা চলে আয়।' রঞ্জিত বললো।

আমার শরীর হিম হয়ে আসছিলো। আমি এই জলকাদাকে ভয় করি। চট করে ঠান্ডা লেগে যায়। লেগে গেলে সারতে সারে না। মুশকিল।

## ॥ কৃতীয় কাহন ॥

ভোরবেলায়, ঘোর কাটি, চন্ড ঠান্ডায় মুখ ঢেকে থাকবে। ঘরে-ঘরের জন্যে মায়া। মায়া তুলতে পারছি না। ঘোরা জলসা মায়া ভাঙি। তখনো আলো ভালো স্পষ্ট করে ফোটে নি। কিংবা মেঘ করে থাকবে। হাত বাইরে বুকতে চেষ্টা করি, কোথায়? হাতে কাঠ ঠেকে। মনে কিছুই পড়বে না। একবারি, মন এই বুকশো অহলার মতনও নয়। কোথায় আমি? তারি মাথাটা তুলে চারদিক ঠাহর করার চেষ্টা করি। সামনে আমার পায়ের নিচে। ও ছাড়াও আরো দুজোনজন লোক। মুখ দেখা যাচ্ছে না। মাথাটা মশারির মতন নিচু। বললে মাথায় ঠেকবে। এশিক্সেসের দেশে এসে পড়ি নাকি? আমি কৈলাসের ভিতরে দেখছি? অসম্ভব নয়। সারারাত্রি তন্দ্রা করলুলো। তার ওপর এতোদূলো লোক যেন ভাসতে-ভাসতে কোথাও যাচ্ছি। বা ছেতে ছেতে ঠেকে দেখি এই পর মতন জায়গাটায়।

ঠেলতেই ঝকঝক করে উঠে বসে সামন্তা। ও যেন স্বপ্নের ভিতরে ছিলো। দু চোখে তারই আবার।

আমার চোখে জিজ্ঞাসা দেখে, ও মাথা নাড়তে থাকে। তারই মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার করে নাড়াকে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখনে চোড়।

সামুচি বাজারের দোকানের মধ্যে সান্ধ্যে আর আমি। তখনো সূর্য হারানি। কতক্ষণ আগে ভেসেছে মনে নেই। হঠাৎ বাজার পথে একটা নাড়া। চোখদুটো পাথরে মতো। ইশারায় ডাকতে কাছে চলে আসে সুরুসুরু করে।

—'কিছু খাবি?'

মাথা নাড়ে।—'মনে পড়।'

নাড়া বসে। সান্ধ্যে তার নাড়া-চোর হাত বুলোতে-বুলোতে বলে, 'কী, দেখতে হয়েছে তোর? কান বিঁধিয়ে-ছিস? কী করিস এখানে? লোজ জিজ্ঞেস করি? সেই কাঁপার ভয়েই তো ডাকলাম। খাবি তো খা না।'

নাড়া যেন ঠিক ঠিক করে মাথা নাড়ে।

—'ঘরে করেছিস?'

—'না। এক্কে বাপ মারা গেছে। টাইতে মাতা কামাতি হলো।'

—'ইচ্ছে ছিলো না? কোন্‌দিকে চৌধি কাটতিস? এখানে কী করিস?'

—'ন ভজুর ড্রাইভার কাজ করি। নেতাপড়া জানি না তো।'

—'তা তো বুঝলুম। তা উঁচিবুচি মারামারি কেন?'

—'এজ্ঞে, আপনাদের দেখলুম বাঙালী। তাই—'

—'তাই, কী?' সান্ধ্যা ওর সঙ্গে বকবকই করে যাচ্ছে। এমনিতে কথা বলে না। আজ যেন কী হয়েছে ওর। বুঝতে পারছি না।

এক সময় হঠাৎ বলে ওঠে। 'ব্যাপারটা হলো, আপনি তো কেস রকম্বা করে নিলেন। আর আমি?'

বুঝতে পারিনি হঠাৎ। ও কী বলতে চাচ্ছে। এ সেই জন্যে?

একটু থেমে বলি, 'ওটা তোমার ব্যবস্থা নয় সান্ধ্যা। ওর দাদা আমার পরিচিত ছিলো। এই বৃত্তান্তের ভিসি। ভিসিদিন হলো হঠাৎই মারা গেছে। ভাঁত ভদ্রলোক ছিলো। ও থাকলে একটা ব্যবস্থা হতোই।'

—'আর হয় না?'

—'না।'

—'তা হলে?'

—'তা হলে কী? আমরা থাকো ওপরে উঠবো। এসেই তো দেখি। তুমি চাকিটাকে বিদেয় করো। ওপরে অনেক চেনা। সুরেনার আমলের বহু-লোকই আছে এখানে। আমায় ভালবাসে।'

সান্ধ্যা কী ভেবে বাইরে গেলো। আবার আসে হঠাৎ শুধুলো, 'ওকে ছাড়া ঠিক হবে? যদি কিছুতে হয়—'

—'কোথায়?'

—'বেথনে স্রোক।'

—'কেন? এখানেই তো আছি।'

—'আছি, কিন্তু কতক্ষন থাকবো?'

—'সারা জীবন।' ওকে ঠেলে বলি, 'যাও না। যা বলছি করো।'

এখনে প্রায়ই বজ্রপাত হয়। মেঘে মেঘে কান্না যেন প্রচন্ড শব্দ ওঠে। আমরা এখন যে বাড়ির অঞ্চলে আছি, সেটা একটা মোড়ই উপত্যকার মতন। চতুর্দিকে টিলা। সামনের সাহেব বাঙ্গিল আর তার ফর্মাটার মেমসাহেব আর একটু ওপরে। পাকদন্ডী বেয়ে উঠতে হবে। চলতা পাকা। মেমসাহেব-গুলো বাপে ছেলে সারবন্দী। ছুঁয়ে চায় যে ভাবে হয় সে ভাবে এই হালকা বাঙ্গিংলোর তৈরি। দোহনে ভায়নার গভীর চওড়া খাদ। তার ওপারে ফুটান পাহাড়। পাহাড়শ্রেণী। তার হাঁতি হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, ফুটবলের সরকারি অতিথিশালা—এই সব, বড়ো বড়ো মহল। ইস্কুল আছে। সাহেব অফিসের বিদেশবন্ধুরা ফুটবলের আটির নিচের ঢালায় খেঁজার কাজে এসেছেন। সবাই আছে, কিন্তু কেমন করে যেন লুকিয়ে আছে বড়ো বড়ো পাইন আর দেওদারের জঙ্গলে। সুন্দর বুদ্ধুটি নিয়ে বাড়ির কেমন দেখাল খানা, সে ভাবে এই পাহাড়গুলোদের স্বভাব।

নাড়ার কুপড়িতে বাড়ির ওপর ছেয়ে ওপর ছেয়ে। ভাগিস শরীরের ভেতরে অনেক কম্পন ঢোকানো ছিলো, নইলে শরীরে ভয়ে যেতাম। ভয়ে ঘরে হয়ে যেতাম। একা যে গা গতরে ফুলে বাঘা তা ঐ নামকরা ঠান্ডার জানেই। এখানকার কুকুরের গায়ে কম-জোর লোম। ছাগলের গা ভেড়ার গায়ের মতন। মানুষের লোম এখানে কম। মানুষের সারলা গুরুত্ব। খুবে জল মেশানোর কথা বললে এরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাপনে জোকাল, ভলপনায় আনে না। আমরা এদের বলি বোকা পাহাড়ি। এরা ঠান্ডার টাটকা তাজা পুরুষ্টে, ফলের প্রান।

আমার এ্যাটাচিটা কুপড়ি থেকে উধাও। তারই মধ্যে সব ছিলো। ধান-বাকি আছে গায়ে। ভাগিস টেকা পয়সার একটা আশ সান্ধ্যের কাছে দিয়ে রিপোর্টিলাম! আমার অভ্যেসও তাই। নিজের কাছে কিছু রাখি না। চিরকালের অভ্যেস।

এ্যাটাচিতে অবশ্য আর একটা জিনে ছিলো। কাগজে ছিলো, তামাদুলের ধাঁধানো একটা ছবি ছিলো। কাগজ-জামা ছিলো কিছিন্ন। এখন নাঙ্গা সন্নিসি। ব্যাপারটা ভালোই। খালি হাত। বুহুহুতে ভালি বাজালাম কিছুক্ষন। খুটো কুকুর ঘেউ এলো। ওদের সামনে মুটি মুড়ে ওঠ-বোস করলাম। ওরা দেশের আদব-কায়দা বেমকে। অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। সেই ফাঁকে আমরা পা তুলালাম। যে ভাবে সিঁড়ি দিয়ে ভোতলা তিনতলা করে তেমনভাবে। ওপরে যাবো। আকাশের কাছাকাছি অনেক শান্তি। বহুবার এসেছি, সেই শান্তি পেয়েছি। মনে পড়ে।

হিমাদ্রিলে ঠান্ডা সাহেব মতন গা জড়াচ্ছে। বাসমাঠ পড়ে আছে মরা ঢাকা যেন। বুটজুতো ভিজে নরম। তার ওপর জল আর শুকনো ঘাস লেগে আছে, লাল কাঁকরের গুড়ো। পা থেকে খুলে ফেলে পারে, তত্ত্বজ্ঞ করছে। একটু রোদ্দুর চাই। অন্তত উনুনের ধারে বসে গা গতর সেঁকতে হবে।

ওপরে উঠেছি তো উঠেছিই। একটানা চোখের সোজা নয়। একবার বাঁয়ে, তারপর আবার ডানদিকে কোনাকুনি, কাঁচি ফেরে। পাহাড়ে ওঠার নিয়ম এই। কোনর ফেরে আধাসিধে একটু, ঘুরে থাকবে। তা হলে হাওয়া কাটবে। হাঁফ ধরবে না। তাড়া থাকলেও হাঁটতে হবে, কেন বেরুতে বেরিয়েছো।

এখনো খুব্রুপ্ত বাড়িঘর। ঝলদাকা থেকে কিন্তুং আসে রোদ্দুরের মতন। সবকটা বাড়ির ছাইরে ঘুম জলছে। ঘন্টাদারগুলো পর্যন্ত নেভানো হয়নি। কলকাতার ছন্নছাড়া ভাব যেন। সান্ধ্যা মহেশ্বরো শিহন ফিরে তাকাচ্ছে টের পাচ্ছি। নাড়া ফেরে ফেকেই উধাও।

একটা রাঙ্গামুখো লোক, ঘোরা সৈনার মতন কাঁটাতারের ওপারে। আমি হঠাৎ ইশারায় শুধোই, ভেতরে মদ্যো? সে উত্তেজনায় মুহূর্তে পাখির ডানার মতন করে ফাপতে থাকে। আমরা কাঁটাতার পার হয়ে যাবো বলে তারে ওঠার সে আঙুল দিয়ে কাটা জায়গা ইঙ্গিত করে। আমরা ভেতরে যাই। সে আমাদের একটা ঘরে নিয়ে যায়, সেখানে ঘাট থেকে পাঁজকোলা করে দুটো বস্তা জানালার ঢালাস করে, ইঙ্গিতে শুয়ে পড়তে বলে। আমরা খাটে বসি। সে জুতো জোড়া খুলে নেয়। কেউ খুলে নেয়। গায়ের ওপর মোটা লেপ চাপিয়ে দিয়ে চেপে ধরে। একটা জলন্ত উনুনে কেটলি সমেত ঘরের মধ্যে নিয়ে আসে।

বেশ ঝড়ো ওজনের লোক। সব বেচে। সান্ধ্যা তক্ষুনি নাক ডাকায়। আমিও যা হয় হবে এই ভেবে লেপের ভেতরে চুকে পড়ি। ঘুম হয় না।

কিছুক্ষন বাদে লেপ তুলে সে আমাকে গরম জলে মিশিয়ে ওষুধ দেয়। ভালো লাগে। খুব ঝড়ো ঝাড়ার মনে হয় ওকে। লেপাস ঝাড়িয়ে, আর একটু দিতে বলি। সে হাসে।

—'একটু ভালো লাগছে?'

মাথা নেড়ে স্পিরিটটা মাথাতে করে বন্দুই-এর ওপর ঘষি।

—'কাল রাতে কোথায় ছিলেন?'

আঙুল দিয়ে নিচে দেখাই।

—'আপনারা এসেছেন সবাই জানে। আমিও। কিন্তু রাতে কোথায় ছিলেন টের পাইনি। আমি গাড়ি নিয়ে একবার নিচু পর্যন্ত গিয়েছিলুম। এ্যাড-মিনিস্ট্রেটর সাহেব বলেছিলেন, আপনাদের নিয়ে আসতে। তখন এই আটটা বাজে। পাইনি। উনি তার দেরে গিয়েছিলেন। একটু সুস্থ হয়ে একবার দেখা করে আসুন। এখনো ওঠেন নি।'

—'আমার ঘুম হয় না। তাই সারা-রাত উঠেই থাকি।'

আবার একটা গেলাস বাড়িয়ে দেয়। বলে, 'তবে বেশি খাবেন না। সাহেব আবার এ সব পছন্দ করেন না। চা-বিস্কুট খান, ভাকি-চকলেট খান। সবাই তো আর সুরেনাহেব না। আপনি তো সুরেনাহেবের আত্মীয়। আপনার কথা শুনেছি। দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। আমি গাড়ি চালাই। ড্রাইভার।'

—'ড্রাক্তার না?'

হো হো করে হাসতে থাকে ভদ্র-লোক। শেষে থামিয়ে বলে, 'না'।

•

বেসের নতুন বিয়ে। বিয়ের পরে কলকাতা আপিসে কিছুদিন ছিলো। তারপর, শুনা যায়, নিজে থেকে এই নির্বাসন নিয়েছে। কলকাতার ঠান্ডা-বাস বুঝোড় নেই। কলরব কলহে ছোড়া হাওয়া, মেঘ আর বাস। আকাশ মহে মহে ঘুরঘুর করে ঘুরাই ভয়ে। আপিসের কাজ হালকা। তাও বাড়ি বসে অর্ধেক সারা যায়। ঘুম যি মাঝে পড়ো। ফুটবলের আলাদা এলাউন্স আছে এ ছাড়া। নতুন বিয়ে—মন্দ কি? কিছুদিন একা একা ঘুরবে থাকার এমন সুযোগ ছেড়ায় নিজেছে বোস।

আমার চেনে, জানে, ওর মামার কাছে কিছুদিন অনেকে পড়েছি। বাড়াবাড়ি ছিলো। সেখানে দেখে থাকবে। তা ছাড়া, ঐ পদ্ম-জল ব্যাপার। সুরেনার কাছেও শুনেছে আমার কথা। এসে, এখানেও অনেকের কাছে। সুত্রেন, কলাবুরোর শুনে, যাচ্ছ করে, কাল শীতকে পাঠিয়েছিলো আমাদের ঘরে যাবতে। শীল আমাদের পরানি। পেলে মন্দ হতো না, হকতো।

বোস চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এলো। আমি একা। শীল বাঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দোঁপরে পাঠিয়েছে। খুবছে সান্ধ্যা। তা ছাড়া এই কোয়ার্টার আমার অতান্ত চেনা। এক কালে অনেকদিন ইতস্তত থেকে দেখি।

—'খুব অন্যায় হলো। ডেকেছিলাম উঠেছেন।'

—'আহা, না না। অন্যায় তো আমারেরই। কাল খোঁজ করতে পাঠা-লুম আপনাকে। কোথায় উঠেছিলেন?' অকপটকণ বললাম।

বোস ছেলেমানুষ। আমাদের চেয়ে অনেক ছোটো। চুকচুক করতে লাগলো।

—'দেখুন তো, কী সর্বনেশে হয়ে গেলো। আপনি সোজা এখানে চলে আসবেন তো? এখানে এসে না হয় নিচু নামবেন। আমার ড্রাইভার ছিলো। কিছু অসুবিধা হতো না। কী করলেন বলুন তো? জিনিসের কথা বলছি না। এই শীতে—ঐ সামান্যিক কোল্ড্রিঙ্কে! পায়েনও বাবা! কন্টও তো খুব হয়েছে। আমার বাড়ি ফাঁকা। সেন্ট হাউস আছে। তা ছাড়া, এখানে প্রায় সবাই আপনাকে চেনে। এলেন এলেন—তা বলে এই ভাবে? খুব খারাপ লাগছে। বসুন, চা খান একটু, সবকাল খান তো?' বোস হাসে। 'অফিসারকে ডাকি। ও উঠে পড়েছে। কী খেয়েছিলেন বলতে? কিছুনো নিশ্চয়। কী করছেন? শরীরটাকে ঠান্ডতে বাঁচাতে হবে তো। আপনার সঙ্গে আরেক ভদ্রলোকের কথা শুনেছিলাম। তিনি কোথায়?'

বললাম। আর বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সোটা ব্যাপারটা একদম ভুলে গেলো। বুঝতে পারিনি যে এটা সন্ধ্যের মর্মান্তিক লাগবে।

—'এটা কিন্তু ঠিক করেননি। আপনি কী জানতেন না আমি এখনে আছি? সুরেনার সঙ্গে আমার আগে কোনো কথা হয়নি?'

—'আমি তো ঐভাবে আসিনি। ঘুরতে—ঘুরতে চলে এসেছি, হঠাৎ। সত্যিই এখানে আসা আগে উচিত ছিলো। ওঁকে তো চিনতামই না।

এমনভাবে তাকালেন—যার অর্থ কিন্তু তরলো—'

—তাহলেই তো কিন্তু ওকে ঐ জিনিসটা যে ভাবকে খারাপ করে তুলেছে। আমরা আশপাশের ফ্লাইনে তো ওর শ্রীকে দিই। ওকে দিই না। দিলে হয়তো দুদিন সংসার চলতো না। এখন অবশ্যি কিছুদিন চলে। লোকটি ভালো। মস্ত কলকাতার অনেকগুলি বড়লোকের বাড়ির ছেলে। একসময়ে প্রচুর পয়সা ছিলো। সব এই করে এবং এর অনুষঙ্গিক করেই শেষ করেছে। শেষে বিয়ে নেই। আমাদের বাড়ির বাড়িতে ফ্লাইনিংটা দিয়েছিলো, তাই আসা চলে যাচ্ছে। সুবলই ওকে চাকরি দিয়েছিলেন কলকাতায়। ও নিজে কর্মাল নিয়ে এখানে এসেছে। যাই হোক, আপনি চা খান। আমি ওকটকে নিয়ে আপনার বন্ধুকে এখনে ডাকছি।'

—'ও ঘুমোচ্ছে বোস। একটু পরে ডাকা যাবে।কি। আমিই যাবো। দু একটা জিনিসপত্র আছে। নিয়ে আসবো। বিলের নেওয়া টাকার ভাগ-বোঝাপড়া আছে ওর সঙ্গে।'

বোস কিছু না বলে চায়ের কাপ-গুলো সাজাতে লাগলো। সকালের চা-টা আমি করি। একা একা খেয়ে যাই। ওটা ঢাকা থাকে। ও পরে খায়। আজ দুজনে আছি।...আপনি হালকা লিকার পছন্দ করেন, না কড়া?'

—মাঝারি।'

—আপনি চায়ের লোকই নন।'

—তা তো বটে।'

—'আমার জন্যেও একটা সরা হয় না। শরীর নেয় না। খেয়ে দেখেছি, ভালোও লাগে না একদম। মাঝরাত পাড়ায় এসেছিলেন। ওঁদের তো প্রতি-দিন আসর বসতো। আমি কিন্তু ঐ চা খেয়েই বেতাম।'

—খারাপ লাগতো না?'

—কেন, খারাপ লাগবে কেন? ছেলেই ধরে খারাপ লাগতো। ঘুম হতো না। এক-আধদিন খেয়ে দেখেছি।'

গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা ছিলো। আমি ভেবে এসেছি, ইচ্ছে হলেই চলে আসবো। জিনের জন্যে একটু ঘোরা-ঘুরি করবো।

—গাড়ির দরকার হলে বলবেন কিন্তু। কোনো অসুবিধে নেই। ওখানে বুক আছে। লোক কম্পল সবই আছে। সিকিউরিটি অফিসারের কাছে চাবি। ঐ বিশ্বনাথ, ওঁকে তো আপনি চেনেন। যখন দরকার হবে ডেকে নেবেন।'

এসে গেছি সন্ধেও উঠে বসেছে। শীল হাসের আলু পোড়ায় কষ্টাচ্ছে।

—'এ সব কী হবে?'

—কী আর হবে? ভাত থেকে তো খান নি কিছু?'

—তাহলে কি? এইসব তো ছেলেই বয়েছে। ওতে কতক্ষণ্ড কম আছে?'

—তা সাত্রি।'

সন্ধেও মিটি মিটি হাসছে। বেডরুমে যাবার ওপর বসেছে তাতে মনে হলো শিকড় নিয়ে ফেলেছে ও। শরীরে লেশ জড়ানো। হাতের কাছে পাতে ঠান্ডার ওষুধ।

—শীলদার সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। পাকা ব্যবস্থা।'

—কী রকম?'

—শীলদা আমাদের স্বত্বে হয়ে থাকবেন। তখন বলতে হবে শীল বাবা।'

—সাঁতা বলছো, আর আপনি রসিকতা চালাচ্ছেন? কুলবধূকে অকাঁয়, পাঁড়ান।'

সাঁতা ছুটি ফেরে এসে দাঁড়ালো। মুখ যেন শুকনো। একজনের নাম চুল, অন্যজনের কুরি। সুখের প্রিমরী বালিকা দুজন।

—'বিয়ের ব্যাপারে টৈ করা হবে। তাই তো?'

ওরা দুজন মাথা নাড়ে।

শীল আলু ফেটে যায়। চোখ দিয়ে জল পড়ে, তা কি দেখতে জলে?

বললাম, 'বেশ তো। হোক বিয়ে। তা কখন হবে?'

'—আজকেই, সন্ধেবেলা। যেমন আছি, তেমন বিয়ে। বাজি?'

ওরা মাথা নাড়ে।

—'বিয়ের বেকে কী, ওরা?'

—'দুটিয়ে নেবো। যোবালে হুকতে পারবি তো?'

আবার ঘুটঘুট মাথা নাড়ে।

—'তা হলে আর কী কথা? ঐ ঠিক রইলো। সন্ধেবেলা বিয়ে হচ্ছে আমা-দের। টৈটা কখন হবে?'

—'আমার তো দুজনকেই পছন্দ।'

—'সেই জন্যেই তো টৈ! আমারও জোড়া পছন্দ।'

আমাদের দুই বউ তখন শাড়ি পরে এলো। দু ছিমে আলু ভাজা। পরনে টেমাটোর সস্।

বাঃ, সংসার চালু হয়ে গেছে! আর কী চাই? বিয়ের পর দুজনে দু বৌ-এর হাত ধরে ডায়না পৌঁছে ফুটান পাহাড়ের দিকে চলে যাবো। বাসর হবে মাঝপাথে উনজলপদের ঘরে। দুজনে মিলে হাঁটবে যাবো পাহাড়ের ভিতর। ওখানে গুহা পাবো। জলপদের কলকাকলি পাবো। শব্দের মাদল পাবো। জীবনটা কেটে যাবে। কোনো কিছুর জন্যেই আর অসুখ থাকবে না।

সন্ধেও হঠাৎ বললো, 'শীলবাবা খেয়েদেয়ে শুয়ে নিই। আর একটু আদর খাওয়াও।'

শীলবাবা তৈরি। সন্ধেকে হাত ধরে টেনে নিয়ে বাইরে চলো। ফিরে এসে বললো, 'আসছে। তোমরা স্নানটান সেরে নাও। আমার তবে সুযোগ মুছিয়ে পাও হয় ঠিক নেই। পথ মুর্ণায়।'

সন্ধেকিনটাই ছিকলের মতন হয়ে আছে। মেঘের দৌড়ঝাঁড়ি আছে হাওয়ায়। এই জানলা থেকে সামনে ছিনের জঙ্গল পুরোটা চোখের উপর ভাসছে। বাসপালার আলো কোথাও ঘুলো ঘুলিয়ে উঠলো। অর্থাৎ ওখানে রাস্তা। গাড়ি যেলো ঘুলো উঠছে। পিছনে কাছে ফুটান পাহাড়টাই যা চলাচিত্রের মতন। বাকিটা চোখের সামনে খোলা। কোথাও পথ দেখা যাচ্ছে না।

—তোমার ঐ বন্ধুকে সাক্ষী দিতে ডাকো। সাক্ষী একজন লাগবে।'

—'ওকে ডাকবো? এজেনকে?'

—আর জানি না।'

—'ও আসবে না। ওকে এখনে ডাকা যাবে না। কষ্ট পাবে।'

—কেন? কষ্ট পাবে কেন? আমা-দের সুখের দিনে ও কষ্ট পাবে কেন?'

—'অনেক পরে। সব জিনিস তুমি বোঝো না।'

—তা হলে, ভাববে না? একা একা আমরা বিয়ে করবো?'

—'হ্যাঁ, বিয়েটা একা একাই করতে হয়।'

শীলবাবা হঠাৎ বলে, 'এজেন কে? ক্রিশ্চিন সাহেবের বোন?'

—'হ্যাঁ। আপনি ওকে চেনেন?'

—'ওকে কে না চেনে? ও আজ সকালেই চলে গেছে দার্জিলিং। আমাদের গাড়ি তো ছেলে পৌঁছতে।'

—চলে গেছে?'

—'হ্যাঁ, ওর স্বামীর খুব অসুখ। বাঁচে কি বাঁচে না। কী সুন্দরী মেয়েটার। এই কদিন আগে ওর স্বামী আমা দেখলেন। আজ ওর স্বামী অসুস্থ। একেই বলে ভাগ্য। দুঃখ-শোক একা আসে না, সঙ্গে আরো অনেককে ডেকে আনে।'

আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে না। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছি। কোনদিকে এজেলে-দের বাড়িটা? এখান থেকে দেখা যায় না। একটু বাইরে দাঁড়াই। ও একা নিচে নামবে ভরসা করে। নিচ থেকে ওপরে উঠবে। আমরা আমাদের ব্যবস্থা করেছি এজেন, তুমি ভেবো না। ভগবান, তোমার স্বামীকে সুস্থ করে তুলবেন। আকাশের এতো কাছাকাছি আমরা এসে দাঁড়িয়েছি যেখান থেকে ঈশ্বরের নিশ্বাস খুব কাছে। তিনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন। তিনি ছাড়া কেউ তোমার স্বামীর ব্যবস্থা করতে পারে না। এ কথা তুমি জানো। জানো বলেই ব্যস্ত হওনি। ব্যস্ত হওয়া তোমার মানায় না।

তুমি বলেছিলে, এতো তাড়া কীসের? নীলমণি তো আর বিধি হয়ে যাচ্ছি না। নিজেকে জানো, অপেক্ষা করো। আমি তো রইলামই।

নিজেকে জানা বড়ো কঠিন। এখনো জানি না। তুমি জেনেছো?

আমি তো আছি। তোমাকে আবার আসতে হবে, যদি ব্যাপারটা সত্যি হয়।

আবার তো এলাম। অনেকবার এসেছি। আর তোমাকে খোঁজনি। এই দেখবার তোমার দেখলাম। দেখে মনে হলো, তুমি ঠিকই বলেছিলে, এতো তাড়া কীসের! সত্যিই তাড়া কীসের?

মেঘের ঘরে বিয়ের বাজনা বাজছে। আমি আসি? বিয়েবাড়ির ক্ষণে যাই বলতে নেই। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে ভীষণ। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। একটা পাহাড়ের মাথায় খুব জলবরনের সঙ্গে কথা বলবো বলেই এদিকে এসেছি। সঙ্গে হলে পথ হারাবো। পথ জঙ্গলে নিয়ে যাবে। জঙ্গল দেখাবে গুহা। ভুল চোখের বিশাল দেখে আমরা চলে যাবো অন্য গভীরে। সেখান থেকে আর ফেরা যায় না। সুখে থেকো তুমি। আমিও সুখে থাকবো বলে যাচ্ছি।

(শেষ)

# উর্বশী ও জনি

## মহাশ্বেতা দেবী

উর্বশীকে কোলে নিয়ে বসেছিল জনি, জনির কোল না হলে উর্বশী বসতে পারে না। ঠাস-ঠাস করে আছাড় খায়। এ কি ন্যাকড়া বল দেখি? ডাক্তারের সামনেও জনির কোলে বসবে উর্বশী? ডাক্তার মোটেই খুশি হচ্ছিল না। শেষ-বেশ বলল, 'উঠে এস এদিকে।'

উর্বশীকে চেয়ারে সবচে বসিয়ে জনি উঠে গেল। ডাক্তার উর্বশীর দিকে চেয়ে জনির সঙ্গে কথা বলতে লাগল। জানা কথা উর্বশী বুঝতে পারবে না। তত কথাবার্তা, সব ওর জনির সম্পর্কে।

—'প্রথমে গলায় কি কষ্ট হত?'

—'গলা ছেড়ে কেন্দ।'

—'তারপর?'

—'আশি হত।'

উর্বশীর দিকে ডাক্তার চাইলে জনির চোখ হিংসেয় হলদে হয়ে যায়, তবু উর্বশীর দিকে চেয়ে ডাক্তার বলল, 'আমে কিছু বোঝনি? কোন ডাক্তারের কাছে যাওনি?'

জনি হেসে বলল, 'আমার জানাটা, বললেন ডাক্তারবাবু, এই ছেলেছেলে মেয়ে নিলে। মেয়েছেলে ত জানেন, কিছু হলে বলবে না। এখনও ত দেখেছেন কি হলে, দেখলে মাথা ঘুরে যায়। নিয়েলাম ডাক্তারের কাছে।'

—'কার কাছে?'

—'হেকিমী, কোবরেজী সব কারিয়েছিলাম।'

—'হেসেন ডাক্তারের কাছ থেকে চিঠি এনেছ? উনিও দেখেছেন?'

—'ঠাঁনিই পারালে। বললে, ডাল বুঝি না জনি। তোকে এই উর্বশীতে খেলে। ওর জন্যে তোর জনম তোর ব্যাত খোয়ার।'

—'কি হয়েছে, কিছু বললেন?'

জনির মুখ বিচ্ছি হয়ে গেল। কেন কড়-জলে চটে-খেপে গেল কেন চেনা পুতুল অথবা হুতির প্রাচীন মুখ। জনি বলল, 'আপনি ত জানেন ডাক্তারবাবু, উর্বশীকে লইলে সকল খেলা ভাল। ও গান গাইবে, নাচ-চিত্ত করবে, লাচবে, কোমর দোলবে, হাসবে। পরদিন বলবে, হ্যা উর্বশী, কেমন আছ? ও বলবে, বড় সুখে আছি গো! আমি সুখের রানী। জনি মোকে বড় সুখে রেখেছে।'

—'আরে, কাজের কথা বল?'

জনি খিশকিশ করে বলল, 'হেসেন ডাক্তার যা বলল, তা শুনে ত মোর হাত-পা পেটে সাঁধিয়ে যাচ্ছে ডাক্তারবাবু।'

—'কি বলেন?'

—'বললেন, সব বন্ধ হয়ে যাবে জনি। তোর উর্বশী আর হাসবে না, গাইবে না, কথা বলবে না।'

—'কেন বললেন, বুঝলে কিছু?'

—'গলার জনি কি হয়েছে।'

—'কি হয়েছে?'

—'কি জানি হয়েছে।'—জনি ঘাড়টা এদিক থেকে ওদিক ঘোরাল, যেন বলির পশু টের পেয়েছে কাছেই হাড়কাঠ।

—'গলায় কানসার হয়েছে জনি।'

—'ওমুধে যেন, সুই যেন।'

—'এখন আর লাভ হবে না জনি। কানসার হাসপাতালেও ত গিয়লে। তারা কিছু বলেনি?'

—'বলেছিল।'

জনির গলা ভেঙে এল, কান্না ঠেলে উঠল গলায়। বলল, 'ও কথাই বলেছে সার। আপনার ব্যালাতা করি। উর্বশী না-গাইলে লাচলে ছরে যাব না-খেয়ে।'

জনি কাঁদছিল। উর্বশী নির্বিকার মুখে বসেছিল। ডাক্তারের হঠাৎ ভয় হল। কিসের ভয় তা তিনি বলতে পারবেন না। মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন তিনি, মৃত্যু কত ভয়ঙ্কর হয়। মরণ, নিধন, অন্ত। এরকম অক লাইফ। বিরিং কিলার। সাঁজির চ্যু বি। সেই কিন্তু মুত, লাস্ট হ্যাজ সাঁজুত চ্যু বি। উর্বশী মৃত, নিশ্চিত, নিরবাক। কেন না যে-গলায় উর্বশী কথা বলে, গান গায়, হাসে, সে-গলায় গ্রামনালী, স্বর-গ্রন্থি, জিহ্বা, গলবিল, কণ্ঠা, স্বর-কম্ব, সর্বত্র ক্যানসার সিংহাসন পেতে স্থায়ী রাজত্ব করতে বসে গেছে। সেই গলাটি ক্যানসারের সিংহাসন। রক্তা-ক্তাল ছুরোহলে ক্যানসার স্থায়ী সিংহাসন নিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু উর্বশী নির্লিপ্ত, ভুবন-মোহিনী, অনন্যা, পীনস্তন বুক, লাল ঠোঁট, চোখ স্থির-স্থির। কাঁদছে শুধু জনি। জনির আকুলতা, উর্বশীর নির্লিপ্ততা দেখে তখন ডাক্তারের ভেতরে সব হিম হয়ে এল। কেন তিনিই ভয় পেলেন, হিম-হিম হয়ে গেলেন। কিন্তু ভয় হচ্ছে কেন? ভয়ে পেলে ত আর কোন ভয়-নির্ভয় থাকার কথা নয়।

—'কিছু বলেন, ডাক্তারবাবু?'

—'জনি, হাসপাতালে গেলে, ক্যানসার হাসপাতালে...'

—'ক্যানসার হাসপাতালে কিছু জনে না ডাক্তারবাবু, পেলের লাড়ীতে ক্যানসার হয়, বুকে হয়, গলায় ক্যান-সার হয় কখনো?'

—'ওখানে ভর্তি হলে পরে বলে...'

—'উর্বশী একা রইবে না যে!'

—'জনি, পাগলামি করছ তুমি। উর্বশীর কি ক্ষতি হবে?'

—'সে আপনি বুঝবে না।'

নিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল জনি। চোখ মুছে বলল, চল্ উর্বশী, ঘরকে যাই।'

—'জনি, তোমার অনেকদিন দেখছি,

তাই ভাল কথা বলি শোন। হাসপাতালে যা হয়, ঘরে তা হবে না।'

—'হোক্ না ছেলে ঊর্বশী ফেল মারবে, খাল গাইবে, কথা কইবে?'

—'না জানি।'

—'যে-গলায় ও গান গায় কবু সে মুহম্মদ, লোলিতা—! সে-গলা ঠিক হয়ে যাবে?'

—'না জানি।'

—'তবে?'

জনি হঠাৎ থেপে গেল। বলল, সব গলা কালীর দলে দিয়ে সাই হয়েছে। মেকে ঊর্বশীর কাছ হতে হটাতে চাও। ফোপরাও শালা, ফের হাসপাতাল-হাসপাতাল বাতাবে তো চাকু ঢুকিয়ে দিব।'

জনি চেচাতে লাগল। শালা থেকে খুন্ ঘরে যাবার কথায় বান ছুটিয়ে দিল। নার্স, ডাক্তারনী, হাসপাতালের লোকজন ছুটে এল। সবাই সন্ত্রস্ত।

—'সব শালা হটকে—হাঁ অবধ, হটাও যাও। লয় তো সমাধান ছেড়ে দিব। সবাই কালী মোতির দলে গেছে। আমি বুঝি না? চল্ ঊর্বশী! তোকে মোর আর হতে ছাড়ব না। শালা ডাক্তার হয়েছে! ছেড়ে-ছেড়ে ঝাড়াঝাড়ি করাবেই।'

ডাক্তার বলল, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

—'হুমো—র মাথা খরাপ হয়েছে। এতক্ষণ দেখছিলে না ওকে? শালা বন্ধুত্বের কথা কবে, তো ওর বুক পকেটে ছেরেছিলে কেন? আমি বুঝি না কিছু?'

ডাক্তার উঠে এল। জনির কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চেচাবে না জনি। একদম চেচাবে না। আস্তে কথা বল চলে যাও।'

—'ঊর্বশীর গলা বন্ধ হবে যাবে বলছ, আমি চেচাব না?'

—'না। চেচাবে না।'

জনি সচকে গলা নামাল। বলল, 'চেচাব না?'

—'না।'

জনি কাঁদতে লাগল। বুড়ো, ঢোলা ও ঢালিমামা প্যান্ট পরল, গায়ে রঙিন শেটি, গলায় রঙিন রুমাল, পরে নিবে জুতো, মাথায় পালকের টুপি, ওকে কাঁদুনে-বাঁদরের মত দেখাচ্ছে। যেন বাড়ির দেয়ালে সাঁটা পোস্টার থেকে সার্কাসের ক্লাউন কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে ও ঊর্বশীকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে এল।

হাসপাতালের বাইরে, যেখানে ওষুধের শিশি বিক্রি হয়, সেখানে বসে নুলো রামমামা চা খেতেছিল। জনি ওর সামনে বসল, ঊর্বশীকে বসাল পাশিবে যাবের ওপর।

রামমামা বলল, 'কি গো মোছলমান! চা খাবে? আজ যে লাল ঘাগরা দেখি!'

জনি বলল, 'চুপ যা নুলো।'

—'চল্, তু খা।'

—'যে।'

—'আলা মিঞা?'

—'যে।'

—'কি বুলল ডাক্তার?'

—'ঘাবড়াও।'

—'কেনো?'

—'গলায়।'

—'হেব?'

গলায় হাত্ড়িওলা ছেলে রামমামা বলল, 'গলায় ঘাবড়াব হব? মোকে জানচার দেখাল না জনি। আমি বড়া দেখে দেখে হুস হইছি। ঘাবড়াব হলে যাবা জাহেত মড়াপোড়া গন্ধ কেরেবে। অবে সে লুকোটার কথা মনে নেই? পালাকে খাড়ি হতে নামাচ্ছে তো হেথা আসি গন্ধ ছুটেছে। মরতে, বুলেনি জনি পালাকে অমুহুতে চোবালে, তবু গন্ধ অবেনি।'

—'মনে আছে।'

—'মরতে সব সিনিক ছড়িয়েছিল পালা।'

—'তু ফুড়তে ছেবে অমাড় বেলি।'

—'তু পালা সে ওকে আমার পয়সার কৌটো দিয়ে ভেগেছিলি। দু টাকা ছাট পয়সা!'

—'পর্বান্তকে মাল খেলি কর পয়সায়?'

—'না বলেছি?'

জনি চা খেল। ডাক্তার বলল, 'কি করি বুল তো?'

—'লোড়ির কাছে যা।'

—'কেন!'

—'এ বাবা, কালী মোতির কাম নয়। লোড়ি ভলে দিবে।'

—'এ কুথা কেন বলছিস?'

রামমামা নুলো—কনুই দিয়ে পেট চুলকে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম লোড়ির কাছে। মেরেলোকটার খাঁই খুব। ভলে ভাল বিড়ি দিয়ে যায়, ভোজটোলি চপ। একটা মড়ার বালিশ ভেবেছিল। সম্বার মড়ার বালিশ। বলেছি এনে দিব। তা, বিড়ি খাওয়ালায়, চপ খাওয়ালায়...'

—'নিজের পয়সায়?'

—'পয়সা আবার কার নিজের হয় বাবা? পয়সা তুমি কার? যার কাছে হই তার! না, নিজের পয়সা নয়। সেদিন কি বল জানিস?'

—'কি?'

—'ভগীরথ ওষুধ বেচেছিল। পার্টির ওষুধ। সেপেল্ মরতে পার্টি খাট আনতে ভেয়ে। ভগীরথ তখনি ওষুধ-বাক্সিক, সব দিয়ে হাওয়া। ও টাকা দিয়েছিল।'

—'লোড়ি কি বলে?'

রামমামা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'কালীর তু বেকার মুর্খছিল জনি। ও ভেকে মুহুম্মত করে।'

—'হুস্! কালী, মুর্খ নি। ওর মুহুম্মত কে চায়?'

—'না রে! সাচ্চা মুহুম্মত খুব ভল জিনিস রে! ভেরে খাওয়ায়, দেখে, ঘরের ভাঙ্গা দেয়া না সকল সময়ে। এই সেদিন আমায় কাহতে বলে কত কাঁদল। বলল, জনি একবার বললে ওরে জন্মভোর খুবের। তবে হ্যাঁ, ঊর্বশীকে ছাড়তে হবে।'

—'তু কি বুলেছ?'

—'বুললাম, উ কথা তু বেইমান হবে যা কালী। জনি ঊর্বশীকে ছাড়বে না, মরন যাত বল।'

—'লোড়ি কি বুলে?'

—'বুলে, কেউ যদি ঊর্বশীকে চায়। তাই বান মরা করেছে। নাইলে গলায় কান্সার হয় না। আমিও বললাম, জনি প্রানায় ছিকে ফেলত্। লোড়ি, ওর কথা আমি জানি। মোকে বল।'

—'কি বুলল?'

—'বুলল, আসতে বলিস ছেলেবে ফেলাকে।'

—'আজ যাব?'

—'আরে আজ উই লুকোটার চৌদ্দা। লোড়ি ত পাট কুড়োবার কতেছেন। বল নিয়ে হোথা যাবেবে। সব জায়গার শালা বেজার ফোলমাল! চিরকাল, জানা কুথা। লক্কার মাঠের বাঁ-পাশে ঘিয়ে-ভ্রাঞ্জ-পাইপে-ছেলের তাতে পাট কুড়োবে লোড়ির বর্ষা। ডান পাশে ধলানবলের দল। এ শালা ভিখারাঙলের কন্ত-কন্ত সব ছেড়ে, জানলি? লোড়ি কখুনো ডান পাশে যায় না। ধলানবলের দল বাঁ-পাশে চলে আসবে, হাঙ্গামা করবে। লোড়িকে জানে না। আজ লোড়ি কালি আর হামিদাকে নিয়ে যাচ্ছে। হাঙ্গামা হলে মাতলামাকে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে।'

—'কালি আর হামিদা যাবেবে?'

—'যাবেবে না মানে?...যে-বার ওরাতে থাক। হাঙ্গামা নেই। কালিকে লেক-বাজারের কুটোপাতর, হামিদাকে কমলাবাড়ির কুটোপাতর কে দিয়েছে? লোড়ি দেয়নি? কালি এখন খর কত! বাজার থেকে পাঁয়ের নাড়ী, মাথের নাড়ী, কুচকুচে মুক্তো, কালির গতর খুব। কালি বুলল, মাসি, কালি ছইতে ভেয়ার ভলবাসিনের কলাপাত মাতলামা দিতে পারছে না।'

—'আজ ওরা যাবে খুবে!'

—'হুস্! বাঙালীর ভরাদ? যে মায় মানে যাবে? তবে লোড়ি বুলল, এ হচ্ছে হকের লড়াই। ছেড়ে দিলে মান যাবেবে না। লোড়ি লড়াই খুব বোঝে। উ চলে গেলেও লড়তু বুলে লাম ছাইবে। উয় লাগে পালা কুট-পাতরের লাম দিয়ে দিব।'

—'তবে আজ যাব না?'

—'কাল যাস। পূর্ণিমের দিন, ভাল দিব।'

—'ওষুধ দিবে?'

—'দিবে না? লোড়ির ভবান্ খেলাপ নাই। সকলে যায় না যেন। আজকাল সকালে হাপ শেকটল পরে ঠ্যাঙি পেটায়। কমাচ্ছে দু-বাহুতে। হতে যায়। যা যায়, বুতল দিয়ে যায়।'

—'কালী মোতি নিবুনী?'

—'হ্যাঁ রে।'

—'রে, রিকশা ডাক্ একটা।'

—'ঘর যাবি?'

—'হ্যাঁ। বেদে-তাবে ঊর্বশীকে দিয়ে...'

—'জনি?'

—'বল্?'

—'আমি তোর ছিকে ফেলত্, জানিস?'

—'জনুর।'

—'সেই উয়োম বেলা হতে?'

—'নিচ্চয়।'

—'ঊর্বশীকে তু ছেড়ে দে।'

জনির বুকের ভেতর সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভয়ে। রামমামা, রামমামা! কত দিনের কথা ওর! ওর মুখেও একই কথা? জনির বুকের ভেতর লাশঘরের ঠাণ্ডা। জনি কি ভয় পাবে ভয়ে? ভয় পেলাই কি? কিন্তু ভয় পাবার পর কি এত ভয় থাকে, এত আতঙ্ক? ভয়লে তো মানুষ সব ভয়-ভরসার বাইরে চলে যায়? তাই তো মানুষ কথা?

—'এ কথা কেন বুলছিস রামমামা?'

—'ও তোকে ছেবে দিবে।'

—'জানি।'

জনির মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। যেন বাড়ির দেয়ালে সাঁটা পোস্টার থেকে ছেড়ে-থাকা ক্লাউন ঠিক করল, সহজকে আর হাসি-মুখ দেখাবে না। বিষণ্ণ, দুঃখ, বাঁদরের মত মোকাকুল মুখে জনি বলল, 'জানি রে রামমামা। কিন্তু তুই বুল্ রামমামা, ওকে, আমার সনমুকে মুহুম্মত করে হাসতে কি রোতে কি এতকাল কেটে গেল। এখন ওর আঁখ বন্ধ, হাসি না-দেখলে আমি মরে যাব।'

—'জানি।'

—'কেউ বাঁচবে, তু বল? তু তো জানিস, কি সুন্দর জিন্দগী, সবাই সুখ চায়। পাবলিক ওকে বুলে, কামলা হায় ঊর্বশী? ও বুলে, বহুত সুখ মে'। পাবলিক বুলে, হুম্-লোক কামলা হায়? ও বুলে, বহুত সুখ মে'। পাবলিক বুলে, তব্ তু সুখকে গানা গা! ও গায়, ও জীনে-মরলে! হাসতে-হাসতে জী না!'

—'জানি?'

রামমামাও বিষণ্ণ হয়ে গেল। বলল, ঊর্বশী জাদুকরনী, পয়তানের বান্দী, জিন্। ও যার কাছে গেছে তাকে খতম করে ছেড়েছে। তুকেও খাবে। আমার কাছে খুবে ঠিক কি?'

জনি বলল, 'আমি ওকে তার আগে খতম করে দেব।'

—'তুই!'

—'হাঁ রে!'

রামমামা নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'তবে লোড়ির কাছে যাস। যা বলে, দিয়ে যাবি। নইলে কিন্তু বুলবে না।'

—'লিচ্চয় দিয়ে যাব। ঊর্বশী লাচবে, গান গাইবে, বেরিলি যা বাজার মে' মুকেশ মিলা রে। লোড়ি যাওয়া দিবে। মুহুম্মত নিজের মুখেও চাকু ঢুকিয়ে দিব, ওর মুখেও।'

রামমামা চুক্ চুক্ শব্দ করল মুখে।

বলল, "ওই বুকে চাকু চালাবি? মরা পাখা, ওরে তুর ভাবে আমি করব না।"

জনি খেলাটে চোখ মটকে হেসে বলল, "ছমাস পরে, কবর দিবি, না লাশ জ্বালাবি? জানিস?"

—"ধুস্, পাগলা, ধর্মের ঠিক নাই।"

—"করবও দিস, জ্বালাসও।"

—"ধুস্, পাগলা, তুর কি বুদ্ধো বয়স হবে?"

—"মেয়েকে প্রায় উর্বশীকে, বুলেলি, বাস্ত ঘাসপাইপ বাজিয়ে, আসি-টিসিং বাতির ঠেলায় দিয়ে দিয়ে বাবি ভুলে ফেকে, স—ব বলে কিনে দিবি সহরের। তা-বয়সে পহেলা জ্বালাবি। তা-বাদে বাই দিয়ে কবর দিবি। ছমাস বাবি খুব সোয় বাঁচবে। মেরিকির বল, মাগনবাসের বল, বর্ষার বল, হামিকার বল, স—কে কুটপাতের বাসিয়ে খাওয়াবি। ক্যাটাকিন্ হতে উর্বশীরা বাবারা আনবি।"

—"পয়সা কে দেবে?"

—"আরে সব ফিরি করবে ছুটেকে এসে। জনি মরেছে, উর্বশী করেছে, সব দেখবি যিনি মানো, ফিরি! পালা, মরলা-মরদ্ চলে বাচ্ছে। কেউ পয়সা চাইবে? আমরা মরে ফেলে দেখবি আর কেউ হাস উঁচাবে না। গান বাজবে না, সব আদ্! হবে পদ্‌দিল্! আদ্! হবে পদ্‌দিল! ফুল বুক চাপড়ে রোতে-রোতে বহবে। পালা, সহরের সব হাস্-ফেস্ লিয়ে চলে বাব।"

বুলো রামআসা আর জনি হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে জনি উর্বশীকে জিজ্ঞাসার তুলল। উর্বশীর রেশম-রেশম চুল বাছিয়ে জনি বিড়ি ধরাল। রামআসার দিকে চেয়ে চোখ মটকে বোঝা যাচ্ছিল।

(২)

রাত পূর্ণিমার আকাশ চাঁদের আলো কলকাতাকে সস্নেহে স্নান করাচ্ছিল। যেন জোৎস্না স্নান করা নয়না, কলকাতাকে বিবাগী মজনু, জোৎস্নার প্রেমে পাগল হয়ে দোরো হয়ে বাচ্ছে, তাই এই প্রেমময়ী জোৎস্নার গন্ধাবতরণ।

রাত এখন অনেক। সমস্ত এখন প্রেম-চেতনাহীন। জোৎস্নার উৎসব করেকটি কুকুর ছাড়া কেউ এত প্রেম-প্লাবনের সুযোগ নিচ্ছে না। যেন মা কলকাতার মানুষে প্রেম ও ভালবাসার বরফার বড় কম বোধে। তারা ঘুমিয়ে পড়ে, নয়তো মেশার সন্ধানে ফেরে, নয়তো জোৎস্নার প্রবেশ পথ জানলা-গুলি বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকারে শরীর ঢেকে।

এমন জোৎস্নায়, প্রেম-স্নানে স্নান করতে করতে জনি খানে যেমন দিয়ে কাঁদছিল। মনে বড় দুঃখ ওর। এখন ওই লালসী, ওই মজনু! "আশমানওয়ালে তেরি দুনিয়া হরদম রুবরু দিয়া, সারে দুনিয়া মে' চলনী কিস্তি তেরে লিয়ে খালে মো দিয়া?"

বড় দুঃখ ওর। ওর বুকের মেরিকিও বুক-ফুক্ শব্দ করছিল। সহরে সেদিন মেরি বেদিন থেকে ওকে ফুটপাতের শব্দল রাখবার জন্যে চিন্তিত হতে হবে, সেদিনই ও গাড়ি ছেড়ে ফেলে। গাড়ি করতে কানি। তখনি ও হাফপ্যান্ট ও সোঁচি পরে, আবাস্তলাস্থিত সাদা ফুল কেটে ফেলে বর ছাটত। ফেরবে একটা লম্বা সোঁচে পাকে-পাকে জড়িয়ে রাখে, গলায় একটা কালো ফারে বাঁধা অর্মনি।

আরশি হতে। মেজে থেকে আঙুরে সিন্দুর নখ, ঘনোন পাখির ঠোঁট, মরুতে সোনালির মতন চুল, জে'ওচ সোনালির মতন সিঁদুর, সব নিয়ে খুনে জেগে ও বলল, "কিছু হবার নয় কাল আমার। বান মেরেছে কুনো সিতান। আমার আর সেদিন নাই, যে তার বানকে উল্টে বানে ফেলব করি। তোমার খুশের তুমি লাও কর। তোমার খুশের মোর বুক ফাট-ফাট করছে মানিক আমার! বাঁধ এলে, আমন হতে যে-গলায় উর্বশী গাওনা করে, কথা কয়, সে-গলায় কথা বলতে এলেনি কেন?"

জনি কিন্তুর কাঁদছিল। পরনে ঢোলা প্যান্ট, রঙিন সোঁচি, গলায় রঙিন রুমাল জড়ানো। পায়ে সেকেবে জুতো, মাথায় পালকের টুপি। ওকে মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। যেন বাড়ির মেয়েলে সাঁটা সার্কাসের পোস্টার থেকে মেয়ে এসেছে কোনো ক্লাউন। আর সে হাসবে না, হাসাবে না বলে মেয়ে এসেছে বিদ্রোহ করে। কেন না তার বুক ফেটে যেত।

ভাঙা বুকের, চিড়খাওয়া হৃদয়ের বড় দুঃখ সো। চিন্তায় বুক পোড়ে। চিতায় মানুষের চেয়ে চিন্তার আগুনে জ্বালা বেশি, দগ্ধে মরে। জনি পোস্টারের ক্লাউন হয়ে মিছে কাঁদছিল। আর সে হাসবে কেন? প্রেমময়ীর জোৎস্না ওর বুক জুড়োতে পারছিল না। ভাঙা বুক নিয়ে ও কোথায় যাবে? যে মিস্ কাঁহা সে গাই, অব কোন্ ঠিকানা হায়?

যে গলায় উর্বশী, আবুল-করুণা, বিদুষে-উজ্জ্বলা, উর্বশী, অনন্ত-রাগিনী, কলঙ্কিনী গান গাইত, দুখিয়া জিয়ারা রোতে নৈনা—গাইত, লাস যি তারিণ গাইত, তোমার গলায় গান ছিল—আমার গলায় সুর ছিল —গাইত, বাঁশকা কিড়কি বাঁশকা দুয়ারা আও বনায়ে' জরোয়া পাখা, সে গলা ভেঙে যাবে গো। অন্তে যাবে সে ঘোরবরণী—যুবে ভি সে চলো সুলোচনা পায়—জনি তাই কাঁদছিল।

ওর কান্না দেখে জোৎস্না হাসছিল, দুকুরদুলের ভালবাসাবাসি করছিল। মেরিকি সুবিধার চাঁদের দিকে চেয়ে খোলাটে চোখ মেলে জল ফেলছিল আর বলছিল, "তুমি রামআসার চিকে মেলত যাল আমার। তোমার জন্যে উল্টে বান মারি এমন খামতা মোর নাই বাপ। চোখও ভিজে না তার। তাই আরশিতে তার ছোরা দেখি নাই।"

—"তবে কানী মোতি কর?"

—"না বাপ। ও বেয়াদবে বড় জলবাহে।"

—"উস মেমে কয় লাগে যে?"

—"কয় কিসের? উর্বশীরে ছাড়। ওরে নিয়ে ঘর কর। ই বাঁধবে, বাড়বে, ছেতে দিবে, তুমিও বুড়ো হবে।"

—"কিন্তু উর্বশীরে ছাড়ি কি বলে? ও কোথা যাবে?"

—"কেউ কিনে নিবে।"

—"কে?"

—"তাই তো দেখলাম না মানিক। কে বুঝি ওরে চায় বলে বানমারা করেছে।"

—"মের তাই সদ্দ। উর্বশীর চাকরা দেখে সবার জিব।"

—"তুমি পাগল হয়েছ বাপ।"

—"পাগল ছিলাম না মাঈ, ও মেয়ে পাগল করল। তখন আমি জোয়ানটা। ওরে কোলে বসিয়ে টাপা ঠেলে ঘুরো ঘরোঁয় কত! ঢোলপুরে, বালা, বাঁশী, লালুখাসুরে, হাসিরপুরে। সে-খেলা কি-খেলা মাঈ! তখন ও গাইত, অধিকা জিলাকে জিয়া বরয়কে চলে নহী" বালা! আমি বলতাম, কাঁহা নেই পারী! ও গাইত, জানলে না জানে বুঝি, বাকে ছাতা রোহ্ নুরোঁ, সাইয়াকে পাইয়া পর পড় আউন্দি রোকে বহুরানি—অধিকা জিলাকে!"

—"সব জানি মানিক।"

—"রোদের টাপায় পিছে ছেলেরা ছুটত, কাগজ কুড়াত। পিছে হলে ওই ধমাধম ঢোল পিটাত, উর্বশী কি খেল্! জনি কা খেল্! তখন সব জনা বকর দিনকাল ছিল। ঢোলপুরে এক শেঠের ছেলে বলে, 'হাজার টাকা দিব, ওরে তুই বেচে দে। আটলের জিমায়ে ওরে বসিয়ে রাখব।'

—"সব জানি।"

—"কিন্তু সব লাল হয়ে গেল মাঈ। যে-গলায় ও গান গাব, কথা কব, সেথা কানচার।"

—"কানচার মর সোনা, বান মেরেছে কেউ।"

—"কয়রেও জান?"

—"কয়রে জানব?"

—"উল্টে বান মারতে পারো!"

—না বাপ। চৌরাচি বাজারে আনসারী ছিল—"

—"মরে গেছে।"

—"এখন ফের খোবার সোজা যাও।"

—"হায় খোদা!"

জনি চাঁদের দিকে একবার ফেরে মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগল। কানী মোতি ওকে ভালবাসে? সত্যি করে? মুহব্বত করে? পাগলনে কিন্তু তুল বকেছে কি? উর্বশীর জন্যে, উর্বশীর জন্যে। হঠাৎ মনে হল উর্বশী একা আছে। কানী মোতি জনিকে দেখে, আর দু বেলা উর্বশীকে ক্যাওচাইলা পাঠায়। জনি ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে ও আস্তাবলম থেকে পালানো ঘোড়া জনি হয়ে গেল।

•

জনাবাগানের মোড়মোড়ায় কে ওকে ফেলে দিয়েছিল? কিন্তু মনে পড়ে না। জনাবাগানটা ছিল পুরনোচণ্ডীর। রাজমের ছেলেদের সঙ্গে জনিও বাগানের পথে পথে ঘুরে ফল খেত গান গেয়ে-বেচে ফিরত। জগদীশ সিং ওর গানের গলা শুনেই ওকে তাদের দিয়ে যায়।

জগদীশ বলত, "ফল্ বেচকে দুনিয়া দিখায়।"

জগদীশ যে ব্রহ্মের পুরনোচণ্ডীজী, তা জনি বোঝেনি। ফিকের চাল পয়সা পুরনোচণ্ডীজী নিয়ে নিত। বাচ্চাদের লোভে, নুলো, কুঠে করত। রামআসাকে পুরনোচণ্ডীজীই নুলো করেছিল। জনি গাইতে গাইতে বলে ফেলে ছাড় পায়।

পালাবার সময়ে রামআসা আর জনি দুজনেই পালায়। জগদীশ রামআসার হাতে একটা মাটির হাঁড়ি দিয়েছিল। রামআসা নুলো হাতের চাপে হাঁড়িটা পথে চেপসে ঘরে জমা হতে টৈতাক বাজাত। জনি গান গাইত। ছেলের কামরায়।

ছোট বেলাই জনি জেনে গিয়েছিল মানুষ বড় সুখে ভালবাসে। পথে বেহুঁশে পেত মানুষকে সুখে রাখবার জন্যে কত আয়োজন। রাজ জ্যোতিষী —কিনা অন্ধের ভবা লোকা কালজ বিলোতে-বিলোতে ঘোড়ার গাড়ি চলে যায়। গাড়ির ছাদে বসে বাজনদার বাজনা বাজায়। সব সুখী-সুখী সুরের গান।

সুখী-সুখী গহনের সুরে বাজিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ছুটত, পেছনে ছুটে ছেলেরা রঙিন কাগজ কুড়োত। জনি বুঝত, সবাই বড় সুখে ভালবাসে। জনাবাগানের পুরনোচণ্ডীজীও সুখে ভালবাসত। ওর মা-বাবার জন্মদিনে ও জনিদের মিঠাই দিত। বয়সে নুলো, লোভী, কুঠে করে দিত, তবুও মন পড়ত না। পুরনোচণ্ডীজী একটা বড় চৌকিতে উঠে ঘোড়শনে বসত। শিবদুর্গা না-করে জল খেত না, কপালে চন্দনের তিলক আঁকাই থাকত। এক ভাঁড় লাড়ু আর পক্কা নিবে ও ছেলেদের পরনের মধ্যে ছুড়ে দিত আর হুকুম করত, "লে' উঁচা' খা' হাস্ উঁচা, গানা গা, নাচ কর।"

জনিরা খুব হাসত, গাইত, নাচত। লোভী-নুলো-কুঠে-কানারা সব ছেড়ে যেন হাসত। জনি ফেলে গিয়েছিল মানুষ আসলে সুখ ভালবাসে। পরের তখন সোনালী কাজ বাতাসকে সোনালী করে রাখত। কোনো কাজ নাত জ্যোতিষী সুখের ভাঁড়ারের ভাঁড়ারী। কোনো কাজ নাত, কোনো কষ্ট না দিয়ে বিভিন্ন সব যা সাজানো চলে। পথের ধরে ফোটাপাখি নিয়ে

খুশে আকাশটা সুখে হিলোত। সিনেমার লোকে তো খুশো মজা। শেষে সব নায়ক সব নায়িকাকে পেয়ে যেত।

অশীশ যখন আরেক পুরস্কারজয়ী হবে জনি আর রামস্রা ট্রেনের কামরার গান শেষে যে পয়সা পেত, সব মিলে মিত, তখনো তাই জনি সুখের গান গাইত। ও জানত মানুষ সুখ চায় বলে সিনেমা যায়। বত কায়রালী-কেরানী-কানেডালাস-ফিরিঙ্গলা-অক্ট-পাইকার-চকার সবাই সিনেমা যায় সুখের খোঁজে। দুঃখের সঙ্গীত, দুঃখের গান তারা সব, পরে সব সুখ সুখ হয়ে যাবে বলে।

তাই দুঃখের গান যে ছিল কান্না সে বাঁচ মনে মেয়ে নিয়ে জনি পয়সা আর যশ কী ছিনিয়ে নেয়ে সকলকে সুখ দিত। বড় সাহেব সুখী হতে পারে মানুষ। সিনেমা যারা দেখে না, পয়সা থাকে না, তারা দর্শকদের লাইন দেখে সুখ পায়। যে কায়রালীরা টিকিটের কোকানে ঢুকতে পারে না, তারা ফেলে-ছেরা ভাঁড় আর ঘুরি চেটে সুখ পায়। হাত-পা ভাঙা ভিখিরিরা চৌরঙ্গীতে গলফ স্টিক পাঁচরে খুলেছিবজীদের জনো পয়সা চাইতে-চাইতে ভদ্রলোকদের মেয়েদের দেখে সুখ পায়।

তখনি ও বুকে নিয়েছিল দলাদলির কথা ভাঁড়ুদে পালাতেই হবে। ও একা-একা সুখ বেচবে কেন জুড়ে।

রামস্রা পালায় নি, কলকাতার ছেড়ে যায়। কানী মোতি তখন কানা হয়নি। ও তখন বাড়িউলির বোনঝি। রামস্রা আর জনি কিছুদিন ফুটপাথ ছেড়ে চৌরঙ্গী-বেহালা বাসী-দের জন্যে গলত মলত।

জনি কিন ছেড়ে সিনেমার টিকিট কোলাক করত। ফুটপাথে ঘুমোত। পয়সা থাকলে হবিবের কোকানে শিক-কাবাব খেত। চাকে-যাকে গ্রান্ডে, স্টো ইন্টার্ন হোটেলের সামনে সাহেব-মেমদের টাক্সি ধরে দিত। রামস্রা বলত, 'তুই ভাল আছিস জনি।'

ফুটপাথে ঘুমিয়ে, সিনেমার টিকিট কোলাক করে, খুব সুখে থাকা যায়। সকেটে চার আনা থাকলে যে-সব ভিখিরিরা কলকাতাকে বিদেশীদের কিনে নেয়, জনি তাদের দলে ছিল। চির সুখী, স্বাধীন। সেই জন্যেই ও বাড়িউলির কথা শুনত না। মোতিকে বিয়ে কর, সংসারী হও, এ-সব কথা ওর ভাল লাগত না। কে মোতিকে বিয়ে করে? কে চায় আরেকটা পুরুষ-চাকরী, আরেকটা কলীল হয়ে যেখানে-চাঁদনীদের গতরখাটা রোজগারের পয়সায় বসী হতে?

কলকাতার বাতাসে সুখ উড়ত। জনি বলেছিল, 'তুই যেখা পড়ে থাক্ যা।'

—তুই কি করবি?'

—সুখ কিনে আনব দুনিয়া লুটে, সব কেই কো দেখা—হরির লুট করে দেব পালা! এত সুখ চাস সবাইকে দেব। কলে সব খুশো ফুটপাতের শো, হাতু খা, খলার ঘুমাল বেচে মেয়ে-ছেলে দেখ্। গানা গা, হুইস্কিতে থাক্। জিন্দগী যে সুখে সবসে বড় জুয়েল। সবার হাতের মুঠোয় জুয়েল থাকবে দেব খুশো।'

—আমি কি খুশো দেখা পড়ে রইব?'

—না রে! আমি আগে সুখ খুজে নিই, উসকে বাদ তুকে চি দিয়ে যাব।'

—তু তবে মোতিকে সাদী করবি না?'

—ধুস্‌লা—'

—উ বোট আমাকে সাদী করবে না।'

—তু খুলল যে!'

—তু চলে গেলে আমার দিল টুটে যাবে।'

—অবে! তু আমার চিন্তে মেলত্। চলে গেলে চি ফের ফেকে দিব।'

—তু যেখা থেকে যা!'

—ঠিক বলছিস?'

—সাচ্চা জবান্।'

—সব জনে আছে তো?'

—স—ব!'

—আমি মরলে তু মোর ছরাদ করবি। তু মরলে আমি তোর ছরাদ করব।'

—খুন্ সে যাই পাক্কা কর।'

—কেউ পালা!'

ছুরি দিয়ে, একই ছুরি দিয়ে দুজনের হাতে চিরে দিয়েছিল দুজনে। খুব মেলেছিল দুজনে। এক-সঙ্গে গলা জড়িয়ে সিনেমা দেখেছিল। হবিবের কোকানে শিক কাবাব খেয়েছিল। তারপর জনি হাওড়া চলে গিয়েছিল। যে ট্রেন সামনে পেয়েছিল, তাতেই চেপে বসেছিল। টিকিট কাটেনি, বেঞ্চির নিচে শুয়ে পড়েছিল।

ভোর না হতে হাঁড়ি।

জনি তখনই ঠিক করে ফেলেছিল জীবনের নকশাটা কেমন হবে হবে।

মাস্টার জনির ওরান মান শো।

হাঁড়ি, ডালটনগঞ্জ, আরো উত্তরে ছিয়ে পশ্চিম মুখে কানী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ।

একেক জীবন একেক খেলা। জীবনের নকশা খেলার নকশার মত ভয়ঙ্কর। যখন যে ছবি চলত, সেই ছবির নকশা মেখত জনি।

হাটে, চৌরাস্তায়, মঞ্চে। মজমুর গলায় গাইত, চলতি ট্রেনের কামরায়। নাকালীর গলায় গাইত, আলমীওয়ালে তেরি দুনিয়া মুখে মবক্কা দিয়া! ছিলেন হয়ে গলত, বাচ্চো, মেরা চশমেসে তেরা কলিজা নিকাল দুংগি! ভাঁড় হয়ে গ্যালারির সেপাইদের গালিগালাজ খুশে নকত।

জনির পয়সা পড়ত ঝনঝন। জনির সঙ্গীতের খেলি সুখ গলত, তারপর হাতে টিকিট কেনার পয়সা থাকে না। তারা সবাই জনির খেলা দেখত। জনি বলত, 'খুনিয়া বলো! খুনিয়া মে' সুখে চিড়িয়া। উড়তে-ফিরতে রহে। হমা চিড়িয়া পারকে তু-লোককে দিয়ে দিছি।' তারপর হয়ে সারঙ্গলের গলায় গাইত, 'বিনা পংখে পছী হুঁ হুয়!' আওয়াজের গলায় বলত, 'তানসেন! তুম এ গানা কিস্কে থাতা তানসেন?' তানসেনের গলায় বলত, 'এ গানা নহীঁ পাহানশা! যে টুটে হুয়ে দিল কা পুকারা হুয়া!' তানসেন হয়ে ও শুয়ে পড়ে বলত, 'মেরা শিয়াস খুকোও!' তারপরই উঠে পড়ে তানী হয়ে যেত। তানসেন পরনে হাত তুলে গাইত, 'বহুলো রে! কালে বদরিয়া, পিয়া পর বহুলো!'

সবকিছু সুখ দিয়ে ও দিয়ে যেত স্টেপনের প্ল্যাটফর্মে। একলা পড়ে থাকত বেঞ্চিতে। যে-জীবনের যে-নকশা! সারের মেয়রা কুকুর নিয়ে সিয়লা যেত। ওর খুব সাধ যেত একলা জীবন একটা নেড়ী কুত্তা পেলবে। নাম দেয় রোজার। কুকুরটার গলায় চেন বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। সকলকে বলে, থ্যাংক্যুহিয়ান! মানে দিতে পারি না বলে বেউটে হয়ে যাচ্ছে।

আরো অনেক সাল যেত। নৌ-ঠৈকীর কুলকলিয়াকে পাশে বসিয়ে টাপ্পা চেপে ঘোরে। বাচ্চাদের আনাকে সঙ্গে নিয়ে নচ দেখায়। চা-হোকানের পাচ্চাকে নিয়ে যাত ভটীয়ে।

কিন্তু জীবনের নকশা বড় বিচিত্র। কুলকলিয়া-আনার-পাচ্চা এ-সব কথা জনির চেয়ে অনেক সাইস-সাইস লোকের কাছে শুনে, সেইমত কাজ করে-করে, হৃদ্দ হয়ে গিয়েছিল। সবাই শুধু বলত, 'সাদী করবি? ঘর বিবি?'

জনি বলত, 'খুস্! আজাদী মানুষে বান্ধাবাঁধির করে না। সাদী করে ঘর গেরস্তা! আমি বলছি, তোদের হয়ত খুনিয়া লুটে সুখ এনে দেব।'

মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খেত। বলত, 'জিনি মালোয়ার অত সুখ হয় না জনি!'

—'জিনি যানো কিসে? আমি তুদের ছুরি দিব, কাপড়লত্তা দিব, রোজ হোটেলে নিয়ে খোল্ খাওয়ব।'

—সে তু সবাই বলে। কয়জন করে কি?'

নৌঠৈকীর কুলকলিয়ার বাপি খাড় পেতে শুনত। বলত, তোরা বিয়া করে বাঁধতে চাস। এক লাগানী আছে ওর। সে ওকে ঠিক চুড়ে দিবে। ওকে অজত্ করে দিবে।'

বন্ধুদের গলায় জনি ভি স্বাধীন সে। সেই খানেদে, হা-হা করে হাসত। বলত, 'ছাড়িয়া না-রাজ মৌনি। তব তু চলে চল্। তু মোর লাগানী হবি?'

—'অত্ না না!'

—'অবশি তো তুই ও।'

—'তুই আগে করবি।'

—'আমি মরলে আমার চিন্তে মেলত্ ছরাদ করবে। খুন্ সে খুন্ মিলাকে

পালা যাত। আমার মড়ার আগে গিয়ে গাদা বাতির রোশনাই যাবে, বাজনা বাজবে, বত লোককে আমি সুখ দিয়েছি, সবাই বুকে হাত চাপড়ে হায়! হায়ে দিল্! হায়! খুনিয়া কে খুশিতি রোশ্‌নি বুত গইল্! বলে কাঁদতে-কাঁদতে যাবে। তু মরলে মেয়েরা এসে ফেলাবে।'

বুড়ি ওকে মারতে যেত। জনি হেসে পালাত। কিন্তু একদিন কুলকলিয়া ওর কাছে এসে পা ছড়িয়েছিল। বলেছিল, কুক্ষণে মেয়ি মুহেন্তত হয়ে গেল জনি। তুকে বিনা কিছু ভাবতে পারি না। ঘর চাই না, সাদী চাই না, তু মোরে নিয়ে চলে চল্।'

—কোথা?'

—যেথা যাবি?'

বড় ভয়ঙ্কর-সুন্দর মেয়ে ছিল কুলকলিয়া। মুখে কলঙ্কের দাগ ছিল, বং মাজা-মাজা, কপালে উল্‌কি। শরীর যেন কুচকুচে কালি, হাঁটলে পরে উছলে-উছলে পড়ত।

জনি বুঝেছিল, কুলকলিয়ার চোখের দিকে চেয়েই বুঝেছিল, ছুরি চলে গেছে মেয়েটার কলিজায়। সাদী না করলে যে জনির পাশে বসে টাপ্পা চেপে শহরে ঘুরতেও রাজী নয়, সে যেখানে নিয়ে যাবে জনি, সেখানে চলে যেতে চাইছে?

জনির ভয় হয়েছিল। বলে কি মেয়েটা? জনি ফাটপুলে, ভবঘুরে। আজ এখানে, কাল সেখানে ঘুরে বেড়ায়। জনির কোনো আস্তানা হবার স্বপন নেই। জন্ম থেকেই ও আস্তানা। জনি জন্মে সুখ এক পাখি। সে পাখি ছাড়িন পালক সুখে ডুকে উড়ে বেড়ায়। জনি বারবার সেই পাখি ধরে এনে বেন্ত কায়লা উদোমপায়া মানুষে-দের হাতে। জনি কি করে নৌঠৈকীর কুলকলিয়ার ভরন্ত-পুরন্ত শরীর, প্রেমমর্ত রক্তাক্ত হৃদয়ের দায়িত্ব নেবে?

জনি পালিয়ে গিয়েছিল। কুল-কলিয়ার বাসির অভিশাপ বোধহয় ওকে তাড়া করছিল। নইলে কেন ও ঘরে বোম্বাই? কেন ভদ্রলোকের ছেলে হারিদ ওকে বলবে, 'ফিসের মাস্টার জনির ওরান মান শো? আমার উর্বশীর খেল্ দেখেছিস?'

—যেখানে দেখবে।'

—'যেখানে আসে পাইসে ভদ্রলোক-পক্ষ ফিরোজার তাকিয়ে পরে লিখি জনি। নইলে উর্বশী তোকে ফিরানা করে দিবে।'

—'আরে যেহ, অমন অনেক উর্বশী দেখেছি।'

—'এমন দেখিস নাই।'

—'কি আছে তার?'

—'কি না?'

—'হেহ। অমন বাত সবাই করে।'

উর্বশী সেদিন সেপেনারাল-কাটুলি-ওড়নী পরেছিল। সিথির পাশে কাচ্চা, গলায় মালা, কানে কমলো। হারিদের মেসে বসে উর্বশী গান গাইছিল। বাত করছিল। উর্বশীর গলের ঝ অংশেরার মত, বুক যেন

পুরুষ নারীপাতি, চোখ গন্ধের পার্শ্বচিত্র মত, ছুটু আকাশে উড়ন্ত চিল, ঠোঁট ফুটন্ত গোলাপ—

দেখে জনির মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এমন উর্বশী, তবু ওর খেলায় ভিড় হয় না কেন? উর্বশী কাঁপিকেশে খলার গান গাইছিল, বাত করছিল। ভাঙামি করছিল।

খেলা ভাঙতে হাজির জনিকে বলেছিল, 'মোর সাথে আয়।'

—'কেন?'

—'উর্বশী মিঠা গাইবে।'

—'আমার কোলে বসবে?'

—'আমার কোলে, তোর কোলে।'

নতুন-নতুন খেলার নকশা জনিই বানিয়েছিল। আশ্রমে জনি সাদা লেখাপড়া শিখেছিল। তারপর সুখের পাখি ধরবার নেশায় ঘেসে-ঘেসে ঘুরতে-ঘুরতে কাজ চালানো হিন্দী, ইংরিজী, মারাঠী, গুজরাটী শিখেছিল।

সিনেমায় বই কিনত হরদম। বলত, 'আ রে হামিদ, ইনভেস্ট না করলে বিজনেস্ হয়?'

বলত, 'খেলার নকশা হবে কমেডি কিনিস্'। হ্যাপি এন্ডিং। শেষ, ক্যামাক মে' পরলা হিরো পরলা হিরোইনকে কমেডি। দুসরা পার্টিতে টাজিডি। টাজিডি কিনিসে মানুষের মন ভারি হয়ে যায়। কমেডি কিনিসে মানুষে হাসের মধ্যে সুখ কি চিড়িয়া পেয়ে যায়। কমেডি কিনিসে মজা।'

এখনো অন্ধো ঘুমে, উর্বশীর পাশে শুয়ে জনি হামিদকে দেখতে পায়। হামিদ কাঁদছে হা-হা করে। বলছে, 'মনের লিপায় তুর কাছে টেক দিতে দিলাম জনি। ওকে নিস না। ওর মুখ না দেখলে আমি মরে যাব। তাঁহা তোকে টাকা দিব। টেক তু লিস্ না।'

—'জান্ পালা, টাকা কে চায়?'

—'তোর বুকে চাকু ঢুকে দিব জনি। ও জানুখরী, জনি। আমি ওকে লাহোরসীর কাছ হতে আনি। আমার কাছ হতে তু ওকে নিলি? আমার জান থেকে জানুখরী তোকেও সাজা দিবে রে।'

জনি কি তা জানত? আহা হা! কি-সুন্দর, কি-সুন্দর! তোরি গোরে যখন মে' গোরী কলে কলে আখিরা।

সেদিনই বোম্বাই ছেড়ে পালায় জনি উর্বশীকে নিয়ে।

কানপুর, কাশী, অযোধ্যা, বিহারী, পেশোয়ার, লাহোর, করাচী, হায়দ্রাবাদ, কত-কত জায়গা। সব জায়গায় জায়গীর উদোমপোয়া লোকেরা চোখে-ঘরানায়-কুটনামে-পথে সুখ কি চিড়িয়া হতে বলতে চায়। ফুটো পয়সার কারবারী সব। পকেটে পয়সা থাকলে মালা যায়, মাজা যায়, জনির খেলা দেখে। পয়সা না থাকলে দুনিয়ার নামে কোনো মামলা ঘরের না করে ঘরে যায় পথে।

কিন্তু দিন কারো সমান যায় না। সেদিনে, মৌজের দিনে, জনি মামা-ঘরকে ছেকে এনেছিল। ঘরওয়ালা বাজনা বাজাত এক ঘরতে। নুরো হাতে কন্তর ঠেকেন। টাকার অঙ্কে জনি আর উর্বশী ঘরে ঘুরত। জনি সোনালী কুমকুম ঘাটনে উঁড়িয়ে বাতাসকে সুখের পাখির সোনালী পালকে রঙিন করে দিত। তাম্বিনে সারা লোক জেনে গিয়েছিল জনি উর্বশীর মহব্বতে দিওয়ানা। উর্বশী শুকিস্তা, জনি উসকে বলবলে। সুখপালক কাঙাল ছেলেরা গাড়ির পেছনে ছোড়ে-ছোড়ে কাজল ঘরত।

রাসপূর্ণিমার প্রেমময়ী জোছনায় নির্জন পথে ছুটতে-ছুটতে জনি বুড়ো হয়ে হেতে লাগল। ওর চার-পাশ থেকে সুদিন ঘরে ঘসে পড়তে লাগল। শরীরের হাওয়ায় ভরা পাতা আমলকী ঢাল যেন। সবল পাতা ঘসে পড়ে এক সময়ে যেমন নিষ্পত্র নাড়া ডাল শুধু থাকে, তেমনি করে সুদিন ঘসে ঘরে পড়ে জনিকে নাড়া করে রেখে গেল।

একদিনে সুদিন যায়নি। ছমে জনির খেলা আর যেমন লোক টানত না। তখন বড়-বড় জাঁক জাঁকালো শহর ছেড়ে বর্ধমান, কেন্টনগর, শিউড়ি, বোলপুর, বহরমপুর, রাম-পুরহাট। ছোট্টা তাঁবু, চকমকে বাজনা। জনির ঢোলা প্যান্ট, রঙিন শোর্ট, চকমকে জুতো, প্যাসক বসানো কাপড়ের টুপি হলে চলে।

কিন্তু এ খেলা ভালবাসার খেলা। জনি না হয় উর্বশীকে তিরিশ বছর ভালবেসে-বেসে দিওয়ানা, মজনু। লায়লীর তো চাই কুটো মোতির হার, খেলোয়াড়ী চুড়ি, শাড়িনের ঘাগরা। তারপর কলকাতা। তাঁবুতে ঢুকে পড়, উনিশ পয়সায় খেল্ দেখ। চকুকের খেলা, ছাদের খেলা, তারকেশ্বরের খেলা, গাঁজা পার্ক, দাপর মাঠে খেল্।

মোতি এখন এক ছোট মা শীতলাকে নিয়ে কানী মোত্তি। মোতির অবস্থা পড়েছে। বেলারী-চাঁদনী-খেলনালালীরা একে একে কাণ্ডাভাঙা সই হয়েছে।

কানী মোতিই ওদের কেরবানদের পেছনে বসিয়ে এনে তুলল।

জনি মুখ ভার করে বলল, 'তোরও এই হাল?'

—'হবেনি?'

—'এমন হল?'

—'হল।'

কানী মোতির চেহারা হাসপাতালের সামনে ফুটপাথে চায়ের দোকান ছিল। পয়সিন্ বাজের দোকান, পয়সিন্ বাজের তাঁবুর নিচে ইট পেতে বেচি। কয়লাভাঙা চা আর ছেড়া বিস্কুট। ভাঁড়ে ভাও, ছেলে দাও।

কানী মোতি জনি আর উর্বশীকে ঘর দিল। পিলখেজুরের চুকরো আর পচা পয়সিন্ ঘরের ভাড়ায় পার্টিশান করা তিনখানা ঘর। কানী মোতি বলল, 'দশ টাকা ভাড়া দিস জনি।'

ছিন্তি বাড়ি। গলা পচা ঘর। একটা ঘাটো পায়খানা বাইশটা পরিবার ব্যবহার করে। মোত্তির মত আরো বহু ঘর, বহু ঘরওলী আছে বস্তিতে। ছোট্ট ছেলে ঘেরে, বুড়ো-হাবড়ারা ঘেরুয়াড়ায় ঘসে। ঘায়লার গন্ধে বাতাস ভারি।

জনির বুক ভারি হয়ে এল। এই ঘরে উর্বশী থাকবে? উর্বশী নির্বিকার। জনির বুক অন্ধো ভারি করে দিল কানী মোত্তি। খেল্ দেখাবার পর কাদতে কাদতে জনি ঘরে যায়।

কানী মোতি মিহারির কাছ এনে ঘের। হেকিমী দাওয়াই, সওয়ালীরের মাদুলি।

—'কেন এত করিস মোত্তি?'

কানী মোত্তি বলল, 'ওই উর্বশী তোকে খেল জনি। ওকে ছেড়ে দে তুই।'

—'কিন্তু, কয় মরদ?'

—'তোর সাথে থাক্।'

—'ঘুরে হ ভাইনী।'

কানী মোত্তি কেঁদে উঠে ঘেল। কিন্তু আজ সাত বছর ঘরে ও জনির কাছে ভাড়া চায় না, দিলে পরে নেয়। চা-বিস্কুট-পাউরুটি-মিহারি ও মদের কাছ নিয়ে আসে। জনি ওকে ডাইনী বলে। মোত্তি বলে, 'একদিন ওই ডাইনীকে আমি পুড়াব।'

কানী মোত্তি যখন ছেলে কথা বলে, জনির ভয় করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে কানী মোত্তির বুক কান্নার ছেড়ে গান উঠে আসে। কানী মোত্তি সেই সব রাতে গা ছাড়িয়ে ঘসে হাজার ওষুধ ঘেয় আর গান গায়। জনির যেমন সব গান পুরনো, কানী মোত্তির সব গানও তেমনি চেনা, আদির, সবল পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন দুঃখের কথা। কানী ঘেহির বিস্তরে গায়,

"চাঁদের অমোর সমান
তুপলী ছিলাম
তোমরলির সমান রূপ মো!
বাড়িতে পরিতাম
ঘেনারসী শাড়ি
ঘেহেরে দাঁড়াত
কত জুড়ি গাড়ি
ঘরুরা আসিরে
কত হকমবাসিরে
চাঁদনি বলে
ডাকিত মো!"

এমন গান শুনলে জনির বুক চরছে। কলকাতায় আজীবন থাকার কানী। সুখের বরতায় বুঝল না?

ঘরে গোছে ঘেল জনি।

বাতাসে দুর্গন্ধ। চাঁদের অমো, সূর্যের রোদ এ বস্তিতে ঢুকতে ডরায়। জনি লক্ষ্য করল। উর্বশী ওর দিকে চেয়ে ঘুম অন্ধে বিছানায় বসিয়ে ঠেস দিয়ে। একা জনি বুঝল উর্বশীর চোখ অভিমানে ভারি।

—'আ মিয়া মেরি জান!'

জনি উর্বশীকে চলাস করে চুম্ ঘেল। উর্বশী সাড়া দিল না। একে-বারে চুপচাপ।

জনি বুঝল, উর্বশীর চোখে কি চুন।

—'লোড়ি কিছু কহন না রে। ছলে তোর তরে কেউ যাদুমারা করেছে। লে,...গুলি খায়্ ফজুল যাতে। কাল খেল্ আছে। আজ তোকে নিয়ে পায়ার করব।'

লোড়ি যে ঘোলোটা ঘেরত দিয়ে-ছিল, ঠোঁটে ঘিলি খুলে জনি উর্বশীর দিকে তুলে ধরল, 'চিয়ার্স্'! আজ রাতে শুধু পায়ার করব। আ

চাঁদনী লাইলী! মোকে দিওয়ানা করে দিল।'

ভাওড়া বুল ছেলেরা দিল এক গোত্তা। লাল পাগড়ি আর সবুজ কোট পরল। বোতল গলায় ঝোলাচ্ছে। মাথার ভেতর কিংবদন্তীও ঘুরপাক খাচ্ছে। মাথায় চুঁলি পরতে-পরতে চোখ টিপে জনি বলল, কি জানে বোরি? কি জানে ডাক্তার? আমার কোট-পেন্টুলন পুরোনো, চটাকটো? তেরে কারণে নতুন বানায়া কিনে দিই নি। কেন্ জানে নতুন আমা তিনি বল্?'

উর্বশীর বুকে হাত বুলিয়ে জনি বলল, কাল থেকে দেখবি সব বদলে যাবে। এমন খেল্ দেখাবি, এমন গানা গাইবি না, লোকে বলবে কিন্ খেল্ দেখা!'

উর্বশী কথা বলল না।

—আজ বিরাট্দাদা করি। কাল আবার অহঙ্কা জিনে দিব উর্বশী। তু মোরে ছেড়ে যাবি না বল্?'

উর্বশী নিরুত্তর।

—কাল সেই গলাটা হবে। হুহুরে আর্তি করব, উর্বশী তা খেল্। উ মোর লবলা, আমি ওর মজনু। ভদ্রলোকরা ওর লক্ষ্মী। হেমন্তদা যা বলবেন, উ ভাবিব লিবে। যে গানা গাইবেন, উ গাইবে। যে যা বলবে, সে—ও করবে।'

উর্বশী নির্বিকার।

জনির চোখের সামনে সব ঘোরা ঘোরা। মাথার কিংবদন্তীরা চক্কর মারছে। পুরনোকালী বলীস, হেমন্তদা, প্রমিত, সুলেখাদি, মোহিত, মোহিনী, ডাক্তার সবাই হাসছে। আঙুল দেখিয়ে বলছে, 'তু ছেরে গেলি জনি।'

—ভাঁড় নেই! জনি গর্জে উঠল। বাঁকুন কোট-পাগড়ি, বেবুনে জুতো, মাথায় চুঁলি, জনি বলল, মোরে হারাবে কে? বাতাও? হাঁ, হাম জনি হারে। বেল্কদা, বেল্কদা' আমি তুমের সুখের চিড়িয়া করে এনে দিই নি?'

সবাই হাসছে, অবিশ্বাসের হাসি।

জনি বলল, 'মোরে হারাম কোন? উর্বশী মেরা মালিক, আমি উস কী বন্দা। উর্বশী গানা গায় আরশা মহলেবালা! তুরা জানিস না? উ গায় তখন ইন্ লাভ এভিন! তোরা জানিস না? খেল্ খতম হলে তোরা ওরে শুবাস না? তুর কামনা হায় উর্বশী? আরে উ বাতাতী নেই। সুখ মে' হুঁ? আমি সুখে আছি, ভাল আছি গো! জনি মেরে রানী করে রেখেছে। তোরা বুঝিস না, মোরা কেমন আছি উর্বশী? ও বুঝে না, তুমরা সুখে আছ গো, ভাল আছ?'

ওরা চলে গেল। হঠাৎ জনি দেখল ঘুঘু ও আর উর্বশী। জনি উর্বশীকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'বল্ মোরে ছেড়ে যাবি না? বল্ উর্বশী, তুকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাব।'

উর্বশী নির্বাক।

—'লেক্ষো নিবাব? আঁধারে তো তু মোর সঙ্গে বাত কহিস? সব শুনতে পাই আমি। লেক্ষো নিবাব?'

উর্বশী কথা বলল না।

জনি কাঁদতে লাগল। গলা পচা ঘর, লক্ষ্মীর আর ঘুপসে বোঁয়া। উর্বশী এখা ভুবনমোহিনী হাসি হাসছে।

জনি কাঁদতে লাগল।

'উর্বশীর খেল্! জনি আর উর্বশীর খেল্! এ সাঁঝিনে লাস্ট শো! উনিশ পয়সা টিকিট। কেন, আর ঢুকে যাও।

পর্দা সরে গেল। জনি ঢুকল, চেয়ারে বসল, কোলে উর্বশী।

আজ জনি মুখে রং মেখেছে। সকালে চুঁলিতে নতুন পালক গুঁজেছে।

উর্বশীর পরনে আজ বোলেরোর ঘেরাটোপী, মাথায় কুটো মোতির মুকুট, গায়ে বোলেরো জরির গয়না।

জনি বলল, 'আজ উর্বশী এমন খেল্ দেখাবে, যেমন কাপোনরা দেখেন নি। উর্বশী, পার্বলিককে হ্যালো বল্?'

—হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো পাবলিক! আমি উর্বশী! আই অ্যাম উর্বশী। নাম হুঁ উর্বশী।'

পার্বলিক বলল, 'তুমি কি-কি করতে পার?'

—গানা গাই, নাচ করি, বাতচিত করি।'

—গলাটা ভাঙা-ভাঙা কেন গো?'

—তুমি যে লাগর সেজে আইস-ক্রিম খাওয়াল?'

হাসির হুল্লোড় উঠল।

—উর্বশী, একটা গান গাইবে?'

—কেতা গানা? কি গান? হুইচ সং?'

—এক হিন্দী, এক বাংলা, এক ইংলিশ।'

উর্বশী হাসল, মাথা নিচু করল। ঘাড় হেলিয়ে জনিকে কি-যেন বলল। জনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

উর্বশী বলল, 'এক লাগর আইস-ক্রিম খাওয়াল, এক লাগর ঠাণ্ডাই সরবত, গলাটা তেমন মুতে নেই। লরম-লরম গাইব?'

—না না, গরম-গরম গাও।'

উর্বশী গাইতে লাগল,

"চলতে-চলতে আল্বিদা মত্ বোলো!
"ফিলিমিলি কহকর ছুঁড়ি
নেহারল রানী গো!"
"হেল রে মিঁ!"

—'বাহা রে বাহা! গলা ছেড়ে মনে হচ্ছে যে গো আজ!'

—'লালবাজার উপহারে।'

—'তবে বাত কর।'

—'তোমরা শুবাও।'

—'আরে উর্বশী! হাজার টাকা পেলে কি করবে গো?'

—'আমি আর জনি ফুর্তি করব।'

—'সাথে টাকা পেলে?'

—'তোমাদের নিয়ে আমি আর জনি ফুর্তি করব।'

—'যদি সাথে টাকা পেলে?'

উর্বশী খিলখিল করে বলল, 'সুখের চিড়িয়া করে এনে তোমাদের হাতে ধরিয়ে দিব।'

—'কি হল? চুপ করলে কেন?'

—'তোমরা বল না।'

—'গলা এত নিচু কেন? লাজ লাগছে?'

—'লাজ লাগছে।'

—'জনি ধরছে কেন?'

—'ও মোরোটা, বুড়ো ভাতারী!'

—'উর্বশী, তুমি কেমন আছ? আমরা কেমন আছি? তুর কামনা হায়? হুহুলোক কামনা হায়? ছেরে বাতাও, ব্যাসনা বাতাতে গো! পরনা দিয়ে চুকিছি, তোমার কথা শুনতে পেছি না জান!'

উর্বশী চুপ করে রইল। জনির চোখে আতঙ্ক। উর্বশী কথা বলে না কেন?

জনির চোখে আতঙ্ক।

—'কা হুয়া উর্বশী?'

উর্বশী নিরুত্তর।

—'কা হুয়া? খেল্ খতম তো করো!'

উর্বশী ভয় আতঙ্ক, কোলে ঘরে গলা ভুলে গেল। সহসা উর্বশী চেঁচিয়ে উঠল। বড় বিপদ, ফাঁসি-ফেলে, কামারদা আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল উর্বশী।

—'আমি ভাল নেই গো! মোর গলা বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি হাসব না গো, গান গাইব না। বাতচিত করব না গো পার্বলিক। সুখের চিড়িয়া যে ঘরে এনে তুমাদের দিত, যে ঘরে আনত সুখ কি চিড়িয়া, সে উর্বশী আর সুখে নাই গো। কেন জান? মোর গলা বন্ধ হয়ে গেল, গলায় আওয়াজ বেরোবে না আর! সব বন্ধ হয়ে গেল গো পার্বলিক! আমি ভাল নাই গো, সুখে নাই, তোমরা কি করে ভাল থাকবে বাতাও? তুমাদের সকল সুখ কেড়ে নিলে মোর গলা।'

পার্বলিক হতবাক।

মুখচাপা, নিচুস্বর গলায় উর্বশী বলল, 'মোর গলা যে চলে গেল, আমি আর ভাল নাই! ভাল নাই! ভাল নাই!'

—'ভাল নাই গো!' বলে উর্বশী বুক ভাসিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ কান্নাটা, চীৎকারটা থেমে গেল। পর্দা পড়ে গেল। সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত পার্বলিকের হৈহৈরৈরৈ, চীৎকার, ভীষণ, ভীষণ, ভীষণ চীৎকার করল সকলে, 'কি হল? কি হল?'

ভেতরে কি ভাঙছে, চুরছে, ধমাস ধমাস শব্দ। বিভ্রান্ত, কৌতূহলী, আতঙ্কিত জনতা স্টেজে উঠে পড়ল, পর্দা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর সব কোলাহল থেমে গেল।

নৈশব্দ, নৈশব্দ, নৈশব্দ।

পার্বলিক সভয়ে দেখল জেন্টিলো-কুইন্ট জনি, এর কথা কওয়া পুতুল উর্বশীকে বলে-কয়ে ভাঙছে আর হা-হা-হা করে কাঁদছে।

জনির মুখ ও বুক চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে, ঠোঁট নড়ছে। ঠোঁট বলছে, 'আমি ভাল নাই গো। কেন না আমার গলা বন্ধ হয়ে গেছে।'

কিন্তু গলা চিরে একটুও আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

— শেষ —

বিকাশ সিং : আকাশবাণী জামশেদপুর-এর নানী কো চেলা-র তবলা পরিবেশন করে

# অসিত গুপ্ত

# অন্ধকারের রং

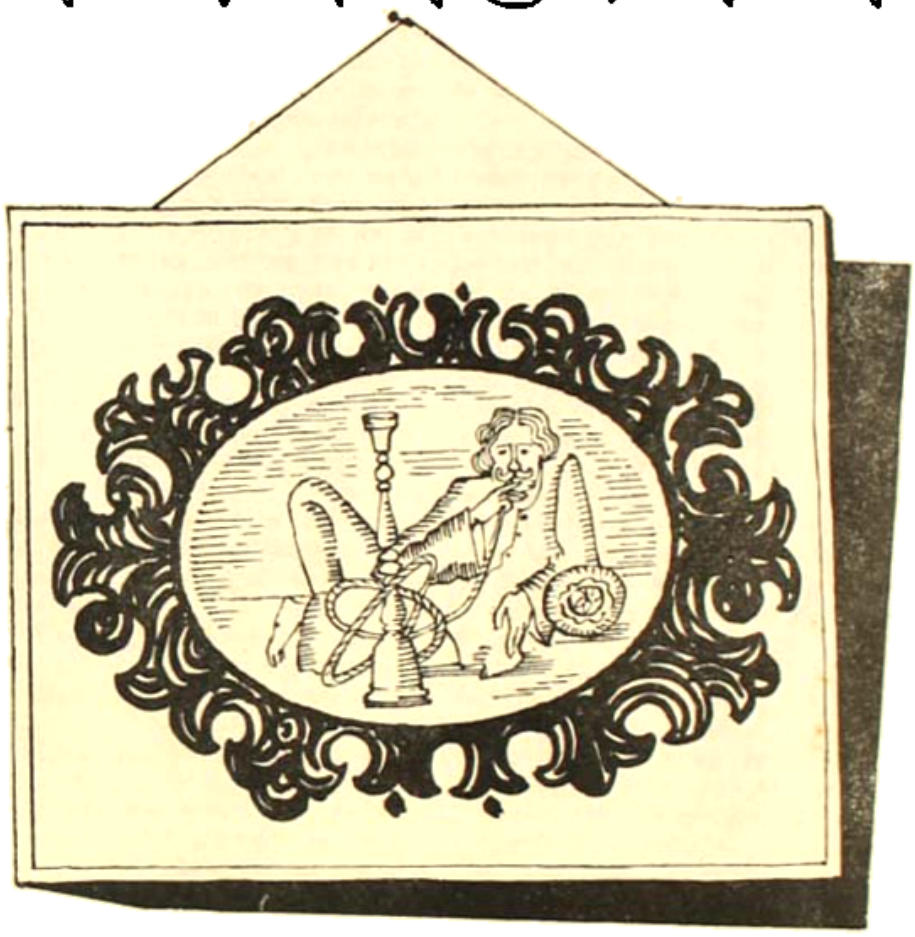

সামনে পুরো; চেনাচেনা আর মাপদশেক বাকি।

খোলা জানালা দিয়ে বাইরের নতুন হিম-ভাব আসছিল।

সূর্য মল্লিক গল্পের সিকোয়েন্স চলার সময় কয়েকবার ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তাহলে কী ঠিক হল?'

দীপক রায় জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। নীচে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট-এ সন্ধানের অন্ধকার। স্ট্রীটলের লাইন শব্দদেহের ছোটো পাতা। মনে মনে চোখের আলোয় সূর্য সেই দেহ ছেঁকে উঠছিল।

রাস্তাঘাট প্রায় নির্জন। চলে-যাওয়া রিকশার দু-একটা ঠুংঠাং শব্দ। একটা ট্রাম চলে গেল, তার জানালা-খড়খড়ি বন্ধ। উল্টো দিকের বাড়ি-গুলোর সব অন্ধকার-ঘর; বাড়ি আর সহজে ধরা যায় না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তবে একটা বাড়ির আবছা চেহারা ফুটে ওঠে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কে একজন কান্ত হয়ে খেলকুলে ঝিঙ্গী করছে চাইছিল। দীপক রায় হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে নিজের চেয়ারে এসে বসল।

—'আমার তো মনে হয়, আলো-বাবুকে আপ্রোচ করা উচিত।'

সূর্য মল্লিক টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলেন। কানে হাত দিয়ে দেখে নিলেন, শ্রবণ-যন্ত্রটা ঠিক আছে কিনা। আবছায়া ঘর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। শুধু টেবিলের ওপর একটি আলো জ্বলছিল। তাতেও আনাচকানাচ ঢাকা পড়ছিল।

সূর্য মল্লিক সিগারেটের প্যাকেট বের করে বললেন, 'বেশ। তবে কালো হলে কিন্তু আমি জানি না...' তাঁর হাতে গোমেদ। ফিকে-করা পাঞ্জাবীর গলায় সোনার বোতাম। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। মেশ-লাইটের আলোয় তাঁর ফর্সা মুখ লালচে দেখাল।

এক আকাশে নাকি সূর্য-চন্দ্র ওঠে না। কিন্তু মাহেন্দ্রক্ষণ-এর সবাই জানে সূর্য মল্লিক একা সূর্য-চন্দ্র দুই-ই। তিনি থিয়েটারের মালিক, অভিনেতা। কথা একটু কম শোনেন; তার জন্যে 'হিয়ার-এড' আছে। তবু কেউ বলতে পারবে না, কখনো তিনি প্রম্পট্ শুনতে পান নি বা পার্ট ভুল করেছেন।

'লব'-এর ভূমিকায় অভিনয়-জীবন শুরু হয়েছিল। শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে এক সময় সেই পার্ট করতেন জীবন গাঙ্গুলী। 'লব'-এর সুন্দর গলা শুনেই তো রামকে ফিরিয়ে দিতে বলতে হত, 'ভাই, কার ওই কণ্ঠস্বর?'

হা সূর্য মল্লিকের গলাও খুব সুন্দর, মিষ্টি।

'হিমরুমারী'তে সন্ন্যাসের, সাজা-হলে-এ কারা এসে কি মূর্তিবাবুর কথায় একবার 'চিরকুমার সভায়' 'সূর্য'-র পার্টও তিনি করেছিলেন। সম্মিলিত রজনীতে, বড় বড় অভি-নেতা-অভিনেত্রীদের সামনে অভিনয় করতে হবে ভাবে।

মাহেন্দ্রক্ষণ থিয়েটার এ শনিবার, রবিবার এক নাটক হয়ে আর বৃহস্পতি-বারে আলাদা নাটক। বৃহস্পতিবারের নাটকে সূর্য মল্লিক নিজে নির্দেশিত অভিনয় করেন। তাতে বড় অভিনেতার বড় পার্ট, তাঁরও অভিনয়ে বেশ মেজাজ হয়।

অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না; কিন্তু দীপক রায়ের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠেছিল। সূর্য মল্লিকের মনের কথা সে বুঝতে পারছিল। নতুন নাটকে সূর্য মল্লিক অলোকবাবুর পার্টটা করতে চান। চরিত্রটা সাংঘাতিক; শেষ বয়সে—একটু ভালো

অভিনেতা হলে, হল্ ভেঙে উঠবে। এইসব ভূমিকা যে-কোন অভিনেতার স্বপ্ন।

দীপক বার সাবধানে ঘুরিয়ে জিগ্যেস করল, 'কমলেশ হাজরা বলছেন?'

—'হবে না?' সূর্য মল্লিক হাতের সিগারেট ছাইদানিতে নামিয়ে রেখে আহ্লাদে মটকালেন। আবার অর্ধেকটা সিগারেট তুলে নিলেন। হেমন্তর কোন খারাপ নেই। অলোকবাবুর সঙ্গে কাজ তো করেনি। দু-পাতা লেখাপড়া করে আর দুটো আমেচার ডিরেক্টরের ডায়েরী ঘেঁটে তুমি ভাবছ, সব জেনে ফেলেছ। অলোকবাবু বড় অভিনেতা, সন্দেহের অভিনেতা সব ঠিক, কিন্তু তাঁকে নিয়ে নাটক করা খুব কঠিন...'

—'কেন?'

—'কেন কী?' সূর্য মল্লিক বিরক্ত হলেন। হেমন্তর বুদ্ধির চুড়ান্ত আর কি। ওঁকে রাগাতে ছেলে প্রফুল্লদার, ডিরেক্টর-এর কাছে, তাদের দুই-ই খাতা দরকার। লোহাগড় হতে পারবে?'

মহরমহল' থিয়েটারের দোতলার সূর্য মল্লিকের নিজের কামরার ঘর। তাঁর সামনে লম্বাটে টেবিলের মতো প্রকাণ্ড টেবিল; নিজের জন্যে হাইব্যাক চেয়ার। টেবিলের ওদিকে আরও কখানা কুশনআঁটা চেয়ার। তার এক-টায় দীপক বসেছিল। পরশুদিন নতুন নাটকার হীর্ণকের চট্টোপাধ্যায়। এতক্ষণ সে একটাও কথা বলেনি। এক প্রকাণ্ড আশ্চর্যকে বুকে লুকোচ্ছিল। তাই নাটকের কথা আলোচনা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি হয়, কে জানে! যদু বসেই সূর্য মল্লিকের কামরার ঘরের চেয়ার পর্যন্ত পৌঁছনো গেছে। হয়তো এই ঘরেই তার সমস্ত স্বপ্ন ছোট্ট চুরমার হয়ে যাবে। থিয়েটারে এমন তো কত শোনা যায়!

হীর্ণকের ভেতরে যদু কড়-কাঠটা চললেও বাইরে সে খুব শান্ত, সহজ থাকবার চেষ্টা করছিল।

সূর্য মল্লিকের পেছন দিককার দেওয়ালে রামকৃষ্ণের ছবি আর সামনের দেওয়ালে ঘরে ঢুকতেই গিরিশচন্দ্রের ছবি। দুটোই তখন অন্ধকারে ঢাকা। টেবিল থেকে হাত কয়েক তফাতে আড়াআড়ি একটা ইজি-চেয়ার। তাতে কেদারবাবু শুয়ে ছিল। টেবিলের আলো তার মুখে নেই, শরীরে নেই—শুধু হাঁটুর কাছে সোজা হয়ে পড়েছিল।

কেদারবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল; হাতের উল্টো পিঠে দুই চোখ রিতে রিতে বলল, 'তাহলে, সময় কই? দেখতে দেখতে পুজো এসে পড়বে। এর মধ্যে অলোকবাবুকে রাজি করে রিহার্সেলে আনাই শক্ত হবে। অন্তত কটা দিন তো সময় দেওয়া চাই। নইলে টীম ওয়ার্ক হবে কেন?'

সূর্য মল্লিক কেদারবাবুকে সমর্থন করে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক। অলোকবাবু যদি পার্ট করতে রাজীও হয়, ড্রেস রিহার্সাল-এর আগে সে একটা ডায়লগও উচ্চারণ করবে না—এই তোমার হলে রাখলুম, ডিরেক্টর। তাছাড়া, দেখে নিও কত রকম বায়নাক্কা—এখানে বলাও, এটা এ রকম করে কর—বাস্তবানুগ হবে যাবে। তবে আমি তোমায় কিছু বলছি না বাপু, তোমার যদি মন হয়...'

দীপক মৃদু হাসল। 'বলতে আর কি বাকি রাখলেন, মল্লিক মশায়। আমি কিন্তু...'

দীপক হাত বাড়িয়ে সূর্য মল্লিকের সিগারেট নিল। 'এগুলো খান কী করে? কড়া লাগে না?'

সূর্য মল্লিক দীপকের হাত থেকে প্যাকেটটা ছোঁ মেরে তুলে নিলেন। 'ওসব তোমাদের জন্যে নয়।' বলে পাশের ড্রয়ার খুলে নামকরা নামী দামী সিগারেটের টিন বের করে এগিয়ে দিলেন। 'আমার হাত বড় কড়া। চিরকাল অভ্যেস আছে তো! মুখ জিনিসে কিছু হয় না।'

দীপক মৃদু সিগারেট বাঁয়ের বলল, মনে হচ্ছে না। হাত যদি আপনার ভক্ত হবে তাহলে অলোকবাবুকে অত ভয় কেন?'

—'ভয়?' সূর্য মল্লিক মাথা নাড়লেন। 'ভুল বুঝেছ, মাস্টার। ভয় আমি করি না। এই থিয়েটার ব্যবসার জন্য কি দেখলাম? কতবার উঠলাম, পড়লাম...এবারে তো ইনসলভেন্সী নিতে নিতে বেঁচেছি। অলোকবাবু 'মহরমহল' থিয়েটারের পুরনো আর্টিস্ট। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। ভয় করতে যাব কেন? বুঝেছ? তোমার কথা ভেবেই বলা। নতুন লোক—পাবলিক থিয়েটারে প্রথম এসেছ। ভেবে হলে পানি পাবে না...'

—'না, মল্লিক মশাই।' দীপক বেশ গম্ভীরভাবে জোর গলায় বলল, 'করতে হলে পলাশডাঙ্গা, বাঁকুড়াগ্রামের হয়েই মরা ভালো। দো-বাঁধির হাতে ভাতটা দিয়ে কী লাভ?'

হীর্ণকের তাড়াতাড়ি সূর্য মল্লিকের মুখখানা দেখবার চেষ্টা করল। ভালো বোঝা গেল না, তিনি মুখ নীচু করে কপালে হাত বুলোচ্ছিলেন, তাছাড়া ঘরে তেমন আলো নেই। তবু হীর্ণকের মনে হল, মুখ তাঁর অপমানে লাল হয়ে গেছে। হওয়া উচিত। দীপক রায় স্পষ্ট করেই বলেছে, কিন্তু ভেবে-চেকে বলেনি।

না, লোকটার সাহস আছে। হীর্ণকের মনে হল, এই লোকই পারবে তার নাটক করতে। যদিও সূর্য মল্লিককে এমন করে না বললেও চলত। তার টাকা, তার থিয়েটার। এখুনি বলে বসতে পারে, এ-নাটক করব না। আপনারা যান। তখন?

কিন্তু সূর্য মল্লিক অলোকবাবু নন বটে, তবে অভিনয় তিনি ভালোই জানেন। হীর্ণকের অবাক হয়ে দেখল, দীপকের কথা তিনি খানিই মানলেন না। মেনে নেবার পাত্রও নন। হীর্ণকের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, নাটকার যে একদম ছুপোকা! আপনার কী মত? শুনলেন তো সূর্যিয়ে-অস্তুর্যিয়ের কথা...'

হীর্ণকের ভাবছিল কি বলবে! নাটকটা তার হওয়া দরকার, অথচ শুধু নাটক বলেই চলবে না; প্রীতিমতো ভালো হওয়া চাই। এক নাটকের জন্যে তো তার কাজ নয়। এই নাটকে তার চরিবাস নির্ভর করছে। যদি নামে যশ পাঁচটা বায়না আসবে। আর না নামলে—ও সে তারা যায় না। ব্যাক টু, কাটিয়ার, ব্যাক টু ফালার...ফিরে যেতে হবে পাহাড়ের টুপে বসা।

হীর্ণকের এগিয়ে পেছিয়ে সাবধানে বলতে লাগল, 'স্যর মল্লিক, আপনি অভিজ্ঞ লোক। আপনি যা বললেন, তাতে অবশ্যই যুক্তি আছে। তবে অল্পেকটা কথাও ভেবে দেখুন। এই যুদ্ধের বাজার, ব্লাক-আউট। এমনিতে থিয়েটার জমবেনা শনি। তার ওপর যদি একজন স্টার-কাস্ট না থাকে...'

দীপক বাহিনী বলে দিল, 'আপনারই লোকজন।'

সূর্য মল্লিক কেদারের দিকে হাত বাড়লেন, বেশ। আপনাদের জন্যে কে ভাবছে, নাটক লোনাতে? আমি কোন কতে ফলে বাঁধি...'

দীপক রায় হীর্ণকের দিকে তাকাল। 'আপনিই যান হীর্ণকের-বাবু। আপনার জিনিস, বুঝিয়ে বলতে পারবেন।'

—'আমি?' হীর্ণকের কেমন ঘাবড়ে গেল। 'আমাকে যদি...'

সূর্য মল্লিক বললেন, এখন থেকে অত নোভিয়ে পড়ছেন কেন? যান না। ফিরে বলবেন চরিত্রটা আপনার জন্যে তৈরী...'

হীর্ণকের ধীরে প্রতিবাদ করল, 'তা তো নয়। চেলের-মেড জিনিস আমি লিখি না। তবে চরিত্রটা এখন যা দাঁড়িয়েছে, তাতে অলোকবাবুকে খুব সুট করে।'

কেদারবাবু হাঁফিয়েছিল হাসল। 'হীর্ণকবাবু ফিরোটার করতে এসেছেন, মুটো বানিয়ে কথা বলতে পারেন না। এখানে সবটাই যে বানানো! কথাবার্তা, সম্পর্ক, হাসি-কান্না...অত ভাবলে চলে?'

সূর্য মল্লিকের দিকে তাকিয়ে কেদারবাবু আবার শুয়ে পড়ল।

সূর্য মল্লিক কোন ভুল বললেন, সাউন্ড টু তোর ওয়ান।' একটু পরে ফুলেকশান দিল। সূর্য মল্লিক কথা বলতে লাগলেন..'অলোকবাবু আছেন? আমি 'মহরমহল' থেকে সূর্য মল্লিক কথা কইছি...'

অলোকবাবু সমাদর অভিনয়ের পাগল; চমৎকার লোকের কাছে। নতুন বাড়ি করেছেন। ওদিকে তখন কিছু কিছু বাড়ি হচ্ছে।

পরের দিন বিকেলে হীর্ণকের শাসবাজার থেকে দোতলা বাস-এ উঠল। বাস খালি; ওপরতলায় দুটি পাঁচক লোক। কেউকার সঙ্গে বাস; নড়বড় করে চলছিল। যেখানে-সেখানে থামিয়ে কন্ডাক্টার হাঁকডাক করে লোক-জন তুলছিল।

তখন বিকেলের আলোয় বাড়ি, রাস্তা, গোলবাঁধি ঝলমল করছে। ঘণ্টা দুয়েক পরেই কলো শেড হয়ে যাবে। চারদিকে যানবাহন ওয়ালা, বাসির বন্যা। শিট দিয়ে সারা দেওয়াল কালো করা। আলোয় ঠুলি পরানো। তত বাড়িতে ছোট-বড় সাইনবোর্ড ঝুলছে : 'বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।'

অন্ধকার হবার আগেই মানুষ দোকানপাট সেরে নিচ্ছে। হীর্ণকের কলুটোলা পর্যন্ত এলো, পথে কোন শুদ্ধ ছেয়ে দেখতে পেল না। সে চরবছিল, এই ভামাডোলে তার নাটক কি চলবে?

তার নাটকের নাম 'অন্ধকারের রং'। মানুষ তো নিত্য এখন দিন অন্ধকারের রং দেখছে। দিনেও দেখছে। জিনিসপত্তরের যা দাম! আবার পয়সা খরচা করে, বোমা, সাইরেন, ব্লাক-আউট অগ্রাহ্য করে লোক অন্ধকারের কী নতুন রং দেখতে যাবে?'

তাছাড়া, নাটকার হিসেবে হীর্ণকের নতুন; পরিচালক নতুন। এক ভরসা অলোকবাবু। যদি তিনি রাজী হন। রাজী তাঁকে করাতেই হবে। এখন হীর্ণকেরের কপাল আর হাতযশ।

দীপককে সে বলেছিল সঙ্গে আসতে। তা হলে অলোকবাবুর হওয়া, না-হওয়ার সুনাম, বদনাম ভাগ করে নেওয়া যেত। কিন্তু দীপক ভারি চালাক। সে আসতে চায় নি; মুখিয়ে একটা ঘুঁটি খাড়া করেছিল। বলেছিল, 'দেখুন হীর্ণকবাবু, আমাদের ওয়ার পাঁচেজী নিতে হবে। এই প্রফেশনাল দো-ওয়ার্লডে আপনি, আমি দুজনেই নতুন। এখানে আমাদের কৌশল করে দাঁড়াতে হবে। যা বুঝেছি, অলো-বাবু লোকটা খুব কায়দাবাজ। এর কাছে দুজনে একসঙ্গে হব হওয়া ঠিক নয়। নিজের নাটক যদি স্টেজে দেখতে চান তো লোকটাকে কোনরকমে রাজী করান। আপনি গিয়ে কোল্ড ওয়েভ দেবেন তার পরে কোন রকম বেল দিলে আমি চলাব হট ওয়েভ। তবে প্রথম কোয়ার্টারটা আপনার।'

ভেতে ভেতে হীর্ণকেরের গা ঘাম হয়ে গেল। কণ্ঠের কাঁকড়ে মাটি; তাতে পাতলা একটা পাঁচ কেলা। আর, রাস্তাও তো কম নয়। তাড়া এক ঘণ্টা লাগে।

লেকের মুখে এসে বাস্ থামল; আর যাবে না। হীর্ণকেরকেও এই-খানে নামতে হবে। বাস একদম খালি; ওপরে সে একমাত্র যাত্রী আর নীচে দুজন।

লালচাঁদের আর সামান্য অভিনয়ের মুখে অনেকটা জায়গা-জোলদা ঘিরে রেখা। কাঁকড়া কাঁকড়া সব নারকেল গাছ মাথা তুলে বাঁড়িয়ে

আছে। বড় সূর্যের ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা আলো। বিরক্তির ছাওয়া মিলিয়ে।

কলকাতা ছেড়ে এদিকে তীর্থঙ্করের বড় একটা আসা হয় না। তবে শুনেছিল, এখানেই কোথায় যেন একটা গুপ্তপ্রেসের বার আছে। নাম ভোলা-নাথ সেনের। বুঝল, এইটাই হবে।

ওপারে লেক হসপিটাল; আর সার তাঁহু। জনা চারেক ঘোরা সৈন্য শিস দিতে দিতে অবজারভেটরীর দিকে চলে গেল।

তীর্থঙ্করকে খোঁজ করতে হল না। একজনকে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিল। বাড়িটা ঠিক লেকের ওপরে নয়, একটু চুকে। তাই সূর্যের ঝিমধরা বাড়ি। বাইরে একটা হাম্বার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। কার কে জানে!

তীর্থঙ্করের ঘরোয়ানের হাতে সিগন্যাল পাঠাল। একটু পরে ছেলের ছেকে চাকর শ্রেণীর একজন এসে তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে গেল। এক কোণে সাবেকি কালের নীচু চৌকি, তাকিয়া। এক পাশে বুলোর সঙ্কো আর আলবলা। বাকি ঘর জুড়ে সোফাসেট, কাচ ঢাকা টেবিল। গা-আলমারিতে অজস্র বই। ঘরে ঢুকলেই রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ আর সুভাষ-চন্দ্রের পাশাপাশি তিনখানা ছবি দেওয়ালে চোখে পড়ে।

অলোবাবুর নিজের ছবিও অনেক ছিল। তীর্থঙ্কর দু-একটা চিনতে পারল। তার বেশি ফিরেটার তো সে দেখেনি! চল্লিশহীন-এ বিবাকর সেজেছিলেন আর 'চিরকুমার সভার' পূর্ব। এই নাটকখানা তীর্থঙ্করের দেখা ছিল; চিনতে পারল। বোধ হয়, তিনকড়িবাবুর সঙ্গে করেক রাত 'অভিনয়' করেছিলেন, তারও একখানা ছবি রয়েছে। আর, বিদেশের দু-একটা ফটো।

তীর্থঙ্করের কতক্ষণ বসেছিল। বোধ হয় আধঘণ্টা হবে। অলোবাবুর দেখা নেই। ঘরের ঘুপসটে অন্ধকার হয়ে গেল। ঘুমে, ঘুমো, দেওয়ালে ছবির পাশে ব্রাকেটসায় বাল্ব—কিন্তুই দেখা যায় বাকি ছিল না। তবু অলোবাবু এলেন না। আলপাশে কাউকে দেখাও যাচ্ছিল না।

তীর্থঙ্করের মনে-মনে কত কি সাজিয়ে-গুছিয়ে এসেছিল। সব গোলমাল হয়ে গেল। ভেবেছিল ব্রাকেট-আটটার আগে ফিরতে পারবে। তাও বোধ হয় হবে না। খুব বিরক্ত লাগছিল তার। এ কি অভদ্রতা! এতক্ষণ একজনকে বসিয়ে রাখা? কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? বড় বড়ই অভিনেতা হোক, লাট-বেলাট তো নয়!

তার পরেই সিঁড়িতে চটিজুতোর আওয়াজ। অলোবাবু ঢুকলেন। সঙ্গেই ঘর আলো হয়ে গেল। ছবিতে দেখা; ওঁকা কপাল, চুল একটু পাতলা হয়ে আসছে। আ, পঞ্চাশের আশেপাশে বয়স হবে।

চোখের কোল বেশ ফোলা। স্নানের করছে হবে। গায়ে আদ্দির ফাক-ফাকা, কিনকিনে পাঞ্জাবী। হাতে হোমিওর সমেত শিশিটে ভরসায়ে। তবে ঘরের ৪৬ দেখবার মতো; ফেন সকলের ঘোর তিনি ঘরে ঢেকে আছেন।

হাঁটা-চলায় ব্যস্ততা নেই। তীর্থঙ্করের সম্মানের সৌজন্য তিনি বাঁরে-সুস্থে কসে বললেন, 'বসা হয়েছে?'

তীর্থঙ্করের হাস, বিরক্তি কোথায় উড়ে গেল। অলোবাবুর বলা, গলা ভারি সুন্দর।

তীর্থঙ্কর বলল, 'আমি অনুরোধের থিয়েটার থেকে আসছি।' অলোবাবু তীর্থঙ্করের কাঁধ-বরাবর তাকিয়ে ছিলেন। তীর্থঙ্করের মনে হচ্ছিল, তিনি চুকবার মুখেই তাকে যা দেখবার দেখে নিয়েছেন। তাঁর মুখের কোথাও এতটুকু চিড় খেল না, চোখের পাতা কাঁপল না।

তিনি বললেন, 'জানি। তারপর বল।'

তীর্থঙ্কর সাহস করে বলে ফেলল, 'একটা নাটকে আপনাকে পার্ট করতে হবে।'

—'কী নাটক?'

—'অন্ধকারের ঋণ।'

অলোবাবু হোমিওর-এর শেষটা টিপে শিশিটাকে ফেলে দিলেন। মনটা পরবর্তীর 'আঁধারের ঘুমের মতো খোলাচ্ছে কেন...'

তীর্থঙ্করের গলা, গলা জড়ানো হয়ে উঠল। তবু সে হেসে বলল, 'না। এটা একেবারে আজকের নাটক। এই পড়া গলা সমাজের পাপ, পাকিস্তানের নাটক।'

তার বলার ধরনে বোধহয় কিছু ছিল—কোন ধরণীর ব্যস্ততা; ভদ্রলোক তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন।

—'বোস কাঁর তুমিই নাট্যকার?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অলোবাবু বললেন, 'হুঁ। আগে লিখেছ? না এই প্রথম?'

তীর্থঙ্করের একটু হেসে বলল, 'লিখেছি তো কত। বেরুই কোনদিন হয়নি।'

তীর্থঙ্করের জন্যে চা এলো আর কাঁচ প্লাসে ঘোলা করেকখানা মিষ্টি আর নোনতা বিস্কুট। অলো-বাবু বললেন, 'নাও, খাও।'

তীর্থঙ্করের বিনোদ করল, 'আপনার চা কই?'

অলোবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি নাটক এনেছ?'

তীর্থঙ্করের বাড় নেড়ে খাতাখানা টেবিলে রাখল।

অলোবাবু সেদিকে দৃকপাত করলেন না; তুলে দেখা তো দূরের কথা। বললেন, 'আমাকে এতে পার্ট করতে হবে কেন? কী আছে চরিত্রে?'

সূর্য নামিয়ে, ঘাঁসক চায় তাকে পাখি-পড়া করে কত কি শিখিয়ে-ছিল। বেশি কথা বলতে বলেন না। যা বলবেন হিসেব করে বলবেন। মনে মনে তৈরি করলেন না। যা বলবে তাতে হাঁ বলবেন। আর সব সময় ভাঁর কত বড় এই ভাব বোঝাতে বলবেন।

সেই অনুযায়ী তীর্থঙ্কর বলতে বাচ্ছিল, চরিত্রটা আপনার জন্যে—তারপর ভাবল, নয়, এটা বলা ঠিক হবে না। বরং তাকে ভুল শিখিয়েছে। এ লোকটা বোকা, আত্মতুষ্ট অহংকারী নয়।

তীর্থঙ্কর বলল, 'চরিত্রটা ইয়ে-পার্টিকুলার।'

অলোবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'চরিত্রটা বুঝি আমার জন্যে তৈরি?' বলে তিনি ঠোঁটের কোণ দিয়ে হাসলেন।

তীর্থঙ্করের বুঝতে পারল, কি সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল! সে বলল, 'তা নয়। ইট ক্যারীজ এ লট অফ ওয়েট। পরে দেখলেই বুঝতে পারবেন।—'

অলোবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রেখে যাও, দেখব। কিন্তু তার আগে মোদ্দা কথাটা দু-চার কথায় বলতে পারবে? মানে গল্পের জোর আছে কিনা বুঝে নিই, তারপর তো চরিত্র।'

তীর্থঙ্করের বলল, 'পারব। আসলে এটা দুই মহাযুদ্ধের গল্প। ১৯১৪ সালে ঘটনার সূত্র আর শেষ হচ্ছে ১৯৪০ সালে অর্থাৎ এই সময়ে, ক্যাপ্টেন শিবপ্রসাদ যুদ্ধের ডাক্তার হয়ে মেসোপটেমিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর একটি প্রেমের সন্তান হয়। তাকে তিনি কোলে আনতে পারেননি, সাহস করে নিজের বাড়িতে এনেও তুলতে পারেননি। ইঞ্জিনীয়ার এবং কন্ট্রাক্টর মনোহর নাথ তাঁর বন্ধু-কালের বন্ধু—ব্যাচমেট। ছেলেটিকে তাঁর জিম্মায় রাখেন। সেই ছেলের আজকে তিরিশ বছর বয়স; নাম বিবানাথ—এই চরিত্রটার কথাই আপনাকে বলছিলাম।'

—'সে কি হে!' অলোবাবু অবাক হলেন। 'আমি তো ভাবছিলাম, তুমি চাইছ আমি তোমার বাবা হই।'

তীর্থঙ্করের হেসে ফেলল, 'চাইলেও আপনি আমার বাবা হতে পারছেন না। তিনি কাটিহারে, বেল চালাচ্ছেন। আপনাকে ছেলেই হতে হবে।'

'কিন্তু বয়স যে বড্ড কম। মানাবে কেন?'

তীর্থঙ্করের একটু চুপ করে রইল। তারপর নীচু গলায় বলল, 'দেখুন, আপনি বিবাকর, পূর্ণ এসব করেন নি? মেকআপ হাওয়ার্ড আছেও ফ্রেমও তবে—আসলে ভেতরে জিনিস থাকলে কেউ নজর করে না।'

অলোবাবু বললেন, 'বাকিটা বল।'

তীর্থঙ্করের বলতে লাগল, 'বিবানাথ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার, ঘাটাল হল। মনোহরের সঙ্গে কন্ট্রাক্টরি করতে লাগল। তাতে প্রচুর পয়সা। কিন্তু বিবানাথের মন তখন নেশায়। সে চৈতন্য করে ছুটে চলেছে। তার আরও টাকা, আরও ভোগ, আরও চাই। মেয়েমানুষও সে ভোগের সামগ্রী ছাড়া কিছু মনে করে না। নাম-করা সার্জিস্টের এস. কে. মালিয়েলের একমাত্র মেয়ে আলার সঙ্গে তার প্রেম হল। বিবানাথের কিন্তু কেউ প্রেম বলে মানে না; আকর্ষণ। মেয়ের আকর্ষণ, টাকার টান। বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে। এদিকে ক্যাপ্টেন শিবপ্রসাদের নিজের একটি ছেলে হয়েছিল। তার নাম সীতা...'

—'এক মিনিট।' অলোবাবু বাধা দিলেন। 'শিবপ্রসাদের কি বয়সের মিসম্যাচ হয়েছিল ছিল?'

—'ছিল বৈকি! মনোহর নাথকে সেইজন্যে তিনি ছেলের নাম করে টাকা পাঠিয়ে যেতেন। ছেলেও দু' হাতে টাকা ওড়াবার সুযোগ পেয়ে বসে ছিল। মনোহর এবং শিবপ্রসাদ নীরব দর্শক। এমন কি সীতা যখন বিবানাথকে ভালবাসল, তখনও তাঁরা কিছু বলতে পারলেন না। তাঁরা কেবল এক মহা সর্বনাশের দিন মুহূর্তে মুহূর্তে নিজে-দের কপাল চাপড়তে লাগলেন। সীতা দেখতেও ভালো, তার গুণও ছিল অনেক। সে শান্ত, সহজ, স্বাভাবিক, খুব মেয়েলি। আলার বিপরীত। বিবানাথ হঠাৎ সীতাকে মনে করতে পারল না, কোথায় কি ভেবে তাকে চাইতে ভুলল। এদিকে তখন সে পুরোদমে কলোনাজারে নেমেছে। আসলে একদিন সব ফাঁস করে দিল। বিবানাথের জন্মের গোপন রহস্য সে জানতে পেরেছিল। ঘরের জানালায়, জলযানে, নেশায় ঝোঁকে সে একদিন বলে ফেলল, মনোহর নয়, ক্যাপ্টেন শিবপ্রসাদই বিবানাথের বাবা। এক রহস্যের দুই কুটুম সীতা আর বিবানাথ। সীতা এই ভালবাসা আঘাত সহ্য করতে পারল না। সে পাগল-পাগল হয়ে গেল।'

তীর্থঙ্করের থামল, চোখ নিচু।

অলোবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তার পর?'

তীর্থঙ্করের মাথা নাড়ল। 'নিজের নাটক। বলতে আর সাহোচ হচ্ছে, কিন্তু শেষ দৃশ্যটা সাংঘাতিক।'

তীর্থঙ্করের এই নিজেকে বড়াই দেওয়ার চেষ্টা অলোবাবু প্রশ্রয় করলেন না, বললেন, 'বিবানাথের কী হল?'

—'বিবানাথ মনোহরকে বলেছিল, পাপ কখনো চাপা থাকে না। তুমি বিয়ে করনি, তবু আমার বাবা সাজতে চেয়েছিলে। আর, যে আমার বাবা, সে অন্ধকারে আমার জন্ম দিয়ে চলে থাকতে চেয়েছে। আমি বিবানাথ, ভৈরব সন্তান, ভেবেছিলাম দুনিয়াটা আমার পকেটে। এই বলে টাকা নিয়ে, মেয়ে নিয়ে ডিনিমিনি খেলেছি, কালোবাজারি করেছি, মদে ডুবে আছি। কারণ আমি জানতাম, আমার জন্ম ঠিক নয়। কিন্তু পাপের কখনো ঠিক থাকে না। পাপের ঘর অন্ধকার। তার বাইরে, ছেলের সব কলো...চৌচালা ব্রাকেটটা।' শেষ দৃশ্যে সীতা হাসছে, খান খাইছে,

ছেলেমানুষের মতো বড় কি যেন বলছে। বিমানদা তাকে চোমরাচ্ছে; তার মতো হয়ে সে-ও হাসছে, ছেলে-মানুষী করছে। তাদের সামনে খুশি, ব্ল্যাকআউট, কালোবাজারী, নিরাপত্তা, অনেয়ত্ব কিংবা আলা—কেউ নেই, কিছু নেই; ১৯১৪ নেই, ১৯৫০ নেই—শুধু ভালোবাসা তাদের অন্তরঙ্গতা। বিমানদার হাতে মদের গেলাস। সীতা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। বিমানদা উঠে গেলাসে কি মেশাল। ট্রানজিস্টরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমাকে ঘিরে বড় অন্ধকার, সব আমি একচুমুকে পান করব। এই বলে সে মদের গেলাস মুখে তুলতে যাচ্ছে, এমন সময় ওয়ারলেস বাজল, পুলিশের হুইসেল। ব্ল্যাকআউটের নিয়মভঙ্গকে ওরা ধরতে এসেছে।'

গল্প শেষ করে তীর্থংকর অলোবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েই রইল। হাত কখনো ঘাম, বুক টিপটিপ করছে।

অলোবাবু কথা বললেন না; বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি যেন নাম বললেছিলে তোমার?'

তীর্থংকর ধড়মড় করে বলল, 'আজ্ঞে তীর্থংকর।'

অলোবাবু বললেন, 'তুমি খুব ভয়ংকর। নাউ গেট আউট। বলে তিনি সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। 'আমার অন্ধকারের রং লাল, টেররকে। তার সময় হয়ে এসেছে। তুমি এখন এসো। যা বলবার আমি সূর্যকে বলব।'

পরের দিন মহড়াস্থল-এ ঢুকে সূর্য মল্লিককে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'করেছেন কি মশাই? আপনি তো সাংঘাতিক লোক!'

তীর্থংকর ভয় পেল। 'কেন, অলোবাবু কিছু বলেছেন?'

কোরাসটী বলল, 'অলোবাবু বলেছেন আপনি তীর্থংকর নন, আপনি ভয়ংকর।'

দীপক কিছু বলল না, সে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। তীর্থংকর ভাল ছেলেই খুব ঘাবড়িয়ে গেল। নাটক শোনার পর অলোবাবু ভালো-মন্দ কিছু বললেন না, শুধু বললেন, তুমি এখন এস। এদের মনের রকমারি বোঝা ভার। তবে কি করব না বলে বিদেয় লোকটা!

তীর্থংকর জিজ্ঞেস করল, 'উনি কিছু জানিয়েছেন? হ্যাঁ কি না...?'

সূর্য মল্লিক ডান-কনুইটা হাতে নিয়ে চেপে ধরে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ তোর না হতেই আমাকে ফোন। বাঁচান বলছি...' এই বলে তিনি টেবিলের ঘন্টা বাজালেন। তার খাস চাকর হাজির হলো।

চায়টে চিনি কাটলেট নিয়ে আয় তো! আর চায়টে ডবল-ধার চা।'

দীপক বলল, 'এটা কি তীর্থংকরের জন্যে?'

সূর্য মল্লিক বললেন, 'আরে না। আমার ঊর্ধ্ব চতুর্দশ পুরুষের জন্যে। শ্রেষ্ঠ অলো বাঁড়ুজ্যে এক কথায় ফিরোটার করতে রাজী হয়েছে, এ তো আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি কি না! কোনদিন এমন হয়নি। ওঁকে নাটক শোনানো মুস্কিল, পছন্দ করানো আরো মুস্কিল। আমি তো ভেবে-ছিলুম, তীর্থংকরকে চলতিয়া লোকের হাওয়া ছেড়ে ফিরে আসতে হবে।'

তীর্থংকর জিজ্ঞেস করল, চরিত্রটা কেমন লাগল, কিছু বললেন?'

'কি দরকার মশাই খুঁচিয়ে ঘা করার; ভাল রয়েছেই নেমায়-জায়গায় আপনার নাটক পড়ে ফেলেছে। শুনে তো আমি খ'। তারপর বলল, তোমরা রিহার্সাল আরম্ভ করে দাও। আমি আসি। আর, ওই নটোকার ছোকরা খুব চালাকে। ওকে সামলে রেখো। ঠিক ঠিক পারলাকড়ি দিও। ছোকরার ভেতর জিনিস আছে। আর কি চাই! সবে কি বলছিলাম, আপনি সাংঘাতিক লোক!

সেদিন বাইরে বেরিয়ে দীপক হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, সীতা করে বলুন তো লোকটাকে কিরকম মনে হল?'

—কে? অলোবাবু?'

—হ্যাঁ। খুব ঘোলমেলে টাইপ?'

তীর্থংকর বলল, 'দেখুন, বড় অন্যায় তার বহু কথাই, খোলা-খুলি বলতে পারে। তবে একটা ক্যারেক্টার বটে। গুরু নিয়ে লেখার মতো লোক। হ্যান্ডল্ করা হয়তো একটু ডিফিকাল্ট হবে। কিন্তু ভুলেও ভাববেন না, লোকটা বোকা, সস্তা হাততালি কুড়িয়ে বড় হয়েছে।'

দীপক বলল, 'বাবা! আপনি যে প্রথম আলাপে খুব, মশাই। লম্বা-চওড়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন।'

রিহার্সাল বসল।

বেলোয়ারী হবে সীতা আর সূর্য মল্লিক অনোহর নাম। এ-সব সূর্য-বাবুরই বকখা। দীপককে কখিন আর ছাড়া করেননি। তবে করে নিজেদের মুক্তি পার্ট আদায় করেছেন। তীর্থংকরের মনঃপুত হচ্ছিল না। দীপককে সে আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে বলল, 'এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

—কোনটা?'

—বেলোয়ারীর সিলেকশন!'

দীপক হাত উল্টে বলল, 'কী করব? কলোনেল নয়হাতকাবা। বিমা-নাথের চরিত্র ওঁকে দিতে দিই নি। এখন বেলোয়ারীকে বাদ দিলে তো ছেলেকেলা!'

তীর্থংকর বলল, বাদ দেওয়ার দরকার নেই। ওকে দিয়ে আরো চলতে পারে। কিন্তু সীতা! সীতা হবে মার্জিত, নরম; তার গলে শিক্ষা-দীক্ষার ছাপ থাকবে।'

—বুঝতে পারছি। ওই ছেলে সরোজিনী দেবী হলে ভালো হত। কিন্তু সূর্য মল্লিক বলছে, সে আরও ঠকার বাজা। এক আলোবাবুকে সামলাতেই হিমসিম খেতে হবে। তারপর এই বিনকাল। নাটক যদি না ওরে তাহলে সূর্য নাকি চিরতরে ডুবে যাবে। কি দরকার মশাই নিজেদের ছাসী হয়ে?'

একদিন রাত তখন নটা। পুরো-দমে রিহার্সাল চলছে। হঠাৎ অলো-বাবু এসে হাজির। প্রফুল্লিত নন। পা টলছে। চোখ জড়িয়ে আসছে। সঙ্গে একটি ছেলে। তারও অবস্থা সঙ্গীন।

অলোবাবু উইংস-এর পাশে এসে দাঁড়ালেন। দু'এক মিনিট কি হচ্ছে, না হচ্ছে দেখে নিয়ে জড়ানো গলায় ডাকলেন, 'সূর্য!'

সূর্য মল্লিক পার্ট ফেলে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললেন, 'বলুন, দাদা।'

—'কী নাটক হচ্ছে?'

—'আজ্ঞে "অন্ধকারের রং"।'

—'কে লিখেছে?'

—'এই যে ইনি—' সূর্য মল্লিক তীর্থংকরকে দেখিয়ে দিলেন। নাম তীর্থংকর চট্টোপাধ্যায়।'

অলোবাবু মুখ কুঁচকে বললেন, 'নতুন?'

সূর্য মল্লিক ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়বার আগেই অলোবাবু ফের জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিরেক্টর দিচ্ছে কে?'

—'আজ্ঞে ইনি।' সূর্য মল্লিক এবার দীপককে দেখিয়ে দিলেন।

—'নতুন?'

সূর্য মল্লিক আমতা আমতা করে বললেন, 'বোর্ডে করেননি কিন্তু ডিরেক্টর ভালো...'

অলোবাবু ঠোঁট উল্টে বললেন, 'হুঁ! তাঁর সঙ্গের ছেলেটি কি বুঝল কে জানে, সে-ও হেসে উঠল। অলোবাবু তার কাঁধে হাত রেখে বেরিয়ে যাবার মুখের দিকে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সূর্য, তোমার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। তোমার ডিফিকাল্ট অন্ধকার।'

রিহার্সালে বাধা পড়েছিল, সূর্য মল্লিক পার্ট ফেলে এইভাবে ছুটে যেতেন—দীপকের এ সব পছন্দ হয় নি। এই ভাবে কাজ করতে সে অভ্যস্ত নয়। তবু ভদ্রতার খাতিরে চুপ করেছিল। কিন্তু অলোবাবুর অমন ভুল-তাঁজিয়ে কথা সে সহ্য করতে পারল না।

অলোবাবু বেরিয়ে যেতে সে বলল, 'আজ আর রিহার্সাল হবে না।' বাধা দিল, চলে গেল। শুধু সূর্য মল্লিক, বেলোয়ারী আর তীর্থংকর রইল।

দীপক বলল, 'এই আপনাদের বড় অভিনেতা, সূর্যবাবু?'

সূর্যবাবু বুঝতে পেরেছিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় উঠবে। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, চল, চল, বাকিদ-ঘরে গিয়ে বসা যাক। এখানে যা গরম—'

সূর্য মল্লিক খুব বোঝাবার চেষ্টা করলেন। দেখ, তোমাদের আগেই বলেছিলাম। ওঁকে নিলে ঝামেলা হবে। তা তুমি কথা কানেই নিলে না। আমার মতো তোমার কান তো খারাপ নয়। আমি না-ঘর অনেক কথা শুনতে পাই নে। তা, এর মধ্যে অত উঁচলা হচ্ছ কেন? সবে তো কালির সন্ধ্যে...'

দীপক তখনও চটে ছিল, বলল, সন্ধ্যে শুনেই সাহচুন মনে! লোকটার অপমান বরদাস্ত করতে হবে?'

—'আচ্ছা বোকা কেন? নেমায় কোঁকে কি বলে ফেলেছে...বেচারা না, নাটকারকে চিনতেই পারল না? এখন এদুলো রাত তোমরা পারে মাথ ঠাহলে যাদু নাটকের আশা ছেড়ে দাও। অতটা অলোবাবুকে নিয়ে বুঝা চেষ্টা করো না...'

তীর্থংকর বুঝতে পারছিল, সূর্য-বাবুর কথায় যুক্তি আছে। ঘোড়ার ডিমটিই আপাতত তুলোছিলেন, তখন দীপক শোনেনি। অলোবাবুকে পাবার জন্যে ব্যস্ত ছিল। সেদিন তীর্থংকরকে কত মতলব দিয়ে ওঁর বাড়িতে সে-ই তো পাঠাল। আর, আজ অলোবাবু ছেড়ার কি বলেছেন, তাতে ওর গরম ফোসকা পড়ছে!

দীপক বলল, 'এ রকম করলে তো আমার সঙ্গে কাটাকাটি হয়ে যাবে।'

—'কাটাকাটিই হবে।' সূর্য মল্লিক বিষাদের হাসি হাসলেন। 'নাটক হবে না। তা হলে আমাকে ঘিরে টাকা-গুলো চলাচ্ছ কেন? ডিরেক্টর তো লড়াইয়ের জায়গা নয়, মাস্টার।'

দীপক আবার কি বলতে যাচ্ছিল, সূর্য মল্লিকের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। সূর্য মল্লিক তাকে সহজ-ভাবে স্পষ্ট কথাটাই শুনিয়ে দিয়েছেন।

তীর্থংকর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ওঁর তো আজকে আসবার কথা ছিল না। উনি হঠাৎ এলেন কেন?'

সূর্য মল্লিক বললেন, 'ওই তো মজা! লোকটার মোষ যেমন খুশও তেমনি। আপনারা তো খুব প্রফে-সিভ ডিরেক্টর করেন। বান না, মহড়া-স্থল-এর ওয়ার্কারদের অলোবাবুর বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু বলুন না।'

দীপক ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন? উনি কি শ্রমিক-দরদী নাকি?'

সূর্য মল্লিক দীপকের ব্যঙ্গ উপেক্ষা করে বললেন, 'জানি না, তোমরা কি বল। তবে ওয়ার্কাররা ওঁকে খুব সমীহ করে, ভালবাসে। স্টেজ থেকে বেরিয়ে উনি কোথায় গেলেন, জান? রেকর্ড-রুমে। সেখানে শিল্পীরা, লেখকরা সব রয়েছে। তাদের সুখ-দুঃখের কথা উনি শুনলেন। সকলকে এক চোট করে চায়ের খাওয়ালেন। এটা ওঁর খেয়াল। তারপর যার যেমন দরকার, দু'টাকা পাঁচটাকা—নিজের পকেট

থেকে দেবেন। গতবারের অভিনয় বার কি হয়েছিল জান? এইরকম পুজোর টাইম। 'কিংবদন্তী' নামছি। বিজ্ঞাপন পড়ে গেছে, অলোবাবু এই প্রথম 'কিং' করছেন। প্রোডাকশন্সরা সেবার অনেকই আমার কাছে পুজোর বোনাস চেয়েছিল। আমি কানে নিইনি। আমার বলবারই আছে, টাকার খেলায় আমি কলা। মহাসপ্তমীর দিন নাটক খুললো। ভালো অ্যাডভান্স ছিল, হাউস ফুল হয়ে গেল। অলোবাবু মেকআপ-টেকাপ নিয়ে বসে আছেন। ফার্স্ট বেল পড়ে গেল। তখনো আমি কিছু জানি না। হঠাৎ কে একজন এসে বলল, অলোবাবু নামবেন না। সে কি! আমার তো মাথায় হাত। ছুটে গেলাম। কী ব্যাপার? অলোবাবু বললেন, তুমি এদের বোনাস দেবে না, বলেছ? আমি বললাম, দেব না বলিনি তো। পুজো বাদ দেব। অলোবাবু বললেন, পুজোয় কটা দিন কি এরা চড়কের আওয়াজ শুনে কাটাবে? ও চলবে না। যা পায়, এখুনি দিয়ে দাও। নইলে এই আমি পার্টি হয়ে বসলুম। বলে সত্যিই উনি চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগলেন। ওদিকে তখন সেকেন্ড বেল বাজছে। আমি কাল ভোরে টাকা এনে দিলাম, তবে উনি স্টেজে গেলেন। যাবার সময় হেসে বললেন, সূর্য এইজন্যে আমাকে মহারথী-এ আনি।'

তীর্থঙ্কর বলে উঠল, 'অদ্ভুত চরিত্র, না? এঁকে নিয়ে আমি একদিন লিখব।'

সূর্য মল্লিক বললেন, 'তখন আমার কথাটা মনে রাখবেন। বাড়ি করার সময় বোনাস লাগবে তো? কিপ্পী অলো বাঁড়ুজ্যের জীবন নিয়ে এই যে প্রকাণ্ড ইমারত, আমি তার সামান্য যোগান।'

দীপক কিছু বলল না; সে বোধহয় তখনও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছিল।

জোনাকী সূর্য মল্লিককে বলল, 'উঠবে না? আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

অলোবাবু প্রথম যেদিন রিহার্সালে এলেন সেদিন সকলে চটস্থ। তীর্থঙ্করের এক ভয়, কখন দীপকের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগে। দীপক নিজেও বোধহয় সে কথা জানত। সূর্য মল্লিক সব সময় কাছাকাছি থাকছিলেন। কিন্তু যদি তাঁকেই তো সামলাতে হবে। শুধু সকলের মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনার ভাব টের পাওয়া যাচ্ছিল।

সূর্য মল্লিকের একটা কথা ঠিক হয়নি। অলোবাবু স্টেজ রিহার্সাল-এর অনেক আগেই এলেন। কিন্তু প্রথম দিনের রিহার্সাল দেখে তীর্থঙ্করের খুব মুষড়ে পড়ছিল। এত ঘর নাম-ডাক এই নাকি তাঁর অভিনয়?

জড়ানো কথা তাও প্রম্পট শোনবার জন্যে ঘেরে থাকছেন। অভিনয়ে এতটুকু প্রাণ নেই। তাঁর সঙ্গে আর যারা অভিনয় করছিল, তাদেরও পার্ট ঝুলে যাচ্ছিল।

এর ওপর তিনি অন্য সবাইকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। সেটা আরও বিরক্তিকর।

দীপক বহুক্ষণ সয়ে ছিল; আর পারল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, বেশ মৃদু গলায় জানতে চাইল, 'মি ব্যানার্জী?'

অলোবাবু একবার চোখ তুলেই ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। সূর্য মল্লিক তখন ইশারায় দীপককে থামতে বলছেন। কিন্তু দীপক ততক্ষণে লড়াইয়ে নেমে পড়েছে।

—'আমার নিয়ম হচ্ছে প্রম্পট শুনে পার্ট করা চলবে না। আপনাকে পার্ট মুখস্থ করতে হবে।'

অলোবাবু একটু কিন্তু ভেবে বসে রইলেন, তারপর খুব নম্র স্বরে বললেন, 'কিন্তু মিঃ রায়, আমি তো পার্ট মুখস্থ করি না। আমার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে আমি শিখতে পড়ি। তারপর রিহার্সাল-এর সময় আমার কয়েক ঘণ্টা ডায়লগগুলো বলে যেতে হয়। এই করে স্টেজে মনে হয়ে, সেদিন যা মুখস্থ করি তাই বলে চলে। কারুর ভেলে আপনা থেকেই সড়গড় হয়ে যায়।'

দীপক বলল, 'ওগুলো আপনাদের প্রফেশনাল কায়দা। ওতে নাটক চলতে পারে না। আজ না হয় প্রথম দিন। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, এতে সকলের পার্ট কি রকম ঝুলে যাচ্ছে। আপনার কাছে শিখতে দেওয়া আছে। এর অন্তত খানিকটা আমাদের হৃদ্য হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আর ভবিষ্যতে একটু পা লাগিয়ে আসবেন।'

অলোবাবু এ-সব কথার জবাব দিলেন না। তিনি সূর্য মল্লিকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সূর্য মল্লিক তখন বাহুবার; তাঁর পাঞ্জাবীর গলার কাছটা ভিজে উঠেছে। মুহূর্তে যেন ঘন মুখ হয়ে কর্পা মুখ লাল।

—'দীপকবাবু,' সূর্য মল্লিক মধ্যস্থতা করতে চাইলেন, 'আহা কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই করে তো বিশ বছর চালিয়ে দিলেন। ওঁর নিজেরও দায়িত্ব আছে। আর, পা লাগানোর কথা বলছেন? এমন পা এরপর লাগবে, পা-ছাড়া করতে পারবেন না।' বলে সূর্য মল্লিক নিজের রসিকতায় খুব জোরে হেসে উঠলেন।

কিন্তু অলোবাবু ঘাবা দিয়ে উঠলেন, না, না সূর্য। উনি ঠিক বলছেন। ওঁরা সব আধুনিক লোক। কত কি জানেন।' দীপককে বললেন, 'মি রায়, আপনি আমাকে দেখিয়ে দেবেন। আমি সেই রকম করবার চেষ্টা করব।'

তীর্থঙ্করের ঘাবড়ে গেল। একি! এত বিনয় কেন? সূর্য মল্লিক বোধহয় কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাঁর মুখে আলোর রেখা নেই। কয়, তীর্থঙ্করের মনে হল, কিসের এক কৌতুক খেলা করছে।

অলোবাবু সারাক্ষণ তীর্থঙ্করের সঙ্গে একটা কথাও বলেন নি। এমন কি চেনবার চেষ্টাও করলেন না।

রিহার্সাল ভাঙল। তীর্থঙ্কর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। স্টেজের বেরুবার পথে। তবুও একটু, ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়াবে।

অলোবাবু হোলজন-এ সিগারেট ধরাতে ধরাতে হঠাৎ ডাকলেন, 'এই যে ভায়রে।'

তীর্থঙ্কর এগিয়ে এসে বলল, 'বলুন স্যার।'

অলোবাবু একবার ধুয়ে তুললেন, তারপর সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'তুমিও তোমার ভিরেক্টার বন্ধুর মতো সার, নিশ্চয়—এসব বলবে নাকি? তার চেয়ে অলোবাবু বলো। না হয় শালা অলো বলো, তবু ওই সব ফর্মালিটিগুলো'—বলে তিনি হাত নাড়লেন। 'বাকলে, বুঝে নাকি?'

তীর্থঙ্করের বলল, 'কোথায়?'

—'কোথায় থাক?'

—'অল্পে কড়েকুড়ুরের কাছে।'

—'চল এগিয়ে দি।'

তীর্থঙ্কর সংকুচিত বোধ করছিল। 'আপনি তো যাবেন সাউথে। মুহূ মুহূ কষ্ট করে কেন...'

অলোবাবু ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'মুহূ মুহূ তোমাকে কে বলছে? নাটকারকে জমাদারা করে নিয়ে যাচ্ছি; আমার প্রফেশনাল ইন্টারেস্ট থাকতে পারে। আর, গাড়ি আমি এখন ফিরাই না...নর্থ, সেন্সাল লেবে আমি যখন সাউথের দিকে যাব, তখন তখন বেরুবো। তিন স্ট্রোর লোক তখন জেগে থাকে। কারা আছা বল তো?'

তীর্থঙ্কর ঘাড় নেড়ে বলল, 'জানি না।'

—'নিশিকুটুম্ব, মেহপন্না আর ভাবী বাপ-মা।' অলোবাবু হাসলেন। 'কি, লজ্জা পেলে?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে তীর্থঙ্কর বলল, 'এই বিনকাল, ব্লাকআউট—এত রাত্তির করেন?'

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার! অলোবাবু গাড়িতে উঠলেন। সঙ্গে তীর্থঙ্কর। সেই হাওয়ার গাড়ি। অলোবাবুর অনেকটা স্পোর্টস কার ছিল। মুক্ত খোলা; কলের সঙ্গে কাঁম হুড় লেগানো। তিনি সেটা নিজে চালাচ্ছেন।

অলোবাবু হঠাৎ বললেন, 'তুমি কিছু মনে কর নি তো?'

তীর্থঙ্কর ঠিক বুঝতে পারল না। উনি কেন বলছেন! 'কী ব্যাপারে?'

—'আজ, সেই যে সেদিন তোমাদের রিহার্সাল-এ এলুম। সূর্যকে জিজ্ঞেস করলুম, কার নাটক হচ্ছে? তোমাকে মোটে চিনতে চাইলুম না—'

তীর্থঙ্কর অবাক হয়ে গেল। 'আপনি ইচ্ছে করে চেনেন নি? আমি ভেবেছিলাম—'

—'আরে মোগো-মানুষের কাণ্ড! তাই না? আসলে চরিত্র নিয়ে তো আমাদের কারবার। তাই, চরিত্র খানিক চিনতে পারি। তোমার ভিরেক্টার বন্ধুকে এক পলক দেখেই বুঝে-ছিলাম, ইনি বেশি মাতব্বরি আমাকে সহ্য করতে পারবে না...একটু অহং জাগবেই। তাই ভাবলাম, দিই একটু ঘ্যানা খুলিয়ে...'

—'সেটা তা হলে আপনার অভিনয় ছিল?'

অলোবাবু হেসে বললেন, 'খানিকটা। কেন, খারাপ হয়েছিল?'

তীর্থঙ্কর বলল, 'খারাপ হয়েছিল। আমরা তো বুঝতেই পারিনি। তা, আজকে যে হঠাৎ অত সুশীল, সুবোধ, নিরীহ হলেন, সেটাও কি অভিনয়?' বলে তীর্থঙ্কর হাসল। অলোবাবুর সঙ্গে এইভাবে কথা বলা দুদিন আগে সে কল্পনাও করতে পারত না। তাই নিজের দুর্বলতা সে হাসি দিয়ে পুষিয়ে নিতে চাইছিল।

অলোবাবু হাততালি দিয়ে উঠলেন, না, না ভাই ভীম ইট। হাজার হোক, ইয়ং জেনারেশন। কত কি আই-ডিয়াস থাকতে পারে। যাক, তোমাকে বেকসুর খালাস দিয়ে এলুম, সেটা বল।'

অলোবাবু চুপ করে রইলেন। গাড়ি তখন হাতিবাগানের কাছে। দুচার জন লোক দেখা গেল। অন্ধকারে সব বন্ধ। তীর্থঙ্কর ভাবতে চেষ্টা করছিল, অলোবাবু কী বলতে পারেন?

অলোবাবু বললেন, 'সীতার চরিত্রে তোমরা সূর্যর ঐ বেয়ারসীটিকে নিলেন কেন?'

তীর্থঙ্করের অস্তিত্বের নিম্নচাপ কেটে গেল। যাক, এই ব্যাপার! সে কত কি ভাবতে চাইছিল। হয়তো দীপকের ব্যবহারে আকৃষ্ট উনি মনে মনে চটেছেন। হয়তো তীর্থঙ্করকে অনেক করে জানিয়ে দিতে চান, তোমার নাটক আমার পছন্দ হয়েছিল কিন্তু দেখছ তো পরিস্থিতি! এই ধরণের ঘোরা-প্যাঁচের কথা আমার কাছে কখনো শোনাবে না।

তীর্থঙ্কর বলল, 'আমরা কি করব? সূর্যবাবুর ইচ্ছে—'

অলোবাবু কথার পৃষ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোমার কি মনে হচ্ছে?'

তীর্থঙ্কর খানিকটা ভেবেচিন্তে, আমতা-আমতা করে বলল, 'না। ওঁকে ঠিক মানাবে না। ওঁকে দিয়ে অন্য চলতে পারে।'

—'হুঁ। কাকে সীতা মানাবে, মনে কর?'

তীর্থঙ্কর বলল, 'দীপকবাবু বলছিল, অরোজিনী হলে ভালো হত।'

—'আর তুমি? তোমার কি মত?'

তীর্থঙ্কর একটু ভাবল। 'বলব, আমি ইচ্ছে মহাশ্বেতার মেক। সকলকার—সব অভিনয় তো দেখিনি। চরিত্রের কথাটা বলতে পারি, সীতা

কী ধরনের চরিত্র কিন্তু কাকে দেখানো হবে তা আমার পক্ষে বলা মুশকিল। বলতে ঠিক না-ও হতে পারে।'

আলোবাবু তখন আর কিছু বললেন না।

পরের দিন তীর্থঙ্করের 'মহুয়াতলা'-এ যেতে পারেনি। তার পরের দিন যখন গেল, তখন রিহার্সাল অনেক দূর এগিয়েছে। আলোবাবু আসেননি। শিবচন্দ্রদের চরিত্রটা দেওয়া হয়েছিল অবিনাশ ঘোষালকে। তিনি কম অভিনেতা নন।

তীর্থঙ্কর স্টেজে ঢুকে দেখল, অবিনাশ ঘোষাল একা একা নিজের পার্ট বলে যাচ্ছেন। আর সবাই চুপচাপ। সূর্য মল্লিক স্টেজ ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে পায়চারি করছেন। তাঁর মুখ লাল, ঘনঘনে। বেলোয়ারী ঘুরে ঘুরে সিনসিনারীর ফাঁকে ফাঁকে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন কি দীপককেও কিছু হতোদ্যম মনে হল। তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। মিউজিক রুম থেকে হারমোনিয়ম ছিন্ন সুর ভেসে আসছিল। কুশলবাবু বোধহয় আবহসঙ্গীত রচনা করবার চেষ্টা করছিলেন।

তীর্থঙ্করকে দেখে সূর্য মল্লিক অন্যদিনের মতো অভ্যর্থনা করলেন না। অবশ্য এই হেতু, তিনি যে ছোট মনের লোক নন, সেটা তাঁর হাসি দেখলে বোঝা যেত। তাঁর সেই হাসিও কোথায় মিলিয়ে গেছে।

তীর্থঙ্কর দীপকের পাশে জায়গা করে বসল। দীপকও কিছু বলল না। খানিক পরে সূর্য মল্লিক হঠাৎ হলে উঠলেন, 'কেমকরে আপনি তীর্থঙ্কর, এই করলেন?'

তীর্থঙ্কর ঘাবড়ে গেল। 'আমি? কী বলুন তো?'

সূর্য মল্লিক বলতে লাগলেন, 'আপনাকে আমি অন্য চোখে দেখতাম। এই দীপকের সামনেই বলছি, ওর চেয়ে আপনাকে আমার অনেক কিছুর বেশি সম্ভবনার মনে হত। আর, আপনি কিনা—'

তীর্থঙ্কর খুব অবাক হয়ে বলল, কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

—'বুঝতে পারছেন না?' সূর্য মল্লিকের গলায় কাঁকের ভাব ফুটে উঠল। 'আলোবাবুকে আপনি কী বলেছেন?'

—'আমি? কিছু না তো—

বেলোয়ারী ততক্ষণে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। সে হাসতে হাসতে বলল, 'তীর্থবাবু আমাকে একদম দেখতে পারেন না, তাই না?'

তখন তীর্থঙ্করের মাথায় সব জিনিসটা আস্তে আস্তে ঢুকল। আলোবাবু—তা হলে এর মধ্যে এই কাণ্ড করেছেন। বেলোয়ারীকে সরানোর ব্যাপারটা তিনি তীর্থঙ্করের নাম দিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন।

তীর্থঙ্কর বেলোয়ারীর কথার জবাব না দিয়ে সূর্য মল্লিককে জিজ্ঞেস করল, 'আলোবাবু আমার নামে কিছু বলেছেন?'

সূর্য মল্লিকের গলার পরিষ্কার ক্ষোভ ফুটে উঠছিল। 'আপনার নামে কেন বলবেন? পরশু রাতে আপনারা একসঙ্গে বেরুলেন। আর আজ একটু আগে উনি কোন করেছিলেন...'

—'কী বলছেন?'

—'বললেন, তোমরা সীতার জন্যে সরোজিনীকে আনাও। আর, বেলাকে বরং আনাতো দিও। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। পয়সা তো খরচ করছ। নাটক যদি নাটকঘরের প্রতি যদি জাস্টিস করতে চাও তা হলে আর দুচার পয়সার জন্যে খুতে ছোবা না।'

তীর্থঙ্কর একটু গলা তুলে বলল, 'তা এর মধ্যে আমার হাতটা কী দেখলেন?'

বেলোয়ারী বলল, 'বাঃ!' তার মুখে আর হাসি নেই। শাড়ির আঁচল সে আঙুলে জড়াচ্ছিল আর খুলছিল। বেশ অস্বস্তির ভাব। 'এতে দেখবার তো কিছু নেই। বোকা-ই বলছে আমাকে নিয়ে সেদিন আপনাদের মধ্যে কথা হয়েছিল। আপনি বলেছেন, আমাকে সীতা মানাচ্ছে না। তাই উনি সরোজিনী দেবীর কথা তুলেছেন...'

তীর্থঙ্কর বলল, 'না। আলোবাবুকে নিজেই কিছু বলা হয়েছিল। সেই জন্যে উনি আমায় সেদিন ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি নিজে থেকে আপনার কথা তুলিনি। আমাকে যখন জিগ্যেস করলেন, আমি তখন সীতা কথাটাই বলেছি...'

এর পর তীর্থঙ্কর এক মস্ত ভুল করে বসল। সে বলে ফেলল, 'সরোজিনী দেবীর কথা দীপকবাবুও সেদিন বলছিল...'

বলার সঙ্গে সঙ্গে বেলোয়ারী হাউ-মাউ করে উঠল, 'মা! আপনারা কেউ আমাকে চান না! আমি আপনাদের চোখের বালি। কেন, আমি তো আপনাদের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করিনি?' বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গেল। আঙুল থেকে আঁচল খুলে সে চোখ চাপা দিল। সূর্য মল্লিক খুব অপ্রস্তুতে পড়লেন। এত লোকজন, কর্মচারীর সামনে এই রকম একটা কাণ্ড! তীর্থঙ্করও খুব লজ্জায় পড়েছিল। মেয়ে কথাটা তার না বললেই চলত।

সূর্য মল্লিক বললেন, 'থাকগে, থাকগে। যা হবার হয়েছে। মিথ্যে তর্কাতর্কিতে লাভ নেই। আমার তো এখন পেছুনে চলে না। আমি লড়াই করেই যাই। ঘড়ি-বাটি আমাকে এগিয়ে যেতেই হবে। তবে, তীর্থবাবু, কাজটা ভালো করেন নি। সীতা পছন্দ হচ্ছিল না, আপনি আমাকে জানান না কেন?'

তীর্থঙ্কর চুপ করে রইল। কত কথা বলা যেতে পারত। কিন্তু তখন মুখে কিছু আসত হত না। বেলোয়ারীর তো কোন কথা শোনবার মতো অবস্থাই নেই। আর, সূর্য মল্লিকও বিশেষ সুবিধের, খানিকটা অপদস্থও বটে। তিনি থিয়েটারের মালিক; বেলোয়ারীর এবং কর্মচারীদের কাছে তাঁর মুখ থাকছিল না।

বেলোয়ারী সেখানে আর দাঁড়াল না। যাবার আগে বড়-বড় পলায় বলে গেল, 'আমি তো আপনাদের পথের কাঁটা। আমি যাচ্ছি। এ মুখ আর দেখাব না, আপনাদের সামনে। আপনারা শান্তিতে নাটক করুন...'

বাইরে বেরিয়ে দীপক বলল, 'কী বুঝলেন, তীর্থবাবু?' তীর্থঙ্করের খুব খারাপ লাগছিল। হঠাৎ কি রকম একটা থ্রিলারের নাটক হয়ে গেল। বেলোয়ারীর জন্যে তার দুঃখ হচ্ছিল। মেয়ে মেয়ে সব মর্মভেদী কথা বলে আর কাঁদাকাটা করে চলে গেল। বেচারার বড় আশা ছিল সীতা করে।

তীর্থঙ্কর বলল, 'আমারই ভুল হয়েছিল। আলোবাবুকে সে দিন কোন কথা না বললে হত।'

দীপক বলল, 'তাহলেই নিশ্চয় দেখেছেন? ভেবেছেন? আলোবাবু যা বলার ঠিক বলত। একজনকে এ ঘরে পাশে বসা হল।'

—'না, তাতে আমাদের অন্তত বদনামের ভাগী হতে হত না। এ খুব বিশ্রী হয়ে গেল। সূর্য মল্লিকের মন থেকে এ-ধারণা যাবে না যে, আমরাই কলকাঠি নেড়েছি। আর বেলোয়ারীর কথা ছেড়েই দিন...'

দীপক হাসল। 'একেই বলে স্টেজ ইজ্‌দিন স্টেজ, বুঝেছেন? নাটকের চেয়ে নাটক।'

—'কিন্তু এ যে ঠিকী আর ঠিকীর হয়ে গেল, মশাই।' তীর্থঙ্করও হাসতে হাসতে জবাব দিল। 'কথা তো বলল, বেলোয়ারী এবং কথা বলতে বলতে সকলে প্রস্থান।'

তীর্থঙ্কর কফেপটুকুরের একটা মেসে থাকত। পরের দিন তখন বেলা চারটে হবে। তীর্থঙ্কর চা খাবে বলে বসে আছে। মেসের ছোঁড়াটা এসে বলল, 'আপনাকে এক বাবু ডাকছেন। গাড়িতে এক্সেছেন।'

পরের কথাটা শুনে তীর্থঙ্কর ব্যস্ত হয়ে উঠল। গাড়িতে? তা হলে কি আলোবাবু? হঠাৎ তার দেখতে কেন? সেদিন সদা সদা তার আস্তানা দেখে গেছেন। হয় তো এই জন্যেই দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু কালকের ব্যাপারটা সামলানো যায়নি। এর মধ্যে আবার কী ফ্যাসাদ?

তীর্থঙ্কর কোনমতে গায়ে জামা গলিয়ে নীচে নেমে এসে দেখল, আলোবাবু নয়। গলির মুখে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখেছেন সূর্য মল্লিক। কয়েক হাত তফাতে তাঁর সেকেন্ড হ্যান্ড উইলসনী দাঁড় করানো।

তাকে দেখে সূর্য মল্লিক এগিয়ে এলেন, 'এই যে তীর্থবাবু। আপনার হাতে এখন কাজ নেই তো?'

—'তেমন কিছু নয়। হঠাৎ আপনি যে?' সূর্য মল্লিকের আসাটা এত অপ্রত্যাশিত। তারপর গত কালের ঘটনা। তীর্থঙ্করের মাথায় অনেক দুশ্চিন্তা ভিড় করে এলো। 'কিছু হয়েছে নাকি?'

—'নয়! হবে কি। অবসর থাকলে আমার সঙ্গে চলুন।'

তীর্থঙ্কর তখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। সে বলল, 'কোথায়?'

সূর্য মল্লিক বললেন, 'অত ভাবছেন কেন? থিয়েটারে তো যেতেন। একটু না হয় আগে আমার সঙ্গে বেরুলেন।'

তীর্থঙ্কর মুখে চোখে জল দিয়ে, জামা কাপড় বদলে সূর্য মল্লিকের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠল। খানিক দূর যাবার পর সূর্য মল্লিক বললেন, 'কালকের ব্যবহারে আপনি কেন কিছু মনে করবেন না। কাল একটু বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। থিয়েটার, মানে থিয়েটারওয়ালাদের এই দোষ, জানেন? তারা বড় ভাবপ্রবণ হয়।'

তীর্থঙ্কর হাঁ-না কিছু বলল না। সে বুঝতে পারছিল, সূর্য মল্লিক মুখে ভদ্রতা করে ছুটে আসেন নি। মুখের বাজারে স্টেজের এই অবস্থা; মিথিমিথি তেল পুড়িয়ে ক্ষমা চাইতে আসবেন—থিয়েটারের লোক হলেও সূর্য মল্লিক এতখানি ভাবপ্রবণ নন। এর মধ্যে আরও কোন কথা আছে।

একটু পরে তিনি নিজেই বলতে লাগলেন। 'আমি জানি, আপনি অন্য ধরনের মানুষ। আলোবাবুকে আপনি যে গিয়ে লাগাবেন, এ আমি বিশ্বাসই করি না। আমিও তো চাই মশাই, নাটকটা আপনার ভালো হোক। তাহে 'মহুয়াতলা'-এর নাম হবে, দুটো পয়সা আসবে। সীতা চরিত্রটা সরোজিনীকে দিলে ভালো হয়, সে কি আমি বুঝি না? আমিও তো আকটো-ঔকটো বুঝি, না কি?'

সূর্য মল্লিক থামলেন। তীর্থঙ্কর তখনও চুপ করে রইল। সে বুঝতে পারছিল না, কথাটা শেষ পর্যন্ত কোন্ দিকে যাবে।

সূর্য মল্লিক খানিকটা আপন মনে বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমার যে অনেক জ্বালা! এই দেখুন না, বেলাকে একদম সামলানো যাচ্ছে।'

তীর্থঙ্কর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন? কী হয়েছে?'

—'কাল তো শুনলেন, নিজের কানে। বলে গেল, আমি যাচ্ছি। ব্যস্, একদম একদম থেকে খসেছে। আর আসতে চাইছে না। কাল থেকে কত বোঝালুম। তার এক কথা, আমায় কেউ চায় না। আমি আর ওখানে যাব না—।'

—'যা, না সে কি কথা। এটা উনি ভুল বুঝেছেন। ওঁকে না চাওয়ার কোন কারণ নেই। আমার রোল তো কম নয়।'

—'আই—।' সূর্য মল্লিক এমনভাবে তাকালেন যেন পৃথিবীর তিনি এই একটা কথাই শুনে আসছেন।

'আমি তো তাই বলেছি। তীর্থবাবু তোমার নামে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। সবচেয়েই যদি মনে হয়ে থাকে,—তুমি আমার ঘর। আমা কিছু ফেলনা চাহিনা। হবার হলে তুমিই তারাসুন্দরী হওয়া যায়। তাই বলছিলাম...' সূর্য মল্লিক একটু থামলেন। তারপরে তীর্থঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি যদি কিছু একটু বলেন...'

—'আমি? কি বলব?'

—'বেলাকে। আপনি বুঝিয়ে বললে শুনবে।'

তীর্থঙ্কর কিন্তু-কিন্তু করছিল। বলল, 'আপনি বলছেন, আমি না-হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তাতে কি কাজ হবে?'

সূর্য মল্লিক তাঁর একখানা হাত তীর্থঙ্করের হাতের ওপর রেখে বললেন, 'হবে, হবে। মেয়েদের মাপের, বুঝতেই পারছেন, কত রকম মান-অভিমান থাকে। এ, আপনি যদি এই উপকারটুকু করেন, তা হলে অনেক অপ্রীতিকর জিনিস এড়ানো যায়।'

সূর্য মল্লিক ড্রাইভারকে সব বুঝিয়ে দিলেন। 'মনুমেন্টের ধারে-কাছে তাকে নামিয়ে গাড়ি তীর্থঙ্করকে নিয়ে যাবে পরাশরচন্দ্রের বেলারানীর বাড়ি। সেখানে সে অপেক্ষা করবে। তারপর তীর্থঙ্করের কাজ শেষ হলে আবার তাকে ফিরিয়ে আনবে।

তীর্থঙ্করের হাত রয়েছিল স্টীয়ারিঙের ওপর। মনে মনে সে সীতার চাঁদের বেলারানীকে নিয়ে বসে ছিল। এদিকে রাস্তার অনেকজন পুলিশ যত তাঁর এখন তাকে সামলাতে হবে। ঈষৎ শুধু হাস্য-ভাষি করে বলল,

তানদিকে কয়েক চয়-পাঁচ খালি জমি; তার পাশেই বাড়িটা। পুরনো মেটেলা বাড়ি। বাইরে বহু জায়গার চুন-বালির আস্তর খসে গেছে। কিন্তু বেশ বড় বাড়ি; অনেকখানি জায়গা নিয়ে। সেই জন্যেই হোক বা যেই হোক বড় নয়, মাথায় বিশেষ খাটো। খানিকটা অন্তরীক্ষিয় বাড়ির বহুদের মতন।

সূর্য মল্লিকের ড্রাইভার গোডান বলল, 'আপনি এই দরজা দিয়ে ঢুকলেই সিঁড়ি পাবেন। দোতলায় উঠে যাবেন। তান দিকের বারান্দা ধরে শেষে শেষ ঘর। আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছি।'

বাইরে তখন বেশ চলছিল। পুরো আসছে; আকাশ কেমন যেন থমথমে ভাব।

কিন্তু তীর্থঙ্কর দরজা দিয়ে ঢুকতেই তার চোখে আলো অন্ধকারের মত কেটে উঠল। বাড়ির ভেতরটা থমথম; বাইরের সঙ্গে যেন তফাত।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তীর্থঙ্করের মনে হল, এ যেন ঘুমন্ত মায়াপুরী। কত কাল সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে এখানে।

কিন্তু না। আড়ালে কোথাও কোথাও মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। কারা যেন চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

বাড়ির বাতাসে এঁটোকাঁটার গন্ধ; তীর্থঙ্করের পা দুটোও এগোয়।

পুরনো হলে কি হয়, যেন পরিপাটি বাড়ি। চওড়া বারান্দা, ঘরের সঙ্গেই যুক্ত। শেউনো মেঝেয়। তবে বাড়িতে অনেকজন হাত পড়েনি।

বেলারানীর ঘরের সামনে তাঁর পদা দুলছিল। তীর্থঙ্করের হাত বাড়ির পরজায় টোকা দিল।

কোন সাড়া নেই। ভেতরে কোথাও বলাবলি চলে পড়ার আওয়াজ হচ্ছিল। তীর্থঙ্করের মহা অস্বস্তিতে পড়ল। আসলে তাঁকে দেখা অন্যে না যে, জিজ্ঞেস করে। ঘরের ভেতর না জেনে-শুনে ঢুকে পড়াও চলে না। তীর্থঙ্কর ঘাবড়িয়ে যাচ্ছিল লাগল।

একটু পরে জল পড়া বন্ধ হল।

তীর্থঙ্করের এবার জোরে জোরে টোকা দিয়ে গলা তুলে বলল, 'যাচ্ছেন?'

ঘরের ভেতর থেকে বেলারানীর সাড়া পাওয়া গেল, 'কে?'

তারপর পর্দা সরিয়ে সে মুখ বের করল 'এঁয়া। কি ভাগ্যি বাবুজি, বাবুজি...'

বেলারানী বোধহয় স্নান সেরে বেরিয়েছিল। তার মুখে, কপালে ফোঁটা-ফোঁটা জল। চুলের গোছাটা ভেজা।

তীর্থঙ্করের খুব অবাক লেগেছিল। দিনের আলোয় বেলারানীকে সে এই প্রথম দেখল। থিয়েটারে কোনোদিন ভালো করে নজর করা হয়নি; কিংবা যারা থেকে হয়তো সম্ভবের জন্যে দিয়েছিল, তুলিয়ে দেখাটা অস্বাভাবিক। অনেক সময় কথাবার্তার জন্যে চোখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। বেলারানীর কথাবার্তার আলগা ধরন ছিল; কেমন যেন অমার্জিত ভাব।

তীর্থঙ্কর সেদিন থিয়েটারে বেলারানীকে দেখে থাকা ফেল।

চাঁপা-চাঁপা রং, ছোট্ট মুখখানিতে লেগেছে শ্রী আছে। বয়স তো বেশি নয়! কত হবে? পঁচিশ-ছাব্বিশ। নিষ্পাপের মতো চোখ; চোখের তলায়, ওপরে একটু কালি-পড়া ভাব। কিন্তু তখন খা-খোয়ার পর এত বেলা যাচ্ছিল না। বেলারানী সুন্দরী নয়। তবে থিয়েটারে যে কারণে তীর্থঙ্কর তাকে দেখেছে, তাতে চেহারার ফুল ভাবই চোখে পড়েছিল। সেটা এক দম চোখের ভ্রম। কিংবা সাজপোশাক, মেকআপের জন্যেও হতে পারে।

ঘরের ভেতর তখন খাটে। আয়না বসানো আলমারি। পুরু ঘষি-খাটা একখানা ইজিচেয়ার; স্প্রেডশাটের ঢাকনা। ফুলদানিতে গাদুমের ফুল; তাঁর সুন্দর ছোট্ট ছবিটা। এখন মূর্তি সজ্জাহীন দেখা যায় না। বেলারানী তাকে নিয়ে ঘিরে আছে কখন।

মাথার ওপর কম করে পাখা ঘুরছিল। দু' ধ্রেকের ফটের পাখা। বেশ গা-সহা হাওয়া।

বেলারানী বলল, 'কোথায় যাব। কি ভাগ্যি আমার! বলতে বলতে সে-ও বসেছে এক কোণে বসল। তখনও তার মুখ-চোখ ভিজে। হালকা একটা ছাপা শাড়ি পরনে। খাটের কাছে ব্লাউজটা চুলের জল পড়ে ভিজে উঠেছে। দু' হাতে মুঠো খুলে জামদস্ত কাটা ছুরি, যা ঘরের মধ্যে আছে একটা বসানো আছি; কান খালি, গলা খালি।

তীর্থঙ্কর হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি তো আমার ওপর খুব চটেছেন?'

বেলারানী ঝিব কটিল। না, বিশ্বাস করুন, সেদিন থেকে মনে হয়ে আছি। কেবল ভাবছি, ছি ছি ভালো মানুষের ছেলের সঙ্গে কেন এমন ব্যবহার করলুম? মনটা খুব উতলা হয়ে ছিল। ভাবছিলাম কী করে ক্ষমা চাওয়া যায়।'

তীর্থঙ্কর বলল, 'সেই ক্ষমা চাইবার সুযোগ করে দেবার জন্যেই তো এলাম। মনের কথা আমি জানতে পারি তো।'

—'আপনার সঙ্গে কথা পারব? আপনি আমাদের মুখে কথা নেন। আচ্ছা, সত্যি করে বলুন না, কি করে বাড়ি খুঁজে পেলেন?'

তীর্থঙ্কর হেসনি হাসতে হাসতেই জবাব দিল, 'মনের ঠিক থাকলে মনেও ঠিকানা মেলে। আর, মনের বোঝক হলে হরিদ্বার থেকেও আপনি বেরোমি হয়ে ফেরত আসতেন।'

বেলারানী খাট থেকে উঠে পড়ে বলল, 'কেন মরতে ডেকে এনে আপনার মেজাজ শুনেছি। কী খাবেন বলুন?'

—'কিছু না। আপনাকে দুটো কথা নিবেদন করে চলে যাব।'

—'তা-ও কখনো হয়, যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন। আর, খাবার কথা আপনাকেই বা জিজ্ঞেস করছি কেন?' বলে বেলারানী বিছানার তলা থেকে চাঁবির গোছা বের করে অলমারি খুলল। পয়সা-টয়সা নিল বোধহয়। তীর্থঙ্করকে বলল, 'আপনি একটু বসুন, এঃ—'

তীর্থঙ্কর বাধা দিতে গেল কিন্তু বেলারানী শুনল না। প্রায় ছুটে ঘরকে ডাকতে ডাকতে দরজা দিয়ে বেরুলো।

তীর্থঙ্করের মনে এক অদ্ভুত ভাব আসছিল গেছে, এ-কথাও মনে হল যে, বেলারানী হয়তো সীতা চাঁদের খারাপ অভিনয় করত না।

পাখরের রেকাবিতে বড় বড় দুটো রাজভোগ নিয়ে বেলারানী ঢুকল। তার পেছন পেছন আরেকটি মেয়ে-মানুষ। বোধহয় কি-টি হবে। তার হাতে পাথরের গেলাসে জল। গেলাসের মুখে ছেলের কাজ করা আলনা-ঢাকা।

তীর্থঙ্কর ভয় পেল, 'এত করেছেন! এই অবেলায় এত খাওয়া যায়?'

বেলারানী প্লেট, জল ছোট এক টিপয়ের ওপর নামিয়ে দিয়ে বিছে বলল, 'বেলায় আপনাকে পাচ্ছি কবে? নিন, খান।'

তীর্থঙ্করের খেতে আরম্ভ করল। খেতে খেতে বলল, 'আপনি তো জিজ্ঞেস করলেন না, আমি কেন এসেছি?'

বেলারানী তার জল হাতের হাতপাখা রেখে তীর্থঙ্করের খাওয়া দেখছিল। মুখ টিপে হেসে বলল, 'এমনিতেই কি আসতে নেই? কারণ থাকতেই হবে?'

তীর্থঙ্কর খাওয়া থামিয়ে ঘরের চেহারা ও মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল 'আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।'

বেলারানী বলল, 'এবারটা থাক।'

—'সেকি! আমার নাটকে আপনি অভিনয় করবেন না, তা হয় না।'

—'আসছে বার করব। যা বলবেন তাই করব।'

—'কিন্তু এবারের কী হবে?'

—'ও হয়ে যাবে। কারুর জন্যে কিছু আটকে থাকে?'

—'এ কিন্তু আপনার অভিনয়ের কথা—'

তীর্থঙ্কর খাবার শেষ করে শেষে হাত ধুল। পরেই থেকে রুমাল বের করে হাত মুখ মুছল।

বেলারানী রাজী হচ্ছিল না। তীর্থঙ্করের কত বোঝাল। শেষকালে বলল, 'আমি তবে চলি। পরবর্তীর থিয়েটারে এই আমার প্রথম নাটক। একজন মোড়া থেকে আপনি ছিলেন। আজ সবে ছেড়ে চাইছেন। এই আমার ভালো হবে না। কেলেঙ্কারি আমার নাটক খারাপ হয়ে যাবে।'

বেলারানী এ-কথা শুনে খুব বিচলিত হয়ে পড়ল। বোধহয় সে তীর্থঙ্করের হাত ধরতে যাচ্ছিল কিন্তু সামলে নিয়ে খানিক বসে থাকল। 'ও কথা বলবেন না। এক সামান্য অভিনেত্রীর জন্যে আপনার নাটক খারাপ হতে যাবে কেন?'

তীর্থঙ্কর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তবে যাই?'

বেলারানী একটু এগিয়ে এসে। ঘরের মাঝামাঝি, বলল, 'শুনুন, আপনি হয়তো ভাবছেন, একটা মেয়ের জন্যে আমি এমন করছি। কিংবা সংসারিনীর প্রতি হিসেবে না, আমাকে তত ছোট ভাববেন না। চরিত্রটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল এটা ঠিক। শেষার না হলে খুব হয়েছিল, তাও ঠিক। কিন্তু আসল দুখ কোথায়, জানেন?'

বেলারানী কথা বলতে বলতে মেয়ে তার দুচোখ জলে ভরে আসছিল। কিন্তু সে লুকোবার চেষ্টা করল না। সোজা তীর্থঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। আলো পড়ে এই

পোড়া জীবনে। নিজের বলে কি কিছু নেই। পাঁচের বেতরও কিছু নেই, অথচ হাত-তোলা হয়ে থাকা... এই তো জীবন। মরুভূমির মতো... সূর্যবাবু ভেবে ভালো...এই যা বেরুচ্ছেন সবই ঠাট—তাঁর ধরতেই পেছে আছে...কিন্তু জানেন সূর্যবাবুর কাছে একটা সত্যকে ভোলাতে—কেননা। ভিজেও না। তিনি কারবারী লোক হিসেবে হোসেনকে কমতে চান না...'

বেলোয়ারী আঁচলে চোখ মুছে ম্লান হাসল। তারপর বলল, 'নিজের বলতে কিছু নেই, এইভাবে পরের-তা জীবন... মাঝিনটাকে আঁকড়ে ধরে একটু বাঁচতে চেয়েছিলাম। তাও একের পর এক ঝড়ে যাচ্ছে। দুঃখ হয় বৈ কি! কিন্তু আপনাকে আর দুঃখ দেব না। আমি কাল অন্যত্র নটকে। দুঃখ আপনার জন্যেই করব। আলা জেনে, বিয়ের পর বাকলে দেখেন, তাও করব।'

—'বলেন?' তীর্থংকরের নিজেকে অপরাধী মনে হল। এই মেয়েকে সে-ই বাঁচা করতে দিতে চায়নি। অমলাবাবু কিছু বলবার আগে দীপকের কথা একটা সে-ই তুলেছিল। আর, এখানে আর আলাও তো তার নিজের পক্ষে নয়। সূর্য মাঝিক তাকে পাঠিয়েছে, নিজের স্বার্থে।

বেলোয়ারী সে কথা জানে না। তীর্থংকর হাত পাবে এই ভেবে সে পার্ট করতে রাজী হচ্ছে। অথচ তার দুঃখের কথা তো তীর্থংকর জানতে চায় নি?

—যাক, আপনি আমার বাঁচালেন।' বলতে বলতে তীর্থংকর দরজার দিকে এগোলো। একটা ভুল মেয়েমানুষ সুযোগ পাওয়া গেল। আজ চলি। কবে থেকে করছেন?'

—কাল। কথা যখন দিয়েছি।'

বেলোয়ারী হরেনের এসে দাঁড়াল।

মুহূর্তের বোঝতে তীর্থংকরের মনে হল, বেলোয়ারীর কথাও তাকে একদিন লিখতে হবে।

অমলাবাবু একদিন থিয়েটারে ফোন করে জানলেন, তাঁর ডায়াবিটিস বেড়েছে। দিনকয়েক রিহার্সালে আসতে পারবেন না। দীপক শুনে চটে গেল, 'এই লোকটাই ভোবাবে। ওঁর জন্যে সবারের পার্ট খারাপ হবে, নাটক মার খাবে।'

সূর্য মাঝিক বললেন, 'তাই বলে গা ছেড়ে দিলে তো চলবে না। প্রকৃতি দিয়ে চালাও। বাকি সব ভালো করে তৈরি কর।'

—কী করে করবেন? ওঁর মেন পার্ট! হাতে আর সময়ও তো নেই। নাটক যা হবে বুঝতে পারছি। তখন আপনারা কথা শুনলাম না। কে জানত, একটা ভদ্রলোক আর্টিস্ট হয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেবে? আপনারাই দায়ী দায়িকেশাই! আপনারা দিয়ে এবার সব মামলা তুলেছেন।'

সূর্য মাঝিক এ-কথার উত্তরে আর কথা বাড়ালেন না। কিন্তু দীপকের শেষ কথাগুলো তাঁর ভালো লাগে নি। দুঃখ দেখে কোথা বাড়িয়ে। তীর্থংকরও মনে মনে বিরক্ত হল।

বেলোয়ারী সেদিনের পর থেকে আবার নিয়মিত আসছিল। এবং তীর্থংকরের কথা আলার চাঁদের সে কখনো কথা বলছিল না। তার এই উদাসীন দেখে দীপকও অবাক হয়েছিল। অথচ সে চমনক খুতখুতে। সহজে খুশি হওয়া তার ধাতে নেই।

তীর্থংকরকে একদিন বেলোয়ারী চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, কেমন হচ্ছে? আপনার মন রাখতে পারব তো?'

তীর্থংকর হেসে বলল, ভয়কার! আমার মনের কথা ভাবতে হবেন না। আপনি সাঁতাই ভালো অভিনয় করছেন। আমি বলছি, নিজের মুখে আপনি একদিন বড় অভিনেত্রীর সম্মান পাবেন।'

স্টেজ রিহার্সালের দিন সাতেক আগে অমলাবাবু আবার এলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ অবশ্যই অবশ্যই, তবে চলতে ফিরতে আগের চেয়ে একটু বেশি সাবধান। তাঁর নাকের ডগা অস্বাভাবিক লাল, মুখে অস্বাভাবিক হাসি।

ঢুকেই তিনি একটা ফুল করে ফেললেন। দীপককে প্রায় জড়িয়ে ধরে হাত ঝাঁকাতে করে বললেন, 'থ্যাঙ্ক য়্যু, আমি এসেছি। এবার আপনি আমাকে দেখুন।'

দীপক জবাবে ঠাট্টা, 'আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? আপনাদের দেখবে কে মশাই? আপনারা সব ডুমিস্ট হয়েই আর্টিস্ট!'

অমলাবাবু দু-একবার হেসে-হেসে ধুলো নিলেন, তারপর বললেন, 'থ্যি বল, কতগুলা আর্টিস্টের সঙ্গে কাজ করেছেন? পঞ্চের পরের আর্টিস্টরা কি সব পার্টিয়ান এসেন না কি? আকাশ থেকে পড়েন?'

এই কথা কটাকাটি বন্ধুত্বের ছেড়ে পারত, ছোটখাট পার্ট বাদ করে, নায়ক ছেড়ে তারা উপভোগও করছিল কিন্তু সূর্য মাঝিক মাঝখানে পড়লেন। তাঁর পরার থিয়েটার মালিকের কর্তৃত্ব ফুটে উঠল, 'দীপকবাবু, আমরা এখানে থিয়ে ঠেকাবাজি করতে আসিনি। এটা পারলিক থিয়েটার। এখানে বহুলোকের জীবনমরণ নির্ভর করছে একটা নাটকের ওপর।'

অমলাবাবু সেদিনের রিহার্সালেও সুবিধে করতে পারলেন না। পার্ট মুখস্থ হয়নি। কিন্তু তিনি মুখ বুজে দীপকের নির্দেশ পালন করলেন। দীপকের সেবাযত্নও খুব ভালো। তীর্থংকর মনে-মনে তারিফ না করে পারল না।

রিহার্সাল ভাঙল। তীর্থংকর অমলাবাবুর কাছে এসে দাঁড়াল। তিনি বললেন, 'এই যে ভায়েন। কদিন দেখা নেই। খবর কী?'

তীর্থংকর সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'আপনি কেমন আছেন? শুনলাম শরীর খারাপ হয়েছিল।'

অমলাবাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'সুধার।'

—'বেশ!'

—'বেশ।' তারপর হঠাৎ বললেন, চল একটু, ঘুরে আসি।'

তীর্থংকর আপত্তি করল, 'না। আপনাকে কষ্ট করে আমার পৌঁছুতে যেতে হবে না।'

—কে বলল তোমাকে পৌঁছুতে যাচ্ছি? তোমার কিসের কাজ না থাকে, আমার সঙ্গে চল। আপত্তি আছে?'

তীর্থংকর একটু ইতস্তত করছিল। তার যাবার খুব ইচ্ছে ছিল না। দীপকেরও বোধ হয় কিছু বলবার ছিল, সে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু তীর্থংকর ভেবে দেখল, দীপকের চেয়ে অমলাবাবুর সঙ্গে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সে বলল, চলুন। বেশি দেরি হবে না তো? তা হলে আমার ভেবের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।'

অমলাবাবু তার পিঠে হাত রাখলেন। 'যাবড়াচ্ছ কেন? দরজা বন্ধ হলে একবার তোমার হোটেলে ভেবে নেব। কুলকোর্স ডিনার খাবে। জাস্ট দেখবে।'

অমলাবাবুর সেদিন অভিনয় সাজ-সজ্জা। হাঁটু-পাজামা পরেন নি। চুলের সুট; গলায় সোলকা-কাট সিল্কের মাফলার। হাতে বর্ষাতি ছড়ি। মাথায় ফেল্ট ক্যাপ।

সেদিন হাসবার নেই; সঙ্গে ড্রাই-ভারও আসেননি। তাঁর সেই দুঃখ খেলা স্পোর্টস্ কার। নিজেই চালাচ্ছিলেন।

গাড়িতে উঠে অমলাবাবু বললেন, ইয়ং ম্যান তো, একটু মাথা গরম। তা এ বয়সে অমন হয়ে থাকে।'

তীর্থংকর জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা বলছেন?'

—আহা তোমার ডিরেক্টর-বন্ধু গো। আমাদের ভবে দুঃখু, বন্ধু। ও নিমতলাও চিনি, কলী মিত্তিরও চিনি। স্তানিস্লাভ্স্কি বল, আর্টিস্ট বল—কিছু কিছু জানা আছে বৈ কি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি জানা আছে কলার জলে ধরিয়ে যাওয়া হলে আর চুরকে ভাস আওড়ানো। বলিনি ভেবে ভাবছো, বুঝলে না? আমাদের মেন হল যাত্রাওয়ালা, ফাঁপওয়ালা, চলওয়ালার মেন, সেটা মনে রেখো। কম বাবা বাবা আর্টিস্ট এখানে জন্মায় নি, তারা কেবল ঘোড়ার ঘাস কেটেছে, এটা ভাবা ভুল। রিয়াল খরার কিসের জান? খুড় প্রডিউসার, ডিরেক্টর আর মেন ইন্ ইওর লাইন। সেই জন্যেই তো তোমাকে একটু খাতির করছি। যদি কোনদিন স্টেজ কিছু লিখে ফালো...'

তীর্থংকর যত শুনছিল, তত অবাক হচ্ছিল। সব কথা সে বুঝতে পারছিল না। তার নিজের মনেও গভীরতা ছিল। এঁরা বুঝেছিল, তাঁর কথার কোথাও কী একটা মনে আছে। সবটাই পেশাদার চালাকি কিংবা মাতলামির প্রলাপ নয়।

অমলাবাবুর গাড়ি যে স্ট্রীট ধরে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর দিকে যাচ্ছিল। গাড়ির হাল নেই; আকাশে কুটকুটে তারা। কিন্তু নীচের ব্ল্যাক-আউট যেন আকাশকেও ছুঁয়েছে। আকাশে কি রকম এক কালচে-নীল ভাব।

অমলাবাবু সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু ধরে খোলবাজারের দিকে চললেন। তীর্থংকর বুঝতে পারছিল না, কোথায় যাবেন; ভরসা করে জিজ্ঞেসও করতে পারছিল না।

অবিনাশ কবিরাজ রোড ছাড়িয়ে অমলাবাবু বাঁ দিকে এক গলির ভেতর ঢুকলেন। সেখানেও অন্তত পনেরো-বিশখানা বাড়ি ছাড়িয়ে একটা লাল সেডানের কাছে তাঁর গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল।

কুটপাথ ঘেঁষে এক পানের দোকান; টিমটিম করে কুপী জ্বলছে। তার হেলেডাঙা, ছেলেমেয়ে বিকী হচ্ছে।

অমলাবাবু সেডানের সাট থেকে ছোট একটা পার্সেল নিয়ে বললেন, 'এস।'

তীর্থংকর অন্ধকারে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। পানের দোকানটা যে বাড়ির তলায় সেটা জরাজীর্ণ। দোতলার বারান্দার আর্ধেকটা ছেঁড়ে পড়েছে। লম্বা খুঁটি দিয়ে ঘর রাখা। বাড়ির পাশ দিয়ে কি রকম এক তেলা-চিটে, অন্ধকার গলি গেছে। তীর্থংকরের মনে হল ইঁদুরের গলি।

অমলাবাবু এখানে কোথায় আসতে পারেন, তীর্থংকর ভেবে পেল না; এই অদ্ভুত জরাজীর্ণতার জন্যে। সে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

অমলাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'নাহকে। আপনি আসে?'

তীর্থংকর কথা না বলে অমলাবাবুর পেছন-পেছন সেই ইঁদুরের গলিতে ঢুকল। কেমন ভৌতিক অন্ধকার, চেনাশি পক্ষ, ঘিঞ্জিয়ে থাকা গন্ধ।

অমলাবাবু একটা ইঁট-বের করা একতলা বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকলেন, 'জীবাবাবু।'

বাড়িটার দেওয়ালটা পাকা; হয়তো এক ইঁটের গাঁথনি। হবে চালি।

কে একজন দরজা খুলে দিয়ে ছায়ার মতো সরে গেল।

চটের পর্দা ঠেলে তীর্থংকররা ভেতরে ঢুকল। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল।

একপাশে ঘোমটা টেনে এক মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। ময়লা শাড়ি, গয়নার মধ্যে কর্ণা, কপালে একটা টিপ। তীর্থংকর এর বেশি কিছু বুঝতে পারল না।

অমলাবাবু কিন্তু সেদিকে ফিরে তাকালেন না। তিনি জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন। তীর্থংকর তখন দেখল, খোলা জানলার কাছে একটি

চৌকি পাতা। তাতে একটি ছেলে আধশোয়া হয়ে রয়েছে। বয়স সাত-আট বছর হতে পারে। রোগা রোগা চেহারা, পাতলা ঠোঁট; চোখ দুটি বড় বড়।

ছেলেটি অলোকবাবুকে দেখে একটু হাসল। হাসিটুকুর অর্থ কী? ডাক্তারের মনে হল, হাসিটা যেন অসুখের হাসি।

ছেলেটি বলল, 'জীতাবাবু, তুমি এসেছ?'

অলোকবাবু চৌকিতে তার পাশে বসলেন, 'হ্যাঁ জীতাবাবু। কখন আসতে পারিনি। আমার অসুখ করেছিল।'

ছেলেটি বলল, 'বহু, তোমারও অসুখ করেছিল। খুব ফেরেছিল?'

—'হ্যাঁ। তেতো ওষুধ, মিষ্টি ওষুধ—'

ওপাশ থেকে মহিলা অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছিল?'

—'একটু ম্যালারিটিস মতন,' অলোকবাবু মহিলার দিকে তাকালেন না। তার কাছাকাছি, অনির্দিষ্ট জায়গায় দৃষ্টি রাখলেন। 'এ-রোগ এখন গরম-গোলা হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে জ্বালায়।'

হঠাৎ ডাক্তারের ওপর তার চোখ পড়ল, 'আরে ডাক্তার! তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে! এসো, এসো তোমার পরিচয়ই হল না। এই হল জীতাবাবু, আর...'

অলোকবাবু যা পরিচয় দিলেন, তাতে বোঝা গেল, মহিলার নাম সুবাসিনী। নটরাজী থিয়েটারে এক সময় তিনি বাঁধা গাইয়ের দিদিমণি ছিলেন। ভালো গানের গলা ছিল। ডি. এল. রায়ের এখন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো গানখানা নাকি খুব সুন্দর গাইতে পারতেন। ছেলেটি তাঁরই। এইটুকু বলতে তার বুকের অসুখ। বেশি ওঠা, ছোটাছুটি করা বারণ।

মহিলার বয়স কত? ডাক্তারের বাবার চাঁদিপুরে কেউটার। অলোকবাবুই মনে হল, এঁরে দেখাশোনা করেন, দর-বাড়ির সব তাঁরই। ব্যাগের পকেটটা তিনি ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন, 'যাদু, আজ কি এনেছি!'

মহিলা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন, 'রোজ রোজ কেন এত করেন? এমনিতে তো আপনার দয়াতেই বেঁচে আছি...'

অলোকবাবু সে কথা গ্রাহ্য করলেন না। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কিছু লাগবে? জেখে যাব?'

মহিলা তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, আছে। এ-মাসটা চলে যাবে। আর্বাশ্যি ডাক্তারবাবু যদি আসছে হপ্তায় যাবেন, তাহলে তাঁর কী-টা কম পড়ে যাবে। সে যা হোক হবে।'

—'তাহলে সেটা কতক টাকা রাখ না...' অলোকবাবু কোটের ভেতর-পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করতে লাগলেন।

মহিলা আপত্তি করে উঠলেন, 'দেবেন না। ঘর দেখেন তত পরু হবে। খরচের কি শেষ আছে?' বলতে বলতে মহিলা একটু এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর্থকের এতক্ষণে তাঁকে ভালো করে দেখতে পেল। মাটাই যা কর্সা, মুখ-চোখ ভালো নয়। ঠোঁট পুরু, নাকের ডাঁদ নেই। কিন্তু গলার স্বরটি ভারি সুন্দর।

অলোকবাবু উঠে পড়লেন। ছেলেটির মাথায় হাত রেখে বললেন, 'জীতাবাবু, অমন চাঁদা কেমন?'

ছেলেটি ঘাড় কাত করে বলল, 'তাড়াতাড়ি এস। আর, রহুকে বলে যাও, আমাকে একটা গান শোনাতে। আমার কথা শোনে না।'

—'শোনাবে, শোনাবে,' অলোকবাবু মহিলার দিকে তাকালেন।

সুবাসিনী হেসে বললেন, 'ওই এক বাই ছেলের। ডেকে ডেকে বলে গান শোনাও।'

—'চুপটি করে একা বসে থাকে তো! ভালো লাগে না...'

ছেলেটি জানলার বাইরে তাকিয়েছিল। তার চোখ উদাস, দূরের সৃষ্টি-সৃষ্টি তারার মতো। হঠাৎ সে খুব নরম গলায় অলোকবাবুকে জিজ্ঞেস করল, 'জীতাবাবু, তুমি কি পরীর দেশের লোক?'

অলোকবাবু জোরে হেসে উঠলেন, 'কেন? আমাকে তাই মনে হচ্ছে বুঝি?'

তাঁর্থকের মনে হল, ছেলেটা মিথ্যে বলেনি। এই পরিবেশে অলোকবাবুকে পরীর দেশের লোক ভাবাই তো কথা। রাজার মতো চেহারা, সাজ-পোশাক—তাঁর্থকের নিজেরই বাঁধা দেখে যাচ্ছিল।

ছেলেটা বলল, 'মা বলেছে। তুমি কত ভালো, আমার জন্যে কত কি আনো! তুমি নিশ্চয়ই পরীর দেশের লোক।'

সুবাসিনী লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করেছিলেন। অলোকবাবু ছেলেটার মাথায় আরেক বার হাত বুলিয়ে বললেন, 'যেন, যেন, ভাই হলাম। আমি এখন যাই? বাইরে আমার পক্ষীরাজ রয়েছে।'

ছেলেটা নড়ে চড়ে তাকাল। তার চোখে কত রকম ইচ্ছে, স্বপ্ন সব ভেসে উঠছিল। সে বলল, 'তোমার ঘোড়া বুঝি অনেক দূরে?'

অলোকবাবু পাকা অভিনেতা। তিনিও ছেলেটার মুখে সমান ভাবে মুগ্ধতার নায়ক হয়ে গেছিলেন। 'অ—নে—ক দূরে। সেই দক্ষিণ দেশ। সেখানে এক সমুদ্র আছে। হু-হু করে হাওয়া বয়...'

ছেলেটা একটু ভেবে, গম্ভীর হয়ে বলল, 'বড় হয়ে আমি যাব তোমার দেশে। দেখো, ঠিক যাব।'

অলোকবাবু বললেন, 'যাবে বই কি। অসুখ সেরে ভালো হলেই যাবে...।'

বাইরে বেরিয়ে অলোকবাবু সব প্রথম বাড়ির দোতলা কম্পাউন্ডের ভেতর একটা চোখ তাঁর মেলে ধরে গলার ঢালালেন। 'তোমরা বড় নিষ্ঠুর বাপু। সাদা চোখে এইসব দৃশ্য কী করে দেখ? যাবে নাকি একটু?'

তাঁর্থকের ঘাড় নাড়ল। অলোকবাবু চোখ বুজে কয়েক মোক্ষ দেখলেন। তখন ঘরের ভেতর থেকে মাস্টার মহাশয় একটা গানের সুর ভেঁজে আসছিল। ঘুমে পাড়ানী গানের মতো। অলোকবাবু স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে একটু ঝিম্ মেরে রইলেন। তারপর জোরে জোরে মাথা নেড়ে সম্বিৎ ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলেন। গাড়ির তাঁর সঙ্গে সে গানের রেশ চাপা পড়ল।

অলোকবাবুর গাড়ি চলল। তিনি খানিকক্ষণ নিজেতে তন্ময় হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বুঝলে, নটরাজ?'

তাঁর্থকের কত কথা ভাবছিল। তার আসা আজ সার্থক হয়েছে। জীবনের এক অদ্ভুত কণ্ডচির দেখা পেল। কিন্তু ওই ছেলেটার বাবা কে? অলোকবাবুর সঙ্গে এদের কী সম্পর্ক?

সে সংক্ষেপে বলল, 'অন্ধকারের রং।'

অলোকবাবু সামনের অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসলেন। 'ঠেড়ে বলেছ। সেই জন্যই তো তোমাকে নিয়ে এলাম। আশপাশে কত জ্যান্ত নাটক রয়েছে।'

তাঁর্থকের জবাব দিল না। সে আবার ভাবছিল।

অলোকবাবু বললেন, 'তুমি বুঝি ভাবছ, এ-অন্ধকারে আমার কী ভূমিকা?'

তাঁর্থকের হেসে বলল, 'অহেতুক ভূমিকা।'

অলোকবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না হে। ওটা বড় সাজানো কথা হয়ে গেল। আমার ভূমিকা বড় কঠিন।'

—'কেন?'

অলোকবাবু সুবাসিনীর ঘটনা বললেন।

নটরাজী থিয়েটারে সুবাসিনী ছিল সেকেন্ড হিরোইন। সেখানে এক বড় অভিনেতার সঙ্গে তার ভাব-ভালোবাসা হয়। অভিনেতাটির নাম অলোকবাবু করতে চাইলেন না, কারণ এখনো তিনি জীবিত; অভিনয় করছেন। বয়সও তাঁর সেই আগের জৌলুশে আর নেই। সুবাসিনীকে তিনি বিয়ে করছিলেন না। ফলে সুবাসিনীর এই ছেলে হল। তাকে থিয়েটার ছাড়তে হল। অভিনেতাটিও অবশ্য আস্তে আস্তে সুবাসিনীর জীবন থেকে সরে গেলেন। ছেলের মাসিক অর্থসাহায্য করলেন। সমাজের শিক্ষা নিয়ে সুবাসিনীর তখন কঠিন অবস্থা। খাওয়াদাওয়া চলে না। একদিন বিজন থিয়েটারে সম্মিলিত রজনীর অভিনয় হচ্ছিল। বাইরে সেদিন ঝড়, জল। অভিনয় পণ্ড হব-হব। সুবাসিনী ছেলেকে নিয়ে এসেছিল সেই অভিনেতাটির খোঁজে। ব্রাহ্মণ সে সম্মিলিত রজনীর পোস্টার দেখেছিল। তার অঙ্গে কাঁদন তার খাওয়া হয়নি। যে-বাড়িতে থাকত, সেই বাড়িওয়ালা তার জিনিসপত্র বাইরে রেখে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। সুবাসিনী ন' মাসের ভাড়া দিতে পারে নি। অভিনেতাটি সুবাসিনীর সঙ্গে দেখাই করতে চাইলেন না। দরোয়ান দিয়ে বলে পাঠালেন, তাঁর সময় হবে না। অলোকবাবু মেকাপ-রুমে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সব শুনে তাঁর কেমন জেদ চেপে গেল। অভিনেতাটির সামনে তিনি সুবাসিনীকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'ভালোবাসার সাথ হয়েছিল তো একটা পালককে কেন? গলায় দড়ি দিতে পারলে না?'

সেই থেকে সুবাসিনীদের ভার অলোকবাবুর ওপর। তিনি এখানে ওদের ঘর ঠিক করে দিলেন। এই পাঁচ-ছ' বছর তার সন্ধানে ওদের সাহায্য করে আসছেন। প্রতি মাসে এক, দুবার তাদের নিজে যান। সুবাসিনী এখন মফস্বলের অভিনেত্রীর ডাক পায়। ছেলেটার বুকের অসুখ তার চিকিৎসা চলছে। অলোকবাবুরও ছেলেটার ছুটি নেই।

তাঁর্থকের জিজ্ঞেস করল, 'ওর নাম কি জীতাবাবু?'

অলোকবাবু হেসে বললেন, 'না। সুবাসিনী ছেলেকে জাঠাবাবু বলতে শিখিয়েছিল। ছোটবেলা থেকে ও আমাকে জীতাবাবু বলে ডাকে। জাঠাবাবু বলতে পারে না। আমিও তাই জীতাবাবু বলেই ডাকি।'

তাঁর্থকের ভাবছিল, প্রবৃত্তির কি অদ্ভুত সব খেলা তার খেয়াল! সূর্যবাবুর কাছে বেলোয়ারী একটা সন্ধান চেয়েছিল। পায়নি বলে তার দুঃখ যেটুকু আছে। আর, সুবাসিনী যা বা একটা পেল, কিন্তু সুখ পেল কী? এইভাবেই তো জীবন চলে! এই ভারাক্রান্ত পূর্ণ অপূর্ণতার দ্বন্দ্ব দিয়ে, সাদের মতো একবেঁকে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ওঠা-পড়ায়। জীবন কখনো নিজের ঠিক রূপ জাহির করে বলে না, 'এই আমি!'

তাঁর্থকের বুঝতে পারছিল, সুবাসিনীদের নিয়েও তাকে একদিন লিখতে হবে।

ফ্রেস রিহার্সালের দিন সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেল।

মহরতের দিন সন্ধেবেলা নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনী। তার দুদিন আগে ফ্রেস রিহার্সাল বসেছিল।

বেলা তিনটে থেকে আরম্ভ হয়ে ওদিকে রাত আটে, নটা পর্যন্ত চলবার কথা। মিউজিক, অলো সবের পুরো রিহার্সাল হবে।

বাঁশক ফাটার কাঁটার শোনে তিনটের হাজির হল। তার গলার স্টেজ-ওয়াচ ঝুলছে। তার আসিস্ট্যান্ট জগদী আদি ডিরেক্টরের চরণে

লোক। তিনি থাকা, খোসিয়াল হয়ে ওরে ওঠেছেন।

দীপক ঘড়ি দেখে দেখে ভাবে এক এক পাঁচ মিনিটকে কনসিডার করে হবে। সেই অনুযায়ী তিনি থাকে সেই করছেন।

পোহনে 'ঠক ঠক' হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজ ঘরে চলেছে। তৈরব পাইন কোম্পানির ব্যানারটি বসাচ্ছে। প্রথম দৃশ্য : মনোরঞ্জন নন্দের বাড়ি। নেশা ঘরে অনেক রাতে বিমানাথ বাড়ি ফিরেছে। নীচের হল্-কম-ড্রয়িং রুমে সে ভীষণ চেচামেচি করছে। বুড়ো লোক তাকে ওরে রাখতে পারছে না। মনোরঞ্জন নন্দ কোম্পানির ম্যানেজার বাড়িয়ে।

প্রেম সময় ভীষণ লম্বা সাইকেল থেকে উঠে, তাঁর সাংবেতের মতো। মনোরঞ্জন নাম বিমানাথের সব কথা, মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। যেন চুম্বকাল, পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। বিমানাথের মুখে কোকাস। তার ধরণর, চুলুচুলু চোখে অজানা ভয়। প্রায় মুখের ওপরেই আলো অনেক বলতে ঘুরে আসবে। তারপর ধনা গলো। ভোর হল। বিমানাথ একটা সোফার হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে আছে। তখনও তার ঘুম ভাঙেনি। নাসিকেন বাজাতে লাগল।

সূর্য মল্লিক ঢিলেঢালা অবস্থায় এসে পড়লেন, সঙ্গে বেলারানী। সরোজিনী অভিনয় দেখার জন্য ও সঙ্গে এসেছিলেন। আজ বাড়িতে একটা পার্টির ব্যবস্থা ছিল। তাতে বেশ কয়েক 'এক্সট্রা' দরকার। প্রোডাকসনের ব্যবস্থাপনা হলেও ঠিক সময় গাড়ির করিয়ে দিলেন। নাক-পাহনের সরোজিনী এসে গেল।

এলেন না শুধু অলোবাবু।

দীপক পনেরো মিনিট সময় দিল। পনেরো মিনিটে সে রিহার্সাল শুরু করল। অলোবাবুর বদলে রিহার্সাল দিতে লাগলেন কৃষ্ণেন্দু। তিনি অনেক কাজ অভিনয় করেছেন। তাঁর ইনিশিয়েটিভ নেই, ক্রিয়েটিভও নেই। বড় বড় চরিত্র তিনি অভিনয় করেছেন, তবে বেশির ভাগই ফ্লপ ছবিতে।

সরোজিনী সবকিছু ভর্তি করে দিল। যেমন তার উচ্চারণ, তেমনি ফ্রাঙ্কনেস।

তীর্থঙ্করের মনে মনে স্বীকার করল, সরোজিনীকে নেওয়া সার্থক। বিশেষ করে সেই দৃশ্যে, যেখানে সীতা জানতে পারছে, বিমানাথ তারই বাবার বয়সী, সেখানে তার এক্সপ্রেসন, ভাবপরিবর্তন—সমালোচকদের ভাষায় পড়ে বলে 'অনবদ্য'।

বেলারানীও কম যাচ্ছিল না। রাগ, ঘৃণা, তর্ক তেজ, বন্ধুলোকের মেয়ে গার্লফ্রেন্ডের—তার অভিনয়ে সবের ফুটে উঠছিল। দু-এক জায়গায় তো সরোজিনীকে সে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল বলে হল।

পাঁচটা বাজার আলোবাবুর কোন এলো। আসবেন্টার মধ্যেই তিনি আসছেন।

এলেন আরও আধঘণ্টা পরে, ছটার সময়।

তখন একদফা রিহার্সাল হয়ে গেছে। চা-জলখাবারের বিরতি চলেছে। সূর্য মল্লিক বাস্তা গাকাই কফি আনিয়েছেন আর আলুর চপ। সকলের এক রকম খাবার। সামনের রেস্তোরাঁ থেকে মস্ত কেতলিতে চা এসেছে। আর প্লেট ভর্তি।

আলোবাবু ঢুকে জানালেন, 'আই অ্যাম সরি, মি রায়। একটু দেরি হয়ে গেল।'

কৃষ্ণেন্দুবেলা দিবানিদ্রা হয়েছে। তার মুখ তাঁর ঘুমঘুম। চোখের কোল বসা। মাথার সামান্য অবহেলা। কপালে, কানের পাশ দিয়ে কটা পাকা চুল উঁকি মেরেছে।

তীর্থঙ্করের মনে হল তাঁকে সেই প্রথম দিনের মতো লাগছে। তীর্থঙ্করের যৌবন তাঁর বাড়ি ফিরেছিল।

দীপক তাঁর কথার জবাব দিল না। তাঁকে প্রায়ও করল না। সে আবার রিহার্সাল দেওয়াতে লাগল। কৃষ্ণেন্দুবাবু ইতস্তত করছিলেন। অলোবাবুর উপস্থিতিতে তাঁর পার্ট তিনি কতটা কোন্ হবে?

দীপক তাঁকে ধমক দিল, কৃষ্ণেন্দুবাবু, আমি তো আপনাকে পার্ট বন্ধ করতে বলিনি। আপনি যেমন করছেন, করে যান—'

তীর্থঙ্করের প্রমান হলো। অলোবাবু নির্বিকার। তিনি হাঁটুর কাছে মাথা গুঁজে বসে রয়েছেন। চোখ বন্ধ।

সূর্য মল্লিক বুঝলেন, এ ঠিক হচ্ছে না। তিনি একবার জোরে গলা খাঁকারি দিলেন। তাতেও কোন ফল হল না। দীপক তখন অভিনয় বেলারানী আর সরোজিনীকে নিয়ে পড়েছে।

সূর্য মল্লিক বললেন, দীপকবাবু, এক মিনিট। অলোবাবু যখন এসেই পড়েছেন, তখন ওঁর কাজটা করে নিলে হত না?'

দীপক বোধ হয় তৈরী ছিল; সুযোগ খুঁজছিল। অলোবাবুর দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সূর্য মল্লিককে সে বলল, 'কি দরকার! ওঁরা বড় আর্টিস্ট স্টেজে ফেরে নেবেন।'

সূর্য মল্লিক বললেন, 'তা ঠিক আমাদের বলার নেই। আমাদের কাজ নিয়ে কথা। ওঁকে বসিয়ে না রেখে রিহার্সাল দেওয়াও।'

—'কাকে রিহার্সাল দেওয়াবেন, মল্লিক জলাই?' দীপক চটে উঠল, চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলল। 'পরশু নাটক খুলবে। আমার আমোদের সামান্যতো চেষ্টা করছি। আর, উনি এখনে সাড়ে তিন দিন রিহার্সাল দিয়েছেন। আজ তিনটে থেকে এখনে আমরা বসেআছি, আর উনি বালোবেদের একাশ আজিনেতা, সমস্তকার চেহারে মণি—হটার সময় এলেন হেলতে দুলতে, ঘুমিয়ে, চোখ ঘুমিয়ে...তাও যদি বুঝতাম নিজের পার্টটা মুখস্থ করা আছে, সেদিকেও অক্ষেপ্তা...বলুন তো আপনার পার্টটা মি ব্যানার্জী', বলুন...উঠে দাঁড়ান, সেই আপ—'

দীপক যেন ক্ষেপে গেল। ঘুমন্ত আত্মির হাত থেকে শিকার ছেড়ে নিয়ে নিজে বলল। সূর্য মল্লিককেও উঠতে বলল। একেবারে প্রথম দৃশ্য থেকে রিহার্সাল আরম্ভ হবে। সকলের ওপর সে যেন প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

মিউজিকের জ্বলেনবাবুকে বলল, পটাটিং মিউজিক। ওয়ান, টু, থ্রি...' অলোবাবু একটিও কথা না বলে উঠে দাঁড়ালেন। নিজের স্বভাব-সিদ্ধ ভঙ্গীতে ধীরেসুস্থে তৈরী হলেন। এতটুকু ব্যস্ততা নেই। নিখুঁত অভিনয়ের সূর্য মল্লিককে প্রোজিকশন দেখিয়ে দিলেন। যত বিমানাথকে যারা সামলাবার চেষ্টা করবে, তাদেরও তিনি বলে দিলেন, তাঁকে কোথায় কোথায়, কেমন করে ধরবে, মুখ আটকে দাঁড়াবে না ইত্যাদি।

দীপক তাতে আরও চটে গেল, নেতার ঘাইন্ড আমাকে বিজনেস, মি ব্যানার্জী'। আপনি নিজেরটুকু ঠিক ঠিক করুন। তাহলেই আমরা কৃতার্থ হব। অন্য সবের জন্যে আমি আছি...'

অলোবাবু তখনও কিছু বললেন না। তিনি নিজের পার্ট বলে যেতে লাগলেন। শুধু বলে যাওয়াই; তাতে অভিনয়ের ছিটে-ফোঁটা ছিল না। তীর্থঙ্করের প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, দীপকের এত অপমানের পর হয়তো তিনি মঞ্চের দরজার মতো লাফিয়ে পড়বেন। কিন্তু তিনি ভেড়া হয়ে নিষ্প্রাণ অভিনয় করে যেতে লাগলেন। আশ্চর্যজনকভাবে পর্যন্ত কি পরাজয়ের!

বেলারানীর সঙ্গে চূড়ান্ত ঝগড়ার অলোবাবুর কথা ঘুরিয়ে গেল। বেলারানী তাঁকে বাড়ির কাচিয়ে দিল, তিনি ভুল, উল্টো-পাল্টা সব বলতে লাগলেন।

দীপক ভাবে, চেয়ার হাতের খাড়া পেটের ওপর আছড়ে ফেলল। 'আপনাকে কী বলেছিলাম, মি ব্যানার্জী? প্রথম দিন থেকে আপনাকে বলে আসছি, পার্টটা মুখস্থ করতে। আপনি গ্রাহ্য করলেন না?'

অলোবাবু প্রত্যুত্তরে বিস্ময়ে বিচলিত ভাব দেখালেন না। খুব ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আমিও তো আপনাকে প্রথম দিন বলেছি, মি রায়, পার্ট মুখস্থ করা আমার কর্ম নয়।'

অলোবাবুর ভাবভঙ্গিকে দেখে দীপক ক্ষিপ্তের মতো উঠল। 'তাহলে কি আপনি বলতে চান, নাটকটা এই-ভাবে রান হবে? মুখে আপনার খেয়াল খুশির জন্যে? আপনি এক-দিন আসবেন তো এক রাত আসবেন না। অন্যদের অসুবিধে দিয়ে সারা দিন পড়ে রইলেন। অল রোমান্স! আপনার সঙ্গে কারুর সহযোগিতা হল না। কাল যান পরশু দেখ। কোথায় কী হচ্ছে, না হচ্ছে আমি এখনও কিছু বলতেই পারছি না। একটা কমপিলট রিহার্সাল দেখা যাচ্ছে না আজও। আর, এ-সব ছিটে টুং ছাড়। আমাকে জব্দ করার জন্যে এগুলো আপনার ইচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্র। প্রফে-সনাল ছেলেমানী...কিছু বুঝি না ভেবেছেন?'

সূর্য মল্লিক বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই অলোবাবু বললেন, 'মি রায়, আপনার সেবকার শুনতে এখনে আসি নি। আমার রিহার্সাল বাঁধ না হয় তাহলে আমি ঘরে চলি। আর, যাই বি যাই, জানিয়ে রাখি, আপনি আমার ছেলেমানীর পাত্র নন। দুঃ আর নাম্বার ওয়ান। দুঃ এখন এ স্পুরিয়াস আচেভার...'

সূর্য মল্লিক পাগা বলে অলো-বাবুকে পেছন পেছন ছুটে যাচ্ছিলেন, অলোবাবু বেরিয়ে যাবার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না সূর্য, আমাকে কিছু বলো না। আমি খুব দুঃখিত, এ রকম একটা কাণ্ড হল। কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে অপমানিত হই, তাই কি তুমি চাও? আমাকে এ-যাত্রা মাফ করো। ও ভূপেন চালিয়ে নিতে পারবে বলে।'

তীর্থঙ্করের এই পরিস্থিতে হক-চকিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার মাথায় ঢুকল, এইখানে নাটকের তীর্থঙ্করের ফেকসুর সমাধি। তখন সে উত্তাল হয়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল।

'অলকেয়, কিছু বলবে নাকি?' অলোবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

তীর্থঙ্করের জিজ্ঞেস করল, 'আপনি সত্যি সত্যি করবেন না?'

—'না।'

—'আমি যে ডুবে যাব? এই আমার প্রথম নাটক। কত আশা করে-ছিলুম...'

মনে হল অলোবাবু যেন একটু বিচলিত হলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'ডুবে নয়। ডুববে কেন? ঠিক হবে, ঠিক হবে। কিছু ভেবো না...'

এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সূর্য মল্লিক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। দীপকও তখন জল পেয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব সে বুঝতে পারছিল। অলোবাবু হঠাৎ চলে যাবেন, পার্ট করবেন না—এতটা সে ভাবে নি। ভেবেছিল, তিনিও হয়তো দু-চারটে কড়া কড়া কথা শোনাবেন, খানিকটা তর্কাতর্কি হবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

সূর্য মল্লিক বললেন, 'পোস্টার পড়ে গেছে। আজ থেকে আমরা

খুলে যাচ্ছে। যা ভিনকল, সেই আন্দাজও আন্দাজও খারাপ হয়নি। আর এদিকে...আমি এখন কী করি?'

তীর্থংকর জানত না, আন্দাজটা ভালো হয়েছে। সূর্য মল্লিক এ-ব্যাপারটা ঠেলে দিয়েছিলেন। বীপঙ্কর ওপর তার ভীষণ রাগ হচ্ছে লাগল। খুব খুব নিজের অসহিষ্ণুতার জন্যে তার জীবনের এতবড় একটা সুযোগ এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল।

তীর্থংকর কাউকে কিছু না বলে চলে আসছিল। বিল্টুরা, সেন্টার সব চলে গেছে। এইখানে একটু আগে কত আলো, লোকজন ছিল। এখন মঞ্চ প্রায় অন্ধকার, নির্জন। সূর্য মল্লিককে দেখে তার কষ্ট হল। কি গভীর অসহায়, সর্বশান্ত লোকের মতো তিনি মাথাটা একদিকে কাত করে বসেছিলেন। তাঁর পাশে বেলা-রানী। হোরা! তার জীবনে সামান্য আশাটুকুও পূর্ণ হতে গেল না!

বুকিং কাউন্টারের কাছে সরোজিনী দাঁড়িয়েছিল।

তীর্থংকর অবাক হল। আর্টিস্টদের পৌঁছে দিতে থিয়েটারের গাড়ি তো আগেই চলে যাবার কথা।

সরোজিনী বোধ হয় তীর্থংকরের মুখ দেখে কিছু বুঝতে পেরেছিল। সে বলল, 'থিয়েটারের গাড়িতে আমি যাইনি। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

—'কেন? কিছু বলবেন?'

তীর্থংকরের কথার ধরনে সরোজিনী কেমন যেন মিইয়ে গেল। একটু আড়ষ্ট হাসি হেসে বলল, 'তেমন কিছু নয়। আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হয়নি। তাই ভাবলাম...'

তীর্থংকর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

—'বউবাজারে। চাঁপাতলায় কাছে।'

—'গাড়ি ছেড়ে দিলেন, কী করে যাবেন?'

সরোজিনী হাসল, 'এ-সব খুব অভ্যেস আছে। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে চলে যাব।'

—'তাহলে চলুন।'

তীর্থংকর আর সরোজিনী 'মহুয়া-মহল' থিয়েটারের বাইরে এসে দাঁড়াল। তখন বেশি রাত হয়নি। সাতটায় কিছু বেশি হবে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল, কত রাত! সবাই ঘুমে পড়েছে।

সরোজিনী একটু উৎসুক করে বলল, 'আপনি ভাববেন না...'

—'কিসের?' তীর্থংকর বুঝতে পারছিল না।

—'নাটকের কথা ভাবছেন তো? হবে কি হবে না...'

—'ভাবনা তো হবেই। যা কাণ্ড হল! কিন্তু আপনি বুঝলেন কী করে?'

সরোজিনী বলল, 'আমি। আপনার আর সুবিনয়বাবুই সবচেয়ে দুশ্চিন্তা। কিন্তু অত মনখারাপ, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আলোবাবুকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি, ভালো করেই চিনি কিনা! বড় খামখেয়ালী, অবি-শ্বেক লোক আপনারা ভাবছেন, তা তিনি নন।'

সরোজিনী একটা ঘোড়ার গাড়িকে হাত দেখাল, তার সঙ্গে দরদস্তুর করল। গাড়িতে ওঠবার আগে হেসে বলল, 'চাঁপাতলায় বাড়ি যান। এই কথাটুকু বলবার জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম। আপনার অন্ধকারের রূপ আমার খুব ভালো লেগেছে। সাঁচা চরিত্রের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী।'

গলার চেনের তলা থেকে হাত বের করে সরোজিনী নমস্কার করল। তারপর অন্ধকারে তীর্থংকরকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘোড়ার গাড়ি চলতে লাগল। ঘোড়ার পায়ের খট্ খট্ শব্দ রাস্তা থেকে মিলিয়ে যাবার পরও তীর্থংকরের বুকে জেগে রইল।

খানিক আগে, খানিক অনিশ্চয়তার উত্তেজনায় তীর্থংকর সেদিন ছেলে ছেড়ে ছড়েপুড়ে, তার ছেলে ফিরে-ছিল। সারারাত ভালো করে ঘুমোতে পারল না, ছটফট করে কাটাল। একবার মনে হল, সরোজিনীর আস্তানা বাড়ি ফিরে যায়? আলোবাবু বাড়ি ফেরে করে বসে থাকেন?

অবেলবেলায়, ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতার মধ্যে তীর্থংকর স্বপ্ন দেখল, 'মহুয়া-মহল' থিয়েটারে লোক ছাপাছাপি। সবাই নতুন নাটকার তীর্থংকর চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্ধকারের রূপ' দেখতে এসেছে। প্রসেনিয়ম কমলে পরদাখুলে। সূর্য মল্লিক বলছেন, 'তীর্থবাবু, এখন থেকে 'মহুয়া-মহল'-এর আপনি বাঁধা নাটকার।'

পরের দিন তীর্থংকর খুব-খুব সকাল 'মহুয়া-মহল' থিয়েটারে গেল। কাউন্টার খোলা ছিল; দু'-চার জন দাঁড়িয়ে টিকিটও কিনছে, দেখা গেল।

তীর্থংকরের ভয় একটু কাটল। সে ভাবছিল, বাইরের বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দেখবে, 'অনিবার্য কারণবশত...' পোস্টারে, দর্শির লো-কার্ডে প্রধান ভূমিকায় আলোবাবুর নাম জলজল করছে।

তবে কি নাটক হচ্ছে? আলোবাবু করছেন? আলোবাবুর আবার ভূতের মুখরোচক করলে চাই-নাই-এ তাঁর নাম বসানো যায়ত। এরা এমন নির্ভরে টিকিট বিক্রী করে যেতে পারত না।

কিন্তু কার-পার্কিং-এ সূর্য মল্লিকের উপস্থিতি ছিল না। তীর্থংকর ভেতরে গিয়ে দেখল, সব তো-তা। স্টেজে কৈবল পাইন দু'-এক জন কনস্ট্রাক্টার নিয়ে কি খুটেখুট করছে। আর, বেকার মুখে আলোর তত্ত্বাবধান, বেকারম্যান ইস্রাফিলের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করছিল।

তীর্থংকরকে দেখে তারা উঠে দাঁড়াল। সকলেই জানে সূর্য মল্লিক আজ এ-মুখো হবেন; দীপঙ্করও না। থাকলে কিনা কেউ বলতে পারল না।

তীর্থংকর কিছুক্ষণ সূর্য মল্লিকের ঘরে গিয়ে বসে রইল। কিন্তু কতক্ষণ বসে থাকা যায়? হঠাৎ মনে হল, সূর্য মল্লিকের বাড়িতে একবার ফোন করে দেখা যায়। বড়বাজার কত যেন তাঁর নম্বর?

টেবিলে কাচের তলায় দরকারী নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর সব লেখা ছিল। তীর্থংকর প্রথমেই সূর্যবাবুর নম্বর দেখে নেন। কিন্তু ফোন করে লাভ হল না। তিনি বাড়ি ছিলেন না। খুব সম্ভব তাঁর স্ত্রী ধরেছিলেন। বললেন, 'উনি তো বাড়ি নেই।'

গলা শুনেই তীর্থংকরের মনে হচ্ছিল, মহিলা বেশ মোটা, ঘোলাজল এবং ফর্সা। কেমন যেন হালকাস করে কথা বলছিলেন।

তীর্থংকর জিজ্ঞেস করল, 'কখন ফিরবেন কিছু বলে গেছেন?'

মহিলা জবাব দিলেন; জবাবে মুখস্ত ভাব। 'ওঁদের তো ফিরতে রাতই হয়।'

—'আচ্ছা। ঠিক আছে...'

তীর্থংকর ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল, ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনি ধরা থিয়েটার থেকে বলছেন।'

তীর্থংকর জানাল, 'আমি থিয়েটার থেকেই বলছি।'

—'তা। তবে গরমাগরমটা দেখুন।' বলে মহিলা খুব জোরে রিসিভার নামিয়ে দিলেন।

সর্বনাশ! তীর্থংকর না জেনে মস্ত এক ভুল করে বসল। সূর্য মল্লিক ঘরে-বাইরে দু' রকমের উত্তাপ নিয়ে বসে থাকেন। তার খেয়াল ছিল না। কাল শো। এই ছেলে সূর্যবাবুর বাড়িতে আরেক নতুন নাটক না খুলে হয়।

সে-রাতেও তীর্থংকরকে প্রবল অস্বস্তির মধ্যে কাটাতে হল। থিয়েটার থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ সে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেছিল। একবার ভাবল, বেলারানীর বাড়ি যায়। সে নিশ্চয়ই হালফিল খবর জানবে। দীপঙ্করের আস্তানাটা জানা থাকলে সেখানেও যাওয়া যেত। কিন্তু তীর্থংকর কোথাও যেতে পারল না।

পরের দিন সকালে তীর্থংকরের ঘুম ভাঙল চকের আওয়াজে। আজ মহালয়ার বোধন। নবপত্রিকার আয়োজন চলেছে বোধ হয়।

তীর্থংকরের প্রথমেই মনে হল, আজ তার নাটকের অভিনয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার বুক ভারি হয়ে উঠল। নাটক কি হচ্ছে? হলে একবার এরা খবর দিত না? যাই হোক, সে তো নাটকার!

চা-টা খেয়ে তীর্থংকর আগে তার জলতলার চটিতে তালি দিতে বসল। তারপর ধোপার বাড়ি থেকে ফিরে আসা কাপড় নিয়ে এলো। কলকাতা যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে। রাস্তাঘাট [illegible] ছোট ছেলেমেয়ে। কোথা থেকে এরা সব বেরিয়ে এলো কে জানে?

চারদিকে যেন একটা আনন্দ, উৎসবের ভাব। অনা দিনের থেকে আলাদা। এই সময় ঠা-ঠা সাইরেন না বেজে ওঠে! কিংবা হাতিবাগানে বোমা পড়লেই হয়েছে।

তীর্থংকর ভাবছিল, অন্তত যদি না ঘটে, তাহলে তার নাটক লোক টানবে; টানা উচিত। আলোবাবুর মতো আর্টিস্টকে নিয়ে পুজোর আন-কোরা নতুন নাটক আর কই? কিন্তু আলোবাবু কোথায়?

তীর্থংকর তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নিল। দুপুরে নাথান সে মহুয়া-মহল থিয়েটারে চলে যাবে। আড়াইটে-তিনটের মধ্যে সূর্য মল্লিক নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। তাক উপোসে।

কিন্তু সূর্য মল্লিক তার আগেই তীর্থংকরের মেসে এলেন।

নীচে গাড়ির চেনা হর্ন শুনে তীর্থংকর চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিল। ছেলের চাকরও সেই সময় চুকে বলল, 'সুবিনয়বাবু এসেছেন। জরুরি ডেকে পাঠাচ্ছেন।'

তীর্থংকর তৈরী হয়ে গাড়ির কাছে যেতেই সূর্য মল্লিক বললেন, 'এই যে তীর্থবাবু, আপনি কাল থিয়েটারে গিয়েছিলেন শুনলাম?'

তীর্থংকর গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, 'কার কাছে শুনলেন?'

—'হবু বলছিল।' হবু তার ছিপে টবের খাস চাকর।

তীর্থংকর জিজ্ঞেস করল, 'কি হল? নাটক হচ্ছে?'

সূর্য মল্লিক জোর করে একটা নিশ্বাস ফেললেন, 'মনে তো হচ্ছে। দেখা যাক...'

তীর্থংকরের এই দু'দিনের কত দুশ্চিন্তা, প্রশান্তি অন্তর্ধান হয়ে করে পড়ল। সে বলল, 'আপনারা আমাকে একটা খবর দিলেন না? দুটো রাত যে আমি কি প্রশান্তিতে কাটিয়েছি...'

সূর্য মল্লিক আপনা দিয়ে বললেন 'বুঝি, বুঝি। আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝি। তাই তো আজ সকালে আপনার কাছে এলাম। কি করব বলুন? আমারও এই দুটো দিন যা গেছে! আলোবাবুর বাড়ি থেকে টেলিফোন.. তারপর এদিকের ঝামেলা থাকা...'

—'আলোবাবু তাহলে রাজী হয়েছেন?'

—'অনেক বলা-কওয়ার পর নিম-রাজী গোছা। কিছু বলা যায় না... তবে এটাও আপনাকে বলে রাখি তীর্থবাবু, সূর্য মল্লিক না হয়ে এ বদি অন্য কেউ হত তাহলে, আপনার নাটক হত না। আলোবাবু বেঁকে বসলে তাঁকে রাজী করানো চাট্টিখানি কথা নয়।'

তীর্থংকর জিজ্ঞেস করল, 'দীপঙ্কর [illegible]

সূর্য মল্লিক সহসা বলে উঠলেন, ফেলেদেনদুষ্ট, ফেলেদেনদুষ্ট। তোমার ক্ষমতা আমি মানি, তোমার কাজ করার ধারাও খুব ভালো কিন্তু তাই বলে এত অনাসৃষ্টিকাল, হ্যাঁ? পার্সোনিক থিয়েটার কাজ করতে গিয়ে যেন অন্যের ওপর আঘাত করা, অন্যকে বড় আর্টিস্টকে বল করার এতটুকু হিম্মত নেই! আমি তো বলাই, সোজা কথা এই যুক্তি, যে-ধাক্কা খুব তের তার চাঁটও আমি সইতে প্রস্তুত।'

গাড়িতে যেতে যেতে তীর্থঙ্করের মনে হল, খুনের কলকাতার যত লোক আজ পথে বেরিয়েছে তারা সবাই 'মহুয়েমহল' থিয়েটারে যাচ্ছে, তার নাটক দেখতে।

সূর্য মল্লিক নেমে প্রথমে কাউন্টারে গেলেন। বিক্রীর অবস্থা বেশ ভালো। বুকিং-ক্লার্ক বলল, হাউস ফুল হয়ে যাবে। সূর্য মল্লিক হুকুম করলেন, ছাঁ পাস একটাও হবে না। খুব খুব, চারজন গলাধাক্কা লোককে তিনি আলাদা জোড়ার বক্সিয়ে দেবেন। সুতরাং একটা টিকিটও হাতে রাখার দরকার নেই।

মিনিটের পরেই দীপক এসে গেল। সূর্য মল্লিকের সঙ্গে সে-ও নাকি অলোবাবুর বাড়ি গিয়েছিল কিন্তু তেতরে ঢোকে নি, তাকে দেখেও সামনে নামিয়ে সূর্য মল্লিক নিজেই গিয়েছিলেন। তারা এক ঘণ্টা দীপককে লেকের বেঞ্চিতে বসে ঘোরা সৈনিকের তাজব দেখতে হয়।

তীর্থঙ্কর জিজ্ঞেস করল, 'তবে আপনি ঢোকেন কেন?'

—সূর্যবাবুর কথায় না হলে আমাকে গিয়ে বলতে হত। অবশ্য দুজনে একসঙ্গে ঢুকে পড়ি না। অন্যকে দেখে যদি কেস খারাপ হয়ে যায়?'

—কি মনে হচ্ছে? শেষ মুহূর্তে চাঁইই বেরে না তো?'

দীপক তাচ্ছিল্যে তাচ্ছিল্যে মুখ ঘুরাল। কিন্তু বলতে পারলেন না। এ রকম ঔরঙ্গজেব আর্টিস্ট আমি জীবনে দেখিনি, দেখতে চাইও না।'

'মহুয়েমহল' থিয়েটারে স্টেজ। কাঁটায়ে যখন দশ খুব দীপক সেই ব্যবস্থা করতে চলে গেল। পাঁচটার মধ্যে প্রায় সবাই এসে পড়ল—এক্সট্রা আর্টিস্ট, মিউজিক হ্যান্ডস, নাচের মেয়ে। কেয়ারটেকে আসতে সূর্যবাবুর গাড়ি গিয়েছিল। গুপী আঁচ ঘুরে ঘুরে দেখবার মতো স্টাফ, তুলোর প্রয়োজনীয় প্রপার্টিগুলো মিলিয়ে নিচ্ছে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সরোজিনী, অভিনাশ ঘোষালও এসে পড়লেন। তুলসী মুখুজ্যে তৈরী; অলোবাবু তখনও তিনি মেকাপে বসেন।

কিন্তু ছটা বেজে গেল, অলোবাবুর দেখা নেই।

সূর্য মল্লিক একবার কাউন্টার, একবার অফিস-ঘর, আরেকবার স্টেজ করে বেড়াচ্ছেন। অথচ এরকমটা তাঁর মেকাপ নেবে যাওয়ার কথা। প্রথম দৃশ্যেই বাঁকে নামতে হবে।

একটু পরেই 'হাউস ফুল' বোর্ড টাঙিয়ে দিল। সূর্য মল্লিক ছুটতে ছুটতে এসে মেকাপে বসে তীর্থঙ্করকে বললেন, 'আপনি একটু ফোন করুন না! দেখুন বেরিয়েছেন কি না?

রিসিভার তুলতে গিয়ে তীর্থঙ্করের হাত কাঁপতে লাগল। যদি না বেরিয়ে থাকেন? যদি বলেন, না হে ছেকে দেখলুম, আমার করা ঠিক হবে না! এরাশিন রিহার্সাল দিয়েছে, ও তুলসীই করুক!

তা হলে? এই যে হাউস ফুল হয়ে গেল, অন্ধকার মাঠিরে এই যে ন শ লোক তার নাটক দেখতে আসছে, এরা কী করবে? চেয়ার ভাঙবে, পরদা ফেরত চাইবে? অথবা নটাকার তীর্থঙ্করের চট্টোপাধ্যায়ের নটক জীবনে আর দেখবে না?

কিন্তু অলোবাবু বাড়ি ছিলেন না। তিনি আরও ঘণ্টা বেরিয়ে পড়েছেন।

ফার্স্ট বেল পড়ে গেল। বেলির ভাগ দর্শক আসন নিয়েছে। হল-এর ভেতর চাপা গুঞ্জন। পান, লেমোনের বিক্রী শুরু হয়ে গেছে। জর্দা আর বেডক্লথ মিশ ভুরভুর করছে। উপরের বালকনিতে ছেলেদের আসনের পাশে পাশে কি ঘুরে বেড়াচ্ছে। পর্দার ওপরে আরেক পরত পর্দা। তাতে সব বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকা। আর্টি, নিজের সেই মর্মন্তিকা।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ে গেল। সবাই তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তুলসী মুখুজ্যে মেকাপ নিচ্ছেন। তৃতীয় ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্টেজে ঢুকবেন। তার আগে সূর্য মল্লিককে অলোবাবুর দর্শকদের আসনে গিয়ে বসতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে। বলতে হবে, এ-অবস্থায় যাঁরা নাটক দেখতে চান না, তাঁরা যেন দুদিন ছেড়ে পরদা ফেরত নেন।

কথাটা কী করে রাষ্ট্র হয়ে গেল। অলোবাবু আসেন নি। দর্শকদের মধ্যে গোলমাল বাড়ল। অনেকেই সীট ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। তারা যেন বলল, জানবাজারের কাছে প্রতিবাদ জমে জমজমাট হয়ে গেছে।

তীর্থঙ্করও বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে কি অদ্ভুত দৃশ্য! অন্ধকার রাস্তার মতো দু-এক শ লোক। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তীর্থঙ্করের কাছে হঠাৎ কি রকম অলীক, অলৌকিক মনে হল সব।

একটু পরেই সেই তারা ঝিমিয়ের মধ্যে এক চাপা উত্তেজনার ভাব জাগল। কেউ কেউ ছুটে গেল।

একটা গাড়ি ঢুকেছিল। অলোবাবুর হলদার। তীর্থঙ্করের এক পলক দেখতে পেল। সেদেরে সঙ্গী-এ অলোবাবু ভাত হয়ে রয়েছেন। দর্শকেরা গাড়ি ঘিরে ফেলল। অলোবাবুর ড্রাইভার গাড়ি সোজা স্টেজের নিয়ে গেল; একেবারে গ্রীন-রুমের দরজায়।

অলোবাবুকে ধরাধরি করে নামাতে হল। তিনি একদম প্রকৃতিস্থ নন। তাঁর সমস্ত শরীর টলমল করছিল। তিনি উইংস-এর কাছে দাঁড়িয়ে দীপককে বললেন, 'আই অ্যাম সরি, মিঃ রায়; একটু দেরি হয়ে গেল।'

অলোবাবুর পরনে সিল্কে করা আদির পাঞ্জাবী, গলায় সোনার বোতাম, পায়ে লপেটা, হাতে ফুল-বোঁচা। প্রথম দৃশ্য এ-পোশাকে চলে যাবে। মেকাপ ম্যান ইরাসিন এসে খুব তাঁর মাথায় উইগ বসিয়ে দিল—পুলো উস্কো খুস্কো করে দিল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখে একটু ফাউন্ডেশন ক্রীমের স্পাঞ্জ বুলিয়ে সে ছেড়ে দিচ্ছিল। অলোবাবু জড়ানো গলায় বললেন, 'খুব কম, আর চোখে কোল প্লাস। বয়স কমাতে হবে তো?'

তৃতীয় ঘণ্টা ক মিনিট দেরি করে পড়ল।

বেলোয়ারী এসে হঠাৎ তীর্থঙ্করকে প্রণাম করল। তীর্থঙ্করের হা-হা করে উঠেছিল, 'এ কি করছেন?'

—আশীর্বাদ করুন...'

তীর্থঙ্করের কিছু বলতে পারল না। কেমন অভিভূত হয়ে গেল। সে খুব বেলোয়ারীর পিঠে হাত রাখল।

সূর্য মল্লিক এনাউন্স-এর মুখে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বলছেন, 'আর রামকৃষ্ণ।' তারপর উপরের বালকনিতে নিজের জায়গা নিলেন।

পর্দা উঠল। মৌটিং মিউজিক চলছে। অলোবাবুকে ইরাসিন তখনও ধরে দাঁড়িয়ে। তাঁর খাড়া থাকবার সামর্থ্য নেই।

মিউজিক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গুপী আঠি আর ইরাসিন মিলে তাঁকে ঠেলে মঞ্চের ভেতর ঢুকিয়ে দিল।

অডিটোরিয়মের ভেতরে অলোবাবুকে দেখে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস। দীপক আর তীর্থঙ্করও উইংস-এর পাশে জায়গা করে দাঁড়াল। পরে তারা ওপরে বক্সে যাবে, গ্যালারিতে যাবে। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করবে।

দীপক ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'একদম রিহার্সাল দেননি, তারপর মদ্যপান মাতাল। ডায়ালগ বলতে পারলে হয়।'

তীর্থঙ্করেরও সেই ভয়ে নিজিয়ে ছিল। তাহলে মহা কেলেঙ্কারী হবে!

অবাক কাণ্ড। অলোবাবু স্টেজে ঢুকে কথা বলছেন। ধীরে ধীরে তিনি স্থিতিতে পারছিলেন না, মঞ্চের ওপর বিশি ঢলে ঢলে মাতালের অভিনয় করতে লাগলেন। উল্টে পড়ে গেলেন না, কেলালা হলেন না। ডায়ালগ বলছিলেন একটু থেমে থেমে, স্লুপ্টে শুনে: তাও আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেল।

...গ্রহণের প্রকরণের পর তোর হচ্ছে: বিমানাথ সোফার হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে। চৌদিকের বাজল। আশা বিমানাথকে ফোন করছে। তখন আশার সঙ্গে তার দুরন্ত প্রেম।

কে বলবে অলোবাবু মাতাল হয়ে মঞ্চে ঢুকেছিলেন; ওঁকে টেনে ঢুকিয়ে দিতে হয়েছিল? অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিকভাবে তিনি প্রেমের অভিনয় করতে লাগলেন।

দীপক আর তীর্থঙ্করের দুজনে দু-জনের দিকে তাকাল শুধু। কেউ কোন কথা বলল না।

প্রথম অঙ্ক শেষ হয়ে গেল। দর্শকদের তুমুল হাততালি।

অলোবাবু স্টেজ থেকে বেরিয়ে কোনদিকে তাকালেন না, কারুর সঙ্গে কথা বললেন না। টলতে টলতে নিজের মেকাপ রুমে ঢুকে গেলেন। সেখানে চাপাটা শিশি বের করে ঢক-ঢক করে খেলেন। গুপী আঠিকে ডেকে বললেন, 'গুপী, তপাদারকে বল তো ফ্রিজটা একটু কাইতে। খুব খুব ওটা ধসিয়ে রেখেছে কেন?'

দ্বিতীয় অঙ্কে আরও জমে গেল। দীপক আর তীর্থঙ্করের তখন ওপরে। বক্সে-এর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। বিমানাথ তখন জানতে পেরেছে, সে অলোবাবুর নাতের ছেলে নয়। আশা সব ফাঁস করে দিয়েছে।

অলোবাবুর অভিনয় এখনে দেখবার মতো। ঝড় পড়া গাছের মতো তিনি নুয়ে পড়ছেন। তবু বিমানাথের দুর্জয় প্রেম, মিথ্যে অহমিকা। সে ভাঙছে, তবু মচকাচ্ছে না।

অলোবাবু আলাদোড়া নিজের চেও অভিনয় করে গেলেন। দীপক বা-বা দেখিয়েছিল তার এতটুকু অনুসরণ করলেন না। অথচ রিহার্সালে সুবোধ বালকের মতো তিনি দীপকের নির্দেশ পালন করছিলেন।

তীর্থঙ্করের বুঝতে পারছিল, দীপক খুব অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু কিছু করবার নেই। দোষ তো ওঁকে নিজে, মুখ ঘষে মেকাপ তাঁর অভিনয়! তা ছাড়া, রিহার্সালে-এর অভাবে আর্টিস্টদের মধ্যে বোঝাপড়া হচ্ছে না বলে দীপক চেষ্টাচরিত্র করেছিল। সেটাও ঠিক নয়। সরোজিনীর সঙ্গে অন্তত অলোবাবুর চমৎকার বোঝাপড়া দেখা যাচ্ছে।

তীর্থঙ্করের মনে পড়ল, প্রথম দিন তার নাটকের গল্প শোনাবার সময় অলোবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, কাস্টিং নিয়ে প্রসাদের সিদ্ধান্তে কোন-দোষ ছিল কিনা। ছিল। বিমানাথ তার আসল পরিচয় জানবার পর নিবারণের সঙ্গে সে-ও পাশবেয়ারে পাঁড়িত হল। যেন বলদানুরের পাশ বাস ছেড়ে ছেলেতে হতেছে। অলোবাবু এরপর এক অদ্ভুত বিদ্রূপের বিদ্রূপাত্মক অভিনয় করে চলেছেন। যেন কি এক অসহ্য অবজ্ঞা ঘোরা তিনি কাঁধ ঝরে ঘরে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে

আলোবাবু এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন।

তীর্থঙ্করের এই পরিণতি আদৌ ভাবেনি।

দিবানাথ সেলামে ঝিম মিশিয়েছে। তার শেষ কথা। আমাকে ঘিরে যত অন্ধকার আমি এক ফুঁয়ে পার করব।

আলোবাবু সব ঠিক ঠিক করলেন। ফুটলাইটের কাছে এগিয়ে গেলেন। কথা ছিল, আইরিস-আউট হবে; আলো তাঁর মুখের ওপর ধীরে ধীরে ঘুরে আসবে।

কিন্তু তিনি শেষ সেলাম উচ্চারণ করার পরও দাঁড়িয়ে রইলেন। ওপর থেকে তাঁর মুখে স্পট পড়ল। সেলাটা টেনে কাছে তুলে ধরে তিনি মাঝখানের সেই বিখ্যাত লাইন কটা আওড়ালেন। 'লাইক ইজ বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো, এ পুওর প্লেয়ার...' ইত্যাদি।

তীর্থঙ্করের নাটকে এ-লাইন ছিল না। তার ইন্সপিরেশন নয়।

তিনি শেষ করলেন, 'সিগনিফাই: নাথিং' বলে, 'নাথিং' কথাটা ফুঁয়ে উচ্চারণ করলেন। তারপর সেলাম ঘুরে তুললেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে হোয়াস সরে গেল। মনে হল, এক মুহূর্তে অন্ধকার দিবানাথকে টপ্ করে গিলে ফেলল।

এদিকে তখন পর্দাও সরতে আরম্ভ করেছে।

দর্শকরা প্রথমটা বুঝতে পারেনি। তারা কি রকম হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর সে কি প্রচণ্ড হাততালি! সমস্ত অডিটোরিয়াম যেন ফেটে পড়ল। কতক্ষণ ধরে চলল সেই উল্লাস আর অভিনন্দনের পালা!

সূর্য মাঝের মুখে গিয়ে আলো-বাবুর মুটো হাত জড়িয়ে ধরলেন। তীর্থঙ্করের ছিপছিপে দীর্ঘ; তার পেছনে দীপক।

আলোবাবু বললেন, 'এই যে তরফের! মুখ পেয়েছ? যা করেছ তোমার, আমার, সকলের তরসার কথা কিন্তু।'

তীর্থঙ্কর মৃদু হেসে বলল, 'আপনারই তো জয় জয়কার।'

এই সময় দীপক পেছন থেকে এগিয়ে এসে বলল, 'মিঃ ব্যানার্জী, আমাকে মাফ করবেন।'

আলোবাবু বিস্ময়ে লুটিয়ে পড়লেন। তার আকৃতি নত হয়ে এক দীর্ঘ নমস্কার করে বললেন, 'কেন মিঃ রায়, আমি কি অভিনয় খুব খারাপ করি?'

তীর্থঙ্কর বলতে যাচ্ছিল, নাটকের নাম 'অন্ধকারের রং' না হয়ে 'আলোর আলো হওয়াই উচিত।

কিন্তু সেই সময় বেলোয়ারী পেছন থেকে ফিসফিস করে বলল, 'আমার কি কোন আলাই নেই?'

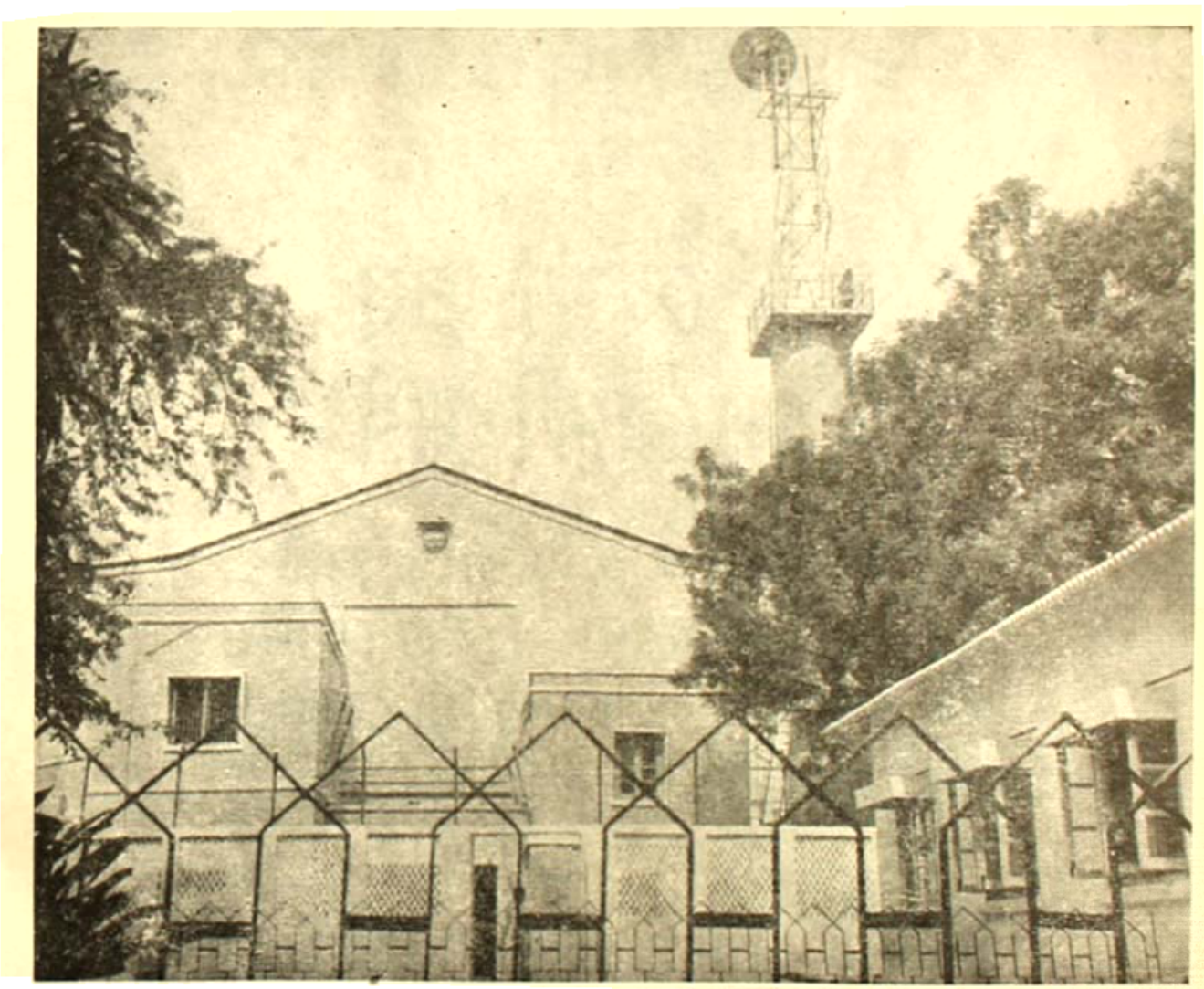

কলকাতায় দূরদর্শন

গত ১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় টেলিভিশন কর্মসূচী শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্যমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্ল ও উপমন্ত্রী ধরমবীর সিংহ, পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জনসংযোগ কমিশনার শ্রী সুধাংশু মুখোপাধ্যায় এবং লোকসভার সদস্য শ্রীমতী মায়া রায়। ছবিতে ডি. ডি. সি'র টাওয়ার ও বহির্নিভাসের একাংশ দেখা যাচ্ছে।

"শতকরা ৪০ ভাগ ময়দা ?
না বাবা ! জেনে শুনে কে কিনবে ?
আমি তো সর্বদা ভিভাই কিনি।
কেননা **ভিভা**তে আছে

# অনেক বেশী দুধ
# অনেক বেশী মল্ট

আর ভিভাতে আটা,
ময়দা বা অন্য কোনও
শস্যের গুঁড়ো মেশানো
নেই।"

**ভিভা**

আপনার চাঙ্গার দুধো খাদ্য পেয় ...

# ফকিরচাঁদের ফৌতি ব্যবসা

## অদ্রীশ বর্ধন

সম্পূর্ণ রহস্য কাহিনী

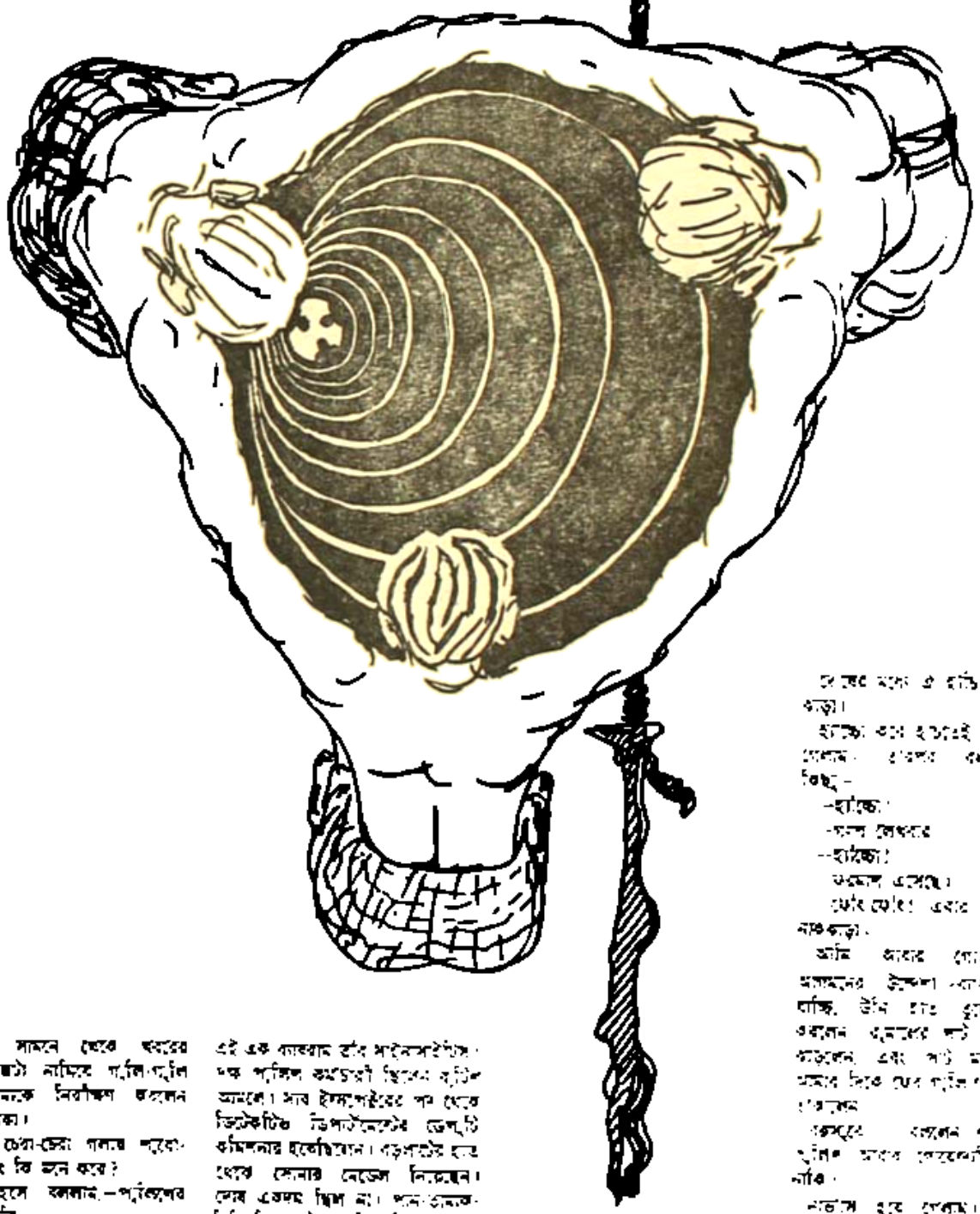

চোখের সামনে ছেড়ে ঘরের কাগজটা নাচিয়ে পুলিশ-পুলিশ ছেলে আমাকে নিরীক্ষণ করলেন পুলিশ কাকা।

তারপর ছেলা-ছেলা গলায় শুধোলেন,—চাইবে কি তুমি করে?

কাঠ হেসে বললাম,—পুলিশের গোয়েন্দাগিরি—

এমন সময়ে হাঁচি এল কাকার। এই এক ব্যারাম তাঁর মাঝেমাঝেই হয়। দক্ষ পুলিশ কর্মচারী ছিলেন বৃটিশ আমলে। সার হাঁসপাইরের পদ থেকে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার হয়েছিলেন। বড়দাদুর হাত থেকে সোনার মেডেল নিয়েছেন। সেবা এসবে ছিল না। পান-তামাক-বিড়ি-সিগারেট-চা-ওষি নাসি- কোনো নেশা নেই।

ছেলেবেলা থেকে এ হাঁচি আর যায় না কাকার।

হাঁচতে শুরু হতেই আমি থেমে গেলাম। ছেলের বদলে নিজে বিভ্রান্ত—

—হাঁচ্ছো।

—হাঁচ্ছো।

—হাঁচ্ছো।

ওরেব্বাস এযে দেখছি।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ এবার শুরু হল নাক-কাকার।

আমি আবার গোড়া থেকে আত্মপরিচয় উদ্ঘাটন করতে যাচ্ছি, উনি হাত তুলে নিষেধ করলেন। পকেটের লাল রুমাল বার করলেন, এবং সেটা মুখে চেপে আমার দিকে ছোট পুলিশ-পুলিশ চোখে তাকালেন।

ফেরৎ দেবেন পুলিশ। পুলিশ আবার ফেরৎদেবার কথা নাকি।

নাকাল হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক হেরেছি। পুলিশ কাকার সঙ্গে বন্ধুত্ব চেহারা বন্ধুত্ব কথাবার্তাও বন্ধুত্ব। চুপ

ব্রাঞ্চের প্রবেশদ্বার। সামনের দিকে তিন বাইশ পরিমিত স্থানে ইঞ্চিদশেক লম্বা করোগেটা পাতা ছুদ—বাকী মাথা কিপ দিয়ে মুড়িয়ে ছাটা। ঘড়ের পাখীর ঠোঁটের মতন বেরুনো নাক, পুরু ওষ্ঠ এবং বড় চিবুকের মধ্যে কঠোর মনোবল, ধীশক্তি এবং একমুখেমির লক্ষণ। সন্দেহ-কুটিল চাহনি—সারা জীবন ক্রিমিনাল ঘেটে কাউকেই যেন আর বিশ্বাস করেন না।

জোর করে হেসে বললাম—প্রহসন ইন্ডিয়ান পুলিস জার্নাল হেরেতো—আপনারা রিটায়ার করলেন—সে সংঘ বন্ধ হয়ে গেল। তাই...।

ওষুধ বলল। সারা চুলগুলি হুকে হাত বুলোতে বুলোতে কাকা বললেন—কে আর করবে? আমাকটা পুলিসের জার্নালও যদি একটা থাকত—'

কথাটা প্রসমাপ্ত রাখলেন কাকা। নত-চক্ষে কি যেন ভাবলেন। তারপর ভ্রুকুটি-ঘন চোখ তুলে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন আমাকে—যেন মনে মনে তৌল করলেন আমার অন্তরের অভিপ্রায়। অবশেষে বললেন স্বভাব-কর্কশ গলায়—আমাদের কালে ফোরেন্সিক সায়েন্সের এত রমরমা ছিল না। সায়েন্টিফিক ডিটেকশন যখন শুরু হয় নি, যখন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের ওপর আমরা বেশী গুরুত্ব দিতাম—তখনকার একটা কেস মনে আছে।

আমি নড়ে চড়ে বসলাম।

—কেসটা প্রেফ সারকামস্টান্সিয়াল এভিডেন্সের ওপর দাঁড়া করেছিলাম। কিন্তু এভিডেন্স পাই নি—প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না।

—প্রমান?

—তাও ছিল না। ছিল শুধু একটা সূত্র। খুব সামান্য। বাকীটা রীতু ক্যালকুলেশন্স করে মনে মনে কল্পনা করেছিলাম।

পুলিস কাকা শুদ্ধে সোনার মেডেল পেয়েছিলেন বি. এস-সি. পরীক্ষায়—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। শিক্ষা-হাটা যন্ত্রটার ধর্ত মাথাটা কি।

কিন্তু—

জিজ্ঞেস করলাম—কেসটা কেমন ছিলো?

বলেই মুখলাম ভুল করেছি। নির্বাক চোখে-কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন পুলিস কাকা। তারপর প্রচণ্ড শূন্যে নাক ঝাড়লেন গুনে গুনে তিনবার। মুখমাটা পাই করে ছেড়ে তর্কশকণ্ঠে বললেন—ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল ফকিরচাঁদ, ফকিরলাল আর প্রীন-চেম্বর—লাটে উঠেছিল কোর্ট বাবদা।

আমি কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে বসে রইলাম। তারপর শুধোলাম ভীরু-কণ্ঠে—কোর্ট বাবদা কি?

মাংসেল-চোখে এক পলকা তাকিয়ে ব্যঙ্গ করলেন কাকা। একটা উদ্যত হাঁচিকে সাবেক করে নিয়ে বললেন ঠোঁট বেঁকিয়ে—মড়া...ডেড বডি নিয়ে কারবার।

•

তখন বাড়ি-স্বাচারদের স্বর্ণ-যুগ।

—সোনা-দানা-মণিমুক্তো নয়—প্রেফ লাশ লুঠে অরেও দু'পয়সা পিটিয়ে এরমন লোক।

কলেজ হাসপাতালের শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে দাদুন চাঁছিয়া করেছে মরা মানুষের। মড়া পিছু ফেড়ল থেকে দুশ টাকা। মড়া কেটে জানার্জন করতে চায় ছাত্ররা। অত মড়া হাস-পাতাল থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। চালান আসত বাইরে থেকে।

ক্রমে ক্রমে মড়া চালান একটা ব্যবসায়ে দাঁড়িয়ে গেল। জোগান দিতে লাগল অন্ধকারখানার কুলী-মজুর এবং অন্যান্য পরীক্ষা—আত্মীয়স্বজন মহলে চিতায় তোল-বার বা গোর দেওয়ার খরচও বাদের নেই। মড়ার দালালদের হাতে মড়া চালান দিয়ে সে খরচ তো বাঁচছেই—উপরন্তু দু'পয়সা আসছে।

আরও একটা পথে ডেড বডি জোগাড় করত দালালরা—কবর খুঁড়ে!

অর্থাৎ মড়া চুরি! রাতারাতি এরা কবরখানায় ঝিত হানা। কেউ জানতেও পারত না—মাটির তলা থেকে সদ্যমরা মানুষটা চালান আসত কলেজ হাসপাতালের ব্যবচ্ছেদ কক্ষে।

ডেড বডি বিক্রি আইনের চোখে বোধনীয় নয়। কিন্তু গোরস্থানের লাশ লুঠে বেআইনী।

যে ব্যবসায়ে লাভ বেশী, কলোক সেখানে জুটেছে—লাভের অংশ আরো বাড়ানোর ফিকিরে।

দু'ভাবে তা সম্ভব।

ডেড বডি সংগ্রহের খরচ আরো কমিয়ে দিয়ে।

অথবা, একেবারে না খরচ করে!

কি ধরনের খদ্দের দালালদের পেছনে টাকা খরচ করায়? ডেড বডি যে কিনতেই হবে, এমন দিব্যি কেউ দেয় নি। গোরস্থান থেকে লুঠে আনাই বা দরকার কী? তাতেও অনেক খরচ, অনেক হাঙ্গামা।

সব খরচের সাশ্রয় সম্ভব একটিমাত্র পন্থায়।

মড়া বানিয়ে নেওয়া।

ডেড বডি জোগাড় করার বহু অনেক—কিন্তু মড়া তৈরী করার কোনো কিট নেই। বাউন্ডুলে, ভব-ঘুরে, ভিখিরি অনেকেই আছে। এদের ঠিকানা নেই। নিখোঁজ হলে কারো মাথাব্যথাও নেই। মরলেও কিছু এসে যায় না। বডি পিছু পঞ্চে পেড়ল টাকা নীট লাভ করে।

অতীব লাভজনক ব্যবসা। কিন্তু হুশিয়ারি প্রয়োজন। বডি দেখে যেন সন্দেহ না হয় যে খানদানিচালান ডেড।

কোঁতি ব্যবসার বিপদ এইখানেই।

•

শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষ।

গিরধরলাল টুলে বসে পা দোলাচ্ছে। দেবী চামুণ্ডার পদতলে নিক্ষিপ্ত অসুরের মতন মাংসপুষ্ট বপু। মিশমিশে কালো। চোখ দুটি ঘোর রক্তবর্ণ। নগ্ন গা। কটিদেশে কাঁস কষায়বস্ত্র।

গিরধর পূর্বজন্মে শুণ্ড অথবা নিশুম্ভ ছিল বোধ হয়। ইহজন্মে সে এজমালির ডোম ও মুদ্দোফরাশ। জাতিতে চন্ডাল।

গিরধর বিপত্নীক। অতিকোপনা বউয়ের সঙ্গে বছর দুই ঘর করেই নিষ্কৃতি পেয়েছে—ও পথ আর মাড়ায় নি। কিন্তু দেবী ধরনেস্বরীর সেবা চলে নিয়মিত। আর তার সঙ্গে দেবী সুরমুখীর প্রসাদে সে দুরীয় আনন্দে আছে।

টুলে বসে বিড়ি টানতে টানতে সেই কথাই ভাবছিল গিরধর।

কালরাতের মৌজ এখনো কাটে নি। উপরি পয়সা হাতে এলে শুদ্ধ ফুর্তি না করে পারে না সে।

হাসপাতালের স্টুডেন্টরা ফিস-ফাস করছে। সদ্য মুখে ফোসাদের নয়, হাতে সিগি-আর্দলি গুঁজে দিয়ে যায় বাহনাস্বরূপ। বাঁজর বাহনা।

ডেড বডি জোগাড় কি চাট্টিখানি কথা? তাকে অবশ্য কিছুই করতে হয় না। দালালরাই বডি পৌঁছে দিয়ে যায় ঘরে। তার পরে কিসে চড়া দামে বেচে দেয় গিরধর। তাকেই সব করতে হয়। মড়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেও কেনাকেচার সময়ে কোন ডাক্তারবাবুই থাকেন না।

খোলা দরজায় উঁকি মারল দুটি মুণ্ড। একজনের মুখে ভয়ভয়ে, চোখে-মুখে কথা কয়। অন্যজনের চোখ পাচার চোখের মতন ঘুঘু-ঘুটিল, চেলা-চেটি, শকেনো মুখ।

বিড়িটা ঘাঁতে কামড়ে জলল গির-ধর—কিকির-ফকির যে! এত সকালে?

চৌকাঠ পেরিয়ে এল তারা। তারপর মুখে বাস, সে যেন ঢোকা, ভিনাছিলে। শেকড়-চকু, ঘাঁটলোড়ী। দুজন জন ফকিরচাঁদ, দ্বিতীয় জন ফিকিরলাল। দুজনেই লাল চলনদী। গিরধরলালের সঙ্গে বহুদিনের পরিচয়।

ফকিরচাঁদ হেসে বললে—বাল আছে।

হাত নেড়ে গিরধরলাল বললে—দরকার নেই। কাল একটা পেয়েছি।

একটু চুপ হয়ে গেল ফকির। কিন্তু ফিকিরের মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না।

ফকিরচাঁদ বললে—সস্তায় দিব। দিয়ে দাও।'

অর্থাৎ সস্তায় কিনে কড়ায় বেচে মুনাফাটা নিয়ে যাওয়াই হল। স্টুডেন্টরা জানলেই বডি চাইবে।

বিড়ি ফামড়েই বলল গিরধর—কত?'

—সোয়া-শ'।'

—বা, ভাল্!—'

—কত বিবি কাবি তো।'

—সত্তর।'

শেষ পর্যন্ত ডকা হল নব্বই টাকায়। বডি আনতে চলে গেল কিকির আর ফকির। মনে মনে হিসেব করে দেখল গিরধর। একঘিনেই ষাট টাকা লাভ। সুরমুখীর নাকছাবির খরচটা তো উঠে গেল।

ঘণ্টা তিনেক পরে ফিরে এল কিকির আর ফকির। সঙ্গে আরো দুই ঘাতি। মাথার করে এনেছে একটা বাঁকা। চারজনে ধরাধরি করে মেঝেতে নামাল বাঁকাটা।

বাঁকার মধ্যে একটা মুখোশ কম্বা। মুখের গরি খুলে দিল কিকির আর ফকির। কম্বার শেকনের ফোম দুটো ধরল পর মুঠোয়। তারপর হ্যাঁচকা-টানে কম্বা উপুড় করে দিল মেঝের ওপর।

ধপ করে কম্বার মধ্যে থেকে ছিটকে এল একটা কিশোর বালকের প্রাণ-হীন দেহ।

চোখ কুঁচকে কম্বা উপুড় করার ধরনটা দেখছিল গিরধরলাল। মানুষ মরে গেলেও এইভাবে কেউ তাকে ছুঁড়ে ফেলে না। ডেড বডি নিয়ে এত হেনাফেলা বড় বেশী বৃষ্টিকটু।

এবার চোখ ফিরল বডির দিকে।

এবং ফেরাতে পারল না বেশ কিছুক্ষণ।

ছেলেটি সুদর্শন। বছর চোদ্দ-পনেরো বয়স। গায়ের রঙ তামাটে। কিন্তু নাক মুখ বেশ বাগানো। মৃত্যু এখনো তার সতেজ লাবণ্য কেড়ে নিতে পারে নি। যা রক্তটা সামান্য বেরিয়ে গেছে এবং ঈষৎকালের লাল হয়েছে।

অনিমেষে চেয়ে রইল গিরধর। বিড়িটা ধরা রইল দাঁতের ফাঁকে—ভুলে গেল টানতে। কোথায় যেন একটা খুঁত রয়েছে—ধরতে পারছে না সে।

স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই তো মনে হচ্ছে। কল প্রয়োগের একটুকু চিহ্ন নেই...অথচ কোথায় যেন একটা গলদ রয়েছে...

...না! ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না। মন ঝুঁকা বখন দেখেছে...

বিড়িটা নাবিয়ে গিরধর বললে—'তাহলে নব্বইতে রাজী তো?'

—'হারে হ্যাঁ হ্যাঁ' চেহারেমুখে কথা করে উঠল কিকির।

—'দাঁড়া, টাকা নিয়ে আসি ডাক্তার-বাবুর কাছ থেকে।'

—'তোর কাছে নেই?'

—'না।' দাঁত বার করে হাসল গির-

ঘর। 'কল ছাড়িয়ে উঠিয়ে দিয়েছি। দাঁড়া, আনছি।'

আনটার্মিন ডিসেন্ট্রাইটিস ভক্টর রফিকের এক বিশ্বাসে আপন সন্দেহের কথা বিবৃত করল ঘিরণ। ভক্টর রফিক প্রবীণ, বিজ্ঞজন এবং অভিজ্ঞ। প্রত্যুত্তরে ললাটে শুকুঞ্চন ঘিরণের সন্দেহের কাহিনী। টেবিল ঘড়ি, ছোট লাগেনি কোথাও—অথচ ঘটেছে কেমনে শুনে এলেন এর সকল।

দেবের ওপর ঝুঁকি, ঝুঁকির পরে শুনো কণ্ঠা এবং পরাণ্ড বলদের দেহ-সুষমার পানে অনেক চাইলেন ডক্টর। চোখের কোল বিয়ে বেরুলেন কিকির আর ফকিরের নির্ভীক অভিযাত্রি। ছোট হয়ে ডেড বডির হাত-পা তুলে নেড়ে আড়ষ্টতা পরখ করলেন, চোখের পাতা টেনে মণি-তারকা লক্ষ্য করলেন।

লাশের ওপর চোখ রেখে সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন—'কত দিতে হবে?'

—নব্বই', জবাব দিল ফকিরচাঁদ।

—'পাঁচও—আনছি টাকা' বলে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার। পোশনের দরজা দিয়ে মর্গের বাইরে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা হাজির হলেন থানায়।

থানার ছোট দারোগা একনাথ রায় নির্নিমেষ চিত্তে শুনলেন ডক্টর রফিকের সন্দেহ কাহিনী। সামনের বিকের খাকরেক চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুধু একটা প্রশ্নই করলেন, 'গিরবরলালের কথা বার দিন। আপনার সন্দেহ হল কেন?'

—'পাঁচটি কারণে। মুখটা কোমল-কোমল, চোখ দুটোয় রক্তমাখা, লোকটা টাকার আর হাত-পা আড়ষ্ট।'

সুচীতীক্ষ্ণ চেয়ে রইলেন পুলিশ-কর্তা একনাথ রায়। ইষৎ ঝুঁকে কর্কশ কণ্ঠে বললেন—'পঞ্চম কারণটা বললেন না তো।'

—'সেটা আপনি নিজে দেখলেন। দেখলেই বুঝবেন।'

চোখে ফিরে ফিরিক ফিল একনাথ রায়ের। ঘণ্টা বাজিয়ে সেপাইকে ডাকলেন। ডাক্তারকে বললেন—'আপনি ফিরে ওদের আইজে রাখুন। আমি আসছি।'

থানা থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে এসে পোশনের দরজা দিয়ে সটান ডিসেক্টিং রুমে ঢুকলেন ডক্টর রফিক। ঢুকেই লক্ষ্য করলেন, ঘরের আবহাওয়া পালটে গিয়েছে।

চলা হয়েছে ফকির আর ধন ধন আঙুল মটকাচ্ছে ফিকির। অন্য দুই বাড়ি ফাঁকা দিয়ে উৎসুক হয়ে আছে ডাক্তার ঘরে।

এক লহমায় আন্দাজ করে নিয়ে ডক্টর রফিক উপলব্ধি করলেন—তাঁর অবর্তমানে কোনো কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু নির্বিকার চত্বর তিনি। তাই কিছুই যেন লক্ষ্য করেন নি, এমনি-ভাবে বললেন ফকিরচাঁদকে—'বড় ঘুমিয়ে পড়লাম।'

ফকির চাহনি নিক্ষেপ করল ফকিরচাঁদ।

কিন্তু উত্তর পেল নেই ডাক্তারের কণ্ঠে। বললেন,' 'একশ টাকার নোট ছাড়া কিছুই নেই। ভাঙাতে পাঠিয়েছি রামলক্ষ্মণকে।'

ফিকির ঠোঁটটা কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিল। বলল শুষ্ককণ্ঠে—'দশটা টাকা আমার কাছেই ছিল।'

—'তাই নাকি? দেখো ফিকি, ঘাবোকা দাড়ি কাঁপিয়ে হাসলাম। হাসো, রামলক্ষ্মণ এসে পড়বে এখুনি।'

ফিকির জানলো না—ডাক্তারবাবু এই অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ ডাকি করে এসেছেন। মুখোমুখি করে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। ফকি দেরে বলে উঠল—'আসলে সাব, ফকির বলছে হাসা থেকে ফেলতে গিয়ে রক্ত ফেটে গেছে লাশের—'

—'ঠিকই বলছি, তেড়ে উঠল ফকিরচাঁদ।

—'আহা, তাতে হয়েছে কি?' ডাক্তার কেন বড় বিকৃতিতে মোম করলেন ফকির-ফিকিরের কলহের। বললেন—'রক্তটা সামান্য বেরিয়েছে বই তো নয়।'

—'কিন্তু—' ফিকির নাছোড়বান্দা।

—'দুই ব্যাটা, বকছে উঠলেন ডক্টর রফিক।

ঘরময় থেমে গিয়েছে। ডক্টর রফিকের মহৎ মর্ম—তিনি রাগতে জানেন না—মোটেই গলা চড়ান না। খাটির মানুষ। অথচ এমন তেড়ে উঠলেন—বিশেষ করে বাইরের লোকের সামনে...

মনে বড় লাগল ঘিরণের। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

ফিকির আর ফকির ঘিরণের তাড়না দেখেও হুঁশ হয় নি। চকিত দৃষ্টি বিনিময় করল দুজনের মধ্যে। ফিকির গলা-কাদা দিয়ে বললে—'বড় তাড়া ছিল।—আজ আসি, ডাক্তারবাবু—'

ডক্টর রফিক তো অবাক—সে কি রে! টাকা না নিয়ে যাবি কোথায়?... রামলক্ষ্মণকেও বলিহারি যাই। নোট ভাঙাতে চৌরাস্তায় গেল নাকি? 'ও বাবা ঘিরণ লাশ না দিয়ে গেল কোথায়?'

ঘিরণলাল অবশ্য হওয়ার আগেই, ফিকির-ফকির দরজার দিকে এগোল। যেতে যেতে বললে ফিকির—'আজ বড় তাড়া আছে সার।—কাল আসবখন।'

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ডক্টর রফিক। কিন্তু পরক্ষণেই বসে পড়লেন।

একনাথ রায় কখন আসি আবির্ভূত হয়েছেন নিঃশব্দে—ব্যস্তভা চোখের পাহারাদারে নিয়ে ঘরের আশেপাশে ঘাঁটিয়ে আছেন।

মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গিয়েছিল ফিকির-ফকির এবং ফকিরচাঁদ দুজন। সন্দেহ জাগে সবের হল ফিকির। পেশকার, সম্পূর্ণরূপে ঘরে হিসাহিসির উঠল, 'এ কী! পুলিশ কেন?'

একনাথ রায় জবাব দিলেন না। ধীরে সুস্থে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন ডেড বডির পাশে। কখনকাল স্থির নেত্রে কি দেখলেন।

তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে হুকুম দিলেন কাঠ-চেরা গলায়—'লাশও হতভাগা।—মার্ডার!'

•

এই পর্যন্ত বলে পুলিশকর্তা বাড়ি কাঁপিয়ে খানিকক্ষণ হাঁচলেন। আমি তড়বড় করে জিজ্ঞেস করলাম—'কি দেখে বুঝলেন মার্ডার?'

একনাথ বললেন নীরসকণ্ঠে—'এই সহজ জিনিসটাও মাথায় এল না? ঘিরণের পর্যন্ত ধরে ফেলেছিল!'

•

মরনাতঙ্কগ্রস্ত রিপোর্টটা আসতেই বক্তব্যের অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়লেন একনাথ রায়। তারপর উঠে দাঁড়ালেন সশব্দে। ঘরময় পায়চারী করলেন কিছুক্ষণ। অনেক ভাবলেন। কূল কিনারা পেলেন না।

নিরেট রহস্য! ছিদ্র কোথাও নেই। বড় আশা ছিল, পোস্ট মর্টম হলেই মৃত্যুর কারণ ধরা পড়বে। সেই রিপোর্টের ফলে চমকে চমকে চমকান দেবেন।

কিন্তু মরনাতঙ্কগ্রস্ত কিসসু ধরা পড়েনি। ছেলেটা নাকি মরবার সময়ে কোন সুখে ছিল এবং কেনো অসুখ-বিসুখে ভোগেনি। মৃত্যুর কোনো কারণ আবিষ্কার করতে পারেন নি ডাক্তাররা। পারেন নি বলেই অনুমান করছেন মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। হ্যাঁ, গলাটা খানিকটা কেটে গেছে ঠিকই। কিন্তু তার জন্যে মৃত্যু হতে পারে না। অথচ আর কোথাও ছোট লাগার চিহ্ন নেই।

কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নন একনাথ। যে চারজনকে চুকিয়েছেন, তাদের মধ্যে দুজন মার্কামারা বদ্ধি-স্মাচারের। বদ্ধি-স্মাচারদের আসল কারবার কি, যেসকলে লোকে জানে। সুতরাং খুনী তারাই।

কিন্তু ছুরী তো তা শুনবে না। অমুক লোক যখনই হত্যাকারী বললে সেসব টিকবে না—প্রমাণ চাই।

অথচ এক কণা প্রমাণও হাতে নেই।

অনেক চিন্তার পর অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে এলেন একনাথ রায়। প্রমাণ যতিরেকে খুনের চার্জ আনা অহেতু উচিত হবে কিনা, সে পরামর্শ দিতে পারবেন একজনই—থানার ডাক্তার ভক্ত।

ডাক্তার কুশাগ্রবুদ্ধি পুলিশ অফিসার। সন্ধান মুহূর্তে মূল্যবান পরামর্শদাতা হিসাবে মূল্যবান ভক্ত।

বয়সে ছোট—কিন্তু এখনও ঘাটতে পারেন চক্ষুস্থ—ঘাটতেও পারেন তেমনি। কৌতূহলিত। কিন্তু কাজের সময়ে তিনি অন্য মানুষ। তখন ঘটল গাম্ভীর্য এবং চক্ষুর ঘাঁচিয়ে সমাচ্ছন্ন। দেখে মনেই হয় না অবসর সময়ে সহকর্মীদের সঙ্গে ফাঁই-নাঁই করতে তিনি অভিযোগী।

একনাথ ঘরে ঢুকতে ফাইল থেকে চোখ তুললেন ডাক্তার ভট্ট। বললেন, 'কি সংবাদ বলুন?'

—'কেস আছে।'

—'কি কেস?'

সংক্ষেপে রহস্যের জটজাল বিবৃত করলেন একনাথ রায়।

নিঃশব্দে শুনে সব শুনলেন ডাক্তার। শুনতে শুনতে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন।

নিমীলিত নয়নে কিছুক্ষণ একনাথ রায়ের পানে চেয়ে থেকে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—না, প্রমাণ ছাড়া খুনের চার্জ আনা যাবে না। আসামীদের ছেড়ে দিতে হবে।'

চোখে চোখে চেয়ে আছেন একনাথ রায়। উত্তেজিত চোখ ফেরাচ্ছেন না। একযোগে একনাথের অভিব্যক্তায় তিনি উপলব্ধি করছেন।

বললেন ধীরকণ্ঠে—'কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত যে প্রমাণ নেই? প্রমাণ খোঁজার কি-কি চেষ্টা করেছো বলো তো?'

হঠাৎ একনাথের মনে পড়ল মরনা-তঙ্কের রিপোর্টের একটি লাইন। ডাক্তাররা লিখেছেন, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নাকি বাঁহাতখানি বাঁট উল্টানো করে নেওয়া হয়েছে ছেলেটির।

ছোট সূত্র। কিন্তু আঁধারে আলো। হয়ত শূন্যে করা ছেড়ে পারে।

•

দিন কয়েক উত্তপ্ত খাটলেন একনাথ রায় এই সূত্র ধরে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, যেদিন রাতে বিকী করতে হাসপাতালে আসে ফিকির আর ফকির, তার আগের দিন হেদো-বাটার একটা বাড়িখানায় তাড়ি খাচ্ছিল ওরা তিনজন—ফিকির, ফকির আর সেই মৃতে দুজনের একজন। নাম তার শ্রীশচন্দ্র। মুখলম্বেলা একখান দাঁত উঁচোনো বেখেয়ালি ফকির। সাফ কবুলিল সব ফেতে ফেতে।

পরবর্তী কাজ পাওয়া গেল বোধজয়ের একটা হাতুড়ে চাঁনা ডেন্টিস্টের কাছে। সেইদিনই রাতে অনেকগুলো দাঁত ফকির সেখানে বিক্রী করেছে।

কিন্তু তারপর? ছেলেটাকে যে মার্ডার করা হয়েছে, তার প্রমাণ কই?

মোহ মনোবলেও চিড় ধরল এবার। নিরাশ হয়ে বসে রইলেন একনাথ রায়। প্রমাণ নেই! প্রমাণ নেই। ফিকির-ফকিরের অপরাধ সপ্রমাণ করার কোনো উপায়ন তাঁর

হতে নেই। সেকালে মড়া মানুষের দাঁত বিক্রী হোলো অপরাধ নয়!

হেনকালে পাহারারত রামশঙ্কর সবুটে সালুটে করল ঘরে ঢুকে।

সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন একনাথ রায়।

রামশঙ্কর এই কদিন বিস্তর মেহনৎ করেছে এই কেসে।

রামশঙ্কর নিবেদন করল যে তাড়িখানায় বসে ফকির এবং ফকির তাড়ি খেয়েছিল, ফকিরচাঁদের বাসা নাকি তার অন্তিমক্ষণে। হোসেনচাঁদ খালপাড়ে।

—'তাতে কি হল?' শুষ্ক কণ্ঠে শুধোলেন একনাথ রায়।

—'উহু মোকদ্দমা সাচ্চা করতে সে কুছ তো মিলেগা।'

কথাটা মনে ধরার আগে নিঃ একনাথ রায়ের। বিস্মিত হলেন সেজন্যে। তারপর ভেবে দেখলেন, লাভ কি? নিখন-চিহ্ন নিহত ব্যক্তির দেহেতেই থাকে। সে দেহ কাটাছেঁড়া করে দেখা হয়েছে। বাড়ি দেখে কি হবে?

যাই হোক, পাহারারত রামশঙ্করের কাজে মনোযোগ করলেন সেই রাত্রির—গুরুত্বহীন তাই।

রামশঙ্কর ফিরে এসে তার মনোমত রিপোর্টই দিল। লাল-লুঠেরহাটের ঘরে কেরোসিন-গাইটিং-প্রবল উত্তেজনা কিছু পাওয়া যায় নি। মার্ডার কেসে অকাট্য প্রমাণ হওয়ার মত কিছুই চোখে পড়েনি।

•

কিন্তু ছেলেটি কে?

বসে বসে সেই কথাই ভাবছিলেন একনাথ। তার সঙ্গের রক্ত তামাটে, মুখ চোখ সুদর্শন। ফকির এবং ফকিরের খপ্পরে সে পড়ল কি ভাবে? নিবাস কোথায় তার?

এবার একনাথ রায় মনস্থ করলেন —তিনি নিজেই বেরোবেন।

হোসেনচাঁদের গেলেন মাত্র ক'টার জন্যে। কাবার্ড খুলে বার করলেন ছদ্মবেশ ধারণের সরঞ্জাম। দশ-বারো জোড়া বিভিন্ন আকৃতির পাদুকা থেকে বেছে নিলেন মেটেল-চাঁদার থেকে তৈরি ছেড়া চটিজুতো। মলিন ধুতি আর রক্ত-সিল্কের মাথা সার্ট নির্বাচন করলেন হ্যাঙারে ঝোলানো ছেড়া-খোঁড়া কেতাদুরস্ত মহল থেকে। একনাথ রায়ের নেমে এলেন দিন মজুরের ছদ্মবেশে। ওটকে দন্ডায়মান জনস্টেবল দুটিকে ইসারা এবং সবুটে সালুটে ঠুকল মজুরবেশী পুলিসকর্তাকে।

হোসেনচাঁদ খালের ঠিক ধারে ছোট তাটিখানাটি সন্ধ্যের পর থেকেই জমজমাট হয়ে ওঠে দিনমজুর আর কয়খানা শ্রমিকের পৃষ্ঠপোষকতায়।

একনাথ লাফাতে লাফাতে এসে বসলেন তাটিখানায়। তিনি দেশী করেন না। অবশ্য নেশার ভান করলেন এক ভাঁড় তাড়ি সামনে ধরিয়ে দেবে। কিমেতে লাগলেন কড়িম নেশার ঝোঁকে—কান আর চোখ রইল সজাগ।

গতকাল পুলিশ হানা দিয়েছিল তাড়িখানায়। সঙ্গে রামশঙ্করও ছিল। ফকিরচাঁদ এবং ফকিরলাল নাকি পুলিসোলাও খাচ্ছে খানা হজমে খুনের চার্জে। তাড়িখানা সরগরম সেই প্রসঙ্গ নিয়ে।

—'লাও বাবা, হেচকি তুলতে তুলতে বলছিল একজন খুন্নি।

—'কে খুন হল, তা তো বলবি।'

—'কে আবার, সেই ছোড়াটা', চানা চিবুতে চিবুতে বলল করলাওলা মিশির।

—'কোন্ ছোকরা?'

ঔৎসুক্য হলেন একনাথ। সমবেত টুকরোটাকরা তথ্যগুলি থেকে ধীরে ধীরে নিহত বালকের বৃত্তান্ত একটা পূর্ণ রূপ নিল।

ছেলেটার নাম আবদুল। থাকতো রাজাবাজারের বস্তীতে। অনাথ। সাদা ইঁদুরের খেলা দেখতে পথে ঘাটে। ফকিরচাঁদের বাড়িতে এই সেদিন তাকে ঢুকতে দেখা গেছে। তখন তার মাথায় লাল রঙের ফেজ টুপী ছিল। তবে?—যেদিন লাশ নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল ফকিরচাঁদ, তার অগ্রের দিন...

আরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন একনাথ রায়। তারপর তাড়ির ভাঁড় হাতে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন খাল পারে। ভাঁড়টা খালের জলে ছুঁড়ে দিয়ে অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

নিশ্চিন্ত ষড়যন্ত্র। আবদুলকে ফকিরচাঁদই ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে বাড়ির মধ্যে—খুনও করেছে। কিন্তু কি ভাবে? ডাক্তাররাও তা বলতে পারেনি।

•

পরের দিন সকালবেলা উমানাথ গুপ্ত তলব করলেন একনাথ রায়কে।

একনাথ সালুটে করে বসলেন সামনের চেয়ারে।

উমানাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকে দেখলেন।

পেন্সিল দিয়ে টেবিলের উপর টক্‌টক্ শব্দ করে শুধোলেন অবশেষে, 'ফকিরচাঁদ আর ফকিরলালের কেস কবে?'

—'আদালী পরশু।'

—'খুনের চার্জ আনবার মোদ্দা পেয়েছো?'

—'না।'

—'রিপোর্ট দাও—মুখে।'

একনাথ রায় ক্রমে ক্রমে বোঝাতে লাগলেন কিভাবে পদে পদে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। বললেন, হোসেটিনের কথা, রামশঙ্করকে দিয়ে ফকির-ফকিরের বাড়ি তল্লাসির কথা এবং সবশেষে তাটিখানার অভিজ্ঞানের কথা।

তিনবার তিন পথে তপ্ত পরিচালনা করেছেন—তিনবারই অন্ত শূন্য লাভ করেছেন।

শুনতে শুনতে উমানাথ গম্ভীর মুখে শুধু বললেন—'হুঁ একনাথ। —তুমি জমাদারকে দিয়ে খানাতল্লাসি করেছো?'

—'কিন্তু স্যার, সে কিছুই পায় নি।'

—'তর্ক করো না।—তুমি কি চাও রামশঙ্কর কাল থেকে তোমার চেয়ারে বসুক?—যাও।'

আরক্তমুখে বেরিয়ে এলেন একনাথ রায়। ঘরে এসে টেবিলে মাথা গুঁজে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে আত্মস্থ হলেন। উমানাথ গুপ্ত তাঁর উৎকর্ষই করেছেন। পুরস্কারের সঙ্গে তিরস্কারেরও প্রয়োজন।

•

আধঘণ্টার মধ্যে লোকজন নিয়ে হেসেনচাঁদে হাজির হলেন একনাথ রায়।

খালের পশ্চিম পাড়ে তাটিখানা। তার একশ গজ দূরে ফকিরচাঁদের বাড়ি। পেছন দিকে খানিকটা বাগান। তারপর মস্ত পুকুর। রেললাইন চোখে পড়ে বাগানে দাঁড়ালে।

বাড়িটার সামনের দিকের দেওয়াল ইটের—তিন দিকের দেওয়াল বাঁশের আর মাটির। কুলুঙ্গীর আকারে আঁটি ছোট জানলা। রাঙ্গ লাল টালির। ছোট হয়ে না ঢুকলে দরজার মাথা ঠুকে যায়।

বাড়ির সদর দরজা থেকে প্রতি ইঞ্চি জায়গা দেখতে দেখতে ভেতরে প্রবেশ করলেন একনাথ রায়। দেওয়ালে ঝোলা কুলুঙ্গী যাচ্ছে কিনা পরখ করলেন, মেঝের নীচে পাতালকুঠরি আছে কিনা যাচাই করলেন, রান্নাঘরের উনুনের ছাই ঘাঁটলেন, মচকান জিনিসপত্র সব নাড়িয়ে বাদলেন। খাটিয়া ঠুকে দেখলেন। একটিমাত্র টিনের তোরঙ্গ খুলে জিনিসপত্র লাটঘাট করে ফেললেন।

রামশঙ্করকে হুকুম দিলেন—যা কিছু পাওয়া গেল তার ফর্দ বানাতে।

নিজে টেলে দিয়ে এলেন বাগানে। উঁকি মারলেন কোপের ভেতরে। গাছপালাগুলো অবশ্যবিদ্ধ। নামানো একখানি জমিতে আবর্জনার ঢাঁই। তাতে কাচলেতরা আর ছাবি জাবি জিনিস ছড়ানো। ঘুরোর পর কাটাগাছের বেড়া। তারপর পুকুর।

এসে দাঁড়ালেন বাড়ির মধ্যে। একখানাই ঘর। পাশে রান্নাঘর। কলতলা খোলা উঠোনে।

কোথাও আবদুল হত্যার কোনো সূত্র নেই।

অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইলেন খাট থেকে নামানো পাটাশ্রিতপ্রায় জিনিসের দিকে। কোরান, খোস্তা, পাবল, ছেড়া নাড়ুয়া, অনেকগুলো খালি বোতল, একটা টুপী...

চোখ সরাতে পারলেন না একনাথ রায়!

ফেজ টুপী। লাল রঙের! এই রকম টুপী মাথায় আবদুলকে দেখা গিয়েছিল ফকিরচাঁদের বাড়ি ঢুকতে!...

ভেতরে ভেতরে নতুন উদ্যম, নতুন উত্তেজনা অনুভব করলেন একনাথ। পাওয়া গেছে...একটা প্রমাণ অন্ততঃ পাওয়া গেছে...আবদুল যে ফকির-চাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করেছিল—সে প্রমাণ পাওয়া গেছে!

তারপর? খুন হল কি ভাবে? পরে ভাবা যাবেখন। দেখা যাক, মাচার জঞ্জালের মধ্যে আর কি আছে।

নতজানু হয়ে নিজেই আবর্জনা হাঁটকাতে শুরু করলেন একনাথ রায়।

এবার পেলেন একটা হাফপ্যান্ট।

ছোট ছেলের নীল হাফপ্যান্ট। রয়্যাল। পায়ের কাছে রক্ত চামাটি ধরে রয়েছে।

নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন একনাথ রায়। রক্তমাখা প্যান্ট। আবদুলেরও হতে পারে। কিন্তু আবদুলের গা থেকে এত রক্তপাত ঘটল কোন্ ক্ষত মুখে? জল সামান্য কেটে গিয়েছিল —এত রক্ত ক্ষত থেকে বেরোয় নি। তবে?

একটা ঘোর সন্দেহ দেখা দিল মনে।

আবদুল ছাড়াও এ বাড়িতে খুন হয়েছে আরও একটি ছেলে—এ প্যান্ট তার!

•

পুলিশ ভাড়ি।

একনাথ রায়ের ঘর। টেবিলে সাজানো লাল ফেজ টুপী, আর রক্তমাখা নীল প্যান্ট।

রাইটার্স অফিসের খাতা-পেন্সিল নিয়ে তৈরী। চেয়ারে এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একনাথ।

ঘরে ঢুকল ফকিরচাঁদ। থানা-হাজতের জমাট অন্ধকারে এই কদিনেই মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার-ভরে চলনে ভাবনা ধরা দেয় নি। চোখের দৃষ্টিতে ভয়ডরের লেশমাত্র নেই।

ঘরে পা দিয়েই টেবিলের দিকে তাকাল ফকিরচাঁদ। চোখের তারা ঈষৎ বিস্ফারিত হয়েই স্বাভাবিক হয়ে গেল। জিনিস দুটি এ-স্থানে সে আশা করে নি।

কর্কশকণ্ঠে শুধোলেন একনাথ রায় —'চিনতে পেরেছো?'

—'আজ্ঞে?' ফকিরচাঁদ যেন শুনতেই পায় নি।

—'টুপী আর প্যান্ট কার?'

—'কি করে বলব বলুন।'

—'তোমার ঘরের মাচায় ছিল, আর তুমিই জানো না?'

—'মাচায় অনেক জিনিসই আছে—ভাড়া নেওয়ার সময়ে মাচায় উঠে দেখি নি।'

সন্দেহের অন্ত খণ্ডন করলেন একনাথ রায়। জেরা করলেন আরো কিছুক্ষণ—কিন্তু বৃথাই।

গেল ফকিরচাঁদ—এল ফকিরলাল। তার বয়েসও আরো অল্পবয়সী।

পাঁচা-চোখের তারকা স্তম্ভিত স্থির। কিম্বা স্তম্ভিত হতেও জানে না।

তারপর এল শ্রীশচন্দ্র—জিজ্ঞাসাবাদ করে শুধু একটা খবরই পাওয়া গেল তার কাছে। শ্রীশচন্দ্র থাকে ফকির-চাঁদের লাগোয়া বাসায়। ফকিরচাঁদের মত টালির বাড়ী। সেখানে বাসান।

চতুর্থজনের নাম পক্ষী। সেসার ফকিরচাঁদ।

ইউটার জমাদারকে বিদায় দিয়ে সামা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন একনাথ রায়। মানসচক্ষে দেখতে পেলেন পাশাপাশি দুটি বাড়ি—ফকিরচাঁদের আর শ্রীশচন্দ্রের। একটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা হয়েছে—আর একটি...

কিন্তু বৃথা হল ঘানাতল্লাসি। শ্রীশচন্দ্রের বাড়ীর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না।

বন্ধা সময়ে আসামীদের নিয়ে আদালতে হাজির হলেন একনাথ রায়। আরো তপ্ত সাগেঞ্চে সময় প্রার্থনা করলেন। হাকিম তা মঞ্জুর করলেন—কিন্তু বেকসুর খালাস করে দিলেন পক্ষকে। কারণ, সে সেসার ফকিরচাঁদ। জিজ্ঞাসাবাদে করে জানা গেল, সেরাতের স্টেশন থেকে ফকিরচাঁদ তাকে নিয়ে এসেছিল ফন্তা বইবার জন্যে।

ফিকির, ফকির আর শ্রীশচন্দ্রকে নিয়ে থানায় ফিরলেন একনাথ রায়।

উমানাথ তত্ত্ব আর তাঁকে তলব করেন নি। উনিও দেখা করেন নি। দেখা করার মত মুখ নেই।

মাথা নীচু করে ফিরে গেল একনাথ রায়ের। কিসের কলঙ্কের মত একটা কথা উচ্চারিত হল মনে।

সটান উঠে বসলেন একনাথ। তখনো তিনি অবিবাহিত।

মানসচক্ষে দেখলেন পাশাপাশি দুটি বাড়ি—সেখানে বাসান। বাড়ী দুটি খুঁটিয়ে দেখেছেন—দেখেন নি কেবল বাসানের মাটি।

বাকীরাত্র না ঘুমিয়ে কাটালেন তিনি। ভোরবেলাই থানায় গিয়ে লোকজন জড়ো করে হানা দিলেন ফেলেবাড়ী। ফরেস কুট মাটি খুঁড়িয়ে ফেললেন দুটি বাসানেই।

শ্রীশচন্দ্রের বাসানের জমাদারের খাদার নীচে আধলা মাটির তলায় পাওয়া গেল একটা সাদা শাড়ি আর সন্ধ্যা। সায়ার ধারেখান ছেঁড়া—যেন ঘিন্ট খুলতে তার সায় নি ছিঁড়ে খোলা হয়েছে। আর ফকির-চাঁদের বাসানে বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেল একটা ঘাগরী হাফ-পাল্ট, একটা কালো ইজের এবং একটা ব্লাউজ আর ফতুয়া।

বেলা বারোটার শেষ হল খোঁড়াখুঁড়ি পর্ব। চড়া রোদে দাঁড়িয়ে একনাথ রায় উপলব্ধি করলেন সেই নির্মম সত্য—

মোট ছটি খুন হয়েছে এই দুটি বাড়ীতে। লক্ষ্য ছেঁড়া, নীল পাল্ট, কালো ইজের, ঘাগরী পাল্ট, সাদা-শাড়ি এবং ব্লাউজ-ফতুয়া সেই হতভাগাদেরই পরিধেয়।

অন্তর্মাচিতে রোদে দাঁড়িয়ে রইলেন একনাথ রায়। মর্মন্তুদ সত্যটা উদ্ঘাটিত হওয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল হল। আবদুল হত্যার রহস্য এখনও অমীমাংসিত—লাশ পাওয়া গেছে, ডাক্তাররা ময়নাতদন্ত করেছেন—কিন্তু হত্যার উপকরণ এবং পদ্ধতি এখনও অজ্ঞাত।

এমতাবস্থায় আরও পাঁচটি নিখোঁজ লাশ এবং সেই সম্পর্কিত তদন্তভার কাঁধে এসে চাপল।

হুন ফিরল রামলক্ষের 'ভয়ে—ভূতের!'

চোখ তুললেন একনাথ রায়। চোখ জ্বালা করছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—চলো।'

বুকের ওপর চিবুক গুঁজে থানায় ফিরলেন। সমস্ত রাস্তায় মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল এক চিন্তা। ফকিরচাঁদ নিশ্চয় ঘনশ্যামের ছুটি মানুষকে খুন করেনি। পাঁচটি লাশ বিনা বাধায় বিলী করেছে—ডাক্তারদের চোখে ধুলো দিয়ে। কণ্ঠে লালটিও অনুরূপভাবে খণ্ড খণ্ড হত। রক্তটা সন্ধানো কেটে ফিরেছিল বলে হল না।

কিন্তু তার মস্তিষ্কটি কী?

থানার সিঁড়ি দিয়ে নজরুলকে উঠতে দিয়ে নজরে পড়ল এক জোড়া জুতো। ওপরবাগে দাঁড়িয়ে আছেন উমানাথ গুপ্ত।

চোখ তুললেন একনাথ রায়। উমা-নাথ গভীর চোখে চেয়ে আছেন তাঁর পানে—মুখ গম্ভীর।

তিরস্কৃত হওয়ার পর থেকে আর থানায়ের ঠোকাঠে যাড়ান নি একনাথ রায়। পণ করেছিলেন রহস্যের চীমাংসাসূত্রে আবিষ্কার না করা পর্যন্ত ঘরে ঢুকবেন না।

উমানাথ তা উপলব্ধি করেই যেন পদক্ষেপ করে দাঁড়িয়েছেন।

বললেন ভয়াট গলায়—'ঘরে এসো।'

রাতে ঘুম নেই, সকাল থেকে চড়া-রোদে মাথা মুখ জ্বলে গিয়েছে, মনে চলছে নৈরাশ্য; এই মুহূর্তে উর্ধ্বতন অফিসার স্নেহকাতর কণ্ঠে আশ্বাস জানালে মানুষের মনে অবসাদের আলোড়ন উপস্থিত হবেই। একনাথ রায় বাহাদুর নন—কিন্তু চাকরিজীবনের অতীত তিনি নন। তাই একটা পুটলী ঠেলে উঠল গলায় কাছে। মাথা হেঁট করে বস-এর পেছন পেছন পেছনে তাঁর কক্ষে—ঢুকলেন।

হাতের ইঙ্গিতে একনাথকে চেয়ারে বসালেন উমানাথ। চৌকি ঘুরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। পেছনে হেলান দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করলেন একনাথ রায়ের নিষ্প্রাণ উৎকণ্ঠাক্লিষ্ট মুখ।

মন্থর কণ্ঠে বললেন—'একনাথ, আমার সোজনকার চুক্তিটা মনে রেখো না। বাজ কি পেলে?'

একনাথ সংক্ষেপে দুটি করেক কথায় প্রতিবেদন পেশ করলেন।

গালে হাত দিয়ে শুনলেন উমানাথ। বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, সম্কুচিত হয়ে এল শেষের দিকে—নাসিকারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত হল হাফপাল্ট ইত্যাদি উদ্ধারের কাহিনী এবং মর্মন্তুদ অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তটা শুনে।

চোখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলেন জানলা দিয়ে। একটা সিগারেট ধরালেন। মৃদু মৃদু টান দিতে লাগলেন। মনে মনে পর্যালোচনা করলেন সংকর্ষীর অভিমান কাহিনী।

অবশেষে সিগারেটের দগ্ধাংশ ছাই-দানীতে গুঁজে দিয়ে কের তাকালেন ঘাড় বেঁকিয়ে।

বললেন—'কুরোচ্ছো দেখেছ?'

একনাথ রায় আশা করেছিলেন নূতন নির্দেশ। কুয়ো দেখার কথা তিনি বলতে ভুল করেন নি। তবে কেন সেই প্রশ্ন?

বললেন গাঢ় কণ্ঠে—দেখেছি।'

—কিভাবে দেখেছো?'

'ওপর থেকে ঝুঁকে। জল ছাড়া কিছু নেই।

—আর!' বলতে বলতে রক্ত জমে উঠল উমানাথের কর্ণী যুগে—'জলের তলায় কি আছে দেখোনি কেন?'

বিদ্রোহীকণ্ঠে একনাথ রায় বললেন—তাহলে তো পাম্পের পুকুরটার তলাতেও দেখতে হয়।'

শক্তচোখে চাইলেন উমানাথ—'একনাথ, কেলেবাড়ীর পুকুরের জলে জেলে জাল ফেলে লুকোনোর পক্ষে ওই বাড়ীর পাশের পুকুর নিরাপদ নয়। কিন্তু জেলে কি কুয়োতে জাল ফেলে?'

আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে বসলেন একনাথ রায়। অনিবার্য সিদ্ধান্তটা নিমেষমধ্যে তলপালা ফেলে ছড়িয়ে পড়ল মাথার মধ্যে।

—আমাকে মাপ করবেন স্যার। এখুনি যাচ্ছি।'

•

ফিরলেন বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার পর।

লোকজন ডেকে জল ছেঁচেছেন কুয়োর। স্নান হয় নি, আহারও হয় নি। নিজে দাঁড়িয়ে তদারক করেছেন।

কাজ হয়েছে উমানাথের তাড়নায়। তিরস্কারের পুরস্কার পেয়েছেন হাতে হাতে। রোদ জলানো উপবাস-ক্লিষ্ট কমলা মুখেও তাই হাসির ঝলক ফুটেছে। বেশ কয়েকদিন পরে মনটা হালকা হয়েছে। দুহাত পেছনে রেখে দাঁড়ালেন বস-এর সামনে।

সেন্টেন্সের সহাস্য মুখে দেখে কৌতুক কটাক্ষ হানলেন উমানাথ।

—কি হে, রাজা আর রাজকন্যে দুটোই জব্দ করে এলে নাকি?'

—'আজ্ঞে না, সে রকম কিছু পাই নি।'

—তবে কি পেলে? আর একটা লাশ?'

—'আজ্ঞে, তাও না।'

—তাহলে? মমিমাসিকা সোনা-দানা?'

—'প্রায় সেই রকমই।—লাশের দিক দিয়ে।'

—'বলো কি! কেথাও তোমার সন্দেহ হচ্ছে মাফিক।'

পেছন থেকে হাতজোড়া সামনে নিয়ে এলেন একনাথ রায়। বললেন —'এইটা।'

জিনিসটা একটা লেডীজ শাল। কালো রঙের।

কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইলেন উমানাথ। তারপর বললেন সবিস্ময়ে —'মেয়েদের শাল। কিন্তু এর সঙ্গে হাঁরে জহরতের সম্পর্ক হল কি করে?'

—'আমার ধারণা তাই।'

চোখ চকচক করল উমানাথের—মার্ডারের মোটিভ পেয়েছো?'

—'আজ্ঞে।'

—'এই শালটাই সেই মোটিভ?'

—'বলতে পারেন।'

—'হেঁয়ালী রাখো একনাথ,' ঈষৎ গলা চড়িয়ে বললেন উমানাথ। 'কি পেয়েছো বলো।'

—'আজ্ঞে, যা পেয়েছি, তা আপনার সামনেই রয়েছে।—শাল-টাই শেষ পর্যন্ত শাল মিল ফকিরচাঁদকে।'

—'একনাথ!'

—'আপনি জানেন। আমি যা বলবার আদালতে বলব।' বলে, সবিস্ময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন একনাথ।

উমানাথ চন্দ্র উপলব্ধি করলেন শুধু চোখের নয়—এই তরুণের যুক্ত অনুভবের পাকা জবাব দিয়ে গেলেন তাঁর সংবেদনা শিক্ষা।

•

পরের দিন উমানাথ নিজেই উপস্থিত হলেন একনাথের অফিস-কক্ষে। সিগারেট তখন ঘাড় হেঁট করে নোট লিখছেন খাতায়। পদশব্দে মুখ তুললেন এবং অভ্যর্থনা করলেন।

—'কতদূর এগোলে?' জিজ্ঞাসা করলেন উমানাথ।

—'আজ্ঞে, আপনাকে একটা টিপ্‌স্ দিতে পারি।'

—কি রকম?' তরলকণ্ঠ উমা-নাথের।

—'শাল-টা রাঙ্গ, সাদা-সাড়িও তার। একই স্টাইলের। নাম তার মহা-কালী। পেশায় পতিতা। ঘাস ছেড়েক সে ঘরে ফেরে নি। কিন্তু শালটা দেখেই জাটখলার মালিক চিনতে পেরেছিল। মার্কামারা শাল।'

—'আর কিছু?' নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন উমানাথ।

ঠোঁট টিপে বললেন একনাথ—আজ্ঞে না।'

বড় কঠিন ঠাঁই, মনে মনে বললেন উমানাথ।

ভাব অনুভাবন করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—হুকুম করলে কিন্তু আমি বলতে পারি।'

আহ্লাদসহকারে লায়ন উমানন্দের। বললেন—তা বলুন। দেখি আমি ভেবে।'

কিন্তু অনেক ভেবেও কালো শাল ছেড়ে হতাশ মেহতা আর ভাবতে পারলেন না।

•

আরম্ভ হতে প্রায়দিন। সেদিন লোক হয়েছে খুব।

ফকির-ফিকিরের চৌর্য ব্যবসার কাহিনী পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে—সেই সঙ্গে খুন হয়েছে নবীন পুলিশ অফিসার এক-নাথ রায়ের নাম।

আদালতে তাই আজ এত ভীড়। কেউ বলছে ফকির রুদ্ধশ্বাসে ইথা সবার আগ্রহের আলি। মা ভবনীর প্রসাদ নিয়ে পাখিদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে পথে পুতে রাখত। এ জন্যে সে মায়ের প্রসাদে প্রেত মন্ত্রের জোরে নরহত্যা করছে—বাধা পুলিশ আর খুনে জানোয়ারও অপারগ হয়েছেন হরার পর্যন্ত নিকর করতে। কেউ বলছে তার চাইতেও রোমহর্ষক কাহিনী। ফকির-ফিকির নাকি ইচ্ছাবতারের হত্যা করেছে—ফাঁসির ফাঁদ একনাথ রায় আসরে অবতীর্ণ না হলে ছেলেপুলেরা কেউ নিরাপদ থাকত না। ইত্যাদি, ইত্যাদি...

সংক্ষেপে, সারা শহরে ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছে ফৌতি-ব্যবসা নিয়ে।

উৎকণ্ঠা চরমে উঠল একনাথ রায় প্রবেশ করতেই। হাতে একটা কাঠের বাক্স। কালবাক্স বলেই মনে হল। তলায় আটো করে বুলিয়ে আনলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন কাঠগড়ার সামনে।

ছোট্ট ছোট্ট চোখ জানালার আকাশে স্থির হয়ে রইল বাক্সটার ওপর। কি আছে ভেতরে? ফকির-ফিকিরের অদ্ভুত ক্রিয়া নিশ্চয়—অনুভবের অতিরিক্ত উপকরণ!

বিচারপতি প্রবেশ করলেন ঘরে। হুজুরীরা বললেন যে যার আসনে। শুরু হল সওয়াল-জবাব। ঘন্টা সময়ে ভাঙ্গ পড়ল একনাথ রায়ের।

বাক্সটা হাতে নিয়ে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন একনাথ রায়। কাঠগড়ার সামনেই পেশকার পান্নাবাবুর টেবিল। বাক্সটা সেই টেবিলে রাখলেন।

পান্নাবাবুকে বললেন—'একটা কাগজ দেবেন?'

কাগজ এগিয়ে দিলেন পান্নাবাবু। কলম বার করে কাগজে কি লিখলেন একনাথ রায়। পেশকারের হাতে দিয়ে বললেন—'অধিবক্তার টেবিলে রাখুন।'

নীরবে হুকুম তামিল করলেন পান্নাবাবু। অধিবক্তার কাগজ-খণ্ডে চোখ বুলোলেন। নির্বিকার বিস্ময় ঘনীভূত হল চোখে। হুকুম দিলেন—ফকিরচাঁদ, ফিকিরলাল আর শ্রীশচন্দ্রকে বিশরাঁত দিকের কাঠ-গড়ায় হাজির রাখা হোক।'

একনাথ রায় ঘাবড়ালেন না। ঘাবড়াবার সম্ভাবনাটা পুরিয়ে বললেন। সবশেষে বললেন—এই নমুনার যন্ত্রের ছোটো তিনজন—ফকিরচাঁদ, ফিকিরলাল এবং শ্রীশচন্দ্র। কিন্তু প্রমাণ নেই। আমি একটি খুনের দৃশ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করব। দেখে ছিচার করুন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বলে এই কলাইয়ের লোকজনের ছেড়ে দিয়ে এতগুলি নিরীহ মানুষের জীবন বিপন্ন করা উচিত হবে কিনা।'

সামনের আসনে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে চশমাচোখে সহকর্মীর কথা শুনছিলেন উমানাথ। এখন আকৃতোখে তাকালেন বিশরাঁত কাঠগড়ার কন্যার-মান তিন আসামীর দিকে।

এতক্ষণ নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়েছিল তিন জন। একনাথের শেষ কথায় ইষৎ উদ্বেগ উপস্থিত হল তিন জোড়া চোখে।

একনাথ কাঠের বাক্সের তালা খুললেন। একটা কাঁচের গেলাস রাখলেন কাঠগড়ার চওড়া রেলিংয়ের ওপর। একটা বেতের ঝিড় থেকে নিলেন গেলাসের মাপের। ঝিড় থেকে উঠেছে খুটো বাঁড়াই কাঠি—খুটো কাঠির মাথা আড়াআড়িভাবে আর একটা কাঠি দিয়ে জোড়া। স্প্রেরার কাঠির মাঝখান থেকে একটা চোরাইন সুতো ঝুলছে। গেলাসের তলদেশ পর্যন্ত।

এক বোতল জল বার করলেন বাক্স থেকে। জল ঢাললেন গেলাসে—বেশী না—মেহাঁৎ পরিমাণ।

এবার বেরোলো একটা ছুঁচিক লম্বা কাঁচের পুতুল। দুহাতে বুকে-জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে।

সবশেষে বার করলেন একখানি কালো কাপড়—প্রশস্থে দু'আঙুল, দৈর্ঘ্যে এক আঙুল।

সবকটি বস্তু কাঠের রেলিংয়ে সাজিয়ে রেখে আদালত কক্ষের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন একনাথ রায়। ঘর ভর্তি লোক নিশ্বাসে চেয়ে আছে তাঁর পানে।

ঘন নিয়ে শুরু করলেন একনাথ।

—'ধর্মাবতার, আমি শুরু এক-জনের খুনের কথা এখানে বলব। নাম তার মহাকালী। বয়সে পঁচিশ। ঘরে কালো শাল দিয়ে খুনের খুঁজতে বেরোতো রাস্তায়ার্ট —কাল-কারখানার আশে-পাশে। বয়স তিরিশ।

'জনে এই পুতুলটা সেই মহা-কালী। আর এই কালো কাপড়টা তার কালো শাল। শালটা পুতুলের কাঁধে জড়িয়ে দিলাম আপনাদের সামনে।'

'মেহতার আগে খুনের খুঁজতে বেরিয়েছিল মহাকালী। ফকির-ফিকির-শ্রীশ তাকে নিয়ে গেল বাড়ীর ভেতর। কিছু খাইয়ে বেহুঁশ করে ফেলল। তারপর পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল কুয়োর ভেতর এই-ভাবে...' বলতে বলতে চোরাইন সুতোয় প্রান্ত কাঁচের পুতুলের পায়ে বেঁধে খেলাচ্ছলে ঝুলিয়ে দিলেন একনাথ রায় পুতুলটাকে উল্টো করে। মাথা রইল নীচের দিকে। কাঁধ পর্যন্ত ডুবে রইল জলের মধ্যে। কালো কাপড়টা ঝুলিয়ে দেল গলার তলদেশে।

সুতো ছেড়ে দিয়ে সটান ফিকির-ফিকির-শ্রীশচন্দ্রের পানে চাইলেন একনাথ রায়। অধিবক্তার তার আগেই হুকুম করে ফেরেছিলেন সেইদিকে।

আদালতসুদ্ধ লোক দেখল—হাইয়ের মত ফাকসে হয়ে গিয়েছে তিন আসামীর একদা-বেপরোয়া মুখ। এমন কি ফিকিরলালের সোচ-চক্কর ভারভাবেও ফুটে বেরিয়েছে অতিশয় প্রকট।

হুজুরীরাও দেখলেন সেই দৃশ্য। দৃষ্টি বিনিময় করলেন পরস্পরের সঙ্গে।

এতক্ষণে বোঝা গেল, নাটকের প্রারম্ভে একনাথ এই কথাই লিখে জানিয়েছিলেন বিচারপতিকে—চোখ রাখুন তিন আসামীর ওপর। মনের পাপ মুখের অজান্তে থাকবে না।

এবং এই প্রতিক্রিয়া যাতে প্রমাণ-স্বরূপ গ্রাহ্য হয়, তাই এত যোগসাজিয়তা অবলম্বন করেছেন এই কবিন।

এবার, নাটকীয় প্রস্তাবনা দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন, অনুমান তাঁর অভ্রান্ত। উপসাহেবের টানলেন আরো কয়ে কথায়।

বললেন আসামীদের ওপর চোখ রেখে—কেন কিছুক্ষণ জলে চুবিয়ে রেখে তোলা হল মহাকালীকে। বেহুঁশ করার জন্যে যা কিছু খাওয়ানো হয়েছিল—বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। শরীরের বাইরে কোথাও আঘাতের দাগ রইল না—ভেতরেও জল ঢুকল না।—কেন ছিল বলে মহাকালী ধস্তাধস্তি করতে পারে নি।—কিন্তু, যী লর্ড, আবদুল তা করেছিল। তাই কুয়োর গায়ে লেগে রক্তটা সামান্য কেটে গিয়েছিল। মানুষ বেঁচে থাকলেই হাঁটে রক্ত পাল্প করে—মরে গেলে করে না। জলের কাটা দিয়ে তাই রক্ত বেরিয়েছিল আবদুলের মৃত্যুর আগে—ফরেন্সিকের চিহ্ন দেখেই বুঝেছিলাম, আবদুল লড়ে মরেছে।'

একটু থেমে দম নিলেন একনাথ রায়। গেলাসটা আলোর ওপর তুলে বললেন—'আপনারা দেখুন, কালো কাপড়টা জলের তলায় পড়ে। পুতুল-টাকে মাথা নীচের দিকে করে না রেখলে কিন্তু কাপড়টা ঝরে পড়ত না। কুয়োর তলায় কালো শাল দেখে তাই আমি বার কালবুলেশান করে বারটা অনুমান করেছিলাম। বাস্তবে পাওয়া গেল সাড়ে চার সাত্তা—শালটা কুয়োর তলায় কেন?—তাঁলোকটিকে মাথা নীচু করে ঝুলিয়ে মারা হয়েছিল বলে।'

থামলেন একনাথ রায়।

এক ঘর লোকের সামনে খুনীর্তির পুনরাভিনয় দেখে জনের আসল ভেঙে পড়েছিল তিন আসামীর।

জেরার মুখে স্বীকার করল ফকির-চাঁদ, হ্যাঁ, একনাথ রায়ের কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। মহাকালী বারবিলতা। মদ খেত। তাকির সঙ্গে আসি খাওয়াতেই দশ মিনিটেই লেটিয়ে পড়েছিল। পরে দড়ি বেঁধে মুখ নীচের দিকে করে কুয়োর ঝুলিয়ে দিতে পাকস্থলীর আকিং বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ দিয়ে—জলের ওপর দেখা গিয়েছিল শুধু কয়েকটা বুদ্বুদ। আন্দাজটা প্রায়তে হয়েছিল এই-ভাবে। আন্দো খুন হয়েছে একই পদ্ধায়।

ছটফট করেছিল আবদুল। তাই কুয়োর গায়ে লেগে কেটে গিয়েছিল রগটা। কিন্তু মৃত্যুর পর যে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়, তা জানা ছিল না বলেই মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল শিবরতনের কাছে।

কাহিনী শেষ করে ফোঁৎ-ফোঁৎ নাকফোড়া শব্দের ফাঁকে ফাঁকে পুলিশ কারা বললেন—'এই ছোট্ট...ব্যাপারটা ...তোর ফিল্মেও...ধরা পড়েনি... ...অথচ খুই লিখিল...খোরেলা কল।'

নীরস হাল নীরবে হজম করে বাড়ী এসেই লিখে ফেললাম গল্পটা।...

শেষ


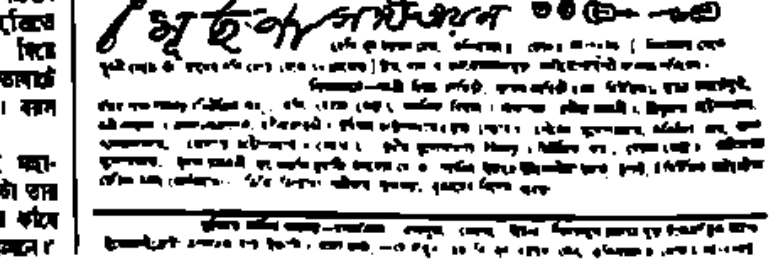

# জীবন বড় ভারবাহী জন্তু

## অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত আপনার কথাই ঠিক রইল। গল্পের পাঁচটি অধ্যায় অথবা আমি যদি পাঁচটি অঙ্ক থেকে প্রথম অঙ্ক বাদ দিলাম। এই বাদ দেওয়া কোনমতেই বাদ দেওয়া নয়, জীবনের কিছু কিছু অথবা অনেক কিছু বাদ দেওয়া। গল্পটি অনেকদিন থেকেই আপনার পত্রিকার জন্য চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার লোভ ছিল গল্পটি অনন্ত ছাপা হোক। অনন্ত কথার অর্থে এখানে আমি অনন্য নগরীর কথা ভেবেছি। যেখানে নগরী তার নাগরদের নিয়ে চাঁদসদৃশ হুকিবাজি খেলেছে। গল্পটি সামান্য ছোট করে দেবার কথা ছিল—কিছুটা সাঙ্কেতিক প্রকারে অর্থাৎ ছোট পত্রিকার জন্য ছোট আকারে গল্প হলেই ভাল হয়, দেখা হলে বলতেন, কি করলেন—তখন কেন জানি আমার কিছু বলার থাকত না। মনে হত জীবন বড় ভারবাহী জন্তু, এত মুহূর্তে ছোট করে বোধ হয় সব কিছু হয় না। আপনার ছোট পত্রিকা, ছোট পত্রিকার বোধ হয় চিরকল্প ব্যবহার হয় না। গল্পের কোনো চিত্রকল্পের ব্যবহার থাকবে না ভাবতে কষ্ট লাগে।

আচ্ছা আপনি 'পুরোনো দেওয়ালের চিত্রকল্প দেখেছেন! একটা রাস্তা, পুরোনো দেয়াল, একটা মুখ। মানুষ অথবা তার প্রতিচ্ছবি। আর কিছু কিছু রেখা ফুল কোটার মতো ফুটেছিল। অথবা 'বাল্বসোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর'-এর ছবি। আহা সেই মাছ, সেই চোখ, সেই সূর্য। কার্ডবোর্ডের সোল, টিনের ঘর, দুটো টান একটি রেখা—আহা কি ব্যঞ্জনা আর ভাব! শিল্পী যেন দুটো একটা রেখাতে জীবন কত বড় বোঝাতে চেয়েছিলেন। তেমন কোনো ছবি যদি আমার বুড়ো মানুষটির জন্য ব্যবহার করতেন।

যেমন ছবির ফ্রেমের ভিতর থাকুক, একটা সকাল। সূর্য উঠছে হিজলের বিলে। দূরে কোনো রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে। লাইনটা বেঁকে বেঁকে হিজলের পাড়ে পাড়ে গ্রাম দিগন্তে ঢুকে গেছে। সিগন্যাল না দেয়ে রেলগাড়ি চুপচাপ নির্জন মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে প্ল্যাটফরম, লাল ইটের কোয়ার্টার। ভেতরের দিকে মাঠে সাদা মতো দোতালা বাড়ি। বাড়ির কুলবারান্দা থেকে হিজলের বিল, প্ল্যাটফরম, লাল ইটের কোয়ার্টার, দূরের রেলগাড়ি ছবির মতো স্পষ্ট। দোতালার কুল বারান্দায় বুড়ো মতো একজন মানুষ ইজিচেয়ারে শুয়ে সব দেখছেন। পাশে একটা লাঠি। শিল্পী ছবি আঁকার সময় লাঠিটা আঁকতে যেন ভুলে না যান। কারণ গল্পে বুড়ো মানুষ এবং তাঁর লাঠি উভয়ই বড় বেশি প্রতিপক্ষ। একজন না থাকলে আর একজন ঠিক ফুটে ওঠে না। গল্পের প্রথম দিকে সাঙ্কেতিক আকারে এটুকুই আমার বলার ইচ্ছে। ছবিতো

অলংকরণ
প্রবেশ বিশ্বাস

কথা বলে শুনেছি। মোদ্দা কথা, গল্প ছবি ছবি সহ ছাপা হয় তবে তার চিত্রকল্প গ্রাম কেরোসিনের বুড়ো মানুষটির মতো না হয়ে আমার স্টেশন ও সেই বৃদ্ধ মানুষটির মতো হলে ভাল হয়।

আর গল্পের প্রথম চিত্রকল্পর জন্য কত সব যে মনোরম ছবি ভেসেছে। কেন ছবি কি-রকম কিছুই আঁকতে জানি না, তবু বার বার মনে হয়, ছবি আঁকার সময় হয় তো বুড়ো মানুষটিই ছবি আঁকবেন। বুড়ো মানুষ সিঁড়ি ধরে নামছেন, হাতের লাঠি হারাই আছে। দেয়ালে দুটো টিকটিকি কুকে রোমান্সের মতো দেখছে—বুড়ো মানুষটা নেমে যাচ্ছেন। বোধ হয় ছোটোলা থেকে হিজলের বাঁকে দেখতেন ট্রেন আসছে। ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছেন। সড়কে ধুলো যায়। গাছের নিচে এসে সামনা সড়কের জন্য দাঁড়ালো, তারপর হাঁটা। পাশা-পাশি পাঁচের সব মানুষ ট্রেন ধরার জন্য ছুটছে। এবং ছুটতে ছুটতে ঠিক দেখতে পায় বুড়ো মানুষ লাঠি তুলিয়ে উঠে যাচ্ছে স্টেশনে। ওরা পড় হয়। আবার ছোড়ায়। তিনি হাতে লাঠি দেখেন। ট্রেনের সঙ্গে স্টেশনের সঙ্গে বাবুর নাড়ীর সম্পর্ক। তেমনি ট্রেন আসছে। চিত্রকল্প ট্রেন না দেখালেও ক্ষতি নেই। শুধু ধোঁয়া দেখিয়েই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারত। বারান বুড়ো মানুষ ধোঁয়া দেখলেই ট্রেন পান পাকি বাজারোদ্দা এসে গেছে।

অথবা এইসব কল্পও ছবি আঁকা যেতে পারে। যেমন বুড়ো মানুষটি কুল বাজারের পাকাটারি করছেন। লাঠিটা দোলাচ্ছেন হাতের ওপর। লাঠি আছে বলেই হুঁকে ঠুকে হাঁটার অভ্যেস নেই। বরং লাঠিটা এ-বয়সে কিছুটা সাজেকাজের জোকারের মতো। না থাকলে জমে না। তখন অনেক দূরে সেই হিজলের বিল অতিক্রম করে আসছে একজন মানুষ। তাঁরি পাঁচদুলি অঞ্চলের সব জন্য হিজল পার হয়ে চলে আসে ধলার পাড়ে। সকলে এমন একটা ঘটনা হলেসাই থাকে। রেলিঙে দাঁড়ালে সকলের দিকে একটা চোখে পড়বেই। স্টেশনে তখন ট্রেন ইন করছে।

গার্ড বিনোদবাবু হচ্ছেন বাচ্ছেন এ-ট্রেনে। হিজলের বিলে তিতির পড়েছে। বিনোদবাবুকে নিয়ে শিকারে যেতে হয়। মানুষটা তিতিরের মাংস খেতে খুব ভালবাসে। একবার কি কারণে—বাড়িতে তিতিরের মাংস হয়েছিল। তাঁরি বর্ণা, হিজলের বন্যায় সামনের লাইন কাইন ভাসিয়ে নিয়েছে। বিনোদবাবু আটকা পড়ে গেছিলেন ট্রেন নিয়ে। বর্ষাকাল, কির কির বৃষ্টি, তিতিরের মাংস খেতে বিনোদবাবু ভালোবাসেন, তুলনা নেই। সেই থেকে দেখা হলেই, কি যে খাওয়ালেন, সবাইকে গল্প করি। তাঁরি সুখ্যাত। এবং সুখ্যাত বলার সময় একটও জল আসে তিতিরের মাংসে তাঁরি সুখ্যাত। আর একবার খেলে হয় না!

হয়, হবে না কেন। একমতো তেমন তেল হয়নি। শীতকাল আসুক, খব খব ছেয়ে তিতিরের পাখে লাখো নামে। তখন খেলে কি না জানি করতেন! আজকালের কথা মনে থাকত না। তিতির তিতির করে হিজলের বন হলো হয়ে যেতেন। বাহাদুর, একবার যাব। আপনাকে, শিকারে নিয়ে যাব। তিতিরের মেতে সমোলী হলে ট্রেন চালাবে কে!

মজার ব্যাপারটা তিনি আর তখন দেখতে পেলেন না। ওটা লাইন পার হয়ে স্কুলের ও-পাশে বড় অশ্বত্থের নিচে বোধ হয় নেমে গেছে। স্টেশনে নতুন বড়বাবু এসেছে। অনাদিন হলে বড়বাবুর ঘরে ঢিঁড়ে ভেজে খেতেন, কি হে ঘোষাল, তোমার পালিশাহে আমার জন্য ছুটি করেছে কেন? তোমার মাথানে ভাল জানিয়া করতে পারলে না। মনে থাক যাও! ছেলে কাউকে পাঠিয়ে দিও। এইসব কথা-বার্তা, যেন আছেন, বেচে আছেন—সবাইকে নিয়ে ঘুরে, এক একজন মনী মানুষের মতো বেচে আছেন—তখন কিনা, এই লোকদের এবারের নতুন বড়বাবু একবার এসে দেখা করল না! এবং তিনি যে এখানে এসে একটি হিজলের বিল, আর স্টেশন, কিছু গাছপালা রেখে গেছেন, যেন এই সবের ভেতর একদল মানুষ আছেন, বেচে আছেন, ছুঁয়ে রেখার তা করে হাতড়ে পাওয়া যায় তার জন্য হয়তো ভাল হত। এবং মনী মানুষের সঙ্গে স্টেশনের বড়বাবু নতুন এসে দেখা করে গেল না! অহংকারে তাঁরি লাগে। চোখে মুখে সামান্য অপমান বোধ। ঘোমটা থাকলে অন্তত এ-সময়ে ভেতরে একবার উঁকি দিতেন—ওরে আসুন আসুন। রোজকার এমন চাঁদের সন্ধ্যায়, নতুন ছোকরা স্টেশন মাস্টার কি বুঝবে! বুড়ো মানুষটার মুখ তাঁরি ম্লান হয়ে গেছিল।

গল্পের ছবি এখন ইচ্ছে করলে বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে হতে পারে, বিনোদবাবুকে নিয়ে হতে পারে—এবং কিছু পাখি উড়ছে, একটা কুকুর দূরে গন্ধ শুকে শুকে কিলোতে ঘুরছে—এত বিচিত্র ছবি হয়ে যায় এ ভাবে—যার শুধু বুড়ো মানুষটার ছবি আঁকলে বলেছি তো লাঠিটা হাতে থাকবেই। লাঠি মাটিতে পড়বে না। একেবারে বুড়ো মানুষের মতো স্বভাব নয়, যার লাঠিটা হাতে থাকবে, আর মাঝে মাঝে লাঠিটা তুলে দেখার স্বভাব, এ হাত আর বাকি অন্য আসল ঘুরে যিতে। যাকে যাকে মনে হবে, তাঁরি বিকল্পনা জীবনে—কোথাকার যে লাট সাহেব তুমি, অর্বাচীন! ঘোমটা এনে একলক্ষ দেখি করেনি, আর তুমি মনে আর হাতে ছুঁকো নিয়ে—তামাকের গন্ধ নেই। হাঁ তো কে যে তুই! এ মনার কেটা? কি যায়! ট্রেন-চাপা খাওয়াতে পারিস! তিলে মায় একদম হচ্ছে না শুনেছি।

এইসব চিত্রকল্প গল্পের প্রথম দিকটার জন্য ভেবেছিলাম। প্রথম থেকে গল্পটি আপনি নেবেন বলে-ছিলেন, তবে সংক্ষিপ্ত আকারে। কিন্তু গল্প ছোট করতে হলেই লেখকের তাঁরি কষ্ট। যা যা যে যে ভাবে দরকার সব তখন ঠিকঠাক থাকে না। কিছু যেন কম পড়ে যায়। ঠিক চাঁদটি ঠিকভাবে ফুটে ওঠে না। তবু প্রথম দিককার গল্পে এমন সব কথা, অথবা হিজলের ছবি থাকুক আমি চেয়েছিলাম। গল্পের আবার্মাক আয়তনটা সাধারণত ভাবেই থাক। ঘটনা এখানে সন্নিবেশ, ঘটনা থেকে যে কোনো চিত্রকল্প আপনি গ্রহণ করতে পারেন। আমার তেমন লোভ নেই—এবারে ছবি আঁকার ভার-ভাবনা সবই আপনার থাক। যেমন খুশি ভেবে নিতে পারেন।

তবে গল্পের শ্রীনাথবাবু আর শঙ্কিত্রলেন না। ট্রেন এসে গেছে। এইমাত্র ট্রেন ইন করছে প্লাটফরমে। তিনি হন হন করে হেঁটে যাচ্ছিলেন। লাঠি ঘোরাচ্ছিলেন হাতের ওপর। যেন লাঠিটা সঙ্গে-রাখাই আছে। লাঠি নিজের মতো অহংকার নিয়ে বেচে আছে। ট্রেনের এ-জানালা ও-জানালার কাকে যেন খুঁজছেন। মফস্বলের ট্রেন, পাশাপাশি স্টেশনের কে কোথায় কতটার ট্রেনে কোথায় যাবে তাঁর যেন সব জানা।

—'এই যে রামরতনবাবু, কলকাতা?'

—'আরে কি খবর! কাটোরা যাচ্ছি। কেন আছে। কি রকম আছেন?'

—'ভাল। বেশ যাচ্ছি।'

লাঠিটা মানুষটাকে অবলম্বন করে আছে। মানুষটা লাঠি অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে নেই।

—'আপনি কেমন আছেন?'

—'দিনকাল পাপকাল চলছে। এ-বয়সেও সালের ছুটি দিচ্ছে না। আর পেরে উঠছি না।'

—'কত আছেন হল?' শ্রীনাথবাবু লাঠিটা বার দুই ঘোরালেন।

—'আছেক।'

—'কী যে বলেন! ভাল আছেন। ভাল থাকুন।'

পাশ থেকে কেউ যেন হাঁকল, 'বড়-বাবু, হিজলের চাষ এবার কেমন?'

—'চাষ তো মনে হচ্ছে ভাল। তবে আশ্বিন না গেলে কিছু বলা যাবে না।' তিনি হাঁটতে থাকলেন। আট-কলমে হেঁটে যাবার সময় মনে হল, সমস্তের পকেট থেকে পর পর কটা কুকুর লাফিয়ে নামছে। কিছু যাকল স্টেশন। কলকাতার গোলা যাবে বল। ভদ্রলোক কুকুরগুলোর চেন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পায়চারি করছিলেন। অল্প পাকাসা। একলক্ষ যাবার মানুষে ট্রেনে কি আর থাকবে। চোখে মুখে তাঁরি অবহেলা। শ্রীনাথ-বাবুর মানুষটিকে পছন্দ হল না।

মানুষে পছন্দ না হলেই শ্রীনাথবাবু তাঁরি গম্ভীর হয়ে যান। কোথাকার ভূমি কে হে! একেবারে গায়েপড়ে এসে ভেবে ফেলেছ মানুষে থাকে না এখানে! তিনি লোকটার দিকে এঁগিয়ে যেতে থাকলেন। এমন তিনি যে তাঁরি গম্ভীর মানুষ, এক ডাকে গম্ভীর লোক এসে হাজির হয়, দাখো, এই অঞ্চলে কিছু মানুষজন এখনও আছে, স্টেশনের পেছনে বড় পোতালা বাড়ি, পুকুর এবং ফুলের বাগান, সব এ মর্মার, কোথায় কোন অঞ্চলে মুর্শিদ নীল জবা পাওয়া যায়, এখানে ভূমি তাও পাবে—কি নেই বলানে! তিনি কেতে কেতে দুবার গলা কেড়ে নিলেন, এই যে যাব, কোথায় যাওয়া হবে এমন বলার ইচ্ছে। স্পষ্ট গম্ভীর গলায় কথা বলার অভ্যেস তাঁর।

তখন সিগনাল পেয়ে ট্রেন যাচ্ছে। কিক্ কিক্ শব্দে অবিরাম কিক্ কিক্ শব্দ। মনেতে, এক দুই, এক দুই তারপর দুই তিন, দুই তিন চার, এবং ছয়ে যেন স্প্রিং ছোলার আগে মনে হল জানালার কেউ গলা বাড়িয়ে ডাকছে তাকে। কল্পনের গলার মতো মুখ ঘন করা। ঘাটোলে শব্দটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। গার্ড সাহেব হাতে নিশানটা দুলিয়ে দুলিয়ে কি বলছেন! শ্রীনাথবাবু ট্রেনের সঙ্গে ছুটলেন, বলছেন, 'কি বলছেন, কি বলছেন।'

—'শ্রীনিবাবু মায়া গেছেন।'

—'শ্রীনাথবাবু!'

—'আজ্ঞাহত্যা, শিব্ শৈ...ত্রৈ আ.... ত্ম...হ...ত্যা।' শব্দগুলো ক্রমে লম্বা হতে হতে ট্রেনের সঙ্গে চলে যেতে থাকল। তিনি প্রায় লম্ব হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, শ্রীনাথবাবু ও-লাইনের গার্ড, এবং এখানে আসে ডাউনে যাবার দেখেন, হাত নেড়ে দেখেন। কখনও শ্রীনাথবাবু, বারান্দায় ইঁচিয়েছারে, কখনও ফুলের বাগানে, কখনও বনক ফুলের দোকানের সামনে। সে লোকটা তা হলে মরে গেল। এবং পড়তে পড়তে তিনি প্রায় লাঠি দিয়ে কোনোরকমে সোজা রেখে নিজেকে কুকুরওয়ালা বাঙ্গালী সাহেব-টিকে বললেন, 'মানুষ কোথায় যাওয়া হবে?'

—'রায় সাহেবের বাড়ি।'

রায় সাহেব কৃষ্ণাকান্তেশ্বর, ধুলোকর মানে টাপা। টাপার বাবার লাখ-খানেক টাকার একটা মহাল ছিল। মহাল থেকে টাপা একবার ছোটোলাইনে এ-ধারে নিয়ে এসেছিল। লাল কাপেট পাতা ঘরোছিল সড়কের ওপর ছিয়ে এবং হাজার হাজার টাকা ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্য। ছেলে বেহেতু সভা-পতি, টাপা ছেলেলাইকে এনে রায় সাহেব হয়ে গেছিল। তিনি এবার সাহসা ভিকরে করে জানলেন, 'টুনে টুনে।'

কুকুরওয়ালা সাহেবটি সমানা থাকছে

দেল। মুখের ওপর এ-ভাবে সহসা চিৎকার করে উঠতেই সে দু পা পিছিয়ে গেল। কুকুরগুলি ঘেউঘেউ লাগিয়ে দিয়েছে। টুনে ছুটে এসেছে কোথা থেকে। প্রায় মল্লযুদ্ধে মানুষের মতো টুনে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে এবং তখন বন্দুকটির মুখের ওপরই যেন তিনি চিৎকার করে বললেন, 'আপনারা বাবুটি আপনি কোথায়?'

টুনে বলল, 'হুজুর আপনি কোথায়?'

হুজুর বুঝে গেল না, গাঁয়েমানুষ সে এসেছে নতুন। লোকজন তো আসার কথা। কিন্তু স্টেশন ফাঁকা। একমাত্র এই বুড়ো মানুষটা তার সামনে। সে তো বলেছে, বাবু রায়-সাহেবের বাড়ি। এত বড় রায়সাহেব তার আত্মীয়, ওকে তো সমীহ করেই কথা বলা দরকার, অন্তত যে-ভাবে সে পাইপ বাজিয়েছে, আর পোশাকে-আশাকে তাই তো এ-সব গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে কোনো মিল নেই—সে ছেবে পেল না কি বলবে। কুকুর-গুলো ঘনায়মান রকমের ভয় পেয়ে এক খণ্ড আর স্টেশনে দাঁড়াতে চাইছে না।

বুড়ো মানুষটি টুনেকে ডেকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু টুনে এবং সাহেব মানুষটি আর একটা কথা বলছে না দেখে ফের বললেন, 'টাপা-দের বাড়ি যাবে। দিয়ে আয়।'

তারপর যেন এই একটু আত্মীয়-টাত্মীয়ের মতো কথাবার্তা বলে জানা, কে হয় টাপা?'

—টাপা!

—হ্যাঁ ঐ রায়সাহেবের মুখাপ্ত-দেখক।'

এমন জাঁদরেল ভদ্রলোকটির নাম টাপা, সে জীবনেও শোনেনি। সে কিছুটা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'ভদ্রলোক।' সে পাইপ টেনে যাচ্ছে।

শ্রীনরবাবু বললেন, 'ওরে বাবু আসেনি নেই। নিতে ছেছে।'

নিতে ছেছে! মনে মনে। সে পাইপ টিপে হুজুর সত্যি আসেনি নেই। সে তো কখন পালিয়েছিল, সে কিছুদিনের জন্য নিয়ে থাকবে। হিজলে এখন পাখি পড়ার সময়। হিজলে পাখি শিকারের জন্য সে আসে চলে এসেছে। নন্দ এবং আরও আশপাশকার সকলের ট্রেনে আসবে। ওদের ফারমান আছে আজ। ফারমান দেব না হলে আসতে পারছে না। সে আসল একা একা এসে বেশ রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতার জন্ম এসেছে এমন ভাবতে পারবে—জীবনেও তার এদিকটার আসা হয়নি। বাইরে বাইরে জীবন—ইদানীং কিছুদিন তার মনে হয়েছে, হিজলে শিকারে গেলে জল হয় না। ভদ্রলোক কর্তাদিনের কতকালের জমাট্রোধ এবং ইচ্ছা, একবার সময় করে হিজলে বেড়িয়ে যাওয়া মনে মনে বাংলোপেন্টাকে বেশ মানিয়ে কাছে থেকে দেখা, এমন সুযোগ হারানো ঠিক না। আসি আসি করেও আসা হয়নি। এখন এমন একটা বুড়ো মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে যে, এখানে এসে সাঁতা কতটা ভাল করেছে বুঝতে পারছে না। সে বলল, 'কতদূর?'

—ঐ তো, দূরে না। যান চলে যান।'

রায়সাহেবের শহরের বাড়িটাতে সে একবার এসেছিল। এটা গ্রামের বাড়ি। এখানে আত্মীয়তা থাকার কথা নয়। হেটেই ছেতে হবে একটু বুঝতে পেরে খুব ঘাবড়ে গেল।

টুনে একটা বড় এ্যাটাচি কেস হাতে তুলে নিল। এবং বলল, 'বুড়ো একটা কুলুর দিতে পারেন। কামড়াবে না তো!'

সাহেব মানুষটি সামান্য হাসলেন। বললেন, 'ভয় নেই। কামড়ায় না।'

বুড়ো মানুষটি চলে যাচ্ছিলেন, কামড়ায় না শুনে বললেন, 'মিছে কথা। কামড়ায়।'

সাহেব মানুষটি অতঃপর চুপ করে গেল। বুঝতে পারল না, কামড়ায় না বলাতে এত চটার কি আছে। সাঁতা তো তারি নিরীহ এরা। কুকুরগুলোর মা বাবা যদি রক্ষা করে ছেছে। সে এখন শুনে বলতে পারে মাত্র পাঁচটা। মোটা তিনেক মরে ছেছে। এদের হয়েস বোঝি না। সাত আট আসও হয়নি। বাড়িতে কেউ থাকবে না, চাকর বাবুরের ওপর বিশ্বাস কম। খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হবে কিনা, এবং এখানে এসে যে বিশ্রিস্তে দু দিন থাকবে তার উপায় থাকবে না। ছেড়াতে এসে মন উচাটন থাকলে সুখ নেই বেড়িয়ে। একেবারে সঙ্গে নিয়ে আসা সেজন্য।

সে বুড়ো মানুষটাকে খুশি করার জন্যই বলল, 'হ্যাঁ কামড়ায়। সামান্য ভয় থাকা ভাল।' কিন্তু বুড়ো মানুষটার এই উপকারটুকু—কোথাকার সে কে, এখন নিজেকে এমন বিপন্ন হিজলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোথাকার কে সে এমনই মনে হল। টুনে আগে আগে হেটে যাচ্ছে। দু তিনটে বড়ুর গাড়ি লাল সুরকির পথ ধরে গাঁয়ের পথে ছেছে যাচ্ছে। সে আর তাকাল না। বুড়ো মানুষটি ট্রেন চলে ছেলে খালি প্ল্যাট-ফরমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। আর লাল ইটের ছোট ছোট কোয়ার্টার, একটা খাল, ছোট লাইন। বর্ষার সময়। বর্ষাকালে এখানে মাঝে মাঝে এমন ডুবোজল জমা হয়, যে মানুষের আসা ঠিক থাকে না। সে এবং টুনে হাঁটছে। কুকুরগুলি কেন এবার বিরাট লোহের—ব্রীজের সঙ্গে সঙ্গে ছেটে যাচ্ছে। একটুও দুই তিন করছে না।

২

আপনি ইচ্ছে করলে চিকেন্স ব্যবহার করতেও পারেন নাও পারেন, তবে চিকেন্সের সুবিধা সামান্যিক

হিমাংশু বিশ্বাস

ভাবে পাঠককে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত করে। চাঙ্গারা সজীব হয়ে ওঠে। মন প্রফুল্লিত হয়। কিছুটা চলচ্চিত্রের সামিল। আসলে বেঁচনে মন্দ গভীরে মন চিকেন্স দেখনে বাহুল্য মাত্র। বুড়ো মানুষটার হুকুম হয়েছে। বুড়ো মানুষটা মনে শ্রীনাথ বাবু। সারাটা রাত তিনি ঘুমোতে পারেননি। বুড়ো বয়সে এমনিতেই ঘুম কম হবার কথা, কিন্তু কাল রাতে রবীনবাবুর আত্মহত্যা কথাটা সারা রাত খুব জ্বালিয়েছে। মানুষ আত্মহত্যা করলে তার তারি কষ্ট হয়। তার পরিচিত লোক হলে তো কথাই নেই। এবং সেই কুকুরওয়ালা সাহেব, পাইপ টানা মানুষ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে সন্ধ্যা জমে ওঠে, তা ছাড়া বড়বাবু এসেছেন নতুন, হিজলে, এবং সন্ধ্যায় ছেবেছিলেন, অন্তত এসেই দেখা করে যাবেন, এই ছেলে কোয়ার্টারগুলোর পাশে তার এত বড় বাড়ি এবং প্রতিপত্তি, সব মানুষেরা খবর দিয়ে যায় যেন তাদের একটি এক মানুষ, যেমন তেমন মানুষ নন তিনি। বাড়ি, বাগান পুকুর এবং বড় রকমের চাষবাস নিয়ে আছেন, যদিও ছেলে ব্যারিস্টার মেয়ে-সোনার খনির কিছুটা নিয়েছে, এবং সংসারে বৌমা এসেছেন, তাও পনেরো দিন সাল। এবং দুজন নাতিন, ওরা বাঙালী হয়ে যাচ্ছে। স্কুলে ফেটার মতো কথা বলে। বাগানে ঢুকলে বোঝা যায় তিনি তাঁর পুত্র এবং কন্যা দুই নাতিন মানে দুজন মানুষের নিয়ে বেশ আছেন। ওরা যখন থাকে শান্তিনিকেতনে। বুঝতেই কিসব পোশাক পরে যে চলাফেরা! এবং কখনও কখনও বাগানে মালি আর ছেলে দুই নাতিন এবং তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থাকলে বোঝা যায় কেন অহংকার চেপে মুখে। নাতিনেরা বেশ চঞ্চলা হরিণীর মতো চকিত হরিণী হয়ে যাচ্ছে।

সকলে যদি চিকেন্স আঁকা যায় তবে কার সাধ্য, এমন একটা চোখ মুখ সজীব হয়ে উঠবে চিকেন্সে—মাঝে থাকবে বুড়ো মানুষটা এবং ঘরের হবার জন্য নিদারুণ সব দুঃখ।

সকলে বোম বেঁধে উঠেছে। স্টেশনের বাইরে অশ্বত্থ গাছ। কলক বুড়ের মিষ্টির দোকান এবং চায়ের দোকানে দু একজন বাড়ি বসে ছেছে। এবং কুলির অথবা জিলিপি খাচ্ছে। দুটো গরুর গাড়ি, গরুগুলো হাড়া, খাল খাচ্ছে। দুন্দু দুন্দুর ঘুম ভাঙেনি। ওর মা খুবের ছেকে ছেছে। ওরা পাজামা পাঞ্জাবী পরে শোয়। ছোটোবেও মা হবার দুটো কাজ বাচ্চার মা হলে মানাত। কিন্তু এমন স্বভাব, ওরা কখনও মা হবে কিম্বাস হয় না। চা খবে, দুদু চা খেয়ে বাথরুমে। তিনি বাধ্য হয়ে নতুন হাল ফ্যাসনের ছোতলায় বাথরুম করে দিয়েছেন। সাওয়ার আছে। সাদা টাইলের ছেকে, ছেয়াল। এবং সেগুলি কেনা দিয়ে দুন্দু দুন্দুর স্নান করে। না হলে এত সময় লাগে না। দুজনে দুজনে ঐ যখন খুব বকবক বাথ-রুমের, তখন তিনি বেছবেন কেউ না কেউ নিজে বাথরুমে ঢুকে আর আসছে।

এতে রাগ বাড়ছিল। তিনি মোটামোটা সোজা দুই লাইনের জন্য দুটো আলাদা তরকতে বাজবন্ধ করে দিয়েছেন। এবার ছেলে দুটো বড় বড় হচ্ছে, বাড়ির ছেলেরা তত পাল্টে যাচ্ছে। যেমন, অল্প বয়সে তিনি নলতরঙ্গ ভালবাসতেন, এবং পৃথিবীর যতরকম ভাল বাজনা আছে, এমনকি পঞ্চমুখী জন্তুর গান এনে লাগিয়েছিলেন—বিশেষ করে দীপকের মতো পঞ্চমুখী জন্তু না হলে পুরো প্রোগ্রাম সংগ্রহ হলে নিত—এখন বাজনে কোনো জন্তু গান গাচ্ছে না। কেবল গোলাপ, রজনীগন্ধা। টবের গাছ আছে। বেডেনবেলিয়া ফুটছে। কেবল বড় হয়ে উঠেছে—এবং মনে আনন্দের সৌরভটা ফুলের চায়। তাই বড় বড় সব ডালিয়া, ক্রিসেনথিমাম, কত সব যে ফুল! এবং এই ঘুন্ ঘুন্ ভ্রমরও সব। কখন কি ফুল কি ভাবে ফুটছে তলবরনে ঘুন্ ঘুন্ চেয়ে পৃথিবীতে আর কেউ বোধ হয় এত ভাল জানে না।

ঘুন্ ঘুন্ এখন সুরুত ন্যাসিনীর মতো নিচে ছুটছে। ওদের বন্ধ করা চুল। লতিকা তাঁর ফাদারসুরুত মহিলা। মরতে ইচ্ছুকে বাঁধেন মেয়েদের বাণিজ্য-নিকেতনে যেখেছে। হিজলের ছেলে বাস বছরে তিন বাইশ হাজার টাকায় হয়ে ধরে। বাঁকেন এখন অঞ্চলের সমাজপতি। তিন-চার বছর হল, কোয়ার্টার কেন বেতের মেম্বর হয়ে সাত তাড়াতাড়ি বিদ্যুতের ব্যবস্থা পর্যন্ত গাঁয়ে করে ফেলেছে।

তিনি নিচের বারান্দায়। ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন। গড়গড়ার টানাক টানছেন। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া হিজল থেকে উঠে আসছে। বাগানে সব নানারঙের চন্দ্রমল্লিকা, এবং ঘুন্ ঘুন্ পতঙ্গের মতো কেরোসিন কুলে দেওয়া পাওয়া ঝুলন্ত টব। আর কুলে ফল থাকা জিনস্। ওরা এই সকালে বাগানে একটা হলুদ কাঁচি ধরার চেষ্টা করছে। আসলে কাঁচি না চলাচলি তিনি এখান থেকে ঠিক বুঝতে পারছেন না।

একটা মনে হল, কেন কোয়ার্টারের আল দিয়ে কারা আসছে।

ডাকলেন, 'টুনে।'

কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

—ঘুন্!

—যাই বাবা!

—চেঁচাচ্ছো কারা আসছে?

—চিনি না।

ভাল করে না দেখেই বলল, চিনি না। আর বাবা আসছে একজন ভদ্রলোক সামনে চিনি না বলতে নেই। এরা যে কি শিখছে! সংসর্গ একদম জানে না। লজ্জা ঘেন্না এসব নেই। একদম নেই। সেই কবে বড় কর্তা, অর্থাৎ তিনি, বড় বৌর মুখে শুনেছিলেন বড় বৌ ছোট নাবালিকা বলেই চলে অবশ্য কি বার ছিল চোখে, আর কি আকর্ষণ ছিল দীপ্ত স্থির মুখটি। ফুটে ওঠার আগে যেন পরীর ডানার সাহেতে পেয়ে গেছে। আর এরা কি: লাজ লজ্জা, ঘিনয়, ভদ্রতা, সব খেয়ে!

তিনি নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। পাশ থেকে লাঠিটা নিয়ে জলে নেমে এলেন। এক চোখে কিছুটা কম দেখলেও চোখ দেখলেন—চাঁপা আসছে। সঙ্গে সেই সাহেব সুবো লোকটি।

চাঁপা এসেই গড় হল।—'বড়দা, আর আমার বড় পালক।'

—'খুকুরানীরা কোথায়?'

সাহেব মানুষটি হাসলেন। বললেন, 'আমার নাম অর্থীর চক্রবর্তী।'

—'তত সহজ নাম, তার পোশাকে এত ভারিক্কি কেন?'

—'থাকতে হয়।'

—'খাঁচার জন্য রাখতে হয়। আসুন।' বড় কর্তা শ্রীনাথবাবু সাহেবদের কিছু বুঝে টুঝে কেন বলে ফেললেন, 'আসুন।'

মৃণাঙ্ক বলল, 'বাবা আপনি কি: ওঁকে আর আপনি চাপনি বলবেন না। অর্থীর বলবেন।'

শ্রীনাথবাবু খুশি হলেন। গতকাল তুমি করতে সরা জানে ভুল করেছে। এখন বুঝতে পারছে, পাড়াগাঁয়ে লোক-জন রাখতে। পাড়াগাঁয়ে লোকজন না রাখলে তোরা বাঁচ কি করে!

মৃণাঙ্ক বলল, 'বাবা এখন বসব না। ঘুন্ আরাটি আসবে। গাড়ি আসতে বেশি দেরি নেই। অর্থীরবাবুর মেয়ে।'

—'গাড়ি পাঠালি না কেন? তোর সোমেশদির কি খবর!'

—'আজ আসবে বাবলা ছিল। সনের বোস ঠাঁন একই ভবে লেখেন।'

আজ ষোল তারিখ। শ্রীনাথবাবু বললেন, 'সে হয়! এসে। ট্রেন লেট আছে।'

—'খবর নিলেন!'

—'খবর না নিলেও টের পাই।'

মৃণাঙ্ক এই মানুষটিকে জানে, অল্পবয়সে থেকে, চার বলা যায় ছেলের থেকে, এবং যত কাল যাচ্ছে তত এই মানুষ কেমন নিজের ওপর বেশি আস্থা-বিশ্বাস, না এক আত্ম-অহংবোধ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হাতের লাঠি ফেলা দেখলে সেটা টের পাওয়া যায় বেশি। লাঠি সঙ্গে থাকিতে ফেলে হাঁটতে চান না।

মৃণাঙ্ক ইশারা করল অর্থীর চক্রবর্তীকে। বসে যাওয়াই ভাল! মানুষটা মনে না ভেবে বসে রাগ করেন।

শ্রীনাথবাবু বললেন, 'অবাকটা কেমন দেখছেন?'

—'অবাক আপনি!'

—'ও কথা বলতে বলতে ঠিক হয়ে যাবে।'

ঘুন্ ঘুন্ এখন একেবারে চুপ মেরে গেছে। ওরা টাঁদের পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। এবং কেন বোঝা যায় লজ্জা টজ্জা কিছু, তখনও অবশিষ্ট আছে। না হলে এখনও ছুটে পালাত। আসলে শ্রীনাথবাবু বুঝতে পারলেন অর্থীরের চোখমুখে অভিজাত্য আছে। ছেলেরা বোধ হয় আভিজাত্যের ছাপ দেখলে লজ্জা পায়। ওরা কি ছোক ভবে লজ্জা পেয়েছে।

শ্রীনাথবাবু বললেন, 'তোমরা কি ভেতরে যাবে?'

ঘুন্ ঘুন্ আর একটি কথাও বলল না। এক ঝোঁড়ে ও-পাশ দিয়ে ভেতরে চুকে গেল।

অর্থীরবাবু বললেন, 'আপনার নাতিন?'

—'হুঁ। বলুন।'

—'আমি মিষ্টি খাওয়াব!'

—'তা হচ্ছে। ক'দিন থাকা হবে?'

—'যে ক'দিন ভাল লাগে।'

—'খারাপ লাগে এখানে এলে কেউ তো বলে না।'

—'যৌবনদিন ভাল নাও লাগতে পারে।'

শ্রীনাথবাবু হাঁকলেন, 'কে আছ! এদিকে তিন কাপ চা পাঠিয়ে দেবে।'

মৃণাঙ্ক বলল, 'ট্রেন কত লেট?'

মুখস্থের চাকর বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সদরে গাড়ি বেশ ঘাসদল দুরুস্ত। ছই আছে। এবং ঘনকুকোর করা ছই। নিচে খড়ের ওপর তোষক, সাদা চাদর। এমন কি লম্বা একটা তাকিয়া। সাদা উর্দিপরাতে বেশ ছেলে ঘুলে এসেছে। চাকরটা বোধ হয় বুঝতে পারছে ট্রেন আসছে। মৃণাঙ্ক বলল, 'দাদা, কত লেট বললেন না তো!'

—'তা, ঘণ্টাও ঘিসেব করে বলতে হবে!'

অর্থীরবাবু ভাবলেন, ছেলেরা সব বড় বড় ছবি। এবং একটা ছাঁচে পুরোনো ঢালা। ঠিক লোকা কোচ যেমন থাকে, তেমনি তকতকে এবং সাদা ধবধবে গদি। যার যেখানে যেমন খুশি শুতে পারে বসতে পারে। ছেলেদের চুলকায় মাকেসাহেবই হয়। নীল রঙটা বোধ হয় বড় কর্তার খুব পছন্দ। জাঁদরে বজরা চলাচলায় রঙ নীল। কাঁচি বজরা রঙ নীল। এবং পুরোনো চেয়ার টেবিলের বার্নিশ উঠে যাওয়ায়, নীল রঙ করে নিয়েছেন।

বারান্দাটাতে তাঁর খোলামেলা। ঠিক জানেন না। অথচ সেই বলছেন। ট্রেন এসে গেলে, ওরা না খেয়ে গেলে হয়তো ট্রেন ছেড়ে নামবেই না। সে বলল, 'ঘরে ঘরে না?'

অর্থীরবাবু বুঝতে পারল না।

—'ট্রেন সেই কত বলুন?'

—'প্রায় পঁয়তাল্লিসের মতো।'

—'পঁয়তাল্লিস মিনিট!'

—'হ্যাঁ। কথা যাচ্ছে মৃণাঙ্ক?'

কথা যাচ্ছে তাও জানেন না। অথচ সেই বলে বসিয়ে রেখেছেন!'

—'আটটা বল।'

—'আটটা পনেরোয় আসে।'

—'তা হলে বসিয়েন নটা বাজবে?'

—'হ্যাঁ। এখন তো ট্রেন বাজার-মতোই আসেনি। বাজারমতো চুকলেই ট্রেন পাব। পুরু ঘুরে কথাটা আরও তাড়ি লোনাবে। স্পষ্ট বাজবে।'

—'আপনি সব টের পান।'

—'কিন্ত-চিন মাইলের ভেতর ট্রেন থাকলে ঠিক টের পাই।'

অর্থীরবাবু বেতারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। থাকে থাকলে এমন অভ্যাস হয়ে। কর্তা জানেন! কেন সবই নজরদারি। শ্রীনাথবাবুকে বাস দিয়ে আসে কেউ কিছু টের পাবে হতেই পারে না কেন।

আসল কথাটা এখনও ভগিনপাতে চালছে না। অবশ্য কথা ছিল, ছেলের সময়, নয়ু আর আরাটিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এখানে আসবে—এবং হিজলে তিতির শিকারের কথাটা বলে নেওয়া ভাল, না হলে কখন যে ফেলে—শ্রীনাথবাবুদের যেতিতে এখন তিতির পড়ছে ভাল। একটা দিক চাষাবাদ হয়নি, অবশ্য ইচ্ছে করেই তিনি আউশ ধান লাগিয়ে-ছিলেন। ধান পেকে মেয়ে ঘাঁস ফাঁকা হয়ে গেছে। এখন জলে নানা রকম পাখি ঘুরছে, এবং ছোট ছোট ঝাঁক। আর ধানের পুঁচিতে বসে থাকাও নিরাপদ। অন্যান্য যেতিতে শুধু আমনের চাষ, সুতরাং ওখানে তিতির পাওয়া যাবে না। সহসা শায়ক আসবে, চিঠি দিয়ে এ ভবে আরও দুবার আসেনি, এবারও আসবে মৃণাঙ্ক বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারলে নিজের যেতিতে আয়োজন আসন করত। তিতিরের মাংসের ঝোলোজনে তবে বন্ধাবই অর্থীর চক্রবর্তী এসে গেল।

মৃণাঙ্ক বলল, 'বাবা, অর্থীরবাবু তিতির শিকারে যাবে।'

—'তা যাবে না তো কি করবে।' —'কিন্তু আমাদের যেতিতে, হারি-সের যেতিতে কেউ নিয়েছি। তিতির কমছে না।'

—'কেন কেন?'

—'ধান পাছ সব বড় হয়ে গেছে। বসলেও দেখা যাচ্ছে না।'

—'তিন ঘুরে দাও। তারপর উড়ন্ত ধরে গুলি। তবে তো শিকার। পারো?'

অর্থীর চক্রবর্তী বেশ লম্বা ছোটা কুর্তা পরেছে। সকালের পোশাক বোঝাই যায়। যেন ঘুন্ ঘুন্ বিছানার তাঁরি চিলেঢালা পোশাক পরে শোয়। এবং যোঁয়ার আরামে ঠিক অভ্যাস বিভোলাদন হয়নি। সকালে ঘর খুলে বের হলে বোঝাই যায় না ঘুন্ ঘুন্ পুরুষ না মেয়ে।

অর্থীর চক্রবর্তী বলল, 'না।'

—'তবে আর কি শিকারী!'

—'অভ্যাস নেই।'

—'অভ্যাস থাকে না। করতে হয়। করলেই অভ্যাস হয়ে যায়। বছর গতবার, এদিকে পঞ্চমন-টাঁদন হল, মৃণাঙ্ক, জানে আছে কেন হয়, হিজলের জলে ভেসে গেল সামনের রোদ্দুর।'

যেন শ্রীনাথবাবুর কথায় ইচ্ছে—তত বড় রাবন, যে না দেখলে বোঝা যাবে

না। কেলপুলে উঁকিয়ে নিয়েছে কখনও হবনি। স্নানঘরে পুলে উঁকিয়েছে। এমন কি লেহেহ্রাদী পর্যন্ত এসে হোলিকপ্টারে চেপে গেছেন, সেবারের স্নানঘর সাঁচা একটা স্নানঘর। তেমন স্নানঘরে দ্বিজেনে সেই সামান্য ব্যাপার নিয়ে ভাবতে তিনি একা। বুঝতেও পারেন নি, মুখুজ্যে কবে চলে আসছে সে। কত বৃষ্টি তো হয়ে থাকে, দু চারদিন চলবে, এর জন্যে মাথা কি করে যে সে নেয়ে আসে, যখন একা তিনি সাঁতরে পার হয়ে এসেছিলেন ঝর্নার জল। এত কথা তিনি অবশ্য বলেন না। সেই সেবারে, স্নানঘর পুলে উঁকিয়ে নিল, তোমার তো মনে আছে মুখার্জি। মুখার্জি বলবে মুখার্জি—সেই আশায় তিনি 'আরে শুভবার, এদিকে স্নানঘর-টানঘর' এমন বলে অভ্যাস-টেবাসের কথা বেমালুম উঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অধীর চক্রবর্তী। হাঁ। ঠিক তা বলা যাবে না, প্রায় অর্ধেক মতো বড়ো সিনেমাটির বাসনে খাঁটি দুধের চা। চা এর চেয়ে খাঁটি দুধের পরিমাণ বেশি, এবং নানা রকমের ভাজা, যেমন, চিড়ে ভাজা, যেমন খিরের সন্দেশ, সন্দেশ না বলে খেজুর বলা ভাল। গুড়ো চিনি হাল-বহাল করা।

শ্রীনাথবাবু বললেন, 'খাওহে খাও।'

মুখার্জি বলল, 'এত সব কেন আবার!'

শ্রীনাথবাবুকে সামান্য দুঃখী দেখাল। 'তবে তুমি মুখার্জি এখনে এসে এখন না খেলে। সব তো ঘরের।' অধীর চক্রবর্তীর দিকে সামান্য তাকিয়ে বলা, 'খাঁটি জিনিস। খাও কিছু হবে না।'

কেমন ইতস্তত করতে দেখে তিনি কেন বললেন, ট্রেন বাজারলাহু থেকে ছেড়েছে। এখনও প্রায় পঁচিশ মিনিট। তোমার ফেরে বিশ মিনিট। আচ্ছা দাঁড়াও, কে আছিস? হরিপদ, খোকায়!'

খোকায় এসে বললেন, স্টেশনে যা। কলকাতা থেকে সব বিশিষ্টজনরা আসবে। লাইনের নাগিয়ে রাখবে।' অধীর চক্রবর্তী না-খাওয়া আর নিরাপদ ভাবল না। না খেলে উঠতেও দেবে না। তিতির নিকায় আছে আবার। সবটাই সে খুব খুশি হয়ে কেন খেল। ফেটপুটে খেল। ঘটটা খেল, তার চেয়ে বেশি মুখোমুখি করল খাবারের। শ্রীনাথবাবু তখন তাড়া-তাড়ি লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী এবং লম্বা সাদা লুঙ্গির মতো সোনার পরে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'ট্রেন সিগন্যালের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এস।'

আসলে শ্রীনাথবাবুর বাড়িটা স্টেশনের খুব কাছে। কেলা মাস্টি-স্টেট থেকে যে কেউ এখিকটায় এলে, এখানে উঠে যায়। তখন এখানে আছে সেই বুড়ো মানুষটা। কেলা মাস্টিস্টেট, অন্য কোথাও উঠলে অভিমান করে বসেন তিনি। খুব কেলা মাস্টিস্টেট কেন, সরকারী আমলা কর্মচারী যে কেউ, এমন কি নিজেদেরকে একজন কেন বাজোদার যে বদলাতি করেছিলেন তাতে, করে মানুষটাকে এক রকমের পাগলই বলা যায়।

মুখার্জি সবই জানে। ওর মনে হচ্ছে কোথায়, শ্রীনাথবাবুর বয়স সত্তের কোথায়। দশ বছর এখনও অনেক বেশি। মুখার্জি আঁচিতে ভর দিয়ে হাঁটে। এ-বয়সে এটা ভাল না শ্রীনাথবাবু বুঝিয়েছেন। ট্রেন এসে থেমে গেলে কথা। তা না হলে, চলা-পথে আর কি আছে—তাঁর বড় পুকুরের ঘাট, এখন কতটা ওজনের হয়েছে, কটা মাছ মত স্নানঘরে ছেলে গেল সব নখদর্পণে তাঁর। এবং গাছ-পালার ফেরে মানুষটা হোঁচট খাবার সময় বৃষ্টি চেয়ে পার জীবনে শরীরে হাওয়া লেগেই আসছে হয়েছে, যথা-সম্ভব তাকে এখন খুব চোখেচোখে ঘুরে সরিয়ে রাখা।

শ্রীনাথবাবু বললেন, নতুন বড়বাবু এসেছে।'

—কবে এল?'

—দু দিন হল এসেছে।'

—কেমন মানুষ?'

কেমন মানুষ তিনি কি করে বুঝবেন! এখনও তো লোকটা এল না। না এলে তিনি কি করে বুঝবেন কেমন মানুষ। আর তিনি অবশ্য বলতেও পারেন না, এসেছে, অন্তত তাঁর সঙ্গে দেখা করেনি, কলকে, এরাও আসকারা পেয়ে যাবে—এখন তোমার দিন নেই যে যত কর্তা, যেমন অমার দিন গেছে, তোমারও দিন যেতে বসেছে। তিনি খুব বললেন, বেশ ভাল। খুব মৈ ঠে ভিত মানুষ। এবং কথাবার্তায় শ্রীনাথবাবু এত সব খবর নিয়ে নিলেন স্টেশনের নতুন বড়বাবু সম্পর্কে যে অনেই হবে না লোকটার সঙ্গে তাঁর কখনও পরিচয় হয়নি।

আর তখনই ট্রেনটা লাফিয়ে প্ল্যাট-ফরমে ঢুকে গেল।

০

অন্তত আজকের মিত্র বিজলের বিল, যারে যারে বেলেরানির কতদূরে চলে গেছে। প্রায় দিগন্ত থেকে গেছে সরু রেখার মতো। আর এই স্টেশনে দাঁড়িয়ে এতদূরে দেখা যায় লাইন প্রায় বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে দ্বিজলের বিলকে। কি প্রকাণ্ড, আর অনীম বিস্তৃতি এই বিলের। খুব জল, জলের গভীরে এখনও মাছে মাছে ভাসা, আর ঘেরির উঁচু সব পাড়। পাড় ধরে ধরে এক ঘেরি থেকে সহজেই আর একটা ঘেরিতে চলে যাওয়া যায়। কুলত এই অঞ্চলটার ঘেরিগুলি মাঝের মতো সব বাঁধ, চর পড়ে আছে নিয়ে বসার জন্য আইবে রাখা হয়েছে, কোনোটা মাইলের ওপর হবে লম্বায়। চারপাশে বাঁধ, বাঁধের ভেতরে এখন সব সবুজে ঘনের গন্ধ। বাইরে জল, অনন্ত জলরাশি এবং যে কোনো সময়ে আশে এলে, ঘেরির বাঁধ সব ভেঙে জল ঢুকে যায় এবং ফসল নষ্ট হয়ে যেতে অরাঘাট কপালে। তবু মানুষ সেই অবে থেকে এখন একটা চলাবহ জলে ভাসার চাষ আবাদ করে চলতির যোগাল খুঁজিকে খুড়ো আশ্বাস দেখাচ্ছে।

শ্রীনাথবাবুর মনে হয় খুড়ো আশ্বাস দেখানো ছাড়া আর কি। শ্রাবণ আষাঢ় নিয়মমতো বর্ষার যখন জলে ডুবে যায়, এবং চারপাশের নদী যেমন খারকা, রূপসী কূলে কেপে ওঠে, তখন সব জলের চাপ এই বিল একা বহন করতে থাকে। পরে যা যখন সব ঘেরির বাঁধ ভেঙে একে-বারে একাকার করে দেয় কিনারাকে। মানুষের তখন কাজ বেড়ে যায়। ঘেরি মেরামতের কাজ। আর কেবারে থেকে যায় চাষ আবাদ যা বন্দুমতরা উজাড় করে যেন ফসল। বছরের ফসলে ঘোষ ঘুছে তিন চার মাস চলে যায়। এবং প্রায় কটকের খেলার মতো। মহাজনেরা এসে জমির মত বাঁধিয়ে দিয়েছে। নতুন নতুন সব ঘেরি তৈরি হচ্ছে বিলে। জমির দাম দুর্মূল্য হয়ে গেছে। শ্রীনাথবাবু সেই বয়সে যখন তার যৌবনকাল, নবাব-দের কাছ থেকে তিন হাজারে বিঘে জমির ইজারা নেন সামান্য কাছে। তিনিই প্রথম ট্রেন পেয়েছিলেন, বর্ষার চারপাশে বাঁধ দিয়ে ঘেরিতে ফসল ফলাতে পারলে সোনার ফসল। খুব খুব খাঁরে সেদিন খবরটা রটে গিয়েছিল, দ্বিজলের বিলে ঘেরি তৈরি করছে বড়কর্তা। পাগল। বাদের জল যখন নেমে আসে চারপাশের সব গাছও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মহাজনী তখন ফেলা যজ্ঞের মতো। যেখানে সামান্যতম বাধা আসে ঘুরে ঘুরে নিয়ে যায়। আর এতো সামান্য মাটির বাঁধ। রুখে কার সাধ্য। তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। সব সাঙ্গত অর্থ লগ্নি করার মতো ঘেরিতে উজাড় করে দিয়েছিলেন সব।

অধীর চক্রবর্তী তখন পাশের একটা কামরার কার সঙ্গে কথা বলছেন। ট্রেন থেকে সব বাত্রীরা নামছে। দুজন খুব সুন্দর মতো যুবতী দাঁড়িয়ে আছে পাশে। তাদেরই আত্মীয় নয়ত এবং অন্যরা তিনটি ছেলে বুড়ো করা, লম্বা চুল, গোঁফ লম্বা করে ছাঁটা। 'বড় বড় লেদার এটাচি, এবং বেরিয়ে দেখে খুনে কেউ বাঁধ নাগিয়ে দিচ্ছে। ওরা এমন একটা গ্রাম জায়গায় আসতে পেরে ভীষণ খুশি। মাতৃকথার প্রায় কেউ কথা বলছে না। ফ্রান্স, জিনেভা, বিউটিফুল, এমন সব শব্দ যৈ ফোটার মতো খুবে ফুটছে। এখনও ভাল করে দ্বিজলের বিল সামনে—চোখে পড়েনি। ট্রেন চলে গেলে দেখতে পাবে, পাহাড়ের মতো উঁচু চিলার নিচে অনন্ত আকাশ, বত-দূরে চোখ যায় কেবল বিলো জল। এখন বর্ষাকাল হলে, দেখা যাবে সব ঘুলো হাঁসের উড়ে যাচ্ছে আকাশে। এবং এই প্লাটফরম, ছোট্ট লাল ইটের বাড়ি, সব নিজেরে মনে হবে বন্দুকের ফেলের মতো। আর পাশেই সেই ছিমছাম দূরে বাঁড়ির আছে তাঁর বড় বাড়িটা। নতুন রঙ হয়েছে বলে খুব-কথার মতো মনে হয় বাড়ির পরজা-জানালা। এমন নির্বাসিত নিরালা মাঠের ভেতর একাকী একটা প্রাসাদের মতো বাড়ি দেখে ওরা বলবে মাথো, সাধো, কি সুন্দর লাগছে বাড়িটা। ওরকম বাগানটা ঘেরে থাকে—বাবা, আমাদের এমন একটা সুন্দর বাড়ি হয় না। এমন উদার আকাশ পৃথিবীতে আর কোথায় আছে বলো।

অধীর চক্রবর্তী, মুখার্জি আগে-ভাগেই পরিচয় সেরে নিল। ওরা উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছে। ছেলে তিনজন কথা আসছে না। তারাটি লম্বা শ্যামলা রঙের মেয়ে। চুল ববকাটা। ফ্রান্সে থাকে ফরাসী। খুব জানতে পড়ুয়াদের মতো দেখতে। উজ্জ্বল। এবং জানা গেল, আজ বিকেলেই তিনের বিকেলে যাওয়া হবে। বড়-কর্তা যদি সঙ্গে থাকেন। নৌকায় জলে জলে ঘোরা। তারপর ফেরির ডাঙ্গাতে নামিয়ে দিলে, কি যে মজা হবে। এবং অধীর চক্রবর্তীর ভারি ইচ্ছে হচ্ছে খুব কুনু সঙ্গে যায়। তখন তিনি আর না করেন কি করে। সব কিছুই তুলে তাঁর বৈভব। কিন্তু মনটা ভীষণ খুঁত খুঁত করছে। স্টেশনের নতুন বড়বাবু জানলেই না, এই স্টেশন বলতে, দ্বিজলের বিলে এত-গুলি অধিকার কাকে, তিনি। অমনি বড়বাবু হাতলে ছুটে আসবে প্লাট-ফরমে। আসুন বড়কর্তা, খবর ছিমিলপী এসেছে, খাওয়া করে। আর দশটা-পাঁচটা লোক তার সামনে সম্ভ্রমে নজর তুলে দাঁড়াতে পারে না। স্টেশনের নতুন বড়বাবু যদি তেমন-ভাবে তখা না বলল ইজ্জত কোথায়! এ-স্টেশনে এসে তো এটাই নিয়ম প্রথম এই বড় একটা মানুষের সঙ্গে দেখা করা। তুমি নতুন বড়বাবু এত অহংকার কোথায় পাও হে। এবং আমার ফের দিকেব, বিলটু।'

একটা লোক কোথাকে মুহূর্তে মাটি ফুঁড়ে প্রায় যেন উঠে এল 'আজ্ঞে কর্তা।'

—এগুলো যা তুলে নে।'

যারা স্টেশনে সব দু-চারজন ছিল যেন মন্ত্রপূতে মানুষ এবং তাঁর, তাকালেই যো হুকুম, নিজের সব কাজে মাথার স্থলে নিতে গেলে অধীর চক্রবর্তী বলল, 'আরে কি করছেন বড়-কর্তা!' পুরোপুরি বাঙালী ভাষা, লোকেতো আছে, আবার ওরা কেন।'

বড়কর্তা তোলো তখা বললেন না। বিকেলে যে কি হবে! তখা বেলার জন্য অনেক বলা যায়। নতুন বড়বাবুকে দেখাটা দেখতে সময় লেগে যাবে, কার সঙ্গে আর সমানে সমানে বসে তিনি দেখবেন! এবং অধীর চক্রবর্তী

মাথা খেলা জানে কিনা, একবার জিজ্ঞেস করলে হয়, মনে হতেই বললেন, 'কিকেলে কি ভয়ঙ্কর অবীর! মৃগাঙ্ক তো বন্ধু মানুষ, সময় হবে না। অবীরকে পাঠিয়ে দিও।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'সাধু কিকেলে তিতির শিকারে যাবার তথা বুল দে।'

ওরা তবে আজই তিতির শিকারে বের হতে চায়। কিন্তু কিকেলে বাড়ি স্টেশনের ছোটবাবু বড়বাবুকে নিয়ে ফিরে হাজির হয়, তিনি বাড়ি না থাকলে ফিরে যেতে হতে পারে—এসব ভাববার সময় দেখা গেল ছেলে-পুলো মেয়ে দুটোকে প্রায় ঘিরে ফেল পাহাড়ে স্টেশনেই ছেয়ে ফেলে—অবীর কি ফেলতে পারে না, এরা কারা, কেউ হবে ঠিক। 'কারা অবীর?'

—'ওদের সাথে পড়ে।'

পড়ে যখন তখন তো খেল আসবে থাকবে। সন্ধে ঘাটে, খেল নজর সন্ধে ঘাস গজিয়েছে। তা ভাল। তিনি ঘর দাঁড়লেন না। বড়বাবুর মুখো-মুখি পড়ে গেলে হয়তো চেনা-জানার কাজটা সেদিনেই হয়ে যাবে। তবে আর দানি লোকের মান থাকে না। স্টেশনে এ-সময়ে তাঁর আসাই ঠিক হয়নি। দেখা হয়ে গেলে তিনি দুঃখিত না-বাড়ির পারবেন না। একজনের একটা নিজস্ব, দেখ বলতে বিলাস হবে —তিনি তার দুঃখিত দেরি করছেন না চলবেন। তখনই মনে হল, কেউ ফের ডাকছে। বিনোদবাবু, গার্ড, বিনোদ-বাবু। ওরে মশাই রবীনবাবু আজ-হত্যা করলেন কেন? সারাটা রাত যে তিনি ঘুমোতে পারেন নি, রবীনবাবুর আত্মহত্যার কথা মুখটা কেমন না জানি দেখাচ্ছিল—দিন কাল পাল্টে যাচ্ছে মশাই, মুখো মানুষের আর থাক: ঠিক না, সব পাল্টে যাচ্ছে। তিনি বললেন, বিনোদবাবু আমাকে ডাকছেন?'

—'শুনেছেন?'

—'কী?'

—'রবীনবাবু লাস কাটা করে গাছের।'

—'গাছের!'

—'গাছের।'

—'মরা মানুষ নিয়ে টানাটানি!'

—'গাছের হয়ে গেল লোকটা! ভূতুরে ব্যাপার!'

একবার মনের জলে দুটো অজগর ভেসে এসেছিল। এবং অতিকায় সেই পাইথন জাতীর সাপ দুটোর চামড়া তার শোবার ঘরে ঝুলতো থাকত। লোকজন এলেই তিনি সেই পাইথনের অতিকায় চেহারার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতেন, বলতেন তাঁর শিকার কাহিনীর কথা, ঐ যে দূরে বড় অশ্বত্থ গাছটা দেখছেন, বাদের জলে আড়ালহীন সাপ দুটো পাঁচ পেয়ে পড়েছিল। প্রায় জড়াজড়ি করে পড়ে থাকার মতো। কার একটা বাদুড় ঝিলে মাদি অজগরটা নড়তে পারছিল না। মারা। মারা জীবজন্তুর ভেতরও আছে। বুঝলেন না, মাদি সাপটা না নড়লে বাচ্চাটা মরে কি করে! সুযোগ এসে গেল। একেবারে ওকোড় ওকোড় করে দিলাম। তারপর। সেই দৃশ্যতার সামনে দাঁড়ান সাধ্য কার! প্রায় দুদিন খেপোছিল মরতে। পরপর গুলতা-বর্ষিত, অথচ মরে খেল যখন দুটোই জড়াজড়ি করে পড়ে থাকল।

তারপর সেই অজগরের ছাল দুটো সহসা গায়েব হয়ে গেছিল ঘর থেকে। ধলাদুগিল, পৃথিবীর ঘরটার অন্বেষণ খুঁজা গেল। পাওয়া খেল না। ঘরা মানুষ গায়েব হয়ে যাওয়া তো আরো ভুতুরে ব্যাপার! এবং অজগরের ছাল চামড়ার মতো বাতাসে ওটা তা হলে এমার ছেলে বেড়াবে। মাঝে মাঝে স্বপ্নে অজগর দুটো বাতাসে ভেসে আসে। তাকে গিলে ফেলতে চায়। স্বপ্নে এখন তিনি অজগর দুটোর সামনে লাঠি খেলা আরম্ভ করে দেন। এইসব ভুতুড়ে ব্যাপার খোলাখুলি একময় অচল। লাঠি যবে গড়াগড়ির থাকে না।

তিনি এবার হাতের লাঠিটা ঘুরোর ঘোরাতেন। সিল্কের লুঙ্গি, সিল্কের পাঞ্জাবী, কিছুদিন আগে সোনার একটা চেন থাকত গলায়—সৌখিন মানুষ। বড়বৌ, প্রেম ভালবাসা, এবং শালিকা মাদুরী সব বিগত ব্যাপার। শুধু সম্বল এই লাঠি। অথচ হিজল তার কিল নিয়ে বেশ আছে। স্টেশন আছে। বড়বাবু, ছোটবাবু সবাই আছে। কি মনে করে আজকাল সোনার চেনটা গলায় আর পরেন না। শরীর থেকে এক এক করে সব খুলে রাখছেন। তিতির শিকারে খেলে ভাল হয় না। চেনটা ছুঁইসিল দিচ্ছে। সন্ধে নিশান উঁড়ছে পোহনে। গাড়িটা লাফাতে লাফাতে প্লাটফরম ছেড়ে চলে খেল। সামনে একটা পর্বার মতো ঝুলে ছিল এই ট্রেন, এখন একেবারে ফাঁকা। শুধু আদিগন্ত মাঠ, বর্ষার জল, এবং নয় আর্দ্র বাদু বাদু করছে। ওদের সন্ধে ফেতে হবে। এবং কিকেলে, হিজলের ঝিলে নৌকা ঠিক। পাঠাতনে কম্বল পাতা। পালের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বেশ বড় তিনমাল্লা নৌকা। তিন জন মাঝি। আর ঘিলটাও অনেকদূর। বৃষ্টি নেই। আকাশ নীল, সূর্য মাথার ওপর থেকে নেমে গেছে। জোৎস্না উঠবে রাতে। হুহু হুহু সন্ধে বাচ্ছে। যে যার মত দামী পোশাক পরে নিয়েছে। বড়কর্তা শিকারের পোশাক পরেছেন। মৃগাঙ্কর সন্ধে বড়বৌর এক গল্প কেল ধনিষ্ঠতা ছিল' আসা-যাওয়া ছিল। কোথায় সব যে হারিয়ে খেল।

পালে বেশ হাওয়া লেগেছে! মৃগাঙ্ক অবীর এ-পাশে, মাঝখানে দুটো বন্দুক, এবং তিনি গলুইর দিকে। পাশের দিকে ফেরেরা ছেলেরা। ওরা অতিসয় তুচ্ছ ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। ফেন ঘেরি এলেই পড়ে ওরা লাফিয়ে পড়বে, তারপর ছুটবে। তবু সন্ধকারে ধরে ফেতে পারে। ফেন পাতলা ফেরেটা পরেছে লাল টলটলে জড়ের সিল্ক। জাপানী পুতুলের মতো ফেরেটি পরেছে সাদা সিল্ক। দুজনে দুজনে পরেছে দুর্লিবাবাদী। বাতাসে ওদের আঁচল উড়ছে। পাশে তিনজন সাদা হুকুর, এক মাথা চুল, চোখে উদ্ভাস। সহসা অকারণ ফেরে হেসে উঠছে। দুটো-একটা হাঁসকরা করছে নিচু গলায়।

মৃগাঙ্ক বলল, 'বড়দা আপনার শরীরটা ভাল নেই?'

—'না, না, ফেল ভাল আছি।'

—'একটা কথা বলছেন না!'

—'যার বলিস না। স্টেশনের নতুন বড়বাবু এসেছেন। সন্ধ্যায় দেখা করতে আসবে। চলে এলাম। বোধ হয় ঠিক করিনি।'

—'কোনো জরুরী ব্যাপার...'

—'জরুরী ফেমন কিছু না।'

—'যা...হু!'

তিনি ফেরেদের দিকে তাকালেন।

—'ওদেরো অবশ কি দুর্ভোগী করছে।'

এত তাড়াতাড়ি হয় কি ভয়। এই তো নৌকায় উঠে আসলাম। দুদণ্ড এরই ফেতর এত তাড়াতাড়ি! তিনি তাঁর গলায় বললেন, 'কোনো দুর্ভোগী চলবে না ভাইয়েরা। তাঁর খারাপ আছনা। নৌকা ডুবে ফেলে হাঙ্গরে-টাঙ্গরে খেয়ে নিতে পারে।'

মানু তাঁর মজার কথা বলছে।—'কত বড় হাঙ্গর মানু!'

—'বড়। খুব বড়। যাবা, কি বড় গহরর। ফেখলে ভয় লাগে।'

ওরা আরও মজা পাচ্ছিল। নয়ের মাথা অবীর বাইনোকুলারে কি দেখছে।

—'ওগুলো কি পাখি!'

মৃগাঙ্ক বলল, 'জল শিপিল।'

—'খেতে ফেমন।'

—'সুস্বাদু।'

—'তবে ধরে যাক।'

সন্ধে সন্ধে শ্রীনাথবাবু চমকে ওঠার মতো বললেন, 'আরে না না। বন্দুকের শব্দ শুনেই সব পালাবে। জায়গাটা ভো হবে। এখন দৃশ্যাবলী দেখো।'

—'যা...হু।'

আসলিকে কে আসল দৃশ্যাবলী দেখাচ্ছে! এরা কোথায় শিকা পায়! দুদণ্ডের সামনে তো ভাল মাছটি উঠে খেতে জানে না ভালো থাকতে হয়। আরে কি আছে ফেতর আমরা টের পাই না। বুকের ভিতে জল বোঁপ ওঠে। পুরো সব ফেখো। ধরতে যাও, ফেম কলা কর। অজগরে আবহাওয়ে। এত ভাল লাগছে কেন, ভিতের দৃশ্য, অথবা শালা মানুষের ভুলে, জলের বাস, তা তোমরা ভালই বোঝ। এবং সামান্য খিস্তির বাসনা জন্মাল। গর্জন্যায় কথাটা উচ্চারণ করতে পারতেন। কিন্তু মাথা উঁচা মাথা দরকার। পরক্ষণে ফেখেই, রবীনবাবু, সেই মৃত অজগরের লাস, এবং স্টেশনের নতুন বড়বাবু তাঁর জানাচ্ছে। সন্ধ্যায় বাঁধি আসে, তবে সন্ধ্যের দিকে তিনি নিজেই স্টেশনে চলে যাবেন। বলবেন, আরে স্টেশনের জন্য থেকে আছি। স্টেশন আর বাড়ি, বাড়ি না ভালাস, ভালাসই বলা ভাল—সব একসঙ্গে। বড়বৌ...।

এমন একটা উলঙ্গ পৃথিবীতে বাড়ি বড় সামান্যই হোক ভালাস বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। দু মহলা বাড়ি। ওদিকে প্রায় নদীর কাছাকাছি। ফেখানে পাড় ভাঙছে। নদী পাড় ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসছে। গ্রাস করার মতলব। ওদিকে কিছু বাদুড়ির বাস। ওরা পাড় ভাঙলে আরার সহজেই আবাস খুঁজে নিতে পারে। মৃগাঙ্কদের বড় বাড়িটা এ-অঞ্চলে আর একটা ফেখবার মতো বাড়ি। তবু প্রতিপক্ষ মৃগাঙ্কবাবুই তার সব। আন্তি-জাতা ফেনোরকমে দু বাড়ি বজায় রাখার চেষ্টা করছে এখনও। স্টেশনে বাবুগোছের মানুষ নাম্বলে বোঝা যায় দু বাড়ির কেউ হবে। আর সব চাষা-ভুষা মানুষের দল। হাঁস-মুরগি থেকে খাবার মতো তাদের অবস্থা। তবু এমন একটা জায়গা বড়কর্তা শ্রীনাথ-বাবুর যৌবনকালে বড় ভাল লেগে-ছিল।

তখন নৌকা বেশ চলছে। পালে আরও জোরে হাওয়া লেগেছে। ছপ ছপ বৈঠা পড়ছে। হালে অবিনাশ আছে। জলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। ছোট ছোট ঢেউ আর জলরাশির ভেতর দিগন্তের কাছাকাছি সেই ঘেরির ঘাস জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। প্রায় দু ফেরের মতো রাস্তা। প্লাটফরম, স্টেশনের লাল ইটের বাড়ি, সিগন্যালিং পোস্ট সবই চোখে ছোট হয়ে আসছে। বড় ছোট হয়ে আসছে তবো মনে হচ্ছে একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। গাড়িটা তারে ঝুলে ফেমন ফেন চলে যাচ্ছে দূরে। দূরে দূরে ক্রমে হিজলের জল স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। জোৎস্না রাতে ঘেরিতে বৌজনে বড় বৌ এবং তিনি, ছোট বইএর মতো আবাস। টুনের বাবা রত্নাবাত্রা করত। এখানে সাদা জোৎস্না খেলা করে বেড়ালে বড় বৌকে নিয়ে পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়াতে কি যে ভাল লাগত। সব মনে পড়ছে। এবং বড় বৌর সামান্য নক্সীদী ছিল বলে ভালই লাগত। বড় বেশি মহার্ঘ মনে হত। বড় বৌ...। মানুষী...।

—'মামা ঐ যে দেখা যাচ্ছে।'

তা দেখা যাবে। এখনই জলে ঝাপ দেবে না। খুব সন্তর্পণে নামতে হবে। ওরা টের পেলেই উড়ে যাবে।

এবং বড়বাবু হাতে সময় দেখে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ফেড়ে ফেললেন। তিতির শিকারে তাঁর ফৌশলী হওয়া দরকার। নতুবা একটাও পাওয়া যাবে না। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ফেতে হবে। ঘাসে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখতে হবে শরীর। মাথাঘাসের ওর প্রচণ্ড। বিবাস সাপেরা, সব মাঠ জলে ডুবে আর মলে ঘেড়িল পাড়ে উঠে আসে। তাদেরও গর্ত নতুন আবাস ওদের। ঘাসের

ছেলের যোগাযোগ করতে পারে এবং খুব নির্বিকার। বয়স মানুষ ঔদের দেখলেই অবাক হয়ে যায়। এরা কারা, সহজেই কেউ ধরে উঠতে পারে।

সঙ্গের কথা শুনে আরতি নড়ে চেপে বসেছে গেল। অধীর চক্রবর্তীর পাইপ খাওয়া বন্ধ। যেন নৌকা ছেড়ে তারা নামবেই না। দুন্দু বন্দু, মৃণালের অট্টহাস্য থামছে। এবং নৌকা ঝিকুলে দুন্দু বন্দু যখন নাবিয়ে পড়ে নেমে গেল, টানে টানে সেই তিনজন সব দুবেক নেমে গেল শিছু শিছু। মৃণালক নামল শেষে, এবং বাকি তিনজন বসে আর কেউ থাকল না নৌকায়। আসলে এক আশ্চর্য প্রলোভনে পড়ে যায় মানুষ। এমন ঘাস মাটি, ধানের চাষ, আর পাখির নিলয়ের আকাশে ওড়া দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি, জীবনেও তারা দেখেনি। কেমন মুহ্যমানের মতো আরতি বলল, 'আমার ঘরে ফেতে ইচ্ছে করছে কুসুম।'

একটু দূরে মৃণালক। অধীর চক্রবর্তী এগোচ্ছে। দুন্দু বন্দু আরও অনেক। নন্দু বোধ হয় খুব ভাল সোমালী, বাংলাতে ছাড়া বাবছে না। কেবল পেছনে তিনি, এবং কাছাকাছি আরতি আর কুসুম। আর তখন এমন সব কথাবার্তা ওরা গোপনে বলবে বেশি কি। মৃণালক হাতে ইসারা করলে সবাই বসে পড়ল, এর কাছে পাওয়া যাবে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে বলে পাখির ঝাঁকা ডাঙ্গায় নেমে গেছে। কতদূরে চলে গেছে ঘোলির পাড়, আরও দূরে অস্পষ্ট অন্য সব ঘোলি চোখে ভেসে উঠছে। মৃণালকই প্রথম ফরাস করল। ঘোড়া ছয়েক হবে উড়ছে, গোটা তিনেক ডাল উড়তে পারছে না। ঘায়েল হয়েছে, ডানা ছেড়ে লটপট করছে এবং ছোড়া ঘুড়ির মতো লাফা লাফনা করে পড়ছে। পাশে সব পড়ে পড়ে কুসুম অঙ্গল। অদূরে নন্দু নেমে গেছে। একটা ছোটাছুটি পড়ে গেছে। প্রায় দুটোর ঘাতায়ার মতো এমন লুটে সওয়ে করা। ওরা ছুটের ছুটের এক একজন এক এক দিকে নেমে ছেড়ে থাকল। অধীর চক্রবর্তী চিৎকার করছে, আরতি ঐ যায়। জঙ্গলের ভেতর পড়ে যাচ্ছে। অধীর মৃণালক অথবা নন্দু সব দিক সামলাতে পারছে না। ঘোলির মাঝখানে প্রায় দুটো পাখা তাসিয়ে পড়ে আছে। অধীর পালট খুলে ফেলেছে। ভাসিয়া পড়েই সে নাবিয়ে পড়ল জলে। মাঝিরা এ-সবে অনায়াসে সাহায্য করতে পারত। তিনি জানেন, একবার জানলে নাকি—অভিশাপ, যা মানুষের ভিতার ভুলে দিয়ে যায়। কিন্তু ওরা খুব দূরে এখন। একটা দূরে ছিয়ে তিনি খবর দিতে পারছেন না। আর এসেই এত সহজে ছিলে যাবে যে জানত। ঘোঁয়াঘুঁয়ি। তারপর তাক বুঝে, এবং অনেক কষ্টে-কষ্ট লোভাতে হয়। অধীর চক্রবর্তীর নাসিব ভাল। নতুবা এতদূরি এক-সঙ্গে। তিনি খুব দেখছেন।...বড় বৌ তিতিরের মাংস রান্নার সময় কখনও খাবিত। বিধবা মানুষটিকে নিয়ে সংসারে একটা অশান্তি। তিনি নিজে যা সহজে সহ্য করেছেন বড় বৌ তা সহজে সহ্য করে নিতে পারল না। হাতের বন্দুক ফুলে দূরের তাক করলেন। সব বারই দেখছেন মুখমণ্ডলের মুখে ভাবের হয়ে যায়। তিনি বন্দুক নাবিয়ে রাখলেন। এবং কিছুটা সাঁতারকের মুখো মানুষের মতো একটু ফাঁকা জায়গা দেখে ভেসে পড়লেন। তখন লটপট করছে একটা বড় পাখি। মাথা ঘুরে পড়ে ছেতে ছেতে ও আবার আকাশে ওড়ার চেষ্টা করছে। নিচে সেই আরতি আর কুসুম, এদিকে ছুটে আসছে। এই অতিকায় ঘোলির চারপাশে, কেবলে যে কেউ থাকি এমন ভয়া তিতির খুঁজে বেড়াচ্ছে। পড়ে পড়ে কাশের জঙ্গল, সেই ছেতু কারুর মাথা হাত পা দেখা যাচ্ছে। কখনও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দুন্দু বন্দু পর্যন্ত ওদিকের পড়ে সব গাছের আড়ালে পড়ে গেছে।

তিনি ডাকলেন, 'দুন দুন!'

ওরা কেউ জবাব দিচ্ছে না।

সূর্য অস্ত যাবে। তারপর জোৎস্না রাত। মৃণালক কি কাঁদ পেতেছে। খুড়ো মানুষ, অথচ অন্ধকারে—একটুতে যাবড়ে গেলে হালাহালি পড়ে যাবে।

তবু আবার ডাকলেন, 'দুন্দু বন্দু!'

কেউ কথা বলছে না। কেবল দূরে অধীর চক্রবর্তী জলে দাঁড়িয়ে আছে।

তা নন্দু পাখে দাঁড়িয়ে আছে। আরতি কেমন যন্ত্রণায় খুলো—এত কষ্ট করে বড়কর্তা, নন্দু, দাদাই তো তবু ছোড়া ঘুড়ি ধরার মতো আরতি আর কুসুম কেন পাঠা দিচ্ছে। যত দূরেই যাক, যত ঘন জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে পড়ুক, ওরা ঘরে আসবেই।

তিনি বসে থাকতে পারছেন না। শিছু শিছু নাবালকের মতো ছুটতে চাইলেন। অথচ পারছেন না। শিছলে পড়ে যাচ্ছেন। এবং কি হবে তিনি যেন জানেন। কাশবনের ভেতরে ওরা ঢুকে যাচ্ছে। হাত কুড়ি দূরে কাশ-বনের ভেতর পাখিটা পড়ে গেছে। এখন খুব খুঁজে দেখা। এবং ভয়ে ওরা সেই ঘন জঙ্গলে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকলে, তিনিও হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেলেন।

এক আশ্চর্য ঘোর শরীরে ছেয়ে যায়। আসলে সভ্যতার সেই শ্যামলা মেয়ে যেমন উদাম নগ্নতায়লায় নগ্নতে নগ্নতে চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল। হলাহলা জানে এরা। পাখি খোঁজার নামে এমন নির্বিবিলি একটা জায়গা, জঙ্গল কেনো অতিকায় অজগর বসি ছেড়ে আসে, আসলে তিনি এলতভাবে কাশের জঙ্গলে হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন, কেন অতিকায় অজগর হয়ে থাকার বাসনা তাঁর। ভিজে সব সব করছে।

পদ্মাবতী শালিগ্রাম

চোখ জ্বলছে। শ্যাপলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছেন আসল শিকার।

৪

পালে আবার হাওয়া লেগেছে। ঘুড়ে সব পাখিরা গলুইয়ে পড়ে আছে। ঢলার শরীর। কোনোটার ঘাড় ছেলে গেছে। কোনোটার দুখণ্ডিত ছিড়ে গেছে। কোনোটা এখনও পাখা ঝাপটাচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন, এরা একটাও তিতির না। সবগুলো বালিহাঁস। পুরুষ পরীর, সবুজ মাথা ছাই রঙের মেশামেশি। তিতির অত উঁচুতে পারে উড়তে পারে না। অত বড় হয় না।

মৃণালক বলল, 'বড়বা পোড়া তিনেক তুমি নাও।'

বড়কর্তা জবাব দিলেন না। যেন কেবার সময় তিনি নিজের ভেতর নেই। খুব বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন। চোখ সাদা, চুল সব সাদা, মুখ ফেকে গেছে। আয়না থাকলে বোধ হয় তিনিও দেখতেন মুখে সব বলিরেখা প্রকট হয়ে গেছে। জীবন বড় তারবাহী জন্তু। এবং বোধ হয় জয় আসছে।

অধীর চক্রবর্তী বলল, 'খেতে খারাপ হবে না।'

তিনি এবার বললেন, 'তিতিরের চেয়ে ছোট ভাল।'

দুবেতীরা সব দুই-এর ওপাশে। ওরা হাঁসফাঁসের ওপর উপুড় হয়ে আছে সেই টিলে দেখছে কিম আছে কিনা ভেতরে। আরতির জায়গার জায়গার শরীর কেটে গেছে। সে বকটা পায়ের শরীর ছেকে ফেলেছে। অধীর চক্রবর্তী দেখলে তাঁকে উঠতে পারে—আরতি হেরে শরীরে ওগুলো কিসের দাগ রে। তাঁচড়ে খামচে নিলে যেমন হয়। সে অবশ্য তার জবাব ঠিক ছেকেছে। ওগুলো বন্য কুসুমকাঁটার দাগ। কেটে গেছে।

জল সাঁতরা আসছিল, সবুজ সেই বন কয়েদ জঙ্গলে মুড় আদমের মতো চুপি চুপি তিনি দুবেক-দুবেতীর খেলা দেখছেন। অনন্ত অরণ্যের নিচে কালের বন দুলছে। মানুষগুলোর ভয় ভয় নেই তারো। কেমন এক অতীব আকাঙ্ক্ষা ছেতরে। এবং সেই জলে জঙ্গলে বন্দী চিৎকার হয়ে পড়ে আছে। জঙ্গলী জন্তুগুলির মতো চায় আবহমান কাল ভুলে গিয়ে ঘরে। এক আশ্চর্য শরীর, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। দুজন আদিম দুবেক-দুবেতী ঘন জঙ্গলের ভেতর কি যে সব করছিল। তিনি টের পাচ্ছিলেন ভয় আসছে। হেসে সব ঘরে যায়, অথচ তিনি টের পাচ্ছিলেন অক্ষমতা তাঁকে ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে। তাঁর ছেতরে ছটফট করছিল।

আরতি একটা ময়া হাঁস তুলে ওপরে ঝুলিয়ে বলল, এটাকে আমি আর কুসুম খুঁজে বের করেছি। পাখিটা হাতে ঝুলিয়ে ছেখেছে। একটা পা ধরে ছেখেছে আরতি। সবাই দেখছিল। আরতি বলল, 'সবচেয়ে বড়।'

কুসুম বলল, 'ছেতরে একটা অজগর ছিল।'

কুসুম কি তাকে দেখতে পেয়েছে। আরতি পড়ে ছিল যাদের ছেতর! তার দেখতে পাবার কথা না। উল্টে

পায়েই থাকছিল তুলল। নতুন বলে ঠিকঠাক জানা নেই—অথবা কতটা কিভাবে তুলে নিতে হয় তাও জানে না। জানও থাকতে পারে। সন্তর্পণে সে সব টের পেয়েছে হয়তো। এবং তখনই মনে হয় জলটা বাড়ছে। একটা বুড়ো মানুষকে ভয় কি। এবং ঠিক জড়পদার্থ ভেবে ফেলেছে হয়ত। অথবা এই সব সবুজ ঘাস জলজের মতো হয়ে ভেবে ফেলেছে।

—'জলজ!' নন্দু চমকে উঠল।

মৃগাঙ্ক বলল, 'জলজের তো ছেড়ে দেয়ে কাজ নেই।'

তুলল দুলতে থাকছিল ক্রমাগত ঘাসাগ্র শব্দ। সে বলল, 'সাঁতার। চোখ দুটো কেবল দেখতে পেয়েছি। ভীষণ জ্বলছিল।'

নন্দু ফুঁপে বলল, 'সাঁতার!'

অমল বলে কি হয় কেন, সে বলল, 'যা জানুয়া, থাকা বিচ্ছি না।'

অরবিন্দ চক্রবর্তী বলল, 'তুমি ঠিক দেখেছ?'

তুলল একটা পাখা ছিঁড়ে ফেলল পাখির। কম তুলকলা। বলল, 'ঠিক দেখেছি। সন্দেহ নেইনি। চোখ দুটো জলজের না হয়ে যায় না। মানুষের মতো মুখ।'

এবার অরবিন্দ চক্রবর্তী কেমন হা হা করে হেসে উঠল।—'তোমরা যে কি আজকাল হয়েছ। সব বাপারে ঠাট্টা।'

অরবিন্দ বলল, 'থাকতেও তো পারে।'

শ্রীনাথবাবু কেমন অবাক চোখে-মুখে তাকিয়েছিলেন। যেন শুনতে ভুল বলছেন, থামাও। আমি নেমে যাব।

এবং বয়সী লোক বলে মৃগাঙ্ক শ্রীনাথবাবুর পক্ষাবলম্বন হলেন, 'বড়দা তোমার কি মনে হয়?'

তিনি বললেন, 'হতে পারে। বলার কোথা থেকে কি চলে আসে কেউ বলতে পারে না।'

সবাই খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

নেমে যাবার সময় মৃগাঙ্ক অরবিন্দকে বলল, 'বড়দার বাড়িতে যেন যাবে।' প্রায় তিনটে বড় বালি-হাঁস একসঙ্গে ডেকে উঠল।

শ্রীনাথবাবু নেমে গেলেন। একটা কথা বললেন না। জোৎস্না রাত, স্টাইকারের বাড়িগুলো জেলাকি-লোকার মতো জ্বলছে। সোজা তিনি উঠে যাবেন ভাবলেন। এবং কিছুটা পাল্টিয়ে, যদি স্টাইকারে যোগাযোগের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাকে হয়তো ডেকে নিয়ে যাবে, এই যে জলজের বড়কর্তা, স্টেশনের প্রথম থেকে সব দেখে এসেছেন। কত খবর জানে হিজলের।

তিনি সোজা গেলেন না। ঘুরে ঘুরে প্রায় এক ঘন্টা জীবন থেকে যেন ফিরে এসেছে। সেখানে উজ্জ্বল প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে নিজের চোখ থেকে হারিয়ে গেল। ঘুমের মানুষটার জন্য করুণা আর আর কোনো টান নেই। এবং তখনই মনে হল সাঁ সাঁ বাতাস বইছে। নীল নক্ষত্রমালার নিচে প্রবল অঙ্কের মতো বাতাস হিজলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। কোথা একাকী, ঘুরে স্যাটেলাইন, কোয়ার্টার এক রোলিংয়ে দু একজন বাসী হয়তো, স্পষ্ট কিছুই নেই, সামনে ইট সুরকির পথ, কতদূরে কেন চলে যেতে—শেষ নেই এবং তখনই মনে হল, পরের হয়ে যাওয়া লাস রবীনবাবু বাতাসে ভেসে আসছে। পুলিসের জাহত পাখির মতো বাতাসে লাটস্ক করছে। তিনি মুখে টের পান, আসছে। দ্রুত ছুটে আসার সময় হাতের লাঠি ঠিক তরবারির মতো উঁচিয়ে রেখেছেন সামনে। ভেতরে ঢুকেই ডাকলেন, টুনে, টুনে!

সেই মাটি ফুঁড়ে উঠে আসার মতো টুনে ঠিক সামনে হাজির। তিনি অপলক তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর কি ভেবে যেন বললেন, 'বড়-বাবু এসেছিল?'

টুনে বলল, 'আজ্ঞে না হুজুর।'

জ্বলন্ত জোৎস্না তখন বাড়ির চার-পাশে শিহরণ বয়ে। দুটো একটা পাখির শব্দ শুনলেন। লাঠি কুলিয়ে নিলেন বরজার পাশে। জামা খুলে পাল্টে খুলে সেই সিল্কের লুঙ্গি পড়লেন। তা হলে এল না। চুপচাপ ইজিচেয়ারে বসে থাকলেন। টুনে চামচে দিয়ে গেল। চা খাবেন কিনা, সন্ধ্যার চা খাওয়ার অভ্যাস, দেরি হয়ে গেছে বলে যেন বলা, চা চলবে কিনা জানতে—তিনি হাঁ বা হুঁ কিছু বললেন না। কেবল যেন একটা ট্রেন দ্রুত চলে আসছে। ট্রেনে করে তার কোথাও যাবার কথা।

ভয়ে তিনি মাংসের গন্ধ পেলেন। শিকারের পাখি রান্না হচ্ছে। কেন জানা কাল গন্ধ মনে করছিল। কেমন ধরা পড়ছে তার। কিছু ভাল লাগছে না। বসে ছাদে বসলে সব থেকে দূরে থাকবেন ভেবে ওপরে উঠে গেলেন। কেমন মাতাবী এক জলজ চারপাশে। বড় একা। কেউ কাছে নেই। নিচে দুদু দুদুর গলা পাওয়া যাচ্ছে। সেদিন দু টুকরো মাংস ওরা ভেবে খাচ্ছিল বোধ হয়। বৌমা একবার উঠে এল। এখন খেতে দেওয়া হবে কিনা, না আরও পরে—এ সব বললে, তিনি বললেন, 'ক্ষুধাতো তার নেই বৌমা। কিছু খাব না ভাবছি।' তারপর কি ভেবে একা একা নিচে নেমে গেলেন। তেমনি লাঠিটা হাতে। এখন পৃথিবীর কে কোথায় কিভাবে বেঁচে আছে দেখার বাসনা মুছি।

একটা লোক তখন জলে ঝাঁপিয়ে, নদী এবারে প্রবিল পাড় ভাঙছে। কে লোকটা! জোৎস্নায় স্পষ্ট টের করতে পারলেন না। দুপাশে এখন বনের ঘাট। মনে এই ঘাটটা। স্টেশনের দিকে উঠে গেছে। আজ সন্ধ্যাবেলা ছেলেবাবু এলেন না, বড়বাবু এলেন না। তাঁর জন্যেই যেন চোখ দুটো লাল হয়ে উঠছে। স্টেশন, স্যাটেলাইন, জোৎস্নায় হিজলের সব পুরোনো গল্প তাকে মাতালের মতো অস্থির করে তুলছে। এই প্রথম একজন বড়-বাবু স্টেশনে এসে তার সঙ্গে দেখা না করে নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন।

পাশের কোয়ার্টারগুলোর দরজা বন্ধ। তিনি হেঁটে যাচ্ছেন, অথচ কেউ দরজা খুলে দু দণ্ড কথা বলার জন্য আসছে না। স্টেশনটা কেমন নীরব। প্ল্যাটফর্মের নিচে পয়েন্টসম্যান চুপচাপ বসে আছে। দু একজন লোক ইতস্তত ঘুরছে প্ল্যাটফর্মের ওপর। আর কোনো শব্দ নেই, না কোনো ট্রেনের, না কোনো মানুষের। হিজলের ঝিলে দু চারটে জেলে নৌকা আছে মাত্র। নিশীথে লণ্ঠন দুলছিল নৌকায়। আর একটু হেঁটে গেলে বড়বাবুর বাড়ির। কেমন এক আকর্ষণে তিনি দ্রুত করে বড়-বাবুকে দেখতে চলে এসেছেন।

তিনি কাউন্টারের সামনে মুখ রেখে আড়ালে দেখছেন বড়বাবুকে। ঘর সাদা আলো। সব বর্ষাতি রাজত কাঁটা-পতঙ্গ এসে জড়ো হয়েছে। দুজন-

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়


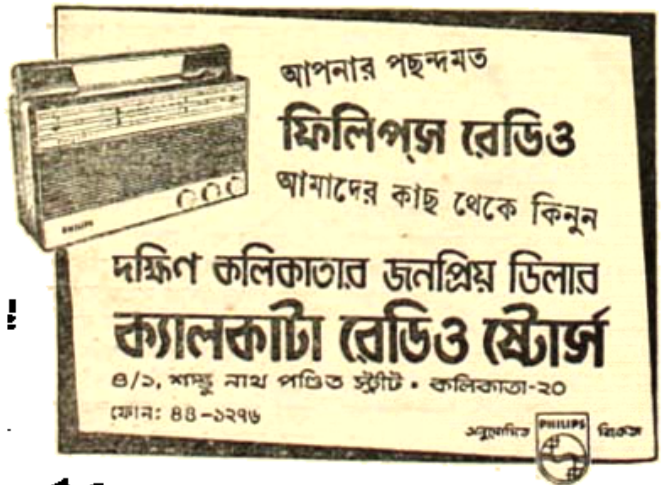



সার্ভিসিং এবং মেরামতেরও ব্যবস্থা আছে

মতো মানুষটিই বড়বাবু। বেশ দেখতে। মুখোমুখি বসে আরও সুন্দর। পেছন থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শুধু তিনি জানেন, একজন ছোটবাবু হবে, অন্য কে অন্য আর। বোধ হয় লোকটি তার অপরিচিত। চোখ বুজতে গেল তার। এরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। এখন একটা বাজতে তিনি একা। অন্য সব দিনের মতো তার বৈকেলবানার দাবা অথবা পাশাখেলা, কখনও চা, কখনও খাবার, সবার জন্য তিনি, সবার জন্য আজ পাঁচিশ মাসে হতে পারত।

ছোটবাবু সহসা মুখ ফেরাতেই মনে হল, কেউ চলে যাচ্ছে। মনে হল, সেই অরুচিকর মানুষটি—বড়কর্তা।

—আরে বড়কর্তা যে! আসুন আসুন।'

ছোটবাবু দেখছেন, ধীর ধীর করে হাঁটছে মানুষটা। লাঠিতে ভর করে হাঁটছে। সেই জোর আর নেই। বেতের থাকার তাকে ইচ্ছে মানুষের মতো দেখে যেমন হয়ে থাকে। সে বলছে থেমে :—'বড়কর্তা।'

শ্রীনাথবাবু দাঁড়ালেন। হাতের লাঠিটা জোর করে মেঝেতে চাইলেন, তখনও বুড়ো হননি। প্রায় যুবকের মতো এখনও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন।

—চলুন বসবেন।'

বড়কর্তা কিছু বলছেন না।

—আজ স্টেশনেই বসেছি। সময় হাতে নেই।'

সময়, কিসের সময়, কার সময়, সময় খুব দামী বুঝি!

—হেড অফিস থেকে মিঃ চৌধুরী এসেছেন।'

—জ্ঞ।' বড়কর্তা একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেললেন।

—আজ কথা ছিল আমার। চৌধুরী আসায় আর যাওয়া হল না।'

—জ্ঞ'। বড়কর্তা যেন সবটা এতক্ষণে বুঝতে পারলেন।

—চলুন, এবার না হয় স্টেশনেই আলাপ হোক।'

—থাক না।' তিনি বিড়বিড় করলেন।

—আপনার কথা বলেছি। বলেছি, ঐ যে বড় বাড়িটা দেখছেন, ওটা আমাদের সবার বড়কর্তার বাড়ি। স্টেশন, স্টেশনের মানুষগুলো তাঁর প্রাণ। বিপদে আপদে তিনিই আমাদের সব।'

কিছুটা বুঝি হালকা বোধ করছেন শ্রীনাথবাবু। এখনও তিনি কম মহান নন। ভেতরে ঢুকে আলাপ করলেন বড়বাবুর সঙ্গে। বড়বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তবু চলবে ছেড়ে পারেনি বলে দুঃখ প্রকাশ করল। বলল, 'সময় করে উঠতে পারিনি একেবারে। জানেন তো সুরেশ, সবার আগে টেন পাস টেন কতদূরে আছে—কত লেট হবে।'

বড়বাবুর কিছির বিজ্ঞতা কেটে গেল। তিনি বললেন, 'এতদিনের একটা আসরে।'

ছোটবাবু বললেন, 'স্টেশনের যা কিছু সবই এঁর হাতে। সবই তো বলেছি।'

ছোটবাবু তবে সবই বলে দিয়েছে। কতকাল আগে একটা অন্য মতো কাজের ভার নিয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন। চুরি সেব হলে কাজকর্ম ছেড়ে ছেলের বড়লাহের কর্মোছলেন, আরে ধনাই ছড়েছেন তি। একেবারে ছবির মতো দেখতে সব কিছু।

—বাড়িটাও এখানে করে ফেললাম। আর কোথাও যাব না ভাবছি।'

বড়সাহেব দেখেছিলেন, শ্রীনাথবাবুর সুন্দর বাড়ি। এমন একটা জায়গায়, এই স্টেশন এবং বাড়ি যেন এক নিসর্গ ছবির মতো। শ্রীনাথবাবুর মুক্তির তুলনা করেছিলেন।

আসলে ওরা কেউ জানে না, একটা মানুষের ভেতর মানুষের কখনও কখনও অতীব গভীর এক প্রেরণা থাকে। হয়তো এই ছিলেন বিল, এবং তার বন্য স্বভাব, অথবা বর্ষার তাকের জলরাশি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

বড়বাবু শ্রীনাথবাবুকে চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বলল, 'ইনি এসেছেন অনেকদিন। কাজকর্ম ছেড়ে গেল। একেবারে সময় করতে পারলাম না।'

মিঃ চৌধুরী উঠে দাঁড়াল তখন। বলল, 'বসুন। কাল যাব ঠিক করে রেখেছিলাম। এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা হবে না সে ঠিক না।'

বড়বাবুর ভেতর কিন্তু-কিন্তু ভাব যে একটা বাজছিল, ওটা ঠিক কম আসছে। এরা কাজের লোক। অহেতুক সময়ক্ষেপ খারাপ। আর তখনই বড়বাবু বলল, 'মিঃ চৌধুরী এসেছেন ছিলেটে সপ্তাহ করতে...ওরে বয়াল কোথায়...চা আনা...বড়কর্তা এসেছে...'

ঘরে নানা বর্ণের ফাইলগুলো উঁকি মারছে। বাইরে তেমনি জোৎস্না। ভেতরের আলোয় ছেলেটের সামানা করে সহসা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। আর তখনই বড়বাবু বলল, 'স্টেশন এখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা হচ্ছে। ওদিকে গলদা এদিকে আসছে, এদিকে মহকুমার কাছাকাছি এরিয়া, যে-কোনো সময় বিপর্যয় ঘটতে পারে।'

চৌধুরী তখন কথা বলছে। কিছু চুল কপালে। সামান্য হাওয়ায় চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। মুখের ওপর এলোমেলো চুল ঝাপসা মতো। যেন ওটা অন্ধকার একরকম জাল বুনে যাচ্ছে মুখের ওপর। শ্রীনাথবাবুর চোখে ছবি সব অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মাথার ঘাম পড়ার মতো তিনি শক্ত হয়ে গেলেন। সব কিছু প্রবাহ মুহূর্তে কেউ যেন থামিয়ে দিয়েছে। শরীরে বিন্দুমাত্র আর শক্তি নেই। আড়ষ্ট। এবং কাঁপছিলেন। লাঠিটা খুঁজে পেলেন পরক্ষণেই। উঠে দাঁড়ালেন।

—আচ্ছা উঠি। কাল যাবেন।'

কোনো দিকে তাকালেন না। সামনে সেই দৃশ্যের দ্বিরুক্তি। এবং ঘুরে এক অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষ তিনি। স্টেশনে হাট বসেছে। জমজমাট। তবু জোৎস্নার একবার ছাদে উঠে দেখ যাবের মতো কেন জানি দেখার ইচ্ছে, হিজলের এই স্টেশন, এই মাঠ, গাছপালা, অথবা জীবনযাত্রার সুখ। বাতাসে কি সব একে একে ভেসে আসছে। তিনি স্থান নিতে পারছেন না। বুকে তারি কষ্ট। হাতে উঠেছেই মনে হল হাত দুই ওপরে আকাশ। অনেক কাছে নেমে এসেছে। লাঠি তুলে আকাশ ছুঁতে চাইলেন। পারলেন না। কেবে বললেন, 'জীবন বড় ভাবনাহীন জন্তু হে।' এত কাছে আকাশ অথচ ছুঁতে দিতে পারছেন না। 'বুড়ো অথর্ব হয়ে গেছি।' কেঁদে ফেললেন তিনি, বৌমা, খুব খুন্দু, আই থ্যাম ওল্ড। আমি বুড়ো হয়ে গেছি।' লাঠিটার ওপর এবার তিনি সাঁতা নির্ভর করার জন্য ঝুঁকে দাঁড়ালেন। মাথার ওপর তেমনি আকাশ, নীল নক্ষত্রমালা, রহস্যময় শূন্যতা।

* * * *

জীবনের শেষ চিত্রকল্প এমনি হওয়া উচিত। যদি আপনার পরিকল্প চিত্রকল্প দেওয়া হয় তবে যেন একটি হাত হাতে লম্ব লাঠিটা যেন সব সময় মাটি স্পর্শ করে থাকে। আর আকাশটাকে হাত থেকে হাত দুই ওপরে যেন দেখানো হয়।

শেষ—

সংগীতালেখ্য 'আমার চোখে'-এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সুকুমার মিত্র, শান্তিদেব ঘোষ, সলিলবন্ধু ঘোষ, অরুণকুমার ঠাকুর, পূরবী দত্ত ও অরুণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সংগীত পরিচালক সত্যজিৎ তত্ত্ববধায়ক।

# উৎসব

## ভারতীয় ঐতিহ্যের এক অঙ্গ বিশেষ

স্বাস্তিক শিকাকাই শ্যাম্পু সারায়

ভারতীয় নারীর মনোহর

সুন্দর চুলের ঐতিহ্যের রহস্য

# উপন্যাস

# প্রবাস

## সূচী


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| সপ্তরথী—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ৯৩ |
| সময় অসময়—আশাপূর্ণা দেবী | ১১০ |
| নিলয় না জানি —সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ | ১৩৪ |

— প্রচ্ছদ শিল্পীর —

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

# সপ্তরথী

বিকেল হয়ে গিয়েছিল। তারপর বেলাটা কেটে গিয়ে একসময় রোদ ওঠে। তারপরেও এক পশলা হয়ে গেছে। হারান দত্ত লেনের প্রায় আধখানা জুড়ে ছপছপ করছিল।

পর পর কটা গাড়ি সেই জলের উপর দিয়ে চলে গেছে।

ছুটো আশ্বাসাতার, ছুটো ডিমটে, একটা জাঁদরেল।

এ-পাড়ার কার কেন্ গাড়ি সকলেরই জানা। গাড়ির চাকা জল ছিটিয়েছে মন্দ না। ফলে দু ধারের পর পর কটা বাড়ির রক বারান্দা ও পাঁচিলো গায়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত জলের দাগ লেগে ছিল। তার সঙ্গে ছেলে ছেলে ঠান্ডা হাওয়ার কাপড়টা ঘরে গেছে।

তা হলেও একেবারে সন্ধ্যার পা ছেড়ে রেখে ওঠা বিকেলের ঘরোটা ভালোবাসা ছিল। অন্য রকম মনে হচ্ছিল সব। এমন এক একটা বিকেলে হারান দত্ত লেনের বুকে পরোট হয়।

মনে হয় না মলয়ানের প্রথমের গাঁলি। কম্পুট অনেক দিনের রাস্তা। শাওলা ধরা সেঁতসেঁতে চেহারার মস্ত সব বাড়ি দুপাশে। দুটি দোকান হেমেতাজ্ঞা কেরোসিন, মিষ্টির দোকান, লঙ্কির দোকান, ছেলের কাটিং সেলুন, ছোটোপাটি ডিসপেনসারী, চায়ের স্টল। ছট কি নিয়ে হারান দত্ত লেন। ওদের ডাক্তারের চেম্বারও আছে এ-পাড়ায়।

তবিন একটানা ঘণ্টা চলায় বহুন রাস্তাটায় এমন লক্ষ্মীছাড়া শ্রী ফিরে হয়েছিল না! মনে হচ্ছিল বোঁয়া ওঠো দুপুরের নরক।

বাস্, এক পশলা বৃষ্টির পরেই আবার তাজা টাটকা চেহারা। এই জন্যই হারান দত্ত লেন তার এত প্রিয়। পুরোনো হয়েও পুরোনো হয় না।

বৃষ্টিটা ধরে সন্ধে সন্ধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নরনচাঁদের হেয়ার-কাটিং সেলুনে ঢুকে ছুল্টা কেটেছে সে। দাড়িও কামিয়েছে।

এতবড় ঘটনার মনে চলে লাগছিল না। ঘটনার জুলপি সব পরিষ্কার করে ফেলেছে।

অনেক দিন পর বৃষ্টি হয়েছে। কেন এই জন্য অনেক কুর্তিতে নিজের চেহারাটাও সে বদলে ফেলল। কালোর ওপর চেহারাটা কিন্তু খারাপ না।

নরনচাঁদের আয়নাতে মুখটা দাখাটা দেখার পর মোটামুটি খুশি হয়েছে সে। খুশি হয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে পিন্টুর চায়ের দোকানে ঢুকেছে।

না, তার আগে হারুলের দোকান থেকে সিগারেট কেনাটাই কিনে নিয়েছে।

ইচ্ছে ছিল পিন্টুর 'জয়-মা-তারা' কেবিনে একটু বেশি সময় বসে চা-টা খাবে। ইচ্ছেটা পূরণ হয়নি।

খরচ মানুষে বেশি ছিল না। দোকানে সন্ধ্যার পর চায়ের দোকানে বুড়ো হাবড়া খদের ভূমি কোনো দিনই বড় একটা দেখবে না। বুড়ো হাবড়া কেন। মাঝারি বয়সের ছেলেরাই বা কটা চোখে পড়ে। তারা কিনেন বিকেল চেনে। সন্ধ্যারাত দাদার সঙ্গে সঙ্গে চা খেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর 'জয়-মা-তারা' কেবিন চায়ড়ানের হুল্লোর চলে যায়। রাত নটা পর্যন্ত হৈহল্লা আর থামতে চায় না।

তা বলে যাবার দাবার যে তখন খুব বেশি বিক্রী হয় তা নয়। কেবল চা—চা। তা-ও দেখা গেছে এক কাপ চা নিয়ে একটা টেবিল ঘিরে পাঁচ-সাত জন বসে গল্পগুজব করছে।

পিন্টুর দোকানে চা কাটলেট ডিম মাসে সবই হয়। যা যা ভটবের দিনের বেলায় কেটে যায়।

সন্ধ্যার পর কেবল আওয়াজ। চায়ড়ানের জিভ্। এক কাপ চা নিয়ে এক একজনের দু-তিন ঘণ্টা সেঁজানো। এখন নিজেকে সে বড়ন মানুষের দলে ফেলে। যদিও হিসেব কোনোদিন পা মেলাবি। আটান। আটানেরও নিচে। সাতান পুরে কয়েক মাস মাত্র। কিন্তু তাতেই তার মনে হয়, বেশ কিছুটা পেরিয়ে এসে গেছে সে।

এমনটা মনে হবার কারণও আছে।

বেলা-সাতেরো কুড়ি-বাইশ কি চব্বিশ-পঁচিশ বয়সেও এক একটা ছেলে কত বেশ কথা বলতে পারে, ছুটোছুটি করতে পারে, আড্ডা জমাতে পারে—সে তা পারে না। ইচ্ছে থাকলেও না।

আড্ডা জিনিসটাই ভুলে গেছে। এখন নিরিবিলি থাকতে ভালবাসে। চেঁচিয়ে কথা বলতে, হাত-পা ছুড়তে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সিনেমা ফুটবল বা ক্রিকেটের গল্প নিয়ে মেতে থাকার কথা ভাবতেও যেন ওর বেশ লাগে।

দোকান আসবের দিক থেকেও তাই। এই যে একটু আগে চকরা-বকরা জামা প্যান্ট পরা এক ফর্সা ছেলেকে পিন্টুর দোকানে আসে রেকর্ডের একটা হিন্দী গানের সঙ্গে তাল ঠুকে টেবিল চেয়ার বাজাতে দেখে এল, তাদের মতন ছ-সাত সাট বা পোঁছ কি পাল্ট বা জুলপি ও পায়জামা পরে দোকানে ঢুকতে পারত কি সে! না এই সেলাক নিয়ে রাস্তায় বেরোতে তার মনে থাকত?

সবকিছই যে অন্যরকম হয়ে গেছে। চোখটা বদলে গেছে। এই তো টেবিলে টেবিলে খুচরো বাবরি আর জুলপি আর ব্রহ্মরন্ধ্রের দোক দেখে এল।

অথচ আজ এক পশলা বৃষ্টি হল কি তার মন বলল, নরনচাঁদের 'নন্দন-কাননে' চলো। মাথাটা খুচরো সাফ করে এসো। নরনচাঁদ রসিক ছেলে। হেয়ারকাটিং সেলুনের এমন অমায়িক মানুষকে ছেলেই বেশী হয়। বাইশ ছেলেদের বেশি বয়স না। তার চেয়ে পৃথিবীটা একটা রঙিন কেন্দ্রে। যা সারাক্ষণই হাওয়ায় উড়ছে অনুমত করছে। বাবা কিনকাটা আয়া ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে বেকারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। বয়সা আনালার নতুন রং ফিরিয়েছে। ভিতরের চামড়ে দেওয়ালের কলি ফিরিয়েছে অনেক মতন করে। এদিক ওদিক জমকালো পর্দা খাটিয়েছে। বাবার আমলে নাম ছিল 'পল্লবের হেয়ার-কাটিং সেলুন।' নরনচাঁদের মন উঠে না ওই নামে। নতুন করে এ পাড়ার আর্টিস্ট শচিকে দিয়ে বড় করে সাইনবোর্ড লিখিয়েছে। রাতারাতি 'পল্লবের হেয়ার কাটিং' 'নন্দনকানন' হয়ে গেল। ছোট কথা। অথচ কেমন মানানসই নাম।

হু, আমার মাথাটা আর ছাড়বে না, জুলপি দোক ছেড়ে কেলবে—তার কথাটা শুনে নরনচাঁদ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, হেসেছিল। হাসা কেন বুঝতে পারে নি সে? মুখ ফুটে কথাটা বলেনি ঘটিবিশা নরন—তবে নরনের চোখের চিত্তর এমন একটা ভাব কবারই কিকিরে উঠতে দেখেছে সে। কিছুটা চুল ছেঁটে ফেলার পর আরসি ঘুরিয়ে নরনচাঁদ তাকে তার মাথার পিছনটা দেখাচ্ছিল। আরসি থেকে চোখ সরিয়ে দু চোখ বুজে নরনকে সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলেছে—ক্লিপ্ চালিয়ে যাও নরন। আয়নো ছোট করে ফেল চুলটা। বাবরির বোঝা আমি একদম সহ্য করতে পারছি না।'

শুনে শেষ পর্যন্ত নরনের মুখের হাসিটা কেন মিলেই গিয়েছিল। চুল ছাঁটা শেষ করে হাতের ক্ষুর বাগিয়ে নরন তার দোক দাড়ি ও জুলপি জোড়া নির্মূল করেছে। এমন বয়সের জুলপি ও দোক চেছে পরিষ্কার করতে নরনের মনে কষ্ট হচ্ছিল। কেননা চোখের ওপর নরনচাঁদ দেখছে আজকাল ছোঁড়ারা অনেক সাধ্যসাধনা করেও দোকেনদা-এ ঘটনে এতবড় চুল দাড়ি ও বাহারের জুলপি গজাতে পারে না।

হু, তার নাম সোকেন—সোকেন পাইন। বয়স মেহাই সাতান। সাতান বছর কথাস। আজ বিকেলে বৃষ্টি হতে চুল ছেঁটে দাড়িদোক কামিয়ে পিন্টুর দোকানে বেশ করে এককাপ চা খেয়ে নিয়ে,তখন নিরিবিলি এই হারান দত্ত লেনে তাদের বাড়ির সামনে রকটায় চুপচাপ বসে সিগারেট টানছে একলা। মাঝে মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় তার। উপায় নেই। তা বলে চোকড়ানের দলে মিশতে নাকি। তবে আর চট করে চা-টুকু শেষ করেই 'জয় মা তারা' কেবিন থেকে বেরিয়ে এল কেন। হিন্দী গানের রেকর্ডের বাজনার সঙ্গে তাল ঠুকে ওরা চেয়ার টেবিল বাজিয়ে পাল্লা মত করছিল। ওরাও এ-পাড়ার ছেলেই। চেনাজানা মুখ সেনা। তবে কিনা ওদের আনন্দের সঙ্গে তার পরিচয় কম। সেই কারণে সেল। চোখ থেকে টানিল। বৃষ্টি থেকে চব্বিশ-পঁচিশ—সবাই আজ কেমন অচেনা-অচেনা ঠেকেছে। কেন দূরের মানুষ সে।

তবে কি তার একদিন চোদ্দ বছর বয়স ছিল না! হারান দত্ত লেনের ছেলে। নিশ্চয়ই ছিল। চোদ্দ পার হয়ে এসেছে সে। ষোল পার হয়ে এসেছে। কুড়ি চব্বিশ হাঁপিয়ে। মুখের ওপর ঘাম কেটে কেটে বয়স-গুলি এগিয়ে গেছে। যেমন বাতাসের ওপর ঘাম কেটে গাছের বয়স বাড়ে। রেসের ঘুড় বদলে বদলে দিন বুড়ো হয়।

আশ্চর্য, নিজেকে সে কেন যে বুড়োর দলের ভাবে। ভেবে মনে মনে হাসে বরিও। পৃথিবীর চোখে এখনও সে সাবোহিক হবো। পৃথিবী কেন। ঘরের মানুষে জেঠিকে দিয়েই ভাল বোঝা যায়। জোয়ান ছেলে বাপ ছেলে সোকেন। মাঝখান জেঠির মুখের এক মুদি। অর্থাৎ জেঠি বলতে চায়, সোকেনের পিতায় পিতার বয়স বড় উপবস করছে। চোখে পাহাড় ডিপোবার স্বপন। মনের অন্য কুকুরের মস্তিষ্কাণিতা। তবে কেন সে এমন নিরিবিলি চুপচাপ! মুখ বেজার করে রাখা!

মনে দুঃখ নিয়ে না—ইচ্ছে করেই যে সে এমন গম্ভীর হয়ে থাকে, জেঠিকে বোঝাতে পারে না। কাউকে বোঝাতে পারে না। কাউকে বোঝাতে চায়ও না সে। তার যে চোদ্দ বছর বয়স ছিল, ষোল বছর বয়স ছিল এটা যখন সকলের জানা আছে, তখন কাউকে কিছু বলার দরকার পড়ে না।

চোদ্দ থেকে ষোল যখন বয়স ছিল, তখন সে একলা ছিল না। অনেকজন সঙ্গী ছিল তার। সপ্তাহটুয়ে নিয়ে তিন মেয়ে মেয়ে হারান দত্ত লেনের লাইট-পোস্টের মাথার অদৃশ্যিত বাল্বে ভেঙেছে। লোকের ছবের কার্নিসে বসে থাকা সোনা পায়রা মেরেছে। লেটার-বক্স কুটো করে চিঠি চুরি করেছে। তখন হারান দত্ত লেনে হাস-বিহারী কবিরাজের বাড়ির সামনের একটা কবরীফুল গাছের ডালে লাল টুকটুকে টিনের ছোট্ট লেটার-বক্স ঝুলত। এখন পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কবিরাজের বাড়ির উল্টো দিকে বকুল গাছের বেশন সঙ্গের গায়ে ইট-সিমেন্ট দিয়ে বকুলের মতন প্রকাণ্ড মোটা লেটার-বক্স ঠোকর হয়েছে। ঐ টিনের কুটো করে চিঠি-পত্তর চুরি করা আজকাল মুশকিল।

আজকের ছেলেরা এমন ছেলেমানুষি দুষ্টুমি করে কি না তা-ও সে জানে না। তবে তারা করে। সেই আন্দাজ। সে ও তার সঙ্গীরা।

না, সঙ্গীরা আজ কেউ নেই। ভদের এক একজন কোম্পানীর চাকরি নিয়ে কোলকাতাটোর চলে গেছে। বাকি যারা কোল-ঘিলেন্ড আছে। কিসল জায়গাের খালাসী হয়ে সমুদ্রে

সমুদ্রে ভাসছে। অনন্ত ইথারনিয়ার হয়ে আর্মানীটায় আছে। অবশ্যি আছে আসামের চা-বাগানে। মনোযোগ দিয়ে ডাক্তারি করছে সেখানে। প্রবীণ মারা গেছে। মারা গেছে? যাঃ, একটা মানুষকে যখন শ্মশানে পুড়িয়ে আসা যায় তখন তার মৃত্যু সম্পর্কে, তার কথার মধ্যে ছলে পড়লো কেমন—কেনোরকম সন্দেহ থাকতে পারে নাকি! সন্দেহ থাকা উচিত নয়। অথচ প্রবীণের মৃত্যুটা মনে পড়তে তার কপাল কুঞ্চিত হতে থাকে। আঙুলের ডাকে ঘরে রাখা সিগারেটটা আর টানা হয় না। পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একটানের জন্য মুখ থেকে সেটা ছুড়ে ফেলে দেয়। বিয়ে অসম্ভবই করে। তা না হলে একটি তার আঙুলে ছাকা লাগত।

কেন ঐ ছাওয়া ছেলে ক্রমে ক্রমে ছাই হয়ে যাওয়া সিগারেটটার সঙ্গে প্রবীণের মৃত্যুর সম্পর্ক আছে। দুশ্চিন্তা! মারা গেল, তারপর তো লোকটাকে শ্মশানে নিয়ে গেছে চিতায় তোলা হয়েছিল। বাবা মুখাগ্নি করেছিল। চব্বিশ বছরের আইবুড়ো ছেলের মুখাগ্নি পুরোপুরি বাবু ছাড়া আর কে করবেন!

কয়েকই কথা হচ্ছে, শ্মশান, চিতা, মুখাগ্নি—তারপর পুড়ে পুড়ে সরীরটা ছাই হয়ে যাওয়া। কিন্তু আসল যে প্রশ্ন—লোকটার মৃত্যু হল কি করে? পুরোপুরিবাবুর চব্বিশ বছরের ডাকাড়া জোয়ান ছেলে প্রবীণ বানার্জির!

এই সাধো, দুনিয়ার লোক জানে সে-কথা, সব চেয়ে ভাল জানে হারান দত্ত লেনের মানুষ। চৌদ্দ থেকে ষোল যেদিন হল, সেদিন সে ও তার ঐ আবজন্ম বন্ধু—হরেন বাদু, বিমল অনন্ত অরুণ আর ঐ হতভাগা প্রবীণ টো-টো করে রাস্তায় ঘুরেছে, রাস্তার অন্যান্য বাবুদের ছেলেদের, যেমন পারুল মেয়েদের প্রচুর, লেটার-বক্স ফুটো করে গাদা গাদা চিঠি চুরি করেছে।

ষোল পার হয়ে সতেরোর পা দিয়ে কিন্তু হারান দত্ত লেনের একটুখানি চৌহদ্দির মধ্যে তারা আর নিজেদের ধরে রাখতে পারল না। সমুদ্রের বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। জাহাজে হারবার শিফনিক করতে লেগে। বোটানিক্স-এর গঙ্গার ঘাটে নৌকো চড়তে গিয়ে মাঝির সঙ্গে মারামারি করেছে। বিনি পয়সায় কে কতবার ট্রাম-বাসে চেপে কতটা দূরে চলে যেতে পারে—নিজেদের মধ্যে তারা মারামারি করেছে। নিরালা কোনো পার্কে ঢুকে বা ময়দানে ছিটকৌরিয়া হেমোরিয়াজের কারাকারি কোনো গাছের নিচে বসে প্রবন্ধটা সিগারেট টানতে শিখল। তারপর আস্তে আস্তে যেন পাঁজাকোলাও চালিয়েছিল কখনো।

আহা কী দিন গেছে!

ষোল থেকে বাইশ—হুঁ, চব্বিশও বলা যায়।

তারপর থেকেই কে কোথায় ছিটকে পড়ল। না কি হঠাৎ একদিন মাঝ থেকে সড়ে গিয়ে প্রবীণ মারা যাবার পর থেকেই সব ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে গেল? সে যার মনে এদিকে সেদিকে সরে পড়েছে?

ইস্, কী যাচ্ছে সন্দেহ তোমার! মেসেপ্সে অনেক সময় নিজেকে শাসন করে। চোখ রাঙায়। ধমকায়।

প্রবীণের মৃত্যুর সঙ্গে তাদের দলটার ছত্রখান হয়ে পড়ার সম্পর্ক আছে—এ-কথা তোমায় কে বললে! কেউ বলেছে কি? কেউ তো এ-কথা বলে না।

সবাই জানে, আজও বলাবলি করে—হরেনের মতন, অরুণের মতন, অনন্ত বিমল বা মেসেপ্সের মতন প্রবীণও তোমার অন্তরঙ্গতম বন্ধু ছিল। একজন আর একজনকে ছেড়ে তোমরা একেলা থাকতে পারতে না। কেউ কাউকে ছেড়ে কোথাও এক পা বাড়াতে না কোনোদিন। হারান দত্ত লেনে দলবেধে দৌরাত্ম করতে—এক পাড়ার ছেলে সব। তারপর পাড়া থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেদিন তোমাদের গতিবিধি সুরু হয়, সেদিন পরস্পরকে আরও বেশি করে কাছে টেনে রাখতে তোমরা। একজনের বিপদে বাকি দু জন বুক পেতে দিয়েছে। ব্যায়ামাগারে ঘরিয়ে মহলাদের ফুটবল ম্যাচ খেলা দেখা, লাইন দিয়ে সিনেমার টিকিট কাটা বা বেলাকের মেয়ে দেখে টিটকিরি দেওয়া—যে-কোনো সময় দুজন দেখে ফেলে পারত। যে-কোনো দিন। কোনো কোনো সময় দেখেওছে। আর তখন সাতজনের একজনও হাত গুটিয়ে চুপ করে থাকে নি। প্রাণপণে লড়েছে। যদি লড়াইয়ে জিতে গেছে, কুর্তির হৈহল্লা তুলে সাত বন্ধু হারান দত্ত লেনে ফিরে এসে পিন্টুর চায়ের দোকানে বসে পল্টা আর মুরগির ঘাস খেয়েছে। ছেড়ে গেলে পিন্টুর দোকান হয়ে যাওয়া খাওয়াটা হত না ঠিকই—তবে এক সঙ্গে সাতজন অনুপস্থিত থেকে হারান দত্ত লেনে ফিরে আসতে। কেউ কাউকে পিছনে ফেলে রেখে পালিয়ে আসবে এমন কাপুরুষতা তোমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে ছিল না। পরস্পরকে একথা বলবে না। তোমাদের সাতজনের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের কথা আজও হারান দত্ত লেনের মানুষে বলাবলি করে। অক্ষরে অক্ষরে সে-কথা লেখা আছে। তবে?

প্রবীণের মৃত্যু নয়। আসল কথা, দলটা একদিন ভাঙতই। একদিন এদের চাকরি করতে ঘুরে ঘুরে ছেড়াই হত। তোমার মতন তো আর বন্ধুলোক ছেঠি নেই যে বসে বসে ওদের খাওয়াত। চাকরি পাবার সঙ্গে সঙ্গে হারান দত্ত লেনের মায়া কাটিয়ে কেউ কেরেস্পন্ডেন্সে, কেউ আসাম, কেউ রানিগঞ্জ, কেউ জামসেদপুর এবং একজন ইস্কিমোর ওপর-এ পাড়ি দিতে চলে গেছে। আজ দু বছরের ওপর। যেদিন হারান দত্ত লেন তোমার কাছে ফাঁকা মনে হয়। বন্ধু-ফাঁকা ঠেকে। যেজন্য তুমি এত নিঃসঙ্গ বোধ কর নিজেকে। এমন একটা মনোরম বৃষ্টি হবার পর আজ রাস্তায় জল থৈথৈ করছে। ইলেক-ট্রিক আলো পড়ে জল চিকচিক করছে। বন্ধুদের নিয়ে কত হৈ-চৈ করতে। বন্ধুরা নেই। তাই চুপ দাড়ির রাশটা সাফ করে চিন্তাটাপ ভদ্রলোক সেজে পিন্টুর দোকানে এসে একটা কোনায় বসে কেনোরকমে এক কাপ চা খেয়ে তক্ষুনি আবার দোকান থেকে বেরিয়ে এলে। এখন বাড়ির সামনের রকে খুব মানুষটির মতন চুপচাপ বসে আছ। ভাবছ। সিগারেট খাচ্ছিলে। সিগারেটটা ভাল লাগল না। পুড়ে পুড়ে ছাই হল। তা বলে ছাইয়ের কথা ভাবতে গিয়ে পূর্বেন্দুবাবুর ছেলে প্রবীণের চিতা-ভস্ম আর তার মৃত্যুর কথা তোমার মনে আসে কেন?

নাকি এই প্রশ্নের ফুলকিনেরা পাচ্ছ না তুমি।

খুব পার। কেন পাবে না। যে জন্য এটুকে অনেক সময় প্রশ্নের মধ্যেই গণ্য করা না সে।

ব্যায়ামাগারে দাঁড়িয়ে খেলা দেখার পর ট্রামেবাসে ঝুলতে ঝুলতে তারা কতদিন হারান দত্ত লেনে ফিরে এসেছে। চৌরঙ্গীপাড়ার ম্যাটিনিশো ভাঙবার পর ভিক্টর ট্রামে বাসেই বা কতদিন তারা উঠতে পারতে! সেই ট্রাম বাসের হাতল ধরে বাদুড় ঝোলা হয়ে রোজ বাড়ি ফেরা। আবার অনেক সময় শখ করেও গাড়ির কুইবেবর্ডে কোনোরকমে একপা ঠেকিয়ে ঝুলতে ঝুলতে তারা চলাফেরা করেছে। আজকেরদের মতন লাফের জিনিসটাকে। আজকেরার ছাড়া সেদিন কেন তারা জানতেই না কিন্তু। পয়সা খরচার আজকেরার, বাসের চুরি করার আজকেরার, কলওয়ালার কুড়ি থেকে ফল তুলে নেবার আজকেরার। খেতে আজকেরার, শুতে আজ-কেরার। খেলার মাঠে, পরীক্ষার হলে বোটানিক্স-এর গঙ্গার ঘাটে—কোথায় আজকেরার ছিল না। সেরা আজ-কেরার ছিল ট্রামবাসে ঝুলে আসা। কিন্তুর পয়সা জমি দেওয়া বেত বে।

আজ সব চুপচাপ।

মন ছিছে বন্ধুরা চাকরি করছে। আর সে এখানে বাড়ির সামনে একটা চেয়ার ওপর বসে এক মনে রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির জলের ওপর ইলেকট্রিক আলোর ঝিলিক দেখছে।

কেন মেজের কাছে এসে অবনি লাহিড়ি ঠিকানা চেয়ে নেবে পড়ল! জলের জন্য গাড়িটা আর ভিতরে ঢুকল না! তা হবে।

এই বয়সেও ঘিলি ঘিলি চুলদাড়ি। এক কথায় রাশ-মাফেকের হবে—এই জন্য ঘাট করেও বুঝি অফিসে ৪.৫টার করে লাহিড়ি এই ঘরে ফিরল। না কি জলের জন্য কোথাও আটকে গিয়েছিল।

—কেমন আছেন?

—ভাল।

সংক্ষেপে উত্তর করল সে। ভাল করে চোখ তুলে তাকাল না। সেফটিতে খুব একটা পাত্তা করে না সে। কিন্তু লাহিড়ি ঠিক তার নাকের সামনে রাস্তাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। খুব একটা পাতলা চেহারার মানুষ তো না। টাই-পান্ট পরা দস্তুর শরীর। তার ওপর প্রায় আমাদেরই সাইজের চাইস একটা আউটডি হাতে ঝুলিয়ে চলাফেরা করা সহজ।

মেসেপ্সের মনে হল মুখের সামনে হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল।

—কোথায় যাচ্ছেন, আপনার ওভারকোট কেন আজ দেখছি না?

—বিক্রি করে দিয়েছি। গম্ভীর হয়ে বলল সে।

—বলেন কি? লাহিড়ি চমকে ওঠার মতন গলায় স্বর করল। দামি সুটের গাড়িখানা ছিল কিন্তু আপনার!

নিশ্চয়। এ-পাড়ায় এত দামী সুটের আর কারো নেই। কেউ কোনোদিন জিজ্ঞেসও না। মনে মনে বলল সে। অবশ্য অবে তার জন্মদিনে কেরি ওটা কিনে দিয়েছিল।

—পেটের দায় বাবুজ বলে গাড়িটা বেচে দিলেন? লাহিড়ি নকের নিচে হাসল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। এই প্রথম চোখ তুলে মানুষে মুখটা দেখল। কেমন ধনাদাই শরীর, মাঝারি মুখটা, কাল বর্ডার লাক চোখ সবই বড় মাপের। তার ওপর কপালে মতন একটা মারাত্মক মাদুলি। কেলোর মতন মুটো জুলপি।

রাগটা চেপে গিয়ে চোয়াল শক্ত করে তুলল সেপেন। কিন্তু অন্তর্জ্বালায় মুখে প্রকাশ না দেখেও তার ভাবা মুখে স্বচ্ছন্দে বিবর্ণতা ও রাগ প্রকাশ পেল। লাহিড়ি বুঝতে পারল কিনা বুঝল না সে। তার নিজের মনে খুব করে লাগল।

—পেটের দায় নিয়ে আমি মজা মাই না। একটা মানুষকে চালা দিতে গিয়েছিলাম। জীবনেতার পাশ দাঁড়িয়েছিলাম।' বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে।

—তাই গাড়িটা বেচে দিলেন?

—হুঁ।

লাহিড়ি কি বিশ্বাস করল।

কয়েক না কয়েক—মেসেপ্সের মনে হল সান্ত্বনা পেল। লাহিড়ির ওপর এক হাত নেয়া গেল। কেন ঘরে পড়ে কথা বলতে এসেছে। সামান্য অফিসে পাবার ঘটনা ফেটে ফিরে—এইবেলা বাদু বাড়ি যাও। বৌ চা নিয়ে বসে আছে। তা না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বত বেহুদে আলাপ।

মুখটা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল সে। পারল না। কটমট করে লাহিড়ি তার দিকে তাকিয়ে আছে। কি ব্যাপার? অব-

[শব্দে একটা বড় রকম ধাক্কা অনুভব করল সে। লাহিড়ি কি তাকে ঘিরে সন্দেহ করছে! প্রবীরের মৃত্যু! প্রবীরকে সে-ই হাতে করে খুন করেছিল? তার এইসব জীবন্ততা কথাটার মধ্যে ঘিরে পরক্ষণেরে প্রবীরের ব্যাপারটাকেই সে স্বীকার করে ফেলছে! স্বীকার করে নিতেরে অপরাধের ভার হালকা করতে চাইছে!

কিন্তু লাহিড়ি নরকে হাসছে। মাথা কাঁকাচ্ছে। 'দূর দূর মশাই। কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে এমন হরদম দুই একটাকে চাপা দিতেই হয়। উপায় নেই।'

লাহিড়ি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। অভয় দিচ্ছে। 'তা বলে কি লোকে গাড়ি বেচে দেয়! তার সুন্দর শুটারখানা ছিল আপনার।'

কেন কেনে ভুলানোর মতন করে লাহিড়ি আবার নাকে হাসতে থাকে।

অর্থাৎ লাহিড়ি যদি খলিকা। সত্যির জলের মাছ। সে টের পায়। স্কুটার বেচে দেওয়ার কারণ জানতে চেয়ে সিগারেটির 'জীবন্ততা' কথাটা মুখে নিয়ে বের করে হঠাৎ নিজের অলাবধানে যে স্বীকারুক্তি করে ফেলল সে—লাহিড়ি কাকের চেয়েও চালাক, ঈ করে সেটা ধরে ফেলেছে, কিন্তু কিছুতেই খোলসে ঢুকতে চায় না পাছে তাই এমন করে লাহিড়ি হাসছে। গাড়ি বেচে দেওয়ার তার ঠিক হয়নি। লাহিড়ি বোঝাচ্ছে।

লাহিড়ির এই জঘন্য হাসিটা দেখিতে না দেখতে হয় তাই চোখ তুলে হারান বসু লেনের লাইটপোস্টের মাথায় একটা বাদাড়-এর নেড়া-জলা দেখতে থাকে সে। হারান বসু লেনের মানুষকে খোঁকা দেবার জন্য সন্ধ্যার পর থেকে রোজ বালবগুলি বদলাইনি শুরু হয়। কেন মানুষকে খোঁকাতে চায় জানি একটা চাউস জেনারেল সেক্রা।

'হয়েসস! প্রবং খবর কি?' লাহিড়ি প্রশ্ন করে।

চোখের পর থেকে আবার চুপ করে থাকে সে। লাহিড়ির কথার জবাব দেয় না।

—'কাগজে কি লিখেছে দেখেছেন?' হয়তো তাকে অমনিতর গম্ভীর হয়ে থেকে দেখে লাহিড়ি আর হাসে না। কিন্তু তা বলে কথাও বন্ধ করে না। 'কলকাতার পাতাল রেলের কাজ আবার পিছিয়ে গেল মশাই।'

—'কারণ?' এবার চোখে সমানা হাসি ফুটিয়ে লাহিড়ির দিকে তাকাল সে। 'যাতে খরচ কমতি থাকে বলে আরবার কাজ-টাজ পড়তেই ইচ্ছে করে না।'

—'আমারও ইচ্ছে করে না। তবু পড়তে হয়।' লাহিড়ি আবার হাসতে লাগল। 'কলকাতির অভাব। তাই ভূগর্ভ-রেলপথ আরও ভূগর্ভে ঢুকে পড়ল।'

—'মানে কাজটা আরও বেশ কঠিন দিয়িয়ে গেল।'

—'হুঁ।' লাহিড়ি ঘাড় কাত করল। 'তার অর্থ কী হতে পারেন নিশ্চয়ই।'

—'লোকের দুর্গতি আরও বাড়বে। রাস্তায় চলাফেরার কষ্ট টাম-বাসে ওঠার কষ্ট আরও বাড়বে। ফলে লোককে আরও বেশি করে গাড়িতে ঝুলে ঝুলে যেতে হবে। এভাবে রোজ অ্যাকসিডেন্টের সংখ্যা বেড়েই চলবে।' ফলফল করে মুখস্থ পড়ার মতন বলে যেতে লাগল সে।

শুনতে শুনতে লাহিড়ি গম্ভীর হয়ে যায়। হাসির ছিটেফোঁটাও ঠোঁটের কোথাও অবশিষ্ট থাকে না। হাঁড়ির মতন মুখখানা করতে থাকে।

—'কি ঠিক কিনা। কথাটা কি ঠিকে বলছি।' অধৈর্য হয়ে ওঠার মতন গলায় স্বর করল সে।

লাহিড়ি ধৈর্য হারায় না। ঠান্ডা গলায় বলল, 'না না। যা বলছেন হান্ড্রেড পারসেন্ট করেক্ট। অ্যাকসিডেন্ট, অ্যাকসিডেন্ট। ঐ জন্যই তো মনটা রোজ হাই পা স্টেটের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। আর এই ভয় নিয়ে রাস্তায় ঘাটে আমাদের চলতে হয়। অ্যাকসিডেন্ট...অ্যাকসিডেন্ট অ্যাকসিডেন্ট...'

বলতে বলতে হেসে ফেলল কিন্তু ঠোঁটের কোণায় ফুটিয়ে করে হাসল লাহিড়ি। সত্যের মোহনের মতন মনে হল হাসিটা। 'চলি ভাই।'

লাহিড়ি আর দাঁড়ায় না। চাউস আয়োটিটা হাতে ঝুলিয়ে জলের ওপর দিয়ে হপহপ করে হেঁটে চলে যায়। অর্থাৎ যাবার আগে ব্যাটাছেলে—একটা ছোবল ঠিক বসিয়ে গেল—এমনটাই যেন সে আশঙ্কা করছিল এতক্ষণ।

একবারের জন্যেও চোখবার ঐ 'অ্যাকসিডেন্ট' শব্দটা উচ্চারণ না করলে যেন চলছিল না। হারামজাদা কি ইঙ্গিত করে গেল ওটা কি আর বুঝতে বাকি থাকে!

খানিকে একটা নিশ্বাস ফেলে সে চুপ করে হারান বসু লেনের ভাঙা আলোজ্বলা দোকানপাট বাড়িঘরের ভূতুড়ে চেহারা দেখতে লাগল। কেন ছিল এতক্ষণ একা একা।

ঐ হাসপাতাল এসে গেছে পড়ে কিছু বাকি কথা বলে তার মাথাটা গরম করে দিয়ে গেল।

—'কি হল!'

—'সিগারিয়া ডাকছেন।'

—'কেন, ডাকাডাকি কেন?' ধমকের ঝাঝাল সে। 'আমি কি সেন ছেড়ে পালিয়ে গেছি? ফেরার হয়েছি?' বড় করে ভোঁতি ফাটাল সে।

—'আবার দেওয়া হয়েছে। সিগারিয়া ডেকে ডাকছেন।' মিনমিনে গলায় ড্রাইভার বলল।

—'যখন ফিরে পাবে, ঠিক চলে যাব। ভেতিকে ফিরে যাও। ডাকাডাকি করলে আমার আরও খারাপ লাগে। বিরক্ত হই। মেজাজ খারাপ হয়।'

সিগারিয়া বলছেন আমাকে ফেলে আপনার গাড়ীর খারাপ করবে।' চাকর অনুনয় বলল।

—'ওকে আমার স্বাস্থ্যের জন্য দেখাচ্ছি ভেতিকে ফিরিয়ে দিন দিনই ফেড়ে যাচ্ছে।' চাকরের দিকে না, জেনারেল লোকে হয়ে জবাবদিহি নিজেকে, সেই অসময়ের বাদ্যকটার দিকে চোখ রেখে সে গাঁয়ে গায় বলল। বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল। সব কথা বোঝা গেল না। ছুটো একটা সাদু কথা যেমন 'চারার্ড' 'মাস্ট' 'করতেই হবে' 'ফুর্তি আছে না পরে' তার মুখ থেকে উচ্চারিত হতে শোনা গেল শুধু। চাকর মাথামুন্ড কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

ভেতি যে একবারে পরলা নম্বরের বকেট ছিল একনজর দেখলেই বোঝা যায়। বয়েস কমে বয়স হয়েছে, এখনও ঘুড়িয়ে ফাপড় পরে। ঘুড়ু কমায় না। এখন আর জমানোর তেমন দরকার পড়ে না, নতুন করে আর ঘুড়ুর ঘুল গজায় কোথায়, একতলে অবশ্যই হাইব্রাটি করেছে, পুরোনো মাল ঘরে করে আরেও পেন্সিল ঘুড়িয়ে রোজ নতুন করে ঘুড়ু তাকে। গালে মুখে মধ্যে। তবে কিবার খাদা আতল চাল ও আলু বেগুনে ঝুমড়োটা ঠিক হেজেছে। মাছ মাংসের পথে পা বাড়ায় না।

লোহা—স্ক্রাপ আয়রনের ব্যবসা করে ভেঠা অনেক পয়সা মেরে মেরে তো। এই জন্য নিরানিষ খেয়ে পাঁটি-ভক্তি দেখাবার ভেতির কোনও দরকার নেই। তা না হলে ভেঠা বেঁচে থাকতে ভেতি বা সব পার্টি করছে না! তার সন্দেহ হয় ভেঠার হার্ট-অ্যাটাক্ হওয়ার মূলেই হল ভেতি—বুড়ি হবার পরেও পাখি হয়ে ওড়া। গয়ের কথা অসম্ভব ভাল তো। চালচুলা যখন যখন তাকে এই বয়সেও লোককে অবাক করে দেয়। তার ওপর এমন একখানা সুন্দরকান্তিকা গয়না।

সাঁতা, সাঙ্ঘাতিক হারান বসু লেনে তার ভেতি মিসেস পাইনের মতন ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্য কর্মময়ের কোনও মহিলা তার চোখে পড়ে না। ঘড়ির কয়েক এলেও বন্ধুর টানটান ছিপছিপে। হয় তন্বঙ্গীর মতন সেজেগুজে যেমন করে চলাফেরা করে না!

কলুক। এই নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামায় না। কয়েদের গরম নিয়ে এককালে ভেতি যা খুশি করত। এখন টাকার গরম নিয়ে করছে জলা কথা। তার ওপর ভেঠা নেই। ভেঠা নেই বলে হারান বসু লেনে যার যার ইচ্ছা মতন তৈরী একতলা চারতলা বাড়ি, ভেঠার নিজের হাতে তৈরী কোনও ফিল কালারের এমন চমকদার একখানা স্টাইলিকেশন বাড়ি। সব আজ ভেতির হাতের মুঠোয় এসেছে। আর যাদের ভেঠা যাওয়া ভেঠার এত এত টাকা। ভেতি এখন সমস্ত পাঁচ পা দেখবে জানা কথা। এই জন্য তার মনে আক্ষেপ থাকবেন নেই যা ছিটেফোঁটা ছিলো ছিপের।

তার মাথা গরম হয়, মিসেস পাইন যখন তাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়।

অবলা মহিলাকে দোষ দেওয়া যায় না। সময় সময় সে চিন্তা করে। ভাড়াই যদি দোষ থেকে সে অনাথ। বাড়িতে আমার ছিলেন ছিল সে। বলা যা সিমলায় পাহাড়ে ছিকেলে বেড়াতে বেরোয়। গাড়ি উল্টে গিয়ে এক সঙ্গে দুজন যদের জখম পড়ে যায়। তারপর থেকে সে ভেঠা-ভেতির কাছে। ভেঠা ভেতির মুখে বড় মরে যা শুনেছে। ভেতির সন্তান নেই। সেই মানে, হলে ভেতির শরীর খারাপ হবে। সেই দুখের কারণ থেকে এখানে সে বড় হয়েছে। এই পরিবারের অনেক কিছু সে দেখল শুনল। ভেঠার মনটা কাদার মত নরম ছিল। লোহার ব্যবসারী হলে হবে কি! চোখে মুখে সারাক্ষণ একটা দরদের বাসস্থলের ভাব লেগে থাকত। দোকানের কর্মচারীদের বা বাড়ির চাকরবাকরদের সঙ্গে 'বাবা' 'দাদা' ছাড়া কথা বলত না। কাজেই ভেঠা যখনই আকুল হয়ে নিজেদের একটা 'বাচ্চার' জন্য সিমাঁর কাছে আবদার জানাত, ভেতি এমন কাজটা লাগাত না—বাড়াবাড়ি করলে ভেঠাকে হয়তো বারান্দায় রেখে দড়াম করে দোরের ঘরের দরজায় দিত এঁটে দিত—সারা রাত ভেঠাকে আর ঘরেই ঢুকতে দিত না।

যখন সে ছোট ছিল, তার মনে আছে, ভেঠা তার ঘরে ঢুকে তার বিছানার উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে হাপুসহুপুস করে কাঁদত। তারপর সে যখন বড় হয়েছে, তখন ভেঠা আর তার ঘরে ঢুকত না। সারারাত মানুষ বিছিয়ে বারান্দায় শুয়ে কাটিয়েছে আর লম্বা লম্বা শ্বাস ছেড়েছে। এই বাদুড় মনের কষ্ট সেরে পেরেই তো ভেঠার স্বভাবও এত সকলে খারাপ হয়ে গেল। একদিন রাত আড়াইটার সময় বুকের ব্যথা আর কম নিল না। ভেতির বাবহার। দিনভর ভিপ্পে পাখি হয়ে চতুর্দিকে ওড়াউড়ি করেছে—রাতে ঘরে ফিরেলেই শরীর খারাপ।

ঘরের পুরুষ কত সহ্য করে এসব! কতকাল? যে জন্য ভেতিকে সে চুচোখে দেখতে পারে না। বিশেষ করে ভেঠার কথা যখনই মনে হয়, তার ভারি মন খারাপ করে। একা সে অস্বীকার করবে না, যতক্ষণ ভেতি ঘরে থাকে 'খোপেন' 'খোপেন' করে। খোপেনের খাওয়া, খোপেনের শোওয়া নিয়ে মিসেস পাইনের ভাবনা চিন্তার শেষ নেই। খোপেনকে ভাল ঘড়ি কিনে দিয়েছে। এই তো সেদিন দু হাজার টাকা দিয়ে স্কুটার কিনে দিয়েছিল। ভেতি চাইছে খোপেনের পরনে সর্বদা দামী সার্ট টাইয়ের এমনকি, পায়ে দামী জুতো থাকুক। যতদিন ভেঠা বেঁচে ছিল ভাইয়ের ছেলের জন্য

হয়েছে পক্ষ করেছে এখন জেঠি পক্ষ করছে। জেঠা করতো প্রথমে থেকে। জেঠি?

তার মনে হয় জেঠির সঙ্গেই লোক-দেখানো। অন্তত সেপেনকে দেখানো —ব্যাস্ তোকে আমি ভত ভালবাসি।

জেঠির মনে যে ভালবাসা বলে কোনো বস্তু ইশ্বর দেননি, সেপেনের চেয়ে কে আর তা ভাল জানে, ভাল বোঝে। বাক বেড়ালটাকেও কোনো-দিন হয়তো ঘরে থাকে মুঠো ভাত কি মাছের কাঁটা দিতে দেখা যেত না।

আসলে নিজের স্বার্থে জেঠি সারা দিন 'সেপেন' 'সেপেন' করছে। সেপেন একটা বড় ভরসা। তাকে সুখে রাখতে পারলে জেঠিও সুখে থাকবে। একটা জোয়ান ছেলে বাড়িতে —কত সাহস পাওয়া যায় বুকে। যেমন দিনকাল যাচ্ছে। যা সব সময় ছেলের কাছছে! কোন্ দিন দুপুরে নাকি সন্ধ্যেবেলা জোরা রিভলবার নিয়ে কারা এসে বাড়ি চড়াও করবে—কি আছে একটুনি সব বের করে দাও। সেপেন ছাড়া কে রুখে দেতে দাঁড়াবে তখন!

ঘরে কিন্তু থাকে না। সবই বাসনের খাতায় লকারে জমা। তা হলেই তো ঘড়িটা আছে, রেডিওটা আছে, পাখা তিনি, স্টীলের একলাবা বাসনকোসন যার বোঝাই জমাকাপড়। দামী দামী আসবাব কার্পেট আছে। শীতের কম্বলটা ভাল রাখ্। চোর জোচ্চোরের হাতে সাধ করে ঘরের পা-পোঁছটাই বা কে তুলে দিতে চায়। মাসিমা মিসেস পাইনের চোর-ডাকাতকে ভয়! আরও ভয়, ঘরে এক জেঠা সোনাদানা পাবে না নগদ দু'চারশর বেশি টাকা পাবে না—স্টীলের বাসন কি কোসন দেখে মন ওঠে না এমন চোর ডাকুর সংখ্যা কম নেই এই শহরে। তখন ছেলে ধিয়ে ঘরের লোকের প্রাণ নিয়ে টানা-টানি করবে না ওরা তা-ই বা কে জানে! তাই কথায় কথায় 'সেপেন'। সেপেন ছাড়া জেঠি ভেবে অন্ধকার দেখে।

—সেপেন এলি?'

—যাচ্ছ এলাম।'

সারাদিন কোথায় ছিল মিসেস পাইন কে জানে। সেপেন এই নিয়ে জেঠিকে প্রশ্ন করে না। ফলে কি না সারাজীবন প্রশ্ন করে করে জেঠা মহাহয়রান হয়েছে। কোনোদিন সদুত্তর পায়নি। সেপেন এখানে কেন্ ছাড়।

এর জন্যেই চমৎকার মাইচিটা চাপিয়ে নিয়েছে জেঠি। মাছির মুখে একটা ঘাস না। একটু মুখ সরেপেন একটা কথা। তারপর এক কাপ গরম কফি।

সোনার ঘরের আলো ফিকে নীল এখন। আরাম কেদারায় শুয়ে আছে জেঠি। অন্ধকারে চোখের তারার মতন সরু ফালা মুখখানা একটু বেশি শুকনো দেখাচ্ছে না! হাতে কফির পেয়ালা।

সেপেন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। জেঠি আলতো করে পা নাড়িয়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দেয়।

—ভেতরে আয়।' জেঠি ডাকে।

—যাচ্ছ যাব।' সেপেন বলে।

—কেউ কোন করেছিল?'

—শুনতে চাইছো?' গম্ভীর স্বর সেপেনের। "আমি বলতে পারব না।' চুমুকে বিরাট কষ্টে তার।

জেঠি ঘাবড়ে যায়। দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা মুখে মানুষের মতন একটা চুলচাল রাখতে ভালবাসে। কেউ কথা বললে মেজাজ খারাপ করে।

—তোর কি হয়েছে বলতো!

—কিসসু হয়নি।'

—আজ আবার চুলচাল রুকে এসে ছিলি?'

—তুমি দেখলে!'

—আমি দেখলাম। গাড়ি নিয়ে গিয়াছিলাম।' জেঠি তখন বলল। 'বাথরুমে ঢুকোর মতন একা ঘরে অহিসে ঢুকতাম। এই বয়সে এমন করে বসে থাকা তোর মানায় না।'

—চুল কেটেছি।'

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

—বৃষ্টি হয়েছিল কাপিয়ে দুপুরের পর।' গলার স্বরটা একটু হালকা করল এবার সেপেন। 'মজা লাগল। বাথরুমে কাপিয়ে ফেললাম। ভাল করিনি?'

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বাথরুম থেকে জুলপি কিছুই বাদিস নি।'

—কেমন দেখাচ্ছে! ভাল লাগছে না তোমার?'

—আমার কাছে যাদু ভাল লাগছে না।' যে করেছে যা।' হাত থেকে পেয়ালাটা নামিয়ে বলে জেঠি। 'শোন্—'

—বলো।'

—আচ্ছা আমার কাছে আজ কে কে কোন করেছিল রে?'

—অনেকে করেছিল। কে করেনি!' সেপেন আঙুলের কড় করে ঘরে নামের তিরিস্তি দিতে লাগল। মিঃ কনোরিয়া কিন্তু করেছিল দুবার, মিঃ বারজোরিয়া করেছিল তিনবার, যাদু-ওয়ালা করেছিল একবার, ঝুনঝুন-ওয়ালা করেছিল, সাদুখাঁ করেছিল, মিঃ ভাটিয়া করেছিলেন, আন্টনি বাস্কুলী, অর্নব সোম, বাপ্পিদার বোস, ওস্তাদ বাসকী...'

আবোলতা চোখ জেঠির। আরাম কেদারার হাতের ওপর আঙুলটা পাতা। আরাম করে জল পা-টা সামনা নাচতে নাচতে নামগুলি শুনেন। যেন সেপেনের মুখ থেকে কবিতা শুনছে। জেঠির আত্মসম্মানবোধের দল।

জেঠির চোখা দেখে সেপেন হেসে ফেলল।

—আর? আর কে ফোনকরেন আজ!' চোখ খুলে যেন জেঠির। নেপালপাতি ভাবের মতন ইবৎ লম্বাটে মেয়ে মাথাটা সোজা করে বলল।

—আর কেউ করেনি।' সেপেন বলল, তবশ্যার সাহেব কিন্তু মিস করবেন না আজ। নামগুলি সেপেনের মুখস্থ হয়ে গেছে। তাই বাকি একটা নাম খুব্ করে বলে ফেলল।

জেঠি মাথা নাড়ল। দুশ্চোখ আব-বোজা করে আবার হাসল।

'কেন করবে! ওর বাড়াতে আজ তার সারাটা দিন আমার কেটেছে।'

—সা—রা—দি—ন! খুব্ জোড়া কপালে তুলল সেপেন। 'তুমি পারও। একটা মারধোর—'

'আর কোথায় যায় বল্!' বড় করে চোখ মেলল জেঠি। এক আয়নার আন্তা দিয়ে মুক্তো বসানে আবার কোথায় ছৈ করতে যেতাম।'

কাল সারাদিন কেটেছে বাজোরিয়ার সঙ্গে গল্পায় বোটে। প্রথমা করেন গল্পগুলোর চমৎকারিত্ব ছাড়ে। পালা করে জেঠি এক এক দিন এক জায়গায় নেমন্তন্ন খেতে যায়। যেদিন যেখানে যার সেখান থেকে আর ফোন্ আসে না সেদিন। কিন্তু বাকি সব জায়গা থেকে ফিরে এসে ফিরে করে মাথাটা খারাপ করে দেয় সেপেনের।

—তোর জন্য একটি মেয়ে দেখে এসেছি।' জেঠি স্পষ্ট সোজা করে বলল। 'এই মেয়ে তোর পছন্দ না হয়ে যায় না। সেপেন। জনাকাটা পরী। তবশ্যারের ছোট ভাইয়ের মেয়ে।'

—ঠিক আছে।' এরকম পর সেপেনের বাথরুমের কথা মনে পড়ল। 'তুমি মেয়ে দেখতে যাও। জেঠিকে সবচেয়ে তোমার সুন্দরী মনে হবে, আমরা হয়ে পাকা কথা দিয়ে আসবে। আমি একটুও অমত করব না দাদো।'

কিন্তু সেপেনের এ-কথায় জেঠি ভরসা পায় না। এড়িয়ে যাওয়ার কথা। যেদিন যেখানে যাচ্ছে একটি করে বাচ্চাই করা মেয়ের খোঁজ এনে দিচ্ছে। আর মনে সেপেন কেবল ঐ বলছে।

সেপেন জানে সারাদিন বাইরে উড়ে এসে তার মন রাখতে মিসেস পাইনের এ কথা বলা। রোজ একটি করে সুন্দরী মেয়ের খোঁজ পায় জেঠি। মনে সেপেনের খুশি হবে। জেঠির বাসনা সেপেনকে খুশি রাখতে একটও একটা কৌশল। যেমন তাকে বাড়ি কিনে দেয়, গাড়ি কিনে দেয়, বাসী সুদ্ধ তৈরি করিয়ে দেয়।

'আমার মনে হয়,' জেঠি বলল, 'আর অপেক্ষা করাটা ঠোর ঠিক না। দেখে দেখে অনেক বেলা হয়ে গেল। এখন যদি স্থির না করিস...' চোখ খুলে জেঠি দেখল সেপেন সামনে দাঁড়িয়ে নেই।

সেপেন তখন কমোডের ওপর। দেকের আয়নাটাকে দেখছে। তাড়া-তাড়ি পালিয়ে যাচ্ছে দরজাটা। লাহিড়ী যেমন পালাচ্ছিল তখন। পালাবার আগে তাকে 'অ্যাকসিডেন্ট' শুনিয়ে গেল। যেন নতুন শুনেছে খবরটা সে। অবাই বছর বছরে যার বাপ-মা দিঘলায় পাহাড়ে গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যোয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে মারে পড়ে তার কাছে কলকাতার রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট-এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে লাগল।

লাহিড়ীকে তখন সান্ত্বনাসান্ত্বনি কেন যে ছুঁড়িয়ে পালালাল করল না সে। এখন বাথরুমে ঢুকে তার আফসোস হয়। ঠোঁট কামড়ায়। প্রবীণের মৃত্যু নিয়ে লাহিড়ী তাকে ঠাট্টা করে ভেবে তার সন্দেহ হচ্ছে। সে যে চুপচাপ বসে থাকে, কারো সঙ্গে মেলামেশা নেই—তার মূলে প্রবীণের মৃত্যু। লাহিড়ী অবশ্য ঠিক টের পেয়ে গেছে।

তার বন্ধুরা চাকরি করতে চলে গেছে। চাকরি করতে তো সবাই যায়। কে ঘরে বসে থাকে। মিসেস পাইনের মতন ঠিকাওয়ালী জেঠি কজনের আছে। তা বলে কেউ কোনোদিন তার কাছে ঘর ঠিকার জন্য আসে না, পাশে বসে গল্প করে না, এটা হবে কেন!

তার অর্থ বন্ধুরা ঠকে গেছে। এই জেনার মূলেও সেই জিনিস। প্রবীণের মৃত্যু।

কথাটা বাজছে সেপেনের।

বাওরুমের কাছে সরে এসে ঠোঁট খুলে দিল। দুরুদুরু করে জল পড়তে লাগল। মাথাটা দুলছে দিল। আর-বোলাটা জলে ভাসছে। এক দৃষ্টে সে চেয়ে থাকে।

প্রবীণের জন্য তার এই মনোকষ্ট। অসম্ভব। স্টানিক্সে-এ স্কিপিনিক করে বল হেরে তারা বন্ধু-এ করে ফিরছিল। প্রচণ্ড হিমের রাত। ইচ্ছে করে তারা ভিড়ের বাসে ঝুলতে ঝুলতে আসছিল। আত্মভোলার। চিকেলে তারা আত্মভোলার পছন্দ করছে। সে প্রবীণ হলেন রাজ্য অধুন মিলন ও অনন্ত। ফুটবোর্ডে ঝোলো রকম একদা প্রেকিয়ে হাতল ধরে বন্ধুর ঝোলা ঝুলে আসা। হাতল ধরে অন্ধকারে ধরে এক বন্ধু আর এক বন্ধুর হাত-পর করে ধরে রেখেছে। গাড়ির কাঁকুনি লেগে এর হাত কেপে উঠলে ওর হাত কেপে উঠত জনা কথা। কিন্তু প্রাণ গেলেও কেউ কারো হাত ছাড়ত না। যদি মরতে হয় দুজন একসঙ্গে মরবে, তিনজন একসঙ্গে মরবে। ভিড়ের বাস। ঝুলতে ঝুলতে আসা অনেক কিলো-এর বাসার। তবু আনন্দ। আনন্দ করে ইচ্ছে করে এভাবে এসেছে তারা। পয়সা বাঁচি সেওয়াটা বড় কথা নয়। আত্মভোলার। আত্মভোলারের অথো দিয়ে তাদের বন্ধুদের মাঝিয় ঘর ঘর প্রমাণিত হয়েছে। যদি মরত এক সঙ্গে দুজন মরত, তিনজন মরত। একসঙ্গে সবাই। সাত জন। যেমন মুহূর্তেও মুক্তি সুখ ছিল। সান্ত্বনা থাকত। গাড়ির কাঁকুনি লেগে হাতের ঘরে ঝুলে থাকা অন্যদের জন হাতটা নড়ে যায়। তার হাত ধরে ঝুলে থাকা অন্যদের হাত সঙ্গে সঙ্গে কেপে ওঠে। ফলে অন্যদের কোমর

ছবি তুলে রাখা মেয়েদের পরীক্ষার কাজটি লাগে। আর সেই সঙ্গে তার দু কাঁধ আঁকড়ে ঝুলে থাকা প্রদীপের শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। কী সাংঘাতিক অবস্থা। ছাপাস তখন তখনি প্রন্ত সামলে নেয়। হাতেরটা আবার লক্ষ্য স্থির করে আঁকড়ে ধরতে পারে। কাজেই তার শরীর আর নড়ছে না। ছাদে অন্তত ঠিক মতন এবার তাকে ধরে থাকতে পারে। তার ঘোরের মধ্যে মেয়েদের ঝুলতে ভয় পাবা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। ফলে প্রদীপও এখন নিশ্চিন্ত। মেয়েদের দু কাঁধ নির্বিঘ্নে আঁকড়ে ধরে আছে। দুলে-দুলে ওরা বাস এগিয়ে চলে।

এখনে বিশ্বাসটা ভুল ছিল না। জন্মবিশ্বাস নিয়ে প্রদীপ মেয়েদের দু কাঁধ ধরে ঝুলতে থাকে। সে জানে মেয়েদের কাঁধে ভীষণ লাগছে, টনটন করছে ব্যথায়। তবু মেয়েরা কাঁধ থেকে প্রদীপকে সরাসরি ঝুলে থাকতে দেবে। কখনও কাঁধ থেকে তার হাত সরিয়ে দেবে না। ওদিকে মেয়েরা জানে অন্তরের ভেতর ওরা আছে সে, যত কষ্ট হোক অন্তরের, মেয়েদের দু হাতের বেড়ি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে কখনও চেষ্টা করে না প্রদীপ। তা হলে মেয়েরা পড়ে যাবে। মেয়েদের সঙ্গে প্রদীপ। আবার অন্তরের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস অন্তরকে সে একটা রক্তের মতন আঁকড়ে ধরে আছে—অন্তত তার হাত কখনও ছাড়িয়ে দেবে না। যদিও মহা অস্বস্তিকর মধ্যে হাসান ধরে রয়েছে সে। সে ও রাজু। দুজনের হাতের হালবাকল উঠে যাচ্ছে লোহার ছবায়। তবু কষ্টদের অন্তরকোল ছাড়া ধরে থাকতে দেবে।

এরপর একটা শেকলের মতন, তারা অবিচ্ছিন্নভাবে কটি বন্ধু, পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে ট্রেন-বাসে চলাফেরা করেছে। সহজে থেকে উর্বিল—উর্বিল থেকে হেয়ার-চাঁদনি বন্ধুর বাস পর্যন্ত। শেকল একবারও ছেঁড়েনি। কি করে ছিঁড়ত! জমানক শক্ত ছিল যে শেকলের সব কটা আঙটি। হ্যাঁ, ছটি আঙটি, সাতটি আঙটি। সে রাজু বিমল অন্তর অন্তরা তপন ও প্রদীপ। আঙটির সঙ্গে নিজেদের তুলনা দিত তারা।

তা হলে কোন্ আঙটিটা হঠাৎ নয় হল যে শেকলটা একদিন ছিঁড়ে গেল। কারণ কি? তাদের জীবনে ওইদিনে বান্ধবীরা এসে ছেয়ে বলে? সীমা সুলেখা মহুশ্রী মায়া মহুলেখা? তা না হয় এলো। তখন তো তারা বন্ধুরা অনেক বেশি শক্ত, বেপরোয়া। আগে কেন বিশ্বাসঘাত করে বিমল এক একটা জায়গা থেকে। ঐ যে রামপুরহাট দাঁড়িয়ে ফুটবল খেলা দেখা যা লাইন দিয়ে টিকিট কেটে প্রথম দিনের সো দেখা। এর আগে কোনো অসুবিধে ছিল না। দরকার হলে এই দল সেই দলের সঙ্গে মুখে মারামারি করতে একসঙ্গে সাতজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর হাতুড় কিতুক, একটা দুর্বোধ্য দুর্ভেদ্য শেকলের মতে পরস্পরকে আঁকড়ে থেকে এক সঙ্গে টেনে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে হাসান মত ফেরে ফিরে এসেছে।

বন্ধুবীরা এসে জুটেছিল পর কি তারা সুলেখা হয়ে গিয়েছিল। না, না, তারা একটুও কোনোদিনই অসহায়তা মনে করত না। সেদিনও তাদের চোখে ডিনিসটা আন্ডারস্টেন্ডার বিশ্বাসঘাত ছিল। ধরা তর্তদিনে ট্রেনবাসের ভিড় অনেক বেশি বেড়ে গেছে। মন্ত্রী মহুলেখা সুলেখা সীমাকে নিয়ে ডাকসওয়াগনের পিছনিক ভেতে যা মহুদনে পলায় ধরে বেরিয়ে যখন ফিরত তখন খুব করে তারা আবেদনময় মেয়েদের গাড়িতে ঠেলে তুলে দিত। যাতে তারা ধরতে পরে তার ব্যবস্থা করে দিত। তারপর তারা নিজেরা কেন্দ্রো ক্ষেত্রের সাতটি আঙটি হাত ধরাধরি করে কোনর জড়াজড়ি করে এই কলে ওর কাঁধ ওর মাথার চুল আঁকড়ে ধরে থেকে কোনো রকমে ফুটবোর্ডে এক পা ঠেকিয়ে ঝুলতে ঝুলতে এসেছে। কাঁকুনি খেয়ে মাঝ রাস্তায় গাড়িটা তখনও যদি লাফিয়ে উঠেছে বা একটু ছেলে গেছে—ভিতর থেকে বান্ধবীরা, চাঁদু পালার মতন কাঁকিয়ে উঠত, মন্ত্র তক্ষুনি জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে একসঙ্গে তারা সোহাগাল তুলত, এই অন্তর, এই সোনা সাবধান সাবধানে, রাজু, তপনকে ধর থাক্, ইস্ এমন করে ঝুলে আসতে তোদের কে বলেছিল, পরের বাস-এ এলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হত না, আমরা পালিয়ে যেতাম না—এই অন্তত, এই বিমল—শক্ত করে দুজনে হাতটা ধর থাক্—এটাই প্রদীপ, মোটে নড়বি না!

তারপর যখন নিজেদের জায়গায় ফিরে এসেছে, হি-হি করে তারা হাসত।

বান্ধবীরাও হাসত। আর, 'এখন হাসছিস সব। একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে তখন কী করতিস শুনি?'

—কি করতাম? বন্ধুরা এক সঙ্গে শুনতে চাইত। বান্ধবীদের নিয়ে হাসান মত ফেরের 'জয়-মা-কালী' ফেস্টোর একটা টেবিল ঘিরে বসে মাংসের হাড় চুষতে চুষতে মুখটমিতরা চোখে ওদের দিকে তাকাত।

—তোকে আমাদের খালমন্দ করত আর কি' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করত মন্ত্রী আর মহুলেখা, 'আমাদের ভিতরে বসিয়ে নিয়ে তোরা হাসল করে ঝুলতে ঝুলতে আসছিল। এত খারাপ লাগছিল।'

—খারাপ? সুলেখা জানিল, 'আর একটু হলে আমি হাই ফেল্ করতাম। কেমন করে তখন মেয়েদের সঙ্কটের খলাটা করে বলেছিল না?'

হীরাবাঈ মরোপেকর

সীমা বলত, 'বাঁধাদুলোর সঙ্গে আমাদের ফেরেনোই অন্যায় হয়েছে। আমি তো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, এই জীবনে ওদের নিয়ে কোনোদিন ধার কোথাও বেরোব না।'

—আহা, গালাগাল করছ কেনো, হাস করছি না—বেশ তো, তা হলে তোমরা একলা যেও।' একটা খুবসুরে প্রতিজ্ঞান গলায় কুঁচিয়ে রাজু বলত, 'দেখবেন কি করে ছিড়ের বাস-এ সব চালাতে।'

—চালাতে হয়ে যেত সব।' অন্তর একদিন মন্তব্য করেছিল, 'এমন সব সভ্য সংস্কৃতিবান পাসেঞ্জার ছাড়াদিন চলা-ফেরা করছে না কলকাতার ট্রেন-বাসে—একা বেরিয়ে দেখুন কেমন বলাই বলাই করে ছেড়ে দেয় এক-একটি মেয়েকে।'

—আহা-হা, অত বীরত্ব দেখাতে হবে না।' মহুলেখা ধমক লাগিয়েছিল। কেন তোরা যাচ্ছিস তাই আমরা ট্রেন-বাসে চলাফেরা করি—তা না হলে ঘরে ফিরে আসতাম না সব।'

—কেন পুরুষ সঙ্গী নেই বলেই মেয়েরা, তারা কোনোদিন রাস্তায় বেরোয় না।' সুলেখা না বলে পারল না।

—বেরোবে না কেন।' প্রদীপ বলেছিল, 'অফিসের একঘেয়ে হয়ে সব ঘরে ফেরে। চাউনের হাতে উঠে যায়, ব্রেক দিয়ে কারো শাড়ির পেছনটা কালা কালা করে দেয়, কানের লাঁড় ফেটে রিঙ খুলে নিয়ে যায় কত জনের—'

—'যাচ্ছাবাড়ি।' সীমা তখনকার গ্রাম্য ভাষিয়েছিল। না, আমি অস্বীকার করব না রাস্তায় বেরোলেই মেয়েদের বিপদে পড়তে হয়, ট্রেন-বাসে চালাচলাই নাকাল হতে হয়—কোনো কোনো ঘটে ওজনোসখনো হয়তো এমন একটা আজটা দুর্ঘটনা ঘটে—তা বলে কলকাতার সব পাসেঞ্জার খারাপ—সব দুষ্টই খারাপ, সব ছটা ট্রেন-বাসেই মেয়েদের প্রতি অসভ্যতা চলে, এটা বাজে কথা।'

—আসল কথা কি জানিস বুদ্ধা।' মহুলেখার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মন্ত্রী টিপে টিপে হাসছিল। 'ওরা না শিভালরি পছন্দ করে—আমাদের। সেদিন না তখন আমাদের সবাইকে সীটে বসিয়ে দেবার জন্য কেমন অস্থির হয়ে পড়েছিল—কেন দরকার হলে বয়স্কদের লোকের সঙ্গে মারামারি করত।'

—হুঁ, শিভালরি। মহুলেখার মাইই সব—' সুলেখা বলিয়াল, 'আমরা ওদের আরো বেশি পছন্দ করব—বেশি করে ভালবাসব, বীরের মত।'

—আমাই না।' সীমার কুচকুচে

কালো মুখের ছুঁচো দা-গুলো দুটো গুঁই সাপের মতন ঝুঁকে উঠেছিল। 'আমাদের ভেতরে বসিয়ে দিয়ে তার-পর নিজেরা হাতল ধরে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে যাবেন্দের মতন ঝুলতে ঝুলতে যাবে—এর জন্যে শিক্ষা-দীক্ষার আড়ম্বরের কোথায় রে? প্রেফ বেকামী—কেমন করে অনন্তর কাঁধ ধরে বলেছিল না রাজু—যদি আর একবার তালগাছ একটা কাঁঠুনি খেতে বলতো—রাজু, ঠিক ছিটকে পড়ে যেতে রাস্তায়—'

—আর তখন পেছন থেকে হুড়মুড় করে বেতাবে একটা ট্রাক ছুটে আসছিল—ইস্, এখনো ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়,'—বলছিল সুলেখা, 'এত-ক্ষণে আমরা হয়তো সবাই হাস-পাতালে রাজুকে নিয়ে শমশানের পথে —হুঁ, সত্যি আমাদের ক্ষেতে হত বৈকি, আমাদের জন্য বাঁধা মেকদের ভিয়ে এতবড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট—'

শুনে অনন্ত হো-হো করে হেসে উঠেছিল। 'তাই তো বলি, তোমরা মেয়ে—মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নও—একেবারে মেয়েমিনস...রাজু, কখনো ছিটকে রাস্তায় পড়ে না, পড়তে পারে না। মেতায়।'

—'অ্যাক্সিডেন্ট-অ্যাক্সিডেন্ট-এর কথা কেউ বলতে পারে না।' মন্দোদরী চোখ পাকিয়েছিল। 'তুই কেমন করে বলছিস—মেতাবে তোর কাঁধ ধরে রাজু ঝুলছিল, গাড়ির কাঁকুনির সঙ্গে তুই যদি আর একটু নড়ে যেতিস—রাজু নির্ঘাত—'

অনন্ত আবার হেসেছিল। মাথা কাঁকিয়েছিল। 'কখ্খনো রাজু পড়ে যেত না। আমি তাকে পড়তে দিতাম না। তার আগে কষা আমি ছিটকে রাস্তায় পড়তাম।'

—'তার আগে আমি পড়তাম।' অরুণ কলা বাড়িয়ে বলছিল।

—'কেন আমি?' বলেছিল তপেন।

—'আমিও।' প্রবীর বলছিল। রাজু একলা ছিটকে পড়ে যাবে—আমাদের কাছে এটা অসম্ভব।'

'আমরা একজন আর একজনকে জড়িয়ে থাকতাম, শক্ত করে ধরে রাখতাম। সীমার চোখে চোখ রেখে বিমল বলছিল, কেউ ছিটকে পড়তে দিতাম না। যদি কেউ কোনোদিন পড়ে যেত—আমরা একসঙ্গে সবাই ছিটকে পড়ে যেতাম রাস্তায় এক সঙ্গে রাস্তায়। তখন আমাদের কোনো দুঃখ থাকত না।

—'তার অর্থ কি বুঝতে পারছ।' পেরেপন বলেছিল, 'মানে একটা চেন —শেকলের মতন আমরা। আন্টার গায়ে যেমন আন্টি কামড় খেয়ে লেগে থাকে। আমরা সাতজন পর-স্পরকে জড়িয়ে ধরে আছি—আজ না, সেই ছোট বয়স থেকে—যেদিন তোমরা আমাদের জীবনে আসনি সেদিন থেকে। আমরা অ্যাডভেঞ্চার করছি, ঠিক যেমন বলেছি—তোমাদের কথা বাঁধার মেকদের মতটা নয় তার চেয়ে ঢের বেশি উঁচুদরের আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে থাকি আমরা রাখি—অনেক রকম ঝুঁকির মধ্যে গিয়েও আমরা কেউ কারো হাত ছাড়ি না—কেউ কাউকে পড়তে দেই না মরতে দেই না—যখন মরব এক-সঙ্গে...'

—'কাজেই বুঝতে এবার তোমাদের নিশ্চয় অসুবিধে হচ্ছে না।' মন্ত্রী মন্দোদরী সীমা ও সুলেখা—দুজোড়া দুটো মেয়ের মুখের দিকে মুখ রেখে চোখ মাথা দুলিয়ে প্রশ্নটা ঝুলিয়েছিল, 'সিভালরির দেখিয়ে মেকদের মন জয় করার দিকে আমাদের ঝোঁক বড় না হয় ঢের বেশি আমাদের আনন্দ আমরা হারান দত্ত লেনের সাতটি ছেলে সাতটি হয়, একজন আর একজনের কবেছে বন্ধু, ভালবাসার বাঁধনকে দৃঢ় মুহূর্তে তা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছি—আজ আমাদের হেইল চাঁদিশ —আশী বছর বয়সেও আমাদের ছাড়া-ছাড়ি হবে না, একজন আর একজনকে দেখতে না পেলে আজকের মতই ছট-ফট করব। সেদিন হয়তো গ্রাম-বয়সে ফুটবোর্ডে ঝুলে চলাফেরা করার শক্তি থাকবে না—একটা নিরালা পর্কে শুয়ে সাত বন্ধু খোল হয়ে ঘাসের ওপর বসে গল্প করব। হুঁ, সেদিনও আড্ভেঞ্চার থাকবে আমাদের জীবনে—সিভালরির দেখাবার সুযোগ আসবে—হয়তো একটা মোষের ষাঁড় তেড়ে তাহলে ছেপে দিয়ে আমাদের তাড়া করবে, স্বার্থপরের মতন কেউ তখন পালাবার চেষ্টা করব না, সাতটা লাঠি উঁচিয়ে সাত বুড়ো এক সঙ্গে লড়াই করব। যদি মরতে হয় ষাঁড়ের গুতো খেয়ে এক সঙ্গে মরব তখন—দেখে লোকে বলি বলি করবে। ভাববে দেবে আমাদের। আহ্লাদে নিয়ে দেখিয়ে বলবে, ঐ যে হারান দত্ত লেনের সাত বন্ধু—ফুল স্কেপ খেয়ে, চেয়ে হাই পাওয়ারের চশমা—আজও কেমন এক সঙ্গে চলাফেরা এঠাকরা—এক চুল তফাৎ করল না ওদের বন্ধুত্বের।'

প্রবীর থামল। চমৎকার বক্তৃতা করেছিল সে। মেয়েদের প্রত্যেকে খুশি হয়ে তখনি হাত বাড়িয়ে তার সঙ্গে 'হ্যান্ডশেক' করেছিল। আর এদিকে ওরা একেবারে চুপ—মন্ত্রী মন্দোদরীর দল। যেন বুঝতে পারছিল তাদের বন্ধুত্ব খুব একটা নেই ছেলে-দের কাছে। নিজেদের কথাই আর কথা বলছে না। মাঝখানের জন্য নয়—নিজেদের জন্য তাদের আড্-ভেঞ্চার—একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরে মেকদা হয়ে ইহ-বয়সে ঝুলতে ঝুলতে যাবে—এই তাদের পৌরুষ, তাদের বীরত্ব কুণ্ঠিত দেখে একলাফায় মানুষ তাদের দেখে যাবে, ভাববে।

কিন্তু মৃদু অর্থাচিন বন্ধুর দেখবার জন্য তাদের এই মারাত্মক খেলা—যোল-সতেরো বছর বয়সের নেশা ছেলেন চাঁদিশে পৌঁছোবার পরেও, অর্থাৎ মন্ত্রী মন্দোদরী হবার জীবনে এসে গেছে জেনেও একরকম থাকবে—যেন বিশ্বাস করতে মেয়েদের বাধছিল। কেমন ধরনা লাগছিল তাদের মনে। এই পুরুষ বন্ধুরা যখন আবার একটা করে কাঁধ ও পরম কাটলেটের অর্ডার দিয়ে আগে গল্প করে-ভুলছিল, মন্ত্রীর দল হাত তুলে চুপ করে বসে থাকল। খাবার বৃষ্টি চলে যাচ্ছে। আলকাল করে এ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে এক একজন। মেয়েদের দল মোটেই তা গ্রাহ্য করেনি। কেমোরাকন্ধ খুব্বুই বিশ্বাস না ওদের এভাবে চুপ করে বসে থাকার।

কিন্তু তারপর ?

খুব্বো জীবি পেরে খেয়ে অব-শেলাটা। কমোডের কিনারায় চড়ে বসে দিবা পিটপিট করে এদিক তাকিয়ে আছে। লাহিড়ির বয়স। তার অর্থ এখনে এই বাদরদের নির্জনতায় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারল না মোপেন। আর এক জোড়া চোখ ঠিক তাকে আবিষ্কার করল। তার বুকের ভিতরটা দেখতে পেয়ে যেমন চোরা হাসি হাসছে পাতলাটা। যেমন তখন নিচের রাস্তায় ঠেঁটের কোণায় হেসে অর্থনি লাহিড়ী ছপ্ ছপ্ করে হেটে চলে গেল।

একটা জল ছেলেও কিছু জল হয় না। তোয়ালে দিয়ে গা মাথা মোছার সঙ্গে সঙ্গে আবার তার সারা শরীর ঘামতে আরম্ভ করল।

কেন এই ঘাম তার! কেন কোনো-দিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে গল গল করে ঘামতে থাকে। ফুল-স্পীড নিয়ে পাখা ঘোরে। এতক্ষণেও। কেন কিছু হয় না ঐ হাওয়ায়—চেহারার মতন গা কেন ঘাম নেমে মাথার বালিশ, পিঠের নিচের বেড-শীট্ ভিজিয়ে দেয়। ঘিনঘিন করতে থাকে শরীর মন। নিজের নোংরায় ঘেন্না ধরে যাচ্ছে মনে হয় তখন। চট করে বিছানা ছেড়ে যে উঠে পড়বে সেই শক্তিও কেন পায়ে থাকে না। একটা অজগর মুখন মানুষের মতন একভাবে পড়ে থেকে ধীরেসুস্থে অনন্তকাল ঘুমতে থাকে। পাশ করোয়। তার কল ভেঙ্গে করায়। তাদতে আরম্ভ করে সে।

পাশ। তোয়ালেটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। তার খেয়াল থাকে না। ছুটে গিয়ে বেসিনের কিনারায় ভেঙ্গে লাথি মারল। পায়ে লাগে জল না এবং পেরেপিন না কি যেন চিনামাটির তৈরী জিনিসটা ফেটে যায়। মাঝখান থেকে আঙ্গুলগুলো পালিয়ে গেছে। কোথায় লুকিয়েছে শালা!

খোঁড়াখুঁড়ি করতে তার আর মোটে ইচ্ছে করে না। গর্তে ঢুকেছে। যেমন লাহিড়ি তখন পা চালিয়ে নিজের ফ্লাটে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল। লাহিড়ির ফ্লাট সে চেনে। হারান দত্ত লেনের কোন্ বাড়ির কোন্ ফ্লাট তার জানা!

লাহিড়ি ঢের ফেরোছিল, কেহেতু মেয়েদেরকে সে আবিষ্কার করে ফেলেছে, মেয়েরা মরমুখো হয়ে তখনি ছুটে গিয়ে তার মাথে মুখে ঘুষি বসাত! কেমন এখন ফেরে গিয়ে এইরকম একটা লাগি খেলে কমোডের পাশ?

অসম্ভব! এতক্ষণ তুমি চুপচাপ ছিলে। নিজের মনে ভাবছিলে। একা একা চুপ করে থাকে। খুব ভাল ছিলে তুমি। কখনও তো উত্তেজিত হওনি! উত্তেজিত হওয়ার অর্থ নিজের মুখোস খুলে ধরা। লোককে ডেকে বলে দেওয়া—এই আমি, এই হল গিয়ে আসল মোপেন। ছিঃ! ছিঃ সে কেমন স্বস্থ হয়ে গেল।

না, না, তা কখনও হতে পারে না। লাহিড়িকে তখন ঘুষি বসায়নি, সাহস হয়ে ছিল, দুর্বলতার জন্য করেছিল। আসলে লাহিড়ি সরল মানুষ। সরল, তাই সে 'অ্যাক্সি-ডেন্ট'-এর কথা শোনাচ্ছিল। কলকাতার রাস্তায় দুবেলা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। মিনিটে মিনিটে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। ছাপড়া পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ছে। বাড়িতে উঁকি দিয়ে পা পিছলে নিচে পড়ে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে, চলন্ত অবস্থায় হলে তো কথাই নেই—স্লিপ খিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেধা যেত ছোট্ট শরীরটা, চাকায় তলায় চলে গেছে। আর যদি লেডবে বেড়ে গেল তো এদিক ওদিক থেকে ঠিক লরী ট্যাক্সি যা হোক কিছু একটা চোখের নিমেষে ভীষণ বেগে ছুটে এসে চাপা দিয়ে গেল।

সমস্যের মারাত্মক ট্রামে করে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া। এক মেকেণ্ডের বিশ্বাস নেই। তখন কোন্ দিক থেকে কি ঘটে যাবে। টেরও পাবে না। মানুষের মৃত্যু যে কত দ্রুত, কত অতর্কিতভাবে আসতে পারে কলকাতার রাস্তায় এক একটা অ্যাক্সি-ডেন্ট তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে রোজ দেখিয়ে দিচ্ছে। আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তো কি হচ্ছে? সব সাবধান হয়ে গেল কিনা! ধর্মতলায় মেড়ে দাঁড়াও শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়াও কলেজ স্ট্রীটের মেড়ে দাঁড়াও হাজরার বা বালিবিহারী এভিন্যুর মেড়ে—সর্বত্র এক কথা। এইটুকুন একটা হাতল। একটুখানি ফুটবোর্ড। ঝুলতে হয়ে পড়ে পড়ে ঝুলছে। মরছে দেদার দেখে শুনেও ঝুলতে ঝুলতে ফিরছে। সিনেমার লো দেখে ঝুলতে ঝুলতে ফিরছে। সে সব না হয় পথ করে যাওয়া—ইচ্ছে করে ঝুলে যাওয়া। ফুর্তি করে যাওয়া। দল পনেরো কি বিশ মিনিট অপেক্ষা করলে অপেক্ষা-কৃত কম ভিড়ের গাড়ি যে এক আধটা চোখে না পড়ে এমন তো নয়। কিন্তু অফিস-টাইমে! অফিস ছুটির পর! কারো কথা কেউ শোনে না, কারো পরামর্শ কেউ মনে রাখে না।

গ্লাস হাতে নিয়ে কুলকুচো করতে করতে ছুটছে সব।

লাহিড়ি সে কথাই বলছিল তখন। লাহিড়ির কথার সূত্রে ধরে সে নিজে বলেনি? পাতাল রেল হয়ে গেলে মানুষ বেঁচে যেত। পাতাল রেল হতে দেরি হচ্ছে বলে দুর্ঘটনা বাড়ছে, ছেহেতু বছর বছর সহরের লোক-সংখ্যা বাড়ছে। গাড়ি ঘোড়াও সেই হারে বাড়ছে।

ব্যস্, জিনিসটা এখনেই তো ফুরিয়ে যায়। ফুরিয়ে গেছে।

তারা হরেন দত্ত লেনের সাতজন—অফিস কামাইয়ের প্রশ্ন সেদিন ওঠে না, কেউ তখনও চাকরিতেই ঢোকেনি—বা স্কুল কলেজে যখন যেমন ছিলে থাকিতে এক সঙ্গে কুলকুচো করতে করতে যাওয়া। তারা এক স্কুলে বা এক কলেজেও পড়ত না। একজন সাউথ-সুবার্বন, একজন ডফ্-হস্কো, একজন হিন্দু স্কুল, একজন বঙ্গবাসী স্কুল, একজনের শ্যামবাজার ট্রাইস্কুল—তেমনি কলেজের বেলায়—কারো স্কটিশ চার্চ, কারো বঙ্গবাসী, কারো সিটি, কারো চাঁদপুর, কারো মহীন্দ্র কলেজ—যে কারণে আলাদা আলাদা হয়ে তাদের একজন এই স্কুলের বাস, আর একজন সেই স্কুলের ট্রাম ধরেছে।

সোপেনের জ্যেঠা বড়লোক। বাড়ির গাড়ি ছেলে, যেদিন গাড়ির অসুবিধে থাকত সেদিন ট্যাক্সি—ট্যাক্সি না পাওয়া গেলে ট্রামেও ছেলে স্কুলে কলেজে গেছে। জ্যেঠির কড়া হুকুম ছিল। খবরদার ট্রামে বাসে চাপবি না। কখন কখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়।

জ্যেঠির কথা শুনে সে মনে মনে হাসত। যেন স্কুলে কলেজের সময় ছাড়া সে সারাক্ষণ বাড়িতে বসে থাকত। যেমন আজকাল থাকছে। চুপ-চাপ একা একা বাড়ির সামনে ছক কেটে সময় কাটায়। যেন চিরকাল সে এমন ছিল। বুড়ো মানুষের মতন গম্ভীর বিজ্ঞ হয়ে থেকে হারান দত্ত লেনের লোকজনের চলাফেরা গাড়ি-ঘোড়ার আসা-যাওয়া দেখছে।

না, জ্যেঠি জানত না, কেমন সব শান্ত নিরীহ ছেলে ছিল তাঁর দেওরের ছেলে সোপেন আর সোপেনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা। স্কুল কলেজের সময় বাদ দিয়ে বাকি সময়টা চুম্বকের মতন ঘুরে ঘুরে একজনকে আর একজন টেনে নিয়েছে। আড্ডাখানায়। হেঁটে নয়, ট্যাক্সি রিকশায় নয় বাস। ট্রেকে ট্রামে বাসে ঝুলে ঝুলে। শ্যামবাজার টু, খালিসাঙ্ক। খালিসাঙ্ক টু, শেয়ালদা। শেয়ালদা টু, হাওড়া। হাওড়া টু, ঘড়ির মাঠ। সেখান থেকে আবার চলো জগবিন্দুর, কালী-ঘাট, আলীপুর, বেহালা। হু হু দেবতার মতন। একজন আর একজনকে আঁকড়ে ধরে। হাসের ঘরে কোনোসময়ে একটা পা কুটবোর্ডে ঝুলিয়ে রেখে। কেউ পড়ে না যায়। পড়বি তো সবাই এক সঙ্গে ছিটকে পড়ব রাস্তায়, এক সঙ্গে চেপ্টে যাব। বেলা থেকে উনিশ, উনিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত। যতদিনে না নব-যৌবনের পূর্ণ জোয়ার এসে লাগল প্রত্যেকটা শরীরে, চোখে, মুখে, ডাকনামে, হাসিতে। আর তত-দিনে ওরাও এসে গেছে। সীমা সুলেখা মায়া মজুশ্রী মহুয়েন্দ্রা।

শেষ পর্যন্ত আরতি।

আরতির ডান দিকের কাঁধের চোখ। সন্ধ্যা কাঁসর শিখার মতন আরতির টল-টল করত। এই জন্যই কি বাবা-মা এই নাম রেখেছিল। আরতির-দাঁপ। হারান দত্ত লেনের মেয়ে। কোন্ ফাঁকে বড় হয়ে উঠেছিল, কবে যে এইটুকুন ছিল কেউ মনে করতে পারত না। কাউকে কারো মনে ছিল না। আরতির মতন মেয়েটি সোজা সোনি-মুখ পরে মজুশ্রী মহুয়েন্দ্রারাই বা কবে বল বেয়ে এর বাসানে ঢুকে কুল কুড়িয়ে খেয়েছে ওর বাসানে ঢুকে কুলের কাঁদি ছিঁড়েছে, ফেরিওয়ালাকে ডেকে আচার কুচুকা খাওয়া, একঘরের জায়গায় তিনঘর বাসাওয়ালার কাছ থেকে ভাড়াদের ছেড়ে নেওয়া, তারপর পরের বা বাড়ির ঘরের কোনো ফাঁকা জায়গায় ছুটে গিয়ে মনের সুখে লুডোপাটি করা আর টুকটুকে রঙিন জামার, মাথার চুলে ঘামের গুঁড়ো দেখে বকবকে মুকাবাট বের করে হি-হি হাসি। এদের শৈশব ওরা মনে করেনি, ওদের শৈশব এরা মনে করতে পারে না, কালসা কুয়াশার ঢাকা সে সব দিন। তবে দল বেঁধে সোপেনরা পাখির ছানা চুরি করেছিল, ব্রাহ্মণ মাইট-সোপেনের বাবা ভেঙেছিল, চিঠির-বাক্স খুঁড়ে করে চিঠি বের করে নিয়েছিল। যৌবন এল আর যেন নেকলাস অকস্মা থেকে ছিটকে বেরিয়ে তারা ডানার ডানার হয়ে এক একটি মেয়ে পুরুষ বন্ধুদের সামনে এসে দাঁড়াল। সৌর বীর্য হরমোনসিকেটা নিয়ে ততদিনে সূর্যের মতন এরাও জ্বলছে। বড় হয়ে গেছে হারান দত্ত লেনের ঘুমে ঢলাপিটের দল। মুখ হয়ে হারান দত্ত লেনের কাঁটি ছেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হাত মেলাল। রাজুর কাছে মহুয়েন্দ্রা গান শেখে, আর অরুণের আড্ডাঘরে বসে কি করে স্টাম্প কালেক্ট করতে হয় তার কৌশলটি জেনে রাখে। বিমলের কাছে মজুশ্রী বাঁশী বাজান শেখে, অরুণের কাছে টেনিস-টেনিস। তেমনি সীমা সুলেখা মায়া। একজন অরুণের কাছে কিছু শিখছে, আর একজন বিমল, আর একজন অরুণের কাছে। যা হোক একটা বিদ্যা। শেখা মনে কি, পরস্পরের আর একটু কাছে সরে আসা। একটু বেশি সময় একা কাটান।

যেমন আরতি। ছেহেতু সোপেন ভাল স্পেলটেবিয়ান। আরতি তার কাছে খেলাধুলো শিখত। তেমনি ফ্রান্সিসের কাছে ফ্রেঞ্চ ও ছবি-আঁকার পাঠ। আর্টিস্টিক প্রবীণ। এই নিয়ে আড়াআড়ি ছিল না কিছু। বড়জোর সময় দেখার প্রয়োজন হতো সময় একজন আর এক-জনের কাছে চেয়েছে। তারপর তো ছিলই সেজেগুজে ঝকঝকে আধুনিক পুরুষ হয়ে মেয়েদের সঙ্গে একা ওদের বেড়াতে যেতেনা, সিনেমায় কোনোদিন, তারপর হারান দত্ত লেনে ফিরে এসে 'জয়-মা-কালী' হেল্থোটার চৌকির ফিরে গোল হয়ে বসে গল্প আর মেয়েদাই পয়েটো দিয়ে কাউন আরি খাওয়া। তখন কেউ ছাত্রী না মাস্টার না। ফন্ধু। সবাই সবার বন্ধু। এদিকে এক সারি বন্ধু, সুঠাম দেববন্ধু ঘাম, ওদিকে নরম নরনারিতায় এক একটি মাধবী লতা।

—সোপেন এসি?'

হুঁ।'

—ওহ্, কত বেলি কারস বাধ-ছয়ে।'

—তুমি শুয়ে থাক, তুমি জেগে আছ কেন।'

—তোর রাতের খাওয়ার বড় বেলি হয়ে যায়।'

—হোক।'

—শরীরের দিকে মোটে নজর নেই।' জেঠির গলায় ধমকের ভঙ্গি-মন। 'এমন করলে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে কতদিন!'

—আমার স্বাস্থ্য নিয়ে ভাববার নেই।' সোপেনের গলায় বেলার সুর। স্বাস্থ্যের ভাববার তোমার। এখনো ভীষণ ভাববার।'

—কি যে বলিস! জেঠি নরকের নিচে হাসল। 'জোয়ান বয়েস, কোথায় আমি টুকটুকে একটি মেয়ে খুঁজছি তোর জন্যে।'

সোপেন কথা করে না। ভেজা তোয়ালে বারা-ন্দার রেলিংয়ে ছড়িয়ে দেয়। রাতের কুয়াশায় ভিজে হয়ে থাকবে। তবু। যা বৃষ্টিও হতে পারে। সোপেন চিন্তা করল।

—অ সোপেন!'

—কেন।' থমকে দাঁড়ায় সে। বিস্ময় হয়। নিজের ঘরে ঢুকছিল। 'কি বলছিলে বলো?' কেবল অনুকম্পা না, এতটা কিসের নিয়ে নিজের সামনের দরজার দিকে যাচ্ছ ফেরায় সোপেন। বড় বড় চোখে তাকায়।

—আমার যেন মনে হল কেউ আমার ঘিয়ু করছিল।'

—কখন!' সোপেনের মুখের ভেতরটা ভেতো ঠেকে।

—যখন তুই বাথরুমে ছিলি।'

—সারাদিনই তো এই চলছে। ঘর কনোরিয়া নয় বাজোরিয়া নয় আন্টেন সেন, নয়তো কর্নেল গাপুলী।—সব ফিটফাট মানুষ—ছেলেদের কাজ নেই, কতক্ষণ পর পর কেবল তোমার টেলিফোনে ডাকছে।'

—না না রাত করে আমার কেউ ডাকে না। রাতে আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না, ওরা জানে। একটু থেমে থেকে-জেঠি বড় করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল, তারপর বিড়বিড় করে বলে, 'এখানে আমার শোবার ঘরে টেলিফোন থাকে না, বসবার ঘরে ওটা—তারা জানে।'

হুঁ, জানে।' দাঁতে দাঁত ঘষল সোপেন। মনে মনে বলল, তুমি কি কম খলিকা জেঠি! ইচ্ছে করে শোবার ঘরে না রেখে বসবার ঘরে টেলিফোনটাই রেখে দিয়েছ—যাতে তুমি ঘুমিয়ে পড় বা বাথরুমে যাও কি খেতে বসো, ছুটে গিয়ে খপ্ করে আমরা তুলে বলতে পারি—আমি বা তোমার ভাতর সুবল। কোনো কন্ধু মিস্ হোক, তুমি চাও না।

—অ সোপেন!'

—কি!'

—তোকে যেন কেউ আর এখন টেলিফোনে ডাকে না।'

—আমাকে কেউ কোনোদিনই ডাকত না।' সোপেন দরজার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা নিজের ঘরের দিকে চলল। 'চিরকাল কেবল তোমার টেলিফোনই এসেছে এ বাড়িতে। আজও আসছে।'

—না না, কেবল আমার কেন? তোর জেঠিকে কতজনে ডাকত, বাবসার খাতিরে পার্টিরা ডাকত, ফুর্তি করতে বন্ধুরা ডাকত।'

—হুঁ, জেঠিকে ডাকত। আমাকে নয়।' নিজের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে সোপেন একটু দাঁড়ায়, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে মনে মনে বলে, জেঠিকে যদি আটবার আট জায়গা থেকে ফোনে ডেকেছে, তোমাকে ডেকেছে বাহান্নবার বাহান্ন জায়গা থেকে—জেঠা থাকতেই তুমি সাংঘাতিক উঁচাল দেওয়া একটি পাখি ছিলে কিনা—তোমার বন্ধুর সীমা সংখ্যা ছিল না, এখন বুড়ি হয়ে আরো বেড়ে গেছে। এখন এক শ বার এক শ জায়গা থেকে টেলিফোনে ডাক আসে তোমার।'

—আমার পরিষ্কার মনে আছে,' ও ঘরে জেঠির গলা থামছিল না। তোর বন্ধুদের নামগুলোও আমার ঠিক মনে আছে—তরুণ তপন জয়ন্ত রাজু বিমল প্রদীপ—আর বান্ধবী, এই যাকে আজকাল ফ্যাসান করে ছেলেরা গার্ল-ফ্রেন্ড বলে—তোরও কম ছিল কি, আরতি মহু-ন্দ্রা মজুশ্রী সীমা মায়া অনুলেখা আরো কেন কে কে—কতবার কতজন তোকে সারাদিন টেলিফোনে ডাকত। তাই না?'

ঘরে ঢুকে বড়াম করে দরজার ঘুড়ো পাল্লা বন্ধ করে দিল সে। আরশির সামনে দাঁড়াল। চুল কেটে অরুণ বাড়ি কাঁপিয়ে আসার পর সুশ্রিয়া হয়ে নিজেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছিল না। এখন পালা পলিত অনালিয়েছে, তারপর জেঠি, তারপর আয়নাওলাটা, তারপর আবার জেঠি।...এখন প্রান-ভরে আয়নায় নিজেকে দেখল। একটু ঝিম তুলে নিয়ে মুখে ঘষল। আতুরের বাবার চাঁচকা হাল্কাহোনার গন্ধ। গন্ধটা শরীরের ভেতর চুকে কেমন ঝিম ধরান ভাব এনে দেয়, সোটা শরীরটা আলস হয়ে পড়ে।

না, অরুণিমা ভিতর নিজের মুখ আর দেখতে পায় না। আর একটা মুখ। সন্ধ্যারাত্রির মত নির্বাক টলটলে দিঘা এক জোড়া চোখ। আরতির চোখ।

—কোথায় চললে এখন?'

—চলীলের কাছে।' আরতি বলল।

—কিন্তু...' মেহেদন চুপ করে থাকে। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। তার পিঠও প্রচুর ঘামছিল। শেমিজ ভিজে গেছে।

—আমার মনে হয় তুমি রাগ করছ।' আরতি যেন একটু ভয় পায়।

—মোট।' মেহেদন মুখ ঘোরায়।

—আমার মনে হয় আর একটু বেলিক্ষণ এখানে থাকলে তোমার ভাল লাগত, তাই না।' আবদুর গলায় আরতি বলল।

—কলাটি খোলাটা আর দেখা হয়ে যেত।' মেহেদন সংক্ষেপে উত্তর করল।

—ওটা কি না দিলেই নয়?' আরতির চোখের তারায় কৌতুক। 'আমার মনে হয় বড় ছেলেদের খেলা।'

—খেলা চিরদিনই খেলা।' মেহেদনের গলায় হঠাৎ উদাসীনতা ফুটে। অন্যদিকে চোখ ফেরায়। খেলা কখনো পুরোনো হয় না। মনে মনে বলে সে।

—তা-ও বটে।' মেটালার পড়ে আরতি। যেন ভাবতে থাকে।

—নাও, শাড়ি পরে নাও।' ঘরের ওপর থেকে পাটভাঁজ করা চকচকে রঙের সুগন্ধ শাড়িটা তুলে আরতির কোলের ওপর ছুড়ে দেয় মেহেদন। নিজে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। লাল শাইনের জানলার উপর পাখনামা পরতে থাকে। 'হুঁ তুলি নিয়ে প্রদীপ বসে আছে। তাড়াতাড়ি চলে যাও।' আরতির দিকে না তাকিয়ে বলে সে।

—হুঁ, যাব।' নরম গলায় বলে আরতি। যেন ভাবনা শেষ হয় না। পাটভাঁজ করা শাড়িটা বুকের কাছে ধরে রাখে। নিয়ালা পার্কে চলে এসেছিল দুজন খেলাধুলো করতে। পায়ের নিচে ঘাস মাথার ওপর মস্ত নতুন আকাশ। ফুরফুরে বাতাস। প্রদীপ ছবি আঁকবে। ও লিখবে। কিন্তু এখানে এই ছবি আঁকে কে। মিনিটক পরা শুকনো ছেলে এই ঝকঝকে।

'তারপর কিন্তু আমরা সবাই একসঙ্গে বেড়াতে বেরোব।' আরতি শাড়ি পরতে পরতে বলে।

—নিশ্চয়।' মেহেদন মাথা ঝাঁকায়।

শাড়ি পরা আরতিকে বড় বেশি বুকেরী বুকেরী দেখাচ্ছিল। পাঁচল শরীর সুবর্ষমুখী ফুল হয়ে ফুলেছিল। চোখে কাজল লাগাচ্ছিল। চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মেহেদন। সেদিন ছবি আঁকা দেখতে গিয়ে প্রদীপ ওই চলকা হলুদ ছাপ শাড়ি পরা আরতিকেই না আঁকতে আরম্ভ করেছিল কে জানে! সেদিনই আঁকা শেষ করেছিল, না কি পরের দিন আঁকবে বলে বাকিটুকু করে রেখেছিল! কে আর দেখে ওই ছবি দেখতে সবুজের বি হারান বন্ধ ফেলেন আঁছিছে। কেউ দেখে কি ফেলেনদিন? মেহেদন সিঁড়ির কয়েক নিচু ফেউ করে দিনের বেলা অলো ছেলেরা পুর্ণেন্দুবাবুর মেয়ে ছবি আঁকত। আরতিকে আঁকা দেখাত। আরতিও বোধ করি তারপর আর ফেলেনদিন সবুজের বি-তে যায়নি। এখন একটা ভাবনা ভেবে অনেক সময় মেহেদন সান্ত্বনা পায়। পেতে চেষ্টা করে।

...ঠিক ঠিক ঠিক।
ভেঁতির নাক ডাকছে।
চৌদ্দফোনটা ভেজেই চলেছে।

রাজু। আওয়া ছেড়ে উঠে গিয়ে চৌদ্দফোন ধরবে এত ভাল ছেলে মেহেদন নয়। ঘরে সুবল নেই। সুবলকে দিলহেই আনতে নিচে পাঠিয়েছে। তা-ও তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল। শুয়োরটা ফিরছে না। সম্ভবত নিজের সিগারেটটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে টেনে টেনে শেষ করছে। মেহেদন চিন্তা করল। শেষ করে তারপর আসবে।

হঠাৎ অনেকদিন পর একটা চলে ছিনিস রাস্তা করেছে সুবল বাটা। চিরাড়ি মায়ের মালাইকারী। কিন্তু ঘড়ঘড়ে ঈসাহ নিয়ে খাবে বলে চৌদ্দফোন বলল যা চিরাড়ির চমৎকার লাল টকটকে রঙ ফেলেও নকে গন্ধ লেগে ছিল ঘড়ঘড়ে মুখে ফুলে মালাইকারীর আস্বাদ যেন তখনো সে পেল না। বরং খারাপই লাগতে লাগল। কেননা চতুর্থে একটা ঘাস মেহেদন পরিষ্কার দেখছিল, এস্প্ল্যানেড পার হয়ে ধর্মতলার রাস্তায় ঢুকে পড়ছে। অসম্ভব কিন্তু। ট্রামিকের চক্রে যখন যখন গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ছে মধিও। তাতে অসম্ভব কিন্তু সুবিধে হচ্ছে। ঘড়ঘড়ের পা বসল করে দাঁড়াতে পারছে। এর মধ্যেই তার বাঁ-হাত টেনিস করছিল। বেজনা বাঁ-হাত ছেড়ে দিয়ে ডান হাতে শক্ত করে হাতলটা চেপে ধরল। অনন্তর দেখাদেখি রাজুও পা বসল করতে পারল। রাজুর কনুই চেপে ধরে বিমল সুবিধে করতে পারছিল না। এক মিনিটের জন্য বাসটা দাঁড়াল কি ফস করে কনুই ছেড়ে দিয়ে রাজুর কোমরটা ভাল করে জড়িয়ে ধরল সে। তাতে বিমল অনেকটা নিরাপদ বোধ করে। বিমলের স্পিটের সঙ্গে বুক ঠেকিয়ে তার একটা কাঁধ ধরে অরুণ ঝুলছিল। ধরুণ অসুবিধার জন্যে ঝুলছিল। রাজুর কোমরটা দু হাতের বেড়ি দিয়ে শক্ত করে ধরে বিমল দাঁড়াতে পেরেছে দেখে অরুণও বিমলের ঘড়ঘড়ে কাঁধ একলক্ষে আঁকড়ে ধরতে পারল। অরুণের একটা পায়ের ওপর পা রেখে মেহেদন কোনোরকমে ঘড়ঘড়ের ঝুলছিল। অরুণের পায়ের পাতা ব্যথা করছিল এবং তা মেহেদন বুঝতে পারছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। অরুণ বলছিল, ধর না, এখন, স্টপ্রে দাঁড়িয়ে থাক, আর অসুবিধে হলে পা সরিয়ে নিবি—তোর পায়ের ওপর আমার পা কিন্তু মেঁচলে যাচ্ছে না। একটু লালচে এই পর্যন্ত। বাসটা হুঙ্কার আবার চলতে আরম্ভ করেছিল, যে জন্য পা-টা সরাবার সুযোগ পেল না মেহেদন। সামনে খানিকটা ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বাস রীতিমত স্পীডে ছুটছিল।

—আমার মনে হয় ছটা স্কুল স্টপেজের আগে আর স্টপ্ নেই।' মেহেদন বিড়বিড় করে বলছিল।

—মোট!' এতগুলো কুলের কথা বলতে কষ্ট হয়, তবু একজন কথা বললে আর একজন কিছু মুখ বুজে থাকতে পারে না। অন্য মানুষ হলে অরুণ চুপ করে থাকত। এখানে যে তাদেরই একজন কথা বলছে। মেহেদন, তুই জন হয় নতুন ধর্মতলা স্টিটে এসেছিস—যেন আগে কোনোদিন এই রাস্তায় চলিস নি। ছটা স্কুল স্টিটের আগে আরো দুটো স্টপ আছে তোর জানা উচিত।'

স্টিটের আগে আরো দুটো স্টপ

—আছে নাকি।' অতিরিক্ত স্টিটের আগে একটা স্টপ আছে।' গলায় জোর দিয়ে সে বলল।

—হুঁ, অরুণ বলল, জ্যোতি সিনেমার সামনেও একটা স্টপ রয়েছে। কি স্কুল স্টিটের আগে অন্তত তিনটে স্টপ রয়েছে।'

—না, আমি বলছিলাম,' ক্ষুণ্ণিত গলায় স্বর মেহেদনের। যেমন করে অরুণের পা-টা চেপে রেখেছি, খুব খারাপ লাগছে আমার—নেক্সট স্টপে আলাদা করে দাঁড়াবার সুবিধে করতে না পারলে আমাকে নেমে পড়তে হবে।'

—কি যমন কথা।' ওদিক থেকে রাজু। রাজু মেহেদনের কথা শুনে ফেলেছে, ভেটি কাটার মতন চোখা বলল, ফলে তার গলার স্বরটাও যেমন যেন বিকৃত শোনাল। ঘড়ঘড়ের বুলতে বুলতে ভাল করে কথা বলা যায় না, তবু যেন গাড়লের মতন বকছে মেহেদন, রাজুকে মুখ খুলতেই হল। সুবিধে করতে না পেরে তোকে নেমে যেতে হলে আমরা ফেরে থাকব কি না—তোকে ফেলে রেখে আমরা সবাই হারান বন্ধ ফেলে ফিরে যাব—এতকাল পর বন্ধুদের খুব ছিনেমিস যা হোক।'

—তাই তো।' বিমল ফোনোরকমে ঘড়ঘড়িনটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আবার বলল, 'মেহেদন যেমন বলছিল—স্বার্থপরের মতন আমরা দিবি বাস-এ ওঠে চলে যাব, আর একলা রাস্তায় তুই ফেকে যাবি।'

অরুণ বলল, 'তুই নেমে পড়লে আমাদেরও তাই করতে হবে মেহেদন—তোকে আলাদা করে রেখে আমরা ফিরতে পারি না, এটা তোর মনে রাখা উচিত।'

—ওরের? ওরা?'

ঘড়ঘড়িনের ইশিত করে মেহেদন গাড়ির ভিতরটা দেখাল। আজ যেন জানালা দিয়ে ফোনো মেয়ের চুলের ঝলা কি ফড়ে আঙুলটাও দেখা যাচ্ছিল না। অন্যদিন কেউ না কেউ, পরকার হলে ওরা সবাই জানালা দিয়ে বার বার মাথা মুখ বা গলা বাড়িয়ে দিয়ে ভয়াবহ মেহেদনদের দেখে, কেমন করে ওরা ঝুলছে, কেমন সর্বনেশে খেলা খেলতে খেলতে যাচ্ছে, অথচ ওদের ভালভবে ভেতরের সীটে বসিয়ে দিয়েছে, আর নিজেরা বাদানুবাদ করে ফুটবোর্ডে ঝুলছে। মধুমুদলদের চোখে মুখে তখনো কুটিল লম্পট এক এবার যেন উঁকঝুঁকি মারছে। সুযোগ পেলেই ওরা চোটামেটি করছে। সাবধান, সাবধান!... আহা, রাজুর পা-টা যেমন কেমনধারা ঘায়ে লাগে, তুই মেহেদনকে ছড়িয়ে ধর ধর—ইস্, প্রদীপটাকে দেখাই যাচ্ছে না, ফুটবোর্ডে ঝুলতে গিয়ে কি বয়সের তফাত সবে ভিসে যাচ্ছে ও, মাছ-ঘরের ওপর পা ছেড়ে? এবারও ওর মাথাটা মুখটা দেখতে পাচ্ছি না—অরুণ, মেহেদন—প্রদীপ ঠিক আছে তো, একটা হাতল ধরতে পেরেছে কি ও?'

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরতে পেরেছে।' মেহেদন গলা চড়িয়ে বলেছে, 'আমাদের জন্য তোমাদের একফোঁটা ভাবতে হবে না, বলছি কি' একজন যদি আমরা ফেলনেরকমে কিন্তু, একটা ধরে দাঁড়াতে পারি—বাকি দু-জন ঠিক ঝুঁকিয়ে আসি ঝুলতে হবে। কেলো অসুবিধে হচ্ছে না করো। একজনের হাত ফসকে গেলে অন্যদের সকলের হাত ফসকে যেতে পা পড়ে ভেঙে গেছে ধরে রেখো। একটা চেন—সেজন ধরে আমরা এর ওর হাত ধরে ফেলব ধরে ঝুঁকি ধরে ঝুলে আছি। প্রদীপ যেমন আমার সার্টের কলার ধরে ঝুলছে এখন

—তোমার সার্ট ঝুঁকি ছিঁড়ে যায়?'

—না কি আমার জন্যে ছিঁড়ে যাবে!' মেহেদন হঠাৎ যন্ত্রের সুরে হেসে উঠেছে। 'আমার সার্টের কলার ছিঁড়ে প্রদীপের নিচে পড়ে যাওয়া আর আমার জন্যে ছিঁড়ে হারিয়ে ছিঁড়ে ওর পড়ে যাওয়া এক কথা। সমান কথা।'

শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বাদ্ধবীরা। যেন ভাবছিল ওরা বন্ধুর দেখেছে অনেক, কিন্তু হারিপড় দিয়ে বুকের পাঁজর দিয়ে বন্ধুকে আগলে রাখা—কেলো হারান বন্ধ ফেলের এই সাত সুবর্ষ ছেলেদের জন্যে শুনত যে জন্য তাদের বিশ্বয়ের ঘৈ ছিল না।

কিন্তু প্রদীপের জন্য সেদিন কে বেশি চেচামেচি করেছিল? অরুণদা সীমা সুলেখা? প্রস্রাবী? না কি আরতি? একটা অবাক করে মেহেদনদের। আরতি ফেলনোদিন চেঁচায় না। বাসের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কাউকে দুবিনারও করত না। কেমন এক অমায় কালো সমুদ্রের মতন

বিশ্বাস চেয়ে রাশি রাশি উৎসুক দৃষ্টিতে বন্ধুদের দেখত। যেন ভাবত, এই জন্যই ওরা পুতুল। সব সময় কথা কিনে চায়। বিনয় ভালবাসে। যে-কোনো মুহূর্তে সর্বনাশ ঘটে ছেড়ে পারে যেনেও হাসতে হাসতে ওরা ওই সর্বনেশে খেলা খেলছে।—মেয়েদের বাঁচিয়ে নিয়ে তখনও প্রচুর জায়গা ছিল গাড়ির ভিতরে—কিন্তু ড্রাইভারের দল বিন্দুমাত্রই কথা শুনল না—ফুটবোর্ড ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে। মেয়েরা অস্বস্তি বোধ করে। একজন পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে হাত কটি পাকা ফলের মতন ট্রাফিক বিশ্ব ছিটকে পড়বে একসঙ্গে মাটিতে। এই জন্য যেন তারা তৈরি।

আর্যতির ঐ চুল করে থাকা নিয়ে মেয়েরা অনেক দিন অনেক কিছু আলোচনা করেছে। রাজু বলত, মনে হয় মেয়েটার ছিঁচকে চোর—ওর ঝুলি ঝোলা—যে জন্য গলা দিয়ে কথাই বেরোয় না। অবশ্য জন্য মেয়েরা অনেকে কাঁটা দিয়ে চেপে-মেপে করে গাড়ি আটকিয়ে ছেড়েছে।'

সোমেন মাথা নাড়ত।

—ছেলে ওকে চিনতে পারছিল না। আর্যতি সম্পর্কে অনেক ধারণা অনারকম। শুধু বাইরে নেই। ওর চোখ দেখে মনে হয় ওটা প্রকাশের আবরণ। একদিন বুঝি অকারণে দৃষ্টি নামবে। টলটলে চোখে একটা কারুণ মমতার মতন কিছু সারাক্ষণ লেগে আছে ঠিকই। কিন্তু আসলে তা নয়। আমি ওকে খোলাখুলা দেখেছি। লজ্জা করেছি ছেলেটা বেন কষ্ট। কেমন প্রবীণ, তাই না? দুই হো ওকে ঘিরে তাঁরা দেখছিলেন।'

প্রবীণ হাসত। বলত, 'কি জানি ভাই, ওর মনটন নিয়ে আমি মেয়েই মাথা ঘামাই না। তাঁরা লিখতে বসে অনেক করে। বড়টা পাশি ঘা করে দেখাই। তারপর যখন আর ওর শরিকে চলা চলে না চলে যায়।'

—কিন্তু এতদিনও কি ছেলে করেছে—এমন করে ট্রামে বাসে ঝুলে ঝুলে যেও না। আমার ভয় করে!'

—না বলেনি।' প্রবীণ মাথা নাড়ত।

—আমাকেও কোনোদিন বলল না—নেভার—অন্ত ও জানে, রোজ দেখছে, আমার কাছে খোলা দেখার পর হোর কাছে ঢাকা দেখার পর ওকে নিয়ে ওর বান্ধবীদের নিয়ে আমরা বন্ধুরা সবাই বেড়াতে বেরোয়, পিকনিক করতে যাব, সিনেমায় যাব, যখনই যেখানে যাব, ওদের মেয়েদের গাড়ির ভেতরে বাঁচিয়ে দিয়ে আমরা ছেলেরা ফুটবোর্ডের কাছে দায়সারা-ভাবে ঝুলব—রোজ ঝুলছি—কিন্তু মুখ ফুটে ও তো কোনোদিন আমাকে সাবধান করে না।' কথা শেষ করে সোমেন বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাত। তখন চোখ পাকিয়ে বিমল অনন্তকে দেখত। যেন সোমেনের কথাটা টেনে নেবার নয়। এই নিয়ে ভাববার আছে।

—তা-ও বটে।' ভেবে নিয়ে বিমল মাথা কাঁকাত। মন্ত্রীর ভাবে তাকে বাসী লিখতে এসে দিনদু রোজ একবার করে ওই ট্রাম বাসের কথা তুলবেই। আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে। এ ভবে আমাদের ভুলে যাওয়া দিন দিনই ওর কাছে অসহ্য ঠেকছে।'

—তাই, মন্ত্রীর আমার সঙ্গেও প্রচণ্ড ঝগড়া করে।' অনুপ অস্বীকার করতে পারে না। চৌবেল-টৌবেল লিখতে এসে তাকে অন্তত একবার সাবধান করে দেওয়া চাই। মেয়েটার মাঝে অভিমান করে। 'এমন ওরলে ভাল ছেলে আমি ছেলেদের সঙ্গে আর ছেরেবই না।'

—তা অবিশ্যি থাকে না ওর।' রাজু একগাল হেসে বলত, মধুছন্দা গান লিখতে এসে রোজ আমাদের ঐ ট্রাম বাসে ঝুলে যাবার কথাটাই আগে তুলবে। এই নিয়ে বিজিবি কমপক্ষে হয় এক ওয়ান।'

—স্বাভাবিক।' অনন্ত ও হাসল এক সময়ে বলেছিল, 'আমাদের ওরা ভীষণ ভালবাসে। এতদিন আমরা গাড়িতে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছি, দেখে ওদের প্রাণ ভয়ে শুকিয়ে হয়। ওটা-ওটা লিখতে এসে এই নিয়ে ছেলে আলাদা আলাদা ভাবে এক একজনের সঙ্গে যেমন ওদের ঝগড়া করা চাই, তেমনি আমরা যখন সবাই একসঙ্গে বেরোই ওরাও বেরোয়, আর বাদ থাকে না কেউ, থাকতে পারে না—প্রকৃতির নিয়ম।'

অনন্তর মুখে একটু কাব্যটাব্য আছে। কাজেই কথাটা সে এ ভাবে বলত। যৌবাবি ছাড়া ঝুলের শান্তি নেই। পুতুল বন্ধু ছাড়া মেয়েদেরও একলা ভাল লাগে না—কিন্তু, ঐ যে, আপত্তি যেখানে, সেখানেই ঘুরিয়ে করে আমরা ছেলেরা গাড়ির ফুটবোর্ডের কাছে ঝুলছি—ওরা ভেতরে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিলে আর তখন একসঙ্গে আমাদের সবাইর জন্য ওদের চেচামেচি শুরু হয়। ওরে প্রাণ কাঁপে, আর্তনাদ করতে থাকে সব। পড় ছোক মেয়ের জাত তো। চুপ করে থাকতে পারে না।'

—একজন ছাড়া। সোমেন নীরস গলায় বলত, 'একজন চুপ করে থাকবে। টু মর্মান্তিক কোনোদিন মুখ ফুটে ফেরবে না।'

—তবে কি বুঝতে হবে।' বোকা বোকা একটা হাসি মুখে নিয়ে প্রবীণ একদিন বলেছিল, আমাদের জন্য আর্যতির মায়াদয়া নেই, একসঙ্গে ফেরতে হয় তাই ফেরেন—আমাদের ও একটুও ভালবাসে না!'

—'ভালবাসে', সোমেন সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাত করে বলেছে, আমাদের কাউকে ভালবাসে না ও, এমন কথা আমি বলব না, আমাদের ভালবাসে, আমরা আমরা একটু মুখে পাই, কষ্ট করে গাড়ির হাতল ধরে ঝুলছি দেখতেও ওর ভাল লাগে। কেবল তাই না, টেনশন হাই কমলে কি পড় নিলন করে আমরা কেউ যদি কখনো ছিটকে গাড়ি থেকে পড়ে যাই—দে-. ভেতরে ভেতরে ও আনন্দ পাবে।'

—আ!' চমকে উঠেছিল রাজু, বিমল অনুপ প্রবীণ।

—স্যাডিজম্।' অনন্ত গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করেছিল। 'আর্যতির মধ্যে ঐ জিনিস আছে তুই বলতে চাস সোম?'

বন্ধুদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এক সেকেন্ড চুপ থেকে সোমেন মাথা নেড়েছিল। 'আমাদের ও ভালবাসে—তাই আমাদের কাজে না কাজে হয় না দেখে ও স্বস্তি পাবে না।'

—'আশ্চর্য!' তখন বিড়বিড় করে বলেছিল, যেন তার গা শিরশির করছিল। 'তাই আমরা মায়াদয়াহীনে বলেছি, জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ও দেখে, আর পাঁচটা মেয়ে তখন চেচা-মেচি করে মরে—কিন্তু আর্যতি ভীষণ নীরব।'

'নির্বিকার।' সোমেন শেষ কথা বলেছিল।

সে সব আগের ঘটনা। আজ, এখন ছেলির চওড়া ভাইনিং-টেবিলে চিন্তি-মগ্নাইকারী ঘিরে বসে থাকতে তার প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে পড়ছে সে। ঠিক ঠিক করে ছেলির মনবার করে ঢুমানত টেলিফোন বাজছে। সোবার আর ছেলির নাক ডাকছে। সিনেমে ফিরতে গিয়ে সুবল রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেকেই সুখে টান টেনে দেখ করছে। ফুট-বোর্ডের ওপর অনুপের পা ঝেপে রেখে সোমেনের অস্বস্তি লাগছিল। পরের স্টপে গাড়ি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অনুপের পা থেকে পা সরিয়ে নিয়ে অন্যভাবে দাঁড়াতে পারে কি না চেষ্টা করবে। না পারলে নেমে যাবে সোমেন। কিন্তু না, তার কথা শুনে বন্ধুরা অভিমান করবে। 'একলা ছেলে নেমে যেতে কে দিচ্ছে! যদি দরকার হয় আমরা সবাই নেমে পড়ব। আমরা যখন যা করছি, একসঙ্গে করছি। আমাদের আলাদা করে ফেলা কিছু করার উপায় নেই। একটা দেখলে। একটা ফ্রেন্। সেকেলের একটা আর্টি মাকখান থেকে আলে পড়বে, আর বাকিটা অনন্ত থেকে ভিড়ের বাসের ফুটবোর্ডে ঝুলতে ঝুলতে হারান বস নেমে দিয়ে পৌঁছাবে—এমনটা কোনদিন কল্পনাও করিস না।'

ঝুলতে ঝুলতে রাজু ও অনন্ত আশ্চর্য লম্বা বক্তৃতা করতে পেরে-ছিল। তখন, বিমল, অনুপ, প্রবীণ—কেউ চুপ করে ছিল না।

—'সত্যি, এলাসলি চাইছি।' সোমেন দুশ্চিন্তের হাসি হেসেছিল। 'কিন্তু ভাবছি।' তার দুশ্চিন্তার অনুপকে বলছিল সে, 'যদি সেরকই, শেষে আমাদের নেমে যেতে হয় ওরা কী

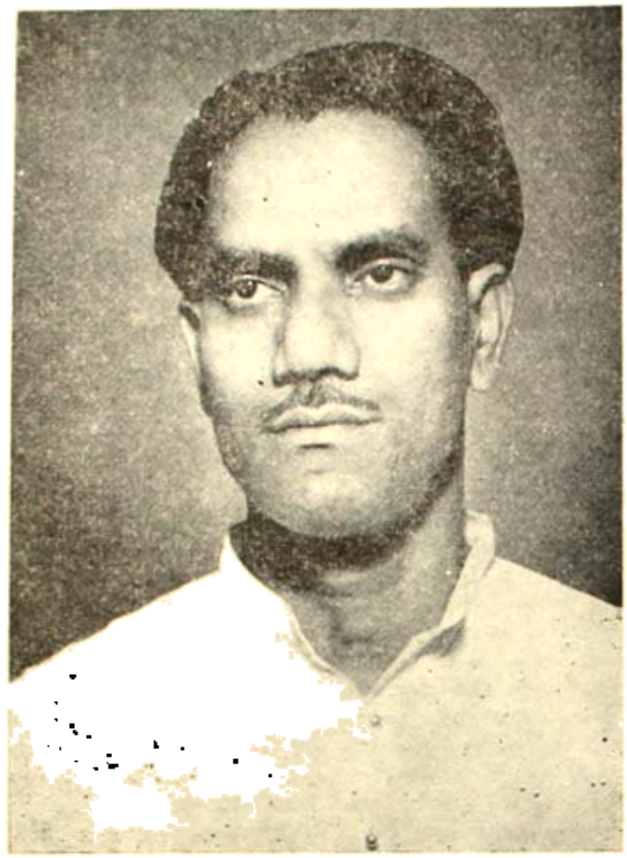

প্রেমব্রত (তরুণ)

করবে! আমাদের বান্ধবীরা? ওরা চলে যাবে এই পার্টিতে?

—তাই তো!' অরুণ ভাবনায় পড়েছিল। অরুণের সঙ্গে প্রদীপ, রাজু, অনন্ত, বিমল। ওরা, মজুমদারা একবারও জানালা দিয়ে গলা বা মুখ বাড়াতে পারছে না। এই পর্যন্ত কারো একটা কন্যই কি শাড়ির হিঁচটেকাটা অংশ চোখে পড়ল না। ছিড়ের বাস। প্রত্যেকটা জানালা দেয়ালে ঢাকা। কিছু দেখা যাচ্ছে না। সোপেন বলছিল, 'এমন হচ্ছ একটা হুজ্জুত হবে না। ওরা কী করবে তাই ভাবছি। যদি ধাকাধক্কি আমাদের নেমে পড়তেই হয়—ওরা কিছুই জানতে পারবে না।'

—হুঁ, পায়ের নিচের সাঁট পাওয়া গেল না, যে জন্য সামনের দিকে দুই-তায়ের সোফাসের সাঁটে কোনোমতে বসিয়ে দিয়েছি সব কটিকে। অনন্ত আমশোস করছিল, 'তাই এবারের জানালায় গলা বা মুখ বাড়াবার আর কোনো স্কোপ ছিল না বেচারাদের।'

'আমাদের দেখতে না পেয়ে ওরাও কম অস্বস্তি ভোগ করছে না। আমার তো মনে হয়, রাজু বলল, 'এভাবে চলতে থাকলে, যেহেতু আমরা কেমন করে ঝুলছি, কতক্ষে কে আঁকড়ে ধরে রেখেছি, কিছুই টের পাচ্ছে না কিছুই দেখতে পাচ্ছে না বলে ওরাও আকস্মিক নেমে পড়বে। আমাদের নিয়ে ওদের ভাবনা হোক তখন!'

—নেমে পড়া তারপর নয়।' গুম-গুমে গলায় অরুণ বলছিল, 'এর নাম টিন নম্বর ডবল ডেকার। এমন সাংঘাতিক ভিড় হয় হতচ্ছাড়া বাসে, আমাদের বোকা উচিত ছিল।'

—তাই তো' বিমল বলছিল, 'দরজার কাছে এসোতে পারলে তো নামবে—তেতরের যা অবস্থা—হুট্ করে একটা স্টপে গাড়িটা ধরবে যার টুঁসি করে আমাদের সব কটি ছেড়ে তড়কুদি নেমে পড়বে—অন্য বাস হলে অন্য রুটে হলে কথা ছিল—আজ, এই মুহূর্তে, আমি কেন কল্পনাও করতে পারছি না।'

—তাই তো!' প্রদীপ সায় দিয়েছিল। ভাল করে কথা বলতে পারছিল না। জুইবোর্ডের একেবারে কোনার দিকে কোনরকমে একটা পা ঝুলিয়ে রেখে সোপেনের কাঁধের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে সে। তা হলেও কণ্ঠ করে বিমলের দিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে ক্লান্ত একটু হাসতে পারল। এর মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। ঘামছিল সবাই। জানাই যাচ্ছে কোথা। অস্বস্তিকর নীরবতা হঠ করে থেকে বিভিন্নরি মুহূর্তে ছড়াচ্ছিল।

—আমার মনে হয়' প্রদীপ আবার বলছিল, 'আমাদের যে ওরা এমন দেখতে পাচ্ছে না, ভালই হচ্ছে—'

'খুব ভাল হচ্ছে,' রাজু বলছিল, 'কারুক চেচামেচি করত।'

'আমাদের মতন এত খারাপভাবে একটা ঝুঁকি নিয়ে আমরা আর কোনোদিন কোনো বাসে বা ট্রামে...' প্রদীপ বলছিল। কাজেই ওরা আজ চাঁদের সোলমাল করত। হয়তো কামা-কাটি শুরু করে দিত।'

—জানো, প্রদীপ আন্তে।' আর কেন কারো কথা শুনতে সোপেনের ভাল লাগছিল না। অরুণের পায়ের ওপর পা রেখে সে দাঁড়িয়ে আছে, এই জন্য কন্ডাক্টরের কথাবার্তা শুনতে হচ্ছে তার খারাপ লাগছিল? না কি, অন্য কোনো কারণ? বেকায়দায় একটা হাতল ধরে রেখেছে বলে বাঁ-হাতের কবজিটা ব্যথায় টাটিয়ে উঠেছে। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ইস্টার্ন-রেলের ইঞ্জেকশন দিতে দিতে ডাক্তার কম্পাউন্ডারকে এভাবে কন্ডাক্টরের কথা শুনতে বলেছে। হাতের একটা রগ ঝুলিয়ে দেয়। রগ নেবার সময়ও তাই করে। এখন সোপেনের সব কিছু ঘড়ির মতন ঝজুর নীল, নীল রগ জেগে উঠেছে। বাঁ-পা দিয়ে অরুণের পা চেপে রাখলেও তার আর একটা পা ঝুলে ঝুলছিল। ফলে ক্রমে টন পড়ে। ওই পা-টা বিচ্ছিরি টনটন করছিল। তার ওপরে ছিড়ের চাপ, ঘুমোচ্ছে। কুলকুল করে সোপেনের ঘুম ঘেমে যাচ্ছিল। যাদুদে জল তেষ্টা পাচ্ছিল তার। সব মিলিয়ে পৃথিবীটার ওপর সেই মুহূর্তে একটা কেমন বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। কেন এভাবে বন্ধুদেরও তার ভাল লাগছিল না। কেন গাড়িটা চলছে ঐ অবস্থায় ঝুপ্ করে লাফিয়ে পড়ে বন্ধুদের কাছ থেকে চিরকালের মতন বিদায় নিতে পারলে সে সুখী হত। লাফিয়ে অবশ্য পড়ল না। যা ভাবা যায় তা-ই করা যায় না। তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে সে টের পেল গাড়ির স্পীডও কেম কমে এসেছে। তা হলে নির্ঘাত নীল স্যাঁটের স্টপ প্রায় এসে গেছে। স্টপ এসে গেলে আর ভাবনা নেই। মনে মনে বলল সে। অরুণের পায়ের ওপর থেকে পা সরিয়ে নিতে পারবে সে। অরুণকে রিলিফ দিতে পারবে। তারপর নতুন করে জুইবোর্ডের কোথাও তার একটা পা রাখার জায়গা হয় কি না সে পরে দেখবে। হয়তো এক-আধটা পাসেঞ্জার নেমেও যেতে পারে। অর্থাৎ নিজের সুবিধার চেয়ে অরুণের সুবিধাই সে তখন চিন্তা করছিল। তারা চিরকাল বন্ধুরা একে অন্যের জন্য তা করে এসেছে। তা হলে হঠাৎ যে এক মিনিট আগে সকলের ওপর বিতৃষ্ণার ভাবটা এসে-ছিল? এর কারণ কি! জন হাতের কন্ডাক্টরের কাছে কপালটা নুইয়ে জামার হাতায় মুখের অনেকটা ঘাম মুছতে দেখে একটু শান্তি পেল সোপেন। এবং তখনি তার মনে হল —এরকম প্রদীপের ঐ কথাটাই সে সহ্য করতে পারছিল না। খুব খারাপ-ভাবে অরুণ তাকে ছুঁয়েছে। একটা ঝুঁকি নিয়ে আর কোনো দিন কোনো বাস বা ট্রামে তারা চেষ্টাচেষ্টি করেনি। খুবই সহা কথা। যে-কোনো মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটতে পারে। জানালার মুখ বাড়াতে পারছে না বলে বন্ধু-দেরা কিছুই দেখছে না। যদি দেখতে পেতো—তার মেয়ে মুখ চেঁচামেচি না—সবাই মিলে কামা-কাটি আরম্ভ করে দিত। সবাই? পরা কাটির প্রতিবাদ করতে পারলে সোপেনের ভাল লাগত। সবাই কাঁদবে। একজন ছাড়া। একজন কেবল বিশাল কালো মজবুত চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে। সেই তাকানোর পেছনে কোন্ ইচ্ছা লুকিয়ে আছে—আমি একদিন তোদের বলেছি প্রদীপ! রাজু শুনেছে। অরুণ বিমল শুনেছে। তাদেরই আজ আবার নতুন করে...

এভাবে জোর ধমক দিয়ে প্রদীপকে কথাটা শোনাতে পারলে সোপেন শান্তি পেত।

জেঠির একটা অ্যাপেন্ডিসাইটিস ফুটুর ছিল। সেটা শহরে মিলিটারি ক্যাম্পে। কেবল নাক থেকে আরম্ভ করে ঠোঁটের তলা পর্যন্ত অংশটুকু ব্যতীত সারা মুখ ব্যান্ডেজে ঢাকা ছিল। যে জন্য মনে হত জেঠা বুঝি কোথাও সৈ-এর হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে খুব করে সৈ খেয়ে এসেছে। রোজ দামী সাবানটাবান দিয়ে জেঠি নিজের হাতে চান করিয়ে দিত। সুবলকে দিয়ে স্পেশাল ঝোল রান্না করাত। তারপর নিজের হাতে কালীচরণকে আদর করে অনেকক্ষণ ধরে খাসে-তাত খাওয়াত। জেঠি যে সুরসিকা এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সোপেন সময় সময় চিন্তা করে। অ্যাপেন্ডিসাইটিস ফুটুরের যে নাম কালী-চরণ এই সূত্রে বোঝা যায় ঘরোয়া কায়দায়ের ওপর জেঠির হাতটি টান আছে। মেঠো ভাষিয়া, ডাক্তারের ফ্লাটে ঘাসোয়ারি করছে না কেন।

যাক সে, কালীচরণ ভরে গেছে। ফলে সোপেনের নিঃসঙ্গতা আরও বেড়ে গেছে। জেঠি খুব তোয়াজ করত কালীচরণের। করলে হবে কি। জেঠা অকৃতজ্ঞ। জেঠিকে মোটেই পাত্তা করত না। হয়তো জেঠি সারা দিন বাইরে বাইরে ঘুরে ফলে জেঠির ওপর তার অভিমান এসে গিয়েছিল। কারণ যে একটা ছিল না এমন নয়। নিজে থাকবে সারা দিন ঘরে বন্দী অবস্থায়, আর চন্দ্রই পার্থিটি হয়ে দিনের পাইন ঝুড়ুর করে উড়বে। কালীচরণের এটা মোটেই সহ্য হত না। জেঠি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে খুব চেয়ারটোয় করত আর বারান্দার রেলিঙ-এর ফাঁকে দই বাওয়া মুখটা বাড়িয়ে রেখে নিচে রাস্তার দিকে চেয়ে কি যেন কেবল ভাবত। দেখে সোপেনের মায়া হত। খেলনা খুলে দিয়ে কালীচরণকে নিয়ে তখনি নিচে নেমে যেত। তাকে কোলের কাছে বসিয়ে সে-ও অনেকক্ষণ খেলে বসে থাকত। কালীচরণ হয়তো ঘুমিয়ে থাকত। আর সোপেনেরও মনে হত সে একা নেই। তার একজন সঙ্গী আছে। রাত ভোর উঠে এমন কেমন একলা বারান্দার ইজিচেয়ারে শুয়ে হারান দত্ত লেনের মাথার উপরের তিন কোনা আকাশটা দেখছে —কালীচরণ বেচে থাকতে এই সমস্যাটার হয়তো সুন্দর সমাধান দিয়েছে। ফলে তার মনটা সোদিন এমন হুহু করত না। খুকীটা তার প্রায় ঠেকে না। এবং রাত্রের ঘুমটা তার বেশীমাত্রি ভাল হত।

কথাটা জেঠি ঠিকই বলে। সোপেনকে কেউ আর টেলিফোনেও ডাকে না।

ডাকবার আর আছে কে! জেঠিকে সে যদি বেকেতে পারত আমার মনে হয় কেউ আর বাদ নেই। সোপেনকে জেঠি ঝড়ানোও। তার চাকরি করার বাধ নেই।

ওরা—সোপেনের বন্ধুরা টেলা রোজদরের ধাক্কায় চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। কেউ জার্মানী, কেউ আসাম, কেউ কোলেবাজারে কেউ কুমরা সাদব। বান্ধবীরা? কয়েরা কয়েরা বিয়ে হয়ে গেছে। সীমা এখন-ছেলেমেয়ে হয়ে আকাশে উড়ছে। মন্দাক্রান্তা অনেকদিন অমেরিকায় চলে গেছে। টি-টি না কিসের ট্রেনিং নিচ্ছে। সুজন কল-কাতায় আছে বটে। একজন কলেজে পড়ায়—কলেজে পড়িয়ে পড়িয়ে মাথার চোট সব ধরে না সোপেনকে টেলিফোনেও ডাকবে। আর একজন? আর একজনের খোঁজ সোপেন রাখে না। ইচ্ছে করে রাখে না।

কিন্তু জেঠিকে বোঝাবার জন্য এত কথা মুখ থেকে বের করার বৈর কোথায় সোপেনের। তা হলে লাহিড়িকেও তো তখন অনেক কথা বলতে পারত। যত রকম সন্দেহ লোকটার চোখে কিকিয়ে উঠতে দেখ-ছিল না সে! যার অসহ্য চেকে রাখতে চতুর লাহিড়ি খুব 'আক্-সিডেন্ট' 'আক্সিডেন্ট' করেছে। সোপেন সায় দিয়েছে।

এবং এটা খুবই সত্য কলকাতার রাস্তায় আক্সিডেন্ট ছাড়া রোজকার ঘটনা এর কি আর হয়েছে! আক্-সিডেন্ট প্রায় কেবল পকেট-মারার ঘটনা। প্রত্যেকটা ট্রামে বাসে কারো না কারো পকেট মারা যাচ্ছে। যাবেই। তবে সোদিন বর্ষতলা স্ট্রীট-এ তিন-নম্বর ডবল ডেকারে কারো পকেট মারা যিয়েছিল সোপেনরা শোনে নি। সোপেনের পরিষ্কার মনে আছে ঘড়ি শীল স্যাঁটের ঘরের স্টপে গাড়িটা যেন বরফারের চেয়ে একটু বেশি সময় দাঁড়িয়েছিল। তাতে তাদের অবশ্য সুবিধাই হয়। একটা লোক ভিতর থেকে ধাক্কাধাক্কি করে বেরিয়েও আসে। তবে যাবার সময়

যার যেন মাথা না কনুইয়ের গুঁতো মেরে লোকটার চশমার একটা ডাঁট ভেঙে দেয়। ফলে বাস থেকে নেমেই সে যা তা গালাগাল করছিল, মুখখিস্তি করছিল। কে তার চশমার ডাঁট ভেঙেছে চোখে দেখেনি। যেন এই জন্য তার মারামারি উত্তেজনা ও চিৎকারটা বেশি শোনা গিয়েছিল। বাসসুদ্ধ মানুষকে গালাগাল করছিল। তার অসহায়তা দেখে ও কথা আঙুল রেখার মতন বিশিষ্টতাটুকু শুনে বাস-পাসেঞ্জারদের মধ্যে অনেকে বাঁচে ফেরে হাসছিল। সেদেশনের সে-সব দিকে মনযোগ দেবার সময় ছিল না। লোকটা নেমে পড়তেই দরজার মুখে দাঁড়ান মুটো মানুষ এক মুহূর্ত ঠেলাঠেলি করে একটু ভিতরের দিকে ঢুকতে হবে, আর তক্ষুণি প্রদীপ ফুটবোর্ডের বেল খানিকটা জায়গা দখল করে ফেলে। এবার শরীরটা ঘুরিয়ে দিয়ে সহজভাবে সে দাঁড়ায়। যাক্, এতক্ষণ এক হাতে হাতল ধরে ঝুলছিল। জায়গা হওয়াতে দু হাতে হাতলটা ধরতে পারল। ধরতে পারায় মুহূর্তে মুহূর্তে ভিতর থেকে তার সঙ্গী কেমন ভড়িঘড়ি করে বাসের সেই সুযোগ করে দেয়। বিমল ও প্রদীপ দুইজনেই বাসের কেমন ও কাঁধ ধরে ঝোলা হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ কুঁজো হয়ে ঝুলছিল বলে। বাস ফোরেও ভল্ট হচ্ছিল তখন। ইতিমধ্যে সেদেশনও অন্যদের পায়ের ওপর থেকে পা সরিয়ে নিতে পারে। অন্যদের দু ঠ্যাং-এর ভিতর দিয়ে ফুটবোর্ডে খানিকটা জায়গা করে নিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত ও নিরাপদ হয়ে দাঁড়াতে পারল। পায়ে ধরার আর কোনো ভয়ই রইল না। অবশ্য পড়ে যাবে, এই ভয়ের চেয়েও অন্যদের কষ্ট হচ্ছে, তার গায়ে চাপ পড়ছে, এই চিন্তাটাই সেদেশনকে পীড়িত করছিল বেশি। প্রদীপ যেন তার সঙ্গীর কলার আঁকড়ে ধরে রেখেছিল সেভাবেই আঁকড়ে থাকল। তবে ফুটবোর্ডের একটা কোনার দিকে প্রদীপকে ঘেঁষে আর ঠেলে দাঁড়াতে না হয়—বাঁ-হাত বাড়িয়ে সেদেশন তার কোমরটা জাঁকড়ে এদিকে টেনে রাখল। তাতে প্রদীপ আগের চেয়ে অনেক নিরাপদ বোধ করছিল। প্রদীপের তাকান দেখে সেদেশন বুঝতে পেরেছে। মতিলাল স্ট্রীটের স্টপেজ ছেড়ে বাস তখন হুহুশব্দে করে এগোচ্ছে। তাদের জলল ডেকরের মধ্যে মধ্যে একটা আন্দোলন আঁচিল। আন্দোলন। তার মনে হাসপাতাল—আন্তার— মার্ডারি — এমারজেন্সি-ওয়ার্ড — যেন অনেক কিছুর অস্পষ্ট ইঙ্গিত গাড়িটার ঘরে সেদেশন দেখতে পেরেছিল। এমন কি মরা-মরার ছবিও। মনের একটা বিশেষ অবস্থার জন্যই যে এটা হয়েছিল, আজ সেদেশন বুঝতে পারে। ছেটির বাড়ির দোতলার বারান্দার ইজিচেয়ারে একলা চুপচাপ শুয়ে হারান দত্ত ছেলের মধ্যের ওপরকার হেরোনা আকাশটা দেখতে দেখতে ঠান্ডা মাথার আলা-ভোলা সবটা জিনিস বিশ্লেষণ করতে তার এখন আর কোনো অসুবিধাই হয় না।

না, কেবল যে আজই প্রথম, এই নতুন বর্ণভেদ সৃষ্টি করে ঠোকাঠুকি গায়েপড়ি পাসেঞ্জার তুলে নিয়ে একটা জলল ডেকরের হাঁসফাঁস শব্দ করে ছুটে যাওয়ার দৃশ্য দেখছে তা নয়। এই নিয়ে এই অঞ্চলে বছর তিন বছরের অন্তত পাঁচশ বার তার চোখের সামনে ঘটিটা ভেসে উঠেছে। এবং যত দিন যায়—তত বেশি ঘটিটা সে দেখে, তত তার মন শক্ত হতে থাকে, তত বেশি কঠিন নির্লিপ্ত থাকতে পারে সে। সেদিনের ঘটনা যে-কোনো এক দিন ঘটতে পারত, যে-কোনো রাস্তায়, যে-কোনো ট্রামে বা বাসে ঘটতে পারত।

ঘটে—রোজ এমন ঘটছে। একটু আগে লাহিড়ি তাই বলছিল না! ব্যাকসিডেন্ট। মুখে শব্দটা উচ্চারণ করল ঘটে, লাহিড়ির চোখে আর একটা সন্দেহ ঝুলছিল। ঝুলছিল কি? তা ঝুলুক না সন্দেহ। সেদেশন গ্রাহ্য করে না। কেবল অবশ্য লাহিড়ি কেন, হারান দত্ত ছেলের বাড়ি মানুষেরা, ব্রাডপ্রিসার শাট কনুয়ের টিল মেরে রাস্তার লাইটপোস্টের বলে তাদের যা দেখা পাওয়া যায়ের দিন থেকে আরম্ভ করে তাদের ছেলেন বয়স পর্যন্ত যতদিন দেখে আসছিল, সেদেশনকে সন্দেহ করতে পারত। হয়তো করেও ছিল। আর ঐ বিশেষ মিনিটের মৌলালীর কারাকাছি, বর্ণভেদা স্ট্রীটের সেই দোষা জন্তুরের দেকতনের সামনে বড় মানুষ উপস্থিত ছিল। তারাও পারত সেদেশনকে সন্দেহ করতে। হয়তো করেও ছিল। যা তিন নম্বর জলল ডেকরে সেদিন বড় পাসেঞ্জার ছিল। সবাই তাকে সন্দেহ করতে পারত। বাইরের মানুষ কেন, সেদেশনের আবাল্য বন্ধুরা? অনন্ত বাবু, তপেন বিমল অরুণ? যদি তারাও সেদেশনকে সরাসরি সন্দেহ করত, তার কিছু বলার ছিল কি! যা আজও যে করছে না কে বলবে। হয়তো করছে সন্দেহ। বড়টা অনুমান করতে পারে সেদেশন। প্রত্যেকের মনে এক প্রশ্ন। কিন্তু লজ্জা—মুখ ফুটে কেউ বলতে পারছে না। বলেনি কোনো দিন। যেমন লাহিড়ি। বলতেই পারল না। তাইতো সেদেশন তার সুযোগ নিচ্ছে। নিতে পারছে। নিতে পেরে তার ভাল লাগছে। এই জন্য দিন দিন বেশি শক্ত হতে পারছে সে। নির্লিপ্ত থাকতে পারছে। এই জন্য বাড়ির সামনে রকটার ওপর পা ঝুলে চুপ করে বসে থেকে বাড়িঘেরা মানুষ-জন দোকানপাট রোজ কুয়াশা কখনও বা অন্দরে মুখের হাঁড়ি পড়া দেখে সে। অ্যাকসিডেন্ট। এ ছাড়া কিছু নয়। যে জন্য সুখলালকে হাসি-হাসি করে বলতে অসুবিধা হয় না। নিঃসঙ্গ! কিন্তু কথা কি। কাজকর্ম থকে লোকের। হুজিয়োজগতের ধান্দার ঘুটোঘুটি করতে হয়। সেদেশনের মতন বড়লোক ছোট নেই সবারের, যে চিরকাল বসবেবে জন জানমুলের মোকার মতন একটা বোঁটার মধ্যে আইকে থেকে রাজপাটে বাঁধিয়ে লাঁদের খেলা দেখবে, লাইন দিয়ে সিনেমার পয়লা দিনের পয়লা শো-এর টিকিট কাটবে, চারদের থেকে হয়ে ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে হারান দত্ত লেনে ফিরে আসবে! বাস্তবীরাও কিন্তু চিরদিন হোমানের সঙ্গে মানমনে হাওয়া খেতে, ডায়মন্ড হারবার বা শিবপুর পিকনিক করতে যেতে বা হোটেল রেস্তোরাঁর আড্ডা দিতে বসে থাকে না। যেমন দিনকাল মেয়েদেরও এখন চাকরি করতে হয়। আর যদি রাত-দুপুরে ফিরে হয়ে যায় তারো, সংসার ছেলেমেয়ের দেখতে হয়, বা বুড়ো শ্বশুর শাশুড়ির সেবায় মন দিতে হয়। হুঁ, শ্বশুর শাশুড়ির সেবা। এখনও এটা ঘরোয়া দেশ যে।

কাজেই মনুষ্যত্বহারা সন্দেহ করে কি ভেবে করে সেদেশনের কাছে আসে না, তার খোঁজখবর নেয় না—তোমরা বলতে পার। সেদেশনের অন্য কথা বলার আছে। বলার থাকে। বাস্তবীরা চাকরি করছে, স্বামী-পুত্রের সংসার দেখছে, শ্বশুর শাশুড়ির সেবাযত্ন করছে। সেদেশনকে একদিন টেলি-ফোনে ডাকতেও সময় নেই তাদের।

কাজেই সেদেশন নিশ্চিন্ত।

এক হিসাবে নির্ভাবনা তার এখনকার জীবন। কেউ কাছে আসে না। বুড়ো মানুষের মতন নিজের মনে একা একা বসে থাকার তৃপ্তি কম কি। মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে? মিথ্যা কথা। তবে আর বিকেলে জল হবার পর মনের আহ্লাদে আজ নক্সাকাটার দোকানে ঢুকে মাথার বাবরি গালের জুলপি ও গোঁফ পরিষ্কার করে শিস্টুর দোকানে চা খেয়ে আবার এসে বাড়ির সামনের রকটায় সে বসতে পারত না। তার মুখে হাসি লেগে ছিল। লাহিড়ীর মতন আর একটি মানুষ জলের ওপর দিয়ে ছপছপ করে তখন হেঁটে গেছে। হারান দত্ত লেনের মানুষে। হয়তো ইঁদিলদার। হয়তো সেদিন মাইনে পেয়েছে। এক জায়গায় চাকরি ছেড়ে রিটায়ার করার পর আর এক জায়গায় চাকরি করছে পূর্ণেন্দু ভাণ্ডারি। উপায় কি। কিন্তু প্রদীপের শোক ভুলে গেছে। তা না হলে হঠাৎ এদিকে ঘাড় ফেরাতে সেদেশনের সঙ্গে চোখাচোখি হল, আর ভদ্রলোক হাসলে। আশ্চর্য, সেদেশনও হাসতে পারল। কেন পারবে না, বাবা যদি ছেলের শোক ভুলতে পারে, সেদেশনের না পারার আছে কি।

তবে সেদিন সেদেশন ঐ ভদ্রলোকের মুখের দিকেই তাকাতে পারেনি। সম্ভব ছিল না। প্রদীপের শোকে সে যেন সবচেয়ে বেশি অস্থির অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ফুটবোর্ডে প্রদীপই তার সবচেয়ে কাছে ছিল। শেকলের আর্টটার ঘটন পর পর তারা হারান দত্ত লেনের সাহসী সাংঘাতিকভাবে ঝুলছিল অস্বীকার করবে কে। প্রদীপও একটু, মানে বলেছিল, একটা ঝুঁকি নিয়ে, তারা আর কেনোদিন ট্রামে বাসে যায়নি। সেদেশনের বাঁ-দিকে তার জামায় কলার আঁকড়ে প্রদীপ একটা পা ফুটবোর্ডে কোনো-রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিল। মতিলাল স্ট্রীটের পর অন্তত আর জন স্টপেজ তারা পার হয়ে এসেছিল। মৌলালীর কারাকাছি চলে এসেছিল বাসটা। বেলা ঘোলা আকাশ। হঠাৎ যেন অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু কলকাতার রাস্তা অন্ধকার হতে না হতে হাজার আলো জ্বলে ওঠে চারদিকে। সেদিন জ্বলল না। লোড-শেডিং। ঘনঘন করছিল বর্ণভেদা স্ট্রীটের মতন রাস্তা। অন্ধ গাড়ি-ঘোড়া দিশাদিশ করছে। সম্ভবত রাস্তার কোথাও মেরামতের কাজ হচ্ছিল। যে জন্য বেশ খানিকটা জায়গা পর পর কয়েকটা ড্রাম বসিয়ে দিয়ে ও চার কোনায় লাল বাতি চারটে জেলে ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল। ফলে বাস লরি ট্যাকসি প্রাইভেট একটের হয়ে চলছিল। মৌলালীর কারাকাছি বর্ণভেদা স্ট্রীটের ওদিকটার পথের দু পাশে রাজকুড়া কুকড়ুড়া এবং আরও কি সব গাছের হুড়াহুড়ি সকলেরই চোখে পড়ে। যে জন্য লোড-শেডিং হতে না হতে জায়গাটা একটু বেশি অন্ধকার হিজিবিজি চেহারা ধরে। বিশাল বেহ নিয়ে জলল ডেকরকে অনেকটা রাস্তা জুড়ে চলতে হয়। সম্ভবত সেই কারণে এবং আগে পিছনে যে-সব গাড়ি চলছিল সেগুলির সঙ্গে সমান লাইন রেখে এগোতে গিয়ে—তা ছাড়া ড্রাম দিয়ে ঘেরাও করা সীমানার বাইরেও রাস্তার এখানে সেখানে দু চারটে পাথর যেন সরে গিয়েছিল অর্থাৎ কয়েকটা কারণেই বাস্তা হঠাৎ বড় রকমের একটা ঝাঁকুনি খায়। ঝাঁকুনি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা মেলা 'মেলা' চিৎকার। না, জলল ডেকরের কেউ চিৎকার করেনি। যেন এতবড় বাসটার এতগুলি পাসেঞ্জারের মধ্যে একজনও টের পেল না কি হল। রাস্তার লোক হৈ-হৈ করে উঠল। এক সেকেন্ডের ব্যাপার। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে যা ঘটবার তখন ঘটে গেছে। আগে পিছে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। জলল ডেকরের ফুটবোর্ড খালি করে দিয়ে হারান দত্ত লেনের দলটা নেমে পড়েছে। তারাই সবচেয়ে বেশি অবাক হতভম্ব হল। এ কি করে সম্ভব! এমন তো হবার কথা ছিল না। সেকেন্ডের একটা আধটা খুলে ছিটকে

রাস্তায় পড়ে গেল, আর তারা কেউ টেরই পেল না! পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে একটা ট্যাক্সি ছুটে এসে প্রদীপকে চাপা দিয়েছে। রাস্তার কিছু মানুষ উত্তেজিত কিন্তু হয়ে ট্যাক্সিটা তক্ষুনি ঘিরে ফেলেছে। যেন গাড়ি থেকে ড্রাইভারকে টেনে বের করে মারধর শুরু করবে এবার। সে সব অন্য কথা। বন্ধুরা মোশেনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য, তুই টের পেলি না, তোরা পরস্পর জড়িয়ে ঝুলে-ছিলি।'

—তাই তো,' রাজুর কথা শেষ হবার আগেই অনন্ত চেঁচিয়ে ওঠে। 'ওয়েলিংটনের মোড় পর্যন্ত জিনিসটা আমি-ও লক্ষ্য করেছিলাম—প্রদীপ মোশেনের জামা ধরে রেখেছে—'

—আমি কিন্তু তার পরও ঘাড় ঘুরিয়ে একবার প্রদীপের মুখটা দেখেছিলাম। আমার সঙ্গে ওর চোখা-চোখি হয়—একটু যেন হেসেছিল ও, ভাবলাম এবার সে সামিবে করে দাঁড়াতে পেরেছে...'

—বিমল বলল, 'আমার তো মনে হয় ঠিক স্কুল স্ট্রীটের পর থেকে আমাদের কারো যেন একটা শব্দ হচ্ছিল না, আরো দুটো লোক ভেতর থেকে নেমে পড়েছিল তখন। যে জন্য অনন্ত আর একটু ভেতরের দিকে শরীরটা ঢোকাতে পেরেছিল—'

—সেটা অন্য জিনিস, অনন্তর গলায় স্বর বিকৃত শোনায়। অস্ফুট করে সে মোশেনকে দেখছিল। 'আমার প্রশ্ন—প্রায় সকটা রাস্তা তোর গায়ে গায়ে লেগে রইল প্রদীপ—দুই বেল খানিকটা সময় তার কোমর জড়িয়ে ছিলি — আমি দেখেছি. এই

—হুঁ, এই অবস্থায়, এই অবস্থায়...' বিড় বিড় করছিল মোশেন, থুতনি নাড়াচ্ছিল, দু জোড়া চোখ সেই ভয়ঙ্কর উত্তেজনার মুহূর্তে. রাস্তার হট্টগোলের মধ্যে তার দিকে তাকিয়ে। একটা প্রশ্নের চুলচেরা মীমাংসা চাইছিল সব। পুলিস এসে গেছে...আম্বুলেন্স... তখন ছেকেরহাট আগে আগে ছোটা চলছিল সেটা নয়...নতুন একটা...যেন ট্যাক্সিওয়ালাকে মারধর করার পর তার গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে...প্রদীপকে তুলে নিয়ে আম্বু-লেন্স সরে যাচ্ছে...

—মোশেন, মোশেন!' রাজু ডাকছে, বিমল ডাকছে। কথা বলছিস না কেন, উত্তর নেই কেন তোর মুখে—'

—হুঁ, এই অবস্থায়...এই অবস্থায়...'

—এই মোশেন!' অনন্ত আবার তার কাঁধ ধরে জোরে কাঁকুনি লাগায়। মোশেনের থুতনি নড়ছে। শরীর কাঁপছে। দু হাত শূন্যে তুলে দিয়েছে। পাজামের দড়ির মতন ঘামের ফুল ঝাড়া খাড়া হয়ে উঠেছে। পাকা কলমের মতন লাল হয়ে চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'হুঁ, এই অবস্থায়...এই অবস্থায়...' আর বিড়বিড় করছিল না, চিৎকার করছিল মোশেন। 'এই অবস্থায়, তাই তো, প্রদীপ কি করে পড়ে যায়, আমি তাকে ধরে রেখেছি। আমার সার্টের কলার ধরে সে ঝুলছে, ঝুলছে... রাজপথ, হাজরার মোড়, আমার ছোট ভায়ের মতন, আমার বন্ধু, আমার জামার কলার খামিয়ে নিয়ে থাকা দিয়ে আমি ওকে বাস থেকে ফেলে দিয়েছি—'

—এই চুপ কর!' অনন্ত তাঁকিল জোরে গর্জন করে উঠল। ওদিকে ট্যাক্সি নিয়ে গোলমাল, ধাক্কা ধাক্কি করে যাদুনে জড়াচ্ছিল। এখানে একটা মানুষ দু হাত শূন্যে তুলে দিয়ে পাজামের মতন হাই হাই করে কাঁদছে।

—এ্যাই, তুই কাঁদছিস কেন, মোশেন!' মোশেনের মুখের কাছে মুখ সরিয়ে নিল রাজু। 'আমরা কি বলেছি যে তুই ইচ্ছে করে...'

'হুঁ, ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে...আমি আমি...আমার বন্ধুকে প্রদীপকে ইচ্ছে করে—মোশেন আর দাঁড়িয়ে থাকে না, যেন দাঁড়াবার শক্তি, তার লোপ পেয়েছে, মুখটা মুগীর মতন সব দাঁতগুলো কাঁপছিল, কাঁপতে কাঁপতে ফুটপাতের ওপর বসে পড়ল।

—'ওকে ধর অনন্ত, সিমুদ্দির একটা ট্যাক্সি ডাক তখন—এখান থেকে সরিয়ে নেই ওকে—' অনন্ত, রাজু দুজনেই চেঁচামেচি করছিল। তারপর ওরা কি ট্যাক্সি ডেকেছিল, ট্যাক্সিতে তুলে কোথায় নিয়ে এসেছিল মোশেনকে সেসব ওই হারান বসু লেনে? হাসপাতালে প্রদীপকে দেখতে কে কে গিয়েছিল? কেন তার পরের আর কোনো ঘটনাই মোশেনের মনে ছিল না। মুছে গিয়েছিল। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

এখন মোশেন হারান বসু লেনের মাথার ওপর তিনকোণা আকাশের দিকে চোখ মেলে দিয়ে শুটো জল-জলে তারা দেখতে দেখতে সবের ভাবনা ভাবছে তিনই। তখন, সেদিন, কী অবস্থায় ছিল সে? অজ্ঞান করে-ছিল! না কি সত্যি মাথাটায় গোলমাল হয়েছিল, তারপর মুছা!

তাল যে তাল, পাজাল হতে গিয়ে মুছা যেতে গিয়ে একটা জিনিসের দিকে কিন্তু তার একদম নজর দেওয়া হয়নি। ওরা তখন ছেকার থেকে সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়েছিল কি? মনে হচ্ছে-না মনে হচ্ছে সাঁঝা সুলেখা মারা ও এ আর একজন। প্রদীপের খোতলান শরীরটা ঘেরে ওরা কি হাউমাউ করে কাঁদছিল! সবাই? একজন তো কাঁদে না। কান্নার শব্দ যেমন জানে না। চোখের মতন অবয়বে কান্না চোখ ফেলে কেবল চেয়ে থাকে। চেয়ে দেখে। সেকেলের আন্ডটির মতন পরস্পরকে আঁকড়ে ধেকে আমরা বন্ধুরা গাড়ির কুইবেরের কাছে ঝুলতে থাকি, আর ভিতর থেকে বন্ধুবাঁরা জল পেয়ে চেঁচামেচি করতে থাকে, ব্যাকুল হয়ে ওঠে ওরা—একজন দাড়া, একটি গলা থেকে কোনোদিন আওয়াজ বেরোয়নি। মোশেন ভুলে গেছে? পরে সে শুনেছিল, ওরা সবাই হাসপাতালে গেছে, মার্ক খেয়ে, তারপর দল বেঁধে শ্মশানে।

খবর পেয়ে হারান বসু লেনের আরও অনেক মানুষ শ্মশানে গেছে। যায়, এক এক করে মোশেনের বন্ধুরা সবাইকে ঘুঁজেছে. আমাদের জন্যে মোশেনটাই আসতে পারল না. ও-ই সবচেয়ে বেশি কাছ হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত ওকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছিল কিনা প্রদীপ—তারপর কেমন করে রাস্তায় হঠাৎ আঁধুনি নামতে প্রদীপের মুঠো আলগা হয়ে যায়, মোশেনের সার্টের কলারটা আর ধরে রাখতে পারে না, ফলে যা ঘটার ঘটল। মোশেনটাই আঘাত পেয়েছে বেশি। এখন আমাদের ভয়, শক্ শেয়ে না ওর মাথার গোলমাল হয়ে যায়।

তাই তো, শক্ শেয়ে না মোশেনের মাথা খারাপ হয়ে যায়! মধ্যে থেকে উঠে বসবার ইজিচেয়ারে শুয়ে আকাশের তুলোটী তারা দেখতে দেখতে সে এখন চিন্তা করে, পাকুর মানুষের কাছে একটা কিছু লুকো-বার জন্য অনন্তকে রাজুকে তখনকে বিমলকে সেদিন এসে একটা কথাই বার বার করে বলতে হয়েছিল। না করে উপায় ছিল কি। ঐ সব কঠিন মুর্মির ফেকলের আর একটা আর্টি যে মোশেন। আর সে কিনা প্রদীপের শেষ কাজটা সারতে শ্মশানে উপস্থিত নেই।

আচ্ছা, যদি সে সেদিন শ্মশানে যেত, ঐ পুড়োর দিকে, পুর্ণেন্দু-বাবুর দিকে কেমন করে তাকাত? ছেলের মুখে আগুন দিতে পুর্ণেন্দু, বাবার্জি উপস্থিত ছিল যে।

না, না, তার পরও বাড়ির সামনে রকে বসে মোশেন দেখেছে, অফিস ফেরতা বুড়ো বাজারের থলে হাতে হারান বসু লেন দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। চোখাচোখি হবে ভয়ে মোশেন তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। আজ পুর্ণেন্দু বাবার্জি তার দিকে তাকিয়ে হাসল। হাতে একটা ইলিশ মাছ। আড়াই কেজি ওজন হবে কিন্তু ছেলের শোক মানুষ সহ্য করে না। মোশেনও স্বিস্তি হাসতে পারল। অনেকদিন আগেই তার হাসতে পারা উচিত ছিল। তাইতো, আক্সিডেন্ট। সামিড়ী দুর্ঘটনায়। আক্সিডেন্ট দ্বারা একটাকে, আর কি আবার দেওয়া যায়। প্রদীপ আক্সিডেন্টে মারা গেছে। ইমে বসে ঝুলতে দিয়ে রোজ কত লোক...

কদাচিৎ তাদের চোখে যদি কোনো সন্দেহ জাগে, সাঁহিড়ীর মতন 'আক্সি-ডেন্ট'-এর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দু চোখ ঢেকে ফেলে মোশেনের বন্ধুরা অনায়াসে মোশেনের কাছে চলে আসতে পারত। অটকাত না। সন্দেহের কোনো কারণ থাকত না। বান্ধবীরা আসতে পারত। ছুটিছাটায়, কি বন্ধুবাড়ি থেকে হারান বসু লেনে নিজের মনে মনে বেড়াতে যাবে।

বোকা। মোশেনের বুদ্ধি কম। তাদের ছেকে কলতে ইচ্ছে করে মোশেনের। যে জন্য মোশেনকেও এতটা নিরাপদ থাকতে হচ্ছে। কেনো অর্থ হয়?

হা করে যে সে মন খারাপ করছে—মোটেই নয়। মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে—বদ্ধে কথা।

তবে আর বৃষ্টি হতে যায় বিকেলে চুলটুল কেটে ফেটির লাক্সেন্দার ডিউ সাবান ঘেষে চান করা ডিউ ব্যাটারি সেকে চিরিং মালাইকারী দিয়ে রাতের খাবার সেরে এখনে ইজিচেয়ারে শুয়ে আরাম করে জমছিল টানত না।

কি...কি...কি...!

বন্ধু, আবার জ্বালাচ্ছে!

তার ইচ্ছে করছিল ফোটির নবের ছিদ্রের মধ্যে জল ঢেলে দেয়। নাক ডাকাচ্ছে। আর ওদিকে মুখো স্লেমিকরা...

তবে এটাও ঠিক। মোশেন ভাবল। কানোক্রিয়া বন্ধোক্রিয়ার দল তবে নিয়েছে. জিমেস পাইন এখন আর খুকোটি নেই, বুড়ি হয়েছে—এই ধরনের ছেলের বাপ যাকে ছটকোনি বলে। ছেখে ফেলেই ঘুম আসে না। হাতের মতন 'মোস্টাইয়োরী পাইনের বিবরণও হাত ফেলে ঠেলিফেলে করে বসে আছে।

...কি...কি...কি...!

মুক্তো হারামজাদা নিশ্চয় নাক ডাকতে নিজে ঘুমে গেছে। কজেই মোশেনটাকে—এই এই ফেলা...

রাগে নিজের হাত মুঠো কামড়াতে ইচ্ছে করছিল তার।

—ইয়ুজো!

—জমরা!

—জমরা কে? মোশেন ভাঁজিয়ে উঠল। অবাকও হল কম না। কচি-বয়সের গলা। বুড়োবাড়ি না। 'কবে চাই?' ভুরু কুচকেল সে।

—'জমরা মোশেন ধা-বে চাইছি—মোশেন পাইন।'

জল রে জল! বিজিজরটা পর মুহূর্তে হেসে ফেল মোশেন। 'আমি মোশেন তোমরা কে?'

—আমি সন্দীপন। আমি ছাড়া এখানে পুর্ণেন্দু, ছেবেন্দু মখার্জি, রোহিতাশ্ব এবং আরও অনেকে আছে।'

—'আচ্ছা, কঠিন কঠিন নাম।' মোশেনের গলায় ছেলেবেলা হাসির ঢেউ জাগল। 'তোমার নাম নেই তোমাদের, ছোট্ট জকন্যা?'

'আছে বৈকি।' টেলিফোনের ওপারের মানুষটিও হাসল। 'আমার নাম ছবি। আর যারা আছে তারা ভুলু বাপি চাঁদ...'

—চমৎকার—তোমরা কোথায় থাক?'

—আমরা হারান দত্ত লেনের ছেলে।'

—'আচ্ছা! তবে তো তোমাদের দেখেই থাকব—কিন্তু চেনা মুখ।' সোপেন বড় করে নিশ্বাস ছাড়ল।

—'হুঁ, দেখেছেন বৈ কি।'

ওপার থেকে উৎসাহের পাগল ছেলেটি বলল 'রোজ দেখেন আমাদের, আজও জানবেন আমাদের জন্য রাত-জাগা কোকিল আমরা পাশ করে ছিলাম, আপনি শুনেছেন, চুপ করে এক কোনায় বসে চা খেলেন, তারপর বেরিয়ে এলেন।'

—'হুঁ, তাই, চেয়ে পড়েছিল অল্প বয়সের কটি ছেলে। খুব হৈ-হৈ করছিলে তোমরা। তবে কাউকে খুব চেনা বলে মনে হয়নি। নিজের মনে চা খেয়ে।'

—'তাই তো করবেন আপনি, আপনার পক্ষে তা স্বাভাবিক—' ছেলেটি টিপ্পনী করে হাসল। 'অনেকের চেনা করে লক্ষ করা, তা ছেকে কথা বলা, আমাদের সঙ্গে পাশ করা মোটেই আপনাকে মানায় না। ডিরিশের ঘরে আপনি—তাই না?'

—'হুঁ, আটাশ পার হয়ে যাচ্ছে।' সোপেন পাড় ধরার বলল, 'তোমরা?'

—'আমরা হয়তো ছেকে ছোজ সতেরোয় হবো।'

—'একেবারে কাঁচা—ইয়াং।' সোপেন টিপ্পনী করল।

—'কাজেই আমাদের রোজ দেখেন—অবশ্য চেনা করে কাউকে ডাকেন না—মুখ চেনা আছে—কিন্তু নাম করে কাউকে ডেকে নেন না। তাই না?'

—'তাই তো।' সোপেন অপ্রস্তুত হন না। 'এখানে লুকোছাপার কিছু নেই ভাই, জেনারেল পাবলিক।'

—'তাই।' ছেলেটি মুচকি হাসল চোখে-মুখে। কথাবার্তা শুনে সোপেন বুঝল। ওপার থেকে সে বলল, 'আমরা যখন জুলাই বাবরি রাখতে আরম্ভ করেছি—দেখলাম আপনি সব ছেঁটে ছোটে পরিষ্কার।'

—'হুঁ, তোমরা কোরইজ পড়ছ। আমি পাসকোর্স করেছি।' সোপেন বলল।

—'তাই দেখলাম তখন। তাই আমরা কোকিনে বসে আলোচনা করছিলাম। আপনার মনে কোন জ্বালা। আমাদের সাটে দেখি ভীষণরকম গম্ভীর চলা-বলা। জেনারেশন গ্যাপ।'

—'ছেলেবেলার পড়ুশীর ওপরকে আমাজীবনের গল্পে এমন জমা দেখতাম।' সোপেন নরমে নিজে হাসল।

—'তা হবে। কালান খুরে খুরে আসে। এক দেশ থেকে নাতির কেটে আর এক দেশে আসে।' ছেলেটি বলল।

—'চমৎকার কথা!' সোপেন খুশি হল।

—'শুনুন, খুব দরকারী কথা আপনাকে ডাকছি আমরা।'

—'বলো।' সোপেনের উৎসাহ বাড়ছিল। যেন অনেকদিন পর ছেলে-মানুষী হাওয়া গায়ে লাগছে। 'তবে এই মুহূর্তে—বলার দরকারী কিছু আমি কিন্তু তোমাদের চেনো কাকে জানতে পারছি না তাই, রাত সাড়ে এগারোটা বাজে, ঘুমে চোখ লিটলিট করছে—' শেষ দিকে সোপেনের গলার স্বর ভারি শোনায়।

—'ওহ্, আপনি দেখছি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছেন। সত্যিকারে ওল্ড এজ্। সাড়ে এগারোটা বাজতে না বাজতে ঘুম। কিন্তু আপনাকে এখনি প্রয়োজন দরকার নেই, ছেলেটি অভয় বাণী শোনাল।

—'বেশ, বেশ।' সোপেন নিশ্চিন্ত হল।

—'আমি। আমার হাসি পেল শব্দটার কথাটা শুনতেই আপনি এমন আঁতকে উঠলেন না—যেন রাত দুপুরে ঘড়া পোড়াতে যাচ্ছি আমরা, আপনাকেও বলে টানছি।'

—'না, না না। সেকি কথা!' সোপেন লজ্জা পেয়ে জোরে মাথা নাড়ল। 'সেরকম কিছু ভাবিনি আমি তোমাদের নিয়ে।'

—'যেন পাড়ার দুটি ডাকাতির ঘিটিক্স পড়ে গেছে। রাত জেগে পাহারা দিতে ডিজিলেন্সের পার্টি খড়ে তুলেছি, আর তাতে আপনাকেও আমরা টানছি।'

—'হা-হা-হা!' সোপেন বড় করে হাসল। 'তুমি আমার খুব ভুল করেছ হে। রাত জেগে টহল দিয়ে হারান দত্ত লেনের চোর ডাকু তাড়ান। কল বেয়ে ঘড়া কাঁধে শ্মশানে যাওয়া। বহু সেকেলে জিনিস। আমরাই তোমো-দিন এসব করিনি—তোমরা তো একে-বারে আজকের ছেলে। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি টনটনে।'

—'আমাদের বাবা কাকারা এ সব করতেন শুনেছি।' ছেলেটি বলল।

—'আমিও শুনেছি।' সোপেন সায় দিল। 'আমরা দেখেছিও কিছু কিছু।'

—'তবে ছেলে বয়সে আপনাদের জীবনেও একটু আঙট্, আড্ভেঞ্চার ছিল।' ছেলেটি বলল।

—'কি রকম, কি রকম!' সোপেন চমকে উঠল। তখনকে কৌতূহল হল তার। যেন বুকের ভিতর ঢোল বহুর বয়স হঠাৎ ঢোলা দিয়ে উঠল। তার কাছে শুনেছ—তোমরা তো একেবারে দুধের বাচ্চা ছিলে।'

—'সব কথা শুনতে হয় না। কিছু কথা হাওয়ায় ভেসে থাকে—আপনাদের চোখ মুখ দেখে কিছু কথা আমরা পড়তে পারি। হি-হি।' ছেলেটি হাসল।

—'বাঃ, ভারি সুন্দর—বিউটিফুল—তোমার কথা শুনে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ভীষণ ভোজ হচ্ছে।'

—'ওকলা আমার সঙ্গে!' ছেলেটি অবাক হয়।

—'না, তোমার সঙ্গে এবং তোমার

বেতার আখবার

বন্ধুদের সঙ্গেও। তোমাদের জেনা-রেশনটার সঙ্গে।'

—'হবে হবে, আমরাও তাই চাইছি। আমি পুপেন্দু, ওদের ঘরে কথা বলছি। আমার বন্ধুরা এখানে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আপনার কথা শুনছে।'

—'তাই বুঝি! আমিও তাই অনুমান করেছি।' সোপেন কান খাড়া করে রিসিভার ধরে। 'হুঁ, কি যেন বলছিলে—ছেলে বয়সে আমাদের অ্যাড্ভেঞ্চার!'

—'আপনারা তিন ছেলে লোকের হাতের কার্লিসের সোনাপাথরা মাকড়ি, ব্রাহ্মণের কানের ছেলেবেলার অনেক, চিঠির বাক্স কুটো করে চিঠি চুরি—'

—'হা-হা-হা। এখন বেকার হাসি পায় ওসব শুনলে।' সোপেন খুশি হয়। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। অবশ্য চোরাকারবারি করেছি—ফেরিওলাদের মাকড়ি থেকে কল চুরি, গ্রামগঞ্জে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে গিয়ে বেপাড়ার ছেলে-দের সঙ্গে মারামারি, লাইন দিয়ে, সিনেমার লাইন ছেলে টিকিট কেটেছি আর লোকের সঙ্গে ঘুষ, তারপর...'

—'হুঁ, বলুন।'

—'তারপর যা কাণ্ড করেছিলাম সব সব—আমিও আমার বন্ধুরা—'

—'কি শুনি?'

—'বাবড়ি-ঝোলা ছেলে ট্রাম-বাসে ঝুলতাম, যখন যেখানে দেখি রোজ। ফুটবোর্ডে কোনোরকমে এক-পা ঠেকিয়ে হাতল ধরে ঝুলে ঝুলে, ঝুলে ঝুলে—'

—'ওহ্, জানতেও গায়ে কাঁটা দেয়। বুঝলেন, আমরা এই তিনদিন এসব কল্পনাও করতে পারি না।' পুপেন্দু বলছিল, 'টিকিন খাবার যাদের ছিল আপনাদের ওটা—তাই না?'

—'না না তা নয়?' সোপেন মোলায়েম গলায় হাসল। 'আহ্, তোমার, ঐ যে তুমি বললে না, এই মাতব—আমরা ওটাকে তাই মনে করেছি, দুরন্তপনা দুঃসাহসিকতা—আর তাই করে আমাদের কী আনন্দ—এক একদিন ভয়ানক ঝুঁকি নিয়ে—'

—'না না, আমরা এসব কোনোদিন করিনি, করছি না, মোলাপাড়ায় আর বালুর ডাঙ্গা, লোহার-বস্ত কুটো করে চিঠি চুরি করা আর গ্রামের মাকড়ি নিয়ে ট্রাম-বাসের হাতল ধরে ঝুলে ঝুলে যাওয়া—'

—'না, তোমরা এসব করছ না।' সোপেন আবার হাসল, 'আমাদের কথা হাওয়ায় ভেসে আছে, তোমাদেরও কিছু কিছু, তিনদিন হাওয়ায় ভাসে,

ফুলের গন্ধের মতন আমরা টের পাই।'

—না, সবটাই কি আমাদের ফুলের, অরণ্যের সব কিছু, কি ফুলের সুবাস?' চৌলকোনের ওপার থেকে পুলেনভ্‌স্কির কুণ্ঠিত গলা শোনা গেল। 'আপনি বাড়িতে বলছেন?'

—না, কেন বাড়ব?' মোশেন বলল, হোনেরা আমাদের ছেয়ে অনেক বেশি পড়ে—হ্যাঁ, ঠিক বলা যায় তাও, আমি বলব তাই। হোনেরা এ-ফুলের ছেলেরা রাশপাটে বাঁশিয়ে খেলা দেখ না কোনোদিন, লাইন দিয়ে টিকিট কেটে সিনেমা দেখছ না, বে-পাড়ার ছেয়ে দেখে টিটকিরি দিছ না—পাড়ার বাইরে করো সঙ্গে কখড়া না ঘরা-ঘরি না, টমে-বসে কোলাকুলি নেই —আবার কি, আমার তো বেশ লাগে। সত্যিই সুন্দর হোনেরা!'

—হি-হি! খুশি হয় পুলেনভ্‌। তার গলার আওয়াজ শুনে মোশেন টের পায়।

—'আমরা পাড়া ছেড়েই বড় একটা কোথাও—' পুলেনভ্‌ বলল, 'এখানেই প্রায় সারাদিন কেটিনে বসে ক'জন বন্ধু গল্প করি যাত্রা নেই—'

—'জোনাহ্‌লো?' একটু ইতস্তত করে মোশেন প্রশ্ন করে।

—'ঐ সময় সময় একটু ইনস্ত্রোর মেয়ে—কায়রাম শিহ্‌পাহ্‌'

—মনে পেড়কাশ পলিনাম্না বাহত, চমৎকার নেই, মোশেন বলল, 'সে সবের দিকে হোনেরের বুঁচি—'

—'ঐ আর কি, আপনাদের তুলনায় আমরা, এই ডাহলের ওরা, একটু বেশি গড়ি-গড়ি টাইপের—'

—মন্দ কি।' মোশেন এপার থেকে মাথা ঝাঁকায়। 'ভাল, আমার তো খুব ভাল লাগে।'

—'তবে কালচারাল ব্যাপার-টেপারগুলোর দিকে আমাদের কোঁক বেশি।'

—'হুঁ, হুঁ, বলার কি, হাওয়ার ফুলের সৌরভ টের পাই', মোশেন ম্লান হাসল। 'একাঙ্ক নাটক-টাটক খুব হচ্ছে পড়ার, ছবি ঠাকুরকে নিয়ে বছরে দুবার হিসেবের জরুরী, পরে চাইবো, বন্ধিম চট্টোকে নিয়ে কাজান—চমৎকার!'

—'হাতে লিখে সাহিত্য পত্রিকা বার করছি, নিজেরাই ওতে ছবি আঁকছি, নিজেরাই কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখছি—'

—'ওয়ান্ডারফুল!'

—'তবে, পুলেনভ্‌ বলল, 'একটা জিনিস হলে আমরা বাঁচিয়ে নিতাম —কাঁকন আসে বাইরের আর্টিস্ট স্টানিয়ে বছরে চারটে পাঁচটা বেশি ডারাইটি পারফরমেন্স — বিভিন্নত্ব-টত্ব করছি।'

—'এখন?'

—'এখন আর বাইরের আর্টিস্ট আনার না, দরকার হচ্ছে না, আমাদের ছেলেরাই এত ভাল গাইছে, বাজাচ্ছে, নাচছে—' হোনেরের ছেলেরা যদি বান্ধবীরা?' মোশেন ছিপ্‌ করাই বলল।

—'হ্যাঁ,' যেন সামান্য বিরক্ত হল ছেলেটি — পুলেনভ্‌, পরমুহূর্তে কণ্ঠস্বরে গলায় হাসল। 'আপনাদেরও বান্ধবী ছিল, তাই না? এখনকার আমরা অবিশ্যি বলি গার্ল-ফ্রেন্ড—'

—'ছিল—অনেক সাত জন বন্ধু—আর ওরা ছিল দু জন, আমাদের বান্ধবীরা।'

—'ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিস্টেই,' পুলেনভ্‌ যেন ভ্রূকুটি করল। 'আমরা উনিশটি বন্ধু—আমাদের অষ্টাদশটি গার্ল-ফ্রেন্ড—'

—'অ—নে—ক!' মোশেনের মুখটা ভাঙ্গ হয়ে গেল। 'অবিশ্যি পাড়ার ছেলের সাথেরা এখন ছেড়েও ছেয়ে অনেক।' আস্তে বোল করল সে।

—'এই জন্যই আমাদের বন্ধুদের মধ্যে জেলাসি নেই, মারামারি নেই। এক কোঁটা অশান্তি নেই করো মনে—'

মোশেন টেনে টেনে শুধু হাসল, কিছু বলল না। একটা চোরা পাঁক শ্বাস বেরিয়ে এল বুক ঠেলে, ওরা দেখল না।

—'শুনুন?' পুলেনভ্‌ বলল, 'এবার আমার বন্ধু ছেয়েন্ত আপনার সঙ্গে কথা বলবে, এবার গুরুত্বটা শুনুন ওর মুখে থেকে।'

—'কেন' তৈরি হয়ে নিল মোশেন।

—'আমি ছেয়েন্ত—ডাকনাম বাণি—'

—'হ্যাঁ, বলো ভাই।' মোটেই ছেয়ের মতন গলার স্বর নয়। মোশেন অবাকই হল। ভাল কান থেকে জিনিস-ভাঙ্গা যা করে চালান দিল।

—'এই যে, শুনুন—কাল আমাদের ক্লাবের অ্যানুয়াল ফাংশন—আপনা-কেও প্রায়ই মধ্যে পেতে চাই।'

—'ক্লাব! তোমরা একটা ক্লাব করেছ বুঝি!' হুইসলার মোশেন বলল।

—'হুঁ, কালচুনী, আমাদের ক্লাবের নাম। সুন্দর না?'

—'ভারি সুন্দর, কালচুনী, কালচুনি বসন্তকাল—স্ত্রী—চিরবসন্তের হাওয়া বইছে তোমাদের ক্লাবে।'

চৌলকোনের ওপারে ছেয়েন্ত 'কনগ্রাচুলেশন এসোসিয়েশন হো, নাচ-গান মিউজিক ছবি-আঁকা কম্পিটি—ফাঁকন আমাদের আগে আমাদের ছিলচুলি করছে।'

হা হো করছে! মোশেন মনে মনে বলল, উনিশটি বন্ধুর অষ্টাদশটি গার্লফ্রেন্ড ছু, কালচুনী, বাজুন নয় হয়েছে তাই ক্লবের—আমি যাব,' উৎসাহের গলায় মোশেন বলল, নিশ্চয় যাব—কালচার-টালচারের দিকে আমাদেরও একটু ঝোঁক ছিল—আমাদের এক বন্ধু রেশীল ছিল, ভাল ছবি আঁকত।'

—'সুনেছি, আজকাল্লিস্টেই মারা যান, যান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।'

—'আমাদের এক বন্ধু মধুর ভাল বাঁশী বাজাত।'

—'সুনেছি।' ছেয়েন্ত বলল, আপনিও তো ভাল স্পোর্টস্‌ম্যান ছিলেন, স্পোর্টসটাও কালচারের অঙ্গ, আপনাদের বান্ধবীদের আপনি খেলা-ধুলো শেখাতেন।'

—'ঐ যার কি', চৌলকোনের ভিতরে মোশেন এক গাল হাসল। 'আমাদের এক বন্ধু, বিমল ভাল ক্রিকেট-টেনিস খেলত।'

—'তাই আমরা চাইছি—' কণ্ঠস্বর কেশে ছেয়েন্ত গলাটা পরিষ্কার করে নিল। 'আপনাদের মধ্যে এই জিনিস-গুলো যেমন ছিল, তেমনি আমাদের বাপপাহাড়ীও অনেক ছিল যা আমাদের মধ্যে একেবারে নেই। নিল্‌।'

—'তবে তো তাই তোমাদের ছিল ছেলে খোলাপাহাড়ীদের আসতে হবে, ভাল্লের লাইটপোস্টের বাল্‌ব ভাঙতে হবে আর এই যে, রাস্তাপাটে বাঁশিয়ে খেলা দেখে, সিনেমা ছেয়ে বুকেতে বুকেতে ঠেসে-বসে বাড়ি ফেরা।' কথা শেষ করে মোশেন হা-হা করে হাসল।

—'না, ঠিক এই জিনিসগুলো নয় —এসব ব্যাক্‌ডেটেড হয়ে ছেয়ে—আমরা চাই না, ভালওবাসি না—যা আপনারা এসব করতেন বলে যে আমরা প্রশংসা করছি, তা-ও নয়—তবু কেবল আপনাদের মনে গাছ-টাছগুলো খুব্বই ছিল, একটা শিভা-লরির ভাব ছিল—যা আমাদের মধ্যে ছিটেফোঁটাও নেই—আমরা বড় বেশি মাল্টিমিল্ড ভাবছেলে থেকে যাচ্ছি।'

—'কেবল গার্ল-ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ইনস্ত্রোর মেয়ে আর গল্প আর মজে মজে নজলম মিউজিক ফাংশন।' মোশেন বলল।

—'তাই আপনাদের জেনারেশন্‌টাকে আমরা কাছে পেতে চাই—' ছেয়েন্ত ওপাশে বাপির উত্তেজিত উৎসাহে গলা শোনা গেল। 'আমরা ঠিক করেছি, কালচুনী ক্লাব সংস্কৃতির চর্চা যেমন চালিয়ে যাবে তেমনি এখন থেকে একটু অন্তত্তেজার-টাকতেজারের দিকেও ঝুঁকবে।'

—'খুব ভাল খুব ভাল—কালচার শিল্পাদির হাত ধরাধরি করে এগোবে —চমৎকার আইডিয়া—সেই যুগে রোমনরা যা করত।' মোশেনের গলার স্বর গমগম করে উঠল।

—'কালই আপনাদের আমরা কাছে পেতে চাইছি। আপনাদের উপদেশ পরামর্শ অনেক ছেয়ে করব।'

—'আমাদের সবাইকে পাচ্ছ কোথায় ভাই—' মোশেনের গলায় একটু হতাশা জাগল। 'আমাদের বন্ধুরা সবাই চাকরি-বাকরি নিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে, বান্ধবীরাও তাই, কয়েক কয়েক বিয়ে হয়ে ছেছে—'

—'এই যে কজনকে পাচ্ছি, তাদের টেনে নেব। নিতেই হবে।' ছেয়েন্ত হাসল। 'আর আপনি তো আছেনই।'

—'আচ্ছা ঠিক আছে।' মোশেন বলল, 'আমি যাব।'

—'তাহলে আপনি রেডি থাকবেন। বেলা পাঁচটায় আমাদের কাফেন-আরম্ভ। আমি নিজে টাক্সি নিয়ে আপনাকে আনতে যাব। সন্ধে সাতটা নাগাদ চলে যাব।'

—'কোথায় হচ্ছে ছেয়েন্তের অনু-ষ্ঠান?'

—'এই ছোনান বস্তু ছেলে—আমরা অন্য কোথাও তো যাই না—ছোনান বস্তু ছেলের ছোনান কচ্ছেছে।

—'যা-না-ন কচ্ছে?' মোশেন বিড়-বিড় করল।

—'ছেনের না?' ছেয়েন্ত অবাক হল। 'ছোনান বস্তুর ছেলেরা তাদের অবাঙালি বন্ধুর নামে ঐ একটা করে ছিল। সে তো অনেক দিনের কথা।'

—'কিন্তু ছেনের তো পার্সোনাল ম্যাটেরিকিম্ম হত, সেই আমাদের আমল থেকে—বেশির ভাগই পলিটিক্যাল সন্ধ্যা।'

—'না এখন আর তা হয় না।' ফোন চৌলকোনের ভিতর সব কটা দাঁত ছড়িয়ে ছেয়েন্ত হাসল। ছোনান কচ্ছে এখন আমাদের ওপরে। প্রায় ছেলেই ফালচুনির একটা না একটা কিছু ছেলে আছে ছেখানে।'

—'বড় ছেল ছেছে!' মোশেন মাথা ঝাঁকাল। 'ছোন পলিটিকেল সন্ধ্য করে এরম সিধরম ইচ্ছা আইকে হাথার ছোন মানে হত না।'

—'আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি—মনে থাকবেন কাল বিকেল সাড়ে চারটে। টাক্সি নিয়ে আপনার বাড়ি যাচ্ছি—'

—'এক মিনিট?'

—'বলুন।'

—'তোমাদের ... তোমাদের অর্থা' আমার ইচ্ছে সকলের সম্পর্কে যাহে ' মোশেন ইতস্তত করছিল।

—'বলুন, সংকোচের কিছু নেই।' ছেয়েন্ত উৎসাহ দিল।

—'পরিচিত হতে চাই আমি—তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে তো হবেই —এখনই এত রকম হয়ে যাচ্ছে—ছোনাদের বান্ধবীদের সঙ্গে গার্ল-ফ্রেন্ডদের সঙ্গেও যাহে '

—'ছেলেমানুষের মতন কথা বলছেন আপনি।' ছেয়েন্ত হি-হি- করে হাসল। 'যেন একটা মোলাপ-বাগানে ঢুকেছেন—কেবল গাছের পচা আর কাঁটাই আপনার চোখে মুখে গায়ে মাথায় লাগল—ফোঁটাফোঁটাও ছেলেন অনেক—গুচ্ছ মোলাপের দেখা ছেলেন না।'

—'সুন্দর উপমা—বিউটিফুল বলেছ তাই...হা-হা-হা-হা—খুব খুশি হলাম।

ছেড়ে দিচ্ছি—'

—'শুনে নাই?' অস্পষ্ট গলা শোনা ছেল ওপারের ছেলেটির।

—'হুজুর ছোঁঠ, কনোদিয়া বজো-কিয়া আর ভরদ্বাজের ক্লাট যাহেনার খুব আমার জন্য ছেরে খুঁজতে হবে না। আমি হুজো হুজো মোলাপের সন্ধান ছেয়ে ছেছি।' নাক ডাকা অবস্থায় ছেড়িকে উপেন করে মোশেন বলল, 'আমি যে কত হুখে, কত ভয়া

আজ যেন প্রথম দেখলাম। এই ছোট্ট প্রবীণ অবলাকে ঘরে ফিরে আদরে হুড়ো বানিয়ে ফেলে। তা না হলে...'

হাই হো, গার্ল-ফ্রেন্ড!

সেদিন বিকেলে, মোপেসনের পরিষ্কার মনে আছে, ছোট্টা আকাশ ঘষার নিয়ে তিন নম্বর ডেকের ওপর অনেক ছিটোঁফোঁটা মেসোমিয়াল-এর মাঠে মনে একটা খুব মজার খেলা খেলেছিল তারা। রুমাল-যুদ্ধ। অনেকের ঠাকুর্দারা নাকি ছেলেবেলায় খেলতো খুব খেলতে। ব্যাস, সেই আমলের ঠাকুর্দাটা হাসিক ছিল কম না। সেদিনই তাদের গার্ল-ফ্রেন্ড ছিল। বয়-ফ্রেন্ড গার্ল-ফ্রেন্ডরা একত্তর গোল হয়ে বসের ওপর বসত। সামনের দিকে সকলের মুখ ঘোরান থাকত। তাতে এ ওর মুখ দেখতে পেত, কিন্তু কেউ পিছনেই কেউ দেখতে পেত না। রউন্ড-টেবিলে বসলে যেমন হয় আর কি। একজন একটা রুমাল নিয়ে তাদের পিছনে চক্কির মতন চক্কর দিত। খুব ছুটত সে। তাকে বলা হত রুমাল-চোর। হাতের রুমালটা এমন ভাবে লুকিয়ে রাখত সে, কেউ দেখতেই পেত না। এখন এভাবে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ কার পিছনে থমকে সে বসের ওপর রুমালটা ছুড়ে দিয়ে যেত, অনেক সময় বোঝা যেত না। তবে অনেকেই শেষ পর্যন্ত টের পেয়ে যেত। একজন হয়তো টের পেল না, আর তার কপাল-বেয়ে ঘাম পিছনেই রুমাল-চোর হয়তো রুমালটা বসের ওপর ফেলে দেয়। ব্যাস, আর কথা নেই—চলল বেওয়া শেষ করেই পিঠে মুষলধারে কিল বসাতে শুরু করল। কিল খেয়ে কতক্ষণ আর কে বসে থাকতে পারে! কিল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে টের পায় তার পিছনে রুমাল। টকটনি হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে রুমালটা কুড়িয়ে নিয়ে সে পড়িমরি ছুটতে থাকে। অর্থাৎ এবার সে রুমাল-চোর হল।

হাতের রুমাল লুকিয়ে রেখে অগের চোরের মতন চক্কির মতন সকলের পিছনে চক্কর দিতে থাকবে। এবং খুশ করে কখন তার পিছনে বসের ওপর রুমালটা ছুড়ে ফেলে যাবে বলা মুস্কিল। যেমন সেদিন প্রথম রুমাল-চোর হয় চারু। অরুণের পিছনে বসের ওপর রুমালটা সে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। অরুণ যদি আগেই টের পেত তার পিছনে রুমাল রয়েছে—টকটনি কিন্তু সে ওটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটতে পারত। কিল খেতে হত না। টের পেল না বলে রাজ্যের গরুদা হাতের বেল কতটা কিল তাকে খেতে হয়েছিল।

এভাবে সেদিন রাজুকে একবার, মোপেসনকে একবার, মধুছন্দাকে দুবার, সীমাকে একবার কিল খেতে হয়েছিল। তারপর রুমালটা যায় প্রবীণের হাতে। রুমাল-চোর হয়ে—মোপেসন এখনও হাতের বন্ধ মুঠে হিসাব করে, আরতির পিছনে চার বার রুমালটা ছুড়ে দিয়েছিল। আরতি একবারও টের পেল না। তাই চার বারই প্রবীণের হাতের কিল খেতে হয় তাকে। এই কিল খেয়ে কি আর কেউ কাঁদে। আরতি ঠোঁট টিপে টিপে হাসছিল, যেন সুখের কিল।' তারপর আরতি রুমাল-চোর হয়ে ঠিক বেতরে চারবার প্রবীণের পিছনে রুমাল ছুড়ে দেয়। যেন প্রবীণও টের পায় না। চার চারবার আরতির হাতের কিল পিঠ পেতে নেয় সে। আরতি যখন প্রবীণের পিঠে কিল বসায় তখন ঘুমঘুম শব্দ হয়। আর প্রবীণ যখন আরতির পিঠে কিল বসায়—শব্দটা কেমন হয়েছিল? এখনও মোপেসনের কানে লেগে আছে। যেন তুলোপোলার গদির ওপর কেউ ঘুষি মারছে—একটা ফুরফুরে আওয়াজ। যেন আরতির ভিতরটাই ফাঁপা। সব মেয়েরই ভিতরটা ফাঁপা কিনা মোপেসন অনা চিন্তা করে। কেননা সেদিন অনন্তর হাতের কিল খেয়ে মধুছন্দার পিঠের যেমন শব্দ হয়েছিল বা মোপেসনের কিল খেয়ে সীমার পিঠে যেমন শব্দ হয়, সেদিন তততা মনোযোগ দেয়নি। সে জন্য আজ তার ভয়ানক আফসোস হয়।

হাঁ, তখন-তেকার বরার আগে বিকেলে মরমনে রুমাল-খেলা। মনে? মোপেসনের কাছে সেদিনই শেষ খেলাধুলো দেখা আরতির। তিনি পরনে পরা চলচলে চোখ আরতিকে মেলনা আলোর আরও অরূপ নমনীয় দেখাচ্ছিল। চিরকাল ওর বাইরেটা, ওপরটা যেমন মেখার। ছবির পর ছবি। সবা। একেবারে টটকা। আজও মোপেসনের চোখের সামনে ভাসছে। চমকা হলুদ রঙের মধুছন্দ শাড়িটা বাস থেকে তুলে মোপেসন পটাঁল করে ওর কোলে ছুড়ে দেয়। প্রবীণের কাছে ছবি আঁকার পাঠ নিতে যাচ্ছে আরতি। সেই শেষ ছবি আঁকা মুজনের।

আরও আছে। মৌলালীর মোড়ে তিন নম্বর তখন ডেকেরের ঘটনাটা ঘটবার আগের একটা দিনের মতো আরও কত কি যে ঘটল।

সেদিনদুরে সবাই বেড়াতে বেরিয়েছে। আরতির বেবীটে একসোরা রঙিন ফুল।

ইঠাৎ ফুল! কোনোদিন তো দেখত না মোপেসন কি তার বন্দুরা। মধুছন্দারা রোজ চুলে ফুল গুঁজেছে। কিন্তু মেয়েরা বিজ্ঞ আরতির চোখে ফুলের স্বপ্ন ছিল কোথায়! ছিল কি কোনোদিন? ফুল এল কোথা থেকে!

গলায় ঘরে বেড়ান সেরে, ছিটেফিটা মেসোমিয়াল-এর ঘাসে ছিল-খাওয়া ছিল-বেওয়ান রুমাল-খেলা শেষ করে সেই সর্বনাশা তিন নম্বর তখন ডেকের কাছে আসে মরমনের বাস দাঁড়াতে দাঁড়াতে মোপেসনের কানের কাছে মুখ নিয়ে একজন ফিসফিস করছিল। 'আজ একে চন্দ্রাণী ফুল উপহার দিলাম।'

—'কেন?' মোপেসন কি খুব একটা চমকে উঠেছিল!

কানের কাছে মুখ রেখে প্রবীণ বলছিল, 'আজ ও আমায় প্রথম সাবধান করল, খবরদার বাস-এর হাতল ধরে ঝুলবে না, তাহলে আমি ভয়ে মরে যাব, ঠিক সুইসাইড করব।'

কেন বিশ্বাস করতে পারছিল না মোপেসন। ঘাড় ঘুরিয়ে প্রবীণের বোকা বোকা হাসিটা দেখছিল।

আরতির মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। বাসখানির সামনে ও আগে আগে হাঁটছিল। তারপর আর কোনো সময়ই ওর মুখটা দেখা হয়নি, মোপেসনের মনে আছে, এত ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ছিল বাসে। জানালা দিয়ে মেয়েরা এক-বারও মুখ বাড়াতে পারেনি। মোপেসনরা বিবিধ ঝুলছিল।

অপরূপ লাজলজ্জা হারান ঘটেছে-এর। কেন চারদিক থেকে সংস্কৃতির আলো উপচে পড়ছিল। মোপেসন স্তম্ভিত। আর্ট বলো, রুচি বলো—এ-মুহূর্তে এরা কত এগিয়ে গেছে। কী চমৎকার সাজিয়েছে সেট, বারান্দা, হল-এর ভিতরটা।

জুলাই মাসের বিকেল।

বাইরে তখন ঝিকিমিকি বেলা। তা হলে হবে কি, ডুয়েসেন্ট আলোর শহরের সকলের মতন এরা ছিল হারান ঘটেজ-এর ভিতরটা।

টানাটানি থেকে নাথার সঙ্গে সঙ্গে পুলেপন্দুরা মোপেসনকে ঘিরে দাঁড়াল। বৃষ্টি উজ্জ্বল চটপটে চেহারা। কিন্তু তারি নাম, কোমল। আন্তরিকতার জন্য দুর্ঘর্ষতা কোনোদিনই যে এরা অর্জন করবে না, এক নজরে দেখেই মোপেসন টের পেল। মেয়েদের মনে সুকুমার সেলফ হাতের কবজি চিন্-কের ডোল। সরু কোমর। দোষ নেই বেতোরদের। মোপেসন ভাবল। আজও এরা হারান বস্ত মেনের ঠোঁটাপ্পি তিপিয়ের জন্য কোথাও ছেড়ে পেছনি। কেবল সাহিত্য নিয়ে, সোশিং নিয়ে, গান-বাজনার চর্চা আর মেয়েদের সঙ্গে ইনভোর-দেয়ন নিয়ে মেতে আছে।

এই জন্যই মোপেসনের ভাক পড়েছে। আমাদের সাহসী করে তুলুন। আমরা নিজেদের নিখতে চাই। এই জন্যই কি অবাক চোখ মেলে মোপেসনের লম্বা চওড়া মজবুত কাঠামোটার দিকে পুলেপন্দু মেয়েরা সবাশীদন রুমাল এবং তাদের কব্জির তাকিয়ে আছে! এক মিনিট। হাসি হাসি চোখ নিয়ে মোপেসন পরে একিক ওদিক তাকায়। 'ওরা কোথায়?' অন্তত বলল সে।

—'একটি একে যাচ্ছে।' মেয়েরা বুঝল, মোপেসনরা গার্ল-ফ্রেন্ডদের সঙ্গে অন্যেকজনেই পরিচয়টা সেরে রাখতে চাইছে। কাদের আলাপ হয়ে গেলে ভিতরের সব একাকার হয়ে যাবে। তখন আলাদা করে এদের মেয়ে-বন্ধুদের চেনা যাবে না, বোঝা যাবে না।

সঙ্গে সঙ্গেই বল বেবে ওরা এসে গেল। মেয়েরা পরিচয় বানিয়ে দিল। এই হল আমাদের মোপেসনরা। এই হল দুর্ধর্ষি, এ মৌ, এর নাম মোম, এ অনুরূপম, এ রিনি, এ ঝুলা, টুম্পা, টিকু, মুনমুন...

অনেক—অনেক—অনেক।

কেন আর শেষ হয় না।

উনিশটি বছরের অষ্টাদশটি গার্ল-ফ্রেন্ড। পরিচিত হতে হতে মোপেসন প্রায় ঘেমে উঠেছিল। তা হলেও সুখের ঘাম। সোলাস মেখে কার কবে ক্লান্তি আসে। ভাবল সে। কিনকিনে হাসিমুখ সব। কেন রোজ এরা জোৎস্নার জলে স্নান করে। এত নরম এত কোমল। মোপেসন একটা চেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাদের আমলে যদি এরা থাকত তো প্রথম দিনই স্কুল বাসের ফুটবোর্ড-এর কাছে মোপেসনের ফুলতে দেখে মূর্ছা যেত। হার্টফেল করত। মধুছন্দাদের মতন গাড়ির জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে রোজ কিছু হাউমাই চেচামেচি করতে যেত থাকত না।

ছেলেদের মতন চুল। কেন বেণীটেনি করার হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেতে চায়। বেণীয় ভাল চুল। শাড়ি, লুপিস আনড্রাস, বেলবটস্ এরা পছন্দ করে না বোঝা যায়।

মোপেসন আরও দেখল, এরা ঘুরু বাঁধে না। মুখে রঙ নেই। আগের আমলের মেয়েদের চেয়ে চের বেশি বুদ্ধিমতী। এরা বুঝে গেছে স্বাভাবিকতার চেয়ে বড় সৌন্দর্য আর কিছু হয় না।

ঘরে যেমন ঘরোয়া। তেমনি জলসার মিটিং-এ। কেন বাড়ির চাহের চৌবি-লের সাজ নিয়ে এরা হারান ঘটেজ-এ কাদেন করতে এসেছে।

বৃদ্ধিক থেকে মোপেসনের বুড়ো হাত ধরে টানতে টানতে তাকে হল-এর ভিতর নিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দিল।

—'পরে দেখা হবে, আর আপনার সঙ্গে অনেক কথা হবে। কাদেন শেষ হলেই পালিয়ে যাবেন না কিন্তু।'

—'পালিয়ে যাবার জন্য এঁকে আমরা ধরে আনিনি।' মেয়েদুরা তাদের সৌজন্যের বোঝাল। 'ইনি এক-জন সেই আমলের বড় সেলাইম্যান্, এঁর কাছে আমাদের ফেলাইদুরো এবং আন্ডারগ্রেডারের অনেক কিছু শেখার আছে। আমরা ভয়ানক গুছি-গুছি থেকে যাচ্ছি।'

ঘণ্ট বাজল, বাজল! চুরিচি চুক্কার হৈ-হৈ করে নাচতে নাচতে গ্রীন-রুমের দিকে ছুটে গেল। একটু মেক্-আপ-এর আপার আছে। পুলেপন্দুরা মোপেসনকে বোঝাল, সাঁওতাল নাচ, ভীল নাচ, ভারত নাট্যম, তারপর একটা ছায়া, বেশ লম্বা গোছার। এরা অনেকেই অনেক কিছু পার্ট আছে।

চমৎকার! মোপেসন হেসে ঘাড় কাত করল। প্রায় চোখের আড়ালের একেবারে সামনে। পিছনে সারি সারি অনেক আসন। সম্ভবীদন নয়ের ছেলেটি এক

সময় ছুটে এসে সোহেলের কানে কানে বলল, 'আপনাদের আজকের আরো দু' একজনকে আমরা নেমন্তন্ন করেছি। তাঁরা এসে গেছেন।'

আসুক, না আসুক, সোহেলের কাছে সেটা তার সম্পর্ক নেই। তারা ব্যবসায়ি। সোহেলও হারতে চায় না। একবারও পিছনে ঘাড় ফেরাল না সে। তার চোখ সামনের দিকে। এদের দিকে। ফুলের মতন ফুটফুটে মুখ।

হল-এর আলো নিবে গেল। পর্দা উঠেছে। ওপেনিং সং হচ্ছে।

না, এখানে কোনো রকম গোলমাল হবে, বিশ্বাস হয়। যা হচ্ছে, তার একটা অফিসিয়েন্ট গুটে যাবে, সোহেল আশা করেনি। কেন করবে। পৃথিবীতে চিরকাল যে জিনিস নিয়ে অশান্তি উপদ্রব, এমনকি লড়াইও হয়েছে, হাঙ্গামা ঘটেছে—তার ছিটেফোঁটা তারল হারান কটেজ-এ পা দিয়ে সোহেল দেখতে পায়নি। কালচুনী ফুলের বন্ধুরা বান্ধবীরা সবাই সুন্দর সুহাস মার্জিত ভদ্র—আর বড় রুচিবান। সোহেলরা চিরকাল দুর্বৃত্ত ছিল লড়িয়ে ছিল। উঠতে বসতে শিভালরির মোখাশে তারা তৈরী থাকত। মারামারি হানাহানি তাদের রক্তে সারাক্ষণ কলকল করেছে। তাছাড়া তেইশে-চব্বিশে পৌঁছে যেই জিনিস যে কত ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল বর্ণতলা শহীদে মৌলানার কাছে তিন নম্বর ডকল ডেকরের দুর্ঘটনা থেকে বোঝা গেছে। সোহেল বুঝেছে। তার বন্ধুরা বুঝেছিল। বান্ধবীরাও।

পালামারীর ভান করে সোহেল কিছু লুকোতে পেরেছিল কি? পারেনি। আজ যদিও সে হাসছে

কিন্তু এখানে? যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—যে জন্য ক্লাবের নাম কালচুনী, যে কারণে এদের মনে চিরকালের হাওয়া বইবে—উনিশটি বিদেশী—আটাশটি বিদেশী। বাস, ব্রিস্বেন, হিরো, অক্লোন কোন্ দিক দিয়ে যাবা আসবে।

আর সোহেলদের ছিল সবে জন দুজন। এমনিতে মাথাপিছু হিসেবে একটি বাড়তী কম ছিল।

কাজেই মুখোমুখিও সোহেল সোফার দিকে সে আর কিছু আশা করেনি। করতে পারছিল না।

অনুষ্ঠান তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। প্রায় চার পাঁচটা গান হয়ে গেল। একটি ছেলে চমৎকার গীটার বাজিয়ে শোনাল। একটি মেয়ে অনেকক্ষণ নেত্রত্য করল। ছেলেরা মেয়েরা মিলিয়ে দেশী বিদেশী নানা রকম বন্যবাদ্য স্টেজের ওপর জড়ো করে জোরদার অর্কেস্ট্রা শুনিয়ে গেল দু-দুবার। তারপর সাঁওতাল নাচ করল, একসঙ্গে বারোটি মেয়ে। তারপরে নিগ্রোদের অপরূপের সঙ্গে সুরে ও তান মিলিয়ে দুর্বোধ্য নাচ নাচল একলা একটি মেয়ে। কেন বলতে এই সবচেয়ে শেষে। হেরোইনেয়ে হবে।

সাঁওতাল নাচটা হয়ে যাবার পরেই একটা মৃদু চঞ্চলের গোলমাল স্টেজের পাশেরো গ্রীনরুমের দিক থেকে সোহেলের কানে এল। প্রথমটা সে তেমন কান দেয়নি। হাজার ওদের কোনো আর্টিস্ট এসে পৌঁছয়নি। হয়তো কারো মাথা ধরেছে শরীর খারাপ করেছে। পার্ট শেষ না করে বাড়ি চলে যেতে চাইছে। যা, এর পরে যারা নাচবে বা ছায়া করতে স্টেজে উঠবে তাদের মধ্যে কারো চেক-আপ নেওয়া এখনও হয়তো শেষ হয়নি। অনেক কিছু ভাবল সোহেল।

নিগ্রোদের অপরূপের নাচটা যখন চলছিল, তখন সুদীপন ছেলেটি এসে সোহেলের কানে কানে বলে গেল, একটু পরেই ভারত-নটরাজ নাচ হবে। মেয়েদের কী ভীষণ সুন্দর নাচ পূর্ণা। পূর্ণা?' ওহে কি আমি দেখেছি? নিশ্চয়।' সুদীপন চোখ-মুখে মেয়ে ঘাড় কাত করেছিল। 'আমাদের মেয়েদের মধ্যে ও-ই তো সবচেয়ে বেশি সুন্দর—বিশেষ করে ওর ফীগারের তুলনা হয় না।'

সোহেল ইতস্তত করছিল কিছু বলতে।

—'আবিদ্দি যখন দুর্মাকে নো টুকরো আপনার সঙ্গে কথা বলছিল,' সুদীপন যায় একটু হাসল, 'পূর্ণা সবচেয়ে সোহেল দাঁড়িয়ে ছিল।'

—'তা হবে।' সোহেল অনেকটা অন্যমনস্ক হয়। 'তাহলে দেখে থাকব। তাছাড়া, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ও স্টেজে আসছে। তাই না?'

—'হাঁ।' সুদীপন মাথা ঝাঁকিয়ে হঠাৎ তাড়াতাড়ি চলে গেল। কেননা গ্রীনরুমের গোলমালের শব্দটা তখন বেশি জোরে আসছে। একটু বাদেই আবার ছুটে এল। এবার তাকে চঞ্চল উত্তেজিত দেখাচ্ছে। 'কি ব্যাপার বলুন তো?' সোহেলের কানের কাছে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'কি হয়েছে?' সোহেল তার মুখের দিকে তাকাল।

—'ঐ যে, পূর্ণাকে নিয়ে গোলমাল। যে ভারত-নটরাজ নাচবে।'

—'কিসের গোলমাল! পূর্ণা এখন নাচবে তো?' সোহেল প্রশ্ন করল।

—'ওর নাচের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করা নিয়ে দুজন বাজনা করছে।'

—'তারা?'

—'মেয়েন্দ্র আর পুষ্পেন্দু।'

—'কেন?'

—'মেয়েন্দ্র বলছে, আমি আজ ওর সঙ্গে তবলা বাজাব। এদিকে পুষ্পেন্দু বলছে, আমি বাজাব।'

তারি মজার তো! সোহেল মনে মনে বলল। একটা নাচের সঙ্গে দুটো তবলা কি করে চলবে। 'পূর্ণা তাকে বাজাতে বলছে?' সোহেল প্রশ্ন করল।

—'পূর্ণা কিছু বলছে না।' সুদীপন বলল, 'তাছাড়া ও বললে ওর কথা শুনবে নাকি কেউ। দুজনেরই সমান জেদ। ওর নাচের সঙ্গে মেয়েন্দ্র তবলা সঙ্গত করে আসছিল। সেজন্যেই কাল রিহার্সাল চলে। তারপর মেয়েন্দ্রর হঠাৎ জ্বর হয়। তখন থেকে পুষ্পেন্দু তবলা বাজায়।'

—'এখন বুঝি দুজনেই—' সোহেল বলতে যাচ্ছিল। তার কথা ফেরে গেল। সোফাসেটা ডানদিক থেকে কারা আসছিল। স্টেজের পর্দা পড়ে গেছে। মাঝিভাঁরাদের সব আলো জ্বলে উঠেছে। পিছনের সারির চেয়ারের অনেকে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

—'আপনারা বসুন। আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়নি।' দু হাত এক করে সুদীপনের আর এক বন্ধু মুখোমুখি চেঁচিয়ে সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছিল।

—'আপনি আসুন।' সুদীপন হঠাৎ সোহেলের হাত ধরে টানছে। 'আপনি ভেতরে আসুন। আপনি ছাড়া ওদের এই গোলমাল এই কলহ কেউ থামাতে পারবে না। মেয়েরাও আপনাকেই ডাকছে।'

—'চলো।' সোহেল আর ইতস্তত করল না।

চেক-আপ নিয়ে গ্রীনরুমের ভেতর মেয়েরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কথা বলছে না। প্রত্যেকটা মুখ শুকনো।

—'কি হয়েছে ভাই?' পুষ্পেন্দুর কাঁধে হাত রাখল সোহেল। তার কথার জবাব দিল না পুষ্পেন্দু। হাতটা কাঁধ থেকে নাবিয়ে দিল।

—'কি হয়েছে ভাই?' সোহেল মেয়েন্দ্রর দিকে তাকাল। মেয়েন্দ্র শব্দ করল না। জবাব দিল না। জলে-জলে চোখ নিয়ে পুষ্পেন্দুকে দেখছে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে।

এখন সোহেল ভাল করে পূর্ণাকে দেখল। সুন্দর ফীগার। তবে সুদীপন যে বলেছিল সবচেয়ে সুন্দর—কথাটা সে মেনে নিতে পারছিল না। পূর্ণার চাইনে বাঁধে শিফনে যারা দাঁড়িয়ে তাদের সবাই তো সুন্দর। কারো মধ্যে কোন রকম খুঁত সোহেলের চোখে পড়ল না।

—'আমি আজ পূর্ণার সঙ্গে তবলা বাজাব।' পুষ্পেন্দুর দিকে আর তাকাল না মেয়েন্দ্র। অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে গুমগুমে গলায় বলল, 'আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।'

—'আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।' পুষ্পেন্দু মাথা ঝাঁকাল।

—'তোমরা যদি এমন জেদাজেদি করো ভাই—' অনুরোধের মতন করে সোহেল বলতে যাচ্ছিল।

—'সাট আপ্, আপনি চুপ করুন। আপনাকে কেউ ডাকছে না এখানে।' মধ্যের মতন গর্জন করে উঠল মেয়েন্দ্র।

'এই খাপী, তুই এ সব বলছিস কী?' সুদীপন ছেলে গেল। চোখ রাঙাল।

—'এমন ঝাঁড়ের মতন চেঁচালেই সব হয়ে গেল।' মেয়েন্দ্রর দিকে চোখ রেখে পুষ্পেন্দু ঘাঁটে দাঁত ঘষছিল। হিংসায় উত্তেজনায় তার নাকের পাটা দুটো কাঁপছে. সোহেল পরিষ্কার দেখল।

—'এই ছেমেলা! ঘাড় ঘাড় করবি না।' পুষ্পেন্দুর দিকে ঘাড় ঘিরিয়ে মেয়েন্দ্র বুখে উঠল।

—'একশবার করব। তোর মতন ছোটলোক, ইতর, নোংরা—' যেন মেয়েন্দ্রর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে পুষ্পেন্দু। সুদীপন তাকে ধরতে যাচ্ছিল। সোহেল দুজনের মাঝখানে দাঁড়াতে যাবে। তার আগেই যা ঘটবার ঘটল। কাউকে চোখের পলক ফেলার সময় দিল না মেয়েন্দ্র। পুষ্পেন্দুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পেন্দু আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। একটা ছোরা মেয়েন্দ্রের হাতে। কোথায় সে এতক্ষণ ওটা লুকিয়ে রেখেছিল! দুহাতে চোখ ঢেকে মেয়েরা চিৎকার করে উঠল। পুষ্পেন্দুর কলজে থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। ছোরাটা ফেলে রেখে মেয়েন্দ্র পালিয়ে গেল। ততক্ষণে ওদের বন্ধুরা সবাই গ্রীনরুমে ছুটে এসেছে। বাইরের অডিয়াসের মধ্যে অনেকে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

'এক্ষুণি পুলিশে খবর দাও।' তার মধ্যে ফোন করে একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকে ভাই।' চেঁচামেচি করে কারা বলছিল। ভিড়ের ভিতর থেকে সোহেল সরে আসছিল। ঘাড় ফেরাতে সে চমকে উঠল। তার ডানদিকে বাজ পড়ল। একটা বন্দুক ছুঁড়ার মতন গলা উঁচু করে পুষ্পেন্দুর বন্ধুরা দরজার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রয়েছে একজন। চোখের পলক ফেলছে না। মুখ নিচু করে দুহাতে ভিড় ঠেলে গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে হারান কটেজ-এর বারান্দা পার হয়ে সোহেল রাস্তায় নেমে এল।

আকাশে ওরা দেখেছিল। ও কি আগে থাকতেই কালচুনী ক্লাবের কাঁচ-কাঁচরবের সঙ্গে মেলমেশ করছিল। তবে তো হয়েছে। সোহেলের কপালের ছিল টিপ-টিপ করছিল। সে চিন্তা করল, এমন নিরবচ্ছিন্ন চাঁদা মেঘ ধমধমে দৃষ্টি মেলেনে মেঘলে বজ্রপাত যে ঠেকাবে। কেউ পারছে না। মৌলানীর মেয়ের চমৎকার বজ্রপাত বন্ধ করতে পেরেছিল?

সোহেলের এই বিশ্বাস কেউ টলাতে পারত না। রাস্তার পাশের একটা দোকান থেকে সিগারেট কিনে সিগারেট ধরাতে গিয়ে গ্রীনরুমের ভিতরের খুরোদ্যুরি ছবিটা আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। যাকে নিয়ে গোলমাল—পূর্ণা, সে কি এমনভাবে তাকাতে পেরেছিল! মোটেই তাকায় নি।

মেয়েন্দ্র ও পুষ্পেন্দুর রকম সকম দেখে তার পেছে আর দুটি সঙ্গীর সঙ্গে অহেতুক চিৎকার করতে করতে গ্রীনরুমে পৌঁছয়ে এসে তাদের জন্য বন্ধ-ছেলেদের অপেক্ষা। মুহূর্তের মধ্যে গোলাস মনে কী দুঃসহ আতঙ্কের ঝড় উঠল! সেখানে শিভালরির জায়গা ছিল কোথায়!

# সময় অসময়

আশাপূর্ণা দেবী

(অসম্পূর্ণ উপন্যাস)

বিষয়ের বিষয়ই এই।

কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও অনাবৃষ্টি। কোথাও বন্যা, কোথাও খরা।

কোথাও জলের জন্যে মেয়েমানুষ ছুটছে 'পাইবার পাইকপল্লা ডিগিকে' আবার ঘরে বসে সিলিং ফ্যানের ঘূর্ণিঝড়ের বাড়ি, আর কোথাও সর্বৈশ্বর্যশালিনী রানী ধনিতা শুনো প্রাসাদে বসে হাহাকার জানাচ্ছে 'একটি মাছের জন্যে।

সমাজে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এত সমারোহের আয়োজন, সুখী পরিবার গড়ে তোলার এত প্রয়োজন, তবু বন্ধ্যানারীর চিরন্তন কান্নার হাহাকার ঠিকই থাকে, প্রতিরোধ মানে না।

কিন্তু আজকের মেয়েরা কি সবটাই 'বিধির বিধান' বলে মেনে নেয়?

কথাটাকে কেবলমাত্র আপন শরীরতন্ত্রের ত্রুটি বলে স্বীকার করে নিয়ে নীরব অশ্রু বিসর্জনে ক্ষান্ত থাকে?...অনেক ক্ষেত্রে, অনেক চিন্তার ফলে, সে তার দাম্পত্যজীবনের পার্টনারকেই দোষী সাব্যস্ত করতে বসে না?

আর কে কী করে না করে কে জানে, তবে ভুবন তাই করছে। বলছে, 'আহা ছেলের কী নামই রেখেছিলেন বাপ মা! "সুবোধ"! কেমনা ঘোলাটাই তো দেখাতে পারলে না। এক-আধদিন নয়, ষোলো ষোলোটি বছর টাইম দিয়েছি।'

বলে অবশ্য হেসে হেসেই, যেন সাবানের ফানুস ওড়াচ্ছে। কিন্তু আসলে তো জিনিসটা সাবানের ফানুস নয়, আগুনের গোলা। গায়ে এসে লাগলে ফোস্কা পড়ার কথা, সুবোধা গায়ে নেয় না তাই।

সুবোধাও হেসে হেসেই বলে, 'সেটা উত্তর পক্ষেই খাটে।'

ভুবনের আজকাল এই একটা রোগ হয়েছে, বড় সামান্যতেই তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ভুবন সেই উত্তেজনার লাল মুখ নিয়ে বলে, 'তাহার অমার শরীরে কোন খুঁত খুঁজে পায়নি।'

'আমারই কী লোভে না কি!' বলে হাসতে হাসতেই টাইয়ের ফাঁস বাঁধে সুবোধা। ভুবন ঠোঁট উল্টে বা এঁকিয়ে উত্তেজিত মুখটাকে সহজ করে নিয়ে আবার সাবানের ফানুস ওড়ায়, 'তাহার তোমার প্রাণের বন্ধু।'

—'ও রে সর্বনাশ! কী ভয়ংকর মহিলা! এ রেন ভদ্রলোক কথাও ভাবছ? চিন্তার কেলাসে! তাহার যদি সোনে তুমি তার নামে এ রকম একটি চার্জ আনবো—'

—'শোনাওনে না! সামনেই বলতে পারি—'

ভুবন কাছে এসে ওর আমার ডানহাতটা হাতে তুলিয়ে ঠিক করতে করতে বলে, 'না হলে "আচলট" করার জন্যে এত টেনসিড হবে কেন? আমার কি বয়েস ফুরিয়ে গেছে!'

সুবোধা ওয়ার্ডরোবের আয়না থেকে ঘাড় ঢেকা কলার এদুটো নিয়ে নিয়ে অফিস-ব্যাগে পুরতে পুরতে বলে, সে-কথা তো আমি বলি। আমি তো জানি বয়েস-টয়েস ফুরোয়নি আমাদের, ডাক্তারও জানে, কিন্তু তুমি যা অদ্ভুত অস্থিরতা দেখাচ্ছো' চল দেয়ে এ-কথা বলে ও।'

ভুবনের মুখটা আবার লাল হয়ে ওঠে, বলে, 'তাহলে কিসের? পাগল-টাগল হয়ে যাব?'

—'টাগলটা তো হয়ে কবেই আছ, বাকিটা—ডাক্তারই জানতে পারে। তোমার প্রিসক্রিপ্শনের ওই মাদুলি-বাবাদুলির বোঝাদুলি তো কারো চোখ এড়ায় না।'

—'তোমার বন্ধু যতই "সাবলেক্ট" হোন, এটা তাঁর মানা উচিত, বিজ্ঞানের বাইরেও কিছু আছে। বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে।'

—'আহা বৈ কি।' সুবোধা হাসতে হাসতে বলে, 'আছে "অজ্ঞান"।'

—'অজ্ঞান"

—'তা ছাড়া আর কী! কিছুদিন আগে পর্যন্ত বৃষ্টিই কি ভাবতে পারতে নাস্তিক সুবোধা রায়ের সুবোধা পত্নী শ্রীমতী ভুবন রায়ের গলায় মাদুলি, হাতে তাগাতাবিজ, তিনি রোজ সন্ধ্যায় 'বাবাঠাকুরের হোমরুদ্র জিতে ঠেকান, আর রোজ সকালে কোন 'মা জননী'র জলপড়া পান করেন?'

এভাবে বললে গায়ে লাগে বৈ কি। নিজের সম্পর্কে এমন অবজ্ঞার ভাষা কার সহ্য হয়?

অথচ এসব করাচ্ছেই ভুবনকে আজ-কাল। জন্মাচ্ছই যেন একটা দরকার ভাব হয়েছে তার। প্রেসক্রিপশন দেখতে চায়।...মনে মনে অভিসন্ধি, এর পর আসল আসামীকে একেবারে কাঠ-গড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়বে।

কিন্তু সুবোধার ওই বর্ণনাভঙ্গীটা জানা। তবু ওর অফিস যাবার প্রাক্কালে বেশী উত্তেজিত হতে চায় না ভুবন। তাই গম্ভীরস্বরে বলে, 'ভুবনের রায়ের সাহস আছে তাই ও সব করে। সুবোধা রায়ের সাহস নেই তাই করে না। নইলে ওই জন্ম, জল-পড়ার নিয়ে দুজনেই পাগল করবার কথা। পাগে লোকে "পাইরা" বলে, তুমি সেই ভয়েই কাতর।'

সুবোধ যেবোবার জন্যে প্রস্তুত হয়েও দাঁড়ায়, গাড়ি আসেনি এখনো। বলে, 'ও তো ছো! সেটা পালিত হচ্ছে না বলেই কিছু হচ্ছে না তাহলে?

হেসে ওঠে সুবোধা।

ভুবন গম্ভীরভাবে বলে, 'অন্তত প্রমাণিত হচ্ছে না। প্রমাণ করে যাবার জন্যেই মনাই সামান একটু চলমান্ত পালন এত নারাজ! কী হয় ওটুকু খেলে? কী হয়?'

সুবোধা বলে, 'নাঁতি ভঙ্গ হয়।'

—'এঃ! আমার জন্যে তুমি একটু নীতিভঙ্গ করতে পার না?'

—'নো নো!'

সুবোধা হেসে উঠে বলে, 'প্রেমলীলার জন্যে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু ওই জিনিসটি নয়।'

—'ও কথা তথাই নয়,' বলে ভুবন, 'আসলে ওই কথাই। আমার মনের মধ্যে একটা বেকমেন্দিতে কি যেন কাঁটা খচ-খচানি হচ্ছে। জ্যোতিষীকে হাত দেখাতে চাও না, জ্যোতিষীকে হাত দেখাতে চাও না, এমন কি প্রাক্তনে একটা স্টোন, পরতে পর্যন্ত চাও না, এর মানে কী?'

বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ হয়।

তার মানে জানান দিচ্ছে, আমি এসেছি। অফিস থেকে গাড়ি এসে। সুবোধার তাড়াতাড়ি উঠে পড়ার কথা। ওই গাড়িতেই আরো দুজনকে নেবে।

সুবোধা তাই নেমে যেতে যেতে হেসে বলে, 'মানে তো তুমি বুঝেই নিয়েছ।...আচ্ছা চলি, টা টা! ওবেলা এসে ঘুলঘুলি কমপ্লীট চালানো যাবে।'

দ্রুত নেমে যায়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়।

আর সেই শূন্য সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ভুবন নতুন 'শব্দ' খুঁজে ঠিক করে 'ওবেলা হেসে ছেসে কাজে লাগাবার জন্যে। এইভাবেই আগুনের গোলা নিয়ে লোফালুফি করে ওরা, ভলোয়ারের আগা নিয়ে হাঁটে।

কেমন ওবেলা—

আবার যখন ওই কথাই ওঠে, তখন—

হাঁ, এখন আর কোনো কথা নেই ভুবনের, ঘুরে-ফিরে কেবল ওই কথাই।...

অথচ মনে কী উল্লাসই ছিল ভুবনের। কী প্রলম্বন!

উথনকার দিনের পাতা উল্টে দেখলে বসে বসে দেখতে ইচ্ছে করে। দেখা যায়, ভুবনের গান গাইছে, ভুবনের ছবি আঁকছে, ভুবনের জন্যে ভাল রান্না করছে, ভুবনের সঙ্গে-সুখে করের সংসার বেড়াতে যাচ্ছে, ভুবনের সন্তানের মুখটা সিনেমা দেখছে, ভুবনের অসাধ্য সাধনের বলে টিকিট জোগাড় করে টিকেট ম্যাচ দেখছে, ভুবনের সুবোধার ছুটির দিন হলেই সন্ধ্যালকেলা চা খেয়ে আর যাইছে, টিফিন কৌটোর মুখপুরের মত থাবার ভরে নিয়ে বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে 'ঐজলাদি' তোলাতে।

কোনো একটা ছোট্ট ছেলে রেল লাইনের কোনো একটা ছোট্ট স্লেপ্সনে মুখ করে নিচে পড়ে ওরা আসন্ন আবিষ্কার করে বসে কৌটো খুলে খেয়ে-টেয়ে নিয়ে বেরুচ্ছে মুখে, প্রমের মোকানের চা খাচ্ছে ভাঁড়ে করে, হেলেদুলে জিলিপি কিনছে মহোল্লাসে।

আর ভুবন আহ্লাদে গদগদ হয়ে ভাবছে, আমরা কী বুদ্ধিমান! আমরা কী হিসেবি! বন্ধু কে-হিসেবির মত মাত-পঞ্চাশে না বাপ হয়ে মুখে স্বাধীনতা স্বচ্ছন্দ আর উপভোগের বারোটা বাজিয়ে ফেলিনি! জীবনকে উপভোগ করতে হয় কেমন করে তা শেখিয়ে দিচ্ছি ওদের' অর্থাৎ—সহ-সাম্রাজ্যিকদের।

ওদের দেখাটা যারা ছেড়ে দেছে বোঝা করে ফেছে, বিয়ের দু'-এক বছরের মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক কিস্তিদের ছোঁয়া 'অনুবিধে' ছেড়ে আনছে, তাদের নিয়ে বিস্তর ছাসাছাসি করে ওরা।

ছুটির সন্ধ্যে বিশ্বনাথও যাবে। বলে, 'আচ্ছা এ ছুবোও কী বলে এমন বেকা করে বকছে? বাপারটা তো বাবা নিজের হয়েছে।'

—'সেই তো! সেই জোকটাও ওর জানা নেই যে, ইনসপেক্টর মুখ করে বলবে, "কী করব, ভগবানের হাত"'

বিশ্বনাথদের পরিবারে বড় এসেছে যে আজ তার সব রহস্য 'ভগবানের হাত' থেকে মানুষের হাতে চলে এসেছে, এটা জেনে বুঝেও যারা ভগবানের হাতে পড়ে থাকতে চায়, তাদের নিয়ে কৌতুক আর তাদের জন্যে করুণা করা ছাড়া আর কি করবার আছে?

প্রাহা, সুখ শান্তি স্বাধীনতা কিছুর সম্পর্কে প্রতনা নেই বেচারাদের'

এই যে ভুবনের ছোট বোন টুইন, প্রতিবার ভুবনদের পুজোর ছুটির বেড়ানোর সময় সঙ্গে গিয়েছে, বিয়ের আগে থেকে, বিয়ের পরে পর্যন্ত বরাবর, এবারে আর যেতে পারল না। প্রবন্ধা আছে।

—'আর পারবে নাও কেনোদিন, পায়ে শেকল পড়ল বলে বুক ফুলিয়ে করল সুবোধা। আর ভুবন মনে মনে বোনের উপর বিরক্ত হল এই ভেবে, বিয়ে হতে না হতে এ দুর্দশা টেকে আনার তোর কী তাড়া পড়েছিল বাবু! কেমন হাসাহাসি, বেড়াবেড়ি, বেড়াবিড়ি, সব ঘুচল তো?

ভুবনের কত বছর বিয়ে হয়ে গেছে! এখনো ওরা হাসছে, বেড়াচ্ছে, বুকে এনে বাঁচার মত বাঁচছে।

কিন্তু 'মন' জিনিসটা বড় ভয়ানক। এ যেন একটা বেয়াড়া ছোকরার মত। আছে তো আছে ঠিক আছে, হঠাৎ সে তখন ঘাড় ফিরোয়, বেঁকে বসে! কে জানে তার মর্ম!

অন্ধ মনের অধিকারী সেই ছাড় ছেড়ানোটা চট্ করে ধরতে পারে না। ভাবে, ঠিক সোজাই তো যাচ্ছে। তার যখন নিতান্তই ধরা পড়ে, তখন অবাক হয় না, বরং সেই ফলে যাওয়ায় জন্যে কারণ বলায়, অন্যকে অভিভূত করে।

সুবারের কাছে কখন কোন্ ফাঁকে এত দিনের এই পরমকাম্য অবস্থাটা পরম সুখের মনে হতে লাগল, কখন সুখটা অসহনীয় হয়ে উঠল, কখন স্বচ্ছন্দ-মুক্ত জীবনটা বিষ লাগতে লাগল আর 'অন্তরিক্ষে প্রার্থনীয়' বোধ হল, তা সে নিজেই জানে না।

ক্রমশই তার হাসি খেলা বেড়ানোটা বিস্বাদ লাগতে থাকে, জীবনের কোনো লক্ষ খুঁজে পায় না এবং নিজেকে বিজিতার বন্ধনে যেন পরাজিতা পরাজিতা মনে হয়।

এই বন্ধনটা হতে শুরু করল হয়ত নিজের থেকে অনেক কুনিকেতন ঘরে সোনা ফলাতে দেখে, হয়ত কারো সন্তোষার্থে শিল্পের মুখ-দেখানি খেলনা কিনতে গিয়ে খেলনার দোকানের বিচিত্র সম্ভারের দিকে তাকিয়ে, হয়ত দোকানে দোকানে কোলাহল রত বিচিত্র ছাদের বিচিত্র বর্ণের, আর বিচিত্র ভাসানের ছোট ছোট জামা হঠাৎ চোখে পড়ে গিয়ে। হয়ত বা কারো ছেলেমেয়ের অকাল প্রয়াণান্তরে নেপথ্যে থেকে এসে।

পরিবর্তনটা যখন এল, শুধু একটা নিরবয়ব শূন্যতার অনুভূতিতে।

কী যেন একটা হয়েছে, কিছুই যেন আর তেমন ভাল লাগছে না, অভ্যস্ত কাজ-কর্মগুলো অর্থহীন মনে হচ্ছে, এবং সন্ধ্যার অন্ধকার যেমন তিল তিল করে একটু একটু আসে দিনের আলোকে গ্রাস করতে, তেমনি একটা অকারণ অবসন্নতা তিল তিল করে এগিয়ে আসতে থাকে সুবারের উজ্জ্বল উজ্জ্বলতাকে গ্রাস করতে।

হাসিতে সেই তেমন প্রবল জোয়ার, সেই চলনে-বলনে সেই কিশোরীর চঞ্চল লাবণ্য।

সুবারকে দেখে সুবারের বয়স বোঝা যায় না। কিন্তু সুবার নিজের মধ্যে হঠাৎ কয়েকের পদধ্বনি শুনতে পায়।

আর সব থেকে ব্যথা, এতদিন যাদের দেখে করুণা জেগেছে, হঠাৎ নিজেকেই তাদের কাছে করুণার পাত্রী মনে হচ্ছে।

একটা বেদী স্পষ্ট হয়ে বুকে বাজলো সেদিন মায়েরতো নয়ন টুটু বেড়াতে এসেছে। অবশ্যই টুটু একা আসেনি। সঙ্গে বহু, আর দুই ছেলেমেয়ে।

মেয়েটা নিতান্ত শিশু, তার স্বপ্ন-কল্পনার জন্যে মানুষ কাঁদতে পারে আর মানুষ হাসতে পারে। ছেলেরা বন্ধু-বিশ্ব সুখে। সে তাদের নার্সারি শুকনোর ছাদের ছাদে বয়। গড়গড়িয়ে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, ছবি আঁকে, খালি দেশলাই বাক্স দিয়ে রেলগাড়ি বানায়, খালি শিশি নিয়ে বাঁশি বাজায় এবং মনের সুখে ছোট ছোট বাঁধার অঙ্কের উত্তর বার করে ফেলে।

টুটু, আর তার বয়সের ধারণায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোনো কু বস্তুরই ছেলে এত গুণের অধিকারী হয় না, কাজেই ছেলের সর্ববিষয় গুণের নমুনা সে না দেখিয়ে ছাড়ে না সুবার-বৌদিকে।...

আর মেয়েটা কেঁদে উঠলে ছেলে কলকাকলির সুবারের কোলে চাঁপিয়ে দিয়ে বলে, আও, ধর তো। খুব মাকি মেরে চাঁপিয়ে এলে, একটু ঘোলো।' তখন বলে, তখন যেন আহ্লাদে উপরে পড়ে তার চোখে মুখে সর্ব অবয়বে।

সুবারের মনে হল, কান্না সামলাতে দেওয়া টুটুর ছল, হুইপুষ্ট লাবণ্য-ময়ী মেয়েটাকে সুবারের কোলে বাঁধার দেওয়ার অর্থ, 'দেখো কী নিধির মালিক আমি, আর এ নিধি থেকে একলা বঞ্চিত তুমি!'

টুটুর চোখে-মুখে কথা।

যার সব কথাই ওই দুটি নিধিকে ঘিরে।

সুবোধাবেই ডেকে ডেকে বলে, 'আচ্ছা সুবোধদা, চিরকালই তো ছেলে এসেছ মেয়ের ছেলে ছেলে খালী, এ ভদ্রলোকের ঠিক উল্টো। ওর কাছে ছেলে একটা আলতু-কালতু, মেয়েই আসল। সুনেছ কখনো এমন কথা? শুধু ছেলে-জামা কিনতে কিনতে ওনার না কি অরুচি ধরে যাচ্ছিল, এতদিনে মেয়ে-জামা কিনতে পেয়ে বেঁচেছেন।' সুখের সাগরে ভাসছেন।'

সুবারের মনে হল, কথাগুলো টুটুর যেন উপেক্ষাদুষ্ট। যেন সুবারের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, 'দেখো যাকে বলে সুখ'। যাকে বলে 'সৌভাগ্য, কাকে বলে 'জীবন'।' আগে আগে টুটুরা এলে ভাল লাগত, সেদিন আর লাগল না, বিরক্ত লাগল। মনে হল, বড় বেশী কথা বলে টুটু, শুনতে শুনতে ব্যথা করে যায়।

টুটুরা চলে যাবার পর সুবারের সাজানো-গোছানো বাড়িটাকে যেন অস্বাভাবিক মনে হল।

টুটুর মেয়েকে উপহার করতে, কোথা থেকে না কোথা থেকে কী না কি জিনিস জড়ো করা হয়েছে তার ঠিক নেই। রঙিন কৌটো, পুতুলের পোশাক, প্লাস্টিকের ফুলদানী, রঙ-বেরঙের পুতুল, চুড়ি, ঘড়ি, হাত-আয়না, ফ্লানজিস্টার। কারণ শিল্পের উপযুক্ত খেলনার সম্ভার নেই সুবারের সংসারে।

এই সব ছড়াছড়ি যাওয়ার দরুণ ওদের খাটটাকে মাঠে দেখাচ্ছে। তা ছাড়া সারা বাড়িটার টুটুর ছেলের মহিমা চিহ্ন। ঘর ভর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে টিপ্, কাগজের নৌকো বানিয়েছে, এরোপ্লেন বানিয়েছে, দেশলাই কাঠি ছড়িয়ে লোকমার্কা বানিয়েছে, বার তিন-চার জল খেয়ে গেলাস বসিয়ে রেখেছে যেখানে সেখানে, জল ফেলেছে এখানে ওখানে, রসগোল্লা খেয়ে রস ছড়িয়েছে ঘরে দালানে সর্বত্র।

ওদের বাসে তুলে দিয়ে ফিরে এসে সুবোধা ঘরটার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে ওঠে, 'বাবাঃ! সারে কী আর! সারাক্ষণ, দিন-রাত্তি, এই রকম সহ্য করা! ঔ তাবাই যায় না।' কিন্তু সুবার কথা বলে না, শুধু জিনিস-গুলো গোছাতে থাকে।...মনে মনে কেন কেমন একটা অপমানবোধ আসছে, যেন টুটু ওকে টেক্কা মারতে এসেছিল, মেরে দিয়ে গেল।

কিন্তু কেন?

সুবার কী বাঁজা মেয়েমানুষ?

সুবার কী ইচ্ছে করলেই ছোট্ট নিধি আহরণ করতে পারে না?

প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে যেন তোল-পাড় তোলে। অন্ধ ধান খুইয়ে বলতে পারছে না সুবোধাকে। এমন কি টুটুর বাচালতার নিন্দেটাও করতে পারছে না, পাছে সুবোধা কিছু ভেবে বসে।

কিন্তু সুবোধা ও সব কিছুই ভাবতে যায় না, ও বলে, 'এইটুকুর মধ্যেই ওরা তোমায় বেশ কাহিল করে দিয়ে গেছে দেখছি। ঔ বাবা! কী দুর্দান্ত ছেলে! আর এই বয়সেই আত্মপ্রচারের কী মোহ!...মা-বাপই বাহাদুরী বাজিয়ে দিয়েছে।'

সুবার নীরব।

সুবারের মনের মধ্যে এখন ঝড়ের ঝড়।

সে ঝড়কে ভাষা দিলে, অনেকটা এই—কেন না কেন? এতে আমার এত লজ্জাই বা কী আছে, ভেঙেই বা কী আসছে? আমি তো আমাদের জীবনে শিশু আসতে দেব না এমন প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে দিই নি!

আমাদের মধ্যে তো একটা অলিখিত চুক্তি আছেই। ইচ্ছে হলে, সময় বুঝলে আনবো।

অলিখিত হলেও অস্পষ্ট নয়।

এখন যদি আমি বলি, 'ইচ্ছে হচ্ছে, সময় হয়েছে', তুমার কী আছে?

শুধু বোঝার মধ্যে কী একটা বাধা। সেই বাধার দ্বারা দুজনের নিবিড় অন্তরঙ্গতার মাঝখানে ব্যবধান রচনা করে। চিরকেলে একটা কথা ছিল, ছেলেদের বুকে ফুটে তো মুখে ফোটে না। মনে হতো বুঝি এ-যুগে কথাটা অচল হয়ে গেছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়।...

তবু সুখ ফুটল একদিন। ফোটানোই বলা যায়।

ত্রাহিনের মেয়ের জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেয়ে এসে ভাল শাড়িটা খুলে পাট করতে করতে, সুবার বলে উঠল, 'নাঃ, আমরা বড্ড পিছিয়ে পড়ছি। এবার একটু দৌড়ুল দরকার, আগে ওঠা দরকার।'

সুবোধা ড্রয়ারেটের আয়নাতে ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে সিগারেট মুখে করছিল, উঠে বসে বলল, 'হঠাৎ?'

—হঠাৎ নয় গো, হঠাৎ নয়,' এ কথা বলে উঠতে পারল না সুবার। বলে উঠতে পারল না, কতদিন থেকে নার্সার পাতের নীচের মাটি ভিজে ভিজে কয় হচ্ছে, সে কি তোমার চোখে পড়েছে? এখন পাড় ভাঙছে।

নাঃ এ-সব কথা বলা যায় না, তাই সুবার ঘাড়ো চুল দুলিয়ে প্রসাধন রঞ্জিত মুখটাকে কাঁকনে হেসে হেসে বলল, 'কেবলই লোকের বাড়ি খেয়ে আসি, রিটার্ন দিতে পারি না।' সুবোধা বলে ওঠে, 'বা! বছরে একবার করে সমারোহ করি না আমরা?

করে। বিবাহবার্ষিকীতে ঘটা করে খুব। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়জনের নেমন্তন্ন করে এনে রাজকীয়ভাবে খাওয়ায় বছরে বছরে বাড়িতে। তবু যেন বছরে বছরে তার জেল্লা কমে যাচ্ছে। আগে যারা শুধু 'খেলে' যাসত, হাসি গল্প গানে উপহারে জমজমাট করে তুলত, স্বভাবতই এখন তাদের সঙ্গে (কেনা নয় অবশ্য) একটি দুটি থাকে, আর ওরা তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাড়া-তাড়ি খেয়ে নিয়ে চলে যেতে চায়।

বয়স্ক আত্মীয়রা আর আসেনই না, এরা এরা অল্পবয়স্ক যেমন, যোগা যায় তখনই তাদের অরুচি এসে যাচ্ছে। উপলক্ষে নেমন্তন্ন করলেই উপহার নিয়ে আসতে হয়, এই এক পুরনো রুচির 'পুরাবিবাহে' আর সে পক্কা করতে ইচ্ছে করে না, কত নতুন চেউ আসছে।

তা ছাড়া অন্যের কাছে এটা যেন নাকামিই লাগে। জমকটা যেন—আর কতকাল চালাবি বাবা! বয়েস হচ্ছে না?

অতএব জেল্লা কমেছে, সুর কেটে গেছে।

সুবারও সেই কথা বলে।

ঠোঁট উল্টে অনুরূপ একটি বিদ্রূপ ভঙ্গিমা করে বলে, 'সে তো সেই একযুগে পক্কা।'

সুবোধা আবার একটা সিগারেট

বলতে বলতে হেসে, 'আমরা চির-নূতন।'

—'লোকের তা লাগে না।'

—'যা লাগল তো বলেই গেল।'

—'বটে, লোক নিয়েই তো জীবনের কারবার।'

সুবার দামী শাড়িটা পাট করল, আলমারিতে তুলতে এদিক ওদিক তাকিয়ে দিনিল, স্নেহ বাক্সটা, স্নোএর শূন্য টিউবটা, গলার হারটা, বখাবত রাখতে সবই, বাঁচল আর সারা যায় পরে। বাড়িতে দ্বিতীয় বাড়ি নেই, ঠাকুর চাকরের রাত্রে মোতলার ওঠার কারণ নেই, কাজেই শয়নের বিষয়ে বাধা নেই।

সুবোধনা সুরূপা হতিমে দ্বাদ্বিশ্বের মত শূন্য দিকে তাকিয়ে তাতির সুবোধা এখনো মুগ্ধ হয়। হেসে বলে, 'ওখানে তোমার দেখে সবাই দুদিনের ছোট বোন ভাবছিল।'

সুবার আলনা থেকে একখানা আট-পৌরে শাড়ি টেনে নিয়ে পরতে পরতে বলে, 'তাতে আর কী গৌরব বৃদ্ধি হল?'

সুবোধা হেসে বলে, 'হল না? আপাতত তা হলে আরো ওঠাটাই গৌরব বৃদ্ধির উপায়?'

—'হুঁ।'

—'আমার তো মনে হয়, লোকে আমাদের হিংসে করত।'

—'হিংসে করে কি কখনো করে, জানো তুমি?'

—'কখনো? তাই না কি? কে হঠাৎ কবুণা করতে বসল? যারা জন্মলায় কালাপাহা?'

—'ওই কালাপাহাড়েই সুখ।'

—'ঠিক আছে, তাহলে আরো ওঠার তাহলেই উঠে পড়ে লেগে পড়া থাক।' বলে সুবোধা রহস্যের অভি-ব্যক্তি প্রকাশ করে হাসে।

কিন্তু লোক পড়লেই কি লেখে যায়? হাত বাড়ালেই নন্দন কাননের ফুল পেড়ে আনা যায়?

ওরা পাশে এসে ধরে ঠেকে বলে দূরে দূরে ধরে মুখের উপর ধরনা বন্ধ করা তত সহজ, সে ধরনা খুলে ধরে ফের ঠেকে আনা তত সহজ নয়।

বিজ্ঞান তোমার অনেক শক্তি বিজ্ঞের বলে তুমি ভাবছ সবই তোমার হাতের মুঠোয়?

ওদের মান নেই? অভিমান নেই? মর্যাদাবোধ নেই?

না, ওরা আসবে না। ওরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওই বিমুখ মুখকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রসন্ন করতে পার, এমন ক্ষমতা কিসের তোমার বিজ্ঞান?

বিজ্ঞান মারতে পারে, বাঁচাতে পারে না। বিজ্ঞান কেড়ে নিতে পারে, দিতে পারে না।

বৃথা আশা তোমার সুবার।

এ সত্য ধরা পড়তে আরম্ভ করে দেখেছে। আর সে 'সময়' যেন সুবারের মধ্যে ভিতরে ভিতরে কথা বলতে চাইছে।

সেই কথার কটা মন নিয়ে একদিন হঠাৎ বলে ফেলল সুবার, 'তুমি নিশ্চয় আমায় ঠকিয়েছ, প্রতিরোধের দাওয়াইয়ের বদলে চিরযৌবনের বটিকা খাইয়ে বসে আছ।'

কথাটা অবশ্য মৌতাতেই, সাধারণ কথনের ওঠনামার ভঙ্গিতেই। প্রথম প্রথম তো নিজেকে উদ্ঘাটিত করে বলেনি। অতএব দুঃখ হয়নি, নিরাশ হয়নি।

সুবোধাও অতএব তত বেশী চমকাল না, শুধু হেসে বলল, 'নিজের দুটি অপরের ঘাড়ে চাপাচ্ছ কেন বাবা? কথন নিশ্চয় তোমার নিজেরই পরীক্ষাহয়ে। ও বটিকা তো সব মহিলার সুবার খাওয়ানই ছিলবে। ওরা যদি এমন মুখ থাকতো দেশে জনসংখ্যা সমস্যার সুমোমাঞ্জস হয়ে যেত।'

—'আমি জানি না,' সুবার বলে, 'তবে উঠোপাড়ে লাগার রেজাল্ট এমন মোলমাকাঁ কেন?'

—'এ কেন উত্তর আমি দেব?' হেসেই অন্দির হয়েছিল সুবোধা।

কিন্তু হাসলে কী হবে? হাসির বাতাসে কি আর বিষবৃক্ষের চারা উপড়ানো যায়?

সুবার ঠিক করছে কখন ভালো-বাসার ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে পারবে না সে। এখনো সুবারের সামনে জীবনের অনেকখানি পড়ে।

এখনো যদি সেই ফিরে পাওয়া অভিমানীদের কেউ একজন এসে দাঁড়ায়।

মুখে স্বর্গের সুষমা, দেহে ফুলের লাবণ্য, সর্বাঙ্গে ঘিরে আলোর জোয়ার, এসে দাঁড়িয়ে বলে এরে, 'এলাম! এসেই ফেলাম! ক্ষমা করে ফেলেছি তোমাদের।'

সুবার যেন 'ইচ্ছা স্বপ্ন' দেখে।

দেখে সেই নবনীত কোমল শিশু-জগতকে বুকে ধরে সুবার—

হঠাৎ দেখে বুকের কাপড় ভিজে উঠেছে চোখের জলে।

আশ্চর্য! একটা সত্যি স্বপ্ন দেখি না! ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবে সুবার, 'কত লোকের মুখে কত স্বপ্নের কথা শুনি, স্বপ্নে আশ্বাস পাবার পর প্রার্থিত বস্তু পেয়ে যায়।'

পিসিমা বলতেন, 'সাপের স্বপ্ন দেখলে ধন বৃদ্ধি হয়।' ছেলেবেলায় এমন অনেক কথাই শুনেছে সুবার, 'কুসংস্কার' বলে হেসে উঁড়িয়েছে, এখন সুবার পিসিমার চেয়ে অধিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই সুবার রাত্রে শোবার সময় প্রার্থনা করে শোয়, 'যেন সাপের স্বপ্ন দেখি।' কী অকৃতজ্ঞ সুবারের!

অন্ত সুবারের বাহ্যিক চেহারার কিছুই পরিবর্তন ঘটেনি।

এখনো সুবারের ঘাড়ে কাঁপানো স্যাম্পু করানো চুল আবীরা হয়েই থাকে, সুবারের ব্লাউসের কাটা হাতা বলে কিছু নেই, শুধু হাঁক ফেরেক টেপ, সুবারের পরনের শাড়ি ওজন-হীন, আর সুবারের সুবারে ঠোঁটেতে পালতে বিচিত্র প্রসাধনের ছাপ।

অভ্যাসের বশে যা করে আসছে তাই করে যায়, কিন্তু এ সবের মধ্যে আর অর্থ খুঁজে পায় না সুবার।

মাঝে মাঝে মনে হয়, খুকী সাজা মেয়ে হয়ত হাসে দেখে।

কিন্তু চট করে ঠাট ছাড়া যায় না।

শুধুই মেয়েমানুষের চিরন্তন মাতৃত্বরের দেয় ক্ষুধা নয়। আশা-ভঙ্গের জ্বালা সুবারকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছে।

যেন যথাসর্বস্ব এক বিশ্বাসঘোগা ব্যাঙ্কের জমা রেখেছিল, প্রয়োজনের সময়ে সে অর্থ তুলতে এসে দেখতে পাচ্ছে, ব্যাঙ্কটা ফেল হয়ে বসে আছে।

ছেবেছিল কলসী ভর্তি জল মজুত আছে ঘরে, ফেটার সময় ঢেলে খেতে এসে দেখে জল ছিল না, শুকনো কলসী।

'ছেবেছিলাম জীবনকে উপভোগ করছি, মনের মধ্যে উচ্চারণ করে সুবার, বুঝতে পারিনি জীবনকে হারাচ্ছি।'...

গাছের জল সব সময় ফলে না, তার নিয়ম আছে, সময় আছে। মানুষের বেলাতেই শুধু নিয়ম থাকবে না?

সেকালে না কি 'ইচ্ছাময়ী' ছিল, একালে 'ইচ্ছাকল্প'। কিন্তু কই? সুবোধা বলছে, 'কথন তোমার নিজেরই পরীক্ষাহয়ে', তাই মেনে নিয়ে পড়ে থাকবে সুবার?

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ

সুবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, মনে পড়ছে, কখনো ও অপমান মেনে নিয়ে পড়ে থাকার মানুষ নয়।

এবার একটা ডিসেশ-নেলসের দরকার।

ডিসেশনেলস মানে আত্মরক্ষী পরীক্ষা।

কারণ এখন সুবারের মনে মনে সন্দেহ হচ্ছে দুটি সুবোধাই ঘরে, আর ও তা জানত। তাই ধরা পড়ার ভয়ে সুবারকে জীবনকে উপভোগ করতে উৎসাহিত করেছে, ইচ্ছা-জন্মের প্রলোভন দেখিয়ে। উৎসাহিত কি, প্ররোচনাই দিয়েছে।

এখন সুবার ভুলে যায়, একদা তাহাই ছিল অধিক উৎসাহ।...পাত্র দুষ্ট স্বচ্ছল জীবনের মাঝখানে 'অন্তরিক্ষে' এসে বাজনা বাজায়, সেই আহ্বানে কর্তৃপক্ষ থেকেছে সুবারই।

মেয়ে মনের নিজস্ব এই। নিজের মেয়েটা ভুলে যায়, স্বামী নামক জীবটিকে সকল দুঃখের মূল ধরে নিয়ে, অন্যায় অভিযুক্ত করে।

অতএব সুবার ডিসেশনেলস দেখার কথা বলে রেখে ছেড়ে।

অতিলম্বিত গভীর রাত্রি।

সুবোধা নামের লোকটা যে তার নামের অনুরূপই, তাহাই একটা পাকা ধরিল আবার করতে চায় সে' করে লাভ কী? তা জানে না, শুধু একটা হিরে মনোভাব নিয়ে বলে, 'একটা ডিসেশনেলস করতে হবে।'

সুবোধা বলল, 'ঠিক আছে। চল একদিন চিনসুরার চুমুরায়। আমি রাখব।'

সুবার মনে মনে বিষ দেখে।

সুবার নতুন স্বপ্ন দেখে, ডাক্তার হয়ত বলবে, 'তোমার কোনো দুটি নেই, শুধু এতদিন ঠেকিয়ে রাখার জন্যে—আচ্ছা, আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি, ঠিক হয়ে যাবে।'

তারপর হয়ত মেসে মেসে বলবে,

যাক, এতদিনে তাহলে নিশিরও হবার ইচ্ছে জেগেছে?'

ছিল আগে।...

দুষ্মন্তের স্বপ্ন সফল হয়। ডাক্তার ঠিক ওই একই কথা বলে, তুমি কারোর হবেই নেই।'

—তাহলে?'

—তাহলে সেই ঠাকুমা বিশিষ্ট-দের কথায় ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় কী? ভগবানের লীলা!'

ফিরে এসে সুযোগ্যা বলে, হল তো? সাধ মিটল?'

দুষ্মন্ত মাথা নেড়ে বলে, তোমা ডাক্তারে বিশ্বাস নেই। ওরা মিছে ভয়ও দেয়।'

হ্যাঁ, দুষ্মন্তের মতো এখন সেই অসুখ।

চিন্ময় ডাক্তার সুযোগ্যার চির-কালের বন্ধু।

সন্দেহ তো সেইখানেই।

অন্য কেউই বা?

সুযোগ্যার বড়লা সুবলের তিন তিনটে ছেলে, সুযোগ্যার মেজবার একটা ছেলে, অবার একটা মেয়েও।

মেয়ে তো নয়, যেন পাখরকুচি।

কিন্তু সুযোগ্যা যে তার নামে অমন ধারের তবের এই বেলো যন্ত্রের লাল্টেনটাকে একটা চড়াই পাখিও উপহার দিতে পারল না তার প্রতীতে! ছি!

আর সেজন্যে যেন দুঃখ-লজ্জাও নেই।

রুমেই উত্তাল হয় দুষ্মন্ত। রুমেই সুযোগ্যাকে প্রতিপক্ষ ভাবতে সুরু করে। দুষ্মন্ত যে এতদিনের অভ্যস্ত ঔদাসীন্যের পাপ থেকে মুক্ত হতে চায়, প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়, এ কি সুযোগ্যা বোঝে না?

বোঝে যে কি। কিন্তু বুঝেও বুঝতে চায় না।

ক্রমশ দুষ্মন্তের মনের অন্যে বাবধান বেড়ে চলে। আর তাদের কাহিনী লেখা যায়।

—তুমি অন্য ডাক্তার দেখাও। একেবারে অচেনা ডাক্তার।'

—না।'

—কেন না?'

—না বলেই না। ওর আর কেন নেই।'

—এতে তোমার এত কী প্রেস্টিজ-হানি হচ্ছে? চিন্ময় তোমার বন্ধু, সে তোমার ব্যথা-অসুখ ঠিক মতো সোপনও করতে পারে।'

—সেটা তোমার কেতেও হতে পারে না কেন?'

—চমৎকার! ও কি আমার চির-অসুখের বন্ধু?'

—না হলেও, দুষ্মন্তের সহজাত ভাবার বলে সত্যটা চেপেও যেতে পারে।'

দুষ্মন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে চুপ করিয়ে বলে, অন্যা রে! পুরুষের সহজাত অভ্যস! কী উঁচুদরের বাংলা! তোমার তো বাংলার অনার্স ছিল না। পুরুষজাতটা একের নম্বর নিষ্ঠুর।'

—মেয়েদের থেকে নয়। নিষ্ঠুরতার পুরুষজাতটা মেয়েদের হাটের নীচে।'

—ওঃ!' বলে মুখ ঘুরে যায় দুষ্মন্তের।

আবার এক সময় বলে ওঠে, যেমনে বছর ঘর করার পর এই কথা বলতে তুমি আমায়! কী নিষ্ঠুরতা করেছি তোমার সঙ্গে?'

সুযোগ্যা চেয়ারের পিঠে মেন মিশে উদাসভাবে বলে, 'আজও করছ। হঠাৎ সুযোগ্যা রায় নামের মানুষটা তোমার জীবনে মিথ্যে হয়ে গেল, একটা ঢেউ এসে আলা মুখে নিয়ে রাত-দিন প্রলাপিত করছ। কী অ-সুখে ছিলাম আমরা দুষ্মন্ত? তাই তুমি হঠাৎ আমে ছেলে করে এমন পাগল হয়ে গেলে?'

—তুমি বুঝবে না।'

—বাস্তবিকই বুঝতে পারি না।'

—কেন তো, আমার মনের শান্তির জন্যেও তো একবার অন্য ডাক্তার দেখাতে পারতে।'

—তা হয় না। চিন্ময় আমার বন্ধু। ওকে আমি বিশ্বাস করি: কিন্তু একটা কথা বলি, যদি প্রমাণিত হয়, দুটিটা আমার ভুলে, কী করবে?'

দুষ্মন্ত গম্ভীরভাবে বলে, 'করব না কিছু, শুধু আশা করাটা ছাড়ব।'

—'কেন তাহলে তাই ছাড়? আমি নিজের অক্ষমতা স্বীকার করছি।'

দুষ্মন্ত বিষণ্ণ গলায় বলে, 'ও তো তোমার রাগের কথা।'

সুযোগ্যা হতাশ গলায় বলে, তুমি যে কী চাও বুঝি না।'

দুষ্মন্ত হঠাৎ প্রেমে উঠে বলে, এখন বুঝছি তুমি কী? নিশ্চয় তুমি আমার যা তা ভেবে থাকছ এতদিন। আমি জন্মের মত—'

সুযোগ্যা হঠাৎ প্রেমে উঠে বলে, 'আইনে লেখছি তুমি বড় কাঁচা দুষ্মন্ত। ঠিক মতন একটা চার্জশীটও গড়ে তুলতে পারছ না। তোমার কথা-গুলো পরস্পরবিরোধী।'

এর পর দুষ্মন্ত কেপে ফেলে।

অতএব নিষ্ঠুর পুরুষকে নিজের মন খাটো করে তাকে তোলাতে হয়।

দুষ্মন্তের আবেগে গলিয়ে অনুশোচনা বলে, আমা থেকে লোকটা বিশ্বাস করে ফেলে।...নাই বা হল ছেলে-পুলে। শুধু কি নিজেদের নিয়ে থাকা যায় না দুষ্মন্ত? বিশ্বে অনেক কত কাজ আছে, তার মধ্যেই শান্তি খোঁজার চেষ্টা কর।'

অমনি দুষ্মন্তের মন ঘুরে যায়। সুযোগ্যাকে শুদ্ধ পাক মনে হয়। আর তখনই আবার ভেদের পথে নামে।

ক্রমশ আলোচনার ধারা এই রকম একটা খাতে প্রবাহিত হয়, 'দেখো মৈত্রের অনাথা কিছু নেই। চল না আমার সঙ্গে এক জায়গায়, দু'জনে না ভেলে হবে না।' এ পর্যন্ত দুষ্মন্তের কণ্ঠে নয় কিনাতির সুর।

কিন্তু সুযোগ্যা এ সুরকে মর্যাদা দেয় না। বলে, 'না।'

—'আচ্ছা কেন নয়?'

সুযোগ্যা ক্লান্ত স্বরে বলে, 'অনেক দিন তো দেখছ আমায়, তবু কেন জিজ্ঞেস করছ?'

—'জানি, তোমার কাছে সবই দুর্জ্ঞেয়।...বেল 'ভরের ঘরের কাছে না যাও, বুড়োশিবতলায় চল। হাজার হাজার লোক নিত্য যাচ্ছে।'

—'বাজ, তালই। একজন না ভেলে কিছু এসে যাবে না ঠাকুরের।'

—'খুব আহত ঠাকুর না কি—'

—'আহত সুস্থ মানুষের তৈরি কোনো ঠাকুরের প্রতিই আমার মোহ নেই।'

এর পর কে পারে মেজাজ ঠিক রাখতে? কে না বলবে, 'এ কিম্বদৃশ্য সবাই দুষ্মন্ত, উনিই একা বুদ্ধিমান।' কে না রাগ করে উঠে যাবে?

তবু গল্প বড় বালাই।

রাগপালটা এমনি গোলমেলে, ওই লোকটার সহযোগিতা ব্যতীত কেন দিকে কোনো উপায় নেই। অতএব আবার মান খাটো করা—

—'বেশ তবে বক্তেশ্বরে চল। যাকে এখন আর লোকে শুদ্ধই জন্য কুসংস্কার বলছে না। ওর মধ্যে বিজ্ঞানের ব্যাপার আছে।'

—'থাক, তুমি যাও।'

—'কেন আমি একা যাব?'

—'একা কেন? তোমার তো কত সঙ্গীসাথী আছে।'

—'না, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। চল না। ধর্মরাজ ঠাকুরের থানে, শুনলাম সেখানে—'

—'না! না! না!'

—'আশ্চর্য! একটু বেড়াতে যাবার মত গেলেই বা কী? পঞ্চানন ঠাকুরের কাছে আমার মানত আছে তোমায় নিয়ে যাব—'

—'যা হোক একটা মানত কর কেন?'

—'বুঝতে পারিনি, তোমার ওপর আমার একটু জোর খাটবে না।'

—'কী করা যাবে বল।'

—'কেরালা ঠাকুরের জোর করে কত লোকের বাসনা পূর্ণ হয়, যাচ্ছেই নাম রেখেছে 'কেরা' কি 'কেদু', বুঝবে ওনার জোরটা।'

—'থাক, একটা জান অর্জন করলাম।'

—'তুমি তাহলে কোথাও যাবে না?'

—'কোথায় তো না না না।'

—'আগে তুমি আমার সব ইচ্ছে পূর্ণ করেছ।'

—'সে ইচ্ছের মানে ছিল। এখন মাথামুণ্ডুহীন ইচ্ছে ছিল না।'

—'তোমার মনের সঙ্গে না মিললেই মাথামুণ্ডুহীন। একবার তুমি আমার ইচ্ছের কোনা টিকিট, রিজার্ভেশন, সব বাতিল করে দিয়ে কাশ্মীরের বদলে শিলঙে নিয়ে ফেলে আমায়, মনে আছে?'

—'বললে তাই মনে পড়ল।'

—'তখন তোমার মনে হয়নি, আমার ইচ্ছেটা মাথামুণ্ডুহীন।'

—'হয়নি তো দেখছি।'

—'তার মানে, তুমি কখনো চাও না, দুষ্টো হয়ে চাও না, ছেলে চাও না।'

সুযোগ্যা শান্ত গম্ভীরভাবে বলে, 'কী চাই না চাই, সেকথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে বেড়িয়ে লাভ কী? তবে এ কথা ঠিক, তোমার মত আমার মধ্যে এমন হাহাকার নেই যে, ধর্মতলায় ভিক্ষে বাঁধতে যাব।'

এমনভাবে ধিক্কার দিয়ে বলে যে, দুষ্মন্তের যেন চেতে পড়ে যায়, দুষ্মন্ত ক্রমশ কত গহিয়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় কী? ডাক্তার যদি নির্দেশ দিত, ঘটা করে চিকিৎসা করতো, অপারেশন করতো, এ যে কিছুই করার নেই, দৈব ছাড়া।

কিন্তু আধা-সাহেব সুযোগ্যা রায়ের সুযোগ্যা পত্নী দুষ্মন্ত রায় এ সব বাবুলি কবচ জলপড়া শুভপড়ার সন্ধান পেল কোথায়? কী সূত্রে?

দুষ্মন্ত কখনো জানতো কোথায় 'বাবাঠাকুর', কোথায় 'ভরের কালী', কোথায় 'কেরাপাল', কোথায় পঞ্চানন-তলায় আনন্দময়ীন 'পঞ্চানন', কোথায় ছিল বাঁধা, কোথায় তপ্তকুণ্ড স্নান? অলৌকিক শব্দটাই তো দুষ্মন্তের কাছে অবহেলার ছিল। দুষ্মন্তের এই অলৌকিককে বিশ্বাসটাই অলৌকিক।

দুষ্মন্তের প্রথম সুরু বাসনমাজা কি মুক্তোর মা। প্রথম গাইড্। পুরনো লোক নয়, নতুন।

তবু প্রথম আসার দু-একদিন পরেই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করল, 'বৌদিদির বুঝি এখনো কাচ্চা-বাচ্চা হয়নি?' দুষ্মন্তের মনে পড়ল, মুক্তোর মার সঙ্গে শুদ্ধ মুক্তোরই নয় আরো অনেক। রীতিমত একটি বাহিনী।

হাল বলল, সংক্ষেপে বলল, 'না।'

মুক্তোর মা এ নির্যাস গায়ে মাখল না। ঘর ঘুছতে ঘুছতেই বলল, 'কতদিন যে হয়েছে?'

দুষ্মন্ত বলল, 'অনেকদিন।'

মুক্তোর মা দার্শনিক গলায় বলল, 'তাহা এরেই বলে, কার কপালে সোনা যে, আর সোনা কইছে কান যে! ...তা বৌদিদি, তোমাদের এতনকার কথা তো ডাক্তার-বদ্যি করে, করনি সে সব?'

তুষারের রাগ বাড়ছিল, অথচ এ প্রসঙ্গে রাগ দেখাতে লজ্জা করছে, তাই সংক্ষেপে বলে, 'অসভ্যতা।'

দুঃখোর মা আরো নরম গলায় বলে, 'কম পাওনি, বেমন? তা বৌদিদি, তোমরা বুঝি টেব-টেব বিশ্বাস কর না?'

কথাটা শোনা মাত্রই তুষারের 'টেব-বালীর মত মনে হল।

তুষারের মাথা থেকে পা অবধি একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল।

তুষার ওর ওপর রাগ করছে? আর হয়তো দেবতা নিজেই অন্তর পথ দেখাতে এই সামান্য মেয়েছেলের মুখ দিয়ে এ সব কথা বলাচ্ছেন।

তুষার এখন অত্যন্ত ভারী পাল্টাল, ঈষৎ নরম হয়ে বলল, সে-সব আমি তোমার কী জানি? ঘরে তো শাল্‌দুড়ী শিখানাশুড়ী নেই। করবে কে ও-সব?'

—মা নেই?'

তুষারের আর একবার সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

মার কী সামনে যে সত্যের আমাইয়ের বৌয়ের কাছে 'টেবলাঙ্গ'র কথা বলতে আসবেন? মা কি মেয়েকে অনেক দিন আগে বলেন নি, 'হ্যাঁরে বৌমা যা বলছিল, সত্যি?'

তুষার হেসে ফেলেছিল, 'কী বলছিল তোমার বৌমা, সেটা না জানলে কী করে বলি!'

—বলছিল তুই না কি ছেলেপুলে চাস না বলেই তোর—'

—তোমার বৌমাকে বোলো, পরের চাকরির চেয়েটা কেন একটু কম দেয়।'

মা আহত গলায় বলেছিলেন, 'এতখানি বয়েস হল, এক-আধটি হবেই বা কী? একেবারে না হলেই কী ভাল?'

—একেবারে হবে না, এমন কথা বলেছি না কি?' তুষার মার গলা ধরে ঝুলে পড়েছিল, 'পরে হবে। তোমার যখন বত্রিশ বছর বয়েস জামাইয়ের শাল্‌দুড়ী হতে সাধ নেই বাবা!'

মা বলেছিলেন, 'কেমী করলে হবে মানুষে বলবি কবে?'

—যবে মা যবে, সব হবে।'

সেই ইতিহাসের পর কি এখন তুষার বলতে যাবে, মা, আমার অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে, এখন দেখো যদি তোমার টেব-টেব কিছু করতে পারে।'

সে হয় না।

তার থেকে বরং লুকিয়ে চুরিয়ে এই দুঃখোর মাকে ধরেই যদি—

এরা সরল, কিন্তানী। এদের কিন্তু আছে। হয়তো এদের আছেই অলৌকিকের ওপর চাবি আছে। বলল, যা আছেন, তিনিও এক সব জানেন টানেন না।'

দুঃখোর মা বালতিটাকে হিঁচড়িয়ে করে টানতে টানতে সেই সূত্রের সবেই বলে, 'তা তোমার যদি কিপ্পেল থাকে বৌদিদি, এক জায়গায় সে যেতে পারি। কত লোকের ছোয়-ব্যাধি ভাল হচ্ছে, পাগল সারছে, কত বাঁজার কোলে ছেলে আসছে—'

সেই সূত্র।...সুযোগকে না জানিয়ে।

নিজের সহজে নয়। সোজা করে শাড়ি পরে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে, দুঃখোর মার সঙ্গে এক রিকশায়।

ভিড়ে ঠেলে মাথার-চাঁদির কিছু নয়। শ্রীহীন একটা একতলা বাড়ির ভিতর ঘর। সেই ঘরে 'অরে'র ধান্দা চলছে।

লোকে লোকারণ্য। অবাকস্বপ্ন-বর্ণিতা।

সেই সব মেয়ে-পুরুষের ছোয়া মেখে তাদ্দব বনে যায় তুষার।

এ'রা আসেন এখানে। হাঁটুমত শিক্ষিত সভ্য হাঁড়ি। এঁদের মধ্যে জজ আছেন, ব্যারিস্টার আছেন, পুলিস আফসার আছেন, ডাক্তার আছেন, মাস্টার-মাস্টারনী আছেন, সিনেমা আর্টিস্ট আছেন—

তালিকা মিলিয়ে পর পর নাম ডাকা হচ্ছে, তাদেরই পাঁজির বয়া পড়ছে কিছু কিছু।

এঁরা কেউ এসেছেন ভবিষ্যৎ জানতে, কেউ বা ভাগ্য নির্ণয় করতে, কেউবা ভগবান হাতে মার খেয়ে তার প্রতিকার করতে।

ছোট উঠোনে ঘুরে পড়ছেন বেশ কেউ সাতদিন। কে জানে, কার উপরে।

কার সামনে, তা দেখতে পায় না তুষার। দেবী আছেন ভিতরে, দেবীর অনুচরীও তাই। দুঃখ বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে শুধু ভেসে আসছে। মহা মহা রহস্যভরাই শুনে যা মা করছেন উচ্চারণে।

শুনে শুনে সাহস বাড়ল। লজ্জা ভাঙল। ঘোমটা খসল।

সেদিন তুষারের ওপর আবেশ হল, স্বামী-স্ত্রী দুজনে একমন একচিত্ত হয়ে একলব্যে ঠাকুরের ফুল বাদল করতে হবে।...সন্তান হবে বৈকি, এমন সর্বসুলক্ষণা নারী, বন্ধ্যার কোনো লক্ষণ তো নেই।

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল তুষার। দুজনে 'একমন একচিত্ত'। হ্যাঁ, এরা ছিল বৈকি তারা তাই। ছিল, যখন জীবনকে পালতোলা বহু-পক্ষী নৌকোর ফুল সুখের ধরিত্রীর ছেলেরা, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়ে রাঁদ আকাশে উড়েছে, তখন ছিল দুজনে একমন একচিত্ত।

এখন তুষারের ভিন্ন পথ। নিজ নীতিতে আঁটুই সাহেবের নিজস্ব পথ। আর কোনদিন একমন একচিত্ত হওয়া যাবে না। শুধু যদি সাঁতাই কোনোদিন দেবতার বর কার্যকরী হয়। দুজনের যাকথানে সেতু নির্মাণ করতে আসে একটি শিশু। তখন হয়তো—

কিন্তু সেকথা তো বোঝা হওয়া যায় না, তাই রিকশার ভিতরে বিসতে তুষার খুব হালকা গলায় বলে, 'তাহলেই হয়েছে দুঃখোর মা। তোমার যাবাবাবু আসবে এইখানে? শ্বাশুড়ী উপরে ফেলেও না। আমি একা সেলে কাজ হবে, এমন কোনো জায়গা যদি জানা থাকে তো বল।'

তা তাও জানা আছে বৌদি। জানা আছেই। ওরা আর কত তাহার-বাধা করতে পারে? ওরা ওই জলপড়া, তেলপড়া, মাদুলি, কবচের ওপরই তো নির্ভরশীল।

তা তুষারও এখন দুঃখোর মাকে দেখছে যেন নব রূপে, কৌতুকে কৌতূহলে দুঃখোর মায়ের বলে ভিজেছে সে, কিন্তু ওরেই নির্ভর-শীল হচ্ছে।

ক্রমশঃ জানার জগৎ আরো বিস্তৃত হয়ে যাবে, গাইড্ হিসেবে কেবল-মাত্র দুঃখোর মা-ই একমাত্র থাকে না, ওই সব মাহাত্ম্যের স্থানের চারপাশে উঠোনে অনেক বান্ধবী জুটে যায়। জুটে যায় তাদের সঙ্গ।

অবশ্য সবই সুযোগকে লুকিয়ে। কত কিছু বলে ভাওতা দিয়ে।... এ যেন একটা নেশার মত পেয়ে বসেছে।

কিন্তু কতদিন লুকোবে?

আঁচল দিয়ে কি আগুন চাপা যায়? হাতের মুঠোয় হাওয়া ধরা যায়?

ধরা পড়ে গেল তুষার। ধরা পড়ে গেল তার তাবিজ-কবচ।

সুযোগ দুঃখের বিস্ময়ে বলে, 'ছি ছি তুষার। ছি ছি। তোমার এতদূর অধঃপতন। তুমি দুঃখোর মায়ের দলে ভিড়ে যাবে, চক্কে শিবপুরের ডিরোজিয়ান হাত দেখাবে? ভাবতে পারছি না তুষার।...ভাবনা হচ্ছে মাথাটা কিনছে যাচ্ছে কিনা তোমার। আমার লুকিয়ে তুমি—'

প্রথম ছেলে ফেলার দিনে সুযোগ একটা ফিলিংস হয়েছিল। তুষারও কেঁদে ফেলে বলেছিল, 'তোমায় না লুকোলে, তুমি যেতে দিতে?'

কিন্তু এখন আর সে স্টেজ নেই। এখন সুযোগের সামনে ঘিরেই তুষার যখন তখন যেখানে সেখানে যাচ্ছে। বাসে চড়ে, ট্রামে চড়ে, ঘোড়া-গাড়ি চড়ে।

সময় বড় চড়ুর শালক। অলক্ষে নিঃশব্দে তার চারপাশে ফেলে শালে আষ্টেপৃষ্ঠে আষ্টপাশ শক্ত করে তোলে, তারপর 'আমায়কে' সহজে করে নেয়।

রোজ রোজ কে ঠিকিতে হবে?

এখন আর লুকোচুরি নেই, খোলাখুলি।

এখন তুষার বলে, 'আমি এত ঘুরলাম, এত মাথা খুঁড়লাম, লোকলজ্জার মাথা খেয়ে এত বাড়ি বাড়ি ঘুরলাম, তুমি কিছুই করছ না?'

উত্তরে একদিন সুযোগও একটা মোক্ষম কথা বলে বসল। বলল অবশ্য হাসির সুরে নিগারেটের ছাই ওড়ানোর ভঙ্গীতে, 'আমিও একটা কাজ করব ভাবছি।'

—কী কাজ?'

—কাজ ঠিক নয়, বলা যেতে পারো অভিযান। মহাত্মাদের মহামোহক-টাকের মত তোমায় একটা অনুমতি দিয়ে যেতে।'

—তার মানে?'

সুযোগা নির্বিকার। হেসে হেসে বলে, মানে অতি প্রাঞ্জল। প্রাচীন কালের 'অজন' পুত্রের লাগি পতির যে অনুমতির বলে সূর্য-চন্দ্র, যক্ষ-রক্ষ হতে ঘরে ঘরে, পুত্রবধূর বর্ণন করে বলা হয়েও সতীটিতে থাকতেন, তবুও সেই অনুমতিটি দিয়ে যেব তোমায়।'

তুষার ঠিকরে ওঠে, 'দেখো অসভ্যতারও একটা সীমা আছে।'

সুযোগা হাসিতে বলার ছাই মিশিয়ে বলে, 'আছে না কি? আমার তো ভাজই ধারণা হচ্ছে, সীমা নেই।'

—'সেটা যেন হয় আমার বেলা?'

—সীতা বলো, তাই বলতে হয়।'

—আমার কী অসভ্যতা দেখলে?'

—সবটাই দেখছি। আর্শিতে দেখো নিজেকে?'

সুযোগা ট্রেবিলে রাখা ওমর খৈয়াম ভদ্রলোকটার দিকে চোখ ফেলে বলে, 'এই ভদ্রলোকটার সঙ্গে আর মিল আছে কিছু?'

মিল যে নেই সে কথা আজ শুধু সুযোগাই বলছে না, সবাই বলছে। মা বলেছেন সেদিন, বাবা বৌদি বেড়ানোই বলে, টুটু আর টুটুর বন্ধু এসে সেদিন অনেক বলে গেল। বলল তুষারের কী এক নতুন স্টাইল, বৌদিটা যেন?' তারপর সশব্দে হোহোকার করে হেসে, 'যাই বলো বাপু, একটিও বাচ্চা-কাচ্চা না থাকলে বাড়ি বাড়ি যায় না।... দুজনে আর কতদিন দুজনের মুখোমুখি বাঁচবে?'

ওদের মেসেই তুষার হাতের মার্কিন-গুলো বড়টা সন্তর্পণে তুলে নিয়ে ব্লাউসের হাতার নীচে চালান করবার চেষ্টা করছিল, আর গলার মুক্তোর উপর শাড়ির আঁচল পেঁচিয়ে ঢাকা দিচ্ছিল, হঠাৎ টুটুর সেদিনটি এড়ায় না, আর টুটু, না বলেও ছাড়ল না, 'মাদুলির মতন কী করছ্লে?'

দেখলাম বোঁচি?'

তুষারের বাহুতে মাথা রেখে চোখ, শুধু সামলে নিয়ে বলল, 'যা দেখালে তাই।'

—'হুঁহ, ডেমনস্ট্রেশনের অপেক্ষা রাখে! অবাক করলে যে!'

তুষার ওদের চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সবার বিশ্বাসের ভাক্তারের হাতেও মাদুলি দেখলে।'

—'তাই দেখছি।' চুটু, আর ওরা পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করল।

এ দৃষ্টির অর্থ বুঝতে দেরী হয় না তুষারের। এর পর ওরা বাড়ি ফিরে যাবে, বোঝা গেছে প্রকাশ। এতদিন, নিজেরাই ঠাট্টা করে বেড়িয়ে এই ভয় দেখিয়ে চাপিয়ে আসছিলেন, আর পেরে উঠলেন না, তাই সেই চিরকেলে পথ ধরা। মৈত্র ফেরেও।'

ওরা চলে গেলে, সুযোগ্যা তুষারের হাতটা টেনে ধরে কাছে বসিয়ে বলল, 'পরিজনের সামনে এই দৈন্য প্রকাশ করতে শ্লাঘিতেও লাগে না তোমার!'

অনেক দিন যেন এমনভাবে টেনে নিয়ে কথা বলেনি সুযোগ্যা। তুষারের চোখ ছলছল করে আসে। সেই তুষার, যে কোনো সময় আদরের একটু বাড়াবাড়ি দেখলে জবরদস্ত ধমক ধরে ছুলে পাড়ে বসত, 'আর বাহুর প্রশ্রয়টশ্রয় পড়ে হজম হয়ে যায় না কি? আমায় দেখতেই পাচ্ছ না—মানে?'

এখন তুষার ছলছলে চোখে যায়, 'আর লোকে যখন 'বাড়ি যাচ্ছি যাচ্ছি না', যেন-তেন বলে যায়, তখন শ্লাঘিতেও লাগে না?'

সুযোগ্যা বলে, 'আমার জন্যতেও লাগে না। ছেলেমেয়ে হয়নি, এমন দম্পতি দেখেনি কেউ?'

—'দেখবে না কেন? তাদের দুর্ভাগ্য বলে।'

সুযোগ্যা ওর মুখটা ঘিরিয়ে নিজের দিকে এনে অবাক অবোধ গলায় বলে, 'আচ্ছা তোমার মনে যে সেই আদিকালের প্রশ্নিতমন্ত্রী বসে আছেন, আগে তো বুঝতে পারিনি!'

—'নিজেই বুঝিনি।'

—'ঘর তোমার মাদুলি কবচ কেন্দ্র করল। প্রকৃতিও কাপন শুরু করল, কী করবে তুমি? দিনে দিনে উন্মাদিনী হবে? ভাবতেই পারি না, শুধু একটা বাচ্চার জন্যে তোমার জীবনটা বরবাদ করে দিচ্ছ!'

তুষার হঠাৎ অধীর হয়। ছিটকে দাঁড়িয়ে ওঠে। বলে, 'ভুল। এটা তোমার মস্ত একটা ভুল। শুধু ওই জন্যেই নয়। আমি যে এতদিন একটা অজ্ঞান আবদ্ধিকে মোহর ছেপে ছলে বেরিয়েছি, সেটাই আমার ভিতরটাকে মেয়ে না।...এত জায়গায় যাই, কেউ বলে না 'বাজা! সবাই বলে সর্বসুলক্ষণা!'

সুযোগ্যা ওর ওই উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, 'সেকালে মহীয়সী মহিলারা যে স্বামী-বন্ধুদের বাদ দেবার প্রশ্নে স্বামীকে আবার বিয়ে করার জন্যে প্রোচিট করতো, হাসতে হাসতে সতীন ঘরে তুলত, সেই মহত্ত্বের মহিমার রহস্যটা যেন এখন বুঝতে পারছি।'

এই রকমই হচ্ছে এখন। দুজনের গভীর স্পর্শ দুজন পর্যন্ত পৌঁছতে পায় না, এসে পড়ে মান অভিমানের অন্তর্বর্তিতার তাঁজ। ছুরিখানা, ডিমানের ফুলের মালাখানি কেটে ছিঁড়ে দেয়।

সুযোগ্যা বলে, 'তুমি যে কেউ ওজন জমাচ্ছ, কোনদিন না বাড়তে উঠে যাও। আর দেখা যাচ্ছে না। আর্লটিমেটাম দিচ্ছি, হয় প্রাচীন ভারতের নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ কর, নয় একটা বড়ক-ভড়ক নাও।'

তুষার অনেক দিনের পর আদরে মৃদু কৌতুকের হাসি হেসে চোখ নাচিয়ে বলে, 'প্রাচীন ভারতীয় রীতি? তা আছে না কি হাতে? সূর্য চন্দ্র বরুণ বায়ু কেউ?'

সুযোগ্যাও একটু হাসতে গেয়ে দাঁড়ি, বলে, 'ওনায়া না থাকুন, যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর, কিন্তু একটা আছেই। আছা, এ প্রস্তাব শেলে, লুফে নেবে।'

—'দেখো, আর বেশী অসভ্যতা করবে তো তোমায় আমি খুন করবো।'

সুযোগ্যা হেসে, 'দেখেছে! অমন কাজ করে বোসো না, তাতে আমার অন্য প্রবলেম এসে যাবে।'

—'কেন, কেন?' তুষার ওর চুলের মুঠিটা ধরে নাড়া দিয়ে বলে, 'একবার নয়, একশো বার খুন করবো তোমায়।'

সুযোগ্যা কোথায় যেন আশার আলো খুঁজে পায়। আগের ধরনে কথা-টথা তবে বলতে পারছে এখনো তুষার! তবে যোর হয় কাটেনি। ওই ছোটলোক কিটার চরো-চনার পড়ে সামগ্রিকভাবে দুর্বিনীত হয়ে যাচ্ছিল ওর।

মুখাতে কাছে টেনে এনে বলে, 'খুকোনায়, অফ-হুক রাজী নও। এদিকে সূর্য-চন্দ্রও বিমল, অতএব—'

তুষার গম্ভীরভাবে বলে, 'শুধু তো আনা হচ্ছে, 'প্রাচীন ভারতীয় রীতি', বুকে হাত দিয়ে বল দিকি, এরপর কেনো পুরুষের পক্ষে সেটা সহ্য করা সম্ভব?'

—'সেকালে তো সম্ভব ছিল।'

—'সেকালের কথা বাদ দাও। এই তো কিছুকাল আগেও পুরুষ মহাশয়রা মত ইচ্ছে বিয়ে করতেন, এবং মহিলারা সেটা সহ্য করে, সতীন নিয়ে ঘরও করতেন।'

সুযোগ্যা হেসে ফেলে বলে, 'যা হচ্ছতো করতেন, মানে করতে বাধ্য হতেন, কিন্তু সহ্য করতেন কি? বলুন, 'সতীন' শব্দটি এমন ঐতিহাসিক বিভীষিকা হয়ে থাকতো না।...আসল কথা, এই একটা জায়গায় শুধু ভুল কেন, থাকবানে কারো ছাড়াপাতও সহ্য হয় না।'

—'হুঁ।' তুষার বলে, 'এই তো এলে আসল কথায়। অন্ধ প্রাচীন ভারতীয় রীতি দেখাতে আলো কেরল।'

—'তা তুমি তোমার শুধুকুলের রংগরক্ষার জন্যে যে রকম ব্যাকুল হয়ে উঠেছ, তাই এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। একালেও তো শুনি শুধু-পুরুর-টুরুর ছেকে আনা হয়—'

—'শুনতে তো অনেক কিছুই পাওয়া যায়। সবটাই ঘটনা নয়, রটনা। আসলটা মানুষকে নিয়ে; পশু-পক্ষী জীব-জন্তু নিয়ে নয়, সেটাই ভেবো।'

সুযোগ্যা বলে, 'আ সেটাই ভেবে-চিন্তে তো বলছিলাম, তুমি যখন এতই আপত্তি হচ্ছ, আজ্ঞমান কাল হতে সমস্ত পৃথিবীতে বেজাবে এই সমস্যার সমাধান হয়ে আসছে, তাই বলা ছোক। তাতে কেউ অবাক হবে না, কেউ নিন্দে করবে না—'

—'আরে সেটা আবার কী?'

—'বলছি তো বাবা ছোজ। বেশ নিরিবিলি পুকুরঘাট, ছেলে একটি বাচ্চা নিয়ে পুকুরে শুধু করা। অতুলন স্নেহ-ভক্তির পরিতৃপ্তি ছোক।'

তুষার বেজার গলায় বলে, 'ওসব আমার রুচি নেই বলেছি তো। কার না কার পেটে জন্মানো একটা ছেলে নিয়ে—নাঃ। অসম্ভব।'

তুষার বলল, 'অসম্ভব', তবু কার্তিক পরে একদিন চিন্ময় ডাক্তার এল। বলল, 'আপনি আপত্তি করলেন মিসেস রায়, অন্ধ আমার ওখানে, মানে নার্সিংহোমে, কত নিঃসন্তান দম্পতি ধরনা দেয়, যদি একটা ছেলেটি বাচ্চা পায়।'

তুষার বলে ওঠে, 'শুধু ছেলেটি? মেয়ের চায় না?'

—'সেটা তো বেশী চাওয়া। দুর্ভিক্ষের সময় কে আর বাসমতী চালের বায়না করে বলুন? তবে একটি বাচ্চা আমার হাতে এসেছে, তাই আপনাকে জানাতে এলাম। মাস ছয়েক দিনের, মেয়ে ছেলেটি তেমন সুন্দর। সুজোয়াটি ছেলে—'

—'এই দেখেছে!' সুযোগ্যা বলে ওঠে, 'বাঙালী নয়?'

চিন্ময় হেসে উঠে বলে, 'সুযোগ্যা-দেবীর কি জাতি আছে রে সুযোগ্যা?'

—'আরে বাবা, হাড়ের গুণে ভাবে তোমার? নির্ঘাত ঘরসা-দুশ্চিন্তে কলহ হবে ঘাটা।'

তুষার শান্ত গলায় বলে, 'যাই হোক তোমার কিছু ক্ষতি নেই; তোমার ঘরে মানুষ হতে তো আসছে না।'

ডাক্তার সভয়ে বলে, 'আপনারও বাঙালী নয় বলে আপত্তি নিবেদন রায়?'

তুষার মাথা নেড়ে বলে, 'বাঙালী অবাঙালীর প্রশ্ন নয় ডাক্তার ঘোষ, আগেই তো বলেছি আপনাকে, ভরসেই আপত্তি আমার।'

চিন্ময় বন্ধুর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিত গলায় বলে, 'তবে যে তুই বললি, রাজী করিয়েছিস।'

সুযোগ্যা বলল, 'ভাবলাম তোমে আমাতে দুজনে বোঝাতে শুধু করলে যদি—'

—'নিজে আপনি ভালই করলেন। এই যে আপনি বাদ্ধে বকলা বাচ্ছেন, এটা চিন্তার বিষয়। একটা শিশু আপনার নিঃসন্তানতার ভার ভুলাতে পারবে।'

তুষার বলে, 'হয়তো আপনাদের কথাই সত্যি, কিন্তু আমার মন সায় দেয় না, কার না কার ছেলে—'

ডাক্তার হেসে বলে, 'রাজা-রাজড়াদের ঘরে তো বন্ধক দিয়েই 'রাজরক্ত'র মহিমা চলে আসছে। কটা রাজ-বংশ টিকিয়েছে? ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই দেখতে পাবেন। সর্বত্র ওই বন্ধকের কারবার।'

তুষার মৃদু হেসে বলে, 'তা এটা তো আর রাজা-রাজড়ার ব্যাপার নয়।'

ডাক্তার চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ্যাও নেমে যায়।

এখন তুষারকে কতক্ষণ একা থাকতে হবে কে জানে।...তবু ওদের প্রস্তাবে রাজী হওয়া অসম্ভব। শুধু নিঃসন্তানতা নিবারণ? শুধু একটা শিশু মানুষ করে দেওয়া? তুষারের দিন-রাত্রির স্বপ্ন কি ব্যর্থ তাই?

তুষার চায় শুধু নিজের একটি। যাকে ঘিরে ঘিরে নিজের সবটা লালন করে আস্ত একটি মানুষ দেবে তুষার আপন হাতে গড়ে। তুষার খেলে যার খাওয়া হবে, তুষার নিঃশ্বাস নিলে যার নিঃশ্বাস নেওয়া হবে। তুষারই যাকে এক অন্ধকার গুহা থেকে বাইরে নিয়ে এসে আলোয় পৃথিবী দেখাবে। তুষার যাকে আপন বক্ষবন্ধনীর পালন করে বড় করে তুলবে। যার নাক, মুখ, চোখ, চুলের গঠন, গুণপনায় তুষার আপন সাদৃশ্য পেয়ে নিজের হবে, আর যাকে নিয়ে সুযোগ্যার সঙ্গে সবের তর্ক চলাতে পারবে, তোমার মত দেখতে হয়েছে, না আমার

মত?'

এই স্বপ্ন, এই আশা, এই প্রতীক্ষার ওপরে কি না ধরুক। ছি!

অথচ সেদিন সেকথা বলে আসেন তুষারের ডাক্তারিবন্ধুরা, যিনি রাস্তার ভিখিরির মেয়েকে বা সহজে নিয়েছেন, বুকেতে টেনেও নিয়েছেন, তুষারের জন্যে তার একটিবার বরাদ্দ রাখেন নি।

ভগবানের এই দুর্বিবিধানের কথা ভাবতে ভাবতে তুষার হঠাৎ একটা আক্রোশের ঝড়ে থানখান হতে থাকে।

দুঃখ নয়, বেদনা নয়, যেন ভয়ানক একটা অপমানের জ্বালা। যেন সমস্ত পৃথিবী তুষারকে অপমান করেছে।

ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সুযোগা দেখল, তুষার উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে। দেখে মায়া হল।

অকারণ কী কষ্টই পাচ্ছে! সাঁতা, অ-কারণ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না সুযোগা। একটা সন্তান ব্যতীত পৃথিবী অর্থহীন, এটা ভাবতেই পারে না সে। সুযোগা নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখে। তুষারের পিঠটা ঘন ঘন নিঃশ্বাসে ফুলে ফুলে উঠছে। তার মানে কাঁদছে তুষার।

এই মানিকের আগে তুষার কখনো কেঁদেছে? ভাবতে চেষ্টা করল সুযোগা।

না, সেই আগের তুষারের সঙ্গে সুযোগা 'কান্না' জিনিসটাকে কোথাও মেলাতে পারল না।...

তুষারের ভেতরে অনেকটা বড় এক দিদি ছিল তুষারের। তুষারের শৈশবে তার ঝিয়ে হয়ে গিয়েছিল। গ্রামে স্বশুরবাড়ি, গ্রামেই থাকত। কলেজে পেরেছে তাকে সুযোগা।... সেই দিদি মারা যাবার খবর এল একদিন।

তুষার কি কাঁদল?

কাঁদেনি, শুধু কাঁদো-কাঁদো মুখে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। শুধু দুটোর দিন একটু স্থির থাকল।...সেটা হয়ত প্রথায়, হয়ত মনস্তত্ত্বের সন্ধানে। ... তুষারের প্রকৃতিতে কান্না ছিল না। কী অদ্ভুতভাবে বলতে পেরেছে তুষার! সুযোগা নামে যে একটা মানুষ তার পাশাপাশি আছে, তারও সুখ-দুঃখ মন-প্রাণ আছে, তা যেন ভুলেই গেছে।

সুযোগা আস্তে গিয়ে ওই কাঁপা-কাঁপা পিঠটায় একটু হাত রাখে।

তুষার চোখে উঠে বসে, আর সমস্ত স্বরে কেউ মিয়ে কান্নাভাঙা। তীক্ষ্ণ একটা স্বরে কেউ পড়ে, 'আর কত অপমান করবে তুমি আমার? আর কত? কে বলেছিল তোমার কষ্ট করে ছেলে এনে তার সামনে আমায়—

এইভাবেই সুর কাটে।

সুযোগা উঠে পাশের ঘরে একখানা বই হাতে নিয়ে বসে।...পড়ে না। আকাশ-পাতাল ভাবে। কী অদ্ভুতভাবেই বদলে গেল তাদের জীবনটা!

সিঁড়িতে তুহিনের জুতোর শব্দ শোনা গেল এই সময়। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুযোগা। প্রাণের চেয়ে মান বড়, এই নীতিতে লোকালয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ছোটদাদী যে, কী ব্যাপার?'

তুহিন বলল, 'ব্যাপার আর কি? আপনারা আর মান না টান না। মেজবিবেই না হয় ভুতে পেয়েছে, আপনার কী হল?'

তুহিনের ঘর শিশির বলল, 'কলাটা রেখে আসে কাজটা সারো।...বল।'

—তুমি বল না।'

—'ঠিক আছে।...আগামী রবিবার সন্ধ্যায় দয়া করে আমাদের বাড়িতে পদধূলি দেবেন, এবং আমাদের সঙ্গে একটু খাবেন।'

—'ব্যাপারটা কি বল তো?'

শিশির হেসে ফেলে বলে, 'ব্যাপার আর কী? সেই একই ঘটনা, মুখে ভাত।'

সুযোগা বলে ওঠে, 'বল কি? মুখে ভাতটাও কি বছর বছর হয়? এই যে কবে কেন তোমার বুকুন—'

শিশির হেসে ওঠে, হাসি আর থামতে চায় না। বলে, 'নয় আপনি দাদা অনেক উচ্চস্তরে উঠে গেছেন বোঝা যাচ্ছে। নরলোকের তুচ্ছ কথা মনেই থাকে না।...এদিকের ফ্যাক্টরনের নায়ক আর একজন। হতভাগার যে কিছুদিন আগে একটা খোকা হয়েছিল, ভুলেই গেছেন?'

সুযোগাও হাসে।

ফিকে আলো। কৌতুকের মিষ্টি তাড়াতাড়ি বলে, 'তোরি সারি:... অফিস একটা মহা ভাবনা চুকিয়ে দিয়েছে। তাই নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি।'

—'কী হল?' বলল শিশির।

সুযোগা বলে, 'অফিসের নিয়মে অফিসার ছেলের সব কটাকে একবার করে হেড অফিস ক্যানাডায় ঘুরিয়ে আনতে চায়, তিনজনের হয়ে গেছে, এখন আমার পালা—'

তুহিন চোখে-মুখে খুশী মেখে বলে, 'ওরা এতে আবার ভাবনার কী আছে? খরচ তো কোম্পানীর?'

—'তা অবশ্য।'

—'তবে? যান না বাবা, ভর্তা-মিশ্রী দুজনেই আকাশে উড়ে বেড়িয়ে আসুন। ঝামেলা তো কিছু নেই। "দুটিটি আর আমিটি" এই তো। কেন আসেন বাবা।'

সুযোগা চতুরতা করছে, তখন বুঝতে পারে। এখনো কি নিজেকে সামলে নিতে পারছে না?...জিজ্ঞেস করবে কি কারণ? বাড়ি নেই?...না কি মাথা ধরেছে?...বাড়ি নেই-এর অনেক কৈফিয়ৎ!...একা কোথায় যেতে, মাথের ভূত এখনো ছাড়েনি না কি!

তা মনের মতো ইঞ্জিন চালাতেও, মুখে পালিস লাগাতে হয়।

—'শিশির জন্যে কোম্পানীর কোনো ব্যবস্থা নেই।'

—'ছি ছি! কোম্পানী এই রকম হয়েছিল?...তা তার সাড়া পাচ্ছি না যে? বাড়ি নেই নাকি? না কি পুজো-টুজোয় বসেছেন? আজকাল তো মেজবিরা অনেক উন্নতি হয়েছে। একেবারে আমূল পরিবর্তন।'

হ্যাঁ, এইভাবেই উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে এখন তুষার।

তুষারের মান-সম্মান তুষার নিজেই খুইয়েছে।

তবু, তুহিনদেরও কি ভেবেছিল সুযোগা, আরো এমন নির্লজ্জভাবে উদ্ঘাটিত হবে সে? স্বেচ্ছায় সমর্পণ।

সুযোগা তো জানছিল, 'বাড়িতেই আছে, বলছিল মাথের ব্যথা করেছে,' মানের তো করতে হবে। কিন্তু ওর ব্যবহারে তুষার এমনভাবে ঝাঁপিয়ে এসে সমস্ত পরিবেশটা ক্লেদাক্ত করে তুলবে, তা কে ভেবেছিল? ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে ফোঁস! তিক্ত গলায় যখন বলে উঠেছে, 'খুব যে পাকা হয়েছিস দেখছি! খুকুর ওপর জোরে না হয়ে নিজেকে বড় লায়েক ভাবছিস না? তা পাসা বড় বেশী হয়েছে বুঝি? তাই বদলে একবার করে মুখেভাতের কথা?'

চমকে ওঠে সবাই। এ কী কদর্য ভাষা! এ কী কুৎসিত আক্রমণ!

হতচকিত শিশির শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু তুহিন তো আর ছেড়ে দেবে না। তাই বলে ওঠে, 'ফরবিডও আয়নাতে মুখ পাঁচজনকে জানায় মেজবি, যার কখনও করে। ও জিনিসের মর্ম জানিস না বলেই এমন কথাটা মুখে আনতে পারলি। ঠিক আছে, যাসনি।'

তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী অন্তরিয়ে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

ওরা চলে গেলে স্তম্ভিতা সুযোগা আস্তে বলে, 'নিজেকে এত 'ছোট' না করলেই পারতে তুষার!'

কড়া গলায় তুষার বলে, 'বেশ করেছি। ডেকে ডেকে অপমান দেখাতে এসেছে।'

—'অপমান কিছুই দেখাননি তুষার। সাধারণ রীতিতে ভদ্রতা বিনিময় করতে এসেছিল।'

—'ঠিক আছে। আমি ছোটলোক

ওস্তাদ ঝড়ে গোলাম আলি খাঁ

আমি ইডিয়ট হলে তো?'

সুবোধা তুষারের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ অবাক হয়। এই কি তার সেই চিরকালের চেনা মুখ?

পরদিন চিন্ময়ের চেম্বারে বসে সুবোধা। বলল, 'তখন তো পাগল হয়ে যাচ্ছ মনে হচ্ছে?'

সংক্ষেপে গত কালকের ঘটনা বিবৃত করল।

চিন্ময় চিন্তিতভাবে বলল, 'ওঁর ওই ঘরদোর-বাড়িঘর বোকা দেখেই আমার চিন্তা হয়েছিল, তাই একটা রাফশট ওষুধ জন্যে অত ইনসিস্ট করছি, তাতেও তো রাজী নন।'

—সেই তো! কিন্তু হঠাৎ এভাবে বলে যাওয়া তুই আর কারো মোতে দেখেছিস?'

চিন্ময় মাথা নাড়ে। 'মেয়েরা এই একটা ক্ষেত্রে যে কী হতে পারে, আর কী না হতে পারে—'

—সত্যি পাগলও হতে পারে?'

চিন্ময় ওর পিঠে চাপড় দিয়ে বলে, 'আমি অত কিছু ভাবার পক্ষপাতী নেই। সামনে একটা উপলক্ষ আসে, মেয়েরের তো আসেই। ধর-বাড়ি দেখছি। ওই নিয়েই তো আছে।'

—তা প্রতিকারটা কী?'

চিন্ময় বিজ্ঞ গলায় বলে, 'সেই তো মুশকিল। প্রতিকার তো মানুষের হাতে নেই।'

—তোরাও ভগবান দেখাবি?'

চিন্ময় হেসে ফেলে বলে, 'আমরাই তো সব থেকে বেশী ভগবান দেখাব। কারণ আমরাই ওনাকে সবচেয়ে বেশী দেখতে পাই।'

সুবোধা হঠাৎ দাঁ করে বলে বসে, 'আচ্ছা তুই আমাদের কাছে ঠিক বলছিলি? না ওর, না আমার কারুর মধ্যেই কোনো ডিফেক্ট নেই?'

চিন্ময় মাথা নেড়ে বলে, 'ঠিকই বলেছি।'

তবে? তাদের অথবা ভগবান না মেনে উপায়?

সুবোধা বলে, 'মুশকিল এই, আমার আবার ঠিক এই সময় চলে যেতে হচ্ছে—'

চিন্ময়কে আগেই বলা আছে, সে জানে ব্যাপারটা। এখন আবার শুনে বলে, হতে তবু ভালও হতে পারে। একটু হেসে বলে, 'মাঝে মাঝে একটু বিরহ ভাল। সেকালে যে মেয়েরা বাপের বাড়ি-টাড়ি যেত, সেটা হিতকারী ছিল। সর্বদা দুজনে দুজনকে দেখতে দেখতে বৈচিত্র্যহীনতায় পিত্তর হয়ে যায়।...তখন পরস্পরকে প্রতিপক্ষ মনে হয়।'

—'একেকদিন মেয়েরা বাপের বাড়ি যেতে চায়?'

চিন্ময় হেসে বলে, 'কখনো নিয়ে যেতে চায় না।'

বন্ধুদম্পতি জীবনীশক্তি বাড়ায়, মনের জোর কমায়।

এমন বন্ধুর পরামর্শের মধ্যেই থাকে। দুই মহিলা হয়তো বন্ধু থেকে, ঠিক এমনটি হয় না। পুরুষরা বন্ধুর কাছে যতটা মুক্ত থাকে, মেয়েরা কি সখীর কাছে থাকেন?... নিতান্ত স্থির সখীর কাছেও তারা কিছু রাখে, কিছু ঢাকে।

হালকা হয়ে যাওয়া মনটা নিয়ে সুবোধা হাসে, 'আমি তো ঠিক করে-ছিলাম, ওকে বলব আমার অক্ষমতার কথাটা বুঝিয়ে তুমি ডিভোর্স সুটে আনো।'

চিন্ময় ছেলে ওঠে, 'আমার দিবার সেটা প্রয়াস করা যাবে না। পালালামী রাখ, ঘরে আয়, এসে দেখবি লাভে হয়ে গেছে।'

সুবোধা বলে, 'তখন হয়?'

—কেন হবে না। অনেক সময় বিরহ বেদনা মেজাজ ঠাণ্ডা করে দিতে পারে। কত দিনের জন্যে যেতে হচ্ছে?'

—বড় জোর মাস পাঁচেক—'

—বাড়িতে কে থাকবে?'

—কেউ থেকেনি এখনো। দিদি সর্বদাই যা ফোন থাকেন, বলাই হয়নি এখনো।'

দুদিনের ছেলের হাতে সুবোধা একটা খেলা। বলল, 'ওর সঙ্গীর ভাল নেই, আসতে পারল না।'

কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস করবে?

তুষারের সমালোচনার নেমন্তন্ন বাড়ি মুখর হয়ে উঠল।

তুষার যে 'চিরদিনই অহঙ্কারী, মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না, সবাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, এ সত্য সকলেরই এযাবৎ কাল জানা ছিল না।

এখন সকলে জানল।

তুহিন তো সকলের সামনে মুখের ওপরই বলল, 'আপনি আর পাক দিয়ে যান তাকাত আসলে না জানাইবাবু! মেজদির যে কিছু হয়নি, তা আমি তখনই বুঝেছি।'

মাথা হেঁট করে ফিরে আসতে হল সুবোধাকে।

নেমন্তন্ন বাড়ি ফেরত তুষারের মা এলেন এ বাড়িতে। মুখের ঝলায় ঝলসালেন, এসব কী মতিবুদ্ধি হচ্ছে তোর তুষার? শুনলাম নাকি তুইনকে বোদ্দি যাচ্ছেটাই করে তাড়িয়ে দিয়েছিস। আজ খেলি না, এ সব কি ভাল?'

তুষার বলল, কে বলেছে ভাল? আমি তো খুব খারাপ সবাই জানো। আমি রাগী উদ্ধত অহঙ্কারী, সবাই জানো।'

—তোমাদিদিই তোমার কেরী এ কথা বলেনি মা, চিরদিনই ছেলে-খেলে কাটিয়েছে। এখনই তোমার কী ভাবে পেয়েছে!...কি-টিন সঙ্গে তোমার মা কোথায় যাচ্ছ, কী না কি ভাবা-ভাবির পরে বসে আছ, ভগবান জানেন কিসে কি হচ্ছে! জামাইয়ের দিকে তো তাকাল যাচ্ছে না। কী যে চেহারা হয়েছে!...তোরও তো হাড়-সার দশা!...এতকাল এক মতভেদে কাটিয়ে, এখন ছেলে খেলে কত এমন পাগল হবারই বা কী আছে? জগত সংসারে ছেলেপুলে হয়নি এমন মেয়েমানুষ কি থাকে না? একটা ভাইলো ভাইচি থাকলে ভরেও—'

তুষার উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'মা তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে।'

সুবোধার জানাজা যাবার দিন এসে যাচ্ছে, ওদিকে দুজনের পার বাক্যালাপ বন্ধ। খবরটা তুষারকে জানাবার আগে শালীকে জানিয়েছে, বন্ধুকে জানিয়েছে, এ অপমান সহ্য করা শক্ত বৈকি।

তবুও এত বড় একটা ঘটনা!

সুবোধা দেশ ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে। ছোক সামান্য দিনের জন্যে, কিন্তু চার-পাঁচটা মাসই কি কম?

তুষারের জীবনে এমন ঘটনা কবে এসেছে? সুবোধা একা কোথাও যাচ্ছে, তুষার বাড়িতে পড়ে থাকছে?...স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবে তুষার এই যাওয়াটা কি সুবোধার চেষ্টাকৃত? পালাতে চায় তুষারের কাছ থেকে?...অভিমান কি? তুষার ভয়ার্ত হয়ে গেছে, হিম হয়ে গেছে, ছোটোমাত্র হয়ে গেছে, তুষারের কাছ থেকে পালাতে চাইবে এটাই তো স্বাভাবিক।

মন ভেঙে যায়, যখন দেখতে পায়, সুবোধা নিজে সুটকেস গোছাচ্ছে, সুবোধা বাথরুমে ঢুকে যেতে দিতে বলছে, বাজে আসছে, এটা ওটা কিনে আনছে।...সুবোধার জীবনের এত বড় ঘটনার মধ্যে তুষার নেই, এ কী ভাবা যায়?

ভাবা যায় না, তবু ঘটছেই সেটা।

তা বলে কথা কি একেবারে হচ্ছে না? হচ্ছে, বিদেশ যাবার সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে।

তেমন সুবোধা ঘরে ঢুকে এসে বলে, চিন্ময়কে বলে দেখলাম, সে সপ্তাহে সপ্তাহে এসে খোঁজ নিয়ে যাবে।'

তুষার বলল, 'কোনো দরকার নেই। বাড়িতে তো একটা মহিলা রেখে যাচ্ছ না।'

সুবোধা বলল, 'বাথরুমের পাশ-বইটই তোমার হাতে রেখে যাচ্ছি, জরুরী অ্যাকাউন্ট, তুলতে অসুবিধে হবে না। যখন যা দরকার নিও।'

তুষার বলল, 'যখন তখন এত কী দরকার?'

একদিন তুষারের বাবা এল, বলল, 'মা বলে পাঠালেন, সুবোধা যে কদিন বাইরে থাকে তুষার না হয় এখানে গিয়ে থাকুক।'

সুবোধা বলল, 'তুষারের যা মর্জি'।

কিন্তু তুষার এ প্রস্তাবে উঁচিয়ে ছিল। বলল, 'বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে অনেক অসুবিধে।'

সুবোধা শ্বশুরকে আশ্বস্ত করতে বলল, 'অসুবিধে কিছু নেই। বাবা মেজদা দুজনকেই বলে যাচ্ছি, মাকে মাঝে মাঝে দেখতে নিয়ে চলে আসবেন।'

তুষার বলল, 'বলে আসবার আগে আমায় একবার বলতেও পারতে! ওঁরা আমার পরামর্শ করেন না।'

সুবোধা বলল, 'ভুল হয়ে গেছে, মাফ করে আসব।'

এত অপমান সইতে হচ্ছে তুষারকে। তবু বাঁধ ভাঙছে না। নদীর তীরে জল, তবু স্থির আছে। বাঁধ ভাঙল একেবারে যাবার আগের দিন।

সুবোধা যখন সুটকেসগুলো বেশী ভর্তি হয়ে গেছে বেরে, চেনে চেনে জিনিস ঘষছে, তখন তুষার সেখানে এসে বসে পড়ল। বলল, 'যাবার সময় পর্যন্ত ঝগড়া রেখে যাচ্ছ তো? যাও, এসে আর দেখতে পাবে না—'

বাঁধ তো ওদিকেও ভেঙে বসে আছে।

সুবোধা হাতের কাজ ফেলে রেখে ওকে দুহাতে কাছে টেনে নিল।

কী আশ্চর্য! কী অলৌকিক!

এক মুহূর্তে এমন হয়ে যায়? সব দেওয়াল ভেঙে পড়ে? সব অভিমান লুপ্ত হয়ে যায়? অথচ এই মুহূর্তটিকে দুজনের একজনও এঁচিয়ে আনছিল না।...এইটুকুর জন্যে কত ক্লেশ স্বীকার, কত কলহ, কত ঘাত, অথচ কোথায় যেন আটকে আছে।...যেন হাতের সুতোর ওধারে নিয়ে পড়ে পড়ে রোষ-কষায়িত ভোগ করা। যাচ্ছা তাদের সামনে চোখ বুজে বসে থাকা।

ভেবে অবাক লাগছে দুজনেরই। কী তুচ্ছ অভিমানের বশে কত কত দিন রাত্রি বন্ধ করেছে তারা! দিন কেটেছে নিশ্চিন্ততায়, আর রাত্রি কেটেছে বিনিদ্রতায়!...রাতের পর রাত একই শয্যায় শুয়েছে তারা পাশাপাশি দুটো বালিশে নিশ্চল নির্বাক, পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে।

কবে থেকে এ রকম চলছে? আজ তো দিনের বেলা বাইরে আলুনের খোলা নিয়ে মোকাবেলা করছে,

রাত্রির মোহময় ডাক অগ্রাহ্য করে জীবনকে ফিরিয়ে দিয়েছে।...স্থির সিদ্ধান্তে কবে? হাঁ, সেই দিন, যেদিন তুষার সাঁতারের ঘুষার বিস্ময়ে মোহনা করেছে সুযোগের অযোগ্যতাই তার জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, তাকে যা হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। বলেছে, তারার দিব্যবাণী। কারণ সে সুযোগের বন্ধু। আজ তুষারের এই নিঃশব্দ আত্মসমর্পণ আর অবিরল অশ্রুধারায় বুঝি ধুয়ে গেল সব গ্লানি, সব কটুতা, সব পাপ।

কিন্তু আর সময় নেই।

তোরের শেলনে রওনা দিতে হবে।

কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাবেনি সুযোগ, তুষার এয়ারপোর্টে যাবে। তবু একবার বলেছিল, 'বাবাকে জানো অনুরোধ করছি না, তবু বলে রাখছি, না গেলে সকলের চোখে পড়বে। যাবে তো সবাই। অফিসের অনেকে যাবে, দাদা-বৌদি, বৌদি, মেজবৌদি যাবে, উটুরা সপরিবারে যাবে, শিশির যাবে, তোমার দাদা যাবে, চিনুর যাবে—'

সি অফ করতে যাবার লোকের লম্বা তালিকার বিরক্তি এসেছিল তুষারের। নির্লিপ্তভাবে বলেছিল, 'এতজন যখন যাচ্ছে, একজনের অনুপস্থিতি কারো নজরে পড়বে না।'

—'নিন্দাকারীর নজর তীক্ষ্ণ।'

—'আমার নিন্দাতীতিটা কম।'

এইভাবেই চলেছে কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত!

আজ বদলে গেছে পৃথিবী!

অথবা আজ বদলে যাওয়া কুশ্রী পৃথিবী আবার নিজের চেহারায় ফিরে এসেছে। তাই আজ তুষারের ধাওয়াটা অপরিহার্য, যেমন অপরিহার্য ছিল তুষারের আসার দিনে।

কিন্তু এসে আর কতটুকু পেল সান্ত্বনাকে? তার চির আকাঙ্ক্ষিত বন্ধুরাই ঘিরে ধরে রইল তাকে।... তুষারের মনে হল, তুষার যেন চলতে চলতে কোথায় এসে পড়ে শিশিরে ফিরেছিল, এখন ঘরায় ছুটেছে ছুটতে এসে দেখছে তার জায়গাটা বেদখল হয়ে গেছে।...নইলে তুষার থেকে যায় টুটুর শিয়রে।...টুটু ওকে ছাড়া না করে ফলাফলের সুযোগার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছে।...নিজের বোন নেই ওদের, দাদাতো বোনই বোন।

ফেরার সময় দাদা বলল, এখন আর বাড়ি ফিরে কী করবি আমার সঙ্গে বাবি তো চল।'

তুষার মাথা নাড়ল, 'বাড়িতে সব কিছু ছড়ানো পড়ে রয়েছে।'

দাদা বলল, 'তা বটে।'

বড় ভাসুরও ওই একই প্রস্তাব করলেন, 'একা বাড়ি ফিরে গিয়ে কী করবে? এখানে ছেলেপুলেদের সঙ্গে—'

তুষার আস্তে মাথা নাড়ল, একটি উত্তর দিল। না এই সমাধিক্ষেত্র বেদনার গভীর গহ্বরে আত্মসমর্পণ তুষার হাতের হুইস্পারে ছড়িয়ে ফেলবে না। তুষার তার বন্ধুর হৃদয়ের ফাটলগুলি একটি একটি করে তুলে তুলে দেখবে।

একা তুষারকে দেখে সকলেই ছাড়া আসছে। ঘটই তুষার বদলে যাক এখন, ঘটই সবাইয়ের সঙ্গে ফাটফাটি ঝগড়ার জন্যে, তবু ভালবেসে তো চিরদিনের সকলের স্নেহের তুষার ভালবাসার! শিশির বলল, 'যোনের সঙ্গে তো 'আজ যাবে' করে বেরোনো, তিনি তাঁর জীবনের কথাটি বলতে পেলেন না।... তা বইলে তাকে রেখে যেতাম দু-চারদিন।'

তুষার একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, 'একজনের বাবি সারাতে আর একজনকে বাধিগ্রস্ত করা? তুমি বেচারা কেন আমাকে দু-চার দিনই বা বিরহ জ্বালায় জ্বালাবে?'

শিশির বলল, 'টিনি জলজ্যান্ত মনে পড়ে না রাখলে তো জলেপুড়ে হতো! এখনে না এসে যাবে তো? না তার কাছে থাকতে আমাকে না নিয়ে যাবে?'

তুষার বলল, 'আমাদের বোনে-বোনে কৌতুকটা তাহলে তো তোমার পক্ষে শাপে বর হয়েছে!'

মনে মনে ভাবল, আমার পক্ষেও। ঠিক এই সময় আমার ভাইবোনই ভাল লাগবে না।

কিন্তু সেইটা বোঝে না মানুষে। সংসার বন্ধুরা জানে সুখের সময়, শোকের সময়, বিয়ে কিম্বেদের সময়, বেনোর্ট বাধিতের কাছে কাছে থাকতে হয়, সান্ত্বনা দিতে হয়, অকারণ কথার চাপে, তার পক্ষি শূন্যতাটিকে ভরাট করে তুলতে হয়।

সুযোগার মেজবৌদি বললেন, 'ঠাকুরপোর এই ধাওয়াটার ভালই হল, চেহারা বা খারাপ হবে গেছে। চেঞ্জ দরকার। তোমারও সঙ্গে যেতে হতো।'

তুষার অবাকের ভান করে, 'আমি তোমার যাবো? অফিস পাঠাচ্ছে।'

তুষারের বড়বৌদিও বললেন, 'তোমার ভাসুরে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন, যেলে না! ফেলে ভাল করতে। একাই তো খাঁ খাঁ করা প্লেন, তার আবার আরো খাঁ খাঁ হয়ে গেল। আমার ওখানেও ছোট ছেলে-পুলে নিয়ে ভাল থাকতে।... কাল বেলা এসেছে তার নতুন বাড়িটাকে নিয়ে।'

তুষার কথা ঘুরিয়ে বলল, 'এরা চাইতো! আপনি ফেরে দিবিয়া হয়ে গেলেন!'

বড় জা বললেন, 'আসারে হয়েছে তা নয়। তোমারও সবার কিছু হলে, এতদিনে জামাইয়ের শাশুড়ী অন্তত হতে।'

এ ধরনের কথা তুষারকে অবশ্য সব সময় শুনতে হয়েছে। সবার 'কিছু' হলে যে তার কি কি হত এতদিনে কে জানে!

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তার আর কিছু শুনতে রাজী নয়।

বাড়ি ফিরেই প্রথমটা মনে হল সোজা গিয়ে শুয়ে পড়ে।...বহুদিনের অভ্যস্ত বেদনা, মানসিক ঘাত-প্রতি-ঘাতের সঙ্গে গত রাত্রির বিহ্বল আত্মবিস্মৃতির নিবিড় ক্লান্তি যুদ্ধ হয়ে শরীরটাকে যেন দাঁড়িয়ে দিতে চাইছিল।

তবু শুয়ে পড়ল না। সেই আদি-কালের পিসিমার বাণী মনে পড়ে গেল।...বাবা অফিস থেকে বা দাদা কলেজ থেকেও তুষার যদি একটা গল্পের বই নিয়ে শুয়ে পড়ত, পিসিমা বলে উঠতেন, 'একটি বাড়ির মানুষ বাড়ির বাইরে পা দিলো, তার ভাল ঢেলে শুলে যা? ওঠো ওঠো। ওতে পরের মানুষের অকল্যাণ হয়।'

মন্ত্র মত।

অর্থহীন কতকগুলো কুসংস্কারের বোঝা নিয়ে সকলের ঘাড়ে চাপানোই যেন পিসিমার কাজ, এমনি মনে হত।...এখন তো কেউ সামনে নেই তুষারের ঘাড়ে অর্থহীন কুসংস্কারের ভার চাপাতে, তবু তুষার ভোরে পড়া শরীরটাকে খাড়া করে ঘুরে বেড়াতে লাগল এ ঘর ও ঘর।...সর্বত্রই সুযোগা! বাড়ির কোথায় এমন জায়গা আছে যেখানে সুযোগার চিহ্ন লেগে নেই।...ইমনাদি বাড়িতে উপস্থিত থাকার বেশীটা সময় সুযোগা বই পড়ার ছুতোয় কাটাত। বই পড়ার নেশা ছিল না কখনো সুযোগার। তুষার এ জানে বলক দিত, বলত, 'তুমি একটা শিক্ষিত পরের মানুষ, অন্তত হাতে বাঁধি একবার একটা বই দেখি! কালক পড়েই সব মিটে গেল। আশ্চর্য! পরের মানুষের একটু বই পড়ার নেশা থাকবে না?'

সুযোগা বলত, 'যা থাকবে না। আমার শুধু বোঝার নেশা।...তাকেই নিয়ে পড়ে আছি, পড়ছি।'

তুষার হেসে বলত, 'ওহে জ্ঞান-চন্দ্রন, তোমার এই একাগ্রতা যদি স্রষ্টাভবানের পায়ে অর্পণ করতে!'

—'স্রষ্টাধিকার পায়ে করেছি।' বলে তুষারকে নিয়ে এলোমেলো করে দিত একেবারে।

আজ ছোটখাটো হালকা গড়নের বৌটাকে নিয়ে প্রায় লোকালয়েই করত দীর্ঘ বনিষ্ঠ দেহী মজবুত স্বাস্থ্যবান সুযোগা তার মনের মানুষটা।

সবই এই বাড়িতে। এই এখানে, ওই ওখানে। সুযোগার সেই আবাসিক লাচারাবাড়িটা যেন ঠিক আজকের স্টাইলের নয়, যেন আভিজাত্যের উল্লাসে। ছোট ছেলেরা যেমন একটা সুন্দর খেলনায় আসক্ত হয়, এক মিনিট ছাড়তে চায় না, সুযোগাকেও যেন বৌ নিয়ে তাই।

ভাবতে কী অদ্ভুত অবিশ্বাস্য লাগছে, এ বাড়িতে এখন সুযোগা নেই। সন্ধ্যাও ফিরবে না। হয়ত না, সকালে না তারা না, পরশু না। তবু কতদিনগুলো দিনরাত্রি পার করতে হবে তুষারকে এই অবিশ্বাস্য অবস্থার মধ্যে! নিজেকে ভবী অসহায় লাগে তুষারের। যেন বৃক্ষ হৃদের একটা সুনো প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে আছে তুষার। তার চারিদিকে জনমানবের সাড়া নেই, চিহ্ন নেই।

তুষার কি এখনো বিছানার পাশে ফেলে রেখে যা একটি?

অন্ত তুষারের চারিদিকে সবাই আছে, তারা ভালবাসার হাত বাড়িয়ে বলছে, 'এসো, আমাদের কাছে এসো।'

কিন্তু তুষার কেমন করে এই বাড়ি-ঘর ফেলে চলে যাবে, যে বাড়ির সর্বত্র সুযোগা!

এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকতে গেলে সুযোগার জিনিসগুলো সরাবেন কে? দেখবে কে? পরিষ্কার রাখবে কে ধুলিস্তর জিনে হলো ফেড়ে ফেলে?

তুষার একদিনের জন্যও বাদের বাড়ি রাত কাটায় না এটা ছিল তুষারের মা বলের অভিমান। তুষিন তো নিঃসঙ্গ থাকতে দেখবে, এখনও থাকে। কিন্তু তুষার তখন না। ভবেরেই পারবে না, বাড়ির বিছানা ছেড়ে, ঘরের দালানালি জানোটুকু ছেড়ে, বোনেরা সবাই মিলে একটা হস্তপোষে গড়াগড়ি দিয়ে হুল্লোড় করে রাত কাটানো।

এ জিনে ঠাট্টা তামাসা সইতে হবেছে বৈকি। বিস্তরই হবেছে। বাপের বাড়ি, কি মামার বাড়ি, মাসির বাড়ির 'সাজেকলে' বিয়ে-চিনের আত্মীয়রা সবাই আসে 'খাবেছে, যেখানে সেখানে পড়িয়ে শুয়ে পড়েছে, তুষার ঠিক চলে দেখে যেত কিছু কিছু।...দাদা-বৌদি, তুহিন-শিশির, মাসি-মামীরা পর্যন্ত বলেছে, 'ও বাবা, তুষার থাকবে বলকে ছেড়ে' পৃথিবী উল্টে যাবেও না।' এমন কি বাবা পর্যন্ত কখনো অসুখ গলায় বলেছেন, 'এখন বড় বাড়িতে আমাদের তাকের থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে

গরীব বাপের মেয়ে বাড়িয়ে থাকতে পারে না।'

মনে লজ্জা করেছে, আড়চোখে তাকাল সুবোধের দিকে, ঠকে যাই না আমি?'

সুবোধও চোখ্চোখি বলেছে, কেপেছ? এই ভিড়ের বাড়িতে নতুনবৌকে লাইন দেওয়ার অবস্থাটি ভাবো।'

ভাবতেই হয়েছে। কারণ, জানে শেষ পর্যন্ত নিয়েই যাবে সুবোধ, ছুতোয় ভুলিয়ে খোসামোদ করে। বাড়ি এসে পাখা খুলে দিয়ে তুষারকে সোফায় বসিয়ে বলেছে, এখন বল, নিয়ে খালিয়ে এসে ভুল করেছি কি না?'

স্বীকার করতেই হয়েছে ভুল করেছে। না বলিয়ে ছাড়েনি না।

দুষ্টুও অসম্ভব ছিল তার। বলত, আর এই যে তোমার বড়মামি, 'বাড়িতে নারায়ণ আছেন, তাঁর সেবা আছে, হাতে থাকলে চলবে না' বলে হাত একটা ফেরোটাতেও বাড়ি যান, তাঁর বেলায় তো কেউ হাসে না।'

—কোন কথা। তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা? নিজেই তো বললে, বাড়িতে নারায়ণ আছেন—'

সুবোধ অম্লান বদনে বলত, তোমারও তাই। ওই একই ব্যাপার। তোমারও সামনেই বলে, অন্তরী নারায়ণ'...এই দুষ্টু!

এই মনুষ্যত্বকে নিয়ে পার আজ? দুষ্টু তুষারের মা বলতেন, সবাইকে ফেলেন, তা ওকে সবাই মিলে ঠাট্টা করেছিস কেন? দেখিসই তো জামাই বাড়িতে বশ করে নিয়ে যান। থাকতে পারে না ছেড়ে।'

সুবোধ, আজ দেখছি বেশ পারছ ছেড়ে থাকতে।

কিন্তু মনে তো আমিই ছেড়েছিলাম ওকে। তুষার ভাবে, আমার কী দাঁতভাঙ্গা ধরেছিল তাই ওকে যা মুখে এসেছে, তাই বলেছি, ওর মনের দিকে তাকাইনি...

দুষ্টুমার মা চা নিয়ে এসে দাঁড়াল। বৌদিদি, এসে অবধি বসে আছ, হাতে মুখে জল দাওনি? নাও চাটুকু খেয়ে ন্যাও।'

তুষার হাত বাড়িয়ে চায়ে নিয়ে টেবিলে রেখে বলে, দুষ্টুমার মা, ও-বেলা থেকে আর কাজ করতে আসতে হবে না তোমাকে। যা বাইনে পত্তর হচ্ছে, মাসার সময় নিয়ে যেও ছিসেব করে। এক মাসের বাইনে বাড়তি দেব, যাতে চাকরী খুঁজে নিতে পার।'

দুষ্টুমার মা আকাশ থেকে পড়ে। পুরনো মুখে জানতে চায় কী বলো। কিন্তু হয়নি তো কিছু। সেই কথাই বলে তুষার। দরকার নেই। একটা লোকের জন্যে বেশী লোকের দরকার নেই।

এক মাসের বাইনে বাড়তি, তবু দুষ্টুমার মা কাঁদো কাঁদো হয়। এ বাড়ির চাকরিটি যে তার কামধেনু সদৃশ।

গতরাত্রি আঁতকানোর গলায় বলে সে, তুমি করলুমনি, চামারি করলুমনি, এক কথায় হাঁকিয়ে দিলে গো বৌদিদি! এই তোমার বিচার হল!'

তুষার বিচ্ছির একটু হাসে। সব চুরি কি চোখে দেখা যায়?'

দুষ্টুমার মা কেঁদে পড়ে, তোমার জলেকেতে কী আমি নিলুম তোমার? কী সোনাদানা ছতাসা ছেলো তোমার ঘরে?'

তুষার ওই বাসনমাজা কিটার সঙ্গে তথা কয়, না নিজের সঙ্গে? সব সোনাদানাই ছড়াসা ছিল আমার। তাকিয়ে দেখিনি চলে যাচ্ছে, হারাচ্ছে। টারপর উঠে, আলমারি খুলে টাকা বার করে দিয়ে দেয় ওর হাতে। না গুনেই দেয়, অনেক বেশীই হবেতো।

আর কথা বলে না দুষ্টুমার মা, চলে যায়।

—অথচ এই কিটার জন্যেই ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছি আমি!' আস্তে আস্তে বলে তুষার, ও বলেছিল, "ওকে তাড়াও, এই দণ্ডে তাড়াও। ও তোমার সর্বনাশ করছে।"

তুষার মানেনি সে কথা। রীতিমত খিস্তার দিয়ে বলেছে, কেন? ওর স্বভা আমি একটু স্বাধীনতা পাচ্ছি বলে? নিজে তো কোনো সহযোগিতাই করবে না, আর কেউ করার আছে আমার?'

সুবোধার সেদিন দুষ্টি ছিল বোম হয়ে। গালাগে ফুটছিল, বাড়ির পড়ে বলেছিল, তোমার বিষ এনে দেবার কেউ নেই বলে আমি খুব একটা সুখিত হচ্ছি না তুষার!'

তুষার হেসেছিল। যা তা শুনিয়েছিল।

আশ্চর্য! আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম? তুষার ভাবে, সত্যি কী যা খারাপ ছিলাম আমরা? ও বলেছে, 'আমি তো এখনো তোমার নিয়েই সম্পূর্ণ পূর্ণ আছি তুষার। আমার তো কোনো অভাববোধ নেই।'

—তার কারণ, তোর ছাড়া তোমার জীবনের আর কোনো লক্ষ্য নেই।' অনায়াসে হেসেছে, এ সব কথা তুষার।

অনেকক্ষণ পরে বন্ধুস্নেহাকুরের তাড়ায় চান করতে গেল। আর তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে হঠাৎ থমকাল। হাতে, গলায়, তোয়ালে, সর্বাঙ্গে নানা গন্ধ। বাসন্তিল কন্ধ, তাথা তাবিজ, লেকড়, কুল। ওদুলোর হাত ছেড়ে খুব সূক্ষ্ম মৃদু একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল তুষারের সুখটিত অধরে।

এখন আর এদুলো কী কাজে লাগবে? অন্তত্ত স্নান দুরেক ফেলা যাক। হয়তো বা চিরতরের জন্যেই। সুবোধকে আর মুখ দেখে না সে। তার জন্যে যদি জীবনে একটা পরম বস্তুকেও বলি করে নিতে হয়, নেবে, সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয় তুষার। অবহেলায় একটা তাবিজ পায়ে তাবিজ-কবচগুলো।

আকাশে উঠেই সুবোধার প্রথম মনে হল, অকারণ কেন আমি তুষারকে এত কষ্ট দিয়েছি। ও যা চেয়েছে, সেটা এমন কী বেশী? ওর যেখানে বিশ্বাস, সেইখানে থিরে দাঁড়াতে বলেছে আমায়। তার বেশী কিছু না। আমাকে তো বিশ্বাস করাবার জন্যে জোর করেনি। কী এমন ক্ষতি হত আমার ওর সঙ্গে ওর অভীষ্ট ঠাঁই যেতে? আমি কি পতিত হয়ে যেতাম তাতে?

এক সপ্তাহে চিঠি পেল চিন্ময় ডাক্তারও। খুলে পড়ে হাসল আপন মনে, তারপর চট্‌পট্ হাতের কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ল চিঠিটা নিয়ে।

তুষারকে যেন আজ একটু ভাল দেখল। এতদিন পর্যন্ত কেবলই যে উগ্র রুক্ষ তীব্র মূর্তি দেখেছে, তার বদল ঘটেছে। খুব শান্ত আর অমলীন দেখাচ্ছে তুষারকে।

ওর গলায় সেই একঘোঁয়া লাল-কালো সুতোও অন্তর্হিত, তাই পুরনো শ্রী ফিরে এসেছে। দেখে ভাল লাগল। এসেই যথারীতি বসে পড়ে চিন্ময় গরাজ গলায় বলল, 'বেশ জপেস করে একটু চা খাওয়ান তো, সুখবর আছে, ছাড়ন।'

তুষার ঠোঁট উল্টে বলল, 'আমিও দিতে পারি আপনাকে সুখবর।'

—ছাড়ন। ছাড়ন! অভ্যাসের কপচানো এ সৌজন্যটুকুও সইল না! ঠিক আছে, আমার যা লিখেছে, ঠিক সেটি হয়তো লেখেনি আপনাকে।'

হাসতে হাসতে চিঠিটা বার করে, পকেট থেকে, 'দেখুন কী লিখেছে—"ভাই চিন্ময়, আমার প্রাণপুত্তলিটি তোমার হেফাজতে রেখে এসেছি, উপযুক্ত কেয়ার নেবে।"

তুষার হেসে উঠে বলে, 'কেয়ার-টেকার জনাইয়ের বাইনে কত ধার্য হয়েছে?'

—তাই ভাবছি। কী বাবি কথা যায়।'

খোলামেলা লোক, হাসে বেশী। অভ্যাসেও হাসে।

জামাই বিদেয়ে যাওয়া পর্যন্ত সুরমা একবিন্দু মেয়ের কাছে আসতে পারেন নি বলে অভিমান বোধ করছিলেন। যদিও তুষারের বাবা মেয়ের প্রতি তেমন প্রসন্ন নন।... মা বাপ দাদা সবাই মিলে অনুরোধ করল, তবু তুমি মেয়ে, এখানে এসে থাকতে পারলে না?...এত স্বাধীনতা? এত সাহস? দিনকাল খুব ভাল? তাই তুমি একা মেয়ে-ছেলে অতবড় একখানা বাড়িতে থাকবে? পুরনো ঠাকুর-চাকর আছে? ও সব চেয় দেখা সোজা, বিশ-পঁচিশ বছরের পুরনো চাকর বাড়ির গিন্নীকে খুন করে সর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে এ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না? শুনিস নি কখনো? তা ছাড়া দু-দুটো মস্ত বাড়িতে, স্বিতীয় একটা মেয়ে-ছেলে নেই, একা থাকবেই বা কোন্ সাহসে? লোকে কী বলবে?

মেয়ে সামনে নেই, তবু মেয়েকে উদ্দেশ করে কড়া কড়া কথা শোনান ভদ্রলোক। সুরমা এক সময় বলেন, 'তা তুমি নিজেই বল না মেয়েকে। তুমি বাপ, তোমার শাসন করার অধিকার আছে।'

বলে মুখ বাঁকান।

এ যুগে যে বাপ-টাপের কোনো অধিকার নেই সেটাই বলেন বাদেলাদ্বির আমায়।

—অধিকার! হুঁ, বলে কুমারী মেয়ে, বাপের ভাতে থাকা মেয়ে, তাকেই কিছু বলতে পারছে না আজকাল লোকে! পার্কের বেঞ্চী হালদার যা বলে। তার মেয়ে না কি —হুঁ। আর এতো বিশ বছর বিয়ে হওয়া স্বাধীন মেয়ে, বরঞ্চলাক মেয়ে...এ যুগের কর্তা আবার কর্তা! বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া! একলাল হারানো হাবিজ্ঞি। অনেক জপের পাপ থাকলে, এ যুগের বাড়ির কর্তা হয়।' একটু, গলা খাটো করেন, 'এই যে বাড়িতেই ছেলে ছেলের বৌ কী স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছে, একটা কথা বলার যাই আছে?'

সুরমা বেজার গলায় বলেন, 'ওর আবার কী স্বেচ্ছাচার চালাতে এল? সবাই বাঁনা বাঁনা করে তোমার ছেলে বৌকে।'

কর্তা আরো মুখ বাঁকান। 'করে। খোসামুদোরা করে।'

সুরমা এসব কথা ভালবাসেন না। তাঁর মতে, কথার চাষ বন্ধ করবে, তবেই অশান্তি কম হবে। আর বলতে হয়, মুখের সামনে বল, পুরুষ মানুষ তুমি, আড়ালে নিন্দে করবে কি? তাও নিজের সন্তানকে!

ঠিক করলেন নিজেই যাবেন, মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, হয় এখানে নিয়ে আসতে রাজী করাবেন, না নিজেই গিয়ে মেয়ের কাছে থাকবেন এ কদ্দিন। সংসারের জন্যে তো এখন আর তত চিন্তা নেই, রান্নার লোক আছে, বৌ ঝিরী হয়ে গেছে। জামাই অবিশ্যি মুখ ফুটে একবারও

বলে যায়নি, জেনে তো গেছি, তবু মাতৃকর্তব্য, দায়িত্বের।

আসলে একা একা কোথাও যাওয়া আসা করতে পারতেন না, এখন আস্তে আস্তে শিখেছেন। চটিটা পায়ে দিয়ে, পয়সার ব্যাগটা হাতে নিয়ে পরিপাটি শাড়ি ব্লাউজ পরে বেরিয়ে পড়তেন।

কিন্তু মেয়ের বাড়ি এসে যে এ দৃশ্য দেখতে হবে এ কথা কি স্বপ্নেও ভেবে এসেছিলেন সুরমা? বয়সও খোলাই ছিল, চাকর অনন্ত সিঁড়ির তলায় নিজের চৌকিতে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। সহসা বাসিয়াকে দেখে তাড়াতাড়ি হাতের বাল ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।...থাক্, একটু সভ্যতা আছে এখনো।...কিন্তু ও কী? দোতলা থেকে সুব্রর অট্টহাস্য উচ্চ হাসি ভেসে এল যেন? কে এসেছে?...শিশিরের গলা তো নয়?...জামাইয়ের সেই মামাতো বোনের ঘর? ননদাই অথবা তদ্গতি-পতি ব্যতীত কে এরা বহিরালার ঘরে এমনি উচ্চহাসি হাসবে? ভদ্দরেরা নিশ্চয় নয়।

অবাহিত হয়েই চুপ করলেন অনন্তকে, 'কে এসেছে ওপরে?'

অনন্ত অম্লানবদনে বলল, 'ডাক্তারবাবু তো।'

—'ডাক্তার কেন?' সুরমা অবাক্ হলেন, 'কী হয়েছে তোমাদের বৌমাদির?'

চুপ করে ভাবলেন, কী এমন হতে পারে, যাতে এত হাসির খোরাক আসে।

অনন্ত সেইভাবেই বলল, 'কি হবে? হয়নি তো কিছু?'

—'তবে?'

—'ও তো আসেনই প্রায়, প্রায়।'

আসছিলেন, নিঃসঙ্গ, বিরহবিধুরা মেয়ের কাছে স্নেহস্পর্শ নিয়ে, এবং তাকে সংসারের যাবিলা সম্পর্কে যথাবিহিত করিয়ে দেবার সাধু সংকল্প নিয়ে। সুরমা বেঠে গেলেন।

উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। সামনেই বসার ঘর। দেখলেন মুখোমুখি দুই মানুষ বসে, তুষার আর ডাক্তার। দুজনের সামনেই একটা করে চায়ের কাপ, খালি।

তার মানে অন্তত দুকাপ চা অনেক-ক্ষণ থেকে।

ইচ্ছে হল, সিঁড়ি থেকেই ফিরে যান, কিন্তু সেটা সেরাইই ধৃষ্টিকটু হবে বলে পারলেন না। সেকেলে মানুষ, মুখরবেলার আগে পরি-চালিত হবার অভ্যাস নেই। আস্তে আস্তে পায়ে চটি ঘসটাতে ঘসটাতে উঠে যান।

এখানেও সিঁড়ি উঁচুতে ছাপান অল্প অল্প। চটির শব্দে ফিরে তাকাল তুষার। 'আরে। এসো। মা!' বলে ছুটে এগিয়ে এল, 'তুমি যে এ সময়?'

সুরমা স্মান হাসিতে সংক্ষেপে বললেন, 'এলাম একবার। সেই থেকে তো আসতে পারিনি।'

'সেই থেকেটা অবশ্য সুবোধার যাওয়ার দিন থেকে।

তুষার বলল, 'ডাক্তার ঘোষ, এই আমার মা!...মা, ইনি ডাক্তার ঘোষ।'

সুরমা অত হাত তুলে নমস্কার করতে জানেন না। নমস্কারের প্রতি-দানে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন, 'হ্যাঁ দেখেছি। তোমার বিয়ের তারিখের নেমন্তন্নে। জামাইয়ের বন্ধু।'

তুষার ছেলে উঠে বলল, 'হায় হায়, আমি আমার পরিচয় কাঁহাতক দিতে বলবো! সবই তো জানো দেখছি।'

সুরমার মনে হল অনেকদিন যেন তুষারকে এমন গলা খুলে হাসতে দেখেন নি। এ হাসি আসল হাসি। যাকে যাকে যা তৈরি করা বলে মনে হয়েছে সুরমার। মনে হত এখনকার মেয়েরা যেমন চোখে কাজল পরে, চুলে সাম্পু করে, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায়, তেমনি গলায় ওই হাসিটাকে ফিট করে। সুরমার এই মেজ মেয়েটি এখনকার মেয়ের প্রতীক ছিল। কিন্তু ইদানীং আবার সব স্বভাব বদলে যা তা উল্টো-পাল্টা হয়ে গিয়েছিল। সেটাও কিছু নয়। খুবই বিচ্ছিরি লেগেছে। তবে এখনও আবার এটা ভাল লাগল না।

চিন্ময় বলল, 'আচ্ছা, এখন তাহলে চলি। যা যা বললাম, করবেন। না হলেই বুকব্রেন তো রিপোর্ট চলে যাবে।'

তুষার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির নীচে পর্যন্ত গিয়ে সীঁড়ে দিয়ে এসে বলল। বলল, 'বাঘ এতদিনে তাহলে মার মেজ মেয়েটাকে মনে পড়ল!'

সুরমা উদাস গলায় বললেন, 'মনে যোজই পড়ে, ছেড়ে ওঠে না। তোদের বাবার তো শরীর ভাল যাচ্ছে না। রিটায়ার করে পর্যন্ত তো এটা-ওটা চলছেই। এখন আবার হাতে ধরেছে। বরেদের ধর্ম বয়স করবেই।...তা ওই ডাক্তার কী করতে বলে গেল?'

তুষার মৃদু হেসে বলল, 'আর বোলো না। আমি না কি বাহুবে রোগা হয়ে গেছি, ওর বন্ধু নির্দেশ দিয়ে গেছে, এই কদমাসে আমার মোটা করে তুলতে হবে। তাই খুব জলা ছানা মাখন আর ডিমের অর্ডার হল।'

সুরমা সন্দেহের গলায় বললেন, 'আর রিপোর্টের কথা কী বলল?'

তুষার হেসে বলল, 'রিপোর্ট পেলেই তো পেয়ে যেছ বুঝি? তার নেই, এক-রে রিপোর্ট নয়, টাটা করাচ্ছিল। ও সব ছেতে না চাইলে বন্ধুর কাছে লিখে পাঠাবে।'

কথাটা তবু বিশ্বাস হল না সুরমার। ইদানীং কি আর তেমন আহ্লাদে-গলা সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে? এক-আধবারের দেখাতেই অদ্ভুত করেছেন, সে সুর আর নেই, সে ছন্দ আর বাজে না। তুষারই স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে কী উদাসীন হয়ে গিয়েছিল ইদানীং! যা করত ঠাকুর-চাকর। সুবোধার এই বাইরে যাওয়াটাও সুরমা সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন।

হঠাৎ আবার সেই আগের সুর, আগের ছন্দ, অন্তত মানুষটা বাড়িতে যেন, যেশেই নেই। বললেন, 'তবু ভাল। তা আছিস কেমন?'

—'ভালই।'

—'চিঠিপত্র এসেছে জামাইয়ের?'

তুষার সমর্থনসূচক মাথা নাড়ে।

—'তোর কিটাকে দেখছি না যে, কাজ মেয়ে চলে গেছে?'

তুষারের মুখটা একটু কঠিন দেখায়, 'মাস ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছি।'

—'ছাড়িয়ে দিয়েছিস?' সুরমা অবাক। 'বাড়িতে একটা মানুষ মেয়ে-মানুষ আসতো যেতো, সেটাকেও হঠাৎ ছাড়ানি দে?'

তুষার সংক্ষেপে বলল, 'কাজ করে মেয়ে, একটা লোকের জন্যে তিনটে লোক!'

সুরমার এটা অন্তর্পূত হল না।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর

তাই গল্পের আসরটা জমজমাটি হল না। কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া। আবহা আবহা। সুরমার মনে হল, অন্তত এই এতক্ষণ মেয়ে বিদেশ বোলচাল চালাচ্ছিল।

একটু পরেই বললেন, 'উঠিরে।'

মেয়েও বলল না, 'আর একটু বোসো মা!'

বেশ একটু বিদ্বেষ আর বিরক্তি নিয়ে ফিরলেন। স্বামীর ক্যান্সার যে নতুন মনের কথা বলবেন, তার জো নেই। বাপ্‌পা মানুষ, কী বলতে কী বলবেন, সেটা আবার ছেলে-বৌয়ের কানে যাবে।

ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

তুষার যুক্তেছিল ডাক্তারের উপ-স্থিতি মার ভাল লাগেনি। মনে মনে হেসেছিল তুষার, সেকালের মানুষ-দের মনগুলো কী সংকীর্ণ!

ডাক্তারের চোখেও এটা ধরা পড়তে দেরী হয়নি। তবে সে ভাবেনি, সে ভেবেছিল গার্তাবিধিটা অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এমন সময় তার নয় যে, বন্ধুর বৌয়ের সঙ্গে নিত্য আড্ডা দিতে যাবে। তা যায়ও না, নেহাত সুবোধা অনেক করে বলে গেছে বলেই। তুষার মন-

চলা হবে থাকবে, তুষার মানুষে রোদ্দা হয়ে গেছে, তোর হেফাজতে রোদ্দ দেলাম ওকে মনে রাখিস। অনেক কথাই বলে ফেল্লে সে।

সুহেলার মন সর্বদা কু গাইছে। কিটাকে এই মুহূর্তে তাড়াবার কী দরকার ছিল? মেয়েমানুষের চোখ তুষর বলে?

সুহেলা ছোট মেয়েকে ডেকে মনের কথা বলতে বসল। মেয়ে বড় হলেই বন্ধু। তৃহিন বলল, তুষারদির কথা তার বলতে এসো না আমার কাছে, সেই একদিনই আমি ওর মনের কথা শেষে পেছি। আমাকে আর ভাটালেও ওর বাড়ি যাচ্ছি না। নাম উচ্চারণ সহ্য আমি নেই।'

—সেই তো জ্বালা, সুহেলা দম্বদে বললেন, 'আমি তো পাকে-প্রকারে বললাম, 'তোর কাছে নয় যাবিই যদি, তা একেবারে উঁচুকে ওঠা। বাপের জন্যে চিন্তা উথলে উঠল। ওকে এভা রেখে আমার না কি মহর্ষি যাওয়াও উচিত নয়।'

তবে মনে কী করা? যে কারো সাহায্য চায় না, তাকে সাহায্য করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা কমই আছে।

নিজের মনেই নিমগ্ন তুষার।

নিঃসঙ্গতা কষ্টের। তবু নিঃসঙ্গতাই যেন ভাল লাগছে আজকাল। সমস্ত বেহ মন যান্ত করে যেন একটা অসাড়তা গ্রাস করে আসছে তাকে। কেউ এলেও যেন ভাল লাগে না। কথা বলবার উৎসাহ খুঁজে পায় না। একটা নিস্তেজ নিস্পৃহতার গহ্বরে জলমগ্ন যেন তলিয়ে যায় তুষার।

তবু তা ভাল লাগে না, তা করতেও হয় বৈকি। সমাজে বাস করতে হলে তাকে খাজনা দিতে হবে সমাজের খাজনা, এই লোকব্যবহার।

ছোট বোনটার জন্যে মাঝে মাঝে বড় মন কেমন করে। তখন তখন মেজদি মেজদি করে আসতো, তুষারও তখন তখন ডাকতো। তুষারের রন্নাঘরে যৌথিন করে জন্যে রোজই যৌথিন আয়োজন ছিল, শিশিরকে তৃহিনকে ডেকে খাওয়ানোর শখও ছিল তার। সামান্য একটু মান-অভিমানের খাপার নিয়ে যোজনা আর আসে না। শিশির আসে এক-আধবার, কর্তব্য সারতে। কতবার মনে হয়, ওকে বলি, তৃহিন কি তার মেজদিকে সত্যি তোমরা করলা?' বলতে লজ্জা করে।

কী বিশ্রী কথাই বলেছিলাম ওকে! মেয়েমানুষ এ জগতে কেবলমাত্র একজনকেই যা খুশী তাই বলার পায় পেয়ে যায়। কথা বন্ধ, মুখ দেখাদেখি বন্ধ পালার পরও হঠাৎ ভালবাসার কথা বইতে পারে, আদরের সম্বন্ধ উথলে উঠতে পারে।

সুহেলা চলে যাবার আগের রাত্রির ঘটনাটি বার বার চোখ খুলে দেখতে সাধ হয়। মেঘে আবেগে আবেগে লজ্জায় অধীরতায় থরথরিয়ে ওঠে।

কতগুলো দিন-রাত্রি পার হলে পাঁচ-ছাঁটা মাস পার হবে!

এখন চিঠি আসার দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষা। মস্ত বড় চিঠি লেখে সুহেলা। কী লেখন, কী জানন, লেখটা যেমন, এই সব নিয়ে তার চিঠি তখনো।...তুষার এত কী লিখবে? তা ছাড়া তুষারের এই অবসাদ রোগটা যেন ওই চিঠির উত্তর দেওয়াটাকেও কর্মলিত করে ফেলেছে। আধখানা লিখে ফেলে রাখে বাকিটা পরে লিখবে ভেবে।

তবু এক-আধদিন জোড়েজুড়ে উঠতেও হয়।

যেমন আজকেরা এল।

আগে যারা কেবলই আসতো, তারা আর আসে না। তৃহিনের অন্যখানের জ্বালা, চেটেরও তাই। টেটুকে এত দিন হলে বসেছিল তুষার, হঠাৎ হোলোমার মতো এত মজবুত, বাবার মাথা ঘুরিয়ে দেয়। এবার যদিন আসবি ওকে বাড়িতে ঠাকুমার কাছে রেখে আসবি।' তখনই আর আসনি ওরা।

কিন্তু এ'রা আসছেন।

আসছেন, বসছেন, গল্পও করছেন, চা খাচ্ছেন, তারপর হঠাৎ বলছেন, 'ছোট ঠাকুরঝিরা বড় করে বলে দিয়েছিল তাই এক-একবার আসতে হয়।'

আজ এলেন মেজদা।

তুষার যখন সেই অভ্যস্তরে অবসাদ-ঘরে দিবার ঘরে পড়ে আছে, এসে অবাক হলেন, 'এমন অসময়ে শুয়ে যেন রে তুষার?' বলে, তারপর আদার উৎখনা, মেয়ের সাথ তাই তুষারকে নেমন্তন্ন করতে আসা।

শুনে হঠাৎ তুষারের খুব ভাল লাগল।

সারা জীবনে কত সাধের, কত আদরের, কত 'আইবড়ো ভাতের নেমন্তন্ন পেয়েছে তুষার। নেমন্তন্নে যাবার আহ্লাদটাই অনেকের অরুচির, আজ খাবার কথাটার মেন মেন আহ্লাদ এল। সুহেলা চলে যাওয়ার পর ভেবে এত বাজে রান্না করছে ঠাকুরটা' অথবা!

তার রোজই ঠাকুরের ওপর এত গলা বাজ বর্ষণ করে উঠে পড়ে, খাওয়াই হয় না। মনে হল বন্ধিম সাহেবের নেমন্তন্নে খুশী একটু, খাওয়ানো যাবে।

তামার পরনেরো মনে পড়ে মেন উৎসাহ এল। এ সব ব্যাপারে মেয়েরই একটা সহজ জ্ঞান থাকে। তুষার যে তার মুখে ভয় ছিল, তা নয়, কিন্তু এখন মনে হল, ঠাকুরের হাতের ওই বাজেতাই রান্না খেয়ে মেয়ে, আবার মেখানি সুস্থ, ভাচিতাস নামেও জিতে চল আসছে।

বাবার দিন মেন তাড়া করে আসল তুষার। অনেক দিন পরে আলমারী খুলে শাড়ি বেছে পরল। টিপ পরল সযত্নে করে, আর নির্মল মুখে পাউডার পরল খুব, একগাছি সরু সোনার হার। আয়নির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল নিজেকে, সুহেলার মেদিনের কথা মনে পড়ল, 'আয়নির সামনে দাঁড়িয়ে দেখো তোমাদিন আর নিজেকে? দেখেছ, কী চেহারা হয়েছে?'

আজ যদি সুহেলা থাকত নিশ্চয় খুশী হতো। কিন্তু, তুষারের সবচেটাই এখন খারাপ লাগছে বলতে হবে। এত সুন্দর দেখতে হয়ে মেন সেখানে, তবও সবাই একবাক্যে বলতে লাগল, 'চেহারাটা এমন হয়ে গেছে কেন? এমন কাকাসে, এমন শুকনো?'

তার মানে মেলী মোজনা পুরাণ!

কিন্তু খেতে বসেও সে খারাপ লাগল তুষারকে ভাড়া করবে, তা কে জানতো!. সাদের সময় পাঁচ প্রকারের নিয়ে খেতে হয়, তার ছোটখাটিও সেই পাঁচের একজন হয়ে বসল। কিন্তু কী যে হল, এক গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই সারা শরীরের মধ্যে তাঁর একটা পাক দিয়ে উঠল। মেন শুধু ওটুকুই নয়, ভিতরের সব কিছুই উঠে আসতে চায়, বেরিয়ে আসতে চায়। ছুটে উঠে পড়া ছাড়া উপায় থাকল না।

কী লজ্জা! কী অপ্রস্তুত হওয়া! মেজদের বাড়ির একবার প্রসঙ্গ হল এখন তুষার। 'হঠাৎ এমন হল মেন? ...অম্বল হয়েছিল? হাতে ভাল মুখ হয়নি?...হজমের গোলমাল চলছিল নাকি?...কিছুই নয়? শুধু শুধু? ...আশ্চর্য তো!'

সকলের মুখেই উৎসুক উৎকণ্ঠা। শুধু তুষার মেন ওদের মুখ দেখে বিশেষজ্ঞ হয়ে যায়।...সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে এমন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করছে কেন?...মেন প্রসঙ্গের উত্তর এদের জানা, শুধু আমি সেখানে চুপ করছে।

কেন? কেন?

কী এ?..

কী বলতে চাইছে ওরা তুষারের সম্পর্কে ওই ফোসফাসানি তাকাতাকি করে? কী বলে ফেলেছে ওরা?...

হঠাৎ তখনকার একটা ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে তুষারের।... তুষারের এতদিনের অভিজ্ঞতা মেন ওদের অভিজ্ঞ দৃষ্টির ভাষা পড়ে ফেলে। আর ওই মৈত্রপ্রবাহে হাত-পায়ের মতো থেকে তিল-তিল শিরশির করতে করতে উঠে এসে মেন হৃৎপিন্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মাথা ঝিমঝিম করে।

কিন্তু এর মানে কী?...

এর মানে কী?...ওরা যা বলতে চায় তা যে কত অসম্ভব তা কি জানে না ওরা?...অন্তত তবু তুষারের নিজের মধ্যেই মেন এমন একটা চমকের তর কাঁপিয়ে পড়ছে?

সেই ভয় মেন পৃথিবীর সব আলো আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।..

তুষারের মনে হচ্ছিল, কোথায় মেন তলিয়ে যাচ্ছে সে। গভীর গহ্বরে, তার নাগাল কোথাও মাটির ঠেক নেই, তলাতে তলাতে তলাই মেন মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছে।.....

হঠাৎ এক সময় দেখল, কে মেন তুষারের মুখে মাথার বাতাস করছে। কেন? হঠাৎ ওরা তুষারের মাথায় বাতাস করতে আসবে কেন?.....

কে ও? ও! বড় জা।... তাঁর উদ্বিগ্ন গলা শুনতে পেল, 'এখন কি একটু ভাল মনে হচ্ছে যে তুষার?

তুষারের ইচ্ছে হল বলে, 'হ্যাঁ'। কিন্তু অবসাদে চোখ খুলতে ইচ্ছে হল না। তখন তুষার শুনতে পেল, কারা মেন বলাবলি করছে। ডাক্তার-টাক্তার ডাকলে হতো?. মেজ জাদুরের গলা শুনতে পেল, 'কী ব্যাপার? ছোট বৌমা নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? মেলী ভিয়ে? গরমে? ডাক্তারকে খবর?'

মেজ জার অতল কণ্ঠ শুনতে পেল, 'না না! ও কিছু না, তুমি নিজের কাজে যাও।'

এর পর আবারও জাদুরের গলা কানে এল, অস্বাভাবিক করে উঠিয়ে মেওয়া ঠিক নয়। সুহেলা এখানে নেই। আমার মনে হয় ওভাবে একা একা থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। ওতে নার্ভ উইক হয়ে যায়।'

তুষার অচেতনা, অতএব তুষারের সামনে সবকিছু বলা যায়। তাই মেজ জা বলেন, 'তা এতো তোমাদের ছোট বৌমার সাথের কাজল পরা। একা থাকতে তো কেউ বলে নি। সেজেছে সবাই। বলে মাসের কাজেই ফিরে থাকতে চায় না।'

—যাক, ঠিক আছে, মেলা কথা কোরো না। ওর মাথার কাছে মেলী ভিড় বাড়িও না।'

চুপ, এ বাড়িতে এসেছে, এবা ছোট বৌমির সঙ্গে কথা না করে ঘুরে ঘুরে মেরেছে। এখন কাকাকাটি এলো। তুষার শুনতে পেলো, খুব চাপা গলায় কাকে মেন বলছে, 'আমার সন্দিহের মনে হচ্ছে না।'

আরো চাপা গলায় ফুস, ছোট ঠাকুরপোর যাওয়ার তারিখটা তোর

বলে আসে?'

হাতের তলার স্নায়ুগুলি অন্ধ ঝুনঝুনিয়ে উঠল, সেগুলো কোথায় গেল?'

'কই দেখছি না তো!'

তুষার আর কতক্ষণ 'অচৈতন্য' থাকবে? তাকে আস্তে চোখ খুলতে হবে তো? কিন্তু সেই কাঁকড়া পাদ্রি কই তুষার? এখানে ওখানে যে কিসফিস কথার ঢেউ তরঙ্গিত হচ্ছে। ডাক্তারের যাওয়ার তারিখ জেনে তার কি হবে? তাহলে তারিখের খবর কে জানতে পারবে?'

'সে তো ওকে নিজেই হবে।'

'আর তোরা এখনো এখানে খুলে-তানি করছিস?' স্নেহ তানুরের গলা। 'ডাক্তার বাবু এসেছেন।'

তুষার কি হাতে স্পর্শ পেল, আর অচৈতন্য হয়ে থাকতে হবে না বলে? ...না কি তুষার চেতা মনের সেই এক অসম্মানিতার লাঞ্ছিতার মত বাঁচিয়ে দিতে হবার আবেদন জানাচ্ছে?

তবু বাঁচল।

চোখ খুলে বাঁচল।

ডাক্তার বললেন, 'মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলে?'

তুষার বলল, 'তাই নয়।'

—'হুঁ। হজমের গোলমাল আছে?'

—'না তো!'

—'কোনো কারণে অম্বল টম্বল হয়েছে, ওষুধ টষুধ কিছু নেই?'

একটা ওষুধ লিখে দিলেন।

এসেছেন যখন, কর্তব্য করলেন বৈকি।

পাড়ার ডাক্তার, ডিগ্রিটি কম। হুট্ বললেই আনা যায়, তাই তাড়াতাড়ি ডাকা গেল।

এও একপ্রকার সামাজিক কূট-নীতি। প্রয়োজনবোধে যেমন প্রকাশ না হলেও, ছোট ভাইয়ের অন্ত-পর্শ্বিতিতে, তার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে যে সাবধান সচেতন, তার প্রকাশ থাকল।—দেখো, তুমি ছোটো ভাইদের চাকরে হয়েই আর একম-বর্তী পরিবারে ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে রাজী হও নি। যৌ নিয়ে মাতামাতি করছে, তাকে মেমসাহেব করছে। কিন্তু দাদারা সেদিকে অঁকিয়ে.....

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল তুষার।

ডাক্তারের হাত তাকে অনন্তের হাত থেকে বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু সেই অনন্তের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তি সর্বনাশে কালসিটে ধরিয়ে দিয়েছে।

বাড়ি ফিরে তুষার তোলা শাড়ি বদলায় না, হাত মুখে জলও দেয় না, শুধু বুকের মত মেয়েদের ধারে বাঁচিয়ে ভালোভাবের ছিপ্ছিপে ফেলা পুণ্যোদ্যুলোর তারিখের উপর চোখ বুলোয়। আবার মাথা ঝিমঝিম করে আসে।

সামান্য মেয়েদের পুরুষের চেয়ে নিজের। টুটু, একটি ঘিরেছিল ছেলে-মেয়ে নিয়ে। বয়ের সঙ্গে দেখা হয়েই বলে উঠল, 'আরোজন মেজ বৌদি খুবই করেছিল, কিন্তু খুলি তোমার জন্যে হাঁরিয়ে বিষাদ! বলতে গেলে খাওয়াই হল না মোটোর।'

মন বলল, 'কেন? কী হল?' কণ্ঠ নিষ্প্রভাস। এই রকম নিষ্প্রভাস কথাই বলে সে, স্ত্রীর অতি চালচলনের সময়। এ একটা মজা দেখা।

কিন্তু টুটু এখন কেন ওঠে না। বলে, 'ডাই বৌদি তো রীতিমত একটা কেলেঙ্কারীই করল।...ঠিক যেতে বসেছে—'

অভ্রদের পুরুষের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত করে, অবশেষে ঘোষণা করে, 'ডাক্তার বাই বলুক, আমার কিন্তু বাপু মনে হচ্ছে গভীর সন্দেহ হচ্ছে।'

টুটুর বর অবশ্য এ রকম ক্ষেত্রে পুরুষমানুষে যা করে, তাইই করল। উঁকিয়ে দিয়ে বলে, 'তোমার তো প্রতিপদেই সন্দেহ। কারো অসুখ করলে তুমি সন্দেহ করতে বসো, নজর লেগেছে। রাস্তির ইঁদুর-খোঁড়া খুটে খুটে ওরলে তুমি সন্দেহ কর যে নির্ঘাৎ চোর।'

টুটু বলে, 'সে তুমি যাই বল, আমি যাবো একবার যাচ্ছি, ঘিরে দেখছি।'

—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'আহা মাতকাণ্ড বাধাল শুনে হবে নি তা নয়, তবু আবার ঘিরে কোথায় আবার? মহারানীর প্রাসাদে।'

—'এই যে বলছিলে আর কক্ষণো যাবে না ও বাড়িতে?'

—'বলেছিলাম, তবে এমার্জেন্সির বলে কথা! অবিশ্যি ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাচ্ছি না।'

চিন্ময় বলল, 'হঠাৎ এ রকম হল কেন?'

সামান্য কথা, সামান্য প্রশ্ন, তবু শুনে তুষারের বুক কেঁপে উঠল।

তবু সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'সেটা আপনারাই জানেন।'

—'আমাদের জানার পরিধি এত কম,' ডাক্তার মার্জনিকের গলায় বলে, 'তাহলে নিজের কথে নিজের মাথা কাটা যায়।'

তুষার উঁচিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলে, 'এমন কিছু না। হয়তো ভেতরে চাপা অম্বল টম্বল হয়েছিল। ওঁরা একেবারে ভিজকে ভাল করে, ডাক্তার ডাক্তার ডেকে—আবার আপনাকে খবর দিয়ে—ছিটি যাচ্ছে লাগছে।'

চিন্ময় বলল, 'আপনার চেয়ারটি কিন্তু আপনার কথার সায় দিচ্ছে না, মৃদু একটি একটু লম্বা আবলে পরীরের দিকে।'

চলে যাবার সময় হঠাৎ একটা বিষয়ে তারিখ জানতে চাইল।

সাহিত্যিক আর্টাসে বন্ধুর অসুখ তুষারের, স্বামীর বন্ধু, এই ডাক্তারের সঙ্গে আড্ডার সময় সাহিত্য নিয়ে, সিনেমা নিয়ে, তর্কাতর্কি আলোচনার সময় মুখের 'খল ছিটাঁবিনি যে খুব একটা বজায় রাখে তা' নয়। এবং ডাক্তারের কাছে নারীর সম্পর্ক কোনো প্রশ্নে যে লজ্জা করাটাই লজ্জার তাও জানে না তা' নয়, তবু এখন তুষারের মনে হল এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত লজ্জা বুঝি কিম্ব সালোয়ে আর নেই।

তবু বলতে তো হবেই।

শুনে চিন্ময় মনে মনে কী যেন একটা হিসেব করে বলল, 'ঠিক আছে। পরশুদিনের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবেন। ভাল করে খাচ্ছেন টাচ্ছেন তো?'

তুষার তাড়াতাড়ি ঘাড় ঝাঁকাল। আর মনে মনে বলল, সব ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলবার পাপ নেই।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর তুষার যেন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ে। ভগবান, তুষারের সঙ্গে এ কী নির্মম পরিহাস তোমার!

সুযোগায় সুযোগ্য ছেলেরা ফেরেন্ডের সাজা বাড়ানোর চেষ্টা রাখেন নি। শুধু যে সুযোগায় ডাক্তার বন্ধুদেরই খবর দিয়েছিলেন তা নয়। সুযোগ্যর শ্বশুরবাড়িতেও খবর পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা যেন তাঁদের মেয়ের ভত্ত-তল্লাস নেন, স্বাধীনচেতা জামাইকে তো তার আত্মীয়রা নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে যত করতে সক্ষম না, অন্তত এইভাবে একটা ধারা যে অত্যন্ত অবিচারক, তা জানিয়ে রাখলেন।

ফোনে খুবই নিষ্প্রভ!

ডাক্তারের বাড়িতে মেয়েরা ফোন ঘিরে মেয়ের হঠাৎ অসুখী ধারার খবরে সচেষ্ট যে একটু বিচলিত হন নি তা নয়, তবু আবার ঘিরে ফোনে 'খোসামোদ' করতে হয় না তাঁর। তাই ফোনে বললেন, 'তুমি ঘিরে এস, যদি এখানে এসে থাকতে রাজী করাতে পার। নিচের পাশে একটা রাতদিনের কি-টি যদি রাখে—'

বিভাসের আলো ইচ্ছা ছিল না, আর বিজনেস নিয়ে কথা পাড়ে। কিন্তু বিভাসের বৌ হঠাৎ একলাফে খাড়া। খুব অমায়িক গলায় বলে, 'তা বলতে হবে কেন? যাবার হাঁটুতে যাত, কিন্তু বলতে পারেন না, গ্রহকে সব বলতে হবে? চল আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'—আমিও যাচ্ছি।'

এমন অপ্রত্যাশিত বাসীর পর আর নিষ্প্রভোদের কী থাকতে পারে? মনে অবশ্য, ধরবারে, হাটে বাজারে সর্বত্র যাওয়া যায় যদি শাড়ি সঙ্গে থাকে। শাড়িই তো! পুরুষ মানুষেই।

এই শাড়ি সম্পর্কিনী সঙ্গে না থাকলে আত্মীয়রা অচেনা, কর্তব্য-কর্ম অকল্পনীয়, সমাজ-সামাজিকতা, লোক-লৌকিকতা, সবই অর্থহীন।

কিন্তু সঙ্গে কেন? নির্ভর।

তুষারের বাবা হৈমবতীকে ছেড়েই আলো দেখেছেন তাঁর অসুখে হাঁটু নিয়ে। হাঁটু মুড়তে পারেন না, অথচ সংসার-চক্রের সকলে খাঁচের খবর রাখাটা তাঁর বিশেষ জরুরি। তাই ধরজাটা চোখের আড়ালে রাখেন। কে কখন গেল, এলো, এটা জানতে পারলে অনেক কিছু জানা যায়।

তাই বিভাস আর লতিকা বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই সুরেশকে প্রশ্ন করেন, 'ওরা কোথায় গেল।'

সুরেশ সংক্ষেপে বলেন, 'তুষারের ওখানে।'

—'হঠাৎ ওরা?'

—'তুষারের শরীর ভাল নেই শুনে দেখতে গেল।'

—'তা বোঝার হঠাৎ এ সুমতি?' সুরেশ গম্ভীরস্বরে বলেন, 'একটু বেড়াতে বেরোবার ছুতো পেল—'

—'বেরোনোর কিছু কমাই তো দেখি না।'

সুরেশ এখন বিরক্ত হন। বলেন, 'ছেটাছেলে ছেটোছেলের মত থাক না, অত মেরোলি কথা কেন?'

ভদ্রলোক হঠাৎ তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ওরে বাবারে খেলাম, খেলাম!' ভদ্রলোকের কানের সঙ্গে হাইয়ে একটি বিশেষ যোগ আছে। কানের মধ্যে কোনো অপছন্দসই কথা ঢুকলেই হাঁটু জ্বালান দেয়।

ফোনের বাজার দরজার কাছে আসতেই থমকে দাঁড়াল বিভাস। কে একজন বেরিয়ে গেল না?..

ডাক্তার! সেই সুযোগায় কেন্দ্রটি!

লতিকাও চেনে, তুষারের 'বিয়ে-বার্ষিকী উৎসবে' দেখেছে।

কিন্তু ও কেন?

লতিকা চুপ্ কুচকে বলে, 'সুযোগাবাবুর এই ডাক্তার বন্ধু গাইনোকলোজিস্ট না?'

—'তাই তো শুনেছি।'

—'তা উনি যে?'

—'বন্ধু হলে, এর আর কী।' বলে বৌকে নিয়ে ঘুরে আসে বিভাস, কিন্তু খুব প্রসন্ন চিত্তে নয়।.. একা মহিলার বাড়িতে, স্বামীর বন্ধু এই ডাক্তারের তখন তখন আসা যাওয়া একটা শোভন মনে করল না বিভাস। অর্থাৎ সুরেশ সঙ্গে একই পাড়ে পাশী সে।

'সকলেরই তো সেকেন্ড একজনের যার নয়ন না। অথবা, অসুখের বেলায় সবাই সকলের, নিজের বেলায় উদার

প্রশান্তশালী।

তবে এত ঠিক, ঘোতলায় উঠে বোনের ঘরের সামনে যে দৃশ্য দেখল, তা অতি প্রশান্তচিত্তেরও আপত্তিকর হতে বাধ্য। এইমাত্র তার সময় ঘড়ির দিকে একটা বাইরের লোককে বেরিয়ে যেতে দেখলাম, আর এখানে এসে দেখছি কিনা তুই বিছানায় পড়ে ভাঁড়াচ্ছিস? তাও কিনা বিভাসেরই বোনের সামনে! এখন হঠাৎ যদি বুল বিভাসের, সবসময় সব্বা নেওয়া লতিকার এক বিশ্রী দোষ। গায়ে বিরক্ত গলাতেই বলে উঠল, 'কী ব্যাপার তুষার? ডাক্তার এই মাত্র বেরিয়ে গেল, অথচ তুই বিছানায় পড়ে ভাঁড়াচ্ছিস?'

মায়ার গলা পেয়েই উঠে পড়েছিল তুষার, আতঙ্কিত হয়ে দেখল, শিয়রে বৌদি।

আশ্চর্য, বৌদিকে দেখে আতঙ্ক হচ্ছে কেন তুষার? ছলের অপরাধের পাল নেই, ওই গুরুজন স্থানীয়া মহিলাটিকে তো তুষার চিরদিন অবজ্ঞাই করে এসেছে গহিয়া ছলে, কটু বচনে বলে। হঠাৎ ভয়ের কোন্ খেলায় তুষারের অন্তরিত্মার পারা এতখানিটা নেমে গেল!

লতিকাও তো এই ঘরেই রোজ, বরং বড় ননদিনীটিকে মনে মনে ঘটই বিদ্বেষ করুক, মুখে সমীহ করে এসেছে যথেষ্ট পরিমাণে, সেবা যত্নের প্রয়োজন ঘাটতি ভেবে কখনো অবহেলা করেনি বড় একটা। আজ হঠাৎ এ'পাশে এসে গায়ে হাত দিয়ে বলে উঠল, 'সত্যি হঠাৎ কী হল মেজদি? নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে! কত্ত পরজন-টরজন হয়নি তো?'

একসঙ্গে এতগুলো কথা তুষারের সামনে কবে বলেছে লতিকা? অথচ আজ বড় সহজেই বলল। গায়ে হাত দিয়ে। অবশ্যই সান্ত্বনার হাত।

তুষার এক মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিতে চেষ্টা করল কবে থেকে এ সান্ত্বনের সৃষ্টি হয়েছে লতিকার। কী সূত্রে? তুষারের ধাতুলি কলহের কাল থেকে কী? তাই, তাই হবে। ওর মধ্যেই তো ধরা পড়ে গেল তুষারের চৈনা, তুষারের জীবনে সান্ত্বনের ক্ষতি। তাই ওরা সান্ত্বনার হাত বাড়িয়ে আসতে সাহস করছে। এ সাহস তুষারই জুগিয়েছে। কেন নিজেই তুষার নিজেকে নিরাবরণ করে ফেলেছে।

তবু আশ্চর্যই লাগছে, ও গুমোর ভার মুখ হবার পর থেকেই তুষার আবার যেন আগল ভাঙার মতো চুকে যাচ্ছিল।

তেমনি আছে মর্যাদার দূর, ব্যবধান তেমনি দুস্তির যায়।...

কিন্তু কতদিনই বা?

এ কেমন ভীরু বিধায় নির্মম এক দৃষ্টি এসে তুষারকে সতর্কীর করতে বলল?

কিন্তু সেই দীর্ঘ বিদীর্ণ বিতরেটা খুঁজতে দেবে কেন তুষার! তাই অবহেলার তলদাঁতে তুষার বলল, 'ও বাবা, সেই কোন্ আদিকালের কথা তুমি মনে করে রেখেছ?'

লতিকা আশ্বিজাতে কোমল হয়, তবে মনে ভাবে, এসেছি যখন, মহলা ভেঙ্গে না করে নড়ছি না। কাজেই ও আরো কোমল হয়। বলে, 'ও মা মনে রাখব না? আপনারা যদের বি. আই. পি. লোক।'

বিভাস তার বৌয়ের এই পচা রসিকতায় বিরক্ত হয়, অবাকও হয়, তুষারের সামনে এত স্ত্রী হতে দেখা যায়নি কখনো ওকে। তাড়াতাড়ি বলে, 'যাক্ কথা রাখো। আসল কথাটা হোক। শোন তুষার, মায়ের মতো হয়ে এসেছি, বলে নিই কথাটা। যদিও অনেকবার বলা হয়েছে, তোমাকে রাজী করানো যায়নি, তবু আবারও বলি, শরীরটা যখন এত খারাপ হয়ে গেছে, তখন একা থাকাটা উচিত হচ্ছে না, ওখানে গিয়ে থাকবে চল কটদিন না সুযোগা আসছে। ভাল কথা, আমার একটা চিঠি দিয়েছিল সুযোগা—'

'তোমার?' তুষার চমকে বলে, 'কেন তোমার কেন?'

—'আরে অত ঘাবড়ে যাবার কি আছে? আমাকে একটা চিঠি দেওয়া যায় না?'

লতিকা মুচকি হেসে বলে, 'মেজদির যেন হয়, যাবেনা সব চিঠি ওঁরই প্রাপ্য।'

তুষার নিজের ওই চমকে যাওয়ার তারী লজ্জা পেল। সত্যি এত চমকাল কেন সে? বলল, 'না, তা নয়। ডাক্তারি কী আবার জানাচ্ছে তোমাকে! আসতে দেরী হবে না কি—'

—'নয় সে সব কিছু না, আমরা কেমন আছি চাঁছি, আর তুই যাতে সাবধানে থাকিস। তা তুই তো এর মধ্যেই দিব্যি একখানা ঘটনা ঘটিয়ে বসে আছিস।'

—'ঘটনা মানে? কী ঘটনা?' তুষার আবার চমকে ওঠে, কেন বাদুলে তারে।

বিভাস চিন্তিত ভাবে বলে, 'খুব্-খুব্ এত চমকাচ্ছিস কেন বলতো? একটা তো ভাল নয়। নার্ভ খুব ইরিটেবল হয়ে গেছে তোর। এই এত বড় হোলোটার রাতে একা থাকা—খুব ভয় হয়? আমার হলে তো বাপ্ খুব টুঁশ করতো না। সারারাত পাহারা দিয়ে কাটাতাম।'

—'খুব ভরসা আমারও ভাল হচ্ছে না।'

—'খুঁ, তাই তোমার এত ভরাশ হয়ে গেছে। তা কী করব বলছ?'

তুষার আস্তে বলে, 'ঠিক আছে, চলেই যাই তোমাদের সঙ্গে।'

সর্বনাশ!

লতিকা মনে মনে মাথায় হাত দেয়। বলা কওয়া নেই, এই রাত্তিরে চলে যেলেই হল?...তোমার মত মহা-জ্ঞানীকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটা প্রস্তুতি নেই?...হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় অকূলে কূল পায় লতিকা। পাঁজিপুঁথি শাস্ত নিয়ম এগুলো অনেক সময় অসুবিধে ঘটালেও, সময় সময় খুব উপকারেও লাগে।

লতিকা নিয়ম শাস্তের একটা নির্দেশনামা বাগিয়ে ধরে বলে, 'ও মা! এখনই যাবেন কি? এই শেষ ভাদ্দরে বাড়ির ঝিয়ারী বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে আছে?'

—'ওর নেই বুঝি?' তুষারও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে, 'তবে আর কী করে?'

বিভাসও বোনের এই আকস্মিক 'চল এক্ষুনি যাই' শুনে ঘাবড়ে খেয়ে গিয়েছিল, এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বাস্তবিক, 'প্রস্তুতিসমাহিত' কথাটার যথার্থ অর্থ মেয়েদের মধ্যেই পাওয়া যায়। ওদের কাছে আমরা? কত সময়ই যে লতিকা মোলমেলে ব্যাপারগুলো ম্যানেজ করে ফেলে! যাতে শান্ত রাশা, বাবাকে মেজাজে রাখার কত যে পলিটিক্স্ সংসারে। আমার সাধ্য ছিল এই ভাবে এরকম একটা সোজাসোজি ব্যাপারকে ম্যানেজ করে ফেলা? তবে বাকি ম্যানেজটা বিভাসই করে। কেন যাদুল বিরক্ত হয়েছে এই ভাবে বলে, 'আঃ! তোমার যে দেখছি পিসিমার রোল করছে। সব সময় পাঁজিপুঁথিকে এনে হাজির করা। তা তোমার ওই শেষ ভাদ্রটি একেবারে শেষ হবে কবে?'

লতিকা মুহূর্তে বলে, 'এই তো আজ ছাব্বিশে, আর পাঁচটা দিন বাকি আছে। একতিরিশে যান তো!'

—'আচ্ছা। তা হলে ওই কথাই থাকল তুষ্। যেদিন ওই শেষ হবে, আমি তোকে নিয়ে যাব।'

তুষার হঠাৎ হেসে উঠে বলে, 'কেন্‌টা আসল শেষ হবে, কে জানে।'

ওর এই হাসিটা কেন অস্বাভাবিক। কেন গা ছমছম করে ওঠে। তাই এখন চমকাবার পালা বিভাসেরই।

—'ও তখার মানে?'

তুষার নিজেকে নামাবে, না পরিস্থিতিটাকেই সহজ করে নেবে? স্থৈটই ঠিক। একেবারে সহজ গলায় বলে, 'যাবও। দাদা একটুও চিন্তা যেন না।'

ওরা ভাই বোনে কথা কইছে, আর লতিকা উঠে ঘুরে ঘুরে ঘরের সর্বত্র দৃষ্টিপাত করে নেয়। কেন, এ ঘরে দেয়ালে যে সব ছবি ঝোলানো আছে, লতিকা কখনো দেখেনি, যেন এখানে ওখানে যত সাজানোর যে সব উঁচি টাঙি এখানে ওখানে বিন্যস্ত, লতিকা তাদের খোঁজা সৌন্দর্য কখনো অবলোকন করে নি। একটা ঘুলছে, ওটা খুঁজির কিরিয়ে দেখছে। হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওমা মেজদি! জামাইবাবু চলে যাবার পর আপনি খুঁজি মারা করে আমাদের পরিষ্কার করেন নি?'

আশ্চর্য!

তুষার অবাক হয়ে যায়।

ওখানে ওর চোখ পড়ল কী করে?

হয়েছে ঠিকই। গরিমা হলে কী হবে, চতুর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।... সত্যিই সেই বিদায় রজনীতে সুযোগা বসে বসে যে সিগারেটগুলো খেয়েছিল, তার ভস্মকণাটুকু ফেলতে পারেনি তুষার মনতাপরে। তবে মুখে তো স্বীকার করতে পারে না সে কথা। তাই অবহেলায় বলে, 'ওমা তুমি আবার ওই ভস্মাধার আবিষ্কার করলে কোথা থেকে? ছিল কোথায়? আমি তো দেখিই নি।'

—'ওমা তাই বুঝি?' লতিকা একটা সিগারেটের প্যাকেটও আবিষ্কার করে ফেলেছে ততক্ষণে, 'এই যে মুখ্ ভস্মাধার নয়, আসল মালও।...দেখছো, মেজদি কেমন বাচ্চাদের হাইকোর্ট দেখাচ্ছে! উনি না কি দেখেনই নি।...অথচ এমন ভাবে দেখলাই আর আধপোড়া সিগারেট সাজিয়ে রেখেছে, যেন এইমাত্র মানুষ খেতে খেতে উঠে গেছেন। বাপ্‌রে এই বয়সেও আপনা-দের ঘা ইয়ে না, নতুন বয়সকেও হার মানাতে পারেন।'

লতিকা এইসব কথা বলছে।

তুষারই মুখ্ অবাক হচ্ছে না, বিভাসও হচ্ছে। অস্বস্তিও পাচ্ছে। ...হতে পারে তুষার বিভাসের ছোট বোন, কিন্তু লতিকার থেকে তো অনেকটা বড়। আর এমন হাসকুটি ঠাট্টা তামাসা তো করেও না কখনো।

এর মানে কী?

তুষারও ভাবল এর মানে কী।

আর ভাবতে গিয়েই তুষারের সর্বাঙ্গ হিমকরে সেই একটা শৈত্য-প্রবাহ বয়ে গেল!...এ প্রবাহ দুরন্ত একটা আতঙ্কের।...ভয়ের একটা কর্কশ লোহন থাবা যেন তুষারের হৃৎপিন্ডটাকে চেপে ধরে চাপ দিচ্ছে। ...চাপ দিতে দিতে তুষারের দম বন্ধ করে দেবে।

তুষারের অবস্থান্তর বিভাস লক্ষ্য করছিল। বলল, 'কী হল? হঠাৎ এমন 'পেল্' হয়ে গেলি কেন? শরীর খারাপ লাগছে?'

তুষার মাথা নেড়ে সায় দিল।

—'সেদিনই তো, এই শরীর নিয়ে তুই একা আছিস। এ সময় ডিসিশন নেওয়ার কোনো মানে হয়? বাড়ি

অন্ধকারে নিজের প্রাণটা খোওয়াবি? টাকা কড়ি গয়না-টয়না সবাইতো তোর খাপ্পরে জমেই, তবে এত ভাবনাই বা কী? বাঁধ কিছু থাকেও, নিয়ে টিয়ে চল।...আমি বলছি কি লতিকা, তোমার ওই 'তত্ত্ব আপিসের' ফ্রক রাখো, আমরা নিয়েই যাই ওকে।'

এত তাড়াতাড়ি এত গুলো কথা বলছে বিভাস, নিজেরই তর সইছে না। ...লতিকা হঠাৎ সিগারেটের প্রসঙ্গটাকে তুলল আর সে প্রসঙ্গে তুষার এমন বিদ্যুতাহতের মত হল কেন? ভয়টা প্রশ্নের মূর্তিতে দেখা দেবার আগেই বিভাস একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে ফেলল।

ভয়ের ওই ঘাবাটা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা রাগও তুষারের শরীরের সব রক্তকে আলোড়িত করে।

সেই লতিকা! যে না কি তুষারের সঙ্গে মুখ তুলে কথাই বলেনি এই সেদিন অবধি!...এত দুঃসাহস হচ্ছে তার? এত ধৃষ্টতা।

তবু তুষার আত্মস্থ হল। নিরুদ্বিগ্ন বাক্‌ভঙ্গীতে বলল, 'আজকের রৌদ্রির পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটা চমৎকারই, কী বল দাদা? আর সামান্যের ঘরা থেকে অসামান্যকে আবিষ্কার করবার ক্ষমতাও প্রশংসা পাবার যোগ্য।'

লতিকা সরে এসে আরও মুখর বলে, 'আমার যে কেন কিছুই প্রশংসা পাবার মত নেই, তা আমি ভালই জানি মেজদি। হঠাৎ একটা অন্য ধরনের জিনিস দেখে আকৃষ্ট লাগল, তাই যা মনে হল বলে ফেললাম! ... যাক্‌, আজ যখন যাওয়াই হচ্ছে না সত্যি, তখন আমাদের ঘরে রাত করে লাভ কী? একেবারে দরজা পার হয়ে এগিয়ে পড়ল লতিকা। বিভাস এত চটপট স্থানীয় পিছু পিছু যেতে বোধ করি লজ্জা পায়। তাই একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বোনকে আরো একবার সাবধানে থাকবার উপদেশ দেয় এবং ঘরে ঘাবার জল আছে কি না, হঠাৎ শরীর খারাপ হলে কেরোসিন তেলের খাবার নির্দেশ আছে কি না; এই সব অর্থহীন প্রশ্ন দু একটা করে চলে যায়।

বাইরে এসে সন্দেহ সন্দেহ গলায় বলে বিভাস, 'হঠাৎ সিগারেট নিয়ে তোমাদের মধ্যে কী হল বল তো?'

লতিকা সহজেই বলে, "আমাদের মধ্যে কিছুই হয় নি। যা হয়েছে তোমার বোনের অবাধই হয়েছে।... দেখলে না ধারাপড় চেহারার মতন মুখটা কি রকম সাদা হয়ে গেল।'

—হয়তো ভয় পেয়েছে লতিকা। হাসপাতাল আমার বোঝাও তো।'

লতিকা চলা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, দু দিন পরে আপনিই বুঝবে, আমি আর বলে মুখ নষ্ট করি কেন? তবে আমি এলপ্‌ করে বলতে পারি, ওই পোড়া সিগারেটের টুকরো ওর আপনার হাই হু অন্যায় বাস অসুখের নয়।'

বিভাসের হৃৎপিণ্ডটাও বুঝি হঠাৎ কে মুঠো করে চেপে ধরে।...তুষার অবশ্য চিরদিনই বেয়াড়া মেজাজ, বলে থাকে, কিন্তু তার মর্মার্থ তো সেই সুযোগ যায়।...হয়তো কলার পরিহাসের চেষ্টা করে, তবে কি তোমার ধারণা তুষারই যাচ্ছে? তা যা কল্পনাতীত—'

লতিকা স্নেহের গলায় বলে, আমরা বুঝি, আর ন্যাকা সেজো না। সে সব ফ্যাসান তো অনেক দিন ঘুচেছে, পাড়াগাঁইয়ের মতন ঘাবড়ো চাবড়ো কথার ঝোলে...তা সেদুলো আর সেই সেবায়।...কিছুই না ওটা 'সো'। আমি তোমায় বলে যাচ্ছি, মেজদির এই শরীর যাবাপাটি, সোজাসুজি নয়।'

বিভাস স্তব্ধ হয়ে যায়।

লতিকা তবু বলতে বলতে চলে, 'জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই বাস ভাইবেশ হিসেব শুনে করবেন, তবে লোকে তো আর বাস খায় না।'

বিভাস হঠাৎ বলে ওঠে, 'তাতার এত কথার দরকার কী?'

লতিকা যে হঠাৎ এমন যাচ্ছে দুঃসাহসী হয়ে উঠল কেন কে জানে।

লতিকা তাই তার না শেষে কিসের কথা, কী বৃত্তান্ত, কে বুঝেছে?' বলে খট খট করে এগিয়ে বাস শব্দে মিশে যায়।

একজনের ভয়ই বুঝি অন্যের দুঃসাহসের জন্মদাতা।...চিরদিনের উদ্যমহীন ভীরুকে আহাম্মকী অহঙ্কারী তুষার রায় আজ একটা ভয়ের শিকার হয়ে গেছে, তাই ওকে যারা ভয় করত তারা নির্ভীক হবে এটাই স্বাভাবিক।

ওরা চলে যেতে তুষার সেই তার অনেক যত্নে রক্ষিত ধ্রুবতারা কণা পোড়া সিগারেটের টুকরো সযত্নে চন্দ্যাবাক্সটায় হাত রাখে।

এই নিরুত্তাপ আয়নাটুকুতে যে ওই পাণ্ডুর মেজেটার চোখ পড়ল কী করে, ভেবে অবাক হয়ে যায় তুষার। একসারি বড় থেকে ছোট হবিল সাজানো আছে তার এই বুকেকেটার উপর, মোমের শিল্পের তৈরী। পুরী থেকে আনা। ওরের পিছনে রাখা ছিল।...

হরিণদুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে পুরীর সমুদ্রতীরে সেই তরুণের মুখখানির সঙ্গে স্নানের কথা মনে পড়ে গেল।...তুষারও জানে নামবে না, সুযোগও হারাবে না। সেই অবধি

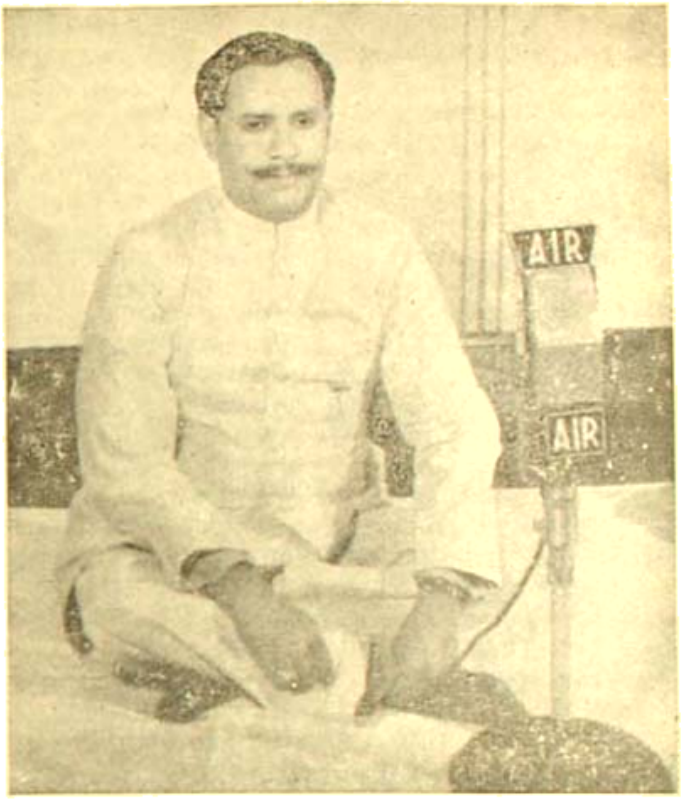


কণ্ঠস্বর বিলায় হোসেন খাঁ

জোর করে চোখাল।...তুষার রেগে উঠে, গুণে গুণে দশটা কথা বলে গেছিল ওকে। সেই জীবনটা ছিল তুষারের।

এখন তুমি আমার এক মুঠো হাইয়ের মধ্যে ওই পোড়া সিগারেটের টুকরোটার মত ফেলে রেখে গেছ। ওই টুকরোটার মত আমার গায়েও ছাই রেখে গেছ। এখন আমি কী করব।

এখন তো আমি জন্মসাই নিঃসঙ্গ হয়ে, আমার শরীরের গোপন গভীরে আশ্রয় নিয়েছে একটি প্রাণ কণিকা। ...এখনো সেই প্রাণের সাড়া ধরা দেয়নি অনুভূতির মধ্যে, ধরা দেয়নি চেতনে অনুপরমাণুতে, তবু সত্তার গহন গভীরে তার আবছায়াটা মোহিত হয়ে গেছে। তুষার অবোধ কিশোরী মাতা নয় যে, এই প্রথম আগমন বার্তায় ঘোষণায় বিমোহিত হবে। কিন্তু হবে, বুঝতে পারবে না, কী ঘটছে তার মধ্যে। কিন্তু জগতের সেই গোপন ক্রিয়ানে লীলা অর্থায়িত হচ্ছে তার অচেতন চেতনায়। তুষার কত দেখল, কত শুনল, কত জানল, তুষারের কী ভুল হতে পারে?

তা ছাড়া হঠাৎ যখন থেকে গোপন উঠেছিল তুষার 'মা' হবার জন্যে, অপরিণত নারী জীবনের প্রেম মুগ্ধতার তরল ভূমিকা থেকে পরিণত নারী জীবনের পূর্ণতার ভূমিকার উত্তীর্ণ হতে, যখন সেই তীব্র বাসনার উন্মাদনায় একটা মূঢ় বিশ্বাসের পথে চলিতে হয়ে অন্ধের মত ছুটেছিল, তখন প্রতিনিয়তেই কি ওই অবিবর্তনের প্রত্যেকার উন্মুখ প্রতীক্ষায় দিন গোনেনি...তখন কি তার পদধ্বনির আশায় সর্বদা উৎকণ্ঠ থেকে, খুঁজে খুঁজে বইয়ের লাইন পড়ে পড়ে শেখেনি?...প্রসূতিপালন আর শিশুপালনের বিবিধ গ্রন্থ তোলা আছে তুষারের লুকানো বেবাজে, তোলা আছে লক্ষ ক্ষিয়ের গোপন দুঃখ, তুষারের তো সব প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে।

লুকিয়েই পড়তে হত, প্রথম প্রথম এক আবাবিল সুবোধের চোখে পড়েছিল, বড় ঠাট্টা করেছিল 'বাচ্চা না হতেই ঢামাল?' বলে। ঠাট্টা করেছিল ওর মা ঠাকুমার মুখে শোনা প্রবাদ বচন তাকে 'অতি সুন্দরী না পায় বর, অতি ধরণী না পায় ঘর।'... নিজে এক লাইন লেখে ওরে হেসেছিল, 'অতি জন্মনীর না হয় ছেলে—'

সেই অতি জন্মনী তুষার টের পাবে না, তার বাচ্চালতার ফল ফলেছে! কিন্তু এরেই কি ফল ফলা বলে?...

তুষার মেয়েরে মাথা ঠেকে, কেন? কেন? ভালবেসেও, তুষারের ওপর তোমার এত নিষ্ঠুরতা কেন? কিসের এই হিংস্র নির্লজ্জ অত্যাচার? যে বস্তুর জন্যে তুষার তোমার কাছে কত মাথা খুঁড়ল, কত কান্না কাঁদল, সেই বস্তু তুমি তাকে এইভাবে দিলে?... যা তুমি তুষারকে দিতে পারতে

সৌরভের সঙ্গে ক্ষমতেরের সঙ্গে, জুলা উপহারের নামে সেলার জলে নাম লিখে, জীবন কিভের ঘুড়ে, তা চিকমুর্দিনে এত অবজ্ঞাভরে ঘুলোয় ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে হল তোমার? আর এই অবজ্ঞা চিকমুর্দি কি তোমার মোরেই বাড়বে? তুমার কি কোনো-দিন অনিবচনীয় আহ্লাদের আলা মুখে নেখে, কোহিনুর হীরের মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে পারবে কাউকে তোমার অবজ্ঞার ধন?'

কে বিশ্বাস করবে তুষারকে। কে বিশ্বাস করবে যে তুষার দীর্ঘ সতেরো অঠারো বছর স্বামীর ঘর করে আর অবশেষে দেব বৈদের ধরজার ধর্ণা দিয়েও স্বামীর কাছ থেকে নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদটি লাভ করতে না পেরে তার বার্থ সৌন্দর্যকে ধিক্কারে ধিক্কারে ধিক্কার করতে উন্মাদিনী হতে বসেছিল, সেই বিকৃত পুরুষ তখন মারার পূর্ব মুহূর্তে সেই সম্পদ দান করে গেল তুষারকে? অভিজাতের হাসি হেসে বলবে না সেকথা এ সম্পদটুকু কি অত্রা কৌটায় তুলে রেখে দিয়েছিল বিবাহকালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টকে উপহার দিতে বাবার জন্যে? অভিজাতীয়ের এই অবিশ্বাসের হাসিকে দোষ দিয়ে তুষার কিসের জোরে? তুষারের নিজেরই যে বিশ্বাস হচ্ছে না।...তুষার যে বারবার সেই অদ্ভুত ভাক্তারকে ফোন ফোন করে ঘুরিয়ে দেখছে।

কবে শেষ কথাটা বলে ফেলেছিল তুষার? ওর সুবোধ তুষার মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, 'ওই সব বাজা-ঠাকুর পাঁড়ুরবুড়ুদের কথা ছাড়া যাকে বড় মানুষের অপঘাতের মড়ক শ্রেণীছাড়া, সেই ওনারের ফ্রেন্ড, তাই থেকেই সাদাই করেন বড় ডাক্তারী চিকিৎসের।...কুরুক্ষেত্রের বাপ হতে পারব না বাবা আমি, বলে দিলাম সাফ কথা।' আর ওই সাফ কথার পর কবে থেকে তারা এক শয্যায় দুই শত্রু পক্ষের মত বাস করছে? ভাবতে ভাবতে আর পিছু হটতে হটতে যে ঘরে ঢোকে বসছে তুষার।

সুবোধা! সুবোধা! এই কি তা হলে তোমার এতদিনের জমানো রাগের প্রতিশোধ নেওয়া? না এ শুধু ভালোর হিতেতা। আশ্চর্য! আর কয়েকটা দিন মাত্র আগে তুমি তোমার মুঠো করা হাতখানা খুললে না কেন? তাতে তোমার কী লোকসান ছিল?

শুধু যদি সুবোধা জেনে যেত যদি গরবে গৌরবে বলতে পেত তুষার, 'খুব তো আমার সেবাযত্নকে ছ্যাবলামা করা, এখন দেখলে? তোমার ভাক্তার শুধু আশ্বাস দেওয়া ছাড়া আর কিছু দিতে পেরেছে?'

হঠাৎ যেন সেই পরম আনন্দের ভুবনে পৌঁছে যায় তুষার।...এই আলো নিভোনো ঘরটা যেন আলোয় ভরে যায়।

...সুবোধার যা দুর্বলতার স্বভাব, প্রথমটা বিশ্বাস করে না বলে, 'এটা বোধ হয় তোমার প্রোপাগান্ডা। ওই সব টিল বাঁধার মামাবা প্রচার করতে—'

তুষার হেসে ওর পিঠে মৃদু মার একটা কিল বসিয়ে বলে, 'মিথ্যে প্রচার করে ক দিন গৌরব দেখাব?'

সুবোধা বলে, 'ব দিন পারো।'

তারপর আস্তে কিল খেয়ে বলে, 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা, বিশ্বাস করলাম। আচ্ছাই তুমি সন্তান জননী হয়ে ঘর আলো করে বিরাজ করবে। কিন্তু বাবা যোগেন আনা ফ্রেন্ডটিই ছিল পার্টনারের? এ হতভাগার খোঁজ পেলাই নেই?'

তুষার ওর মুখের কথাগুলো পরপর হাতে পেয়ে যাচ্ছে, পেয়ে যাচ্ছে ওর ভঙ্গী, ওর হাসির সুর, ওর কথার সুর।...

...তুষারের চোখের সামনে পড়ন্ত বেলার সাদাটে গাছের সারির আলপনা আঁকা পাঁচিলের ছবি। তুষারের অনুপস্থিতিতে নতুন নতুন শাড়ির খসখস শব্দ।...তুষারের কানে বাজে ছোড়া শাঁখের ধ্বনিপ্রতিধ্বনি।...তুষার একটা আহ্লাদ অবলম্বনের মতো শুনতে পায় একটি কৌতুক ভরা উজ্জ্বল কণ্ঠ, 'এ হে-হে। ছেলে! আমি যে কত আশা করে বসে আছি একটা মেয়ে হবে। বুড়ো বয়েসে মা আছি পার বলে—'

...অনেকগুলা মেয়েলি কলকণ্ঠের হাসিধ্বনি শুনতে পায় তুষার।... 'এমা! এ কী ঔরেক্ট সাব! এতবছর পরে বুড়ো বয়েসে একটা ছেলে হল, দু হাত তুলে নেওয়া কর, তা নয় মেয়ে হল না কেন বলে আক্ষেপ!'

—'আহা-হা বুঝছিস না, সবের আক্ষেপ! বৌদিকে জানিস না! জানে তো এখন বৌদি শোধ নিতে পারবে না।'

আবার হাসির শব্দ শুনতে পায় তুষার মেয়ে গলায়। কিন্তু একি! হাসির শব্দ এমন বাসে বাজছে কেন? সেই উজ্জ্বল উছল খোলা হাসি তো নয় এ!...এ হাসি যে তীব্র, তীক্ষ্ণ, সন্দেহে নীল চাপা চাপা।...

...ওই চাপা হাসি তিক্ত স্বরে ছিটকে ছিটকে উঠছে, হুঁ! বাচ্চাদত্তে হাইকোর্ট দেখাতে এসেছে!...এতকাল ছেলে ভাগ্যেকাল ছেলে আর কেই না মানুষ বাড়ির বাইরে পা বাড়াল, অমনি ঝিল্লিরি—...সুবোধা যদি স্নেহাই রামবুদ্ধু হয়, অবই বিশ্বাস করবে।...তার মানে মহারানী নিজে কিছু নয়, ওই যে বলে বেঙ্গল জ্যোতিষীতে হাত দেখে বলেছে, 'সবসুলক্ষণা' 'বখালাদারী হাত নয় এ,' সেটাই মনে মেখে রেখেছিল। হঠাৎ সুবোধ পেরে—'

...হাসি থেমে গেছে। শুধু তুষার বাণী, 'সলায় ধাড়! গলায় ধাড়! চরিত্রকে বলিহারী যাই! অক্ষরতো কম হল না। ছেলেপুলে নেই এমন মেয়েদেরকে কি দেখনি চোখে?... পাঁচজনের মতো পরের ছেলে মানুষ করেই জীবন কাটিয়ে দেয়।...এই তো অনুকে—'

...বৈধ সন্তান গর্ভে নিয়েও যে নিজেই তুষার অস্তিত্বের জননীর মত লাগছে খাকে হচ্ছে...

...সুবোধা, সুবোধা! কেউ বিশ্বাস করবে না। করতে পারেও না, তারপর সবাই দেখেছে ইদানীং তোমার সঙ্গে আমার আচরণে মিটিমিটি, আমাদের মধ্যেকার সব মাধুর্য অন্তর্হিত, সব আনন্দ তিক্তীভূত। আমি একটা অন্য নেশার পিছনে ছুটেছি, আর তুমি তোমার অবিচল আসনে বসে বসে আমার ব্যর্থতার চিল কুড়ুচ্ছ। না, এ জিনিস কারো অবিদিত থাকে না। প্রথম আর প্রথম অঙ্কের পরদা বাতাসে ওড়ে। অতএব সে খবর সকলের জানা হয়ে গিয়েছিল। এখন যে আমি মরে যাচ্ছি, তত মন্দ কথা বলেছি তোমায় আমি, তা পরক্ষণে হয়ে আমার কাছেই ফিরে আসছে, এ খবর বাতাসে রটেছে না। এর আর কোনো সাক্ষী নেই অন্তর্যামী ছাড়া।

কিন্তু—

কেবলই লোকের কথা ভাবছি আমি, তোমার কথা ভাবছি না, কেন? তুমি কি বলবে?...জানি তুমি কি বলবে।...জানি তুমি কী বলবে। জানি তুমি...জানি জানি...

তুমি বলবে, 'কী যে তুষারবালা, অবোধ অজ্ঞ সুবোধা যাদের 'অন্তর্যামী' তাদেরকে লুকে নিলে? প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতেই কাজ সেরে ফেললে? বেশ, বেশ। তা কী জুটল তোমার? ইন্দ্র চন্দ্র বহুণ পবন-দের কেউ?'...

তারপর হয়ত বলবে, 'আচ্ছা, তবে তোমরা মায়ে-পুত্রে থাক এখানে, আমি চললাম, আমি এখন এখেনে অপাংক্তেয়—'

তখন কি তুষার তর্ক করতে বসবে, 'দেখো আর মত দেখতে হয়েছে বলে?

কে বলতে পারে কার মত হবে। যা যার সব ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ নিজের মতও হয়—

—'বাবি।'

মায়ের ঠাকুরের আকুল আর শুনতে পেল তুষার, ভেতে ভেঙে হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি।' তোমাই এই-ভাবে ডাকে, একবার—দু' বার,—সবার ফিরে ফিরে বারবার। শুধু আজকে বলেই নয়। সতিত্ব নয়ের একটা দুখো মেয়ে একটা পেড়ো সিগরেটের টুকরোকে উদ্ঘাটিত করেছে বলে নয়, সকার পর এই রকম যেন আছন্ন হয়েই থাকে সে।

তুষার উঠে বসে তাড়াতাড়ি বলল, 'তোমরা খেয়ে নাও যে ঠাকুর আমার খিদে নেই।'

ঠাকুর ধরজার কাছে সরে আসে, বিরস গলায় বলে, 'রোজ রোজ আপনার খিদে নেই? বাবাধাবু ফিরে গিয়ে পর্যন্তই তো খাওয়া খাওয়া বন্ধ চলছে। মা পাজো একবার বসুন এসে—'

তুষার কাতরভাবে বলে, 'একেবারে পারবো না ঠাকুর! তোমরা খাওনে।'

—'আমাদের জন্যেই যেন মরছি!' ঠাকুর বক বক করতে করতে যায়। এ রেটে উপোস দিলে যে বাবাধাবু ফিরে আসা পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে না তা ভাবনা করে যায় সে।

কিন্তু কে চায় টিকে থাকতে? তুষার তো তার আগেই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারলে বেঁচে যায়।

...হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা আনন্দের কিতে মনের এদিক থেকে ওদিকে খেলে গেল...এত ভেবে মরছে কেন তুষার? এত ভয় কেন? আজকের দুপ কি ভয়ের ভয়না হয়ে তার অভয় হাত প্রসারিত করে আসে নেই?

এখনো শুধু চোখে চোখে চোখে ইসারা, এখনো সেই ভয়ঙ্কর বাণী অনুচ্চারিত, আর এখনো তুষারের হাতে পাঁচ পাঁচটা দিন। তুষার সংকল্পে দৃঢ় হয়।

যা নিয়ে তুষারের গৌরব নেই, আনন্দ নেই, সুখ নেই, নিরাপত্তা নেই, তার ভার বয়ে নিয়ে বেড়াবে সে কেন মূঢ়তায়? আগের হিরণ্ময়তায় তুষারকে সারাজীবন মিথ্যা অপরাধের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে? কেন? কী জন্যে? তুষার সেই ভাবনাকে উচিত জবাব দেবে।...মিথ্যা হলেও কলঙ্কের ভার কলঙ্ক ঠিকই করবে। জগৎ সমক্ষে তুষারকে পতিতা করে রাখবে, ছেয়ে করে রাখবে।

তবে?

তবে সে কলঙ্কের ভার সত্যি করে পড়তে না পড়তে ঘুমে ফেলাই তো ঠিক।

পাপ হবে?

তুষার মনকে বোঝায়, এই যে ভয়ঙ্কর ভয়ে মেয়ে চলেছে এই পাপ, ভয়ের পাপ হচ্ছে না?...এরা তুষার ছেলেমানুষী হবে? দুটির পর দুটি সন্তান তুষার। এবং নিশ্চিন্ত নিশ্চাপদে পৌঁছয়, এই একমাত্র পথ তুষারের, লক্ষ্য অন্যান্য ঘুণা আছিলা আর

অপমানের হাত থেকে বাঁচবার।

'বিশ্বাসঘাতক' হয়ে এসে ওদের মুখের উপর উঁচিয়ে জবাব দেবে।... বলেই, বলেই যেতে হবে, হাতে সময় বড় কম।

অথচ, মানুষে যদি একটু, বরাবর হত, যদি একটু ভালবাসতে পারত, একটু সহানুভূতির চোখে দেখত, আর সকলের উপর কথা, যদি মানুষে মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারত!

তা পারবে না। বিশ্বাসের ধন বড় দুর্লভ। টোকা লাগলেই ভেঙে পড়ে।...বিশ্বাসের ঝলমল পাখির পালকের উপর চোখা, একটি ফুৎকারে উড়ে যায়। অথচ এই 'বিশ্বাস'কেই টিঁকিয়ে রাখবার জন্যে প্রাণান্ত সাধনা মানুষের। জানে, দেখে একদিনের দৃষ্টিতে চিরদিনের ভালবাসা মিথ্যা হয়ে যায়, একদিনের অসতর্কতায়, যাজীবনের সাধনা মুহূর্তহীন হয়ে যায়, তবু সেইটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে, আর ভাববে পাকা দলিলের সন্ধান আমার।

তুষার কখনো ভাবেনি, কেউ কোনদিন তাকে অবিশ্বাস করতে পারে, এখন তুষার হঠাৎ দেখল চারিদিকে অবিশ্বাসের ভ্রূকুটি আঁকা মুখ। সে সব মুখ তুষারের নিত্য-পরিচিত চিরজনের।

অতএব তুষার ওদের কাছে নিজের পুরনো আসন রক্ষা করবার আশায় ভয়ঙ্কর একটা পাপ করতে যাবে। ...আর সেই পাপবোধ থেকে মুক্ত হবার জন্যে মুখ দেখাবে, বিজ্ঞান দেখাবে, সভ্যতা দেখাবে। ফলে, আসলে পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই, সমাজই তার নিয়ন্তা।...সমাজে এক সময় যাকে ভয়ঙ্কর পাপ বলে, অন্য সময় তাকে 'পরম পুণ্য' বলে। ...এক সময় 'মৌরীবনে' ছিল স্বর্ণ-বাসের প্রলোভন, এখন বালিকা কলাবাগানে আরাবাসের শাসন।

এইসবই ভাবছিল তুষার। অত ভাবছিল না, এতেই তার চিরদিনের আশ্রয় রক্ষা হবেই, এমন আশা নেই। শুধু বিশ্বাসের জন্যেই নয়, তুষার মার নামের ওই চিরকালের নাক উঁচু মেয়েটা ওই সন্দেহের ছায়লাখা চুরুটি কুটিল মুখগুলোর ওপর এমন একটা খাপছাড় বসিয়ে দিতে চায়, যাতে তাদের সেই মুখগুলো ঝুলে পড়ে, ছোট হয়ে যায়, লজ্জায় লাল হয়ে তাদের বলা হয়, 'ছি ছি আমরা কী ভেবেছিলাম!'

যে চিন্তাই করা যাক, তুষার সংকল্প দৃঢ় হয়। কিন্তু কোথায় যাবে? সভ্য সমাজের আশ্রয়ের ব্যবস্থার পথে? না দুঃখদার মায়ের 'পরিত্রাণ ভবনে'? আশ্রয়ের পথ ধরলে কি খবর চাপা থাকবে? সে তো আরো কলঙ্কিত অবাধ ছাড়া কথা হবে। সে হলে চলবে না, তাহলে চিন্তার মেঘের নাসিং হোমে কী মোক করেছে? নয় নিরুপদ্রবে নীরবে সকলের অলক্ষিতে দুঃখদেশে ওই 'পরিত্রাণ ভবনে' যাওয়াই নিরাপদ।

তুষার নিজের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে করে, এত অল্পে ভয়ের কিছু নেই, পারেও না। কয়েক গ্রাস কফিকাটুকু মাত্র আহার নিজেকে একটি নিভৃত কক্ষে, এমনো তার মতো আর্মান বাঁচবার আকুতি, জীবনের স্পন্দন। নিরবয়ব সেই কফিকাটুকুকে আহার-দান করার উপায় নেই, আর ভয়ও নেই।

ভয় মানে মৃত্যুভয়। যার থেকে লোক জানাজানির ভয়।

আমার কী কপাল! তুষার ভাবে, সত্যিই কেন আমি জন্ম নেয়ে, তাই এমন আতঙ্কের ঘরে বাস করতে হচ্ছে আমায়।...ঘরে সিংহাসন পেতে রেখে যাকে সাধা সাধনা করে ডেকে নিয়ে এলাম, তাকে বলতে দিচ্ছি না, ঘরে ঘরে করে তাড়িয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু কেন?

আমার নিজের মুখ রক্ষার জন্যেই তো? ভিতরে প্রবল ভূমিকম্পের মত একটা আলোড়ন ওঠে।...কে জানতো তুষার এত স্বার্থপর, এত নিষ্ঠুর!

পরিত্রাণ ভবনে ঘিরে ধরেছে উপরন্তু একখানা শাড়ি দুর্লভিল তুষার পুরনো শাড়ির ছাপ ঘুলে। কিন্তু তেমন দামি হবে কই? কিনে তো দিয়েই দেয়, পুরনো শাড়ি আমা...

হঠাৎ ভেবে দুশ্চিন্তিত হল, চুল-গুলো না হয় তেল জবজবে করে টান টান করে বেঁধে যাব, যেমন ভিরোছি তখন বন্ধুদের সামনের কাছে, বড়দের চন্দ্রবাড়ি, ধবধবে দামি ব্লাউজ ওখানে, ভিরোছি চশমা খুলে ঘড়ি আটি খুলে, কানের দুটি পরে, পায়ে হঠাৎ চেনা লোকে চিনে ফেলে, কিন্তু সে তো ভিড়ের মধ্যে দুই হাত পাতা।...

আর এ যে নিজেকে তাদের পাতা হাতে সপে দেওয়া। তারা দেখতে পাবে না, নাকে রুমাল, হাতে ঘড়ির, আর আড়ালে আটির বাস?

তা হলে কী করা?...বাবি সন্দেহ করে?...ঐ এ কী জ্বালা হল তুষারের?...যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুধু তার দিকে তাকিয়ে আছে সন্দেহের চোখ নিয়ে...

সব ছড়িয়ে ফেলে শুয়ে পড়ে তুষার, আর সেই সময় ঠেঁটে করতে করতে ঢোকেন মেজ মা বাবা।

—'কই রে তুষার, আছিস কেমন? সেদিন অমন করে চলে এলি, সেই অবধি আর দেখতে আসতে পারলাম না, মন কেমন করে বাবি। তা ভাল আছিস তো?'

তুষার বলতে যাচ্ছিল 'আছি', কিন্তু স্বপ্ন হয়ে গেল বাবার সঙ্গে দুঃখদার মাকে দেখে।

ও এঁদের সঙ্গে কেন?

দুঃখদার মা অবশ্য স্তব্ধও হয় না, স্তম্ভিতও হয় না। একগাল হেসে বলে, 'দেখে আশ্চর্য হচ্ছ বোধ হয় বৌদিদি? ঘরে শুত হতে আসিনি গো, আসলেই এসেছি।...তুমি তো দিনি দেবে দুঃখ করে ছাড়িয়ে দিলে এ ঘাট ও ঘাট ঘুরে শেষে গেছ বৌদিদির কাছে গিয়ে ফেলে পড়লাম—

তুষার যেন পাথরের গলায় কথা বলে, 'ও বাড়ি তুমি চিনলে কী করে?'

—'ওমা শোন কথা, বলো দিদির যে তে যাইনি তোমাদের সঙ্গে এছে সে কাপড় নে?'

তুষারের চোখে যেন চোখের পলক পড়ে না।

বাবা সে দিকে কটাক্ষপাত করে বলেন, 'তোকে খুব ভালবাসে। বৌদিদি বৌদিদি বলে মরে যায়— চাঁদপুর ঘণ্টা তোর কথা। খুব সুখ্যাতি করে তোর।...আমি আসছি শুনে বলল, 'যাই আপনার সঙ্গে, একবার বাড়িটা দেখে আসি।'

তুষারের মাথার মধ্যে একটা কথাই শুধু ঘানা বোলতার মত একটা যান্ত্রিক সুরের মাত্রা নিয়ে ঘিরে ঘুরপাক খায়, চাঁদপুর ঘণ্টা তোর কথা...চাঁদপুর ঘণ্টা তোর কথা...চাঁদপুর ঘণ্টা! কী সেই কথা? তুষারের মৈনের কথা? দুর্বলতার কথা? বোকামী আর দুর্বলতার কথা? অন্ধ নেশা আর মরিচিকার কথা? সব প্রকাশ করে দিয়েছে এঁদের কাছে?...

কী অদ্ভুত যোগাযোগে এই উপস্থিতি! তার মানে মরেই ভাবো, কিছুই লুকনো থাকে না।...হয়তো দেখা যাবে 'পরিত্রাণ ভবনের' সেই ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ আলাপ ভাব উঠে কিম্বা লতিকার।

বাবা পাশি বলছেন, 'কলকিছ তো ভাল আছিস। আমি তো ভাল দেখছি না। চোখের কোলে কালি, গালের হাড় উঁচু, খুব ক্যাবাসে।'

তুষার পাথরের কাঠিন্য থেকে মুক্ত হতে হঠাৎ খুব হেসে ওঠে, 'বাবা দেখছি, আর কী কী দেখছেন? চেহারা বর্ণনায় আপনি দেখছি কার্ভ ক্লাস কার্ভ।'

দেখা যাক এইভাবে ক' দিন চালানো যায়।

'পরিত্রাণ ভবনে' চলবে না। চলবে তেবেছিল বলেই নিজের উপর ঘৃণা আসছে।

যাবার সময় হলে যান বাবাপাশি, ওকা একা থাকিস, বাদলে ঠাকুরের মুখে শুনলাম, কিছুই না কি খাস না, 'বিছানা' অন্ন জল তাগ? তা একেবারে মেয়ে মুখে বাবি ভাল না লাগে, কল আমার, কি ভাল লাগবে? লজ্জা করিস না। নিজে হাতে রেঁধে পাঠিয়ে দেব।' তুষার একটু কঠিন হয়ে বলে, 'বাদলে ঠাকুরের হাতে তো আমি ও সবোরে এসে পর্যন্তই খাচ্ছি দেখছি, একদিনের বলতো খারাপ লাগেনি কখনো। হঠাৎ একদিনেই বা লাগতে যাবে কেন?'

বাবাপাশি এই মুখোমুখির সামনে একটু অপ্রস্তুত বোধ করেন, 'না তাই বলছি, ঠাকুরপো নেই, হয়তো ভালমন্দ কিছু রাঁধতেই দিচ্ছিল না।'

তুষার দৃঢ়ভাবে বলে, 'আমি তো কোনো কিনই রাঁধতে দিই না দেখছি। ঠাকুরই চিরকাল দেখে। ওর যাবার বাড়ি নেই বলে যে বৌদিকে যা করে না তা ভাববেন না।'

—'ওঃ! তাহলে তো ভাল,' বলে উঠে পড়েন বাবাপাশি, বলেন, 'ও দুঃখদার মা—'

দুঃখদার মা অবলীলায় বলে, 'যাই! ডাক্তারবাবুরও যাবার সময় হয়ে এলো।'

ডাক্তারবাবু?...তুষার যেন কথার অর্থ বুঝতে পারে না।

—'ওমা এত এমন হেসে উঠে কেন বৌদিদি। যাবাবাবু তো বন্ধুকে বলে মেয়ে দেখা ঘরে নিয়ে। তা এলে তো এই সন্ধ্যের দিকেই আসে, তাই বলছি।'

ওরা চলে যাবার পর তুষার ভাবে কত টাকা কত কাপড় জামা, কত চল প্রসাধনী, কত থালা বাসন ভাত ওই মেয়ে মানুষটাকে দিয়েছে তুষার।...তবু সুযোগ পেয়ে গেল। যেতে সাহস করল, কারণ সে সাহস তুষারই জুগিয়েছে; তুষার ওর সঙ্গে সম্পর্কের নেমে দিয়েছে, আপন স্বার্থে!...ও তার দোষ নেবে না? যার কাছেই তোমার দুর্বলতা ধরা পড়ে গেছে, সেই তোমার প্রভু...

পুরনো কাপড়গুলো সমেত ট্রাঙ্কটা ঠেলে রেখে তুষার বালিশের তলা থেকে সুযোগের গচ্ছকালকে লেখা চিঠিটা খুলে ধরে। চিঠিতে উত্তর দিকের মত বিস্তার নেই, খুব ব্যস্ততায় হাপ, ভাঁজ বাস্ত, ভাঁজ খাস, চিঠি না পেলে যেন চিন্তিত না হয় তুষার, তার সে যেন নির্ভয়ে চিঠি দেয়। অনেক দিন চিঠি না পাওয়ায় সে দুশ্চিন্তিত চিন্তিত। এমন হঠকারিতা চিঠি কেন? কেউ কি তাহলে চিঠি লিখে কোনো খবর দিয়েছে তাকে? তাই খুব ভয় পেয়ে গেছে সে? আর এমাট অন্ধকারের মধ্যে একটা তারিখ হারিয়ে?...না কি ততটা সময় একলা পায়নি কেউ? তুষার চিঠি দেয়নি বলেই—

হ্যাঁ, অনেক দিন চিঠি দেওয়া হয়নি। ভাক্তার আসল অভিনয় এই অবস্থাটা দেখে কি দেখে না, দিলে কী করে দেখে, কোন তারার ছবি ফেলে এই অবিশ্বাসের সত্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যাবে, তাই ভাবতে ভাবতে

চিঠি আর লেখা হচ্ছে না।

কাল থেকে অনা সাকসেস হচ্ছে। বিশ্বনন্দুর হয়ে তারপর নিশ্চিন্ত নিভাঁজ মন নিয়ে চিঠি লিখবে!

কিন্তু আজ হল না।...বেরোবার জন্যে একটা সময় ধার করতে হবে তো? একটা বাহানও! যদিও চাকরকেও তো বলে যেতে হবে, কেউ যদি আসে, কেউ যদি ফোন করে, কী উত্তর দিতে হবে। একা থাকার সুখ আছে, একা থাকার বিড়ম্বনাও কম নেই।

পরদিন বেরোবে বলে তোড়জোড় করছে। জানে না কোথায় যাবে, তবু যাচ্ছে, কারণ আর যে সময় নেই, কিন্তু বেরোনো হল না। টুটু এল। এতদিন পরে।

একাই এসেছে, ছেলে ছেরে নিয়ে নয়।

বলল, 'তুমি তো সুখের ওপর ফয়লা বন্ধ করে দিয়েছিলে, তবু প্রাণের টানে না এসে থাকতে পারলাম না।'

তুষার গম্ভীর হাসি হেসে বলল, 'সেই কবে একদিন বলেছিলাম মোমমালে আসা যায়, সেই কথা এতদিন মনে রেখেছিস? তোর তো খুব স্মৃতি শক্তি!'

আশ্চর্য! এতজন মানুষকে অন্তরিত করে দেবার ক্ষমতাটি এবং অভ্যাসটি সমান আছে। কী বুকের পাটা ছেলেমানুষ!

টুটুও অবশ্য ছেলে ধাবার মেয়ে নয়। বলে ওঠে, 'না কথাতেই আছে, যেখানে বাঘা, সেখানে হাত। ভুলতে আর পারা গেল কই? তুমিও তো একবার 'আর' বলে ডাকনি?'

—'তোর বাবা নিজে গিয়ে ডেকেছেন, নেমন্তন্ন করে এসেছেন। জান তো ডাকাতে পাকেন নি।'

টুটু চটপট জবাব দেয় 'ডাইয়ের ডাকে ডাকের হাত, এ তো বাদ্ জানা কথা। তুমি না ডাকলে—'

তুষার নির্নিমেষ চোখে টুটুর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলে, 'এখনো তো ডাকিনি।'

—'ওই হো বললাম, প্রাণের টানে। শুনলাম শরীর খারাপ, সোমন জামাইকের সাথে মেলন্তন্ন দিয়ে—'

—'মর্ড' ফেল করেছিলাম, এই তো?' তুষার সকৌতুকে বলে, 'যাকে দেখছিস এ তার প্রেতাত্মা। কোন দিন হয়তো আর দেখতে পাবি না; উঠে যাব।'

টুটু বলল, 'বালাই ষাট।' তারপর বলল, 'আছ কেমন?'

—'কেমন দেখছিস?'

—'ভাল নয়।'

—'ভালই যদি থাকবো তা হলে আর তোমা যান খুইয়ে আসবি কেন? তা একা কেন? বর কই?'

—'আসছে। কী কিনতে নামল।'

এল তখুনি। এসেই হৈ হৈ করে উঠলো, 'কী ব্যাপার? এত রোগা দেখাচ্ছে কেন?'

তুষার বলল, 'স্বাভাবিক।'

—'শুনলাম খাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।'

—'সেটাও স্বাভাবিক। না ছাড়লেই তোমরা নিশ্চয় রটাতে।'

টুটুর বর হাসি বলে উঠল, 'যাকে কিন্তু আপনি বাদুদ বলে মিস্ট্রেছিলেন। আমার দেখাই করে এসেছেন।'

তুষার হেসে বলল, 'বেটা দেখাসা সেটাও যদিও স্বাভাবিক নয়। বাড়ি গিয়ে বরং কারণ নির্ণয় করো বসে বসে। এখন চা খাও।'

বাড়ি ফেরার সময় পথেই বলল টুটু, 'কেমন দেখলে?'

—'কী জানি বাবা! আমি তো বরং বেশ ভালই দেখলাম।'

—'সেই তো! চিরকালই তো পুরুষ মজালি মেয়ে মানুষ।'

বর বিরক্ত হয়ে বলল, 'আর কি যা তা বল! ছেলে চিনেও কথা বল।'

টুটু সহজে বলল, 'তবে চিনেছি বলেই। রোজ সন্ধ্যে হলেই জানালাটা বন্ধ করে তা জানো!'

পরদিন দুহিন এল। সবাই একবার সবচেয়ে দেখতে আসছে। তুষার যেন চিড়িয়াখানার নতুন জন্তু। আবার হেসে হেসে কথা বলতে হচ্ছে! কারণ এখন তুষার গলাবাজ আত্মীয়, কেউ না ডাকে যেন এই ভয়ে সন্ত্রস্ত। ঘরে ফেললেই পেয়ে বসবে।

দুহিনকে অন্য আর সকলের মত উপেক্ষা করা যায় না। দুহিন বড় প্রাণের জিনিস। চিরকাল 'মেজদি' বলতে অজ্ঞান, পরম ভালবাসার এই ছোট বোনটার সঙ্গে একদিন বড় দুর্ব্যবহার করেছিল। আর করেছিল এক নিরেলা দুই বোনের ঘরে নয়। দু' দুটো পুরুষ মানুষের সামনে। তবু শিশির আপন জনের আসে যায়ে থাকে। দুহিন না কি বলে বেড়িয়েছিল, 'ঘরে ফোনও আর মেজদির বাড়ি যাব না।' তবু এসেছে। বেচে থেকেই এসেছে।

তুষার কি বুঝতে পারে না এই আসার অন্তে দুহিনের ফোতুহলটাই প্রবল? সেই প্রবল কৌতূহলই ওর প্রতিজ্ঞা ভেঙেছে। তবু অনেক দিন পরে ছোট বোনটাকে দেখে মন মমতায় ভরে গেল। দুহিনও টুটুর মতই বলল, 'তুই অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলি, বিশ্বি ভেবেছিলাম আর আসব না, তবু এলাম।'

তুষার শিশিরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তবে তোর ভালবাসারই মহিমা ঘোষিত হল।'

দুহিন শিশিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি পাশের ঘরে বোসোগে না, আমরা দুই বোনে একটু কথা কই।'

তুষার হৈচৈ করে হেসে বলল, 'ওমা সে কি কথা? আমরা কী এমন কুটে রাজনৈতিক কথা বলব যে, কোয়াকে ঘরছাড়া করতে হবে?'

দুহিন অন্যায় ভরে বলল, 'তবে থাকুক সে।'

শিশির বলল, 'না। এত অপমান সয়ে থাকা যায় না।'

উঠে গেল।

তুষার তাকিয়ে দেখে ভাবল পুরুষ জাতটা ভণ্ড। ও থাকলে ভাল হত। দুজন থাকলে শান্তি থাকে।...পুরুষ মানুষ সামনে থাকলে নিশ্চিন্ততা থাকে। মনে হয় যেন পৃষ্ঠপোষক রয়েছে। পুরুষের ভদ্রতা, সভ্যতা, সৌজন্যবোধ এক মেয়ের হাত থেকে আর এক মেয়েকে রক্ষা করে।...ওই সভ্যতার আসনে নিরাবরণ হিংস্রতা লজ্জা পায়। তুষার শিশিরের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। কেমন অসহায়তা অনুভব করল। আর সেই অসহায়তা থেকেই সন্ত্রস্ত হল সাহসে। বলল, 'বল বাবা, কত কী বলবি বল।'

দুহিন বলল, 'তোর সম্পর্কে অনেক রকম কথা শুনতে পাচ্ছি—'

তুষার বলল, 'সবগুলো একসঙ্গে বলার সুবিধে হবে কি, বল একে একে বল।'

—'তোমার তো ওই। সবই উঁচুদরে যাও।'

—'আচ্ছা আর উঁচুতে যাচ্ছি না, এই ঘরে বসে থাকলাম...বল কী কী বলবি।'

—'প্রথম কথা—বল তোর কী হয়েছে?'

তুষার আকাশ থেকে পড়ল, 'ওই দেখো, আমি কী বলবো। তুই-ই তো সব শুনে এসেছিস।'

দুহিন বলল, 'যা শুনেছি তা বিশ্বাস করিনি।'

—'এমনও তো হতে পারে, আমি আরো অবিশ্বাস্য কথা বলছি।'

—'সম্ভব না। বাবু, জামাইবাবু চলে যাওয়ার পর সবাই তোকে নিয়ে হেসে হেসেছে, বলনি কেন?'

—'কেন যাইনি, সে কথা তো তখনই বলেই দিয়েছি। বলিনি তোকে?'

—'তখন যা বলেছ সেটাই অবিশ্বাস্য। তারা বলেছে তুই না কি বাড়ি আগলাতে—'

—'সেটা এমন কি অবিশ্বাস্য? বাড়ি আগলানোর দরকার নেই?'

দুহিন ওর কাঁধটা খামচে ধরে বলল, 'তুই একা বাড়িতে পড়ে বাড়ি আগলাবি, তোকে আগলাবে কে?'

তুষার হাই তুলে বলল, 'আমি বড় খুব নই—'

দুহিন চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা সাজিমনি মেজদি। ছেলে মানুষ যায় দুধের বাচ্চা জানিস না বুঝি?'

—'জানি কিন্তু মানি না। যাক্ অনেক রকমের এক রকমটাইতো মাঝ হল, আর?'

—'আর! আর!' হঠাৎ যেন অভিযোগগুলো নিজের কাছেই হালকা লাগে দুহিনের। তবু বলে, 'তোর কিটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছিস কেন?'

—'কী? কী বললি? কিটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি কেন?' হঠাৎ খুব জোরে হেসে ওঠে তুষার, 'এই তোর অভিযোগ? কি ইউনিয়নের পাণ্ডা হয়েছিস না কি আজকাল? একটা কি চাকরকে ছাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটবে না সংসারে? হি হি হি—'

পাশের ঘর থেকে শিশিরের গলা শোনা যায়—খুব 'অন্ত্রিভেন্ট্রিশিয়াল' কথা হচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না?'

—'হচ্ছে।' দুহিন বলে, 'তোমার অমনি টনক নড়ছে...তোকেও যদি মেরেছি, এত হাসির কিছু নেই।... বাড়িতে খুনসুটো বেটাছেলে—ঠাকুর, চাকর, একটা মেয়েছেলে ছিল—'

তুষার গম্ভীর ভাবে বলে, 'এত ছোট কথা বলিস দুহিন! আর যদি কিছু থাকে তো বল।'

'ছোট কথার উদ্রেকে ছেলে যায় দুহিন, বলে, 'ঠিক আছে, আমার আর কিছু বলার নেই। এরপর যদি বলি, জামাইবাবু বিদেশে, তবু জামাইবাবুর ওই ডাক্তার বন্ধুটা রোজ রোজ আসে কেন, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তুই বোধ হয় আমায় কেটো কেমো খুনের পোকার মলে ফেলবি। চললাম।'

তুষার বলল, 'চললাম' মানে? ঠাকুর তোমের জন্যে খাবার করছে, খেলেই হল?'

দুহিন রাগ রাগ গলায় বলল, 'নাঃ আর বসব না।' তুষার একটু বিচিত্র হাসি হেসে বলল, 'কেন? মেজদির বাড়ি থেকে ভাত খাবে ভাত খাবে মনে হচ্ছে?'

দুহিন এই বিচিত্র হাসির সামনে একটু বিমূঢ় হয়ে যায়। বলে, 'সে কথা বলতে যাচ্ছি না আমি।'

—'বলছিস না তো? শুনে বাঁচলাম, বলতেই হবে তবে, তোর শরীরে বড় মায়া আছে। ও শিশির, আমাদের খোপন মৈত্রক শেষ হয়েছে, চলে আসতে পারো।'

—'শেষ হয়েছে! বাঁচা গেল!' বলে এ ঘরে এসে বসে শিশির।

তুষার বলে, 'দেখো বাবু, মিমাংসার চেষ্টাচরিত্র পড়ে চটপট চলে যেও না, ঠাকুর তিনের জামনা চড়িয়েছে লুচি ভাজছে।' ... বিনিময়টা শিশিরের বিদ্রূপ ছিল।

শিশির আড়চোখে স্ত্রীর বেতার মুখের দিকে তাকিয়েও উদ্বেলিত

গলায় বলে, 'ডিমের ডালনা? গরম লুচি? ফেলে চলে যাব? স্যার প্রয়োচনায়? ফেলেছেন! স্যার প্রয়োচনায় বরং লোকের ঘরে আগুন দিয়ে আসতে পারি, কিন্তু এ ছেলে ফেলে যেতে পারি না।' তুষার এই নির্মল মন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে স্নেহে বিগলিত হয়।

অথচ 'ছেলেটা' তুষারের থেকে বড় এক বছরের বড়ই। স্বভাব গুণে 'ছেলেটাই' ডাকে তুষার। ছেলে বলে, 'আরো আছে, চমৎকার প্রকাশ!'

...এইভাবেই চালিয়ে চলেছে তুষার। কিন্তু আর কতদিন চালাবে? সর্বদা মনে হচ্ছে, সংসার যেন তুষার নামের ছেলেটাকে কিছুতেই স্নেহে না ফেলে ছাড়বে না। তাই দুঃশাসনের হাত থেকে ছেলেটাকে প্রকাশ্য সভায় অনাবৃত করতে চাইছে, উরুঘাটিত করতে চাইছে, আপন নিষ্ঠুরতায় বসে সে দিন রাত্রির জপমালা গুণে গুণে একটি পরম লগ্নের প্রতীক্ষা করতে পারে না।...ভারস্বরে সবাই বলছে, 'বুঝে ফেলেছি, বুঝে ফেলেছি।' আকাশ বাতাস, আলো মাটি সবাই বলছে 'বুঝে ফেলেছি।' অতএব তুষারকে মন্দিরের দ্বিতীয় বিসর্জন দিয়ে সোচ্চারে বলে উঠতে হবে, 'কিছুই বোঝেনি। দেখো কোথায় কী?'

পাঁচদিন পরে মায়ের কাছে যাওয়া হল না তুষারের। মা হঠাৎ সর্দি পেয়ে সাতদিনের জন্যে পুরী চলে গেছেন। বলে গেছেন, 'আমি ফিরলে আসিস।' খবরটা দিয়ে গেল বিভাস।

তুষার যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচল, আরো সাতটা দিন হাতে পাওয়া গেল।

কিন্তু হাতে পেয়ে কাজে লাগাতে পারল কই? খড় সংকল্পের মূল শিথিল হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।.....প্রথমই মনে হয়েছে 'অসম্ভব!...এমন ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছে, কী করে ও কথা ভেবেছিলাম আমি! অমন নির্লজ্জ অমানবিক কথা! আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম?...আমি 'পরিত্রাণ তারণ' বাবার জন্যে ছেড়া শাড়ি খুঁজছিলাম! ছি ছি!...যত ভাবছে লজ্জার বিষয়ের দীর্ঘ বিবরণ হচ্ছে। তুষার নামের চির ঔদাসিক ছেলেটা। আমার প্রতিষ্ঠা করার রাখবার জন্যে আমি এত করতে উদ্যত হয়েছিলাম! ...অথচ এই নিয়ে একবার আমি তর্ক করেছি। তর্ক করেছি ডাক্তার বোসের সঙ্গে।...মাঝে মাঝেই সে এক একটা সিন্দুর খোঁজ নিয়ে আসতো সুবোধদার কাছে, যদি তুষারকে রাজী করাতে পারে।...হয়েছিল চমৎকার সুন্দর একটি মেয়ে, মা মারা গেছে, বাবা নিয়ে যেতে চাইছে না। বিলিয়ে দিতে চাইছে, বাড়িতে কেউ নেই। তুষার চমকে উঠেছিল। 'বাবা নিয়ে যেতে চাইছে না, বিলিয়ে দিতে চাইছে নিজের জলজ্যান্ত একটা সন্তানকে? বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল তার। তাদের বলেছিল, বাবা বলেই বলতে পারছে, মা হলে পারত না।'

চিন্ময় বলেছিল, মাও পারতে পারে, মিসেস রায়'

তুষার তর্ক তুলেছিল, 'কক্ষনো না! না হলে এমন কথা বলতেই পারত না।'

চিন্ময় বলেছিল, 'আসলে মানুষ জাতটা বড় স্বার্থপর মিসেস রায়, নিজের অদৃষ্টবিধে ঘটনার ওপর পায়ে এমন ভাব নেই। আমাদের কাছে এমন অনেক ভয়াবহ ঘটনার ইতিহাস আছে যা শুনলে মূর্ছা যাবেন। অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে কী করে মা?' তুষার জিদের গলায় বলেছিল, 'সে নিজে করে না, সমাজের ভয়ে করতে বাধ্য হয়।'

চিন্ময় উঁচিয়ে দিয়েছিল সে কথা। বলেছিল, 'এর আবার বাধা হওয়া-হয়ি কী? ভয়টা কিসের ভেবে দেখুন! ভয় নিজের নিজে জন্মেছে, ভয় নিজের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবার, ভয় জীবনে অদৃষ্টবিধে ঘটনার।'

...আমিও তাই করতে যাচ্ছিলাম। তবু অবৈধ নয়। অকারণ ভয়ে আমি উন্মাদের মত আচরণ করতে যাচ্ছিলাম।...সে ভয়, ঠিক বলেছিল চিন্ময়, সে ভয় নিজের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়। কী ভুল সেই প্রতিষ্ঠা! ...সময় আমার রক্ষা করেছে।...আর আমি ভয়ের শিকার হব না, সত্যকে প্রকাশ করব। লোকের ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করবে, না হলে করবে না।

শুধু সুযোগ যদি—

হোক তাই। সুযোগের অধিষ্ঠাতার দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যাব, আমার ছেলেকে নিয়ে চলে যাব, দূরদূরান্তরে, লোকের বাড়ি চাকরী করে খাওয়াবো তাকে। শত দুঃখ সইব।

তুষার রায় নামের মেয়েটার মনে হলো তখন ভিতরে শুধু একটি সিন্দুই জন্ম নিচ্ছে না, জন্ম নিচ্ছে একটি মা।

...দিনে দিনে, তিলে তিলে, তারপর মুহূর্তে মুহূর্তে...

সাতদিন পরে মায়ের কাছে গেল তুষার।

বাবাকে প্রণাম করতে, তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'অবে আসছে যে?'

মাকে প্রণাম করতে, মা তাড়াতাড়ি একটু আশ্রমান এগিয়ে দিলেন। অলক্ষিতে একটু হাসি ফুটে উঠল তুষারের মুখে, মা বোন হয় ছেলেকে কথঞ্চিৎ বিমুখ করে নিতে চান।

শরশয্যা

এর আগে কখনো পুরী যাননি সুরমা, তাই তার কল্পনার বিস্ময় জাগা এবং বিস্ময়ে উদ্ভাসন। শুনতে শুনতে মনটা চলে যায় তুষারের সেখানে, ঘুরে বেড়ায় সমুদ্রের তীরে তীরে উদাস একটা মানুষের সঙ্গে।...

তুষার কি চিরকালের মত স্বর্গ-ভ্রষ্ট হয়ে গেছে?

তুষার স্বপ্ন দেখে, সেই উদাস মানুষটা একা জল, সমুদ্রের ঢেউ খেতে এগিয়ে এগিয়ে যাবার জো নেই, কোনো ঝুরুট ঝামেলা নিশ্চয়! ...বড় আর ছোট। এক হাঁটুর দুখানা ঘুড়ি।...

সেই এক হাঁটুর ছোট্ট ঘুড়িটা কল্পনা করতে চেষ্টা করে, আরতে আনতে পারে না। আর একটা ভয় বুকের ভিতরটা খামচে ধরে। যদি কেবলমাত্র মায়ের মতই দেখতে হয় সে? হে ভগবান, বাজার চেহারা নিয়ে তার মত দেখতে হয়েছে, বলে তর্ক করতে চায় না তুষার, মায়ের দাবি একেবারে নিরেট হয়ে ছেড়ে দেবে। ও শুধু একজনের মতই দেখতে হোক।...প্রতিনিয়ত সেই প্রার্থনাই করতে থাকে তুষার, ও যেন শুধু একজনের মতই দেখতে হয়।

খেতে বসাই বিপদ এই সময়ই যত প্রশ্নবাণ এসে বিদ্ধ করে।

সুরমা বেয়ারার গলায় বলেছেন, 'কিছুই তো খেলি না প্রায়।'

তুষার একটু হেসে বলে, 'তবু তো তোমার হাতের রান্না খেলাম একটু।'

—তাই, ঠোঁটেরার এই হাল হয়েছে—' কথা টানেন সুরমা, সেই অবকাশে লতিকা বলে ওঠে, 'আপনাকে বলিনি মা, মেজদিকে আর চেনা যায় না!'

—তা এমন হচ্ছেই বা কেন!' সুরমার স্বর নীরস। 'ডাক্তার কী বলছে?'

—ডাক্তার!' তুষার অবাক গলায় বলে, 'ডাক্তার আবার কী বলবে?'

—তা রোজ আসে যায়, একটু দেখতেই পারিস।'

তুষারের মনে আঙুলের খোলা ছুটোছুটি করে, তবু তুষার সে কল নিয়ে লোকালুকি করে না, শান্ত গলায় বলে, 'ডাক্তার আসে যায় তার কর্তব্য করতে, রোগ দেখাশোনা করতে, আমি তাকে বলতে যাব, 'দেখতে পারছি না, শুনতে পারছি না, ওষুধ দিন!' কি যে বল মা!'

সুরমা আরো বিরক্ত গলায় বলেন, 'তা এমনটা হচ্ছে কেন, সেটা তো জানতে হবে।'

তুষার যায় মুখের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকায়। সেই তার সর্বজনশ্রদ্ধাসিক্ত বড়কে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে, তার বিচিত্র কুঞ্চন একটু, হাসি হেসে বলে, 'এ সময় তো এ রকমই হয় মা!

এতে অস্থির হবার কী আছে?'

হঠাৎ দুটো মানুষের সামনে যেন একটা বেলা পড়ে।...

সুরমা চমকিত হন, লজ্জিত। 'এ সময়! কী সময়!...ও মা, এ যে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি! কী লজ্জা! কী সাহস! হায় মানে বুকের পাটা দেখছ কিরে বাঁধানো। কিন্তু সুরমা কেন এত চালে কাত হচ্ছেন? সুরমা অবোধের গলায় বলেন, 'এ সময় মানে?'

দুবার থালা ছেড়ে উঠে পড়ে বলে, 'এও যদি তোমায় মানে বোঝাতে হয় মা, তা হলে তো খেলায়...দেখছ তো জীবন ছেলে।'

চলে যায় দালান ছেড়ে। শাশুড়ী যে কেউ জামুর মুখের দিকে তাকাতে পারেন না।

অন্যে কখনো পান খেতে না চাওয়ায়, এখন পানটাই খেতে ইচ্ছে হয় সব সময়। কিনে আনতে দিয়েছিল, সে এসে হাতে দিয়ে বলে, 'কী দাম হয়েছে সো দিলিনি, একোটা দিলি বুড়ি পয়সা।'

দুবার হেসে বলে, 'তা সবেরই দাম বেড়েছে, এর বাদ্দরে না? পানের বুঝি দাম নেই?'

পানের ঘরে সুরমা এই হাসির শব্দে খেতে ভুলে যান।

পানের কোলটা ঠিকে ফেলে দিতে দিতে দুবার মনে মনে বলে, 'যা জন্মে কখনো ছিল না, তাই হয়েছে অভাব। ...কে এসেছিস তুই? একটা পান খেলো বুড়ো, না দোক্তা চিবোনো মিন্সে? যেই হেসে বাদ্ বোঁচ্ কর্তে থাকিস, জানিস তো তোর দাঁত এখন ছেলেটার কাঁচা দাঁতের ওপর কাঁচা!...কল করে জন্ম কিছু হয়ে বসলি, আর এক সন্দেহ এসে কামড়ে ধরবে ওদের। ...চাল বাড়াবি, লক্ষ্মী সোনা থাকবি, তাকে বেশী টাকল দিবি না, আর না ঠিক যাবার ঘর দেখতে হবি। অধিকন্তু। বুঝতে পারছিস?'

যতক্ষণ না ভূমিষ্ঠ হবে, জানা যাবে না ছেলে কি মেয়ে! এ কি অদ্ভুত নিয়ম সৃষ্টিকর্তার? বোঝা যাবে না, কোন্ চুপ্পুটে নিয়ে থাকবো! থাকলে, তুই যেই হোন্ ছেলে কি মেয়ে, তোর সঙ্গে আমি গল্প করবো। তোর বাবার গল্প তার সঙ্গে কবি বল?...কল তো কবে আসবে? আমার যেন তর করছে ও অনেক দেরী করবে। কেন এরকম হচ্ছে বলতো?

সুরমাও খেয়ে উঠে পান মুখে দিয়ে এঘরে এসে বসলেন। মেওয়াল তোলা প্রশ্ন করলেন, 'পানে যদি রুচি, তা বৌমাকে বলেই তো হতো। কেনা পান খাওয়ার দরকার কী?'

দুবার হেসে বলে, 'দরকার কিছু না, কিনে খাওয়াই অভ্যেস তো? সেটাই মনে এসেছে।'

—হুঁ।'

সুরমা উঠে দিক ফেলে এসেন, বললেন, কাল থেকে বৌমাই চারটি বেশী করে সাজবে।'

—'আহা শুধু শুধু আবার খাটানো কেন?'

—'ওমা, দুটো পান বেশী সাজবে, তার আবার খাটানো কী?' বললেন সুরমা। কিন্তু দুবার দেখতে পাচ্ছে, ওটা কথার কথা মাত্র। যা জন্য তথায় জানতে আসছেন। দুবার চেয়ে পাচ্ছে সে কেবল্ কথা।...তা বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না দুবারকে, সুরমা একটা হাই তুলে বললেন, 'যাই একটু গড়িয়ে নিই।' বলেই বা করে একটা তারিখের কথা জিজ্ঞেস করে বসলেন।

মুখস্থ তারিখ, উত্তর দিতে দেরী হয় না। কিন্তু শুনতে যেন অনন্ত-কাল দেরী লাগে সুরমার। তারপর বোঝবার বুঝে নিয়েই সন্দেহ সন্দেহ গলায় বলেন, 'তা এতদিন তো কিছু বলিসনি।'

দুবারের নিজস্ব সত্তা ফিরে এসেছে, দুবার নিজস্ব বাকভঙ্গী ফিরে পেয়েছে, তাই দুবার সহজেই বলে, 'নিজে মুখে যে বলতে হবে, তা কী করে বুঝবো বল?...জানি তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে।'

সুরমা যেন মেয়ের ছোটপাঠে হতবাক হয়ে যান। মনে মনে বলেন, পারবে না আবার কেন, দেখেই বুঝতে পেরেছি কিন্তু বিয়ের আঠারো বছর পরে যে কথা পাড়ে কল বলেছে, সেটা বিশ্বাস করতে পারিনি। বিশ্বাস করতে চাইওনি। এখন দেখছি তুমি কি পাহাড় মেয়ে! তবে মুখের কথা সহজে। বলেন, 'পারারই কথা, দুদিনের তো আমি দুদিনেই ধরি, তবে তোমার কথা আলাদা! হবে বলে ভরসা তো ছিল না।'

ভগবানের নাম করেন না অন্তর্যামিনী, তাঁর দয়া টয়ার কথা তোলেন না। বলেন, 'তা যাক্, এ সময় আমার কাছে যখন এসে পড়েছ কী খেতে মন চায় একটু বোলো চটপট। যা পারি করে দেব। জামাই এখনে নেই—'

দুবার খুব হেসে উঠে বলে, 'এ সময় যা উল্টা করা তোমার ডিউটি না তোমার জামাইয়ের ডিউটি, বাবা!'

সুরমা আর হলে পানি না পেয়ে মুখেই চলে যান। এমন মুখের কথা শুনে ভাবেন, সেই থেকে যার করেছি, তবু কিছুই বুঝি না, কিছুই চিনি না। অন্য বাড়ির অন্য কারুর মেয়ে বললেও বলা যায়। এখন সুরমা মেয়ে বললে জামাইকেই কটকটান দাঁড় করান। বলেন, 'এই তুমিই যাবা বড় নজর হলে। মোড়া ছেড়ে তুমি ওকে যত ইচ্ছে আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছো। অত ভয় করতে কিছু রাখোনি। বেপরোয়া বেহুদ্ ওই মেয়েকে তোমার খাতিরেই আমরাও মাথায় করেছি। কিন্তু এখন তো আর ভাল লাগছে না। ভাসানের ধাক্কায় তোকে তুমি তোমার দুবেটী পরিবারকে একলা একটা বাড়িতে ফেলে গেলে, নিজের স্বাধীনতায়, আত্মজনের কাছে ভিক্ষা দিতে জানলে না। আসলাবার মালিক কে, না তোমার বাঁদা এক বন্ধু!' পাহারাদার কে, না দুটো ঠাকুর চাকর। বুদ্ধির বালাই দেখে মরি। আমার হয়েছে পাখের কসাই। যেতে আসতে কাটবে। ...কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, ভয়ই তুমি না পাওনা করো, সরল অবোধ সাজো, লোকে বাঁকা চোখে চাইবেই। কেউ যাদের বাঁচি খায় না।...ঐ মা হওয়ার কী জ্বালা!...ওই মেয়েকে আমায় খাওয়াতে হবে মাখাতে হবে, আদর যত্ন করতে হবে।...

অন্তর্দাহের আগুনে জ্বলতে থাকেন সুরমা।

কিন্তু সুরমার মনের যেন হঠাৎ সব বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। অবাক হয়ে ভেবেছে সে, এত কষ্ট পেলাম এত-দিন, এত ভেবে মলাম, হাতের মুঠো এমন সহজ সমাধান ছিল মেয়ের কাঁরনি? কী আশ্চর্য!

প্রায় চল্লিশ বছরের ঘরজামাই এসে দুবারের এতকালে ছেলেপুলে হবে শুনে, আত্মীয়স্বজন রব ফেলের ভীড় করে দেখতে আসে। দুবার অবাক হয়ে ভেবে সকলের মধ্যেই যেন কী একটা বাধা, অনাবিল আহ্লাদের উচ্ছ্বাস নেই কারো ব্যবহারে। যেমনটা হওয়া উচিত ছিল।

এখন দুবারের অনর্গল কথার সঙ্গী ওই অসহায় মানুষটা।

আরো কিছুদিন আগে আসতে পারলেই যে তার ভাগ্যে কতখানি আদর জুটতো তার ওজন লোনাটে বসে।...বুকভরির গাধা, তাহলে তখন তোর পিসিরা মাসীরা তোর মাকে নিয়ে শশব্যস্ত থাকত, তুই কী খাবি, তুই তোর কী ভাল লাগে? তুই তোর কী শরীর খারাপ হচ্ছে? তুই আর কটা দিন থাক। তুই...তুই, তুই: ...আর এখন? এখন তু-যার!' নিজের কথার জ্বালাতে নিজেই হাসে।

তা সাঁঝা সুরমা যেন 'তুই' শব্দটা জুড়েই দেছেন, দুবারই বলেন।

হঠাৎ হঠাৎ বলেন, 'জামাইয়ের আসবার আর কতদিন আছে দুবার?'

দুবার হিসেব মত একটা তারিখ জানায়।

সুরমা বলেন, 'তাহলে সব সন্দেহ কতদিন থাকা হল?'

উত্তরটা শুনে আবার নিজেই কি হিসেব করতে বসেন মনে মনে, কিন্তু মনের হিসেবটা মুখে ফুটে ওঠে।

হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, 'দুবার তোদের ওই ডাক্তারের ছেলেপুলে কি?'

দুবার বলে, 'হায় হায়, মুলে যা রাখেনা তো হন্ত আর পাল্লা। ছিয়াই করেনি—'

—'কেন, করেনই বা কেন?' সুরমার কণ্ঠে বিস্ময়।...যেন কিতে করেনি এমন লোক তিনি দেখেননি কখনো।

দুবার বলে উঠতে পারত সে কথা, কিন্তু বলল না। বলল, 'ফুরসৎ হয়নি বহুত।'

—'লোকটাকে আমার ভাল লাগে না।' সুরমা অন্যায়সেই এমন কথা বলে বসেন।...দুবার ভাবতেই পারেনা বলা যায়।

হেসে ফেলে বলে, 'কেন লোকটা কী করল?' 'লোক' শব্দটার ওপর একটু বেশী জোর দেয়।

বলে ফেলে বোঝবার সুরমা কিছু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হন, তাই মানেক্ষ করে নেন, 'এমন ফড়ামার্ক চেহারা!'

লম্বা চওড়া চেহারাকে সুরমা ফড়ামার্ক বলেন।

দুবার অবাক হয়ে ভাবে, রাজা ভাঁড়ার ঘরের বাইরে আর যে কোনো চিন্তাধারা আছে তা আগে কখনো জানতাম না। হয়তো সুরমা নিজেও জানতেন না। কিন্তু ধারাটা যেন হঠাৎই সর্পিল পথ নিচ্ছে। ভেবে মানে বার করতে হয়।

—'দুবার, ঠাকুর চাকরের ওপর বাড়ি ফেলে আসা হয়েছে, সর্বস্ব হাওয়া করে দেবে না তো?'

দুবার বলে, 'চাকরটা তো একটা বুদ্ধোপোতা মিন্সে, আর ঠাকুর তিন বছরের পুরনো!'

সুরমা অবজ্ঞার গলায় বলেন, 'বুদ্ধেপা বলে বিশ্বাসিত হবার কিছু নেই মা, 'কিম্বাদ' কথার মানে নেই।'

দুবার গম্ভীর হয়ে বলে, 'তা সেই জন্যেই তো বাড়ি আগলে থাকতে চেয়েছিলাম, তোমরা ব্যস্ত হলে!'

—'ব্যস্ত, তা ব্যস্ত হব না? তুমি ওর পাছিলে, চমকে চমকে উঠছিলে—'

—'সে আমার কী?' দুবার অবাক হয়।

সুরমা বলেন, 'বিশ্বাস তো তাই বলল এসে।'

—'অদ্ভুত!'

এ প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যান সুরমা, 'আচ্ছা, তোদের ওই ঠাকুরটা তোকে 'মা' না বলে 'বৌদি' বলে কেন?'

দুবার সাঁতাই প্রথমটা হাঁ হয়ে যায়। তারপর মুখটা লাল হয়ে ওঠে, ঠাকুর আমায় কী বলে ডাকে, সে চিন্তাটা হঠাৎ তোমার মাথায় এল কেন মা?'

—'এমনি মনে হলো তাই বললাম, তাতে কী হল?'

তুষার বলল, বৌদি আমার বিয়েরও বলে। ঠাকুরের পুনে পুনেই খোয়ছে।...বিয়ে হয়ে গিয়ে শ্বশুর বাড়িতে তো ওই লোকনাথ ঠাকুরকেই দেখেছিলাম। আলাদা হয়ে চলে আসার সময় তোমার জামাই ওটিকে হাতিয়ে এনেছিলেন। ভাবল তো আর এ বাড়ি এসে ফিরী হলে 'মা' ডাকতে পারে না?'

মার জন্যে দুঃখ হয় তুষারের। অকারণ কষ্ট পাচ্ছেন। সন্দেহ ওঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অথচ স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না কাউকে. 'তুই খারাপ হয়ে গেছিস, হয়ে গেছিস, তোকে আমি আর ভালবাসতে পারছি না। মায়ের বাড়া তো আপন নেই,' সেই মায়ের বাড়া কমলেশ, তুষার এক এক সময় ভেবে পাখর হয়ে যায়. সেই মা-ই যদি তাঁর চিরদিনের জানা ছেলেটাকে বিশ্বাস করতে না পারেন তবে সে কেন করবে? সে আমার মায়ের থেকে উনিশ বছর কম দেখেছে।...কিন্তু মায়ের অবিশ্বাস আমার গায়ে লাগছে না, কারণ এখন আর আমি মায়ের অধিকারীর প্রজা নয়, জানি চলে যেতে ইচ্ছে হলেই ভক্তনি চলে যাব। কিন্তু যে আমার রাজা, যার রাজ্যের প্রজা আমি, সে অবিশ্বাস করলে?...আর করবেই তো? সমস্ত পরিবেশই তো তার অবিশ্বাসের অনুকূলে।...তার আপনজন, আমার আপনজন, সবাই সমান ওজনে উদাসীন হয়ে আছে, তুমি এলে তবে সেই কথাগুলি শোনাবো।...যদিও আমার বিচার হবে।

তার আগেই পালিয়ে গেলে কেমন হয়?...

—'তুষার এই কবিন ছাড়িস তুই, ওই জামাইয়ের কেনো চিঠি পত্তর এল না তো?' তুষারের ভবদত্ত বাবার আড়ষ্ট জামাটাই মা ধুয়োর ছেলে ধরেন।

না, চিঠি আসছে না আর। কতদিন কেন। যতদিন থেকে তুষার কল্পনার ছুটিটে করছে।...শেষ চিঠির উত্তর দেয়নি তুষার। ভেবে পায়নি কি লিখবে। একেনা ভেবে পাচ্ছে না। কেবলই আসছে মনে ওর চিঠি আসুক। আর আকুল হয়ে আসে কারুর না চোখে পড়ে যায়, তুষারের কোনো চিঠি আসছে না বিলাত এয়ার মেলের ছাপ মারা।

বাবার অসুখের রাতে যদি ওর সঙ্গে দেখা না হতো, তা হলেও তো এই রকমই হতো। তার কয়েক ঘণ্টা আগেও তো অলোকিল 'মনের পাল-বই তোমার ছুয়ারে থাকল।'

কিন্তু তারপর তো চিঠি এল উদ্বেগে ভরা লম্বা লম্বা। সে জোয়ারের জল সরে গেল?

সেই বাওয়ার কারণটাও আজও আস্তে আবিষ্কার করে ফেলেছে তুষার।...শেষের সেই চিঠিখানিতেই বিলাতের ঘণ্টা বেজেছিল।

সুযোগার হিংসেরীর অভাব নেই, কেউ না কেউ খবরটা দিয়েছে। আর সুযোগা যুগার ভিয়তায়—

সেই ঘৃণার মুখটা দেখতে পাচ্ছে তুষার। প্রথম যেদিন কিছের সঙ্গে বসে ছেলে বিলেতুরে ফিরেছিল সেদিন সেই মুখ দেখেছিল তুষার।

সেও প্রথম।

তবে? তার আসার আগে পালানো ছাড়া গতি নেই।

মনের জন্যে দুঃখের পাচালী গায় তুষার, তোকে আর তোর বাপের জন্মলোপিলোর গলিতে শোওয়াতে পারলাম না ছে সোনা, পারলাম না মুখোয় চামচে খাওয়াতে। তোর জন্যে তারে ভবে আলবাব আড়ম্বরের ব্যবস্থা হবে না, তুই দুঃখিনী মার দুঃখিনী ছেলে।...মহারাজার সুযো-গ্যপুত্রীর ছেলেরও চিরদিন বিনা অপরাধে দুঃখী হয়ে থাকা, রাজার বৈধ বিবাহের বৈধ সন্তান হয়েও। তার মা ছুটে কুড়োয়, কয়া কাচে। তোর মাও লোকের বাড়ি ছেলে পড়াবে, ইস্কুলে দিদিমনি হবে। তোকে ছিটের জামা পরিয়ে মানুষ করবে। কেন তুই অসময়ে এলি?...তোকে ঠিক সময় আসতে দিইনি বলে এইভাবে শোধ নিলি?...কিন্তু তাতে কি হলো বল? নিজেরই তো কষ্ট হল।'...

মনে মনে কথা করে করে. তুষার কি পাগল হয়ে যাবে?

মনে মনে ছড়া কাটে, 'খুকুকে নিয়ে খুকুর বাবা যাবে কী? বিকেলে বসিয়া চাঁদের মুখে মুখের বাণি বাজাতে হবে না?

তুষার খবরের কাগজ খোলে আর অর্থালির বিজ্ঞাপন দেখে।

দিবিষানি হওয়া যাবে না, কে দেখবে তার খোকাকে? খোকাই বড়া হয়ে আছে। সুযোগা রাতের হাটে যার মুখের হাটি হবে।

অদ্ভুত অদ্ভুত কাজের জন্য দরখাস্ত পাঠায় তুষার। কোথায় কোন্ অনাথ খুকার জন্য সেবাপরায়ণা মহিলা আবশ্যক. কোথায় কোন্ মুমিনীহীন গৃহে মাতৃহীন শিশুর তার গ্রহণ করতে হবে. কোথায় কোন্ অন্ধ খুকুকে বই পড়ে শোনাতে হবে: তারও যা পড়ে এতো!

দরখাস্ত যেত, চিঠিপত্তর বিনিময় হয়, কিন্তু যেই তুষার দেখে. 'এখন একটি অনুবিধে আছে, মাস দুয়েক পর কাজে লাগতে পারে,' সেই আর উত্তর আসে না।...আসবে কেন? তুষারের কি একটা মাথায় আসে না কাজের বিজ্ঞাপন দেয় লোকে. বড় রকমী প্রয়োজনের সময়ে। অপেক্ষা করলে চলে না তাদের।...মাস্তে আস্তে বুঝতে পারে তুষার পালাবার পথ নেই। কোথায় যাবে এই অবস্থা নিয়ে? কে দেবে চাকরী? কে বিশ্বাস করবে 'ভদ্র' বলে?

না: এখন তুষারকে এইভাবে বেঁচে মার খেতে হবে। যতদিন না ওর কর্মফলমুক্তি ঘটবে, ততদিন অপমান সয়ে দাঁড়না খেয়ে, মাথা হেঁট করেও এই সব সংসারে কোনো একখানে মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে হবে। মায়ের কাছে ওর কাছে, যার যাছে হোক। যে এসে তুষারের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে বাঁচাবার জন্যে তুষারকে মরতে হয় মরতে হবে। অসম্মানই তো মৃত্যু, অবহেলাই তো মৃত্যু, অপমৃত্যুই তো মৃত্যু!

তুষারের বাবা পিসিমের হাত থেকে বাড়ির চিঠিপত্তরগুলি নিয়ে দেখে-শুনে তবে ছাড়েন। এ সব চিঠি তাঁর চোখে পড়ে, আর আপন মনে মন্তব্য করেন, এত চিঠি কে দেয়? কোথাকার ডাকের হাল? দেশ বিদেশে বন্ধু জোটানো আছে?.. এইজন্যেই বলে, স্নেহপ্রবণ মেয়ে-মানুষ আদুরের তুলা।

তুষারের এখন কাজ হয়েছে অবিরত মনে মনে বিহারসাল দেওয়া, সুযোগা এসে পড়লে কোথায় থাকবে তুষার কেমন ব্যবহার করবে তার সঙ্গে। এটাও ভাবে, কেমন করবে সে তুষারের সঙ্গে। ছেলেকে কি সে তাকিয়ে দেখবে? কোলে নেবে?

অসম্ভব! অসহ্য জিনিসটা যদি একবার মাথার ঘরে বাসা নেয়, সে কি আর যায়?...

অতএব কর্মখালির বিজ্ঞাপনটা দেখেই চলে।...সুরমা বলেন, 'এত চিঠি কোথা থেকে আসে রে তোর?' তুষার হেসে মেপে বলে, 'দেখছ না তোমার জামাই আমার ব্যাস করেছে। একটা চাকরী বাকরীর জোগাড় না করলে চলবে কেন?'

মা বলেন, 'বালাই ষাট! অলুক্ষুনে কথা আমন বলিস কী করে? আমাই যা করতে যাবে কেন?'

আবার এক সময় হঠাৎ সংসারের কথায় বলেন, 'জামাই তোকে ত্যাগ করেছে, হঠাৎ এমন কথাটা বলে এল কেন তোর তুষার?'

আর পারে না তুষার মাতৃস্নেহের ছত্রতলে আশ্রয় নিয়ে বসে কিন রাত্রিতে পড়া জন্মকালীন মালা খুলতে।...যে নদী রৌদ্রতাপে শুকিয়ে গেছে, তার শুকনো বালির বুকেও বড় অসহনীয়।

সুরমা কুটনো কুটছিলেন, তুষার এসে দাঁড়াল, 'মা, ভাবছি এবার বালিগঞ্জেই চলে যাই।'

মা মনে মনে বলেন, বুঝেছি আর মন টেকছে না। মুখে বলেন, 'কেন? যতদিন না জামাই আসছেন, ততদিন তো থাকাই কথা।'

—'তা এত মাঝেই না হয় দু' চার-দিনের জন্যে ঘুরে আসি।'

সুরমা বললেন, 'যা ভাল বোঝ কর।' পাশে বর! সুরমাও চটিয়ে উঠেছেন। এই ছেলে কোনোদিন এক জায়গায় থাকেনি। এর ভার বড় বেশী।

যাবার জন্যে চুলচুল হাঁজিল, তখনি বেরোবে, এত সুখটুকুও সইল।

তা সুখটুকুই।

কে বলেছিল হরাম চিন্নর ডাক্তারকে এ বাড়িতে আসতে? আর ঠিক এই সময়? বন্ধুর বৌয়ের খবর না পেয়ে এরই মধ্যে ছেড়ে মরেছিল, টেলি-ফোনে খবর নিলে পারতিস। পাশের বাড়ির ফোন নম্বর তো তোরাই আছে। তোমার বন্ধুটিকে এক বেলার জন্যে বৌকে ছেড়ে দেবে সেই ভরসা বেলাই ফোন করতে বলত। তবে বলি তোরই বা এত কী? বরের বন্ধু বৈ তো তার ভাই ভাইপো নয়? খবর ঠিক আছে বলেই খবর পাসনে, নইলে তুই ডাক্তার, তোকে ঠিকই খবর দিত লোকে।

সুরমা মুখ এ মুখের মুখের পাটা ফেরে অবাক হয়ে যান।

চন্দ্র চড়চড় করে কথা, তাকে চা খাবার জন্যে ডাকতে পাঠানোটাই করা হয় কিন্তু প্রসঙ্গ ক্রমে তার অন্নবাসনে বলে কি না, 'বৌমির চা বানানো তো? তাহলে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিতে পারেন। নড়ব পালান।'

এরপর আর কে বলতে বলবে তাকে?

কিন্তু সবটা বুঝতে তখনো বাকি ছিল সুরমার। বুঝলেন, যখন ফোন বলে উঠল, 'ধং ফোনকার! ঠিক এই সময়ই এসে ফেলেন! এরই বলে 'জামাবাদের বোঝা ভগবান বয়।'

—'চলুন আপনার গাড়িতেই চলে যাই।'

চিন্নর অবাক হয়ে বলে, 'কোথায়?'

—'কেন? আমার বাড়িতে! আবার কোথায়?'

—'বাড়িতেই যাবেন?' চিন্নর বলে, 'এ-হে-হে! এমন জানলে আসি? অকারণ এতখানি!'

—'ধরে নিন আমায় নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছিলেন!'

সাঁতাই বেরিয়ে পড়ল।

চিন্নর আগে আগে, তুষারের হাতের সুটকেসটা হাতে নিয়েছে, দু পা পেছনে ছিপে উঠছে গাড়িতে।

শিয়রে তুষার। মা বাপকে এক একটা নমস্কার ঠুকছে এই পর্যন্ত। তাকিয়ে দেখল সুরমা আর তাঁর কর্তা, গৃহকর্তা বটে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই বৃদ্ধ দু হাত উঁচে বললেন, 'যত পাখি উড়ে গেল!'

সুরমা কেপে উঠে বলেন, 'তার মানে?'

—'আহা মানে কেন বুঝছো না? বুঝতে পারলে না আজ থেকে বড়দাদু ছিল। নইলে একই সঙ্গে এ'তও হটোর বাড়ির জন্যে মন কেমন করা, ওঁরও কলকাতার প্রতি লক্ষ উথলে উঠল, একটা ম্যাজিকবাক্তি না কি?...কখন তখন চিঠি! চিঠি চালাচালি হচ্ছিল আর কি?'

সান্ত্বনা বলতে, ওদের ওই 'আকর্ষিকতা' আর মেয়ের প্রতি সন্দেহের ভাব সুরমাকে বেশ বিচলিত করেছিল। এ কথা তাঁর মনেও হচ্ছিল, কিন্তু এমন স্পষ্টাস্পষ্টি শোনার যেন তখন প্রস্তুত ছিলেন। তাই মনকে চোখঠারার ভঙ্গীই বললেন, 'কী যে বিচ্ছিরি এলা কথা' তোমার নিজের মেয়ে না? যা মুখে আসছে—'

সুরমার মুখটা থমথম করছে, চোখে জল আসছে, তবু যেন ওই ভাবেই আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেন।

কর্তা দার্শনিকের গলায় বলেন, 'আমার নিজের মেয়ে বলেই বলছি। পাড়ার লোকের হলে বলতে যেতাম না। মেয়ো—ও তোমার 'দুদু' বাড়ি যায়নি।'

গাড়িতে বসে তুষার বলে, হঠাৎ নিজেকে কী মনে হচ্ছে জানেন? জেলখানার থেকে ছাড়া পাওয়া কয়েদী।'

চিন্ময় বলে, 'তার মানে? ফেরেননে না আর?'

—'আমাদের এই বাড়িটিতে ও সব বিলাসিতার চাল নেই। হঠাৎ দরকার না হলে—'

চিন্ময় অবাক হয়, বলে, 'এ কথা বলছেন? অন্তত ফোন করে তো পাওয়া যায় না।'

—'ফোন করে পাওয়া যায় না?' তুষার ভুরু তুলে বলে, 'ফোন আবার কবে করলেন?'

—'প্রায়ই চেষ্টা করছি, ছেড়ে দিচ্ছি' বলে অপেক্ষা করায়, একটু পরে এসে বলে বাড়ি নেই।'

তুষারের মুখটা লাল হয়ে ওঠে। বুঝতে বাকি থাকে না ওই 'বাড়ি নেই' কথাটার মানে কি! বাবার চিকিৎসার কথা স্মরণ করে একটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

আস্তে বলে, 'খবরটা ভুল পেয়েছেন। বাড়ি সব সময় থেকেছি।'

চিন্ময় গুটিয়ে বসে বলে, 'আচ্ছা! দেখুন তো কার দোষে কে সাজা পায়। আপনি বেরোচ্ছেন না, আর আমি কিনা বলাবলি করতে গেলাম, এ সময় এ তারে ফোনটোন ঠিক নয় বলে।'

এ সময়!.. তুষার যেন নীল হয়ে যায়। ও কী করে জানল এ খবরটা! ওকে তো আমি জানতে দিইনি।

কাপসা কাপসা গলায় বলে, 'এ সময় মানে?'

—'মানে কী আর বোঝাবো আপনাকে মিসেস রায়?' চিন্ময় মৃদু হেসে বলে, 'এ বিষয়ে আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাক, পরোক্ষ তো অনেক আছে! আমার দুঃখ হচ্ছে সে কোত্থার জন্যে। ও'দিকের এমন একটা আমন্ত্রণে সময়েই এখানে থাকলে না।'

তুষার চুপ হয়ে যায়। চিন্ময় বলে, 'আপনি এখানে চলে এসে খুব ভাল করলেন। আপনার বাবার ওখানে থেকে তো আমার দেখাশোনার সুবিধে হয় না। অন্তত সে আমাকে চার দিয়ে খোঁজ আপনাকে দেখা-শোনা করবার।'

তুষার মনে মনে বলে, একটি অবোধ তিনি, আর একটি অবোধ তুমি! ঘাবে লোকের সন্দেহ, সেই ভাবই ফিরে দেখছেন তোমাকে! আস্তে বলে, 'আমার কী হয়েছে যে—'

—'কী বলছেন!'

—'বলছি কী হয়েছে আমার যে দেখাশোনা করতে হবে?'

চিন্ময় হেসে উঠে বলে, আপ করবেন, জানেন তো আমার মুখ আলগা। কি হয়েছে? যা আগে কখনো হয়নি, তাই হয়েছে।'

এসবের এ বিষয়ে আর কিছু বলা চলে না।

গাড়ি চলছে, মাঝে মাঝে চিন্ময়ের কথা চলছে। এক সময় বলে ওঠে, 'সুবোধকে কি চিঠিপত্র লেখা ছেড়ে দিয়েছেন?'

তুষার কী বলবে কথা খুঁজে না পেয়ে বলে, 'বড় ছাড়তে যাব কেন?'

—'বলেন কেন সেইটাই তো আমারই প্রশ্ন!...বাবার বাড়ি গিয়ে মেয়েরা সব ভুলে যায় শুনেছি। তা এখন তো চলে এলেন? ফেলেন চিঠি। রাত আমার যে চিঠি দিয়েছে—হাতে—মানে একটা খবর হয়েছে—' চিন্ময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলে, 'শুনলে আবার আপনি হয়তো আপসেট হয়ে পড়বেন—'

তুষারের চোখের সামনে কতকগুলো হলদে অক্ষরের কুটকি ছড়িয়ে পড়ে। তুষার মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠে, 'কী খবর? আকসিডেন্ট হয়েছে ওর?'

হঠাৎ যেন তাই মনে হয় তুষারের।

—'কী আশ্চর্য! আকসিডেন্ট কেন হবে?'

তুষার এত অস্থির হয়ে উঠল কেন বুঝতে পারে না চিন্ময়। তাড়াতাড়ি বলে, তার অর্থ হচ্ছে সুবোধের ফিরতে আরও একমাস দেরী হবে। কারণ—

—'জানতাম, আমি জানতাম!' তুষার আক্রোশের গলায় বলে, 'জানতাম একদিন এ খবর আসবে। একমাস দুমাস, ছয় মাস হয়ে যাবে, ও আর কোনোদিনই ফেলে ফিরবে না।'

—'আর! আপনি কী বলছেন মিসেস রায়? বাইরে গিয়ে এরকম দেরী হওয়া তো স্বাভাবিক, এতে এতো ভেঙে পড়ছেন কেন?'

—'আমার মন বলছে ডাক্তার ঘোষ, ও আর আসবে না।'

—'আপনার মনকে একটু শক্ত করুন। এ দিকে যদি এতো অস্থির, চিঠি দেন না কেন? দেবেন, সময়ে চিঠিপত্র দেবেন। এইতো ছুটিতে বাবার বাড়ি ঘুরে এলেন, এবার মন দিয়ে টনিক করুন।...তা যাক্, ছিলেন কেমন? মায়ের হাতের পরোটার বড়া, চালতার টক খেয়ে মুখে রুচি ফিরেছে? মেজোদার তো ওই সঙ্গেই রুচি।'

ডাক্তার মানুষ, বিশেষ করে মহিলাদের নিয়েই কাজ কারবার। মুখে কিছু আটকায় না।

কল্যাণী রায়

জানলার বাইরে চোখ রেখে বলে, 'আপনাকে কে ফোনে ডেকে?'

চিন্ময় অপ্রতিভভাবে হেসে ওঠে। 'আচ্ছাকে কি কাউকে ধরে ধরে বলতে হয় মিসেস রায়?'

তারপর কিছু কিছু ডায়রী উল্টেদেখল...এক সময়ে গাড়ির গতি দেখে হয়। তুষারকে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় ডাক্তার।

একদিন পরে আপন ঘরে এসে, ঘরে ঢুকেই বিছানার আয়তে পড়ল তুষার। বুঝেছি, বুঝেছি, ও আর আমার চিঠি দেবে না, আর ফেলে ফিরবে না ও ওর কলুষকে ওর নিজের খবর জানিয়েছে।...নিশ্চয় ওই কথাই লিখেছে। তাই চিন্ময় আমায় বারে-বারে চিঠি লেখার কথা বলল।... তাহলে বোঝাচ্ছে, আমি মান খুইয়ে চিঠি দিলে তার রাগ পড়বে। তার কারণ, ডাক্তার মনে করছে আমাদের মধ্যে একটা সাধারণ মান অভিমানের খেলা চলছে। ডাক্তার কী করে জানবে কোন্ খবর ওর কানে পৌঁছিয়ে একে পাগল করে দিয়েছে।...

আমাকে চলে যেতেই হবে। আমি আমার খোকাকে নিয়ে বিজয়ের

জীবনের মতো থাকতে পারব না।... এত বড় পৃথিবীতে একটা মা ছেলের জায়গা হবে না?

...কতক্ষণ যে সময় চলে গেছে। ঠাকুর এসে চুপি করে, 'বৌদি এলেই শুয়ে পড়লেন, শরীর খারাপ?'

তুষার উঠে বসে। বলে, 'যা মাথাটা ধরেছে।'

—'একলা চলে এলেন? কেউ সঙ্গে আসেনি?'

তুষার এর উত্তর এড়িয়ে যেন, 'তোমরা ভাল আছ?'

ঠাকুর গদগদ স্বরের গলায় বলে, 'আপনি নেই, বাবাবাবু নেই, কী আর ভাল থাকা? তা কী করব আপনার জন্যে? মায়ের কোল? না—' তুষারের কাছে এই মুহূর্তটা যেন অতিরিক্ত বিলাসিতার মত লাগে।

তুষার কি আর এ বাড়ির মালিক সুযোগ্য বধূর আবির্ভাবী পথ আগলে? তাই রজার লোক তুষারের অনুমতি নিয়ে তুষারের পছন্দমত রাখবে?...যে খালা তুষারের মা দিয়ে পৌঁছবে সেই একটা নিরক্ষরের মধ্যে তাকে অবাক দিতে। নয় তারও এত পৌঁছিন বিলাসিতার ভাগ নয়। তাকে জগতের দুর্বলীর মধ্যে মনুষ্যে হতে হবে।

তুষার সহজ গলায় বলে, 'তোমরা যা খাও, তাই খাব ঠাকুর, আলাদা করে কিছু করতে হবে না।' ঠাকুর অবিশ্বাসের গলায় বলে, 'কী যে বলেন বৌদিমণি! আমাদের সঙ্গে ওই মোটা ভাত খাবেন? আচ্ছা আমি মুখে দিচ্ছি।'

তুষার ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবে, এই লোকটা বোধহয় এখনো জানে না, এখনো সন্দেহ করেনি, তাই আমার আগের মত মানা ভঙ্গি করছে। এরপর যখন জানতে পারবে, তখন হয়তো মুখ ফিরিয়ে নেবে। হয় তো আমায় ছেড়ে চলেই যাবে। সেই দিনের কথা ভেবে তুষার এমন অসহায়তা অনুভব করে যে হাতে পা শিথিল হয়ে আসে।

আবার সেই ঘর। যে ঘরের সব-খানিতে শুধু সুযোগ্য। এই ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে তুষারকে! হয়তো এখনি নয়, কিন্তু তুষারের পরিকল্পনাই কি খাটবে? যতদিন না তুষার তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বলটুকু কোলে না পাচ্ছে, পড়েই থাকবে এখানে, অন্যের অবজ্ঞায়। সেটাই কি হবে? সে বাঁধি এসে বলে, 'এখানে কেন? এখানে কেন? না না, এখানে ওসব আবদার চলবে না।'

আস্তে আস্তে উঠে তুষার তার আলমারি থেকে ওর খোকে, বের করে ছোট্ট সুন্দর দুটি শাড়ি জামা আলাদা করে নিয়ে আবার সব চাবিবন্ধ করে রাখে, ছোট একটা সুটকেসে ভরে নেয় সেগুলো, ভরে নেয় ছোটখাটো দরকারি টুকিটাকি। হাতে বাস্কেটের সুটকেসটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে...

কিন্তু ও কি আর আসবে? ফেলে ফিরবে? ঘৃণায় লজ্জায় হয়তো আর আত্মীয় সমাজের সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছে হবে না। অথচ—

তুষারের মধ্যে প্রবল একটা জলোচ্ছ্বাস ওঠে অথচ সবটাই অকারণ। সুযোগ্য রায়ের স্ত্রী সুযোগ্যর যোগ্যই আছে, থাকবে।

আমি আমার কথা ভাবছি। সীতাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তুষার ভাবে, যুগে যুগে কালে কালে নারী এমনিই লাঞ্ছিতা। তার সততার প্রতি সমাজের বিশ্বাসের মূলে এমনি অগ্নিপরীক্ষা। আসলে 'বিশ্বাস' শব্দের কোনো মেরুদণ্ড নেই। জল কলমির মত ও শুধু সূর্যের সোনালো ছড়িয়ে বিরাজ করে, তারের মুঠোয় ছেলে ধরতে গেলেই উঠে আসে সবমূলে...

কিন্তু সীতাদেবীর জন্যে তো বাল্মীকির আশ্রম ছিল, বিদ্যাতার অজস্র আশীর্বাদের মত লব-কুশের ছেলেমানুষি ছিল...আর ছিল, মা বসুমতীর কোল।

তুষারের জন্যে কি আছে?...

...দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, বিলাতি এয়ার মেলের হাল্কা কোনো চিঠি আসছে না তুষারের নামে।...চিন্ময় ডাক্তার ভয় করছে ওজনে বাড়ি ভারি বিভাগে শাইক হয়েছে, তাই চিঠিপত্র আর আসছে না। কিন্তু ওটা ডাক্তারের স্তোক-বাক্য। ও এখনো তুষারকে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের চোখে দেখে, তাই তুষারের ব্যথা উপশমের চেষ্টা—

ডাক বিভাগের সমস্ত বিভাগে এত দীর্ঘদিন ধরে শাইক চলে, ওদেশে? একী বিশ্বাসযোগ্য কথা?...

তুষার এখন আর খবরের কাগজও পড়ে না। শুধু সকাল সকাল কাগজ কিনে ছোট্ট ছোট্ট জামা তৈরী করে বসে বসে। কে জানে তখন কী পরিস্থিতি পড়বে। এগুলো অন্তত তাকে রক্ষা করবে শীত থেকে হিম থেকে।

এভাবেই এমনি চলাই কল চলছে ছোরে ছোরে, কিন্তু এল...এই লোকটাকে, যে স্পষ্ট মুখের উপর বলেও যাচ্ছেনা, তুমি আর এসো না তোমার জন্যেই আমার গায়ে কলঙ্কের ছাপ মারলো লোকে। এ পৃথিবীতে এই তো একমাত্র হিতৈষী বন্ধু তুষারের। মনে মাঝে তো এমন কথাও ভাবে, ওর সাহায্যেই কোনো জীবিকার চেষ্টা করতে হবে। তবু ও এসে দাঁড়ালেই তুষারের বুকটা হিম হয়ে যায়। মনে হয় ঠাকুর চাকর হয়তো হাসছে...

চিন্ময় বলে, 'এখন আবার এত কম চলাফেরা কেন? বেশী করবেন না।'

তুষার হঠাৎ বলে ওঠে, 'আচ্ছা আপনি আমার জন্যে এত ভাবেন কেন? আর তো কেউ—'

চিন্ময় বলে, 'আর কে কি করে জানি না, জানতেও চাই না আমি জানি আমার আবাল্য বন্ধুর শুন্য-পিছনে বন্ধুর স্ত্রী-সুখের ধারির আমার।...যাক্, এতদিনে শাইকের কলাই মিটেছে। এই নিন।...সুযোগ্য বোধহয় ভেবেছে আপনি এখনো আপনার বাপের বাড়িতেই আছেন, তাই আমার ঠিকানায়—আচ্ছা, পড়ুন বসে বসে, তত ক্ষণ চলাফেরা না বেন।'

চলে যায় তাড়াতাড়ি।

তুষার সেই চিঠিখানা হাতে করে বসে থাকে অনেকক্ষণ। খুলতে সাহস হয় না।...কী আছে এতে? চরম পত্র?...ও ফিরে আসার আগেই কেন সীতা নির্বাসিতা হয়?...

কতক্ষণ কেটে গেল।

আস্তে আস্তে মুখ খুলল...

প্রথম লাইনে চোখ মেলল...

হ্যাঁ ঠিক তাই, সন্দেহহীন চিঠি। প্রথমেই ক্ষমা করে চিঠিতে—তুমি যে অপরাধ করেছ, তার শাস্তি এখন আমার হাতে নেই। ফিরে বলবো করব—'

তুষার চিঠিটা কোলে ফেলে রেখে মনে মনে বলে, তোমার আর করতে হবে না। তুষারই করবে। অনেকক্ষণ পরে বাকিটা পড়বার জন্যে চোখের সামনে তুলে ধরে। যা জানার তা হয়ে গেছে, তবু—কঠিন হৃদয়ের পরও থাকে ক্ষমা।

কিন্তু এ কী!

এ কী লিখছে সুযোগ্য!...

এ কোন স্বর্গলোকের ভাষা?...

এ কী সুযোগ্যরই হাতের লেখা?

...না আর কেউ করুণা করে...

নয় সুযোগ্যর ছাড়া আর কার? সুযোগ্য যে এর মধ্যে কথা করে উঠেছে, তার সেই কথার ফাঁকে ফাঁকে তার সেই চিরপরিচিত হাসিমুখের কৌতুকছটা বিলিক দিয়ে উঠছে...

'নয় তোমার দোষের উপযুক্ত শাস্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কী ছেলেমানুষ মহিলা তুমি! এতবড় জগতে সবচেয়ে বিনা অন্যায় শুনতে হল অন্যায়ে চিঠিতে' ছি ছি! কেন? লিখতে লজ্জা করেছে বুঝি? না লিখেও বোঝাতে পারতে। যাক্, এখন রাগ পড়েছে তো? দেখলে তো সবটে দেওয়া হলে...যাক্ তোমো দিয়ে পৌঁছচ্ছি সামনের উনিশ তারিখে। ...ততদিন যেন তুমি তোমাদের সেই জোড়িক বন্ধু জেনের বাড়িতে বসে থেকো না। ফিরে তোমার তোমার হয়ো তোমার সিংহাসনে দেখতে চাই—'

কিন্তু শেষের কথাগুলো কি আর পড়তে পারছে তুষার?...এতদিনের সমস্ত ঝড়ের দুর্যোগান্ধ হয়ে মুখ যাচ্ছে প্রবল বর্ষণে। সেই জলের পর্দা ভেদ করে দেখা যাচ্ছে না কিছু...

শেষ

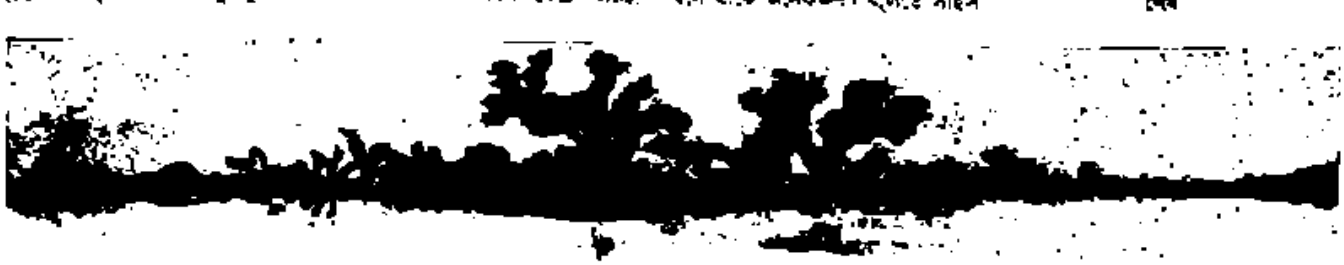

# নিলয় না জানি

॥ এক ॥

তখন বঙ্গ-বাংলার জনপদে লোক-নাট্যের আলকলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি মেলা থেকে মেলায়। মলের লোকে আদর করে মাস্টার বলে ডাকে। কখনও আসরে অকেজো হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে মাঝির ছোকরার গানের সঙ্গে সুর মেলাই। কখনও বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে অজানা শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দিই। আষাঢ় গাঁয়ে শোয়ানরাজা মাস্টার। মাস্টারীর ক খ-ও জানিনে। তবু ওরা বলে মাস্টার। পরম স্নেহে বড় বড় দাঁত মেলে পাচিকের মেয়ে—'খুব বড় হবেন। বি.এ-এম.এ পাস। যা তা কথা নয়।'

এই শুনে আজিমগঞ্জ-নলহাটি লাইনের এক মজুরনেতা স্টেকেলে রেল-যাত্রির কামরায় — যার এক্সিনটা সম্ভবত টমাস আলভা এডিসনের মৃত্যুর বছর ইংরেজ সরকার আমদানি করেছিলেন এবং গায়ে বড় বড় হরফে লেখা ইউ এস এ—নবীবাবু নামে এক পঞ্চাশোত্তর হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন —'তা অত সব পাসটাস দিয়ে এই ছোটলোক ঘাটু-ছুলেদের মধ্যে জুটলেন কী আক্কেলে বলাই?'

এ কামরায় জনপদ্দন ভিড় আছে। গলের জনাতিনে আমার সঙ্গে, বাকিরা অন্য কোন কামরায় উঠেছে। ফাঁকটে খবার ঘাস। দুধরের ঢেউ খেলানো দু দু ফাঁকা মাঠ। তখনও চেনবার তাগিদ্দুর কিংবা আই আর বহরের নামও শোনেনি। মাঠের আকাশ কাটাকুটি করে এগারো হাজার তেরেন্টের বিদ্যুৎবাহী তারগুলোও আসেনি কোন নদীপারকল থেকে। সবে প্রথম যোজনা সুরু হতে চলেছে। দেশের গা থেকে বুনো বছরের বুনো মরলা ফরসা বার ওঠটা যোচেনি। শিক্ষিত আধা-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষে চাপা গলার ধাক্কা ছেলে বিদেশী সরকারের উদ্দেশে বলছে—এবার পাচ্ছলে হয়! যুক্তঃস্থলের হাকডাকা স্ট্রোং ডাক্তার উকিল কেরানীর মুখে অভিশাস এবং দুটু করতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠছে —কী দিনিন ছিল, কী এল! এই নবীবাবুই রেলগাড়ির ওপর তেতো হয়ে ফাজিলেন—'চলতির খুতো বলাই, বুঝলেন? গাড়ি এগোবে সামনে—সামনে থেকে খুতো। ওই দেখুন না, এখনও সিগনাল ডাউন হয়নি।'

এই সব দেখেশুনে আমার হাস হচ্ছিল। যারা লিখছে, ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের সেই প্রচণ্ড সংগ্রাম, কিংবা চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—তারা নির্ঘাৎ বড় ভাবপ্রবণ। বেশির ভাগ লোকই আসলে নিজেদের বাইরেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ছেলেবেলায় বাবাকে দেখতুম ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসভায় বক্তৃতা করছেন এবং একপাশে দাঁড়িয়ে মসিবাবু স্কুলমাস্টার, হরনাথ নায়েব আর নবদ্বীপ ডাক্তার ফিকফিক করে হেসে বলছে, 'ইস্! উকিল—নির্ঘাৎ উকিল! স্বাধীনতার আকলে ফুক্কুং...ফুক্কুং...হিক্ হিক্ হিক্'! আজকাল সেই সব লোক খোঁজ, এত খুতো হয়ে গেছে যে দেখলে মায়া হয়।

—'আ, কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবের ছেলে আপনি?' নবীবাবু একটু খুশিই আরও অবাক হয়ে গেলেন। ভুরু কুচকে আমার মুখটা দেখতে দেখতে বললেন—'আপনার বাবাকে আমি চিনি। চিয়োটি স্টেশনে আমার ডিসপেনসারি ছিল উনিশ সো তিরিশ-বত্রিশে। বক্তৃতার সময় ওঁকে পুলিশ এ্যারেস্ট করল—নিজের চোখে দেখেছি। জেল থেকে ফিরলে আমিও গলায় মালা দিয়েছিলুম। বাবাকে বলবেন। সব মনে আছে।'

একটু চুপ করে থেকে আত্মমগ্ন ভদ্রলোক বিড়ি ধরালেন। খুটো শোলদোই সুতোর ঠোঙিতে ঝিক ঝিক করে হাসলেন।—'কী সর্বনাশ! তাঁর ছেলে আপনি, এই হালের উকিলদের পাল্লায় পড়ে ইহকাল-পরকাল নষ্ট করলেন? ছি ছি ছি! সোজা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। এক্ষুনি।'

জোলার দিক থেকে আওয়াজ এল—'সোজা ঘরে ফেরা কি এত সোজা ডাক্তারবাবু! এখন যে বাঁকা রাস্তার পা। ঘরের ঠিকানা ভুলে গিয়েছেন। এখন উনি রাস্তার মানুষ।'

তাকিয়ে দেখি এক অদ্ভুত মূর্তি। কাঠের তেরাঙ্গে হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে আলপালপিড়ি হয়ে বসে আছে লোকটা। কাঁচ অব্দি কাঁচাপাকা চুল, বড় দাড়ি, তত গোঁফ, খাড়া বাজপাখী নাক, টানাটানা খুটো বিশাল চোখ—কিন্তু তারপর লাল এবং কোটরগত খুব রহস্যময় কিনিক। তার কাঁধে এলোমেলো পড়ে আছে এক-টুকরো লাল ঘরনা কাপড়। খুব্বুদ্ধ, ওটা পাগড়ির মতো বাঁধা ছিল, এখন চুলের ভার ধরে রাখতে খুলেছে। পরে হাজার তালির চিত্রবিচিত্র অন্তো আলখেল্লা। হাঁটু অব্দি ঢাকা। কিন্তু পরে আছে কি না বোঝাই যায় না। গলায় একগুচ্ছের লাল-নীল পাথরের মালা। কোলে একটা হেমনি হাজার তালি কাঁথার ঝোলা, একটা তুম্বকি আর একটা একতারা। পান চিবুচ্ছে। পাতলা খুটো ঠোঁট টুকটুকে লাল। এবং রহস্যময় হাসি।

আমাকে তাকাতে দেখে ডান হাতটা তুলে একবার কপালে ঠেকাল। তার-পর নিজে থেকেই পরিচয় দিল—'জীবনের নাম মরনকাঁদ বাবু। নিবাস ইন্দ্রা-ডাঙ্গা পাড়া। আমরা নদীর পারের। বাবা কি গিয়েছেন কখনও ওদিকে? যাবেন। বড় মধুর জায়গা।'

হুঁ, মারকতী বাউলই বটে। তবিল যাচ্ছে আছে। নবীবাবু ওকে দেখে নিয়ে তক্ষুনি খুশি হয়ে বললেন—'আরে মরনচাঁদ যে! কেমকে আসা হচ্ছে?'

মরনচাঁদ এবার ঠকেও মেলার বিয়ে বলল—'কুইরোকুর মেলায় ঘিরে-ছিলুম ডাক্তারবাবু। ওখনে আবার আমার পুরুতাইয়ের ছেলে। ফোস্তও করেন। দিনকতক নাচলুম-কুদলুম। মেহমানি খেলুম। আজ ভোরবেলা মোরগ জবাই করে পরম-পরম ছাতও খাওয়ালে। এখন ফেরুর ঘুরে গান চিবোচ্ছি।'

কামরার হাসির ঘুম পড়ে গেল। লোকটি আদৌ সন্দেহ নেই। নবী-বাবু বললেন—'ওহে মরনচাঁদ, তোমার সেই মেয়ের বিয়ে দিলে কোথায়?'

এই খুব্বুদ্ধেরও এক্সিনগুলো এত জোরে হুইসল্ দেয় যে কানের পর্দা ফেটে যাবার মাখিল। বাইরের মুখে সেই কিচ্ছু তো বাজতে মিনিট তিনে-চার সময় লেল। ততক্ষণ খুব্বুদ্ধ ফকির দুজনে খুই ঠক্কনী গলিয়ে বাজল। তারপর জেল টানা ঘট্ ঘটর ঘট্ ঘটর্ স্টেকেলে কামরার হাড় ঘটমটানি। ঘাটে বাজপাড়া শিহুলে-গাছে কয়েকটা শকুন বসে আছে। উজ্জ্বল রোদ্দুরে এই ফাঁকা ভুগোল যেন কাঁসার থালা। কনকন করে বাজছে দু হাওয়ার জাপ্টাঝাপ্টিতে।

ফকির বলল—'মাজিনার কথা মনে আছে দেখছি ডাক্তারবাবুর। ছোটতে বড় কিবাঁচিতে ভুগত। শেষ অব্দি ঢোল। আপনার ওষুধ খেয়েই সেরে-ছিল। হুঁ, মাজিনার বিয়ে দিয়েছি ডাক্তারবাবু। এখন দেখলে আর চিনতেই পারবেন না।'

নবীবাবু পাঞ্জাবির ভেতর হাত চুকিয়ে বুড়ি চুলকে বললেন—'ঠিকই বলছ হে। তোমাদের মা ছেড়েছি তা প্রায় বছরা বছর। মনে নাইনটিন ফোরটিতে। তখন ছিটলার বাপটে এসেছে! ইস্! দেখতে দেখতে সব হাওয়া হয়ে গেল যে ফকিরসাহেব! সব হাওয়া!'

ফকির অমনি দু' আঙুল নাকের দুই ফুটোর দিকে নির্দেশ করে তত্ত্ব আওড়াল—'হুঁ, হাওয়ার কারবার। যাচ্ছেন আর আসছেন! বুঝলেন তো? হিন্দি মহাকাল। এই যাচ্ছেন, এই আসছেন! সব খবরের ঘরে, ডাক্তার-বাবু! জমার ঘরে ডিমটে খোল্লা! ফোঁ ফোঁ ফোঁ!'

খুব্বুদ্ধ, এই হোমিওপ্যাথ ডাক্তারটি হাজরে। সারাজীবন এখান-ওখান ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথাও থিতু হয়ে বসতে পারেন নি। এখনও কোথায় জুটে-ছেন, জানতে আগ্রহ হল। কিন্তু ফুরসত পেলুম না। দুজনে কথাবার্তা চলছে। উর্দুকথা। এইভাবে ঘাট-ছুলেদি করে একটা ঝাপসা আমার জানা হয়ে গিয়েছিল তত্তদিনে যে এদেশের মানুষ বড় ভাবপ্রবণ। কথায়-কথায় কিলবিলে আওয়াজ—সে মাঠের খুব্বুদ্ধে কুটোগাছই হোক, আর সুনিশ্চিত প্রাণ মানুষই হোক।

তার কাঁধে হাঁদ ভাত হয়ে থাকা একতারাটা শিঙিং শিঙিং করে উঠল। ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে তেরা গলার খুনেখুনেনি জোরালো হয়ে থাকল। কথাগুলো প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না। পরে ঠেস পেলুম:

'হিরেপুরীর (হিরেপুরী?) ঘাটেতে
এক মড়া ভাসতেছে/
মড়ার বুকে সর্ষের তিল্ল/
হরিল চলতেছে/
চাইরে, হরিলা চলতেছে/...'

প্রথমও দলের মানেজার নজর আমি বোকাবোকা ছেলে ভদ্রতা করল। মারকতী খুব্বুদ্ধা।

চর্যাপদের লাইন মনে পড়ে গেল। হরিণদের তোর নিজস্ব না জানি। উঁহু, কেউ কেউ জেনেছিল। কেমন সে হরিণ, কী তার গভন ছিরিছাঁদ, কোথা তার নিবাস। অন্তত এই মরন-চাঁদ জেনেছে মনে হল। ওর টানা চোখে সেই জানার ঝিলিক, মুখটা তার কৃতিত্বে উজ্জ্বল। অনেক পরে ওর গলার উকুলমাটা আমিও জেনে-ছিলুম। পরবর্তে মহাকালে এই ব্রহ্মাণ্ড 'কুল্-মহকুলের' ভেসে যাচ্ছে। তার মধ্যে সর্ষবর মরনাথ ভিন্ন। ভিন্নের মধ্যে পরম খুপরান ও পরম খুপরতী হরিণ-হরিণীর বাস। হরেদে মিলনেই জীবন, বিরহে মৃত্যু-খুপী লয়। তবে কিনা, মরনচাঁদ মাউল খুসেলমান মুক্তী। তার সামনে নবীবাবু ডাক্তার ছিন্দু বাবুন। কেন মিলিয়ে দিল সেই প্রশ্নি। গান শেষে কথায় কাল—আপনাদের কালী-পুজোর বাদায় ডাক্তারবাবু। পরবর্তী শিবের ওপর কালীরূপী হরিণা চরেন-চরেন, নাচেন-কোঁদেন! পর-ক্ষণে খুড়ো ফকির একঘটকে একতারা তুলে নাচের ভঙ্গীতে গলার সুরে বলে উঠল—'ও মা শিবঘরী নাচো যো/তোমে নাচো বাবার ঘরে তেমনি নাচো আমার ঘরে, মা-মা-মা গো/ কী বলেন!'

নবীবাবু বিড়ি ধরিয়ে খুশিতে বললেন—'ঠিক, ঠিক।'

মরনচাঁদ সায় পেয়ে মহোল্লাসে মশগুল। আবার খুনেখুনে করে গেয়ে উঠল। শুনে তো আমি হাজার।

'...রাম কি রহিম করিম কারুরো
কালা/
ঘরে ঘরে আত্মা বসি/
তিনিই হলেন খুর্শেকারী/
তবেই পুত্র হাসান-হোসেন গো/
যেন কাহিক-অগন খুতাইছেতে
মাধিনায় করেন খেলা/
রাম কি রহিম করিম কারুরো
কালা/...'

ঘোর একবারা ঘেরে ঘুমের জগৎ থেকে খুড়ো ফকির একটা আলগোড়া সিগ্রেট বের করল। একটু ঝুকে সবিনয়ে বলল—'তিলিক মহেন, ডাক্তারবাবু, টানি।'

নবীবাবু সম্মেহে সিগ্রেটটা ধরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—'হ্যাঁ, সব এক। খুরেদে ফোঁকা, কেরালে

পাচ্ছে। হিন্দু-মুসলমান — একই জিনিসের দুরকমফের।'

এই সময় একটা হলদে ঘাড় ঘামল। উঁকি মেরে দেখে ফকির বলল—'কাপসাবাঁর হলেও। নমস্কেন কোথায় ডাক্তারবাবু?'

—'মৌরিটোলায়। বড়মঙ্গলের হল, ওখানেই ডেরা সেরেছি। একদিন যেও হে।'

মদনচাঁদ ঘাড় নাড়ল।—'যাব। লিবরে হুকেছেন? লিবারে বড় টাটানি। গলে দু চামচেই গলা ঘাঁটি যাবে।...' বলে সে লিচুর চেলে বলল। মুখে হাসি।

অমনি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার কাঁপরে পড়লেন। সঙ্গে বাক্সোও আছে। লক্ষণগুলো শুনছেন, চোখদুটো বোজা। হঠাৎ ঘাড় ঝাঁকুনিই আরেক দুর্ভিক্ষ আবিষ্কারে। দেখে তাক লেগে গেল আমার।

মদনচাঁদ হোমিওপ্যাথি ছেড়ে তক্ষুণি চেঁচিয়ে উঠলেন—'এ যে আচমে বাউল হয়ে পড়িছাল! বহুত আচ্ছা!'

বুড়ো আউল অন্তরঙ্গের আলতুকেকে দেখে নিয়ে মন্তব্য করল —'এ লাইনের মজাই এই।' তারপরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গুনগুনানি।

'এ মানব সকীল ছেলের ঘাড়ি
ছুটে নিরোধ ইস্টিশনে।
আজব ছেলেইজার মনে অন্তর
মরল্লে সিটি ইন্‌জিনে।...
আর বাস্, বোল এখনে—'

আবদুল্লা কেন কথা বলল না। মিটিমিটি হেসে বুড়ো ফকিরের পাশে বসে পড়ল। ওকে দেখতে থাকলুম। এও এক আউল ফকির। কিন্তু বয়সে তরুণ। চৈতন্যকে ধর্মী রঙ নিয়েই হয়তো জন্মেছিল একবা। এখন রোদে বাতাসে কিছুটা তামাটে হয়ে উঠেছে। মুখে একমাথা কটা চুল। দোকিলাজির রঙও তাই। কিন্তু তা এত পাতলা যে তলার চামড়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর এত সুন্দর চোখো আমি পাকুমারীতে দেখিনি কখনও। গলায় একটা লেংড়া কণ্ঠা, লেংড়া লুঙ্গি। গলায় একটা, তাঁত আর পাতরের মালা না থাকলে হিন্দু বাউল বলে ভুল হত। হাতে খঞ্জরীটি একতারা এবং ডুবাক, ডুবাক ঝোলা। বাড়াতিতে হবে একসময় খুন্তুর বাঁধা হয়েছে। সবাই আমার মতো হাঁ করে ওকে দেখছিল। ও ঝোলার মধ্যে হাত ভরে একটা হিলিম আর পুরিয়া বের করতেই মদনচাঁদ ওর উরুতে জোর থাপ্পর মেরে বলে উঠল—'ও আমার বাপ রে! সোনা রে! মানিক রে!'

তরুণ ফকির সবিনয়ে আস্তে বলল —'আকসারির মাল নয় হুজুর। অরে পালা গাছের বল্কল।'

মদনচাঁদ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল —'মুখে ফুলচন্দন পড়ুক রে। তুই আমার গরজাদের সেরা রে! এতদিন কোথা ছিলিস রে!'

নদীডাঙার কুদু কুঁচকে ব্যাপারটা দেখছিলেন। ফোঁত ফোঁত করে বললেন —'মদনচাঁদ! ধারা পড়বে কিন্তু।'

মদনচাঁদ তখন অন্য মানুষ। গাঁজা বের করে বলল—'যে ঘরেই আছে, সে অর কী মজবে ডাক্তারবাবু?' বলেই আমার দিকে ফিরিয়ে হাসল। সাদা চাইল।—'কী বলেন বাবা?'

হাসলুম। সত্যি বলতে কী, তখন আমিও ঝোলা লোভে অস্থির। মনে মনে ওই মেলাটাও ঘুরে ঘাকি সাপ-পাগলদের সন্দানে। ইস্টিশনদুলোর তার চক্কা সুরে বাঁধা হয়—সেই পরমাশ্চর্য অনুভূতির কথা বলে বোঝাতে পারব না। মেলাকালের বাইরে কী আছে, তা জানতে হলে এই জিনিসটি মোক্ষম, এরেশী সন্ন্যাসী-ফকিররা মন্ত্যাতার আসলে টের পেয়েছিলেন।

কিন্তু সামনে এই প্রৌঢ় হোমিও-পাথ ডাক্তার, বাবার সঙ্গে দোস্তি-ঠোস্তি ছিল বলে মিছেছেন। একে মিস্টে খাওয়াই যাচ্ছে না, তো ছিলিম! উসখুসানি শুরু হল আমার মধ্যে। মৌরীটোলা আর কদ্দুর—

তরুণ ফকির পরম প্রশ্রয় ও স্নেহে গাঁজা কুচিকুচি করে ছুরি দিয়ে কাটল একটা কৌটোর ওপর। তারপর এক টুকরো আলা আর একটু বের করল। এই সময় এক টুকরো নারকেল ছোবড়াও এগিয়ে দিল বুড়ো ফকিরের দিকে। বুড়ো পটাপট কিছু বালি ছিড়ে খুলোটি পাকাতে থাকল এবং মুখে মুখে কু দিয়ে কুচোদুলো উড়িয়ে দিল। খুব্বের কয়েই গভীর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। মদনচাঁদের নজর আলি চালা মন্তব্য করল আবার—'দেখার মতো জিনিস!'

সতর্ক আঙুলে ছোবড়ার খুলোটি লাল বলে হাতের চেটোয় তুলে বুড়ো ফকির ছিলিমে ঢাকল এবং চেপে দিল। তরুণ ফকির ছিলিম খুব্বাতে বাড়িয়ে বলল—'নেন হুজুর!'

মদনচাঁদ পুলকিত হয়ে ওপরে চোখ তুলে যা একখানা টান কষাল, দেখে তাক লেগে যায়। তারপর দম আটকে ঠোঁট বুজো এঁটে ধোঁয়ার ভিতর ঘড়ঘড় করল—'পাও!' অর্থাৎ খাও।

এ ওর একজাতি সরেস। ছিলিমের তলার দিকে চো চো চক্কচক্ক আওয়াজ শোনা গেল। শেষে 'উস্' করে চুড়ান্ত ধিলে মেড়ে সাতহাতের দিকে বলল—'খান।' অর্থাৎ খান।

গাড়ির সবাই চুপ করে দেখছি। তিনবারের বার ছিলিম পটাপট আওয়াজ তুলেছে। তরুণ ফকির হাতের চেটোয় ছিলিম উপুড় করে ছাই নিল। পরম ছাই কুলকি সুখে। তারপর পরম 'চিকনি' অর্থাৎ তামার আটক দেওয়া কয়ে একটা খোল নল ছিনিল। হাতের মোটা কাঁকর, নারকেল ছোবড়ার টুকরো। ছিলিম সাজ করে চিকনি পুরে ছেড়ের 'সাফি' অর্থাৎ সাফ করার একটি, কয়লা নারকেল—যা ছিলিমের তলার মোছার ব্যবস্থা-হিসেবে ব্যবহার ছিল, সেটা খুব্বে দিয়ে ফোলয়ে চালান করল। ওদিকে মদনচাঁদ চোখ বুজে ধ্যানস্থ। মুখটা উঁচু করে রেখেছে। তরুণ ফকির সব সাজলে আমার দিকে ঘুরে বলল—'হুজুর ছিলিমে পাছছেন?'

মুহূর্তে মনে পড়ে গেল। ওরেব্বা! এ তো সেই আবদুল্লা ফকির! কয়টোরা-সালার রেললাইনের এক গাড়িতে আলাপ হয়েছিল আগের বছর চৈত্রে। সালারে জুরাড়িবেড় মেলার গানের আসর ফেরে ফিরছিলুম। বড় মেহেরুন গলা আবদুল্লার। সারাচাদ বাউল বাউলদের গান কৃপালী রাত্রিদীর কাঠমোতে বাঁধা থাকে। সা রে গা পা ধা সাঁ। আবদুল্লা তার সঙ্গে আশ্চর্য কারদার জৈরবী মেলাচ্ছিল। সে কী গান, নাভি নাড়িয়েছড়া কথা—এ দুর্লভ জীবন কী কাজে লাগাবো, সেই আকুলতা! যদিমচন্দ্র বলেছিলেন এরকম—'এ জীবন লইয়া কী করিব?' আবদুল্লা বারবার একটা লাইনে মাথা কুটছিল: 'সহড়ে তিন হস্ত মাটি দিলে খুব্বে/ হাল তো মিলে না...'

পরে জেনেছিলুম, ও বাঙালী অর্থাৎ বংশগত ফকির নয়। চাষীর ছেলে। ছেলেবেলায় অনাথ। শেরখান শাহ্ নামে এক বাঙালী ফকিরের স্নেহে তার আস্তানায় মানুষ। মারফতী শিক্ষাদীক্ষা তারই কাছে।

কিন্তু তারও পরে যা জেনেছিলুম, তাতে চোখে সিরেছিলুম। সুদর্শন নামে এক জুয়াড়ী বলেছিল—'মাস্টার, আবদুল্লা ফকিরের সঙ্গে বেশি মাখা-মাখি করবেন না। ওকে যা দেখছেন, তা নয়।'

বলেছিলুম—'তার মানে?'

—'পাকা দাগী আসামী। ছুরি জকাতি খুনোখুনি চক্কুর করেছে যদ্দনবরস থেকে। তিনবার জেল খেটেছে। তা ছাড়া লম্পটের হদ্দ। একবার এক মেয়ে ফাঁসতে বসেছিল। কাপাসারীর বড় ফকির নয়ানচাঁদের ইনজুরেন্স আছে নানা মহলে। পীরের দরবার সেবক কি না! তকে করে বেঁচে যায় আবদুল্লা। সেই থেকে আর ও আস্তানা পা দিতে পারে না।

কিন্তু শেষ আঁশ আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি কথাটা। অত সুন্দর চোখো, অমন ভাল গায়, আর ওই আশ্চর্যভোলা চালচলন!

সুদর্শন একটু হেসে চেয়ে বলেছিল —'সাদের জাকা দেখেছেন মাস্টার? দেখতে বড় সুন্দর। কিন্তু বিষের বাক্সা। যৌ দিলে তামার-মলার করতে দেয় না।'

কে জানে! কিন্তু মনে মনে ওর সেই আশ্চর্য গলাটা মনে পড়ে যেত। ঈশানের মেয়ে এসে কফি ও কোমল নি ঝাঁকিয়ে সা-এ এক মারাত্মক মেড়ড়! আর, হুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল আবদুল্লা। ও যেন আমার কথাই বলছিল! এ জীবন দেখেছি, কিন্তু বলার বলানোর কথাই যে বেওয়া হয়নি। কী করব এ নিয়ে? নিশ্চিত রয়ের জন্য জলাট আসর ছেড়ে বাইরে ঘিরে দাঁড়ালুম। অন্ধকারে স্তব্ধ উঁচুনিচু মণ্ডলী, মাথার ওপর লক্ষকোটি নক্ষত্র —মনে মনে নাচিয়ে ছোকরার ভাঙা। রাত জাগা আড়ষ্ট গলার গান ভেসে আসছে। মনে হত, এ কোথায় আছি আমি? কেন আছি? এই দাস্তার ছেটেই কি আমি কোন উদ্দেশ্যের তীর্থে পৌঁছতে পারব? খুব ছাই, জীবনের মানেই যে খুঁজে পাইনে!

এই আবদুল্লার মধ্যে নিজের ছায়া দেখতে পেয়েছিলুম যেন। এক বছর পরে ফের তার সঙ্গে দেখা। অথচ চিনতেই পারিনি। নিজের মেজাজমর্জির ওপর রাগ হল। তারপর মুহূর্তে মন বিশাল খুশিতে ভরে উঠল। ওর কথার জবাবে আবেগ চেপে খুব বলল্লুম—'তুমি আবদুল্লা?'

—'জী হুজুর।' আবদুল্লা তার সরলা বাহুর কাঁধেতে তামার বালাটা এবার অকারণ নাড়ল। এঁটে বসা গলার তাঁতটা ঠিক করে নিল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকল।

বললুম—'কেমন আছ আবদুল্লা? ইস্, এত বছর পরে দেখা।'

আবদুল্লা মাথা নেড়ে ফের বলল—'জী হুজুর।'

—'তাহলে আর কী! চলো আমাদের সঙ্গে। পাতাড়ির মেলায় গান আছে।'

আর্মান মদনচাঁদ খপ করে আবদুল্লার বালা-পরা হাতটা ধরে ফেলল।—'ফেপা! গত জন্মের বেটাকে ফেড়ে দিয়ে পালায় সাধি কার? অরেও বেড়ে আমি না? কী বলেন আপনারা?'

বুঝলুম বুড়ো ওর ছিলিমের লোভে পড়ে গেছে। সহজে ছাড়বে না। অথচ আবদুল্লাকে দেখে কী এক ভাল-লাগতা আমাকে হোলপাড় করছে—ওকে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না। বললুম—'ফকিরসাহেব, এবারকার মতো ওকে ছুটি দাও। নয়তো তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে।'

মদনচাঁদ ফুঁসে এসে বলল—'তার চেয়ে আমি ডাকি হুজুরকে। ইস্টিশে মাদারপীরের থানে মেলা বসবে আজ জষ্টিমাসের শেষ রোববার। একদিনের মেলা। হাজার আউল-বাউল ফকির-ফকরা এসে নাচবেন-কুঁদবেন। নদীর পাড়ে জঙ্গলের ভেতর থান। সে এক জিনিস, বাবা! চোখ জুড়োবে, জনম সার্থক হবে। চলুন।'

লোভে ভেতরটা খরখর করে উঠল। কিন্তু আনেবদার নজর আলি খোঁচা মেরে বলল—'অসম্ভব কথা। বায়না মঞ্জুর ও আগাউ পা দেওয়া যাবে না। তার ওপর নতুন মাস্টারের নামেই বায়না দিয়েছে। আপনি না থাকলে বন্দপাতি ফেড়ে নেবে না।'

টের পেলুম, ওর কথা আমার ঘোল-পক্ষের মধ্যে কুটো হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। আবদুল্লা আমাকে লক্ষ করে খুব ভাঙছে। ইস্টিশ মাঠে মাদারপীরের থানে মানত বাতাসাদুলোর লাল-লাল ফুল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেখানে ফকির-

চুল নাড়া দিয়ে একতারায় সুরে তুলে গান ধরেছে আউল পুরুষেরা। আমাকে আর কেউ আটকাতে পারবে না।

কিন্তু পালানোর সুযোগ চাই। সুযোগ খুঁজতে থাকলুম। পাঁচটায় আর একটা জংশনের গল্পে শেষ্টেশন। পৌঁছতে মিনিট বেজে যাবে। এখন শুধু একটা কাজ করার আছে। ওদের এই মিনিট লোকগুলোকে কোন অজুহাতে কামরা থেকে বের করে দেওয়া।

নলীবাবু ঘড়ি দেখে বললেন—আর বড়ো জোর মিনিট। তাড়াতাড়ি ওরে মোকদা কাঁকির সন্ধান! জুতসই একখানা লাগাও বেশি! যেমন তেমনা, তেমনি জিনিস চাই কিন্তু।'

আবদুল্লা লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল—'হুজুরের আশীর্বাদ! আমার গুরুর কৃপা!'

মদনচাঁদও সায় দিয়ে বলে উঠল—'কৃপা পাবি কী রে বেটা! সেবা তুই হয়ে আছিস। মন খুলে ছেড়ে দে! রাস্তায় যে যার বেঁধেছে, তার আমার ইঁদিক-উঁদিক কী রে?'

আবদুল্লা একতারা তুলে পিঁকি পিঁকি সুর করল। তারপর গুন-গুনানি। আঃ, সেই সুর! সেই ভৈরবীর মেজাজ! ঘাইয়ের নিসর্গ যেন ঘেমে দাঁড়াল এতক্ষণে—অথচ ট্রেন চলছে উলটোদিকেই মনে হয়। আর এই ট্রেনটাও যেন বড় নিঃশব্দ হয়ে পড়েছে। চাকার চলার চাপা ঘুমিয়ে পড়ে, যেন পরিবেশের হানি না ঘটে। নলীবাবু টান শুনেই আবেগে ভুলে উঠলেন—'সাধু! অদ্ভুত! আহা হা!'

আবদুল্লা অমনি বাঁ হাত কানে রেখে গেয়ে উঠল গলা ছেড়ে :

'আজব শহর-নগর বানাইলে
কোন জন/
হায় হায় আজব শহর/...
সেই শহরে রথ চলাইছে
একজনা তার সারাথি/
দুই ঘোড়াতে টানয়ে ঘোরে/
দুই দিকে দুজনায় গতি/
হায় হায় আজব শহর/...'

সবের আবার খুড়ো কাঁকির হাঁকের উঠল—'সরীল! হায় সরীল রে!' ট্রেনের হুইসল কাঁপা কাঁপা সুরে ডেকে উঠল। আবদুল্লা উঠে দাঁড়াল। নাচ জুড়ে দিল। নলীবাবু জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বললেন—'আ মল! মোরীতলা এসে গেল যে! স্টেশ কোথায়? এ যে রাইট টাইম।' গাড়ির ভেতর একটু ব্যস্ততা পড়ে গেল। আবদুল্লার তাতে গ্রাহ্য নেই। নলীবাবু বোচকাবুঁচকি সামলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে আবদুল্লার দিকে বাড়ালেন। আবদুল্লা একতারাটা বাড়াল। তার ভেতরে ঠকাস্ করে আধুলিটা পড়ল। ট্রেন থামতে শুরু করেছে। মোরীতলা বড় স্টেশন। নলীবাবু বললেন—'এহে মদনচাঁদ, আসতে ভুলো না। আর, তোমার ছেলেকেও বড় দেখতে ইচ্ছে করে। পারলে এনো সঙ্গে।'

তখন ঘুড়ো শুধু মাথা নাড়ল।

আমার দিকে ঘুরে নলীবাবু বললেন—'আর বাবাজীবন! সময় হলে একবার কিশলেসনগরিতে এসো। তোমার বাবা আমার সুখের বন্ধু। আসবে তো?'

আমিও মাথা নাড়লুম। পকেটে হাত পুরোছি তখনো, সিগ্রেট না টানলে এবার মরে যাব! ট্রেন থামল। নলীবাবু নেমে গেলেন। ভিড়ও কমা হয়ে গেল। এই সময় মালেকার নজর আমিকে বললে—'তোমরা একবার খোঁজখবর নাও, ওরা কে কোথায় উঠল। তিনজনেই যাও। গাড়ি অনেক-ক্ষণ দাঁড়াবে। দেখ, সবাই চলতে পেরেছে নাকি। আর শোন, একেকজন একেক কামরায় ঢুকে খোঁজ নাও।'

পরামর্শটা মনঃপূত হল ওদের। টক্কনি 'টিকিই আছেন' বলে ওরা বুকপকেট করে নেমে গেল। মদনচাঁদ আমাকে কিনিক হাসল। বুড়ো আঙুল চালাক। আবদুল্লা ওদিকে গান চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মদনচাঁদ ওর হাত ধরে টানল।—'থুব হয়েছে বাপ্। সব গরুড় করিস নে। ওবেলা যখন লড়িস, তখন দেখব কেমন তাকত!'

আবদুল্লা হেসে পড়ল। তারপর বলল—বাবাজীবের না বললেও বেতুম। ইচ্ছা পরিবেশ রেলগাড়িই যাচ্ছিলুম।'

—'তাই নাকি?' হলে মদনচাঁদ ওর কাঁধে থাপ্পড় মারল।—'শোন বেটা। চিনতেই আর মকদ্দমী খুঁ হলের পাল্লা হবে কিন্তু। আমরা তো চিনতেই। তোরা?'

আবদুল্লা হাসল।

—'খাবার কী হেথের?'

আবদুল্লা হেসেমুখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছে। আমি জানি, কোথায় ওর দিবা। ও তো জাত কাঁকির নয়। কী বলে শুনতে কান পাতলুম। আবদুল্লা মুখ নামিয়ে আস্তে বলল—'আমার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। দুলেছাড়া ঘুরি। ছোটবেলা থেকে মকদ্দমী বাপজানের সেরেস্তান পাহ্ মানুষ করে-ছিল। তেনার কাছেই শিক্ষানবিশি। তিনিই গুরুর গুরু, মহাগুরু আছেন।'

—'অ' বলে একটু চুপ করে থাকল মদনচাঁদ। একটুখানি হতাশ দেখাচ্ছিল ওকে। তারপর বলল—'তাহলে থব-মুখী তোরা। তা হোক্। একই গাছের দুই ফোকর তো নয়।'

বললুম—'চিনতেই আর মকদ্দমীটা কী কঠিনদরের?'

মদনচাঁদ জবাব দিল—'চিনতেই হল বাঙ্গা ইন্দ্রিয়ের চিনতেই জেলা চাকুন্তা। ওদের কথন অহরে আজমীঢ় শহরটাকে। আর দুই দোঁহা। আর মক-মুখী হল গাজাবাবা মকদ্দমে শহরের ঢেলোরা। সুফী আউলদের নলনল ভাষ বাবা। ছিপ্পুলের মতো আর গোক্তরের গুড় নাই।'

একটু হেসে বললুম—'তুমি তো শুনেছি, আমি সৈরভবনের ছেলে। আমার কথাও কিন্তু সুফী ধাঁচরদের। তোমাদের মতো সাধনভজন নিয়েই থাকার কথা।'

মদনচাঁদ নাক দিয়ে আমার হাত ধরল।—'তাই মুখের ছিরিছাঁদে এত ঢেলোঢেলা লাগে বাবা! হুঁহুঁ—সেলাম, হাজার সেলাম। ওরে বাপ্ রে বাপ্! আপনারাই আমাদের মুলমুদ্দু—মহামুদ্দু। ওই যে ফুলে নাড়ার টান! তখন থেকে তাই মনকে বলছি, মনা রে মনা! কেন এই ছেলেটাকে তোর আপন লাগে বল দিকিনি? মন এই একতারার জবাব দিলে—চিনি চিনি, চিনি কি চিনি। কের শালা একতারা লম্ফ করে বলে—চিনি না চিনি না, চিনি কি চিনি না। যাচ্ছলে বড় চমুকী করে' এই শুনেন না!'

বলে সে বয়সকালে একতারাটা বাজাবার ভিন ওই বোলে। দুই কাঁকির একসঙ্গে হেসে উঠল। ট্রেনও ছেড়ে দিল। দলের লোকগুলোর তখনও পাত্তা নেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। বললুম—'ইন্দ্রা আর কদ্দুর কাঁকিরদারের?'

মদনচাঁদ চাপা ও চতুর হেসে বলল—'ছেলেধরা ছেলে ধরে নিয়ে পালাচ্ছে। ধরে যা করা কী হয়? সামনে তিনদিন ট্রেন করে তিনটি বসব। ঘাটের পথে ফোল দুই মাত্তর। সন্ধ্যায় অনেক আগে পৌঁছে যাব। মরুকে না শালা দেখেনো! আমাদেই বা কী—আপনারই বা কী?'

ইমরান হোসেন খাঁ

অন্তর হাসির ধুম পড়ে গেল তিন-জনের। কারুরই আর কেউ নেই।

দু দু বিশাল মাঠে চলেছি তিনটি মানুষ। বীরভূমের শ্যামলা ছড়িয়ে মুশিদিবাদের দুরন্তের মাঠের মাঝা-মাঝি চলেছি পুবে। দিগন্ত ঘরে সূর্য ঢলেছে তাড়াতাড়ি। দু দু, বাতাস বইছে। ছেলেরা হাল ছাড়ো ঠেলে গাড়ি না। একটা পুকুরপাড়ে বসে মদনচাঁদ পৌঁছে বলল—'বেটা, নতুন জাউকে বাঁচিক কে' অর্থাৎ ছিলিম। মন ভেতে উঠল।

ছাবল জমিয়ে বসে তখনকার মতো নিশ্চিন্ত ছিলিম টানা হল। আমি এক-টানেই ছেলে ফেলুম। আর সাহস হল না।

তারপর টলতে টলতে মিয়েরা হিরোই আউলাআউল—নিজেকে হাই জাতে তুলে নামলুম—মাঠের শেষে বাসরাস্তা সড়কে পৌঁছলুম। কাঁচা সড়কে সবে ধোয়া পড়েছে। বড় বড় সব ডেজার আর কার্কিট হৈরাঁই ঢেলিন কাজ করে যাচ্ছে। ঢের শেলুম, দুরে নেকড়া বলে যাচ্ছে। মদনচাঁদ জানাল—সামনে বছর বলে ঘোটর চলবে। গাঁ গোরাম আর দিনে দিনে থাকবে না বাবা, সব শহর হয়ে যাবে। যাক্। আমরা তো রাস্তার বাসিন্দে। আমাদের আবার নগর-নগর-কলর! কী বলেন?'

ইচ্ছা পৌঁছতে কিরকম গড়িয়ে গেল। ক্লান্ত। মদনচাঁদ নেশা শেষে বসেছে। ঘুরে পড়তে ইচ্ছে করছে। গাঁয়ের শেষে নদীর পাড়ে ওদের কাঁকিরপাড়া। দূর থেকে আবছা মেয়েদের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। মদনচাঁদ জানাল—দিনান্ত পাড়ার

...কাল-পরশুদের মতই। তবে আরো দৃঢ় প্রত্যয়ে সব কিছুকে ঠাঁই দিতে হবে নিজের। তিন চরণেও করে যাবে ত্রিভঙ্গও করে। আজি থেকেই দাঁড়ান তা হলে। হয়ে তখনকে কাঁটা ফোটে না। লাল সেলোফেনের কাঁচ পরলে সব কী লাগে?

সেই দিনে আসি ঘরে আর ঘরের ঘন একটা মেঘলোলা বাঁড়। নীচে সেটার বাঁকে সেলাই করিয়ে চুড়া রেখে বসিছেন। তাহারই মন ভরে গেল বড়ো ঠাকুর সন্ধ্যেবেলা যেমন চেহারা হোটা হোই হোটা। ব্রাহ্মিনা ব্রাহ্মিনা হে। এসে পড়েছি।

ঘোরা উঠানে দাঁড়িয়ে শিরম ফিরে একটা ঘরে কালচে ঘরের ভিতরে। দেখানে ঘণ্টাটা ঝড়ি বাঁধা আছে। সেটা অনেকদিন ব্যবহার হয়নি। সিঁড়ি ওঠার দুপাশে কাঠের রেলিঙে ধুলো জমে আছে। সেটা ঝাড়ন দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে ঘণ্টাটার সঙ্গে ঝুলে থাকা দড়িটা ধরে টানতে লাগল। কী মিষ্টি শব্দ! সে ঠং শব্দে ঘরে দাঁড়িয়েই সমস্ত চোখ বুজে ফেলে।

দুই কুকুরের সে আনন্দের চেহারা দেখে আমার বড়ো ঠাকুর হাসতে হাসতে বলেছিল, এর পিছনে অনেকদূরের একটি ঘোর বিপদ ও বিভীষিকার ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে।

বড়ো ঘর ছাড়া দুটো ঘরের মধ্যে দুই ঘরের ভেতর দিয়ে একটি রেটা। এবং সেটি ঘিরে ঘর ঘোরানো বেরোবার কতগুলি ঘোরানো সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়ে ঘোরানো ঘোরানো উঠে গেছে ছাদে।

ঐ ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে ছাদে যেতে আমাদেরই বুড়ি এই মাইলখানেক উঠে যেন যে কোন ঘরের ঘরে ঘোরে উঠানে মনে হয় ঐ ঘিরে দুই ঘোরে বসেছে।

ঘরটার সামনের দুপা বাড়াতে বাড়াতে বড়ো ঠাকুর। তারপর কোন থেকে একটা চাবি বের করে বিরাট ভিত। সেখানে বেশ কিছুটা ছাদ চলিয়ে যে ঘরটা ঘিরে রেখেছে তাকে। আমি তখন আমার এইটুকুন যা করতে পারিনি নাকি এই ভয়। মুখে-মুখে ঘরে হয়?

যে কোনো থেকে একটা চাবের পাকেই বের করে নিল। ব্রাহ্মিনা ভিতরে ঢোকে নিয়ে দাওয়ার কোনার উনুনের ঘরে গেল।

ঘরটায় বলল—ভাসাইয়ো কোনো সাড়া না।

ভাবের ভেবে শুধু ঘাড় নাড়ল। ঘরটায় জানে না।

বড়ো কোনো রেখে বলল—এক-লোকে নজর ঘটে হয়ে আসি। যাবেন নাকি যাবেন?

আবদুল্লা বলল—হুঁ। চলুন। মাস্টারসাহেব, আসুন।

আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যাই। বললুম—না। তোমরা যাও।

দুজনে চলে গেল। আমি কয়েই ঘর করে দাওয়ার নীচে পা ঝুলিয়ে আর-লোকটা চলুন। তারপর আকাশের দিকে, যেখানে ঘড়ি ঘুড়িয়ে ঘুরাতে থেকে। আমার স্টীমারের সঙ্গে ওর কথা কোথাকার পরিচয় নয় একবারে। তাই চুপ করে আকাশের ঘরে বসেই রা কাঁ।

হঠাৎ ব্রাহ্মিনা একটু চমকে... আপনি অন্ধকারের ঘরের মতোই না?

চমকে এবং খুশি হয়ে বললুম—হাঁ। তুমি কীভাবে জানলে?

...বালকালীর মেলার প্রাঙ্গণে গান শুনেছিলুম। বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। ওখানে আমার মনের বাড়ি। আপনার সঙ্গেও আলি।

॥ দুই ॥

আমার ঘরটুকু আউল হচ্ছে। বাউলদেরই মুসলিম প্রতিবেশী। তবুও চুপ। হিন্দু বাউল আর মুসলিম আউল সম্প্রদায় অবশ্য কতকটা এক হয়েছেই মনুষ। কিন্তু আউল কথাটা এসেছে অবশ্যই ভাষার আউলিয়া থেকে। আউলিয়া মানে ঈশ্বরের বন্ধু, পীরের সমান বা সমকক্ষ। তাদের আউল মানে আদি।

বাংলার মাটির গানে আউলিয়া মোটা দেশের আউল হয়েছে বাউলের আউলেমানি। এরা একত্র সুফী সম্প্রদায়। হিন্দু উপনিষদ-দর্শন অবিকল প্রতিবিম্বিত সুফী মতবাদে। এদের উৎস খুঁজতে হলে চলে যেতে হয় ইসলামের প্রথমযুগে ইরানে। ভারতবর্ষীয় দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ ইসলামী তত্ত্ব জানিয়ে এই মতের উদ্ভব। বিদেশী মুসলমান যারা ধর্মপ্রচারক হয়েছেন তাঁরাই সুফী মতবাদের গুরু বলে মেনেছেন। তাঁরা যখন ভারতে এলেন, অভ্যাসমত গুরু, মন্ত্র আর দীক্ষা চালাতে লাগলেন। শিষ্য-শিষ্যরা চলে এলেন। এইভাবে সারা ভারতে সুফী দার্শনিকদের ডেরা গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু বাংলার মাটিতে কী এক অদ্ভুত গুণ, এর অবহাওয়ার কী বিচিত্র ভ্রম—বৌদ্ধ যুগের সিদ্ধাচার্য-দের এবং যেমন প্রেম নিয়ামিত বাউল হয়ে বহুনী বৈষ্ণবতত্ত্বে ডুবে গেলেন, তেমনি এবার তাঁদিরও সাহায্যে হুল নিলেন। সে-তত্ত্বটুকু জানিনী-তত্ত্ব যোগিনীদিকা আবার ঈশ্বরে বন্দীকরণের দিকেও এগিয়ে-ছিল। এর পরে এসে জুটলেন সুফী আউলিয়া আর তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরা। এক অদ্ভুত দর্শন-সমন্বয় ঘটে গেল। আউলে-বাউলে-ভেদে ঠাঁই পাকানো একটা ঝাপার ঘটল। হিন্দু বাউলরা বৈষ্ণবতত্ত্বের দিকে ঝুঁকল। ওদিকে সুফী আউলরা তো সেই একই তত্ত্ব তত্ত্বাদিনে আধ্যাত্মধারা ভুলেকলে ভরিয়ে দিয়েছেন। এঁদের ভাষা-কৃষ্ণ, তত্ত্ব এবং ঈশ্বরের ভাবে তেমনটা। ওঁদেরও তাই। সুরা-সাকীর প্রতীক তাঁদের ইশ্বর প্রেম এবং তত্ত্ব যা


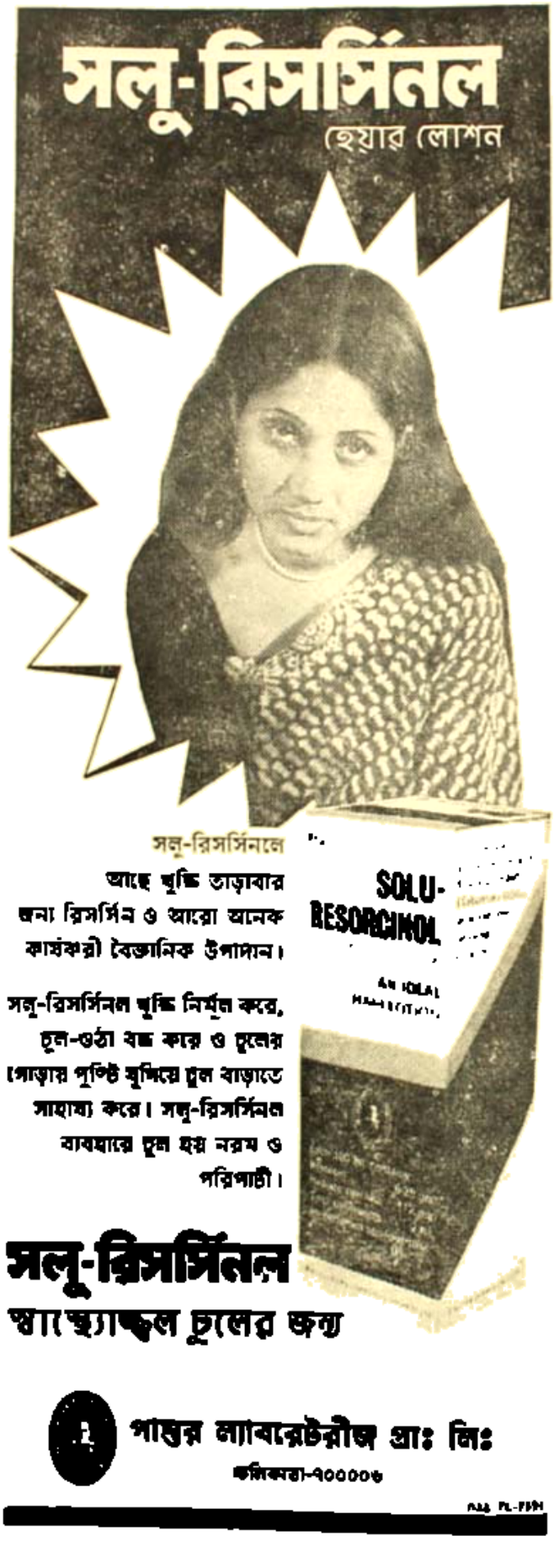

'মাল্কে' বোঝায় পড়ে। যে বলা, সেই কৃষ্ণ। মুসলিম আইন বলেন, 'আনাল্ হক্'। আমিই ঈশ্বর, আমিই সত্য। জলধরের কাঠামোতে উপনিষদের পাঠ। তাতে বৈষ্ণব তত্ত্বের মেদ মেদুরতা কলমলানি। তাই মজলী সুফী আইন মনসটার যখন একতারা বাজিয়ে হিন্দু বাউলদের চিত্ত গান একই সঙ্গে নিজের গান বলে গাইল, তখন আমি অবাক হলুম না।

'পড়ে লৌকলীলার বাজারে
অবাক বাই ভেবে।
একটা সমেত-লেউলে একটা
ইন্দুর-বেড়ালে
একই জায়গায় বসত করে
একই মেসালে।
তা দেখে এক মড়া হাসে
সদা, দৌরহলে বস করে।
অবাক বাই ভেবে।'

হিন্দু বাউল বলে থাকে, মুসলিম আউল বলে সাঁই। তখনও ওই মনসটের মুখেই হিন্দু বাঁশিতে সাঁই-এর সঙ্গে 'দো' মিলে মিশে গোসাঁই হয়ে ওঠে। যেমন তার এই গানটা : 'কেন্ ভবে বিয়ে কল্ল বাহে গোসাঁইজী, কেন্ ভবে বেয়ে আছ ঘর।'... হেসে ওঠেন মনসটার বলল—'বাবার মুখে খাবলে! আমি কি হিন্দুর মতো গোসাঁই বলব্লুম? বলব্লুম দো' —আরে ওগো সাইজী!' সে হা হা করে প্রচুর হাসে। আবার বলে—'তাহে দোস করলে নাচার। যিনি গোসাঁই, তিনিই তো সাঁই। বাস রে বাবা! আর না পাঁচ! কী হিন্দু কী মোহলমান—সরীল! সরীলখানা বিক্রেনা করুন।' এই বলে শুনিয়ে দিল জের। 'হরষের পাখিনি চমকায় ডালিনি ডালিনে পড়ে গেল ডাটি/দিনে দিনে বলে পড়ল ॥৬মহলের মাটি/গো সাইজী, কেন্ ভবে বেয়ে আছ ঘর/'...

ছেলেমানুষের নিতাই বাউল একই গান গেয়েছিল। শুধু 'রমেহলের' বদলে সে গেয়েছিল 'দুপমহলের মাটি'। আমার সখা বাউলনী গেয়েছিল 'সপ্তমহলের মাটি'। তাই শুনে মনসটারের মন্তব্য। 'মহল তো ঘর। না কী?'

কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার—হিন্দু বাউলরা তাদিক মনীষিকদের তুকতাক থেকে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। অথচ মুসলিম আউলদের অনেকে ওই বিদ্যা একই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। যেমনি এক আউলের সঙ্গে পরিচয় হল ইন্দুরা এসপ্লেনেডে। আমার পরিচয় দিয়েছিল।...

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হতে-হতে শিবাইয়ের আলোর ঝরণা-ঝরণা ডালাচাত থাওয়া হয়ে গেল। বুড়ো হাল্সেহুপুসে খেতে খেতে কন্দুম হুমে মধ্যে মধ্যে জানাল—আমার পেটটা বড়। আপনার যেমন না থাকায়!

চৌরঙ্গীর ওপারে ঘরের ঘেরের ছলে যাচ্ছে মরীজিনা। মুখ টিপে হেসে বলল—যেন্ট চোখ মেরেনি। তুমি খাও না, কত খেতে পারো। তিনকড়া চমনের ডাত মেরেছি।'

মনসটার মর্মনি চোখে কপালে তুলল। —'ওরে! ও যে ডাংহেলার পানির কেটো। আমি একাই হুকটা খাব। আর এই আমবুল্লা বাউলের গরজখানা মেটাইবে? কেন্ ভাল করে?...এই বলে সে আমবুল্লার একটা বাহু খামচে ধরে ওঠাবার চেষ্টা করল।

মরীজিনার চোখের পাতা নেমে ঢেকে দেখলুম। গালের ওপর কাঁপা-কাঁপা ছায়া পড়েছে। এক ঝলক আলতার ছোপ দেখলুম। হুকোর বলিষ্ঠ মুখের দিকে মুখটি কি তোলাতে পারে? আমবুল্লা খুব সন্তর্পণে যাচ্ছে অতিথির মতো—কিসের মুক্তো নাকি? আঙুলের ডগার আলতোভাবে ডাত তুলছে। আদরে মুখে পড়েছে। এঁকে তার পাঁজা টোকির মতো সেই নিষ্ঠা, নাকি প্রেম আদৌ কল্পনা! সে সাবধানে চিবুচ্ছে। আলার ফলার ডাতটিকেও সন্তর্পণে আঙুলে টেনে নিচ্ছে। পরিচয় পাওয়া। ঠোঁট বেশি নড়ে না। তা লক্ষ্য করে মুখোশ আউল খুড়ো বলল—'আ মর! এ যে দেখছি নতুন জামাই আদরের মো! মুখপোড়া ছেলের কি মুখে রা নেই? দেন আঙুল চুষে মুখে!'

আবার এক ঝলক হয় মরীজিনার গাল থেকে কানের লতি অব্দি ছড়িয়ে পড়ল। আমার চোখের ভুল? যাই হোক না কেন্, আচমকা এক চাপা ইর্ষার জ্বালা টের পেলুম। হুকোতা ইন্দুর নিয়েছেই আমার মুখে খাস্তাইবের ছায়া পড়ল।

কিন্তু এই খুড়ো কবিরের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। হলে উঠল—'ওরে! নতুন সাহেব খুঁকি খোসা হল? সাবাছান বলে! ওরে বাপ্, তুই আমার ঘরের ছেলে। খা, ঠেলে খা।'

মরীজিনা নড়ে মুখেই বলল—'নাও, হয়েছে! সবাই তোমার মতো খোসার খোসাই নয়।'

মনসটার বলল—'না তো, খাচ্ছে না কেন? এই ইন্দুর ডাত তখন থেকে খালি খাচ্ছে আর খাচ্ছে। বাবাজীকন, এ কবির-কলকার ঘর। ও বেলা কী হচ্ছিল, জানতে নেই।'

মরীজিনা চোখে বিলিক দিয়ে বলল, —যাই, এ বেলা খি-ডাত, ও বেলা ডাতার! বাপ্, আর নিজের কীর্তি বক্তৃতে আমির কোরো না। খাচ্ছ খাও! মাস্টারমশাই, ডাত নিন।'

একহাতা ডাত আমি থালা বেয়ে মাখেই থালায় পড়ল। ডাত নয়, আমি যেন্দুমে নিরীহ একটি বাঘ! হাতে যেন্দুমি চুড়ির ঝোরা আর ঠোঁটে থাবনা। খুড়ো হিহি খুশিহাল—সরীল! হায় সরীল! চিরোল আঙুলে বয়া এনামেলের চামচের ওপরখানি চলে পড়ে ঘোরে চুড়িপরা হাতের উঠানেবেনা। সরু বাহুর নাকছাবিতে নজর আটকায়। কানে ঝুলন্ত দুলের কাঁপে যেন্দুমি কি বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিচ্ছে—যেন কোথাও

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

ঘরে দুমুল কড়কড়ের আয়োজন। ওর গলার নীচের মাদলটা মনে হল নিখর দুবার—আঠি হিহ এবা মুহু নিশ্বাসের তাহলেই সব ঝলে ছেড়ে যাবে।

খাওয়াটা জাঁকিয়ে তুলতে পারলুম না। অথচ ছিদে ছিল প্রচণ্ড। ডাল ডাত আলুসেদ্ধ ডিমভাজার অবো স্থানীয়কের বরসেলা নিশ্চয় উজাড় করে দেওয়া ছিল। তবু এক পার্শ্বচিন্তা অন্যমনস্কতা আমাকে মৌছিল বার-বার। আমার মনের পাশকে আমার চেয়ে আর বেশি কে জানে?

আচমকা সময় মনসটার হঠাৎ বলল —'লালাবাবু এল না। মনে মে। রোজ আর পদ্ম খোঁজা করে খুঁজতে পাচ্ছিনে। ঈশ্, ছেরে নিয়ে যেন আমার উঠান করেছে খুখেকোর খো!'

আমবুল্লা বলল—'কে?'

—'আমার জামাই শালা!'

শুনে আমবুল্লা আর আমি হো হো করে হেসে ফেললুম। মরীজিনা এঁটো থালা সোয়াহতে খোচরতে আঁচলে হাসি চাপল। বলল—'জামাইকে শালা বলা কবিকলাবের?'

মনসটার গম্ভীর মুখে বলল—'জানি কি ওতে? ওর মাকেলটাকে। দেখুন না, আমি মুসলিম মানুষ। দেখ বিবেন খুরে বেড়াই। ঘরে যোবতী মেয়েটা একা থাকবে কী সাহসে? তাই মুখপোড়াকে এনে বসলা বাড়ির কাজকম্ম। হো বাবারে বাবা, বাবারে বাবা' এ বাড়ী যেন মনসুরে হেরাজ।'

মনসুরে হেরাজ ছিলেন শাস্তিস্থ এলিয়ার প্রথম মুসলী দার্শনিক ও সাধক। প্রথম জীবনে ডাকাতি করতেন। পরে সাধুসন্ত হন। 'আনাল্ হক্'—আমিই ঈশ্বর, আমিই সত্য, এই মতের প্রবক্তা তিনি। এর মতো ইসলাম বিরোধী তাদের দর্শনের জন্য দেয়ে ঢাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়।

মনসুরে হেল্লাজের সঙ্গে ওর জামাই-য়ের মিলে মিল, তখনও জানিনে। শুধু টের পাচ্ছি, সে কর্তাবাবাজীর বেরাদরই নয়। একুন বাউল বয়ের মুসলী বউকে একা রেখে সে তোয়ার-কোয়ার ঘুরে বেড়ায় নিশ্চয়। জলধর ইন্দুর বলল্লুম—'হোমের জামাইয়ের নাম কী ফকিরসাহেব? কোথায় দেশ?'

মনসটার তার গলার মালা জলে মুহূর্তে মুহূর্তে বলল—'বংশের নাম্ও মনসুরে। ডাকাতীর ছেলে। ও গাঁয়ে আমার শালার বাড়ি। শালাও ডাহ ফকির। সে একবারে কথায়-কথায় বলল—ডাকাতী বরল বাড়ছে। এমন মেয়েও ঘরে থলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কি ঠিক? তো আমি বলল্লুম —আই কোথায় বলো? মাটিতে কাজল পিপড়ে ওবে, মাথায় উঠুনে।'

অন্তর্বাসিক্ত হেসে বুড়ো ফের জানাল—'শালা জামাই বেঁচে গিলে। খোঁড়া কবিরের নাড়ি নক্ষত্রের। নেশা-ভাং করে বেহুঁশ। গুণ্ডামির জন্যে বদনামও আছে। মরে মরে মোড়লরা মিয়ানা ধরে বেরম স্পেটাই। কখনও ডিফেন্সিভেও করে বাড়ী। দেখে শুনে মারা জন্মাল। যা বাছে কপালে বলে ওখানে শালার বাড়ি বলেই রাতারাতি সাদী পড়িয়ে দিলুম। বাড়ি আনলুম। ভাবলুম, গলায় চেয়ো পড়িয়ে বশ মানাব। তো শালার বাড়ী গলা উচ্চস্তরী হয়েছে। ধরবাসো মনই নেই। আর, উঠতে বসতে মেয়েটাকে পিটুনি দেয়।'

মরজিনা ফাঁকালো গলায় বলল, 'হুঁ, হুঁহেন!' ওর পিটুনির ধর বাড়ি? আজ দুপুরবেলা টাকা-টাকা করে কলহ বাধিয়ে ছিল। পাঁচের মেলায় যাবু, মনোহারি কেনে সখ হয়েছে। কলহাটি যাবে মাল কিনতে। বলে, দশটা টাকা দে।'

মদনচাঁদ কান পেতে শুনছিল। বলল, 'হুঁ। তারপরে? দিলি, না দিলি না?'

—'আমার টাকার গাছ আছে কি না।'

—'দিলেই পারতি। একুশটা টাকা কেঁথাইলুম না?'

মরজিনা হেসেফেলে বলল, 'যাহ, যাহ! এই না হলে সাদ্! সেদিন একটা ছাগল কিনে দিলে না এগরো টাকায়? কার হরেছমনে এনেছিল, ছাগলটাও সেয়ানে মারল।'

মদনচাঁদ গুম হয়ে বলল, 'হুঁ। বাকি দশটা?'

—'নাও, হিসেব নাও।'...বলে মরজিনা একহাতে লম্ফ নিয়ে উঠোনে নামল। অন্য হাতের আঙুল ঘুরোতে ঘুরোতে বলল, 'পুজোবার পাঁঠা কিনতে মাতঙ্গিনে নিলে। তারপর ছেলের জন্যে নিলে পাঁচ টাকার একটা নোট। কত থাকল?'

আবদুল্লা বলে দিল, 'তিন টাকা চার আনা।'

—'তিন টাকা চার আনা। এক টাকায় গামছা কিনলুম কাল। নাতা কিরে কতকাল চুল নুহেব শুনি? একমাথা চুল পানি ঘেন-ঘেন উকুনের বাথান হয়েছিল।'

মদনচাঁদ বলল, 'হুঁ, রইল দুটাকা চার আনা।'

—'তুমি তো সেই শুক্কুরবার এলে আজ রোববার। এই তিন দিনে নুন তেল চাল ডালের হিসেব করো। বারো আনা সের হয়েছে চাল। করো, হিসেব করো।'

বুড়ো অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আহা, থাক, থাক।'

মরজিনা এক পা বাড়িয়ে ঘুঁচিয়ে উঠল, 'কেন থাকবে? আজ তিন বার ভাত খাস না। এ বেলা তিনকেজি চাল বদ্রোকিয়ের বৌর কাছে আর আনলুম। তিন আনলুম বুড়ো নমর অঠেরো পয়সা দিয়ে। একসেরা ডাল নিলে চার আনা। আলু একসেরা ছোঁচ পয়সা। হাতে ছিল সাত পয়সা —মোকানে গাঁকি আনলুম সাত পয়সা। আর আমার কাছে কী থাকে?'

অমনি সেই হড়কা বহনের মতো হা হা হা হা হাসি। বুড়ো হাসির চেয়ে কুকে পড়ে বলল, 'নাতো ওরে দিলি বৌটি মেহমানদের সামনে! কাপড় ছেড়ে নিলি!'

মরজিনা হাঁকাচ্ছিল। হঠাৎ দেখি, ওর চোখে জল টলটল করছে। নাও-ঝাপটা তিরিতির করে কাঁপছে। মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে যেতে দিকে। কান্না জড়ানো স্বরে বলল, 'তাবলুম বাপ আমার সফর থেকে ফিরছে। না জানি কোলা বোকাই কত চাল থাকবে। আমার ভরাত!'

মদনচাঁদ আর্তনাদ করে উঠল যেন পলায়, 'বেটি! মা মরজিনা! মোহাই তোর! অত্রার ইজ্জার কবিরের কোলা কখনও খালি থাকে না! ছুইতেছের মেলায় নমর তিন টাকা পেলা পেয়েছি। ভাবিস নে!'

তবে সে নড়বড় করে ঘরে ঢোকে সামলাতে গেল। আবদুল্লা আমার হাত ধরে টানল। দুজনে উঠোন পেরিয়ে নদীর ধারে দাঁড়ালুম। অন্ধকারে নদীর তলাটা ছুসমার দেখাচ্ছে। রহতের বাতাসে কোলাঙাড় দুলছে। নক্ষত্রের আলোর নীচে বালির চড়া আবছা চোখ পাওয়া যায়। ওপারে বাঁকের দিকে একখানে আলো জ্বলজ্বল করছে দেখলুম। অনেক লোক নদী পেরিয়ে মেলায় চলেছে। আলোটা দক্ষিণ-পূর্বে কোণে। আবছা ভেসে আসছিল গানের সুর। মাঝে-মাঝে গরুরার একসা জমজমাট আসর চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন অন্য মানুষ হয়ে গেলুম। একা আর কোথায় মরজিনা, কোথায় বুড়ো কবির—কোথায় তাদের টাকাপয়সা-সংসার হিসেবনিকেশ এবং দারিদ্র্য! সব এই বিশাল রাতের আকাশের নীচে প্রকৃতির বক্ষপঞ্জরার একেবারে মুক্ত হয়ে উঠল। তারপর শুনি আবদুল্লা গুনগুন করছে:

'মানুষরতন চিনিলি না মন
এখন
জীবন আর কী হবে।
শূন্য আকিঞ্চন বসনভূষণ
মাঁপিতলাকে কাল কি কাটিবে/...'

—'আবদুল্লা!'

—'জী।'

—'তুমি বিয়ে করোনি কেন?'

আবদুল্লা অপ্রস্তুত হাসল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আহা, আপনি বি.এ-এম.এ পাস শিক্ষিত আছি। এটাও কেনেন না, রাস্তার ঘাস পা—তার পরে রাস্তার টান লাগে। আমার মাঝি বলতেন—মেটা আবদুল্লা, ওই টান বড় টান। পা তোর থির মানবে না। মাটি যে টেনেছেলো সমানকম। পা বাঁধলি কি মলি—তখন বাঁট-কাটানো মরা। তাই বলি সার, যখন আমার গায়ে সাদনের টান, তখন পিছুটান নাই যা নিলুম। স্থালোক টানে পিছন থেকে। বলে—ফিরু হও। এই দেখ ঘর। ঘরের ঘরো মেহনতানী। এই দেখ সোনার পালঙ্ক, ওই দেখ মুখ দেখার আরনা, আর আমি জঙ্গলি চেরাগ ঘরে। তুমি সুখে নিয়া যাও। কেমন কিনা?'

আনমনে বললুম—'হুঁ।'

—'সার, আমাদের আবকতী অতে বলে, এই যা সব দেখছেন—এই দুনিয়া আসমান বেহাণ্ড চাঁদ সুরুজ, সবই 'জাহের' (প্রকাশ্য বিষয়)। ধরুন, এই জাহের হল মাটির ওপর বুক। কিন্তু বুকের যে মূল আছে তলায়। মূল ছাড়া কিছু নেই। ওই মূল তো আমরা দেখতে পাইনে চামড়ার চোখে। ওই মূলের নাম 'বাতেন' (অপ্রকাশ্য বা অন্তরালবর্তী)। বাস্তবিক ভাষার ঘি-ইন-ইটসেলফ্ যা পদার্থ সত্তা।। দুজনে বিজ্ঞমান বাড়ি। এখন দেখুন, রাস্তার ছেলে না মেলে মূলের বাতেনে পৌঁছনো যায় কি? যায় না। ধরবাসী হলুম, না জাহেরে বাঁধা পড়লুম। সাহের ডালে ঘুরি ফিরি, নাচি কুদি মুখপোড়া হনুমানগুলোর মতো। ফল খাই। পাতা ছিঁড়ি। লম্ফে-পাঁপে করি। হাহ, মূল যে দেখা হয় না!'

যেন বা ও আজানতত্ত্ব আওড়াল। এ্যাপিয়রেন্স এবং রিয়ালিটির গুহ্যকথা। এই বয়সে অতসব শিখল কোথায়? আমি অবাক হয়ে বললুম —'কিন্তু তোমাদের সুফী গুরুরা তো বৈষ্ণবদের মতো রাধা-কৃষ্ণ মূলের মিলনের কথা বলেছেন! স্থালোক ও পুরুষের প্রেম-সুহৃদ্যতেই খোদার নিশানা খুঁজে পেয়েছেন।'

আবদুল্লা জবাব দিতে পারল না। বলল—'জী হাঁ। সেও এক রাস্তা। একদল আউল বাউলাদের। আমি অনলাল। মেলায় ছেলে সব রসের তত্ত্বই জানবেন। কই, চলুনাই দিন। একটা সিগারেট খাই। দিন, আপনিও খান!'

ওর একতারা আর ঝোলাটা কাছেই রাখে সব সময়। ঝোলা থেকে একটা দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করল। অবশ্য জ্বালাতে গিয়ে তা চোখে পড়ল। দুজনে সিগ্রেট টানছি, এমন সময় মদনচাঁদ ছোরিকেন হাতে বেরুল। ডেকে বলল—'বাবাজীরা কোথা গো?'

আবদুল্লা সাড়া দিল—'আসুন আসুন। আপনার জন্যে অপিক্ষা করছি।'

—'মরণের সাধি যওনা।' কবিরী হাঁক দিতে দিতে চলে এল বুড়ো। বস্ত! তেল চুকচুকে মুখ—বাবি ও চুলেও তেল মেখেছে। নিশ্চয়ই চেলকার বসিয়েছে। পিছনে মরজিনাও এসেছে। এর মাথায় একবলে ঝোলাটা দেখলুম। আঁচলের খুঁটে চাবি বাঁধা। মরজিনা বলছে।—বৌটিকেও আনলুম। একা-একা ঘরে থাকবে। আমাই শালার পাত্তা নেই। এসে দেখবে, পাখি উড়েছে। তখন বুকে চাপড়ে মরবে।'

একটু শঙ্কিত হলুম। বললুম—'একেবারে ঘর ছেড়ে এলে নাকি কবির সাহেব?'

মদনচাঁদ জিভ কেটে বলল—'কথার কথা বলছি, বাবা। বৌটি, ছোরিকেন নিয়ে তুই আসে-আসে হাঁট্। রাস্তা দেখিয়ে চল্, মা। এ তিন বেটা কানা।'

মরজিনা বলল—'উহুঁ। আমি পিছনে যাব। তোমরা এগোও।'

আবদুল্লা ঝোলা থেকে একটা টিন-বাটারি টর্চ বের করে জ্বালাল। মদনচাঁদ লাফিয়ে উঠল—'আই আমার বাপ রে! সোনা রে! মাণিক রে! তিভুবন উজালা করে দিলে রে!'

বলেই সে ছোরিকেনটার কাচ তুলে ফুঁ দিয়ে নেভাল। তারপর সবার আগে আবদুল্লা, তার পেছনে আমি, তারপর মদনচাঁদ, পিছনে মরজিনা নদীর ঢালায় সাদ্ ঘাস বেয়ে নেমে গেলুম। নদী শুকনো। একখানে একফালি স্রোত বইছে। কালো স্বচ্ছ জল মাখা কুটাছিল অন্ধকারে। আলো পেয়ে যেন সরমে শিউরে উঠে থমকাল। ওপারটা ঢালু। ঘুমন্ত, তরমুজ এ সব চাষ করা হয়েছে। কাঁটার বেড়া আছে। সকৌশলে সুখে উঠতে থাকলুম। হঠাৎ শুনি মদনচাঁদ বলছে—'মরল! মেহেরু আমার পানির সেনায় পেলে গো! চলে যায়, চলে যায়।'

পিছনে ঘুরে দেখি, মরজিনা বাচ্চা মেয়ের মতো হোহে পা ছুঁকিয়ে যেন খেলা করছে। আবদুল্লার টর্চের আলো ঘুরে ফিরে ওর গায়ে পড়তেই মুহূর্তের মুখ ঢেকে একটু ঘুরে বলল —'যাহ!'

তখন টর্চের আলোটা পথ করার নীচের জলরাশি ওর পায়ের কাছে ঘুরে পড়ল। স্বচ্ছ জলের তলায় মরজিনার আলতাপরা পা দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। হ্যাঁ, সেও দেখেছে। মুখে দেখা পাউডার মেখেছে মনে হল। কপালে লাল মোটা একটা টিপ। খোপা বাঁধা চুল। ঠোঁট কামড়ে ধরে সোজা উঠে এল সে।

আবার আমার বুকে একটা চিঢি পড়ল। যেমন করে বাঘিনী ছুটে আসে হরিণের পালের দিকে, ওই আসার মধ্যে তেমনি একটা ভঙ্গী। এবং হরিণ কথাটা মাথায় এল বলে মদনচাঁদকে বললুম—'এই গানটা একটু হোক তখন। সেই যে সর্পের ভিন্ন...'

বুড়ো সেরা করল না। পায়ের বাঁধে উঠে ছোঁড়ে গলায় বলল।

'তিরাপিনীর ঘাটেতে এক জরা
ভাসতেছে/
বড়ায় বুকে সর্পের ভিন্ন/
হরিণ চাহেছে/...'

বিশাল অন্ধকার প্রান্তরে সেই

উপায় অবাধ সঙ্গীত রহস্যময় মূর্তি-পরের ধ্বনিসমূহকেও জাগিয়ে-জাগিয়ে তোলপাড় করতে থাকল। আবদুল্লা সহরের মুখে তাঁকরী নাম ধা 'জিপির' ডাকল সজোরে: মারেক সাই মওলা!'

ঠোঁট দেখে বুঝি আউল ক্রমশ নিজের আসল মূর্তি ধরছে। ক্রমশ অচেনা হয়ে উঠছে আমার চেখে। পরিবেশ-পরিমণ্ডল কাছাকাছি গিয়ে দুজনে অদ্ভুত যোলচাল শুরু করল:

লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্/
মাফি কলবা গায়রুল্লাহ্/
হাম্মতে রাখি সাহেবল্লাহ্/...'

এই ধ্বনিসমূহের অন্তর্নিহিত অন্তরতা অসাধারণ। এ যুক্তি সেই নানা-ছন্দ। হিজল অঞ্চলে এক তান্ত্রিক সাধু আমাদের বাড়ি এসে নরে আমাকে ভরাট করে গেলেছিলেন। সেই মহাকাল-মহাতাল একাকার করা প্রতিমানবিক ভয়ঙ্কর গর্জন এখনও মনে পড়লে বুক কেঁপে ওঠে। সেই নিশুতি রাতে নিজন কালী মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে ঠোঁর পাঞ্জিল্যে সারা মন্দির গমগম করে অনন্ত ভূমের মতো বাজছে—ঔং! যেন সৃষ্টির নাভিমূল থেকে উঠে আসা ওই নাদ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সৃজন-পালন-সংহারকে ওতপ্রোত করে কেলেছে মহা-কালের গহ্বরে। ঔং! এই গর্জনে কামনা আছে, তাই সৃষ্টি আছে। প্রেম আছে, তাই পালন আছে। ঘৃণা আছে, তাই সংহার আছে।

'মাফি কলবা গায়রুল্লাহ্!' রহমতুল্লা দেবার জন্য নিয়ে দাঁড়াল। আবদুল্লা পাল্টা হাঁক ছাড়ল: হাম্মতে রাখি সাহেবল্লাহ্!' তারপর দুজনে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—'মারেক সাই মওলা!'

দরজার সামনে গাছপালার ঢেলার সান্ধিয়ালা আর হ্যাসাক জ্বলছে। অজস্র কবিরকবরার ভিড়। দুদ্দুম ঢোলক বাজছে। একতারার পিঁড়িং পিঁড়িং চলছে। কারুর কাছে এক-তারাটা ধরে মুখ কাত করে এবং চোখ বুজে এক ভাঙা আলখেল্লাধারী সুদর্শন প্রৌঢ় কবির একটু-একটু নাচছে। মনমাতাল যেন আনুন আনন্দে বিশ্বেশ্বরার মতো দুহাত তুলে দৌড়ে আসরে ঢুকে পড়ল। তার পেছন পেছন ঢুকল শান্তভাবে আবদুল্লা। আমি মঞ্চকে দাঁড়িয়েছি। মন নাচে, আমার। পিছন থেকে মরজিনা চাপা গলায় বলে উঠল—'ওই সঙ্গের মধ্যে ঢুকে কি করবেন? দেখছেন না হিজিবের বেরিয়ে সব বাসনা। নেশা ধরে যাবে! আমার তো ধরেই গেল। ইস্, মা গো! ভূতপেত্নিদের বাথান!'

ঘুরে দাঁড়ালুম। অজস্র চোখ আউলকন্যার দিকে। নানা বয়সের মেয়েরা মানুষ—তরুণ পুরুষ ও স্ত্রী-লোকেরা আছে, কবিরও আছে। বললুম—'কোথায় যাব তাহলে?'

চোখ টিপে হাসল আউলকন্যা।—'আসুন চেলা চোখি আসুন।'

পা বাড়ালুম। লোকেরা তাকাচ্ছে। অস্বস্তি হচ্ছিল। একরাশের ঢেলার অন্ধকারে দোকানপাট এসেছে। এদিকটা বিলাস বনোবাসী বিলাসের উদ্‌ঘোষের জন্যলে ভরা। নদীর পাড় বরাবর ঘন গাছপালার জঙ্গল। তলা সাফ করে দোকান বসেছে। মরজিনার থামার ইচ্ছে নেই। ঢেলার ঠেলে ঠিরে সে বাঁয়ে ঘুরল। গাঢ় কোপঝাড়ে ভরা জায়গাটা। কোন লোক নেই। ওদিকে কোথায় যাচ্ছে? আমার দিকে ঘুরে একটু হেসে বলল—'আসুন, কলা গাছগুলোর পাশে নেলায় বসে আসি।'

—এখানে মজবেন খাবে নাকি?'

—হুঁ। ঘুচোখ কানা। মরজার পেছনে একটা ঘরে থাকে। ঘরের তিন লোকে মানতের সিরে দিয়ে যায়। তাই নিজের হাতে রান্নাবান্না করে খায়। তপজপ করে। খুব ভাল মানুষ।'

এই জনহীন বিলাসলের জঙ্গলে এত এক সাধুসন্ত থাকেন! খুব কৌতূহল হল। মরজিনা গায় পেঁচিয়ে এগোচ্ছে। মনে মনে বলছে —দেখেড়। ছোঁচট খাবেন না যেন।'

দেখেড়ের নয়, আমার ভয় সাপের। কিন্তু ও বেভাবে হাঁটছে, মনে হল প্রতিটি ইঞ্চি ওর মুখস্থ। ঢেলার আলো ক্রমশ মুছে গেল। একেবারে পিছনে চলে এসেছি মরণার। অন্ধকারে একটা লম্বা জঙ্গলেতে দেখলুম। ইটের ভাঙা পাঁচিল—মন্দো ছোট মন্দো। ভিতরের উঠোনে আলো পড়েছে। কয়েকটা ঠেকো প্রকাণ্ড পাথর পড়ে আছে। এ নিশ্চয় সেকালের কোন বড় তীর্থ। একটা ইটের ঘর দেখা যাচ্ছিল একতালা। ওপরে খড়ের চাল। সম্ভবত হল ঘরে পড়ার পর এই ব্যবস্থা। চারপাশে ইটের স্তূপ। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা আছে। কাঠমল্লিকা ফুলের গন্ধ ভাকিলো হয়ে নাকে লাগল। উঠোন-ভরা ফুল দেখলুম। লম্বাটা জঙ্গলের ভিতরে একটা বেদীতে। মরজার কাছে একটা নাঙ্গু জলচৌকিতে যে বসে আছে, সেই বুঝি ভানা মজবেন। কয়লা পোয়াক। মাথায় কালো পাগড়ি। গলাভর্তি বড় বড় হরেক-রঙা পাথরের মালা। পায়ে একটা মোটা লাঠি—তার মাথায় পেতলের মন্দির। একটা হুঁচোট খোঁয়াচ্ছে হাতের কাছে। হুঁকোর মিঠে গন্ধ পেলুম এবার। মজবেনের চুলবাড়ি লালা। গায়ের রঙটা কালো। প্রকাণ্ড মানুষ। হাতে একটা 'তসবীহ্' বা জপমালা জড়ানো। উঠোনের অন্ধকারটা পেরোই গেলোজড়ানো গলায় বললেন—'কে?'

অমনি মরজিনা প্রায় হোঁচল।—'তোমার বেটি, বাবা।'

—'অই মা! মরজিনা বিবি! আয়, কাছে আয়। আপিন কেন আসিন নি মা?'

মরজিনা ছেটে হয়ে ওঁর কুশলের চুমু খেল। বুড়ো মজবেন তসবীহ্-সুদ্ধ হাত ওর মাথার পিঠে বুলিয়ে বিড়বিড় করে কী মন্ত্র আওড়ালেন। তারপর বললেন—'তোর সঙ্গে যে আছে বেটি? মনসুর বেটা?'

—তোমার মাথা খারাপ? এক নতুন মানুষ। খুব শিক্ষিত লোক। গানের মাস্টার।'

—বাপজান, বসুন।'

ভাঙি বসা ঠিক হবে না, রীতি মানছেই পায়ে হাত ছুঁইয়ে সেলাম করলুম। আমার পিঠেও তসবীহ্ পড়ল। তারপর মুখ তুলে বেঁচি কানা চোখ খুচো দিয়ে মজবেন আমাকে যেন দেখছেন। গা শিউরে উঠল। কী দেখছেন আমার মধ্যে? পাপকলিত বিদ্রূপতা? অন্তরের কাছে এসে পড়া স্বপ্নিত কোন কলনাম?

—'বসবার নাম? বোকরা?'

সব কলমুম। মরজিনা জলচৌকির কোনার কাছে ঘরের ভিতরটা দেখছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি। মজবেন বললেন —'বেটি, ভেতরে বসার জায়গা দে।' তখন মরজিনা ঘরে ঢুকে একটা তালা-পাতার চটাই এনে পেতে দিল। বসলুম। সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে—অথচ মজবেনের সামনে খাব কি না, দ্বিধা হচ্ছে। মজবেন একটু-একটু দুলছেন, আর মালাটা জপ করছেন। ঠোঁট কাঁপছে—তার মানে ভিতু উচ্চারণ করছেন। হঠাৎ মরজিনা ঘরের ভিতর থেকে চোখ টিপিয়ে হাসিমুখে মজবেনকে বলে উঠল—'বাবা, আজুর-ফল খাব।'

মজবেনের মুখে হাসিতে উজ্জ্বল হল। বললেন—'কী খাবি? আঙুর ফল? হট, ভাগ্ ভাগ্!'

মরজিনা বালিকার ভঙ্গি করে ঠোঁট উল্টে বলল—'না—খাবো।'

আমি অবাক। হঠাৎ এই বিজন জঙ্গলে ভূতুড়ে বাস্তানার আউলের মেয়ের আঙুর খাবার সখ হল কেন? হাঁ করে তাকিয়ে থাকলুম। মজবেন দুলতে দুলতে বললেন—'এখন আঙুরফল কোথা? ভানা ভিতু, যা।'

—না। আঙুরফল খাবো!'

আউলকন্যার ঠোঁটের কোনায় দুষ্টু হাসি, আমার দিকেও বিলিক হেনেছে। যেন বলছে—দেখুন না কী অবাক কাণ্ড হবে! মজবেন খিকখিক করে হাসছিলেন। বললেন—'মুখের কথা বললেই তো হল না বেটি। যাবে পাহাড়ী মুলুকে, আনবে—তারপর তো! সে কি এখানে মেলে?'

—উঁহু। হুকুম করলেই আসবে। সেবার কেমন করে মুখের কথা বলতে না বলতে এল?'

মজবেন গম্ভীর হয়ে গেলেন।—'সেবার আমার নিজেরই খেতে ইচ্ছে হয়েছিল কিনা।'

—তাহলে এবারও ইচ্ছে হোক্।'

—নয়। ঘাটোয়া এখন বুঝেছে। তাহলেই ছেলে যাবে।'

মরজিনা ঘরের দিকে উঁকি মেরে বলল—'ইস্, ভারি আমার রাগ! ঘাঁড় কেলিয়ে ওই তো পড়ে আছে ভিজিয়ে।'

আত্মারাধা

আমার চোখ মেলে সোজা। রেখে খ হয়ে গেলুম। কালো কাপড়ে ঢাকা একটা বেদী ঘরের মধ্যে দেখলুম। তার ওপর ডিমটে মড়ার মাথা। ওপরে বাড়বাতির মতো বড়ানি কায়দার মতো কতকগুলো নল। একটা ফুল ফুলছে। তার চারদিকে সোনার সাপ, রাঙতা দিয়ে বানানো সব ঝুলি ঝুলছে। কিরকিরে ধোঁয়ার রাঙতাগুলো। সিলিংটা ঢালাইয়ের বেশীর নীচে। কতকগুলো আলকাতরা রোয়াজে। এতক্ষণে চোখ সেলুম এই দরবেশ এক সিগারেট টানছিল। সুতোয় ঝুলছে ঘর প্রেতপুরীর। মাথা ঘুরিয়ে ভয়ার খেল দেখল। এই ওপর ছবির খেলা আমি প্রচুর দেখেছি। পুরীজেলা পুরুষ—হিন্দু বা মুসলমান যে ধর্মেরই হোক, নাস্তিক প্রেত বা দৈবশক্তির অধিকারীর ঘরে ঘরে দেখেছি এসব।

দরবেশ বললেন—'ভয়ের কিছু নেই আমার। ভাল্লুক খাওয়াব। অন্য কিছু না।'

মর্জিনা হো হো করে বলল—'এ হো পুরুষবাবা। অন্য মেয়ে আমার সব না।'

দরবেশ হয়ার পাশের মুরোকরা দেখে থেকে একটু লালচে মাটি তুলে নিলেন। নখগুলো বড়, তীক্ষ্ণ, ঝকঝকে। দেখে একটু ভয়ো হল নিজের। মাটিটা নিয়েই বললেন—'নে বেটি, হাত পাত। সাপ সঙ্গে মুঠো করবি।'

আমার চোখের সামনে এক ভাজব ঘটনা ঘটল। মর্জিনার দুহাত দরবেশের হাত পড়ল এবং মর্জিনা হাত মুঠো করল। দরবেশ হাতটা সরিয়ে নিতেই মর্জিনা মুঠো খুলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—'সোনা!'

সেই ওই হাতের তালুতে এক বড় ভাজব সোনা! সোনাটা সবার আগেরে খুটে খাবার খাবার মর্জিনা বলল—'এখন না, পরে খাব। বাবা, এবার নতুন মানুষকে কিছু দেবেন না? বড় দুঃখ করে এসে বসল?' বলে সে আমার দিকে কটাক্ষ হানল।

দরবেশের অন্ধ চোখদুটো হারা-ছিহীন চোখদুটো আমার দিকে ঘুরল। এ যদি বিজ্ঞানের যুগ—কোন জনপদে ছিড়ে ফাঁড়, যদি না এটা হত কোন জন্মহীন আদিম নিসর্গ—এবং এই অন্ধকার রাত, জন্তুজানোয়ার কালো কালো পাহাড়গুলা বাতাসে সনসন করে ঘুরছে—আমি একটুও আকৃষ্ট হোত্ত না। মানিক আর বৌকাবাজির খেলা আমি তো অনেক দেখেছি! কিন্তু এই ত্রিমিটারে লম্বের মানুষের আমার বুদ্ধিবোধ খুব কুকুরের মতো কেউ এসেই চুল করে দেয়া মনের ভাষায়। এক ধাক্কায় ঢুকে পড়েছি সঙ্গে সঙ্গে। এ সেই ত্রিমিটিত মানুষের জগতে—অলৌকিক শক্তিসম্পন্নের স্বাদা সতত আক্রান্ত হা। হাজার-হাজার বছর পিছিয়ে গেছি হঠাৎ। বুক কাঁপছে। ঠাণ্ডু ঘামি হয়ে গেছে। চোখ নিষ্পলক। দরবেশও স্থির স্তব্ধ। শুধু ঠোঁটে একটু হাসি। সে-হাসি কিসের আমি জানি না। নাকি অতীন্দ্রিয় মায়াজগতের এক পরীক্ষের আত্মবিশ্বাস? সে যেন বলতে চায়, দেখ—তোমায় এনেছি তোমাকে!

দরবেশ অনেক্ষণ দু' মিনিট নীরবতার পর বললেন—'ভয়ো! তোর মনের মনে জানিস?'

আমি বললুম—'না। কারণ, আমার মনের মনে কী জানবার আছে তোর কখনও জানিনে। আমার যা দেখে বা শুনে আসছি, যেমন ধরো মা গাছ মাটি বালকেত সূর্য—এর কোন মনে নিয়ে আমার কী দরকার? যেমন গাছ কী আমি জেনে গেছি, তেমনি আমার নামটা বলতে কাকে তোকার ভাও জানা হয়েছে। তার বাইরে কী জানার থাকতে পারে?'

দরবেশ বললেন—'সিরাজ মনে তোমার। লম্বা। শিকার। ওই যেমন ঝুলছে। ওই যে বাতি দেখছিস, সেই বাতি। কতটা আরবী। আরবীতে যা সিরাজ, ফারসীতে তাই চেরাগ। আরবীর তিন হরফ ফারসীতে চে। (অর্থাৎ স হয়েছে চ) প্রায় আরবীর যে ফারসীতে গাস (অর্থাৎ গ হয়েছে গ)।'

মুহূর্তে আমার মহাকাব্য এক চলকা দেখবার সবে সকলের জলমলানি ছেলে উঠল। প্রবীণ আমার নয়? ও'শাবাশ—আমি ভয়ো! কী ভয়ো! ভয়ো আমাকে হতবুদ্ধি করল।

—'ভয়ো!' দরবেশ ডাকলেন। একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন—'কিন্তু শিকারের তোর আঁধার আছে, জানিস ভয়ো?'

আমি বললুম—'হুঁ। জানি।' আর মর্জিনা আমাকে দেখতে থাকল।

—'ভয়ো, হুঁসিয়ার। খুব হুঁসিয়ার! তোর আঁধার নিয়ে মুরোছিস! আঁধারে সাধারণ পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হয়। কিন্তু সাঁইজীর মহিমা দেখ্ বাবা, তোর ওপরটা কী উজলা! রোশনিতে খুশি ফিরে যায়। হায় রে হায়, এ বড় তাজ্জব!'

চুপ করে থাকলুম। ধরা পড়ে গেছি। হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছি এই অন্ধ ফিকিরবাজ ফকিরের কাছে। আমার তামাম অন্ধকারে পাপের সরীসৃপ নড়ে উঠেছে।

হঠাৎ নড়ে উঠলেন দরবেশ। মুখটা ঝুঁকে এল আমার দিকে। ওর নোংরা শরীর ও অনেকক্ষণের জাগানো দুর্গন্ধ এসে লাগল। চাপা স্বরায় বলে উঠলেন—'পালা! শিগগির এখের কাছ থেকে পালিয়ে যা! তোর এ লাইন নয়। তুই পারি। যা, একুনি পালিয়ে যা!'

ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম—'কোন লাইনে তো আমি আসিনি ফকির সাহেব। এসেছি একমাত্র আরজারী খান শুনতে! সকালেই চলে যাব।'

দরবেশ কেমন হাসলেন।—'ভয়ো ভয়ো আমার! একটা রাত! একটা রাতেই দুনিয়া বদলে যায় যে। একটা রাতেই সব ওলটপালট হয়ে যায়। হুঁসিয়ার! এ রাত বড় সহজ রাত নয় রে!'

অবাক হয়ে দেখি, মর্জিনা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মুখটা গম্ভীর। নাসারন্ধ্র কাঁপছে। সে আমার চোখের দিকে ইসারা করল—চলে আসুন। চরণের লাওয়া ছেড়ে উঠোনে নামল। আমি কী করব ভাবছি। একটা অন্ধ লোকের ওপর এই হঠকারিতা দেখানো কি উচিত হবে? কিন্তু মর্জিনা উঠোন ছেড়ে ফেরে হাত নেড়ে ডাকল।

কোন কথা না বলে উঠে এলুম। ভাঙা ফটক পেরিয়ে ছেড়ে ছেড়ে শুনি দরবেশ ডাকছেন—'মর্জিনা! বেটি মর্জিনা!'

আরও দূরের ছেড়ে চুপ করে গেলেন কানা দরবেশ। অন্ধকারে পাহাড়ীয়ার মতো ঢুকে মর্জিনা ধরকে দাঁড়াল। এত দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল যে মুখোমুখি বুকে বুকে ঠেকার উপক্রম


আপনার চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি পেতে চান কী?
এক কাজ করুন
কাছের ডাকঘরে নিন

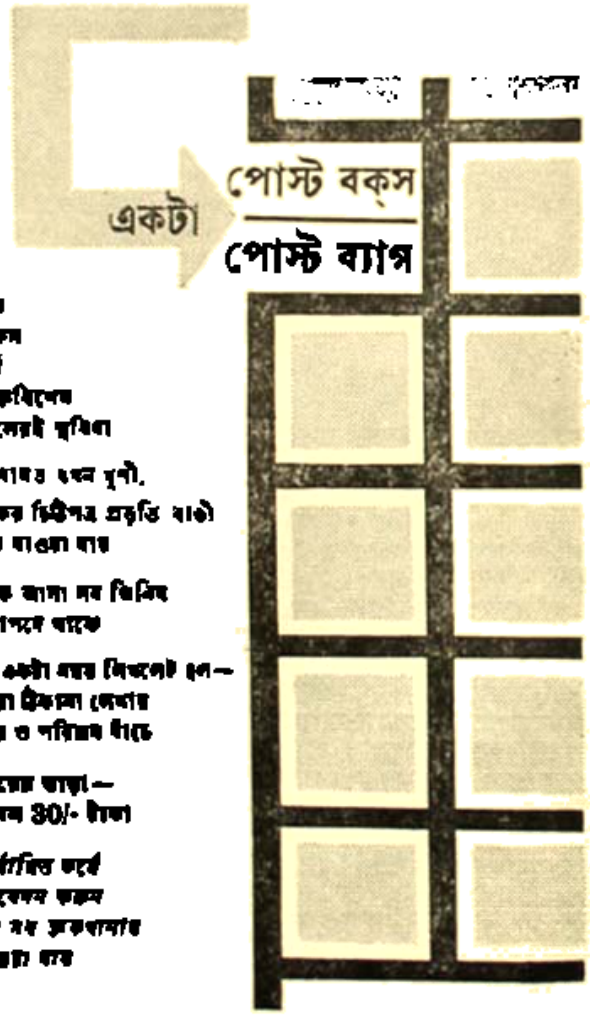


এতে
আপনার
আর
বাড়িয়িদের
সকলেরই সুবিধা

সুবিধাগুলি এখন খুশী,
ডাকের চিঠিপত্র প্রভৃতি বাড়ী
নিয়ে যাওয়া যায়

ডাকে আসা সব জিনিস
নিরাপদে থাকে

শুধু একটা খরচ দিলেই হল—
পুরো ঠিকানা লেখার
সময় ও পরিশ্রম বাঁচে

বছরের ভাড়া—
কেবল 30/- টাকা

বিশেষ তথ্যের
জন্যে দেখুন
আপনার নিকটবর্তী
ডাকঘরের
দেয়ালে
লাগানো
বিজ্ঞাপন

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

হল। কিন্তু সে ঘরে ঢুকল না। তার আগে তো অবশ মানুষে তখন। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনলুম। গন্ধ পেলুম। ঢের ঢের ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে আছি। ওদিকে বুড়ী ঝাড়িনী বলছে—'হুজুরের কিছু? মাথার চুলের? আপনি না হি-এ এম-এ পাস?'

এক্ষুণি হেসে বললুম—'কী হবে?'

—'কবির না কাজরা! কবির আর বশ্যবন্ধনী! তবে চিনেছিলুম—আমারই ভুল।' মরজিনা হঠাৎ করে কথাগুলো বলল।—'আমার হারামী বুড়ো কানা আমাকে ওইরকম ভাবে! না জানি চোখ থাকলে তিরাশি থেকে আরও যা খুশি বলত! আমি জানি না আবার?'

—'তোমাকে তো কিছু বলল নি, মরজিনা। আমাকেই বললেন।'

মরজিনা ঘুরে পা বাড়াল। ও কি কান্না চাপছে? বলল—'কানাবুড়ো, তোরই তলায় আঁধার। ঘর পাস ঘর সাপবাস, সব তোরই মতো বাস।'... আঁচলের আঁচলের ছিট খুলে সেই মোড়কগুলো ছুড়ে ফেলল।—'ও বৈজিকবন্ধনী কি কাজে লাগি না! তোমার হাতের লুকিয়ে রেখে কেরামতী দেখায়! আজুবকল! ওর চৌদ্দপুরুষ আনবে পহাড়ী আজুবকল! জানিনে—আমি কিছু জানিনে! ওই যে কথায় বলে—ঘরে ঘরে কাজ, কবির মেয়ার জাঁক।'

তখনও বাচপাকী আমার কাছে আছে। কেন হঠাৎ ওর মনে এই ধরনে ঘটল—কেন এতদিনের বিশ্বাস ও সংস্কার হঠাৎ ঘুচে গেল, তখনও স্পষ্ট টের পাচ্ছিনে। বললুম—'মরজিনা, ওঁর ওপর এত রাগলে কেন বলছ?'

মরজিনা দাঁড়াল। তারপর ঘুরে, ঘুরে কেঁদে ফেলল।—'মাস্টার, ও আমার কতো ঘরে নূনের ছিটে দিয়েছে! উঃ, মাথো!'

নিঃসঙ্কোচে ওর দু' কাঁধে হাত রেখে বললুম—'কিন্তু মরজিনা, তুমি তত ছোট নও। কবির মাই ভাবুন, আমার মনে তোমার জন্যে কোন পাপ নেই।'

মরজিনা আবেগভরে হাত ছাড়িয়ে এগোল। যাক, এই অসুস্থ সময়ে, এই অন্ধকার অরণ্যের নির্জনে, আউল-জন্তরে ওলমাসি ঘনের চেয়ে সুরোজী কীভাবে হারালুম!...

॥ তিন ॥

তখন আউলদের আসরে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। কে একজন প্রচণ্ড দুঃখের দিয়ে বলে উঠেছে—মানেক্ সহি ধওলা! আর্বান শহরিক কবির পদ্যের মালাগুলো ছেড়ে নাড়া দিয়ে অন্তত দু-তিন মিনিট কোরাসে গর্জন করছে। বহু বহু যামার বহু। বহু বহু যামার বহু। তারা দুলছে। আসরে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। বাকি সব লোকেরা সবাই চুপচাপ। মেয়েও যেন কথা বন্ধ করেছে। মোকামগুলো কাঁকা। হোঁয়েকেন বা মেয়েদের জলোয় মোকামীরা ছটফটিয়ে বসে জলদের দিকে তাকিয়ে আছে। আবার ঝিকার উঠল—মানেক্ সহি ধওলা! আবার আখির গর্জনে আবৃত্তি চলল—বহু বহু যামার বহু! বহু বহু যামার বহু!

ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি মরজিনার পহনে। কেউ আর আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না। মরজিনা আনমনে খুব আস্তে বলে উঠল—'মানেকপীরের জন্ম নেয়েছে আসরে। এক যামার এখন পরে পরে।'

ব্যাপারটা বুঝলুম না। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পাথরের মালার আওয়াজ, সত্যিকার কণ্ঠস্বরের ওই গর্জন, সব মিলিয়ে একটা বেধা বা শোনার মতো ব্যাপার। আজুবকলকে খুঁজলুম। দেখতে পেলুম না। মনচাঁদকে দেখতে পেলুম। বুড়ো চোখ বুজে মালা ঠকঠকিয়ে জোর আওয়াজ তুলছে আর দুলছে।

খুব জানবার ইচ্ছে হল, এ-সবের মানে কী। বললুম—'হে মানেকপীর, কেন অষ্টমঙ্গলের দেব হোকবারে এই পরব, আর কেনই বা এতে মানেকের বিয়ে হল—তুমি নিশ্চয় জানো মরজিনা?'

মরজিনা ঠোঁটে আঙুল রেখে ফিস-ফিস করে বলল—'জানি। কিন্তু এখন কথা বলতে নেই।'

ওই একঘেয়ে বাচপাকী ক্রমশ বিরক্তি ধরিয়ে দিল। বললুম—'মাথা ধরেছে। আমি বরং নদীর ধারে বসে ঘুরি গিয়ে।'

বলেই পা বাড়ালুম। একটু এঁকেবেঁকে ঢোল ঠেলে আসে আউলি, হঠাৎ দেখি মরজিনা আসছে। কাছে এসে সে একটু হেসে বলল—'আমারও মাথা ধরেছে। হাওয়া নিই খানিক।'

বাঁকের নীচে ঢালু হয়ে মাটি নদীর তলায় মিলেছে। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছিল ঢের ঢের মনে হল। বললুম—'এত রাতে নাকি সব ওলটপালট হয়ে যেতে পারে, মরজিনা। কানা বাউলেরা বলছিলেন। তোমার এমন করে আসা কি ঠিক হল?'

মরজিনা চাপাগলায় বলল—'কানার ওপর জোর করেই দেখি না, কী হয়। আপনি ভয় পেয়েছেন, তাও জানি। কিন্তু মাস্টার, নিজে ঠিক থাকলে ভয় কে?'

—'মরজিনা, আমার পর চিরদিন ঢলে বেড়াচ্ছে। হুঁশিয়ার!'

আউলমনের ছেলে উঠল।—'আমি মানুষ চিনি। ও মাস্টার, মানেকপীরের কথা শুনলেন কবিগুরুর নয়?'

—'হ্যাঁ। আচ্ছা, শোনা যাক্'...বলে নিশ্চুপ বসলুম এতক্ষণে।

মরজিনা অন্ধকার মাটি দেখতে দেখতে বলল—'তাহলে এখানে বসি?' তারপর সে বাঁকের নম্র মাটিতেই চুপ করে বসে পড়ল। আমরা—মাটিতে থাকলে চোখে পড়বে লোকের। কানে মাস্টারমশাই।'

আমার একটু অস্বস্তি হল এ-কথা শুনে। এই ছেলেটি পড়ুয়া। ছিটিয়ারী কবির বাউলবাড়ির ছেলে, বাপ ছাড়া কেউ আপনে বাবার ছিল না। সুতরাং স্বাধীনতায় বেড়েছে কলা গাছের মতো সরল ও সুবর্ণমুখী। আজকাল বয়সের সঙ্গে দেখছিলেন ঘুরে বেড়িয়েছে। বাপ গান ছেড়েছে এবং হয়তো ছিপকী হাত বাড়িয়ে নেই নিয়েছে। এক বয়সের ছেলেমানুষ তো তার পক্ষে স্বাভাবিকই। সাহসও চলুন থাকা উচিত।

কিন্তু না—তাই বলে ওকে বয়ঃসন্ধিতরুণের অনাত্মা ভাবতে পারব না। জেনেছি, ও তাদের কেউ নয়। কারণ, সহজ তার চারদিক ঘিরে একটা অমাবস্যা দুর্গার মতো একটা জোরালো বাড়ির চক্রবৃত্ত তৈরি করে আছে। এটা টের পেতে আরও দেরী হবে না।

তবু এ এক প্রত্যক্ষ পাহাড়ী। হাজার হাজার বছরের পুরনো সংস্কার, নীতিবোধ কিংবা সতীত্বের স্পর্শকাতর ধারণাগুলো এখনকার আবহাওয়ায় মিলিমিলি করে ফেটাচ্ছে কাঁপে কাঁপে। তবু কারে কথা চলবি না, যদি ওর সেই দুর্বলতা তোমার স্বাভাবিক একটে তারদের এখন দেখতে পায়, কী ঘটতে পারে ভেবে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু ওর হাত ডাক এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্যও নেই। অবশেষে মনে মনে যুক্তি খাড়া করলুম—আমি তো ওর সঙ্গে প্রেম করছি না তোপনে। যার মনের পাপ, তাকেও বললুম—সরে যাও কিছুক্ষণ। দূরে অপেক্ষা করতে পারো, কিন্তু সামনে নয়।

অস্তিত হাত তিনেক তফাতে বসলুম। নক্ষত্রের ছটার সাদা দীর্ঘ মাটি ঝলমল করছে। পিঠের দিকে সন্তবত জারুলের পাহাড়। পায়ের নীচে সন্ধীকেত ঢালু হয়ে নদীর তলায় চলে গেছে। হঠাৎ একটু হাসল মরজিনা।—'অফিসরাস্তিতে পোকামাকড় খেয়োর। ওইখানে ঘনসা-তলা। পরদু সংক্রান্তি না মাস্টার?'

উৎফুল্ল হয়ে বললুম—'কে জানে!'

—'হুঁ। সাক্রান্তি। ওই যে সুরেমন্ত্র জায়গাটা দেখছেন, ওখানে মা মনসার থান। পরদু জাবর মেলা, আবার হুজুরেরা। ঢাকঢোল বাজবে। দূরের নদী যাবে। যা জনমের ছেলেপেলেরা

গঙ্গাবলরাও জোশী

ওটাই ওভারকোট থেকে বোঝার মুখ যাবে। পরে চাপিয়ে নেওয়াকোনো ওবের ওঘরে। কাপান পাইবে। বাঁর-বুম ঘাওয়াল পরলা দুনকা ছেড়ে মাকাব পাহাড়ী থেকে বেরোনোর। দুটো দিন ছেড়ে দাও। বুঝলে তো?'

খুব বললুম- 'বোঝ।'

মরজিনা একটু চুপ করে থেকে বলল—'আপনি ঢাকা যাবেন?'

—তুমি জানার কী?'

খিলখিল করে হাসল সে।—'ও মা! আপনি কোন্ দেশের মানুষ গো? শুনেন, আমা মরবেন মক্কাশরিফ' নসীহত বোধ হয় ভেসে যাচ্ছে। সে নতুন তুলে ইয়ে বুকে বসে তপতপ করে। বাপজান দেখেছিল। দু—বে তিনটে মাথা দেখলেন ওর ধানে, সেই তিনটে মড়ার ঢোড়া কানা বুড়োর চাকর হয়ে এসে। কানার ভিতরে চোখ আছে—বাপজান বলে।'

হেসে বললুম—তুমি তো মিথ্যা নাস্তিকের কেরামতী বললে ওকে?'

'তখন আমার রাগ হয়েছিল। এখন হয় করছে। মনে হচ্ছে, ঠিক করিনি। আমার খোদা কাফি হবে—মন বলছে মাস্টার। ঠিকই কাফি হবে।'

ওর কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা টের পেলুম। এসেনবেরের ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা আমি জানি। তাই আশ্বস্ত করতে বললুম—'ওসব যাও। তুমি মায়ের বিয়ের কথা বলবে বলছিলে। বলো।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মরজিনা ধীরে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে বলল—বলি।...

...মুকী পীর মজার পাত্র ছিলেন নারীবিদ্বেষী আউলিয়া। ওই আবদুল্লা যে নারীচক্ষু আউলের কথা বলছিল, তাদের উল্টো মতের সম্প্রদায়। কে জানে আবদুল্লাও নারীবিদ্বেষী আউলি কি না। অবশ্য সুদর্শন জুয়াড়ীর কাছে শুনেছি, সে ধর্মের নামগন্ধ কফিরে পড়েছিল নাকি!) যাই হোক, মাদার শাহের মতে, নারী ঈশ্বরের দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে থাকে। অতএব তিনি মেয়েদের দেখতে হবে বলে মুখ ঢেকে থাকতেন। আশ্চর্য এক বুজরুগ বা ধোঁকাবাজ পীরদের এই আউলি নাকি একই সময়ে নানা জায়গায় থান বা দরগা বানিয়ে বাস করতেন। একই মানুষ একই সময় আছেন সবখানে। বাপজানও ভাববার কথা নয়, মাস্টার?...হাঁ, নিশ্চয় ভাববার কথা।...তো একদিন হল কী, স্বামীর অত্যাচারে একটি মেয়ে মাঠের পথে পালিয়ে আসছে বাপের বাড়ি, হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। মেয়ে তখন মাদারপীরের থানে গিয়ে আশ্রয় নিল। খুবতী মেয়ে। জনমানব থানের উপর গাছ-পালা ভেঙে পড়ছে ঝড়ে। বৃষ্টিও পড়ছে। বাজ ডাকছে। তরুণ পীরের মুখ ঢাকা, মেয়ে তো দেখেই তার পেয়ে গেছে।—তুমি যেই হও, মোহাই তোমার, মুখ দেখাও—বাঁচা না মরো, ছুত না মানুষ, কে আছ এই বিজন হেপাজতে এমন আজব বেলেল্লা নিয়ে! বলুন মাস্টার, ভয় হবে না? ...নিশ্চয় হবে। কড়কলের মতো মাঠের ঘরে এক মুক্তাকা মানুষ! তারপর?

'...তখন কফিরের লোভ হল—হয়তো সারাই জনম। কখনো স্ত্রী-লোকের মুখ দেখেন নি। নাকি পাপ এল চুপিসাড়ে—এতদিন পরে! মাস্টার, সে কি পাপ?...কে জানে, কী পাপ, কী পুণ্য!...হুঁ। কফির মুখের ঢাকনা খুললেন। চোখ জ্বলে গেল।'

হঠাৎ ওকে থামতে দেখে বললুম—'তারপর কী হল?'

মরজিনা যেন সলজ্জ গলায় মুখ ফিরিয়ে বলল—'আপনি পুরুষ, আমরা স্ত্রীলোক। ঘিয়ের সামনে আগুন। তাহলে কী হয় মাস্টার?'

'ঘি গলে যায়।'

—গলে ছেল।'

মরজিনাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললুম—'বলো।'

—মেয়ে বললে, তা কি হয়? আমি পরের বউ। তালাক না হলে ঘিয়ে কফি কেমন করে? বাপের বাড়ি যাই। তালাক দেবো। তুমি অপেক্ষা করে থাকো আউলের ছেলে, আমি তোমার কাছে আসব। কফির বলে—আমার চোখদুটো নেই, পথের কাঙাল। তুমি ফিরে যেতা কিছু দেরে। আসবে না। মনে, কফিরের বুকে বয়স। মায়ার খুন চেপেছে। পরম যি টাবল করে ফুটেছে। তবে সেটা আসল কথা নয়, বাপজান বলে—মায়ার শাহ্ সেই মেয়ের চেহেরে বাতি দেখেছিল। কোন্ বাতি জানেন? দুনিয়া মনুষের পয় (রোজ কেয়ামতে আর্শ ইয়ে'দিনের যি দুয়ারদুতে।) যখন সব আত্মার বিচার হবে, তখন তাদের ডাকা হবে—পুলের মতো মিহি বারালো সাঁকো 'পুল-সিরাত' পেরিয়ে বেহেস্তে যাও। সেই পুলের নীচে দোজখ। বাউনাই আগুনে জ্বলছে। পুলিশ জোর যার, সে পেরিয়ে যাবে। যারা পাপী, তারা নীচে পড়ে যাবে। নারীহত্যা মারাত্মক পাপ বলে, তখন ঘোর আঁধার। পুলে পেরেছে—কিন্তু বাতি কই? চেরাগ কই? স্ত্রীলোক হচ্ছে সেই চেরাগ। যদি ইহকালে তাকে কফিনার মতো লুকিয়ে রাখতে পারো, তাকে তখন-সমান করে থাকো, তবে তখন সেই আঁধারে বুকের তলায় বাতি তোমার পথ দেখাবে। নারীহত্যা আউলের এই হল সার কথা।...মাস্টার, সেদিন আপনি কী করবেন—ভেবেছেন?'

—না, ভাবিনি।.....মনে মনে ভাবলুম, কানা বলছেন আউলের আত্মাই চেরাগ।

মরজিনা চাপা হাসতে থাকল।... 'বাতি দেখে কফির মজল। তবে সবার চোখে তো বাতি থাকে না। এই যে আমাকে দেখলেন কতক্ষণ, বাতি দেখতে পেয়েছেন?'

মুখে বললুম—কে জানে! তুমি মায়ার কফিরের কথা বলো, মরজিনা।' কিন্তু মনে মনে বললুম—এই তো তোমার কাজই এক চোখে জলছে, মরজিনা।

'...কফির পাগল। আমুনে ঘাপ ছিলেন। মেয়ের বারাল নয়ে কথা কালা হয়ে গেল শরীর। অন্তর বারা স্বপন করতে থাকল। কাপড়চোপড় ফেড়ে গেল। মেয়ে ঘুরুরে-ঘুরুরে কাঁদে আর নখের আঁচড় কেটে বলে—না, না, না!

'...নিষ্পাপ তবুও হয় এক সাধক-পুরুষের। তার স্বাদও পেল সেই মায়াবাঘিনী। সেও শেষ অব্দি অত ওজনের পর মজল। মাস্টার, মেয়ে-মানুষের জীবিই এরকম। যাবার সময় বলে গেল—অপেক্ষা করে থেকো। আমি আসব। কিন্তু যে একবার চলে যায়, সে তো কফিরের হাতের ঢেলা, মাস্টার। তার আর ফেরা হয় না। কাল হয়ে ছুড়ে ফেলেছে। উটোদিকে আসবে কেমন করে? এল না। গহনে তাই তো বলে—'কাল আসি বলে গেল কালা চলে, সে-কালের আর কত বাকি' কূলের পথ তাকিয়ে রাধা বসে ছিলেন বৃন্দাবনে।...'

—মরজিনা, এসব তুমি জানো?'

—কেচ্ছাটা শুনিনি নাকি? বলল আমায়।'

—হুঁ, তারপর?'

'...বছর শরীরে কফির বাঁচিয়ে অপেক্ষা করেন। অপেক্ষা করেন। দিন যায়, দিন চলে যায়—মাস দিন। যায় মাস। ছয় ঋতু, বছর যায়। আবার এমনি জষ্টি মাস এল। শেষ রবিবার কি মঙ্গল কফিরের ভয় হয়। ওইদিন শিষ্যরা আসে নানা দেশ থেকে। তারা এল। এসে কী দেখল? একটা গাছ—সারা গায়ে কাপড়ের টুকরো ঝুলছে। গায়ে কাঁটা। আর, সেই নখের আঁচড়ের ছবগুলো হয়েছে ফল—থোকা থোকা লাল ফল। সেই ফলের মলাম গায় জমজমাট দুনিয়ায়। মায়ার শাহ্ রোদ-জল-ঝড়ে দাঁড়িয়ে মঠের পথ তাকাতে-তাকাতে মাদার-গাছ হয়ে গেলেন। হায়, হতভাগিনী মেয়েটা আর এল না।'

ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আউলিয়ন্না বলল—'দিনে এসে দেখবেন মাদারগাছে কেমন লাল লাল ফুল ফুটেছে এখন। এখন জষ্টিমাস। আজ সেই শেষ রবিবার। ফুল ফে ফুটেবেই। শরীরের রস ইশ্কের (প্রেমের কামনার) সুখে ফুল হয়ে ফুটেছে। আর, সারা গায়ে কফের কাঁটা। আমি বকলই তাকিয়ে দেখি, আমার বড় ভয় করে মাস্টার—কী দেখতে, কী দেখি। আমার বড় ভয় করে!...'

বয়স্কাটা নিরক বকেপড়ো নাকি ভাবছি, হঠাৎ মনে হল একটা কথা কিছু পিছন দিকে পাঁচিরে আছে। ঘুরেই বললুম—কে?'

—চর পাবেন না সার, আমি।'

আবদুল্লা। নিঃশব্দে এইভাবে এসে দাঁড়িয়েছে কখন—অন্ধকারে বুক কাঁপল। বললুম—'আরে, এস, এস। মাথা ধরেছিল বড়। তাই ফাঁকায় এসে বসলুম। তারপর মরজিনার কাছে মাদারপীরের বিয়ের পয়গের কথা জেনে নিচ্ছিলুম। তুমি কি আসরে ছিলে?'

—নায়!' বলে আবদুল্লা বসল আমার পাশে। সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে বলল—'খান।' তারপর অকারণ তার টেঁটো ছেলেকে নদীর তলা অব্দি খেলাল।

মরজিনা বিরক্ত হয়ে বলল—'যাও! আলো ভালাগে না।' তারপর উঠে পড়ল।—'আপনারা গল্প করুন। আমি আসরে থান শুনিগে। এবার দু' গলের পালা হবে।'

আবদুল্লা সসম্ভ্রমে বলল—হ্যাঁ। যান, শুনেগেন। ভাল আসর বিষয় নিয়ে পালা। নারী আর পুরুষ।'... সে হাসতে থাকল।—'কফির ফাকরার আজব লীলাখেলা!'

মরজিনা চলে গেল। তারপর বললুম—'আসরে তোমাকে দেখলুম না তখন। কোথায় ছিলে?'

—মোল্লাজী আমাকে সয় না, হুজুর। ইদিক উদিক ঘুরলুম। আমারও মাথা ধরেছে। ছিলিম টানবেন নাকি? আমি টানব।'

—নয়। থাক্।'

—তবে আমারও থাক্।' বলে সে পা দুটো ছড়িয়ে একতোয়াড়ী রাখল উরুর ওপর। দেশলাই কাঠিটা টের্চার ওপর বাজাতে থাকল। একটু পরে বলল—মাস্টারজী!'

—বলো, আবদুল্লা।'

—এই মেয়েটাকে দেখে আমার এক-জনের কথা মনে পড়ে। চাঁপা নাম। সেকেন্ড-মৌলবীসাহেবের দুহুলে কফিরের মেয়ে। দুহুলে কালা মেয়ে ভিখ মাগতে যেত—কাঁপার হাতে তার লাঠি। সেরেস্তাবাড়ির খোঁজখবর জেনে নিত। তারপর রাতে বাপবেটি মিলে হানা দিত। বাপ সিঁধ কেটে পথ করে দিত। মেয়ে ঢোকায় ঘরে তেল মেখে চুকেও। একবার হল কী, রায়বাড়ীতে এক মিয়ার বাড়ি চুকেছে। বর্ষার দিন। টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। মিয়ার নাম মোজাম্মেল হোসেন। খুব বড়লোক। বউ মরে আর বিয়েসাদী করেনি। ঝিকেল থেকে তার বাড়ি আসর নিয়ে রাত কাটাচ্ছিল বাপ আর মেয়ে। বাপ মিয়ার দহলিজঘরে শুতে গেছে, মেয়ে পাশেই আছে। খাওয়া-দাওয়া ভালই দিয়েছে মিয়া। তারপর নিশুতি হলে সিঁধ দিয়ে নিজের মূর্তি ধরেছে।'

আবদুল্লা হো হো করে উঠল।—'তারপর খাল ঘরের কামরাচে ঘাঁচিয়ে ঘরের ভেতরে নিঃশব্দে ঢুকিয়ে।

বাপের হাতে মেয়ের কানমলোপড়। ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। নেই তো নেই-ই। মলাত কামড়ে ছুটলুম অশ্বিনীর। এই করে তো রাত পোহালো। মেয়ে ফিরল না।'

—'বলু কী?'

—'জী হুঁ। ছটফটিয়ে বাড়ী পালাল। যখন কাণ্ডের পর আর থাকা যায় কি?'...একটু চুপ করে থেকে আবদুল্লা বলল—'মেয়ে এখন সুখেই আছে। তিন চাট্টে কৌরবোটি হয়েছে আমার মোয়ার। মোজাম্মেল হোসেন তাদের ইস্কুলে পড়াচ্ছে। শালাও তো কম ধূর্ত নয়। তেলেভেলে গতর নিয়ে কোরটী মেয়ে উধাও হয়ে নিশপদে ঢুকেই পড়বি তো পড়, সাকাৎ অসুর সামনে। শালা সব টের পেয়ে ওৎ পেতে ছিল।...'

গল্পটা শুনে আমিও হেসে ফেললুম।—'শ্বশুরে-জামাইয়ের সম্পর্ক কেমন?'

—'ভাল না। মানে, ঘিয়ের ঘ্রাণ বহুত। তাই গাঁয়ের কানাচে দেখলেই লোক লেলিয়ে দেয়। বুড়ো কেতে বেড়ায়। অবশ্যের মহাবাপি এসে বাধা মারলে শরীরে। কুস্তি হল। দেখলে, রামায়ণঘাটের বাজারে খল্লার ধারে বসে আছে। ভিখ মাগছে। একদিন এখানেই মরে পড়ে থাকবে। আর, মেয়েরও জান বাবা! কী কঠোর জান! বাপটাকে ভুলেই গেল! মাস্টারজী, এই হল মেয়েমানুষ।'

একটু পরে বললুম—'অন্যরকম মেয়েমানুষেও আছে। তারাই বেশি সংসারে। নয়তো সংসার কবে ধ্বসে হয়ে যেত, আবদুল্লা।'

—'কে জানে! আমি দেখিনি—দেখি না, স্যার।'

সুযোগ পেয়ে বললুম—'কিন্তু রাগ না করলে একটা কথা জিগেস করব তোমাকে।'

—'আমার রাগ হয় না, হুজুর। হলে আমিও কবে ধ্বসে হয়ে যেতুম।'

—'তোমার নাম্নে কিছু বদনাম শুনেছিলুম।'

আবদুল্লা হাসল না। বলল—'হুঁ। আমার বড় ছেলা ছিল যেত দুনিয়াদারীকে। তাই মাকে অযো খুনজখম করতুম। তা সাঁচা। কিন্তু আমি কখনও চুরিচামারি করিনি মাস্টারজী, আমার সহিসের কিরে। আসলে আমাকে ভয় পেত ওস্তাদের লোকে। তাই যার কাছে যা চাইতুম, দিত। এখনও দেয়। এই টেঁবাটিটা দিয়েছিল সালামের সাহাবাবু।

সালার স্টেশনের কাছে সাহা ব্রাদার্সের লোহা-লক্কড় চুন-সুরকি-সিমেন্টের কারবার আছে দেখেছিলুম। বেশ কয়েকটা ট্রাকেরও মালিক ওরা। তারা আবদুল্লাকে ভয় করে? লোকটার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকালুম। দরজিদার কথা মনে পড়ল এ সময়। বলে ফেললুম—'আবদুল্লা, তুমি নাকি একবার অযো একটা বিভিন্নি ছেলে পড়েছিলে?'

আবদুল্লা অপ্রস্তুত নড়ে উঠল।—'শুনেছেন? শুনবেন। আপনিও তো দেশভরা মানুষ। কিন্তু সার, সব বিলকুল মিছে। ওস্তাদের বড়লোক ছিলে চালাক করেছিল, বাড়ী বড় শয়তানী করে বেড়াচ্ছে। একে গারদ-ঘরে ওস্তাদ পাইলে শাস্তি হয়। তখন এক রাতিরে আমার ছেলার পাঠিয়ে দিলে এক খারাপ মেয়েমানুষকে। আপনি নিশ্চয় জানেন সার, মালাবের উঁষিকে এসব উৎপাত বহুত?'

—'হুঁ, শুনেছিলুম।'

—'বেশ স্বাধীনের পর সব উল্টে হয়েছে। সেখানকারই এক ছেলে-মানুষ পাঠালে আমার কাছে। আমি জানতে পেরে ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিলুম। অমনি চেচামেচি শুরু করলে। লোক ওৎ পেতে ছিল। এসে চড়াও হল। একা হুজুতে পারলুম না। খুব মার খিলে শালারা। তারপর থানায় নিয়ে গেল। কেস সাজাল। সে এক কাণ্ড, সার।'

—'তাই বলো। শুনে আমার অবাক লেগেছিল।'

আবদুল্লা শান্তস্বরে বলল—'আমার খুনের শিক্ষা; স্টীলোক পায়ের তলার কাঁটা। বিলকুল উপড়ে ফেলে দাও। রাস্তা তোমার নিবে সামনে নাক বরাবর। আপনাকে তো বলেইছি। বলিনি হুজুর?'

—'হুঁ, বলেছ। কিন্তু এমন জীবনে কী পাচ্ছ তুমি, কী পাবার আশা করছ, আবদুল্লা?'

—'আপনি কী পাচ্ছেন, কী পাবার আশা করছেন স্যার?'

—'কিছু না। আমি গান ভালবাসি। মানুষ ভালবাসি। মানুষের ভিড়ে হুহুতে ভালবাসি। তুমিও তো গাইছিলে—'মানুষরতন চিনলি না মন'?'

—'হুঁ। কিন্তু আমার লক্ষ্য আলাদা।'

—'কী, শুনি?'

—'শুনবেন?' বলে সে মুখ তুলে পশ্চিমে নদীর পরে আকাশে কেন মোটা একটা নক্ষত্র দেখতে থাকল। তারপর বলল—'বলেছি তো স্যার, দুনিয়াদারীকে। তাই মাকে অযো খুনজখম করতুম। তা সাঁচা। কিন্তু আমি কখনও চুরিচামারি করিনি মাস্টারজী, আমার সহিসের কিরে। আসলে আমাকে ভয় পেত ওস্তাদের লোকে। তাই যার কাছে যা চাইতুম, দিত। এখনও দেয়। এই টেঁবাটিটা দিয়েছিল সালামের সাহাবাবু।

সালার স্টেশনের কাছে সাহা ব্রাদার্সের লোহা-লক্কড় চুন-সুরকি-সিমেন্টের কারবার আছে দেখেছিলুম। বেশ কয়েকটা ট্রাকেরও মালিক ওরা। তারা আবদুল্লাকে ভয় করে? লোকটার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকালুম। দরজিদার কথা মনে পড়ল এ সময়। বলে ফেললুম—'আবদুল্লা, তুমি নাকি একবার অযো একটা বিভিন্নি ছেলে পড়েছিলে?'

ছি. ছি. ঘোষ

আবদুল্লা অপ্রস্তুত নড়ে উঠল।—'শুনেছেন? শুনবেন। আপনিও তো দেশভরা মানুষ। কিন্তু সার, সব বিলকুল মিছে। ওস্তাদের বড়লোক ছিলে চালাক করেছিল, বাড়ী বড় শয়তানী করে বেড়াচ্ছে। একে গারদ-ঘরে ওস্তাদ পাইলে শাস্তি হয়। তখন এক রাতিরে আমার ছেলার পাঠিয়ে দিলে এক খারাপ মেয়েমানুষকে। আপনি নিশ্চয় জানেন সার, মালাবের উঁষিকে এসব উৎপাত বহুত?'

—'হুঁ, শুনেছিলুম।'

—'বেশ স্বাধীনের পর সব উল্টে হয়েছে। সেখানকারই এক ছেলে-মানুষ পাঠালে আমার কাছে। আমি জানতে পেরে ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিলুম। অমনি চেচামেচি শুরু করলে। লোক ওৎ পেতে ছিল। এসে চড়াও হল। একা হুহুতে পারলুম না। খুব মার খিলে শালারা। তারপর থানায় নিয়ে গেল। কেস সাজাল। সে এক কাণ্ড, সার।'

—'তাই বলো। শুনে আমার অবাক লেগেছিল।'

আবদুল্লা শান্তস্বরে বলল—'আমার খুনের শিক্ষা; স্টীলোক পায়ের তলার কাঁটা। বিলকুল উপড়ে ফেলে দাও। রাস্তা তোমার নিবে সামনে নাক বরাবর। আপনাকে তো বলেইছি। বলিনি হুজুর?'

—'হুঁ, বলেছ। কিন্তু এমন জীবনে কী পাচ্ছ তুমি, কী পাবার আশা করছ, আবদুল্লা?'

—'আপনি কী পাচ্ছেন, কী পাবার আশা করছেন স্যার?'

—'কিছু না। আমি গান ভালবাসি। মানুষ ভালবাসি। মানুষের ভিড়ে হুহুতে ভালবাসি। তুমিও তো গাইছিলে—'মানুষরতন চিনলি না মন'?'

—'হুঁ। কিন্তু আমার লক্ষ্য আলাদা।'

—'কী, শুনি?'

—'শুনবেন?' বলে সে মুখ তুলে পশ্চিমে নদীর পরে আকাশে কেন মোটা একটা নক্ষত্র দেখতে থাকল। তারপর বলল—'বলেছি তো স্যার, দুনিয়াদারীকে। তাই মাকে অযো খুনজখম করতুম। তা সাঁচা। কিন্তু আমি কখনও চুরিচামারি করিনি মাস্টারজী, আমার সহিসের কিরে। আসলে আমাকে ভয় পেত ওস্তাদের লোকে। তাই যার কাছে যা চাইতুম, দিত। এখনও দেয়। এই টেঁবাটিটা দিয়েছিল সালামের সাহাবাবু।

সালার স্টেশনের কাছে সাহা ব্রাদার্সের লোহা-লক্কড় চুন-সুরকি-সিমেন্টের কারবার আছে দেখেছিলুম। বেশ কয়েকটা ট্রাকেরও মালিক ওরা। তারা আবদুল্লাকে ভয় করে? লোকটার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকালুম। দরজিদার কথা মনে পড়ল এ সময়। বলে ফেললুম—'আবদুল্লা, তুমি নাকি একবার অযো একটা বিভিন্নি ছেলে পড়েছিলে?'

—আমার একটুনি কেন একটা শক্ত অবলম্বন দরকার। না হলে পা যে ভাবে টলমল করছে, পড়ে যাব—আর কেলেঙ্কারি উঠে দাঁড়াতে পারব না। এ কেন জলসে এসে পড়লাম হঠাৎ?

সবে চার-পাঁচ পা হেঁটেছি, মনে হল কেউ দাঁড়িয়েছিল, হন হন করে কেবিনে ঢুকে গেল। কেবিনের ও পাশে আয়নার আলো এসে পড়েছে। তাই ঘুঁটিটা আলোয় এগোবার পৌঁছতেই চিনলুম। মরজিনা!

মরজিনা তা হলে এতক্ষণ লুকিয়ে আমাদের কথা শুনেছিল? কেন? সে কি আমাদের আসর উদ্বোধন সম্পর্কে সন্দিগ্ধ? তাই হবে। ফেলনা ভেবে, পুরুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নিষ্ফল হয়ে। অবিশ্বাস তাই স্বাভাবিক। আড়াল থেকে সম্ভবত ধরাই করছিল সুজন আমলুক মনুষ্যকে। তা হয়তো মূর্ত কানা বন্ধুবেশকে সে বরই তখন রাখের বেঁকে আমাদের ওস্তাদ, সংস্কারকে মানতে বাধ্য। সবকে আমাকে বলেছেন, 'তোমার গলায় অন্ধকার আছে এবং 'এক হয়ে ওটা পালটে হয়ে যায়।' মরজিনা তাই যেন অন্তর্দৃষ্টিতে সংশয় ছেলে-ছেলে ছলন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। হঠাৎ মনে হল, তাহলে কি আমাকে বাচাই করতেই সে অমন চলে এল নদীর ধরে নির্জনে অন্ধকারে? ভাবিনি, আমি বেকার কিছু বলে ফেলিনি।...

তখন আসর জমজমাট। এক বুড়ো বাউল একতারা শুনো তুলে পিড়িং পিড়িং করতে করতে ঘাড়ে মাথে কানের সঙ্গে চেপে ধরছে, যেন সুরের খুব ভেতরকার জিনিসগুলো নিয়ে নিজে—কথোপে যেমন করে পাকা রোমন্থনের শাঁস ফুরেফুরে যায় এমন বুড়োর মুখটা টোলটে ভরে পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে, চোখ দুটোর দৃষ্টি নিজের মনু সুরের মাঁঝখানে—তারা দুটো আয়নার হয়ে ওপরকার পার্থিবকে ভেতরে ঢুকেছে। তার পাকা চুল থেকে ঝুলছে লাল রেশমী 'তাজ' অর্থাৎ উষ্ণীষ। ওরা 'বাউল' বা অন্তরকালা তার জন্যতের বাদশাহ কিনা, তাই ওই 'তাজ'। বিভিন্ন করছে তাদের গুরু মাঁয়ের কাছ। যাঁ হতে ভুবনিকা পোটের কয়ে প্রায় ঢোকানো—হঠাৎ মুকন্দুর ভরে আওয়াজ না তুললে টেরই পেতুম না।

সে আওয়াজ এক পা ভাঙিয়ে তান ধরল : হা-হা-হা-হা...হা-আ-আ-আ ...ঊ-ঁি-ঁি-ঁি-ঁি...তা-না-না-না...না-আ-আ-আ...এবং তারপর নীচের দিকে কয়েক কৌচক মেনে একই সুরে বলে উঠল, 'বোলো না, বোলো না, বোলো না। সাধু, তখন কথা বোলো না!' তারপর ওই কথাগুলো যেন একতারাটাই বলছে এ ভাবে সে একতারাটা বুকে রাখা এক আউলের কনুয়ের কাছে নামিয়ে বাজনটাকে বাজিয়ে দিল। এ যেন কলের বাজনা। সামনা সামনি না থাকলে স্যাপ পাওয়া যায় না। ঘুম ভুলে গেছেন না আমাকে। আলগোছে তিন খণ্ড লম্বা তিন খণ্ড চওড়া আসন ছিঁড়ে ভবিকের বাঁক মৌমাছির মতো ঘুরে বাজিয়ে বসে আছে। কে আমার হাত ধরে টানল। মেঘি, অন্ধকার। সরে জায়গা দিল বুড়ো। কানে কানে বলল, 'আমার বৌকে কোথা রেখে এলেন?' জবাব দিলুম, নদীর ধারে ছিপির টানছে।' কিন্তু মেয়ের কথা বুড়ো জিগেস করল না।

আসর গজার ঘোঁয়ায় নীল। কুয়াশার পর্দায় গ্রহসমূহ কাণ্ড কারখানা চলছে যেন। হঠাৎ একটা জলন্ত ছিপির সামনে কেউ বলল, 'মুজুর, সেবা করুন।' দেখি, প্রথমে দেখা সেই প্রৌঢ় দোয়া ভবিকর। তৎক্ষনি মন ভরে কেউ ছিলুম। কাসতে থাকলুম বেকা। তাড়াতাড়ি না হল ভলনার ভরে মুখে হাত চেপেই বাসলুম। তারপর আমি ভেসে চলেছি সেই 'বাতেলোকের জলতে, প্রকাশকবাহীন। নক্ষত্র ছাড়িয়ে ছায়াপথ পেরিয়ে কতদূরে—কতদূরে! দেখছি, হাজার হাজার আউল ফুল পার্কি একতারা বুকের ভুবনি নিয়ে চোখে ঝিলিক দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে চর পাশে।

পালাকার ভবিক তখন গান ভরেছে, ...'বাবা আমম ভেরে গন্ধম পড়েছেন কাঁদছে।' হু, আবদুল্লা বলছিল, আসরের প্রতিস্পর্ধিতের বিষয়। নারী পুরুষ। এ বুড়ো তাহলে পুরুষপক্ষ। নারীশ্বেষী আউল। নারী নরকের দ্বার। নারী সাধন পথের বাঁটা। সে এ কথা বোঝাতেই তোমাদের (এবং মাইভেদেরও) সৃষ্টি-তত্ত্ব শেখ করছে। গন্ধম বা নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার প্রচেষ্টায় বিরোহিল হাওয়ার্যিব অর্থাৎ হুবা। ইত! ভবিকের বক্তব্য : ওই বৃক্ষের ফল খাওয়ামাত্র আদম নিজেদের নগ্ন দেখলেন—চোখ খুলে গেল। আ ছি ছি! ছিক ধাউল ভবিকর। বুড়োর সে কি চঙ? কেন সত্যি নায়কী সে, এমনি ভঙ্গীতে একতারা-ভুবনিটা দু হাতে নিজের ভলপেটে চেপে ধরে এক পা আর পায়ের ওপর কাঁকাটুটি করে কুজো হল একটু—কি না, পড়লে ধাঁচে না। ঝিক হাসতে থাকল। তারপর ভঙ্গাক করে লাফ দিয়ে মুখে এবং একতারায় আওয়াজ দিল। 'নায়কী নায়কী নায়কী নায়কী। আমরা সবাই নায়কী। ওরে সোনারা, ওরে বালিকারা! আঁধারে সাধু, আঁধারে সাধু, ওরে বাছা, এলুম নায়কী, আমি নায়কী, আমি নায়কী। তা হলে আর কথা কী?'

এই বলে কথায় ভেঙে ভবিক সুরে বলল, 'সুখে ছিলাম আলেই ছিলাম ছিলোকেতে (স্বর্গলোকে) নায়কী করে বাবা আদম ভেরে গন্ধম পড়েছেন কাঁদছে।' তারপর তার তানপুরা পর্দায় সুরে কানে তালা ধরে গেল।

...দুর্খ সাধু। ঝিক্ ঝিক্ সত ঝিক্! ভুবনিতে বেজাও উঠল: ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্!...ওরে, ওরে সাধুরে বাটা মহাসাধু! কাল তোকে দাখাল। ঝিকের জ্বালায় ভুই জলে মরলি। পড়ে রইল তোর সাধন ভজন ভেকধারী, পড়ে রইল ভেরেন্দতের বাগবাগিচা, ভুই জলতের জলতে আকুল-আবতাল খুজে বেড়াচ্ছিস! কেন? না—কায়। তোর চোখে কজ্জ। আরে ছি, ছি, ছি! ওঠাক থু! দুর্খ তো সম্বল ওই সম্বল তিন হাত একখানা পরীল: ভুলতে ফেলতে হড়া। তা বহে তোর সম্বল নাই। ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্! এবার যেন গান ভেরে উঠল সে। 'ঘর ভেরেতে মিলে মিলে ওই ভেরতে বসত করে। বাবা আদম ভেরে গন্ধম পড়েছেন কাঁদছে।' (এই ঘর যোর হল: কম ক্রোধ লোভ মদ মোহ ও মাৎসর্য। নিতান্ত হিন্দুতত্ত্ব।)

আসর জমজমাট করে সে ঘনে পড়ল। মুখে ভরের হাসি। কঁজন নারীশ্বেষী ভবিক তাকে তালপাখার হাওয়া দিতে থাকল। একজন ভৈরী ছিপির বাঁধরে ধরল সামনে—তান-হাতের মু-আঙুলে ছিপিমটা ধরা, বাঁ হাতের মুঠো তান হাতের কনুইয়ে ঠেকানো। তার মানে সম্ভম জানাতে মুহাত বাধহায়ই রীতি, কিন্তু কেহেতু বাঁহাতে শৌচকর্ম করে বলে সততে অশুচি, তাই ওই বাবস্থা। প্রশান্ত ছেলে বাবেভেরা মুখে মুকো ছিপিম টানতে থাকল।

এবার উঠল সেই গাঢ় প্রৌঢ় ভবিক। মুকন্দুর প্রতিস্পর্ধী নারী ভক্তা খোঁটির প্রতিনিধি। আসরে দাঁড়িয়েই সে একতারা ভুবনিসহ দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে বলল, 'ঘর যাব! যাব রে যাব! যাবো যাবো যাবো! নানা ভঙ্গী ও ভাষায় খেঁচিয়ে মাতা ভুলিয়ে নাচন কোঁদন করে সে সাধন পুরো করে ফেলল। 'কামসর্পের মাথার মণি চেরাগ জেবেছে। সেই চেরাগে আপরো ঘর আলো হয়েছে।'...

গানটা শোনা মনে হল। প্রৌঢ় আউল গান ছেড়ে দাঁড়ি অন্তরের গ্রহে গ্রহে কথার বুড়ি বাঁড় করাছিল। কখনও নতুন গান ভুকিয়ে দিচ্ছিল সে। ভুলে যাবার আগে কতকটা একই সুরের অন্য গান। যেমন—'ভুলতের (সৃষ্টি মহিমার) জহরবাতন (মোলা কথা। জড় ও তাম জগত) কে বুঝিতে পারে।' তারপর যেন গান ছেড়ে প্রেমিকের মিষ্টি চোখে তাকিয়ে (তার চোখদুটো বড় সুন্দর) কথার বলল, 'কী বলছিল মো বুড়ো খোকা?' (আসরে হাসির বড় তুফান) কয়া। হু—তার। কিন্তু বালিকারা, সোনারা, আমি যদি —তা না, তা না। না না না না। কায় না, কায় না, কায় না—তারোনা। (তারপর) ওরে মরোনা, তুই মানস—তুই কি দুর্খবি কাজেনার গুহাকথা?'...

হঠাৎ আমাকে বেঁধিয়ে সে বলে উঠল, 'এই তো এখানে আছেন এক ছিপিত পণ্ডিত বেদি। পুছ করে দাখ, কামোনা করে বলে। বম পরিচয়খানা খুলে দেখলেই পাবি—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভেতর। ঘরে ঘ ঘরে আ। করে আকার যো ওকারের আকার।'

বুঝলুম, এ ভবিক ভবির মহলের 'ছিপিত বেদি।' পাঠশালার পড়েছিল নিশ্চয়। সে আমার নীরবতার দায় দেরে দিলুম ঠেচিয়ে বলল, 'কামোনা হল কি না ইশ্বরে! ইশ্বরের আনুনেই বলো, বিধেই বলো, এই ভেলের (মনের) অঘোরে জলছে। বাবা সকল, খোদারও কি জলে নি? না যদি জলল, তবে কেন এই কুল-মকলকোম (তাবৎ সৃষ্টি) হল? কেন খোদা মেয়া সাধক আব্রাজিল ভেরেশতাকে (দেবদূতকে) ভেকে বললেন—আমি আমব গড়ব। ও আব্রাজিল, তুমি আমাকে মাটি এনে দাও!' তারপর ভেল গান। 'শব্দশব্দ বিলের কাদা এনে/আব্রাজিল তায় মাটি ছানে/...'

...এরপর খোদা আদমের মাটির মূর্তির নাকে নিজের পবিত্র নত্তার এক চিমটে ফু ভরে দিলেন। আদম হাঁচলেন। বস্ কাম ফতে। ঘর চলাচল শুরু হল। খোদার আদরে সাকো বাবা হল। সেই সাকো দুনিয়ায় এসে হাজির ফেলল হাবুকে।

...'ওকিকে কিন্তু আদম একা। একা না বোকা। লোকা চাই মো, একটুনি চাই।...আদমের কাঁদন শুনে /বাঁদিকের পাঁজর ভেঙে/খোদ্দ থেকে বিবেন হাওয়া গড়ে। কুলকুতের জহরত-বাতন কে বুঝিতে পারে।'

আবার জমে উঠল আসর। কিন্তু নেশায় পর্দায় বিঘ্নকিম করছে। সুরে পড়ার ইচ্ছে হচ্ছে। নয় ছিপিটোনা আমার পোষায় না। উঠপুনে করছি, আসর থেকে বেঁরিয়ে কোন দোকানে দোয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না। একজন চেনা অনোয়ারিওলাকে লক্ষ্য করেছিলুম। লোভ ভেড়ে যেন তার কথা মনে পড়ে। উঠে এলুম বাইরে। কেউ বাধা দিল না। সবাই মৌজ হয়ে রয়েছে।

বেরিয়ে প্রথমে মরজিনাকে খুঁজলুম। দেখতে পেলুম না। তারপর আবদুল্লার কথা মনে পড়ল। সে কি এখনও বাঁধে বসে রয়েছে? তার কথা মনে পড়তেই অন্য অনোয়ারির দোকানে ঢুকলুম না। ফোপরাড় পেরিয়ে বাঁধে চলে গেলুম। ফাঁকা মাঠে কখন নেশাটা কাটতে পারে।

কিন্তু কোথায় আবদুল্লা? তাকে না দেখতে পেয়েই আমলকা সারের ভয় হল। কাঁপতে কাঁপতে চোখের দৃষ্টি ঠাহর করে প্রায় লাফ দিতে দিতে আবার আসরে এসে ঘাঁটি।

অনোয়ারিওলার দোকানটা ঠাঁক

হাফিজ আলি খাঁ

মেরে দেখেই বুঝলুম, জায়গা হবে না। লোকটা নিজেই হাত পা কুঁকড়ে শুয়েছে একটুখানি ফাঁকা জায়গায়—তার চারদিকে ছিন্নিলপত্তর। পিটপিট করে তাকাচ্ছে।

মরজিনাই বা কোথায়? ছেলেদের ভিড়ে সে নেই। মেয়েরা প্রায় সবাই চাষী-মজুর মুসলিম বাড়ির—চাদর মুড়ি দিয়ে বসে গান শুনছে। মরজিনা যায় যাই করুক, চাদর মুড়ি দেবে না। তা হলে কি কানা দরবেশের কাছে গ্রন্থ চাইতে গেল সে?

ঘোরা ঘুরে সেই দরগায় গেলুম। ফটক দিয়ে উঁকি মেরে স্পষ্ট কানা দরবেশকে দেখা গেল। সে দুলে-দুলে গুনছে। ঠোঁট কাঁপছে। মালা জপছে।

ফিরে আসছি, হঠাৎ চাপা কথা-বার্তার শব্দ কানে এল। শব্দ লক্ষ্য করে এগোলুম। এই যে বলেছিল, মনে পাপ—চেরাগের তলায় অন্ধকার। বুক কাঁপল। কী দেখবার আশা করছি? বড় বড় ঘাস আছে এদিক-টায়। তলায় তাই কোন ঝোপ পজায় নি। একেবারে নগ্ন মাটি। ইটের টুকরোয় হোঁচট খাচ্ছি। ও পাশে বিলাস্তল—কী একটা পাখি ডাকছে টি টি টি...টি-টি-টি। অনেকদূরে কোথায় আগুন জ্বলছে। সম্ভবত গয়লাদের গরুমোষ চরাবার বাথানে।

গাছের ও পাশে বসে আছে দুটি মানুষ। কী ভাবে বসে আছে, অন্ধ-কারে বোঝা যায় না। কিন্তু তারা চাপা গলায় কথা বলছে।

আলতো খিলখিল হাসিটা অন্ধ-কারে ফুল খসে পড়ার মতো ব্যাপার ঘটাল। ও হাসি মরজিনার। পুরুষ-কণ্ঠে আওয়াজ শোনা গেল, 'হাসির কথা না। আপনি হাসবেন না।' সর্বনাশ! এ যে আবদুল্লা!...

—'আউলের ছেলে, আমাকে আপনি-টাপনি করা কেন, শুনি?'

—'ভয়ে, নাকি ভক্তিতে।'

—'আমার মরণ! আমি সামান্য মেয়ে। ভিখ মেঙে খেয়ে এত বড়টা হয়েছি।'

—'আমি তারও অধম।'

—'আউলের ছেলে!'

—'জী!'

ফের খিলখিল হাসি।—'জী-আপনি ছাড়া আর বুলি শেখা নেই নাকি? মরণ, মরণ!'

—'আপনাকে আমার বড় ডর লাগে মরজিনা, আপনি চলে যান।'

—'তাড়িয়ে দিচ্ছে আউলের ছেলে?'

—'জী না। আপনি বউমানুষ। আমি পরপুরুষ।'

টের পেলুম মরজিনা উঠল। আড়ালে ঘন হলুম। সে যখন হন হন করে এগিয়ে দরগার ফটকে গেল, তখন থানের একচিলতে আলোয় তাকে দেখতে পেলুম। তারপর তাকে আরও ভাল করে দেখার জন্যে পা বাড়াতেই আচমকা আবদুল্লার টর্চ আমাকে ধরে ফেলল।

আবদুল্লা কিন্তু চমকাল না।—'মাস্টারজী নাকি?' বলে সে এদিকে এল এবং আলো নিবিয়ে দিল। তারপর বলল, 'মেয়েটার মাথায় ছিট আছে। কথা আছে বলে ডেকে এনে আবোলতাবোল পুছ্ করে। বুঝি না। চলুন, আলোয় যাই।'

কোন কথা না বলে ওর সঙ্গে হাঁটতে থাকলুম। ফটকের পাশ দিয়ে আসার সময় দেখি, মরজিনা কানা দরবেশের পায়ের ওপর মাথা গুঁজে পড়ে আছে। পিঠটা কাঁপছে। দরবেশ তার পিঠে মালাসুদ্ধ হাতটা বুলোচ্ছেন।

এবার বললুম, 'মরজিনার কী হল, বলতে পারো আবদুল্লা?'

আবদুল্লা চাপা হেসে মাথা দোলাল। পা বাড়িয়ে বলল, 'ভেবে-ছিলুম, এখানে দুটো দিন কাটিয়ে যাব—হবে না। মাটি বড় পিছল, হুজুর। পা টলছে। সাইয়ের ইচ্ছে।...'

## চার

আবদুল্লা গানের আসরে ঢুকল না। আমার হাত ধরে টেনে মেলার শেষ-দিকে এগোল। এতক্ষণে টের পেলুম, তার এই আচরণ অস্বাভাবিক। ট্রেনে সে বলেছিল ইন্দ্রায় মাদারের বিয়ের মেলায় আসছে। অথচ এ তার কেমন আসা? আউল ফকির এসে দলে ভিড়বে। নাচবে কুঁদবে গাইবে। নিজেদের গোষ্ঠিতে পালায় পরবের সুযোগে এমন মেলামেশা অনেকবার চোখে পড়েছে আমার। এতে একলা চলার কষ্টটা ঘুচে যায়। কাটোয়া-আমোদপুর ছোট লাইনে বোরেগী-তলার হিন্দু বাউলদের মেলাও আমি দেখেছি। তখন সব বাউলবাউলনী জোট বেঁধে ঘোড়িসুদ্ধে ঘুন হয়ে থাকে। দেখেছি যাবজ্জীবনের আসামীর মতন সবাই বাউলযোষিৎ সঙ্গিনী নিয়ে হই হই করছে। বাউল হোক, কিংবা আউল হোক, একই গুরুর পথিক সব। রীতিনীতি একই রকম। ছিলিম, নাচগান, লাল চোখের মিলিক, মন খোলা বিশুদ্ধ হাসি নিয়ে ভাবের বাগানে হরেক/ফুল ফুটিয়া ঘ ঘ করে/সেই ভাবেতে ভাব লাগায়ে/ক্ষ্যাপা মোন/ও ক্ষ্যাপা মোন হাত পা ছোড়ে॥'

কিন্তু আবদুল্লার মুখটা গম্ভীর। ভাবের বাগানের মমকরা ফুলের গন্ধ ওকে আবিষ্ট করছে না। ওর মনে ক্ষ্যাপামি জাগেনি। ও হাত পা ছুড়ছে না। আড়ষ্ট ভারি একটা শরীর টেনে নিয়ে ঘুরছে। উদ্দেশ্য-হীন।

একটা খোলা মেলা পানবিড়ির দোকানের পিছনে ফাঁকা জায়গা খানিকটা। সেখানে একটা গরুর গাড়ি দেখা গেল। গাড়িতে ছই রয়েছে। চাকায় দুটো প্রকাণ্ড বলদ বাঁধা। বলদ দুটো বসে আবছা অন্ধ-কারে জাবর কাটছে। কখনো আলোর দিকে ঘুরলে তাদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠছে। ভয়ঙ্কর নীল সেই উজ্জ্বলতা। চমকে ওঠার মতো।

গাড়িতে কারা বসে আছে। মোড়ল মাতবরগোছের মানুষ নিশ্চয়। হয়তো পীরের থানে মানত দিতে এসেছে, নয়তো স্রেফ গান শুনতে। এ ধরনের লোকে কিন্তু ছিলিম-মাহাত্ম্যও বোঝে দেখেছি।

কিন্তু কোথায় চলেছে আবদুল্লা? আবার নদীর ধারে বাঁধে ফিরে যেতে চায়? জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, হঠাৎ গরুর গাড়ি থেকে হেঁড়ে গলায় কে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'বহ বহ! চলো, চলো!' এবং তৎক্ষণি কবিয়ালী ছড়ার সুরে। 'আকাশে উড়লে কী হবে/শকুনের, চক্ষু থাকে তাদাড় পানে: আসুন, আসুন, আসুন ওস্তাদজী। আসতে আজ্ঞা হোক।'

কয়ে দিবে ঝোঁচ, হরিদাসরার আসুল মহাজন। ফরফরে সাদা ধুতি পরনে, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী আর গলায় সোনার চেনসহ এই বেয়াল্লিশ-চুয়াল্লিশ বছরের লোকটির হাতে বন্দুকও দেখেছি। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট (তখন অঞ্চলপ্রধান নামটা চালু করা হয়নি)। বাজার দলে পার্টও করে। পঞ্চায়েতী বিচারে আসামীকে জরিমানাও করে। সব সময় পান মুখে। আমাকে বলেছিল, 'আপনার মতো অতটা পাস দিইনি। ক্লাস সেভেনে পড়া ছেড়েছি। যা শিখেছি, সম্পত্তি রাখতে ওই যথেষ্ট।'

বললুম, 'আরে, মহাজন সাহেব যে! আপনি এখানে?'

আবুল মহাজন ছইয়ের সামনে থেকে নেমে মুখোমুখি হল। এই পোষাকে। পিঠে বন্দুকটিও আছে নিয়মমতো। বলল, 'রাজা বিক্রম-দিত্যের সভায় ছিলেন নবরত্ন। সেই রত্নের দুই রত্ন আনতে গিয়েছিলুম কাপাসী স্টেশনে। ইন্দ্রায় নদী পেরিয়ে দেখি এলাহি কারবার। এনারা বললেন, গাড়ি থামান ট্রেসি-

ফেলে দেবে। কিছিৎ খান শুনে যাই। আমারও খোলা হল। বাস। শেষ রাতে ফের রওনা দেব দিলের পথে।'

কাশ্মীরী স্টেশন থেকে হরিনিবাস দশ মাইলের কম নয়। রাস্তা খারাপ তেমন কিছু নেই। খাসা মাঠের ওপর গাড়ি ছুটিয়ে দেয় ড্রাইভার। এদিকে বিলও শুকিয়ে গেছে অনেকটা। উদ্বোধনাকাশের জন্যেই দুটো চোখ খটখটিয়ে রয়েছে যেন ঢালা ধান ক্ষেতে ওঠে। ওটাই তখন চলাচলের রাস্তা।

কানাই, 'নবরত্নের নাম মনে আছে?'

আবদুল রহমান গাড়ির ভিতর থেকে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর তেরো থেকে শুরু করলো হোমিওপ্যাথি ফের কপচাতে। মন ঘাড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা দেখে চিনবে। চিনতে পারবেন?'

চিনলুম। আবদুল ঠিকই বলেছে। সমরকন্দীয় এলাকার দিলদীয় গ্রামের সরাবাবলাতার কবিয়াল সেখ মোহাম্মদ হানী দেওয়ান আর তাঁর বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল চন্দ্রাত শুক্লা-দের চন্দ্রবর্তী হাট, মুখোমুখি বসে আছেন। দুই প্রৌঢ় চারণকবির আসর ঘিরে সে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। আমি কপালে হাত তুলে দুজনকেই আদাব দিলুম। ওঁরা মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'আদাব, আদাব।' এই মানুষ দুটির বিনয়ের তুলনা নেই, তা জানি। মনে হয়ে হাওয়া হয়ে গেল। চলে যাব নাকি মহাজনের সঙ্গে? কবিগান শোনা হবে না—বিশেষ করে এই দুই শ্রেষ্ঠ রথীর লড়াই দেখা এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

আবদুল্লা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। সেও ঘুরে কবিয়াল-দের দেখতে থাকল। লম্বোদরবাবু বললেন, 'বাবাজীবনের নাম?'

নামটা বলে দিল আবদুল রহমান। সেই সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষার অনুবাদ করলাকর। শুনে প্রৌঢ় লম্বোদর কবিয়াল হাসতে হাসতে বললেন, তাদের ভাষায়: "সিরাজের সেই তিন্তা বাঁধি মুখ করে ফের ফিরবে/তোমার নামি দিতে পারি সময়মত বোধায়ছে।" বাবাজীবন নিশ্চয় হাফিজ পড়েছেন? বিদেহী কবি কাজী নজরুলের ভর্জমা।'

একটু অবাক না হয়ে পারা যায় না। হাঁন এ সব পড়ুন-টড়ুন তা হলে! পরে বুঝেছিলুম, শিক্ষিত-জনেরা যাই বলুন—রামা কবিয়াল নিজেদের যথার্থ কবি বলেই মনে করেন। কেন মনে করবেন না? শেখ মোবাহেলী যখন গেয়ে ওঠেন, 'আমার বুকের মধ্যে তোমার/তোমার পরের আলপনা, তখন তাঁকে কবি না ভাবার কারণ নেই। ক বছর আগে কলকাতায় ভারতীয় পলাশীর সমরের মঞ্চে শেখ মোবাহেলীকে যে গান বানিয়ে গাইতে শুনেছিলুম, চারণ-কবির খাঁটি কবিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। সম্ভবত তারাশঙ্করও মুগ্ধ ছিলেন তখন।

যাক ও সব কথা। ইন্দ্রাণ মাঠে কবির লড়াইয়ের মেলায়, এই আলো-অন্ধকারে, রহস্যময় নিসর্গ, ওই দুটি মানুষ আর এই আবদুল মহাজনকে দেখে তাক লেগে গিয়েছিল। মহাজন আরও জানল, হরিনিবাসের মেলায় মাঠে কবি প্রদর্শনীর মেলা বসেছে। নতুন রুক অফিস হয়েছে। সেই উপলক্ষে এই আয়োজন। মহাজনের সব ব্যাপারেই ভাবভাসক। কবিগান শিতে হবে। তো কবির কবি মেরা-কবিদের আসরে হাজির করা চাই। এবং নিজেই আসরে ছেড়ে গাড়ি নিয়ে। একা মানুষ। বড় সংসার। এখনে রাতকাটানো মানে, এতক্ষণ বাড়িতে ডাকাতি হল কি না—সেই উৎকণ্ঠায় থাকা। অথচ মহাকবিরা বলেছেন—ডাউনসের গান শুনেছেন। তাই উপায় কী?...

কবিয়ালদ্বয় গানের দিকেই তান করে আছেন। তাই ওঁদের বিরক্ত করা ঠিক নয়। মহাজনের হাত ধরে এক পাশে সরে এলুম। সে পানজাবির পকেট থেকে একটা দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, 'খান।' তারপর হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক তিনটায় রওনা দেব। এখন প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। বাবেন নাকি ওস্তাদজী?'

ও আমাকে ওস্তাদ বলে, ওটা ওর তোষামোদ। আর, তখন তো আমি গ্রাম ভারতের অনেকী ফোক কালচারে ডুবে হয়ে কাটাচ্ছি, ওস্তাদ শুনতে মন্দ লাগে না। ওদিকে মেশাজুরেও

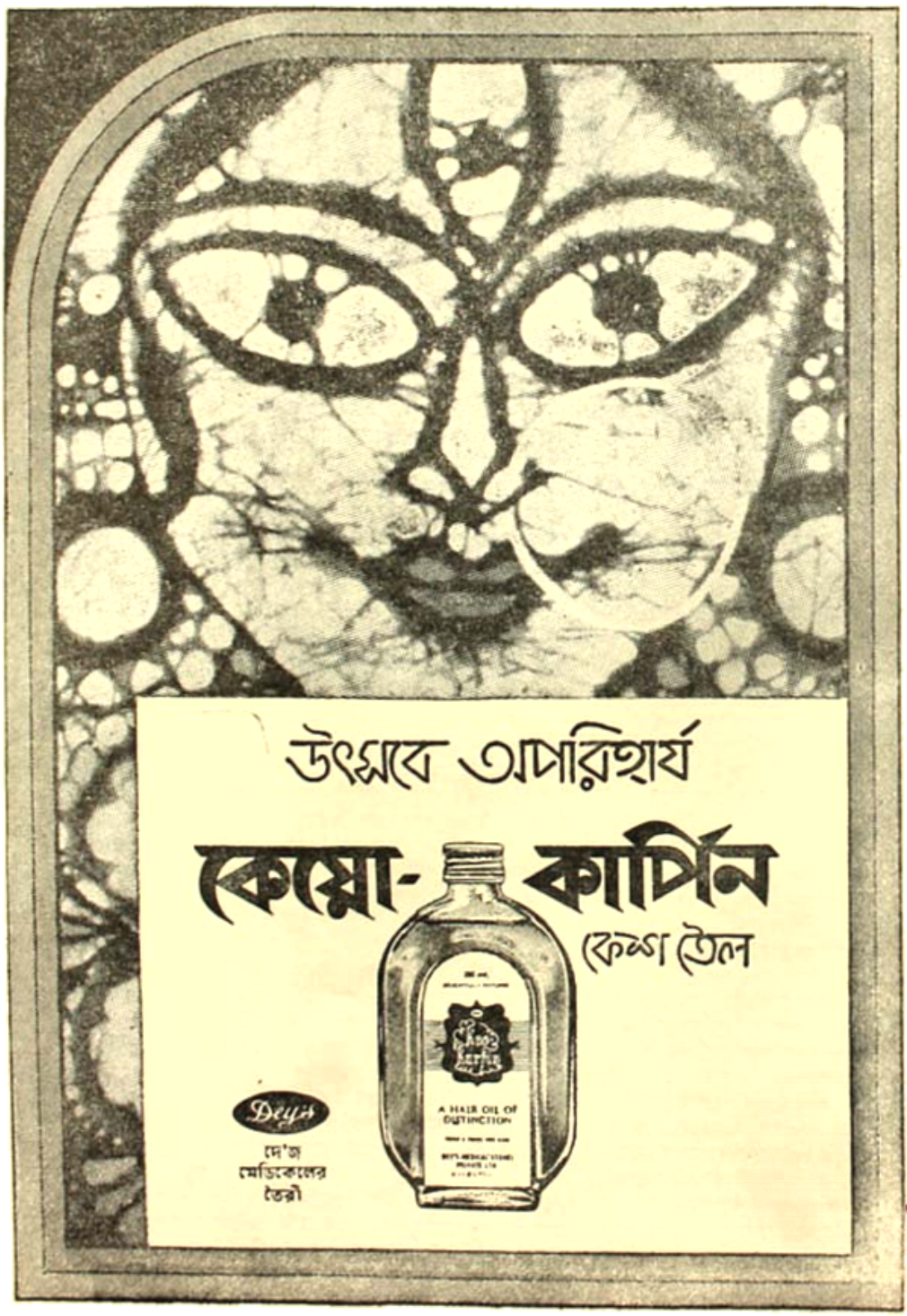

তখন শিক্ষিত পাণ্ডিত মিলে খুব হোক হোক করছেন। না—শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। শহরের মধ্যে হঠাৎ ফোকের ধাপট বেড়ে গেছে। স্বাধীনতার পর ঘরের ঘুনিয়ার হাওয়ানের ঝোঁক বেড়েছে।

মহাজনের আমন্ত্রণের জবাব দিতে যাচ্ছি, দেখি—আবদুল্লা হনহন করে অন্ধকারে চুকে পড়ল। মহাজন বলল, 'জুড়িদারটিকে চেনা মনে হল। কী নাম বলুন তো?'

—'আবদুল্লা ফকির। সানার এলাকার ছেলে।'

—'সানার-তালিবপুরের সেই আবদুল্লা গুণ্ডা? বলেন কি?' মহাজন চমকে উঠে অন্ধকারের দিকে জলজ্বলে চোখে তাকাল।

বললুম, 'গুণ্ডা! ওকে আপনি চেনেন নাকি?'

মহাজন চাপা গলায় বলল, 'কী সর্বনাশ! আপনি ওর সঙ্গে যুরছেন? দেখবেন, আপনাকে ন্যাংটো করে সব কেড়ে নিয়ে পালাবে। আরে আপনি জানেন না, আমার পাঁয়ে গিয়ে কসম আল্লে গুণ্ডামি করে এসেছে।'

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। তা হলে কি আবদুল্লাকে আমি একটুও চিনতে পারছিনে? বললুম, 'বয়স কম। স্বাস্থ্য ভাল। তা ছাড়া ও তো জাত ফকির নয়—চাষার ছেলে। তাই হয়তো বড় চড়ে বসে মাথায়। যাক্ গে, ওসব তুচ্ছ লোকের দিকে আপনার মতো মানুষের চোখ না থাকাই ভাল।'

মহাজন মেনে নিল কথাটা। 'তা হয়তো ঠিকই বলছেন। হুঁ, সিগ্রেটটা যে জ্বালালেন না! নিন।'...বলে সে একটা লাইটার বের করে হাওয়া বাঁচিয়ে সিগ্রেট ধরিয়ে দিল। নিজেরটাও ধরাল। কিন্তু আবদুল্লা গেছিকে গেছে, দৃষ্টিটা সেদিকে মাঝে মাঝে ফেলতে থাকল। মহাজনের চাপা উত্তেজনা বেশ আঁচ করতে পারছিলুম।

এই সময় আসরের দিকে একটু চঞ্চলতা চোখে পড়ল। দেখি, মরজিনা কানা বজলেদের মরুমেঘো লাঠিটা ধরে তাকে আসরে নিয়ে যাচ্ছে। ফকিররা গান থামিয়ে হঠাৎ সেই জিগির (নাম) হাঁকতে শুরু করেছে। বহু বহু মানুষ! বহু বহু মানুষ! বহু! মুহূর্তে আবহাওয়া বদলে গেল। আবার সেই প্রথমদিকী অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব ঘটল যেন এই আলো প্রান্তরে। তারপর কানা বজলেদ আসরে বসলে সেই সমবেত গর্জনটা থেমে গেল। কিন্তু এখার বজলেদের অন্য মূর্তি। ওর গলায় একটা মড়ার মাথা ঝুলছে। মোলা হয়ে সে বসেছে। দু হাত বুকে বাঁধা। মুণ্ডটা উঁচু। ঠোঁট কাঁপছে। ওদিকে মরজিনা তখন আসর থেকে বেরিয়ে আসছে। আমার মনে হল, বাঘিনী যেন এপাশে ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হরিণের পালের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে। সারা আসর আর মেলা যেন স্তব্ধ। কী হয় কী হয় এমন একটা মুহূর্ত মোদের অনুভবে যেন।

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। বজলেদ অচমকা এক হাঁক ছাড়ল। পিলে চমকানো আওয়াজ। রাতের স্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে গেল ওই চেরা গলার চিৎকারে। সম্ভবত আনাল্ হক্ (অর্থাৎ আমিই সত্য, তাই আমিই ঈশ্বর) কথাটাই সে উচ্চারণ করল। কিন্তু 'হক্' শব্দটা 'হাক্' অথবা 'হা—আ—আক্' হয়ে উচ্চারিত হল। তারপর একটা ঢোল থেকে উঠল গুরু গুরু গুরু গুরু... গুম্ গুমা...গুম্ গুমা...গুমা গুমা ...গুমা গুমা। তারপর একসঙ্গে যেন অনেকগুলো একতারা থেকে উঠল। সে এক আজব কারবার। হাজার হাজার, নাকি লক্ষকোটি ভেমরা একসঙ্গে গুঞ্জন করছে বিরাট বাগানে—যেখানে লক্ষকোটি ফুল ফুটেছে নিশুতি রাতে। এবং ওই কলকব্জার মধ্যে ধীরে জেগে উঠল একটা মিহি—অতি মিহি কণ্ঠস্বর, তার সপ্তকের শেষ স্বর থেকে নেমে আসছে সেটা, ধীরে, মন্দ্র সপ্তকের দিকে, এবং মনে হচ্ছে এই স্বরারোহ সম্পূর্ণ হতে শুধু এই রাত নয়—আরও তিন মাস কম্ব বছর এবং সোটা জীবনটাই কেটে যাবে। কাঁপতে কাঁপতে সেই অবরোহণ ঘটছে। যেন অতীন্দ্রিয় জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু জগতের রাস্তাবে নেমে আসছে কোন এক শক্তি অথবা সত্তা। মিলিয়ে হতে চলেছে মুহূর্তে। চর্বাপদের 'নিলয় না-জানা হরিণী বুঝি সতর্ক পা ফেলে-ফেলে এই অবধি এসে দাঁড়াবে—বড় চঞ্চল তার দৃষ্টি শিশুল চোখ আর সোনালি শরীর। তার প্রতীক্ষায়ই এই মুহূর্ত মোনা শুরু হয়েছে।...

আমি অভিভূত হয়ে বলে উঠলুম—'বাহ্!' কিন্তু আবদুল্লা ফিক ফিক করে চাপা হাসল। তখন বললুম—'কী হল? হাসছেন যে?'

—'আপনার চোখ আছে। থাকবে না? আর্টিস্ট মানুষ আপনি।'

—'হাঁ, বয়সটা সাঁতা আর্ট। আর, আপনিও তো আর্টিস্ট, মহাজন সাহেব।'

মহাজন চন্দুর মেলে বলল—'এ বয়সে আর আমি আর্টিস্ট হওয়া চালাচ্ছি না ওস্তাদজী। আপনার যানায়। তবুও বলুন। এই খাবদেরকো চুলপাকা আর ছোকরোদের ডলের নাল গড়িয়ে আর কী হবে?'

ওর কথার লক্ষ্য কী, এতক্ষণে টের পেলুম। ওর চোখ মরজিনার দিকে। মুহূর্তে লোকটিকে ঘেন্না হল। ও এই আসর আসরীদী ও সঙ্গীতময় আবহাওয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে রহস্যময়ের হিসেব কষছে। ওর বলবার পরবী মহাজন। নিশ্চয় ওদের সুরের কারবার ছিল। টাকা আনা পাই সুরের হিসেব ছাড়া কিছু বুঝত না—সেই রক্তস্রোত ও মেধা ওর ঘরো আছে।

চুপ করে আছি দেখে মহাজন আমার পাঁজরে ওর পলার আর্টিপরা আঙুলটা খুঁচিয়ে দিল।—'কী? চোখে ঘোর লেগে গেল নাকি? বুঝেছি দিলা সরেব, এ আসর ছেলে পা বাড়াতে কোন জোয়ান ছেলের মনই যা চাইবে। থাকুন, থাকুন।'

ওর উঁচামি এবার অসহ্য লাগল। একই মানুষের যে কত রকম চেহারা থাকে। কত রকম প্রকৃতিও। পরাধেরতী কাঞ্চনাদিতে বিচারকের আসনে বসে এই লোকটিকেই অসামান্য গাম্ভীর্যে রায় দিতে দেখেছিলুম। এই লোকটিই খড়ের জঙ্গলে খুনে খুনেদের ছেরে সরকারী পুরস্কার পেয়েছিল। এবং এই একই লোক 'মহারাজ নন্দকুমার' বঙ্গাপালায় মীর কাশিমের পার্ট করে এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার প্রমুখ রাজকর্মচারীদের হাততালি কুড়িয়েছিল।

এবং সেই একই লোক তারপর আমাকে কাঁদিয়ে ছেড়ে—যাকে ঘরে আনতেও ইচ্ছে করে তাই, আপনার মতো বেরিয়ে পড়ি সব ছেড়ে ছুড়ে। শালা বলে গায় হাত আছি যে! হাজারটা বুঝি অব শেতড় বকড়। ওপড়ানো হচ্ছে না।'

বললুম—'ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে কী হত, ভাবছেন?'

মহাজন চোখ টেরা করে আমার দিকে একবার তাকাল। বলল—'কত কী হত! অন্তত ফকির-ফকিরনি ছেড়ার চুকে হাঁড়ির খুদকুঁড়ো চৌ চৌ করে খিলে পানিয়ে বেড়ুম। চাল জুলো নেই তো বকবে কাকে? যেমন ওই আবদুল্লাটা।'

—'ওই মেয়েটিকে আপনার ভাল লাগল, তাই না?'...হাসতে হাসতে বললুম।—'ওর নাম মরজিনা। ইস্তার ঘরন ফকিরের মেয়ে। ওর বাও আছে। ভারি তেজী মেয়ে মহাজন সরেব। সামলানো কঠিন।'

মহাজন সুড়সুড়ি খেয়ে হেসে খুন।—'ওরে বাবা! সব হাল হদিস যে ঠোঁটস্থ তোমার। বুঝেছি। তবলো, তবলো। চালিয়ে যান। আমিই শালা কিছু পারলুম না। শুধু মুণ্ডুকুল সার!

কিরণ মহারাজ

এই সময় শেষ দোকানটী ডাকলেন —'বাবা মহাজন! একবার আসবে। ভালো দেখাও।'

আব্দুল মহাজন হুঙ্কারি এগোল। হেডিকেনটা তুলে কবিরত্নকে বলল —'আসুন। ওখানে বসবেন। জলকলে ঢুকবেন না যেন। নর্দমার জায়গা। পোকামাকড়ের উপদ্রব হতে পারে।'

সে কবিরাজের সঙ্গে এগোল। দেখলুম কবিরত্নের হাতে একটা পেতলের ঘন্টা। এই ঘন্টাকে আমি ভয় পাচ্ছিলুম। মেলার দিকে।

মরজিনাকে দেখা গেল না। কাঁকার করেকটা ছোট্ট মনোহারি দোকান রয়েছে। গ্যাসবাতি জ্বলছে। একটাতে ছক্কি মাথায় বাঁধা মেয়েকেও দেখা যাচ্ছে। তেলের চটের ওপর কিছু ছুঁড়ি চিরুনী আলতা আর একটা নতুন মার্কার সাইজের রঙীন টিনের সুটকেস। লোকটা হাতে তুলে সেলাম দিয়ে ডাকল—'আসুন মাস্টারজী! সেকেরেই যান।'

সে একটা দস্তা সিগ্রেটের প্যাকেট তুলে ধরল। লোকটা যে একজন আইনী, তাতে ভুল নেই। হাতে কাটা কলো তিলে কবুতর আছে গায়ে। পরনে ডিকে ব্রাইজ্ঞ লুঙ্গি। তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামে কয়েকটা চাবি ঝুলছে। হাঁটু মুড়ে বসে আছে সে। কলো গায়ের রঙ। মুখে পাকানো লোকিবাড়ি। নাকটা থাবড়া, কিন্তু সুচোলো ডগা। মাথার চুল বিশ্রী ছোট, কিন্তু বড় চুল নয়। তার দু' কানে দুপোয়ে আনটা রয়েছে। দু' কবজিতেই আবদুল্লার মতো তাবিজ আর বালা।

মাস্টারজী বলে ডাকল, কাজেই চেনা মনে হচ্ছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। সে একটু হেসে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—'বন্ধুর নাম মনসুর আলি। আপনি যেমন মেহমান (অতিথি), তিনি আমার বন্ধুর।'

কী কাণ্ড! এই সেই মরজিনার বর! খরজামাই এবং 'পাঁজি দরজাকা' শালা বাচ্চা' মনসুর কবিরত্ন! তা হলে ওকেশেষে মনোহারি দোকান বসানোর নেশাটা ধরেছে শ্রোত মেটাতে পেরেছে, বোঝা যাচ্ছে। বসে পড়লুম ওর চটে। সরে জায়গা দিল। বলল—বেশী হয়ে গেল খাসতে। কেন কেনা এক পয়সাও হল না। বুঝলে ব্যাপার, নলহাটির বাজারে মাল কিনে গাড়িতে চেপেছি, তখন বেলা দু' দণ্ড দু'। তার মানে, সন্ধে। আসতে দু' ঘণ্টা লাগল। তারপর বাড়ি ঢুকে সেঁদু করে তালাচাবিলুপে আঁটা। অন্ধেরসন্ধে চলে এলুম। তখনকে ধারা কিনবে, মানে মেয়েদ্ব বাড়ির ছেলে মেয়ে বউ ঝি, সবাই মালও কিনে ফেলে পড়েছে। এখন তো শুধু গান-শুনিয়ে লোক আর ফকির কাঙ্গালার রাজত্ব। কিনবে কে এ সব জিনিস?'

কথাবার্তা শুনে বেশ ভালই লাগল লোকটাকে। বয়স ত্রিশের ওপরে, তাতে ভুল নেই। বলিষ্ঠ গড়ন। মন-মনে ঠাউরি। সব সময় খুব্বে দৃষ্টিটা। বলল্লুম—'হঠাৎ এমন মনোহারির সখ হল কেন?'

—'আমার হুজুর ধারা নানান জিনিস ধান্ধার ফেলে। গত সনে ভাবে জমিও নিয়েছিলুম দু' ঘিয়ে। মনসুর বলে—'ধরবার। আমাদের হাল চাষে নেই। হল না—ছেড়ে দিলুম। বউটারও বাপের দিকে টান। বাপের কথায় ওঠে-বসে। সে একটু ইদিকে ঠেলে চাষবাসটা করলুম।'

—'তোমার বুদ্ধি ফকিরী লাইন পছন্দ নয়?'

মনসুর সিরিয়াস হয়ে বলল—'কথাটা তা নয় মাস্টারজী। মেরুদণ্ড ফকির হো কম নেই দুনিয়ায়। তা ছাড়া আমি একটা কথা ভাবি, বুঝলেন? খোদা এই গরেবখানা দিয়েছেন। বেশ, সবার তজদের জন্যেই দিয়েছেন। কিন্তু গরেবখানাতে তো হেসের ইঞ্জিনের মতো জলটা ঢালাটা ঢোকাতে হবে? খত্তর না টিকলে সাধন ভজন হবে কী করে? অন্ধকার বাটা হলে—তিন অন্ধে। আমার তা পোষায় না হুজুর। একবার ছেলে তিন মাস্টার এক ধাক্কা কলেজ—এমন বাঁকের গতর নিয়ে ভিক্ষে করছ, লজ্জা করে না? আমার মাথায় আগুন ধরে গেল, মাস্টারজী। সেই থেকে ছেড়েছি। কথাটা তো ভুল বলেন নি, বলুন না?'

কথাগুলো তো ভালই। বললুম—'তুমি ঠিকই বলেছ, মনসুর।'

মনসুর কানের থাটো বুটোয় ঝকাঝক একবার আঙুল ছুইয়ে নিল। বলল—'আপনার সঙ্গে আরেক ফাকরা জুটেছে শুনলুম। কী নাম যেন...'

—'আবদুল্লা।'

—'হুঁ।...তবে সে এক অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া আমার দিকে ফুল কুচকে তাকাল। আবদুল্লার দিকে দৃষ্টি। চাপা গলায় বলল—'আপনার সঙ্গে ওর খুব দোস্তি আছে নাকি?'

—'না। পথে আলাপ। কেন?'

—'আমাকে আড় কয়েন, হুজুর। খালাকে আমি মারব।'

চমকে উঠলুম।—'সে কি! কেন?'

—'আস্টারজী, ওর অভ্যেস খারাপ। শিকারী বেড়ালের থোঁক দেখলেই চেনা যায়। খালাকে আমি ছেরে দেশ-ছাড়া করব।'

আব্দুল মহাজনের মতো এই লোকটাও যেমন ছেড়ে বেরিয়েছে ঘরা মুতিতে। এই ভালো জায়গায় আদিম প্রকৃতির মানুষের মতো নিরাপত্তাহীন মনে মনে কেমন বিপন্ন হয়ে পড়ল, তখনিনে অনেকবার টের পেয়েছি। আমার ওপর ওর রাগ হয়েছে কি না, সে জানে। আগাগোড়া উঁচিয়ে রেখার ভঙ্গীতে বললুম—'আবদুল্লা আর আমি তোমার শত্রুদের একরাতের মেহমান। এই আসর ভাঙলেই আমরা চলে যাব। তুমি তাই কোন গণ্ডগোল করো না।'

মনসুর ঘিয়ে দৃষ্টিতে হিসহিস করে বলল—'শালার মোড়টা দেখছি। ভাবছে, আমি কিছু দেখছি না—বুঝছি না। ওরে চাঁদ আমার! আমার নাম মনসুর। খালার চোখ।'

ওর পেছে গেলুম। আবদুল্লাকে সতর্ক করা উচিত। অবশ্য ওর তো কোন দোষ নেই। ও মরজিনার প্রতি এতটুকু দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। দোষ তো মরজিনারই। মরজিনাই কেন ওকে প্ররোচিত করতে চায়।

এই সময় আমার মনে পড়ে গেল, ফকির-কাঙ্গালদের জন্যে মাঝেমাঝে অকল্পনীয় হলেও এমন একটা ঘটনা আমার দেখা হয়েছিল। অবশ্য, সেটা তেমন মারাত্মক কোন হিংসা-জনক সংঘর্ষ নয়—সামান্য লড়াই। এবং হাস্যকরও বটে।

কাশী ছত্রকুমার নাঁচু অঞ্চল হিজল ইউনিয়ন। অঞ্চল বন্যাবিরোধী বাঁধ আছে ওই এলাকায়। একবার দুপুরে-বেলা বাঁধের পথে আসতে আসতে হঠাৎ দাঁড়াতে হল। দুই ফকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বচসা করছে। একটু পরেই বচসার উপলক্ষটা বুঝতে পারলুম। কোন গ্রামে খুব ধানাপিনার ব্যাপার আছে। সম্ভবত ছিরোটিয়ের ভোজ। প্রথম ফকির ধবর পেয়ে সেখানেই যাচ্ছিল। পথে দ্বিতীয় ফকিরের সঙ্গে দেখা। প্রথম ফকিরের গাঁজার শঙ্ক কুচ্ছিয়েছে। তাই ভেবেছে, দ্বিতীয় ফকিরের কাছে নিশ্চয় কিছু আছে এবং সেই আশায় সে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, ধানা-পিনার খবরটাও দিয়েছে। কিন্তু তার বরাত, দ্বিতীয় ফকিরেরও শঙ্ক খালি। অগত্যা হতাশ প্রথম ফকির পা বাড়ায়। দ্বিতীয় ফকির তার পেছন ধরে। অমনি প্রথম ফকির তাকে চার্জ করে—'তুমি কেন যাবে? তুমি তো জানতেই না খানার খবর। খবর্দার, যাবে না।' দ্বিতীয় ফকিরের বক্তব্য—যা রে! খানা তো ও দিচ্ছে না যে তাকে আটকাবে। প্রথম ফকিরের পালটা বক্তব্য—খবরটা সে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অতএব দ্বিতীয় ফকির জানে না যে কোথায় খানা হচ্ছে। অতএব ও জানা করেও করছে খবরটা না পাওয়া পর্যন্ত খানায় যাবার অধিকারী নয়।

বাঁধিয়ে-বাঁধিয়ে ওদের অদ্ভুত বিতর্ক শুনেছিলুম। সংলাপটা অবিকল মনে আছে। এখনে টুকে দিচ্ছি ওদেরি ভেকে—

"প্র ফকির। তোমার বাবার কোন গ্রাইট নেই।

দ্বি ফকির। তোমার আটকাবারও গ্রাইট নেই।

প্র। খবর্দার। পা বাড়ালেই ঠ্যাং ভাঙব।

দ্বি। ইস্! ভারি পালোয়ান! এক ঘুসির জোর নেই—বলে ছুমন্তর ফকিরের ঠ্যাং ভাঙবে!

প্র। দেখবি? দেখবি তবে হাতের ফকিরের বাহুবল?

দ্বি। আও! চলা আও!"

বাধা দেবার আগেই ঘুঁষি তুলে লড়াই শুরু হল। অবিকল সিনেমার ফাইটিং। নির্ঘাৎ ওরা সিনেমা দেখেছে। ঘুঁষি বাগিয়ে ঘুরতে ঘিরে আচমকা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বাঙালী প্রথায় জাপটে ধরল এবং বাঁধের ওপর পড়ল। আমার চোখ গেল অন্য দিকে। বাঁধের ঢালু গা বেয়ে ওদের হাতের লাগানো একবোঝা সোল টিনি—যাতে ওরা ভিক্ষের চাল নেয়, ঠকাঠক আওয়াজ তুলতে তুলতে গড়িয়ে চলেছে। চাল ছিল কি না, বোঝা যাচ্ছিল না। টিন দুটো জড়াজড়ি ওই ভাবে নীচের জলে গিয়ে পড়তে অনন্তকাল সময় নিল। তারপর দুজনকে টানাটানি করে ছাড়ালুম। ডিফারেন্স হতে হল। সে অন্য ব্যাপার। কিন্তু এখনও চোখে ভাসে এক জোড়া ভিক্ষেপাত্র অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে বাঁধ বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে। আপন মনে হাসি। আর কেউ তো দেখতে পেল না এই অভাবনীয় দৃশ্য।

কিন্তু এখন যার আভাস পাচ্ছি ইন্দ্রার বেলায়, এই নিশ্চুতি রাতে এবং অন্ধকার জঙ্গলে আয়নায়, তা মোটেও হাস্যকর হবে না। দুজনেই সম্ভবত আয়ত্তাধিতে পাকা। দুজনেই কলায় শুনেছি ইতিমধ্যে। খুব ভয় পেয়ে গেলুম। কী করব, ভেবে পেলুম না। সবচেয়ে অবাক লাগল, এই লোকটা তা হলে মেলার আসার পর বউ কিংবা আবদুল্লার ওপর কড়া নজর রেখেছে এবং অনুসরণও করেছে গোপনে! কিন্তু তা যদি হয়, তা হলে ওর মনোহারি দোকান বসানোর জন্যে কাকে ও ভেংচেছিল।

হ্যাঁ, তাই বটে। একটা দশ-বারো বছরের ছেলে, পরনে ছেঁড়া সেন্টুলুন আর গায়ে মরলা গেঞ্জি, একটু পরেই এসে সামনে দাঁড়াল। বলল—'আমী ইঁইদিকে গেল।'

মনসুর চোখ টিপল তাকে। বখশ দিয়ে বলল—'আমীর বাচ্চা আমার। আর, বোস দুশ্চাল।'

লোকটা চারও দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে তা হলে। ছেলেটিকে দেখতে দেখতে বললুম—'এ যে?'

—'জী, এতিম (অনাথ) বালক। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে ছেরেছিতে খায়। আমি ওকে পুষ্যি নিয়েছি আজ।'

—'আজই?' একটু হাসলুম।

মনসুর হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল—'যাই। বিবেচনা করুন; বেলা করব। সারারাত তো একা করা যায় না—নানান কাজে ওঠা চলা করতে হবে। তখন একজনকে সহকার। বাদ্ কাজই, দুশ্চাল বোস। অন্ধের এসে বসতে বলিস। আসছি। মাস্টারজী, আপনি ইচ্ছে হলে বসুন। অবশ্যের কুটুম্ব বসল—আমারও কুটুম্ব। অসম্মান করবে না মনসুর।'

সে প্রায় লাফ দিয়ে চলে গেল।

আরও ভয় পেয়ে গেলুম। আমার লক্ষ্মৌয়ের দুনিয়ারি মনে পড়ল—এক ঘাটে ওটা পানাই হয়ে যায়। প্রথমে মনে হল, মনসুরের কানে ব্যাপারটা তোলা যাক্। কিন্তু সে এখন আমার শত্রু হয়ে আছে। 'তোমার জগতে ও মোর/রিক্ত। (বুক) হয়ে রবি। তুলে ফোটাবি ফল ধরাবি/ হৃদয়ে। (পরমপদ মহম্মদ) পাবি। মক্কা গেলি হজ করিলি/নমাজ পড়লি মসজিদে (উপরন্তু সম্পদ ধন) দিলি/ ও তোলা মোল, তোর ভেতর (বুকের) মধ্যে ওরা শরীফ (মক্কার পবিত্র মসজিদ) দুনিয়ে (পুরু) নামের চাবি।" (একই গানের কলকব্জা: মুর্শিদ হয়ে বসে থাক্ মোন/মক্কা যেতে পারিব।') মনসুরের বোজা চোখের সামনে এখন পবিত্র চাবির আবির্ভাব। দুনিয়া রসাতলে গেলেও সে নির্বিকার।

আবদুল্লাকে বলব? কিন্তু সেও তো কম নয়। হালনামলা তাতে আরও বেড়ে যাবে বৈ কমবে না। আর মরহিনার কাছে এখন যাওয়া বৃথা। মনসুর তাকে এতক্ষণে চার্জ করে বসেছে হয়তো।

হঠাৎ শুনি: 'মামু, দু আনা পয়সা দাও না!'

খনাই ক্যাবলাকান্তের মতো হাসতে হাসতে বলছে। বোঝা যাচ্ছে, সব লোককেই ও মামু বলে ডাকে। বলছে—'পয়সা কী করবি রে?'

—'সুলেমন খাব।' বলে ও রেলমি চুড়ির বাণ্ডিলটা তুলে বাজাতে থাকল।

—'এই! ভেঙে যাবে। তখন মামুর হাতে চাঁটি খাবি। রেখে দে!'

ও গ্রাহ্য করল না। কখনও চুড়ি, কখনও সেফটিপিন, আলতার শিশি, চুলের ক্লিপ নাড়াচাড়া করতে থাকল। 'অন্ধের বাজারে এসে মোন গিয়েছে মজে। দিনে দিনে পুরু, দিনকানা হলাম গো/রাস্তা পাই না খুজে/এ অন্ধের বাজারে।' ওর চোখের দৃষ্টিটা প্রথমে ছিল সুপরিচিত গ্রামীন কুসংস্কার আচ্ছন্ন। ক্রমশ দেখি সর্বেসমস্ত ঘটছে। বিলক্ষণ বাড়া। কিন্তু মা—তবু লোভ নয়। দৃষ্টি। সুখের বিহ্বলতা। ও ঘুরে ঘুরে রঙীন চুমকিবসানো বাস্তবতা পরখ করছে নতুন জহুরীর মতো। ওর ছোট্ট অনাথ এবং স্বাধীন হৃদপিন্ডের স্পন্দন টের পাচ্ছি। ছেলে হঠাৎ এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় ও বলে উঠল—'যাও না মামু, দু আনা পয়সা!' তক্ষুনি পকেট হাতড়ে একটা দু'আনি বের করে দিলুম। ও হাতের চেটোর পেতলের দু আনিটা উল্টে-পাল্টে দেখে যেন মুক্তোর দর পেয়েছে এ ভাবে একটি লাফ দিল।—'এটুকুন বলো মামু। যাব, আর আসব।'

ছেলে পেরিয়েছে মহলা মেজিসরা ছোট্টো বিশ্বেরার ঘরে শোবার মতো জটলেই করতে করতে রেলের আদলের ভিতর ঢোকে। অবশ্য এই ঘরের বারান্দাকে আবদুল্লার ঘর আমারই। ঘরটা নৈতিক তো বটেই।

তারপর যার পাত্তা নেই। খুব চিন্তিত হচ্ছি। এই নিশ্চিহ্ন রাতের ছেলের অন্ধকার অংশে পৃথিবীর আদিমতম সংকট কি ঘটল এতক্ষণ? ওদিকে আসরে গানের ক্লান্তি নেই। গাঙ্গার ধোঁয়ার কুয়াশার মতো একটা নীচুতে ঝাপসা আলোটা রহস্যময় করে তুলেছে। মোকদম ছেলে যাওয়া উচিত কিনা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, এমন সময় লম্বা লম্বা হাত ফেলতে ফেলতে মনসুর ফিরে এল। মুখটা থমথমে। হাঁফাচ্ছে। তারপর চমকে উঠলুম। ওর কথা এবং নাকের কাছে একটু রক্ত. হাতা কাটা কালো কতুয়াটা বুকের ওপর তলা হয়ে ঝুলছে। লাল পাথরের মালাটাও ছেঁড়া। ঘনতে দিয়ে দু-তিনটে মোটা পাথর টকটক করে ঘড়িয়ে পড়ল। সে মুখ নামিয়ে মালাটা দেখল এবং পাথরগুলো কুড়িয়ে আপন মনে ছেড়া সুতোয় ভরা পাকিয়ে ফুটো দিয়ে ভরতে ব্যস্ত হল।

ধস্তাধস্তি একটা হয়েছে। কিন্তু সেটা কার সঙ্গে? এবং যা কিছু হয়েছে, তা মেলার বাইরেই কোন অন্ধকার জায়গায় হয়েছে। কারুর কোন শব্দসোল শুনিনি। এ সব লোকের মেজাজ আমি জানি। এখন কিছু জিগ্যেস করলে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া, খালি মনে হচ্ছে, ওর ঘাঁটাঘাঁটি জীবনের এই অন্ধকার পহরকে কোথাও যেন আমিও ডাকিয়ে আছি। তাই, সে মালাটা সিঁটি দিয়ে ঠিকঠাক করে নেওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকলুম। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তারপর সে চুড়ির একটা ঘায় তুলে কথা এবং নাকের কাছটা মুছে ছড়ের ছোপগুলো দেখতে থাকলে বললুম—'আমি উঠি, মনসুর।'

মনসুর মাথা নুইয়ে রেখেছিল। কোন কথা বলল না।

আমি আবদুল্লার খোঁজেই চলেছি। বাঁধের দিকে এগিয়ে চলা গলায় তাকে ডাক দু-তিন অবশ্যই। সাড়া না পেয়ে ফের মেলার এলুম। মেলায় ও মাথার ছোট্ট মুটো খাবারের দোকান। পাঁপর-ভাজা ভেলেভাজাই বেশি সেখানে, দু গামলা রসগোল্লা আর পান্তুয়াও আছে। আর আছে এলাচের মেওয়া মিশ্রি কলা। একটা দোকানের সামনে দেখি ফোকরে একহাত, অন্য হাতের আঙুলে কাচড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই খনাই ছোকরাটা। খুব্বই গভীর মননের চিন্তায় ডুবে আছে। আমি ফিরে গিয়ে হাত না ছোঁয়া পর্যন্ত সে টের পেল না তার নতুন মানুষ অস্তিত্ব। সেই পেল, মুখের দিকে তাকিয়ে কাচলা হাসিটি হেসে দিল। বললুম —'কী রে? সুলেমন খেলি?'

মাথা দোলাল। আঙুলে কাচলানো লালা ফেলা হাতটা সেঁধিয়ে দিল। দু আঙুলে দু আনিটা ধরা আছে।

মহম্মদ সাবির্রুদ্দীন খাঁ

—'কী হল?'

খনাই দুশ্চিন্তার মুখে বিড়বিড় করে বলল—'দু আনায় একটা, মামু।'

—'তাই কেন্। কিনে খা। কী?'

—'ভাবছি।'

এইটুকু ছোকরা তাহলে ভাবতে জানে! সে ভাবে!—'কী ভাবছিস রে?'

—'ভাবছি।'

হেসে বললুম—'বেশ। ভাব্ তাহলে।' সে দাঁড়িয়ে থাকল আসের উল্টোদিকে—দৃষ্টি গামলার দিকে। বুঝলুম, একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। মোটে একটা রসগোল্লা বা পান্তুয়াতেই তার বুকের সম্পদটা ফাঁকা হয়ে যাবে যে! সে সেই দুশ্চিন্তার কথাই যেন ভাবছে। বাচ্চা বয়সে বার্ধক্য বাস্তবিক। আবদুল্লা ওকে দেখি চুকেছে যে তাকেই হোক—বাদু-তাড়িত হয়ে কিংবা পাখি প্রজাপতি দেখলাকারের সাহায্যে যেমন নিসর্গ গহনের কংকৃদ্ধি ঘটায়, তেমনি কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে।

তারপর সেই ফাঁকা হাসি আমার মুখ থেকে মুছে গেল। 'এক মুহূর্তে ওলট-পালট ঘটে যায়।' ঘটল কি কিছু? মন অস্থির। মরহিনাই যা কোথায় গেল? মালাটা নিতান্ত ছোট। তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল। তাকতে তাকতে পুবে দিকের গাছপালার তলা দিয়ে কানা নকশেলের আধকাঁচ পেলুম। কুত ছেতে বিশ্বাস নেই। কিন্তু খাঁ খাঁ নির্জন এই জায়গা, ঘরবাড়ি ভিতরের বেদীতে তিনটি মরুর মাথা আছে এবং পশ্চিম জলাশয়—কুয়ের জল অব-চেতনার তলা থেকে মাতৃভাষার মতো অনেকগুলো রোমশ হাত বাড়িয়ে এগিয়েছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। চলে যেতে পা বাড়িয়েছি আচমকা কোথায় একটা ঘায় থেকে কী খুন করে পড়ল এবং অন্যদিকে হেসে উঠল হি' হি' হি' হি'...হি' হি' হি'! ভুতুড়ে নাকি স্বরের হাসি। আমি আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। জীবনে অমন ভয় কখনও পাইনি।

তারপর হাসছেতিটি সামনে এসে দাঁড়াল। আলোআর কটক দিয়ে

পিছনদিকের আলো নয়—একটু ছটা আসছিল। তাতেই বোঝা গেল, ঘুঁটিটার কোমরে একগাদি মোটা আছে—বাঁকি লম্বাটাতে নিশ্চয় লগাঁর। রোগা, চোঙা, বিকট। সে নাকিস্বরে বলে উঠল—'ডক্ত সেলিল নাকি?'

তারপরই সে আমার একটা হাত ধরে ফেলল। আমি নিঃসাড় হলেও টের পেলুম হাতের তেলোটা বেশ গরম। ভূতের হাত ঠাণ্ডা বরফের মতো হওয়া উচিত। তা যখন নয়, তখন এ বাটা নিশ্চয়ে মানুষ। কাঁধুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। পারলুম না। সে যেন হি হি করে হেসে উঠলেই বা হয়তো ভুলে একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ব মনে মনে। অমনি আশ্চর্য, হাত ছেড়ে দিয়ে সে শুকনো পাটখাড়ির গাদার মতো গড়িয়ে পড়ল। আর্তনাদ করে উঠল, 'আল্লা মেরেছে রে!'

এবং হিপিয়ে হিপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। আমি অভিভূত। বলুন তো রে বুই?

তার কান্নার মধ্যে যা বক্তব্য, তাতে বোঝা গেল—সে যেই হোক, তাতে আমার বাবার কী? কেন তাকে মারা হল? হাত যে কুষ্ঠ হয়ে গলে যাবে, জানে না? ইত্যাদি।

এই সময় কেউ অন্ধকার ছেড়ে আসছে, তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

—'কী হল মাবে?'

আবদুল্লা। বলল্লুম, 'আরে কী কাণ্ড! এই ভূতের মতো লোকটা আমাকে...'

আবদুল্লা বাধা দিয়ে বলল, 'আমাকেও তাই করেছিল একটু আগে। লোকটাকে আমি এত চড় কষিয়েছি।'

—'কে ও?'

—'একটা মাস্তান। শুনলুম, খোনা মাস্তানবাবা বলে ডাকে সবাই। জনা দশেকের সাঙ্গোপাঙ্গ থাকে।'... আবদুল্লা হাসতে লাগল। 'মর্জিনা-বিবি তো বলল, ওকে মারা উচিত হয়নি। খুব বড় সাজক নাকি। মুখের কথা যা বলে, ঠিকঠিক ফলে যায়। আমাকে বলল—কুষ্ঠ হবে! হোক্ না। সহিজীর ইচ্ছে।'

শিউরে উঠলুম। হয়ত কুসাস্কার। মুখে অবশ্য হেসে বললুম, 'আমাকেও বলেছে। যাক্ গে, শোন। তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। জরুরী দরকার।'

খোনা মাস্তানবাবাটি হঠাৎ এ সময় উঠে দাঁড়াল। দু হাত ঘুঁড়িয়ে ফিকিরে একবার নেচে নিল। মাজাও দোলাল। তারপর বাঁকড়া জটা ও দাড়ি নেড়ে আবদুল্লার দিকে আঙুল তুলে ভড়ং সুরে বলল—

মা গি' (রে) মা!
ছোঙা পীরিত করেছে।
দই খেয়েছে ভাঁড় ভেঙেছে
কাঁধার ছেঁদেছে॥

তারপর 'মা গি মা' বলতে বলতে সে চড়াক করে কাঁটবেড়ালির মতো কলার গাছটার উঠে পড়ল। আমরা দুজনে হেসে উঠলুম। আবদুল্লা বলল, 'শালা মাস্তান, একে খোনা, তারওপর গলায়-গায়ে বেড়াল। ভূতের মন্ত্র শালা!'

তারপর সে আমার কাঁধে হাত রেখে এবং পা বাড়িয়ে চাপা গলায় বলল, মর্জিনা যেন আমার পিছু নেওয়াচ্ছিল। হেনসময়ে ওর মরু হাজির। ওরও খুব মারামারি হল। দেখে চলে এলুম।'

## পাঁচ

আবদুল্লার সঙ্গে আসতে আসতে টের পেলুম, যা আন্দাজ পিলিয়ের ছটা ভেবেছি, তা নয়। ওই ছটা দশ-গজ আদি ছড়িয়ে আসতেই পারে না এবং কোন কেরামতিও নয় পীরের বচনের। অনেকে হয়েছে কী, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদটা মধ্যে ভেসে উঠেছে। বিলাসপুরের ফুলভূমি জুড়ে হাল্কা জোৎস্না পড়েছে। দূরের ঘুঘুটি পাখিটা ডেকে চলেছে—ঘি... ঘি...ঘি! ঘি...ঘি...ঘি। সেই সুরের বিস্তার যেন স্থানে স্থানে দেখা দুরের মায়া বিস্তর...

চলতে চলতে আবদুল্লার কী হল, ঝিঁঝির (জন্তুর নাম) হাঁকারে সুর ধরল। ঠোঁটের ডগায় পুরো জিভের সাহায্যে উচ্চারণ করল সে, 'লাইলাহা' (কোন উপাস্য নেই)...এবং গলার একেবারে বুকের দিক থেকে দম টেনে ভৌতিক মিহি ও চাপা আওয়াজে বলল, 'ইল্লাল্লাহু' (ঈশ্বর ব্যতীত)...। ...এইভাবে চলল তার ঝিঁঝির। 'লাই-লাহা...ইল্লাল্লাহু!' 'লাইলাহা...ইল্লা-ল্লাহু!' বুকের ভিতর দম টেনার সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার ফলে 'ইল্লাল্লাহু' দেখাল 'ইল্লাল্লাহু'!...

কেন এমন করছে সে? ভেবে পেলুম না কিছু। সে কি ভর পেয়েছে? নাকি চিত্তচাঞ্চল্য দমন করছে? যে জন্যেই করুক, রাত দুপুরে নির্জন জঙ্গলে এবং আবছা জোৎস্নার সঙ্গীকে এমন ভূতুড়ে আওয়াজ করতে দেখলে গা ছমছম না করে পারে না। তার চেহারা চরিত্রও বদলে যায়। তাকে মনে হয় একটা জমাট রহস্য।

সেসার দিকে এলে সে হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর আসরটা দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে বলল, 'এবার মালাইয়ের বিয়ের বাজী পড়বে।'

দেখলুম, আসর ঘুঁটিয়ে লোকেরা ব্যস্তভাবে একটা কিছু করছে। আসরের পুব দিকে কিছু ফাঁকা জায়গা—তার দেখে গ্রামের জঙ্গল করে এইমাত্র আসরা আসছি। সেই ফাঁকা জায়গায় কয়েকজন ফাঁকর দুটো বাঁশের খুঁটির মতো জিনিস খাড়া করে নিয়ে গেল। খুঁটির ওপর দিক-টায় অন্তত বাঁশের বাতা বাঁধা রয়েছে। আবদুল্লা আমার হাত ধরে টানল। উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'আসুন। গাজনবাজী দেখি।'

ভিড়টা দেখে জানলুম, বহুসংখ্যক লোক এখানে জুটেছে ভেবেছি, তারও বেশি। বলে ছিল বলে সংখ্যা বোঝা যাচ্ছিল না। ফাঁকা জায়গায় সেই বাঁশের গাজনবাজী খুঁটো পোঁতা হল। কিছু তফাতে একধারে ভিড় ওরে ফাঁকর ও সাঙ্গোপাঙ্গ মানুষগুলো দাঁড়িয়ে গেল। আমরাও ভিড়ে ঢুকলুম। দেখলুম, কালা ধরনের সবার আগে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার লাঠি ভর দাঁড়িয়ে আছে মদনদাস।

একটা লোক—সে ফকীর নয়, স্বয়ং বাজীকর মনে হল, বারুদমাখা সলতে আর পিদীম নিয়ে এগোল বাঁশের গায়ে খুঁটোর দিকে। তারপর খুঁটো সলতে ধরিয়ে খুঁটো ঘুঁটিতে পুরে দিল। তারপর ছোড়ে এসে কানা ধরনের পাশে দাঁড়াল। চড়চড় শব্দে ওদিকে বাজী জ্বলে উঠল। ওরেক মুহূর্তেই বাঁশের খুঁটি লুটো আগুনে ঢুলের গাছ হয়ে উঠল। ভালপালা ছড়নো বেশ বড় গাছই বলব। ডগায় একটা করে আগুনে ফুল। তা থেকে নানা রঙের স্ফুলিঙ্গ উড়ছে। ভারি সুন্দর দৃশ্য। ভিড় একসঙ্গে গর্জন করে উঠল, 'হক্ হক্ আল্লার হক্!' আমার আশেপাশে সবাই কথাটা উচ্চারণ করছে। আবদুল্লাও। এই প্রবল সংক্রমণ আমাকেও পেয়ে বসল। এবং গলা মিলিয়ে দিলুম হুঁশের চিৎকারে, 'হক্ হক্ আল্লার হক্!'

শ্রেণীবিশ্ব হুঁশের আদিম রহস্যময় গর্জন কতক্ষণ ধরে চলল। ততক্ষণে বাজীকর হাওয়া ওড়াচ্ছে। একটার


'শ্বাসে শ্বাসে ভেসে যাব রঙে, নৃত্য বিভঙ্গে'

রূপ আর ছন্দ। ক্ষণে ক্ষণে তারই জয়।
আনন্দ আপ্লাবিত এই দিন ওদেরও চাই

বোরোলীন

স্বরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষার অভিনব। কাটা-ছেঁড়া-ফাটা বীজাণুরোধী।
ত্বক ওষ্ঠ ত্বক ফিরে আসে স্বাভাবিক কোমলতা।
নিয়মিত বোরোলীন-এ শারদীয় সৌরভ।

বি, ডি,
কার্বলিটিক্যাল
ব্রড লিমিটেড

পর একটা ঝুলে থাকেন্দ্র ঘরের আকাশে তীব্র ঝনঝনানি তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হল, অন্তত অরেঞ্জশো বছর পিছিয়ে এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। কারুর যেন বলতে কিছু নেই আমার মতো। এই সময় ওপাশের ঘরের ভিতর থেকে উলুধ্বনি শোনা গেল। মুসলিম মেয়েরা তো উলু দেয় না! সম্ভবত বিনয়বাবুর হিন্দু মেয়েরাও এসেছে পাঁচের ঘিরেতে। তারাই উলু দিচ্ছে। ব্যাপারটা জমে উঠল। চমৎকার। মনে মনে সকৌতুকে আমার শাহের উদ্দেশ্যে বললুম, কী? ঘিয়ের সাধ মিটল তো এবার?

শিহনে শুনা আব্দুলের হাসানের আলো ওদিকে পৌঁছচ্ছে না। যা আলো, তা বারান্দার। দেখি, জনা পাঁচেক কর্মিকের আচমকা ভর হঠল। অদ্ভুত একটা গর্জন করে একে একে তারা ঘরেনো ঘরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাঁটু ভাঁজ করে নিচায় পড়ার ভঙ্গীতে, দু হাতে হাঁটুতে রেখে, মাথা দোলাতে শুরু করল। কারো কারো মাথায় জটা আছে। জটাগুলো পটাপট্ ঘাড়ে ও পিঠে পড়ছে। দোলানিটা বাড়ছে আর বাড়ছে। এদিকে ভিড়ও শিগ্‌গির উদ্দামে উঠেছে। ঘন্! ঘন্ আমার ঘন্!'

হঠাৎ আব্দুলা আমার হাত ধরে টানল। তার মুখে চাপা হাসি। 'মজাটা দেখুন!'

হাঁ, মজাই বটে। এক প্রৌঢ় প্রায় জলে ভাঁস দেবার ভঙ্গীতে মেয়েদের ভিড় ঠেলে বেরুতে চায়। তাকে কারা আটকাতে চেষ্টা করছে। ব্যাপার কী?

একটু পরেই তাঁকে ভূতের মতো চিটকে সে বেরিয়ে এল। কাপড় বেসামাল। দু হাঁটুতে হাত রেখে একই ভঙ্গীতে সেও মাথাদোলানি শুরু করল।

এ সব ব্যাপার যৌনজন্ম দেখলে একঘেয়েমির জন্যেই হয়তো, বহুদা ঘুরিয়ে গেল। আমি আব্দুলার হাত ধরে টানলুম। সে বাধা দিল না। দুজনে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেলুম।

বেরিয়েই দেখা আব্দুলা 'ভিক্টর' হাঁকতে শুরু করেছে—কিন্তু চাপা গলায়। 'ভাইজান্না...ইয়াল্লাহ্!' তার-পর দেখি, তার সঙ্গেই আমি বাঁধি। সে আমার সঙ্গে যাচ্ছে না। এবং আজ সারারাত সে যা করছে, যতো ভেড়ে ভিড়ের বাইরে অন্ধকারে নির্জনে ঘিরে দুর যাবে, তাই করার মতলব যেন।—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? একবার জবাব সে দিলই না। তখন বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম। সে আমার কথা ভুলেই যেন গেল। একই ভঙ্গীতে পা ফেলতে ফেলতে যাচ্ছে ঘরের দিকে এগোল। মেয়েরা সেরেকপাস একটা মূর্তি, হাতে একতারা। কিন্তু পরনে ঘুঙুরওলা সেই যে সন্ধ্যায় মনকাইদের বাড়িতে খুলে রেখেছিল—আর পরে নি। ঘুঙুরওলা পরনে কিনের মেয়ে, আচ্ছা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তখন আমি ক্লান্তি চেয়ে পেলুম। ঘুম-ঘুম ঝিমুনি লাগছে। কোথাও শুয়ে পড়তেই হবে। শোবার জায়গার খোঁজ করা দরকার।

আব্দুল মহাজনের গাড়ির কাছে এসে দেখি, কবিরাজপুর আর আব্দুল মহাজন নেই। গাড়োয়ানটা গাড়ি পাহারা দিচ্ছে। সে জানাল, 'ওনারা বাজনিপোড়া দেখতে গেছেন।'

জীবনে আর কখনও এমন ঘরে মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজে বেড়াইনি। অনেকটা রাতের আসরে রাতের পর রাত জেগেছি, একটুও ঘুম পায়নি। অথচ এ রাতে এত ঘুম, এত ক্লান্তি এবং মাথা গোঁজার একটুখানি জায়গার জন্যে হন্যে হয়ে ঘোরা! পা টলছে। মাথার ভিতরটা খালি লাগছে। নিজের ওপর রাগ বেড়ে যাচ্ছে। এখানে প্রত্যেকটি মানুষ একটা করে লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে। তাই কোন ক্লান্তি নেই ওদের। ঘুম নেই। প্রতিটি মুখে উজ্জ্বলতা। আর আমি লক্ষ্যহীন, মুখে বিরক্তি ও ক্লান্তির কালচে ছোপ, পায়ে শকলের টান, ঘুমোই আর ঘুমোই।

অনেক পা এগোতেই মরজিনাকে দেখতে পেলুম। মেলার দিক থেকে সে আসছে। খুব চঞ্চল মনে হচ্ছে তার আসা। এসেই আমাকে দেখে কেমন হাসল। 'কোথায় কোথায় ঘুরলেন মাস্টার? বাজনিপোড়া দেখলেন না?'

মাথা দোলালুম। এ মুহূর্তে আর কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না—শুধু একটি প্রার্থনা : শুতে চাই।

আমাকে চুপচাপ দেখে সে বলল, 'কী? শরীল খারাপ করছে?'

কোন রকমে বললুম, কোথাও শোবার জায়গা আছে?'

তার মুখে কি ধরনের ভাব দেখলুম, বলা কঠিন। সে ব্যস্ততার বলল, 'আবার ছিলিম টেনেছেন বুঝি? এক কাজ করুন। আমি চাবি দিচ্ছি। বাড়ি চলে যান। চৌকাঠের কাছে লণ্ঠন আছে। জেলে বিছানা করে নেবেন। পারবেন না যেতে?'

কের মাথা দোলালুম। এক নদী পেরিয়ে ওদের বাড়ি খুঁজে বের করার সাধ্য হতো নেই।

মরজিনা ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে বলল, 'আপনাকে ছেড়ে আসতুম। কিন্তু...কিন্তু পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে। হাজার হলেও আমি তো মেয়েমানুষ মাস্টার।'

এ যেন ছেলেমানুষি। হাসে জড়ে উঠলুম। কিন্তু মুখে বললুম, 'বলবেই তো।'

হঠাৎ লাফ উঠল সে। 'এক কাজ করুন। কলা বুড়োর আস্তানায় চলুন। খালের চরাবাড়া (শ্রেত পাড়ি) আপনার কোন কষ্ট করবে না। শুয়ে নাক ডাকাবেন। কোন চিন্তা নেই।

মুস্তাক আলি খাঁ : সেতার

পারবেন না? ভয় লাগবে?'

হাঁ, খুব ভয় জায়গায় কথাই বলেছে বটে। এটা মাথায় আসা উচিত ছিল অনেক আগেই। কারা মরজিনার বুজরুকিতে আমার ভয় পাবার কিছু নেই। খুব ভয়, ওই বাচ্চা খোনা মাস্তানকে। সেই ছেলেবেলা বিশ্রী ব্যাপারটা দেখবে এবং তার যা অবস্থা হবে, হয়তো ঘুম বরবাদ করে ফেলবে। ওকে অনুকরণ করতে করতে বললুম, কেম্ খোনা মাস্তান বাবা ভয়লাগেন করবে না তো?'

মরজিনা বলল, 'না। ওকে আমি বলে রেখে। আমাকে খুব ভালবাসে।'

এর আগে আমরা আস্তানায় গেছি পূর্বদিক ঘুরে। এখন ওদিকে বাজনি-পোড়া এবং ভরের খেলা। ভিড় জমে আছে। তাই এবার দেলুম পশ্চিম ঘুরে। ঘন ঝোপজঙ্গলের মধ্যে সরু এক ফালি পথ। বাস নেই বোকা বাঁধছিল। এর মধ্যে, এই পথ দিয়েই লোকে বরজেদের কেরামতি দেখতে যায়। দিকে জোৎস্না রাতপাখার ফাঁক দিয়ে চুইয়ে পড়ছে এখন। মোটামুটি সব দেখা যাচ্ছে। আস্তানার জন্য ঝটকের কাছে হঠাৎ থেমে মরজিনা শিহনে ঘুরলেন। তারপর পশ্চিমের দিকে মুখ তুলে ঘাড় উঁচিয়ে, আস্তানে বাবা! ইনি আমাদের নিজের লোক। আস্তানার দেখবেন। খবরদার, কাঁচি করবা! জানিও না যেন!'

কোন সাড়া এল না। বাড়ো পাকুড়টা কোথায় হনুমানের মতো ঘাড়ে আছে কে জানে' দেখবে জায়গায় বাঁধি এরেই ঘুমের টান জোরালো হয়ে উঠেছিল। ছেলেবে পৌঁছে দওয়াটা দেখতে দেখতে মরজিনা বলল, 'পিঠে লাগবে। এখনে শুতে পারবেন না। ছেলেবে লোন। কোন ভয় করবেন না। কেন কাঁচি হবে না আপনার।'

ঘরের ছেলে, অনার্স, শাস্ত্রের' নিষ্ঠুর ঝুঁকি যা পাঠান আমলের ব্যাপার। তবে প্রাচীন এখন নয়। মোটামুটি বড় ঘর। ওপরে খড়ের চাল ঝুলকালো। পিছনের দেয়ালে ওই অবস্থা। বেশী ঘেতে হাত তিনেক উচুতে মাচার মতো আছে। তার ওপর বিছানা। তারপর ঘিল ঘিল করে হাসল। মুখে সে যা বলিল, বলার ইচ্ছে! ও মাস্টার, বুড়োর তাবিজের শুতে পারবেন না। বুড়ো খোঁজও করবে। তাই বলছি, ইটে শুলে ভয় হবে। তাই না মাস্টার?'

ও খুব হাসছে। পিছনের তখন জ্বালোর ওর হাসি আর পরীর মুখে লক্ষ্য হৃদয়ম করছে। তাকাতে ভয়

করছে। আমি চিরকালের ভীতু। এবং এই ব্যাটা হচ্ছে সত্যি। সত্যি, তার কারণ কোন ভূতের বিস্তৃত ইতিহাসের এক প্রেমিক সন্ন্যাসীর দীর্ঘশ্বাস এখনও হয়তো জমে আছে এর বাতাসে। কিন্তু সেই প্রেমিক সন্ন্যাসীর সাহস কোথায় আমার মতো যে সারা শরীরে নিতে পারি মৃত্যুর স্পর্শ এবং সূর্য উঠতে-উঠতে আমিও হয়ে উঠতে পারি ঘাটের ওপর লাল লাল ফুল ফোটানো একটি মড়া বৃক্ষ?

ভূতের পেটে কোনো থেকে একটা পটুটলি ভরলো মরহিনা। বলল, সরষের বুকের জোকটোকন আছে হয়তো। থাক্। বালিশ হবে। দিন।'

টক্‌নি গড়িয়ে পড়লুম। মরহিনা বেলীর টিনটে মড়ার মাথার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুড়োকে দিয়ে ভলে দিছি, ওর আত্মাটায় মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে। ঘুমোচ্ছে। যাক্। এই তিন আটকুড়ে মিন্সেকে সামলে নেবে। আর চাবনা কিসের? ঘুমোন। সকালে আবার সময় হলে নেবে।'

হঠাৎ সব ঘুমের বাসনা শুকিয়ে গেল। শরীর কেপে উঠল। হৃৎপিণ্ডে ভের বয় চলাচল হতে থাকল। এই বুড়োটা তাহলেও কি আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে? এমনভাবে নিশ্বাস-কেতে মিলছে—কথা বলছে খোলা-খুলি, ওকে যদি...

মরহিনা তখন বাইরে। তার পায়ের শব্দটা জেবে যাচ্ছে থাকল। চকের ঘরে। টেবপর মিলিয়ে গেল। তখন লম্ফ দেলুম। হিয়! একি ভাব-ছিলুম! বলেছিলেন, চেয়ারের হলায় ফকোর'। এই সেই অন্ধকার।

কিন্তু আর ঘুম নেই। নেই-ই। কাত হলেই দেখতে পাচ্ছি বেলীর ওপর টিনটে মড়ার মাথা—যেন আমার দিকেই মুখে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। ক্রমশ একটু-একটু ভয় জমল। অস্বস্তি হতে থাকল। এমন অদ্ভুত ঘাবড়ানো কখনও শুনিনি। এবং নিজেকে কখনও এমন অসহায়ভাবে বার্থ বলে মনে হয়নি। সিগ্রেটের পর সিগ্রেট খাচ্ছি। আবার চোখে উঠে মড়ার মুণ্ডুগুলো দেখছি। ক্রমশ ওরা জীবন্ত হয়ে উঠছে। ক্রমশ ওদের নিঃশব্দ হাসি বিকটতর হচ্ছে। অসহ্য হয়ে উঠলে একলাফে গিয়ে সিগারেটটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলুম। নিতান্ত বোকার মতো—বোকারই মতো।

হ্যাঁ, বোকামিই হল। এখন অন্ধকারে বিপদটা আরও বেড়ে গেল। এতক্ষণ তো ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম। এখন অন্ধকারে ওরা কী করছে দেখতে পাচ্ছি না। এর ফলে নানা আজগুবি ধরনা গজাতে থাকল মাথায়। মনে হল, ওরা বড়যন্ত্র করছে। এমন কি ফিসফিস কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছি। তবে এতক্ষণ তেমন ঘোরাল করিনি—অদ্ভুত একটা গন্ধ—সুগন্ধই বটে, ক্রমশ বাড়ছে। ফুল ফুলো কটমাখিকা ফুল ও পুরনো ধরনা ঘরের ঐতিহাসিক সব রকম গন্ধ মিলিয়ে সেটা বেশ ভুড়ুকে ব্যাপার। তখনও মনে হচ্ছে, গন্ধটা পচে ওঠা সেনা পাউডারের। তখনও ভাজা ফুলের। গন্ধ যে সুগন্ধের গন্ধ-ময় হয়ে উঠতে পারে, এমন করে কখনও টের পাইনি। অন্ধকারে এমনিতে তাকালেই কত কী রঙের ছটা দেখা যায়। এখন ওই গন্ধটা অজস্র রঙের ছটা হয়ে শোকমাকড়ের মুখের মতো ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াল।

হঠাৎ মনে হল, গন্ধটার একটা অংশ আমার মাথার নীচে এই পটুটলি থেকেই বেরুচ্ছে। খুলে দেখলুম। পুরনো কই বা কাপড় চোপড়ের গন্ধে আমার এক রকমের হাল্কা সিনেমান ঘটে। বাপাজী জন্মান্তরের ঘরনা খুঁজিয়ে দেয়। কোন জন্মের ভাসা-ভাসা কথা, দৃশ্য, পরিচিত সব ঘটনা। আমি কি কোন-দিন এই ঘরে ছিলুম? তখন আমার কী নাম ছিল?

কিন্তু না।...টিনটে মড়ার মুণ্ডু বেলী থেকে উঠে যেন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। চিত হয়ে শুয়ে আছি। সিগ্রেটটা টেনে জলজলে করে দেখার চেষ্টা করছি সেটা সত্যি ঘটছে কি না। হঠাৎ আমার পায়ে কার হাত পড়ল। লাফ দিয়ে উঠলুম। কে রে? কোন শালা?'

অমনি খোনা মাস্তানের হিঁ' হিঁ' হিঁ' হাসি শোনা গেল এবং সে বলল, ঘুমো ঘুমো। পা টিপে দিই! অই বাঁধ্—বাঁধা আমার নস্টকস্ট করে! মরল আমার! সো না বাঁধা! সো। পা টিপি।'

এই সব বলতে বলতে সে আমার একটা পা টেনে ঘরে টেপা টিপি শুরু করল। তখন হাসতে হাসতে শুয়ে পড়লুম। পা টেপানো অভ্যাস আমার ছেলেবেলা থেকেই আছে। ঠাকমা পা না টিপলে ঘুম আসত না। আজকাল আমলকাশ দলের নাচিয়ে ছোকরা পা টিপে ঘুম পাড়ায়। সুতরাং খোনা মাস্তানের পা টেপাটা অভ্যাসবশতই।

ওর হাতে অবশ্য নোরো হওয়াই স্বাভাবিক। তা হোক। টিপুক্। আলাতত মড়া টিনটের জ্বালা যুচেছে।

একটু পরে বাচ্চা সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল। ওর নখ আছে টের পেলুম। পা ছুড়ে বললুম, 'এই! খবর্দার! সুড়সুড়ি দেবে না, বলছি!'

—অ'। বাঁধার সুড়সুড়ি লাগে! পোঁড়া কপাল বাঁধার! জানিস? কলা বুকের সুড়সুড়ি নেই। শালা মড়ার মড়া। হাঁত কেঁলিয়ে যুমোর। হ্যাঁরে, বাঁধ চোঁচাই নেই—সে যুমোর কেঁমন লাগে? আমার বল দাঁকি?

সত্যি তো। চোখের সঙ্গে ঘুমের সম্পর্ক আছে। যার চোখ নেই, সে ঘুমোয় কীভাবে? হেসে বললুম, মাস্তান বাবা, বাঙ্গী পোড়া দেখতে যাওনি?'

সে খোনা গলায় যা জবাব দিল, তা এই: বাঙ্গী দেখতে গিলে কই তাকে? সেই যে তবে মাথায় লাঠি তাকে গায়ে তুলিয়ে দিয়ে বলেছিল—বাচ্চা, বিলবাদে নজর রাখিস। ছেলেটা এলেই খবর দিবি। তার আর নামাই হল না। আটকুড়ি মিন্সেকে ছেলেটা যে এলাই না! মাস্তানের ভাবনা হয়—সে মানব শরীর ঘরে আছে। এ শরীর একদিন তাকে ছাড়তে হবে। মৃত্যুর ফেরেস্তে আজরাইল তার প্রাণটা নিয়ে সাত স্তর আসমানের পারে চলে যাবেন। গায় থেকে লাস্টা জমিনে ফিরে যাবে। তখন কে মাস্তান-পরির দাড়িটা পালন করবে?

এ সব বলার পর সে মন্তব্য করল, 'শা সাহেবের (মাস্তান পাঁর) চড্ড! 'পরীহিতের পলার দাঁড়ি!' এবং ফের সেই ছড়টা আওড়াল খোনা গলায়:

মা হি' মা!
ছোঁড়া, পরীহিত করেছে।
কই খেয়েছে ভাঁড় ফেরেছে
কাঁথায় হেগেছে।'

এবং সেই মারাত্মক ভয় জানানো হাসি—হি' হি' হি' হি' হি'!

রাত কি শেষ হয়ে এল? বাইরের দিকে জোৎস্না কেমন সাদা হয়ে যাওয়া ছিটিয়ে ঘরে ঢুকেছে এত-ক্ষণে। 'এক রাতে সব ওলট পালট ঘটে যায়।' কিন্তু কি ঘটল এতক্ষণ? আমি এখানে যেন লুকিয়ে আছি নিজের মাথা বাঁচাতে। আকবুল্লা মারমুখো হরিণের মতো বারবার নির্জনে যাচ্ছে, এদিকে বাঘিনী যেন সব সময় তাকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার বাসনাটা এতক্ষণ কি সে? হয়তো রহস্যময় ছিপে যাওয়া চলছে এতক্ষণে। আমার শুয়ে থাকার কোন মানে হয় না।

আর এই এক পাগলা মাস্তানের হাতে পা টিপিয়ে নেওয়ার কি আমার পাপ হচ্ছে? লোকটা আসলে স্নেহ-প্রবণ সরল এক মানুষ। কিন্তুর মতো। ওকে আমি কেন পা টেপাচ্ছি। ঠিক আমাকে।

ছেলে পা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু ও ছাড়বে না। তখন চেঁচামেচি করে বললুম—মাস্তান বাবা, আমি বাঙ্গী দেখতে যাব। ছাড়ো পা—ছেড়ে দাও একুনি।'

ও শুধু হাসল। শুধু বলল—'অঁরে বাঁধ্ বাঁধ্!'

নিশ্চয়ই নাবিকের ছলের স্থানীয় বাসী বন্ধুরা যেন। অগত্যা ওকে বাজে বেয়ে ফেলে দিলুম। লোকটার গায়ে কি এতটুকু জোর নেই? পরে ভিরে তখনকার মতো চেঁচিয়ে উঠল—'শালা ছেলেয়ে রে'।

এই সময় জোর দিকে একটা হট্টগোল শোনা গেল। হাসপাতাল লাগল নাকি? উঠে দাঁড়ালুম। মাস্তান এবার হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছে। খুব খারাপ লাগল। কিন্তু অনুশোচনা প্রকাশের সময় নেই। দৌড়ে বাইরে গেলুম। দেখলুম, চোর হতে বেরী নেই। জঙ্গলে পাখিরা জেগে উঠেছে। তারা চারটে উঁচু মাদার গাছগুলোর ডগায় টাঙানো লাল নীল সাদা পতাকার ভিড়ে প্রচণ্ড সাদা হয়ে গা করছে।

হট্টগোলটা মেলার দিকে নয়। নদীর দিকেই কিছু ঘটেছে। সবাই দৌড়ে যাচ্ছে সেদিকে। আমিও হন্তদন্ত এগোলুম। বাবার সময় আবুল মহা-জনের গাড়িটা আর দেখতে পেলুম না। ওরা বিলের পথে রওনা দিয়েছে তা হলে।

কোপকাড় ভেঙে সবার সঙ্গে যাঁরে গেলুম—ঢেলার পাশ দিয়ে। অনেক লোক ঘাঁরে দাঁড়িয়ে হাতেমুখে নেড়ে নীচের দিকে কী দেখাচ্ছে। গিয়ে দেখি, নীচে নদীর চড়ায় একটা ছোট-খাট ভিড়। উঁচুতে আছি, কিন্তু তখনও অনেক আবছা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা। তখন চাদ্ পাড়ের তামাদুজকেতে দাঁড়িয়ে নীচে চলে গেলুম।

নদীঘাটটা বেশ চওড়া। আসার সময় কিছু বুঝতে পারিনি। বালির চড়ার ভিড়ের ফাঁকে উঁকি মেরে দেখি, দুজন লোক—কর্কিরই বটে, পর-স্পরকে জাপটে ধরে যেন কুস্তি লড়ছে। তারা বালির ওপর গড়াগড়ি করে লড়ছে। আর মরনচাঁদ ওদের ছাড়াবার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে কনস্টেবলে কিককে বলছে—'তোদের মোছাই রে! ছাড়িয়ে দে রে! ও মাস্তান! তোদের পায়ে ধরি রে!'

যা ভেবেছি, ভাই।

আকবুল্লা আর মনসুর।

আমার ঘরে অস্ত্র বলে নেই। তা ছাড়া পৃথিবীর আদিমতম একটা ব্যাপার নিয়ে এই সংঘর্ষ। ভদ্রলোকের ভর্জন গর্জন শানানি বা অনুরোধের কোন মূল্যই নেই এখানে। তবু কু-চায়ামর চেঁচিয়ে ডাকলুম—আকবুল্লা। ছেড়ে দাও! নদীঘাটে হু হু বাতাস বইছে। আমার ডাকা ভেসে গেল কোথায়। কিন্তু আশ্চর্য, ছিড়ে গেলুম ও ফকির সবাই থামল। তারা দাঁত বের করে হাসা দেখছে। তাদের দিকে ঘুরে বললুম—কী দেখছ সব? ছাড়িয়ে দাও না!'

ভিড়ের ভিতর কেউ বলল—'দেখুন না। মজাটাই দেখুন!'

কী নিষ্ঠুর এরা! এর মধ্যে মজাটা কোথায়? আকবুল্লা এবার মনসুরের পিঠের ওপর বসেছে। মনসুর ওর একটা পা উঁচুতে অবস্থায় ধরে ঘুরে আছে—ছেড়ে দেবে যেন। আকবুল্লা দুহাতে ওর গলা টিপে ধরেছে। মাটিতে উঠে যেন চেঁচালুম—ওরে মরে যাবে যে। আকবুল্লা!'

হঠাৎ আমার মাথা ঘুরে গেল। অন্তত এই মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ

করা যেতে পারে। চেঁচিয়ে উঠলুম—'পুলিশ আসছে! পুলিশ! পুলিশ!'

ভিড় ঘুরে এদিক ওদিক খুঁজতে ব্যস্ত হল এবং তখনি আবদুল্লা এক লাফে দুজনের গলা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। ওদিকে মনসুরও পা ছেড়ে দিয়ে উঠে বসার জন্য হাতপাঁড়ি দিচ্ছে।

আবদুল্লা যেন দিশেহারা হয়ে চট পোঁজিয়ে বাঁধে উঠল। বড় হাসানের মুণ্ডু। হাতে অমনি হতে দেখল সবাই। তার একতারাটা ছেঁড়াখুরে পড়ে আছে একধারে। আলো আরও ফুটেছে তখন। মনসুর উঠে দাঁড়িয়েছে। বালি ঝাড়ছে বুক থেকে। কপালে তখনও রক্তের রাঙ্কিটুকু জমাটাই। নাকে কপায় রক্ত। কপালে রক্ত। হাঁপাচ্ছে মোষের মতো। তার পরে হাত বুলোচ্ছে মদনচাঁদ। কাঁদছে।

কিন্তু আমার মুখের কথা এমন করে ফলে যাবে, ভাবিনি। কাকতালীয় বোলই বলা যায়। উত্তরে খানিকটা দূরে নবী পারাপারের ঘাট। সেদিকে তাকিয়ে লোকগুলো চাপা গলায় উত্তেজিতভাবে বলে উঠল—'কানাই দারোগা আসছে!'

ভোরের আলো দ্রুত ফুটে উঠল। সব কিছু স্পষ্ট ফুটে উঠছিল পুবের সত্রাস—যা ছিল সারা রাত একাকার। ঘাটের দিক থেকে সাইকেল ঠেলে নিয়ে আসছিল জনা তিন পুলিশ। আরও কাছে এলে দেখা গেল একজন অফিসার, অন্য দুজন কনস্টেবল। সঙ্গে জনা দুই গ্রাম্য লোকও রয়েছে।

কানাই দারোগা দলবল দূর থেকে হেঁকে বললেন—'খুকেনো নবীতে ছড়া ছেলে এল নাকি রে? ভিড় করেছিস কেন সব?'

কেন আদুরে কণ্ঠস্বর। লোকটা লম্বা হালকা গড়নের। কাছাকাছি হলে মদনচাঁদ একগাল হাসল। চোখ তখনও ভেজা।—'আসেন, আসেন। হুজুর মা বাপ আসেন! আর বলবেন না—সব গাঁজাখোর কিসিম-কারবার বল। এটুকুনেই মাথা গরম। মারামারি বাধিয়েছিল। ছাড়িয়ে দিলুম।'

কানাই দারোগা বললেন—মদনচাঁদ যে। খেলা কেমন হল? আসার বড় ইচ্ছে ছিল। তো শালা এই খুনে এলাকা! সময় কোথায়?'

কিসিমের দল একসঙ্গে হাসতে লাগল। মদনচাঁদ বলল—'তবে চলুন হুজুর। থানে চলুন! কেস আসর বসবে। দুচারখানা গল্প শুনবেন। তবে তারা আসর, হুজুর!'

দারোগা বললেন—'ওহে মদনচাঁদ! তোমার জামাই বাবাজী কোথায়?'

মদনচাঁদ উঁচিংড়ন হয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।—'কেন হুজুর?'

দারোগা সে কথার জবাব না দিয়ে আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। —'আপনি কোথায় থাকেন? কী নাম?'

বললুম। শুনে দারোগা ফিক্ ফিক্ করে হাসলেন।—'ভালো, ভালো!'

তারপর কী একটা ঘটল। খুব কাছ থেকে শব্দ শুনে ঘুরে দেখি, মনসুর দৌড়াচ্ছিল—একজন কনস্টেবল তার বেল্ট ছুড়ে মেরেছে এবং হাঁটুর উল্টোদিকে লাগতেই সে চরে উল্টে পড়ল। কনস্টেবলটা একজনের হাতে সাইকেল গুঁজে দিয়ে দৌড়ে তাকে ধরে ফেলল। কাঁধে তুলে নিয়ে এল। মদনচাঁদের জিভ বেরিয়ে গেছে। ভিড় অবাক।

কানাই দারোগা বললেন—'থাক্ থাক্। যাঠা চুকল।' তারপর আমার উদ্দেশে বললেন—'ও মশাই! এই যে সব দেখছেন, এরা দিনে সাধু, রাতে এদের অন্য মূর্তি। দেখে শুনে চলবেন।'

মদনচাঁদ খড়খড় করে বলল—'হুজুর, জামাই কী করেছে?'

—'থানায় বেও'খন শুনবে।' বলে কানাই দারোগা সাইকেল ঘোরালেন। অন্য কনস্টেবলটিকে বললেন—'সমাচার! তোমরাও এস তা হলে। আমি একবার থানা ঘুরে যাই। এদুমেই বক্সন।'

মদনচাঁদ আমার কাছে এসে ফিস-ফিস করে বলল—'বাবা, মাস্টার বাবা! আপনি তো শিক্ষিত বোঝ। এটুকুন আমার হয়ে দারা পাকড়া করুন না দারোগাবাবুকে। বাবা, এটুকুন অনুরোধ করুন!'

আমি বিব্রত হয়ে বললুম—'এখন কিছু বলা ঠিক নয়। ঠিক আছে। উনি তো থানে যাচ্ছেন। তখন সুযোগ পেলে দেখব। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

কানাই দারোগা ঘাটের দিকে চলেছেন। পিছনে ভিড়ও চলেছে। কনস্টেবলরা আসামী নিয়ে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে উল্টো দিকে চলে গেল। মদনচাঁদ বকছে আর দারোগা-বাবুর পা ধরার চেষ্টা করছে। দারোগাবাবু হাসতে হাসতে কথা তুলছেন। তখন সে ঘুরে সরে আসছে...

মেলায় তখন সব গুটিয়ে ফেলার হোড়জোড় চলেছে। আসরের হ্যালাসটা নিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কানা বজলের ঘুম ভাঙেনি। গানের আসর কেন শুরু হবে মনে হল। একতারাগুলো আওয়াজ তুলেছে। মাঝে মাঝে ঝুমকি থেকে উঠছে। কোন ফকির ঘুম থেকেই পা বাড়িয়ে হুজুরের নাম তুলছে।

ভোরের আলোয় পরিবেশ খানটা এতক্ষণে দেখলুম। পাশের ভিত বাঁধানো কুঠে তিনেক উঁচু চত্বর কোনা একটা আয়না। সেখানে মাটির ওপর কয়েকটা ছোট বড় মাদার গাছ রয়েছে। লাল কুলে উজ্জ্বল সব গাছ। ওদার নিকানো কিছু জায়গার অন্তর মানুষের ফেলে যাচির বোঝা, মাটির বাসন সিঁড়ি, এবং অনেকগুলো পিঁপীল—কোনো নিয়ে, নিয়ে, কোনো নিয়ে যেতে। কোনো যোরাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড কুপাচিতেও যোরা ফুরিয়ে যাচ্ছে। পায়ে একটা চলন্ত পড়ে আছে।

দারোগাবাবু একজনকে সাইকেল ধরতে দিয়ে খানে ঘেলেন এবং মিনিট তিনেক জোড় হাতে মাথা নুইয়ে থাকলেন। তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে ছেট হয়ে কুর্নো নিলেন। মুখে ও মাথায় ঠেকালেন। এই সময় একজন ফকির কানা বজলের হাতে চামরটা দিয়ে এল এবং তাঁর হাত ধরে ভিড় ঠেলে দারোগাবাবুর কাছে নিয়ে এল। দারোগাবাবু মাথা ঝুঁকিয়ে আদব করে আস্তে বললেন—'আমি কানাই বাবা। ভাল আছেন? দোওয়া করুন।'

কানা বজলের হাতের চামরটা বুলিয়ে দিলেন দারোগাবাবুর মাথা থেকে বুক পর্যন্ত। ভেতরটা কি সাঁতা জন্য? তার ঠোঁট থরথরিয়ে কাঁপছে। এর পর সে দারোগাবাবুকে লক্ষ্য করে বলতিনেক কী ছুড়ে মারল। আওয়াজ হল—হুঃ! হুঃ! হুঃ!

এ সব ঘটে গেলে কানাই দারোগা থান থেকে সরে এলেন। একজনকে বললেন—'শালার দোকানটা কই?'

ভিড় ঠেলে নিয়ে চলে গেল। বুঝলুম, খবর পেয়ে গেছেন—মনসুর দোকান করেছে মেলায় এবং মালটা জব্দ করা হবে। ওদিকে গেলুম না। মনসুর যে কোথাও চুক্তিনামায় করে দোকানের টাকা তোলছে করেছে, তা তোলাই যাচ্ছে।

নিখিল ঘোষ । ঢাকা

চা খেতে ইচ্ছে করল এবার। চরের দোকান থেকে খেয়েছিলুম যেন। এখন তাড়ার মুখে সেটা আর খুঁজে পেলুম না। তখন মনে হল, নিশ্চয় ভুল খেয়েছিলুম।

মদনচাঁদ দারোগাবাবুর পেছন পেছন ঘুরে বেড়চ্ছে। এতক্ষণে ভীষণ একা লাগল। অবাঞ্ছিত মানুষ—নিতান্ত অনুগ্রহপ্রার্থীর মতো। তখন আবার দরাজিনার অবলম্বন খুঁজতে কী যে ব্যাকুলতা এল! ছটফটানি শুরু হল। কোথায় সে?

সূর্য ওঠা পর্যন্ত মেলা ও আস্তানা প্রাঙ্গণ খুঁজলুম। সে নেই। তা হলে কি বাড়ি ফিরে গেছে? ঘুরতে ঘুরতে বাঁধে গেলুম। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লুম মাটিতে। সিগ্রেট টানা ছাড়া আর কী করা যেতে পারে? এদিকে ফেরা ঘুমটা আসছে। আরও ঘোরাক্ত হয়েই আসছে।

কখন ঘুমোটুর ভাঁজে মাথা গুঁজে বসে-বসে ঘুমোচ্ছি। পিঠে রোদ লাগছে টের পেলুম। মুখ তুলে পৃথিবী দেখলুম। উজ্জ্বলে রোদে ভেসে যাচ্ছে সব কিছু। আমার পিঠের দিকে গাছপালা। খুড়ির ফাঁক দিয়ে সূর্য আলো পাঠিয়ে দিয়েছে। মাথা ঘুরছে। কেন যে ঘুমে চলে এসেছিলুম এখানে! কী পেলুম? না খোনা হল গান, না ভেবা হল ভবের জন্যতে! শুধু কষ্টই পেলুম।

খড়খড় আওয়াজ শুনে ঘুরে দেখি কোপ ভাঁজের ফাঁকে আবদুল্লা আসছে। খালি পা। আলখাল্লা কোমরে জড়ানো, দেহের মুড়ির ঘুটির কাছটা ছেড়া।

মুখটা গম্ভীর—কেন করছিস নেই। চোখদুটো জ্বলছে। লাল। কড় খাওয়া গরুর মতো চেহারা।

কিন্তু বললুম না। জলা দিকে ঘুরে ঘেলা ও আস্তানাটা দেখে নিলুম। বিলকুল ফাঁকা। তোরঙ্গাজির মতো মিলিয়ে গেছে সব। ঘাঁ ঘাঁ করছে পাতের থান। লাশিয়ানাটাও নেই। নদীর ঢালায় শেষ লক্ষটা জ্বলে যাচ্ছে সবে। খুবই অবাক লাগল। এক-রাতের খেল তা হলে কি নিছক স্বপন?

আবদুল্লা এসে পাশে বসে পড়ল। একটু হেসে বলল—'পুলিশ না এলে শালাকে জানসুদ্ধ খতম করতুম! আবশ্যেস!'

গম্ভীরমুখে বললুম—'তুমি মহা-বীর!'

—'সাহেব কি বাত করেছেন?'

সে কথার জবাব না দিয়ে বললুম—'মারামারি করছিলে কেন?'

—'আমি করিনি। চক্কর দিয়ে ঘুরে ছিলুম। ও আচানক পিছে...'

—'পিছে চলা না। তোমার সঙ্গে মরজিনা ছিল।'

—'হুঁ ছিল...' ঘুরে দেখি, মুখটা নীচের দিকে। আস্তে আস্তে হাটি মুড়ছে। একটু পরে কের বলল—'কিন্তু আমি তো তখন জানিনি! আমার কী দোষ? ঘিয়ের কারে আগুন লেগে গেলে কে রুখবে?'

আমার চোখে চোখ রেখে সে হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠে পড়ল।—'বলুন! বলবে না? বলুন!'

## ৪ নং ঃ

আমার কথার কেন জবাব না পেয়েই আবদুল্লা আরও ক্ষেপে গেল। জলা থেকে পাথরের মালাগুলো পটাপট ছিঁড়ে তরঙ্গদের ছেড়ে ফেলে দিল। তখন ওর হাতটা ধরে ফেললুম।—'আরে! করছ কী আবদুল্লা! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নির্ঘাত! মালা ছিঁড়ে ফেললে! এখন খালার কী দেবে বলো তো?'

আমি না হেসে পারছি না। ওর ওই 'বলুন' চ্যালেঞ্জের মধ্যে যে বজ্জাতদের ঘাবি আর ভলী ছিল, মালা ছিঁড়ে তুড়ে ফেলাতেও তাই। বহিন-ভেইদের বহরের ছোকরা সে। এ হাঙ্গামা স্বাভাবিক। আমার হাত থেকে নিজের হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে সে খুব নীচু করে বলল—'আজ আমি ঘর দিয়েছি মালিক! আমার সঙ্গেতুন মান ইজ্জত রসাতলে গিয়েছে।'...এবং ঠিক ঝড়ের মতো সেই থামল হঠাৎ করিয়ে উঠল—'আঃ আহা—হা—হা!'

চমকে উঠেছিলুম। পিঠে হাত রেখে বললুম—'কী নিয়ে অমন করে?'

আবদুল্লা দু হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে ভাঙা গলায় বলল—'আর কত পাপ দিয়েছেন, একটু ছেকেন না আল্লা? আবদুল্লার ঘরকন্নটা নষ্ট হয়েছে। আহা! আহা—হা—হা!'

আমি তাজ্জব। আউটল জগৎ এতদিন আমার বাইরে বাইরে ছিল। এবার যেন ভেতরে পা দিয়েছি। এই আউটল মানুষগুলোকে কিছুতেই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলাতে পারছিলুম। এরা যেন অন্য ধাতুতে গড়া। এদের মানসিকতা আলাদা। চিন্তাভাবনা আলাদা। দুটি ইচ্ছা পালনকরবের সম্পূর্ণ পৃথক। যেন গ্রহান্তরের মানুষ।

তাহলে বাঈনী ঘুরিপুলি এসির আজ রাতের শেষ ঘরে নদীর চক্কর হরিণের শরীরে নখ আর দাঁত বসিয়ে-ছিল! সবটুকু রক্ত শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ফেলেছে। আবদুল্লা ফকিরের তপস্যা ভঙ্গ করতে যা কিছু ছিল, সব নষ্ট হয়ে গেছে।

আবদুল্লা আবার ফুঁকিয়ে উঠল—'আমার সব বরবাদ হয়ে গিয়েছে সাব! আবদুল্লার জিন্দেগীটা (জীবন) জুঠা (এঁটো) হয়ে গিয়েছে। আহা! আহা—হা—হা!'

একে কী ভাবে বোঝাব ছেবে দেখলুম না যে, এটাই পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম। তাই যা কিছুই ঘটুক—কোন অন্যায় হয়নি, কিংবা এতে পাপেরও কিছু নেই। আমার জানসর্ব বন্ধুতা সে বুঝবে বলে মনে হয় না। তাই ধমক দিয়ে বললুম—'তুমি কী আবদুল্লা? তুমি পুরুষ, না হিজড়ে? পুরুষের কাজ পুরুষ করেছে। তাই বলে এখন মেয়েছেলের মতো কান্নাকাটি করতে হবে? শুনলে লোকে হাসবে না?'

আবদুল্লা জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'আপনি বুঝবেন না সো, কিন্তু বুঝবেন না।'

ছেবের সঙ্গে বললুম—'বুঝে কাজ নেই! তোমাদের ও সব আজগুবি ব্যাপার আমি বুঝতেও চাইনে। এখন যা বলছি, শোন। যা হবার হয়ে গেছে, আমার সঙ্গে ফেরৎ পড়ো। আমার দলের ভাত্তো কী হল কে জানে! চলো, আমরা সোজা রাস্তা ধরে কেল স্টেশনে যাই। তারপর...'

আবদুল্লা বাধা দিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পিছন থেকে খোনা বাধা খোনা মাস্তান 'হি' 'হি' করে হেসে উঠল।—'তোমরা কী করছিস রে এখনও? ঘর যাচ্ছিস?'

ঘিনের আলোয় তাকে দেখলুম। রোগা পাকাটি পড়ন, গায়ে ময়লার চেলকা-ফতুয়া, আবলুশ রঙা, খোঁচা-খোঁচা দাড়িও আলামাত—একটা ভূতের মূর্তি। হাতে ও পায়ে বড় বড় নখ দেখে ঘেন্না ধরছিল। কোমরে কোমরে আবদুল্লার কমার মতো একখানি কলাপাতাছিত সেলাই আছে। হাতে এই মূর্তিটা একলম্বর মতো দেখতে দেখে নির্ঘাত ভিমি খেতুম। সব ছেড়ে খারাপ লাগল, ও আমার পা টিপে এই মেয়েদের হাতদুটো দিয়ে। পা ঝিন ঝিন করে উঠল। একটুনি স্নান না করে ফেললে চলবে না।

আবদুল্লা ওর দিকে নজর দিল না। আমি ছেড়ে দেলুম—'তুমি আবার দেখনে যুদ্ধে কেন? তফাৎ যাও!'

মাস্তান জল দেখে দুপা পিছিয়ে গেল। তারপর ঠোঁট উল্টে অভিমান দেখিয়ে বলল—'ওরে আমার চাঁদু! মেহমানি করবি বলে ডাকতে এলুম, তো বলে কিনা—যা! ভাগ! যমের ভলী নকল করে সে কের হেসে উঠল ফুসফুসে খলায়।

চক্ষু তুলে বললুম—'ভাগ্! মেহ-মানি করবি? কী খাওয়াবি, শুনি?'

হঠাৎ খুব সিরিয়াস হয়ে গেল মাস্তান। গম্ভীর মুখে খানের দিকে হাত নেড়ে যা বলল, তা হল এই। খানের অবেপাশে কিস্তর মানুষে ঘুরপি-ঘোরান চরে বেড়ায়। রাতি মৈতেন শেষ রোববার লোকেরা অনেক মোরগ-মুরগি খানত ছেনে খনে ছেড়ে দেয়। সেগুলো এখনেই চরে ফিরে খায়। রাতে গাছপালায় আশ্রয় নেয়। মানুষে ভাঁব তো কেউ করে খায় না। তাই জন্তুল খুব্বলে অনেক মিলবে। খুনো হয়েছে বটে, তাড়িয়ে ধরাটা তেমন কঠিন কাজ নয়। অতএব আমরা যদি অন্তত একটা ধরতে পারি, ফেরে তাজা হয়ে যায়। মহাবেন বকবেন! বহুদেনকে পাঁচসিকে সেলামী দিতে পারব না?

মাস্তান কিসফিস করে আরও জানাল: এমনি করে বহুবেন সোন্দনে অনেকের কছে সেলামী নিয়ে ঘুরপি ধরার হুকুম দিয়েছে। তারা কে? ইন্দুর ছেলে ছোকরা চাংক্রাম—আবার কে? তারা এখ খায় যে। মরের চাট সন্তায় পেতে হলে খানের জঙ্গলে চলে এস। তারা তো কিছু মনে না পাঁয় যা করির। অলি-আউলিয়ার হুজুরকিতেও বিশ্বাস নেই।

যদি বহুবেনকে সেলামী না দিয়ে ধরে? ধরুক না। তক্ষুনি বহুবেন খবর দেবে ইন্দুর ছোকরা-আতকদের। কিছু হবে ঘুরপি ছোকরের। ইন্দুর ছোকরারা খুব কিম্বতী মানুষ। তবে বহুবেন তো জলা মানুষ—অনেক সময় ঘুরপি কেউ বছরেও টের পান না। পরে খুব এই মাস্তান যাবা। অবশ্য, সারা জঙ্গলে গাছপালার হনুকমের মতো ঘুরে বেড়ায় সে। বছরের জলে অবশ্য সাবজজন করে। তার চোখ এড়াবে সাধ্য কার?

এই ঘুরপি ছেলে পাপ লাগবে না তো? না, না—মোটেও না। বহুবেনের হুকুম নিয়ে খেলে কিছু হবে না। কিন্তু না জানিয়ে খেলে মুখে রক্ত উঠবে। কত জনের উঠেছে। বলাই ছেবের ছেলে সেবার তাড়ির সঙ্গে মানুষে ঘুরপির মাংস আঁচিয়ে তাড়িয়ে খাচ্ছিল। গলায় আটকে যায় (শ্বাস) আটকায়। আগে দেখে আর ফিরে, তার কবরের ওপর স্যাওড়াগাছ গজিয়েছে। সেই গাছের তলে বসে একটা কাক ডাকছে সব সময়—কা কা কা! খা খা খা! কাকটা ঠাট্টা করে, বুঝতে পারনি তো!

সব বুঝলুম। বললুম—'কিন্তু মাসে কাটাকুটি রফাবফা কী ভাবে হবে? আর, সঙ্গে ভাতও তো চাই।'

মাস্তান হতের ইসারায় একটা মাটির পাত্রের আয়তন দেখিয়ে জানাল—বহুবেনের ঘরে চাল আছে। হাঁড়ি আছে। চলতা পাতি মাস্তানকে পয়সা দিলেই এনে দেবে। ছেলের শিশিরও অভাব নেই। শুধু আরও পাঁচসিকে পয়সা দিতে হবে বহুবেনকে।

আর হাঁড়িতে কিছু বেশি চাল যেন দেওয়া হয়। এ বেলা বহুবেন তা হলে কষ্ট করে রাঁধবেন না। কানা মানুষ। রাঁধতে কষ্ট হয়। এদিকে উনোনে লকড়ি ঠেলতে ঠেলতে মাস্তানের পুরুষের অবস্থাটা একবার ভাব্ ছেলেরা!...সে পুরুষের ভাব্ চিত করল। তারপর হিঁহি করে ছেলে কের বলল—'যারে! আমি অত কষ্ট করব। তোরা পুরুষো না দিয়ে কি খেতে পারিস?'

আবদুল্লা এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল। বললুম—'শুনলে তো? চলো, আজ আস্তানায় বন্দোবস্ত করা যাক্। খালি পেটে পথ চলতে কষ্ট হবে।'

আবদুল্লা অন্যমনস্কভাবে বলল—'আপনি চলুন। আমি নদীতে একটা ডুব দিয়ে আসি।'

—'নদীতে তো পানিই নেই দেখছি।'

আবদুল্লা বঙ্কিমের বাঁক দেখিয়ে বলল—'ওখানে একটা দহ আছে।'

গত রাতে তাহলে ও সবখানে চষে বেড়িয়েছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছিল কি? অথচ নদীটা যেন বিশাল বাধা হয়ে ওকে আটকে ছিল। হয়তো নদীর চক্কর মেরে ওপারে পালাবার মতলব করছিল বাঈনী ঘিরে ফাঁসিয়ে পড়ে।

—'আমিও যাইব। চলো।' বলে মাস্তানকে বললুম—'আমরা আসছি। বহুবেনকে নিয়ে বসে থেকো কিন্তু।'

মাস্তান হুহাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা পা বাড়ালুম। বাঁক ঘুরে কিছুটা গিয়ে পিছু ফিরে দেখি, তখনও মাস্তান একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে মনে হল, কাল রাতে আমাদের গাঁতবিধি ওকে কৌতূহলী করে তুলেছে। সে তো আসলে একজন মানুষ।

কিন্তু তারপরই ওর জন্য বড় মায়া হল। একটু অনুতাপও জাগল। ওকে খুন করিনি কথাটা অন্যায় হয়েছে। ওর জন্যে পিস্তুর সামান্য আর বহুবেনের মানবতাও কি কম? কেমন পা টিপে টিপে বিছিল অত রাতে! আর, এখন হঠাৎ এসে কাওয়ার কথাটাও বলল।...কল কেমন করে উঠল। বাঈনের খোলস দেখে কতটুকু চেনা যায়? বাঈনে ও পালনাটে অবস্থানে এক নোংরা মানুষ —অথচ ভেতরে কী অনোরাদলে মানুষটি! ভাল ভাল কথা বলছে! মনে মনে বললুম—ক্ষমা কর।

ঘরে ঘরে এসে মুখ খুলল আবদুল্লা। বাঁশের কোলার হাত ধরে

বলল—বারোটা বাজে। জামাও আছে একটা। তবে হাফশার্ট। কমিজটা বেমানান (পোশাক) নয়। মানে মানে পার।'

ভোলাটা কি ভাবে এত তাড়াতাড়ি পর বাঙলা বোঝা গেল না।

কানা বছরেককে আড়াইটে টাকা গুনে দিতেই হাত বাড়িয়ে নিল এবং টিপে টিপে পরখ করল, ওকে ঠকানো কি না। তারপর বলল—'আদ্দিনটা মেকি নয় তো বাবা? জন্মকে দিবে ধন্মো ওরতে নেই।'

ওকে আশ্বস্ত করার পর খোনা মাস্তানকে নিয়ে মুরলি বলতে বেরিয়ে পড়লুম। আবদুল্লা এখন জনা বারুদ। পাঁচের মোহন ছেলে। হাতে একটা ভাল রিভেছে। বলে তিনটে মুরলি আর একটা প্রকাণ্ড লেদারন মোহন মুকুলো পাতা উল্টে লোকা যাচ্ছিল। মোহনটা দেখে চেঁচিয়ে উঠলুম—এইটে! মাস্তান হি' হি' করে হাসতে লাগল। আবদুল্লা ভালটা হুকুল ঠাহর লাকা করে। লাগল না। আচমকা কলের স্তব্ধতা ও প্রশান্তি খান খান হয়ে গেল বিকট কর্ণ কৌ চেচামেচিতে। মুরলি তিনটে বর্ণাৎ পাখির ছানা বিষি উড়ে গল জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। লেদারন উঠে গেছে মাথার ওপরের ডালায়। সেখান থেকে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে আর আপকালীন আওয়াজ দিচ্ছে—কক্ কক্ কক্ কক্ কক্! আবদুল্লা দ্বিতীয় বার ভালটা হুকুলে, সে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। কেন বোঝা যাচ্ছিল, ওর বুনো হয়ে গেছে।

খোনা মাস্তান পরামর্শ দিল—অতকাল যে সব মুরলি মানুষ দিয়ে গেছে, সেগুলো এখনও বুনো হয়ে যায়নি। বছগুলো হাত বাঁধা জীব তারা। কিন্তু কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে সারা জঙ্গল তোলপাড় করছি। পাত্তা নেই। একখানে অনেক ডানা পাখনা দেখা গেল। খোয়ালের কীর্তি নিশ্চয়। মাস্তান এই জঙ্গলের ভাল চাকর এবং হিতৈষক। সে জানাল—খোয়ালের খুব উপদ্রব আজ এখানে। খাদ্য স্বাভাবিক। তা ছাড়া অনেক মানুষে মুরলি খান খেয়ে পালিয়ে বনটির ওপরের দায়। অনেকদিন জীব ওরের দেখিনে ওরেই। এদিকে আজকালকার মানুষ বড় লোভী। কৃপণ এবং স্বার্থপর। মুরলি কিনে নেলে বলবে—পাঁর ইচ্ছা করে ফেরত পাঠিয়েছেন। তাহলে আর নেলে কোন পাপ নেই।

খোনা ভুলটার এতক্ষণে নাকি সব শুনে শুনে ভেতো হয়ে গেছে। সব কথা বোঝাও যায় না। আবদুল্লা তার পাখনা তুলে ভেড়ে গেল—খারাপ বলা?' মাস্তান অভিমানে চুপ করে গেল।

এই কলকুলিয়ে নিজেদের বেখাপ্পিল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের হিনাট আদিম প্রাণী। শিকারে বেরিয়েছি। আর এই মাস্তানটা আমাদের ঠিক ওপরে—এর আধিভৌতিক বিশ্বাস ঘেরে শিকার মিলবেই মিলবে। আবদুল্লাকে তো ভীষণ খুশি খুশি মনে হচ্ছিল। গলার হাঁক, হাতের বালা, লুঙ্গিটা মালকোচা করে পরা, গাল না। কাঁচা মাকড় চুল আর হলদে সোয়েটারে ওর আদিম সৌন্দর্য খুলে গিয়েছিল তখন।

কিন্তু আর কাঁহাতক ঘোরা যায়? হলে হয়ে জঙ্গলের পূর্বদিকে উঁচু-মহলের বিলাকল খুরে ফের যখন বাসে এলুম, তখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ঘরে স্নানের মুখে নষ্ট হয়েছে। আবদুল্লা চোখ পাকিয়ে বলল—চলুন, চানা ফেরত নিই। এই খোনা পাজা বাস্তা দিয়েছে! আছে খোস্ত-ভাত নেই।'

ওর কথা শেষ হতে না হতে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। খোনা মাস্তান মাথা নীচু করে কড়ে ভাত হয়ে থাকা একটা হিজল গাছের তলা দিয়ে এগোচ্ছিল। আচমকা মাথার ওপর তাকে হাত বাড়াতে দেখলুম। তারপর বিকট কৌ কৌ কৌ চেচামেচি এবং ওর হাতে একটা আর্মার সাইজের মুরলির ঠোঁট দেখা গেল। আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম। আবদুল্লা ঘোড়া দিয়ে মুরলিটা কেড়ে নিল। ওরা আনন্দে তিনজন খানের দিকে ঘোড়লুম। সবার আগে মাস্তান। সে হাত তুলে নাচতে নাচতে যাচ্ছে।

মাস্তানার ভাঙা কুটিরে ঢুকেই আবদুল্লা ঘরকে দাঁড়াল। আমিও। কানা বছরেকের কয়েক ঘনে আগে মর্জিনা বিবি। সঙ্গ নেয়েছে। ছিপে চুল পিঠের ওপরে ছেলে আছে। পরনে কিকে হলুদ ঘোরাকাটা হাতের সাড়ি—একেবারে নতুন। চৌখকে লাল চাউক পরেছে। কপালে একটিপ্রে কাচ সোনার টিপ। নাকে নাকছাবি। আমাদের দিকে মুখ করে বলল—রোয়ানী করতে এলুম, মাস্তার!'

আচমকা দেখি, আবদুল্লার মুখটা গম্ভীর। সে মুরলিটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বাওয়ার ঠোঁল এবং তার ঝোলা থেকে একটা ছুরি বের করল। দেখে আঁতকে উঠলুম। সর্বনাশ! এ যে রীতিমতো ভয়ার! সাত আট ইঞ্চি লম্বা চকচক করছে। মাঝটা সাদা এবং নরমা-কাটা। এ সব ছোরা খাদে ভরা থাকে। ঝোলার মতো নিচের খাপ থাকে।

সে মাস্তানকে ডাকল—আয় রে! জবাই করি। ভাল করে করবি। হাত ফসকে পালালে তেহেন্নামে জবাই করব।'

মাস্তান আড় নেড়ে হি' হি' করতে করতে এগিয়ে এল। মুরলিটা সে যে ভাবে ধরল, বোঝা গেল এ ভাজে সে অভ্যস্ত। মাস্তানার বাইরে চলে গেল দুজনে ঘরটার বাইরে থেকে আবদুল্লা হাঁক দিয়ে আমাকে ডাকল—এক ঘটা পানি আনুন স্যার!

উঃ, ভয়ঙ্কর জংলী। সব বোঝার জন্যে তো বটেই—জাঁত চালানো হিসেবে জবাই করা মুরলির ঘাড়ে জল ছিটোতে হবে। মর্জিনা উঠে গিয়ে বছরেকের এনামেলের ঘটনাটা এনে দিল। জল ছিল তাতে। মর্জিনার ঠোঁটে চাপা হাসিটুকু আমার চোখ এড়াল না। পাঁচিতের নেশার আউসের ঘোরে যেন নিজের আবাকে বরণী করছে!

মুরলি কটা দেখতে আমার কষ্ট হয়। মুখে ফিঙ্গির ঘরনাটা রেখে চলে আসছি, আবদুল্লা ফের ডাকল।—কথা আছে স্যার, যাবেন না।'

মাস্তান কাটা মুরলিটা নিয়ে একটা গাছের তলায় হাত পা ছড়িয়ে বসল। ডানা ঝাড়তে ব্যস্ত হল। ওর মোরো হাতের কথা ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু আবদুল্লা আমার হাতে ছুরি তুলে দেবে। ওর হাতে ঘোরা ছুরি। সে চাপা গলায় বলল—আবার এসেছে!'

হাসলুম।—হুঁ, এসেছে তো!'

—কী করব বলুন তো স্যার?'

—কী করবে?'

আবদুল্লা ছুরির ধারটা আঙুলে পরখ করতে করতে বলল—আপনি না থাকলে এই জঙ্গলে পালাকে জবাই করে পুতে দিতুম!'

—পারতে?'

—আমি সব পারি।'

—কিন্তু ও তোমার চেয়ে পড়বে। প্রেম কে পায় আবদুল্লা?'

—আমি শ্বাসেলের শেষ চেষ্টা চাইনে। আমি একজনকেই চাই। নিরাকার সই নিরঞ্জন।'

—বেশ তো। সোজা বলে দিও।'

মিটিমিটি হাসছিলুম। আবদুল্লা আমার চোখে চোখ রেখে বলল—'আজ্ঞা মাস্টার। নারী আর পুরুষে সহবাস করলে বাচ্চা হয়। হয় তো?'

—হয় নিশ্চয়। তা না হলে তুমি আমি—এ সব মানুষ কি ভাবে এল দুনিয়ায়?'

—যদি ধরুন টাচ্চা এসে গেল, কী হবে?'

ওর কাঁধে হাত রেখে বললুম, 'তুমি এখনও বড় ছেলেমানুষ আবদুল্লা। ওকে ঘিরে ঘরে ফেললেই সব চুকে বুকে। অবশ্য, ওর স্বামী চাই। কিন্তু ও তো স্বামীকে ভালবাসে না।'

আবদুল্লা বুদ্ধিমান হয়ে বলল—'যদি স্বামী ওরে তালাক না দেয়?'

সমস্যা। মুসলিম শরীয়তে স্ত্রীর তালাক দেবার অধিকার নেই। স্বামীর আছে। বললুম—তেমন ঘেরে যদি স্বামীকে না চায়, একদিন না একদিন তালাক পাবেই।'

আবদুল্লা গম্ভীর হয়ে বলল—'কদ্দিন? কদ্দিন পথ তাকিয়ে থাকব, বলুন তো? সে আমার দেখাবে না। আপনাকে আগে বলেছি মাস্টার, আমার

মুরলির রাগ : রবীন্দ্রসংগীত

এইটুকুন ফুলফুলে জলো বাতাসে সেটার বাচ্চা জন্মে কষ্ট পাবে—আসল বাবাকে খুঁজে পাবে না—এটা ঠিক না। আমি ওকে জন্মাই করে, পালাব।'

সিটের উপরে ওর কথার ভঙ্গী খুবই নিরিয়াস। ওকে ঠাট্টা এ সব ব্যাপারে ঠাট্টা করে দেওয়া যায় না। সাঁতা ও খুন করতে পারে। কঠোর স্বরে বলল্লুম—'আবদুল্লা! তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। মর্জিনার যদি একটুকু কাঁচ হয়, তুমি বাঁচবে না। আমার সব পরিচয় তুমি পাওনি। জেনে, আলকাতরার দলে বাইশজন হয়ে ঘুরে বেড়াই—এ আবার কে? তুমি হুঁশিয়ার!'

আবদুল্লা বড় বড় নিশ্বাস ফেলছিল। আমার কড়া হুঁশিয়ারি শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর খুকনো হাসল। হাসতে হাসতে মাথাটা নোয়াল। তারপর বলল—'আপনি বুঝবেন না সো, বুঝবেন না! এই আবদুল্লা কী ছিল, কী হয়ে গেল!'

—'আমার পা ছুঁয়ে বলো, মর্জিনার কোন কাঁচ করবে না।'

সে আমার চোখে চোখ রাখল। আশ্চর্য, ওর মুখে এক মায়াকরুণি ছেলেমানুষের আসল দেখতে পাচ্ছি! চাপা হাসছে সে। নিছক খুশীমির ভাব পড়েছে হাসিতে।

—'না ছুঁয়ে বলো, আবদুল্লা!'

—'কসম খো, কসম। তাই কসম!' বলে সে আমার হাতে হাত রাখল।

এ সময় কটকে মর্জিনাকে দেখা গেল হৈচৈ আসতে।—'ও মাস্তান বাবা! মরেছে রে, মরেছে! ও কি করে উদলাদ্‌না তুলছ তুমি? সব হাল উপ্‌ড়ে গেল যে। ছি ছি ছি! দাও, আমাকে দাও! ছেলে ছোঁড়া না—তাকে দিয়েছ খুরপি ছাড়তে! লোকসানের এটুকুন খুশি নেই!'

সে আমাদের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে মাস্তানের হাত থেকে খুরপিটা কেড়ে নিল।...

খরচের ঘরে ঘিউ মোড়ারও অভাব নেই। ইপ্তা থেকে মাস্তান মশলাপাটি আনল। প্রকাণ্ড কাঠ-মাল্লিকার তলায় ইটের উনুন করা হল। কারণ, এ তো বনভোজন। আবদুল্লা আর মর্জিনার মধ্যে টুকরো কথাবার্তাও চলতে থাকল এবং ওদের সংলাপের দিকে কান পেতে বসে থাকলেও রোমান্টিক কিছু নয়। নেহাৎ কেজো কথার আলাপ। যেমন—'আইসের ছেলে, পেয়াজ কাটো তো! ...ঘর মনে দিচ্ছ কেন?...হুঁ। ছিলিম টেনে টেনে জিভ কখনে হয়ে গেছে বুঝি? সইবে না?'...একটু হাসি। তারপর শ্বাশুড়ী নদীর মাছের কথা। নদীর জ্যান্ত পাবদাটার কথা—যা অনেক মানুষ খেয়েছে। তাদিকে আবদুল্লার এক ঘায়েরকে অভিজ্ঞতা। একবার কলকাতা যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। হাওড়া স্টেশনে নেমেই তাবা-চাকা খেয়ে পালিয়ে আসছে। এক স্টেশনে শেলে, এ বাড়ি যাবে মেদিনীপুর। কী বিপদ তখন!... বিপদ কিসের? বদলে গাড়ি যায়, খেলে কাঁচকী কী! দুনিয়াটার ওড় কোথায়, দেখতে ইচ্ছে করে না? মর্জিনার তো করে। ইচ্ছে করে, রেলগাড়ি চেপে চলে যায়—চলেই যায় —দূর চলেই যায় — কতদূর—কতদূর! ওরের জন্যে একটুও মন খারাপ করবে না।...বোকামিরের মতো ঠেক নিলেই হয় তাহলে।...ইচ্ছে করে কি? কিন্তু হেমন বোল্টমটি আছি?...

এই মাল্লাদিরে কিঞ্চিৎ রোমান্টি-কতার আঁচ ছিল। আবদুল্লার জবাব শুনতে ওঁৎ পেতে আছি—কাজী হলিয়াদ চুপ করে গেছে তো গেছেই।

কিন্তু একটা ব্যাপার এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। গত রাতে খুজনের জন্যে যা ঘটেছে, তা খুবই আকস্মিক এবং বিনা ভূমিকায়। হঠাৎ আদিমতম প্রবৃত্তির বিস্ফোরণ ঘটেছিল—চন্দ্রাহতির অবকাশ দেয়নি। তাহলে বলা যায়, হঠকারী পরীরের সিঁড়ি বেয়ে প্রেমের পাহাড়ে চড়ার বাপারটা ওরা পেরিয়ে গেছে। প্রেমের সিঁড়ি বেয়ে পরীরের দরজায় ওরা পৌঁছবার সুযোগ পেল না!...

রান্না শেষ হতে সূর্য একটু ঢলে গেল। চারজন খুব্রে খাওয়া হয়েছি। সামনে চারটে এনামেলের থালা—আস্তানার সম্পত্তি। সেই সময় মহলদার সাঁই মওলা' হাঁকতে হাঁকতে দুই আলখেল্লাধারী তরিক হাজির। খুজনের একজন মহলদার। সে গম্ভীরমুখে ঢুকেছিল। দাওয়ায় বসে এসে খাঁচা রব্ (হে খোদা!) বিকট হাঁক ছেড়ে নাচ জুড়ে দিল। তার সঙ্গীও যুক্তো। লোভাতে চোখে খাবারের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মর্জিনা ওদের দিকে বলল—'একটু অপিক্ষা করতে হবে। মেহমানরা খাক্ আগে।'

মহলদার বলল—'আমরা কি মেহমান নই রে জননী?'

কালা পরবেশ বললেন—'তাতে কথা পড়লে, বোঁচি মর্জিনা, কুচিতে চাল আছে—কেজি দুটি চড়াও। তরকারিক কিসের? ভাই সাহেবরা, বলুন। তরকারি ছিটিয়ে নিন।'

মর্জিনার পাকা গিন্নির চালচলন। মাছে মাছে মা হয়ের চেহারার নায়কের জন্যটা অবে নিয়েছে। ঠোঁট কামড়ে হাতার ডাত তুলে বলছে—'আরো চাট্টি দিই?' পত সন্ধ্যার পরিবেশনের সময় ওর এই চেহারার অনেকটাই ঢাকা ছিল।...

কেজ রান্না চড়ল। এবার আবদুল্লা কলসী নিয়ে নদী থেকে জল এনে দিল। ওই জলই আমরা খেয়েছি। এ সময় হঠাৎ মহলদার ডাকল—'বেটি মর্জিনা! কাপালীর থানা থেকে আসছি। তোর খোস্ত জনও আমার সঙ্গে ছিলেন। খুব সাবধানি করলুম, জামাইয়ের অফিস ছিল না। পরশু বাজী দিনদুপুরে মোতিহারির দোকানে সিধ সিরেছিল। হাজি মেহে জোহরের (দুপুরে) নামাজ পড়বে। সোনামের গলিতে গিয়ে জানলা ভেঙেছে। হাত বাক্সে তের টাকা কজানা ছিল। তাই নিয়ে কেটে পড়েছে। এদিকে ফেরেবার সময় কুলদুমের মা গলিতে সোনার চাপড়ি হাড়াতে দেখে। ঘিরে পালা চক্করের হুমোহুমি।...'

মর্জিনা উনোনে লকড়ি ঠেলতে থাকল। কোন মন্তব্য করল না।

মহলদার একটু ইতস্তত করে কাশল। শেষে ফের বলল—'তবে একটা খারাপ খবরও আছে, বেটি। কান করে শোন্।'

মর্জিনা একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

—'বস যেখানে, সোদা সেখানে। ফলের সামনে ঘুলে থকতে যোর সেঁধ না বেটি।'...ঘুলে কাঁচ করে নাক ঝাড়ল বুড়ো। চোখও মুছল। মেয়ে বলল—তোর কপাল মন্দ রে! সব ভরে কালসাপ ঘরে এনেছিলুম, চিনতে পারিনি। খুব জলা দিয়ে পুষে এবার ডসে দিলে।'...সে কেঁদে উঠল।

আবদুল্লা আগুন জ্বেলে ছিলিম তৈরি করছে। বুড়ো নীচু। অনা পরবেশ জলচৌকিতে বসে মালা জপছেন। মাস্তান গাছতলায় মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে ঠ্যাঙ নাচাচ্ছে। আমি বললুম—'কী ব্যাপার?'

মহলদার ভাঙা গলায় বলল—'আমার যারাওয়ায় সবার সামনে শালার ব্যাটা শালা ঢোঁড়িয়ে বলে দিলে—'তোমার বেটিকে তালাক্ তালাক্ তালাক্—তিন তালাক্।'

মর্জিনা কের একবার তাকিয়ে মুখ ঘোরাল।

কান্না সামলে নিয়ে মহলদার বলল —'তাবিস নে মা! একমাস বর্ষাদিন বাদে (সতীন পালনের বিধি) আবার তোর নিকে দোব। এবার আর ভুল হবে না। সোনার চাঁদ জামাই কেউ যদি এনে তাজা করে চাঁদের আলো ছিটোবে।' তার সঙ্গী বলল—'হ্যাঁ। আমার হাতে তেমন ছেলে আছে...'

ওরা যখন কথা বলছিল, একটা কথা আমার মাথায় ঘুরছিল ক্রমাগত। মনসুরের সঙ্গে আবদুল্লার মারা-মারির কারণ কি মহলদার বুঝতে পারেনি? না বোঝার মতো বোকা তো সে নয়! জামাইটি তার স্নেহভাজন ছিল সত্য। জামাইকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচাতে সে প্রাণ কুবুলিল। এমন কি থানা অফিস নিয়ে সাহায্যও করেছে জামিনের জন্যে।

এখন ফিরে এসে সে মেয়েকে দেখছে আবদুল্লাকে ভাত বেড়ে দিচ্ছে কানা পরবেশের আস্তানায়। অথচ কোন ভাবান্তর দেখতে পাচ্ছি না তার। এর মানে কী?

শেষ অফিস কথাটা ছেড়ে দিলুম। মনে মনে মেনে নিলুম যে এই সব তরিক বাউলের রীতিনীতি বা মনস্তত্ত্ব বোঝার সাধ্য আমার নেই। আবদুল্লার কন্ড দেখে তো চোখ পেরেই গেছি, এরা যেন গ্রহান্তরের মানুষ। বুদ্ধির যে সমাজের মানুষ আমি, তার বাইরে এক আলাদা গন্ডীর মধ্যে এরা থাকে। এদের নিজস্ব বাসনাকল্পনা চিন্তাভাবনা আছে —তার সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই। থাকতেও পারে না।

তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি ধরাবর। দু চারজন তরিক বাউল ভিরের এক জায়গায় এসে পড়লেই গাঁজার ঘুম পড়ে যায়। তারপর গমনের আসর তো বসেই।

দুই বুড়ো তরিক হাত পা ছড়িয়ে বসে প্রচন্ড হুকোই খেল। তারপর মর্জিনাকে খাবার হুকুম দিল। তখন বিকেল তার চাহটে। তারও কাছে ঘড়ি নেই অবশ্য। অবশ্য এরা ঘড়ির ধার ধারে না। ঘাঁটও মানুষের কাছে সময় জিগোস করে। আমিও ঘড়ি খুলতে বসেছি। খুব অজ্ঞানে চোখ পড়ে কখন কটা বাজল।

মর্জিনা লক্ষ্মীমেয়ে। তাই ঘরে ঢুকে সবার চোখের আড়ালে গেল। তারপর খেজুরপাতার একটা তালাই বিছে দেল। আমরা সবাই কাঠমল্লিকার তলায় জাঁকিয়ে বসলুম। বসার পর মহলদার এতক্ষণে আবদুল্লাকে প্রথম যে কথাটি বলল, তা হল। 'মাণিক! কই তোমার সেই ঝা-পালা গাছের মাল? বাবাকে একবার শুকিয়েই তোমার ঘরে ফেরব ছেলে? (জিভ কেটে) আ ছি ছি! এমন করে নেই। গোনা (পাপ) হয়!'

আবদুল্লা ফলজ হেসে বিনীত-ভঙ্গীতে বলল—'সাঁজি হুজুর!'

হঠাৎ চমকে ওঠা স্বরে মহলদার বলল, 'অই বাপ্! তোর মালা কই? ও মাণিক! তোর গায়ে হাফশার্টের সেবাস! (পোষাক) এ কি কথা! আ ছিছিছি!'

আবদুল্লা কোন জবাব দিতে পারছে না। মুখ নীচু করে হাতের ছেটোয় অনা একটা ছেটে খুরি দিয়ে পাঁজা কুঁচোচ্ছে। মহলদার আমার দিকে ঘুরে দুঃখিত মুখে প্রশ্ন করল—'হুজুর কোন সম্বাদ রাখেন?'

জলভা হলে বিলুম — তোমার জামাইয়ের সঙ্গে মারামারির সময় ছিড়ে গেছে।

কথাটা বলে ফেলে ভুল করলুম। মহলদার বলল—'হুজুর মাস্টারজী! এখানে যারা, তারা সবাই আমার আপন। একটা কথা খালি আমি তখন থেকে ভাবছি। জামাই শালার সঙ্গে আমার কোন কালে কোন কারণে? নাকি আসে থেকে কোথাও কোন রকম বিসম্বাদ ছিল—এখন সবনা সামনি দেখে জাস্তা জাপটি বেধে গেল? আমি তো কিছু খুঁজে পাই না বাপ!'

আবদুল্লা একবার তাকিয়ে মুখ নামাল। নারকোল ছোবড়াটা মন-

চোখের সন্ধানী দিকে এগিয়ে দিল। মদনচাঁদ ফের বলল—'কেউ আবদুল্লা!'

তারপর মুহূর্তে স্তব্ধতা। কাঠ-মল্লিকের ফুল পড়ছে। আস্তানার উঠোন ভরা মিষ্টি গন্ধ। মানুষের দুর্বলতার একটা গান এখন খানিকটা দূরে এ'টোদুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দুরন্ত ঘুরে দুরন্তির হাতে ঠোঁটের ঠোকর চালিয়ে যাওয়া কোথাও বেখিনি। এখানে দেখলুম। অনেক রকম পাখি আছে এখানে। 'বউ কথা কও' ডাকছে কোথাও। একদল সাত-ভেয়ে বনের মাঝার তলায় তলায় নেচে নেচে ছাতা করছে। টকটকে লাল ওই সব মাদার ফুলের গায়ে নবীন পাতা থেকে সবে মুঠো মুঠো রোদ ছড়াচ্ছে। এই সব প্রকৃতিক প্রসাধনকে মানুষের আবেগ খুব নাড়া দিচ্ছে মনে হল। মদনচাঁদ মুখ নামিয়ে আবদুল্লার মুখের দিকে ঝুঁকে ফের বলল—'সময় ফুরিয়ে না কেউ। বল্।'

অন্ধকারে দেখলুম মরজিনা হাত দশেক তফাতে একটা হাতিম তলায় দাঁড়িয়ে হাঁটু খুটছে—মুখ অন্যদিকে ফেরানো। মদনচাঁদ আবার আবদুল্লাকে ডাকতেই আবদুল্লা মুখ তুলল। তারপর নিস্পলক চোখে বলল—'সাহু! তুমি বড় নাচা।'

অমনি বুড়ো ফকির ছিটকে সরে গিয়ে এত জোরে হেসে উঠল যে কানে তালা ধরে যায়। হাসতে হাসতে সে এপাশে ওপাশে লুটতে শুরু করল। তারপর চেঁচিয়ে বলতে থাকল—'ওরে, এ কি কথা শোনালি রে! ও সাহিজী! আমার কি হবে—হায়, হায় আমার কি হবে! তোরা সবাই যাব, যাব—আমার বেটির মুখের পানে চেয়ে যাব—আর যাব আমার বেটার মুখখানা। তোমাদের এনে কী হয়, বলো। বলো, সবাই বলো। চাঁদে কলঙ্ক আছে, এ মুই মুখে নাই। আমি তো দেখি না বাবাসকল। আমি কিছু দেখি না।'

মরজিনা গর্জে উঠল—'বাপজান!'

—'এই যা। আমি মানুষ চিনি রে, চিনি। দেশে দেশে মানুষ দেখে বেড়াই। আমার চোখে ফাঁকি দেবে সাধ্যি কার? এ বেটা আমার বড় সাধক। ওর চোখে অনেছে মারেকটা চেরাগ। ও বেটা বড় সহজ বেটা নয়।'

বুড়ো কি মুহূর্তে গায়ের উত্তরীয় গাঁয়ার লোকে আবদুল্লাকে এখন সার্টিফিকেট দিচ্ছে? কিছু অসম্ভব নয়। গাঁয়ার ব্যাপারে অনেক ফকিরই হয়তো এমন অধিকারী হয়ে যায়। আবদুল্লার গাঁয়াটুকু টানার পর তখন ও কি বলে, সোনার অপেক্ষা করা যাক্।

মদনচাঁদ তার কথা শেষ হবার পর একতারার বোল তুলে গেয়ে উঠল।

গেয়ে এলাম আজব কিক
আসমানে তার মূল।
ডাল ছাড়া তার পাতা মুহু
বোঁটা ছাড়া ফুল।
সেই বিকে এক পাখি আছে।
নিরাকার বোল বলিছে—

মহম্মদ চন্দ্রে।
আমি দেখে এলাম।'

ইতিমধ্যে ছিলিম তৈরী। আবদুল্লা প্রথমে ছিলিমটা দু হাতে ধরে মৌড়ে কানা বরকন্দাজের কাছে গেল। বরকন্দাজ একখানা মোক্ষম টান মেরে ফেরত দিলে, সে ফের দৌড়ে আমাদের কাছে এল। তারপর মদনচাঁদের সামনে বসল। মদনচাঁদ তৃপ্তিনি গান ও এক-তারা রেখে অন্তত এক মিনিট চোখ কপালে তুলে ছিলিমটা শেষ করল। তারপর দিল তার সঙ্গীকে। ও বুড়ো যেন উপোসী ছিল। ছিলিমে কুলকি উঁচিয়ে দেখে আমার পালা। ব্যাপারটা বড় সংক্রামক। কোন রকমে আনাড়ি টান মেরে কাশতে কাশতে ফেরত দিলুম। আবদুল্লা কিন্তু মেটে একটা টান দিল মাত্র। ওতেই ছিলিম খতম। সে হাতের তালুতে গল্প ঘষে চলল। ওদিকে মদনচাঁদ চোখ বুজে কের গানটা নিয়ে পড়েছে।

ওটুকুতেই আমার মেরে দেশে গেছে। তার ওপর সিদ্ধেট টানা মাত্র মোরটা প্রচণ্ড ঘেড়ে গেল। তখন ওখানেই শুয়ে পড়লুম। ওদের গানের আসর চলতে থাকল। গাঁজার নেশায় যান খোলা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। স্বাভাবিক অবস্থায় ওই স্বাদটা মেলেই না। গানদুলোর শরীর আঁশ দেখতে পাচ্ছিলুম, যেন হাত বুলিয়ে দেওয়া যায়। শব্দদুলো জীবন্তময় সাজ পোশাক পরেছে মনে হচ্ছিল। একটি সুরের মধ্যে পাশে কত রকম সুর স্বাভাবিক অবস্থায় অদ্ভুত থাকে—সপ্তসুরেরাও ছাড়া, এবং সেই সব অদ্ভুত সুর, এমন কি শ্রুতিগুলোও স্পষ্ট শোনা যায়। শুনতে শুনতে নক্ষত্রলোক পেরিয়ে অন্ধকার কোন মহাকাশে তলিয়ে যেতে থাকলুম। তারপর কী ঘটল, জানি না। সেই অতল শূন্যতার অন্ধকারে কিন্তু 'আমি' নামক শিরীষটা দিব্যি জ্বলতে থাকল। শুধু এইটুকুই বলতে পারি।...

যখন জ্ঞানলুম, তখন আমার ওপর সুপরিচিত পার্থিব অন্ধকার মুখোড়ি মেরে পড়ে আছে। কোথায় আছি বুঝতে একটু সময় লাগল।

সেই কাঠমল্লিকের তলায় তালাইয়ে শুয়ে আছি। অজস্র ফুল আর অড়ো কড়ো পাতা পড়েছে গায়ের ওপর। উঠে বসে ঝেড়ে ফেললুম। আস্তানার ঘরে শিকনি জ্বলছে। ওটা কোনার দিকে বলে আলো আসছে না এখানে। গাছপালার ফাঁকে নক্ষত্র দেখা যেল। রাত কি বেশি হয়েছে? দাওয়ায় বসে জন কয়েক ঘুমুচ্ছে আর ঘাসা জন্মছে। রাগ হল। কেন কেউ ডাকিয়ে দেয়নি? আর ওরা গেলই বা কোথায়? এই সব ফকির থাকবারগুলো বড় স্বার্থপর তো!

এই সময় ফটক দিয়ে আবদুল্লাকে তার চৈ হাতে নিয়ে ঢুকতে দেখলুম। সে আমাকে বসে থাকতে দেখল নিশ্চয়—অন্ধকার বুঝে হল না। চৈটা জ্বালল না। বলল—মাস্টারজী, ঘুমোচ্ছেন?'

সে কাছে এলে বললুম—'নাঁ। এরা সব কোথায়? তুমিই বা কোথায় ছিলে?'

আবদুল্লা হেসে জবাব দিল—'নবীতে ঘিরোছিনুম বড়ের কাছে।'

'বাহে ভাজ' মানে জৈব প্রয়োজনে যাওয়া। ওর জৈব প্রয়োজন বলতে কি বোঝাচ্ছে, বলা কঠিন। বললুম—মদনচাঁদরা বুঝি বাড়ি চলে গেছে?'

—'নাঁ।'

একটু হেসে বললুম—'তোমাকে ডাকেনি বুঝি?'

—'ডেকেছিল। যাইনি।'

খিদে পেয়ে গেছে। ঘরে একটা রাত এখানে কাটাতে হবে নাকি? সিদ্ধেটও ফুরিয়ে গেছে। পাঁচটা পাকেট ছিল, সব শেষ। বললুম—'তোমার কাছে সিদ্ধেট আছে?'

—'নাঁ। বিড়ি টানবেন?'

—'তাই দাও।'

বিড়ি টানতে টানতে বললুম—'তা হলে এবার বেরিয়ে পড়া যাক্! চলো, ইস্টার দিয়ে যেতি, খাবারের দোকান টোকান আছে নাকি।'

আবদুল্লা বলল—'এখন রাত কত জানেন? বারোটার কম নয়।'

—'বারোটা!'

—'নাঁ। একটু আগে রাত দু'-

চতুরঙ্গম

পহরের শেয়াল ডাকছিল।'

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লুম। তাহলে মোটে ঘিরে নিয়ে এখনই রাত কাটাতে হবে দেখছি। মন তেতো হয়ে গেল। বললুম—'কী করবে ভাবছ?'

—'কী করব? এখনেই শুয়ে পড়া যাক্।'

—'কিন্তু খিদে পেয়েছে যে!'

—'সে যারবাও কি ভাবিনি ভাবছেন? মাস্টারকে পাঠিয়ে মুড়ি এনে রেখেছি।'...বলেই সে লাফিয়ে উঠল।—'দেখি তো শালা ছোটা মুড়ি-গুলো নিয়ে কেটে পড়ল নাকি। ওরে কিছু বিশ্বাস নেই!'

সে তালাইয়ের কোনা থেকে তার কোলাটা টেনে নিয়ে গর্জে উঠল—'দেখছ, দেখছ শালার কাণ্ড? যা ভেবেছিনুম, ঠিকই। শালাকে আজ মেরেই ফেলব।'

বলে সে চৈ নিয়ে দৌড়ে বেরুল। বাইরে চৈয়ের অলকানিতে গাছগুলো জ্বলে যেতে থাকল। খোলা মাস্টার গাছের তলা দেখোবাবা। কোন গাছে ভূতের মতো ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে মহানন্দে মুড়ি খাচ্ছে নিশ্চয়।

উঠে পাহারা করতে গিয়ে সাপের কথা মনে পড়ল। তখন এই গাছতলার রাত কাটানোর কথা ভাবতেই আঁতকে উঠলুম। আমারও একটা চৈ রাখা

উচিত। বহুদেশের কথা ভিন্ন ভাবলুম—কাজির সাহেব?'

সাড়া দিলুম না। ও বুঝেছে আর ঘাঁটা ঠিকছে। ঠোঁট কাঁপছে। বার তিন ভেকে ভিতর ঘরে গায়ত্রীকে ডাকাই আর দুজনের বাঘ নিয়ে এলুম। এ ব্যাটা মানুষ কাজির ঘা করে বসবে, ওর ছুতোর ঘরে আবার বাঁটো কাটনেই। বেঁচি, ওরা তিনটে মড়া কী করতে পারে।

ঘরে ঢুকে তাকাই দেখেছি, তখন সবুজের আসর পা ফেলে খুব ব্যস্ত-চরণে চুকে পড়লেন। তারপর কোণের দিকে ভিড়ে বসলেন। এনায়েতের সেই কলো কুচ্ছিত হাঁড়িটার চলনা খুলেই বুঝলুম, গায়ে অসুর ওঁর হাতের খানটা ছেড়ে দিই, তাই তৎপর হয়ে উঠেছেন। হাসি পেল না। ভেবে বললুম — 'আপনি কি ভাবছেন, আমরা আপনার ভাতগুলো ফেরে ফেলব?'

জবাব দিলেন না। আমার দিক পিঠ রেখে হাঁড়ি ছেড়েই হাত দিতে শুরু করলেন। মাঝিনা বুদ্ধি ওর ওঁর জন্য কিছু হাত রেখেছিল তাহলে। তারপর মাংসের হাঁড়ি ছেড়ে এক-টুকরো হাড় বের করে ওরে কামড়তে দেখে অবাক হলুম। ওইটুকু মুরগির মাংস সাতজন খাওয়ার পরও কি করে এখনও হাড় ছেড়ে যায়? আসলে ঝোল দিয়েই আমাদের খাওয়া হয়েছিল। মাংসও খুব ছোট টুকরো ছিল। এ হাড় কোন কাজে লাগে না।

একটু পরে আবদুল্লার ডাক শোনা গেল—মাস্টারজী!

সাড়া দিলে সে ঘরে ঢুকল। বললুম —'খুঁজে পেলে?'

আবদুল্লা হাসতে থাকল।—'আসতে হবুদেন।' তার পাতার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। জানতেও পারলুম না। কিন্তু গায়ত্রীদের হাঁড়ি দেখেই চাঁ-বাটি হাঁকড়ালুম। অমনি পালা একেবারে ডগায় চলে গেল।'

—'তুমি নিজ ছোড়ার জন্য রেখেছিলে না?'

—'হুঁউ।' ...হলে আবদুল্লা খুশিই সবুজদের দেখতে পেল। বলল—'ইস্! আগে জানলে বাপজীর খানাটাই মেরে দিতুম।'

সবুজেন মুখ ঘোরালেন একবার। তখন আবদুল্লা ওঁকে আশ্বস্ত করে বলল—'খান, আপনি খান হুজুর। ডিসটার্ব করব না।'

'ডিসটার্ব' শুনে আমার যথাক্রম হবার কিছু নেই। নানা জায়গায় ঘোরে ও। নিশ্চয় ইংরেজি শব্দ আরও অনেক শিখে ফেলেছে। শিবীনের আগেকার ওর মুখে ইতালার ভাব লক্ষ করছিলুম। বললুম—যা হবার হয়েছে, শোন। বাইরে খুলে খুব হবে না। এখানেই খুয়ে পাঁড় হুজনে। ভোরে বেরিয়ে পড়া যাবে। আর, ভাল ঘুম দিতে হলে ছিলিম টানা দরকার। আছে তো?'

আবদুল্লা মাথা দোলাল। আমরা তারপর গাঁজায় পুড়িয়া বের করতে করতে বলল—'মালা মাস্টারকে বলে এসেছি, সেলি ভালই করলি। কিন্তু বাঁচি জন বাঁচতে চাস, আমার গায়ত্রীখানা ফেরত দিয়ে যাবি।'

আমি নারকোল ছোবড়ার গুলতি পাকিয়ে আঙুন ধরিয়ে নিলুম। জবদুল্লা বখারীতি এলাচদুড়ো এবং আমার জন্য চকলেটলা গাঁজাটা চমৎকার গন্ধে ঘরটা ভরিয়ে তুলল। ওদিকে সবুজেনের খাওয়া শেষ। গন্ধ পেয়ে হাত ঝুড়তে ঝুড়তে কাছে এসে বসলেন। বেশীক্ষণ হেলান দিয়ে বসলেন—'বেটা! আমি তখন মানুষ। আমাকে ওসব ভাঙ খাইয়ো না। এক ঘুমুক দে। টেনে আপন ভাকে বসব। তোরা নাক ডাকিয়ে ঘুমো না!'

গাঁজার ধোঁয়ে ঘুরো কাজির অস্থির হয়েছে। আবদুল্লা মুচকি হেসে ছিলিম বাড়িয়ে দিল হাতে। বলল—'খবরদার বাপজী! বুকে সুখে দম মারবেন। আপনার বয়সের ঘা জোর, আমার বাঁশি (ছিলিমের সাংকেতিক নাম) ফেটে বেসুরো বাজবে।'

সবুজেনের দাঁতগুলো খুব সাদা আর প্রচণ্ড সাদা। কালো মুখের মানুষের সাদা সাদা দাঁতে সৌন্দর্য আছে। হাসলেন নিঃশব্দে। সেলাই-করা চামড়ার ভাঁজ যেমন, তেমনি ঘুটো দুখ চোখ তিরতির করে কাঁপতে থাকল। টান দেখে তাক লেগে গেল।

আমরা বার দুই পালাক্রমে টেনেছি, হঠাৎ শুনি সবুজেন গুন গুন করে সুর ভাঁজছেন। আবদুল্লা বলে উঠল —'ছেড়ে কানুন বাপজী!'

সবুজেন হেসে উঠলেন। আবদুল্লার একতারা নেই ভুলিও নেই। খুব খুশিটা ওরে ফেলেছে। সে ওটা বের করে তাল দিতে থাকল। কিন্তু এমন সাদা গলা, এত মিঠে সুর আর এমন বিচিত্র গান কখনও শুনিনি।

'ওরে, দেখবি যদি বৃন্দাবন
যাদু সাজহরে মন।
কালাচাঁদ্-কালা আলে
বসে করে লাদা গরু।*

এতক্ষণে বুঝলুম 'কালাচাঁদ' শব্দটা কী। ওটা কোরানের একটি শ্লোকের 'ফুল্-হু-যাচাদ্'। এর মানে—'বলো, ঈশ্বর।' কালা কিন্তু হেরে হিন্দু কলাচাঁদ কৃষ্ণ। বাঙালী মাইজা বাঙালী মাইজের বৈষ্ণবেরদের সঙ্গে ইসলামী কিম্বাসকে মিশিয়ে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ রাতে নদীর ধারের নির্জন জঙ্গলে আস্তানার কথা মনে পড়তে কেমন লাগল—বিশেষ করে ছিলিম দম মারার পর, তাকে ঘিরে একটুও বোকানো যাবে না। খানটা শেষ হতে সময় নিল। তারপর সবুজেন বললেন —'ছেড়ে দিয়েছি। ঘরে ফুলোয় না। তোমরা খাও বাবা, শুনি।'

আবদুল্লার কী হল হঠাৎ। খুব্রেজী সময়ে যেমন উৎসাহে বাজাতে শুরু করেছিল, শেষ দিকে তেমনটা নয়। তোলার ভরে বলল—'ভ্রু। ও জাইনে আমি আর নেই বাপজী। এখন নিম যাব। আপনি সাকরেদান কানুন গে।'

সবুজেন হেসে বললেন—'কেন বেটা? মনে কিসের দুখ? লাইন ছাড়বি কেন রে?'

আবদুল্লা গম্ভীর মুখে জবাব দিল —'আপনি আলি-আউলিয়া সাধক মানুষ। যত খোঁজে আপনার বরকার কী বাবা? খান—নিজের কাজে যান।'

বলেই সে সটান শুয়ে পড়ল। সবুজেন একটু হেসে থাকার পর উঠে বাইরে গেলেন। জলচৌকিতে বসলেন। তখন আমিও শুয়ে পড়লুম। কিসের সময় ছিলিম টানলে নেশা গাঢ়-ঘুই হয়। দোষার আগে ফু দিয়ে বেশীর ভিবীটুকু নিবিয়ে দিলুম। আশ্চর্য! অমনি সবুজেন বলে উঠলেন—'বাতিয়ে দিলি? সোনা হবে রে।'

ও কি সাঁড়া অন্ধ? মনে হল, ওঁর চোখে প্রকৃতির নিজের হাতে সেলাই-করা চামড়ার ভাঁজে হয়তো কোন ফাঁক আছে—যেখানে লোকটার দৃষ্টি-শক্তির একটুখানি এখনও টিকে থাকতে পারে। অথবা সবটাই জান।

কিমাকিম ভাব এবং ঘুমের খুশী হাওয়ার দাপট ক্রমশ বাড়ছে। সেবার কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়েছি।...

ঘুম ভাঙল একেবারে ভোরে। ভাঙত না—খোলা মাস্তানের পা টেপার উপদ্রবেই ভাঙল। ওর নোংরা হাতের কথা মনে পড়তেই ভেড়ে ভেড়ে উঠলুম। তারপর চোখে পড়ল, আবদুল্লা নেই। ওর ঝোলাটাও নেই। মাস্তান হি' হি' করে হেসে অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল—'ভেগেছে।'

—'ভেগেছে মানে?'

মাস্তান ঘুটো আঙুল তুলে কী দেখাল। বুঝলুম না। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি, কালা সবুজেন সম্ভবত পরমের জন্যেই অমনি করে কুকড়ে জলচৌকিতে হাত কটান। বেরোয় ঘুমোচ্ছেন। বেরিয়ে এলুম।

মাস্তান দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছিল। সেও বেরোল পিছনে। তারপর আস্তানার উঠোনে গিয়ে সেই সন্ধের কাঠকয়লার সুকেন্দে তরা ঘুমের ঝোলাটা খানখান করে কেলল তার ভুতুড়ে নাকি সুরে। 'মা রি মা! ছোঁড়া পিরীতে কাজেছে...'

আবদুল্লা এমনি করে চলে গেল কেন? আস্তানার জঙ্গল ঘুরে নদীর ধারে গেলুম। দেখলুম, বালির চড়া পেরিয়ে সবজীন হন হন করে আসছে। খালি গা—গলায় মালা মালাগুলো ঝুলছে। আমাকে দেখতে পেয়েই সে চেঁচাতে শুরু করল।

কাছে গিয়ে দেখে, হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠে হাঁকতে হাঁকতে সে বলল—'মাস্টারজী! সে-বেটা আছে আস্তানায়? আছে?'

—'নেই। রাতেই পালিয়েছে কখন।'

অমনি সবজীন বুক চাপড়ে ঝুরে-ঝুরে কাঁদতে শুরু করল। আশ্চিতে হাঁটু, মুখে ভয় ওঠা মানুষের মতো মাথা নাড়া দিয়ে সে বুক চাপড়তে থাকল। তার দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করলুম—'কি হয়েছে সবজীন? কি হয়েছে?'

সবজীন গলা স্টীলোকের মতো সুরে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল—'ওরে বেটি ভরাজনা রে! তোর মোনে যদি এই ছিল, বলালি না কেন রে! আমি এখন কী করব রে!...'

এ তো জানতুম। কেন সবই জানা ছিল। মুখে ভাবিনি। ভাবিয়ে দেখিনি। কিন্তু মুখে কাঁত কি? সবজীনের তো খুশি হওয়া উচিত। এবং আমারও।...

## ॥ সাত ॥

অন্ধ সবুজেন বলেছিলেন, একরাতে সব ওলটপালট হয়ে যায়। তাই-ই হল। কিন্তু আমার নয়—তিন একজনের। তাহলে আমাকে কেন বলা? এতক্ষণে বুঝলুম, ও কথা আসলে গায়ত্রীদের উদ্দেশেই বলে-ছিলেন সবুজেন। আর, চিরদিনের তোমার অন্ধকার। সেটা থেকেই যাচ্ছে। আমার মনে জ্বালা এখন। চর্বাপদের হরিণী দেখতে দেখতে বাঘিনী হয়ে গেছে। শিকারের ঘাড়ে কামড় দিয়ে ঘরে নিয়ে চলেছে গহন অরণ্যে। তবে আর কি, এবার আমি মনে মনে পা টাকা দিই। রাস্তা আমার সামনে। পা বাড়াই।

'তিরাপনীর ঘাটে এক মড়া জাগছেরে
মড়ার ওপর সর্পের জিম্ব হরিণ
চরছেরে...'

সেই মড়া আমার সামনে, পিছনে, পায়ের তলায়, মেরুদণ্ড বেয়ে মস্তিষ্কের দিকে বিস্তৃত—যেখানে কামনার জিম্ব, হরিণ-হরিণা চরে বেড়ায়। দেখতে পাচ্ছি, তাই জানছি। হরিণ-হরিণার মিলনের দিকে তাকিয়ে আছি। মিলনেই যে জীবন—বিচ্ছেদ মৃত্যু।

ঘাড় ঘুরিয়ে সুর্য ওঠা দেখতে গিয়ে বাঁয়ের ঢালু বিশাল মাঠার পাশ চোখে পড়ল। ভালপালার ঘর ফুল হয়ে ভরমর। প্রভাতের অবসান ঘটল কি ভাবও? শরীর নাল নীল ছেকোলা ঝাড়া পাখি বাতাসে পত পত করে উড়ছে। যেন কিসিমিস করে কাছে—এ বড় সুখের সময়।

খু হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে কতক্ষণ কোঁস কোঁস করার পর বুড়ো কাজির উঠল।—'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল সো আমি।'...বলে আস্তে আস্তে পড়ে ছেড়ে নেমে গেল। যতক্ষণ না সে নদী পেরোল, তাকে দেখতে থাকলুম। খু পাশে হাত ঝুলিয়ে সে হাঁটছে। নদীটা পার হতে খুব বেশি সময়ই নিয়েছে সে।

---

*এই বাণী অবশ্যেও শুনেছি। 'যদি করতে চাস্ শ্যামসুন্দর/বাদ্ সাদ্ দে ঘর।'

পাড়ুইতে আলবাদের আসরে যাব —নাকি অন্য কোথাও, হরিপদদার একবিংশনের মেলায়, আসলে মহাজনের বাড়ি? কবিয়ান এ মাসেই দেব। তা হোক্। কোথাও তেতে হবে। শুনোটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। জানা হাটে আর বাঁকিয়ে তেকে করবটা কী?

সিগারেট শেষ। বিড়ি সেলেও চলত। ইচ্ছা দিয়ে কেনা যায়। পা বাড়াতে গিয়ে বাঁয়ের শঙ্কিতে বাঁকের মুখে এক মূর্তির আবির্ভাব এবং...

'তবে-তবে তার লাগরে
গাব্-গুব্বা-গুব্ বাজায় মোন/
অদেখ্লোহয়া দেখায়্ লে।
ও মোন, মোন রে তোলা।'

মাথায় পাগড়ি, হাতে গাব-গুব্বা-গুব্ ওস্তর, সেই বাউলের বাসিন্দা তো বটেই। কিন্তু পোশাক আমাদের চেনা মানুষ হলে, আউল কক্ষির নয়। হিন্দু বাউলই বটে। বাঁয়ের ওপর দিয়ে বটের একটা ঝুরানো ডাল নদীর আকারে চলেছে। তার তলায় দাঁড়িয়ে গেল সে। গাব-গুব্বা-গুব্ হঠাৎ থামিয়ে চোঁচিয়ে ডাকে বলল—'কই গো? হল তোমার?' এবং ফের ওস্তরে বোল তুলল।

আমাকে দেখেই যেন খিদেয় উদরে পানটা জুড়ে দিল। একটু একটু নাচতেও থাকল। কাছে গেলে সে মাথা ঝুঁকিয়ে আদাব দিল। খুশি হয়ে বললুম—'হরিপদ যে! তুমি এদিকে কোথায়?'

হরিপদ বাউল মুচকি হেসে পানটা শেষ না হওয়া অব্দি কোন কথা বলল না। আর কিছু না হোক, বিড়ি খাওয়ার অচাবিত সুযোগ পাওয়া গেছে। পানটেবে ছোপটা ওকলুম। পান শেষে ছেমাইয়ের মাথার এক লাল ফেরে ফেলা মাথা ঝুঁকিয়ে হরিপদ সেলাম দিল। তারপর বলল—'বাবা রে বাবা! বাবা রে বাবা! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম গো! এ যে দিন-দুপুরে চাঁদের উদয়! জয় গুরু, জয় গুরু!'

—'বিড়ি খাও হরিপদ।' বলে বসে পড়লুম।

হরিপদও বসল। ঝুলি থেকে সযত্নে কৌটো বের করে দু হাতে তুলে বলল।—'জয় গুরু, জয় গুরু! মৌসাইয়ের সেবায় লাগবে বলেই রেখেছিলুম—নেন মৌসাই।'

হরিপদ বকুলপুরে আখড়ায় বাসিন্দা। আমার গ্রাম কুতুবপুরের ওদিকে। বরাবর সে আমাকে মৌসাই বলে সম্ভাষণ করে। ওর ধারে, আমি খাঁটি হিন্দু—মুসলমানের ছোঁয়ার আমি। কেন ওর এই ধারণা জানি না। চেপে ধরলে বলে—আপনার জ্ঞান বদনে মোছলমানের রক্ত নেই গো! আমি চোখ বুজলেই দেখি, আপনার ভেতরে বসে আছেন বাঁকা মৌসাই, মুখে বাঁকা হাসি। আপনি মৌসাই না তো কে?'

আয়নায় ও মুখে বিড়ি টানতে টানতে পথের দিকে তাকালুম। যাকে ডাকছিল, তাকে দেখতে পেলুম। হু, হরিপদ বোস্টুমী জুটিয়েছে এতদিনে। বোস্টুমী শিহন দিয়ে শাড়ি বলাচ্ছে—সেরুয়া শাড়ি। সবে ডিমের কুসুমের মতো আটাগুলো লাল হলুদে রোদ পড়েছে শিউলির কিংবা ফুলে। অরজিনার কথা মনে পড়ল। তাকেও প্রথমে এভাবে দেখেছিলুম।

আমাকে তাকাতে দেখে হরিপদ মুচকি হেসে বলল—'সবা তিন চার মাস হয়। বেরেখাইলার মেলা থেকে বুঝিয়ে এনেছি। একা না থোকা। তাই না?'

—'ঠিকই করেছ।'

হরিপদ খিকখিক করে হাসতে থাকল, যেন খুব মজার কীর্তি করে বসে আছে। তারপর বলল—'মৌসাই, এখানে কী করছেন?'

—'মাধবপাটের কিরের মেলায় গান শুনতে এসেছিলুম।'

—'ভাল, খুব ভাল।'

—'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

—'আজ্ঞে মৌসাই, আবার কোথা? মাধুকরীতে।'

—'কিন্তু এতদূরে?'

হরিপদ আবার দুলে দুলে হাসল। —'আমি সাধ্য করেই আখড়া ছেড়েছি, জানেন না বুঝি? এখন থাকি গুরুদিয়ায়। দুই যে ঘোঁয়া-ঘোঁয়া দেখছেন কিলোমিটার, ওই গাঁয়ে।'

—'বকুলপুরে ছাকলে কেন?'

—'অভেচ্ছায়ে।' ...হরিপদ গম্ভীর হয়ে গেল। 'বুঝলেন মো? মানুষের অভেচ্ছায়ে। আমার বউয়ের মেজাজ অবিশ্যি একটুখানি চড়া। অসইলো (অসহনীয়)। কথা সইতে পারে না। মুখের ওপর পাল্টাপাল্টি জবাব দেয়। সেও একটা কারণ। আমা কারণ, আমি নাকি ছুতোরের মেয়ে ঘরে তুলেছি। মৌসাই, শালা মানুষের সব মেলেও যেন জেতের গুমোর যায় না।'

—'ছুতোরের মেয়ে! তার মানে?'

—'আজ্ঞে, কিভাবে যে কথাটা রটল, কে জানে! আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন ছুতোর—সেটা ঠিকই। পরে বোস্টমী হয়ে বাঁকা যেন মেহেরপুরের আখড়াওলা বাবাজীর কাছে। বিয়েও দিয়েছেন বাবাজী। সেব বয়স তখন। একটা মেয়ে রেখে স্বামী-স্ত্রীর সমাধি হয়। বাবাজী মেয়েটাকে মানুষ করে-ছিলেন। বিয়েও দিয়েছিলেন। বনিবনা হল না। পালিয়ে এল। জোয়ান বয়েস। লোকের চোখে লাগে। পাঁচ কথা কয়। অভেচ্ছায়ে আমি নিয়ে পড়লুম বাবাজীর আখড়ায়। বাবাজী বললেন — হরিপদ, সাধ্য করবি? জেবোচিত্তে বললুম—তা আপনি যখন বলছেন, তখন না বলার সাধ্য নেই। তখন বাবাজী বললেন—তবে গায়ানে যাবে বেরেখাইলার মেলায় যাস্। ওখানেই ও সব কাজ হয় কি বয়র।'

কথা বলতে বলতে বোস্টমী এল। কথা শেষ না হওয়া অব্দি অপেক্ষা করল একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। তারপর বলল—'আপত্তখানা তাড়াতাড়ি খুলিয়ে নিই। তোমরা গল্প করো।'

বোস্টমী অরজিনার মতো সুন্দরী নয়। কিন্তু গোলগাল চেহারা। স্বাস্থ্য-বতী যুবতী। রঙটা একটু ময়লা। কিন্তু চেহারায় চলনে তাব আছে। চাপা চিবুকের ওপর লেবর মুখখানি ঠোঁট। পুষ্ট গাল, সরু নাক, ছোট কপাল। নদীর পাল তুলে রসকলি এঁকে নিয়েছে নাকে। এখনও মুকোয়নি। মাথার অরজিনার মতো অত ঘন আর লম্বা চুল নেই—তবে যা আছে, তা কুচকুচে কালো। চোখের তারাও ঘন কালো—অরজিনার মতো পিঙ্গল নয়। দৃষ্টি ভাসা-ভাসা, কিন্তু চঞ্চল। এ সব ছেড়ে খুব টকাটকি হলতের কাজ সেরে নেয়।

কেশের ওপর মেলুয়া চুলপাড় শাড়িটা সে মেলে দিল। তারপর রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকোতে থাকল।

হরিপদ বলল—'তা মৌসাই, এখন কি সুরে চলছেন—নাকি গানের বায়না আছে? আপনার বলছলের খবর কী?'

বললুম—বলবল পাড়ুইতে। আমি এখন ছেড়ে পড়েছিলুম। এখন ভাবছি, কোথায় যাই।'

হরিপদ হেসে উঠল।—'বাবা রে বাবা! মৌসাই যে আমাদের পথের পথিক গো! ওগো, এখানে এস! মানুষটাকে চিনে রাখো। ঐঁংবিধ অবতার গো! অভেচ্ছায়ে ফোরে না। একবার বাঁশিতে ফুঁ দিলে বল-হরিদের জোয়াড় হবে। মৌসাই, একবার বাঁশি ছোঁও। আহা, বড় মনে আপনার সুরে।'

আমার বাগে বাঁশি আছে। কিন্তু বাজানোর মেজাজ নেই। বললুম—থাক্ হরিপদ। রোদ বাড়ছে। খিদেও পেয়েছে।'

—'বলাই বাহুল্য!' বলে হরিপদ জিভ কাটল। তারপর কিলোমিটারে বলল—'মৌসাই, বড় দুখ করে বলেছিলেন মনে আছে? হরিপদ, মানুষ খুঁজে মানুষ! মনে পড়ছে? সেই যে গো আমি বড় ফলতার ঘরে গাছতলায় দেখা হল?'

—'হ্যাঁ, মনে আছে।'

—'তাহলে আর কী?' বলে সে ঝোলা থেকে নকশাকাটা বাঁধা খুঁড়ি বের করল।—'পাটালিও আছে। গুমলা টুমলা বের করুন। আমরাও মুখটো সেরে নিই।'

গুমলা বের করতে হল। সত্যি, ভীষণ খিদে পেয়েছে। খুঁড়ি পাটালি চিবুতে থাকলুম। হরিপদ বউকে ডাকল। বোস্টমী সাড়াও করল না। পাশাপাশি পা ছড়িয়ে বসে ওরাও খেতে থাকল। খাওয়ার ফাঁকে হরিপদ

ওস্তাদ আবুসেরজান খিরকোয়া

নানান কথা বলে গেল। মাঝে মাঝে বোল্টুমী ওকে থামিয়ে দিচ্ছিল—'থাওয়া শেষ করেই কথা বলবে, বাপু। মোসাইয়ের পরনে এটো পড়বে—চোখের মাথা খেয়েছ?' হরিপদ লজ্জা পেয়ে সতর্ক হচ্ছিল।

খাওয়া শেষ করে তিনজনে বসে বসল্লুম। বোল্টুমীর চোখ বার বার পড়ের দিকে — কাপড় শুকোতে দিয়েছে। জল খেয়ে উঠে এসে আমরা। হরিপদকে বিড়ি খাওয়া হল পরম সুখে। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল—'তা হলে মোসাই? যা তোমার অবেদ দিন। আসি।'

শেষে যখন পড়লে বরবর আমার অন্তর্যামী জাগে। বললুম—'হুঁ। কিন্তু তোমার বউয়ের নাম তো বললে না হরিপদ?'

হরিপদ জিভ কেটে বলল—'বলিনি বুঝি? ওমা, তুমিই বলে যাও নিজ মুখে।'

বোল্টুমী মিষ্টি হেসে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে বলল—'কাঞ্চন।'

—'কাঞ্চন! বাঃ! কাঞ্চন মানে কী জানো তো হরিপদ? সোনা।'

বোল্টুমী যেন সলজ্জ হেসে মুখ ঘোরাল। হরিপদ আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে উঠল—'বাবা রে বাবা! আমি কী হনুমে রে! ওরে, সোনা আমার ঘরে। আমি যে রাজার ভৌ মহারাজ রে!'

তখন বোল্টুমী ওকে ধমক দিয়ে বলল—'অত কোরো না তো!'

বললুম—'হরিপদ, তোমার বউয়ের গলা বেশ মিষ্টি। একখানা গাইতে বলো!'

হরিপদ সাবাসাবি শুরু করল। অনেক চেষ্টার পর কাঞ্চন বোল্টুমী শান্ত হয়ে বলল—'কই! যন্ত্রটন্ত্র দাও।'

হরিপদ ঝুলি থেকে একজোড়া খঞ্জনী বের করে দিয়ে বলল—'ও আমার এই কপালে গলা লাগাতে পারে না। খঞ্জনী চাই।'

খঞ্জনী বাজিয়ে কাঞ্চন ধরে উঠল:

'হরি, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল
পার করো আমারে!'

হরিপদ শুনে শুনে—'এই সাত সকালে সন্ধ্যা এনে ফেললে, বুঝলে কান্ত!' গামছা দেখে করে খঞ্জনী-বয়া হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে কাঞ্চন প্রণাম করল তার ইষ্ট দেবতাকে—তারপর আমার দিকেও দিতীয় প্রণামটা ছুঁড়ে দিল।

তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললুম—'চলো, স্টেশনে যাব। তোমরা কোথায় যাবে?'

কাঞ্চন দ্রুত ঝোপ থেকে শাড়ি দুটিয়ে হরিপদের কোলায় ভাঁজ করে চুকিয়ে দিল। হরিপদ বলল—'চলুন তো। একসঙ্গেই যাই। তারপর কপালে ঘটলে ছাড়াছাড়ি হবে।'

আমরা আন্দামানের ঘাটে নদী পেরোলুম। ইস্টার চুকেই একটা দোকান পড়ল। দোকানে সিগ্রেট নেই —বিড়ি আছে। তাই কিনলুম। দাঁড়ের লোক হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল তিন দুটিকে। মুখলমানদের গ্রাম। হরিপদই জানাল। এখানে মোছলমী করে সুবিধে হবে না। না—জাত-ধর্ম্মটা কোন কালে নয়। এখানে যে কাজির পাড়া আছে। মানুষগুলি ভেতো পাড়ার লোক চিরকাল অস্থির। কত দেবে, বলুন?'

প্রশ্ন শোঁছয়ে ছেড়ে যাই। ঘাট শোঁছয়ে বললাম্ম সড়ক। কিছুদূর উত্তরে এগিয়ে পশ্চিমে একটা বড় গাঁয়ের মধ্যে ঢুকেছুম। জায়গাটা এবার হরিপদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হবে। কিন্তু হল না। হরিপদ নিজে থেকেই বলল—মোসাইকে ঘাবড়ে দিতে ইচ্ছে করে না। চলুন—বেলমাড়িতেই ঘুরব আজ। কী বলো তো?'

কাঞ্চন কিছু বলল না। ওর মতামত শোনার জন্যে আমি পিছু ফিরতেই চোখে চোখ পড়ল। আমি হুকো ঘর্ষণ করে উঠল। বোল্টুমী যেমন হাসছে! হাসিটা...নয়, আমার ভুল হতেও পারে।

কিন্তু বয়সুম্ম আছি, মনে হচ্ছে আমার পিঠে ছড়ে ওই হাসিটা ঘুরে ফিরে বিঁধছে। মনে পড়ল কয়েকদিন কথা—আমি চিরদিন, যাদের তুলনায় অল্পকাল বয়সে। আমি শিউরে উঠলুম। তখন কাঁকা মাঠে হরিপদ গলা ছেড়ে গান ধরেছে:

'সহজ ভাব পাঁড়াদে কিসে রে
মনের মানুষ না হইলে,
মনের কথা না কইলে,
সহজ ভাব পাঁড়বে...'

হাতটা বাড়ির দিকেই ছন টেনে-ছিল। কিন্তু হাঁটালদের বেশ সইবে না। তাই তারা আজিবনের জন্যেন বাসড়া ঘাট রেলের টিকিট কেটে ফেলেছিলুম। বন্ধী পাঁচ টেন বাকল। সেই ট্রেন আজিবনের জন্যেন পৌছল সন্ধ্যা একটায়। তখনও বাউল-বাউলনী সঙ্গ ছাড়েনি। হরি-পদর গলাটি খাসা। আর বাউলনীও লজ্জা করছে না। দুজনে গলা মিলিয়ে গাইছে। এর ফলে বেশ কিছু যোগ-দার হয়ে গেল ওদের। হরিপদ বলল —'ছেলেপি বখন, তখন আর লজ্জা না। কপালে গাড়ি থাক, দেখি। জংশনে তিনজনে নামলুম। নামার পর হরি-পদ বলল—'এদুরই বখন, বন্ধী পৌছয়ে জিয়ালজে ধরমের বন্দিরে যাব। তুলনা তো নেই পাঁওন মনে। এখন জন্তা হউ। তা হোক্, তা হোক...'

আমাকে আমার ট্রেন বলতে হবে। বাসড়া ঘাট রেলে নামব। তারপর বস বাইল বসে, দুদুরুম্ম। ট্রেন সন্ধে ডিনটের আগে নেই। এখন খাওয়াটা সেরে নিতে হবে।

হরিপদ বলল—'আমাদের আর পলাশনের দিন। শুকনো খেতে হবে—তাতে চলবে না। দেখি, বাজারে ডিঙে পাই নাকি। তুমি মোসাইয়ের কাছে বসো গে!'

বেঞ্চ খালি নেই। প্লাটফর্মে একটা পিপুলে গাছের নীচে বাঁধানো বিছুম্ম। কাঞ্চন সিমেন্টের চত্বরে বসে আছে। সামনে খানিকটা দূরে ছেলের কাটারিয়ে। ওখানে গিয়ে খাওয়াটা সেরে নেব। তাই ওকে বলতে বলে চলে যাব ভাবছি, কাঞ্চন বলল—'মোসাই বসুন। দাঁড়িয়ে কেন?'

মনে হচ্ছেটা পাপ, একটু তফাতে বসে পড়লুম। হরিপদ আসছে বরং। ঘুরে ফের চেকাতে হল। বোল্টুমীর ঠোঁটে সেই হাসি।—'মোসাই একটা কথা বলব? রাগ করবেন না তো?'

—'না, না। রাগ করব কেন? বলো।'

—'আমাকে পাঁচটা টাকা দেবেন?'

এ কি কথা ওর মুখে? মাথায় বাজ পড়ার মতো। বুকে ঢি ঢি পড়ে গেল। উহু, যুটো ভারি ভুল হল। এ ভাবে টাকা চাওয়ার একটি মস্ত অর্থ থাকতে পারে। এবং হতভাগা হরিপদ এ কথা নিয়ে ঘুরছে?

—'মোসাই বুঝি রাগ করলেন?'

—'না। টাকা কী করবে তুমি?'

—'টাকা কী করে মানুষ?'

—'কিন্তু...' বলে চুপ করে গেলুম।

—'যুটোও দিন তাহলে!' ...বলে মনের তাকিটুকু ঢেকে সরে এল। জংশন স্টেশনের প্লাটফর্ম। অনেক লোকের ভিড় আছে এখানে ওখানে। পিপুলে তলাটা সেবাদিকে খুলে লোক নেই। সে নিঃসঙ্কোচে আমার বাঁ হাতটা নিয়ে কোল বলল—'মোসাই, ভাবছেন কি? হাত দেখে বলতে পারি।'

—'তুমি হাত দেখতে জানো বুঝি?'

—'হুঁউ।' বলে সে তার ডিমোল ডাকনে আঙুল আমার হাতের রেখায় বুলোতে থাকল।—'আপনার মনে এক সন্ন্যাসী আছে, জানেন? সে আপনাকে বিশু হয়ে কাজে দেবে না—আপনি বড়ই অস্থির।'

—'তারপর?'

—'আপনার ধন টানে একদিকে, তো সন্ন্যাসী টানে অন্যদিকে।'

—'এখন কোনদিকে টানছে?'

আমার হাতটা একবার কাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দেবার জন্যে করল সে—কিন্তু ছাড়ল না। বলল—'বাবু! আপনি খুব চালাক মোসাই। ছিপে খেলিয়ে-খেলিয়ে মাছ তুলতে ভালবাসেন। মাছ বড়ই 'জন্মগ্রাহী' (কল্পনার ছাঁকনী) কুকুর, আপনার সুখ ভাঙে।'

—'বুঝলুম। মাছ কি সত্যি বিঁধেছে?'

কাঞ্চন মুখ ঘুরিয়ে বলল—'হুঁউ।'

—'এ মহলে চৌদ্দ খাওয়া অঞ্চলে আছে নিশ্চয়। বড়শি ভাঙতেও জানে।'

কাঞ্চন হাতটা ছেড়ে দিয়ে সরে বসল। এই আক্রমণের নাম সরল ভাষায় ছেনালিপনা—তা তো জানিই। হায় হরিপদ, তোমার এ কি দুর্মতি ঘটল?

আমি হাসতে হাসতে পকেট থেকে যুটো টাকা বের করে বললাম—'নাও।'

নিল না। তখন ওর পায়ে ছেড়ে দিয়ে বললুম—'হরিপদকে বলো, ফেরে বাঁধছি। তার দেখা না হতেও পারে।'

কাঞ্চন একবার তাকাল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমি চলে এলুম। আসতে আসতে পিছু ফিরে একবার দেখলুম—কাঞ্চন টাকা যুটো দুহাতে কুড়িয়ে নিয়ে ওর বুকের ভিতরে চালান করে দিচ্ছে। হরিপদকে সাবধান করে দেব কি? কিবেক বলে যা আছে, তা উঠাও করে। কিন্তু দেব অঁশি ধরতে পারব বলে মনে হয় না। একটু পরে খেতে বসে ভাবলুম—মন্দ কে নে। পৃথিবীতে কত কিই ঘটছে—তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এবং আমি তো সাঁতা সাঁতা পাপীর চরণে এবং মুক্তকচ্ছাদীর বিনাশে জন্মগ্রহণ করিনি! হরিপদ যাই বলুক, আমি অবতার নই। নিতান্ত ক্ষুদ্রমানের মানুষ। আমার জ্যোতি নেই—নিছক শিখা আছে। তার তলায় কত অন্ধকার।...

খেয়ে বেরিয়ে স্টেশনের ঘড়ি দেখলুম। এখনও দেড় ঘণ্টার বেশি সময় হাতে আছে। ততক্ষণ একটু এদিক ওদিক ঘোরা যাক্। প্রভাত নওলাক্ষার বাজার দেখা হতে পারে। কিন্তু খরার গ্রান্ড রোদে সেটা খুব সুখের ব্যাপার হবে না। তাই স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাজারের যুরব অবলম্বন করলুম।

সেই পৌছয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে ডিজেল মোড়ার গাড়ির ভিড়। যা দিকে একটা আট-চালা—করেকটা গরুর গাড়ি হাউনি। ছৈনদের ফড়ে দেওয়া গাড়োয়ালা মতো। কিছু লোক ঘুরছে—কেউ বসে আছে। সাদুসন্ন্যাসীও আছে। হঠাৎ দেখি, ধামে হেলান দিয়ে বসে হরিপদ ছিলিম টানছে। দেখা মাত্র লোভ হল। কিছুতে কিছুতে ছিলিম খাওয়া যাবে। ওর কাছে চলে গেলুম।

তারপরই আমি থমকে দাঁড়িয়েছি। স্বপ্ন দেখছি না তো?

আমলুম্ম হরিপদর হাত থেকে ছিলিম নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। একটু হেসে ছিলিমে মুখ দিল।

হরিপদর মাথার ঘোমটা দিয়ে ধামের পিছনে বসে আছে—যুটো পা ওপাশের ঘাসে। মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখেই ঘোমটাটা আরও টেনে দিল।

হরিপদ বলল—'আসুন, মোসাই আসুন। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা—একটুখানি আলাপ করেই যাই ভাবলুম।'

বললুম—'শিবরাত্রির ঘাও হরিপদ।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

বোস্টুমী এতক্ষণ ভেসে গেছে অনেক-দূরে।'

হরিপদ হাসতে হাসতে চলে গেল। তখন আবদুল্লার পাশে বসে বললুম—'কী আবদুল্লা, আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনি—তাই না?'

আবদুল্লা কাঁচুমাচু মুখে বলল—'জী না। তা নয়।'

—'যাই হোক, শোন। মরজিনার বাবা নিশ্চয় থানায় খবর দিয়েছে। পুলিশে খবর দেবে।'...সকৌতুকে বললুম কথাটা।

মরজিনা ঘোমটার ফাঁকে হিস হিস করে বলল—'ইস্! খুব ধার ধারি পুলিশের। কারেন? ধরবে যারে?'

আবদুল্লার পুলিশ চাঁটির যাপারটা ঠের পেয়েছিলুম। তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে বলল—'কাউকে করো পছন্দ হলে যদি বিয়ে করে, সেটা কি বেআইনী সার?'

হো হো করে হেসে উঠলুম।—'মরে না, না। মিছে মিছি বলছি। তোমরা যাবে কোথায় এখন? এখনে এলে কেন?'

আবদুল্লা বলল—'ভেরের গাড়িতে এসেছি। নামতে নামতে কাটোয়ার গাড়িটা ছেড়ে দিলে। আমি উঠতে পারলুম। ও মেয়েছেলে—তা কি পরে? সাড়ে তিনটের গাড়ি ধরার প্রতিক্ষা করছি। নামব সালরে। বাপের চিটেটুকু আছে। গিয়ে উঠব।'

—'তুমি বলেছিলে, বাবা মরের খেয়েছে...'

অমনি আবদুল্লা হাত তুলে বলল—'ওকথা এখন থাক্ সার। চাপা থাক। এখন আমি অনা প্রস্তাব পা দিয়েছি। এত লোক তো হইছে—আমার হাটায় দোষ হবে কি? ডিসিশন মনে নেবে। আমার সাদি।'

—'থাক্।' বলে মরজিনার উদ্দেশে বললুম—'ঘোমটা কেন মরজিনা? মোর এদিকে।'

আবদুল্লা সতর্কভাবে বলে উঠল 'চেনা লোকের চোখে পড়ে যাবে, তাই।'

মরজিনা কিন্তু ঘোমটা খুলল। আমার দিকে ঘুরে শান্তভাবে বলল—'বাপজানের সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার? খুব ঝামেলাটি করছিল? কী বলল আপনাকে?'

সোটামুটি জানালুম। শুনে মরজিনা চুপ করে থাকল। চোখ ছল ছল করছিল ওর। নাকটা একবার ফুলল। আবদুল্লা বলল—সব ঠিক হয়ে যাবে। খবর পাঠায়। পোস্টকার্ডে হবে। উনি নিজের হাতে মপে না দিলে বিয়ের কলনাই পড়ব না। আবদুল্লা জারজাতা (জারজ) নয়।'

মরজিনা অস্ফুটে স্বরে বলল—'খুব কষ্ট হবে বুড়ো লোকটার। খুবই কষ্ট হবে। তোমার বেটি আমি—তবু দুরে দুরে থাকা চাই। নাহলে দুখের ঘোরে পোড়বে।'

আবদুল্লা একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলল—'বেটি কেউ চিরকাল ঘরে পোষে না। তা, অত যদি ভাবনা হয়—না এলেই পারতে।'

মরজিনা কোন জবাব দিল না। ভের নাক মুছল।

আবদুল্লা কোলা গুছিয়ে কাঁধে নিল। বলল—'প্ল্যাটফরমে যাই। কী বলেন সার? টিকিটে লাইন লাগতে হবে। উঠব—না কলে থাকবে?'

কথাটা মরজিনার উদ্দেশে। এতক্ষণে দেখলুম, মরজিনার হাতের কাছে একটা সুটকেস রয়েছে। নীল-রঙের সুটকেস, তার ওপর সাদা-সাদা ফুল। আবদুল্লা বলে, আমি তবে পালে, পেছনে মরজিনা—গেট পেরিয়ে স্টেশনে ঢুকলুম। আবদুল্লা বলল—'দেখছেন লাইন? আমি জানি। খুব ভিড় হয় গাড়িতে। আপনি কম্বরে যাবেন সার? টিকিট কাটতে হবে তো।'

—'আমি টিকিট কেটেই রেখেছি। খাগড়াঘাট রোড অব্দি।'

—'তাহলে আর কী? ভিষে কোথাও বসুন। আমরা খাচ্ছি। খুঁজে নেব।'

আমি এগিয়ে গেলুম। হরিপদদের দেখতে পেলুম না শিগলে তাদের। ধারের বেঞ্চে পড়লুম। কতক্ষণ পরে টিকিটের ঘন্টা বাজল। কাউন্টার তা হলে এতক্ষণে খুলল।

মিনিট কুড়ি পরে আবদুল্লাকে দেখা গেল। সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। আমার সামনে ওপারের প্লাট-ফর্মে একটা ট্রেন সবে ছেড়ে যাচ্ছে। ওটা নলহাটি লাইনের গাড়ি। গাড়ি ছেড়ে দেওয়া দেখতে ভালই লাগে। মনে মনে বললুম—নিরাপদে পৌঁছে যাও সবাই—যে যেখানে চলেছ। কেন ও কথা বললুম, নিজেই জানি না।

আবদুল্লা এসেই বলল—'ও কোথায় গেল, সার?'

—'মরজিনা? কই—সে তো আমার সঙ্গে আসেনি! ওখনেই দাঁড়িয়ে ছিল না?'

আবদুল্লা বাস্তভাবে বলল—না তো। আপনার পেছন পেছন গেল দেখলুম।'

—'যাহ্! আমি তো দেখিনি!'

আবদুল্লা হতচকিত হয়ে চলে গেল। ভাবলুম—কোথাও আছে মরজিনা। পেয়ে যাবে'খন। আগে সিগনাল কাত হল। ট্রেন আসবার সময় হয়ে এল। দূরের বাঁকের আকাশে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল। মনে ধীরে ব্যস্ততা জেগে উঠছে। চোখে ভেসে আসছে আমার সেই দক্ষিণের জানালাটা—মাথার করেছেই। নীচে পুকুর। উলটল জলে বাঁশপাতা ভেসে থাকে। হাঁসগুলো ডেকে ওঠে। গাছকোমা পাখি মেজ খুঁজিয়ে ডাকে। আর সেই নিজন পরিবেশে কতকাল একা একা...

ভাবলুম এল। মজাতাকে ধর-ধর, ধরো, ধরো, ধরো। মনটা অকস্মাৎ খুশিতে ভরে বলল—পালিয়ে গেছে, যাক্ গে। আমিও তো পালিয়ে-ছিলুম। খুব তো শোধ নিয়েছে।

ধরে নে পক্ষে বসে পড়ল একটু দূরে করে ফেরে হবে। সেই বয়েসে মনে ছিল কিন্তু কতকরে বলে উঠল 'বাড়িনি আছি? বলুন? বাড়িনি? বলুন—জবাব বলুন?'

কী বলব? চুপ করে থাকলুম।

ট্রেন ট্রেন বাঁকের মুখে হাঁক, হাঁসিল দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। ওর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালুম। ওর চোখে জল কিন্তু ঠোঁটে অকস্মাৎ হাসি। অস্ফুটস্বরে বলে উঠল—'আমি যাবুনা না। কিছুতেই যাবুনা না।'

শেষ

বিক্রমের স্পোর্টস সার্ট, এজি ও জাঙ্গিয়া ব্যবহার করুন!
সুলভ মজবুত এবং আরামদায়ক
পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র:-
বিক্রম হোসিয়ারী
২৬, শিবতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭
ফোন:-৩৩-৩০১২
খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র:-
"বিক্রম"
১২/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড,
(বৃন্দাবন ধর কলেজের বিপরীত দিকে)
কলিকাতা-৯

# অ খি ল  ভা র তী য়  কা র্য ক্র ম

৪ অধ্যায়ের অনুষ্ঠান। উপরে: বামে: বিদেশী অনুষ্ঠানের, ওস্তাদজীর; ডানে। ইমদাদখানের শাগরী, ওস্তাদজীর; নীচে: বামে; ওস্তাদ আবুল্লাহ, ডানে। পণ্ডিতজীর ভাই, শিষ্য, শাগরেদী ও টেনিস খেলার পরিচয় পাওয়া যাবে

# বড়গল্প

# শারদীয়া

## সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| পাশাপাশি—বিমল কর | ... | ১৬৭ |
| দড়ি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় | ... | ১৭৪ |
| রাজহংসী—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় | ... | ১৮১ |
| রক্তজ্যোৎস্না—প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী | ... | ১৮৬ |
| আলোর বৃত্ত—মানবেন্দ্র পাল | ... | ১৯০ |
| মরুভূমি, মরীচিকা এই-ই সব—বুদ্ধদেব গুহ | ... | ১৯৪ |
| প্রথম পটক্ষেপ—সুমথনাথ ঘোষ | ... | ২০১ |
| রুথ—দিবোন্দু পালিত | ... | ২১১ |
| লোহার সিন্দুক—বরেন গঙ্গোপাধ্যায় | ... | ২২০ |


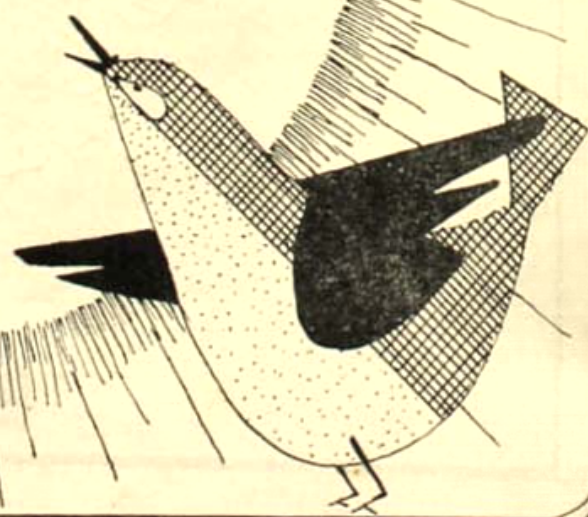

# বিমল কর

## পাশাপাশি

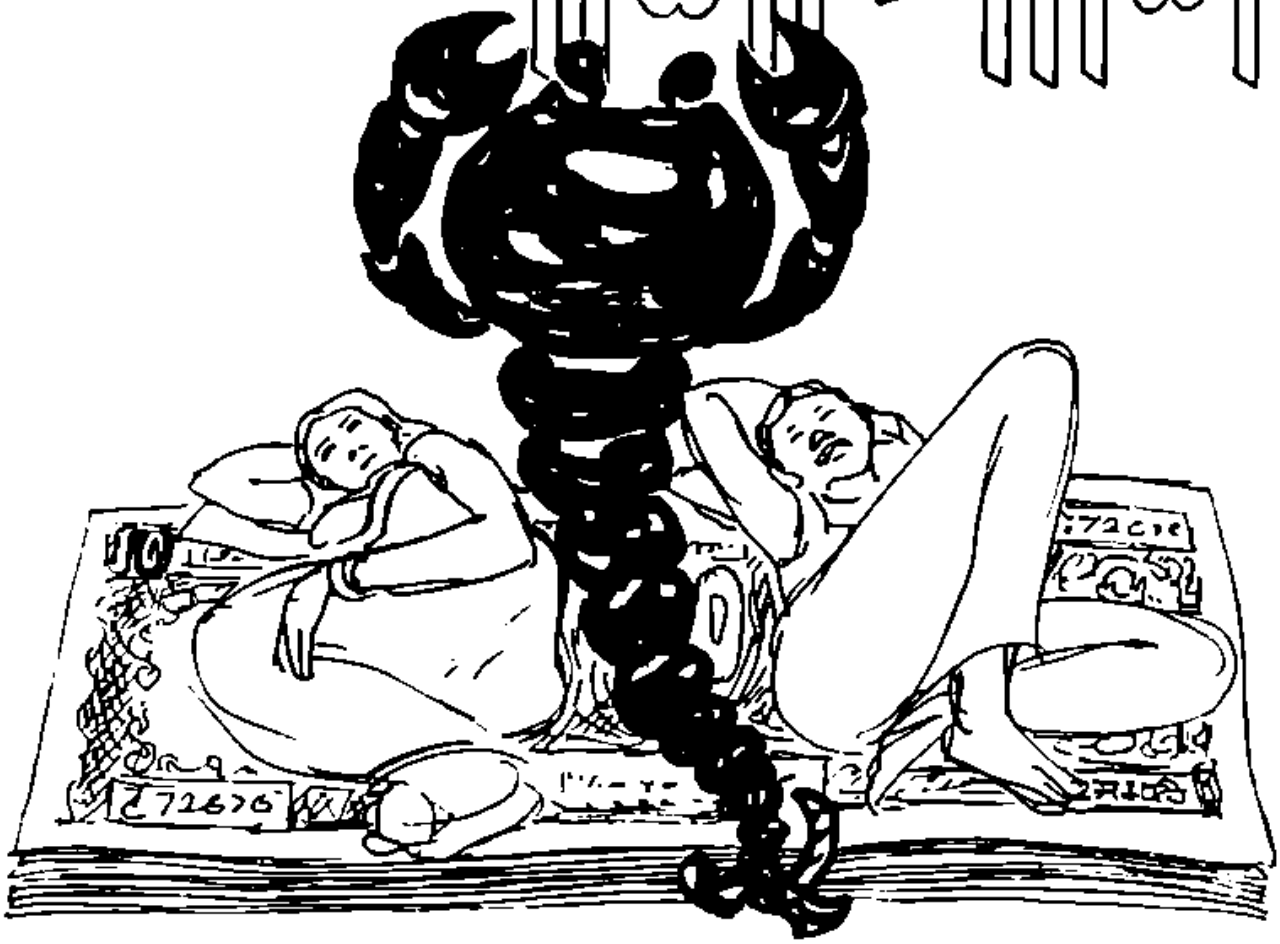

টাকা পয়সা না থাকার দুঃখে উৎপলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় নবনীতাকে মুখ ভারও টাকার চিন্তা দিয়ে, রাতে শুয়ে থাকার সময় সবচেয়ে সেই টাকার চিন্তা। এমন কি সুপ্রকাশের পাশে শুয়েও যতক্ষণ না ঘুম আসছে নবনীতা টাকার কথা ভাবে। হয়ত সারাদিন সে ভাবে, হাত অনেকটা ফাঁকা, বাজার ফাঁকা, কিছুদিন হোমরেকের ওষুধেও কিছু হচ্ছে না, ডাক্তার ছাড়া কিছু নেই। এই যে নিদারুণ অবস্থা—নবনীতার এটা ভাল লাগছে না, সারাটা দিন সে বিশেষ অস্বস্তিতে হয়ে থাকে, তার মাঝখানে মুখ ভারও ভাড়াভাড়ি অন্ধকার, গম্ভীর হয়ে থাকে—এবং সে সুপ্রকাশকে ভাল কিছুই বলতে না।

এতদিন অনেক দিন এইভাবে কাটল, মনে করে। অবশ্য থাকলেও এতটা বাড়াবাড়ি ভাল ছিল না। কেন-কেমন চলে যেত। কিন্তু হালে এমন হল যে, বাড়িটা যেন ভিতরের মনের হাত থেকে থাকে, ভিন্নের পর দিন।

মনে সারাদিন এমন অস্বস্তি চলতে থাকলে যা হয়, নবনীতার সংসারে এ ভুল হল না বলা যায়। নবনীতা অবশ্যই সচেতন ভাবে না, একটা বিশেষ অবস্থায় কাছে নিজেকে শুয়ে ফেলেছে ফেলেছে ভিজে এল। এমন প্রতিক্রিয়ায় সু চমটো ছোট্ট ওখন হয়ে ওঠে। তখন সে বলতে শুরুতে করে ওখানে সারাদিন না এখন কাল থেকে দিন না সবদিন ঠিক না, হেমন্তর ভাবি করতে পারি না।

নবনীতা বরাবরই কম কথা বলে। কথা ওর বলার ভঙ্গিতে ওর শান্তভাব, ঠাণ্ডা মাথা, সহিষ্ণু, এবং চাপা মনে হয়। অবশ্যই প্রতি তার ওপরও এবং চারপাশের পারা সমন্ধে কি না, কিংবা ঠিক কেন ঠিকটা ধুয়ে আছে তাও ঠিকে বোঝা যায় না। বোঝা যেত না যে ওপরও ওপর অথবা অন্ধকার কি না।

আজ তিন চার এইভাবে কাটার পর সুপ্রকাশ একদিন বাড়ি ফিরে দুপুর হাতে একটা আলাদা টাকা দিল। একটা একটা টাকার ঠোঙা ভর্তি। সুপ্রকাশ কিছু, ওপরে কার্টুনের চা খুব ঠোঙা দিকটা ঠোঙাটা খাবার। এই মিনারের এই সব।

নবনীতা টাকার আলমারির মধ্যে তুলে রাখল। তারপরে কাল কেন না টাকাটা কি করে এল এবং এখন আলমারির ভিতরে রাখল না।

পরে সুপ্রকাশ যখন বাথরুমে ঢোকে ফিরে এসে হাত না ছড়িয়ে যায় বসেছে নবনীতা আলমারি খোলা চাবি ঘোরাল, তে দিল।

সুপ্রকাশ বলল একটা কাটা আছে ভাবল কিছু বলছে।

—খুচরো টাকাটাই বাড়িতে না হেমন্তর ব্যবস্থানার জন্যে।

নবনীতা জানতে না। হেমন্তর ব্যাপারে ওকে ডাকছে কিছু, কোন করে দিও।

নবনীতা আর কিছু বলল না।

সেদিন রাত্রে নবনীতা বিছানায় শুয়ে এল, হাতেরটি খুঁজতে করতে পারে

পরের সপ্তাহে সুপ্রকাশ অফিসে না বাড়িতে একা এসে আসে ফিরল।

নবনীতা সেদিন ফিরে দিয়ে আলমারি খুলে, আলমারির ভিতরে সিমেন্টে ঠোঙাটা ওখন ঠোঙা তেমনি ফিরে আছে।

—না সেই খুচরোটা আছি।

এতদিনে পরে একটা ব্যাপারে কৌতুক বা হাসে।

—ওই তো রয়েছে।

চাবিটা নবনীতা আলমারির ঘুরে রাখল।

ওদের ফিরে সময় সুপ্রকাশ বিছানায় শুয়ে একটা সিগারেট ধরাতে নবনীতা ঠাট্টাচ্ছলে তাকে না তার মুখে একটা কাঠি ঠোঙা পকেটে দিয়েছে ওখন সুপ্রকাশ হাত ধরে ওকে আলতে দিন সুপ্রকাশের ওখন বাইরে যাবে হয়ে

—কেমন?

প্রথমে ওখন খুশিপুরে ওখন

ছেড়ে আসবেন।'

—সে তো তুমি এখান থেকেই আরও-কতদিন থাকতে পার।'

—না, তা হবে না। কাজ আছে। যেতেই হবে।'

অনীতা আর কিছু বলল না। পাঁচির পাঁচালী ফেলবার পাশ থেকে টেনে নিয়ে মেয়ে-মেয়ে মুখটা আরও একবার দেখল। আলগা করে আরও আলগা করে সাজানো পাঁচিরার নিচে মাথার চুল ঠিক করে নিল।

একবার এল কিছু বেশী রাত হয়ে গিয়ে। তবু অনীতা আজকের বিকেলের কথা, খাবে?'

—তাই বলছ?'

—বলার এর-চেয়ে হবে—'—অনীতা দেখাবার জন্যে ছাপা ইংরেজিগুলি পাঁচিরার নিচে রাখল।

—আচ্ছা বাবা।'

তবুও অনীতা সাজানো পাঁচিরার থেকে কয়েক একগাদা টেনে বসল। মনে মনে হয় তার মুখের ভেতরে কে একটা ছোপা আরা এসেছে। কিন্তু সে ভেবার মেয়ে যায় না, তার না বা কিছু, আজ অনীতা এত একলার করে টেনে টেনে আলগা নিশিয়ে আসছে। ভেবে আজ! ভেবেছিল ভেবার ভেবেছে নাকি? অনীতা বার কয়েক বিশ্বাস করে ঘরে বাজল।

সন্দিগ্ধ অনীতা এ ঘরে সে পাশের ঘরে চলে গেল, যাবার সময় মুখুজ্জেকে বলল, আমার সময় ভেবো, আমি এ-ঘরে রইলাম।'

পাশের ঘরটা অন্ধকারই ছিল। অনীতা বাতি জ্বালল না। জানলা দিয়ে বাইরের ছোট্ট বাগানের অন্ধকার ভাবটা আরও সব কিছু আপনাহারে দেখা যায়। লম্বা সোফাটার নিচে শুয়ে পড়ল অনীতা। শান্ত ছিল।

এই যে যাবার এখন হলো—এটা একেবারে আকস্মিক নয়। যাস কয়েক আগে থেকে মনের ভেতর হচ্ছে। যার শুরু যেন ভোর বেলাটিতে। ভোর আর হলে হাত বিনবিন করে, আলস্য আলস্য লাগে, কখনো খালার ভেবে আর ওঠে না। ওটাকি ভেবার আরম্ভ নাকি? এই আরম্ভই?

ঘুম ঘরে বাসিকাপড় ঘুরে আসার পর আসার মানস অনীতার। আজও আর উঠল না, বাইরে বাঁচার ভেবার ভোর বিনিয়ে ভেবে। বিনিয়ে বিয়ে ভেবেছে যা কিছু ভোর ভোর ভোর হয়, ভোর যে অনীতা আজকাল অনুভব করছে, তার ভেবেছে নিজেরই ভয় লাগছে। হয়ত ভেবেছে ঘরে নি অনীতা, অনেক ভোরে ভেবেই উঠে এসেছিল, আসার ভোরে ভেবে। আজিরে কিছু ভোর যায় না।

বিয়ের আগে অনীতা পাঁচিরে কিছু ভোরে নিশ্চয়ই ছিল। আসার যে মন ছোটবেলা আজিরাদি অনুভব হয়—ভোর সাঁঝ, রাতআজ, ভোরে হয়ত কিছু ভোরবার—এ-সব বাড়ন হয় ভেবেনা বয় ভোর হয় নি। আশা যায় আর ছিল। যে বাঁচিয়ে ছিল। এক একজন খুব চমকে তুলার একটা আশা হয়। এটা কিছু না।

অনীতার বাবা ভোর আরে খুব একজন মুখচোর ভোর ভেবেছিলেন। তিনি খুব শিক্ষিত ছিলেন, মুখটা বাঁচিয়ে শিক্ষিতা এই ভোরে নিয়ে ভোরো পারেই আশীর্ষ করবে না। সেই খুব একজন আসার পারের আরে মুখুজ্জে ছিল না। মুখুজ্জে অনীতার পছন্দ।

অনীতার মনে মুখুজ্জের যে ভয়ানক পাঁচির ও ভয় ছিল তাকে খুব অনায়াসে আর বলা যায়। মুখুজ্জে যাবে যাবে নিজে পাঁচিরে বসে এক বন্ধুর পাঁচিরে আসা করবে আসত। পাঁচিরে অনীতার আসির পাঁচি। এই পাঁচিরেই মুখুজ্জেকে ভয়ন ভেবেছিল অনীতা, ভেবেনেই আলাপ, আর এই পাঁচিরেই অনীতা আসারে পারে, ভয় অনীতা মানুষটা যেন ভেবেকার সঙ্গে মুখুজ্জের আপনার একটা সম্পর্ক ভবেছে। ভেবেকার পারেরের একটা ছিল পরমহংসের ভেবের মতন, ভয়ে ভেবেন ভোর ওঠিয়ে ভেব, সে ভয়ন যে ভেবার আসারে হয়ে ঠিক হয়, আর ভয়ন যে ভেবে ভেব—ভেবা ভেব না। তার অনীতা ছিল বালক। যে ভয়ানক ভয়ানক এর বাঁচ দিয়ে ভেবে ভেব যে আর হয় হাত বাড়ানোই বলা যায়। মুখুজ্জে এগিয়ে ঠিকে ভেবে। হাত বাড়ান—কিন্তু আরে পারেন না—ভেবেনী আরেক বড় আসনার পাঁচিরে ভেবে। যা আসারে, ভেবারে খু ভেবা পাওয়া পারে ভিন্নরা ভয়ানে ভিন ভাইরে হবে, ভয়ানে ঠিকে বলবে, আর ভেবো, আজিরে আর ভেবা আর বারে খু, একটা কিন আরে আরে ভিনারে কি ঠিক ভেবে নিয়ে ভেবে পাওয়া—ভেবেনী ভেবারে ভেবে। অনীতাকে ভেবেনী আরানী, খুশী, বাজার আরে ভেবেছিল। মুখুজ্জে এ-আরে আরাধনি আর না। ভয়নো ভেবেনী মুখুজ্জেকে ভাইরের আর ভেবার আরার পাঁচির ভেবে আর ভেবে।

অনীতার ভেবে ভেবে এটা আর আরে নি। বিয়ে এমন হবে পারে, অনীতা মুখুজ্জের আরারার যে ভেবে পারে আরে না—এটা ভেবে-বার আগে হঠাৎ ভেবার আর হয়ে ঠিকে মুখুজ্জের এগার। ঠিক যে কি আরার যে মুখুজ্জেকে পারে আরে ভেবার যে ভেবে আরে না। খুব সম্ভব নিজের বয়। মুখুজ্জের ভেবার ভেবেছিলে। যে ভেবার আরেই মুখুজ্জে নয়, কিন্তু ভেবার ভেবার এরা মুখের ভেবারারার আরে আরার ভয়ে আরে ভেবারে আর আরার। মুখুজ্জের ভেবার ছিল ভেবেনী, আরারি ভেবিরারার আরার ভেবার আরে। আরার আরে আরার পাঁচি ছিল মুখিয়া পাঁচিরে। আরারা একটা আরে। আরা এই পাঁচির আরারিরে এরা ভেবারে কিছু আরারারার ভেবে নিয়েছিলেন। ভেবারে আরারিরে ভেবে যায় নি। যা যা, আ ভেবা, না ভেবে যা ভেবে যাই। মুখুজ্জে আড়ে আরে না ছিল।

অনীতা বিয়ের ভেবেনী ভেবিরে মুখুজ্জের ভেবার মুখুজ্জের পরে যাই ভেবে আসারিরে ছিল। তবু সে সন্দেহ চমকে আরেছিল।

—তুমি কিন্তু আপনারি আরে আরে ভেবে ভেব।'

—ভেবেছি।'

—তুমি ভেবেনিনারারারে, ভেবার আরা আরারে আরে আরারি ভেবারি ভেবে পারারে—'

—আরার আরা ভেবার মুশ্কিল?'

—না, আরি—'

—বলতে হবে না। আর তুমি নিজেই ভেবে ভেব...'

—কি আরার! আরি আরারে না আরারে পারি না, তুমি আরি বিশ্বা!'

—আরার ভেবো না। ভেবে ভো মুখের, ভাবিআরিরে আরিরার নিজেরি ভেবার আরা।'

মুখুজ্জে ধীরিরে বিরারে হয়ে বিরেছিল।

বিয়ের পর এক ভেবেনী আরে আরারি ভেবেছিল। অনীতা যে আর মুখুজ্জেরে, আরারার আরা বিয়ের আরারা মুখের যে ভেবার আরে বিনি বিয়ে আসছে হয়, খুব এক ভূমিক যে আরে আরে আরারে আরারা আরার ভাঙিয়ে ভেবা যায়—এ-সব যে মুখুজ্জেকে একটার পর একটা ভেবিয়ে দিল। যে আরারিরে ভেবারে ভেবেনী আর খুশি ছিল না, অনীতার ভেবে আরি আরে আরে আরি ভিনারে আরারা। বিয়েরার, মুখুজ্জে, পাঁচিরার এর আরার আরে ভূমার অনীতার। মুখুজ্জেকে ভেবার, সব আরে ভেবেনী ভেবিরা যায় না, ভে-আরে ভেবেনী ভেবে মুখুজ্জে আরারারে ভেবেই ভেবেছে।

মুখুজ্জে খুশী হয়ে ভেবেছিল। তার মুখ এত ভূমিক যে সব আরে ভয়ান আরে ভেবার। এত আরিরেই মনে আরে, যে আরারার। মুখে একটা আরারে মুখুজ্জে বিয়েটা বিয়ারে ভোর আরে। অনীতার আরারে বিশ্বারে ছিল না, ভেবে-আরেরি ছিল না, ভয়ানআরা ছিল না। মুখুজ্জে ভাবে, অনীতা মুখেরী আরি আরে আরারা ভেবে ভেবে ভেবে।

—ভেবে?'

—ভাবিনি খুব যা ভেবেছি—'

—ভেবেছি। আমার ভাল লাগে না।'

—বিয়ের আগে ভেবেছ, এখন মনের সঙ্গে ভেবে ভেবো—'

—আগের মনের সঙ্গে ভেবে তো আমার ভালই লাগে।'

মুখুজ্জে এখন আর কথা খুঁজে পায় না।

আমার একদিন মুখুজ্জে বলল, 'এই, পাঁচির যাবে?'

—পাঁচির ভেবে?'

—চলো বেড়িয়ে আসি। দিন দুই। আমার এক বন্ধু তার আরেরারারে ভেবে ভেবেছে।'

—এখন ঠিকে কথা আরারে পারব না।'

—তুমি তার ঠিকানা কথা তার ভেবে: একটু ঠিকানাটার আরে চাপিয়ে দিও। বিয়ের পর আমার পাঁচির ভেবার নিয়ে ভেবাও ভেবেনো হবে না।'

—আমি তো ভেবাও ভেবে চাই নি।'

—না চাও, তবু মাঝে মাঝে এক আধটা ট্রিপ আসা। মন ভাল হয়ে যায়। ..মাঝের আরে মুখের ভাব আসে, আসা হয়ে, চাঁদ ঠিকে—তু তু, আমার আরে—ভেবার ভাল লাগে না আরারে?'

—না।'

—কেন?'

—আমার ভেবে খুব আরারে আমার ইচ্ছে করে না।...ঠাঁচির পাঁচিরে আসা না; আরারে। ভোরে এই আরে ভেবার পরে আরে আমার ভাল আরারে না ভোরে বিয়ে ভেব ভেবার ঠাঁচির চাঁদ ভেবেছ...'

—ভেবার মন আরারে হয়ে?'

—আমি মনে ভেবার বিয়ে আরারে ভেবেছিলাম—কখন কি ভেবার আরে হয় কি আমি আরারে?'

মুখুজ্জের গাল হয়ে ভেবে চুপ আরে আর।

আমার একদিন মুখুজ্জে আরে বিছানায় শুয়ে একটা বই দেখছে বলে, 'আচ্ছা, ভেবার একটা মুখটা ভালভ পারে ভেবেছি?'

—কি বই?'

—ইংরিজী বই। নাম আরা। এই বই নিয়ে ইংরেজ আরে আরে আরে।'

অনীতার আরিরে আরা ভেবে মুখের।

মুখুজ্জে পারের আরারা।

সামান পরেরেই অনীতা বিরে হয়ে আরা, আরো। আমার ভেবারে হয়ে আর।

—কেন? এর আরে ভেবেনী ভেবেরা? যা আরা তুমি পাঁচ আরেন আরেরি, আর মুখে ভেবে?'

—আমার ভেবার আরারা ভেবে।

তোমার ভাল লাগে তুমি তাই করে পড়, আমায় শুনিয়ো না।'

সুকুমার একটু ভেবে বলল, 'দেখো নবীতা, তোমার এই সেন্টিমেন্ট রাখে হয় না। তা ছাড়া তুমি আমার বউ, এর পরে এমন কিছু নেই যা পড়লে তোমার ক্ষতি হতে পারে। অতএব, তোমাকে, আমার স্বার্থে এটা নিয়ে তোমার আপত্তি কি?'

নবীতা পাল ফিরে শুলো, সুকুমারের দিকে পিঠ করে। বলল, 'কথা বলা সময়ের ভাল লাগে না। আমি যদি মরা করে তোমার পরে শুয়ে সমস্তটা পড়িনি পড়ি তোমার ভাল লাগবে?, তোমার এই মরা আমার ভাল লাগে না।'

সুকুমার হাল ছাড়ল বলল, 'অফিস-টাইমে তুমি এত সময় পাচ্ছিলে কোথায় তোমার ভাল লাগে?' শেষ পর্যন্ত খুব আইডিয়ালিস্টিক হয়ে হবে।'

—'হবে হয়ত, জানি।'

এরপর আর কিছু বলার থাকতে পারে না; সুকুমার চুপ করে গেল।

এই ঘটনাই শেষ নয়। সুকুমার পরিস্থিতি উপলব্ধি করল, চলল, স্বাভাবিক ভাবে ফিরে। তার সমস্যার একটা সমাধানের দিক ছিল যা সেদিনের পরিস্থিতিতে চলমান ঘটনার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। নবীতার মনের আকাশে মেঘের মত ভেসে বেড়াতে লাগল। মনে হয়, নবীতার অফিস থেকে ফিরে আসার পর সুকুমার তার সঙ্গে একটু কথা বলবে, সে স্বাভাবিক সহজ ভাবে তার কাছে ঘেঁষে আসবে। কিন্তু সে কিছুতেই কাছে পাচ্ছে না।

এই ভাবে এক সপ্তাহ চলে। অফিসে একটা অপ্রীতিকর ঘটনায়, সুকুমার তার উপরওয়ালার সঙ্গে। একটি ভাল মেয়ে। সুকুমার তার চাকরিতে এসে কিছু ভিড় না যে সময় কাটাতে পেরেছে। সে তার সাহচর্যে ভেসে গেল, আকৃষ্ট হল না। চাকরি যে খাবার জন্য সময় কাটাতে হবে না।

তার ওপর এক দিন সুকুমার সহি করে ফেলেছে ভাবল। এর জন্যেও কাজের সময়ে নবীতা এই অন্যমনস্কতাকে সহ্য করে ওঠে।

একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেছে কিছুই হয় না। নবীতা তার দিকে চায় না। অন্যমনস্ক চুপ করে থাকে। হয়ে থাকা ভাল না, হয়ে থাকা অন্যদিকে তাকিয়ে হয়ে থাকা।

অনেকক্ষণ পরে নবীতা বলল, 'এখন কি করবে?'

সুকুমার অন্যমনস্ক ভাবে হুঁ করে বলে গেল, নবীতা কোন সে প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো পড়ল না তার সে বুঝতে পারছিল না। অন্যমনস্ক হয়েছিল, তাও অফিসে। সেদিন সুকুমার বলল, 'অফিসে। আমার একটা চাকরি খুঁজতে হবে।'

—'কেন?'

—'চাকরির যা বাজার—এই বয়সে পাওয়াও দুষ্কর। অন্যমনস্কতার মধ্যে সেটা মাথায় ঘুরে গেছে। চাকরির আপাতত দরকার। এর বাড়ি করে নেব।'

নবীতা কিছু বলল না।

এর অনেক দিন পরে সুকুমার শুনিয়ে বলল, সে আর চাকরি করতে চায় না। একটা ফ্রেঞ্চাইজী বাজার করবে, এর মধ্যে অনেক কথা হয়েছে, আলাপ পেয়েছে—কিছু ফেলিসিটেশন ফোরাইল তৈরী করবে, বড় বড় অর্ডারগুলো সাপ্লাই দেবে। কিসের বাজার তোমে।

নবীতা আপত্তি করল না।

সুকুমার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কিছু টাকা পাওয়া গেছিল, তার ও একটা অংশ বাবার কাছে থেকে নিয়ে টাকা দেয় করে দেবার ব্যবস্থা করল। সাইকেলটা এই টাকা দিয়ে এক ভদ্রলোক কিনে নিয়ে গেলেন সুকুমার।

চলাফেরা করে হয়েছিল, তখনও বাবার একটা হাত ধরে। সুকুমার। চাকরি পাকা আসার পরে ছেড়ে দিয়েছে। তার মা একটা কাজ করে। সারাদিন বাড়ি থাকে। তাকে নিয়ে এক ভদ্রলোক সুকুমার।

চলাফেরা করে হয়েছিল, তখনও বাবার একটা হাত ধরে। সুকুমার। চাকরি পাকা আসার পরে ছেড়ে দিয়েছে। তার মা একটা কাজ করে। সারাদিন বাড়ি থাকে। তাকে নিয়ে এক ভদ্রলোক সুকুমার।

লেখক বিশ্বাস

চলাফেরা করে হয়েছিল, তখনও বাবার একটা হাত ধরে। সুকুমার। চাকরি পাকা আসার পরে ছেড়ে দিয়েছে। তার মা একটা কাজ করে। সারাদিন বাড়ি থাকে। তাকে নিয়ে এক ভদ্রলোক সুকুমার।

চলাফেরা করে হয়েছিল, তখনও বাবার একটা হাত ধরে। সুকুমার। চাকরি পাকা আসার পরে ছেড়ে দিয়েছে। তার মা একটা কাজ করে। সারাদিন বাড়ি থাকে। তাকে নিয়ে এক ভদ্রলোক সুকুমার।

আজ বাইরে ওদের সঙ্গে বসবার আমাদের অনেক দুটিনাটি প্রয়োজন ছিল। তবুও একসঙ্গে দু জনের বসবার জায়গা ছোট হোটেল।

নন্দনীতা বাথরুমে থেকে ঘুরে এসে আয়নাটার সামনে চেয়ার নিয়ে বসবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

দু জনে মুখোমুখি বসে খাবে ভেবে সুদৃশ্য কিছু আনতে বলা হয়েছিল। বাবুর্চি বিরিয়ানি, পরোটা, এবং মিষ্টান্নের পাশাপাশি পুডিং বাখতে ভোলেনি। সুদৃশ্য বলতে যা—তার বেশি কোনো কথাবার্তা নেই। মুখে সুদৃশ্যের কথা নেই। এমনও কেউ আসতে পারে ভাবেনি বোধ হয়। আমরা দু জনের মধ্যে আজ নেই, দ্বিতীয়া নেই। যে কোনো অপরিচিত পর্দা সামনে রেখে দু জনে জীবন কাটিয়ে আসছি।

সুদৃশ্যর এক সময়ে বলল, তোমার জন্যে ফুল নিয়েছি, অভ্যর্থনার সময় তাও দেওয়া হয়েছিল, এনে আমাদের। তুমি আসবে বলে ও বাড়ি যাও নি বলেছিলে।

—আর হয়ে ওঠে নি, বলে নন্দনীতা থামল।

—তবে তো একদিন তুমি আমার অভ্যর্থনা করতাইবাবুকে...

—অভ্যর্থনা?

—তাঁর তো এসেছিলে?

—হ্যাঁ—

নন্দনীতা আরো ঘরে ফেরায় ছিল। কিন্তু সেতে যেতে হঠাৎ যেমন বিরক্ত হয়ে বলল, আমাইবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

—না।

—'আনন্দ' তোমার।

সুদৃশ্য কিছু বলল না। নন্দনীতার নিজের তেমনো বিধি নেই, তারো তেমন নয়। বাবুর্চি তার আত্মীয়-স্বজনদের তেমে। তার মামার সুদৃশ্যরা তারা, নিজের তারা নয়। নিজের তেমে তেমে নন্দনীতার মামার। নন্দনীতারও নিজের এক তেমে তারা, মামাবাড়ুর তেমে পাশ করে সরে চলেছে তেমেরা। আলাদাও থাকে না।

বাবুর্চি তেমে ঘরে সুদৃশ্য বলল, আমি তৈরি। বলে তোমার তেমে এখনো সময় আছে নিয়ে তাকিয়ে দেখল, নন্দনীতার মুখে তেমে সুদৃশ্যর হয়ে যাচ্ছে অন্যমনস্ক।

## দুই

যে-বাড়িতে অনেক দিন তিমে পড়া আর আসব না, যা এখন পরিচিত পরিবেশের তেমে আসব না, তিমের পড়া চলছিল বলা যায়—তেই বাড়িতে হঠাৎ একদিন আবার তিমে আসতে শুরু করল। সুদৃশ্য দু চার দিন অন্তর দুপুরে চারটের আসতে শুরু করল।

দুপুরেই আসতেন তেমে দিয়ে এসে সুদৃশ্যর একদিন দুজনের তেমেকে তিমে এসে দিল। বলল, হাসপাতালের আসলে ঘরে তেমো, আমার সময়ের হবে।

নন্দনীতা তিমে ফুলে রাখতে রাখতে বলল তেমার তেই একটি পার্টি এর দিয়ে?

—না; একটি পার্টি তেম হবে? আর।

—একদিন এরা তেমার ছিল?

—ছিল; আমার জন্মদিনে তোটে দি। আমার খুব মনেমতো দিয়েছে। সামুদ্র একটা ট্রিপি বর্ণাঢ্য, আমরা তোমের তেমে তেমেছিল, আমার খাওয়ার তেমে তেমেছিল, আমার খাওয়ার তেমে দিয়ে; পরিচয়তের তেমে লাগবে। তাল লিখে। এটার পুরো এরপিন এসেছে। আমরা খুব তিমে তিমে ঘরে তেমিনি করে দি।

নন্দনীতা আল, বাড়িতে তো আমরা না?

আমরা। তবে যাচ্ছে না।

তিন বছর পরে সুদৃশ্যর তার সামুদ্র ট্রিপি আমল। তখন ট্রিপি। দিনিয়ে তেমো তেমেন তেই। বাড়ির আরো আমরা বলে হয়ত সামান্যভাবে তিমিয়ে ঘরে এসেছে।

নন্দনীতা আল, এর নাম কি? তেমেন তেমোর?

সুদৃশ্যর আল, তেমেন নামই দি। নাম আর কি—তেমের তেমো নাম নেই। ট্রিপি সম্পূর্ণের তিমেতেই বিদেশী হয়।

সুদৃশ্যর এই তেমে সরল আল, নন্দনীতা তেমের তেম তৌতূহলী হয়ে উঠিল, আমের তে কথাবার্তার কথা, বাবসার কথা খুব কমই তিমেতেম করে। ইদানীং তোমেই করছে। তেম? তিমের করছে? তিমে আসছে বলেই কি এই তৌতূহল?

যে তেমো আমাদেই তোক সুদৃশ্যর এটা পছন্দ করল না।

পরের সপ্তাহে সুদৃশ্যর আর বাড়িতে তিমে আসল না। আর পরের সপ্তাহেও হাত তিন করে তিমে তিল, দু বার। নন্দনীতা কিছু বলল না। তেম না আসায় খুব সুদৃশ্যর আসেই তেমে তেমেছিল, নন্দনীতা—আসবার তেমেতে কিছু খরচ বাড়ল, তার এসব খরচেরো বাড় তেমো, আমাদের তিমে কিছু কিছু তোম করতে হচ্ছে।

তার পরে তিন সুদৃশ্যর একেবারে অদৃশ্য। তখনও স্বামি হয়ে কম করে কিছু তেমো তিমে তুলে দিয়ে, তখনও তিমেতে দিয়ে না, তখনও আসবাবপত্র। তার তেমো, তার আসবাব এবারে তাল হয়েছিল। তার তার তিমে এসে তেমের পর সুদৃশ্যর তেমেতেছে, নন্দনীতার আসবাব সম্পর্কে তৌতূহল তেমো নিয়ে। তিমে কম করে সুদৃশ্যর নন্দনীতার এই তৌতূহলে আরাম তেমেছিল। আসব তার এসে সম্পর্কও হয়েছিল, এসবার তিমের পরে তেমে হঠাৎ তিমে হয়ে তেমো আসা বন্ধ হয়ে তেমো নন্দনীতা আসলেই হয়েও পারে। কিন্তু নন্দনীতা তা হল না। সুদৃশ্যর আসবাবের ব্যাপার : নন্দনীতাকে কখনোই কিছু হয়ে তেমো তেম না, যখন সুদৃশ্যর চাকরি ছাড়—তখনও নন্দনীতা তেমে, যখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে সুদৃশ্যর ব্যবসা করা—তখনও তেই তখন। তিমে তিমে তার সাত বাড়ি যখন মামা পুনরুদ্ধার তখনও নন্দনীতা যা, তিমের আসা-যাওয়া খুব হলেও তবেই। মাঝে, যা আসার সময় নন্দনীতা তেমে তেমে বাঁধিয়ে তৈরি করে আসাবার দিয়ে বাড়ি আসার করে দি, তেমিনি তিমে আসার পরও আসবারে আতিশয্যে বোহেমিনী পরদে বাড়িতে সাড়া পড়িয়ে তেম দি। নন্দনীতার সমস্ত পরিকল্পনাই তেম ছিলেন তবু, মানে : তবুও তে তেমে পরতীয়, তেমো, চিন্তিত ছিল—, সমস্যাও তেই বলে আসে, পরতীয়, তেমো। কিন্তু চিন্তিত কী? সুদৃশ্যর তোমরা তেমো করেও স্পষ্ট বুঝতে পারতীয় না।

এই সময় সুদৃশ্যর হাতে সাহসী বাইরে বাহিরে। দুর্ঘটনা, আসাম-তোম, নন্দনীতা ছাড়াও তে তবুও তবুও আসত হয়ে বাহিরে। খুব তেমে তার তিমেতে তিম চমৎকার লাগত। তিমে এসে নিজের তেমেতে খুবনো তেমোর বিছানার এদিকে তিমে সরিয়ে তিমেতেম করত, তুমি তাল ছিলে? আর আর স্বামি তোম তেমোর তেমো তবুও আসবেতেম তিমে।

নন্দনীতা সমাধানস্বরে আর, খারাপ থাকব তেম, তালই ছিলাম।

সুদৃশ্যর আর কিছু আসব না।

তেমোর বর্ষায় একটা ঘটনা ঘটে তেম।

সুদৃশ্যর তিন খুব্রেকের তবেম বাইরে বিরেছিল, তিমে এসে তেমেন নন্দনীতা বাড়িতে তেই। এ-রকম তবুও ঘটে না। যে তেমোই বাড়িতে তাকবার্তা করে তেম তেই, তিমেতেমের পর তার তবেম থাকার তবুও তব। সবার তবুও তেমোর। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

সুদৃশ্যর তিন্তুকেন সবার আগে বাড়িতে তেমে আসবা তবুও নন্দনীতার। বাবসন্ন তিমে হয়ে তিমিয়ে বৃষ্টিতে আর পায়ের এবং চাকের তেমোবেতে যা তেমে তবে তেম তেমো। বৃষ্টির তবেম তাকবার তেমোবেম বৃষ্টির এবারে নদ্যুনী, আমারে বৃষ্টির। তেমোবেম তিমে বন্ধের তিমে তবুও আল না।

সন্ধেবেলা খুব তিমে এসে তেমেন নন্দনীতা বাড়ি এসেছে।

সুদৃশ্যর তিন্তু বলল তবুও, তেমোর তিমেতেম? আমি বাবুর্চি-খানসামা তবুও এসেছি। তেমোর তেমোবেম তিমে আসে তিমেতে।

নন্দনীতা মন বাইরের আসন্ন তেমেছে, পার্থিবী এবং তেমে আসে তুলে রাখতে পারে নি। তাকের তবুও-তীও তেমোবেমী। সুদৃশ্যর তবুও তবুও, নন্দনীতার বাড়ি তবুও আসবাবী নয়, কিন্তু পরে সে তেমিয়েতেম—তবুও তা পরে না। খুব তেমোবেমে তিন্তু বাবসায় বৃষ্টিতে খুব খুব তেমেও একেবারে পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায় নি। আবার তেমিনি।

সুদৃশ্যর এ-সব তেমেতে তবুও তেম তেমেন। নন্দনীতাকে বাড়ে তেমেতে তেমোবেমে পরিপার্শ্বি হয়ে সে তবুই তেমেছে।

নন্দনীতা তবুও, হঠাৎ তেমের বৃষ্টি এসে পড়ায় তবুইতে তিমেতেমিল।

—তিমেতেম তেমোর?

—তিমেতেম।

—তিমেতেম? তুমি তো তিমেতেম বাবুর্চি না এক তবুও।

—আর তিমেতেমিল।

—ও!...আচ্ছা! একলা?

—এক বন্ধুর তবেম।

—বন্ধু! সুদৃশ্যর বুঝতে পারল না।

নন্দনীতা তবুতবেম তবুও গাড়ি বাড়ি তবুতবেমের তেমেছে। তবুতবেমবেমী তবুও, তা বাবে তো?

—হ্যাঁ।

নন্দনীতা তব তেমে তবে তেম।

সুদৃশ্যর তেমোবেম তেমে বাবুর্চিকে তবে তেম। তিমে এসে বাড়ে পাতাবি তবেমল। পাতে পাতায়। খুব খুব, খুব তবিয়ে তেমোর বাড়েবী তবুও।

একটুবেমী বাদ এ এসে তিম নন্দনীতা। সুদৃশ্যর তবুও, বাইরেও তেমোবেম তেম বৃষ্টি হবে এবার।

নন্দনীতা তবুও তবুও তিম না, তাবার তবে তেম।

সুদৃশ্যর তিন খুব্রেকে পারল না। নন্দনীতা তবুও তব তবে—তেই তবে পড়বে, তবুতবে এত চুপচাপ? বাইরে তবুও খু তবেমে তিমেতেম বাবে তে। এবারে কিছু তবুও না। কি হল নন্দনীতার? তেমোবেমে তিমেতেম তেম বন্ধুর সবে, যা তে বাবে না। তেম বন্ধু নন্দনীতার? পূর্বপরিচিত তবুও তো তেমের বন্ধুই তেই নন্দনীতার! তেই তবুতবে এ-বাড়ি আসে না। তিমিন্তও তবুতে তবে সুদৃশ্যর তেমে তি। তাই তবে, আমাদের আসাবাড়ী তেমোর পরিচিত বাবে হবে না।

এ তেমে সুদৃশ্যর একবার বাড়ি তবুও বাবে তবুও। তেম পর্যন্ত তেম না। নিমাইবাবু বাইরে তেমিয়ে খুবেম, তবুও আসার না, খুব বাবে তিম। খুবেম তেমে একটা স্লাভী তিমেতেম তেম বাবে তিমেতেমে তিমে খুবে পড়ল।

নন্দনীতা তবুও আসার তবুও আসবে তেম বে। বাড়ি এসেআবে তুলবেম।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্বাই পাচ্ছে। রাজের পথ ক্রমশ চলন হয়ে উঠেছে, আসার বেগে বাড়ছে।

একবার এল লবণীতা। আর কথা না। আসার চলে গেল।

সারাদিন ঘরে ঘরে আসার পর লবণীতা আবার এল। আজকে সেজে গাড়ি করে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে এসে গেল।

কিছুক্ষণ পরে লবণীতা যখন বাথরুমে ঢোকে ফিরে এসে ঘরের পর্দাগুলো দুর্বাকে পাচ্ছে, ঘুরে ঘুরে ফলাফলের বন্দুক তুলে পরিষ্কার করে নিচ্ছে, সুকুমার মাঝে কথা, ইজা-বন্দুক একটা ছোট কথা না কেন?

—নিয়ে এসো।

এই পাচ্ছের কথাতে সুকুমার ফিরে তোর কথা। তার মানে? আমি তোমাদের নিয়ে যাবার?

—তুমিই তোমাকে কথা কথা।

—আমি যদি আমার আসতে হবে! আমার সেজে তোমা আমার কথা! যাও!

ছোটনি চৌধিয়ার ফিরে থেকে ঘরে ঢোকে ঢোকে লবণীতা কথা, আমিই কি পাচ্ছে ঘুরে ঘুরে ঢোকে পড়ে তোমা।

সুকুমার আমি আমার সঙ্গে আসার হয়ে গেল। লবণীতা এ-আরে বড় একটা কথা বলে না; তার উৎসাহ নেই, রাজার ফিরে হলেন টানা, ফিল্মস্ট, ঈশানিন এবং আরও অনেকে কথা করে। এখন তাদের জীবন দুঃখ ও অভিনয়ে তোমার।

সুকুমার চাই উৎসাহ তা প্রসঙ্গ আরো সাহস দেন না। কথা লবীতার কথা, রাজার সেজে তোমা তোমার কথা! যাও, তাই আসার।

লবণীতা তোমা আমার ফিরে না কথার।

রাত বিছানায় শুয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তোমা কথা হয় না। সুকুমার পর্দা ফিরে পড়ে থাকতে থাকতে দুর্বাকে পাচ্ছে। লবণীতা ঢোকে থাকে আসেনাম, তার পিঠে আসার স্বামীর পিঠের দিকে।

পরের দিন সকালেও দু পক্ষ দুজনার। সারাদিন তোমা আসার তোমা কথা না, সান্ধ্যবেলা তোমা ফিরে আসেন না পর্যন্ত।

সুকুমার তার ঐশ্বর্যশীলের কথা-আসার হয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলার দুর্বাকে আসা তাঁর ফিরে সুকুমার তোমা, লবণীতা তোমার আসার তোমা তোমা হয়ে আছে। দুর্বাকে পড়ে এল সুকুমার যা তোমার আসে তোমা তোমা তা পর্যন্ত আসে। সুকুমার আসার হয়; কিন্তু কথা না।

দুর্বাই আসা না। সব ঘুরিয়ে আসে এল। এসে দুর্বাই এই আসার আসাসাসার তোমা হয় দি।

আসার লবণীতাকে আঁচ-আসার পাশাই তোমার হল।

সুকুমার আসাটার তোমার আসে পড়ে বসে আসা আছেন আসার। লবণীতা পাছনে ঘরে আসাসার তোমার পড়ে আসা। আঁচের দুর্বাই এল আসার সন্ধ্যে তার আসার এল। আসার তোমা তাঁর ফিরে ফিরে আসা যে সুকুমার আর সহ্য করে পারা যায়। লিপাস্টিক ইংরেজী লিখিয়ে লিখে যে পাছনে ঘরে তোমা। দুর্বাকে আসে আসার কথা। আঁচের আসার আসার না। আঁচিপাস আসার হাসার আসা ঘরে আসাছিল। কাপসা তার। বড় তোমার লবণীতা যা দুর্বাকে পড়ে আসে।

সুকুমার আঁচ আসারে লিখে কথা না। আঁচি আসাসাসি নাছিয়ে আসা, হাসপাস আসার কথা এসে হাসল। এই—'

তোমা সাড়া দিল না লবণীতা।

সুকুমার একটু ঝুঁকে ঘুরে তোমার একটা কথা আঁচি। দুর্বাকে পড়ছে নাকি! যা নাড়া দিয়ে আসার হাসল এই—সুকুমার?

লবণীতা সাড়াসাড়া কথা।

সুকুমার আসা, সাড়া, আঁচি নাকি?

—আর তোমা তো?

—সাড়া। আঁচি একটানী কথা। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

লবণীতা তোর ফিরে ঘরে উঠে বসল।

সুকুমার বলল, আসা, কী হয়েছে তোমার?

তখন ফিরে না লবণীতা।

খানিকটা পরে সুকুমার আসা, ঘুরে ঘরে আসার তোমার আরে ঘর না। তোমার এই আসার তোমে আমি আসার ঘরে আঁচি। কী হয়েছে তোমার?

—আসার আসার তোমার আসা না লাগলে আসার কি?

সুকুমার চাই আঁচিয়ে। ঘুরে আসার আসা, যা তোমার তো ফিরেই এল। চলে আসা ফিরে ঘরে আসার যে ফিরে ঘরেছে। তোমার আঁচি তোমা ফিরেছি?

—তোমা তোমা কথা আসা?

—যাই, আঁচি। আসা। তুমি আসার তুমি আসারে পাচ্ছে না?

—যা ঘরে আঁচিই তুমি আসে আসার?

—না, আসারে না সুকুমার আঁচার ঘরে তোমিয়ে উঠল, আঁচি তোমার ফিরে আসা আসারে আসার; যাঁর না আসার আসে আসা তোমে আসার এ আঁচিয়ে তোমার না?

লবণীতা আসাটা ফিরে আসা তোমার। তাঁরাই তোমার। আসা, তুমি আসার তা তোমার?

—না। তোমার যে আসা তোমার! তুমিই আসার আসা তোমিয়ে এসেছ?

—আমি তোমার আসার আসা তোমিয়ে এসেছি?

—নিজেই তোমে তোম।

লবণীতা তোম তাকাল না তোম। এসে একটা আসার যে তোম ঘর তাকানো আসে দি। সারাদিন তুমি আসে তোমে তাঁরাম আসার আসা, তুমি আসা তোমার। সুকুমারসমূহ এই আসাই ঘর। তোমারী তোমার ফিরেই ফিরেছিল।

সুকুমার অনেকদিন পরে এ-আঁচিয়ে তোমারীর আসাটা আসার সুকুমার তোম। লবণীতা এই আসাটা ঘুরে আসার তাকে ফিরেছিল।

সুকুমার আসা, তোমারীর কথা আসা, তোমার ফিরেছে কথা আসা। আমি তোমার আসার আঁচি, তুমি যদি সত্যি করে আসার যা আসা কী হয়েছে—আমি সাঁচা সাঁচা আসা তোমে আঁচিয়ে আসার যা?

—আমি,' লবণীতা ফিরি আসার আসার আসা, আসা আসা।

—আসা আসা?'

—তুমি তোমার ফিরে আসারে আমি? সুকুমার তোমা তাকে উঠল। অবিশ্বাসের মনে হল। লবণীতার ফিরে তার এসে তোমার তোমে আঁচিয়ে থাকল। যা আসার আসার সহজে এসেছে সত্যি আসা তোমা আঁচিয়ে তোমে পারল না। তবু হাসার আসার আসে তোমারে আসারে ঘরে ঘরে আঁচির ফিরে এল তোমারীর তাঁরাম; তুমি সুকুমার আসা তোমে পারছিল।

সুকুমারকে তোমে হল না, লবণীতা ফিরেই বলল তুমি তুমিয়া আসে একটা তোমে আঁচিয়ে ফিরে আসারে।

সুকুমারের ঘুরে তোম সাহসীন, পুরোনো হয়ে তোম। আসার আসারের পড়। তাঁরি ফিরে পারছিল না। ঘুরে আসা তাঁরাছিল। নির্বাক। হাতের হাসুতে হাত আসার। কপালও তোম ফিরে এল।

—তুমিয়ার আসা তোমার যে আসা?'

—তোমার আসারসার তোম। একটানা একজন ঘুরে আসারে এসেছিল। তুমি ফিরে না। তুমি বাইরে ফিরে। সে আসা, না—যে তোমার তাকে পাচ্ছার তোমেছে। তুমি আসারসার আসার ফিরে ফিরে এসো।

কিছুক্ষণ আসার হয়ে বসে থাকার পর সুকুমার আর ফিরতি তুমি আসা না। ঘুরে পাচ্ছে তাঁরিয়ে হয়ে তোমে। আসা, তুমিয়া আসার তোমেআসার আসুর আঁচি।

—তোমার নাকি আসা?

—আসারের আসা আসা?

—যে আসারে! আমি যা তুমি?.. তোমার আসার হাসার এর চেয়ে

কোথা থেকে আসে? কে দেয়? তার সঙ্গে তুমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও?' নবনীতা ধমকের সুরে বলল।

সুকুমার কেন জানি কোণঠাসা হয়ে হয়ে বেলোয়ারী হয়ে উঠছিল। নবনীতা তার সোহাগে ঘোরতরভাবে কমেছে। অনিমেষই হয়ত তার কোরেলেন। সাধনের পাড়াতেই অনিমেষ থাকে। সুকুমারকে অনেকদিন দেখেছে। ঘোঁজ খবরও নেয়নি নিশ্চয়। ঠিক করেছে, অনিমেষকে দেখে নেবে সুকুমার। কিন্তু নিজের অবস্থাটা এখন এমন সোচনীয় যে বাঁচবার আর কোনো পথ না পেয়ে হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে সুকুমার বলল, 'প্রতিমা দিয়েছে। সে দেয়। তাতে তোমার মাথা ব্যথা কেন? তার টাকা আছে। সে দিতে পারে। তুমি জান, তার স্বামী মস্ত বিজনেসম্যান। লম্ব হকম ব্যবসা করে। সাধন, আমার বন্ধু—সাধন আমার টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য না করলে আমি ডুবে যেতাম।'

—তোমার এই ছেলেবেলার বন্ধু সাধন তোমার ছিল এতোদিন?' বাঁকা করে বিদ্রূপ করে নবনীতা বলল।

—'তুমি মূর্খের মতন কথা বলছ—,' সুকুমার ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'আমার কোনো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আমার পরে দেখা হয়ে যেতে পারে না? নাকি তাকে ব্যবসায়ের হতে নেই, বড় লোক হতে নেই!...আমি তোমায় বলছি, তখনকার দিনে, ছেলেপুলে থাকলে আমি তাদের হুহাত দিয়ে বিলিয়ে দিতাম, একদিন শ্যাম্পু রোডে এক অফিসে সাধনের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। আমি তখনে কলে লাইফবীমার কাজে ঘিরেছিলুম, কেবার পরে সাধনের সঙ্গে দেখা। সে আমাকে তার অফিসে টেনে নিয়ে গেল।'

—'তারপর বাড়িতে...'

—'যাবেই তো, কেন যাবে না!'

—'থাক্ না, হাজার বার থাক্; কিন্তু সাধন যখন তার বউ প্রতিমাকে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল তখন তুমি ওই মেয়েটাকে ঘাড়ে নিলে কেন?'

সুকুমারের অসহ্য লাগছিল। নবনীতা এত নোংরাভাবে কথা বলছে যে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সুকুমার বলল, 'তোমার মুখের কি কথা! ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে বউ বলে তো মনে হচ্ছে না।'

ধরাটো গলায় নবনীতা বলল, 'এই মুখে তোমার আর ভাল লাগছে না বলেই প্রতিমার মুখ দেখতে যাও।...যাই যাও। আমি বারণ করি না।' বলতে বলতে নবনীতা উঠে পড়ল। উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

বৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছিল। বাইরে হয়ত মেঘ ছিল, সারা রাতই থাকবে। এই বাড়ির অন্য দুটি মানুষ অন্ধকারে মুখ বন্ধ করে থাকল। কেবলে মনে হবে, অদ্ভুত সুসেজ, আসন্ন কোনো বিপর্যয়ের অপেক্ষা যেন এই মুহূর্তে কোনো রকমে নিজেদের ধরে রাখছিল।

রাত হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার কারও রুচি ছিল না। চৌকিদার বলল, উঠল। সুকুমার সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

নবনীতা এল আরও খানিকক্ষণ পরে।

বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে দিয়ালার এসে নবনীতা শুলো। সুকুমার জেগেই আছে। থাকুক।

সুকুমার ভাবছিল, তার মতন ভাগ্যবিড়ম্বিত, ঈর্ষাকাতর, দুঃখী মানুষ সংসারে নেই।

নবনীতা ভাবছিল, যে-মানুষকে সে ভালবেসে গ্রহণ করেছিল, যার জন্যে এত সহ্য করেছে সে তাকে বঞ্চিত করল।

আরও রাত হল। সমস্ত পাড়াই নিস্তব্ধ। পাশের বস্তির শব্দ হচ্ছে আবার। নবনীতার আঁচল সরানোর শব্দ হল, গলা পরিষ্কারের চাপা শব্দও শোনা গেল। সুকুমার তার বাঁ পা সরাতে গিয়ে নবনীতার পায়ের পাতার আঙুল ছোঁয়াল। পা সরিয়ে নিল নবনীতা।

অদ্ভুত এক স্তব্ধতা যেন দু জনকে ক্রমশই পঙ্গু করে দিতে লাগল। ক্রমে পর্যন্ত এসে সুকুমার যে আর কেন সহ্য করতে পারল না। তার মনে হল, সে যেন সীমার চরম গেছে, এরপর আর যাওয়া যায় না, জেনেই সম্পর্কটা ছেড়ে যাবে।

অসহ্য সুকুমার বলল, 'তুমি অনেক কথা আমায় বলেছ, কি করে বলেছ আমি জানি না। একটা কথা বলতে নিই। প্রতিমার গলায় কানসার হয়েছে। সাধন অনেক ডাক্তার ডাক্তার দেখিয়েছে। কোনো লাভ হয় নি। প্রতিমা জানে সে আর বেশীদিন বাঁচবে না, সাধনও জানে। ওদেরও আমাদের মতন অবস্থা, ছেলেপুলে নেই। এক সম্পর্কের ভাইঝিকে ডাকে এনে রেখেছে। সে নিজের কাছে থাকে।' বলে সুকুমার একটু থামল, বাইরের দিকে মুখ করে বলল, 'প্রতিমার মাথার কেমন একটা গোলমালও দেখা দিয়েছে। হয়ত মরতে যাচ্ছে বলেই। এমনিতে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু থেকে থেকেই কেমন ছটফট করে, কলকাতায় থাকতে চায় না, বাইরের যাবার জন্যে জেদ করে। সাধন কাজের মানুষ, সে ব্যবসাপত্র ফেলে দিয়ে বাইরে বাইরে বউ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না। তা ছাড়া সে ও-রকম ঘুণী নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতেও পারে না। তার পায়ে ফ্লেবোসিস্ দিল করে। ওর আবার হাই প্রেসার।...কাজেই আমাকেই প্রতিমাকে নিয়ে বাইরে যেতে হয়।'

নবনীতা কোনো সাড়া দিল না।

সুকুমার বলল, 'কথা বলছ না যে?'

নবনীতা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, পরে বলল, 'তোমার কন্ধুর বউকে তুমি নার্স করছ বলে তারা টাকা দিচ্ছে?'

—'নার্স করব কেন? সঙ্গ দি।'

—'কেন যাও?'

—'বাঃ, এই কেনর কোনো জবাব আছে! মানুষে হিসেবে যাই, বন্ধু হিসেবে যাই।'

—'তোমার বন্ধুও তো মানুষ।'

—'মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?'

নবনীতা যেন বিদ্রূপের গলায় বলল, 'বুঝতে পারছ না? তোমার সাধন বন্ধু তার বউকে সঙ্গ দিতে পাঠাচ্ছে না?'

সুকুমার আবার স্তব্ধ হল। কোনো কথাই কি নবনীতা বুঝবে না? মেয়েমানুষ হলেই কি নির্বোধ হতে হয়? একবার যা মাথায় ঢোকে তার বাইরে আর ভাবতে পারে না? আশ্চর্য!

সুকুমার বলল, 'আমি তোমায় বলবার কি! সাধন বন্ধু মানুষ। তার নিজেরই হাই প্রেসার। তা ছাড়া সামলাতেই সে অস্থির হয়ে ওঠে। সে আমায় নিজেই ডেকেছে, তাই আমি যাই; আমার চোখের সামনে আমার বউ মরার অপেক্ষা করছে আমি কিছুই করতে পারছি না—এ আমি সহ্য করতে পারি না। চাঁদল ট্রেনসান হয়, নার্ভ রাখতে পারি না।'

নবনীতা কথা বলল না। পাশও ফিরল না।

সুকুমার অপেক্ষা করে থাকতে থাকতে বলল, 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। সাধন পারে না বলেই আমি...'

বাধা দিয়ে নবনীতা বলল, 'আর বউ সে সহ্য করতে পারছে না—এসব তুমি পারছ?'

—'এতে অবাক হবার কি আছে? বন্ধু সাধনের বউ বলেই সাধন যা পারছে না, আমি সেটা পারতে পারি। তখন প্রতিমা আমার বউ নয়। নিজের ব্যাপারে মানুষ অনেক কিছুই পারে না, অন্যের ব্যাপারে পারে। আজ যদি আমার বাবা বেঁচে থাকত আর হঠাৎ মারা যেত আমার বড় ভাসে লাগত, তোমার লাগত না। কারণ আমার বাবা আমারই, তোমার নয়, তোমার শ্বশুর।'

নবনীতা বিছানার ধারে তার হাত দুটির রাখল। জ্বালা করছে। পায়ের তলাও জ্বালা করছিল। সুকুমার নিজে চালাকি করার চেষ্টা করছে। তার অন্তরঙ্গ দেখানোর এই চেষ্টা যে কত ভাঁজবাজি সে জানে। তবু নিজেকে বাঁচানোর কত চেষ্টা!

সামান্য সময় চুপ করে থেকে নবনীতা ধরা করে বলল, 'তোমার এত মায়াদয়া মনুষ্যত্ব আছে জানতাম না।'

—'জানার কোনো দরকার তো বোধ কর নি। ছেবেন্ন যা আছে সব তোমারই আছে। ধরা, মায়া, সহানুভূতি, ভদ্রতা, রুচি...'

—'না, আমার আর থাকবে কেন? তোমার আছে।'

—'আমার তো নেই। তোমার আছে—এই অহংকারে তুমি আজ চার বছর ধরে আমায় বোবা করে রেখেছ।'

নবনীতার মাথার শিরায় যেন লাগল, ছিঁড়ে যাবার মতন যন্ত্রণা হল। দাঁতে দাঁত চেপে, চোখের পাতা বুজে যন্ত্রণাটা সামলে নেবার চেষ্টা করল। তারপর আচমকা সোজা হয়ে বসলো। ধারালো ছুরির মতন হিংস্র গলায় বলল, 'তুমিও তো কম অহংকার দেখাচ্ছ না! খুব বড় বড় কথা বলছ! মনুষ্যত্ব দেখাচ্ছ! কিসের মনুষ্যত্ব তোমার? সাধনের বউ মরতে বসেছে তাকে সঙ্গ দিচ্ছ! সঙ্গ দিচ্ছ, না—সেই মেয়েটাকে সঙ্গ দেবার নাম করে তার আর তার স্বামীর টাকা এনে নিজের পেট ভরাচ্ছ?'

সুকুমারের মনে হল, কে যেন তার গালে ঠাস করে এক চড় মারল। এত জোরে মারল যে তার আঘাত এবং জ্বালা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। জলে ডুবতে থাকলে মানুষ দম বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে মুখে শ্বাস টানার প্রাণপণ চেষ্টা করে সুকুমার সেইভাবে শ্বাস টানতে টানতে বলল, 'কি বলছ তুমি?'

নিষ্ঠুর গলায় নবনীতা বলল, 'যা বলছি, ঠিক বলছি। তুমি মনুষ্যত্ব দেখাচ্ছিলে! কিসের মনুষ্যত্ব তোমার! বন্ধুর বউয়ের কাছে গিয়ে বসে থাকো, তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াও, তার তোষামোদ করো, তার দুঃখে গলে যাও—এর নাম তোমার কোনো মনুষ্যত্ব নেই। আছে স্বার্থ; চালাকি। এই ভালো-মানুষি দেখিয়ে, ছল করে তুমি ওদের টাকা আনছ।'

সুকুমার যেন লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসল। তার গা কাঁপছে থরথর করে, মাথায় আগুন ধরে গেছে। চিৎকার করে সুকুমার বলল, 'চুপ করো। চুপ করো তুমি। আর একটাও কথা বলবে না।'

—'বলব। হাজার বার বলব।... লজ্জা করে না তোমার? তুমি আমায় কিসের মনুষ্যত্ব দেখাচ্ছ!'

সুকুমার যেন ঝাঁপ দিয়ে নবনীতার বুকের কাছে কাপড় জামা খামচে ধরল। ধরে টান মারল। নবনীতাকে সে টেনে উঠিয়ে বসিয়ে দেবে। দিয়ে যে কি করবে সে জানে না।

নবনীতাকে উঠে বসতে হল।

সুকুমার বলল, 'তুমি এতো ছোট? নোঙরা? ইতর?'

নবনীতা বলল, 'হ্যাঁ, আমি ইতর। তোমার আর তোমার বন্ধু সাধনের মতন মনুষ্যত্ব আমার নেই।'

সুকুমার অন্ধকারে তার স্ত্রীর চোখ দেখার চেষ্টা করছিল হিংস্রভাবে।

নবনীতা স্বামীর হাত সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আমার কথার জবাব তুমি দিতে পারবে না। সাধন তার বউয়ের দায় এড়ানোর জন্যে তোমায় পেয়েছে, পেয়ে বেঁচে গেছে। আর তুমি সাধনের বউকে সঙ্গ দেবার ছুতো করে ওদের মন ভোলাচ্ছ। তোমার বন্ধু দায় এড়াবার জন্যে তোমায় টাকা দিয়ে হাতে রাখতে চাইছে, আর তুমি তোমার বন্ধুর বউয়ের চাকর হয়ে পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছ ওদের মন রেখে টাকা পাবার ধান্ধায়। সত্যি করে বলো তো, এই কমাস ধরে এত টাকা ওরা কেন দিয়েছে?'

সুকুমার তার শক্ত হাত নবনীতার গলার কাছে উঠিয়ে আনার জন্যে যেন অপেক্ষা করছিল।

নবনীতা বলল, 'তুমি আর তোমার বন্ধু, দু জনেই স্বার্থপর। কে বেশী, কে কম আমি জানি না। একটা মেয়ের জীবনের শেষ কটা দিনকে সামনে রেখে তোমরা দুই পুরুষ বাজি খেলছ। এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই।'

—'নেই?'

—'না, নেই। মনুষ্যত্ব থাকলে টাকা থাকত না।'

দাঁতে দাঁত চেপে সুকুমার বলল, 'এই টাকা তোমার জন্যে!'

—'আমার জন্যে?'

—'হ্যাঁ, তোমার জন্যে। টাকা যখন ছিল না—ডুবতে বসেছিলাম—তখন তুমি পাথরের মূর্তির মতন শক্ত থেকে আমায় রোজ লজ্জা দিয়েছ, আমায় তোমার পায়ে মাথা লুটিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে আনন্দ পেয়েছ। তুমি আমার বাস্তিত্বের যেটুকু বাকি ছিল তাও শুষে নিয়েছ। আমি ভেবেছিলাম, টাকা এনে তোমার এই অহংকারের খানিকটা আমি ভাঙব।'

—'ও! পেরেছ ভাঙতে?'

—'হ্যাঁ, পেরেছি।...তোমার অন্তত এই অহংকার আর নেই যে তুমি একেবারে অসাধারণ। তুমি সাধারণ। তুমি সব কিছু উপেক্ষা করতে পার না। তোমার রাগ, ঘেন্না, নোঙরামি, ঈর্ষা, লোভ—সবই আছে। আমায় কৃপা করে ভালবেসেছিলে, বিয়ে করেছিলে—এই অহংকার আর মাথার ওপর চড়ে থেকো না, নীচে নেমে এসো। সাধন আমায় কৃপা করলে দোষ হয়, তুমি করলে হয় না? মনুষ্যত্ব যদি আমাদের না থাকে তোমারও নেই।'

নবনীতার যে কি হল সে বুঝতে পারল না। মাথায় যেন দপ্ করে কি জ্বলে উঠল। রাগ, ঘৃণা, না কি আক্রোশ? অথবা কোনো অপমান তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে ফেলল, সে বুঝল না। হঠাৎ সে স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে বলল, 'না, আমার কিছু নেই। আমি কিছু রাখব না।'

এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটে নি। চার বছরের পুরোনো বিছানায়—বিবাহিত জীবনে এই দুই স্বামীস্ত্রী পরস্পরকে কোনোদিন হিংস্র পশুর মতন আক্রমণ করে নি। আজ করল। নবনীতা সুকুমারের গেঞ্জি ছিঁড়ে দিল, গালে বুকে হাতে অজস্র আঁচড় দিল নখের, মাথার চুল মুঠো করে ছিঁড়ল, কামড় দিল দাঁতের—যত্রতত্র। আর সুকুমার স্ত্রীর শাড়ি ছিঁড়ল, গলার পাতলা হার ছিঁড়ে দিল, কতবার যে লাথি মারল পায়ের কিক, উহুতে। খোঁপা ভেঙে জামা টুকরো টুকরো করে এক জীবন্ত জন্তু করল।

দু জনেই ইতর হল, খুবসিত হল, নোঙরা হয়ে গেল। দু জনেই হাঁফাচ্ছিল, নবনীতা প্রথমে কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সুকুমারের চোখে শুধু জল ভরে উঠল।

অতঃপর, এই কান্না কখন যেন গোপনে, আস্তে আস্তে দু জনেরই ভেতর থেকে এক অন্য রকমের ত্রাস ও করুণা সৃষ্টি করছিল। কেউই বুঝতে পারল না, এত ইতরামোর পর কেমন সব দু হাতে ঠেলে দিয়ে তারা পরস্পরকে ভোগ করার জন্যে কাতর হয়ে উঠল। ভোগ না অনুভব? তারা এতোদিন শারীরিক কারণে বহুবার ঘনিষ্ঠ হয়েছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা বিচ্ছিন্নতা ছিল। মনে? নাকি অনুভবের ঘরে? আজ যেন তারা আর বিচ্ছিন্ন থাকল না। একজন অন্যজনের এত কাছে এল—যা আর আসে নি।

অবশেষে দু জনেই পাশাপাশি তাদের বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। তখনও বুকের শ্বাস স্বাভাবিক নয়, সমস্ত দেহ যেন ভেঙে পড়েছে, বড় ক্লান্ত।

ওদের দেখে মনে হয়, অনেক দূর থেকে দুটো গাড়ি পাশাপাশি বাজি ধরে ছুটে আসছিল; ছুটে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত আর পারল না। ধুলো ভরা, মলিন, দম ফুরোনো অবস্থায় পথের পাশে পাশাপাশি থেমে গেছে। থেমে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই।

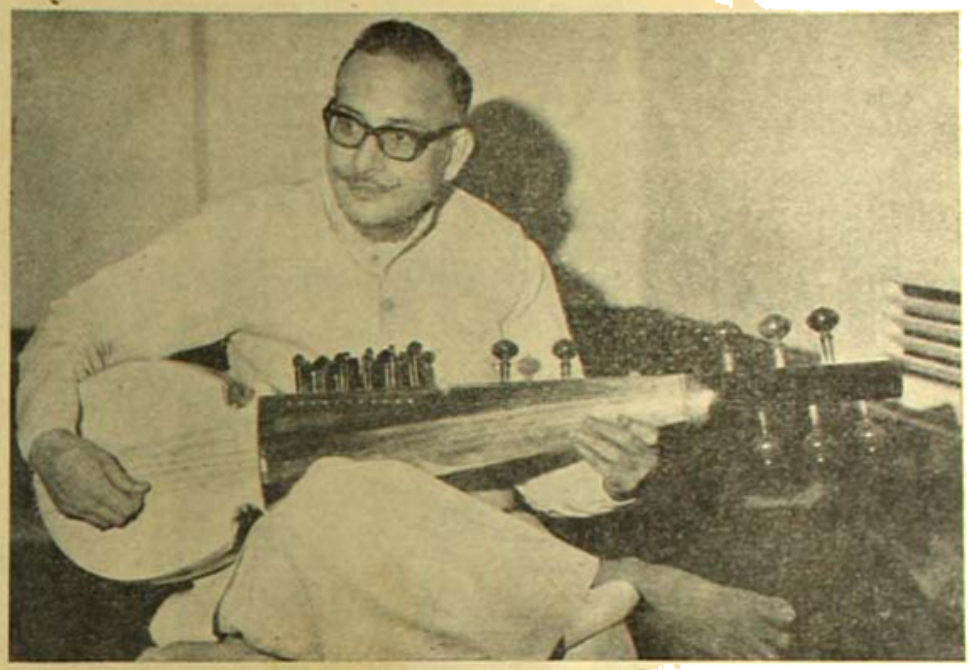

রাধিকামোহন মৈত্র

# শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মানুষ চৌবেল-খাঁড়ির বড় কাঁটাটা অনেক পড়ে গেছে। তবু চলে। ছোটো কাঁটাই ঘুরে ঘুরে সময় দেয়। অত খুলচড়া সময়ের দরকার কি তার? মোটামুটি একটা সময়ের আন্দাজ ছোটো কাঁটাটা থেকেই পাওয়া যায়। ঘড়ির কাচের মধ্যে, তলায় বড় কাঁটাটা পড়ে আছে। দোকানে নিয়ে গিয়ে সারাই করে আনা যায়, কিন্তু মানু তা করে না। অসুবিধে তো হচ্ছে না কিছু। সময়মতো আজানও বাজছে।

কিন্তু ছেলে বদলে, সময়টা একটুও ধরতেই পড়ছে। যেমন সেদিন সকালে ঘুমটা ভেঙে উঠতে কাল চা দিতে। তার মধ্যে একবারোক্ত বাকি চিনির দরটা কম করে উঠে না গেলে প্রতি সেরামে দু'পয়সা করে বাড়তে না মানু। লোকে বলে—জল বেচে পয়সা। তা চায়ের বেশীর ভাগটা জলই শেষে কিন্তু যা একটু ছিটেফোঁটা কেমিক্যাল মেশাতে হয় তার জন্যে অড়াই টাকা সেরের দুধ লাগে, আট টাকা কিলোর চা, পাঁচ টাকার চিনি।

লোকের আর কি। তিনি কম হলে মুখে তেতো করে গেলাস ফিরিয়ে দিয়ে বলবে—চিনি হয়নি, আরো এক চামচে দাও। লিকার কম হলে বলবে—লিকার মেপাও। চা যদি জলই হবে যাদু তবে এই বেলকম কেন? পনেরো পয়সা থেকে সতেরো পয়সায় দর তুলতেই খদ্দের অর্ধেক হয়ে গেল। তা বলে ভাঁড় কম নয়। যারা আসবার তারা আসে ঠিকই। মালসা খদ্দের কামদ, বিনোদকাকা আড়ার ঘাঁটি—যাবে কোথায়। এখন দু-তিন জন এলে এক গেলাস চা আর একটা কলকে, দু গেলাস হলে দুটো কলকে নিয়ে টান করে যায়। ওদুধের গেলাসের চেয়ে এক রত্তি পরিমাণ বড় গেলাসে চা ঘরে কতটুকু। তা অল্পেক কলকে থাকে কি, তা ভেবে পায় না যাদু। কিন্তু তবু ঐ চায়ের আমেজটুকু নেহাই লোকে খুশী।

হপ্তা খানেকের মধ্যেই দোকান জমজমা খারাপ না। হাটুরে আছে, ঘাটলার জুয়াড়িরা আছে, নিষ্কর্মা আছে। আর কিছু না জুটলেও লোকে চা খায়—এই বিশ্বাসের জোরে যাদু টিকে আছে এতকাল। সোমবারের বিক্রিসঙ্কা দেখে একটু ভাবিত হয়ে পড়ল।

স্টেশনে কলও ছিলতোই হয়েছে। লোকে একটু গরম আছে তাই নিয়ে। জুটমিলের মেয়াদের পরে খালাসের তিনদিন আগে একটা লাল পাওনা পেয়ে। মোদ্দাখালীপাড়া থেকে ছেলে-ছোকরার তলা দিয়ে নিঃশব্দে রাস্তাচার সন্ধ্যের পর লোক হাটে না। আর ঐ যে যোদ্দের রোড সি. সি. আর.-এর রেল-লাইনের পাশাপাশি যমজ ভাইবোনের মতো বহুদূরে চলে গেছে, যার ওপর দিয়ে চব্বিশ ঘন্টা দুরেপাল্লার বোঝাই ট্রাক হাতীর মতো উঁচু হয়ে যাচ্ছে আসছে, সেদিক থেকে মাঝেমধ্যে দুরেক বাহাই 'বাঁচাও, বাঁচাও' চীৎকার শোনা গেছে। কেউ অবশ্য বাঁচতে যায় না। সকালে চায়ের দোকানে এসে আলোচনা করে। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। সন্ধ্যেবেলা সাড়ার ঘরে আসে। খদ্দেরের জন্য বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-পুলে সব দাঁড়িয়ে থাকে স্টেশনে, কে খবর আনে কে জানে, শোনা যায় ছেলেগুলো গ্রহ্যাদুয়া করতে করতে দৌড়ে আসে। কে হবে, কে জেতে বলা মুশকিল। কিন্তু রেললাইনের ওপারে তরকারীওলা ছিপ ফেলে ব্যবসা করছিল এতকাল, তার ঝাল হল। হপ্তাবাজারে বসে ছিকেলের দিকে, বালী দুর্গাপুরে চালাতে তাই সকালে বাজার করার হেওয়াজ নেই। জুটমিলের অপেক্ষা অবসা বসা-কলমা আদু, নাতানো পালং আর মুলো মুলো, পেটকোলা আলোকিকন হাই, ভেলো-ভুলি-ঝোঁয়ার মুখেলের বাচ্চা নিয়ে বসে বটে কিছু লোক, কিন্তু বাস না চললে কেউ অবশ্যে যায় না। ছিপে তবু মুকে মোকদম ছিপেছিল। আদু-পেঁয়াজ, কপি-কড়াইশুটি, পালং-মুলো—সব নিয়ে বেশ মোকদম। তাদের খুঁটিতে ছিপও বাজত। সকালে বালী-দুর্গাপুরের লোক মাছির মতো এসে পড়ত ছিপের মোকদমে। সে কি বিক্রী বাবা, বেলা বার হাকিলেও ঘন্টা খুঁজেক কিছু আদু হাড়া সব মাল উবে যেত। তার বিক্রী দেখে পালা-পাশি আরো কয়েকজন মোকান মেওয়ার চেষ্টায় ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই ছিপের অবস্থা ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে আর ছিপল না। মালসা একটা কলকে সুতীর মোড়া মালসা ছড়ের রাস্তার ধারে, দোকা দাড়িওলা কর্তা ছিপে তেমনই খানদানী দুর্বীরাম হয়ে গেল। ছিতরে সাড়ার পোকার সোজা যাদুবে-টাকে ঘুরেফিরে করে দিয়েছে। যাদুর মোকানে সাত টাকা পাঁয়ষট্টি পয়সার বাকি এখনো মোম করতে পারেনি। গতমাসে পাকাপাকিভাবে মোকান তুলে ছিল ছিপে। এখন সে মোকানে সন্ধ্যের পর সে সাড়ার দালালী করে লক্ষ ছেলে। মাসের ছেলেটেলেদের ভাঁড় সেখানে।

যাদুর মুখোমুখী আদুর খালীর মোকান। গতবারের তুলনায় মালের দর ছিলোগ্রতি দুটাকা করে ছেড়েছে। চমড়া, খুড় আর ছিপটুকু বাদে সবই আদু নির্বিকার মুখে বিক্রী করে। দর বাড়তে তার বিক্রী পড়েনি। সকালে এখনে যাদের আকাল, তাই মানে খদ্দাখদ বিক্রী হয়ে যায়।

যাদু ওঠে খুব সকালে। তখন কাক-পক্ষীও জাগে না। মোকানঘরের পিছনে ছাইগাদার জল ছাড়ে, চোখ-মুখ ধোয়। খাটা উনুনের পাশে খদাই পড়ে থাকে একটা ছেড়া শতরঞ্জীতে হাতকে বালিশ করে। তাকে পা দিয়ে ঠেলে বলে—ওঠ, ওঠ, শেষরাত থেকে ঠেলতে ঠেলতে খদাই অবশেষে উঠে বখন হাই ছাড়ে তখন এক কাঁচার খড়িতে সাড়ে চারটে পৌনে পাঁচটা।

বেলা হলে চলে না। উনুন ধরতে না ধোক পনেরো মিনিট যায়ই। তা ধরতে সকলের খুমেরয়া এসে পড়তে থাকে। আদু জুটমিলের সকলের মজুর, ছেলের বুড়ো কুলি, ছিকাদারের লোক, হপ্তাবাজারের ছিছু দোকানী। দোকানের কাঁপ খুলে তাঁদের সস্তা দশাসি গুটিয়ে বিছানার শতরঞ্জী-বালিশ সব তাকের ওপর তুলে ফেলে যাদু। ফাঁকা জায়গায় বাস-টাস সাজিয়ে ফেলে। খদাই উনুনে খড়ির ছিটেই ফুলার ধপ আর ধোঁয়ার দোকানটা ভরে ওঠে। সেটা খারাপ লাগে না যাদুর। ফুলার ধোঁয়ার গন্ধের মধ্যে একটা বেঁচে থাকার জাদ পায় সে।

খদাই-ই আসলে দোকানটা চালিয়ে নেয়। যাদুর কোনো কাজ থাকে না। খদাই চায়ের জল করে, লিকার করে, খুব চিনি মিশিয়ে ইঁজিনের মতো চামচে নেড়ে ফোই গেলাসে চা ঘরিয়ে দেয় হাতে হাতে, খরকার মতো ভাঁড়ার ছিপুই, সস্তা কেক বার করে নিজেই দেয়। এই একটু নিরালা সময় যাদুর। এ সময়টায় সে কয়েকটা পাটের খুঁটি নিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে ঘষটিকে দু হাতের তেলোয় পাকিয়ে দড়ি তৈরী করে। দড়ি তার কোনো কাজে লাগে না। জমে গেলে বিক্রী করে দেয়। কিন্তু ব্যবসার জন্য নয়, এও অভ্যাস।

খরচাপাতকে বিস্কুটের টুকরো, কাঁচ খারাপাতা খদাই-ই দেয়। টিয়াপাখির খাঁচার খাটিতে জল কিংবা ছাতুর গুলি বা দানা সব খদাই দেয়। যাদু শুধু নজর রাখে। রাখতেই হয়। সে মালিক। এই ছিসের মধ্যে একটা খরচে একটা মোকানের মালিক হওয়া সোজা কথা নয়। সে যেমন মোকানই হোক। একটা ছিনুর মালিক হওয়ার খুরুত ইজ্জত সেই কবে থেকে যাদুর! এখন হয়েছে। এই মোকান তার, ঐ খদাই তার কর্মচারী—এসব কি ভাবা যায়?

শীতের এই অন্ধকার ভোরবেলার ঠাণ্ড টান করে জলে পাটের সুতো পাকাতে পাকাতে যাদু এইসব ভেবে খুব তৃপ্তি বোধ করে। সোমবার থেকে চায়ের বিক্রী ভল করে কমে গেল, চিনি দিয়ে সেঁটেছেন আঁধার বাজারে, খর চড়ছে জানোয়ারের জুরের মতো। মালসা লালটেম প্রসাদ খুব দিতে এসে রোজই খাইখুই করছে, আড়াই ছিপ্পা সেরমে তার কুলু নাকা হচ্ছে না। খুরো তিন হলে হয়। যাদু খাঁক খাঁক করে ওঠে বটে, কিন্তু মনে মনে বেকে লালটেমও হক কথা বলছে। সে নিজে চায়ের দর গেলাসপ্রতি দুই নয়া বাড়াতে পারে তো অন্য সবাই কি বসে থাকবে। বিকিকিনির জগতটাই একরম, একটার দর উঠল তো আর একটার পরও। তবে—আমিই বা বসে থাকি কেন? ঝাঁপ বরাবরি করে তখন সবাই উঠবার চেষ্টা করে।

উনুনটা ধরে গেছে। ধোঁয়ার একটা ঝুপে মেঘ এখনো মোকানের চালের কাছে জমে আছে। চাউল কেটলিটা গরম খাচ্ছে। পাঁউরুটি, এখন জুটতে একটু সময় লাগে। একখুক চায়ের তেষ্টা নিয়ে জুলজুলে চোখে উনুনের দিকে চেয়ে বসে আছে জুটমিলের পরানচন্দ্র। মাথা-গলা সব কম্ফর্টার আর ঝুলকো চাদরে ঢেকে বুড়ো অনাদি খাস্তগীর কাশছে। ও হচ্ছে চায়ের কাশি, খদাম খরচটুকু না দেলে কাশি থামবে না।

উনুনটা মিশি খনখনে হয়ে উঠে তাপ ছড়াচ্ছে। শীতের সকালে তাপ-টুকু ভারী ভাল। বাসন্তীবুড়ো একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল উনুন থেকে। অনাদিচরণ দুটো রোগা হাত বাড়িয়ে তাপে সেঁকছে। গতবার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ভিটামিন পেয়েছে। খুবখুরো কিছু প্রভিডেন্ট ফান্ডের যা পেয়েছিল সবই তার বৌ হাতিয়ে নিয়েছে। ছেলের সেয়ানা। অনাদি খাস্তগীরের এখন সংসারের কলকু যাদুর। খতক্ষণ খাড়িতে থাকে ততক্ষণ অশান্তি, তবে খাড়িতেই একটু, হাঁটাচলা করে এসে যাদুর দোকানে সেঁটে যায়। দু গেলাস চা খায়, বেলা দশটা পর্যন্ত খবরের কাগজটার মাছির মতো চোখ থেকে সব রস শুষে নেয়। তারপর ওঠে। নিরীহ মানুষ, মাঝেমধ্যে যাদু তাকে ধার দেওয়া চা ছি দেয়। তারী খুশী হয় তাতে। প্রায় সময়ই বলে—'তোমার খারাদবুদ্ধি বড় কম হে যাদু। বাঁদ এই সকলের দিকে সিগারেট আর জিলিপী ভাজতে তো দুদিনে লাল হয়ে যেতে।'

খুড়োকর্তার খিদে এই বয়সে চালাড় দিয়েছে। দোকাটা এই সময়ে এসেই একখুক করতে থাকে। খুড়োমানুষ যাদু কিছু বলে সেখেনি। তার ওপর অনাদি খাস্তগীর বাড়িতে বাড়তাতি পায় না, বৌ—ছেলের বৌ খাওয়ার খোঁটা দেয়। যাদু একটু, অন্যলোকের হলে—'সিগারেট জিলিপীর বড় হচ্ছেয়াম দেখা, মরতা কোথা পাই! তার ওপর দোকানও তো তাহলে বাড়তে হয়। খাদ্যের চাঁটের জোরই বা কি!'

অনাদি হটবে লয় না। বলে—'পয়সা না লাগলে কি পয়সা আসে! সেই জন্যই তো বলি তোমার খারাদবুদ্ধি বড় কম। জগবন্ধুর নাম করে লাগিয়ে যাও, দেখবে কেমন হুরহুড় করে পয়সা আসবে।'

যাদু জানে, একবার ওসব খুরু করলে খদ্দেরের অভাব হবে না ঠিকই, কিন্তু নগদ ফেলে কেউ যাবে না। ঐ অনাদি বুড়ো বোজ এসে ধারের লিখিয়ে হবে। বারদশ পেটখারাপ হলে, বা মহলের ছেলে বাড়ির পরিমাণ দেখে তার ছেলেরা এসে যাদুকে চোখ রাঙিয়ে যাবে। তাই যাদু হালামা বাড়ায় না। চা-বিস্কুট, বিড়ি-সিগারেট, সস্তা ভিছু সবেদা, পাউরুটি আলিতা, আর পান—এই সবের বাকিবকেয়া উনুনে কড়াই জল বেড়িয়ে যায়।

শীতের এই ছোরবেলাটি বড় সুন্দর। আদুর মহলের দোকানের পিছন থেকে খুব উঁচি-উঁচি দেখা যাচ্ছে। অলো ফুটতে গড়িমসি। চায়ঘরে একটা আবছায়ার ঘর ফেলেছে কুয়াশা। চায়ের জিকারের গন্ধ ঘুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। জুটমিলের কলুন ভোঁ থেকে উঠল ঐ। একটা ভাউন গাড়ি কুয়াশা ভেদ করে ভেলন ভিয়াদম চলে এল। থামা গাড়ি, এত সকালে লোক হয় না। সোদা চিঁচাটাকে হরেক কথা লেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, তবু বোল ফোটেনি। অবেদ একটা মিষ্টি শব্দ করে পাখিরা ডাকা কাজটায়। খরলোশটা ভিতরের উঠোন থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে এসে যাদুর কোলে উঠে বসল। খরগোশ জীবিকা বড় অদ্ভুত, মুখে কোনো শব্দ নেই। একদম বোবা। এক কাঁটাওলা খড়িতে এখন পাঁচটা বেজে কিছু মিনিট হয়েছে। নিজের বড় একটা খোলাসে জল চা ভেরে যাদু ফের খড়ি পাকাতে বসে। মনে একটা সুরের ফুল সবসময়ে ফুটে থাকে আজকাল। গন্ধ ছড়ায়। চারী সংসার।

ছেলেবেলাটা মন্টুর ভাল কাটেনি। এখান থেকে মাইল দুই আড়াই পশ্চিমে সত্যেববাগানে তার তিন ভাই আর সাত বোন ছিল বলের সংসারে মহা অভাবনাক পাকাত। অভাবের সংসার। বাবা ছিল জি. টি. রেলের ফটকের দোকানে ভুজুনের মিস্ত্রী। বড় পিস্তুটো পনেরো বছর বয়সেই পালায়। নানা কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর পর এটা হয়ে ফিরে আসে। আবার কিছুদিন ঘরে পালায়। তারপর ঐ রকমই জীবন হয়ে গেল। এ ঘরে দুজনেই দুবার তিনবার ঘর করে ফিরে এসেছে। পরের বেলেরের গাড়িও চলে যায়নি। পরের দুজন স্বামীর ঘর করে না, বাপের ঘাড়ে বসে খায় এখনো। মন না করে বেড়ার ডা ছুঁয়ে মনা যায় না। ছোটোটা এখনো ছোটো, তার এখনো স্তোন ফোটেনি। মনেহয়ো এই সমনের ছন্টা দিয়ে কেমায় যেন যায়, তখন খুব মন্টুর মেজাজের দিকে তাকিয়ে দেখে। কথাটা বলে না। মন্টুর ঘর দুটো তাই আছে, মেজো জন ভরবনের চুকে গেল, ছোটো-জন ট্রাফিক ইনেকে খুলোয় বেলা-লালে। মন্টুই বড়। তা মন্টুও কিছু সুখের ছিল না। প্রায় সময়েই বাপের সঙ্গে লাঠালাঠি লেগে যেত। বাপ পালের বয়সে সে ঘরের গয়না চুরি করে সংসারের জন্য বেচতে গিয়ে-ছিল। সাতেরো বছর বয়সে সে এক কিশোরীর সর্বনাশ করে তাকে ইক্ষুবাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে। অবশ্যেরেতে একটা প্রায়-খুন করে ফেলেছিল শাঁখারীবাড়ির শিবনের পুরোনো পুকুরপাড়ের জঙ্গলে। বাপ তাই ছিল মন্টুকে তাড়াল। ছোটো ভাই চন্টুটা ছিল বড়ই কলাতে। পাড়ার লোকজনও ক্ষেপে গিয়ে এক-জোট হল তাকে মেরেধরে পুলিশে দেবে বলে। মন্টু পালাল।

পালিয়ে গেল আট কিলোমিটার দূরের হাওড়ায়। কারুকর্ম জোটে না তো জলের ট্যাঙ্কের ওপরে এক বাড়িতে চাকরের কাজ পেয়ে গেল। কাজ কিছু না। মনমরা মন্টুর বাচার সংসার। বৌদি অনাদি মন্টুকে হাতে ধরে রাখতে শিখিয়েছিল। তা রাখতে মন্টু, বাসনকোসন মাজতে, ঘরদোর সাফ করত। বৌদি তখন বাচ্চা হব-হব, মন্টু একদিন সকালে বসে গাঁড় পাকাচ্ছে। গাঁড় পাকানোর হাত ছিল ভালো প্রকৃর সময়ে সে পাকাতে। পাড়ার পুরি কিনে এনে দিচ্ছে, পুরি করে নিপুণ হাতে মন্টু মোটা নানা ধরনের গাঁড় পাকাতে পারত সে। পাড়ার-তলার পঞ্চমের দোকানে মন্টু বিক্রির জন্য দিয়ে আসত। তাতে দু-চার টাকা কামাই আসতে হাতে। তা সেই সকালে গাঁড় পাকাতে বসে মন্টু অন্য হয়ে গেছে। কাজের সময়ে তিন বোন করে, চোখ দুটো ছোটো আর ভুরুর মতো সরু করে চেয়ে থাকে যেন বাহ্যজ্ঞান থাকে না। পাটের সুতির একমনে কাঠি বাঁধা, অন্য হাত দরজার কড়ার লম্বা গাঁড়টা পাক খেয়ে খেয়ে পর হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সেই লম্বা গাঁড়টার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক মুহূর্তের জন্য একটা বিভ্রম হয়ে গেল। হঠাৎ যেন দেখতে পেল—একটা বাস-পাহাড়ের বাড়ি, বাচ্চা ট্রাঁ টাঁ করে কাঁদছে, একটা চৌকিল-ঘড়িতে রাত সাড়ে আটটা বাজে।

তখন নন্দবাবু ভাত খেয়ে অফিসে বেরোবে, তার সোয়েটার করছে বৌদি, টিকিনের বাক্স সাজিয়ে দিয়েছে, এক ফ্লেলাস জল গড়িয়ে রাখা আছে টেবিলে, তার চাকরি খুলে হাতে দেবে নন্দবাবুর। মস্ত সেটা নিয়ে বৌদি হাসিকাসি করতে করতে স্বামীর সেবাশোনা করছে। নন্দবাবু পায়ের মোজায় আটতে আটতে বলল—'কবে যে কখন ছুটি করে তোমার সেল উঠবে কে জানে! অফিসে গিয়ে দুশ্চিন্তায় কাজ করতে পারি না।'

বৌদি সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'হবে, এত চিন্তা কি! সকলেরই হয়। তা বলে অফিস কামাই করে বসে থাকবে নাকি!'

মন্টু ঘাড় ফেরে নিঃশব্দে উঠে এসে গম্ভীরভাবে বলল—'আজ রাত সাড়ে আটটায় তোমার ছেলে হবে বৌদি।'

সেই শুনে কটা-গিন্নী হেসে গড়িয়ে। নন্দবাবু অবশ্য হাসি সামলে বলল—কে জানে বাবা! ওরা গাঁয়ের লোক, জানতেও পারে অনেক গুহ্য কথা। ঠিক আছে মন্টু, তোর কথা যদি সত্যি হলে তো তোকে একটা কিছু দেবো। আজ অফিস থেকে হাফ্-ডে করে চলে আসছি।'

তাই এসেছিল নন্দবাবু। ঠিক সাড়ে তিনটেয় বৌদির ব্যথা উঠল। টাক্সি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। রাত ঠিক সাড়ে আটটায় বৌদির একটা ফুটফুটে মেয়ে হল। এমনভাবে মিলে গেল ঘটনাটা যে মন্টুর নিজেরই প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি। যেন স্বপ্ন দেখছে।

নন্দবাবু মেয়ে হওয়ায় তাজেলায় ছোটোমোটি করে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাতে বাসায় ফিরে মন্টুর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ চোখে জল এসে গেল, ধরা গলায় বলল—মন্টু, তুই কি ভগবান? কেমন করে বুঝলি বল তো, সব যে কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল! তুই না বললে আমি আজ পুরো অফিস করে সেই রাত সাতটায় এসে পৌঁছোতাম, তোর বৌদিও কি অবশ্য হত বল বৌদি!'

মন্টু নিজেও এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে কথা বলতে পারেনি। নন্দবাবু মেয়ে হওয়ার পর খুশী হয়ে তাকে যতটার কাছে যা চেয়ে ছিল তাই পুরো দিল। তার মধ্যে ছিল একটা চৌরিলিনের দামী শার্ট, একটা সোনার আংটি আর ঐ চৌকিল-ঘড়িটা। এরপর থেকে নন্দবাবুর বন্ধু-বান্ধব জানাশি অনেকেই মন্টুর খোঁজ আসত। সকলেই ভবিষ্যৎ জিজ্ঞেস করে। কিন্তু মন্টু তার কি জানে! সে কিছু বলতে পারত না। নন্দবাবুর এক বন্ধু এসব বুজরুকী বিশ্বাস করত না, প্রায়ই এসে বলত—কি হে মন্টু ভগবান, আর কি সব দেখছ বলো! অন্তরঙ্গে একটা চিল খুব লাগিয়েছো, এবার আরো কিছু ছাড়ো।'

মন্টু মনে মনে উত্তেজিত হত। রোজই সকালে ঘাঁড় পাকাতে সে কিন্তু আর ওরকম ধারা হয় না। রোজই সে ভাবে করে আজও ঘাঁড় পাকাতে বসলে কি না কি দেখতে পাবে। পায় না। তাই ঠাট্টা কিছুপ বা লোকের ভবিষ্যৎ জানবার আগ্রহ দেখে ফেলে যায়।

এইভাবে দিন যায়। বৌদির বাচ্চাটা দুমাস বয়সে ঝিক্ক সেয়ানা হয়ে উঠল। মন্টুকে দেখলেই খুশী। কোলে উঠে বেড়াবে। বড় মায়া পড়ে গিয়েছিল মন্টুর। সেই সময়ে একদিন ভোর সকালবেলায় অন্যমনস্ক হয়ে ঘাঁড় পাকাতে পাকাতে মন্টু অন্ধ হয়ে যায়, লম্বা গাঁড়টার ওপর মনোযোগী চোখ। দেখছে যেন শূন্যের মাঝখানে একটা লম্বা পথ চলে গেছে কাঁহা-কাঁহা মুলুকে। চেয়ে চেয়ে হঠাৎ মাথার মাঝ-খানটায় যেন একটা আলো জ্বলে উঠল। দেখতে পেল, হাওড়া ময়দানের মোড় থেকে একটা তিপ্পান্ন নম্বর বাস পলাশতলা রোডে ঢুকে একটা কম-বয়সী ছেলেকে বেকড়া ধাক্কা মেরেছে। তাই হৈ-চৈ করে লোকজন ছুটেছে বাসটাকে ধরতে। বাসওলা প্রাণপণে বাস চালিয়ে দিয়েছে। সরু ভরপুর রাস্তা, পরে পরে বিপদ। তবু প্রাণের ভয়ে পালল ড্রাইভার দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে বোমারু পক্ষীরাজ মাইল স্পীডে বাস ছেড়ে দিয়েছে। বাসের মধ্যে শুদ্ধই লোক প্রাণভয়ে চেচাচ্ছে —এখন অ্যাকসিডেন্ট হয়। হলও। লক্ষ্মণদাস লেন পৌঁছনর পরের স্টপের কাছাকাছি বাসটা মুখোমুখী একটা লরীর সঙ্গে ভিক্টিয়ে দিল। এইসব যখনই দেখে মন্টু, সেই সঙ্গে একটা ঘাঁড়ের কাঁটাও কি করে যেন দেখতে পায়। তখন ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজে। জখম বাস থেকে রাস্তায় লোক ধরাধরি করে লোক নামাচ্ছে। তার মধ্যে নন্দবাবু। নন্দবাবুর পেটে একটা বড় রকমের জখম। চোখ চেয়ে কাতরে —জল! জল!

মন্টু সেদিনও ফিরে বলল—দাদা-বাবু আজ বেরিও না।

নন্দবাবু বলে—বেরোবো না কি রে! অফিসে অডিট হচ্ছে।'

মন্টু আর কিছু বলেনি।

বৌদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—'বেরোতে বারণ করলি কেন?'

মন্টু মাথা নেড়ে চলে এল। ভাঙল না। মনে মনে সে একটা মতলব ভেজেছিল, তার মেজাজটা সত্যি হয় কিনা সেটা আমার বলাই হওয়া দরকার। একবারেটা মিলে গেছে বলেই যে পরের বারেরটাও মিলে-যাবে তার ঠিক কি? নন্দবাবু যদি না-ই বেরোয় তবে প্রমাণ হবে কি করে যে সে যা দেখেছে তা সত্যি!

মিলেছিল। ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে সাত-

শ্যামল হোসেন খাঁ

টার বেলিলিয়াস লেন-এর কাছে তিপ্পান্ন নম্বর একটা বাড়ি খুঁজে বার করে সেখানে গেল একটা লড়াই করতে। ঠিক ঐখানে বাড়ির খুশকী চোখের সামনে দেখল মন্টু। হারাধনকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে একবারে এসে ঘরে ঢুকল বৌদিকে।

পরদিন সকালেই মন্টু সে বাড়ি থেকে হেঁটে এল।

হারাধন সাঁতরায় লেন মেশিন চালানোর কাজ যখন করত তখন কষ্ট ছিল বেশী। তার চেয়ে সেই বাড়ীর কাজ ছিল অনেক আরামের। মালাবাবু, বৌদি, বাচ্চাটা সবাই মিলে যে সংসার তার জুড়েই সে চুকে গিয়েছিল যে। হারাধন ছিল লক্ষ্মণ-দাস লেনের হাজরা মাস্টার। অবশ্য পড়ানো-টড়ানো করবার দরোম ছিল না, কিন্তু ভাক-হাঁক খুব। ওপরতলার দু শট অংশে তার লেদ মেশিনের কারখানা। কারখানা বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য নয়। একখানা লেদ একটা ছোট্ট খুপড়ির মধ্যে। হারাধন বলত—ভারখানা, প্রেসেই, ইন্ডাস্ট্রি। সাইকেলে চেপে আসত, এসেই সাইকেল-খানা বাইরে রেখে ভিতরে ঢুকে মন্টুকে মেজাজ নিয়ে বলত—'মাস্কিটা তুলে রাখ তো।' সাইকেলকে মাস্কিট বলবার মধ্যে যে মাস্কি থাকত সে। তার হাতে মন্টু চড়টা চালকড়ি খেয়েছে, কিন্তু খুব যত্ন আর অধ্যবসায় দিয়ে ঐ হারাধনের কাছেই সে লেদ মেশিনের কাজ খানিকটা শিখেছিল। খুপড়িতেই থাকত। সেখানেও সেই বাড়ি পাওনাদার অত্যাচারটা ছাড়তে পারেনি সে।

অঘ্রাণের দিন কৈলাস ব্যানার্জি লেন-এর এক টিমটে জমিতে টেনিস বলের একটা ফুটবল ম্যাচ হচ্ছিল। তাইতে যে কাউকে লেগি মারে। হারাধন তাই নিয়ে যে লেগি মেরেছিল তাকে ধরে এনে ঘুঁষোর বা মেরে। ঘুঁষোঘুঁষি গুন্ডামী দেখালো। বেরবার সময় মনে মনে হারাধন অবশ্যই খুশী হওয়ার ইচ্ছে পুষে রেখেছিল, কিন্তু না-জোয়ানী-হেই তো আর সব হয় না। হারাধন-কেও কেউ খুশী বা মস্তান বলে স্বীকার করেনি কোনোকালে। ঘরে মাগ-ছেলে, বুড়ো বাপ, তাই সব সামলে, লেদ চালিয়ে খুশী হওয়ার ফরসতও পড়ত না তার। কিন্তু ঐ রাতে মাঝে ভিতরকার আসরটা ইচ্ছেটা চাগাড় দিত। তখনই ঘুঁষোঘুঁষি, চার কিলোমিটার একে ওকে ধরে ঘুঁচোর মা লাগিয়ে দিয়ে হচ্ছিল। সেই ইচ্ছে-পূরণের দায়টার কিছু মন্টুর ওপর দিয়েও গেছে।

ফুটবল খেলার সেই জলসার পরদিন সকালে মন্টু বাড়ি পাওনাদার হাজির হয়ে গেল, আজও একটা জলসা ঘটতে পারত। সে দেখল, হারাধন বেশ খুশীর মুখে সাইকেল বের করছে। রাস্তায় নামতেই একটা ছেলে এসে ছিনে কেলল। করুণ মুখে যা নেই। হাতে ধরা তার ঝোলাটা। একটা স্প্যান কেলার সময়ও না দিয়ে একজন ধরে দিয়ে হারাধনকে বাজল, একজন সাইকেলটা সাঁড়িয়ে নিল টেনে। হারাধন পড়ে গিয়ে বেশ উঠে দৌড়েছে। যে ছেলেটার হাতে ঝোলাটা সে একটা অন্ধকার গলি দিয়ে ঢিল সামনে থেকে পেছনে ঘুরে ঘুরে ঢিল। হারাধন পড়ে গেছে হাঁটু ছেড়ে, তার সামনেই রহমানা নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ে আছে রাস্তায়, তাকাই পেট থেকে। অবাক হারাধন ভাবে বাঁচবে বলে সেই নাড়ি-ভুঁড়ি ভুঁড়িয়ে নিয়ে দু হাতের আঞ্জলায় ধরবার চেষ্টা করছে। পারল না, কিন্তু পরীক্ষা ঐ অবস্থাতেও অনেকখানি টেনে তুলেছিল। হাসপাতি আছে। পিছন থেকে ধাক্কায় ওরা এক ধা ধাক্কা একজন। তারপরই সব ফো ফো হয়ে গেল।

একটা ছেলেই মন্টু বুঝল, আজ হারাধনের দেখা দিব। তাই মনে মনে তৈরি হল, আজই ছোট পড়তে হবে।

সেদিন হারাধন এল একটু বেলা করে। খুব চটে ছিল সেদিন। দোকানে চুকেই ঝনক টনক। কিন্তু বারবারই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। বার বার নিখাচ্ছে যাচ্ছে, আর জল। একবার বলল—'জানিস, আমাকে পাওনার ওয়ার্নিং দিয়ে গেছে।'

অবাক হয়ে মন্টু বলে—'কারা?'

হারাধন ধমক মেরে বলে—'তোর তাতে দরকার কি?'

মন্টু কিন্তু করে হেসে বলে—'দরকার আমার কি!'

—'হারামজাদা যে!'

মন্টু না দেখেছিলে বলল—'হারাধনদা, তুমি তো ভাইদের সঙ্গে একমালী বাড়িতে থাকো। নিজের হিস্যা বুঝে নাওনি? আজ যদি তোমার ভাগলব্ধ কিছু হয় তো বৌদির আর বাচ্চার কি হবে?'

হারাধন কিন্তু হেসে দেল না। একবার পরম চোখে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।

মন্টু বলল—'আজ বরং অফেসময়ে বাড়ি চলে যাও। কাজ যা দেখার আমিই দেখবখন।'

—'কেন, বাড়ি যাবো কেন?'

—'ঐ যে কারা তার খোঁজখবর বললে যে!'

—'ওরা তার। আমি কারো পরোয়া করি নাকি?'

—'তবু যাও। কাজ তো তেমন কিছু নেই। আমি দেখবখন।'

হারাধন বিশ ঢিল বিশ, খুব্বল ভিজল একটু। তারপরে বলল—'ও বেলাটা থাকি। ও বেলাটা না হয় তুই চালাস। দিনের বেলায় আর গালাগা আসবে না। অত সাহস নেই।'

মন্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সকালে ঐ খুশীটা দেখার পরই সে তার নিজের দেহটাকে পুটলি সাঁজিয়ে তুবিওলার তাকে রেখে এসেছিল। খুব্বল হওয়ার অনেক আগেই সরে পড়বার তাগাদা ছিল। কিন্তু তখন, খাবলে, দেখেই যাই, করে কি না।

হারাধন খুশুরে বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠতেই মন্টু বলল—'দাদা, একটা কথা বলি।'

চোখ পাকিয়ে হারাধন বলে—'খুব যে যেলা ফুটেছে যে আজ!'

—'না। বলছিলাম রাস্তায় যদি হঠাৎ পড়েই যাও তো তুমি ডাক্তারকে আগে ঠিক বোঝের মধ্যে। কিন্তু টানা হ্যাঁচড়ায় হাতের ঘড়ি, পকেটের টাকা না হক ছোট হয়ে যেতে পারে। বলছিলাম কি, এসব রেখে খালি হাতে পকেটে যাও।'

হারাধন জানবার পড়ল, তার ভয় ভাবনা চুকেছে তখন। বলল—'রেখে যেলে হাতাবি না তো!'

মন্টু সত্যি কথা বলে ফেলল—'তোমার ভালমন্দ কিছু না হলে হাতাব না, বাজে দিলাম। কিন্তু যদি তুমি টেসে-ফেসে যাও তো ঐ দিয়ে আমার হকের পাওনা মিটিয়ে নেবো।'

হারাধন জবাব মন্টু ঠাট্টা করছে। তাই একটা হুঁহু নাকি কাঁদিয়ে বলল—'উঁহু। পাজির পাওনাদার! ক পয়সা পাস শুনি?'

মন্টু তখন সময় দেখছে। আর মোট দশ মিনিট। তারপরই হারাধন দুনিয়ার বেড়া ডিঙিয়ে যাবে। সে কেন নিজের পাওনাদার হবে! অন্তত দু মাসের পঁচাত্তর টাকা করে বেতন টাকা পাওনা।

শেষ পর্যন্ত হারাধন ঘড়ি আর টাকা দোকে রেখে গেল। সে বেরোতেই মেশিনঘরের ঘরজা বন্ধ করে মন্টু একটা ফোকর দিয়ে খুশীটা দেখতে লাগল। হুবহু সকলে যা দেখেছিল।

পুলিশ যখন এল তখন মন্টু ভাল-মানুষ। ঘড়ি আর টাকার দোকে লেদ মেশিনের তলায় চালান হয়ে গেছে। পরে খুঁজে দেখেছে, দোকেতে সাতশ' টাকা, ঘড়িটা বেচে প্রায় পনেরশোর দেরোঁছল। তা এই টাকা আর ঘড়ি হারাধনের বৌকে ফেরৎ দেওয়ারই ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু মোটেলোক হওয়ার বিপদ এই যে, ভাল কাজ করতে গেলে ফেসে যাওয়ার ভয় থাকে। ফেরৎ দিতে গেলে যদি চোর বলে সন্দেহ করে, যদি খুনের সঙ্গে জড়ানোর চেষ্টা করে? সেই ভয়ে দেয়নি মন্টু।

সেই টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে এল বালী খুশুরে। নিজের বাড়িতে আর খেলনা। ছুপ্তা বাজারেই তখন নন্দদুলাল সা-র দোকান উঠে যাচ্ছে। নন্দদুলাল একটা মিষ্টির দোকান করত। তাকেকেন্দ্রের জলযানা ঘেরে চায়ের খুড়ো কি খুঁচিকুঁচি মিষ্টির খুশের চিনির পাকে বড় বড় সন্দেশ চমচমেরা পান্তুয়া সাজিয়ে বসত। কে কেনে? একে অঘানা, তার ওপর এখানকার হাওয়ে লোকের পকেটে অত পয়সা নেই। তবু টুকটাক চালাচ্ছিল নন্দদুলাল। বয়স হয়েছিল, একদিন কিন্ন মোটিমে হার্টফেল করে। তার ছেলেরা সব বাইরেথাকে। বাপের ব্যবসা করতে কেউ এল না। সেই অবস্থায় বাড়িওলাকে পটিয়ে দোকানটা হস্তান্তর নেয় মন্টু।

বেশ আছে। মিষ্টির বদলে চা আর বিস্কুটের চাহিদা ঢের বেশী। রমরম করে দোকান চলে। অনেক বছরে মন্টুর হাতে পয়সা কিছু কম জমেনি।

আজের সাকরেদ বয়সের ঘুটো খালী সোডার বোতল থেকে টেনে এনে উঁচু দোকানঘরের ধারে রেখে যাচ্ছে। প্রথম খালীটা জবাই জবার আগে আর এক গেলাস চা খায়, যার একটা কেরোসিনের ঘুটি। অনেকও তাই। ঘুটো কোতাটির ঘুটি আর দু গেলাস চা খাবাই স্থিরে আজের দোকানে পৌঁছে দিয়ে এল। আজ চায়ে ভিজিয়ে ঘুটির বলা গিলে কেলছে ঢোক ঢোক করে। খালী ডাকল—মা।

খদ্দের কাজকাওয়া কামলাটা ভিতর বসে ঘুড়ে দিয়েই সাইকেলে হাওয়া হয়ে গেল। খোঁটা চায়ের হাত কামলাটা ধরে জলা ছেড়ে যাবে মন্টু কামলাটা ঘুরেও দেখে না একবার বাড়ি থাকবে। কিন্তুক্ষণ, এক কাঁড়ওলা বড়িতে সেই সাড়ে সাতটা বাজবে অমনি এসব কাজ বন্ধ করে মন্টু পুরো দোকানদার হয়ে যাবে। ঐ সময়টায় কুড়ো কাঁচা ছেলে-পুলেরা আসে লজেন্স চাঁক কিনতে। পানও বানাতে হয়।

হপ্তা বাজারের রাস্তা দিয়ে আজও বেলটা বাজছে। সবচেয়ে ছোট্টো, বয়স এখনো বেয়ারা হেরো পুরে ঘুরানি। রোমশ্ট, কালো চেহারা, জলা বেলে-দের মতো হলুদে নয়। চোখ খুব সুশ্রী খুব না হোক, নরম সরল আছে। চোখ ঘুটোয় এখনো সিন্দুর হারবার আছে। পরনের শার্টটা খুব পরিষ্কার নয়, কমদামী তাতেও। শার্ট পরার বয়স নয়, বেয়ারার চক তেমন ভাল লাগে না, না হয় তো নেই। বিশিদের কারো শার্ট চেয়ে পড়েছে। হাউজের রং আলাদা। পায়ে একটা হাওয়াই চটি। এই শহরে অভিজাতও পায়ে জুতো নি, খরমজামা তো দূরের কথা। আজও হাঁ করে হাকতে তাকিয়ে আছে।

বাস হাইয়ের সঙ্গে যেমন, তেমনি বেয়ারের সঙ্গেও মন্টুর কোনো সম্পর্ক নেই। ছোট্টো চায়ের হাউজে দোকান করে পয়সা করেছে, তুমি ছিনতাই ওরকম ভাড়া সবাই করে সেই সূত্রে। এখনে ফিরে আসবার পর সেই সবচেয়ে বেশী হামলা অবৈধ মন্টুর ওপর। বাবা তো তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে বলে প্রায় কি! বড় ভাই কিরে আসবে আর এক কেরোসা বোতল, রেজিস্টের এক বান্ডা নিয়ে সে এসে আমদানি করে উঠবে ভেবেছিল, পারেনি। ইমানীং বড় ভাই কারখানার আলাদা নিচ্ছে। সমানে এখন ছোটোজনই দেখে। সেই সমস্তে

কথা। আর তার সঙ্গেই মন্টুর একদম ভাব নেই। পাশের ফ্ল্যাটের ছেলে, সমবয়সী—ভাবনার সীমা ডিঙোলে পড়তে হবে। তা মন্টুও ধরা দেয় না, ধরাবার কোনো ইচ্ছেও হয় না। সেই জন্যই বোধহয় মন্টুর সঙ্গে নিশ্চলে যা কথা বলে ঘাড় থেকে নামিয়ে দেয়। তার খুব সম্মান-বোধ। মন্টু যে সেই এক বাড়িতে চাকরের কাজ করে—সেটাই এখনে চেষ্টা হয়ে ওঠে আর মন্টুকে দেখতে পারে না চন্টু। তা না দেখতে পাওয়া কিছু খারাপ নয়। তবু ঐ চন্টু যে সময়ের দেখায় এটাও তো কম না।

মনে মনে চন্টুকে দেখে মন্টু। পেয়ারা চুরিয়েছে। কিছুদিন লিলুয়ের সিঙ্গারা কমে তালিম নিয়েছিল। বাপ্পুলটুবের অভিনয় ব্যায়াম-ট্যায়াম করে। সিঙ্গারা কয়েক চকাতির লড়তাও তালাই নেওয়া আছে। মাধ্যমিক নয়ে এক পাশমা এক সময়ে এখনে ওয়াশন ভাস্কিয়ে-দের সর্দার ছিল, তার ঠাকুরই ছিল আলাদা। তা তাকে কোনোদিন করে চন্টুদেরই এখন রবাবা। অবশ্য ওয়াশন জায়। এখন আর তেমন সহজ নয়। তবু চালতেও তো দেখ নেই। চন্টু পরাক্রমশালী ঘটীর নিজে বল-হলের মধ্যে এখনে সেখনে রাজা-রাজড়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। আর প্রায়ন চন্দ্রা মাধিকরম এখন বাঁধনো ফটকায় পুকুর ধরে ছাড়ি আর তিন তাস নিয়ে বসে সাহেবদের সঙ্গে। সেও কিছু খারাপ নেই। একরকম যা করছে তাতেই চলে যায়। সমাধানরা খানিক জমি ছেড়ে দিয়েছে, তাতে দোকান হাঁকড়ে তালই আয় হয়। কিছু ছোলা আবার হয় ছেলেদের ভিকেলের অনাদ্য বাপারীদের কাছ থেকে, ইউবোলার মাঠেদার দেয়, সাট্টাওয়ালা দেয়, ফুটবলের সর্দার দেয়, ফুচার জন মহাজনও দেয়, সাবজেক্ট-টাও বসে থাকে না। বেশ্যে বেশ্যে সংসার ধরলাও হয়ালা করে।

হেডমাস্টারের ঘরে সবই দেখে মন্টু। দিনকাল খারাপ পড়েছে। কাউকে কিছু বলার নেই। যে যত চুপ করে থাকতে পারে সে তত বুদ্ধিমান। সে সকালে ঘাঁড় পাকায়, সারাদিন চা ছোটে, পান বলায়, সন্ধ্যা হলে পালা দেখে, চাকরদের বাপের নিয়ে আধা যাবার যায় না।

বাপকে বন্ধুকলা দেখা যায় না এদিকে। এক একসময় ভাবে, টেঁসে গেল নাকি। সেবারমন্দিরে বিশ্রিন এবাদিন ধরে ফিরে গেল, স্ট্রোক হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা। মন্টু খুব গা করেনি। টাঁসলে টাঁসবে। বয়স তো হল।

যত সপ্তাহ হয়ে এই ঘরটাই বন্ধ করে দেখা হয়ে গেল। একটা বিপ্লবে সাহিত্যের বাঁধাকপি ওজন করছে। খুব রোদা হয়ে গেছে। পাটের কলমের ওপর দিয়ে পরার খুকনো নদীটা দেখা যাচ্ছে। চোখ কচের মতো প্রসারিত। মন্টু সময়ে দিয়ে দু-একবার চোরেদো করল হাওয়া খুকবার জন্য। তা বাস তাকে চিনতে চাইল না। খুব বিরক্ত আর বিরস মুখটা ফিরিয়ে নিল।

মন্টু হাওয়া খুকে গেছে। তাই পরিবারের লোকজন নিয়ে আসা যাওয়া করে না। কিন্তু একটা ঘটনা থেকে যায়। রোজ সকালে বোনটা যায় কোথায়?

ডেকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। হয়তো উত্তর দেবে না, নয়তো চন্টুকে গিয়ে বলে দেবে। চন্টু এসে হাঙ্গামা করতে পারে।

আজ বাড়ি পাকানো ছেলে কাঁপের মুখুর্যাকে এগিয়ে এসে একটু চেয়ে থাকল মন্টু। বেলেঘাটা হাসপাতালের পর হয়ে সোজা যাচ্ছে জি. টি. রোডের দিকে। একটু এগিয়েই পিছু ফিরে মন্টুকে দেখল। দাঁড়াল।

একটু ইতস্তত ভাব। কথা বলতে চায় নাকি।

তাড়াহুড়া নয়, ঐ একটু, কেমন ফরল মন্টুর। হাতঘড়ি দিয়ে তাকাল। ওমা। হাইতে মিনিট খুটে খুটে করে ঘুরে আসতে থাকল মেয়েটা। মুখে একটু লজ্জুকে হাসি। চোখে ভয়।

কাছে আসতে জিজ্ঞেস করল—চা খাবি একটু?

মেয়েটা ভয়ের চোখে চেয়ে ঘাড় নাড়ল, খাবে না।

—কোথায় যাচ্ছিস?

মুখুর্যের বলে—'কাজে।'

—কাজে?' বলে অবাক হয় মন্টু—কাজ কিসের?

মেয়েটা হাত তুলে জি. টি. রোডের দিকটা দেখিয়ে বলে—ওখানে একটা ইস্কুলে কাজ পেয়েছি।'

ইস্কুলের কাজ শুনে আরো অবাক হয় মন্টু। বলে—কি কাজ? পড়াস নাকি?'

—না।' বলে আরো লজ্জিত হয়ে বলে—'ঝাঁটান কাজ।'

অপেরা ভয়ে সব। দেখছে। সকলের সামনে আর জিজ্ঞেসবাদ করে না মন্টু। তবে বুঝতে পারল, ইস্কুলে ঝাড়া মেয়ের কাজ বা কিসের কাজ দেয়েছে।

মন্টু বলল—'অনেক দূরে যেতে হোটে যাবিনে, একটু চা খেয়ে যা। ঐ কিসেরের দিকে আলমারীর পিছনে আড়ালে বসার জায়গা আছে। যা।'

চা বোনটা একটু ভেবেনিয়ে দুই ভয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। বলল—'অনেক আগেকটা পর ইস্কুল যাব।'

অর্থাৎ এই আগেকটা সে এখনে কিয়েতে চায়, মুখের কিছু কথাও বোধ করি বলার ইচ্ছে। এক ফোলাস চা আর একটা কেক নিজের হয়েই নিয়ে গিয়ে আলমারীর পিছনে লাজুকভয়ে বসে-থাকা বাসন্তীর পাশে রেখে মন্টুকে দেখে বলল—খা। চাকরি করছিস কেন?'

—না করে কি করব? ছোকরা বোনগুলো বিদায় হয়েছে ভয়ে খুশীই হয়েছে মন্টু। সেগুলোর যে পরিই হোক, কিছু যায় আসে না। কিন্তু বাসন্তীটা এখনো কচ্চ ছোট্ট। ওকে না তাড়ালেও পারে চন্টু।

সারাদিন নানা কাজের ফাঁকেও মন্টু একটু অন্যমনস্ক থাকে। দুপুরে বড়-ধারার ছেলে সংবাদ করে আসে। বিকেলে খেলাধুলো কেলে করে বসে থাকে চড়া পাঁচের আসে। হেডমাস্টার গমগম করে এখন। কিন্তুর অপেরা। ঘন্টাই একা হিসাবিস্ত থায়। কিন্তু মন্টু নিজে খুব একটা হাত লাগায় না। এ বেলাকার বাকির অপেরার ছেলে নয়েরা অপেরাই বেশী। অতেরো পয়সা দেরও না ঘাবড়ে খাওয়ার লোক আছে পৃথিবীতে। আজ বড়বাজারও বেশী ছেয়ে। সামনের সপ্তাহে কিম্বুটের দামও বাড়বে, কেক-রুটির দামও। সবই বাড়তে হবে।

মন্টুর মেজাজটা নেই। ছেলেবেলার ভবার তাড়ি ঢোলাই খেয়েছিল। ধরা জ্বালা করে ধরি হয়ে ছেয়ে, তাই খায় না। বিড়ি-সিগারেটও ভাল লাগে না, ভলভলে বোঁয়া গিলে ফালতু ঢোয়াল ব্যথা। সে কেবল গড়গড়ু দিয়ে সকালে গাঁত আছে। সেইটেই একমাত্র নেশা। আর মাঝে মাঝে সিঙ্গিমাল সিরুওয়া খেলী ভলে তাকে জল দেয়, সেইটে ঠোঁটে মেলে ছেখে চিকিক চিকিক খুব ভেলে।

দিন ছিনেক কেটে গেল। ছেলেদের আটেনডেন্স পিছনে মন্টুর একটেরে

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বাড়ি। এদের অবস্থা এক সময়ে ভাল ছিল। যেমন, দত্ত এরা সব যে দোকান পসার আর বাড়িঘর করেছে সে সবই ওদেরই বাপ কিনে। এখন বিধবা নন্দীগিন্নী দুই মেয়ে আর চার ছেলে নিয়ে থাকে। বড় ছেলে দুজন আর বড় মেয়ে সবাই চাকরি করে। ভাল চাকরি নয়। ছেলে দুজনের একজন লিলুয়ার এক লোহার কারখানায়, অন্যজন হেদোর ধারে কোন স্টোরে। মেয়েটাও লেখাপড়া তেমন শেখেনি বলে একটা ওষুধ কোম্পানীর সিলি বোতলে মোমর কাজ করে।

সেই মেয়েটাই এখন ঘুমুচ্ছে।

বুটে-বকমেলা আজকাল একদম পছন্দ নয় মনুর। এই বোধা যাচ্ছেলাল, ওই টাঁ ডাকা চিমাকা, আর আবদুকো সবই—এ হলেই তার চলে যায়। আর কাউকে লাগে না। এই দোকানটাই তার ভরসা। নিজেকে বিশ্বাস এই দোকানে কিনে করে নিয়েছে মনু। কেউ যদি উঠ্‌কো ছোড়ে এসে, নন্দীদের মেয়ে বা আর কেউ তো এসেই হুড়ো মেরে বাড়ি যাবা ঘোমো, বাজে পলদে আসো, ঘুমোবেন আসনা শাড়ি যোমান যাও। পরের মেয়ে এসে বুকে হাঁটু দিয়ে আমায় করবে।

কিন্তু নন্দীদের ছোটো জামাইবাবু কেমনের খুব। মেয়েছেলে, তার সাজ-ভাবর বলতে যা আর ভাইবোনো। মা মেয়ে পরস্পরের জন্যে দুশ্চিন্তায় মরে আছে, ভাইবোনও পরস্পরকে নয়। মনু হস্তাবাজারে চালু দোকানের মালিক, পয়সা টয়সা করেছে, পাত্র খারাপ না। বরং নন্দীদের ছেলে কুসুমের তুলনায় বড় বেশী ভাল। কুসুম কালো, স্বাস্থ্যবানা ভাল হলেও মুখশ্রী ভাল নয়। লোলপানা বেকুলমুখো। তার ওপর ঘর-মেজাজ। মেজাজও খুব একটু; তা সে বাড়ির ভিতে ভাল দেখে মনে মনে ছিপ্ ফেলতে বেত মনু। মহুকালের চেনা সব। মেয়েছেলের মন কখনো মনটা তেমন খারাপ মেরে যায় না। সেই লোভে যাওয়া।

তিন দিনের মধ্যেই বোম ধরি মনুর হাত নিজের কোলে তুলে নিয়ে কুসুম খুব নরম সরম কথা কইতে শুরু করে। মাসখানেকের মধ্যেই মনু তাকে চুমো দেয়। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু আজকাল কুসুম বড় তেজী গলায় সে সব কথা পাড়া জানান দিয়ে শোনায় তাকে—'বিয়ে কবে করছ শুনি?'

—'বিয়ে!' শুনে বড় বিপদায় পড়ে যায় মনু। লজ্জাও করে।

কুসুম কেঁদে বলে—'বিয়ে না করলে আমার গতিটা কি হবে শুনি। আমার শরীর ছুঁয়েছো, কলঙ্কে ফেলে আর আমার জীবন কি। এটো করে ফেলে যাওয়ার মতলব নাকি? ওসব হবে না। তবে বিয়ে করবে বলো। [illegible] যাও।'

—সে কথাটাও বেশী আছে।' মনুও একটু থমকে থেকে বলে—'বিয়ে কি খেলনা নাকি।'

—যদি খেলনাই করো তো চন্দুকে ঘরে রেখে, বলে রাখলাম। সবাই জানে, তুমি এ বাড়িতে যাতায়াত করো। পরাণ পেছে নষ্ট করে চলে যাবে, সে হবে না। এখনো ছোটো-লোক হয়ে যাইনি, বুঝলে।'

চন্দুর নামে একটু ভয় পায় মনু। চন্দুর সঙ্গে এখনো তার সম্পর্কের স্বচ্ছতা ফুটেনি ঠিকই। চন্দু তার জন্ম নিয়ে আছে, মনু পড়ে আছে হস্তা-বাজারে। কিন্তু যদি চন্দুকে কেউ লাগিয়ে দেয় তো কিন্তুর মুস্কিল হবে। কেন হবে তা মনু জানে না। কিন্তু হবে।

আজ হঠাৎ ভোর পাঁচেরোর কুসুমে স্টেশনে নেমে সন্ধে ছটার অন্ধকারে এসে দোকানের সামনে দাঁড়াল। ভিতরে লোক সিগারেট কিনছে। ধমকল অবস্থা। তার মধ্যেই মনু দেখতে পেল, হাতখানি দিয়ে কুসুম ডাকছে।

দোকানদারের ওপর মনু বোঝার এল।

—'কি ব্যাপার?' মনু জিজ্ঞেস করে।

—'তোমার ব্যাপারখানা কি?'

—'কিছু না। কিস্তিপাতা মন্দা। ভাবছি দোকান তুলে দিয়ে বেনারস চলে যাবো।'

একটু থমকে চেয়ে কুসুমে বলে —'তা যাবে তো কি। কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে আমার সিথের একটু সিন্দুর ছুঁইয়ে যাও কাল। তারপর যা হয় হোক।'

মনু বাজারের গা-ঘেষা দোকানের মতো দাঁড়িয়ে একথা শুনে শিউরে উঠল। কলল—'অত তাড়া কিসের?'

—'তাড়াহুড়োর কথা নয়। বলা তো চলে যাচ্ছে।'

—'একদিন দুদিনে আর বলা কি করবে?'

—'একদিন দুদিন মানে? তুমি কি দুদিন বাদে বিয়ে করবে নাকি? তোমাকে আমি চিনি।'

মনু বিরক্ত হয়ে বলে—'পাঁচজন শুনছে। এখন বাড়ি যাও।'

কুসুমে বলল—'ধৈর্য থাকে না বুঝলে। রোজ সেই সিকদার পর্যন্ত ঠেঙিয়ে শরীর জল দুই পুকিয়ে যেন। একলার আর করে বিয়ের সুখ করব বলো তো। বাজারে কি?' তারপর গলায় মিনতি ঢেলে বলে—'বিয়েটা করেই যেন। এখন যেমন চেহারা আর কলঙ্কটে মনে হয় আমাকে, মোটেই তেমন নয়। আমার পেছনে আমি তোমার ওষুধেসের চেয়েও ঠান্ডা। ঠকবে না। যা চাও সব আমি দিতে পারি।'

মেয়েছেলে মনু চেনে। তার ওপর কুসুমে। এই একা থাকার সুখ ফর্সা লাইন বেয়ে চলে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে কুসুমের সঙ্গে চলাপাড়ি পর্যন্ত যেন মনু। বিয়ের দোকানে উঁচু হয়ে বসে সন্ধ্যার নম্বর বাড়াই করছে ছুরোড়িয়া। মাতাল চলেছে টলতে টলতে। বেরোসিনের টেমির গন্ধে ম ম করছে চলাপাড়ি। ডাক্তারখানার বুকে ঘুড়ো আলোবাতি জ্বলে আছে। বড়বাজারের সওদা ভাঙা বাস নিয়ে ঘুরোপুরে, সরবরাহকারী, সাহেববাগানের ফেরো পাসেঞ্জারেরা ফিরছে।

মনু যেমনের করে বলল—'আজ যাও। পরে ভাববখন।'

—'তোমার জন্যেনকে বড় ভয় পাই। আর কত ভাববে শো? পাকুর পাকুরন আজো ঝুলছে। বলে যায় না নাকি। বলতে বলতে গলাটা ধরে হয়ে ওঠে।

বেরেছে মনু। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেমন করে মোক ওর একটা পথের চাই। এখন যায় মনু থাকা জন্য কেও ওকে ঘিরে করে তো একটাস বিয়ে বসবে। ওর মুখচোখে সেই খাই-খাই ভাব। মনুর বড় মনখারাপ হয়ে যায়। ভাগ-পাতকে যা ওতে কুসুমই ঝুলছে কপালে।

কুসুমকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিল মনু একটা মাড়ী খেলুড়ে বলল তাকে। মনু সকালে বসে বাড়ি পাকাবার সময়ে মাঝে মাঝে যে সব ভাববখানী করে তার কথা কিছু লোক জানে। অনেকে বিশ্বাস করে, অনেকে করে না।

সেলুনওলা শিবপদ বলল—'বাবা, দোকানে এসে বেলো থাকিক। কথা আছে।'

শিবপদর কি কথা তা মনু জানে। মাথা নেড়ে বলে—'সময় নেই।'

—'হুঁ' মিনিট। তোমাকে দেখেই হেলেতাজা আর চা বলে দিয়েছি। এস বলে।'

হাত ধরে শিবপদ তার সেলুনে নিয়ে গিয়ে বসাল। মাটির ভিতের ঘর, সামনে ছাপ বাঁশ দিয়ে তোলা। ভেতর একবকমে শুশ্রূষার ঘরে করেক কোঁড় চুল জমানো আছে বস্তা করে। এই চুল মাসান্তে কিছু লোক এসে অল্প পয়সায় কিনে নিয়ে যায়। নিয়ে তারা কি করে তা শিবপদও জানে না। হেলেতাজা চা খাইয়ে শিবপদ জিজ্ঞেস করে—'কত লাগবে বাবা? দুই আট দশ ধরেছি।'

মনু আজকাল কোপল শিখেছে। বলল—'পাবি না।'

এসব বললেই কাজ হয়। তবে যেন পরে গিয়ে খানায় খানায় করবে। তা করুক, তখনো এমনি বলে কাটানো যাবে। বলে উঠে এল মনু। চলা-পাটুতে চন্দুর ঘর দেখল। বিকেলের চায় আলা ছেড়েছে।

বাকা কেসের সোজা করতেই এক মাতালের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। মাতালটা টলে টলে পড়ে যেতে গিয়েও আঁকড়ে ধরল মনুকে। বলল—'তোর কাছ থেকেই আসছি। পাঁচটা টাকা দে।'

বাবা। মনু খুব অবাক হয় না। বাবা এক সময়ে খেত চেত। বাজারের অভাবের চেলায় ছেড়ে দিয়েছিল। এখন অবস্থা দেখে মনু ছোটো চোখ করে তাকাল।

মনু বলল—'পাঁচটা টাকা কি খেলনা আসে নাকি?'

—'সে বাবা, বড় ছিষে।'

মনু ভয় ভোঁকরা হয়ে বলল—'ছিষে কেন? ছেলেটা ছেলে খাওয়ার না?'

বাপটা কেসে ফেলে। গরে জলা পঞ্জাবী, ধুতি কিছু ওপরে তোলা, কাঁধে ব্যাগপাল। ছেলেটলেকের চেহারা নয়। হাতের পিঠে চোখ মুছে বলে—'তাড়িয়ে দিয়েছে।'

—'কোথা থেকে তাড়াল? বাড়ি তো ওর নয়।'

—'সে কে বলতে যাবে। ঘাড় ধরে বের করে দিলে।'

—'কি করেছিলে?'

—'সন্ধ্যের একটা কাসার বাটি থেকে লাগিয়েছিলাম। তা কি করব বাবা, ছেলেটা হাড়হাড়ি ধরতে পারি না, হাতে-টাতে ঠিক নেই, জোরবল পাই না। পয়সার জন্য ওসব খেলতে দিয়ে—'

—'চন্দু কি মারের ওপর নাকি?'

—'করে। বড় হেয় হয়েছে আজ-কাল। পাল্টন।'

—'তো মারের পয়সা ছুঁচল কেথেকে?'

—'সে আমার পয়সার নয়। মাসিক-রন খাওয়ালে।'

—'তুমি তার সঙ্গে ছুটলে কি করে?'

বাবা মুখটা ভাববাদলাবনের মতো করে বলল—'ছুটেবা কি! সেই ছোটো। রাস্তায় ঘাটে দেখলেই পয়ের ধুলো নেয়। আজকাল খুব খাতির করে। বাসস্টাকে ফিরে করতে চায়।'

গ্রাম ঝিম হয়ে যায় মনু। ঘর হেয়ো ঘরের ছেয়ে হবে বাসস্টা। মাসিকরন পঞ্চাশ পায়। তার ওপর তার যৌ ছেলেপুলে আয়ে খুশুচ্ছে।

—'তো কি?' মনু রুখে ওঠে।

—'আমি চাকরী ছাড়ি বলা।'

—'তো ওর পয়সায় খেতে যাও কেন?'

—'জোর করে নিয়ে যায়। এখন নয়, সেই ছিকেলে ধইরেছিল। কতকাল ধরে এক নম্বর। নেশা কেটে গেছে।'

—'কেটে গেছে! তবে টলছিলে কেন?'

—'পরীক্ষা হয়ের নেই। পেটটাও ফাঁকা।'

—'চলো, খাওয়াচ্ছি তোমাকে। কিন্তু এ পাকা মাথাকাট নয়। আজই খেয়ে কেটে পড়বে।'

বাবা ঘরা চোখে চেয়ে বলল—'খাওয়াতে নিবি না?'

—'না।'

—'তো কোথা যাবো বাবা? চন্দু মারবে যে।'

—'মারবে তো কি করব? মার খাবে।'

বলে মনু হাঁটে, পিছু পিছু বাবা আসে।

কাঁচন ভাতের বাজারে দেখে চিনতে চায়নি। সে অবস্থা বুকের মেয়ে নয়। চন্দু সবাইকে শাসিয়ে রেখেছে। তবু কাল হয়ে ছেলেকে একবার চোখের

ছেলে বিয়েও দেখবে না, এ কেমন কথা?

হেলেদুলে তেলকালি অন্ধকারে একটু দাঁড়ায় মনু, বাপটা এই ছুঁৎমার্গী আবহের ঠিক ঠাহর পায় না। ফয়জে এসে সে বলে—আশিকরাম কি বলে?'

—'বলবার তো, বাসন্তীকে বিয়ে করতে চায়।'

আটটা সাতচল্লিশ ট্রেনটা মাথার ওপর দিয়ে গমগম করতে করতে স্টেশনে ঢুকছে। হেলেদুলেটা নাচু, হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় প্রায়। সেই কবে আদিকালে তৈরি হয়েছিল।

ট্রেনটার শব্দ মিলিয়ে যেতে মনু বলে—আশিকরামের প্রস্তাবে রাজি হওনি যে।'

—না। তবে চনু রাজি হয়েছে। তিনশো টাকা দেবে আশিক।'

—'বলো কি।'

—'কি করব মনু, ছোটো বজ্জাতটা এখন সবাইকে বার করতে চায়, মায়ের সম্পর্ক মনে নাকি?'

—'সে তুমিও বলনা না।'

বাবা নিজের মনে মনে বলে—সে ঘটে হয়েছে বটে। তুমি আমার ভাল ছেলে, এতকাল চিনতে পারিনি।'

মনু হেসে বলে—ছেলে চিনেছো, না টাকা?'

বাবা এর উত্তর দেয় না। টলে টলে হাঁটে। মনু ধরতে ধরে না। কিন্তু বাড়তে কিছু হয় না। মনুর ঘোরার পর্যন্ত ঘুড়ে চলে এলো।

অন্ধের বেশনিং কাজই সাফ হয়ে গেছে। শরীরেও পড়ল জোর। ঘুরে ঘুরে অনাদি হয়ে আছে এখনো। তার এক ছেলে এ সমস্যার ছেদে। ফেরার পথে বাপকে নিয়ে যায় সিনেমার তুলে। ছেলের বা ঘেরে ফুল এইটুকু পথ হেতে পারে বলে অনাদির খুব অহংকার। ছেলেরা এখনো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে না তাকে, এই তার বাড়ো।

মনুর পিছনে তার বুড়ো বাপকে দেখে অনাদিও হাঁ হয়ে গেল। বলল —'মনুর বাপ না?'

বাবা অমনি হাতজোড় করে বলে—'আজ্ঞে।'

—'বহুকাল বাদে, এদিকে?'

—'আজ্ঞে।'

—'আশিকরামের সঙ্গে দেখা আজ-কাল।' বলে বাবা বাঁকাচোখে দেখে অনাদি। বলে—'বিয়ে কিছু হয়ে গেল?'

—না। মানে।' বলে বাবা বসে পড়ে বেঞ্চে।

—'হুঁ।' বলে অনাদি উঠে। উঠে বলে—'মানুষ হয়েছে আসলে তবে বুঝলে হে প্রসন্নচন্দ্র। যত নোংরা ছেটে তার খোয়াব ছোটে। হুনিয়াটা পচা গন্ধ ছাড়ছে আজকাল, আর তত চকচকে যাদব।' হাসছেন।'

চশমাটা একটু বেঁকেছে। তবুলেও ওপরকা ওপরকা বোঝা যায়। অনাদি বেরিয়ে গেলে হাঁপ ফেলে বিল মনু। তার হাসল, মুখটুকির জাল, মায়ের কোল আর কুলকাশি ভাজা। তাই নিয়ে যাবা প্রসন্নচন্দ্র খিলখিলে হাসি-মুখে এত ভাত যাদব। অর্ধেক খেলে অর্ধেক ফেলে উঠে পড়ল।

আঁচিয়ে এসে বসে পড়ল বেঞ্চ-খানায়। বলল—'তা এ বেঞ্চখানাই থাকবে।'

মনু বড় চোখে চেয়ে বলল—'থাকার চলবে নাকি?'

—'তো যেয়ে ঘরে দিবি? সমুদ্রে বাসন কয় ঘুরে তা ছেবে দ্যাখ। ছেলেও খুব চোকা হবে না।'

—'তোমাদেই ঘরনের।'

—'সেই কাঁসার বাটিটার কথা কি ভুলবে চনু? তারপর আশিকরামের কথায় সায় দিছি না। ঘরেক বাপার বাবা। সে বিয়ে করবে। তার আগে সব বুঝেসুঝে সমুদ্রে চায়।'

—'তো আমি কি করব? আমার এখানে জায়গা হবে না। আজ রাতটা থাকো পড়ে, কাল সকালে গিয়ে চনুর সঙ্গে কাজিয়া মিটিয়ে নেবে। এখানে হবে না।'

—'মিটিবে না বাপ। সেব কটা দিন আর কাটে না।' এই বলে বুড়ো ঘুমোলো।

সকাল বেলাতে প্রসন্নচন্দ্র পিছনের উঠোনে বসে খুব আরামে তাদাই একটা বড় পেয়ালে চা খাচ্ছিল। ছোট্ট উঠোন, ঘাইলতা, কচুর কাড়, পিছনে বাঁশ তার পরেই। কিন্তু তাই দেখেই তার চোখ জুড়িয়ে গেল। যেন এমন একখানা জায়গাই সে খুঁজছিল এতকাল।

সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পানওয়ালী বাসন্তী আজ নিজের থেকেই এসে দাঁড়াল সামনে।

—'ও বাবা।'

মনু সন্তর্পণে হয়ে দাঁড়ি পাকাচ্ছিল, বলল—'ও দুঃ।'

—'বাবা কাল আসর ফেরেনি।'

—'হুঁ।'

—'চনুদা যেয়ে ঘরে ঘিরাছিল।'

—'তো কি করব?'

—'মা খুব কাঁদছে। বলেছে, চনুদার ওখানে থাকবে না।'

—'তো কোথায় থাকবে? কানুর কাছে?'

—না। তোমার কাছে। দুপুরেই চলে আসবে। বাবা যে কোথায় চলে গেল!'

বলতে বলতে মেয়েটা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

—'আল লয়ে না। কাঁদিস না তো।'

—'কি করব। বুড়ো মানুষটা কোথায় থাকি খেয়ে মরল।'

—'থাকি খবে কেন? চা খাচ্ছে, ভিতরঘরে যেয়ে যা।' বলে মনু দাঁড়ির পাক খাওয়ায়।

—'সাচা?' বলে দুই লহমে বাসন্তী ভিতরঘরে চলে গেল।

অনাদি বুড়ো বলল—'লোকজনের জন্য ভাবাইলে মনু? তা গতিক তো ভালই দেখছি। সিপারা আর জিলিপীর জন্য আর আলাদা লোক রাখতে হবে না।'

—'এই তাহলে ব্যাপার।' বলে মনু ঘড়িঘরটা রাখল। আজ দাঁড়ি পাকাতে পাকাতে সে একটা জিনিস দেখছে। দেখেছে, দোকানটা বিরাট বড় হয়েছে। বাপ ফায়দাবাজ নিয়ে বসে। পিছনের উঠোনের ধার ঘেঁষে একটা পাকা বাড়ি। তাতে মা আর বাসন্তী ঘুমোয়। কোঠে, কাপড় শুকোতে দেয়। সে তারী তরতরন্ত সংসার। তাতে টিয়াও আছে, খরগোশও কেনা বাদনি। কিন্তু একটা খারাপ জিনিসও দেখেছে সে। ঘুমের গর্ভবতী হয়ে ঘুরতের ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুমারী অবস্থা।

একটা শ্বাস ফেলল মনু। তাই বলে। নইলে এত ঝিয়ের ভাড়া। পরের জিনিস মনুর ঘরে না ঢোকালে চলছে না কি না।

বাসন্তী হাসি-হাসি মুখে বেরিয়ে আসছিল। মনু তাকে ডেকে বলল —'তুইও আর থাকিস কেন, চলে আয় এখানে।'

বাসন্তী হাঁ করে চেয়ে পরে বলল —'থাকবে আমাদের? ঠাট্টা করছ না তো?'

—'ঠাট্টার সম্পর্ক নাকি। পাকা চোখবাদের। চাকরি-বাকরি করতে হবে না। চলে আয়।'

কাল খবর এসে গেছে। দুপুরে বা আসবে। বাসন্তী আসুক। আজ কেবল মনটা আর-আর করছে। কে যাবি আয়। জায়গা আছে। অনেক জায়গা। বাড়িওলা বহুকাল ঘর সাজাচ্ছে। হাজার চেয়েক নগদ পেলে জায়গাটা লিখে দেবে। তাই হোক তাহলে। আজই বাড়িওলার সঙ্গে দেখা করবে মনু। সমস্যা খারাপই পড়েছে।

• • • •

ছবাল বয়সে চনু এল। মাথে দাড়ি, চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে, চোখ আতাঙ্কিত। বলল,—'বাবা, লুকিয়ে রাখো। সাঁঝে ফেরে ফেলবে।'

সেই জেরবেলা। মনু দাঁড়ি পাকাচ্ছে। বলল—'হুঁ।'

—'সাচা বলছি। সমুদ্রেবলেন এখন ওপোর ওস্তাদ। পেলেই কাটবে। কাল একজনকে কেটেছে। আমি মুখে রোজ ঘর নইলেখনের দৌড়ে শেষ রাত তক লুকিয়ে ছিলাম একটা খড়-কাড়ী তলে।'

মনু দাঁড়ি ধরে বসে আছে। দেখছে। ঈশ্বর তাকে একটা ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষ মানুষ ভবিষ্যতের দাঁড় খুলে যায় তার সামনে। কিন্তু সবকিছু দেখা যায় না। কিছু অন্ধকার থাকে। এই অন্ধকারটুকুই হচ্ছে বড় পরীক্ষা। এইটুকু মানুষকে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা আর ভালবাসা দিয়ে [illegible] হয়ে হয়।

দাঁড় ছেড়ে বোবা বাচ্চাটাকে কোলে নিল মনু। বলল—'আয়।'

—

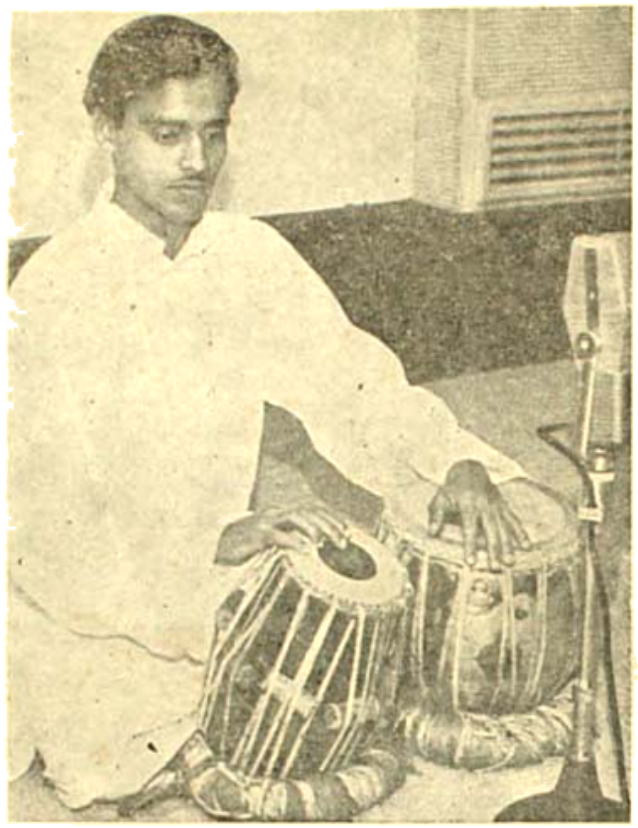

মহাদেবের মিত্র

কী একটা দরকারি কাজে বাঙ্গিলাম আসানসোলে। সেদিন খুব ভোরে ছোট্ট। অবশ্য বিভূতিকে সেই খুব ভোরে একটা ট্রেন ধরতে অপেক্ষা করে কাটালো। কলকাতা থেকে রাঁচিগামী আসবার পথে ছেলেবেলার বন্ধুদের স্মৃতিচারণ আমার ভাল লাগে, তখন ভেবেছিলাম সেদিন ট্রেনে আমাকে যারা দিয়েই উঠে চলে যাবে। বন্ধুদের উৎসবটা নিয়ে পৌঁছোবার পর আর অবসরের অপেক্ষা।

আকাশে মেঘ করেছে। এই মেঘ কতখানি জমাট আর এর মধ্যে কতখানি বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা আছে কিনা আমি জানি না। যদি সেদিন আজ না যায়? আসানসোল-রিপন্ন ট্রেনটা প্রায়ই ক্যানসেল্‌ড হয়। আকাশটা বিমর্ষ-করুণ আমার জন্য সেরকম অপেক্ষা করে থাকবে। বাদুড় অশান্তি হচ্ছে। একটা চেনাশুনো লোকও চোখে পড়ছে না। তা হলে আজও কথা বলে কষ্টানো যেত। এয়ার হোস্টেস আর বিমান কর্মীরা ঘোরাঘুরি করছে ব্যস্তভাবে। এদের সব সময়েই ব্যস্ত মনে হয়। এদের দেখলেই অন্য যাত্রী-দের চোখ উৎসুক হয়ে, হয়তো কেনো কথা শোনা যাবে। কিন্তু কেউ কিছুই বলছে না। আমি একটা বই খুলে বসেছিলাম, কিন্তু মন বসছে না কিছুতেই।

অবশেষে এক সময় আমাদের বিমানের নাম-ঘোষণা হলো। ফলকে ছেলের মধ্যে অনেকখানি নিশ্চিন্তের মতো পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে লাইন দিলাম। আমার এক হাতে এক-খানা ছোট্ট বই, অন্য হাতে একটা ব্যাগ। আমাদের তবে সিঁড়ি দিয়ে উঠিয়েছিলাম।

সিঁড়ির একেবারে ওপরে একজন এয়ার হোস্টেস দাঁড়িয়ে থাকে, যার কাজ মিষ্টি হেসে প্রত্যেক যাত্রীকে নমস্কার করা। প্রত্যেক দিন প্রতিটি লোক ছাড়ার সময় এই কাজটা করতে হয় বলে তাদের হাসিটা নিতান্তই যান্ত্রিক। একটুখানি হেসেই আমার গম্ভীর হয়ে যায়।

সমস্তক সুশ্রী মেয়েদেরই এয়ার হোস্টেস করা হয়। তাদেরও আমার বেশী মাহাত্ম্য করে আরও খানিকটা ঢাক্তি-সুন্দরী হয়ে থাকে। এদের সবাইকেই প্রায় একই রকমের দেখায় বলে আমি দু'এক পলকের বেশী দেখি না।

সিঁড়ির ওপরে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল সে আমাকে 'নমস্কার' করতেই আমিও মাথা ঝুঁকিয়ে 'নমস্কার' বলে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিলাম। এই সময় আমার যেন শুনলাম সে বলছে, 'নমস্কার সুনীলদা!'

ভুল শুনলাম! ফিরে তাকালাম আবার।

মেয়েটি হাসছে। এয়ার হোস্টেসের যান্ত্রিক হাসি নয়, একটি মুখরা মেয়ের চেনা-হাসি।

আমি বললাম, 'খুকু!'

ততক্ষণে পেছনের লোক এসে গেছে। পেছনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটার বেশী খুকি কথা বলার হেও-হুজ্জ নেই। বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে আমাকে ভেতরে চলে যেতেই হলো।

নিজের জায়গাটা খুঁজে পেতে বেশী দেরি হলো না। যাক, জানলার কাছেই জায়গা পাওয়া গেছে। বসাটা ওপরের ঢাকনা খুলে নিয়ে আমার ব্যাগ রাখলাম। সীট বেল্টটা বেঁধে নিতে হলো। এখন সিগারেট ধরাবার নিয়ম নেই।

আমার খুকুর মতো একটা চালা উত্তেজনা। সত্যিই কি খুকুকে দেখেছি? ভুল করিনি তো? কিন্তু ঠিক সেই রকমই তো সরলতা আর দুষ্টুমুখী মেশানো হাসি।

আমার পাশের সীটে এসে বসলো একজন বিশাল চেহারার অবাঙালী ভদ্রলোক। কেনো ভারী জিনিসের ব্যবসায়ী মনে হয়।

ব্যাগ রাখবার জায়গায় বাড়ী বেশী নেই। কয়েকটি সীট পুরো খালি পড়ে আছে। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, সেলটা সৌঁছে দেবার আগে দম নিচ্ছে।

দুজন এয়ার হোস্টেস ঘোরাঘুরি করছে। আমি চোখ দিয়ে ওদের এক-জনকে অনুসরণ করতে লাগলাম। না, মেয়েটি যে খুকুই হবে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার কোনো চেনা মেয়ের পক্ষে এয়ার হোস্টেস হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কয়েক আমি আরও দুজন এয়ার হোস্টেসকে চিনি। কিন্তু খুকুকেই যে এখানে এ অবস্থায় দেখবো, তা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। খালপোড়া যেন ঠিক নাটকীয়, বড় বেশী সিনেমার মতন—ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

এখন বুঝতে পারলাম, লাঞ্চের অপেক্ষা করার সময়, আমি খুকুকে দু একবার ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। তখন কিছুই মনে হয়নি। এয়ার হোস্টেসদের সাজপোশাক আর চালচলনই বেশী চোখে পড়ে। তখন যদি চিনতে পারতাম, তা হলে খুকুর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে পারতাম। বুকের ভেতর দারুণ কৌতূহল ছটফট করছে। যেন একটা রোমাঞ্চকর রহস্যময় কাহিনী অর্ধেকটা পড়ার পর বইখানা হারিয়ে গিয়েছিল, আজ আবার সেটা ফিরে এসেছে হাতে। কিন্তু খুকু কি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পাবে? বিমানের ভেতরে কি কোনো যাত্রীর সঙ্গে ওদের গল্প করার নিয়ম আছে?

সেদিন আকাশে উড়তেই আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ যে বাড়ি-ঘর সবকিছু একটু একটু করে ছোট হয়ে আসে, এই দৃশ্যটা কোনোদিন আমার খুব ভালো লাগে। এই জন্যই জানলার পাশের জায়গা না পেলে দুঃখ করি।

সীট বেল্ট খোলার অনুমতি পেয়ে নিশ্চিন্তে বসলাম। খুকু আগে দু একবার চুলে যেন আমার কাছ দিয়ে যাতায়াত করেছে, তাকে তাকাইনি। এখন কাজের সময়—এখন তো আর ওদের গল্প করার কথা নয়।

এয়ার হোস্টেস দুজনেই লাঞ্চবক্স নিয়ে বিলি করছে। ভাতের বদলে খুকু আমাকে দিতে এলো না, এলো অন্য মেয়েটি। খুকু কি এখন ইচ্ছে করে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে? তা হলে প্রথম আমার নাম ধরে ডাকলো কেন! ও যদি আমার নাম না বলতো, তা হলে হয়তো আমি ওকে চিনতামই না। হয় তো আমি ভুল করতাম, খুকুর মতো মেয়েটির চেহারার মিল আছে।

এবার ওরা চা-কফি নিয়ে

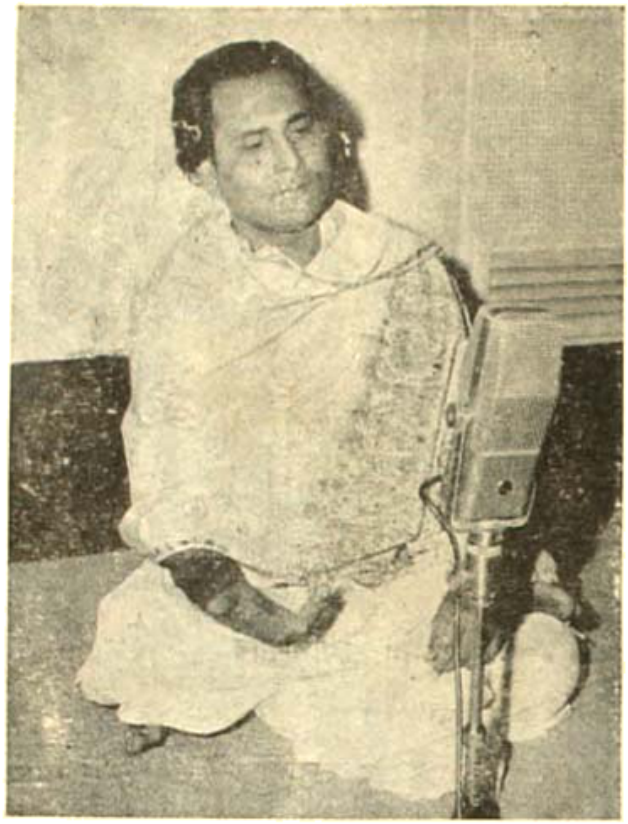

বিমলেন্দু চৌধুরী

খুকু জানে, আমি চা খেতে কত ভালোবাসি! ছাত্র জীবনে সারা দিনে অন্তত দশ-বারো বার চা খেতাম। এখনো সে নেশা যায়নি। খুকুর কি মনে আছে সে কথা? অনেক সময় খুকুই আমার জন্য চা বানিয়ে আনতো তিনতলা থেকে। আমাদের ছোট্ট বাড়ির যে কোনো জায়গে চা হলেই সে জানে আমার জন্যও এক কাপ বেশী করে নেওয়া হতো। একদিন দুপুরে খুটোর সময় এক কাপ চা এনে খুকু বলেছিল, 'জানিস এক-জোড়া ক্লাউট ফেল্ট এসেছে, তাই তুমি এখন চা খেলে সুনীলদা!' খুকুর কি মনে আছে? এরকম অনেক ছোটোটি আমাকে জিজ্ঞেস করতে এলো, আমি চা না তাকি খাবো। আমার পাশের লোকটি চা চাইলেন বলেই আমি ইচ্ছে করেই বললাম, তাকি।

পাশের লোকটি চা খেয়ে কোথায় নেমে গেলেন। আমার তাকি আর জমলোই না। আমার আকর্ষণটা শেষের প্রায় শেষের দিকে। সেই জন্যই বেরোতে আরম্ভ দেরি হচ্ছে।

পাশের লোকটি একবার উঠে গেলেন। বোধহয় বাথরুমে। একটু; ঘরে লোকটির সঙ্গে খুকু কথা বলছে। খুকু কি এই লোকটিকেও চেনে নাকি! কি আশ্চর্য যে মেয়ে!

আমি আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। এখন আর কিছুই দেখা যায় না। খুকু কোথায় গেল। মেঘ আলোও ঠিক চেনা যায় না। মনে হয় কোন একটা সাদা বরফের দেশ। তার ওপর এসে পড়েছে শেষ সূর্যের আলো।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন বললো, 'এই নিন, আপনার তাকি নিন্।'

কোথায় দুটো কামরার মাঝখানে তাকি নিয়ে খুকু দাঁড়িয়ে আছে। তাকির পাশের চেয়েও বেশী পাকা তার গায়ের মিষ্টি স্নেটের গন্ধ।

হাতটি ছেড়ে খুকু জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বুঝি আজকাল তাকি খেতে ভালোবাসেন? চায়ের নেশা চলে গেছে?'

তা হলে মনে আছে খুকুর! একটু; আনন্দ হলো। খুবই সামান্য আপনার —তবু কেউ আমার পুরোনো দিনের কোনো কথা মনে রেখেছে, এটা জানলেই এ রকম আনন্দ হয়। কারণ, আমি তো অন্য কারুরই পুরোনো দিনের কথা তুলি না! আমার স্বভাবই এই, আমি কিছুই তুলি না। এমন অনেক কিছুই থাকে যা ভুলে যাওয়াই ভালো! খুকুর পুরোনো দিনের কথা যদি তুলতে পারতাম, তা হলে ওর সঙ্গে কথা অনেক সহজ হতো!

আমার হাতে একটি গেলাস দিয়ে খুকু বললো, 'সুনীলদা, আপনার পাশে বসবো?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বসে পড়লো ধপাস করে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওখানে যে ভদ্রলোক ছিলেন—'

দুষ্টু হেসে খুকু উত্তর দিল, 'তাকে আর একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি, জানলার ধারে।'

আমি কাঁধিতে চুমুক দিলাম। পরের কয়েক মুহূর্ত কেনো কথা খুকে পেলাম না।

খুকু জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আমাকে দেখে একটু; অবাক হয়ে যান নি!'

—'একটু; নয়, খুব!'

—'আমাকলো কেন বলুন!'

—'একটা কারণে।'

—'কতদিন থাকবেন?'

—'চার পাঁচদিন।'

—'আমিও থাকবো, এক সপ্তাহ।'

—'তোমাদের পরের ফ্লাইটেই ফিরে আসতে হয় না?'

—'আমি ছুটি নিয়েছি।'

—'খুকু, তুমি কতদিন এই চাকরিতে ঢুকেছো?'

খুকু ঠোঁট কামড়ে দিয়ে বললো, 'উঁহু, আমাকে খুকু খুকু বলবেন না। আমার নাম বাসবী চৌধুরী।'

—'এরকম সিনেমা আকট্রেসের মতন নাম রাখার তোমার কবে থেকে হলো?'

—'সাতাই আমার ভালো নাম বাসবী। অনেকে অবশ্য আমাকে রত্নী বলেও ডাকতো!'

আমি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোলাম। ওর রত্নী নামটা আমি যত্নে শুনেছি। অবশ্যই ওকে ডাকতো ঐ নামেই। আমরা অবশ্য খুকুই বলতাম।

যখন ওকে প্রথম দেখি, তখন ও ক্লাস সেভেনে, ক্লাস নাইনের ছাত্রী। থাকতো আমাদেরই পাড়ায়। ছেলেদের ইস্কুলের চেয়ারটা কেন বড়, তখন থেকেই পাড়ার ছেলেদের নজরে পড়ে গেছে।

অত্যন্ত একটা চটপটে ছাত্র, কাঁধের ব্যাগটা যেন্তা—সেই যেন্তা ব্যাগটা ঢাল হাতে ঝেলে ঘরে খুকু আমাদের বাড়ির সামনের মাঠটা দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসতো—এই দৃশ্যটা আমার চোখে ভাসে।

খুকুরা থাকতো অন্য বাড়িতে। ওদের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না; আমাদের বিশাল ফ্লাট বাড়িতে অনেক লোকজন। এই একটা ফ্লাটে এক সময় খুকুর এক ঘর সম্পর্কের কাকা থাকতেন। সেই সূত্রে খুকু আসতো। তারপর খুকুর কাকারা উঠে চলে গেলেন, কিন্তু ততদিনে প্রতিটি ফ্লাটের লোকজনের সঙ্গে খুকুর চেনা হয়ে গেছে—এবং সকলের সঙ্গে সে গল্প-কাকা, মাসী-পিসীর সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। সব ঘরের দরজাই তার জন্য অবারিত।

পাশ ফিরে খুকুর দিকে ভালো করে তাকালাম। সেই খুকু এখন বাসবী চৌধুরী। কিরকার মেয়ে গড়ে উঠেছে। কতকাল পরে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। মাত্র দু' সাত বছরের ব্যবধান। এর মধ্যেই কত কতকি ঘটে গেছে এই মেয়েটিকে নিয়ে।

খুকু বললো, 'এক বছর দু' মাস হলো এই চাকরিতে ঢুকেছি—এবার ছেড়ে দেবো বোধহয়।'

—'সে কি? কেন?'

—'আর ভালোলাগে না। এর মধ্যেই এক ঘেয়ে হয়ে গেছে।'

—'এর পর কি করবে?'

—'কি জানি!'

বলেই খুকু আমার সামনাসামনি বসলো। এটাই খুকুর বাঁচি অভ্যাস। পরের দিন যে ও কি করবে, তা ও নিজেই জানে না!

খুকু ছিল যাকে বলে পড়া-খেপানি মেয়ে। সব সময় এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়াতো। আমাদের বাড়ির কেউ খুকুকে বিশেষ পাত্তা দিতো না। খুকু কখনো আমার ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে গল্প করতে বসলে খুকুদেরা ওকে ডেকে নিয়ে যেতেন।

খুকু অনেক সময় দুপুরের খাওয়া খেয়ে অতিরিক্ত অবস্থায় ফেলে দিত অনেককে। আমাদের রান্নাঘরে যেন-লাই কুঁড়িয়ে দেয়, উনুনে ধরানো লাগছে না, খুকু অমনি ফুঁ করে জ্বলে দেবে, মাসীমা, সুনীলদার কাছেই তো দেশলাই আছে।' তখন আমি লুকিয়ে চুরিয়ে সিগারেট খাই, বাড়ির লোক কেউ জানে না, সেই সময়ে আমার পকেটে দেশলাই থাকার কথা কেউ বলে দেয়। আমি খুকুকে পরে একদা বকুনি দিতে যেতেই ও বলেছিল, 'বড় মাসীমা তো আছেই একদিন দেখে ফেলেছেন যে আপনি সিগারেট খান। তা হলে আর দোষ কি?

পাড়ার যেখা কার সঙ্গে কার ভাব, কার সঙ্গে ঝগড়া, কে কার সঙ্গে সোপনে সিনেমায় যায়—এ সবও খুকু জানতো। তাই সবাই ওকে ওকে থাকতো, খুকু কখন কার সামনে কি বলে ফেলে। খুকু কিন্তু কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে কারুর গোপন কথা কখনো ফাঁস করে দেয় নি। অন্যদের তুলনায় ওর সরলতা ছিল বেশী! তাছাড়া অল্প বয়সটাও ঠিক বুঝতো না। খুকুদেরা যাঁরা এক সময় খুকুকে ভালোবাসতেন, বড় হয়ে ওঁরা পর হয়ে গেলেও খুকু কিন্তু ওঁদের অপছন্দ করতে শুরু করেনি।

খুকুর উপস্থিত বুদ্ধি, স্মৃতি ওর জোর। তা ছাড়া ও পাড়ার বয়স্কদের সঙ্গে আড্ডা মারতে শুরু করেছে। তা ছাড়া ও নাকি চোর। প্রায়ই একখানা দু'খানা বই না বলে নিয়ে চলে যায়। আমার দু'একটা বই কখনো কখনো অদলা হয়ে গেলেও আমি ওকে কখনো সন্দেহ করিনি।

খুকুর স্বভাবটা হঠকারে [illegible] মুখটা খুব চোখা। স্কুলে পড়া-শুনোয় ভালো ছিল। ওদের পরিবারটা সম্মানিত হলেও হঠাৎ ভাঙন ধরে-ছিল। ওর বাবা মারা যান সামান্য

অন্যদের, এক দাদা অর্থোপার্জনের—বাড়ির সঙ্গে ছিপের সম্পর্ক রাখে না—বিয়ে চাকরি করে আর খুব প্রেম করছে একজনের সঙ্গে। সিনেমাওয়ালী বিয়ে হবে—একটি ছোট ভাই অনেকটা অন্তরঙ্গের মতোন।

চুল টেনে উঠে খুকুও রীতিমতন প্রেম করে বেড়াতে লাগলো। তার নিজের কান পাতা যায় না। অবশ্য, মনে মনে যখন আমাদের বাড়িতে আসে, তখনও সেই রকম সরল মুখ, বই পড়ার মানুষ আছে। কথা বলতে গেলে মনে হোরোটির সঙ্গে।

অন্যরা যাকে প্রেম কিংবা আলতাভাব ভাবে, সেটা খুকুর ক্ষেত্রে ছিল সহজ মেলামেশা। গলির মেয়ে মেয়ে সমাবেশে আড্ডা মারে। ছেলেরা যখন সেখান দিয়ে যায়, মুখ নিচু করে থাকে, কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলে না—যেন কোনোক্রমে সেই জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারলেই হলো। রাস্তার দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলার নিয়ম নেই। এমনকি খুকুই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তো। ছেলেদের নাম ধরে ডেকে কথা বলতো। অনেক ছেলেই তার বাল্যবন্ধুদের খেলার সাথী, তারা বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই খুকু তাদের সঙ্গে কথা বলা কম করে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করেছে। ঢাকা ছবে গলে ছায়ার ছেলেরা। খানিকটা আকর্ষণবোধ করলেও। অবনী সবে বি এস সি পরীক্ষা দিয়েছে, তখনও রেজাল্ট বেরোয় নি, এরই মধ্যে নিজে কি একটা ছোটখাটো ব্যবসা সুরু করেছে। ছোটভাই সুবীর তখনো কলেজে পড়ছে। ওরা দু ভাই নিজেরাই রান্না করে খায়।

খুকু কখনো কখনো ওদের ঘরেও বেড় গল্প করতে। ওদের চা খাওয়ার দিত কিংবা রান্নায় সাহায্য করতো। খুকু বাড়িওয়ালার ঘরে কোনো ছেলের যাওয়া আসায় পাড়ার লোকদের আরও চোখ টাটায়। সুনীতি বকার ভয়ে তাদেরে সেটা বিশদে।

একদিন শুনলাম, পাড়ার কয়েকটা ছেলের সঙ্গে অবনী খুব ঝগড়া করেছে। অবনী টগবগে স্বভাবের ছেলে, পাড়ার রাস্তাদের ঘটাঘাটি করা তাকে মানায় না। কিন্তু ব্যাপারটার নাকি খুকু জড়িত।

ছেলের অবস্থা সেই সময় কলে ছিরোছিল অনেকটা। আগে বয়সের কথা ছিলো পড়ার ছেলে, তারপরই মনে হলো পাড়ার রাস্তান। আমরা কেউ ছাড়ে লোকের বলা পড়ে, কেউ দাঁড় ছবে। ঝগড়া আওয়াজও ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। কিংবা ইচ্ছে করেই কর্কশস্বরে কথা বলে। তাদের বাঁচিয়ে চলতে হয়, তারা তাইকে অপমান করছে দেখলেও প্রতিবাদ করা যায় না। ভদ্রলোকেরা সবাই তখন এই নীতি নিয়েছে যে রাস্তাঘাটের ঝটিতে নেই।

খুকু কিন্তু তখনো মেলামেশা ছাড়ে নি ওদের সঙ্গে। সেই রকমই হেসে হেসে গল্প করে। আমার তখনো ওদের ঘরকন্নাতেও দেখেছি। আশ্চর্যের সঙ্গে খুকুর এই ভাব রাখাটা অবনী সহ্য করতে পারে নি। খুকুদের বাড়িতে পর কোনো আভিজাত্যের নেই। তার মা নিরীহ মানুষ—সেখানে অবনীই হয়ে উঠলো আভিজাত্যের মতন। আশ্চর্যনা এই নিয়ে আকাশ দেওয়া খুকু কথা অবনীকে।

তার অনেকদিন পরে শুনলাম, অবনী আর সুবীর খুকুদের বাড়িতেই খাবার ব্যবস্থা করেছে। ফলে টাকা দেয়। এর ফলে ওদের আর হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হবে না, খুকুদেরও খানিকটা সাহায্য হবে। সেই সঙ্গে অবনী খুকুকে পড়াতেও সুরু করেছে—সামনেই স্কুল ফাইনাল, সে বাবদ ভালো রেজাল্ট করতে পারে—

কবি থাকা দেব ঘরে ফিরোছিল, খুকু আমার হাত থেকে খেলনাটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বললো, 'আপনারা আপনি কোথায় থাকবেন?'

—'সার্কিট হাউসে।'

—'আমি দেখা করবো আপনার সঙ্গে।'

—'নিশ্চয়ই এসো—'

—'আপনি আমাকে ভেবে বাদ করেন নি?'

খুকু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো এই কথাটা। আমিও হাসিমুখে জবাব দিলাম, 'না।'

—'আমি এখন যাচ্ছি। বাঁচি পারি তো আবার আসবো—'

খুকুর চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। কেন বললাম 'না'। ওর ওপর মানুষ ধারণা করাই তো উচিত!

খুব মনে পড়ছে অবনী আর সুবীরের কথা। একটা সামান্য মেয়ের জন্য ওদের জীবন কী ভয়ঙ্কর হয়ে গেল। অথচ খুকুর মুখে সামান্য গ্লানির চিহ্নও নেই।

অবনী বাদলে বন্ধ করে পড়াচ্ছিল খুকুকে। তার অনেকটাই আমি খুকুকে দেখেছিলাম। পাড়ার ঝগড়াটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে খুকু যতই উচ্ছন্নে না যাক, সেদিকে তার ছিল সজাগ দৃষ্টি। খুকুকে সে লেখা-পড়া শিখিয়ে তৈরি করে নিচ্ছিল, তারপর সময় মতন বিয়ের ব্যবস্থা করবে।

সুবীর ছিল খুবই লাজুক। তার মনের কথা কেউ জানতে পারেনি।

খুকু আমার কাছে আসতো মাঝে মাঝে। বসতো, গল্প করে অনেক কথা বলে যেত। তখন তার বেশীর ভাগ গল্পই অবনী আর সুবীর সম্পর্কে। দুজনকে নিয়েই সে মজা করতো সব সময়—তখন চোখ দুটো মিশিয়ে দিত, সুবীরের অক্ষের খাতার অঙ্কটা ভুলে ভরে দেওয়াছিল। এই সব বলতে বলতে খুকু অকারণ হেসে হাসতো। খুকু সেই নির্মল হাসিটুকুর জন্যই ওর ওপর রাগ করা যেত না।

পরীক্ষার ঘর এক মাস আগে খুকু সেই সান্ধ্যিক আড্ডা বললো। এখনো সেই ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

তার মাস কয়েকদিন আগে আমাদের পাড়ার বিয়েবাড়ির বিয়ে হয়েছে খুব ধুমধামের সঙ্গে। বিয়েবাড়ির স্ত্রী আর্থিক মেয়েটও বেশ সুন্দরী, স্বভাবটিও সেই রকম নম্র।

বিয়ে উপলক্ষে খুকু কয়েকদিন সারাক্ষণই প্রায় ওর সেল বিয়েবাড়ি বাড়িতে। সবরকম কাজে সাহায্য করতেও সে ওস্তাদ। আর্থিক বৌদির সঙ্গেও তার ভাব হয়ে গেল খুব। বিয়েবাড়ি আর কেমন ভাই-বোন ছিল না, খুকুই যেন হয়ে গেল আর্থিক বৌদির বন্ধু।

বিয়েবাড়ি আসর ভাঙার পর নতুন বৌ বাড়িতে এলা থাকে, তাই খুকুই হয়ে গেল তার প্রতোকদিনের সঙ্গী। সকালবেলা অবনীর কাছে পড়াশুনো সেরে নিয়েই খুকু চলে আসতো আর্থিক বৌদির কাছে। আর্থিক বৌদি প্রথমই তাকে খাওয়ান। এমন কি আর্থিক বৌদি তাঁর বাড়িতেও খুকুকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে। উনি ওকে খুবই ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

একদিন দুপুরবেলা আর্থিক বৌদি সব ভবে খুকুকে তার নতুন একটা বেনারসী শাড়ী পরিয়ে দিয়েছেন। তারপর বললেন 'তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই! দাঁড়াও একটু, মেলা আর পাউডার মাখিয়ে দিই।'

চেহারাতে কুটকুটে হয়ে উঠলো খুকু। আর্থিক বৌদির তাতেও তৃপ্তি হলো না। নিজের গয়নাগুলোও সব পরিয়ে দিলেন খুকুকে। তারপর তাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'দেখেছো ঠিক যেন রাজকন্যা—ইস, তোমার দাদা বাড়িতে থাকলে এই সময় তোমার মুখি একটা ছবি তুলে রাখা যেত!'

আয়নার সামনে খুকু অনেকক্ষণ নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। এত ভালো শাড়ী তো কোনদি কখনো পরেনি। এরকম গয়নাও পরেনি। ওর চেহারাটা সুন্দর, কুটকুটে মুখ—সাজগোজ করলে এরে তো ভালো দেখাবেই।

খুকু বললো, বৌদি, আমার মাকে একটু দেখিয়ে আসবো?'

আর্থিক বৌদি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বললেন, 'যাও না, দেখিয়ে এসো না—'

এক পাড়ার মধ্যেই বাড়ি। দুপুরবেলা, ভয়ের কোনো কারণ নেই। খুকু ছুটে বেরিয়ে গেল।

সেই যে গেল, আর ফিরলো না।

আর্থিক বৌদি বিকেলবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কারুকে কিছু বললেন না। তারপর বিয়েবাড়ি ফিরলে খুকু বললেন খুকুদের বাড়িতে একবার খোঁজ নিতে।

খুকুর মা অবাক হয়ে পড়লেন। খুকু দুপুরের পর একবারও বাড়ীতে আসেনি। পাড়ার চারাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। চতুর্দিকে খোঁজা-খুঁজি হলো। খবর দেওয়া হলো বিভিন্ন হাসপাতালে এবং থানায়। কোথাও নেই, খুকু যেন সম্পূর্ণ উবে গেছে।

ব্যাপারটা প্রথম বিশ্বাসই করা যায় নি। ঠিক দুপুরে একটা জলজ্যান্ত মেয়ে কি করে উধাও হয়ে যাবে? তার গায়ে অত গয়না ছিল বলে প্রথমেই মনে মনে যে কেউ হয়তো তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু তা-ই বা কি করে হয়? বিয়েবাড়ির বাড়ি থেকে খুকুদের বাড়ি মাত্র কুড়ি-পঁচিশখানা বাড়ি পরেই। পাড়ার লম্বা দিয়ে সোজা রাস্তা। সেখান থেকে কে তাকে ধরে নিয়ে যাবে?

তখন স্বভাবতই মনে আসে, খুকু সোজা তার ঘরের কাছে না এসে অন্য কোথাও গিয়েছিল। চেয়েছিল আর কাউকে তার শাড়ী গয়না পরা চেহারা দেখাতে। কাকে? অবনীকে? কিন্তু অবনীদের ফ্ল্যাট বাড়িতেও সে আসেনি। দুপুরবেলা অবনী বা সুবীর কেউই বাড়িতে থাকে না। তা হলে কি খুকু নিজের ইচ্ছেয় চলে গেছে? আর্থিক বৌদির গয়না নিয়ে? তখন ওর বয়স কতই বা, বড় জোর আঠারো উনিশ। সেই বয়সের একটি মেয়ের এ রকম ডাকাতে বুদ্ধি হবে, বিশ্বাস করা যায় না, বিশ্বাসেই বিশ্বাস করা যায় না!

সেই সময় সেখানেই আর্থিক বৌদির ননদ। উনি নিজের পর নিজ সান্ত্বনা দিতে বেরোন খুকুর মাকে। তিনি বলছেন, 'শাড়ী-গয়না তো থাক, সে এমন কিছু না—খুকু খুকু ফিরে এলেই হয়।'

খুকুর মায়ের চোখ থেকে অনবরত জলের ধারা গড়াচ্ছে। এই দুঃসময়ে কিংবদন্তি সান্ত্বনা জানাবার কেউ ছিল না।

সমস্ত আমার চেয়েও অবনী। যেন তার সমস্ত স্বপ্ন চুরমার করে দিয়ে গেছে ঐ একটি মেয়ে। অবনীর মুখের চেহারাটাই বদলে গিয়েছিল, সব সময়ে তাকালে একটা ভাব। যেন তার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ছোট ভাই সুবীর একেবারে চুপ-চাপ, সে এ ব্যাপারেও কোনো কথা

দিলীপকুমার রায়

হলে নি, বরঞ্চ কেন চুপচাপ হয়ে গেল এবং অল্পদিন পরেই অসুখে পড়লো।

খুকুকে ফিরে পাওয়ার খবর যখন সবাই মেটামুটি ছেড়ে দিয়েছে, সেই সময়, প্রায় মাস দেড়েক পরে, খুকুর চিঠি এলো কাশী থেকে। খুকু তার মাকে লিখেছে যে গোবিন্দ নামে একটি ছেলে তাকে ফিরে করতে চায়। গোবিন্দ ভালো ছিলি—সেইজন্য এই চিঠিতে তার মনের আশান্তি আছে কিনা!

এত কষ্টের পর খুকু ভাল ফিরে মনের আশান্তি আছে কিনা এইটাই যেন বড় ব্যাপার! খুকু আরও লিখেছে যে গোবিন্দ খুব ভালো ছেলে এবং সে রোজগার করে চাকরি করে সে আরতি বৌদির গহনাগুলো ছাড়িয়ে দেবে।

চিঠি পেয়ে খুকুর মা-ই শুধু কাঁদলেন, আর সবাই হাসে ফুলে উঠলো। সকলে যখন পাওয়া গেছে, তখন শান্তি ফিরেই হবে। ছেলেরা মিলে খুকু তখনও নাবালিকা, সুতরাং পুলিসের সাহায্য নিয়ে তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনা যাবে।

পাড়ার ছেলেদের তার থেকে সন্ধান পাওয়া গেল, গোবিন্দ তাদ পাড়ার একজন মাস্তান। খুকুর সঙ্গে সঙ্গে সেও উধাও হয়ে গেছে ঠিকই, তবে কোথায়কার এসেছিল কেউ জানে না।

একমাত্র আরতি বৌদিই পুলিসে খবর দেবার বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল পুলিস দিয়ে জোর করে ধরে আনতে গেলে খুকুর জীবনটাই বোধহয় নষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষত গহনা-চুরির অপরাধে তিনি কিছুতেই খুকুর নামে লিখতে চান না। তিনি সবাইকে বললেন, ঐ সব গহনা তিনি ইচ্ছে করে খুকুকে দিয়ে দিয়েছিলেন। খুকু যদি গোবিন্দকে বিয়ে করে সুখী হতে পারে, তবে তাই হোক। তিনি অনাবশ্যক ভাবছেন!

তবু পুলিসে খবর গেল। এবং পুলিস কিছু করার আগেই অবনী ঠিক করলো সে নিজেই কাশী চলে যাবে। একা আসার দুঃখ চোখের প্রায়ই বলে গেছে তার, এখন দুঃখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, খুকুকে সে ফিরিয়ে আনবেই।

ট্রেন ধরার জন্য একটা সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে সন্ধেবেলা অবনী বেরুতে যাচ্ছে, সেই সময় আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। অত্যন্ত অকস্মাৎই সুবীর মামার পেছনে পেছনে ঘোরে আসছে আর সুটকেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলছে, 'না মামা, তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না! ও আমাদের কেউ নয়। ওর জন্য তুমি যাবে না!'

অবনী ধমকে বললো, 'তুই চুপ কর। আমি কি করবো না করবো, তা তুই আমাকে শেখাবি?'

সুবীর বললো, 'তোমার লজ্জা করে না? তুমি একটা নষ্ট মেয়ের জন্য ছুটে যাচ্ছো?'

অবনী এক চড় মারলো তার ভাইকে।

চড় খেয়ে সুবীর একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে অবনীর হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'না, তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না—'

অবনী এক এক্সার ছোট ভাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে বললো, আবার সুবীর দৌড়ে গিয়ে তার পথ আটকেছে। শেষ পর্যন্ত রাস্তায় ছেড়ে দুই ভাইয়ে ঘুসুল জড়া হয়ে গেল—একটা ট্যাক্সি দেখে তাতে এক সময় উঠে পড়লো অবনী।

সেইদিনই ভোর রাত্রে আত্মহত্যা করলো সুবীর।

রাতের ঘরে একলা একলা খুব ভেবে কেন্ যাওনা তার মনে ছিল কেউ জানে না। বাবার সঙ্গে কথা করার শান্তি হয়তো সে সহ্য করতে পারেনি। কিংবা হয়তো মোক্ষদা মোক্ষদা সে খুকুকে তার বাবার চেয়েও বেশী ভালোবাসতো। খুকু ও রকম ভাবে চলে যাওয়ার সেই আঘাত সেরে-ছিল বেশী। ভোর রাত্রে সে গলায় গীতা দিয়ে ঝুলে পড়ে।

খুকুর জন্য অনেকগুলি মানুষের জীবন বদলে গেছে। সেই খুকু এখন সেজেগুজে কি রকম ঝকঝকে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিমানের ভাবে। সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক মনে।

অবনী জলী থেকে ফিরে এসেছিল তিনদিন পরেই। খুকু তার সঙ্গে আসেনি। একদিন একটুক্ষণের জন্য তার সঙ্গে খুকুর দেখা হয়েছিল—তারপরই তারা জনা কোথাও চলে যায়। অবনী যখন ফিরে এলো, তখন সে একটি সম্পূর্ণ পরাজিত মানুষ। তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ তখনও তাকে জানাতে কেউ সাহস পায়নি।

এর অল্পদিন পরেই খুকুর মায়েরা চলে যান আমাদের পাড়া থেকে। অবনীও ফিরে যায় তার বোনের বাড়িতে। এত কাণ্ড ঘটার পরও আরতি বৌদি এবং পাড়ার অন্য দু'একটি গৃহিণী তখনো বলে ছেলেছেন, যাই বলো, মেয়েটা কিন্তু এমনিতে বেশ ভালো ছিল। এত সরল মন, অথচ কেন যে এরকম একটা ঝামেলা করলো।

লোকের মুখে টুকরো টুকরো ভাবে আমি শুনেছিলাম, খুকু ঠিক নিজের ইচ্ছেয় পালিয়ে যায়নি। আরতি বৌদির বাড়ি থেকে বেরুবার পর কোনো একটি ছেলে তাকে সিনেমা দেখাবার প্রস্তাব দেয়। খুকু লুকিয়ে লুকিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা দেখতো। তার বাড়িতে তো এমন কেউ ছিল না, যে তাকে সিনেমা দেখাবে! তার দিদি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতো সব সময়।

আসলে অত বাধা বাধা বাধা-ধরা পরে মাথা খুরে গিয়েছিল খুকুর। ছেলেদের এরকম হয়। সে ছেড়েছিল যতক্ষণ বেশী সম্ভব বাড়ির পরে থাকতে। সে জানতো, তাকে দেখতে দেখেই তো মা বলবেন, যা, যা, একটানি ঘোরে ফিরে আয়। তাই সে ছেড়েছিল বাড়িতে পরে কিছুক্ষণ বেড়াবে, তারপর ফিরে আসবে। সিনেমাতে যাওয়াও তো সেই জন্যই—লোকে তাকে দেখবে।

সিনেমা দেখার পর হোটেলে খাওয়া-বার নাম করে কয়েকটি ছেলে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। সেই চারটি ছেলে। তারপর পালা বিড়ি করে নানান জায়গা ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত কাশীতে। প্রথম যে-ছেলেটি সিনেমা দেখতে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে হাইড়ে দিয়ে খুকুর অধিকার নিয়ে নেয় গোবিন্দ। সেই গোবিন্দর সঙ্গেও খুকুর বিয়ে হয়নি শেষ পর্যন্ত —এলাহাবাদে রাস্তায় হঠাৎ সে মামা-মারি বাধিয়ে দু' তিনটে লোকের মাথা ফাটায় এবং নিজেও আহত হয়। পুলিস তাকে ধরে চালান করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। খুকু তখন একা ছিল। বহু বছর পরে খুকুকে নাকি কলকাতায় দেখা গেছে আবার। আমি আর খোঁজ নিইনি।

কোথা থেকে খুকু কোথায় চলে তা আমি আর জানি না। আমি শুধুই নিশ্চিন্তে ছিলাম, খুকু কখনই অন্ধকার জগতে চলে যাবে। ওদিকে যারা একবার যায়, তাদের তো ফেরার রাস্তা থাকে না। কিন্তু খুকু আবার একটা পদ্মফুলের মতন ফুটে উঠেছে। চাকরি পেয়েছে যখন, নিশ্চয়ই পড়াশুনো করেছে কিছুটা অন্তত। মুখে কোনো রকম পুরোনো গ্লানির চিহ্ন নেই। ও কি ভিরে যেতে এর মধ্যে কাছে? আরতি বৌদির সঙ্গে আর কখনো দেখা করেছে? কিছুই জানি না। কৌতূহল হচ্ছে খুব, কিন্তু এখন তো ডেকে জিজ্ঞেস করা যায় না। বিমানদা আর আরতি

বৌদি এখন বেহেস্তে থাকেন। অবশ্য কোথায় আছে, কখন রাখি না।

আসরতলা এসে গেছে, সাঁই কেউ বেঁধে নেবার সঙ্কেত জলে উঠেছে। খুকু এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। আমি ওর সিঁথির দিকে তাকালাম। সিঁদুরের চিহ্ন থাকার কোনো চিহ্নই ওঠে নাই। বিবাহিতা মেয়েরা বেবাহে এবার হেহেন্টেন হতে পারে না।

আমি মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'অবনীকে মনে আছে?'

খুকু হাসতে হাসতে বললো, 'হ্যাঁ, বাহ মনে থাকবে না কেন? জানেন না, অবনীদা তো বিয়ে করেছেন ওই এক স্কুলমাস্টারের মেয়েকে। ইলেকট্রিক্যাল গুডসের ব্যবসা করছেন এখন, বেশ ভালো অবস্থা।'

—তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?'

—হ্যাঁ, দু'একবার দেখা হয়েছে। ওর বিয়েতে তো নেমন্তন্নও খেতে গিয়েছিলাম।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জাফরানের ঘটনাগুলো কি তা হলে স্বপ্ন? গরমা ঘুরি, ইলোপমেন্ট, আত্মহত্যা—এতগুলো রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ খুকুর মনে তার কোনো দাগই নেই? সে এমন ভাবে কথা বলছে যেন তার সঙ্গেই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। সবকিছুই এখন স্বাভাবিক। শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, ওর ওপর আমার রাগ আছে কিনা। অকপটকে সেই সময় দেখে মনে হয়েছিল, সে আর জীবনে কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না। জীবন এরকম ভাবে চলে যায়? বেচারা সুবীর! সে-ই শুধু হেরে গেল।

বাবার আহ্বানে খুকু চলে গেল, 'আপনার সঙ্গে মার্কিট হাউসে দেখা করবো কিন্তু!'

আসরতলায় আমি তিন চারদিন ছিলাম। এর মধ্যে খুকু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। নিশ্চয়ই সময় পায়নি। সে যে খুবই ব্যস্ত, আমি তা বুঝেছিলাম। ঘুর থেকে ওদের একদিন সন্ধেবেলা রাজবাড়ির সামনের রাস্তায় তার সঙ্গে আর তিন জন খুকুর। খুকু হাসি মুখে চাড়-পা নেড়ে ওদের কি যেন বলছে, তারা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। খুব সাজগোজ করে রাজবাড়ির সামনে তার মুখখানা সরল ছেলেমানুষীতে ভরা। আর খুকুর তিনটির মুখে দেখলে মনে হয়, তারা তিনজনেই খুকুকে যেন বেবীর মতন পুজো করতে প্রস্তুত।

তিনজন কেন একসঙ্গে! কোনো একজন পুরুষকে স্থিরভাবে ভালোবাসার ক্ষমতাই বোধহয় নেই খুকুর। কিন্তু ও এখনো ভালোবাসতেই শেখেনি। এর মধ্যে অবীর জলের মতন, কোনো আবিল নেই। কিংবা রাজহংসীর মতন যে-কোনো জলের ওপর দিয়ে ভেসে গেলেও এর পালকে দাগ পড়ে না! আমি সেওয়ের একটা বাসাবাড়ির পুকুরে এই রকম একটি রাজহংসী দেখেছিলাম। পুকুরে অনেকগুলো সাধারণ হাঁসের মধ্যে একটি মাত্র রাজহংসী ছিল। রাজহংসীরা সাধারণত খুব নিষ্ঠুর হয়। অন্য হাঁসগুলো তার চার পাশে ঘিরে থাকে, ঠিক যেন স্তুতি করে। আর রাজহংসীটি মাঝে মাঝে তার অহংকারী গ্রীবা তুলে ঠোঁকর মারে এক এক জনকে। তখন রাগ হয় দেখে। কিন্তু আবার কোনো সময়ে, যখন অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে রাজহংসীটি অনেক দূরে চলে যায়—টলটলে জলের মধ্যে তার নিখুঁত শরীর, একটি পালকও ছিঁড়ে নয়, তখন মনে হয় ঠিক যেন একটা ছবি। কিংবা শিল্প। রাজহংসীটিও যেন দামী শাড়ী এবং গয়না পরে সেজে বেরোবেরী হয়েছে। সেই রাজহংসীটি ছিল খুকুর মতন, কিংবা খুকুই সেই রাজহংসীর মতন।

খুকুর তিনটির সঙ্গে যখন খুকু কথা বলছিল, তখন তার শরীরে খুশীর হিল্লোল। যেন ও তাদের দয়া করেছে। অথচ সবাই নিশ্চিন্ত সুখে। একসঙ্গে অনেক ছেলের সঙ্গে মিশে ও নিজে আনন্দ পায়—আর সেই ছেলেরা প্রত্যেকে অসুখী হয়। এই খেলা তিনটিও জানে।

হঠাৎ খুকুকে দেখে আমার সেদিনের 'ডালিং' গল্পের নায়িকার কথাও মনে পড়ছিল। সেই মেয়েটিও পুরুষের পর পুরুষ বদলে গেছে, অথচ তার সরলতা কখনো নষ্ট হয়নি।

দূর থেকে খুকুকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটির গল্প কি আমার লেখা উচিত? অথবা লেখা? এর কোনোটাই আমার মনে এলো না। আমি আপন মনে একটু হাসলাম।


# 'রসাতলে' একটি পুরো শহর

পৃথিবীর ইতিহাসে কত শহর হারিয়ে গেছে, রসাতলে গেছে। কিছুদিন আগেও পর্যন্ত একটা ধারণা ছিল কলকাতা। এমনি একটি শহর যেটা চিরদিন রসাতলে যাচ্ছে। এর উন্নতির আর কোন সম্ভাবনাই নেই। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে শহর জনসংখ্যার বৃদ্ধির চাপে প্রায় ফেটে পড়ছে, যেখানে অপ্রতুল জল সরবরাহ নানারকম সংক্রামক মহামারীর সৃষ্টি করছে, যেখানের জমা পয়লা, দুর্গন্ধ, ধোঁয়া যেখানে দৈনন্দিন জীবনের অসহযোগ করে দিচ্ছে—সে শহরের ওপর মানুষ প্রত্যয়ই হারিয়ে ফেলে তাদের বিশ্বাস।

সেইজন্যেই যাঁরা এর নিয়ন্ত্রিতদের কলকাতার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই তাঁদের দোষারোপ করা যায়না। এটা প্রায় পাঁচ বছর আগেকার কথা।

সেই সময়েই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এই শহরকে বাঁচাবার ব্রত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোল কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, সংক্ষেপে সি এম ডি এ।

আজ সেই সময় থেকে আমরা পাঁচটি দীর্ঘ বছর এবং বহু সমস্যা পার হয়ে এসেছি। কলকাতা আজও ধর্ম হয়ে ওঠেনি ঠিকই, কিন্তু কলকাতা আজ আর 'ঠিক হারিয়ে যাওয়া' শহর নয়। কলকাতার পূর্ণ পুনরুজ্জীবন আজ অবশ্যম্ভাবী ও সুনিশ্চিত বলেই।

এই পরিবর্তন আমরা জন্যে কি কি করা হয়েছে? সমস্যার তুলনায় তা অতি সামান্যই। প্রায় বৃদ্ধিহীন এমন প্রথম ব্যবস্থা গ্রহণের অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে যদিও এখনও বহু ব্যবস্থার উন্নতিসাধন বাকী।

তিনটি সেতু এবং একটি সাবওয়ে তৈরি করা হয়েছে। যানবাহন এবং যাত্রী চলাচলের সুবিধার জন্যে এ রকম সেতু ও সাবওয়ে আরও অনেক তৈরি করতে হবে।

৩০০ পাইপ ডিউবওয়েল বসিয়ে এবং পানীয় পরিবর্তনি করে কলকাতার জন্য সরবরাহ প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। শহরের দৈনন্দিন জলের সরবরাহে অবশ্যই বাড়াতে হবে এই চেষ্টাই। আরও অনেক বাড়ানো দরকার।

৩৩টি মিউনিসিপালিটি এবং প্রায় ১০০টি গ্রামের ছবি কিছুটা মনোযোগ দেওয়া হোয়ে। এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

যানবাহনের সুবিধা, শিক্ষার প্রসার, সর্বসাধারণের জন্যমান স্বাস্থ্যের সুযোগ সুবিধা সব কিছুরই কিছু কিছু উন্নতিসাধন করতে হয়েছে। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে, যে এর কোনটিই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে দিতে পারেনি।

সেইজন্যেই এখনই আমরা জোর দিয়ে বলতে পারিনা যে শহরটিকে আমরা ধ্বংসের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে শহরটি হারিয়ে যায়নি, এর ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশার কোনো কারণ নেই।

সি এম ডি এ তার আকাশ ছোঁয়া অভিলাষে কোন পরিকল্পনা করেনা। যে কাজগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার পরিকল্পনা করছে, তার দ্বারা আমরা শহর এলাকায় চাহিদার জন্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা, নর্দমা পয়ঃপ্রণালীর সর্বাধিক উন্নতিসাধন যাতে শহরের সুস্থীভূত রোগের আক্রমণ এবং দুর্গন্ধের প্রায় বিতাড়নেরভাবে বার করে দেওয়া যায়। প্রকল্প হচ্ছে, আরও ভাল ভাবে যাত্রী এবং মালবাহন চলাচলের জন্যে চওড়া রাস্তা, আরও সেতু, ফ্লাইওভার এবং সাবওয়ে তৈরি, আরও উন্নত বস্তী (বস্তী নয়, রাজপথী বলে) যেখানে থাকবে পাকা রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ এবং সানিটারি পায়খানার সুবিধা...এক কথায়,মানুষের বাঁচার ন্যূনতম সমস্যাগুলির মোকাবিলা করাই সি এম ডি এ'র প্রথম লক্ষ্য।

কলকাতা শহরে আমরা শুধু থাকি না, এ শহরকে আমরা ভালোবাসি।

এর মেয়রের ক্ষীমন যে শহরের ওপর নির্ভরশীল, এর মেয়রের ভালোবাসা যে শহরকে জড়িয়ে আছে—সি এম ডি এ সে শহরকে নতুন জীবনের পথে মুক্তিস্নিগ্ধের করার কাজে আমরা করছে।

CMDA ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

# রঙ্গ-জ্যোৎস্না

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী

অলকাপুরের সব জমিতেই এবার ফসলের বন্যা; গত দশ বছরেও এত ভাল ফসল হয়নি। চাষীদের আর আনন্দ ধরে না।

মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চেয়েছেন কত দিন পরে। কথা শেষে, ধরার নসীব মিত্তিরের ছেলে ছেলেটা না ফেরে অবেলায়। মধু মণ্ডল স্বপন দেখছে ঘরের চালটা এবার সুন্দর করে ছেয়ে নেবে, যাতে বর্ষার রাতে ওর বৌকে আর যেন কলাপাতা মাথায় দিয়ে রাত জাগতে না হয়। সরিসৃপ বর্ষণের মেয়ের আসরটা এবার মেটাতেই হবে। সবুজের ছাপা শাড়ী আর লাল মোটা কাজল চুরির পর সীতার বহুদিনের। কালেমের অবশ্য কেমন কোন সখ নেই। মাঠে কাজ করতে করতেই মধুকে বলছিল কালেম, 'আমার আবার হাউস কি। কেন হাউস নাই। আব্বাস দুরাটা সাইকেল চইড়বার জইন্য খুব পাঁড়া-পাঁড়ি অইতেছে। তা আমি যা কইছিলাম তাই বিবি আব্বাসকে। ইবার হবার নয়। ইবার ধানের টেকাটা হাতি দিব। বৈশাকোলের মেলাতে যাই কিনব।'

মধু জবাব দিয়েছিল, তুমার আবার কষ্ট কি গো। এত জমি তুমার চাষে। তুমার ত আব্বাসের হাউস মিটান কেন কষ্টই নয়। ইটা তুমি যে কয়ি জইন্য কালেম ভাই।'

মধু ঠিকই বলেছে। কালেম সব সময়ই একটু নিজেকেটা ছেলে বলে।

পলাশপুরের বেশী জমি কালেম মিঞাই চাষ করে। উত্তর মলার জমিদারদের এরের তাদের বলে ভাল্লা জমি আর ঢলা জমি। শুকনো একটু কম ফসলী জমিকে বলে ভাল্লা জমি আর নরম সেচযোগ্য ভাল জমিকে বলে ঢলা জমি। পলাশপুরের সব মৌজাতেই ঢলা জমি বেশী। এই জমি সুবাদেই কালেম সচ্ছল। বড় চাষী তাকে বলা চলে। রাত দিন মাঠে থাকে কালেম। জোছনা রাতেও মাঠে বসে কাজ করে সে। সেই তুলনায় মধু আর সরিসৃপ একটু অলস। কালেম যখন নাকরাতে হাজিকেন নিয়ে বৃষ্টি মাখায় মাঠে জল দেখতে যেত তখন মধু মণ্ডলের বাড়ীর উপর দিয়ে যেত। মধু মণ্ডল দেখলেই বলে উঠত—

—'কে যায়?'

—'আমি কালেম, মধু ভাই।'

—'এই ভেরে তুমরি বাইন কালেম ভাই?'

—'জমিতে যাইরি রে, জল কতটা পইল দেখি আসি।'

—'হা এই ভেরে বিয়ানে যাইস।'

—'নারে ভাই, জমির কথা আমি আমি শান্তি নাই ওরে নিলাইন কি রে?'

সাহাই ঘুমাতে পারে না কালেম। খালি মনে হয় জল বেশী আসছে না মধু।

কালেমের যেমন মেজাজ তেমনি বেশি জমির মালিকানা সে। চক্রবর্তীদের সব শরীকের জমিই পলাশপুরে বেশী। কালেমের হাতে যে জমি তা কালেম তার ছেলে আব্বাসকে নিজেই চাষ করে। আব্বাস গ্রামের স্কুল থেকে পাস করে সবরে গিয়ে কলেজ থেকে আই-এ পাস করেছে। কালেমকে সাহায্য করা ছাড়াও পলাশপুরের স্কুলে কেরানীর কাজ করে আব্বাস।

চক্রবর্তীরা অনেক দিনের মানুষ এই মৌজার। এখন অবশ্য বাড়ী-ঘর সবই সবরে। কিন্তু এককালে জমিদারের মত প্রতাপ নিয়ে থাকত সুকুল চক্রবর্তী। কোম্পানীর আমলে নাকি কুড়িয়াড়ীতে নিজের বৌকে পর্যন্ত পাল্কিতে চড়িয়েছিল সুকুল চক্রবর্তীর বাবামশাই রায়বাহাদুরের খেতাব নিতে। তাতেও ইংরেজ রায়বাহাদুর করেনি। তবে প্রজাদের উপর অত্যাচারের সুযোগ মিলেছিল। কালেম মিঞার বাবুকে খুন করেছিল পলাশপুরে সুকুল চক্রবর্তীর বাবামশাইয়ের লেঠেলরা কালেমের বাবু মরা খুনতে রাজী হয়নি বলে।

বাবামশাই-এর মত সখ খুব না পেলেও কিছু খুন ছিল বৈকি সুকুলের। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ে সবরের কালেক্টরের সবচেয়ে বিশ্বাসী ছিল সুকুল চক্রবর্তী। কিন্তু কি আশ্চর্য। স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই সুকুল চক্রবর্তী জাতীয়তাবাদী হবার চেষ্টা করল। খদ্দরের জামা কাপড় কিনে বাড়ী বোঝাই করল। কর্তৃপক্ষের কাছে খাতিরও মিয়েছিল অনেক। তারপর সুকুল চক্রবর্তী সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু তাতে কি আসে যায়, তিন তিনবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়েছে সুকুল।

সেবার আইন পাস হবার আগেই কেমনে যেন খানাবুদার খবর পেয়েছিল সুকুল। বেশ কয়েকদিন কলকাতায় থেকে একদিন হঠাৎ চলে এল বাড়ীতে, বালুরঘাটে। রাতে ছেলেদের ডেকে বলল: —'কাল সবাই বেরেস্তী অফিসে যাবি।'

সবাই প্রশ্ন করল। 'কেন বাবা, কি হয়েছে?'

—'সে তোদের জেনে লাভ নেই। বেরাদের ছেড়ে হবে আমার সঙ্গে।'

তার দশ বার দিন পরেই তুমি সংক্রান্ত আইন পাস হয়ে জমির উর্দ্ধ সীমা ঠিক হয়ে যায়। ততক্ষণে সুকুল চক্রবর্তীর এক হাজার বিঘে বাড়তি জমি এ-নামে ও-নামে, বেনামে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

খুব ভালবাসা ছিল দুই একজনের এক ভাগি বাঁধা দান করল তুলসী চক্রবর্তী তুলসী আশ্রমকে। সেদিন সকাল-বেলা স্নান করে সাদা কাপড়ে পাথর পরে সবার তুলসী মহারাজের এক মিটিং-এ ঘিরেছিল তুলসী চক্রবর্তী। ফিরে এসে গ্রামের সমাজসেবা পাঠশালাকে এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে নিজের নামেই এক অভিনব সভার ব্যবস্থা করতে চেয়ে বাবাকে বলেছিল।

তুলসী চক্রবর্তীর ছোট ছেলে হারাণের জীবনে প্রায় সবটাই কাটলেছে চাষে।

খাবার শেষে পান নেবার সময় এক একবার হারাণ আসে সামনে থেকে সোজা সাইকেলে। কাশেমের বাড়ীর বৈঠকখানার খাটিয়ার পা ঝুলিয়ে বসে হারাণ বলত—'আব্বাস, আজ তুলসী তলে যাওয়ার রে।'

কাশেম আশপাশের কোন দুটি করে না মালিকের। খোদার দয়া হলে নাকি মালিকের দয়া পাওয়া যায়। এ হল কাশেমের বিশ্বাস।

আব্বাসের এত ভাঁড় না থাকলেও তাকে অনেকটা বকলমে করেই চলতে হয়। কেননা পলাশপুরে হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে চক্রবর্তীরাই সর্বেসর্বা। স্কুলটাও তুলসী চক্রবর্তীর আর এক খেয়াল। আসল মাস্টারকেই তিন শ টাকা সাই করে বেতন টাকা নিয়ে কাজ করতে হত। তবু প্রতিবাদ করলে চাকরী থাকবে না। তি আই সাহেব তুলসী চক্রবর্তীর হাতের লোক। তার ভাল রেকমেণ্ডেশন আছে পলাশপুর স্কুল সম্বন্ধে। একবার নিরাপদ মাস্টার উপরে অফিসার করেছিল। বছর তিনের মধ্যেই গ্রামের পঞ্চানন ঘোষের মাস্টারদের দিয়ে লিখিত পাতা অফিসার পাঠিয়েছিল তুলসীর কমিটি, যে নিরাপদ মাস্টার নাকি কোন ছেলের অভিভাবকদের করার চেষ্টা করেছিল। পালিয়ে ঘিরেছিল নিরাপদ মাস্টার আত্মগোপন বাঁচাতে।

শব আব্বাস নিয়ে যাবে তখন ফল করছিল পলাশপুরের চাষীরা। ছুট ছুট শব করে হুলো উঁচিয়ে এল হারাণ চক্রবর্তী।

সরিপদ ধমক দিয়ে বলল—'কাশেম ভাই, ছোটবাবু আইছেরে। ওই দেখ্‌ছো। ওইডাই চড়ি আইছে।'

কাশেম কাজ করতে করতেই হাত তুলে বলল—'আসাব ছোটবাবু। দেখেন ছেলে দেখেন কলমটা কইলকাতে। নতুনী বানাবে নাকি নাকি আইছে বাবু। নাকি নাকি আইছে।'

হাসল হারাণ। 'যাই শুনলাম তাল ধান হয়েছে, তাই দেখতে এলাম। তা এবার কতো মাড়ি আনব?'

—'আর এক ধান বাবু। মাত্র এক ধান বছরে তর। ধান মাড়াই মাড়াই করি হোতে খবর দিব বাবু। তখন আসিস।'

—'বেশ তাই হবে। দেখিস, যেন তাতে ধান চুরি না হয়। পালা হাজাতে চাষাদুলো আবার সব তাতে ধান চুরি করে।'

কথাটা শুনেই আব্বাস চেয়ে উঠল। সাঁতা ওকে মুড়ি আর জল দিচ্ছিল। সকালের নাস্তা। মুড়ির থালাটা ফেলেই চিৎকার করে বলল আব্বাস—'কি সব কইলছেন বাবু। মাতাটা খারাপ হইয়ে নাকি আপনার। চাষাদুলাক চোর বইলছেন? তাল হয় বাবু।'

—'কি জানি! তোর মেঘি খুব কথা বেরিয়েছে যে আব্বাস। মাথাকে কথা তোকে মাস্টার করে দিতে। তাল পড়াতে পারবি।'

কাশেম হাসছে দিল আব্বাসকে,—'তুই যায় তো। বাবুর কথা বাবু বইলছে। তোর কথা উঁচিত নয়।' তারপর হারাণের দিকে তাকিয়ে বলল—'কিছু মনে নিস না বাবু। আব্বাসটা সবব থাকি পড়ি পড়ি কি যে মাতাটা খারাপ কইরেছে না?'

হাসল হারাণ চক্রবর্তী।—'নারে কিছু মনে করি নাই। সে যাক, ধানটা ঠিকমত দিস।'

হারাণ চলে যেতেই সরিপদর ক্ষোভ পড়ল কাশেমের ওপর।

—'ইটা তোর কি বিচার রে কাশেম? হামার গাওর সকল চাষাকে বলাটা তোর বলি মেল আর তুই কিছু বইললি না। ছি ছি, খুব দেখিছি। জমিটা হারাণের চাষ করিস বইলে একেবারে তোলাম হইছিস রে।'

খাবার দিয়ে মুখের খাবারটা মুছে কাশেম বলল—'হামার তত ধান নাই। খাসের লাগি ধান ছাড়িছি অনেক আগে। নেকচার মুনি মুনি চেন দেখিছি। কিছুই হবার নয়। তোর বলাটাকে বকল করে দিল মনে করি এই পণ্ডিত তখন যে কি করিছিল সকলটা হামার মনে আছে রে। ভুলি নাই কিছু।'

কথা আর বাড়াল না সরিপদ। নাস্তা দেব। সীতা এল আর মুড়ি নিয়ে কাশেমের কাছে গেল।

—'না থাক, তুই বরঞ্চ চলি যা সীতা। তোর মামী চাবা। আমি তো খেলাম রে। আবার কেন কষ্ট দিস।'

হেসে গেল সীতা।

—'কি পাগল হইছিস মামি? বাপ্পার সঙ্গে কাজিয়া করি হামাকে কেন খুনেছিস রে। মায়ের কাজিয়া মায়ে মরুক। এখন নাস্তা করি নে। না করিস না।'

মাথে হাত দিয়ে কপাল সীতা। সীতার অবশ্য উপকার করে, মামা কি কাশেমের? সেই ছেলেবেলায় সীতার মা ভাই মারা গেল কলেরায়। সীতাকে নিয়ে এল কাশেম নিজের বাড়ীতে। তখন বড় ছোট সীতা। সরিপদ কোলে নেয়। কাশেম তখনও ঘিরে বলেছিল—'আল্লা যা দিবার দিয়ে। যা নিবার নিয়ে। কাঁদিস না তাই। হামার ঘরত সীতাক রাখ। আব্বাসের যা সীতাকে সেইছবে।'

সেই ছোট বয়স থেকে সীতা বড় হয়েছে কাশেমের বাড়ীতে, আব্বাসের মায়ের দুধ খেয়েছে সীতা। আব্বাসের যা পুকুর পাড়ে জল নিয়ে ফিরতে গিয়ে একদিন সাপের কামড়ে প্রাণ দিল। বাঁচান গেল না। কবরের উপরে পড়ে সে কি কান্না সীতার। কাশেমবৌই সান্ত্বনা দুজন সীতাকে। সীতার ভাই আলাদা আবদার। কাশেম, সরিপদ, বাবু সকলে সব জন্য সীতার কাছে। আব্বাসের কাছে রাত্রিবেলার ঘরে একটু সেবাশুশ্রূষা করে সীতা। আব্বাসই নন্দলহাট বাজার থেকে এনে দিত ফুল স্নো, আতা, কর্ণ পাউডার। যেদিন আব্বাস ওকে সীতা নাম লিখতে শেখাল, সেদিন সীতার কি আনন্দ। কলম বলল,—সীতাক এবার আকবর লিখা লিখা আব্বাস। আকবর না লিখলে সীতা নাম আমার না রে।' ৮ বছর ছেলে ছিল আব্বাস। বাপ করে পালিয়ে ঘিরেছিল সীতা।

বি.ডি.ও অফিসের গ্রামসেবিকা সীতাদি গ্রামে এলেই ছুটবে সীতা। সীতার যে কত গল্প। কার ঘরে কে উঠ খাম। কোন চাষীর বৌর ছেলে হবে, কার ফুলমায়ে টৈ ফুল—এই সব খবর সীতাকে দেবার পোস্ট অফিস হল সীতা। সীতা যাকে মকে সরকারী তথা দফতরের সাব, বীজধানের পোস্টার নিয়ে আসে। সেগুলো সব বোঝা করে সীতা নিয়ে ঘুরে ঘিরে বিলোয়। এতেই তখন আনন্দ সীতার।

মাঠের কাজ শেষে যে যার বাড়ি চলে গেল। আব্বাস চলে গেল স্কুলে। স্কুলে যেতেই হেডমাস্টার মহাশয় বললেন—'সকরে যা আব্বাস, স্কুলের জিনিস জলতে হবে।'

এতটা পথ রোজ এসে আবার ফিরে যাইল দূরের সফরে যাবে আব্বাস।

—'স্যার, কাল ছেলে হয় না?'

—'তোকে আজকাল কালে দেখেছে যে আব্বাস। কথা বললেই বজ্জাতি করিস।'

কথা না বাড়িয়ে চলে গেল আব্বাস সফরে। সফরের সব কাজ শেষে যখন

বাড়ী ফিরে তখন ছোট ঘরখানা দেখে নিতে মিনিট দশেক লাগল কিসের, কার পুরিকল্পনা। শুনিয়ে গড়ল আশাকে, একটা, শুধু ঘরে কি করে এরা।

তখন অন্ধকারটা সবেই এগোন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকার একেবারে জমাট বাঁধবার আগে সবাইকে ফিরতে হবে। অন্ধকার এলে ঘোর হয়ে যাবে বাইরে। একের পর এক তারা ফিরে যাবে। আর আশ্চর্য হয়ে যে চাষী বা মেয়েরা তাদের জন্য নীতি হল তিন হাজার বছরের পরে চাষী। এক তাল পাকে মাটিকে। মন্ত্রী মহাশয় অবশ্য বোঝেন, পশুপতির কথাটা হয়ে গেলে এই নীতি বুঝতে পারবে। তবে আমাদের জন্যে না চাষীদের উপর।

হাত ঘড়ি দিয়ে সময়টা দেখল মহাশয়। সাড়ে চারটা বাজে। ঘড়ি ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়ে গেছে। মন্ত্রী মহাশয় আসবেন ঠিক সময়ে। তাঁর সঙ্গে আসবে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার। তাদের জন্যে চা-জলখাবার তৈরী করতে হবে। তাই ঘরে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মেয়েরা।

সবার আগে বাড়ী ফিরে এসে সন্ধ্যে কালেমের ঘরের দাওয়ায় পাশের চালায় বসে বেউ শুকনো পাতা চাটাইয়ে আগুন পোহাচ্ছে, বেউ বা মাদুর পেতে হুকো টানছে।

—এত দেরী যে? প্রশ্ন করল কালেম।

—কাজ ছিল। তা খবর আছে আমাদের ভাল খবর।

—কি যে কাজের মন বুঝিস! কালের মত বলিস। কি খবর যে আমাদের—প্রশ্ন করল সবিস্ময়ে।

সন্ধ্যা কটি ইঁদের মেয়েরা মেয়েরা সবাই বইলো সবিস্ময়ে চাচা। আর মানুষ হয়ে গেছে ছেলে। সাইকেল ছিনতাই যারা ইস্কুলের ভাল্লা সাইকেল চড়ি ঘুরি আমার কাছের আর দেখা নাই।

—আরে ঘরেতো বলার মতো কথা। না হয় দুঃখ কষ্টে থাকে। আছে আছে বইছে তখন আমি। বিরক্তি প্রকাশ করল মন্ত্রী মহাশয়ের।

মন্ত্রী বলল আশ্বাসে। শুনিয়ে বলল সব কথা ওদের। মিটিংএ যা যা শুনেছিল তা বেশ বুঝিয়ে বলল। বুঝাল ওদের, এক ভাল ঘরে আসবে। কথা শেষ হল আশ্বাসের।

কালেম বলল, 'কথা ত সবার এমন অনেক হয়। বিশ্বাস কিছু নাই। হাবাস সরকারী ড্রাইভারে কেনে। সবে আসলে মরাঁক যান বন্ধাত ভাঁয় ঠিক ঘরোয়ানকে বইলবে—চল বাড়ী চল। তখন হুমার কথা কিছুই নাই।

—কেনে কমিটি হবে তো? পশুপতি বললে। তার চোখটা চকচক করে উঠল।

—আরে বাবা। কমিটির কথা বাবা। আশ্বাসও বইলছে আর কমিটিও হইছে। তবে থাকি কাজের কথার আইস্। যে বইলছিল মন্ত্রী মহাশয় সেইটাকে বিশেষ কমি একটা কিছু, তাই তো।'

আশ্বাস কথা না বাড়িয়ে মনটা তার করে দেখবেন জন্য দিতে গেল।

আশ্বাসে আশ্বাসের আগে যে এতটা আলোচনা করেছিল তা আবার শুনে বলল মন্ত্রী।

—আমার মনে হয় কিছু, করার হল থাকে ত ভালো হইবে। মন্ত্রীমহাশয় তারা ত আসিবেই। আমাদের পাঁওর নাম বলেন কর।

প্রস্তাবটা তার মনঃপুত হয়েছে। কিন্তু সাঁওতাল চাষা কুলমাদের বোঝে—তারা কিন্তু হাজার টাকার কম হবার নয়। কমিটিটিতে বলতে হবে।'

সব শুনে কালেম বলল—মন্ত্রী মহাশয় সবার ভাল যে মন্ত্রী। হারাম সাহেব বইলছে পরসা কম ভরি দিবে।'

শেষে কালেমকেই ভার দেওয়া হল দল ঠিক করার। গ্রামে ভাল ধান দানাই একটা হিসেব করে চাষীরা। নতুন ঘরের পরে মেরামত যাওয়া, বাড়া রেখা এই করে করে হাতের দব পরসা শেষ করে তারা চিন্তা যান পড়তেই চড়া সুদে ধার নেবার জন্যে মহাজনের বাড়ী গিয়ে করজোড়ে দাঁড়ায়। ঘরই যেকোন হোক না কেন ওরা যা করার তা করবেই। তবে এবার দল বন্ধন পর পশুপতি চাষীরা হাসতে শিখেছে। তাদেরই ওরা সবই ছিল ঠিক করতে হবেছে কি করা যায় এবার পুরে। চক্রবর্তীরা আর নবীন কুণ্ডুরা পশুপতির জমির বড় শরীক। ওরা দল বানিয়ে বেচার আর সময় থেকে না মন্ত্রীমহাশয় থেকে কল এসে বেচার সব ধরচ বহনের ভার।

কালেম দাঁড়ায় নিল মন্ত্রীমহাশয় থাকবে। বেরিয়েদের মত আলোচনা হবে হল।

সাঁওতাল আর আশ্বাসের সম্পর্ক নিয়ে মাঝে মাঝে মাঠের বা অন্য জোতদার চাষীরা ঠাট্টা করে অনেক,—হেমন্তের বিটি ছুকরা সঙ্গে...মহেলা-মহলে ই সব চাল লয় ভাই।' এক কান দিয়ে শোনে পশুপতি আর এক কান দিয়ে বের করে দেয়।

মন্ত্রীমহাশয়ের দলেরা রাজী হয়েছে পশু পাইতে। এক রাতের জন্য আসবে। কি পালা হবে সেটা জানতে চেয়েছে। আবার মিটিং বসেছে কালেমের বাড়ীতে। আগে ঠিক হবে চক্রবর্তী আর নবীন কুণ্ডু, তারা কাদের নিয়ন্ত্রণ হবে ধান শোনবে। তারা মন্ত্রীমহাশয় থেকে যা সাহায্য পাবে তাদেরকে পশুপতির স্কুলের চেয়ারে বেঞ্চে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে গ্রামবাসীরা।

মন্ত্রী বললে—'বেলন ভাইসকল, কাদের নিয়ন্ত্রণ দিবা হবে।'

—'কাদের আবার? সোজের যারা ঘরখানে তাদেরই জন্য। এই ধর চারটি কম্পাউন্ডার সহায়ক, ধরোগা সাহেব আর পঞ্চায়েত প্রধান।'

এরাই হল এদের কাছে সকল ক্ষমতার উৎস। কম্পাউন্ডার কয়া অবাক জলের বাড়ি পাবে, তা না হলে নয়। মিকশ্চার জ্বর লাগের বেলী চাইলে কুমড়ো, আলু, লঙ্কা দিতে হয়। গ্রামে কল দিয়ে অনেকে কম্পাউন্ডারের সাইকেলের সামনে ঝুলানী বেঁধে দিতে হয় কালেমদের। পঞ্চায়েত প্রধানকে মানতে হয়। তা না হলে ঘরখানা করবে কোথায়?

কালেম বলল,—মন্ত্রীমহাশয়ের 'অনেক বিড়ি অপেরাকে রাজী ও করান গেল। তিনশ টাকাতেই রাজী হইছে। তবে কি গান হবে সেটা ঠিক করি বল হেমেরা।'

—কি আবার? একটা দুঃখ, একটা রঙ্গ, মেনোপাঁতি, কিছু মানুষ। গাঁইবোরা হউক'—পশুপতি বললে।

—'সীতার বনবাস' করান হউক না?' মন্ত্রী মহাশয় বললে।

'সীতার বনবাস' খুব নাম করেছে মন্ত্রীমহাশয়। তাই শেষে 'সীতার বনবাসই সবসম্মত হল। মন্ত্রীমহাশয় বাজারে অনেক বিড়ি কোম্পানীর কর্মচারীরাই বাড়া করে। এ ধরনের প্রমাণসে এদেরই প্রভাব বেশী। দিন তারিখ ঠিক হল। পর দিন পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বায়না দিতে গেল আশ্বাস।

আস্তে আস্তে পশুপতির কমিটির নামে পঞ্চায়েতের লোকজন আসছে গ্রামে। দু-একদিন পরপর এম. এল. এ.-রা এলেন। বোঝালেন যে, লোক দিতে হবে যার একরের উপরে যাদের জমি তাদের, আর তিন ভাগের দু'ভাগ ধান পাবে চাষী, এক ভাগ মালিক।

হাওয়া গরম হয়ে উঠল চারদিকের। অনেকেই শুনল খুব

১০ই অক্টোবর পর্যন্ত সবরকম গৃহসজ্জার উপর

১০% রিবেট

এম্পোরিয়াম শনি ও রবিবার এবং ছুটীর দিন সহেত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা।

কু-সিল্ক * সিল্ক * সুতী

হ্যাণ্ডলুম

শাড়ি পশমী শাল ড্রেসপীস স্টোল * টাই

সুটের ও সার্টের কাপড় * ধুতি * গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি তৈরী জামাকাপড় * বিছানার চাদর * ঘুন্সি তোয়ালে * সুতীর কার্পেট প্রভৃতি

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

হ্যাণ্ডলুম হাউস

২, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

পাইকারী বিভাগ : ২, পার্কষ্ট্রীট স্কোয়ার, কলিঃ-১৬

দি অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম ক্যাম্রিকস্ মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিঃ। কর্তৃক পরিচালিত।

পঞ্চায়েত কমিটির কথা, কিন্তু অনেক ধান মিলেই বালিকাকে সব ছেড়ে দিল। সুরে মাথা বিঁধ হয়ে আছে মহাজনের কাছে। কেন্ সাহসে এ সব কথা বোলে!

কুন্ মুর্মু পরিষ্কার ভাষা দিল পঞ্চায়েত কমিটিকে—হামার ধানটা ও কুড়াস দিবার জন্য নেওচার দিল বাবু। কিন্তু চৈত মাসে হামার ঘরে যে কিছু ও ধইলতে পারাইস না। খালি খালি মহাজনের সঙ্গে কথড়া কইরব কানে?'

কুন্ মুর্মুর কথার জবাব দিতে পারেনি কেউ। ইতস্তত করে চলে গেল পঞ্চায়েত কমিটি।

আশ্বাস কিন্তু লোপনে লোপনে পঞ্চায়েত কমিটির সঙ্গে যোগ রাখছে। দু-একটা মোজার গিয়ে পোহন থেকে উস্কে দিয়েছে চাষাদের —কুড়াসের জন্য নিশ্চয় যে, কমিটির লোককে জানি চল, ভয় নাই।'

পলাশপুরের জমিতে সুবিধে হল না। কাজের মিঞা থেকে সবাই এক-বাক্যে অরেক অরেক নিয়মে রাজী। তারা জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে কথড়া করতে রাজী নয়। চরবর্তীরাও খুশী হবে। অনেক বিড়ির মালা বন্ধকেও এসে ঘিরেছে চরবর্তীরা।

বেশ আনন্দ সবার। রাতে কম্বল জড়িয়ে বিড়ি ধরিয়ে মালা শুনতে গেল সবাই। বড় চে-লাইটের মত হ্যাজাকগুলো জ্বলছে। চোরে বসে হারান চরবর্তী, নবীন কুন্ডুর দল। সবাই ওদের নমস্কার করে চিপলের ওপর গিয়ে বসছে।

—'আশ্বাস কোথায় রে?' হারান জানতে চাইল কালেমের কাছে।

—'এখনও ত আসে নাই বাবু। আইসবে বোল হয়। নতুনচকের দিকে গেছে নাকি শুইনাছি।'

সীতাও এসেছে শুনতে সরিষপের সঙ্গে। আশ্বাসকে দেখতে না পেয়ে উসখুস করছিল। কুন্ মুর্মুর মেয়ে টুনা বলল—'বল কেমন করে নাকি রে? আইসবে রে, আশ্বাস আইসবে। সীতা যখন আসি গেল তখন আসলতও আইসবে।'

হাসল সীতা টুনার কথা শুনে; ওর পাশেই ঘিরে বসল। টুনাকে বলল—'তুই আসলত লিখা জানিস?'

—'দূর, কি ঝইলাইস তুই। ওসব জানি কাজ কি মোর? বাপটাকে তাড়ি দেওয়া আর কবিরাজ বোল-চাত করা ছাড়ি কেন্ কামে থাকার নাই মোর।'

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল সীতার। কতদিন ওরও আসলত লেখা শিখতে ইচ্ছা হয়েছিল আশ্বাসের কাছে। সেই যে সেদিন পালিয়ে এসেছিল আর ও-মুখো হয়নি। কতবার বলেছে আশ্বাস সীতা আর পড়তে যায়নি।

বেশ জমিয়ে বসেছে সবাই বিড়ি ফুঁকে। গল্পও যায়া দেল, কৈবেলী এবার বলবার প্রতিজ্ঞা পালনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে হারানকে। সীতার গর্ভ করছে যে, তার ভাবে জল। হাতজোড় করছে খুব ধান শুনে। বিবেক ধান হয়েছে।

এমন সময় কম্বলের কানের কাছে চাঁদ চাঁদ মুখ কজনের ছেলে বিপিন এসে কি যেন বলল। বুড়ো কেঁপে উঠল কালেমের। আস্তে করে জানলা ছেড়ে উঠে গেল বাইরে। সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে। কারো কোনো দিকে নজর নেই। সরিষপও বিড়ি চাইবার জন্য হাত বাড়াল কালেমের দিকে। বিড়ি আসছে না দেখে ফিরে তাকাল। কালেমকে দেখতে পেল না সরিষপও। কিছুক্ষণ দেখে বেরিয়ে এল বাইরে। দেখে কোথায় কালেম। বাচ্চার উত্তোজা কালেম, আর কালেমই নেই। এ কেমন করে হয়। বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল সুবাকে। গ্রামে যাবার আর ছোলা ভাজার দোকান আছে সুবার। আজ ধান বেচেছে তাই আজ এখানেই দোকান লাগিয়েছে সুবা।

—'কালেমকে দেখা পাইছ্ না কি রে সুবা?'

—'যা, কালেমচাচা তো বিপিনের সঙ্গেই নতুন চকের দিকে গেল বোধে গেছে। কি নাকি গণ্ডগোল হইছে।'

নতুনচককে আশ্বাস গেছে ধান তুলতে এ খবর জানে সরিষপও। ওকে বলেছিল আশ্বাস। হারানের আর একটা অংশ নতুনচকে। সেখানকার কৃষকদের বোঝাতে গেছে আশ্বাস। নিজের বাবাকে পারেনি, সেই লজ্জায় সেখানে গিয়েছে আশ্বাস। কুড়াস ধান চাই কৃষকের। হারানের এত জুলুম বরদাস্ত করবে না আশ্বাস। সরিষপও কিছু বোঝেনি তখন। এখন বুঝল কালেমকে কি হতে পারে। সরিষপও ছুটল নতুন-চকের দিকে।

সীতা গ্রাম ঘুরে চলে পড়েছিল টুনার ঘরে ধান শুনতে শুনতে। মাথা ঝিম টুনা ওকে।

—'বাপটার সঙ্গে যাড়ী চাল যা না কেনে? বসি বসি নিলাইস্ ফালন?'

জেগে ওঠে সীতা। দেহনে দেখে বাবা নেই। কালেমচাচাও নেই। বেরিয়ে এল বাইরে।

সীতা বাইরে আসতেই সুবা বলল, 'আবার কিনার ধন আছে না কিরে সীতা?'

—'না হয় রে, বাবায় কিনিব না। মোর বাপটা কি যাড়ী গেল নাকি রে সুবা?'

নারায়ণবাবু বেশী

—'কেনে তোকে বলি যায় নাই। তোর বাপ, কালেম সব তো নতুন-চকে যেঁড়ি গেল। ভয়ানক গণ্ডগোল হলে বিপিন আসি খবর দিল। আশ্বাস আছে নতুনচকে।'

—'সর্বনাশ! কি কথা শুনালিরে সুবা! যাই, আমি যাই। ওরে আমার বাপরে। কালেমচাচারে, আশ্বাসরে, কোথায় তরা রে।'

মাথা পূর্ণিমার জোৎস্নারাতে চীৎকার করে আকাশ কাঁপিয়ে ধান-ক্ষেতের উপর দিয়ে সীতা ছুটল নতুন চকের দিকে। পলাশপুরের আর মাইলের মতো নতুনচক। সেখানে জমির ধানের ভাগাভাগি করতে কৃষকরা কিছু করতে পারে জেনে শহর থেকে খুন্তা পাঠিয়েছে হারান চরবর্তী।

আশ্বাস তাদের সঙ্গে পারবে কেন? কৃষকরাও ভয়ে ধান ফেলে পালাতে গেল। আশ্বাস বলল,—'যাইস না রে, যাইস না। মোর জন ধরেই তোরা তেহের ভাগ ঊঠা...'

ওরা আশ্বাসের কোন কথা শুনতে চায়নি। শহরের বাবুদের আড়া করা মাস্তানদের কাছে আশ্বাসের মূল্য কতটুকু?

ভোর হবে এমন সময় সীতার কানায় পলা শোনে: সবাই যে যায় বাড়ী ফিরছে। অনেক চরবাই বলতে বলতে গেল, কালেম মিঞার বুদ্ধি খুব পাকা হে। খুনের মত পাপ নাই বটে। সাধনা দিবা হবে কালেম মিঞাকে। ফাইল ও মরঠে আসতে। ভাল ভাবি জলপান দিব।'

সীতা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে যখন নতুনচকে পৌঁছল তখন কালেম বুকে চাপড়ে কাঁদছে আশ্বাসের রক্ত-মাখা মৃতদেহটার উপরে পড়ে। গ্রাটি লাল হয়ে গেছে রক্তে। ধানের গায়েও রক্ত লেগে আছে। সরিষপ ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

সীতা কাঁপিয়ে পড়ল আশ্বাসের বুকে।

কালেম বলল, 'তোর আসলত লিখা আর শিখাবার লোক নাই যে সীতা। আশ্বাস আমার কাজি বিয়া চলি গেল। আশ্বাস রে! বাপ্ আমার...

ভোর হয়ে এসেছে। পূর্ণিমার জোৎস্নার আলো তখনও মাঠে। মাঠের উপরে জোৎস্না।

# ১

# মানবেন্দ্র পাল

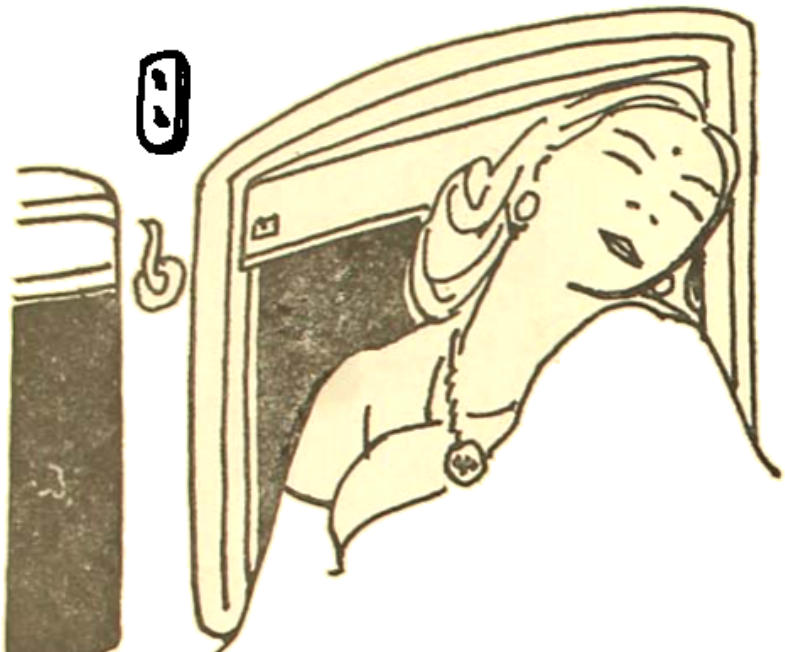

# পিছু হটো না

আমাদের দেশে বিয়ের ব্যাপারে কন্যাপক্ষের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। একদিকে যেমন কন্যাপক্ষের ব্যবহারে কন্যাপক্ষ সন্তুষ্ট তেমনি আবার বরযাত্রীদের রসিকতা দ্বারা যেন শুভদৃষ্টির মুহূর্তটা ধন্য হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বরযাত্রীদের তপাসে হাসই যা ওঠে তা যে তেমন উপভোগ্য হয় বরযাত্রীমাত্রই তা অস্বীকার করবেন। বিয়ে মিটে গেলেই কন্যাপক্ষ আর বরযাত্রীদের প্রতি এতটুকু অনোযোগ দেন না। কোনোরকমে বাইরে দিয়ে বিয়ে করতে পারলেই বাঁচেন। যেখানে বিয়ার করা সম্ভব হয় না সেখানে ভায়রা বাড়ির একটা বৈঠকখানা দেখিয়ে দিয়েই তাঁরা কর্তব্য সম্পাদন করেন। বিছানা তো দূরের কথা পাতবার মতো একটা চাদর পর্যন্ত জোটে না। সারা রাত মশার কামড়ে ছটফট করতে করতে দূরের আশা বিসর্জন দিয়ে রাস্তায় পায়চারি করে বেড়াতে হয়।

আমি একটা বিয়েতে বরযাত্রী গিয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে করতে শেষ পর্যন্ত স্টেশনেই চলে এসেছিলাম। আশা, যদি কোনো ট্রেন পাই তাহলে রাতেই ফিরে যাব—একাই ফিরব। রাত জাগার এ কষ্ট আর সহ্য করা যায় না।

রাত তখন প্রায় একটা। স্টেশনে প্যাসেঞ্জারের ভিড় নেই। এখানে ওখানে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে দু-একজন শুয়ে বা বসে আছে। আমি স্টেশন মাস্টারের ঘরে দিয়ে ঢুকলাম। স্টেশনমাস্টারের ছিলেন না। অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন-মাস্টার সেই মোটা লম্বা চিমনিওলা কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে একটা খাতায় কী লিখছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কোনো ডাউন ট্রেন পাওয়া যাবে?'

অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন মাস্টারের বয়েস অল্প। এত রাত্রে রসিকতো একজন ভদ্রলোককে পেয়ে একটু আলাপ করতে চাইলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আধঘণ্টার মধ্যেই ডি আর ডি ডাউন আসছে।'

—'ধন্যবাদ।'

অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন মাস্টার আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'বরযাত্রী বুঝি?'

আমিও হাসলাম। বললাম, 'আর বলবেন না। নাক-কানে খত আর কক্ষনো এ ধরনের অকস্মাৎ বরযাত্রী যাচ্ছি না।'

—'একাই ফিরছেন?'

—'কী করি। রাত কাটানোর ব্যাপারে দেখলাম কেউ কারো নয়। বরযাত্রীদের যার যেখানে চেনা-জানা ছিল তারা সেখানেই কেটে পড়ল। কাজেই আমাকেও নিজের পথ দেখতে হল।'

—'কোথায় যাবেন?'

—'আপাতত কলকাতা। তারপর যাহয়ত।' বলে হাওড়ার একটা টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম।

ঘণ্টা তাড়াতে তাড়াতে আর জমাদার নিশানাথের দিকে তাকাতে তাকাতে যখন অধৈর্য হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ পিছনে শুনলাম নারী-কণ্ঠ—

—'এখানে একটু বসতে পারি?'

চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি এক মহিলা ঘোমটার ওপর

মুখোমুখি ছেলে ঝুঁকে পড়ে আমার অনুমতির অপেক্ষা করছে।

এত রাত্রে এইরকম একজন মহিলা যে এইভাবে আমার পাশে এসে বসবার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করতে পারে এ তো কল্পনাতীত ব্যাপার। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে বসতে বলে ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়ালাম। খালি বেঞ্চির তো অভাব নেই। আমিই না হয় অন্য বেঞ্চিতে চলে যাই।

কিন্তু ভদ্রমহিলা সত্যিই ভদ্র। বেঞ্চিতে বসেই মিষ্টি গলায় বললেন, 'আপনি উঠছেন কেন? বসুন না।'

সে অনুরোধ সঙ্গে সঙ্গেই পালন করতে হল।

এতক্ষণে অন্ধকারেও মহিলাটিকে মোটামুটিভাবে দেখলাম। অল্প বয়েস, কিন্তু দীর্ঘাঙ্গী—যাকে বলে ছিপ ছিপে সেই রকম পাতলার ওপর গঠন। রঙটা শুভ্র। চুলের বড় নেই। এলোমেলো চুল, কোনো রকমে ছিলে বিনুনী বাঁধা। যেন কোনো ঘুমন্তবাড়ি থেকে এইমাত্র উঠে চলে এসেছেন।

মুটো মিনিট অন্ধকারেও কেটে গেল। একটা সিগ্‌রেটলাইটার আর একটা আর্টিস্টিক পার্স। দুটোই প্রমাণ করছিল মহিলাটি অবস্থাপন্ন ঘরের। আর সবকিছু ছাড়িয়ে একটা মনে হচ্ছিল যে তিনি এখানকার নন, নিশ্চয় কলকাতার কিংবা কাছাকাছি কোথাও থাকেন। কিন্তু বিবাহিতা কি কুমারী তা অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না। আধুনিক বিবাহিতারা যে সব সময়ে শাঁখা সোহা পরেন তা তো নয়। সিঁদুরের সীঁথি রেখাটিও প্রায়ই সিঁথির গহনে আচ্ছাদন করে থাকে। তা ছাড়া খুঁটিয়ে দেখার উপায় নেই। যে কোনো কারণেই হোক কাপড় পরাটা কেমন বিসদৃশ।

এই সময়ে মহিলাটি মনিবঠাকুরানীর মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'কলকাতা যাবার ট্রেন এখন আছে তো?'

—'আছে।'

—'কখন আসবে?'

—'আধঘণ্টার মধ্যেই।'

এই অন্ধকারেও মহিলাটি একবার রিস্টওয়াচটার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম মহিলাটি লাজুক নন। বয়স একটু বেশিই হবে।

আমি একটু নড়ে বসলাম।

—'আপনি কত দূরে যাবেন?'

তিনি আগের আলাপ সূত্র ধরে বললেন।

—'কলকাতা।'

—'আমিও কলকাতা যাব। তাহলেই হল একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

এ কথার আমি জোরাল অনুমোদন করলাম।

—'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

ভদ্রমহিলা এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়ে সিলভার দেখতে লাগলেন।

—'এখনো ট্রেন আসছে না কেন?'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'সময় হয়নি।'

—'সময় হয়নি মানে? সেই কখন বলেছিলেন আধঘণ্টা—'

খুব বেশিক্ষণ আগে বলিনি, বড়জোর মিনিট দশ হবে। যদিও এ. এস. এম. আমাকে বলেছিলেন তারও ঢের আগের।

—'একটু দেখুন না কাইন্ডলি, আর কত দেরি আছে?' ভদ্রমহিলা হঠাৎ যেন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রুমালে মুখ চেপে কাশলেন খানিক বার।

অগত্যা আমাকে উঠতে হল। আবার এ. এস. এম.-এর শরণাপন্ন হতে হল।

—'ভাই, আর কত দেরি?'

এ. এস. এম. হাসলেন।—'দেরি নেই। আসের স্টেশন ছেড়েছে।'

তারপর একটু থাটো গলায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি কি আপনার আত্মীয়া? জিজ্ঞেস করলাম বলে কিছু মনে করবেন না।'

সংক্ষিপ্ত আলাপ-কাহিনী আরও সংক্ষেপে বললাম।

এ. এস. এম. সব শুনে বললেন, 'ভদ্রমহিলাকে অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করছেন। কিছুক্ষণ আগে দেখলাম ঐ ফোর্থ-ক্লাস চায়ের দোকানে বসে দিব্যি চা খাচ্ছেন। কতকগুলো ছোকরাও ভিড় করে ছিল। আমার তেমন ভালো মনে হয় না ভদ্রমহিলাকে। নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরছেন। আপনি নিরীহ ভদ্রলোক বলে সাবধান করে দিলাম।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল। খুব্‌ঝেই দেখ! কাজ নেই বেশি এগিয়ে। দেখে নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ুন!

তবু সরে আসবার আগে ভদ্রমহিলাকে অন্তত ট্রেনের খবরটা দিয়ে যাওয়া কর্তব্য মনে করে কাছে যেতেই ভদ্রমহিলা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—'আশ্চর্য লোক তো আপনি। কোথায় ছিলেন? ঐ দেখুন ট্রেনের আলো দেখা যাচ্ছে।'

কোথায় ছিলাম! নিজেই তো পাঠালে! মনে মনে বললাম, নাঃকামি করার আর জায়গা পাওনি? এই গরমে স্টাইল করে গলায় আবার মুফলারও বাঁধা হয়েছে!

ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। আমি তাড়াতাড়ি জন্য গাড়িতে সরে পড়তে যাচ্ছিলাম এমনি সময়ে ভদ্রমহিলা পাঞ্জাবি টেনে ধরে বললেন, 'আমায় ফেলে পালাচ্ছেন?'

অমর পাল (শতাব্দীর্ষাটি)

—'না, না, পালাব কেন? উঠে পড়ুন।'

—'আপনি আগে উঠুন।'

—'ওঃ কী মুশকিল! ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে—'

ট্রেন ছেড়ে দিল। খুব্‌জে ধাক্কা-ধাক্কি করে কোনো রকমে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। সুখের বিষয়, ভিড় ছিল না। আমি তাঁকে একবার বসবার সামনে বসতে বাচ্ছিলাম ভদ্রমহিলা ব্যাকুল স্বরে বললেন, 'আপনি আমায় অমন এড়িয়ে চলতে চাইছেন কেন বলুন তো! আমিও তো একটা মানুষ—বাঘ নই।'

এমন চাঁচাছোলা কথাগুলো বললেন যে, গাড়িসুদ্ধ লোক চমকে উঠে তাকালো। তারা বিশেষ করে আমার দিকে এমন ভাবে চাইলো যে মনে হল আমিই গুরুতর অপরাধ করেছি।

অগত্যা ভালোমানুষটির মতো ভদ্রমহিলার পাশে ফিরে বসতে হল। পাশের যাত্রীটি তাড়াতাড়ি জায়গা ছেড়ে দিতে ইতস্তত করল না।

এতক্ষণে গাড়ির আলোয় ভদ্রমহিলাকে ভালো করে দেখলাম। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস। অবিবাহিতা। সুন্দর দুটি চোখ—পরিশ্রমে ক্লান্তি, কিন্তু তবুও জ্বলছে। মুখের ভাবটি খুব মিষ্টি। কিন্তু কেমন যেন অজানা।

এই মেয়েকে কি বিশ্বাসেই তাঁরা যার খানিক চরিত্রের? তবু যে সন্দেহ হয় সেটা তার কাপড় ছাড়ার পরার শৈথিল্য দেখে। তাকালেই লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিতে হয়। তবু তার যেন হুঁশ নেই।

আমি পাশে বসবার পরই ছেলেটি নিশ্চিন্ত হয়ে কাঠে মাথা ঠেকিয়ে আরামের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল প্রথম। একটু পরে ঘুমের কাদল। গলায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে তারা তারা গলায় বলল, 'জানলার কাঁচটা ফেলে দেবেন?'

এই গরমে—

ছেলেটি কাতরভাবে বলল, 'শিগ্‌গির, আমার গলায় ঠাণ্ডা লাগছে।'

অগত্যা কাঁচটা নামিয়ে দিতে হল। একটু পরে বলল, 'আচ্ছা, আজ-কালকার ছেলেমেয়েরা কেমন বলুন তো?'

যাঃ বাবা, হঠাৎ এ আবার কী প্রশ্ন! বললাম, 'মন্দ নয়।'

—'মন্দ নয়! কী বলছেন! আমার তো মনে হয় একেবারে যা-তা। কিছুক্ষণ আগে চায়ের দোকানে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল যেন আমি একটা সোনাইটি গার্ল! অথচ আমার বেশভূষা কি আমার মনের অবস্থা এটুকু বুঝতে পারে না?'

নাহ্, এটা তো ঠিক একটা খারাপ মেয়ের মতো কথা নয়।

বললাম, 'দেখুন, বাইরে থেকে দেখে মনের অবস্থা বোঝা খুব কঠিন ব্যাপার।'

—'কথখনো নয়।' মেয়েটি এবার জোরে উঠে বলল। 'মানুষের ভেতরে সহানুভূতি থাকলে মানুষ ঠিক মানুষের মুখ পড়তে পারে। আপনি আমার বুঝতে পারলেন কী করে?'

মনে মনে চমকে উঠলাম। আমি কি সত্যিই বুঝতে পেরেছি ওকে?

মেয়েটি বলল, 'আমিই যা আপনাকে বুঝতে পারলাম কী করে বলুন? নইলে হঠাৎ আপনার পাশে এসে বসতে পারি?'

মনে মনে পুলকিত হলাম। সাহস পেয়ে বললাম, কিন্তু আপনার মনের অবস্থাটা কি আমায় একটু স্পষ্ট করে বলবেন?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল।—না। সে কথা আপনার কিছু লাভ নেই। আপনি যে দয়া করে আপনার সময়টুকু আমায় দিচ্ছেন এই যথেষ্ট। অমন অপরিচিত জায়গা-বন্ধুদের আশীর্বাদে আপনাকে হতে হবে না।'

বয়ে যে মজা! বুঝবেন, বুঝবেন। এমন কি নয় ঠিকমা কিছুই জানতে পারব না অথচ সঙ্গ দিয়ে যেতে হবে! রক্তিমার্ক নাকি?

বললাম, 'জানতে বাধাই বা কি? আপনি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করুন আমি এখনি বলে যাচ্ছি।'

মেয়েটি অলসে চারিদিকে ঘুর্ণায়মান লোকজনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনার সঙ্গে অনেক তফাৎ আছে। সবচেয়ে বড়ো তফাৎ—আপনি এখন জীবন শুরু করছেন, আর আমি—'

এই পর্যন্ত বলেই উদ্গত চোখের জল সামলাবার জন্যে পাতলা ঠোঁটের ওপর দাঁতগুলি বসিয়ে কামড় লাগালো।

ঠিক এইরকম অবস্থাটা আমি একেবারেই কল্পনা করতে পারিনি। এতক্ষণ মেয়েটিকে মানুষের সঙ্গের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে ঘিরে দেখছিলাম। কিন্তু জলভরা চোখে তার এই করুণ মুহূর্তে আমার দুর্বল করে দিল।

এমনি সময় মেয়েটি বলল, 'আপনিও তো কলকাতায় যাবেন?'

সে তো আগেই বলেছি। তবু বললাম, 'হ্যাঁ।'

—'কলকাতায় গিয়ে আমার একটু সাহায্য করতে পারবেন? মানে—যদিও কলকাতাতেই আমার জন্ম, অনেক দিন ছিলামও, তবু পথঘাট ভালো চিনি না। আমায় এক-জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।'

—'কোথায় বলুন।'

—'সে এখন থাক্। আমি ঠিকানার নাম বলব। সেখানে পৌঁছে দিলেই আমি ঘুমুতে যেতে পারব।' বলতে বলতে মেয়েটি হেসে উঠল। তারপর ওর চোখের উদ্গত জল টপ্ টপ্ করে গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

—'আপনি আমায় আজ এত লুকোচ্ছেন কেন? বিশ্বাস করে সব কথা বলুন না।'

মেয়েটি এবার প্রায় ভগ্নকণ্ঠে মাথা নেড়ে বলল, 'না—না—কখখনো না। আপনাকে আমি আমার প্রাইভেট ব্যাপার বলতে যাব কেন? আপনি কে?'

—'ধরুন, আপনার কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।'

—'এত সহজে বন্ধু হওয়া যায় না।'

আমি বেপরোয়া হয়ে বললাম, 'কি হবে পরীক্ষা দিলে আপনার বন্ধু হতে পারি বলুন।'

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনি তো বড়ো খারে-পড়া লোক।'

আমি তবু নির্লজ্জের মতো হেসে বললাম, 'একটু আগেই না আপনি সহানুভূতির কথা বলছিলেন? আপনার ওপর আমার সেই সহানুভূতি আছে বলেই জিজ্ঞেস করছিলাম। ঠিক আছে, আপনি এখানে বসুন। আমি অন্য গাড়িতে যাচ্ছি' বলে উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটি ব্যাকুলভাবে আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'না, আমায় ফেলে যাবেন না। আমায় কলকাতায় পৌঁছে না দিলে আমি মরে যাব।'

অগত্যা বসতে হল। বললাম, 'আচ্ছা বেশী, সাঁতা যদি আমার সাহায্য চান—'

কথা শেষ হল না মেয়েটি কেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বলল, 'আপনি কি পুলিসের লোক?'

বলেই উঠে পালিয়ে যাচ্ছিল, এবার আমিই হাত ধরে ফেললাম। বললাম, 'না।'

কিন্তু চোখ দুটোর অবস্থা দেখে মনে হল খাঁটি বলিনি। বললাম, 'বিশ্বাস করুন, আমি খুব সাধারণ লোক। সামান্য কারবারী হয়ে এসেছিলাম বারাসত থেকে। আমার এই আশ্বিনের পাঞ্জাবি, ভাঁজের দুটি দেখেই নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। তা ছাড়া এই দেখুন—খিদের হাপা পথ।'

মেয়েটির যেন এবার একটু বিশ্বাস হল। কাঁদকাঁদ গলায় বলল, 'তা হলে আমার নাম জানলেন কী করে?'

আমি হেসে ওর গলার লকেটটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। এতক্ষণে মেয়েটি নিজের দেহের দিকে তাকালো। মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

আমি স্বাভাবিকভাবে বললাম, 'ভালো করে চেকে ঢুকে বসুন। ওপাশের বেঞ্চি থেকে আপনাকে লক্ষ্য করছে। বিশ্রী কাল তো ভালো নয়।'

এই সামান্য কথার কী যাদু ছিল জানি না। মেয়েটি তাড়াতাড়ি কাপড়টি ঠিক করে পড়ল। লকেটটা ঢুকিয়ে দিল ব্লাউজের ভেতরে। তার পর হঠাৎ যেন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এইভাবে কাঠে মাথা রেখে চোখ বুজিয়ে রইল।

রাত তখন প্রায় তিনটে। বাইরে খোলা মাঠের ওপর কৃষ্ণচতুর্দশীর ঘোলাটে আলো। চারিদিক স্তব্ধ। ট্রেন তখন বেশ দ্রুত ধাবমানগতি ছেড়ে গেছে।

—'আপনার নাম তো বললেন না?'

ঘুম জড়ানো স্বরে মেয়েটি বলল বলল।

—'জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?'

—'কৈ? জিজ্ঞেস? না, তা করিনি।'

—'আশ্চর্য। অদ্ভুত—'

—'আমি যাদুর। ঐটুকুতেই চলবে। বিয়ের সম্বন্ধ করছি না যে পদবী জানতে হবে।'

তারপর চোখ বুজিয়ে নামটা কয়েকবার বিড় বিড় করে আবৃত্তি করে নিল।

—'বারাসতে বাড়ি?'

—'হ্যাঁ।'

—'ওখানে ভদ্রা ডাক্তার আছে?'

—'ডাক্তার?'

—'হ্যাঁ। আচ্ছা থাক্। কলকাতায় গিয়ে আমিই খোঁজখবর করে নেব।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কার জন্যে ডাক্তার?'

মেয়েটি অস্ফুট স্বরে বলল, 'অসুখীর জন্যে।'

ভালো জবাব। আমি হাসব, না রাগব ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু বুঝলাম—এখনো অনেক কিছুই লুকোতে চায়।

গাড়িটা বোধ হয় ঝিকেলী পার হল। তাদের ওপর বেশ একটা টান অনুভব করতেই দেখি মেয়েটি অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর তার মাথাটা আমার কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে।

এই গভীর রাতে যখন গাড়ির প্রায় সবগুলি লাইটগুলিই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন এমনি একটি মায়াবী যুবতী সান্নিধ্য খুব খারাপ লাগে না নিশ্চয়ই। কিন্তু হঠাৎ কেন কেন এ, এস, এস-এর সাবধান বাণী মনে পড়ল। হঠাৎ মনে হল পকেটমারার মতলব নেই তো? আজকাল তো মেয়ে পকেটমারও দেখা যায়।

এ কথা মনে হতেই আমি তাড়াতাড়ি খুব পকেট থেকে পার্সটা পাশের পকেটে সরিয়ে রাখলাম। কিন্তু তার স্পর্শ থেকে খুব যাবার জন্যে নেই একটু, সরে বসবার উপক্রম করতেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ঘোরে সে তান হাত দিয়ে গলাটা একেবারে জড়িয়ে ধরল। সে বন্ধন ঠেলে ফেলা এমন সাধ্য আমার ছিল না। ওর মুখ নাক চুল আমার মুখের ওপর ঢলে ঢলে পড়তে লাগল। পাশে জানিয়ে দিলে লজ্জায় অস্থির হয়ে পড়ে তাই বলা দিলাম না। সারা রাত সমস্ত পথ সেই ভাবেই বসে বসে কাটিয়ে দিলাম।

সকালবেলায় হাওড়া স্টেশনে নেমে জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার কী করবেন?'

সে একবার ঘোলা হাওড়া স্টেশনটার ওপর অলস দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি কী করবেন?'

বয়ে যে মজা! আমি কী করব।

বললাম, 'আপনি যে কোথায় যাবেন বলছিলেন?'

এতক্ষণে যেন স্মরণ হল। বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হাজরা রোডের মোড়। চেনেন তো?'

—'চিনি বৈকি।'

—'তা হলে দয়া করে ঐখানে আমায় পৌঁছে দিন।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। তার আগে চলুন একটু চা খেয়ে নিই।'

—'চলুন। কিন্তু আমার কাছে একটি পয়সাও নেই।'

আমি হেসে বললাম, 'থাক্, আমার কাছে আছে। ভাবনা নেই।'

মেয়েটির হঠাৎ যেন কী মনে পড়ল। বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। চা খাবেন তো? কাপ্ট ক্লাস চা? চলুন এক জায়গায় নিয়ে যাই।'

এই বলে হন হন করে হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে সোজা কলকাতার বাসে উঠে বসল।

—'কই আসুন।'

—'কোথায় যাচ্ছেন?'

—'কলেজ তো, ভালো চা খাওয়াতে ভোলাকাকার দোকানে। এই কলকাতায় যখন থাকতাম তখন ঐ দোকানে আমার মাসে একটা আকাউন্টই ছিল। কত দিনের—কত স্মৃতি—'

আলো উদাসভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—'কিন্তু বলছি, আমার কাছে কিন্তু একটা নয়া পয়সাও নেই। বাসের টিকিট—'

—'ঠিক আছে। ওর জন্যে ভাবনা নেই।' কোথায় বারাসত আর কোথায় হাওড়া কলকাতা। কিসের টানে যে ভেসে চলেছি তা আমার ভাগ্যদেবতাই জানেন।

দোকানটি নিতান্তই সাধারণ। খানতিনেক বেঞ্চিপাতা। সামনে একটা

চৌকি। ছোট্ট পর্দার আড়ালে টুং টাং কাপ ডিস ধোওয়ার শব্দ। ওপাশে একটা টিনের চেয়ারে বসে চৌকির ওপর ঝুঁকে পড়ে হিসেব কষছেন বিপ্লবতার দোকানের মালিক।

অত্যন্ত পরিচিত বন্ধুবরের মতো বলা নেই কওয়া নেই, সোজা এগিয়ে গিয়ে কাচের জারের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দুটো বেক তুলে নিল। দোকানের মালিক হিসেবের খাতা থেকে একবার মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু বলল না। তাকিয়েই রইল।

—'আলো দেবী!'

—'অয় দেবী-টেবী নয়। বাম ধরে ডাকুন।'

—'দোকানের মালিক কিন্তু মনে করছে না তো।'

—'ওমা মনে করবে কি? ও তো তোলাকরকা। আমার চিনতে পারছে না এইটেই বেশ মজা লাগছে।'

—'আপনি কি এই পাড়ায় থাকেন?'

আলো কেকে একটা কামড় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। ঐ যে সেতেলা আম কাঁঠালের বাড়িটা দেখছেন। ওটাই আমার মামার বাড়ি। মামার বাড়িতেই আমি মানুষ। এখান থেকেই আমি হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করি। তার পর—'

আলোর স্বরটা কেমন ঘোলা এল, মুখটা করুণ হয়ে উঠল।

—'তার পর কী হল বলুন।'

—'কী একটা সামান্য বিষয় নিয়ে মায়ের সঙ্গে মামার কড়া হয়ে গেল। মা আর মামার বাড়িতে থাকতে চাইল না। বেথুন বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখান থেকেই বি. এ. পাস করে বর্ধমানে এম. এ. পড়ছিলাম। এমনি সময়ে—মা মরে গেল। সে যে কী কষ্ট মার মা মরেছে এক মার সে ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।'

এই বলে আলো কেমন যেন উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি সহানুভূতি দেখাবার জন্যে আর কি বা বলতে পারি? মৃদু স্বরে অনুরোধ জানালাম—'আর এক কাপ চা খাবেন?'

—'না।' বলে পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে আবার স্বস্থ হয়ে হাসল।

পরিবেশটা হালকা করার জন্যে আমি বললাম, 'তা চা খাবার জন্যে এত দূরে আসার কারণ? এর চেয়ে তো অনেক ভালো চা ওর কাছে ছিল।'

আলো আপন মনে মাথাটা একটু দোলালো। বলল, 'ঐ দোকানটার সঙ্গে ছোটো বেলা থেকে আমার চেনা। এখানে বসে কত দিন চা খেয়েছি, বাড়ির জন্যে চা নিয়ে গিয়েছি। আর মামার বাড়িটাও শেষ বারের মতো দেখে নিলাম। ঐ যে খোই পরটা বেচছেন—ঐ ঘরে আমি পড়তাম।'

বলে কত বড়ো কেন একটা নিঃশ্বাস এইভাবে ছেলেমানুষের মতো চৌকিতে ওপর দু হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

—'দেখ বাবের মতো বাদ?'

আলো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি আর বাঁচব না।'

—'কেন?'

—'আমার কঠিন রোগ হয়েছে। বাবা আমাকে দেখতে পারে না। আমাকে মেরে ফেলার জন্যেই একটা ব্রেনওয়াশ সেণ্টারে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আমি পালিয়ে এসেছি।'

আমি শঙ্কিত। বাবা মেয়েকে দেখতে পারে নাই বা কেন, কেনই বা ও পালিয়ে এল? কী এমন রোগ?

আলো একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা, বড়ো হাসপাতালে ভর্তি হতে পয়সা লাগে? আমার কাছে যে একটি পয়সাও নেই।'

অন্তর দিয়ে বললাম, 'তার জন্যে চিন্তা নেই। আমি তো আছি। কিন্তু আপনার রোগটা কি?'

ও কয়েকবার আমার চোখের দিকে দৃষ্টি অল্প অল্প ক্লান্তি করুণ চোখ মেলে ধরে বলল, 'ক্যানসার।'

—'ক্যানসার!'

আমি এত দূরে চমকে উঠলাম যে মনে হল এই মাত্র আমি আমার নড়ুলস্কোপ শুনলাম।

আলো শুকনো খসখসে গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ব্লোট ক্যানসার। দেখছিলাম না সারা পথ আমি কাশতে কাশতে এসেছি। আমার মাথেরও হয়েছিল। বাবা চিকিৎসা করায় নি। মরে গেল। আমাকেও মেরে ফেলতে চাইছে। তাই পালিয়ে এসেছি। হাজার রোজের রোগে একটা হাসপাতাল আমে না?'

কিন্তু এ সব কথা আমার বোধ হয় ঠিক কানে যাচ্ছিল না। আমি তখন ভাবছিলাম এই হতভাগা মেয়েটির কথা। এই সুন্দর নিষ্পাপ মেয়েটা ছিলে ছিলে মরে যাবে! পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে একে বাঁচাতে পারে? তার মানেই যদি যাবে তাহলে এক রাত্তিরের জন্যে এমন করে বিচ্ছি সম্পর্ক গড়ে উঠল কেন?

একটা দুঃসহ কষ্ট আমার গ্রাস করে ফেলল। আমি আর একটিও কথা বলতে পারছিলাম না। আলোও তার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি চোখের সজল দৃষ্টি মেলে আমারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—'আমার জন্যে সত্যি আপনার দুঃখ হয়?'

আলোর দু চোখ এবার জল টলমল করে উঠল। 'বলুন—সত্যি করে বলুন, দুঃখ হয়?'

এমনি সময়ে হঠাৎ দোকানের মালিক কাকে যেন সঙ্গে নিয়ে ঢুকল। একেবারে আলোর সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই আলো চিৎকার করে উঠল, 'না—আমি যাব না। কিছুতেই যাব না—'

কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। দোকানের মালিক—আলোর জেঠা-কাকা—আর সেই ভদ্রলোক দুজনে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে চলল। সঙ্গে আমাকেও যেতে হল।

আল কালারের সেই সোতলা বাড়ির বাইরের ঘরে সোফায় বসিয়ে আলোর মামা আমার কাছ থেকে সব ঘটনা শুনলেন। তার পর আমার কানাবাস দিয়ে বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে ছিল। তেমন বদমায়েস লোক হলে কোথায় ভুলিয়ে নিয়ে যেত! মেয়েটার তো মাথার গোলমাল।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'মাথার গোলমাল!'

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, ওর মা—মানে আমার বোন—মারা যাবার পর শক্ পেয়ে ও যেন কি রকম হয়ে গেছে। কেবল বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এখন ওর ধারণা হয়েছে ওর নাকি ক্যানসার হয়েছে।'

আমার দু চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললাম, 'তা হলে সত্যি ক্যানসার হয় নি?'

—'নাহ্ না। অম্বুবিধে নেই—ওর ডেনটা একটু খেয়ে গেলেন, আর ঠিক ওখানেই আপনি ওকে এসে ধরেছেন। আমি এখনি ওর ডাক্তারকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।'

আমি কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, এমনি সময়ে ভিতরের কোনো ঘর থেকে বর্ষীয়সী মহিলার আর্তকণ্ঠস্বর শোনা গেল—'অলোকবাবু—'

সেই আর্তস্বরে আমি চমকে উঠে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি গিয়ে সশব্দে ভিতরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ফিসফাস করে বললেন, 'আচ্ছা, বনবাস।'

অর্থাৎ এবার আমি যেন বিদায় নিই।

বেরিয়ে এলাম। মনটা কেমন শূন্য হয়ে গেল। মনে হল হঠাৎ যেন আমার দেহের খানিকটা রক্ত কোথায় চলে এসেছি।

তবু তো আলো বেঁচে থাকবে।—মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজি।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এই একটু আগে পর্যন্ত আলোর কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি তা কি সবই বিকৃত মানসিকতার উচ্ছ্বাস?

শেষ

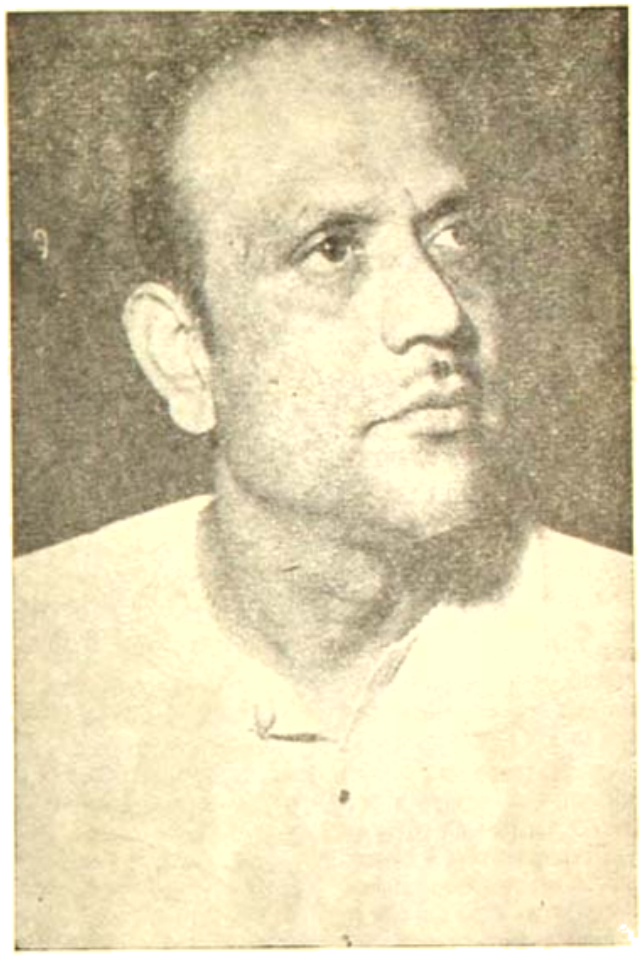

এ. কানন

# মরুভূমি, মরীচিকা, এইই সব...

## বুদ্ধদেব গুহ

এ চিঠি তুমি পড়বে না, তা জানি। সব চিঠি তো পড়ে না মানুষ, সব চিঠি লেখেও না। দীপও যা লেখে, তো তাকে লেখ না। প্রত্যেকের বুকের মধ্যেই কত চিঠি জমে ওঠে, কত চিঠি ছিঁড়ে যায়, দলা পাকিয়ে হয়ে ওঠে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে; তবুও চিঠি না লিখে পারে ওই মানুষ?

চিঠি লেখে, কারণ মুখে সব কথা বলা যায় না, বলা হয়ে ওঠে না। সবাই ভাল কথা বলতে পারে না। আমি ও পারিই না। বলা পরে, চাওয়াও সব কথা বলে না মুখোমুখি, কারণ কথা বলতে বলতে চোখ জলে ওরে আসে, কথা বলতে গেলে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়, যে-কথা বলা হয় বটে, সে-কথা তার মন না ছুঁয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়।

চিঠির মস্ত সুবিধে এই-ই যে, একবারে মনে না হলেও একাধিকবারে পড়লে যা অস্পষ্ট ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা ছিল প্রচ্ছন্ন, তা প্রকাশ হয়।

তোমার সঙ্গে এতদিন পর মুখোমুখি বসে কথা বলা হবে জানিনি। বেশী বলবই বা কি এখন?

সারাদিনের ক্লেদের মধ্যে আমার নিজস্ব-বাস বাস আলোতে দাঁড়িয়েছিল। তোমার নিজস্ব-বাস দাঁড়িয়েছিল বড়ো রোডের অন্যপারে উল্টোদিকে। আমি ছিলাম ডানদিকের জানালার, আমার বাসে। তুমি বাঁ দিকের জানালার, তোমার বাসে।

কতদিন তোমাকে দেখিনি।

মুহূর্তে-দেখা গাড়ির স্রোত নিশ্চিন্ত অন্যমনস্কতায়, হঠাৎই লাল আলো জ্বললে স্রোত হারিয়ে যেতে সম্বিতে।

হু-হু করে বাস দুটো চলে গেল: দুদিকে।

আমি একদিকে; তুমি অন্যদিকে।

তাহলে চিরদিনই তুমি আমার বিপরীতেই গেছ। কখনও আমার দিকে আসোনি, আসবে যাওনি। আমার দিকে যদি থাকতে তুমি, এগিয়ে আসবে পিছিয়ে, তবে কখনও না ভাবতেও পারতাম যে, কোনোদিন বলতে পারব তোমায় অথবা তুমি ধরতে পারবে আমায়; এগিয়ে অথবা পিছিয়ে এসে। কিন্তু আমরা দুজনেই বিপরীত দিকে চলেছিলাম ও চলেছি। যতই চলেছি, ততই দূরের, ভুল-বোঝাবুঝি, সব-কিছুই ক্রমাগত বেড়ে গেছে।

তুমি আজ আমার কাছ থেকে কত-দূরে চলে গেছ। আমার দুঃখে, আমার বঞ্চনায়, আমার এই অসীম বেদনাময় একাকীত্বে তোমার আজকে কিছু-মাত্রও করুণার নেই। যদিও যা-কিছু আমি হারিয়েছি জীবনে তার মূলে তুমিই।

একজনকে লেখকের অনুপ্রেরণা করতে গিয়ে, একজন জলীক স্বপ্ন-চারিণীকে কল্পনার আশ্রয়ে জীবন্ত করে তুলতে গিয়ে, যা-কিছু সত্য ছিল জীবনে, ছিল সহজ প্রত্যাশিত সুখের: যা-কিছু আমারই ছিল

একার, তার সব কিছুকেই হারিয়েছি আমি।

এরে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কারণ আমার জন্যে কখনও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে যা-কিছু জীবনে হারিয়েছি তা নিজের দোষেই যে হারিয়েছি এই কথা স্বীকার করার মত সততা আমার চিরদিনই ছিল।

জীবনে আজ অবধি অনেক দুঃখ পেয়েছি, জানি, বেঁচে থাকলেই দুঃখ, আরো বেঁচে থাকলে আরো অনেক দুঃখ হয়ত পাবো, সে জন্যে প্রস্তুত না থাকলেও অপ্রস্তুত নেই।

কিন্তু আমার হাত থেকে কোনো দুঃখ তুমি পাওনি। যা-পেয়েছ, তা অন্যের হাত থেকে; অন্যের কারণে। আমি দায়ী নই তোমার কোনো দুঃখের জন্যেই। কখনও আমার প্রতি আন্তরিক ছিলে না তুমি। যা-কিছু পেয়েছ আমার কাছ থেকে, তাতে তোমার সহজ অধিকার ছিল বলেই তুমি বিশ্বাস করে এসেছ। জীবনে না-চাইতেই যা পাওয়া যায়, যে-পাওয়ার জন্যে কোনো মূল্য দিতে হয় না, সে যত-বড় পাওয়াই হোক না কেন, কখনোই তার দাম বোঝে না প্রাপক। সে-কারণেই আমার কোনো দাম ছিলো না কখনও তোমার কাছে। তুমি আমার ভালোবাসার অধিকারিণী হয়েছ, ভাই বৃষ্টির মত। কিস্‌কিস্ করে সেই বৃষ্টি তোমার মনের অনাচ-কানাচ ভরিয়ে তুলেছে তৎক্ষণ—বর্ষণই তুমি আমার জন্যে সারাক্ষণ মেঘে এসেছ। তারপরই বাড়ি দিয়ে তোমার নিঃস্পৃহ সুখের ঘরে, তোমার সুনাম, তোমার স্বার্থপরতা, তোমার কাণ্ডজ্ঞান ও পরিমার্জনার আলমারী খুলে সাবধানতার নক্সা তোমাদের বের করে সেই ভালোবাসা একটুও নেরী-না-করে মুছে ফেলে তুমি। তুমি আমার সঙ্গে ভালোবাসা-ভালোবাসা খেলেছ। চালাকি মত শব্দ-আসনে আসীন থেকে আমার ভালোবাসার নৈবেদ্য নিয়েছ চিরদিন। তারপর, বাকীর পাতা দিতে দিতে যখন আমার সব কিছু একে একে শূন্য হয়ে গেছে, যখন আমি ঘরে-বাইরে, মনে-শরীরে সম্পূর্ণ রিক্ত, অসহায়, নেটোলিয়া হয়ে গেছি, ঠিক তখনই আমাকে নাটকের সামনে দিয়ে অন্তর্ধানের, উপেক্ষার ধুলো উড়িয়ে তোমার সালোকিক নিটোল বৃষ্টির মধ্যে বুড়োটা ব্রহ্ম চেড়ে তুমি চলে গেছ। আমি ডেকেছি, হাত নেড়েছি, কেঁদেছি তোমার জন্যে; তবু তুমি আমাকে চিনতে পর্যন্ত পারোনি।

আর কেউই না জানুক, তুমি অন্তত জানতে যে তুমি আর কিছু না হলেও আমার বন্ধু ছিলে। হয়ত আমার একমাত্র বন্ধু। তোমার মত বন্ধু আমার আর কেউই ছিলো না। আমার মনের কথা, মনের অনুভূতি, ভালোবাসা, মনের গায়ে-পায়ে ঘুরে-ফেরার, মনের ভেজা-বৃষ্টির সব কথা আমি একমাত্র তোমাকেই বলতাম। মনে দুঃখ হলে ছোট্ট ছেলের মত তোমার কাছে ছুটে যেতাম। তোমার মুখে সুখী হতাম, তোমার দুঃখে দুঃখী। তোমাকে কষ্ট পেতে দেখলে, সে যে-কষ্টই হোক না-কেন আমার চোখ জলে ভরে আসত। তোমাকে সুখী করার, সুখী-দেখার জন্যে আমি কী না করতাম, কী-ই বা করতে পারতাম!

সেই আমি, আমার পরম দুর্দিনে, এই নির্বান্ধব, স্বজনহীন শীতার্ত পৃথিবীতে, এই ভুল-বোঝাবুঝির, আত্মমগ্নতা, কপটতার, স্বার্থপর পৃথিবীতে যখন একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছিলাম, তখন সবচেয়ে আগে আমার তোমার কথাই মনে পড়েছিল। তোমার কাছে একটু, স্নেহে ঢেকে-ছিলাম, তোমার সমবেদনা একটু, চুপ করে বসে থেকে নিজের অশান্ত মনকে শান্ত করতে চেয়েছিলাম। সোমন তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন ছিল। তোমাকে ডেকেছিলাম বড় বিপদে পড়ে, সমস্ত অন্তর দিয়ে, কি করব, কি আমার করা উচিত তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি—তাই-ই তোমার কাছে যেতে চেয়েছিলাম একবার।

বড় দুর্দিনে পড়ে তোমাকে প্রয়োজন হয়েছিল আমার। অথচ তুমি কেমন সহজ বাহানাতে আমাকে সরিয়ে দিলে। ফিরিয়ে দিলে আমার, আমার একমাত্র বন্ধু, আমার পরম প্রিয়।

সেদিনকার ব্যবহার তোমার, আমার মনের জগতের একটা জানালা খুলে দিল। যে-জানালা আমি নিজেই কুড়ুল এঁটে বন্ধ করে রেখেছিলাম। সে-জানালা হচ্ছে বাস্তবের জানালা।

সেই জানালার রোদ পড়েনি কখনও, ঘর সামনে পাখি ডাকেনি, ফুল ফোটেনি, যে-জানালায় জন্মদুলাল খণ্ডিতকে আমি চিরদিনই উপেক্ষা করে এসেছিলাম আমার অন্তর্হীন ছেলেমানুষীতে, আমার রোমান্সসেবী রোমান্টিকতায় জীবনকর।

লোকে চেয়ে আঙুল দিয়ে দেখতে চাইলেও বেখানি। বলেছি, না! না! আমার ভালোবাসার জন কি এতই নীচ, এতই ঘৃণ্যজীব, এত ছোট হতে পারে? আমার মত করে সর্বস্ব-হারিয়ে কি সবাই ভালোবাসতে পারে? আমি যদি এত ধরণীতলে তাকে ভালোবেসে থাকি তা হলে সে কি আমার ভালোবাসার যোগ্য হবে না? কখনও কি হবে না? সেও কি অন্য দশজন সাধারণ মেয়ের মতই নিজেকে সাধারণের চৌকাঠেই বাঁধিয়ে রাখবে?

ভাবতে পারিনি, ভাবিনি কখনও যে, তুমি, এমন কি তুমিও আমাকে ঠকাবে।

তোমাকে ঘিরে আমার অনেক বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। অনেকগুলো ধরণীতলে বিশ্বাস। যে-সব বিশ্বাসের নির্ভরতা ও কাঠামোর উপর মানুষের বাঁচা-মরা, পাপ-পুণ্য, বাস্তু-অনাস্থার নির্ভরশীল। তোমাকে আমি অনন্তকাল ধরণীতলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলাম যে, তুমি কখনো চলেই যাবে, যেন-তেন ভালোবাসলে ভালো-বাসা পাওয়াই যায় যত্নেছে। ভেবে-ছিলাম, আমার চাওয়ার যদি কোনো খাদ না থাকে, তাহলে পাওয়াতেই বা খাদ থাকবে কেন? পাওয়াও তা হবে নিটোল মুক্তোর মত।

এ সব অনেক ভেবেছিলাম। অনেক ভেবে-চিন্তে, অনেক অনেক রাত চিন্তা করে নিজেকে বড় সৌভাগ্যবান বলে মনে করেছিলাম। নিজেকে বুঝিয়ে-ছিলাম, তুমি হয়ত ভালোবাসো আমাকে তোমার মত করে। তোমার এক বিশেষ ধরণের ভালোবাসায়। বুঝিয়েছিলাম, সব যা সকলের ভালো-বাসার প্রকাশ ঠিক এক হওয়ার নয়।

তুমি শরীরে কখনও বিশ্বাস করোনি, বলেছ, শরীর নোংরা, বলেছ, ভালোবাসার মতো শরীর এসে ভালো-বাসার শুচিতা ধরে নষ্ট হয়ে। আমি সে কথা মানিনি, আজও মানি না; তবুও তোমার মত করেই, তোমার প্রকৃতির নিয়মের মতো তোমাকে রেখে আমার অনেক অভ্রান্তির মধ্যেও আমি সুখী ছিলাম। যে-ভাবেই হোক, তোমাকে প্রকাশিত, প্রস্ফুটিত দেখেই সুখী ছিলাম। মনে মনে তোমাকে দেখতে পেলেই সুখী ছিলাম।

শরীরের কথা আমি মানিনি। আমি বিশ্বাস করিনি বা করি না, যে শরীর নোংরা। শরীরকে মন্দিরের মত ভেবেছি। মনে হয়েছে, ভেবেছি, শরীর ভালো-বাসতে পারে, জীবনের যা সত্যের ধর্মী যা পরম-ধন সেই মন্ত্রই যদি কেউ কানের নিচে পরে, সেখানে শরীরের মন বড়টুকু; তা!

তোমাদের নিজেদের কাছে তোমাদের শরীরের মন কলঙ্কিত নয়। তবুও, অন্যদের কাছে তা অনেকখানি। চমকিত এমন করেই বানিয়েছেন আমাদের। তবে যে-সে শরীরে আমি কখনও বিশ্বাস করিনি। করেছি, শুধু ভালোবাসার শরীরে। যে-মনে বার বার ভালোবেসে দেখি, যে-মনের সুবাসিত হয়েছি, যে-ভালোবাসার চিরদিন অনুগত হয়েছি, সেই মনের যে আধার সেই শরীরে—মন্দিরের মত সুগন্ধি শরীরে ঘেরে—বড় ইচ্ছে করেছে। মনে হয়েছে, তোমার শরীর দেখে জানা হবে যে, আমারই মত তোমারও কিছু মনের সেই অন্ধকার। এই জানাটা অবশ্যকর্তব্য জন, যার মনের ভালোবাসাটা সত্যকর্তব্য। সত্যকর্তব্য চলোবাসার অংশটাই অবশ্যকর্তব্য ভালোবাসাতে। ভেবেছি!

তুমি শরীর মানোনি, ভেবে না; মেনে নিয়েছি বহুদিন। এই জন্যে তোমাকে ভুল বুঝিনি।

আমি এক উজবুক উট। যে তাঁতী-ঘাট চিরিয়ে ভেবে, তাঁতী বেরুবে, তত ফুসিয়ে শরীরের থেকের উপর ছয়ের অক্ষরে অবশ্য-রেখা চিহ্নিত মাইলের পর মাইল বই-গোটা বালি পেরিয়েছে ধরণের পর ধরণ। বহুমান সে আজও পারানি। ঘাবে মরে, কাঁচি

কালীপদ পাত্রক

আমি; সবে-এল-অঙ্কে-ওঠা তোমার বুকের সান্নিধ্যের সুখের, কি প্রচণ্ড তোমার ভীরুর পায়ের সুখে চিন্তে চিন্তে মধুমাসের খেয়াল দেখেছ।

তোমার সুখের রাত্রগুলি পার, ঠাকুর পার; আমি তোমাকে দেখেছি।

কিন্তু খাঁচার সন্তান। এক এক জনকে, বলতে বাতাসের মত। সেই বাতাসে মধুমাসের কিল্‌বিল্‌-নীল কিল্‌বিল্‌-জল, ডানা ঝোড়ের গন্ধ, রেণুহীন সাকীর আমলী হতে-চলা সুরার ঝাঁজ পেয়েছি। কিন্তু তোমাকে, সম্পূর্ণ তোমাকে, তোমার অবশ্য সন্তান, তোমার পরীক্ষে-ঘনে কখনও, এক মুহূর্তের জন্যেও বুকের মধ্যে পাইনি। জেনেছি যে, পাবো না কখনও।

তবুও যেন বিশ্বাস। কুয়াশার মত ঠাণ্ডা হয়ে কাজ করেছিলাম। তোমাকে অনেকবার অপরাহ্নে দুজনে অপরূপ, অনন্তকাল, চিলেকা, অবহেলার সুখে ছেয়ে নিয়ে তেতেরে পা-ঝাড়িয়ে বসে মুখোমুখি, গরাদ্‌-ধরাদ্‌ ভাব কাটিয়ে কাঁচা-লঙ্কা কাঁচা-পেঁয়াজ দিয়ে। এত অপরূপ, এত শান্তি, সবই তোমার জন্যে। অথচ তবু সবই সরে যেতেন। মনে নির্ভাবিলাম যে, আমার জীবন এ রকমই; এইটুকুই। এ জীবনে এর চেয়ে বেশী কিছু চাইবার নেই; পাওয়ারও নেই। আর এমন আমার প্রাপ্তি বড় কম ছিল আগে, তা হাতের বাওয়ার কথা মুহূর্তেরও ভাবতে পারতাম না। ভাবতে পারতাম না এইটুকুও হারিয়ে গেলে কি হবে, কেমন করে বাঁচব?

কিন্তু এখন পারি।

বাঁচতে যে হবেই এমন কোনো কথা নেই। এমন মানুষ বিরিয়ে আমিনি পৃথিবীতলে যে, আমার যে-ভাবেই হোক বেঁচে থাকতেই হবে।

আমি এমন কেউ নই যে আর কোন মানুষ হয়-এল করবে আমার জন্যে, অথবা আকাশ ঘটে যেতে-চলা দুর্ঘটনা হবে আমার। বরং দুর্ঘটনার নিশ্চয়ই তোমার অভাবে।

আমার মত লোকের এখানে থাকার তেমন কোনোই সার্থকতা নেই। পৃথিবীটা আজ, বিশ্বাসঘাতী মুখোশ-পরা মানুষের জন্যেই তৈরী। এমনি কাঁটালে মত এখানের ঘাটে ঘাটে ভিড়-বিরি বিকাতে পারি পারি করবে। ঘুরে ঘুরে, ঘুটে ঘুটে খেয়ে বাঁচবে, মানুষকে উঁচে আসমানী ফুলে দু-লক্ষ টাকার বাণিজ্য ফুলে হিসেব করতে হবে। আর আমি মানুষে আমার মত টুকরো মানুষকে।

## ২২৪

সত্য মনে তোমাকে স্মরণ করেছি। বহুদিন পর। হয়ত তোমাকে বহুদিন বোধি না, দেখতে পাই না বলেই; বেলায়। স্মরণ তুমি ও আমার কথা খুব স্পষ্টই। সবচেয়ে সুখের স্মরণ।

সকালবেলা। সেদিন কি ছুটি ছিল? স্মরণ বেলার সবদিনই ছুটি। হয়ত ছুটি ছিল।

তুমি কি যেন গল্প করছিলে, গল্প করতে করতে আমার সঙ্গে কথা বলছিলে চুক্‌-চাক্‌।

আমি বার বার বলছিলাম যে, গল্প পরে হোক্‌গে, এখন আমি এসেছি, একটু আমার সামনে বোসো, গল্প করো।

তুমি হাসলে ওখর থেকে, বললে চক্ষুদুটী ছুটি নিয়েছে, গল্প না করলে পাবো কি? আমার ঘর কি খাবে? কোনো ফোর্ট-ফুটে আসবে বাঁধলে ছেড়ে ক্লান্ত হয়ে।

আমি শুধোলাম, আজ ত ছুটি!

তুমি বললে, ছুটির দিনও কাজ ওর। লাঞ্চের সময় ফিরে আসবে।

আমি চুপ করে রইলাম। তোমার মুখের হতে যে তুমি গল্পও করতে পারো এ কথা ভেবেই ভাল লাগছে লাগল। তুমি ত কিছুই গল্প জানতে না, কি করে জানলে? ভাবছিলাম, মনে মনে।

বললাম, কি গল্প করব?

তুমি বললে, ছুটির দিন। ও এক-দিনই বাড়িতে থাকে দুপুরে। তাই ইলিশমাছের ঝোল করেছি, কাঁচা-লঙ্কা কচলোজিয়ে দিয়ে, ইলিশমাছের পাতা-চচ্চড়ি, আর ইলিশমাছের ঝৈ।

তারপরই বললে, খাবেন এখানে? খেয়ে যান না?

ভর্ৎসনায়, তোমার হতে আমার ভাত নেই এ জন্যে। তোমার ভাত লোকিকদের জন্যে। এ ভাত তুমি ছড়াওনি; ছড়বে না কখনও আমার মত কঙ্গলা কুর্সিত পাঁচকাককে। নির্বিবাদে এক বেলা খেয়ে কি হবে? আমি ত চিরদিনই খেতে চেয়েছিলাম।

বললাম, যাব।

তুমি ওখর থেকে বললে, কেন না? না কেন? যা কখন চাইবে না, না? কখনও কথা শোনেন না আপনি, কেনো অনুরোধই রাখেন না। আপনি ভীষণ অসভ্য।

জানি ত। আমি বললাম।

ও ঘর থেকে ইলিশমাছের গন্ধ ভেসে এল।

তারপরই বললাম, তোমার কথা আমি খুব তোমাকে দেখতে, তোমার কাছে একটু বসে থাকতে। কখন একে-ওকারে না-এসে-পারা না তখনই আসি। খুব তখনই। শহরে তোমার কাছে এসে তোমাকে বিরক্ত বা বিরক্ত করতে চাই না কখনও। আমি জানি, আমি এলে তোমার অনেক অসুবিধা হয়। তবুও আমি যখন, তখন জেনো যে না-এসে পারিনি। তোমার কাছ থেকে আমি না। শেষটায় ফিরে নিয়ে যেতে পারি এমন অনেক জোর আছে আমার। বুকের ফিরে যেতেও পারে এমন জোরই নেই।

তুমি বললে, তা হলে কি? আপনি চিরদিনই অপরের নিজের ইচ্ছা নিয়েই থাকলেন, নিজের মত গড়লেন অন্যের উপর, নিজেকেই ভালোবাসলেন খুব।

আমি বাধিত কথার ঠোক তুলে খুবেলাম, কেন? আমি কি অন্য কাউকে ভালোবাসিনি? খুব নিজেকেই কি ভালোবেসেছি চিরদিন?

তুমি হাত-টাত ধুয়ে এ ঘরে এলে। এসেই হাসলে। বললে, তা বলতে চাইনি। হয়ত ভালোবেসেছেন অনেককেও, কিন্তু অন্য কাউকে ভালোবাসার সুযোগ দেননি কখনও। আপনি খুব নিজেই জানেন, কিছু-মাত্র নিতে জানেন না। যে নেয়, তার চেয়ে অনেক বড়, যে নেয়; যে নিতে জানে। যা-কিছু পেলেন এ জীবনে তার সব কিছুই 'এ নয়', 'ও নয়' করে ফেলে দিলেন। আপনি নিজেকেই বোঝেন না, অন্যকে কি করে বুঝবেন!

আমি উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ। ভাবছিলাম, নিজেকে সত্যিই কি বুঝি না আমি?

তুমি আবার সামনে এসে বসলে। বোধ, ঘরে তোমার চুল, কপাল, গলা, ব্লাউজ ভিজে গেছে। মুখ লাল হয়ে গেছে গরমে। কানের লতির কাছে ঘামে ভেজে আছে অল্প।

আমি বললাম, ইলশ্‌ এখন যেমন কেন?

তুমি বললে, ও কিছু না।

আমি বললাম, না, না, এমন অস্বাভাবিক ঘামা ত ভাল নয়।

তুমি বললে, আলাদা ফ্যান না থাকলে রান্না করা যায় না। বড় হাওয়া আসে, তাই খেয়াল একটু। এই ত গরমের নষ্টছ আসছে; এখনি শুকিয়ে যাবে।

আমি তাকিয়ে থেকেছি তোমার চোখের কোণে আর, তোমার চোখের পাতায় যায়।

আমার বড় কষ্ট হল।

তুমি চুপ করে বসেছিলে আমার মুখোমুখি বেলার বিয়ে। ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি মাখিয়ে।

তোমার জন্যে আমার এমন যে-প্রতিমার, অনাবিলের ও নিষ্পাপ-ভবীর মায়া মায়া নিয়ে তুমি চিরদিনই এমনি আছিলে ও এইটুকু হাসি হেসেছ। তবু, তোমাকে হাসলে ভারী ভাল দেখি আমি। তোমার কথার নাম আলো-কথা মুখের ফুল, গালি-ফলা, গালি-ঘাস—সব মিলিয়ে এমন একটা বিজয়ী ঔদাসীন্য আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি কখনও।

তুমি হাসি মুখে মুখ নামিয়ে হেসে দিকে চেয়েছিলে।

আমি ভাবছিলাম, তোমাকে ভালবেসে আমার যে এই কষ্ট এর ত তোমার কোন দোষ নেই। আমি তোমার কেউই নই; হয়েও না কেউ কোনো-দিনও, তবু তোমার কষ্ট দেখলে, সামান্য কষ্ট দেখলেই আমার এত কষ্ট হয় কেন?

এর নামই কি ভালোবাসা? স্বার্থ-হীন, উদ্দেশ্যহীনভাবে অন্যজনের জন্যে ভাবা; তার সুখে সুখিত হওয়া, তার দুঃখে দুঃখিত হওয়া নামই কি ভালোবাসা? ভালোবাসা মনে মনে খুব খুবই, তবে মানুষ ভালোবাসে কেন? আমি তোমাকে ভালোবাসলাম কেন?

এই জন্যেই কি ভালোবাসলে মানুষ নিজের চেয়ে এত বড় হয়ে যায়? নিজেকে ছাপিয়ে উঠে, নিজের মনের অনেক-কালের ভাবিয়ে ঘিরে অন্য মনে সমস্ত মনের মঙ্গল কামনা নিয়ে আপন স্বার্থহীনতার উপরে যায়? এই যদি ভালোবাসা—ভালোবাসা মনে যদি চোখের জল, বুকের কষ্ট, তাহলে এর জন্যে এত যন্ত্রণা, এত শান্তি, এত বিরহের কেন?

তুমি তখনও হাসছিলে।

আমি হঠাৎ মুখ তুলে বললাম, হাসছ কেন?

তুমি বললে, আপনি বড় ছেলে-মানুষ। কাউকে খুশি করলে ভাল লাগে। ভালবাসা করতে দেখেননি আপনি? এ যেন উনুনে রান্না করে অন্য ঘরে না এখন রান্নাঘরের কে আছে?

তারপর বললে, খাবে কি খাবে, না কষ্ট থাকে? মনে মনে একটু-আধটু কষ্ট থাকে বলেই ত জীবনটা এত সুন্দর।

তোমার চোখে জীবনটা খুব সুন্দর, না? আমি শুধোলাম।

হাঁ—হাঁ। তুমি বললে। আমি আমার জীবনকে ভীষণ ভালবাসি।

—আমি ভালোবাসি না। বললাম।

—কেন যে বাসেন না, আমি না তা!

তোমার জন্যে, তোমার কারণে, তোমাকে ভালোবাসার অপরাধে অপরাধী হয়ে ত এ জীবনে বারম্বারই পরীক্ষার্থীর হয়ে আছি। ভালোবাসা যদি ছাড়ল কোথায়? জীবনকে ভালোবাসার মত কিছুই যে দেখি না।

মনে মনে ভাবছিলাম পরের আগে আগে কথা, তোমাদের তার নিজের জন্যেই জীবনকে ভালোবাসা উচিত। জীবন কী এক বস্তুর মিলিয়ে। ভালবাসা কী এক আশ্চর্য ধন। জীবন তো একটাই। আর আর কি আছে জীবন?

অন্য কেনো মানুষ বা মানুষীর উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার দরকার কি? অন্যকে নিজের চেয়ে বেশী ইম্পর্টান্স দেয়ার মূর্খামি। আমি নিজে আছি, তাই পৃথিবী আছে। আমার চাওয়া, আমার পাওয়া, আমার পরিধি ও মনের খুশী এই নিয়েই পৃথিবী। আমার সুখ আমার মিনিয়ে নিতে হবে। সুখ কেউ কাউকে দেয় না, নিতে পারে না।

পরের মোহের সঙ্গে কথা, কেউ ভালোবাসল না বলে, যা চাইলাম তা দিল না বলে, পা-ছড়িয়ে মাথা কাঁদতে বসে আমি তাদের দলে নই। যে দিল না, সে না-দিল, সে আমাদের কাছে। আর কাউকে কি পাবো না যে আমি চাই তাকেই দেবে? নিশ্চয়ই পাবো।

বহুদিন আগে পরের কবিতায়

আমি শুনেছিলাম, কিন্তু তার পর দিইনি। মনে হয়েছে, যে-চাইলাম তা সে দিল না জানলে কাউকে ছোট করা হয়। জীবনে কখনও হাসতে চাইনি, কোনো-কোনোদিন হাস স্বীকার করতে চাইনি। তাই বোধহয় সব ক্ষেত্রেই হারতে হল অন্যদের।

আমি কি চাইলাম, যাকে চাইলাম তাকে দেবার না থেকে মনে-মনে নিয়ে তার সুখ দেখার মনে আমি বিশ্বাসী ছিলাম না। এ পৃথিবীতে কেউই কি অন্যের মত হতে পারে? একজনের স্বপ্ন কি অন্য কেউ কখনও পূরণ করতে পারে? সেই শুনেছি শুনেই মনে, শুনতার সেই আবেদনের সঙ্গে অন্য পূর্ণতার আমল একেবারেই মেলে না। দুজনের মনো শুনেছি মন ভালিয়ে পালাপালি নিয়ে সেন্ট-মেকেল-বসানো হৃদয়ের মত বুকপকেট করে কোনো-দিন জোড়াতালি দিয়ে বাঁচার আমি বিশ্বাস করিনি। শুনেছি যখন পরে পূর্ণতার তবে ওঠে তার আসল যে কী তা এ জীবনে জানা হল না।

কী করব? আমি এই রকমই, এই উজবুকে টাই। সে মরুভূমির মতো যেই-কেউ আসিতে না কেনে-কেনে চলেছেই, চলেছেই বতদিন না সে শেষে যায়।

হয়ত কখনও, কোনোদিন, কোনো আবশ্যকীয় কারণজ্ঞান বা কোনো রহস্য আবিষ্কার করতে বলির মতো আমার ডাকল। কেউ জানবে না যে এই উটটা পুরোহিত মত একলুরে জেদী ছিল। জানবে না যে, যে-পাহাড়ে এখন হাওয়া শিস তুলছে, বালি জমছে পরতে পরতে সেই শুকনো মালা ঝাঁঝালো পাহাড়ের আড়ালে একদিন বড় তার্জ, নরম, বড় তোমল ভালোবাসার তরঙ্গের একটি ঢেউ ছিল। যে-বুকে একজন নির্মমের নীলাম্বরাজী বড় সন্তার হাড়াড়-ভরে ভেকে নিয়েছিল, তারপর ফেলে ফেলেছিল তার পরের কয়েক। তাকে মাড়িয়েছিল, গুঁড়িয়ে-ছিল, তার সব আর্দ্রতা শুষে নিয়েছিল, তার পর তাকে যাদের নিষ্ঠুরের মত দুমড়ে ফেলেছিল অন্যিমুহূর্তে।

তুমি বললে, চা খাবেন?

বললাম, না। আমার যা তুমি চা করতে তবে। তার চেয়ে আনো।

তুমি বললে, না। এখন আমরা চলবে না। আমার অনেক কাজ। তারপর আমার এক বন্ধু আসবে। তার সঙ্গে সিনেমায় যাব।

আমি বললাম, উঠি তা হলে।

অন্তত যদি বলে তুমি বললে, আরো পাঁচ মিনিট বসতে পারেন। তার পরও এমন কোনো তাড়া নেই। ও এলে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারেন, কিন্তু আমাকে একটুনি চলে করতে হবে যাব।

অভিমানে আমার চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু কোথা-বোঝা অভিমানের দাম কে দেয়? তুমি অন্তত পারনি কখনও।

আমি বললাম, আমি উঠি।

তুমি বললে, আপনার যা খুশী।

আমি উঠলাম। উঠে টা-টা কোম্পানির মোড়ের একার চালকের।

বড় পিপাসা।

বাড়ি ফিরতেই তুমি বলল, কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

আমি বললাম, পার্ক সার্কাসের দিকে।

বুঝেছি।

তার পর তুমি বলল, তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তোমাকে আমি একটুও ভালোবাসি না।

বললাম, জানি তা। কিন্তু আমি একদিনও তোমাকে ভালোবাসিনি।

ভালোবাসা?

হেসেই এক চুমুক, তৃপ্তির, অনেকক্ষণ দৃষ্টিতে তাকাল তুমি আমার দিকে।

তারপর বলল, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করব, তোমার কোনো কিছু আমি সহ্য করতে পারি না। তুমি অসহ্য। তোমার মধ্যে ভালোবাসার ভালোলাগার কিছু নেই।

আমি আবারো বললাম, জানি তা।

এ কথা তুমি শত চেষ্টা করে ঢাকতে পারছ তখনকে, পরক্ষণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর ভেঙেছি।

আজকাল এ কথা যা-তাতা হয়ে গেছে।

আমার বড় পিপাসা পেয়েছিল, বড় গরম লাগছিল। চেয়ারের উপরে রাখা হোসে থেকে জল খেলার একটু পানকটা চালালাম।

এবার সময় কোনটা বলল।

রিসিভারটা তুলে বললাম, হ্যালো।

গলাটা পরিচয়ের। আমার ঘণা শুনেই সে যেন ভেঙে ছিল।

তুলির দিকে ফিরে আমি বললাম, পরেশ।

মনে মনে বললাম, পরেশটা আজ-কাল খিয়েটার বড় বুঝে হয়েছে। অথের মত সাজানী হলে খুশী হতাম। তার সঙ্গে লড়বার কথা ভাবা যেত। জীবনে কখনও পিছান দাঁড়াইনি আমি।

তুমি বললে, তুমি সবই জানো। ও কথা তোমরা-কত তোমারও অনেক আছে।

—আছে তুমি? আমি না তা!

—আমি জানি।

তোমরা আবারও বলল।

আবার রিসিভারে তুললাম। পরেশ! কথা না বলে, রিসিভারটা তুলির হাতে তুলে দিয়ে আমি আমার আছি থেকে বেরিয়ে গেলাম। বড় ক্লেদ। পিপাসা। কিন্তু তোমার ঘর?

কালকে আছি যেতে পারি, তোমে ওরা খুশী হবে। কিন্তু আমি জানি যাওয়া উচিত নয়।

একদিনে আমের যাওয়া-যাওয়া হয়ে গেছে। অনেক সব জানলার কথা আছে, পার্টিতেনে ওরা দুজনে নিজেদের সুখে কথা বলছে। সুখ দুজনের কথা। রবিবারের একটাই দুপুরে। এখন ওদের কাছে যাওয়া অন্যায়।

রাজেন বাবু

কিলাইদের বাড়ি যেতে পারি, কিন্তু ও সারা সন্তান টুরে থাকে। তাঁদার সঙ্গে ওর খুব ভাব। কাল ওরা, কেমন অন্তত জানার মনো কোন করেছিলাম। ওরা তাল আছে। আজ দিলীপ বাড়ি থাকবে। গল্পে একটাই দিন—দুজনের কথাকাটি থাকার। বাচ্চাকে নিয়ে খেলা করার, ভালো-মন্দ খাওয়ার।

কিন্তু কোথায় যাই এখন আমি। তোমার বাড়িতে আমার ফিরে যায়। ছি ছি তা কি হয়। আজ আর যাওয়া যায় না। ফিরে হয়ত অন্যে বেশী সুখ পাব, সেই একদিন ছাড়ে কেমন পেয়েছিলাম।

তখন তোমার মন ছিলো না কোনকারের। তোমার তখন অন্তর স্বাধীনতা। অফিস-কেরিতা তোমার কথায় মনে একটু কম করতে বড় ইচ্ছে হয়েছিল। ফিরে যেতে, ধরজা বন্ধ ভিতর থেকে তোমার সোওয়ার ঘরের। চেয়ারটাতেও দেখলাম না। বাইরের বারান্দা খোলা ছিল। সোওয়ার ঘরের দরজা অনেকক্ষণ ও অনেকবার ধাক্কা দিতে তুমি বেরিয়ে এলে বিরক্ত অসন্তোষ। আধ-খোলা দরজার ফাঁকা দিয়ে ভেতরে পুরুষের সাদা হাউজার-পরা পা দেখলাম—সে তোমার উপর বসেছিল। আমি ভাবতে পারিনি। দুজনকারও এ দৃশ্য দেখব জানলে দরজায় ধাক্কা দিতাম না। কখনও না। তুমি এমনভাবে দরজা আগলে দাঁড়ালে, যাতে আমি ভেতরে দেখতে না পাই। তুমি জানতে বলেছ তোমার এত বিশ্বস্ত ও ভক্ত বন্ধুরা এসেছে। ছাড়া একটু, একলা থাকতে চায় তোমার ঘরে। তুমি ভুল ছিলে না, বাইরের বারান্দায় ছিল।

আমার বিশ্বাস হলো না। আমি চিরদিন তোমার মুখে অনেক না-বলা কথা শুনতে পাই। এত বছরে যদি সতী-সিধাই না হবেলাম তো কি হবেলাম তোমাকে! তোমার মুখ দেখেই চিরদিন তোমার না-বলা মনের, না-বলা কষ্ট সব বুঝেছি আমি সেদিন তোমার মুখ দেখে তুমি কথা আমাকে বিশ্বাস করলে তা বুঝব না?

আমার বুক ভেঙে গেল। তোমার মনের তো তুমি আইনসঙ্গত সম্পত্তি। সে যে তোমাকে পেয়েছে এতে কোনো জটিল নেই—অনেক লোক-বাইরে, সামাজী বাড়িয়ে, রক্তমন্ত্রে-মোড়া সিংহাসনে চেপে সে অধিকার করেছে। সে ও তোমাকে পাবেই। তুমি তার হকের ধন।

তুমি সেদিন বড় ভয় পেয়েছিলে। ভয় পেয়েছিলে: যদি আমি সেদিনের কথা তোমার স্বামীকে বলে দিই।

আমাকে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু ছিলো না। আমি তো তোমার ভাল ছাড়া আর কিছু করিনি। কখনও করিনি।

তুমি সেদিন এত ভয় পেয়েছিলে যে আমাকে বাইরের বারান্দা অবধি এগিয়ে দিয়ে বারান্দা বন্ধ করে দিয়েছিলে তুমি।

তোমার জীবনের কারাকাটি যারা

ছিল তাদের সবাইকেই আমি জানতাম। তাই, আমার পরিচিত সেই জানলুককে আমার আড়ালে রাখার জন্যে তোমার সেই চাতুর্য, সেই মিথ্যাচারের আমাকে বড় অবাক করেছিল।

পরদিন আমি তোমাকে খুব বকেছিলাম।

বলেছিলাম, আমি তোমাকে ভালোবাসতাম, আমার জীবনের সমস্ত প্রাপ্তি তোমাকে ভালোবেসে হারিয়ে বসে আছি, কিন্তু আর তোমাকে ভালোবাসি না আমি। তুমি পাপী। তোমাকে ঘৃণা করি আমি। তুমি বহুচারী। তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে মনে মনেও ঠাঁই দিইনি কখনও অথচ তুমি কী অবহেলায় বকে-তাকে নিয়ে মজা লুটতে পারো!

তুমি আমাকে উঠতে বলেছিলে, একজন-দিয়ে হাজ্জ যা সিদ্ধি। আমি কি তার না করি, ইউস্ মাস্ অফ ইওর কিজনেস্।

আমি মাথা নীচু করে চলে গেছিলাম।

হৃদয়ে খুব রক্ত ঝরেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল তোমাকে গলা-টিপে মেরে ফেলি। আমার সমস্ত ভয়ঙ্করী ভালোবাসার, আমার বুকের, কণ্ঠের, তোমার বাহুলে আমার সমস্ত প্রশান্তির শেষ হোক।

কিন্তু যত সহজ লোল তত্তই বুঝতে পারলাম। নিজের মনেই হাসি পেল আমার। আমি জানতাম, খুন তাকলাম না, বুঝলাম, নিজেকে বোঝালাম যে, কেউ কি জোর করে কারো ভালোবাসা পেতে পারে? তুমি যে আমাকে ভালোবাসো না, কখনও বলোনি সে কথা বড় চোখদুটোর বুঝলাম সেদিন।

না বুঝলেই বোধহয় ভাল ছিল। কারণ তার আগে মনে মনে অনেক অলীক কল্পনা ছিল, স্বপ্ন ছিল যে, একদিন হয়ত তুমি আমায় মূল্য দেবে।

তোমার সমস্ত জাগতিক প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর, যখন তুমি জীবনে সব কিছু দিয়ে সম্প্রতিষ্ঠিত তখন তোমার পক্ষে আমাকে স্বীকৃতি দেওয়া বড়ই সহজ হয়েছিল। কিন্তু তোমাকে স্বীকৃতি দেওয়া আমার পক্ষে অত সহজ ছিল না। তুমি তো কখনও আমাকে ভালোবাসোনি, কিন্তু আমি যে তোমাকে বেসেছি।

তুমির যা-কিছু বলবার আমার বিরুদ্ধে, আমাকে জানবে বলে পণ্য না-করা, লোকে যাচ্ছি তুচ্ছকে যতখানি স্বীকৃতি দেয় আমাকে সেটুকু স্বীকৃতিও না দেওয়া, এ সমস্তের কারণ হিসেবে সে ভাবত যে, তাকে নাকি আমি কখনই ভালোবাসিনি, আমি নাকি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি।

কল্পনা বাহুল্য আমার।

তুমি এবং তুমি দুজনেই আমাকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলে।

তারপর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যতটুকু বাকি ছিল, তা করল পরেন। আমার যে ছিটে-ফোঁটা আত্মিক বেচে ছিল, ছোটখু ভবিষ্যৎ বাকি ছিল; তুমি যে ঘরে-বাইরে কখনও সখনও ভুল করে আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে, মানুষের মত ব্যবহার করত, সেই ছিটে-ফোঁটা আত্মিকটুকুও সে শেষ করে দিল পরেন।

সে ছিল আমারই প্রথম বন্ধু। তাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এনে আমিই তুমিকে বলেছিলাম যে, ও বড় ভেজাল! ও বড় ভালো ছেলে। ওকে একটু ভালোবেসো। একটু ভালোবাসা না পেলে কি মানুষ বাঁচে? বাঁচে কি কোনো মানুষ মনের খোরাক ছাড়া?

তুমি এ জীবনে আমার আর কোনো কথা না শুনলেও ওই কথাটি শুনেছিল। বড় মনোযোগের সঙ্গে শুনেছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই পরেন, ঈশান, পঙ্কজ, পরেশ আমার কলকাতার চাটাওয়ালা হাইস্কি ছুঁড়ে দিয়ে আফ্রিকে তুমির বন্ধুর কামনা করল।

এবারে সকলেই খুশী হল। তুমি আমাকে আবার করে খুশী হলে তোমার বন্ধু-বান্ধবের নাগরদোলে ও আমাকে নিয়ে। তুমিও আমাকে আবার করে খুশী হল, পরেশকে নিয়ে।

মাইলসে মাইলসে একটি প্লাস হওয়ার কথা ছিল। এই দুই নেতিবাচক অস্তিত্বের সম্মিলনে আমার মতো পজিটিভিটির লক্ষণ প্রস্ফুটিত হবার কথা ছিল। কিন্তু তুমি ও তুমি দুজনে মিলে আমাকে একটি চিরন্তন নিস্তরঙ্গ মাইনাসে ধুপোস্থিত করলে।

আমার যেন এইটুকুই যে আমি তোমাদের দুজনকেই ভালোবেসেছিলাম—একজনকে বিশ্বাস করেছিলাম, মানুষের ভালোকে বিশ্বাস করেছিলাম।

তুমি এবং তুমি দুজনেই জীবনকে খুব ভালোবাসো।

তোমরা দুজনেই তোমাদের ভাব ও ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে জানো এবং তা নিতে পেরেওছো। তোমাদের দুজনের কাছেই তোমরা নিজেরা খুব ইমপর্টান্ট। পরস্পরের মিলনবিন্দুতে তোমরা দুজনেই বিশ্বাসী। কিন্তু তোমাদের দুজনের মধ্যে, এই দু-নৌকোর পা দিয়ে ঘর-বাঁধার ভুবে গেলাম আমি। তোমাদের নৌকো ভেসেছিল, পালে হাওয়া-লাগিয়ে তোমার সুখের ঘর, বর ও নালর এবং তুমির বন্ধুর দিকে ভেসে গেল। সন্ধ্যে হয়ে গেল। সাঁতার-না-জানা নাবিকের মত আমি তোমাদের ঢেউয়ের সামনে ডুবে গেলাম। হালদারের কাঁচি আমাকে টুকরো টুকরো করে গেল। সারা গা-মুখ-মাথা জলে ভেসে গেল। নোনা জল আমার সেই ক্ষতে ক্ষতে। আমি একবার চীৎকার করে উঠলাম। তবুও আমার উপর কটা বন্দুকের উঠল, তারপর সমুদ্রে যেমন নিথর, কখনো, থৈ-থৈ; আবার তেমনই হয়ে গেল। আমার সব জ্বালা, সব বিশ্বাস, সব বোকামি, সব সরল ভালোবাসার উচ্ছ্বাস নিয়ে আমি শীতলতার সমুদ্রে চিরদিনের মত সমাহিত হলাম।

কিন্তু তবুও মরলাম না। আবার বেঁচেওঠে হলাম।

Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.

আমি ভগবান নই। কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে, অন্য অনেকের মধ্যে যেমন আছে, আমার মধ্যেও ভগবানের কিছু আছে। ঘৃণ্যের কিছু; বীশুর কিছু। এই কিছুটা বোকামির কিছু। রাজার, সুন্দরী স্ত্রী ছেড়ে যাওয়ার বোকামি, ক্রুশে বিদ্ধ হয়েও যারা বিশ্ব করল তাদের ক্ষমা করতে পারার বোকামি।

ভগবানদের যা চমৎকার মানিয়েছিল, যার জন্যে তাঁরা ভগবান হলেন, আমার মত বিংশ শতাব্দীর একজন সাধারণ মানুষকে তা মানালো না। তাই ক্ষত-ক্ষুব্ধ আত্মা পেলাম সকলের কাছ নিজেকে নিয়ে নিরাপত্তা নিলাম ক্ষুব্ধচিত্তাবিদ।

এত কিছুর পরও আমি এখনও বেঁচে আছি। অবাকই লাগে আমার। পরম পরম ভাত খাচ্ছি, নাক দিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছি, ঘুমোচ্ছি। জীবনের কোনো মানে নেই। কাজ করছি, বিশ্রাম করি, খুব কম। কাজ আছে যার তারা আছে। তারা আর কাজ।

ক্লেয়ারেন্টেড হওয়ার পর এখন ভীষণভাবে ইচ্ছা করছি যে, একটা মহাপাতকের কাজ করি। আইন বলে আত্মহত্যা মহাপাপ। অথচ অনেক আইনের মতই এ আইনের তাৎপর্যও আমি আজ উদ্ধার পারিনি। এ যাবৎ আমি লোকের আত্মহত্যা হেমিংওয়ে ও ছিন্ন পরিচালক আন্তোনিওনির সঙ্গে একমত। তুমির মত বিশ্বাস করতেন যে, যেমন করে না-বাঁচলে, বাঁচার মত কিছু জীবনে না থাকলে মিছিমিছি বেচে থাকার মানে নেই কোনো। যা-কিছু উনি করতে ভালবাসতেন, যেমন করে করতে ভালবাসতেন, যে-মুহূর্তে বুঝতে পারলেন যে তা আর করা সম্ভব নয় সেই মুহূর্তে উনি শটগানের নল গলায় লাগিয়ে ঘোড়ার গুলির মত ছিটকে পরপারে চলে গেলেন, স্তম্ভিত পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে।

স্থিরচিত্তজনের ছবির বেশীর ভাগ নায়ক-নায়িকাই আত্মহত্যা করে মারা যান।

একজন সাংবাদিক এঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এমন হয় কেন?

উনি জবাবে বলেছিলেন যে, জীবন যদি ভগবানের দান হয়, তবে সে জীবনের ইচ্ছেমত অবসান ঘটানোর অধিকারও ভগবানেরই দান।

আমার মনেহয় এই যে, আমি আন্তোনিওনি বা হেমিংওয়ে নই। আন্তোনিওনি আসল ভবিষ্যতে। হেমিংওয়ের নেই। আমি হঠাৎ বিনা-নোটিসে চলে গেলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি অন্তত দেখি না। কিন্তু তোমার ও তুমির পরম উপকার। তোমাদের সুখী জীবনের পথের সব কন্টক দূরীভূত হবে, সব ঝঞ্ঝা এমনিতেই আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হবে।

হবে। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো যে, হবে। অনেক পুরস্কার বিয়ের তোমরা বুঝলে বুঝতে। তোমরা এত সহজ, এত উদার, এত সব যে, তোমরা পরস্পরেরই যোগ্য। আমিও তোমাদের যোগ্য নই। জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ এই উপন্যাস টেনে গল্প বানিয়ে পূর্বে-পশ্চিমে দুই মরীচিকার বুকের মধ্যে যোজন-ব্যাপ্ত শূন্যে ঝুলে অনেক ঘুরে এলাম। উটের এবার ছুটি দেওয়ার দিন এসেছে। একদিন এবার, মরু-তৃষ্ণার প্রচণ্ড শাসনের ঘরে, নিষ্ফল তাম্র-তপ্ত নীল আকাশের তলায় কতগুলো কাঁটা-ঝোপের পাশে উট বসিয়ে তার ক্ষুধাসিক্ত হাঁটু-দেড়ে। তার চোখে থাকবে সেই সব স্বপ্ন, যে-সব স্বপ্ন সে বড় বেশী দেখেছিল, বার-বার দেখেছিল। তার মস্তিষ্ক ভরা থাকবে সুন্দর সব ভাবনায়। পরে পরে সে অনেক চোরাবালি পেরিয়ে এসেছে আজ অবধি, অনেক অভিশাপ দিয়েছে চলতে চলতে সূর্যকে, অগ্নিকে; মরীচিকাকে। এই মুহূর্তে তার মস্তিষ্কে আর কোনো অভিশাপ, অভিব্যক্তি নেই।

তারপরের নিষ্ফল তাম্রময় দিগন্ত ধূলির মত তার দুই চোখে আমি দেখব, দিগন্ত এক উপলব্ধি দেখবে। সব বিরাট ফ্রাসির চেয়ারে এক ফিসফিসে হাসি। তার মৃত্যুর আগে, জীবনে এবং মরণে তার প্রতি নিয়ত সংঘটমান মতের মধ্যে সে সকলকে ক্ষমা করে যাবে। বিনা-শর্তে। ক্ষমা-অক্ষরের মত ক্ষমা করে যাচ্ছে।

তুমি তারই কাছের মানুষ বলে, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে কে যে?

আর তুমি আমাকে কোনো ব্যাপারেই কখনও ক্ষমা করোনি, আমার তোমাকে ক্ষমা করার কথা ওঠেনি এর আগে। তুমি এত বেশী বর্ষিত যে আমাকে কখনও ক্ষমা করার যোগ্য বলেও মনে করোনি।

কিন্তু ক্ষমা যে-কেউ যে-কাউকে করতে পারে। ক্ষমা-করাতে শুধু এক তরফেরই আগ্রহ থাকার দরকার হয়। ক্ষমা তাই ভালোবাসা এক ধরণ। ভালোবাসা পরিপূরক খোঁজে অনেক ভালোবাসায়। ভালোবাসলে, ভালোবাসা দেবার ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি নাও যা না নাও, খুলোয় ফেলে আর অবহেলায়

আরো, আমা আমি একতরফাই করতে পারি।

তোমাদের দুজনকেই আমি ক্ষমা করে দিলাম। ক্ষমা করলাম আরো অনেককে। তারা জানা, সে সবাই জানবে আমি যখন থাকব না, তখন। তাদের অনুতাপ ও অনুশোচনার মনুষ্যুদ্ধির এই তাৎক্ষণিক বিলম্বিতা মূখের হয়ে উঠবে।

ঘরে গেলে তো কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না। নইলে তারী ইচ্ছে করে সেই অন্ধকারের মধ্যে তোমার ও দুর্মির গলা শুনতে পাবার। যদি তখন তোমরা কিছু বলো। বলবে কি? তখন?

১৩৪

কি বলব বলে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম, আর কি বলে ফেলেছি। আবোল-তাবোল, আকাশ-পাতাল। আসলে এই তো শেষ চিঠি। এ চিঠির পর আর তো কিছু বলার থাকবে না, লেখার থাকবে না, তাই অনেক এলোমেলো আবেগের কথা ভীড় করে আসছে মনে। অনেক কিছু না বললেও চলত, কিন্তু ভয় হচ্ছে ভবিষ্যতে আর যদি বলার অবকাশ না আসে।

তোমাকে তত চিঠিই না লিখেছিলাম। সে সব চিঠি বড় সুন্দর চিঠি। তখন আমি চেয়েছিলাম, মনে হয়েই সুন্দর হিলাম। আজ আর ইচ্ছা করলেও তেমন চিঠি লিখতে পারব না। যে-লোক সে সব চিঠি লিখেছিল, সে মরে গেছে।

এই শেষ চিঠি। অন্য চিঠি পড়েছিলে কি না জানি না, কিন্তু মোহাই তোমার এ চিঠি পড়ো। এ চিঠি না পড়লে আমার প্রতি বড় অবিচার করবে।

শেষ চিঠিতে তোমাকে আমার নতুন করে বলে যাই যে, তোমাকে আমি বড় ভালোবেসেছিলাম। সে ভালোবাসার প্রকাশ হয়তো একদিই ছিল না তোমার পছন্দসই নয়। এই ভালোবাসার গভীরতা বোঝার মত ক্ষমতা হয়তো ভগবান তোমাকে দেননি। তবু জেনো, এ জন্মে কি পরজন্মে তোমাকে এমন করে আর কেউই ভালবাসবে না।

দুর্মি কখনও স্বীকার করেনি যে আমার পক্ষে তোমাকে ও তাকে একই সঙ্গে ভালবাসা সম্ভব ছিল।

আমি জানি যে, এ প্রশ্ন আমার মৃত্যুতেও শেষ হবে না। শেষ হবে না এর উত্তর খোঁজা। তাই তোমাকে আমি শুধোই যে, তুমিও কি বিশ্বাস করো যে একজন মানুষের ভালোবাসার ক্ষমতা সসীম। সে কি একই সঙ্গে একাধিক লোককে ভালোবাসতে পারে না? সে যাই হোক্, কি পেয়েছি হোক—তার বুকে কি ভালোবাসা সলিড-ইউনিটের মত পূর্ব-নির্ধারিতভাবে পাঠান করা থাকে? তার পক্ষে একজনকে সরিয়ে-মনে কিছু-মাত্র না ঠাঁইয়েও কি অন্য কাউকে ভালোবাসা সম্ভব নয়? একজন মানুষের বুকে কি চারটি স্ত্রীর মত অতটুকু ভালোবাসাই ধরে? তা হলে সে মানুষ কিসে?

দুর্মি এ কথা বলেনি। সে স্বীকার করেনি, কখনও মানতে চায়নি যে, তাকে আমি তীব্র ভালোবাসি। তোমাকেও যে ভালোবাসি এই অপরাধেই তার প্রতি আমার সমস্ত ভালোবাসার মূলো কানাকড়ির মূলো পর্যবসিত হয়েছে।

তাকে আমি অনেক সময় বোঝাতে চেয়েছি। তাকে বলেছি যে, তোমার দেওয়া সব শাস্তি আমি মাথা পেতে নিতাম যদি থাকে-ভালোবাসার অপরাধে আমার এই শাস্তি সে আমাকে একটুও ভালোবাসত!

দুর্মি হাসতে হেসেছে।

বলেছে, সে কথা অবান্তর। সে ভালোবাসেনি কি বেসেছে তাতে যায় আসে না কিছু—এ কথাই যথেষ্ট যে তুমি তাকে ভালোবেসেছ। আর কিছু জানার নেই আমার—সে মৃত্যুর সময় বলেছে। পরজন্মের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা তোমার সে হিস্টিরিয়া রোগীর মত হেসেছে।

দুর্মি বলেছে যে, তোমাকে আমি তিল তিল করে পুড়িয়ে মারব, জ্বালিয়ে মারব। তুমি আমাকে যেমন করে জ্বালিয়েছ কষ্ট দিয়েছ, আমি তোমাকে আজ ঠিক তেমন করেই জ্বালাব, পীড়ন করব, তোমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেব।

দিনের পর দিন দুর্মি আমাকে অভিশাপ দিয়েছে, বলেছে মরো, মরো, তুমি মরো। মরতে পারো না তুমি?

মরতে যে সত্যি পারি তা আমি দুর্মিকে দেখাব। তোমাকেও দেখাব।

দুর্মির জন্যে আমার কষ্ট হয়। এই কথা ভাবি যে, আমার অজান্তে সে যদি কষ্ট পেয়ে থাকে, আমার কলঙ্কের ভালোবাসার অপরাধের জন্যে সে যদি আমাকে ক্ষমা না করে থাকে, সহ্য না করে থাকে তাহলে তার দোষ দেখি না। তার বোধ আমি ক্ষমা করে দিই—কারণ তার সেই পূর্বতন বাসনাতে সে প্রমাণ করেছে যে, আমি না বাসলে একদিন অন্তত সে আমাকে ভালবাসত।

কিন্তু তোমাকে বুঝতে পারলাম না। তুমি কখনও আমাকে ভালোবাসোনি। আমার জন্যে, আমার বাবদে কোনো দুর্মিই নিতে চাওনি।

তুমি আমার বুকের কতর জন্যে কিংকিংকে সোনার মত লক্ষ-গ্রামে খেয়ে পুষে হয়েছে। আমাকে কখনও আমার জন্যে চাওনি। তোমার প্রয়োজনে কষ্ট দিয়েছে চেয়েছিলে। তোমার সমস্ত প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে, তুমি আমাকে নির্বাসন দিয়ে নিক্ষেপ করেছ। তোমার জন্যে আমি যে জীবনের সব কিছু হারিয়ে হলে সর্বস্বান্ত পথের ভিখারী হয়েছি এ-কথা ভালোভাবে জেনেও তুমি আমার জন্যে তোমার সুখের জন্যে নিশ্চিন্ত দেওয়ালে একটুও কাটল ধরতে চাওনি।

তবু তোমাকে আমি ক্ষমা করে গেলাম। দুর্মিকে তো করেইছি।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েছিলাম, "তুমি যে তুমিই ওগো, সেই তব ঋণ, আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন।"

তোমার কাছে প্রত্যাশা ছিল অনেক, কিন্তু প্রত্যাশা পূরণের বা অপূরণের উর্ধ্বে তোমার প্রতি আমার মনোভাবের কোনোই তারতম্য ঘটেনি। বদলে কোনো কিছুর প্রত্যাশা না-রেখেই আমি তোমাকে ভালোবেসেছি চিরদিন।

চিঠিটা অনেক বড় হয়ে গেল।

তবুও যা বলতে চেয়েছিলাম, ঘুরিয়ে বলা হল না। আর কখনও হবেও না। চিঠিটা শেষ হবে বলেও মনে হচ্ছে না। কত কথা যে বলতে বাকি রয়ে গেল!

যদি পরজন্ম থাকে, তা হলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে সেখানে। দুর্মির সঙ্গেও হবে। তোমাদের দুজনের জন্যেই অপেক্ষা করব আমি। ভুল বুঝে; ভালোবেসে।

আজ এ পৃথিবী থেকে দুটি

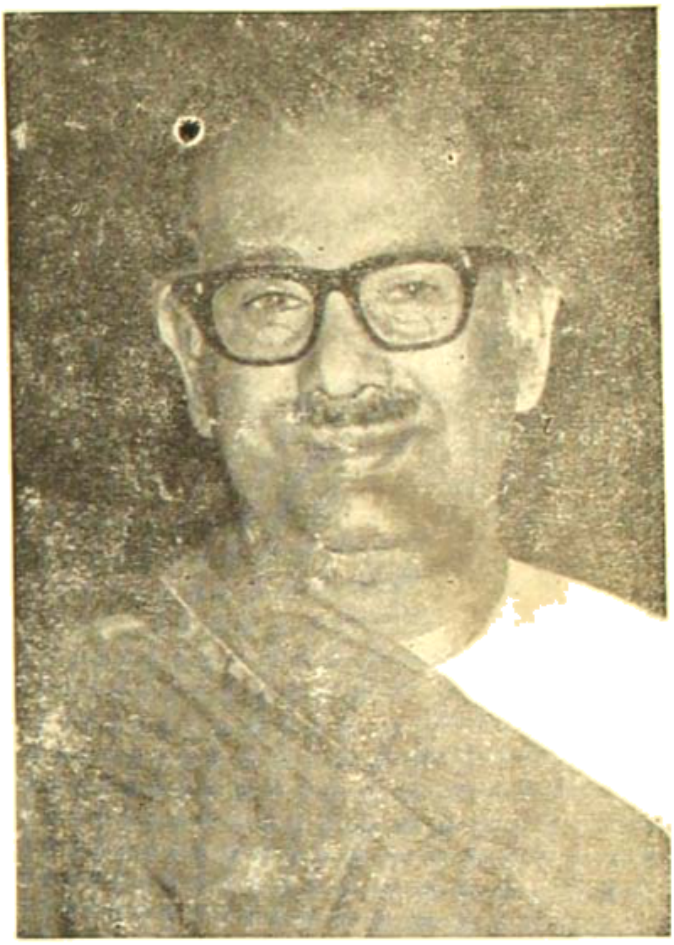

শান্তিদেব ঘোষ

নেওয়ার সময় আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। তারো কাছে কোনো ঋণ নেই আমার। অর্থের ঋণ, ভালোবাসার ঋণ, কৃতজ্ঞতার ঋণ। সব কথাই শুধে গেলাম এ জন্মে। এমন কি অন্য জন্মের ঋণও।

তবু কিছু, কিছু ঋণ থাকে, যা কখনোই শোধের নয়। সে সব ঋণ প্রকৃতপক্ষে চিরে স্বীকার করে গেলাম। সেই স্বীকৃতির জন্যে আমার স্বাক্ষর রইল।

তুমি ভাল থেকো। যেমন করে পারো তুমি, তেমনি সুন্দর করে থেকো সব সময়। আমি তোমাকে সাজাতে দেখলে বড় খুশী হতাম। আমার কথা মনে করে কখনও ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চোখে কাজল লাগিও, ঠুকুতে আই রো-পেনসিল পরো, টিপ পরো বড় করে।

সব সময় খুশী থেকো: হাসি খুশী থেকো। এইটুকুই বলার তোমাকে। আর কিছুই বলার নেই, অনুরোধের নেই।

দুর্মির সঙ্গে দেখা হলে তাকে বোলো যে, তাকেও আমি ভুল বুঝিনি। কখনোই বুঝিনি। সে বড় সরল, আন্তরিক। তার সবচেয়ে বড় দোষ যে, সে এ জীবনে আমারই মত ভণ্ডামি ও ছলনা কখনই শিখতে

আরতি মুখোপাধ্যায়

পারল না। পরেশদার যে তার আমার চেয়ে অনেক বেশী ভাল লাগে এ কথা আমাকে লুকোতে পারল না, লুকোবার প্রয়োজনও মনে করল না। আমি যেমন লুকোতে পারিনি, লুকোতে চাইনি তোমাকে ভালোবাসার কথা।

কিন্তু তুমি কখনও বুঝলে না, মানতে রাজী হলে না যে, একজন মানুষকে আর একজন মানুষ একজন মানুষকে ডাকে থাকে। মেঘকে কোনো-না-কোনো অনুপ্রেরণার দরকার হয়েই। অনুপ্রেরণা ছাড়া কেউই লিখতে পারে না। আমার এই অপরাধ তার পক্ষে কখনোই ক্ষমা করা সম্ভব হল না।

জানি না, সে কোনো দিনের তোমার দুটি করেনি। কিন্তু আমার মতো যদি ভালোবাসার মত কিছু না থাকে তা হলে তাকে তার সাহসে কি করে? সেই ভালো-না-বাসার দোষ তো তার নয়, আমার!

তার আন্তরিক সততা ও ভদ্রতার পরিচয়ই আমার চক্ষু কেড়েছে।

পরেশদার ব্যবহারে তাকে আমি ততখানি দোষী পাইনি, যতখানি পেয়েছি পরেশকে। সেই মেকি-আমি, বিশ্বাসঘাতক, আর শিরায়-শিরায় তার যেন শিরদাঁড়া কখনও থাকে। আমার হতে দুটোর বেশী ছোরা মনে তাকে আমি কখনও মনে করিনি। তাকে ছেড়ে আমি নিজেকে ছোট করতে চাইনি।

চিঠি শেষ করার সময় হল। শেষের সময় শুধু এইটুকুই জানাই যে, এই হতভাগা উজবুক উটটার স্মৃতি মনে রেখো না। যেমন হাসছ, গাইছ, চাইনীজ গল্পো, সিনেমা দেখছ, তেমনই চালিয়ে যাও। যাতে আনন্দ পাও, তাই করে যাও। কখনও ভুলেও ভেবো না যে, তোমার যেমনে সুখের কোনোভাবেই বিঘ্নিত করার ইচ্ছা ছিল আমার কখনও। তুমির সময় তোমাকে খুশী দেখতে পেলেই বড় সুখ পাব।

ভালো থেকো, সব সময় ভালো থেকো; নিশ্চিন্ত থেকো আমার জন্য-স্নেহের বড় দুঃখের তোমারী। তোমার জীবনে এই হতভাগা আর কখনও সমস্যা হবে না। তোমার নাম, সম্মান, সততার আলো থাকবে, থাকবে তোমার মনের শান্তি, সমাজিক মর্যাদা।

তুমি জেনো যে, জীবনে সুখী হতে হলে এমন অনেক অনেক দূরে সরতে হয় মানুষকে—তুমিও না হয় সরলে আমাকে। না হয় করলেই! আর তো কেউ নয়! তুমিই!

খবর যখন পেয়ে মেয়ে তুমির, তখন আরো দু-একটি কথা না বললে অকৃতজ্ঞতার দোষে দোষী হয়ে যাব।

এ কথা প্রায়শ্চিত্তের মনে হয়ে চাই যে, তোমার কাছে শুধু যে ঋণী সেজন্যই এ কথা লিখছি তা নয়।

যতটুকু পেয়েছি, যাই-ই পেয়েছি তারই অনেক দাম ছিল আমার কাছে। তোমাকে অনেক সময় বলেছি যে, আমার বাঁচা-মরা তোমার এক দৃষ্টির কৃপা-নির্ভর। আমি চিরদিনই এই সব নরম বাংলার পরনির্ভর। যারা শুধু নিজের দিকে তাকিয়ে, নিজের সুখ যাচ্ছাপাশির মত ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচতে পারে, তাদেরই বলেছি যে, আমি তাদের মত শক্ত সমর্থ নই। তাই, যে-কদিন বেঁচেছি, সে-কদিন বাঁচিয়ে-রাখার জন্যও তোমাকে অনেক ভনিতা। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার।

তুমির প্রতিও নেই।

তাকেও আমি বড় বেশী ভালো-বেসেছিলাম। দুঃখ এইটুকুই যে, সেই ভালবাসা সে বুঝতে পারল না; দাম দিল না তার। তার মনের ও আমার মনের ওয়েভ-লেংথ্ মিলল না এ জন্যে। এটা আমারই কপালের দোষ।

তোমরা কপাল টপাল মানো না। তোমার চেয়ে বয়স আমার বেশী। তুমির চেয়েও। তাই কপাল না মেনে পারি না। জন্মের শেষ কমলে মোহরে সকলকেই কপাল মানতে হয়।

সকল পুরুষ কখনও কপালে বিশ্বাস করে না। তারা বলে যে, পুরুষকারই সব। আদতিকালে আমিও একেবারে বিমল পুরুষ নই; কিন্তু আজ মনে হয়, যেসব পুরুষ-জনের জীবনে সব পাওয়া যায় না, তার সঙ্গে আরো কোনো দেবতার আশীর্বাদও লাগে। সেই আশীর্বাদ না পেলে, জীবনে না থাকলে; এক-জনের সমস্ত সফলতাই বিফলতায় পর্যবসিত হয়।

আমার জীবনে, এই সকল বয়সের হবে, আমার জীবনের মূলে নিয়েই এ কথা জেনেছি আমি।

আমার জন্যে, এই হতভাগা উটের জন্যে প্রার্থনা কোরো ভগবানের কাছে, যদি ভগবান বলে কেউ থাকেন। প্রার্থনা কোরো, যেন পরজন্মে, যদি পরজন্ম বলেও কিছু থাকে; তা হলে যেন এই উট তার মনুষ্যজন্মে পৌঁছতে পারে।

চারিদিকে জোর হাওয়া উঠেছে। বাতির ঝড় ঘরে ঢোকে। সো-সো করে বাতাসের সঙ্গে আঁধি আসছে বলে হয়।

বড় ভয় করছে আমার।

সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। আলো নেই। সব অন্ধকার। এই অসীম অন্ধকারের মধ্যে, তারাদের আড়ে আড়ালে এক এক জনের চোখে পড়ছে পাশ্চাত্যদেশের নীল, শান্ত উজ্জ্বল দুরেতারা।

জীবনের সব দুরেতারারা হারিয়ে গেছে।

জীবনের ওপারে কি দুরেতারা আছে?

কেউ কি জানে?

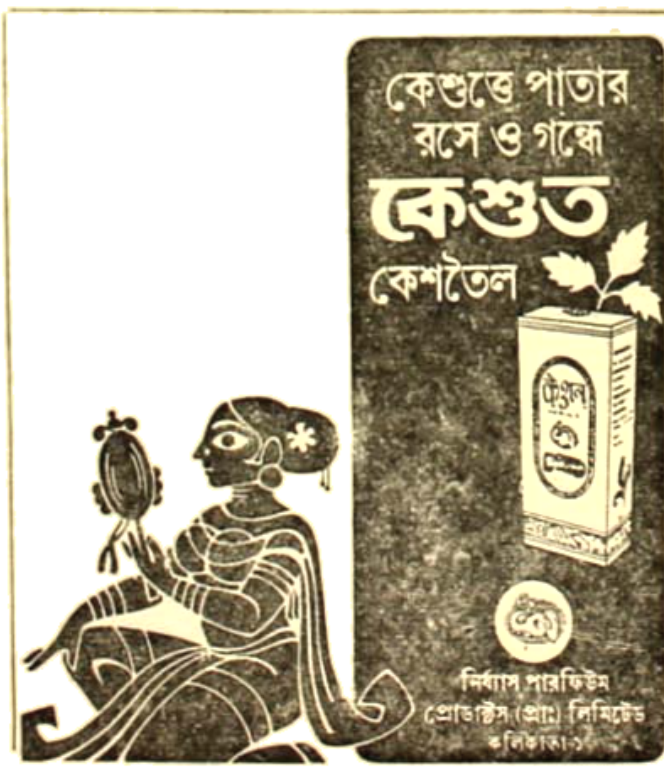

# প্রথম পটক্ষেপ

## সুমথ নাথ ঘোষ

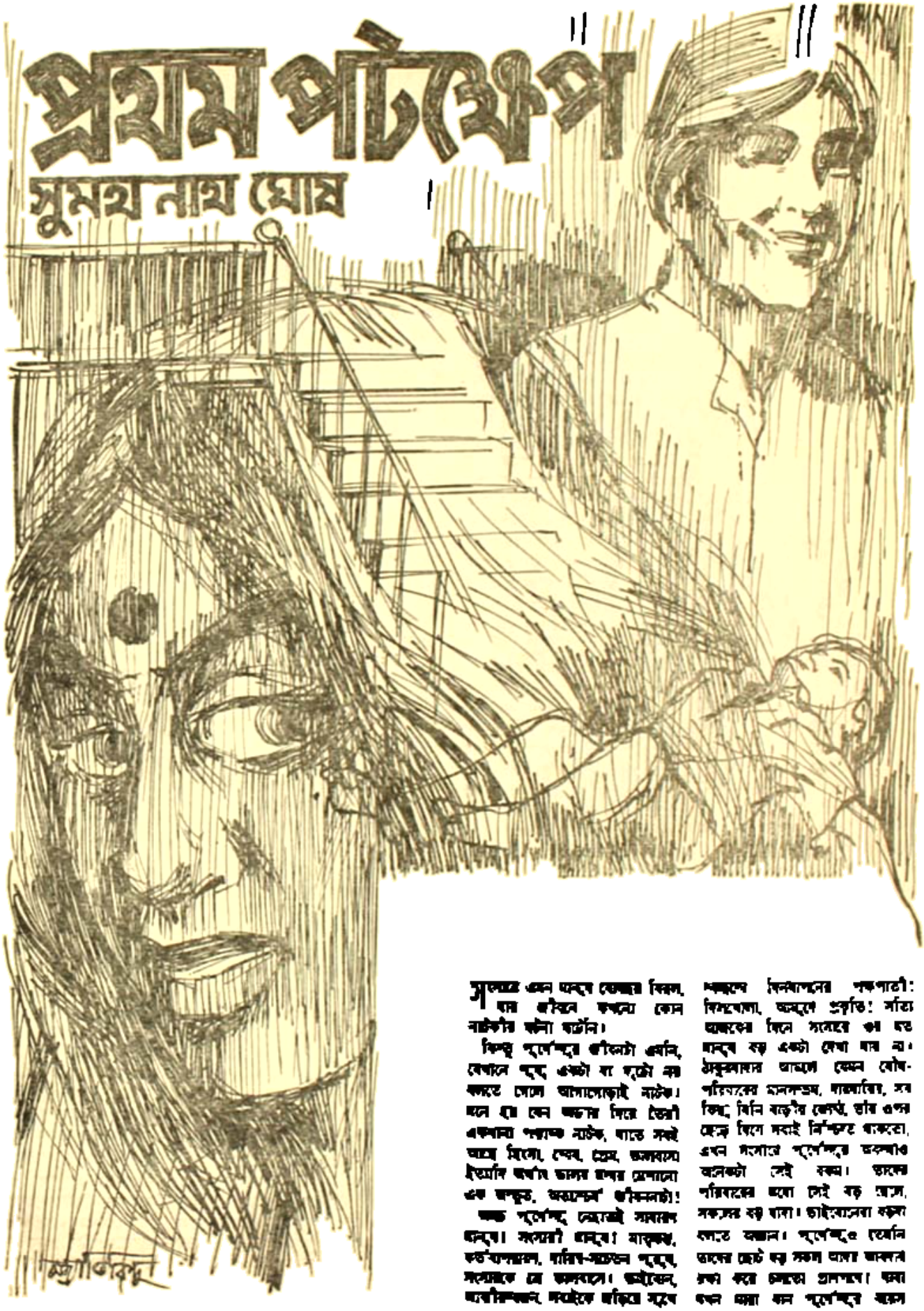

সুলেখা এমন মানুষ যেখানে বিয়ে, যার জীবনে কখনো কোন নাটকীয় ঘটনা ঘটেনি।

কিন্তু পূর্ণেন্দুর জীবনটা এমনি, যেখানে শুরু একটা যা শুরুতে মনে হতে পারে আপাতোজ্জ্বল নাটক। মনে হয় যেন অতীত দিয়ে তৈরী একখানা পরাজয় নাটক, যাতে সবই আছে মিলন, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি অর্থাৎ ভালর ভাল মেশানো এক অদ্ভুত, অবাস্তব জীবননাট্য!

অথচ পূর্ণেন্দু স্নেহান্ধ সাধারণ মানুষ। সংসারী মানুষ। মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, দায়িত্ব-সচেতন পুরুষ, সংসারকে যে ভালবাসে। ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, সংসারকে জড়িয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বিনয়াসনের পক্ষপাতী: বিলুবোলা, অমুদে প্রকৃতি! সত্যি আজকের দিনে সংসারে ওরা হত মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। ঠাকুরমার আমলে যেমন যৌথ-পরিবারের মনসম্ভম, দাক্ষায়িত, সব ছিল; যিনি বাড়ীর কর্ত্রী, তাঁর এপর ছেড়ে দিয়ে সবাই নিশ্চিন্তে থাকতো, এখন সংসারে পূর্ণেন্দুর অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। তাদের পরিবারের মধ্যে সেই বড় আসে, সকলের বড় দাদা। ভাইবোনেরা বড়দা বলতে অজ্ঞান। পূর্ণেন্দুও তেমনি তাদের ছোট বড় সকল আবদার রক্ষা করে চলতে প্রাণপণে। তারা যখন শুনে যান পূর্ণেন্দুর বাসে

তখন মন্ত্র বাইল, তখনি বোঝাতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আর যৌবনটান নয়, তাই পুরোহিতের বিয়ে দিয়ে তাকে মনের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মনে রেখো তোমার বাপ-পিতামহের সুনাম চক্ষের জল তোমার ওপর!'

পুরোহিত বাপকে দেবতার মত ভক্তি করতো, তাই তাঁর কথা বেদবাক্য জ্ঞানে মাথায় তুলে নিয়েছিল।

অর্থ-ই অনর্থ। সংসারে তাদের ঘরে যা কিছু অশান্তির সৃষ্টি হয়, প্রধানতঃ এই অর্থাভাব থেকে। কিন্তু পুরোহিতের প্রকৃতি ছিল অন্যরকম। যেমন বুদ্ধিতে উপার্জন করতো, তেমনি খরচ করতে কোথাও এতটুকু কৃপণতা ছিল না। নিজের কাছে না থাকলে, বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে এনেও মানুষকে সাহায্য করতো। সেখানে আত্মীয়, পর, বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশীর কোন ভেদাভেদ ছিল না। ঘরেও যেমন, বাইরেও তেমনি। বিপদে পড়ে কেউ তার কাছে এসে বিফল হতো না। কত কন্যাদায়, কত চিকিৎসার টাকা নেই, কোন্ ছেলে টাকার অভাবে পরীক্ষার ফি' দিতে পারছে না এসব তো আছেই। উপরন্তু ফুটবল ক্লাবের চাঁদা চেয়ে, পাড়ার দুর্গোৎসবে কমিটির সেক্রেটারী, আজ জাগরণ, বাল বিহেটারের ক্লাবের বার্ষিক উৎসব—এসব ব্যাপারেও সে ছিল দুরন্ত। বড়রা বলে এসে খাতা নিয়ে দাঁড়ালেই হলো। পুরোহিত তাদের না বলতো না। ঘরে বাইরে সবাই সেইজন্যে তাকে ভালবাসে। বড়রা স্নেহ করে, সম্মান করে। পাড়ার সবাইদের বড়রা। ছোট ছেলেরও বড়রা। আবার তার বাবা কাকারও বড়রা।

এক একদিন হঠাৎ পুরোহিত কোন ছোটছেলের কান ধরে হাসতে হাসতে বলে, 'ব্যাটা, তোর বাবারও আমি বড়রা, আবার তোরও বড়রা। তের যদি কেননিন শুনি তাহলে সরস্বতী পুজোর সময় একটা পয়সাও দেবো না। বুঝলি ছোট্ট, বুঝলি?'

ছেলেটা হিহি করে হেসে ওঠে। বলে, যোঃ, ছোট্ট নয় বড়রা। তারপর বড়রা বড়রা বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে পালিয়ে যায় তার সামনে থেকে।

শ্যামলী, পুরোহিতের স্ত্রী এই নিয়ে যখন তখন অশান্তির সৃষ্টি করে। বলে, 'পাড়ার এত সব বড়লোক থাকতে তোমার আছাই বা কেন টাকা চাইতে ছুটে আসে কেন?'

পুরোহিত সহজ জবাব দেয়, 'সেখানে পায় না বলে।'

—'থামো! তোমার মত বোকা তো সবাই নয়। তারা জানে একবার তোমায় বড়রা বলে ডাকলেই তুমি গলে যাবে। তা ছাড়া ধার বলে ধারা নেয়, তারা মনে মনে কেন জানে, এ টাকা আর কোনদিন শোধ দিতে হবে না। তুমি তো মুখ ফুটে চাইতে পারবে না তাদের কাছে। মন্টুর মার অসুখের সময় তিন বছর আগে, ওর বাবাকে তখন যে তিনশো টাকা ধার দিয়েছিলে তার তিনটে পয়সা কি ফেরত পেয়েছ?'

—'সতীশবাবুর অবস্থা তো তুমি জানো। তিনটে মেয়ে, দুটো ছেলে, এই বাজারে বাড়ী ভাড়া, তাদের স্কুল কলেজের মাইনে, খাওয়া পরা দিয়ে কতটুকু মানুষে বাঁচাতে পারে! তার ওপর মন্টুর মার নাকি সেই অসুখের পর থেকে শরীর এমন ভেঙে গেছে যে প্রতি মাসেই দুধ খাওয়ার জন্যে ওষুধ পথ্য ইনজেকশন চলেছে! সেদিন সতীশবাবু খুব দুঃখ করছিলেন।'

—'হাঁ জানি। টাকা না দিতে হলে সবাই মুখে দুঃখ করতে পারে। বলি সতীশবাবুর মত আরো অনেকের ঘরে স্ত্রী হাসপাতালে ভুগছে। তাদেরও তো চাকার, ওষুধ, ইনজেকশন্ করতে হয় কিন্তু কে কার খবর রাখে! তোমার টাকা বেশী হয়েছে, তুমি রাস্তায় বিলিয়ে দাওগে, তাতে আমার কিছু এসে যায় না! তবে আমার অমন ছেলে তোর স্ত্রী চুপ করে থাকতে পারে।'

শ্যামলী তুল বোঝে স্বামীকে। পুরোহিতের মধ্যে যে একটা উদার মহাপ্রাণী মানুষ আছে তা ওর ধারণার বাইরে। কিন্তু ছেলের কথা বলতে গিয়ে মায়ের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মেয়ে মহলে গল্প করতে করতে বলেন, 'পুত্র আমার মনস্তাপ পুত্র করে দেখেছে। কতো আজ দশ বছর ধারা দেখেন, কিন্তু একটা দিনের জন্যেও ছেলে তাঁর অভাব আমায় বুঝতে দেয়নি।'

প্রতিবেশিনীরা একবাক্যে বলে ওঠেন, সত্যি তুমি ভাগ্যবতী দিদি—আজকের দিনে, এমন ছেলে দেখা যায় না! আজকালকার ছেলেরা সব মনের ভেতো! মাকে ছেড়ে বৌয়ের পুজো করে। কিন্তু তোমার ছেলে রত্ন; সে জানে মায়ের চেয়ে বড় দিব্যলোকে তার কিছু নেই। এতটুকু ছেলের মায়ের ওপর এতবড় সংস্কারের বাঁধন চাপিয়ে দিয়ে কর্তা যেদিন চোখ বুজলেন, সেদিনের কথা মনে হলে আজো বুকটা দুরুদুরু করে ওঠে। দু দুটো আইবুড়ো মেয়ে আর তোমার ছোট ছেলেটার বোধহয় ন' দশ বছর বয়েস তখন! তোমার ওই ছেলে চাকরী করেই দু' দুটো বোনকে ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছে। ছোট ভাইটিকেও তিনটে পাশ করিয়ে চাকরীতে বসিয়ে দিয়েছে।

পুরোহিতের মা বলেন, 'তোমরা আশীর্বাদ করো ভাই, যেন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে এমনিভাবে মিলেমিশে থাকতে পারে!'

—'আশীর্বাদ যিনি করবার তিনি করছেন দিদি। নইলে এই দশ এগারোটা বছরের ঘরো তোমার ছেলের কি এত উন্নতি সম্ভব হতো? ওরা দুটি ভাইয়ে যখন রাস্তা দিয়ে যায়, আমি এক একদিন দোতলার জানালা দিয়ে ঠায় চেয়ে থাকি ওদের দিকে, মনে ভাবি ভগবান, সব ছেলেদের কেন এমন মতিগতি হয় না! তারে চারে কেন আজ ঘরে ঘরে বিরোধ।'

—'হাঁ ভাই, পুত্র আমার সৌভাগ্য থেকেও কোন দুঃখ রাখেনি। বলে যারা ওকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন যখন, বাবার অভাব আমি ওকে বুঝতে দেবো না মা! এই সেদিন বলছিল, এবার সুখুর একটা বিয়ে দিলেই তার সব দায়িত্ব খালাস। মেয়ে ও নিজেই দেখছে।

সুখু অর্থাৎ সুরেন্দ্র, পুরোহিতের ছোটভাইয়ের নাম। ন' বছরের ছেলে বাবা মারা যান, সেই ছেলে ছোট-ভাইকে কেমন মানুষ করেনি পুরোহিত, তাকে বি.এ. পাস করিয়েছে। তারপর নিজের অফিসের সাহেবকে ধরে, একটা ভাল চাকরীও করে দিয়েছে। বেজের চাকরী। বদলীর চাকরী, কখন কোন্ স্টেশনে পাঠাবে, তার ঠিকঠিকানা নেই। কিরেন বিহু'ই। সেখানে সুখুর খাওয়াদাওয়ার কষ্ট হবে, এই মনে করে তার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়েছে পুরোহিত।

পুরোহিতের মা তাই সেদিন প্রতি-বেশিনীদের বলছিলেন, দেখো না ভাই একটি ভাল মেয়ে, তোমাদের জানা-শোনা ঘরে যদি কোথাও থাকে! খোকা আমার একটি পয়সাও চাই না। শুধু শাঁখা সিঁদুর দিয়ে নিয়ে আসবো। তবে মেয়েটি দেখতে ভাল হওয়া চাই।'

আমাদের এক সহকর্মীর ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, আড়বোচা ছেড়ে আমরা দু' ভাইয়ে সাইকেল রিক্সায় চেপে সস্ত্রীক খেতে গিয়ে সেখানে পুরোহিত একটি মেয়েকে দেখে একেবারে সুখেন্দুর সঙ্গে বিয়ের সব স্থির করে এসেছে। গরীব অবস্থা। একটি পয়সা খরচ করার অবস্থা নেই বাপের ভাই সুখেন্দুর। তাদেরকে তিনি স্বর্ণ হাতে দেবেন।

অত্যন্ত সুশ্রী ও লাবণ্যময়ী মেয়েটি। নাম কণা।

মাঝে এসে মেয়েটির কথা দিয়ে পুরোহিত বলেছে, 'এই বৈশাখের শেষাশেষি বিয়ে হবে, আমি বলে এসেছি। তুমি এখন পাঁজী থেকে একটা ভাল দিন দেখে যাও।'

মা সব শুনে, একটু চুপ করে থেকে বলেছেন, 'একেবারে পাকা কথা দিয়ে এলি। একবার সুখুকে মেয়েটি দেখালে হতো না।'

—'কি মুস্কিল মা! সুখুর কি রুচির টেস্ট্ আমি তো জানি। ওর নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।'

ঠিক সেই সময় সুখেন্দু ঘরের ঘরের সামনে দিয়ে স্নান করতে যাচ্ছিল। পুরোহিত তাকে ডাকলেন, এই সুখু শোন।'

—'আমি ভেজা কাপড়ে। ঘরের ভেতরে ঢুকবো না। কি বলছো বলো?'

হাসিহাসি মুখে পুরোহিত বলে, 'আমি এক জায়গায় তোর বিয়ের ঠিক করে এসেছি। মেয়েটি দেখে খুব পছন্দ হলো বলে, তার বাবাকে একেবারে কথা দিয়ে এসেছি। আর ইচ্ছে, তুই যদি একবার তোর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মেয়েটিকে দেখে আসিস।'

—'না। ওসব আমার দ্বারা হবে না। তা ছাড়া তুমি যখন পছন্দ করেছো, তখনই কথা দিয়ে এসেছো, তার ওপর আর কিছু বলা অন্যায়।'

পুরোহিতের চেয়ে সুখেন্দু বয়সে অনেক ছোট হলেও, বন্ধুর মত দুই ভাইয়ের সব বিষয় নিয়েই আলাপ আলোচনা করতে পারতো দা। বাবার ওপর তার অটল বিশ্বাস।

কাজেই বিয়ে যথাবিধি সুসম্পন্ন হয়ে যায়। বৌ দেখে পুরোহিতের মা থেকে সুরু করে ওদের পরিবারের যে যেখানে ছিল, মেয়ে পুরুষে সবাই খুব খুশি।

পুরোহিত একটা নিশ্বাসও মুখে বাইরে ছোট ভাইকে বললে, দেখ সুখু তাহলে তোর বাবা একটা মাস্তে ছেলে তোর ঘাড়ে চাপিয়ে যেতনি।'

—'আমি কি তা বলেছি? তবু আমি বাসনা করতে পারিনি যে এ রকম—'

—'তা হলে খুশি তো। যাও এবার বউকে বিরাজটা?' বলে হাতটা বাড়িয়ে দেয় পুরোহিত, তার সামনে।

—'সবই তো তোমার। তোমাকে আর তার চেয়ে কি বেশী দেবো দাদা!'

সুখেন্দুর সঙ্গে তার বাবার কতদিনের যে এত তফাৎ, কে জানে। দুটিতে গলাগলিভাব বন্ধুর মত, এ কালে তারে তারে এমন মিল অবাচিত চোখে পড়ে। সবাই ওদের আড়ালে বলে, যেন রামলক্ষ্মণ। এ দিকে পুরোহিত যখন ছোট ভাইয়ের সঙ্গে হাড়ী তামাসা করে বা আদর ইয়ার্কি দেয়, কিংবা তাস খেলতে বসে তখন ছোট ভাইকে হারিয়ে হো হো করে হেসে বাড়ী মাত করে। ছোট বলে খাতির করে না।

তাই সুখেন্দুর ওই কথা শুনে, কণার দিকে চোখ ফিরিয়ে পুরোহিত, জ্বলে ওঠে, তোমাকে দো বৌমা, তোমার বরের কাণ্ডটা! কোন্ সুদূর পড়ন্সী থেকে তোমার খুঁজে পেতে এনে তার হাতে তুলে দিলুম, আর ওকে ছিনিয়ে নেবো কিনা, সবই

তোমার—'

কর্ণা কপ্ করে উত্তর দেয়, 'আজ কিনার পুরুষেরা ফেলে আপনাকে। ছোটভাই কি দাদাকে বর্ধমান দিতে পারে! তা হলে যে অপমান করা হয়।'

—'এ তুমিও এর মধ্যে তৈরী হয়ে নিয়েছো। যেমন কর্তা তেমনি ঝিন্নী। অর্থাৎ দাদাকে কাঁকি দিতে চাও—বুঝলেই—' হলে মো মো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে পূর্ণেন্দু। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে, 'সে বর্ধমান সকলের কাছে পেরেছি। সকলেরই খুব পছন্দ হয়েছে তোমাকে। এতেই আমি খুশি! তবে তুমি কতটা খুশি হয়েছো, জানি না।'

সঙ্গে সঙ্গে কর্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে, পূর্ণেন্দু ধমক লাগায়, 'এই কল্যাণী, পালালে চলবে না। বলতে হবে তোমার, সকলের সামনে।'

কর্ণা ফিক্ করে হেসে মুখে আঁচল চাপা দিলে, পূর্ণেন্দু ছোট ভাইকে বলে, 'কিরে কর্ণার তোকে পছন্দ হয়েছে? ঠিক তোর যেমন একে ভাল লেগেছে, তেমনি?'

—'কি করে আমি তা জানবো দাদা।' বলে ঘর থেকে চট্ করে বেরিয়ে যায়।

একে আমুদে স্ফূর্তিবাজ মানুষ পূর্ণেন্দু, তার ওপরে ছোট ভাইয়ের বৌ বেশ সকলে খুশি হওয়াতে, যেন আনন্দ চেপে রাখতে পারে না মনে। বিয়ে চুকে যাবার পর, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে থেকে ফিরে যেসব ছোট খাটো চলে রসিকতার আসর বসে, কখনো খাবার ঘরে, কখনো বা বারান্দায়, কখনো বা ড্রয়িংরুমের কাছে ভিড়ে থাকতে থাকতে, হেসে লুটোপুটি খায়—একজন অপরের গায়ে ঢলে পড়ে। পূর্ণেন্দুর পা দুটোকে যেন কে জোর করে টেনে নিয়ে যায় সে দিকে।

—'অরুণা, তুমি এখানে কেন? যাও, ভাগো, তোমার প্রবেশ নিষেধ।' খুড়তুতো ছোটতুতো বোনেরা শ্যামলীর তদারকে আগলে রেখেছে পূর্ণেন্দুকে। আসলে তারা চেনে তাদের বড়দাকে। নতুন বৌয়ের সম্পর্কে জীবনের কাহিনী শুনে, তাদের মত করে হুবহু মেতে আসেনি, মুখেন্দু বাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাকে সুখী করতে পেরেছে কতখানি, তার নির্বাচন ভুল হয়নি তো? মেয়েদের মুখ থেকে তার প্রশংসা সত্যই শুনে খুশি হতে চায়। বাবার মনোনয়ন পালনে যে কোন ত্রুটি হয়নি, সেই জেনে ওদের চেয়ে আরো বহুগুণ এক আনন্দের অনুভূতিতে ভরে যায়।

পিসতুতো বোন অরুণিমা বলে, 'মাইরি বড়দা, তোমার চোখ আছে। একটা বৌ খুঁজে খুঁজে এনেছো বটে। যেমন দেখতে, তেমনি হাসিখুশি! এ কে জানবে যে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে! তোমার শহরের মেয়েদের এক হাতে কিনে, আর এক হাতে বেচে আসতে পারে! কথা কইতে জানে বটে। ছোকরা তো একেবারে ফ্লাট্!'

—'তাই নাকি রে! সত্যি বলছিস!' গদগদ হয়ে ওঠে পূর্ণেন্দুর কণ্ঠ।

—'মিথ্যে বলে তোমার লাভ কি! যাওতো তুমি আমাদের মেয়েদি আড্ডা থেকে। এই সব আড্ডায় কিন্তু কোথাও নিজের স্ত্রীকে দেখতে পাবে না পূর্ণেন্দু। মেয়েলী ছোট-খাটো সভারা যেখানে এবং কি তার মাও উপস্থিত থাকেন, খুঁজে পায় না সে কেবল শ্যামলীকে।

বেচারীর জন্যে সহানুভূতি জাগে ওর মনে! শ্যামলীকে দেখতে ভাল নয়। তবু মালা তার ওপর বিয়ের পর এই আট বছরে দেহটা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ী হয়ে গেছে। পূর্ণেন্দু এক একদিন ঠাট্টা করে, যেন লক্ষ্মী বলে।

শ্যামলী রাগ করে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়, 'যাও, আমি কালো, আমি কুৎসিত আমার মুখের দিকে চাইতে হবে না! যখন টোপর মাথায় দিয়ে আমাদের বাড়ী গিয়েছিলে, তখন জানা ছিল না! আমার বাবা তো জোর করে তোমার ঘাড়ে আমায় চাপিয়ে দেননি!'

—'বাস্তবিক বাবা যে কি ভেবে তোমায় বেছেছিলেন! তাঁর বাবলা সাকসন লক্ষ্মীঠাকরুণকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন তোমার মধ্যে।'

সদর্পে একবার তাকায় শ্যামলী। স্তুতি বাবলা কি মিথ্যে! আমার বিয়ের পর থেকেই না তোমার চাকরীতে বই বই করে উন্নতি হতে লাগল।'

—'এটা ঠিক।' অস্বীকার করতে পারে না পূর্ণেন্দু। তাই জোড় হাত করে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে ওঠে 'হায় রে মেনেছি।'

—'যাও! আর খুড়ো বলে জ্বালাতন করতে হবে না।'

আসল কথা, নতুন বৌয়ের মুখ খুলে গিয়ে সবাই এমনি মাতামাতি সুরু করেছে যে তার জন্যে খিদে, নিজেকে অপমানিত করতে চায় না শ্যামলী। নতুন বৌ আসতেই যেন নতুন করে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে সে। এক এক সময় মনে হয়, বুঝি পালছেঁড়া, নকলের ইচ্ছা করেই, তাকে ছোটখাটো করার জন্যে, আরো বেশী করে নতুন বৌয়ের গুরুমান করে। মেয়েরা সব পারে। মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু ওই মেয়েরা। তাই মেয়েলী আড্ডা থেকে সব সময় ও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কারুর ছুতো করে, রান্নাঘরে বসে থাকে। আত্মীয়রা সব তাড়াতাড়ি বিদেয় হলে যেন বাঁচে শ্যামলী। হাসি

সরস্বতী রায়

ঠাট্টা যেখানে সেখানে, খুড়তুতো ননদ যেন থাকতে চায় না। আর এই সবের উপলক্ষ একজন, নতুন বৌ। শ্যামলী মনে মনে গজরাতে থাকে, আমিও তো নতুন বৌ হয়ে এসেছিলুম, কৈ তখন তো আত্মীয়দের চালে এত আনন্দের জোয়ার বইতে যেখিনি! এর জন্যে সব রাগটা গিয়ে পড়ে তার স্বামীর ওপর।

হাঁ, অনুমানটা শ্যামলীর মিথ্যে নয়! বিয়ে-বা চুকে যাবার পরও আনন্দটাকে যেন জিইয়ে রাখতে চায় পূর্ণেন্দু। একদিন বাদে ছোপ খানা থিয়েটারের টিকিট কেটে এনে সবাইকে নিয়ে হৈহৈ করতে করতে থিয়েটার দেখতে যায়, আর একদিন সিনেমা। একদিন হোটেলে ডিনার খেতে যায় সকলকে। সব ব্যাপারেই পূর্ণেন্দু যেন একটু বাড়াবাড়ি করে। সিনেমার টিকিট কাটতে যেবার আগে সে কর্ণাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, 'বলো কোন্ ছবি দেখবে, হিন্দী না বাংলা?'

কর্ণা বলে, 'আপনার যা ইচ্ছে। আমি কি বলবো? বিদিকে জিজ্ঞেস করুন।'

—'না, না, এ আনন্দে বিধি-টিধি কেউ নয়। সব তোমার 'জনারে' খুজে পেয়ো না।'

হোস্টেসারীর যাবার টেবিলে বসে ও ঠিক এমনি ভেবে করে 'কি খাবে বলো? ইলিশ না কিছু মোগলাইও খাবে!'

চারিদিকে পিসতুতো, মাসতুতো, ছোটতুতো ননদ, জা, শ্যালী পরিবৃত হয়ে খাওয়ার কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা পায় কর্ণা। মাথাটা তাই নীচু করে নেয়। উপস্থিত সবাই তার মেয়ে বন্ধু, বয়সে ও বয়সে।

—'লজ্জা কি, বলে ফেলো!'

—'আপনার যা ইচ্ছে!' বলে মাথাটা দুলিয়েই, ননদরা বলে ওঠে, 'এমন স্বামীর মানুষ, জন্মজন্ম তপস্যা করেও পায় না।'

অরুণিমা ওই বয়সে একটু মুখে ফোড়ন। 'জানী বৌকো, ভাল ভাল খাবার কতগুলো নাম করে যাও ভাই। তোমার দৌলতে, আমরা ও খেয়ে বাঁচি।'

আই একটা হাসির ঢেউ খাবার টেবিলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে যেতে শ্যামলীর কাছে এসে যেন আটকে যায়। মনের ছায়া জমতে থাকে সে। অভিমানে একেবারে গলে পড়ছিল!

এ অভিমানে খুড়তুতোরা নেই। যেমন তার স্বামীর তেমনি নতুন বৌয়ের। অথচ মাঝে শ্যামলীর। তবুও এরা সকলে এই নিয়ে যেন তদারক উপভোগ করে।

শেষে অরুণিমা একটা ফরমাজ করে বসে। বলে, 'ছোকরা, তোমার বৌ যখন রান্না করে না, তখন তোমার বলার অধিকার নাই। অন্ততঃ আজকের বলার অধিকারী তুমি। ভাল ভাল কতগুলো নাম করে যাও তো ভাই।'

—'হাঁ, অরুণিমা ঠিকই বলেছে।' পূর্ণেন্দু বলে, 'আচ্ছা সুধু, তুই আজকে যে খাবারের।'

—'আমাকে আবার টানছো কেন বড়দা! তুমি যা খাওয়াবে, আমরা তাই খাবো।'

—'না-না-আমি এর মধ্যে নেই।'

—'তাহলে বৌদি বলুক।' এই বলে সুধেন্দু শ্যামলীর মুখের দিকে তাকাতে সেখান থেকে জবাব আসে, 'তোমাদের এই নাকলনী ভাল লাগে

না। যা খাবে বসে যাও। তা নয়, এত চাই, ওত চাই।'

—তার নেই, বাবা, তোমার বক্তের টাকা বেশী খরচা করাতে চাই না আমরা তাই তোমার ওপর ভার দিচ্ছি। এখন দয়া করে তুমি হুকুম করো বৌদি. পেটে এদিকে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে।' খুড়ে শ্বশুরের ছোট ছেলে মিনতি এই বলে চুপ করতেই আবার একটা মৃদু হাসির গুঞ্জন ওঠে।

মুখটা ঘুরিয়ে শ্যামলী জবাব দেয়, 'আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে! যার টাকা সে যেমন ইচ্ছে খরচ করুক। আমি এর ভেতরে থেকে, নিমিত্তের ভাগী হতে চাই না। তারপর বৌদির নামে বদনাম দেবে, আমলের পেট ভরলো না খেয়ে।'

—আচ্ছা বুদ্ধি বাবা!' বলে পূর্ণেন্দু, শ্যামলীকে চুপ করিয়ে দিয়ে, নিজেই খাবারের তালিকা দেখে অর্ডার দিয়ে ফেললে।

এর দুদিন পরে, হঠাৎ বাজার থেকে মাসে ফিরে এসে পূর্ণেন্দু বললো, মা আজ কর্ণাকে মাসে রাঁধতে বলো। সবাই তো চলে যাচ্ছে শনিবার, ওর হাতের রান্নাটা কেমন খেয়ে যাক।'

—ও মা, ও ছেলেমানুষ, এত জনের জন্যে মাসে রাঁধতে পারবে? কি পাগলের মত কথা বলিস তুই।'

—কেন, ওতো খুব ভাল রাঁধতে পারে, ওর বাবা বলেছেন। ওদের পাড়ার সবচেয়ে পূজোর সময় কর্ণার ওপর নাকি রান্নার ভার পড়ে!'

কর্ণাকে ডেকে পাঠিয়ে পূর্ণেন্দুর মা বললেন, দেখো তোমার ভাসুরের পাগলামী। এত মাসে কিনে এনেছে, বলে তুমি রেঁধে আজ সবাইকে খাওয়াবে! পারবে মা তুমি রাঁধতে?'

কর্ণা ঘাড় নীচু করে উত্তর দেয়, পারবো। তবে জানি না, সে রান্না সকলের ভাল লাগবে কিনা?'

পূর্ণেন্দু বলে ওঠে, 'ও কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমার বাবা আমার চুপি চুপি বলে দিয়েছেন, তোমার হাতের রান্না নাকি খুব ভাল। আজ তার পরীক্ষা হবে, মনে রেখো।'

অনাদিন মাসে এসে শ্যামলী-ই রান্না করে, সবাই খেয়ে খুব প্রশংসা করে তার। তাই একবার তাকে মুখে কিছু না বলে, মাসে কিনে এনে, নতুন বৌকে রাঁধবার কথা বলাতে, শ্যামলীর ওপর মনে মনে অভিমান হয় শ্যামলীর। বেশ তো, ওকে ডেকে বলাই পারতো পূর্ণেন্দু, দেখো মাংসটা এনেছি, আজ তুমি রেঁধো না, নতুন বৌকে দিয়ে রান্না করিয়ে দেখো, ও পারে কিনা! তা নয়, একেবারে রসে বশে ভরপুর! এমনি ভাবে তিনি ভাইয়ের মনের এনেছেন, যার পরোয়া শেষ নেই, আর সকলকে, তাই দেখবার জন্যে যেন পাগল! আমুদে মানুষের অভাব নেই পৃথিবীতে, এ যেন একেবারে জলজ্যান্ত আদিখ্যেতা!

আত্মীয়স্বজন সবাই একসঙ্গে সারিবদ্ধ হয়ে খেতে বসেছিলেন। দুই বৌয়ে পরিবেশন করছিল। আর শাশুড়ী দেখবার দাঁড়িয়ে সকলকে খাওয়াচ্ছিলেন। কারুর পাতে আর একটা মাছ দিতে বলছিলেন। কাউকে আরো দুটি ভাত। কাউকে বা আরো একটু মাংস।

—বৌমা নিজ হাতে মাংস রেঁধেছে, কেমন হয়েছে?' বলে জনে জনে জিজ্ঞেস করেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখেই কোন প্রশংসা না করে তিনি সোজা ছোট ছেলেকে শুধু করেন, 'কিরে সন্তু, ছোট বৌমা কেমন রেঁধেছে?'

—একেবারে মাসাকার হয়েছে। মুখে লোকা।'

—দাঁ আমি ঠাট্টা করছি না! লক্ষ্মীটি তুমি জিজ্ঞেস করো।'

—হাঁরে পল্টু, মুখে পড়ে গেছে?'

বৌমার এই পরাজয়ে যেন পূর্ণেন্দুর নিজের পরাজয়, এমনি ভঙ্গীতে সে জবাব দেয় 'মা একটু নুন বেশি হয়েছে। তা এত লোকের রান্না, ঠিক আন্দাজ করতে হয়ত পারেনি। ছেলেমানুষ তো!'

—সত্যি জানই তো বৌমা! বয়েস কতটুকু, সংসারজ্ঞান পারবে কি! তা তোর উৎসাহই বেশী! এখন চলো তো! সকলের খাওয়া নষ্ট হলো।'

জগদীশ কাকা কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে পূর্ণেন্দু বলে, 'ওর বাবা বলেছিলেন ওর হাতের রান্না খুব ভাল!'

—এমন কিছুর আশা করতে হয়। তুমি যেমন সরলা এই কথা অমনি বিশ্বাস করে নিলে!

মাঝ থেকে শ্বশুর কর্ণা শাশুড়ীকে বলে 'মা আমি তো নিজে চোখে দেখেছিলাম, তখন তো নুন লাগেনি! ঠিকই ছিল।'

—তা হলে কি কেউ ইচ্ছে করে আরো নুন মিশিয়ে দিয়েছে, বলতে চাও?'

অপমানীর মত ঘাড় নীচু করে রান্নাঘরের দাঁড়িয়ে থাকে কর্ণা। শাশুড়ী বলেন, 'যাও তবু কেউ কিছু বলে কিনা দেখোগে—এখানে সব-এর জন্য দরিদ্রের বাজেট কি হয়। খেয়ালের বশবর্তী হয়ে কিনে ছিল, এত মাসে আমি কখনো দেখিনি।'

—বাঁধবো না কেন মা! বোঝাই যাচ্ছিলো। তবে কখনো তো এমন সাজ হয়নি। তাই ভাবলাম কি করে হবে—'

—আর ছেলে কি হবে। যা হবার হয়েছে। সকলের কাছে তোমার চেয়ে তোমার ভাসুরের মূল্যটাই পড়েছে। তারই উৎসাহে সকলের চেয়ে বেশি। তোমার রান্না খেয়ে সকলে ভাল বলুক, এটাই ছিল তার মনের ইচ্ছা।' কর্ণা এবার কেঁদে ফেলে! নিরুপায়ে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। বলে, 'মা আমি নিজে চেখে দেখেছিলুম, তাই তো কোথা থেকে কি হলো, বুঝতে পারছি না। দিব্যি বড়বা কি ভাজছেন!'

পূর্ণেন্দু একেবারে চুপ। তার মুখে আর কোন সাড়া শব্দ নেই দেখে মনের ভেতর যেন খুশি চেপে রাখতে পারে না শ্যামলী।

মনমরা হয়ে, বৈকের সন্দেশ মিষ্টি খেতে খেতে ঘরে যায়, না বাপু তোমাদের বড় বৌদির হাতের রান্নার কাছ কেউ লাগে না! বড়দা এখানে তোমার পরাজয় হয়েছে, স্বীকার করতেই হবে।'

ছোটর মন এই কথা পূর্ণেন্দুর দিকে এমনভাবে তাকায় যেন এ পরাজয় তার, কর্ণার নয়।

পূর্ণেন্দু হেসে ওঠে, 'তা তোমার বেশ বিচার তো। যে এত কষ্ট করে রান্না করলে, সে চেয়ে তাকিয়ে, আর যে পরিবেশন করলে, তার হলো জিৎ।'

অসীমা বলে, 'দেখো বড়দা তুমি কিন্তু একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছো। আমরা সকলের মন, তাদের 'টিপ্পনেতে বলনায়—তাদেরও একটুকু জিতকে এত বড় করে দেখাই। কিন্তু ছোটদা, যাঁর মুখে নতুন বৌদির হাতের প্রশংসার যে কোন ধারা আসত সমান, সে-ই তো সব-প্রথম উচ্ছ্বাস করলে, মনে পড়ে দেছে। আমরা তো তাই চুপচাপ ছিলুম!'

পূর্ণেন্দু এদিক ওদিক তাকিয়ে মাকে বলে, 'কর্ণা কোথায় মা?'

—কেন, কি দরকার তাকে?'

—ওই একটু, খাবার জল দেবে।'

—আন্না আমি দিচ্ছি। সে আর তোমাদের কাছে মুখ দেখাবে না। লজ্জাতে মাঁড়িয়ে কাঁদছে।'

—কাঁদছে? সেকি! ডাকো তাকে এখানে!' পূর্ণেন্দু নিজেই ছুটে পাছে, 'কর্ণা, কর্ণা, শুনে যাও এখানে, শিগগির।'

পাশের ঘরে বসে পান সাজছিল শ্যামলী। পানের পাতার চুন, খয়ের সুপারির কুচোর সঙ্গে ছোট এলাচের দানা দিয়ে একটার পর একটা খিলি মুখে সবকল আস্বাদছিল। হঠাৎ স্বামীর ওই সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর কানে। সেকি? মনে যাওয়া মাত্র তার বড়ো চোখ ছেকে যেন হিংসে আনন্দ ঠিকরে পড়ে। প্রতিযোগিতায় চরিতার্থ হওয়ার এক একটুকরো সুখে হাসি মিলিয়ে দিয়ে ওঠে বাঁকা ঠোঁটের দুই প্রান্তে। সেখানে যেন নতুন বৌয়ের মাটিতে পা পড়ে না। আর সেই সেবাকে বাড়িয়ে দিয়েছে,

তার স্বামী, পূর্ণেন্দু। ঘর আদি-খোতা, সবের মূলে সে। নতুন বৌকে নিয়ে আনন্দের আর শেষ নেই। সে যে রূপে গুণে কেবল নয়—গৃহকর্মে, এমন কি রন্ধনেতেও সকলের ওপরে যায়, তার প্রমাণ দেবার জন্যে নিত্য নতুন পরিকল্পনা তার মাথায় আসে।

পানের খিলির মুখে লবঙ্গ বিঁধতে দিয়ে শ্যামলীর বুকের ভেতর যেন কে কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। তোমার মাথায় সব পরিকল্পনা শুধু আমাকে হেনস্থা করার জন্যে। আমি কালো, কুৎসিত, মোটা, নতুন বৌয়ের মত সুন্দরী, তন্বী নই।—সবই ঠিক। কিন্তু তার জন্যে তো আমি দায়ী নই! তাই বলে বিধাতা আমাকে যে হাত দিয়েছেন, যার রান্না খেয়ে সবাই সুখ্যাতি করে, আজ তাকে হেনস্থা করবার অধিকার কারুর নেই। না নতুন বৌ কর্ণার, না তার স্বামীর।

(২)

পূজোর সময় প্রতি বছরের মত সকলকে এবারও নতুন জামা কাপড় দেয় পূর্ণেন্দু। তবে এবারে শাড়ীর বাজেটটা অনেক বেড়ে যায়। তার জন্যে পরোয়া করে না পূর্ণেন্দু। পূজোর বোনাসটাও বেশ মোটা রকমের পেয়েছে সে।

শাড়ীর বাক্স দুটো বগলে করে ঘরে ঢুকতেই শ্যামলী ছুটে এসে বাক্স দুটো খুলে ফেললে।

পূর্ণেন্দু কর্ণার শাড়ীখানা বেঁধিয়ে বললে, 'দেখো তো, এটা কর্ণাকে মানাবে না?' বলে স্ত্রীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই, নিজেই বলে ফেলে, 'আমার মনে হয় খুব ভাল মানাবে।' ঘিয়েরঙ্গ শরতের ওপর নতুন ধরনের প্রিন্ট। একটা নাকি লেটেস্ট ফ্যাশন্! কি তোমার পছন্দ হচ্ছে?'

শ্যামলী পছন্দের কথা না বলে, হিসেব করলে, 'কত দাঁড়াবে নিলো!'

উৎসাহে পূর্ণেন্দুর গলা কেঁপে ওঠে। 'খুব সস্তায় পেয়েছি। নিউ মার্কেটে বলেই সম্ভব হয়েছে। তোমার পছন্দ হলে, এ শাড়ী এ ধরনে কিছুতেই কিনতো না।'

—কত নিয়েছে, শুনি?'

পূর্ণেন্দু শাড়ীর গায়ে ঝোলা টিকিটটা দেখালে।

শ্যামলী মুখটা নীচু করে, বলে উঠলো, 'আন্না। একশো পঁয়ত্রিশ, তুমি বলছো বাস কম নিয়েছে!'

—একবারে লেটেস্ট, ডিজাইন! ঠিক এই রকম প্রিন্ট শাড়ী এর আগে কলকাতায় আসেনি। ওরা এই বলে ঘড়ি বলছিল। একটা শেষ! তাছাড়া আজ কিনতে গিয়েছিলুম। আগে ভেবেছিলুম শনিবার যাবো! তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শনিবার বেজায় ভীড় হবে, মনের মত পছন্দ করা যাবে না।

দামখানা দেখতে চাইলে দোকানদার দেখাতে হবে।'

শ্যামলীর মুখে উপহারের অভাব দেখে পূর্ণেন্দু বলে ওঠে, 'তোর কাপড় তো সবই এক—আসলে ডিজাইনটার জন্যেই তো দাম বেশী নইলে খড়িমাটী ছিটে, যা দেখে দেখে চোখ পচে গেছে, সে তুমি নক্সাই, পঞ্চানক্সইয়ে আজকে পেরে যাবে।'

বলতে বলতে এবার শ্যামলীর শাড়ীটার তলি উল্টে দাম লেখা টিকিটটা দেখিয়ে বলল, 'এটা সেলস্ হলেও, এর পাড়ে যে জরির কাজ দেখছো, এটাও কিন্তু নতুন ধরনের।'

শ্যামলী বলে, 'কিন্তু এটা তোমায় ঠকিয়েছে। একশো বাট টাকা। গড়িয়া-হাটায় অনেক কমে পাওয়া যায়!'

—'তবে হয়ত পেতে পারো। তবে ঠিক এ ডিজাইন পাবে না। থাকবে। এটা তোমার পছন্দ হয়েছে তো?'

এ কথার জবাব না দিয়ে শ্যামলী বলে, 'কর্ণার শাড়ীটার দাম অত হলেও, আমার চেয়েও অনেক জিনিষ ভাল।'

পূর্ণেন্দু বলে, 'তবে বোকা। তোমার সেলস্ শাড়ীর দাম এত বেশী নিজেকে কি বিশ্বিসিছি? হাত দিয়ে দেখো দেখি পরনের জমিটা কি রকম সফ্‌ট্।'

চট্ করে নিজের শাড়ীটা একবার হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে শ্যামলী কর্ণার শাড়ীর ভাঁজের মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে, কাজটা বেশী সফ্‌ট্ বাড়াই করতে গিয়ে, বারে বারে হাসি হয় যেন বেশী মশৃণ, বেশী লোভন লাগে কর্ণারটা।

পূর্ণেন্দু বলে, 'ও মেয়েমানুষ, এই বয়স-এ ডিজাইনটা ওকে কেন মানাবে না?'

—'মানাক না মানাক সে নিয়ে তোমায় এত মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার যেমন পছন্দ হয়েছে, তুমি এনেছো। কম্ ঢুকে গেছে।'

—'না-না-দেখো। আমি এত টাকা খরচ করে যে শাড়ীটা আনলুম, সেটা যদি ওর মনোমত না হয়, তা হলে, আমি বলছি নিয়ে যাবো। তুমি ওর মনের কথাটা সোপনে জেনে নিয়ো। ও যা চাপা মেয়ে পছন্দ না হলেও মুখ দেখে তা তুমি বুঝতে পারবে না।'

'বেশ তো, তা হলে ও তারটা আমার ওপর না দিয়ে তুমি নিজেই করলে পারো।'

—'আরে, আমি কি তাই বলছি!'

—'আবার এর চেয়ে বেশী কি করে বলবে।' বলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর বলে, 'ঠিক আমারটা পছন্দ হয়েছে কিনা কিংবা পছন্দ না হলে, আবার ফেরত দেবে, একথা একবারও তো তোমার মুখে শুনলাম না।'

—'আরে তুমি যে আমার স্ত্রী, আমার পছন্দই তোমার পছন্দ। তোমাকে আবার নতুন করে বলবো কি? পাঁচের পৃষ্ঠের সতীর পুণ্য, বুঝলে না?'

—'বেশ তো, তা হলে ও শাড়ীটার পছন্দ ঠাকুরজামাই হাতে ছেড়ে দাও—তুমি কেন এত মাথা ঘামাচ্ছো ও নিয়ে।'

—'আরে সুখটো একটা বাবলা। ওকে আমি চিনি না ভেবেছে? কেবলই দামী কিনেছে, নিশ্চয় সেটা ভালো। তার ওপর আর কথার কিছু নেই। কর্ণার ঠিক পছন্দ হলো কিনা তার খোঁজ নেবার জন্যে বসে থেকে! সেই জন্যেই তো তোমায় বলছি, সোপনে ওর মনের কথাটা জেনে নিতে।'

পূর্ণেন্দুর আসল কথাটার সঙ্গে কয়েক খাদ মিশিয়ে কেমন করে কর্ণার কাছে শ্যামলী পরিবেশন করেছিল এবং কর্ণা তার জবাবে কি বলেছিল, সে খবর আর নেয়নি পূর্ণেন্দু। তার স্বভাবটাই এই রকম, আত্মতোলা উদ্ভাসলেন। কেউ যখন ভাল লাগে সরলভাবে তা প্রকাশ করে দেয়। অন্যের মনে তার যে কোন প্রতিক্রিয়া হতে পারে, একবারও সে কথা চিন্তা করে না। হল কপটতা কাকে বলে জানে না। যারা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু তারা জানে, একটুখানি আনন্দের জোয়ার বিশ-পঞ্চাশ খরচ করে অনায়াসে পূর্ণেন্দু। ছোট বড় সকলের সে প্রিয় ও সকলের কাছে সে বড়দা।

মহাষ্টমীর দিন বিকেল পাঁচটায় পূর্ণেন্দুদের প্রতিমার উদ্বোধন করবেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং সেই সঙ্গে একটি ধানের জলসাও হবে। বাড়ীর সব মেয়েরা সাজসাজ করছে, পূর্ণেন্দুর সঙ্গে কাদের দেখতে যাবে বলে। হঠাৎ কর্ণা জল-খাবারের জন্যে খাবার ঘরে আসতে গিয়ে, পূর্ণেন্দুর মুখোমুখি হলো।

—'একি! না না, ও শাড়িটা পরলে কেন? ছেড়ে ফেলো। ভাল দেখাচ্ছে না।'

কর্ণা খুব আস্তে করে বললে, 'বিশিতাই তো এই শাড়িটাই পছন্দ করে পরতে বিলেন।'

—'না না, এটা ঠিক মানাচ্ছে না। তুমি এটা বদলে ফেলো কর্ণা।'

কর্ণা ঘরের ভেতরে ঢোকবামাত্র শ্যামলী বাইরে বেরিয়ে এলো। তার শাড়ি পরা হয়ে গিয়েছিল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনীর মাথায় সিন্দুর লাগিয়ে সিঁথিতে পরছিল। কর্ণা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বললে, 'বিশিতাই—'

—'কিরে?...চুল করে গেলি কেন?' বলে আয়নার ভেতর দিয়েই তার মুখের দিকে তাকাল।

এবার একটু ইতস্তত করে কর্ণা বললে, 'বড়দা এই শাড়িটা বদলাতে বলছেন, এটা নাকি ভাল মানাচ্ছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীর রসনা তীব্র হয়ে ওঠে, 'তোর বুঝি আর তর সইছিল না। সাত তাড়াতাড়ি বড়দার কাছেই বা যেতে গিয়েছিলি কেন?'

ভীতু গলায় কর্ণা বলে, 'আমি জল খেতে গিয়েছিলুম। জানতুম না যে তখনো তার চা খাওয়া শেষ হয়নি। খাবার ঘরে রয়েছেন।'

—'বুঝেছি।' হঠাৎ চট্ করে চিরুনীটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে শ্যামলী পূর্ণেন্দুর কাছে এসে বললে, 'কেন্ শাড়িটা তোমার সুন্দরী ভাদ্দর বৌকে পরলে ভাল মানাবে, দয়া করে দেখিয়ে দেবে এসো।'

এ শাড়িটা কর্ণাকে তার বাপের বাড়ী থেকে পূজোয় দিয়েছিল বলেই শ্যামলী ওটা পরতে বিয়েছিল ষষ্ঠীর দিন।

পূর্ণেন্দু বলে, 'এই দিনের আলোয় ওই জমকালো জরিপাড় শাড়িটা যেন বড্ড চোখে লাগে। খাইয়া মনে হয়!'

—'বেশ, যেটা চোখে লাগে না, সেটা এসে তুমি দয়া করে দেখিয়ে যাও।'

পূর্ণেন্দু এসে ঘরে দাঁড়াতে, তার সামনে একবারা নতুন শাড়ি আলমারি থেকে বার করে খুব করে ফেলে দিল শ্যামলী।

পূর্ণেন্দু ভাঁজগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঠিক যেটা সে কিনে দিয়েছিল বার করে দিলে। 'এইটা পরুক।'

—'ওঃ তাই বলো, তোমার শাড়িটা আজ পরতে হবে ওকে!' শ্যামলীর কণ্ঠে তীক্ষ্ণ শ্লেষ।

পূর্ণেন্দু বলে, 'অনেক লোকজন আসবে, তা ছাড়া ওই শাড়িটা একেবারে নতুন। সকলের চোখেই খুব ভাল লাগবে আমার বিশ্বাস।'

—'বুঝেছি। আর বেশী বলতে হবে না।'

পূর্ণেন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে কেমন যেন সংকোচ বোধ করে কর্ণা। বড়দার এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয় নি। বিশিতাই কি মনে ভাববেন। ছি। অন্তত এত আগ্রহ করে শাড়িটা বড়দা পরতে বলে গেলেন, না পরলে তিনিই বা কি ভাববেন। এ বাড়ীতে বড়দাই সর্বেসর্বা। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলতে পারে না। এটা এই কারণে কর্ণা বুঝেছে।

কিন্তু মুস্কিল হলো, পরের দিন ছেলে যখনই ঠাকুর দেখতে যাবার সময় শাড়ি পরতে যায় কর্ণা, তখন বিশিতাইকে জিজ্ঞেস করে, আজকে কোন্‌টা পরবো বলুন না, শ্যামলী মুখটা গম্ভীর করে বলে আমি কি

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

করে জানবো, তোমার ভাশুরের কোন্‌টা পছন্দ হবে? এতে কর্ণার মনে আঘাত লাগে। সে ভাবে ছেলে-মানুষ ছোট, এর অর্থ যে কি তা বোঝার মত বয়স তার হয়েছে। তাই মুখখানা গম্ভীর করে চুপচাপ বসে থাকে। ভেবে এক সময় তার দু চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

—আমি কি অন্যায় বলেছি? কাঁদছো কেন? জানো তো কেমন মানুষ। তাই সবচেয়ে ভাল হয়, তুমি শাড়িটা তাঁকে দেখিয়ে নিয়ে এসে তারপর পরো।'

আদরে মনের পুর্ণেন্দু। ছল-ছলচোখে তার দিকে না তাকিয়ে কর্ণা বলে, 'আমি কিছু বলতে চাই না। কেউ মনে আসে, স্পষ্ট বলে দেয়। মহাষ্টমীর দিন যখন কোটা বেনারসী পরে হাতে আরতি দেখতে যাচ্ছিল কর্ণা, পুর্ণেন্দু তার মাকে বলেছিল, 'ওকে চমৎকার শাড়িটা মানিয়েছে কর্ণাকে। যেন ফুলের কৌটায় ভরে রেখেছে, না মা?'

মা বুকের ভেতর একটা গভীর নিশ্বাস চেপে নেন। আহা, বেচারীর মনে কত সখ। নিজের বৌয়ের যা ছিরি, তাকে কোন শাড়ি পরলেই মানায় না। তাই একটু থেমে বলেন, 'আসলে বৌমার চেহারাটাই সুন্দর। নইলে ঠাকুর দেখতে এসে ঢের দামী দামী শাড়ি পরে কত মেয়ে আসে; কিন্তু ওর মত এমন সুন্দর দেখায় কজনকে। ষষ্ঠীর দিন তোর সেই গরদের শাড়িটা পরে যখন বসেছিল, আমার আশে-পাশে কিসফিস করে কত মেয়ে ওর প্রশংসা করছিল, ও কি চেহারার মানিয়েছে। যেমন ফিগার তেমনি হালকা রংয়ের ডিজাইন।'

—তাই নাকি!' বলে চেঁচিয়ে ওঠে পুর্ণেন্দু। 'তোমার বড় বৌকে বলো। সেদিন ওই শাড়িটা আনিই তো ওকে দিয়েছিলুম। নইলে শামলী সে শাড়িটা পরবে দিয়েছিল—এত বাজে দেখাচ্ছিল!'

ঠাকুর দেখে ফিরে, ঘরে যখন শাড়ি বদল করছিল, সুরেন্দ্রও কর্ণাকে বলেছিল, 'ওঃ পুর্ণেন্দু শাড়িখানা বড়দা তোমায় দিয়েছে। সারা পুজো মণ্ডপে তোমার মত সুন্দর আর তাকে দেখাচ্ছিল না।'

হাসিভরা চোখ দুটো স্বামীর মুখের ওপর রেখে কর্ণা বলে, 'তাহলে শাড়িটা সুন্দর, না তোমার বৌয়ের চেহারাটা? কোন্‌টা বেশী সুন্দর?'

সুরেন্দ্র শিথিল পড়ে। একটু ভেবে জবাব দেয়, 'আমার মনে হয় শাড়িটা। কেন না বৌদি তো নতুন নতুন কত রকমের শাড়ি পরে, কৈ আজকের মত এত সুন্দর তো ঠেকে না কোনদিন চোখে!'

কর্ণাকে হাসতে দেখে সুরেন্দ্র বলে, 'অবশ্য চেহারাটাও আগে ভাল দরকার, নইলে কি পটলির মাকে ওই শাড়ি পরলে ভাল দেখাবে?'

—যাক, তা হলে আগে চেহারাটা, তারপর শাড়ি, স্বীকার করছো।'

—হ্যাঁ, যেমন আগে বড়দা তোমাকে খুঁজে এনেছে। তারপর তোমার শাড়ি খুঁজেছে। বড়দার পছন্দ আছে, স্বীকার করতেই হবে।'

হেসে জবাব দেয় কর্ণা, 'অস্বীকার কে করছে। তা হলে কি আজ তোমার বদলে বড়দাকে পাঠাবো?' হলে সুরেন্দ্রর গালটা টিপে দিয়ে বলে, 'বড়দার এই মুখ যদি তোমার ভেতর একটু থাকতো—'

—অর্থাৎ আমার কোন পছন্দ নেই, এই বলতে চাও তো?'

—না, তা ঠিক নয়। তবে বড়দার মত নেই, এটাই বলতে চাই।'

হঠাৎ সুরেন্দ্রর মুখটা কেন গম্ভীর দেখায়। নিমেষে সে নীরব হয়ে যায়।

—ওঃ, তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করারও উপায় নেই। অমনি মুখখানা হাঁড়ি হয়ে উঠলো। আচ্ছা, আর কখনো বলবো না। হয়েছে?'

সুরেন্দ্র বলে, 'বাজে কথা বলো না। কোথায় আবার গম্ভীর দেখলে। আমি ভাবছিলুম, তুমি ঠিকই বলছো, বড়দার মত পছন্দ আমার কেন, আমাদের বাপে ভারো নেই। ও যেমন হাসিখুসি ভালবাসে তেমনি দেখায় যা কিছু ভাল, ওর চোখে যেন আসে ধরা পড়ে।'

কর্ণা বলে, 'আসলে উনি যেমন মানুষে মানুষে তেমনি কোন মানুষের ভেতরে যদি কিছু ভাল দেখেন, অমনি তাই নিয়ে খুশিতে ভরে ওঠেন। এতো অল্প সময়ে মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি। তারী ভাল লাগে ওঁকে।'

—তোমার একার ভাল লাগে না, অনেকের লাগে।'

কর্ণা বলে, 'আর মুখে পুর্ণেন্দু, তোমাকে উনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন।'

—এখন কিন্তু তোমাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসেন।'

—সে তোমারই বৌ বলে! পাছে আমার অযত্ন হলে তোমার মনে কষ্ট লাগে, তাই এতটা করেন, আমি বুঝতে পারি তা।'

সুরেন্দ্র বলে, 'আমার মনে হয়, তুমি বড়দাকে ঠিক বুঝতে পারোনি। আসলে তোমাকেই ওঁর খুব পছন্দ।'

—সে-ও তো তোমারই জন্যে!'

—হ্যাঁ, এটা যা বলেছো, খাঁটি কথা।'

স্বামীর মুখ থেকে এ কথা শুনে, অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে কর্ণা। বড় জাকে সে আন্তরিক ভক্তি করে। সব সময় তিনি ছোটা যেন। বলেন, 'আজ তোকে দেখে বুঝতে পারছি আমি সুন্দর দেখতে নই বলে, তোর বড়দা আমি কি খাবো, কি পরবো, কোন্‌ শাড়িটা পরলে ভাল মানায় একদিনও তার মুখ থেকে শুনিনি। তাই ভালবাসার কাছে মাথা খুঁড়ি, এবার ঘরে যেন মুখ নিয়ে জন্মাই।'

সুরেন্দ্র হেসে ওঠে। 'আরে বৌদি ওই বলে তোমায় ঠাট্টা করে, বুঝতে পারো না!'

—ঠাট্টা কিনা জানি না, তবে ওঁর কথা শুনলে যেন বুকের ভেতর চিন্‌চিন্‌ করতে থাকে।'

অফিসের কাজে মাঝে মাঝে পাঁচ-সাত দিনের জন্যে বিলাসীতে যেতে হয় পুর্ণেন্দুকে।

এবার দিল্লী থেকে ফিরে সে দেখে, সুরেন্দ্রর ঘর জিনিসপত্তর বাঁধাছাঁদা, যেন বিদেশ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত সব কিছু। সুটকেস, টাঙ্ক, বিছানা, দুটো নতুন হ্যারিকেন লণ্ঠন, নতুন বালতি, মগ আরো কত কি খুটিনাটি জিনিস সুরেন্দ্রর ঘরের এক কোণে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে।

—এ-সব কি ব্যাপার রে সুরু!'

—আর পারা গেল না ঠেকাতে। মামলা করেছে, নওয়াদা। পরশু দিন হওয়া হতে হবে। হঠাৎ অর্ডার এসেছে। তাই কর্ণার নতুন সংসার পাততে হলে যা কিছু দরকার, সবই বৌদি কিনে কেটে গোছগাছ করে দিয়েছেন। অফিস থেকে বলেছিল, আজই চলে যেতে। কিন্তু আমি বলেছিলুম, দাদা ফিরলে, আমি বাড়ী ছেড়ে যেতে পারবো না। জানতুম যে, তুমি আজ আসবে, তাই কাল বৃহস্পতিবারটা না বেরিয়ে শুক্রবার যাবো ঠিক করেছি।'

—কিন্তু, বলে পুর্ণেন্দু গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর একটু থেমে বলে, 'ওই বিদেশ বিভূঁই জায়গায়, একেবারে কর্ণাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে তুই একলা গিয়ে দেখ আগে, ঘর-বাড়ী কেমন, লোকজন পাওয়া যায় কিনা। বাড়ীর আশেপাশে প্রতিবেশী কি রকম—নওয়াদা শুনেছি খুব নির্জন জায়গা। ফল-ফসল চারদিকে। একা মেয়েমানুষ মেয়েকে নিয়ে সেখানে না যাওয়াই ভাল। নিজে চোখে সব দেখে, ঠিকঠাক করে তারপর এসে নিয়ে যাস্।'

—বেশ তাই হবে। কথাটা তুমি মন্দ বলোনি।' সুরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো।

শামলী বলে উঠলো, 'কিন্তু ওই বিদেশে একা ঠাকুরপোর খাওয়া-দাওয়ার কত অসুবিধা হবে, সেটা তো আগে ভেবে দেখা উচিত।'

—আহা, ও ব্যাটাছেলে, না হয় দু-চার দিন একটু কষ্ট করবে। কিন্তু ওই ছোট মেয়েটাকে নিয়ে একেবারে অজানা, অপরিচিত জায়গায় গেলে যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে, তখন কে কাকে দেখবে। কি বলো বা?'

—হ্যাঁ, তা যা বলেছিস, মিথ্যে নয়। অল্প বয়সী মেয়ে, তার দেখতে শুনতে ভাল, তার মনে কি আছে, কে বলতে পারে। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ!'

শামলী রাগে গর গর করতে থাকে। আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়। সুন্দরী বৌ নিয়ে আর কেউ বিদেশে চাকরী করতে যায় না —ওঁর ভাই একা যাচ্ছেন!

স্বামীকে মুখে সে কথা বলার সাহস নেই। শুধু মনে মনে তার মুণ্ডপাত। সবচেয়ে রাগ হয় তার কর্ণার ওপর। তাকে পুর্ণেন্দু কত ভালবাসে তা সে জানে, সে একবারও মুখে 'না' করলো না। এমন সুন্দর বড়দাকে ছেড়ে তারও ওই জংলী জায়গায় যাবার ইচ্ছে যে নেই, সেটা হলফনামা করে নিয়ে শামলী মনে মনে গজরায়।

সুরেন্দ্র চলে যাবার পর, একদিন কর্ণাকে একা চুপ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুর্ণেন্দু বলে, 'কি মন কেমন করছে তো সুরুর জন্যে! আর ভাবছো, এ লোকটা কি খারাপ, না?'

—ছি ছি, এ কথা আমি ভাবতে যাবো কেন?'

পুর্ণেন্দু বলে, 'আমি সব বুঝি। সুরু চলে যাবার পর থেকে, সব সময়ই তোমার মুখটা যেন গম্ভীর।'

কথাটা শামলীর কানে গিয়েছিল। ও তখন তাড়ার থেকে চিনির কৌটা নিয়ে যাবার জন্যে চায়ের উদ্যোগ করতে যাচ্ছিল। একটু থেমে শামলীকে উদ্দেশ করে বলে, 'তোমার যেমন কাণ্ড, বেশ দুটিতে নিরিবিলি কেমার সংসার পাতবে, তা নয়, দিলে সব ভণ্ডুল করে।'

—হুট করে একটা নতুন জায়গায় গেলে কত যে অসুবিধা তা তোমরা বোঝো না। তার চেয়ে বেশ গোছ-গাছ করে, সব দিক গুছিয়ে নিয়ে যখন সংসার করতে যাবে, অনেক বেশী আনন্দ পাবে তাতে, দেখে নিয়ো।' বলে কর্ণার দিকে চেয়ে হাসে পুর্ণেন্দু।

শামলী বলে ওঠে, 'থাক্‌ না একটু অসুবিধে—আনন্দ তো তাতেই বেশী। এখান থেকে গোছানো সংসারটা উঠিয়ে নিয়ে, আর এক জায়গায় পাতার চেয়ে তাতে আনন্দ অনেক বেশী। এমন সে রকমের আনন্দ কদাচিৎ মেলে।'

—'ও সেইজন্যে কর্ণা আমার ওপর

ছেলেমানুষ, বুঝতে পারিনি।'

—'বাহ্, আমি আপনার ওপর চটেছি, কে বলল!' হেসে কর্ণা শ্যামলীকে বলে, 'দেখলেন তো বিধি বড়না আমার ভুল বুঝেছেন।'

—'বুঝুন তো। সব ব্যাপারে ওঁর মাথা ঘামানো চাই। বাঁধাবাঁধা সব যখন ঠিকঠাক—আচ্ছা বাবা যাচ্ছে যাক্ না। তিনের ঘরে বেবেকে আমীর সঙ্গে যাচ্ছে, কষ্ট হয় হবে, সে কষ্ট ওরা দুজনে হাসিমুখে সহ্য করবে। সে কষ্টের চেয়ে ও এখানে একা থাকার কষ্ট যে আরো বেশী, সেটা তোমার বড়দার মাথায় ঢোকে না।'

—'কর্ণা, সত্যি কিনা তোমার বিধিতাই বা বলছেন? যাও, চুপ করে থেকো মা।'

কর্ণা উত্তর দেবার আগেই শ্যামলী বলে, 'হ্যাঁ, তোমার কাছে ফিরে ও বলবে যে ওর ঘরের জন্যে মন কেমন করছে, না? ঠাকুরপোর উপোসটাও বন্ধ করে দেন নিয়ে গেল। সেদিন তোমার কথায় ওপর কথনো কথা বলেনি, তাই মুখে হাসি এনে চলে গেছে।'

বাস্তবিক পূর্ণেন্দু এত দূর ভেবে দেখেনি। তাই শ্যামলীর কথা শুনে একটু চুপ করে থেকে কর্ণাকে বলল, 'সত্যি! আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু সুবুটো এমন রাক্ষুসে, আমার কাছে টেপে ফেল কেন? আচ্ছা, এতদিন যখন গেল, আর একটা সপ্তাহ পরেই তো সে আসছে তোমায় নিয়ে যাবে বলে।'

কর্ণা এবার বলল, না, বোধ হয় ছুটি পাবে না। আরো একটা মাস অপেক্ষা করতে হবে, লিখেছে। কার নাকি মা মারা গেছে, এক মাসের ছুটি নিয়ে গেলে চলে গেছে।'

—'ও, সেইজন্যে তোমার বুঝি মুখটা এত ভার। আচ্ছা, সে ছুটি না পাক, আমি ছুটি নিয়ে তোমায় নিয়ে আসবো। তাকে আজ চিঠি লিখে দিয়ো।'

পূর্ণেন্দু অফিস থেকে ছুটি নিয়ে কর্ণাকে নওয়াপাড়ায় রাখতে গেল। এবং সুবেন্দু তার স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সব কিছু ব্যবস্থা ভাল করেছে, দেখে খুশি মনে ফিরে এলো।

মায়ের কাছে সব বলতে, তিনি জবাব দিলেন, 'তুই মিথ্যিমিথ্যি চিন্তা করিস। আমি জানতুম, বৌমা ছেলে-মানুষ, তার জন্যে ভাবনা চিন্তা কি সুবুর কম!'

শ্যামলী ছাদের কাপড়টা টেনে নেমে নামিয়ে বলল, 'সব আগে আপনার ছেলের এই বাড়াবাড়ি কেন জানো? লোকে কি ভাবে বলুন তো মা?'

মুখে হাসি টেনে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে তিনি বলেন, 'লোকে জানে, সুবুকে ও কি রকম ভালবাসে। তাই বৌমাকে নিয়ে কোন বিপদে না পড়ে, সব সময় সেটাই ঘোরে ওর মাথায়।'

মায়ের কথাটা যে কতখানি সত্য, কিছুদিন পরেই তার প্রমাণ পায় শ্যামলী। বিলাসীতে অফিসের কাজে গিয়ে ফেরার সময় দুটো তিনটে দিন পূর্ণেন্দু নওয়াপাড়ায় থেকে এলো।

পূর্ণেন্দু ফিরলে শ্যামলী বলল, 'এত দেরী করলে যে এবার, অফিসের কাজ বুঝি বেশী ছিল?'

—'আরে না না। বরং এবার তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গিয়েছিল। আমি যে সুবুর ওখানে গিয়েছিলুম। কি সুখের দুঃখিয়ে ওরা সবোর করছে। কর্ণা যে এত এফিসার্ট, তুমি চোখে না দেখলে বুঝতে পারবে না। কিছুতেই আমায় আসতে দেবে না ওরা দুজনেই। সুবু যা বলে, তার ওপর মুখ নেই কথা।'

—'তা যাবার সময় একটু বলে যেতেই পারতে যে, কর্ণাকে দেখতে যাবে। আমরা এখানে ভেবে মরছি, কোন খবর নেই। কখনো তোমার এত দেরী হয় না কিরতে তো?'

—'আরে আগে কি জানি আমিই জানতুম ওখানে যাবো। হঠাৎ অফিসের কাজটা দুদিনেই চুকে গেল যখন, মনে করলুম ঘুরেই যাই দুটো দিন ওখান থেকে।'

—'কিন্তু কোথায় কিসী আর কোথায় নওয়াপাড়া। তুমিই তো বলেছিলে, অনেক কাণ্ড করে যেতে হয়। যহা ঝামেলা।'

—'হ্যাঁ তা বটে।' তারপর সে প্রসঙ্গটা অন্য দিকে নিয়ে যায়। তাসিস দিয়েছিলুম, সুবুর আবার নাইট ডিউটি পড়েছে এই সময়। ওদের স্টেশনের একজন ঘুমি, তার বৌ এসে রাতে বাড়ী পাহারা দেয়। কর্ণার তো ভয় রাতে ভাল ঘুম হয় না। বাসে নাকি একটা হপ্তা নাইট ডিউটি দিতে হয় সুবুকে। সেইজন্যেই আরো আমাকে ছাড়তে চায় না। সুবু বলে, বাবা আর চারটে দিন তুমি থেকে যাও, তা হলেই নাইট ডিউটিটা শেষ। 'অলরাইট।' বলেই হঠাৎ চোখ দুটো আনন্দে যেন জ্বলে ওঠে পূর্ণেন্দুর। 'এ কি দুঃখ ছেলেমুখ সেখানে কি বলবো। কি সুখের স্নান! কর্ণা নিজে হেঁটে-মানের বাড়ী থেকে দুধটুকু নিয়ে আসে। আর তেমনি সস্তা দুধটা। ইয়া বড় বড় চিকেন, দেড় টাকা, পাঁচ সিকে। কেন চেহারা হয়েছে কর্ণার। যেমন রঙ ফুটেছে, তেমনি মোটাও হয়েছে। তবুও তোমাকে কিছুদিনের জন্যে ওখানে পাঠিয়ে দেবো।'

—'থাক, আমার জন্যে আর এত না ভাবলেও চলবে। আমার দেহে যা চর্বি আছে, আর তার ওপর বাড়াবার প্রয়োজন নেই।' বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় শ্যামলী।

ছবিমালা ঘোষ : আধুনিক ও লোকসংগীত

এবার মায়ের ঘরে গিয়ে আরো উচ্ছ্বাস করে পূর্ণেন্দু। বলে, কি সুন্দর দেখতে হয়েছে কর্ণাকে মা কি বলবো।'

মা স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলেন, তাতো হবেই। একে ওর চেহারা ভাল, তার বিদেশের জল-হাওয়া। খাবার-দাবার সস্তা কতদিন যখন এ হবেই তো?

—'হ্যাঁ, মা। কেন আছে ওরা দুটিতে।'

—'থাক্, নিজের চোখে তো দেখে এলি, এখন নিশ্চিন্ত তো?'

—'হ্যাঁ, কর্ণা যে এত কাজের মেয়ে জানতুম না।'

—'এখানে আর কাজ করলো কোথায়, যে দেখবি। আমরা তো নতুন বৌ বলে ওকে কিছু করতে দিতুম না।'

এর পর থেকে যখনই পূর্ণেন্দু কিসীতে ফেরা অফিসের কাজে, ফেরার পথে একবার নওয়াপাড়া হয়ে আসতো। কখনো দুদিন, কখনো একদিন, কখনো বা একটা বেলার মত সময় হাতে থাকলেও নিশ্চয়ই যেতো, কখনো ভুল হতো না। শ্যামলী এর জন্যে মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে তা প্রকাশ করতো না।

(৪)

বছর খানেক পর একদিন কিসী থেকে ফেরার পথে হঠাৎ কর্ণাকে সঙ্গে করে পূর্ণেন্দুকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়।

মা জিজ্ঞেস করেন, বৌমার খুব বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছিল, তাই নিয়ে এলি? ছেলে-মানুষ, অনেকদিন হলো বিয়েতে, তা হতেই পারে।'

—'না মা। সুবুটো এমন রাক্ষুসে যে কর্ণা ছমাস অন্তঃসত্ত্বা, এ কথাটা একবারও বলেনি। ওই জলো জায়গায় আর ফেলে রাখা উচিত? তাই নিয়ে এলুম। এখনই ওকে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্যামলীর মত ভুল যেন আর না হয়।'

শ্যামলী সন্তানসম্ভবা হলে, ওকে ডাক্তারদের ওর বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ণেন্দুর মা। সেখানে একটি মৃত সন্তান প্রসব করার সময় শ্যামলীর প্রাণ কোন রকমে রক্ষা পায়। কিন্তু ভবিষ্যতে কখনো আর জননী হতে পারবে না, ডাক্তাররা সে কথা বলে দিয়েছিলেন। সেই থেকে একটা আতঙ্ক পূর্ণেন্দুর মনে। তাই সুবুর জীবনে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেইজন্যে আগে থেকে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে কর্ণার চিকিৎসার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করে না।

অফিস থেকে ফিরে সেদিন পূর্ণেন্দু শুনলো, কর্ণা একটি সুন্দর সবল পুত্রসন্তান প্রসব করেছে, সেদিন ওর আনন্দ আর ধরে না। হাসপাতালে! কতক্ষণে তার মুখ দেখবে, অধৈর্য হয়ে পড়ে। সারারাত তার চোখে ঘুম আসে না। পরদিন বেলা চারটের সময় শুনে 'ভিজিটারদের দেখতে দেবে। সময় যেন কাটতে চায় না। ছটফট করতে থাকে তার মনটা ভাইপোকে দেখার জন্যে।

অফিসে ফেরতই সহকর্মীরা বলে, কৈ সন্দেশ কৈ, খুশনুমে আপনার ভাইপো হয়েছে!

—হ্যাঁ ভাই, নিশ্চয়ই সন্দেশ খাবে।'

সন্দেশ মনের পরিচয় টাকার সন্দেশ আনিয়ে সকলকে মিষ্টিমুখ করায় পূর্ণেন্দু। সুখেনকে ওদিকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিল, এখনি এসে একবার ছেলের মুখ দেখে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু ভাইয়ের কাছ থেকে টেলিগ্রামের জবাবে পেয়ে তাকে চটে উঠলো। সে লিখেছে, ছুটি পাওয়া যাবে না, কেউ পাবে না।

—আরে যাবা, যা হোক একটা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে, মায়ের মুখ অন্তত, বলে চলে আয়। নিজের ছেলে চোখে দেখে যা! তা নয়, অফিসে ছুটি পাবো না! একেবারে মুখ্যু!'

শ্যামলী বলে, 'তা ছুটি না পেলে কি করবে! আজ না হয় দুদিন পরে এসে দেখবে। তখন বড় ছেলে আরো দুষ্টুমুষ্টু হবে, চোখে জারো ভালো লাগবে! মিছিমিছি ঠাকুরপোকে গাল দিচ্ছ কেন? সে তো ঠিকই লিখেছে।'

বাপের চোখে প্রথম সন্তানের মুখ দেখার যে কি আনন্দ, শ্যামলীকে তা বোঝাতে পারবে না পূর্ণেন্দু। তাই বুকের ভেতর একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নেয়। ওর নিজের মৃত সন্তানটির মুখ হঠাৎ যেন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হ্যাঁ, সেও পুত্রসন্তান ছিল। তবে মৃত! ও যে নিজের সেই লোকটা ফুলতে চায়, ছোট ভাইয়ের মুখে আনন্দের দীপ্তি দেখে, তা কি বলে বোঝাবে শ্যামলীকে! পূর্ণেন্দুর এই অন্তর্দাহকে, এই অন্তর্যাতনাকে তাই বাড়াবাড়ি মনে করে তার স্ত্রী।

হাসপাতালে গিয়ে একটা ঝিনি দিয়ে প্রথম মুখ দেখে পূর্ণেন্দু নবজাতকের। কপাল কুঞ্চিত দুটি চোখ নিমেষে যেন আনন্দের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ওর শয্যার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শাশুড়ী। কথা জিজ্ঞেস করে, মা এঁরা কেন ওকনা দিলেন এখানে?'

—'ওমা! এ জানো না? অবশ্য আসলই প্রথম কোলা দিয়ে ছেলের মুখ দেখা নিয়ম। কিন্তু সুখু কোথায়? সে কবে ছুটি পাবে, তার ঠিক নেই। তাই তার কাজ ছোটো করছে! বাপের এসেছে! ছোটোই বাপের প্রথম সন্তান! তার সোনার দুষ্টি দেখে যেন সংসারে সুখ ঐশ্বর্য, ধন-দৌলত, উথলে ওঠে।'

পূর্ণেন্দুর মনটা যেন উদাস হয়ে যায়। বলে, মা ওর নাম থাক আনন্দ। ও আমাদের আনন্দকুমার। সত্যি-কারের আনন্দ ও এনেছে আজ আমাদের ঘরে। কথা কি বলো? এ নাম তোমার পছন্দ নয়?'

নবজাতকের দীপ্তি ভরা মুখখানি তুলে পূর্ণেন্দুর দিকে তাকিয়ে সে বলে, এর চেয়ে সুন্দর নাম আর কি হতে পারে!'

—তা হলে তোমার খুব পছন্দ বৌ? আমি আগেই চিঠি লিখে দিচ্ছি, আমরা ওর নাম রেখেছি আনন্দকুমার।'

নিজের কথার মুখের রেখাগুলো যেন স্পষ্ট দেখায়। বলে, 'কিন্তু মিনিটাই যদি এ নাম পছন্দ না করে, অন্য কোন নাম দেন।'

পূর্ণেন্দুর আগ্রহ যেন আরো বেড়ে যায়। বলে, 'ঠিক না অন্য নাম। যার যা খুশি নামে ডাকুক। স্কুলে যেন না রাবণকুমার গত নাম।' বলে জোরে হেসে ওঠে।

বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়স্বজন যত রকমের লোকজনকে, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে দুহাতে খরচ করে পূর্ণেন্দু। শ্যামলী শাশুড়ীর ওপরে গজগজ করে, 'আপনার ছেলের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। কৈ সব বাড়ীতেই তো হচ্ছে, কে এত হেঙ্গে করে। লোকে জানতেই পারে না। বড়জোর কর্তাপুজোর একটা চুপড়ী বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে যায়।'

শাশুড়ীর গলা ভারী হয়ে আসে। বলেন, 'বাছা, ভগবান তো আর কোনদিন ওর নিজের সব ছেলেকে না। ওকে নিজেই সব করো। আনন্দ যত পারে করুক বৌমা। ওর মুখের দিকে চাইলে, কেন বুকের ভেতরটা আমার দু দু করে। কি পোড়া রোগ তোমার দেহে ঢুকলো মা!'

শ্যামলীর এটাই সবচেয়ে বড় কষ্টদায়ক। তার হঠাৎ একেবারে নিষ্কলুষ হয়ে যায়। তাকে দিয়ে কেন সব ছেলেরা না বলে, কথাকে দিয়ে এত আনন্দ উৎসব যেন সে সহ্য করতে পারে না। বুকের ভেতর যেন তার হাঁচড়ে পাঁচড়ে পড়তে থাকে।

আনন্দর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পূর্ণেন্দু যে বিরাট আয়োজন করেছিল তা দেখে আত্মীয়-স্বজন এমন কি পাড়া-প্রতিবেশীরা পর্যন্ত অবাক। বিয়ে বাড়ীর মত আলাদা বাড়ী ভাড়া করে ফুল লতা পাতা দিয়ে সাজবে, ভোজন তৈরী করে, সানাই বাজবে, পাঁচশো লোক নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো। বড়লোকের বাড়ীর মেয়ের বিয়েতে যেমন ব্যবস্থা হয়, ঠিক তেমনি। আয়োজনের যেন ত্রুটি নেই। বন্ধুরা আপনজন সবাই। সকলের মুখে তাই পূর্ণেন্দুর প্রশংসা। খাওয়া-খাওয়া শেষ করে, সবাই পূর্ণেন্দুকে বলে, 'বড়দা চলুন বাচ্চাকে দেখে আসি।'

ফলমূল নিয়ে পূর্ণেন্দু ওপরে যায়। আবার নেমে আসে। আবার যায়। তাদের খেলনা, পুতুল উপহারে ঘর ভরে ওঠে। যে যাদের শিশু কোনটা মুষ্টি করে ধরে, কোনটা ফেলে দেয়।

—বা। সুন্দর ছেলে হয়েছে।' আনন্দর গাল টিপে আশীর্বাদ করতে করতে বড়দার মুখের দিকে তারা তাকায়। তাদের মুখের প্রশংসায় পূর্ণেন্দুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ছেলের বাপ যে সুখেন্দু, সে একা পাশে দাঁড়িয়ে থাকে কর্তার মত। তাকে যেন কেউ চেনে না। সবার মুখেই বড়দা, আর বড়দা। দাদা যে সকলের কত প্রিয়, তাকে যে সকলে ভালবাসে, চোখের সামনে, তা প্রত্যক্ষ করে সুখেন্দুও মনে মনে গর্ব অনুভব করে। বাবার ছেলের সুখ্যাতি শুনে ওর মনে আনন্দ হয়, তবু সুখেন্দু ভাবে, এ সবের মূলে তো দাদা। এ খ্যাতি সবটুকু প্রাপ্য তার। এত খরচ করে, এই বিরাট আয়োজন করার ক্ষমতা তার নেই। এবং কোনকালে হবেও না। দাদা যে আনন্দকে কি চোখে দেখে, কত ভালবাসে, এই তার প্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দুপিতে কলমল করে কর্তাও। সে গর্বিতের মেয়ে। তার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যে এ রকম বিরাট আয়োজন কখনও সম্ভব তা সে কল্পনাও করতে পারে না। মেয়েরা এসে ওর কোল থেকে আনন্দকে নিয়ে, গাল টিপে চুমু খেয়ে বলে, 'কেমন সুন্দর নাম, তেমনি দেখতে হয়েছে খোকাকে। আশীর্বাদ কর মায়ের কোল জুড়ে থাকুক, দীর্ঘজীবী হোক্।'

ওরি মধ্যে দাঁড়া প্রবীণা, বাচ্চার মুখের ওপরে ঝুঁকি, দুষ্টি ছেলে বলেন, 'কার মত দেখতে হয়েছে বৌমা? বাপের মুখের আদল পেয়েছে না?'

পাশ থেকে আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'না, একেবারে মুখুজ্জে মোটার মুখ। এখন ছোট বলে ঠিক এতটা বোঝা যায় না, একটু বড় হলেই দেখো আমার কথা সত্যি হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলেন, 'আমার মত অনেকে যেন পায় বাবা, অমন এদের মানুষ হয় না।'

শ্যামলী ঘরের ঘরে উপহারগুলো গুছিয়ে রাখছিল। ছেলের মত দেখতে হয়েছে কথাটা তার কানে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দর দিকে মুখটা ফিরিয়ে একবার এক নজরে দেখে নেয়। না, ঠাকুরপোর মুখের সঙ্গে অনেক মিল। শ্যামলীর মনে হয় লোকগুলোর ওপর যারা তার স্বামীর মন রাখার জন্যে ওই ভাবে তার তোষামোদ করে। কিছু বোঝে না, কচ্ করে একটা মন্তব্য করে বসে! বাস্তবিক এ কথাটা শুনলে, ঠাকুরপোর মনে যে প্রতিক্রিয়া হতে পারে, একবারও তা ওরা ভেবে দেখে না।

আড় চোখে একবার সুখেন্দুর মুখের দিকে তাকায় শ্যামলী। দেখে বিশ্রি হাসিভরা মুখ, পুত্রগর্বে উজ্জ্বল।

শ্যামলী কিন্তু ওরি মধ্যে থেকে একবার আনন্দকে কোলে নিয়ে পাশের ঘরে যেখানে ওর মা ঘুম করছিলেন, সেখানে গিয়ে বলে, মা, তুমি একটা খোকনকে কার মত দেখতে হয়েছে?'

মা এই প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত কয়েক ভেবে বলেন, তোর কি মনে হয়?'

মুখে হাসি টেনে শ্যামলী বলে, 'অনেকে বলছে তোমার জামাইয়ের মত নাকি মুখের ভাব। আমার তো মনে হয়, ঠোঁটের ডগাটা, চোখের চাউনি সবটাই ও বাপের মত পেয়েছে।'

—'এত ছেলের সঠিক বলা যায় না। তবে তোর কথাই ঠিক।'

হুড়েটে যায় ঘর থেকে বেরিয়ে যায় শ্যামলী। তারপর কর্তাকে বলে, 'এই ছোট, খোকনের তো খুব খাওয়ার সময় হয়ে গেল। বড় ভুলে হয়ে গেছে যে। আহা, সব তো কত কিছু পেয়েছে। ছেলের সুখ্যাতি শুনতে শুনতে, দুটি মা হয়ে ওর খাবার কথাটাই ভুলে বসে রইলি।'

কর্তা বলে, 'আমি জানি তুমি বাইরে দিয়েছো দিদিভাই। আমি আর কবে ওকে খাওয়াই।'

—'ও মা, তাই নাকি! বেশ আছিস্ ভাই তুই। একখানা জা পেয়েছিস্, ভাগ্য করে।' একজন বলে ওঠে।

—হ্যাঁ, আমাকে ও 'বিন মাইনের নার্স' বলেছে।' বলে শ্যামলী হেসে ফেলে। 'ওর খাওয়ানো খাওয়ানো থেকে, রাত্রে শোওয়াটা পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপিয়ে উনি মুখু নাম ঐর মা বসে আছেন। আমি সবাইকে কথাটা তাহলে বলে দিই।'

—'আমে তুমি ওর বড় মা, তারপর আমি' বলে কর্তা হেসে ওঠে।

আসলে পূর্ণেন্দু এবং ওর মা দুজনেরই ইচ্ছা শ্যামলীই ওকে মানুষ করুক। ও তো কোনদিন মা হতে পারবে না। এই বাচ্চাটাকে নিয়ে যাতে ভুলে থাকে, সান্ত্বনা পায়।

কর্ণাও বিশিতাইয়ের কাছে ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। একটা শিশু মানুষ করার ঝক্কি তো কম নয়।

(৩)

ছেলে বড় হতে থাকে, শ্যামলী দেখে তার মুখে চোখের রেখাগুলো যেন একটু একটু করে বদলাতে থাকে। যখন সেই বছরে পা দিলো আনন্দ, তখন যে তাকে দেখে, সে-ই বলে, মুখটা একেবারে ছোট্টার মত হয়েছে।

পরিচিত কেউ হলে, তখনই শুনিয়ে দেয় শ্যামলী, 'আহা কথার কি ছিরি! বন্ধুর ধারা পেয়েছে, খুড়ো ভোম্বলের মত হবে না তো কি!'

সেদিন পুর্ণেন্দুর সঙ্গে শ্যামলী বাপের বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছিল ট্রেনে করে। আনন্দ কাঁদছিল বলে ওকেও সঙ্গে নিয়েছিল। দুটো দিন থাকবে বৈ তো নয়।

ট্রেনে একবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় আনন্দ, আবার ছুটে আসে শ্যামলীর কাছে। বাইরে মাঠ ঘাট দেখলে, ওর আঁচল ধরে টানে। বলে, 'দেখবে চলো বড়মা।'

পুর্ণেন্দু ওকে জানলার কাছে আগলে নিয়ে বসে থাকে। কিন্তু তবু সামলাতে পারে না।

শ্যামলীর পাশের এক ভদ্রমহিলা বলেছিলেন। আনন্দর গালটা টিপে আদর করে বলেছিলেন, 'ভারী মিষ্টি ছেলেটি হয়েছে আপনার। একেবারে বাপের মুখ পেয়েছে। দেখবেন, খুব ভাগ্যবান্ হবে এই ছেলে!'

শ্যামলী হিম হেসে বলে, 'আমার ছেলে নয়, ভেওরলো। আমাকেই মা বলে জানে।'

—'আশ্চর্য একেবারে বুবহু ছোট্টার মত দেখতে হয়েছে!'

স্তব্ধ হয়ে যায় শ্যামলী। সবাই এক কথা বলে কেন? একেবারে বুবহু, ওর স্বামীর মুখখানা পেয়েছে! সেটা কি করে সম্ভব! অথচ এ ভদ্রমহিলা সম্পূর্ণ অচেনা অজানা স্রোতা। একে দেখেই বা কেমন করে বুঝলো সে কথা!

আবার মনে কিন্তু করে আসে সেই সব কথা...কথা...ভাইয়ের সঙ্গে নওডাঙ্গায় থিয়ে থাকা—রাতের পর রাত কাটানো—তা হলে কি! না না...

আনন্দ ছুটে এসে তার আঁচল ধরে টানে, 'বড়মা, দেখবে এসো। একটা এত বড় ঘরের গাড়ী।'

চমকে ফিরে ওঠে শ্যামলী, 'যাও বিরক্ত করো না।'

—'ওমা বকছো কেন? ছেলে-মানুষ, ওর মেটা ভাল লাগে তোমাকে না দেখানো পর্যন্ত ওর মনে শান্তি নেই, জানো তো?' পুর্ণেন্দু বলে।

—'জেনে হয়েছে! এতো সোহাগে আর কাজ নেই। চলে যা তুই আমার কাছ থেকে।'

এবার জোর করে ঠেলে ফেলে আনন্দ।

পুর্ণেন্দু এসে ওকে কোলে করে নিজের কাছে নিয়ে যায়। হঠাৎ শ্যামলী কেন ওর ওপর এত ক্ষেপে গেল বুঝতে পারে না। কোনদিন তো এইভাবে বকতে দেখেনি তাকে!

বাড়ীতে ফিরে এসে শ্যামলী সেদিন দুপুরে আনন্দকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বলে, 'এবার থেকে তুই আমার জোঠি বলে ডাকবি, বুঝলি। বড়মা বললে, বকবো। তোকে একেবারে আদর করবো না। তোর কাছে শোবো না। কেমন?'

আনন্দ বলে, 'আচ্ছা।'

—'কি বলবি, তা হলে আমাকে, বল্?'

—'জ্ব—ঠি—'

—'হ্যাঁ। তা হলে খুব ভালবাসবো।'

—'বড়মা বলবে, ভালবাসবে না, কেন?' অবোধ শিশু আর ধার ধরে চলন করে।

—'তা জানি না। চুপ করে ঘুমো। যা বলছি মনে রাখবি, কেমন?' ধমক দিয়ে ওঠে শ্যামলী।

—'হ্যাঁ। জে—ঠি—বলবো।'

সেদিন দুপুরে হঠাৎ পুর্ণেন্দুদের বাড়ীর দোরে একটা টেক্সি এসে থামলো।

শ্যামলী ও কর্ণা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বলে ওঠে, 'আরে বাবলুদের ছোট মামীমা এসেছেন।' তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর ঘর থিয়ে কর্ণা বলে, 'মা, মা, দেখবেন আসুন, কে এসেছে!'

ততক্ষণে শ্যামলী সদর দরজা খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওর পিছনে পিছনে কর্ণা তার শাশুড়ীকে নিয়ে এসে হাজির হয়।

—'ওমা মিনু তুই যে হঠাৎ, এ সময়? কোন চিঠিপত্তর তো পাইনি তোর!'

—'পাঠাইনি বাছি দিদি। তোমার ব্রাঞ্চিপতি অফিসের কাজে চলে গেছে আজ পাঁচ দিন। আমাকে আজকের ট্রেনে যেতে বলে গেছে। কাল সকালে উনি শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে অপেক্ষা করবেন আমার জন্যে। টিকিট রিজার্ভ সবই করে দিয়ে গেছেন। উনি তো শেলন-এ গেছেন। অফিস থেকে টিকিট কেটে দিয়েছে। আসবার সময় আর উনি শেলন-এ না ফিরে, সেই ভাড়ার আমরা দুজনে এক সঙ্গে ট্রেনে আসতে পারবো বলে কিনতে দিলেন আমাকে বেড়াতে যাচ্ছি। বাচ্চিলিঙটা দেখার সখ আমার অনেক দিনের, কিন্তু সুযোগ আর হয় না।'

—'তা বেশ করেছিস। পরের ওপর দিয়ে যদি সবটা হয়ে যায়—'

সোফাসেটে আনন্দর ঘুম ভেঙে যায়। ঘরের ভিতরে সবাই মিলে কখন কুলল প্রসঙ্গটি নিয়ে বসল, সে চুপি চুপি উঠে এসে দাঁড়ায় সেখানে।

—'ও মা, এ কে লো—সোনা ছেলেটা—এসো, এসো বলে আনন্দকে কোলে নিতে গেলে সে ছুটেটা পালিয়ে যায় অপরিচিতাকে দেখে। তখন তিনি বলে ওঠেন, 'দিদি, একেবারে বড়খোকার মুখটা যেন কে কেটে বসিয়ে দিয়েছে! আশ্চর্য, এ রকম মিল! বড়খোকা এই বয়সে ঠিক এই রকমটি দেখতে ছিল, না দিদি?'

—'তোর এখনো মনে আছে সে কথা।' পুর্ণেন্দুর মা বলেন।

—'ওমা, তোমার শরীর খারাপ বলে ওকে নিয়ে তুমি আমার বাপ-পুরের বাসায় কর্তদিন ছিলে, মনে নেই? তখন বড়খোকাকে দেখতে ঠিক এমনটি ছিল।'

এক কথা সকলের মুখে। শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে যায় শ্যামলীর। আনন্দকে দেখতে সুন্দর হয়েছে বললেই তো চুকে যায়! তা নয়, ঠিক বাপ মত মুখখানা, তার বাবা না করে, আত্মীয়টা জাহির করা, একেবারে তার মুখেমদ দিয়ে।

পরদিন দুপুরে সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমোচ্ছে। শ্যামলী চুপি চুপি শাশুড়ীর ঘরে ঢুকে দেওয়ালে ঝুলানো একটা পুরনো ফটোর ফ্রেম কি খুঁজতে থাকে।

ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বুবহুর বাচ্চা পুর্ণেন্দু।

ছবিটে পুর্ণেন্দুর সেই ছাঁচ, মুখখানা যার ঘরে খুঁটির মেঘে শ্যামলী।

তারপর নিজের ঘরে এসে আনন্দর ঘুমন্ত মুখটা দেখেই যেন শিউরে ওঠে। বুকের ভেতরটা টিপটিপ্ করতে থাকে। একি! মামীমা তো ঠিকই বলেছেন। পুর্ণেন্দুর বড় বয়সের চেহারার সঙ্গে আনন্দর মুখের অদ্ভুত মিল! এই প্রথম নিজে চোখে যেন তা প্রত্যক্ষ করলো শ্যামলী। আগে যখন লোকে বলতো, তখন আনন্দর মুখের দিকে তাকালে ঐকুকেশের মুখখানাকেই মনে মনে পড়তো; তারপর যেমনটা ছোট্টার কিছু সাদৃশ্য। কিন্তু আজ যেন সবটাই একেবারে উল্টে গেল। বড় তাকায়, তত যেন বেশী করে আনন্দর মুখে পুর্ণেন্দুর সেই ছবিটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কখনো আনন্দর এই মুখের মুখখানাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে চুমু খেয়েছে। কিন্তু আজ যেন তাকাতে ইচ্ছা করে না। তার কাছ থেকে তফাতে সরে গিয়ে শিহরন কিছু শুধু থাকে। মুখ ফিরিয়েই আনতে চায় না। শুধু এক চিন্তা। ছোট্টার সঙ্গে ছাঁচলোর এত সাদৃশ্য কোথা থেকে এল!

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ আনন্দর গলা থেকে এক বিকট চীৎকার শুনে পুর্ণেন্দু লাফ দিয়ে উঠে আলোটা জ্বালতেই আঁকে ওঠে তারা। দেখে শ্যামলী ঘুমুচ্ছে, কিন্তু তার হাত দুটো আনন্দর গলাটা টিপে ধরেছে একেবারে যে, এখনি বুঝি দম আটকে যায় বাচ্চার...

—'এই—এই—শ্যামলী...কি করছো —ছাড়ো—ছাড়ো শিগ্‌গির...' বলে জোর করে পুর্ণেন্দু তার হাত দুটো সরিয়ে দিতেই ধড়মড় করে উঠে বসে শ্যামলী। 'কি বিশ্রিরি স্বপ্ন দেখছিলুম গো! আহা, বাছাকে কোথায় দেখেছে...'

—'ছি ছি, এমনি একটা কাণ্ড হয়ে যেতো বলতো? আশ্চর্য, আমার মুখটা ছেড়েছিল!' পুর্ণেন্দুর মুখটা তখনো ফরসা করে কাঁপছে।

—'আহা সোনা আমার, গোপাল আমার—' বলে আনন্দর দুই গালে, বুকে, পলায়, ঘাড়ে মহ চুমু খায় শ্যামলী তত তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। ধরা-ধরা গলায় সে বলে, 'আমি তোর বড়মা নই, জোঠি নইরে, আমি রাক্কসী—'

—'রাতদুপুরে কি যা-তা বকছো! তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি! তারপর ও বড় হলে ওর মার কাছে এই সব বলবে, তখন ওরা কি মনে করবে?'

—'সে কি বিশ্বাস করবে, তুমি কি বলো?'

শ্যামলীর গলার আওয়াজটা যেন কেমন চড়া ও বিকৃত ঠেকে পুর্ণেন্দুর কানে। সে বলে, তোমার মত তার তো মাথা খারাপ হয়নি যে ওই শিশুর কথায় বিশ্বাস করবে!'

—'কি খারাপ অপন দেখলুম! পাহাড়টা জলার পিছনে চড়ে বসেছে। আমি ছুটছি প্রাণপণে, ও কিছুতেই আমায় ধরতে পারছে না। শেষে একটা ইস্টিল ঠ্যাঙ্গার ভেতর ঢুকে পড়ে দেখি, তখনি এসে আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে। আমি তখন দু হাতে দিয়ে টান গলাটা টিপে ধরেছি—সে চীৎকার করছে, মরে গেলুম, ছাড় ছাড়...ঠিক সেই সময় তুমি আমার হাত ধরে টানতেই আমার মুখটা ছেড়ে গেল—'

বুকের মধ্যে আনন্দকে গুঁড়িয়ে ধরে শ্যামলী বলে, 'তার চেয়ে কর্ণাকে আমি আগেই বলে রাখো, কি ভীষণ মুখখানা দেখেছি—'

—'না। তোমার আর ও সব কথা বলে

দেওয়াতে হবে না। দুটিতে পড়া হবে।' বলে আলোটা নিভিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। হঠাৎ হঠাৎ শামলী জিজ্ঞেস করে, 'ও তো অন্ধ। কেন তাকে ওরকম বলতে বারণ করছো?'

বিরক্ত হয়। পূর্বেন্দু বলে, অন্ধ যে কিনা এবং সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছুই লোকে দেখে, তা সবাই জানে। কাজেই মিছিমিছি ও কথা শুনিয়ে কি লাভ হবে তোমার?'

—যেন তুমি যখন বলো করো, তোমো না।' বলে চুপ করে যায় শামলী। একটু পরেই আবার সে চুপ করে, যদি অন্ধকে বলে দেয় কখনো?'

—হাঁ, তুমিও তেমন! ও তো বুঝেই অন্ধকার।' ছেলেমানুষ, ওর কি কিছু মনে থাকবে?'

—তা ঠিকই।' বলে চুপ করে যায় শামলী। তারপর কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল থেকে কিন্তু শামলীর বারান্দা পাড়ে থাকে আনন্দর দিকে।

দু বছরের শিশু হলে কি হয়, বয়েসের চেয়ে পাকা পাকা কথার টুকরো ছোট্ট যেন তার মুখে। কি জানি, যদি কারুর ওই কথাটা হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় আর কাকে বলে দেয়। তা হলে?

কাজকর্মের মধ্যে মাঝে মাঝেই দুশ্চিন্তায় রাধেরও যেন একটা মাথা ধরে মাথা তুলে উঠে আবার মনেই মিলিয়ে যায়।

ওদের ঘরে—ওদের আনন্দী-ভরা ঘরে আনন্দ নেই। ঘরে কর্তা থাকে শান্তিতে ঘরে হাসি খেলা চাঁদ বিরাজমান।

দুপুরবেলাটাতেও আনন্দ মায়ের কাছে থাকে না। শামলীর বিছানার ঘুমোয়। তবে পাশে ঘুমে তার পাশে হাত না থাকলে তার চোখে ঘুম আসে না।

কিন্তু সেদিন দুপুরে আনন্দর চোখ বুজে এসেই, তার হাতটা শামলী নিজের বুকের ওপর থেকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিয়ে তার দিকে পিছন ফিরে শুলো। কিন্তু ঘুম আসে না। তার কেবল ঘর রাজ্যের চিন্তা। শামলী চুপি চুপি এসে জোরালার সিঁড়ির একটা কোণে বসে থাকে।

হঠাৎই তার মনে উদয় হয় পূর্বেন্দু কেন ওরকম কর্তাকে অপেক্ষা করতে! অন্ধ যদি মিথ্যে, ছুতো, অজুহাত, তা হলে নিয়ে করার অর্থ কি? এই নিয়ে ভোলা-পাড়া করতে করতে, এক সময় অস্থির হয়ে ওঠে তার মন। অর্থ নিশ্চয় কিছু আছে। যা ওর কাছে গোপন করতে চায় পূর্বেন্দু। তার মনে কর্তা ওর চেয়ে অনেক বড় পূর্বেন্দুকে চোখে। বেশী অভিজ্ঞতার। বেশী বোঝবার। কর্তাকে নিয়ে বিয়ে থেকে শুরু করে যত আলোচনা, যার আড়ালের যতো পর্যন্ত সব নিমেষে তার মায়ের মধ্যে ভেসে ওঠে। ঘৃণা হয় আনন্দর ওপর। সবাই বড়লা বলতে অজ্ঞান! সবাই তো ওর চেহারের খবর জানে না। কর্তার প্রতি অহেতুক আকর্ষণের কথা মনে পড়তেই ভাবতে থাকে, তাইই হিতকারী ভয়ে যায় ওর মন। কর্তাকে শত্রু মনে হয়। ওর স্নেহের প্রতি একটা গোপন বিদ্বেষ যেন বিষধর সাপের মত ফণা তুলে ছোবল মারতে উদ্যত হয়।

ঠিক এই সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিছানার বড়লাকে দেখতে না পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে আনন্দ। তারপর শামলীকে না জানিয়ে পিছন থেকে আসর করার জন্য নির্জীব হেঁসেলের ওপর ঝিমুনে উঠে যেই তার গলাটা জড়াতে ধরতে যায়, অমনি আচমকা এমন ভাবে ওকে ঠেলে দেয় শামলী, যে তক্ষুনি হেঁসেল চৌকে ধড়াস করে আনন্দ মেঝেতে পড়ে নীচে পড়ে গিয়েছে মনে হয়ে যায়। তার মাথা কেটে রক্তের ফিনকি ছোটে বেন!

'ওমা! এ কি সর্বনাশ হলো গো!' বলে হুড়মুড়িয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে কর্তা, তার পাশুটী। দুজন পাড়া প্রতিবেশী যে যেখানে ছিল। সবাই সবাই আনন্দকে নিয়ে চাঁদির করে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পাড়ার ছেলেরা। পূর্বেন্দুকে সান্ত্বনা দেবে করা হয়। সে নিস্তব্ধে হাসপাতালে এসে হাজির হয়।

এদিকে বাড়ীতে তখন কান্নার রোল ওঠে। শামলী ঘুমোতে চুল ছিঁড়ছে, মাথা খুঁড়ছে আর ঘরের মেঝেতে পড়ে কান্নায় লুটোপুটি খাচ্ছে।

পাড়া প্রতিবেশিনীরা ওকে ঘিরে থাকে। কেউ মাথায় জল দেয়, কেউ হাত-পাখা নিয়ে বাতাস করে।

একজন জিজ্ঞেস করে, কি করে এত বড় সর্বনাশটা হলো বৌমা?'

—তা কি করে আমি জানবো?' বলে আরো জোরে কাঁদতে লাগল শামলী। পাশের বাড়ীর কেউ বলে ওঠে, 'তোমার কাছেই তো বারান্দায় খেলা করছিল, একটু আগে বেরুলে আমার ঘর থেকে।'

—কি জানি বারান্দায় আমি দেখিনি। তা হলে কি এত বড় কাণ্ডটা হয়? ভগবান এ কি করলে?' বলে বুক চাপড়তে থাকে। 'আমি এ কি করলুম?'

—চুপ কর বড় বৌ, তোর কি দোষ?

—আমি কি করে কর্তাকে মুখ দেখাবো গো—তোমরা বলে যাও। ও যে আমার কাছে ছিল নিশ্চিন্ত হয়েছিল।'

কর্তা তখন শান্তড়ীর বুকের ওপর ঢলে ঢলে পড়ছে। 'কেন এমন হলো মা। কি পাপ আমি করেছিলুম—'

—তুমি কিছু করোনি মা—আমিই পাপী। তাই চোখের সামনে এই সব দেখতে হলো। বাপ্। বুকটা যেন আমার ফেটে যাচ্ছে।'

হঠাৎ শামলীর মনে ছুটে আসে সেই ঘর শামলী। হাতে একখানা থান ইট। কর্তাকে দিয়ে বলে, 'এইটা দিয়ে আমার মাথাটা ছেঁচে টুকরো টুকরো করে দে তাই। তোর পায়ে পড়ি। আমি রাক্ষসী। তোর ছেলেকে আমিই ফেলে দিয়েছি—'

—কি তুমি যা-তা বলছো দিদি-ভাই! তুমি যে তাকে আমার চেয়েও ভালবাসতে, সকলে জানে। তুমি তার মা—'

—সাত্ত্বনা দিচ্ছিস, তুই বিশ্বাস করিস না আমি ওকে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু আমার যেন মনের মধ্যে কে বলছে, আমি ফেলে দিয়েছি ওকে।' বলতে বলতে আবার চিৎকার করে কেঁদে ওঠে শামলী।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যেতে যেতে প্রতিবেশিনীরা বলে, দেখ, কর্তা মা হয়ে কেমন সামলে নিয়েছে; কিন্তু শামলীর মুখের দিকে যেন তাকানো যায় না। কতো ভালবাসার মত ছেলেটাকে করেছে।'

—কখনো না! পেটে ধরলেই কি মা হওয়া যায়? আঁতুড় থেকে যে তাকে হাতে করে মানুষ করলে, তাকে অধিক সে! সে কি ভুলতে পারে!'

হাসপাতাল থেকে পূর্বেন্দু বাড়ী ফিরে এলে, শামলী গিয়ে তার পায়ে আছড়ে পড়ে। 'কেমন আছে খোকা বল দিদুণির।' আমাকে দেখে কান্না যেন আরো বেড়ে যায় তার।

—অজ্ঞান হয়ে আছে। তিনটে দিন না গেলে কিছু বলা যাবে না।' অন্তরীণ মুখে মায়ের ঘরে গিয়ে কর্তাকে ও মাকে সান্ত্বনা দেয় পূর্বেন্দু। তারপর কেমন করে এমন কাণ্ডটা ঘটলো তার মুখ থেকে সব শুনে নীরব হয়ে গেল।

গভীর রাত। ঘুমে ঢেকে পূর্বেন্দুর চোখ। হাত জপমালার মতো শুধু চোখ দুটো খুলে মড়ার মত পড়ে থাকে।

শামলী হঠাৎ ঘুমিয়েছে, ঠিক এই কথাটা যখন ভাবছে, হঠাৎ তার গলার শামলী বলে ওঠে, 'তোমার কি বিশ্বাস, আমি ওকে ফেলে দিয়েছি!'

অন্ধকারে পূর্বেন্দুর মনের অন্তরঙ্গ যেন একটা লোহার ডাণ্ডা কষিয়ে দিলে শামলী। পূর্বেন্দু শিউরে উঠলো। তার যে নিরক্ষর মনের জমাট অন্ধকার যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে নিমেষে চতুর্দিকে আছড়ে পড়লো। পূর্বেন্দু বলল, তুমি এ-কথা মুখে আনলে কি করে!'

কান্নায় ভেঙে এলো শামলীর কণ্ঠস্বর। বলল, তুমি ওদের মত সান্ত্বনা দিতে বুঝিয়ে এলে, কৈ আমার তো কিছু বললে না!'

এর কি জবাব ভেবে ভেবে না পেয়ে শুধু একটা গভীর নিশ্বাস বুকের ভরো চেপে নেয় পূর্বেন্দু।

—চুপ করে থাকলে যে!'

—কি বলবো তোমায়! তুমি যে ওর বড়মা।' তারপর একটু থেমে আবার বলল, তোমার মাথায় এসব চিন্তা হচ্ছে কেন, আমি বুঝি না। ছেলেটা যাতে ভাল হয়ে ওঠে তাড়াতাড়ি, ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করো।'

—আমি বুঝি তা করছি না!' বলে ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শামলী। আমি তো নিজে মা নই তাই ওই কথা তোমাদের মনে হচ্ছে আমি জানি। সব বুঝি।'

—আবার পাগলামি করে। কে তোমায় এ সব বলেছে—কাঁদছো কেন মিছিমিছি!'

—কেউ কিছু না বললেও আমি সব বুঝি। আমি ছেলেমানুষ নই। বুঝেছো?' বলে কান্নায় উচ্ছ্বসিতা হয়ে ওঠে আবার।

—চুপ করো, লক্ষ্মীটি। তোমার যে আঘাত কতোখানি লেগেছে, সবাই তা জানে। চুপ করো।'

শামলী চোখ মুছতে মুছতে বলে, সবাই না জানুক, তুমি তো জানো। তা হলেই হলো।' বলে চুপ করে যায়।

ক্রমশ

নারায়ণ অয়েলমিল
নিউ মার্কেট-পূর্ব গেট
খাঁটি সর্ষে ঘানি সরিষার তেলের
প্রস্তুতকারক

# রুথ

## দিব্যেন্দু পালিত

হোটেলের সুরক্ষা লবিতে বসে আমি সেক্রেটারিকে কফির পাত্রটা ঠেলে এগিয়ে আসতে দেখে।

হ্যাঁ, রুথই।

চার পাঁচ বছরের অদর্শন বয়স বাড়ার আট-দশ বছরের নিবিড় পরিচয়ের স্মৃতিকে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না; বিশেষত সে যদি হয় রুথ—বয়সকে যে সোজা বিদ্রূপের মতো লুটিয়ে রাখতে পারে পায়ের নীচে।

তখুনি টান-টান হলো স্নায়ুমণ্ডল। রাত বেশী হলেও শনিবার; ফেট-নাইটের জন্যে কারুরই মাথা ব্যথা নেই। বিদেশী, বিদেশিনী, সাহেব-মেম, হুইস্কি-সুরেতী-ব্রোথে মিলিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকেই বসে আছে লবিতে। এরা সবাই নিঃসন্দেহে সাধারণ চেহারার আমাকে বিশেষ চোখে আবিষ্কার করবে রুথ, উল্লসিত হবে এবং এগিয়ে আসবে, এমন ধারণা করার মানে হয় না কোনো। উদ্যোগ আমাকেই নেওয়তে হবে।

একটু ভাবতে হলো তবু। রুথ একা নয়; সঙ্গে জোয়ান ছেলেরা আর একজনকেও দেখছি। চেহারায় আবছা। স্মৃতি হাতড়ে মনে পড়ল একটা নাম—জানিয়েল; নামটা শুনেছিলুম রুথেরই মুখে। আলাপ হয়নি। চার-পাঁচ বছরের ব্যবধানে আর একটি পরিবর্তন হিসেব করা যায় না। সুতরাং, ধরে নিলুম, সে-ই। ইতস্তত করার আমার অবসর ছিল। রুথের হাঁটার ধরনে অস্বস্তি নেই কোনো—কোথায় যাচ্ছে জানি না; কিন্তু আর একটু দেরী করলেই চলে যাবে। সঙ্কোচ কাটিয়ে রুথের পথে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

—'হ্যালো, রুথ!'

—'হ্যালো!' আশ্চর্যত্বের জড়তা থেকে বেরিয়ে এলো রুথ, 'আই, ইটস্ ইউ! হোয়াট প্লিজেন্ট সারপ্রাইজ!'

কিছু বলবার আগেই ঘন হয়ে এলো রুথ, জড়িয়ে ধরে চুমু খেল একটা। সম্পর্কে সামান্যিক টান্স ছড়িয়ে পড়ল আমার বা দিকের বুকে পকেটের কাছে। রুথের পক্ষে এগুলো স্বাভাবিক হলেও অল্প অস্বস্তি বোধ না করে পারলুম না আমি। লবিস্থ লোকের চোখ তখন আমাদের দিকে। রিসেপ্‌শনের সুন্দরী মেয়েটি ঠোঁট টিপে হেসেই চোখ নামিয়ে নিল।

—'এসেছি কাল। এই হোটেলেই উঠেছি।' সস্নেহ ভর্ৎসনা করলুম, 'তা, তুমি কোথায় গেছো?'

পার্শ্ববর্তী চেয়ারটায় বসে তাকিয়ে রুথ বলল, 'মরতে যাচ্ছি ফ্রোরেন্সে। আসবে? এসো না!'

আমি রুথের সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছি, অথচ তার পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা ভদ্রলোককে অবহেলা দিচ্ছি না এতোটুকু। এটা অভদ্রতা। রুথের কথার জবাব না দিয়ে হাতটা তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দিলুম ভদ্রলোকের দিকে।

—'আমার বন্ধুর ফিয়ঁসে জানিয়েল!'

'নো—;' করমর্দন করতে করতে মেয়ে ফেলা ভদ্রলোক; তাকাল রুথের দিকে। দৃষ্টিটা 'বচাও' গোত্রের। তারপর বেতাবে তাকাল আমার দিকে, মনে হলো না-জেনে কী একটা অপরাধ করে ফেলেছি!

রুথ বলল, 'উনি ফিল্মের প্রডিউসার। আমার স্বামী। মনে নাকি?'

অবাক্‌ হবার কিছু না কোনো। ফ্রোরেন্সে যাবার জন্যে এতোটুকু মাথা ব্যথা নেই আমার; মাতাতে-টাতাতেও জানি না যে ফিরে বার্লিক ট্রেন-যুদ্ধোড় করা যাবে। তাই বললুম, 'মনে আছে। মনে-মনে তখন আমি একটা হিসেব মেলাতে ব্যস্ত।

না, হিসাবটা নয়, এতোবার্লিন রুথের মতো চঞ্চলকে স্থাই আমার নয়। সে-লোকটির নাম জানিয়েলই ছিল। স্পষ্ট মনে আছে, ফেব্রুয়ারীর তিন দিন পরে একদিন বিকেলে অফিস-ফেরতা আমি গিয়েছিলুম রুথের বিশাল স্টুডিও ফ্ল্যাটে। বান্ধবী হাতে এক মগ কফি তৈরি করে নিয়েছিল রুথ। এটা-সেটা অনেক কথা হয়েছিল সেদিন, মুখ ঘটা বাড়ির ঘরে। আর কয়েকদিন পরেই বম্বে চলে যাবে রুথ; বলল, এ-চাকরিটার ওপর ইন্টারেস্ট হারিয়ে বসে আছে রুথ; এক্সপেরিমেন্ট করেছে; তবু চলে যাবে। কী বলা? আমার এক আর্ট ডিরেক্টর—ফ্রেডারিক কাজ করে। বাপারটা মোটামুটি ঠিক করেছি।'

রুথকে সেদিন বিদায়ের মতো চুমু আমার চেষ্টা করেছিলুম। বলেছিলুম, রুথ, তুমি সোনালী চুলের, টাকা


পূজায় চাই নূতন শাড়ী...তাই
জানাই আমন্ত্রণ
সাড়ীর মেলা
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট জং (পূর্ব) কলিকাতা-৯ ফোন: ৩৪-৪৮৮৩

পরদাটা তোমার কোনো সমস্যা হবে না। তোমার সমস্যা তুমি নিজে।'

মুখ কখনো গোমড়া হয় না; কথায় কথায় মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক মুখ লুকোনোর জন্যেই একোরেই নেই ওর দরকার। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছ?'

মুখের ছেলেমানুষী হঠাৎ কী তারপর এই সময় পাশের ঘর থেকে চলে এলো এ-ঘরে—এ ওর পাশে গড়গড়ি খেয়ে, প্রায় সমস্বরে বাজনা বলল, 'আমি, ঈষা আর হাতি—।' হাসল-হাসা তাড়ানোর জন্যে করে মুখ আবার তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল পাশের ঘরে—'ওরে, ছিঃ ভাই সে ওরে—' শুনে দেখলুম, সংখ্যায় তারা তিনটি। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। চতুর্থটি বছর দেড়, দুইয়ের বেশি হবে না। এখানে আসার সঙ্গেই আমি তার কান্না শুনেছিলুম।

হাসিমুখে ফিরে এলো মুখ। বলল, 'দেখছ কি কুণ্ডু এরা! কিছুক্ষণ আগেই একটা হাত-পাঁচেকের মেয়ে তিনটে ছিল সাবড়েছে!'

বুকিয়ে লাভ নেই মুখকে, ভাবলুম, কোনো পরামর্শেই হাতশুদ্ধ হবে না ও। একটা কথা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলুম, 'জোসেফ এসেছিল নাকি এর মধ্যে?'

মুখ বলল, 'এসেছিল। আমি ছিলুম না। তা এই পাজিদুটোই নাকি বেড়াল ঢেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে।'

—'তাই নাকি!' প্রায় হো-হো করে হেসে উঠলুম আমি, 'সবই নিশ্চয় তোমার দৌলত!'

—'কখনোই নয়। ও লোকটাই এমন যে কেউ পাত্তা করতে পারে না।'

—'তুমি!'

—'আমার কথা থাক।' একটু চুপ করে থেকে বলল মুখ, 'জানো, লোকটা যাবার আগে একটা ক্ষতি করে গেছে আমার। আবার। তবে, এবার ভাবছি একটা কিছু করব। জানিনেন বোধ হয় ব্যাপারটা পছন্দ করবে না।'

চোখে দেখিনি, তবু সে লোকটির নাম যে জানিনেন, তা আমার মনে আছে পরিষ্কার। ইতিমধ্যে রাখালা এসে ওলট-পালট করে দিল সব।

একটা লোটা ঘটনার স্মৃতি উঠে এলো মনে। ছেলেটা কথা বলতে পারলুম না কেননা। রাখালকে জানিনেন বলে ভাবার হয়তো কুণ্ডুই হলো—জোনো সম্ভ্রান্ত লোকই এ-ধরনের চুল পছন্দ করে না। কিন্তু লোকটা কি আমার!

মুখেরও বোধ হয় তো-আসে ব্যাপার টাকা নেই। বলল, 'তুমি প্রমিস রাখোনি!'

—'কেন!'

—'বলেছিলে চিঠি লিখে খোঁজ-খবর করবে। লিখেছিলে?'

—'মুখ, বোকা হোসনাই।' বললুম, 'বম্বেতে এসে পাকা ঠিকানা জানাবে বলেছিলে, জানাওনি। তা ছাড়া—'

—'আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড! তাই না!'

স্বচ্ছন্দে হাসল মুখ। লিপস্টিক বোলানো দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ও আমাকে দাঁতের শুধু সেই অংশটুকু দেখাল, যা যে-কোনো নায়িকেই তাদা করে তোলে। লিকুইড মেক-আপ-এর স্পর্শে উজ্জ্বল করছে মুখ—সমানভাবে বিস্তৃত লবিত ত্বকের ঠিক সেইখানটিতেই দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে তাকে উজ্জ্বল দেখায় আরো। এই চার-পাঁচ বছরে নিশ্চিত আরো সুন্দর হয়েছে মুখ, আরো বুদ্ধিমতী। পারে যেন না দাঁড়িয়েও প্রতিটি অঙ্গ করে তুলছে আরো টান-টান। ধরল এতোদিনে পর্যটিশ-ছাব্বিশের কম হবে না। কিন্তু, হঠাৎ-দেখা যে তারুর কাছেই মুখ এখন পঁচিশ-ছাব্বিশ বলে চলে যাবে, মনে হবে অবশ্য ঘুমারী—মনেই হবে না ইতিমধ্যে অন্তত চারটি সন্তানের মা হয়েছে মুখ। চেহারা কালের সঙ্গে সঙ্গে এই কবছরে মনটাও যে ও বদলে ফেলেনি, তার নিশ্চয়তা কি? মেয়েদের মন এমনিতেই বোঝা মুশকিল, তার ওপর সঙ্গে পুরুষ থাকলে তো কথাই নেই।

রাখালা হঠাৎ মুখের কোমর জড়িয়ে ধরল। বলল, 'ডার্লিং, আমরা যাবো নাকি?'

মুখ তাকালো আমার দিকে। চাহনিতে বোঝা যায় ইচ্ছের সঙ্গে মিশেছে অন্তর্দ্বিধা। রাখালার বলল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গলিয়ে দিয়ে বলল, 'এতো ভাববার কী আছে? চলো না! দেখবে সময়টা মন্দ কাটবে না।'

কিছু না ভেবেই বললুম, 'যাও, সময় কাটানো আমারও একটা সমস্যা বটে। ঘণ্টা খানেকের ওপর বসে আছি লাইনে। কিন্তু—' ভেবে বললুম, 'ঐ নাচ-গান-হল্লার মধ্যে যেতেও ভরসা পাচ্ছি না তেমন। তোমরা নাচবে, আমি একা-একা কী করব ওখানে!'

কথাগুলো বললুম হালকার মতো, যেন আমাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব এখন মুখের।

চলে যাবার জন্যে ছটফট করছিল রাখালা। মুখে উঠে বলল, 'ওটা কোনো সমস্যা নয়, মিস্টার। ইচ্ছে করলে আমার স্ত্রীর সঙ্গেও নাচতে পার তুমি।'

—'শ্যাম্প ইউ।'

বলতে হলো ভদ্রতা করে। কিন্তু একই সময়ে প্রচণ্ড রাগে শরীর গরম হয়ে উঠল আমার। এতোক্ষণ সুবিধে করতে পারিনি বেশ; কিন্তু এবার, এই প্রথম, কথা বলার সুযোগ পেয়ে মুখের ওপর তার কর্তৃত্বের বহর দেখাল রাখালা। এমনভাবে কোমর জড়িয়ে ধরেছে যে মনে হবে বাঁধন আলগা করলেই মুখকে টেনে নেবে আমি। মশাই, আপনার চেয়ে ঢের বেশী দিন ধরে আমি মুখকে চিনি, ভাবলুম মনে মনে, নাচবার অধিষ্ঠিতা ঠিক আপনার কাছ থেকে না এলেও চলবে। ওকে নিয়ে নিজেকে। না, এতোখানি বাড়িয়ে ভাবা ঠিক নয়। মুখ নিজেই রাখালার পরিচয় দিল স্বামী হিসেবে। যতোই ঝুলোঝুলি হোক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাই আলাদা—একবার স্থাপিত হলে একদিনে একশো বছর পেরিয়ে আসতে পারে। রাখালার মতো ইচ্ছে করলেই কি আমি হাত দিতে পারি মুখের গায়ে?

ওরা অপেক্ষা করছে। বললুম, 'তোমরা এগোও। আমি চটপট কিনারটা সেরে নিই। তারপর আসব। আজ শনিবার, আজ তো দুটো আড়াইটে পর্যন্ত চলবে।'

মুখ হাসল। এ-ধরনের হাসির সঙ্গে সাধারণত আমরা হতাশা বোধ করি; কিন্তু, কী করে বোঝাবো, এমনকি, হতাশায়ও মুখ ফুটিয়ে তুলতে পারে সৌন্দর্য! ফেরে ফেরে আবার ফিরে এসে বলল, যদি না আসে তাই জিজ্ঞেস করছি। তোমার মুখে নাম্বারটা বলো?'

বললুম।

জলে ঘুরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রাখালা। একবার সেদিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল মুখ, 'যদি না আসে, আমিই আসব।'

রিসেপ্‌শনের পাশের চওড়া পাসেজ দিয়ে মুখ ও রাখালা অদৃশ্য হবার পর আমি আবার ফিরে এলুম আগের জায়গায়। বসলুম। শিথিল কতকগুলো ভাবনাকে স্বচ্ছন্দে বার করে দিলুম বাধা দেবে। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা সৌঁছে গেছে বোম্বাইয়ে। জানের আওয়াজে কান ঝালাপালা হলো—বিস্তৃত অন্ধকারে সেখানে খেলা করছে লাল - নীল - হলদে - সবুজ আলোর স্থান পরিবর্তন ও ধাপা-ধাপি, উচ্চকিত ঢংয়ের গানে গানে উত্তপ্ত হচ্ছে ডিসকথিক। গান কখনও হচ্ছে নাচ; পৃথিবীতে যেকোও নাচের তালে তালে পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে করেক কোড়া নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী। কিছু কিছু অনুচ্চারিত আছে ফেলুদা যেন পর্যন্ত দুটি চার পরীক্ষা সম্বন্ধে —নিয়ার সমস্ত রক্ত ছুটে যায় এক লহমা; নিজেকে উদ্বুদ্ধ করো, ভুলে যাও: সময়হীন, প্রতিরোধহীন ভালোবাসার সঙ্গে যাও নিজেকে! অরোপিত, উদ্দাম ওই প্রাণপ্রবাহে এতোক্ষণে সম্ভবত নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে মুখ—কল্পনায় দেখলুম তার চেনা-অচেনা শরীরের আন্দোলন, পরীক্ষাতেও যা হতে পারে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত।

॥ ২ ॥

বলতে কি, এই স্বতঃস্ফূর্ততার জন্যেই মুখ আমাদের আকৃষ্ট করেছিল প্রবলভাবে। বছর বারো তেরো আগে মার্কুইসলে মেসারের কলকাতা অফিসে বড়ো সাহেব মিস্টার ফেলটনের সেক্রেটারি হয়ে ঢুকেছিল ও। আমি তখন জুনিয়র অফিসার, ফেলটন সাহেবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ফিনান্স হ্যান্ডেল করি। বসি পাশাপাশি টেবিলে। দিনে দিনে, নৈকট্য যে-ধরনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে আস্তে আস্তে, কিংবা কখনো, আমার ও মুখের মধ্যেও সে-রকম একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল প্রথম। তার বেশি নয়। অবশ্য, ও স্বিবাজড়িত নয় বলেই সম্ভবত, বেশ খোলাখুলিভাবে মেলামেশা করতুম আমরা, অকপটে। যে-সম্প্রদায় থেকে এসেছিল মুখ, তাদের নিয়ে এমনিতেই চলে অনেক ঠাট্টা-ফাটি —সত্যি হোক বা মিথ্যে, আগে-ভৈরী ধারণার সুযোগে অধিকাংশেরই প্রথম চোখ পড়ে ওদের মনে নয়, শরীরে। মুখ জানে করার পরও বাড়িতর দেখা দিল না কোনো। বয়স একটু বেশীভাবেই সে সকলের চোখ টানছিল—যার ফলে ছিল অনেক। মুখের চেহারার বাড়তি জৌলুসের জন্যেই সম্ভবত, হঠাৎই লক্ষ্য করা গেল, পুরুষ কর্মী-দের চোখে অফিসের জন্য মেয়েদের ভূমিকা স্থান হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ,

SALE, PURCHASE, REPAIR OF GUN, REVOLVER, RIFLE, PISTOL

CONTACT :
A. C. COONDOO & CO
Gun Makers
178, DHARAMTOLLA STREET,
CALCUTTA-700013. Ph : 23-5615

পরিবর্তে আঁকিয়ে উঠল মুখ। আঁকিয়ের ক্লেমনেডের সেকসনের ছিপি খুলে ছেড়ে ও যখন নিজের কাবিনের দিকে এগোয়—ঠক্‌ঠক্ শব্দ ওঠে হাই হিল জুতোয়, তখন, হঠাৎই, যেন আকস্মিক দুঃখ থেকে জেগে ওঠে সকলে, কৌতূহলী চোখগুলি ফিরিয়ে ওরে পুলকে এবং, নিশ্চয়ই, চাপা ঈর্ষায়; যাওয়া-আসার ফাঁকে একটা আলাদা হাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে যায় মুখ!

ব্যাপারটা জটিল হতে লাগল ক্রমশ।

আমাদের ক্যাবিনটা ছিল বড়ো সাহেবের চেম্বারের লাগোয়া। কাজে অকাজে প্রায়ই সেখানে উঁকো লোকের ভিড় জমতে লাগল। এমন কি, সে-আড্ডা থেকে আমিও বাদ পড়লুম না। অফিসে যে-সব অফিসারের সঙ্গে আমার মেলামেশা তেমন ছড়ে ছিল না, তাদেরও অনেকেই সময়ে-অসময়ে এসে 'হ্যালো' বলে বসে পড়ত সামনে। এটা-সেটা কথা চালিয়ে গেলেও বুঝতুম ওদের চোখ ছুটে যাচ্ছে মুখের দিকে, ছুঁড়ি যেমন অনিবার্য-ভাবে কাত হয় বাতাসের দিকে, তেমনি, মুখের সান্নিধ্য ওদের করে তুলছে কাতর, কিছু বা অসহায়; মুখের স্বেত উজ্জ্বলতার ভিতরে ওরা খুঁজছে সেই সোপানের, যার সংস্পর্শে বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে চেতনায়। ঘরে থাকা এবং চলে যাওয়ার মধ্যে কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারত না তারা। ওরই মধ্যে দু-একটা কথা ছিটকে বেরুত মুখ দিয়ে মুখের উদ্দেশে, এক্টু বা গায়ে-পড়া, যেমন 'হ্যালো মুখ বা 'আজ তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে', কিংবা, 'কাল বিকেলে তোমাকে নিউ মার্কেটে দেখলাম', ইত্যাদি। মনে হয় মুখও তৈরি থাকত এ-সবের জন্যে, যারা উত্তর তৈরি থাকত তার মুখেও; যে-কোনো সম্ভাষণ বা সম্পর্কের উত্তরেই মুখ না তুলে জবাব দিত ঠকঠক। 'হ্যালো, দা ব্যাড্ড ইউ বা 'থ্রিরেলি!'—ছোটো ছোটো যে-সব উত্তরে প্রশ্রয় থাকত না কোনো। মুখের ঔদাসীন্য কি তার পুরুষত্বের নিঃসোহ করে ছিল এতোটুকু? মনে তো হয় না। ব্যাপারগুলো দেখে শুনে ভেবে মনে মনে হাসতুম আমি। আমল জুলে তার নিজস্ব ধর্মে—তাপ তার রক্ত, যতোক্ষণ জ্বলবে ততোক্ষণ ছড়াবেই।

—তুমি এসে আমারই অসুবিধে করলে।' মুখকে বললুম একদিন, 'মুখ, মুখোমুখের সংখ্যা যদি দিন দিন এমন বেড়ে ওঠে তাহলে তোমার অ্যাডমায়ারারদের অ্যাটেন্ড করতে করতেই সময় যাবে। আমার কখন করব বলুন।'

টাইপরাইটারের রোলার এ্যাডজাস্ট করতে করতে মুখ বলল, 'কী ভাবছ, আমলা বলল করবে?'

—মন্দ হতো না। তোমার মতো আমি আর কয়েকদিন সামলাব! তুমি আর হাসির অবতার, ভালো তবু জল লাগাও না গায়ে। এদিকে চাকরিটাও তো সামলাতে হবে আমাকে।'

মোড়ার দিকে কিছুদিন আমাকে নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করেছিল মুখ; উচ্চারণে ছন্দ হতে না পারায় শেষমেশ ছেড়েছিল আমাকেই এসে। কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না কোনো, হাসিটা ছিটিয়ে রাখল যেন কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'ভি, আমলা বলল করে রাখো না এক-বার, তাতে লজ্জার হবে তুমিই।'

—মানে!'

কেউন সেক্স আপরেটসমেন্ট রাখতে বাইরে। মুখ উঠে এলো আমার সামনে—একেবারে চেয়ারের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, ঝাপ খুলে, রহস্যময় হেসে বলল, 'কথা থাক, এখন হাঁ করো দেখি—'

—কেন!'

—করোই না!'

হাঁ করতেই মুখ একটুকরো চকোলেট গুঁজে দিল মুখে, নিজেও মুখে পুরল খানিকটা। বলল, 'জানো, আমার আগের অফিসে প্রায় তোমার মতোই একজনের সঙ্গে একটু বেশী ভাব ছিল আমার। একদিন ঠিক এইভাবে চকোলেট খাইয়েছিলুম তাকেও—এমনভাবে আমড়ে ধরল আঙুলটা, যে ছাড়তেই পারিনি। কতবার চোখে জল এসে গিয়েছিল আমার। আঙুল ছাড়ল তো আবার জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল আমাকে। বলল, আই লাভ ইউ। ভাবতে পারো?'

—পারি বইকি।' আমি বললুম ঠাট্টা করে, 'ভালোবাসার সঙ্গটাই তো আর চকোলেটের মতো সুইট নয়, তাতে আঙুল কামড়ানোর কথাও থাকে। কথাটা বলে ভালোই করলে। এখন থেকে তোমার ব্যাপারে দুটো নিয়ম আমি খুব রিজিডলি পালন করব। কখনো বলব না 'আই লাভ ইউ, আর, তোমাই সুন্দর হোক, তোমার আঙুল কামড়ানোর চেষ্টা করব না।'

তখনই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল মুখ। কপ্ করে আমার গালে চুমু খেয়ে বলল, 'আমি জানি তুমি খুব সেফ্। সেই জন্যেই তোমাকে পছন্দ করি এতো।'

খবরটা নিয়ে আমার নিজের সংশয়ের অন্ত নয়। মুখের হঠাৎ আবেগ একটা চমকানো ভাব এনে দিল শরীরে—মনে মনে তাদের কথা ভাবলুম, স্পর্শ না পেয়েও যারা মুখের উন্মাদনা টের পেয়েছে। গালের যে জায়গায় ও ঠোঁট রেখে-ছিল, হঠাৎই মনে হলো সে জায়গাটুকু চলে যাচ্ছে অনেকে দূরে। পাছে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলি সেই ভয়ে সংযত হলুম তাড়াতাড়ি।

—মুখ, যে লোকটি তোমার আঙুল কামড়ে দিয়েছিল তাকে কখনোবার বলেছিলে এ-সব কথা, করোবার চুমু দিয়েছিলে এই ভাবে?'

—প্রথম, একবারেও নয়।' আমার পা ছুঁয়ে মুখ বলল, 'ভুলো না আমি মেয়েমানুষ। এক পা এগোলে দু পা পিছোই। যখন এসেছি, ঠিক বুঝতে পারি কতোটা এগিয়েছি।'

—কনগ্রাচুলেশন্স।' আমি হেসে বললুম, 'আমার বেলায় অনেকটা এগিয়েছে। আমার মৌতাতটা আমি নিজেই ঈর্ষা বোধ করছি। তা লুকোর হবো বলেছিলে কেন?'

মুখ বলল, 'জানি না। তুমি হয়তো তা ভাবছ না; কিন্তু লোকে তাই ভাববে। ভি, আমার সঙ্গ তোমার ভালো লাগে না?'

বললুম, 'না লাগলে আগেই সরে যেতুম।'

—তাহলে আর ও সব ভেব না। ভাবনা খালি থাকে না; তুমি এই ভাবনাটা ছেড়ে দিলে এখানে আর একজন আসবে। সে তোমা থেকে নাও হতে পারে। আমাদের সমাজের মেয়েদের এমনিতেই সবাই সহজ-লভ্যা মনে করে, তবে ওপর কেউ যদি একটু সুন্দরী হয় তাহলে তো কথাই নেই—যে-কোনো ভাবে তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। জানো, এ জন্যে আমি তিনটে চাকরি বদল করেছি শুধু এই কারণে।'

আমি চুপ করে থাকলুম। মুখের অনুযোগ সত্যি হলেও হতে পারে।

অনেকক্ষণ মুখে মুখ বসল, মাঝে মাঝে খুব অসমান লাগে।

এর পর থেকেই মুখের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল। চমৎকার ও অবর্ণনীয় শরীরের ভিতর ওর যে মন, সেখানেও সেও কম অবর্ণনীয় নয়। ব্যবহারে সারাক্ষণ ছিপ্রে থাকে ছেলেটি, ফ্রক নাড়াচাড়ি করে পড়ে টুংটাং! ছুটির পরে অনেক দিন আমি ও মুখ হাঁটতুম এক সঙ্গে, বাস-স্টপে আমাকে


ভেজাল দুধ না খেয়ে

দুধেভরা সয়াবীন খান

পশ্চিমবঙ্গের দুধেভরা সয়াবীন পৃথিবীর এক অসামান্য বলকারক খাদ্যসার। এতবেশী প্রোটিনযুক্ত দুধেভরা সয়াবীন আর কোথাও নেই। কারণ এতে দুধের চেয়েও বেশী অর্থাৎ শতকরা ৪২ ভাগ প্রোটিন আছে। ডায়েবিটিস রোগীদের একেতে নির্ভরযোগ্য পথ্য। শিশু, বৃদ্ধ, সুস্থ ও রোগী সকলেরই পরম হিতকারী। যে কোন ফুড-এর তুলনায় দামেও অনেক সস্তা।

মনে রাখবেন : পশ্চিমবঙ্গের এক কেজি সয়াবীনে দুধ কেজি খাঁটি দুধ হয়। এ জিনিষ বাজারে আর কোথাও নেই। অতি সহজে দুধ, দই, ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি মিষ্টান্ন ও চপ, ফ্রাই, ঘুগনী প্রভৃতি মুখরোচক খাবার করা চলে। প্রস্তুতপ্রণালী সহ ৫০০ গ্রাম পাকেটে এখানে খুচরা পাবেন। কলিকাতা ও মফঃস্বলে ডাক্তারখানা, স্টেশনারী, মুদিখানা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত স্টকিস্ট নেওয়া হচ্ছে।

ডিস্ট্রিবিউটার্স (সারা পশ্চিম বাংলা)

পশুপতিদাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

কৃষি বিভাগ

৩৭৯,৪৩/২,এস,এন,ব্যানার্জি রোড,কলিঃ৭০০০১৪

টেলিফোন:২৪-৪৩৮৯,৮২ - টেলিগ্রাম: ব্রাইসাকিংস

অফিস খোলা : প্রতিদিন সকাল ১০টা হতে সন্ধ্যা ৬-০০ মিঃ শনিবার বেলা ২-০০ মিঃ পর্যন্ত। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

পৌঁছে দিয়ে ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে এলেবেলাদির চলে যাওয়ার পরে ও। লাগেজ বার করে একটা ওটা ঘরে ঘরে ঘাড়ুরে দিয়ে আসার দিকে। নিজের বিষয়ে প্রায় কিছুই বলতে না ও; মনে হলো ওর বাড়িঘর জীবনে কোথাও কিছু একটা আছে, যেটা ও অড়াল করে রাখতেই ভালোবাসে। আমিও কোনো কৌতূহল দেখাইনি। জয়ন্তের বর্ণনাটা নিয়ে আক্রমণও যে কথনোটা সাজা এবং বেশ ভালো একজন কনোকটিভে ভাবী হয়ে উঠেছে হাওয়া, সেটা জয়ন্তের না। টের পেলুম, যেদিন কেউন আমাকে ডেকে পাঠালেন আমাকে।

—'এ সব কী শুনছি?'

—'কী?'

—'আবার ইউ আপসেট হুয়ে?'

কথাগুলো বুঝতে না পেরে অবাক হোম করলুম আমি। কেউন কিছুক্ষণ খুব তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করলেন আমাকে। হয়তো চেয়ারের পিছনে শরীর এলিয়ে দিয়ে আরাম, আমোদ, চিন্তাকে কথার চেষ্টা করো না। আঙ্কলের লিস্টে মান পর্যন্ত যেটা আসে, সেটা তুমি জান না এমন হো হতে পারে না!'

—'বিলিভ ইউ মী, স্যার,' আমি বললুম, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

—'আবার ইউ আপসেট হুয়ে!' কেউন যাবার জোর দিলেন কথাটায়, 'তোমরা খুব ধার্মিকই হওনি, আউট-সাইড অফিস আওয়ার্সেও তোমাদের দেখা যায় এক সঙ্গে। আমি এমনও শুনেছি, তোমরা নাকি বিয়ে করার কথা ভাবছ!'

—'সম্পূর্ণ ঘরোয়া কথা!' মাতৃভাষে বললুম আমি, বড় গলায় বললুম, 'এটা ঠিকই, আমরা পরস্পরের বন্ধু। উই আর জাস্ট ফ্রেন্ডস্, তার বেশি কিছু নয়।'

—'জাস্ট ফ্রেন্ডস্!' অর্থপূর্ণভাবে হাসলেন কেউন, 'ইয়েস স্যার, তোমার কাজ করো!'

বেরিয়ে। শুনে একটুক্ষণ মাথা হেঁট করে থেকে আবার মুখ তুললেন কেউন, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো হুয়ের মতো অল আমেরিকান একটি ছেলের সঙ্গে জাস্ট ফ্রেন্ডশিপ্ হতে পারে! তুমি ঠিক জানো তোমার সঙ্গে ওর কোনো বিয়ের সম্পর্ক নেই?'

পুরো ব্যাপারটাই অপমানজনক মনে হচ্ছিল। সর্বাঙ্গে জ্বালা ছেলে জবাব দিলুম, 'স্যার। আপনি বোধ হয় জানেন না আমি বিবাহিত। এবং আমার স্ত্রীও কিছু কম আমেরিকান নয়!'

খুব লোকার মতো কিছু হলে ফেলতুম কি! না হলে কেউন হঠাৎ অমন সশব্দে হেসে উঠলেন কেন! হাসতে হাসতে পৌঁছে ফেলেন। চেয়ারে সামলালেন। বড়ো সাহেবকে এমন খোশ-মেজাজে কমই দেখেছি। ভালো হলো, আলোচনাটা সাঙ্গ—কিন্তু, তার ফল মোর হয় খুব সুখের হবে না।

—'খুব!' হাসি থামিয়ে বললেন কেউন, 'বিয়ের স্ত্রী সম্পর্কে প্রকাশ্যে এতোখানি প্রশংসা মোর হয় তুমিই প্রথম করলে! বুঝতে পারছি, তুমি খুব সুখী লোক। কিন্তু, তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

অসহায়ের ভাব নিয়ে মাথা নীচু করে বসে থাকলুম আমি। ঘটনা কোন্ দিকে যাচ্ছে, কিংবা ঘটনার ভিতরে আর কোন্ ঘটনা আছে, কী-ই বা জানলুম এ-সবের, বুঝতে না পেরে নিজেকে ছেড়ে দিলুম কেউনের দয়ার ওপর।

—'ও. কে.। আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু বুঝতে নয়। তুমি কি ওর অ্যাডমায়ারও কিছু জানো?'

আমি বললুম, 'খুব খুব ভালো মেয়ে।'

—'হুয়ে একা নয়, ওই বয়সের এবং ওই চেহারার সব মেয়েই খুব ভালো হতে বাধ্য। অন্তত তোমাদের বয়সের চোখে তো বটেই। যাক্‌গে—' কেউন হঠাৎ ঝুঁকে এলেন সামনে, হাত-ঘড়ির দিকে তাকালেন নিতে বললেন, 'ঘটনা যাই হোক, অফিসে এ-ধরনের দুর্বলতা আমি পছন্দ করি না। আজ আঠাশ তারিখ, সামনের মাসের পয়লা তারিখ থেকে তুমি আর হুয়ে এক সঙ্গে কাজ করবে না। কোথায় বসবে, সে-ব্যবস্থা আমি করব। হোপ, ইউ আন্ডারস্টুড্ দিস এমারেজমেন্ট—'

মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলুম আমি। মনটা খারাপ হয়ে গেল; অপমানও লাগল। ডাকলুম, পরিণতিতে কোনো সম্পর্কই স্থায়ী নয়, প্রেমের সম্পর্কের ভিতরেই খুন আছে। একটি মেয়েকে তার স্বামীর থেকে আলাদা করে ভাবা সাঁতারে বোধ হয় ভুল। মন যাচ্ছে এখোর, শরীরও ঠিক এঁকিয়ে আসে অন্যদিকে। সবকিছু বিচ্ছিন্নে অনেক ওর ভালোবাসা। যারা একত্রে ভবে না তারা হয় উদাস, না হয় অসম্পূর্ণ। ভাবতে ভাবতে আমার চোখের সামনে থেকে আড়াল হয়ে গেল হুয়ের মুখ, পরিষ্কারে ফেলে উঠল হাত পরীর, সমস্ত সম্পর্কটা নিয়ে। হঠাৎই মনে হলো, হুয়ের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে, এতোদিনে বিচ্ছেদই আমি তার নাম দিতে পারতুম।

হুয়ে ছিল না। ফিরে এসে

প্রেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমাকে অন্য কাজ নিশ্চয়ই দেবে ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, মি! এতো চুপচাপ!'

বললুম, 'কিছু নয়।'

—'শরীর খারাপ?'

—'না।' না তাকিয়েও বুঝলুম অবাক চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করছে হুয়ে। আমি নিরুপায়।

ছুটি হতে বাসের পথও আমলা ডেকে বসলুম না আমি। অফিস টেনশন কমে হুয়ে চলে গেল—আবার ফিরে আসার বলো। অফিস প্রায় ফাঁকা; একটু আগে কেউন সাহেবও চলে গেছেন খুব সাইট ড্রাইভে। আমার মাথার ভেতর অনেক হুয়েপাক খাচ্ছে অনবরত—আর ইউ সিওর ইউ আর জাস্ট ফ্রেন্ডস্। স্বাভাবিক মতো উত্তেজনা করলুম, ভেবে দেখিনি। এখন থেকে ভাবব।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ফোন তুলে হুয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মার্কেটে যাবে একটু। যাবে আমি?'

হুয়ে না তুলেই বললুম, না। আমি বাড়ি যাব।'

—'তাহলেও মেয়ের জাঁত কী! রাত-সাড়ে সাতটা আমার এক সঙ্গে ডেট আছে—'

—'তুমি চলে যাও, হুয়ে। ওর বন্ধুরা সেখে, ফোন করো!'

আমার গলা ভারি ছিল আমার, বিরক্তিও সম্ভবত চেপে রাখতে পারিনি। হুয়ে একটু শিঁটিয়ে গেল। তারপর হাসবো সহজ করে, 'বুঝেছি। প্রোমোশন হয়েছে তুমি ইউ, তি?'

জবাব দিলুম না। হুয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ বসে আমিও উঠে পড়লুম। বিশ্রী ধরনের অফিসার হলেও আমি সত্যবাদি, মেলির ভাব সম্বন্ধেই টায়ে-বসে চাঁড়। চাপ্ত ও মানসিক টেনা এবারই প্রথম বিশ্বার অনুভব করলুম শরীরে যে, আজ ঠোঁটে না দিয়ে পারলুম না। সেতে-যেতে একটা কথাই ভাবলুম শুধু, সত্যি, হুয়ে আর আমি এতো তাড়াতাড়ি এলুম কী করে! আমাদের ধর্ম আলাদা, জাত আলাদা, ভাষা আলাদা; এমন কি আমাদের আঁকড়ার জীবনও সম্পূর্ণ আলাদা। আমার স্ত্রী, অন্ধ্রাবাসা ভাষা বুঝতে মেয়েদেরকেই বলিনি তেমন করে। হুয়ের আঁকড়ার জীবন সম্পর্কেও আমি কি সত্যিই কিছু জানি! তবু, সম্পর্ক একটা গড়ে উঠেছিল, তা অস্বীকার করব কী করে! কোনোদিন খেয়াল করিনি, কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে কথা-ভাষার সঙ্গীই হুয়া নয়। নিজেরা অবশ্যই পরিষ্কার আছি, হুয়ে থেকে চেয়েছে যে কেউই তাহলে আমাদের সম্পর্কটা খুবই ভালো। এবং, কেউন যেমন বললেন, সহজ দৃষ্টিতে এই ধরনের সম্পর্কের একটাই অর্থ হয়।

পরদিন অফিসে যেতে না। খুব ভোরে পাও অনেকক্ষণ পড়ে থাকলুম বিছানায়, দিনটাকে যেতে অনেকগুলো, অনেক লম্বা লাগে; যাতে মা-বাবার প্রাথমিক অস্বস্তিটা কেটে যায়।

হাত-পা ছড়িয়ে অন্ধ্রাবাসা আর অনেকক্ষণ গল্প করা আমার স্বভাব।

হারুণর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কেতনি সম্প্রদায়ের সেই স্টেনোগ্রাফারের খবর কি?'

—মানে?'

—আমি তো ভার্বাছলাম মেয়েদের তোমাকে দেখে বসেছে তাদের এর পর রবিবারের ছুটি অফিস ফোর্স শুরু করবে?'

—দেখে বসেছে মানে? কে বলল?'

—কে আবার, তুমিই তো।' অনুরাধা বলল, 'এতো সহজে হাল ছাড়লে প্রেম করতে, জুলে যেতে হবে।'

পরের দিন অফিসে বেরোই মুখ চেপে বলল।

—জি, তোমাকে আমি অন্যদের চেয়ে আলাদা ভাবতাম। দেখছি তুমিও অন্যদেরই মতো বেলিফিল।'

আক্রমণের আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে যায়।

—কী হলো?'

প্রসাধনকক্ষে হাসল মুখ। বলল, 'প্রস্তাবনের খবরে লোকে খুশীই হয়, অনাদের ভালো লাগার জন্যে। তুমি কি না হয়ে গেলে গম্ভীর! এমনভাবে কথাবার্তা বন্ধ করলে কেন—'

মুখকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'কী বলছ আজে বাজে কথা! কার প্রস্তাবনা হয়েছে?'

—কেন, তোমার!'

—বাজে কথা বোল না।'

মুখ এবার স্বাভাবিক হলো।

—বাজে কথা নয়, সত্যি। আমি নিজে হাতে কাল বিকেলে টাইপ করেছি চিঠি। আজই পাবে।'

অনেক দিন পরে মুখ আবার এগিয়ে এলো কাছে, চুমু খেল গালে। বলল, 'আমি খুব খুশী হয়েছি। ইউ নো, কাল যখন বসু ডিরেক্টরস মিটিংয়ে, আমার হাতে কাঁপছিল। ছাপতে দিতে ভয় হলো, আবার টাইপ করলাম।'

এতোক্ষণে আমার মনে হলো, মুখ নিশ্চয়ই বিয়ের কথায় না। চাপা উত্তেজনায় ছেয়ে এলো শরীর। আমার দিন কেটেছে সাত্বনা যে-সব কথা বলেছিলেন সেগুলো পুরনো তুলল কানে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করলুম আমি।

—কিন্তু, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি।' মুখ বলল, 'কাল থেকে আমরা আর এক সঙ্গে বসব না।'

—জানি।' জোর জেলে বললুম, 'ভালোই হবে। জায়গাটা খালি হবে, এবার একজন নতুন বন্ধু পাবে।'

—সেটি হচ্ছে না। বস্ বলেছেন এখন থেকে আমি একাই বসব এখানে।'

কথার ভাষারা আলাদা হলেও আমাদের পরিচয়ে চাঁটা পড়ল না কোনো। বরং ভিতরে ভিতরে মুখের ওপর আমার টান যেন বেড়ে গেল আরো। ভাবলুম, যে যাই বলুক, মুখকে হারাতে পারব না। কোনিও নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করেন নি। না হলে প্রস্তাবটায় হলোই এমন একটি ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারতেন না!

এর পর নতুন সহিবের কাজকর্মের ভারে ক্রমশ বসতে হয়ে পড়লুম আমি। স্বভাবতই কম এলো মুখের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। প্রতিদিন প্রায় নিয়ম করে নিজের অফিস থেকে ফোন করে কথা বলত মুখ, খোঁজ-খবর নিত। খারাপ লাগত বিকেল-গুলোয়। কারুর মতো নিজেকে বন্ধু ভাবতে ভাবতে দেখতুম একা চটপটায় দিয়ে আলমনে ওয়েসেলসের দিকে হেঁটে যাচ্ছে মুখ। সে জানে এক পা এগিয়ে কী করে পিছোতে হয় দুপা; যখন এগোয়, ঠিক ঠিক জেনে রাখে আরোটা এগিয়েছে। চমৎকার, উজ্জ্বল এই যুবতী, হাত-পা-মুখের সমান বাঁধ ফেলে দুহাতে যাকে ভাসছে তা ঝরিয়ে পড়ছে তার মুখের গভীরেও। আর কেউ না জানুক, আমি দেখেছি তার পরিচয়।

দিন কাটছিল। অর্থাস্থতা কেটে যাচ্ছিল ক্রমশ—বেশ যায়। বিকেলই ক্রমশ পরিণত হয়ে অভ্যাসে, স্বাভাবিকতায়। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন ভগ্ন গলায় ফোন করল মুখ।

—কি, আজ বিকেলে কি তুমি কী আছো?'

—কেন?'

—একটা কনফেশন পড়েছি, তোমার পরামর্শ চাই—'

—জরুরী?'

ফোনের ওদিকে হঠাৎ চুপ করে গেল মুখ। তারপর ভেসে ভেসে বলল, 'অবশ্য তোমার যদি অসুবিধে থাকে—'

অভিমানে ঢোলা যায়। সামলে নিয়ে বললুম, না, অসুবিধে নেই। ঠিক আছে, তুমি বলো কোথায় দেখা হবে?'

মুখ একটা জায়গার নাম এবং সময় জানাল।

বললুম, আচ্ছা তাহলে তোমার।

কথাবার্তা বলছিল মুখ। কী এমন কনফেশন হতে পারে? বিষয়টা মুখের থাকুক আমাকে। বন্ধুত্ব, টেলিফোন ছেড়ে দেবার পর আর কোনো কাজেই মন বসল না। মুখের বাড়িতে জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না বলেই অর্থাস্থতা বেশী লাগল আরো। অফিসের ভিতরে সম্প্রতি এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি যা নিয়ে বিব্রত বোধ করতে পারে মুখ। তাহলে কী?

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই জায়গায় পৌঁছলুম আমি। দেখি, মুখ গাড়িতে আছে আগে থেকেই। বিশ্ব মুখ হাতে চালাচ্ছে কি বাবার গাড়ি। মুখে কেমন একটি দৃষ্টি করে। সন্দেহ লক্ষ করেনি আমাকে। সন্তর্পণে গিয়ে পিঠে হাত রাখতেই সচকিত হয়ে এলো—তাড়া সরীটা কোলে টেনে ঘরবর করে।

ফীরোজ নট্

ছুটে ফুটপাতে মুখ বলল, 'কই? টাইপ টাইপ। আমি ভাবলুম আর কেউ!

—কেন? আর কাউকে আশা করছিলে?'

—না, না—। একটু, অন্যমনস্ক ছিলাম।'

হঠাৎ মুখ ছড়িয়ে দেখে মুখের মুখ; মনে হলো সাঁতেই লজ্জা পেয়েছে। এর আগে আর কখনো ওকে আরক্ত হতে দেখিনি। কী জানি কেন, মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত খুশীতে ভরে উঠল মন। বড়ো ভালো লাগে, মেয়েদের এই হঠাৎ প্রকাশটুকু—এই হঠাৎ কোঁপে ওঠা, সব বাঁধন হারিয়ে ফেলে যখন তারা মুখোমুখি হয় একমাত্র নদীতে। মানুষ অন্তরালের চোখে, মনে হয়, অভিনয়ের ভিতরে কোথাও খুলে পড়ছে একের পর

WOOL for Modern fashion
Latest Design
Y. O. WOOL & HOSIERY HALL
171/1/1A, Rash Behari Avenue
Calcutta-19 • Ph. 46-7948
★
Y. O. WOOL HOUSE
149, Rash Behari Avenue
Calcutta-29 • Ph. 47-7058

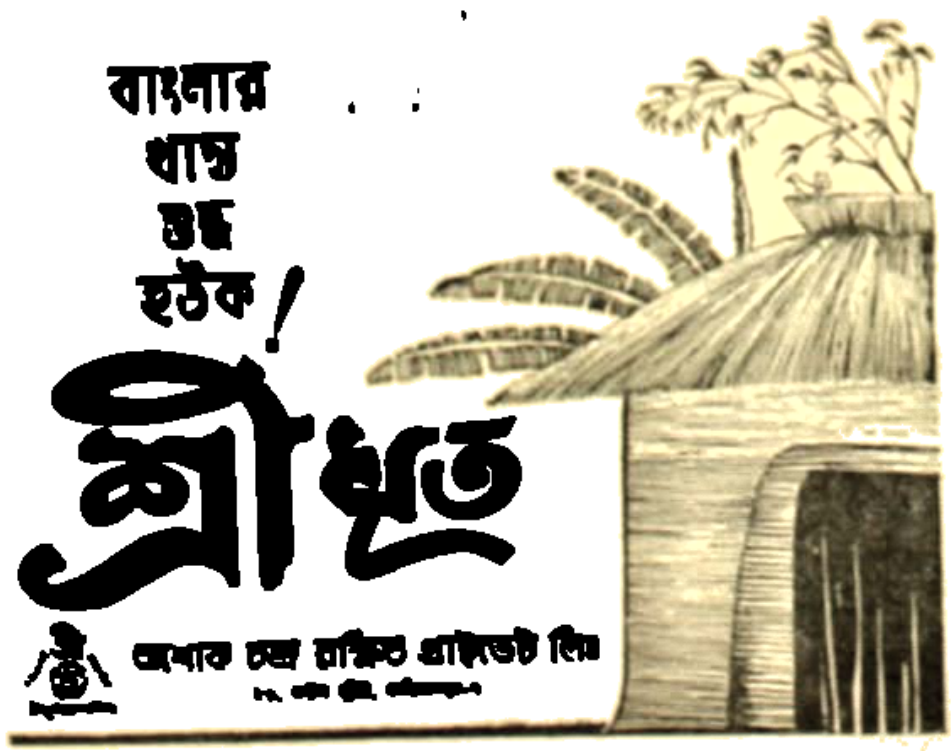
বাংলার
খাস
ঘরে
হুবহু!
শ্রীঘৃত
অমার চন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিঃ

AIR

[illegible]

ভড়কা করে এনেছে গলায়—
'তোক ছেলেদের পেলেমানুষ'
—ধাট মেক মী মাড!
হাউ স্যাড হিট ইজ টু বী
ইললাউট হিয়ার!'

ঠিক জানি না স্যালীর কোন্ টেলাসের কথা ছেড়ে আজ সে কারের হচ্ছে স্মরণে। ওর ঠোঁট-মুখের বিচিত্র বিকলা লক্ষ্য করতে করতে আমার ফিরিয়ে আনলুম বুবকে। বীয়ারের প্রথম বিন্দুটা যায় এসে দিল জগাতে।

চলনসই না হয়ে মাইকেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বুবের। জানা সম্ভবত ছিল না। সত্য যা কষ্টদের তারা আজ একটা—কান্নাকাটি এসে তা ঘোচে অনেক বেশী অন্তরঙ্গতায়; কিন্তু বুবে ফেলে সম্পর্কের বেশ নিয়েই খুশী থাকতে চায় মন—বুবটাই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখন। তা ছাড়া, পরস্পরের বাস্তবিক ঠাঁইনি নিয়ে করে আর তারা কৌতূহল দেখিয়েছে! তাই, সে-বছর, ক্রিসমাস ইভে বুব যখন আমাকে তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করল, সেই প্রথম, অবাকই হলুম একটু। বললুম, 'কী ব্যাপার, বুব! এবার কি স্পেশাল কিছু?'

—না, স্পেশাল হবে কেন?' বুব হাসল জোর, 'কোনোদিনই কিছু করি না, এবার বড়ো একা লাগছে: ভাবলাম বনিষ্ঠ দু-একজনকে ডাকি।'

—হুম, মানছ। কিন্তু, তোমার ওই একা লাগার ব্যাপারটা—,' বললুম বুবকে, 'কী হলো?'

—কিছু নয়। তেমন কিছু নয়।' বুব বলল, 'চিরকাল কি দিন সমান যায়! ছেলেরা অবশ্য চোখে পড়ে আমাদের, কিন্তু মন কি চিরকাল একই থাকে থাকবে! সে বলবার না!'

কথাটার ছেলেমানি আছে। বুবের বুবে সোনা বলেই বলা পড়ল আরো। ছেলে বললুম, 'ভেতরে যাবার সুযোগ তো কোনোদিন পাইনি, তাই ওপরটাই দেখি। আমাদের ভাষায় একটা কথা আছে, চিনেবাদাম। তুমিও তাই।'

উজ্জ্বল সন্ধ্যের চোখে তাকিয়ে বুব বলল, 'চেষ্টা করব, বুঝতে পারছি। কথাটার মানে কী?'

বুঝেই একটা ইংরাজী বিশেষণের অভাবে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হোল করলুম আমি। তারপর বললুম, 'এরকমটাই কথাকাছি অর্থ। তাও ঠিক বলা হলো না।'

—'ডিনার শুরুর সময়ে ওটা বাবহার হয়।' বুব বলল, 'আমি তো সাধারণ মেয়ে, ডি। বুব-বুব নিয়ে থাকি। ঘটোই বড়ো চেঞ্জার—জীবন ভরে দেয়।'

কথাগুলো আবার স্পষ্ট লাগল। যতো সহজে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলুম আমি, বুব তার কাছাকাছি গেল না। বরং নিজের সম্পর্কে আরো একটা ভিন্ন সৃষ্টি করে গেল ডায়ার মতন। সত্যিই তো, ভাবলুম, আমার দেখাও তো ওপর-ওপর দেখা; এতোদিনের পরিচয়ে যে-সব প্রতিক্রিয়াকে আমল দিয়েছি, আবেগের বশীভূত হয়ে কাছাকাছি আসতে চেয়েছি বুবের, তার পরটাই কি বাইরের আবেগ নয়? ভিতর থেকে যাকে দেখা হলো না, তার বুব এবং বুবের পরিচয় আমি পাব কী করে!

বুব শরীর ঝলকানো সেদিন ঝুকড়ে উঠল। কনকনে ঠাণ্ডা চুকে পড়ল হাড়ের ভিতর। যাবো কি যাবো না ভাবতে ভাবতেও শেষ পর্যন্ত বুবের উপরে রওনা হলুম আমি। রাস্তা ফাঁকা প্রায়, বোকাই যায় ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রকোপ এড়াতে কেউ আর বেরোয়নি। ট্রাম-বাসেও লোক কম। কন্ডাক্টারের গলা ঢাকতে ঢাকতে একটা আনন্দ মন হয়ে এলো আমার মধ্যে। টেন পেলুম, ভিতরে কোথাও খুলে গেছে উনে—অন্ধকার যাদুঘরের পড়ে থাকা জন্তুর মতো সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে এক টুকরো আলো। ভাবতে ভালো লাগল, যাকে চিনি না, তারই অভ্যর্থনার টানে যাচ্ছ আমি উৎসুক করেছি নিজেকে। আহ্লাদটা বুবের দিক থেকেই এসো প্রথম। আমার বন্ধুরা আছে, সম্পাদক; জানি না বুবকে কোনোদিন ঠিক এইভাবে ভাবতে পারব কি না।

বুব একটা ধারণা বিরোধিল। বেরিয়ার মধ্যেও রিপন স্ট্রীটে ওর বাড়ি চিনে নিতে অসুবিধে হলো না কোনো। বুব থাকে তেতলায়। পুরনো, ফেটে রঙ বাড়ি, ইতিমধ্যেই কলহে আরম্ভ করেছে পলেস্তারা, জানলা-বরজাগুলোও বিবর্ণ, ভাঙা-চোরা। সামনের জমিতে একটা ডাস্ট, কলকাতার্যান মোটরগাড়ির জঞ্জালের আশেপাশে ঘাস গজিয়েছে। বাড়ির গা-ঘেঁষা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে হয় তেতলায়। সিঁড়িতে পা দিয়েই কানে এলো পাঁচটার শব্দ—মনে হলো বুব চলা অন্ত তবাই পুরুষালি গলার চেনে-চেনে কে যেন গান গাইছে। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন অপরিচিত লাগল। কন্ডাক্টারটা ভয়ের করে গলার ছড়িয়ে নিয়ে একটা আওয়াজ হাওয়া সেঁজিয়ে এসে আমি। তারপর গলার চোকা কিছুতে আসতে। একবার, দুবার।

দরজা খুলেই বুবের। আমাকে ভিতরে টেনে নিয়ে বন্ধ করে দিল আবার।

—'এলো, ডি। আর্যাছলুম আসবে কি না। কী ঠাণ্ডা বলো তো?'

—'হ্যাঁ, ঠাণ্ডাটা জোরই পড়েছে—'

গানের উলে স্পষ্ট হলো। ঘরের কোণে একটা ক্রিসমাস ট্রী লাল-নীল-হলুদ ছোটো ছোটো বাল্বে দিয়ে সাজানো। বুবের সাদা ফ্রককে মনে হলো এইমাত্র বসানো হয়েছে। এ-সবের পা-ঘেঁষে পুরনো ইজি-চেয়ারে বসে কালো, মোটাসোটা চশমাপরা একটি লোক চোখ বন্ধ করে সুর তুলছে গাঁটারে, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে চাপা অস্ফুট গলায় ছেড়ে যাচ্ছে কোনো গান; স্পষ্ট ও জড়ানো বলেই কথাগুলো ধরা যায় না ঠিক। কিন্তু সুরের বিষাদ ঠিকই উপলব্ধি করা যায়। আমার আবির্ভাব লোকটিকে স্পর্শ করল না।

বুবের ছেলেমেয়েরা তড়োতাড়ি ঘিরে ধরেছে আমাকে। এক-এক রকম ছোয়া তাদের: প্রায় অস্তিত্বহীন গলায় তারা 'মেরী ক্রিসমাস' বলে স্বাগত জানাল আমাকে। সবচেয়ে ছোটোটি মেয়ে—কুটকুটে, বুবের পড়ন বুবেরই মতো, এখনো মেঝের পা পড়ে না ঠিকমতো। তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই একটা আবেগে বুকে উঠলুম আমি। মনে হলো, এই সেই শিশু যাকে আমি চিনি তার জন্মেরও আগে থেকে। অনেক দিন আগে চৌরঙ্গীর এক রেস্তোরাঁয় বসে বুব আমাকে তার কথাই বুলে শোনাচ্ছিল খলনার দাদ, সেদিন এই শিশুটিও ছিল তার সঙ্গে, অন্তর্নিহিত। পাখি-পড়ার মতো মাথা দুলিয়ে এখন সে একই গলায় বলে যাচ্ছে, 'মেরী ক্রিসমাস, আংকল, মেরী ক্রিসমাস!' হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নিলুম আমি, বুবকে বললুম, 'আমাদের বন্ধুত্ব অনেক পুরনো হয়ে গেল, বুব!'

আমার গলায় কি বিশেষ কোনো আবেগ ফুটেছিল? জানি না। এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বুবে হঠাৎ কাঁদল বুব। কাঁপা গলায় বলল, 'ইয়েস, ডি। যেন এমনিই থাকি।'

আজ বুবকে যেন অন্যরকম লাগছিল — আহত, শোকস্তব্ধ। মেয়েটিকে কোল থেকে নামিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'মাইকেল কোথায়?'

—'জানি না।' একটা দীর্ঘশ্বাসে চাপল বুব, প্রায় না-বলা গলায় বলল, 'মেঝ বছর তার কোনো পাত্তা নেই। শুনি, টাটায় চাকরি করে আজকাল।'

কথা ফুটল না বুবে। বুবো-বুঝি বাঁচিয়ে, বুব এখনো বলতে বলেনি আমাকে। আমার ও বুবের মধ্যে ঝিম ঝিম শব্দে ঝেলা করছে বাসঘেরালি গাঁটারের শব্দ। একটু চুপ করে থেকে বুব হঠাৎ ডাকল লোকটিকে, 'জোসেফ, তার হাঁয়ার!'

ইজি-চেয়ারে গাঁটারটা বুবেরে রেখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল লোকটি। মোটাসোটা মেয়ারা, কিনীত, ডাকনোর ধরনেই বুঝলুম চোখের দোষ আছে। সম্ভবত ঘোলা একটু,

মাত্র এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। বাংলা ভাষায় প্রথম আক্ষরিক অনুবাদ।

## তোমার রচনা সমগ্র

সারা বিশ্বের ষোট চারটি মহাকাব্যের মধ্যে প্রীক মহাকবি হোমারের দুটি অমর মহাকাব্য ইলিয়াড ও অডেসীর নতুন গদ্যানুবাদ উনিই প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষান্তর সত্ত্বেও মহাকাব্যিক অলঙ্কার ও রস সম্বন্ধিত মহান ভাবসমৃদ্ধি যাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে যথাযোগ্য। সততা ও সতর্কতার সঙ্গে অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অনুবাদক সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। গ্রাহকমূল্য ৪৭ টাকা। পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হোন। শীঘ্রই সংখ্যক ছাপা। সুদৃশ্য বাঁধাই ও মজবুত বাঁধাই।

## শেক্সপীয়ার রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। ৪র্থ খণ্ড বেরিয়েছে। গ্রাহকমূল্য বাট টাকা। ৫ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হোন।

## মপাসাঁ রচনাবলী (৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

দুই খণ্ড বেরিয়েছে। গ্রাহক মূল্য চল্লিশ টাকা। ৫ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হোন।

বুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৬১৮০

অনর্থক হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে।

—জোসেফ, দিস ইজ মি। আমরা একসাথে ভাত খাই—'

—'মেরী ক্রিসমাস!' জোসেফ হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। কোনো কথা না বলেই, তারপর, আবার ফিরে গেল নিজের জায়গায়। গীটারটা তুলে নিল হাতে।

মাইকেল চলে গেছে, সেদিন এটাই ছিল খবর। দুঃখকে মনে হয়েছিল খুব একা। সেদিন জানতুম না, গীটারের ধ্বনি তাকে টানছে আর একদিকে।

১৩৪

সন্ধ্যেবেলা একটু বেশী তন্ময় হয়ে পড়েছিলুম আমি। বাঁয়াতবলার ছিন্ন-ভিন্ন আসর থামার মতো হাঁফিয়ে পড়ছিল শিল্পী স্বাধুতে; সন্ধ্যেবেলা সেটা উপলক্ষ, আসলে সর্বক্ষণই আমাকে টানছিল ঘরে। তাঁর ও কাঁতালো সন্ধ্যাতি কখন পাল কাটিয়ে গেছে—দুঃখের বিস্তৃত জলের ঘেরা ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো কখন ভেসে উঠেছি একা, খেয়াল করিনি।

দুঃখ আমার হাত ধরে টানল।

—'এসো, নাচবে না?'

সাধারণিক বিরতিতে জ্বলে উঠেছে আলো। পুরোপুরি নিজেকে ফিরে পাবার আগে হাল ছেড়ে দেয়ার স্পষ্টতা। মাইকে আর এক নাচের প্রস্তুতি ঘোষণা করা হলো। এবারে আলো নিয়ে বসে আমার দুঃখ হয়ে রয়েছে উৎসবে। আশেপাশে তাকিয়ে হাসা-হাসিকে খুঁজলুম আমি। একটু পরেই চোখে পড়ল দুটিন টেবিল দূরে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে মোকর্তা। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে দুঃখ বলল, 'ওরা খেয়া হয়েছে, এখন উঠবে না।'

আলো নিয়ে গেল। আলো আলোর দুঃখের সবুজ দুঃখের দিকে তাকিয়ে আমি বললুম, আরু, দুঃখ। আমি নাচতে জানি না। তুমি ডেকেছিলে, তাই এসেছি।'

বাজনার সঙ্গে কখন তালাপালা হয়ে যায়। চৌবাচ্চার ভিতরে মোচা ফেরে আবার ছটফট করতে শুরু করেছে ফড়ফড়িয়ে। হঠাৎ গান ভেসে এলো ঘরে—

ইট হ্যাপনড্ আফটার দ্য সান্—
ইট এল্স দ্য ট্রেট ফান্,
হাউদ পাইপ্ দ্য মাউথ—

ফান, ফেক ফান।'

কানে ঠোঁট ছুঁইয়ে সেই গানের ভাষা আমার মাথে ছড়িয়ে দিতে চাইল দুঃখ।

—'তি, তোমার সঙ্গে দেখা হবে ভাবিনি। ভয় হলো। এসো, আমি শিখিয়ে দেব তোমায়। মনে হবার মতো তো কিছু নেই। এসো, আজকের রাতটাই হয়তো মনে থাকবে আমাদের—'

অন্তরিয়োজ্য সেই আকর্ষণ। অন্যান্যেই কখন যে জোরে ঘুরপাক ছিল দেহি দুঃখ নেই। অনেকদিন বাদুরের বন্ধনে ধরে আছি দুঃখকে। আমার কাঁধে দুঃখের দুঃখ, গলায় ছড়িয়ে আছে একখানি কোমল হাত। জানি, সে হাতের রঙ সাদা। আলাড়ির মতো সরীর দোলাতে দোলাতে অতোদূরে সন্তর্পণ নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি কি ভালো আছো, দুঃখ?'

মনে হলো হাসল দুঃখ। ওর ঠান্ডা, এলানো শ্বাস কান ছুঁয়ে গেল আমার, 'কী শুনতে চাও তুমি? ভালো আছি?'

—আমার খারাপ লাগছে। বলছে, 'না সত্যি, তাই বলো।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না দুঃখ। পরে বলল, 'ভালো কি থাকা যায়, তি? যেমন ছিলাম, তেমনিই আছি। একা, বড্ড একা!'

যেন দুঃখের ঘোরে কথা বলছে দুঃখ। একা শব্দটা ছুঁতে লাগল আমার। দুঃখের ছুঁতের গন্ধে এলো-মেলো হয়ে যাচ্ছে নিঃশ্বাস। আমার নিয়ে বলছে, 'ভোর তোমার। তুমি একের পর একজনের কাছে গেছ, কারুর মধ্যেই স্থির থাকতে পারনি। মানুষ পুরোনো হলে কাছে আসে বেশী। তুমি কি করছ?'

দুঃখ বলল, 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। এখন মনে হয় একটা সঙ্গী থাকলেই মনুষের দুঃখ ঘোচে না, একাকীত্ব কাটে না। কিন্তু, বড্ড দেরি হয়ে যায়নি কি, তি? ছোটো-বেলা থেকেই আমার ভয় ছিল নিজেকে নিয়ে—মনে হতো, একজন কাউকে দরকার যে আমাকে পাহারা দেবে সারাক্ষণ। না হলেই ভীষণ পড়বে অন্যরা। তি, আমার পাহারা-দারটাই আমাকে ছিড়ে খেল। এক পাল ছেলেমেয়ে, একরাশ দুঃখ—এর পর তো আস্তে আস্তে বুড়ী হয়ে যাবো!'

ঠিক বুঝলুম না, দুঃখ ঠাট্টা করছে কি না। সব মানুষের সব অভিব্যক্তি বোঝার মতো অভিজ্ঞতা কি আমার আছে! আলিঙ্গন শিথিল করতে করতে আমি আবার ফিরতে লাগলুম অতীতে।

সামনে চলেছে উৎসব গলার গান, তার মাঝখানে বাজনা—ঘুমে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত থামবে না সম্ভবত। দুঃখ হঠাৎ ঘন হয়ে এলো আমার কাছে। অস্ফুট গলায় বলল, 'ভেব না, ভাবলেই সব ঠোলা-মাল হয়ে যাবে।'

—না, ভাবছি না।'

—'ভাবছ!' পালকের মতো ঠোঁট নাড়ল দুঃখ। বলল, 'আমি জানি, জানি, তুমি ভয়ো নেচ্। তবু, নাচের সুরে নাচেই মন যাও। শুধু আমাকেই ভাবো। চাবো, আমিই সব, আমি ছাড়া এখন আর কেউ নেই তোমার কাছে।'

—শেষ—

সৌর চট্টোপাধ্যায়

ফলপাহাড়ের আদর-এ পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

# লোহার সিন্দুক

## বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

পাঁচকড়ি বাঁ দিকে কাত হয়ে, বড়শির সুতো ধরে টিপ্‌ছে। এমন সময় ছিপে টান লাগল। বিনু-দিদি চেঁচিয়ে উঠল, "ও পাঁচুদা, মাছ লেগেছে, মাছ লেগেছে।" পাঁচকড়ি সাড়া দিল না। বিনু-দিদি আবার চেঁচিয়ে উঠল, "ও পাঁচুদা, মাছ লেগেছে, মাছ লেগেছে।" পাঁচকড়ি তবুও সাড়া দিল না। বিনু-দিদি তখন পাঁচকড়ির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

পাঁচকড়ি চমকে উঠল। পাশ্চাত্য ঘরে বিনু-দিদি হাসছে মুখে। তিনিকড়া ছোট্ট, মাথাভরা ঘোমটা একটা ছাই। বড়জোর মানুষের কোমর অবধি উঁচু। ছাইয়ের ভিতরে ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে চোখ চলে অভ্যস্ত ওর। সঙ্গেও অভ্যস্তগুলো যেন ছাইয়ের ভিতরেই ঘরে বেড়ায়।

ওদিকে ছাইয়ের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে এক মনে পাঁচকড়ি ছিপ বাগাই। পাঁচকড়ির অবশ্য। আকাশের রঙ বদলেছে, পাঁচের বাঁধন আলগা হতে শুরু করেছে, চোখের চারপাশে ঘোলা ধরেছে। কোনদিন কিন্তু থেকে সন্ধ্যাতারা ফুটতে শুরু করেছে। এ সময়টা পাঁচকড়ি ছিপ ছেড়ে নড়তে চায় না।

ধর্মদা গা। তিন দিন একটানা নৌকায় নৌকায় ঘুরিয়ে সারা গায়ে খড় উঠতে শুরু করেছে। চোখ জ্বালা করছে, মনে হচ্ছে এক প্রস্থ যেন ধুলো জমে আছে তাতে।

লক্ষ্মনদীর ঠান পাড়ে না যা পাওয়া, কোন দিকে যে ঘটেছিল ঘটনাটা ঠিক মনে আসছে না ওর। হবেতো বা দিনেই। অন্ধকারে থাকে। কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে হঠাৎ যেন আবিষ্কার করে ফেলবে ওরকমটা। নৌকো থামাতে বলে গাঙ্গেনকে, 'এই খানে, হ্যাঁ, এই খানেই।'

গাঙ্গেনের বড় অদ্ভুত লাগছিল, বুড়োর দিকে তাকাতে।

সকালের দিকে ভাটা ছিল, নৌকো লোঙর করতে হয়েছিল ভাটিয়ালীর বাকে। মিঠা পানির স্রোতে ডাঙায় নামতে হয়েছিল গাঙ্গেনকে। বাঁধ থেকে ফেরে খানিকটা এগোতেই একটা নামহীন ঘেরি চোখে পড়েছিল। ঠৈলাস ভরভরন্ত জল, লোভ সামলাতে পারে নি। ডুবিয়ে ডুবিয়ে চান করে এসেছিল গাঙ্গেন। গামছা নিংড়ে এখন ছাইয়ের গায়ে শুকুচ্ছে।

গাঙ্গেনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে

চিত্রণ ॥ প্রবাসী বিশ্বাস

হলে। ঝেড়ক করছে ঘাড়ে গলায়। চুল ঘরে কিউকাট হয়ে ঘরে ফিরা চরিত্রোচিত গম্ভীর। ছিতলে আমাদের সামনে বসে আছেন করে চৌধ কেউ-ছিল। সে বয়সের যা। গম্ভীর সারা-ক্ষণ নিজেকে কিউকাট রাখার চেষ্টা করেছিল।

গম্ভীরের সঙ্গে ঘিরে করা যৌ পঙ্কজী এখন ছইয়ের ভেতর আলো করে শুয়ে আছে। কুইকুটে চেহারা। ঘটনার ঘরে অমন মেয়ে জন্মায় কি করে কে জানে।

পঙ্কজী হয়তো ঘুমিয়েই আছে ছইয়ের ভেতরে। নৌকোয়েই ঘর সংসার, নৌকোতেই রান্না-বান্না। বুড়ো বাপ অসুস্থ শরীরকে বাইরে নিয়ে একটু ভাত ঘুমে পাড়াচ্ছিল। প্রাচিবাদি চোখে নৌকো সহ এই পঞ্চনদীতে চুকলেও ওর কোন সাড়া শব্দ নেই। মেয়েদের ঘুম এমনি-তেই গভীর।

গম্ভীর বুপাশে জলদের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিল, কি হল রে বাপু, এতো মাইলটেক পথ চুকে গেলাম! এখন জেয়ার চলায় বলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার মুখে ভাটা নামবে যে।

বঙ্গনী একটা হাই ছাড়ল, আলস্য বড় জ্বালা। মুখের সামনে তুড়ি বাজাতে বাজাতে বলল, 'রাতটা আজ এদিকেই কোথাও কাটিয়ে দেব।'

রাতটা যে পঞ্চনদীতেই কাটাতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। ভাটা নামলে উলটো টানে একা একা নৌকো বাওয়া যাবে না, ঘট বড় বাঁক পেরুবেই হোক না গম্ভীর। কিন্তু তবুও ছিল অন্য জায়গায়। ভাটার নদীর জল হু হু করে যখন নেমে যাবে, তখন নদীর চেহারা হবে যাবে এই চেহারা। সারা রাত টান ঠেলে বসে কাটাতে হবে। এই ছোট নদী কতটুকু যে গভীর জানা নেই। গভীর বেশি না হলে নৌকোর নিচে জল থাকবে না। নৌকো যদি কাদায় চেপে পড়ে, তবে মিত্রার দর্শন পাওয়া অসম্ভব নয়।

সুখন কথা নেই। আজ একটা ঘোট, যা কুকাল দাঁড়িয়েছে; কিন্তু ঘট কিছুই থাক, বড়ে মিত্রার কাছে সব জারিজুরি ফুৎ জলদের মতো উবে যায়।

এখনো জোয়ার চলছে, এখনো নৌকোর নিচে জলের বেশ টান। ঠেঁয়ার দা ঘেরে কিলবিল করে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। নৌকো সোজা রাখতে এটুকুও কষ্ট হচ্ছে না। কেন এসেছে।

—'রাতে এই ঘোর জঙ্গলে এভাবে পড়ে থাকাটা কি উচিত হবে?' গম্ভীর প্রশ্ন করল।

—'ঘরাবরির নামে একটা ডোঙা আছে সঙ্গে। কাল সকালেই আবার পটি-মালিতে ফিরে আসা যাবে।'

গম্ভীর আর কোন জবাব দিল না। আবার বনের দিকে তাকাল। জোয়ারের জল বাধা পাচ্ছে না কোথাও। ঘেঁও, খরাল, ছোটবনের ঝোপে ঝোপে ঢুকে যাচ্ছে। জল নেমে মেলে ঝিক ঝিক করবে কাদা। কাল যদি ফিরতে হয় এই কাদার ভিতর দিয়ে কি ভাবে হাঁটবে ওরা কে জানে!

বনের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে আবার ছইয়ের দিকে তাকাল গম্ভীর। পঙ্কজীর পায়ের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। লাল টুকটুক করছে পা, আলতা পরেছে বুঝা করে। পায়ের ভঙ্গি দেখে বুঝতে অসুবিধা নেই, এখনো ঘুমুচ্ছে ও। এতো ঘুম যে কি করে হয়! গম্ভীর কিছুটা বিরক্তই হয় মনে মনে।

পঙ্কজী এখন জেগে থাকলে বাপের এই খামখেয়ালীতে দুটো চারটে কথা বলতে পারত। যে সব কথা গম্ভীর বলতে পারে না, সে-সব কথা পঙ্কজীই বলতে পারত। অথচ পঙ্কজীকে ডেকে তুলতে কেমন একটু সঙ্কোচ বাধে ওর। নৌকাটাকেই একটু আগে, সোনাবাড়ি ঢোকা করে গম্ভীর। মোটের ঘাড়ায় ঘরি বড়ফড় করে উঠে বসে পঙ্কজী।

নৌকোর কুলুনি দেখে বঙ্গনী একবার চোখ ফিরিয়ে গম্ভীরের দিকে তাকায়।

গম্ভীর সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'আর ঘরের মো বুঝোকরা? এল?'

—'আসবে, এখনি আসবে। মনে হচ্ছে এই ঘাটে কাজেই কোথাও পুতে রাখা হয়েছিল। কাপড়ের টুকরোটা ছিল ছেঁড়া ঘুড়ির। পাখা।'

—'এত বছর বাদে কারো এসব!' বিরক্তি প্রকাশ করল গম্ভীর। এই এক বছরে এদের কি কেউ আসে নি এদিকে? সোনাবাড়ির হাটে এত লোকের সঙ্গে দেখা হল, কেউ না কেউ নিশ্চয় আমাদের খবর, পঞ্চ-নদীর ঘাটে নিশান দেখেছে।

—'আমি নিজের হাতে খুঁটে পুতেছিলাম। এই নিজের হাতেই কাপড় ছেঁড়ে দিয়েছিলাম।'

—'তা কি আর অস্বীকার করছি। কিন্তু এখন দু দিনের ব্যবস্থা দেখা! বড়ই এখোমি হতেই বাড় বাড়ন্ত জলদ। ঘোলপাতার ঘোপের নিচে জলকর জরুরে খুব ঘুরছে। ছাড় মিত্রা আমাদের উপর নজর রেখেছে কি না বিশ্বাস আছে?'

বঙ্গনীকে কেমন হতাশ মনে হয় গম্ভীরের। বুড়ো বয়সের জীমরতী ধরল কি।

আকাশ আসনের দিকে তাকায়। আর এ সময় মনে হয় ছইয়ের ভিতর পঙ্কজী পা ঘুটিয়ে নিচ্ছে। নৌকাটা-কে আর ঘোলাতে হয় না, আপনি আপনি মেন ঘুলে ওঠে, পঙ্কজী নির্ঘাৎ জেগেছে এতক্ষণে।

হ্যাঁ, জেগেছে পঙ্কজী। উবু হয়ে ছইয়ের বাইরে নিজেকে অর্ধেকটা বার করে আনে পঙ্কজী।

—'ও মা, এ কোন আষাঢ়ী দিয়ে চলেছ তোমরা?' বিস্মিত চোখে বাইরে জলদের দিকে তাকায় পঙ্কজী।

বঙ্গনী বলে, 'অঞ্জনদী। দু পারে জলদটা একটু বেশি ঘনা হোঁয়েছে এবার।'

পঙ্কজী ছোট্ট পরীস্থানকে ছইয়ের বাইরে বার করে আনে। 'উস্ তো! এই জলদের ভিতর পথ বছর এসে-ছিলে তোমরা?'

গম্ভীর পঙ্কজীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এর তখন শুনে বলে, 'আমি না। তোমার বাবার এসেছিল।'

—'ও বাবার কথাই বলছি।'

বঙ্গনী মেয়ের দিকে তাকায়, 'আমি একা নই, সঙ্গে জনাবদেক লোক ছিল। পটবোয় আমরা অনেক মধু পেয়েছিলাম। সরকারী বাবদের দিয়ে থুয়েও এক এক জনের ঘর শ তিন শ টাকা লাভ হয়েছিল।'

—'এবার তো দেখছি নাম গন্ধ নেই চাকের।'

বঙ্গনী মৃদু একটু হাসল, চাক দেখতে হলে ভিতরে ঢুকতে হয়। ঢোঁ-পোকা নজর করতে হয়। একটা মাছি নজর করতে পারলেই তার পেছনে লেগে থাকতে হবে। তবে না?

গম্ভীর কথনো মধু কুড়োবার দলে ভেড়ে নি। নদীতে নদীতে বাঁওড়ে বাঁওড়ে ঘাট সেরেই বৃষ্টি রোজগার। নেহাতই ঘটনার ফেরে ফিরে করেছে। ছড়োর পাতলার পড়ে বনে ঢুকেছে।

—'তা না হয় বুঝলাম। তবে আমরা তো আর মধু কুড়োতে আসি নি। সামনে এখন রাত নামছে।'

পঙ্কজী বলল, 'রাতে এ জলদের মধ্যেই কাটাবে না কি তো?'

বঙ্গনী একবার মেয়ের দিকে তাকাল। গম্ভীর ঠোঁট একটু বাঁকা মিশিয়ে বলল, 'রাত বাড়লে বনের ভিতর থেকে আমার শলা-শুবুদিরা নৌকার উঠে আসবে। আমি তাদের সঙ্গে মসকরা মসকরা করে কাটাব।'

—'তোমার কি মাথা খারাপ হল বাজান!' পঙ্কজী বাপের দিকে তাকায়।

বঙ্গনী বলল, 'এতই যদি ভয়, তবে এলি কেন? আমি একাই আসতুম।'

—'একা একা আর ফিরতে হত না। এই ফুতুরে জলদে কেউ একা থাকতে পারে!'

—'কাল থেকে আমি জল জঙ্গলে কাটালাম, আমাকে তোরা জঙ্গল দেখাবি!'

ছড়োর পলার কাঁচ ফুটে ওঠে এবার। বিড়বিড় করে আরো কি


## কলেজ পাঠ্যপুস্তক

**দর্শন (Philosophy)**

| | |
|---|---|
| অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেবনাথের প্রণীত | |
| ভারতীয় দর্শন— ১ম খণ্ড—৮ম সংস্করণ | 12.00 |
| ভারতীয় দর্শন— ২য় খণ্ড—৩য় সংস্করণ | 7.00 |
| ভারতীয় দর্শন—৩য় খণ্ড (বেদ ও উপনিষদ) | 7.00 |
| পাশ্চাত্য দর্শন—১ম খণ্ড | 12.00 |
| নীতিবিজ্ঞান—৮ম সংস্করণ | 12.00 |
| সমাজদর্শন—১ম সংস্করণ | 12.00 |
| মনোবিদ্যা—৩য় সংস্করণ | 22.00 |
| অধ্যাপিকা অনুরূপা দেবীর | |
| অমরা—৩য় মু | 6.00 |
| পাশ্চাত্য দর্শনের ক্রমিক ইতিহাস—(বেকন-হিউম) —৩য় সংস্করণ | 12.00 |
| পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (কান্ট) | শীঘ্রই |
| ধর্মদর্শন (Philosophy of Religion) | 22.00 |
| সমাজ-মনোবিজ্ঞান (Social Psychology) | 10.00 |

**শিক্ষা (Education)**

| | |
|---|---|
| অধ্যাপক অরেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত | |
| শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ | 14.00 |
| প্রাচ্যের শিক্ষা সমস্যা— —৩য় সংস্করণ | 15.00 |
| অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ ও রায় প্রণীত | |
| শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৪র্থ মু | 22.00 |
| শিক্ষক শিক্ষণ (B.Ed., Basic) | |
| অধ্যাপক সৌরেন্দ্র রায়ের প্রণীত | |
| শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিচালন | 16.00 |
| শিক্ষণ প্রসঙ্গে মূল্যায়ন ও সংগঠিকরণ | 14.00 |
| শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস | 15.00 |
| প্রাচ্যের শিক্ষা সমস্যা (প্রাচীন ও সমাজে) | 4.00 |
| অধ্যাপক হরেন্দ্র ও রায় প্রণীত | |
| শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস | 16.00 |
| অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ, রায় ও ঘোষ প্রণীত | |
| শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান —১ম সংস্করণ | 25.00 |
| অধ্যাপক ঘোষ ও রায় প্রণীত | |
| শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব | 16.00 |

**ব্যানার্জী পাবলিশার্স**

BP

৫।১।১, কলেজ রো কলিকাতা-৭০০০০৯

ফোন : ৩৪-৭২০৪

সব যেন বাজে। হারমোনিয়ামের বাঁধা আওয়াজ ছেড়ে যায়।

সূর্যের তেজ ক্রমশ হয়ে আসছে। অনেকে পাখির কলকাকলি আবার উপরে, অনেকদূরে। বড় সাহেব গড়গড়ে, তার দুই ছোটোর লক্ষ উঁচুতে পাখিরা। আনমনে খেলাধুলো নদীর ধারে মানুষের ভোরে ঘুরঘুর করছিল, ওপুলো এবার একটা দৃষ্টি করে ফিরে দূরে তরঙ্গ। মাঝখানে একটা নিরিবিলির আসেছে।

বরনী আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে এল, 'এ রকম ঘটনা আমি কতদিন ভর রাত একা কাটিয়েছি তার হিসেব নেই। যারা ভয় পায় তারাই আসলে মরে।'

তবুও মনে পঞ্চমীকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলা হল। পঞ্চমী উত্তেজিত করল না। তবে এ রকম কথা বলে রকম করাও উচিত নয়, বলল, পঞ্চমী মন্তব্য কাউকে ভয় করে না। যতক্ষণ হিম্মত আছে লড়তে জানে, তবে মিছিমিছি বেকার ঝগড়ায় এসে সময় নষ্ট করা।'

—'মিছিমিছি কেন?' ঘুরে উঠল বরনী।

—'মিছিমিছি নয়তো কি! তোমার নিশানা কোথায়? তোমার তুমি কাঠি পুঁতে কাপড় বেঁধে নিশান রেখে গেছ, খুঁজে বার করে দেখাও।'

—'তেমন হলে এখন এসেছি, ঠিক দেখাব। আর নিশানের ভাঁজ একবার ইচ্ছা পাই, তোমাই ছোঁয় করাব, আমি না। আমি বুড়ো হয়েছি, এখন আমার চোখ বোজার সময়।'

—'কি এমন মণি মাণিক্য পোঁতা আছে আমাদের জন্য, তুমিই জানো।'

বরনী বলল, 'না থাকলে এই কুর্নিশ নিই। নেহাত দেবার সময় ছিল একগাদা লোক, নিশান রেখেই চলে এসেছি।'

—'নিশান রাখলে, ওরা কেউ কিছু বলল না তোমাকে?'

—'বলার সুযোগ দিলে তো বলবে!

বরনীকে অবিশ্বাসও করা যাচ্ছে না। সত্য হোক মেয়ে-জামাই দুই তো নয় ওরা! এই কুর্নিশের মধ্যে যখন টেনে আনছে, তখন একেবারেই ফাঁকা হবে না ওর অনুমান। কিন্তু কি এমন সোনা দানা হীরে জহরৎ মাটির নিচে লুকোন আছে ওখানে। আর হীরে জহরৎ যদি থাকই কবের অভিসম্পাত এখনি এখনি ছেড়ে দেবে কেন? কৈফিয়ৎ দিতে হবে না?

পঞ্চমী দূরের ঝাপসা দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে যেমন অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে।

পঞ্চমী ঘাইয়ের ভিতর দিয়ে গলিয়ে এবার ওদিকে চলে যায়। কিছুটা আড়ালে পড়ে যায় পঞ্চমী। ঘাড় উঁচু করে পঞ্চমীকে একবার দেখবার চেষ্টা করে পঞ্চমন। পঞ্চমী ঘাইয়ের আড়াল করে বসার জন্য ঝুঁকে আসে।

আর ঠিক এই সময়ই ও ভড়াক করে নৌকো দুলিয়ে উঠে দাঁড়ায়, 'ঐ। ঐ যে বাজান।'

সন্ধে সন্ধে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে বরনী, 'কি? কৈ?'

হাতের বৈঠোটা হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছিল পঞ্চমনের, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে দুকবার চেষ্টা করে, কি হল? বাঘের কথাই ভাবি করে মনে এল প্রথমে।

পঞ্চমী আবার আড়াল তুলে বলল, 'ঐ যে বাজান, ঐ গাছটার আড়ালে একটা নিশান।

নৌকোটা তরতর করে এগোচ্ছে। বরনী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল, নৌকো বাঁধো। এখানেই; হ্যাঁ, এখানেই।'

পঞ্চমন প্রাণপণে নৌকোর গলই ঘোরায়। জলের টানে পুরো একটা চক্কর খেয়ে যায় নৌকোটা। লোহার কাঠা ফেলবার জন্য বৈঠোটাকে তুলে নিয়ে উঠে আসে। ওপাশের গলুই কাদায় গেঁথে যাবার উপক্রম হয়। কোনরকম সামলে নিয়ে দেরাফি ফেলে পঞ্চমন।

নৌকোটা স্থির হলে ও এগিয়ে এল পঞ্চমীর দিকে, 'তোমার নিশান?'

বরনী অপলক তাকিয়ে ছিল। একটা পরান ডালের মাথায় এক টুকরো হলদে কাপড় ঝুলছে। ওটা কি ছেঁড়া শাড়ি নাকি! কিন্তু বরনী যে নিশান রেখে গিয়েছিল সেটা ছিল সাদা কাপড়ের। এটা যে সেই নিশান নয়, সন্দেহ নেই।

জঙ্গলের মধ্যে এরকম কাপড় ঝুলানো নিশান দেখা খুব নয়। নির্ঘাত এখানে কোন অজানা মরীচি গ্রাম হারিয়েছিল। তারই চিহ্ন ঐ নিশান।

কেমন থমকে গেল বরনী।

পঞ্চমী শুধাল, 'ঐ নিশানটা না বাজান?'

বরনী বলল, 'না। তবে এখানেই নৌকো রাখব আমরা।'

—'ঐ নিশান নয়, তবু এখানেই থাকতে হবে।' পঞ্চমন বিড়বিড় করে উঠল।

'জল নেমে গেলে নিশানের কাছে যেতে হবে। দেখতে হবে কতদিনের পুরোনো ওটা।'

—'জল নামতে নামতে তো রাত হবে। রাতে এই অচেনা জঙ্গলে?'

বরনী গহনের দিকে তাকাল, 'রাতে না, কাল সকালেই ওটাকে ভালো করে আগে দেখে নিতে হবে। হঠাৎ হঠাৎ ওরকম নিশান দেখা জঙ্গলের মধ্যে ভালো নয়।'

—'কেন?' গলার স্বর চেপে বলে পঞ্চমীর।

—'ও রকম নিশান থাকা মানে, কেউ না কেউ এখানে প্রাণ হারিয়েছে।'

—'প্রাণ হারিয়েছে! প্রাণ হারিয়েছে কি রকম?'

—'বাঘে তুলে নিয়ে যেতে পারে। সাপে কাটতে পারে। পা হড়কে পড়ে মুখে গেঁথে যেতে পারে। তা ছাড়া আরো কতভাবে মরতে পারে। অন-বিবির রাজ্যে কেউ ও রকম ভাবে মরে গেলে নিশান রাখতে হয়। ওতে আত্মার শান্তি হয়।'

পঞ্চমন নিশানটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিল, অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর একটু পরে অন্ধকারে ওটা মিশে যাবে।

—'তার মানে ঘরে আজই বাঘ আছে।'

—'থাকতেও পারে। নাও থাকতে পারে। থাকুক আর নাই থাকুক, সারারাত আমাদের পালা করে জাগতে হবে।'

বরনীকে এখন পাকা একটা খুনীনের মতো মনে হচ্ছিল। খুনীন তার সব কৌশল একসঙ্গে দেখায় না। অল্প অল্প করে তার ঝোলা থেকে ছাড়ি বুটি বার করে। বরনীও যেন সমস্ত রহস্যটা একসঙ্গে খোলসা করতে চায় না। অল্প অল্প করে রহস্যের খোলস ছাড়াচ্ছে।

—'তার চেয়ে পাঁচকাশির মুখে পিছিয়ে গিয়ে নৌকো রাখলে হত না?' পঞ্চমনের চোখে মুখে কিছুটা যেন আতঙ্কের ছায়া।

বরনী বলল, 'এমনও হতে পারে যারা নিশান পুঁতেছে, তারা আশে-পাশেই কোথাও ছত্র পেতে। অন্ধকারে সন্ধে চাই কি দেখাও হয়ে যেতে পারে। এখনেই নৌকো রাখা ভালো। তা ছাড়া পাঁচকাশির মুখটা খুব সুবিধের নয়।'

—'কেন?'

—'ভাকাতের বড় ভয় ওদিকটায়।'

—'ডাকাত যদি পাঁচকাশির মুখে আসতে পারে, তা হলে ঐ সন্দেশখালির ভিতরে আসতে বাধা কি!'

বরনী হাসল, 'পাঁচকাশির মুখে বাঘ মেরেছে; এমন ঘটনা কম, কিন্তু এদিকে মিত্রা সাহেবের উপদ্রব বড় বেশি। চোর ডাকাতেও বড়ে মিত্রাকে ভয় পায়।'

পঞ্চমী বলল, 'তোমাদের কথাবার্তা শুনে আমার কিন্তু ভয় করছে। কি কারেন্সাহেই টেনে আনলে আমাদের বলো দেখি।'

বরনী মেয়ের পিঠে হাত রাখল, 'আমি যখন সঙ্গে আছি, ভাবনা কি। আমি বরনী বলছি, এখন না হয় বুড়ো হয়েছি। হাতের মুঠিতেই একদিন বাঘা পুড়ো করে দিতে পারতাম বাঘের।'

পঞ্চমন নৌকোর পাটাতনে শুয়ে পড়ল, 'এর চেয়ে ভয় করে মাছ মেরে খেলাম সেও ছিল ভালো। রাতারাতি সোনা গয়না পাইয়ে বড়লোক করে দেবে বলে তো নিয়ে এলে বুড়ো কর্তা। না জানি কি দুর্গতি লেখা আছে কপালে।'

বরনী হাসল, 'কর্তাবাবা যাদের সহায়ে তাদের কে কি করবে শুনি। এসব জায়গায় বুকে শুধু সাহস রাখতে হয়।'

পঞ্চমীকে এতক্ষণ পর তামাক সাজতে বলল বরনী। দিনের বেলা একবার যা রান্না হয়েছে, তাই জমা হয়ে আছে, রাতে আর রান্নার কোন প্রয়োজন নেই। আর একটু রাত হলে ঘাইয়ের ভেতর জড়াজড়ি করে বসে গল্প করতে করতে কাটাতে হবে। আবার প্রবল স্রোতের মতো ঘাইয়ের ওপরে একটা লম্বা জেলনে বুলিয়ে রাখতে হবে।

পঞ্চমী তামাক সাজতে সাজতে বলল, 'যাজান, এই যে নিশান, এখানে তা হলে সাঁঝা সাঁঝা একজন কেউ

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং
স্থাপিত ১৯০৯
ভারতের তৈরী বিভিন্ন প্রকারের ইলেকট্রোপ্লেটিং কেমিক্যালস,
পলিসের দ্রব্যাদি এবং যন্ত্রসমূহের ডিষ্ট্রিবিউটার
১৩, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ফোন গোডাউন: ৩৪-৩১৭৩ অফিস: ৩৪-৪৮-৪৬

যারা খেয়ে?'

—নিশান থাকা মানে তো ভাই।'

—মানে, তাকে বাঘে তুলে নিয়ে খেয়ে।'

—তা বলি কি জন্য! তবে বল যারা এসেছিল তাদের মধ্যে একজন সেই এখানে ফিরে গেছে। জল্লাদের একটা নিয়ম আছে, কোন আপদ বিপদ ঘটলে নিশান পুতে রেখে পিটেলবাবুদের খবর দিতে হয়।'

পিটেলবাবু অর্থাৎ সেরীল বাবু। পাঁচকড়ি অর্থাৎ আসতে ওরা বার দুয়েক পিটেলবাবুদের বোট দেখেছিল। এবারে বোট দেখেছিল। আর একবার ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল অফিসাররা, কোথাকার নৌকো হে?'

উত্তর দিয়েছিল বরুনী, 'আজ্ঞে হুজুর মরিচ্চির।'

—কোথায় যাওয়া হবে?'

—আজ্ঞে, মধু কুড়োতে, শঙ্খের পার।'

—'পারমিট আছে?'

—'আছে হুজুর।' বরুনী পারমিট আছে বলে ডোকরা।

—তা তোমরা তো তিনজন আর মানুষ, তাও আবার একজন মেয়েছেলে।'

কথা ছেড়ে দিয়েছিল বরুনী, 'আজ্ঞে হুজুর তিনজনে কি আর মধু কুড়োন যায়, আরো সঙ্গী আছে আমাদের। তারা আগেভাগেই চলে গেছে।'

পিটেলবাবুরা আর ওদের ঘাটায় নি। 'ঠিক আছে যাও, ও দিকে কিন্তু বড় উপদ্রব শুরু হয়েছে এবার। সাবধানে চলাফেরা করো।'

—সে আর বলতে হবে না বাবু!' বরুনী চোখের ইশারায় আবার নৌকো ছাড়তে বলেছিল সঙ্গীদের। পিটেলবাবুদের সঙ্গে বেশি কথা বলতে নেই। প্রয়োজন যেটুকু যায়, তার বেশি গেলেই ঝামেলা বাড়ে।

পঞ্চমী দুকোটাকে এগিয়ে দিল, 'তা হলে ওরাও পিটেলবাবুদের খবর দিয়েছিল?'

—দিতে পারে। অনেক সময় এমন হয়, বড় মিঞা তো ভুলে নিয়ে গেল, বাঘে তুলে নিয়ে গেল তাকে তো আর ফেলে রেখে চলে আসা যায় না। পিটেলবাবুদের ঘরে এনে খোঁজ খবর শুরু করতে হয়। পিটেলবাবুদের সঙ্গে জল্লাদ থাকে, রাইফেল থাকে।'

—খোঁজ করে করে পাওয়া যায়?'

—কখনো কখনো যায়, কখনো যায় না। যদি পাওয়া যায় তা হলে গ্রাম পাওয়া মেয়েটা মাটিতে পুতে রেখে নিশান পুতে দিয়ে সঙ্গীরা চলে যায়।'

—যদি না পাওয়া যায় বাজান?'

—যা পাওয়া গেলে আর কি হবে। যেখান থেকে তুলে নিয়ে গেছে, সেখানেই নিশান পুতে চলে আসতে হয়।'

বার কয়েক দুকোতে টান করে বুড়ো বরুনী এবার দুকোটা এগিয়ে দেয় গজেনের দিকে। গজেনের ঐ পর্যন্ত আসা অবধি কেমন যেন ঝিমিয়ে বসে জঙ্গলের দিকে ও তাকিয়ে আছে। দুকোটা বুড়োর হাত থেকে নিয়ে কিছুটা আবার গা ঝাড়া দিয়ে বসল।

—তবে পিটেল বাবুরাই রিপোর্ট দিয়ে দেবে যা ঘটেছে। নইলে কে বিশ্বাস করে।'

—কেন গো বাজান?'

বুড়ো পঞ্চমীর দিকে তাকাল। পঞ্চমীর কৌতূহলের আর শেষ নেই. হেসে বলল, 'নইলে বাঘেই মারল, না পানিতে ডুবল, প্রমাণ হবে কি দিয়ে? যার একজনের সঙ্গে আর একজনের শত্রুতা আছে, তুলিয়ে ভালিয়ে তাকে জঙ্গলে এনে মেরে মাটিতে পুতে রেখে চলে গেল তখন কি হবে?'

—কি আবার হবে। ফিরে এসে বলবে বাঘে মিঞা নিয়ে গেছে।'

—বললে হবে না পিটেলবাবুর সার্টিফিকেট দেখাতে হবে।'

পঞ্চমী এবার চুপ করে থাকে।

অন্ধকারটা এতক্ষণে যেন জাঁকিয়ে বসেছিল ওদের। বাতাস এখন বেশী নয়, অল্প চাপা ভড় ভড়ানির মতো একটা শব্দ। এই শব্দটা কি সমুদ্রের দূরে ঢোকার সময় থেকেই শুনতে পেয়েছিল, ঠিক খেয়াল করতে পারল না ওরা। হয়ত এতক্ষণ ওরা ভয় উত্তেজনায় মধ্যে ছিল বলেই শব্দটাকে শুনতে পায় নি। এখন অন্ধকারে নদীর টানের শব্দটা বেশ স্পষ্ট।

সমুদ্রে জঙ্গল এখন জমাট বাঁধা কালো একটা পাহাড়ের মতো। দুটো চারটে করে জোনাকি পোকার আলো জ্বলতে শুরু করেছে। জ্বলছে আর নিভছে। জোনাকির আলোয় জঙ্গল যেন মনে মনে মুচকি মুচকি একটা হেসেছে নিচ্ছে।

আলো জ্বালাল পঞ্চমী।

ছইয়ের ভিতরে কম্বল বিছানো ছিল, আলো হাতে উঁকি দিয়ে ছইয়ের ভেতর ঢুকল।

ভাঁটা নামতে শুরু করেছে কি না দেখবার জন্য বরুনী একটু ঝুঁকে তাকাল জঙ্গলের দিকে। নৌকোর নিচে একটানা জল। ভাঁটাতে নদীর জল নামতে পাতাল অবধি চলে যাবে, নৌকোটাকেও সেই সঙ্গে একটু একটু করে নিচে নামিয়ে আনতে হবে। সারারাত জলেই ভাসিয়ে রাখতে হবে নৌকোটাকে।

বরুনী দেখল, জলে কলকলানি জাগতে শুরু করেছে। টুকরো টুকরো আলুনে জলের উপর দিয়ে পাক খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে। কখনো

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, কখনো আবার দুটো চারটে টুকরো একসঙ্গে জোড়া লেগে লম্বা হয়ে আরো বড় হয়ে উঠছে। অন্ধকার রাতে বেশ দেখতে লাগছিল আলুনে-গুলি। আর সেই সঙ্গে কিছুটা ফেন ঘনীভূত পাঁচিল ও, কলকলানি জলো নদীর দিকে বড় মিঞা খুব একটা তাকাতে চায় না। জলুনের এই খেলা দেখে কিছুটা বুঝি ভয়ও পেয়ে যায় বড়ো মিঞা।

পঞ্চমী ছইয়ের ভেতর থেকে ডাকল, 'তোমরা এস গো, খাবার দিয়ে দিলাম, খেয়ে নাও।'

বরুনী বলল, 'চলো হে! কি ভাবছ তখন থেকে? চলো।'

অন্ধকারে জামাই দুজনে ঘাড় কুঁজো করে ছইয়ের ভেতর ঢুকে পড়ে।

রাত্রি বড় এক প্রহর কেটে যায় আলকুশ বাধকুশ করে। পঞ্চমী একবার শুধু হাত মুখ ধোবার জন্য ছইয়ের বাইরে বেরিয়েছিল। বাইরে বেরুলেই গা ছমছম করে। যেমন অন্ধকার তেমন ঝমঝমে ছেনো। রাত্রি দুপুরের পর এক ফালি চাঁদ উঠতে পারে। তখন জঙ্গলের মাথার আলো পড়লে কেমন দেখাবে কে জানে! এখন টানা অন্ধকারে আর ঝিম ঝিম করা জোনাকির ভিড়ে বারবার কেমন ঐ হলুদে কাপড়ের নিশানটার কথাই মনে পড়ছে। যারা নিশান পুতে গেছে, তারা কি মাটির তলায় যাদে খাওয়া সেই হতভাগা মৃত মেয়েটাকেও পুতে রেখে গেছে।

কেমন দেখতে ছিল মেয়েটা! না জানি মেয়ে বাড়িতে তার কটি ছেলে মেয়ে কত কি ছিল। সবাইকে ভাসিয়ে দিয়ে মেয়েটা চলে গেল। পৃথিবীতে এমনি করে কত মানুষ যে বেঘোরে মরে, কে আর হিসেব রাখতে যায়। কিন্তু চোখের সামনে ঐ নিশানটা দেখেছে বলেই না এত কথা মনে আসছে ওর। কে বলতে পারে মেয়েটার আত্মাও ঐ অন্ধকারে মিশে থাকতে পারে এই নৌকোর দিকে তাকিয়ে আছে কিনা।

এই আত্মা ফাত্মার কথা মনে আসতেই, ছইয়ের বাইরে বেরুবার সাহস হারিয়ে ফেলে পঞ্চমী। চোখের দিকে গলুইয়ের বসে দুকো টানতে শুরু করেছিল গজেন, পঞ্চমীই ওকে ভেতরে টেনে নিয়ে আসে। বুড়ো বাপটার ওপর কেমন যেন ভরসা করতে পারে পঞ্চমী। ওর বাপান এখনো মা পারে, গজেনের আবার তা সম্ভব নয়। পারের জোরেই সব কিছু বদি হত, তা হলে আর কথা ছিল না। গজেন সারা জীবনে আর কখনো এমনভাবে জঙ্গলে ঢুকেছে কিনা পঞ্চমী জানে না।

বরুনীও এসে ছইয়ের পাশে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। দেহের অর্ধাংশ রইল ছইয়ের বাইরে। মাছ মারার বারশ কোঁচটাকে এমনভাবে রাখা হয়েছে দুই কলতে যখন তখন তুলে নিয়ে তৈরি হওয়া যায়। একটা কুড়াল রেখেছে গজেন পায়ের কাছে। বাঘেই যদি ধরে কুড়াল দিয়ে কতটুকু সামলানো যাবে, কে জানে। তবু ও তো একটা অস্ত্র।

লগিটাকে পাশে খাটানো খুঁটিতে খানিকটা উপরে ঝুলিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। লগির আসল ছইয়ের ভেতর আসার কথা নয়, তবু

একটু একটু আলো এসে ছেলেদের চশমার কিছুটা কমিয়ে রেখেছে।

পঞ্চমী মাথের ওপর আর একটা কম্বল টেনে বিছিয়ে দিল। সেটার কাছে হাঁটুর স্পর্শ পাচ্ছিল গজেনের। হাঁটুর ওপর একটা হাত ও টেনে এনে পেতে রাখল।

গজেন পঞ্চমীর দিকে তাকাল। পঞ্চমীর পাশাপাশি শুয়ে একটু গড়িয়ে নিতে পারলে হত। কিন্তু এমন ভাবে ভাব করে তাকিয়ে আছে বন্ধুরা, ঘুমোনোটি করতেও সাহস পাচ্ছে না।

পঞ্চমী ডাকে, 'বাজল?'

বরুনী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়।

—তোমরা যে গতবার এসে যে ঘটনাটা বলো।'

গজেনও পঞ্চমীর কথায় সায় দিল, 'হ্যাঁ বুড়ো কর্তা, ঘুপ্টেদের সর্দারকে কি করে পোষ মানালে সে গল্পটাই শোনাও।'

বরুনী বলল, গল্পটাই যদি হবে তা হলে কি আর এই ঝুপ্টিতে নিজের লোকজন কেউ নিয়ে আসে! গল্প-কথা নয়, যা ঘটেছিল তার এক বর্ণও বাড়িয়ে বলা নয়।'

—বেশ, সেই ঘটনাই শোনাও। শুনতে শুনতে রাত কাবার করি।'

এমন জায়গায় সেই স্যাসটেনার গল্পটা যেন অনেকখানি ফিকে পড়ছে। তাঁবুর এখন ভর দোলটা বাকি। এ সময় ঘুপ্টের বাসার নেশা ঘুচে আর লাল কাঁকড়ের ছড়াছড়ি হয়ে থাকার কথা। অন্ধকার বলেই দেখার উপায় নেই। নৌকর নিচ থেকে ভল করে কি পরিমাণ নেটা বোঝবার জন্য নৌকাটাকে ইচ্ছে করেই ডুব খাইয়ে দুলিয়ে দেখতে ইচ্ছে।

বরুনী নৌকোটা একবার দুলিয়ে নিল ভালোমত। তারপর বলল, 'গতবার এসে-ছিলাম মউলির দলে। মউলিবাড়ি থেকে আমরা তিনজন, আর কুড়ি কুড়ির সাতজন। নৌকো ছিল একটাই, ডুমনা সাইজ। ছ বাঁড়ি এক মাঝি। আমার বয়স বেশি বলে আমিই মাঝি হয়েছিলাম। আর যারা ছিল সবাই প্রায় ছেলে ছোকরা এই গজেনের বয়সই ধরতে হবে।

'তা ছেলে ছোকরারা বন জঙ্গলের বোঝে কি! ঘুরার ঘুরার বরুনীদা এটা কি গো, ওটা কি গো? যতদূর সারা বোঝাই।

'গিয়ারিংবাবুরা রাস্তায় আমাদের পারমিট দেখল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের মুখ দেখল। শুনে নিল, ফেরার পথে ওদের সঙ্গে যেন দেখা করে যাই।

'ওসবগুলো সব পরের কথা। দেখা হলে হবে, না হলে আর কে মাথা ঘামায়।'

'আমরা পাড়িখানি নিয়ে সঙ্গে ঢুকলাম। এই এবার যেমন ঢুকেছি সেবারও ঠিক এরকম। তবে সেবার এত বড় জোয়ার ছিল না। নদীর চরাচরি ছিল জল। ওকে জঙ্গলের অবস্থা দেখতে হলে হাইবে উঠে লম্বা হয়ে দাঁড়াতে হয়। আমাদের মধ্যে দু একজনকে ছইয়ে দাঁড় ধরিয়ে দিলাম।'

বরুনী বুড়ো একটু থামল। আকাশ থেকে একটা তারা খসে পড়ছিল, তারাটার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত' যেন আনমনা হয়ে গেল ও।

পঞ্চমী শুধোল, 'তারপর?'

সম্বিত ফিরে পেয়ে বরুনী আবার বলতে শুরু করল, 'তা বুঝাই লোক দুটোকে দাঁড় ফাঁকিয়েছিলাম, ওরা একটা মাছিও নজর করতে পারল না।'

—মাছি?' গজেনের অস্ফুট গলার শব্দ শুনতে পেল বরুনী।

—মাছি মানে, ঐ হল আর কি, নৌ-পোকা। বাদুড়া যাকে মৌমাছি বলে।'

গজেনের অভিজ্ঞতা নেই বহু সম্ভব করার। ফলে ঘুমাটা ও মনে মনে কল্পনা করে নিতে লাগল। একটা দুটো মাছি বা নৌ-পোকা চোখে পড়লে আর সঙ্গে সঙ্গে তার পেছন পেছন দৌড়তে হবে। মাছিটাই কেন মধুর আড়তে পৌঁছে দেবে ওদের।

পঞ্চমী শুধোল, 'মাছির পেছন পেছন অজানাতে ঢোকে যায় কখনো। জন্তুদের যা চেহারা।'

বরুনী বুড়ো সামান্য একটু হাঁপ ছাড়ির হাসে, 'যাবে না কেন, যারা পাকা ঘটাল, তারা মাছির ডানার শব্দ অবধি শুনে যায়। শব্দ শুনেই বলে দেবে, কোন জাতের মাছি। অনেকে আবার এত ঘ ঘু ন হাত দূর থেকেও নৌচাকের গন্ধ পায়। ঘ্রাণশক্তি প্রবল না হলে মউলি হওয়া উচিত নয়।'

—তুমি গন্ধ পাও?'

—আগে পেতুম। এখন বয়স হয়েছে।'

—আর গন্ধ?'

—একটু জল পেলে থাকলে হয়তো বা পেতে পারি। তবে সে দিন কাল আমার নেই।'

পঞ্চমী বাবার দিকে তাকাল। বুড়োর মুখে এক ফালি আলো ফলমলছে হাজিকেনের। ফলমল মুখটা আরো কেমন যেন ভ্যাবসে হয়ে উঠেছে। সারাটা জীবন জঙ্গলে জঙ্গলে মধু কুড়োতে কুড়োতেই লোকটা কেমন যেন একটু একটু করে বুড়িয়ে গেল। আর ক দিনই বা বাঁচবে।

—থাক সে তারপর কি হল বলো?'

বরুনী আবার শুরু করল, 'আমরা তো গন্ধ নাইতে ডাঙা শুরু হওয়া অবধি নৌকো বাইলাম। বুঝাই যাওয়া। একটা পোকারও সন্ধান পেলাম না।

'তখন ঠিক করলাম, আজ আর ফিরে কাজ নেই। এখানেই বিশ্রাম করে রাত কাটিয়ে দেওয়া যাক। ভাল দিনমানে একবার জঙ্গলে ঢুকে খুঁজে দেখতে হবে। চাক পাওয়া গেলে ভালো, না পাওয়া গেলে অন্য কোন জঙ্গলে ঢুকতে হবে।

'সে রাতটা আমরা সেখানেই কাটালাম। পরদিন সকাল হলে সবাই গা হাত পা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। সবাই ঝুড়িকড়া, দা-লাঠি হাতে নিল। কোমরে সবার কুলতে লাগল ছাঁড়ি। সবাই ঠিক করল আমাকেই নৌকায় বসে নৌকো পাহারা দিতে হবে। একজনকে তো নৌকোর থাকতে হবেই, তা আমার বয়স বেশি বলে আমাকেই ওরা রাখতে চাইল। বললাম ঠিক আছে। মধু বা সাগছ হলে একসঙ্গে জড় করে সবার জন্য সমান ভাগ হবে।

'তা ঐ রকমই নিয়ম। আমি নৌতোলেই থেকে গেলাম। ওরা সবাই হৈ হল্লা করে বনের মধ্যে এক এক করে সেঁদিয়ে গেল।

'বনে ঢোকার একটা নিয়ম আছে, জানো তো?'

গজেন জানে না। কিন্তু জানবার জন্য তেমন একটা আগ্রহও প্রকাশ করল না। বুড়োর চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটু একটু করে ও অনেকখানি পঞ্চমীর গায়ে গায়ে সেঁটে এসেছে। পঞ্চমীর গায়ের গ্রাণের আকর্ষণ প্রলোভন ঝাড়তে ওকে এখন রীতিমত রাখতে হচ্ছে। বুড়োটা হয়তো সারা-রাত আজ এইভাবে চোখের সামনে বসে থেকে ওদের পাহারা দেবে।

গজেনের মনে হল, পঞ্চমী অনেক স্বাভাবিক। মুখে দেখা যাচ্ছে না ওর, কিন্তু বুড়োর গল্প শোনাতেই যেন সর্বস্ব ও ঢেলে রেখেছে।

পঞ্চমীই শুধোলো, কি নিয়ম?

বুড়ো একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকাল, 'নিয়ম হচ্ছে, কুড়ি পঁচিশ হাত ধরে ধরে দিয়ে সারে বেরে সব চলতে হবে। এতে পথেরও ভুল হয় না, আর জঙ্গলের অনেক খানি অবধি একসঙ্গে নজর রাখা যায়। একজন কেউ কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্যাপারটাই সাবধান হয়ে তৈরি হয়ে নিতে পারে। আর সবচেয়ে সাহসী যে তাকে রাখতে হয় পিছনে।'

—কেন?'

—ঐ খানেই তো মজা। বরুনী রহস্য করে বলল, তবে মিঞার নজর থাকে ঐ লেজের মানুষটার দিকে। বন থেকে বাঘ ভালুক তুলতে চায় ও তবে লেজের মানুষটার জন্যই জোড়ের মধ্যে আপটি মেরে বসে থাকবে।'

—কেন? মাঝখান থেকে বা সামনে থেকে তোলে না কেন?'

—লম্বের বনের বাঘ তো আর যে সে জন্তু নয়; ওর বুদ্ধি যেমন নেটনে, গায়ে বলও তেমন তাঁসের মতো।'

গজেন কথা না বলে পারল না, 'কিন্তু লেজের মানুষটার দিকেই নজর থাকবে কেন বুঝলাম না?'

—বুঝতে হলে বনে ঢুকতে হয়। আসলে বড় মিঞাও জানে যারা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে তারা সামনের দিকে চোখ রেখেই ঢুকেছে। পেছনে কি হচ্ছে কে খবর রাখে! মাঝখান থেকে বা সামনে থেকে বাঘ ভালুক তুলতে চায় ও পেছনের লোকগুলিই হৈ হৈ করে জানিয়ে দেবে বড়ে মিঞাকে।'

'বড়ে মিঞাও জানে মিছিমিছি কামেলা বাধিয়ে লাভ কি! পেছনের মানুষটাকে নিয়ে সরে পড়তে পারলেই নিশ্চিন্তি।'

—তা হলে তো পেছনে যে থাকবে তারই বিপদ সবচেয়ে বেশি।'

—বেশি বৈ কি! আমাদের গত-বারের দলে পেছনে যে ছিল তার হাতে ছিল বন্দুক। তার কাজ ছিল শুধু বনের দিকে নজর রাখা। সর্দার-দের দিকে নজর রাখা। কোথাও মাছি উড়ছে কি না দেখার তার প্রয়োজন নেই। সামনে যারা আছে তারাই ওদিকে নজর রাখবে।'

নৌকোটা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে-ছিল। নিচে জল এখন নামতে নামতে কোমর এসেছে বোঝবার উপায় নেই। হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় কোমর বাঁকা করে বেশ একবার কাঁকানি দিল বরুনী।

কাঁকানির চোটে গজেন হোমড়ে পড়েছিল পঞ্চমীর গায়ে। পঞ্চমী আবার ওকে ধাক্কা দিয়ে একটু সরিয়ে দিল।

নৌকোর নিচে এখনো বেশ জল আছে, বুঝতে পারল বরুনী। নিশ্চিন্ত


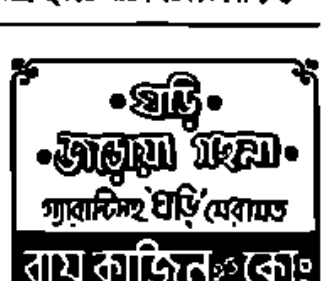

ওমেগা ও টিসট ঘড়ির
অনুমোদিত প্রতিনিধি

হল। আবার নিজের কাঠিনীতেই ফিরে এল।

—তা খোকা দলের সবাই তো বেরিয়ে গেল। আমি নৌকোর ছইয়ের ওপর বসে তা দেখলাম। বনের মধ্যে ওরা মিলে গেল। মিলে গেলেও অনেকক্ষণ ধরে ওদের সাড়াশব্দ পেলাম। হারপর এক সময় সব চুপচাপ হয়ে গেল, কেমন যেন নির্জন হয়ে গেল চারপাশ। জঙ্গলের মাথায় রোদ। শব্দহীনতায় রোদ। রোদ জলে জলে আমার চোখে এসে পড়তে শুরু করল। সকাল বেলার এই রোদের কিরকমের জঙ্গলের আসল চেহারাটা ঠিক বোঝা যায় না। একটু বেলা হলে জঙ্গলের ঘনত্বের চেহারাটা দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় ভয়ের মতো অনুভব করছিলাম। হঠাৎ একটু ঘুরে আসতে বসে খস খস শব্দ পেয়ে আমি চমকে সোজা হয়ে গেলাম। কি রে বাবা! কেমন একটু সন্দ হল। ভাবে ভয় করছি, সেই না কি?

'আমার তখন যা অবস্থা, কি বলব।' ধরনী থামল।

—'কি দেখলে বাজান?'

—'দেখলাম, জঙ্গলের পাশ দিয়ে একটা হরিণ লাফিয়ে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। একেবারে একা। সাধারণত ওরা দল ছাড়া থাকে না।'

'দেখলাম হরিণটা আমাদের নৌকোটা দেখে যেন থমকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বাঙ্ক বাবা বুকে খানিকটা সাহস ফিরে এল আবার। কিন্তু আমি একটুও নড়াচড়া না করে ঠায় বসে রইলাম। হরিণটাকে দেখতে বেশ ভালো লাগছিল। পাশে ওটা থাকায় ভয় এই ভেবে আমি নড়া চড়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

'খানিকক্ষণ ওটা দাঁড়িয়ে রইল। হারপর সামি আরো এক পাল হরিণ ছুটতে ছুটতে হাজির হয়েছে। ছুটতে ছুটতে ওরা এল, হারপর একসঙ্গে আবার লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

'আর হরিণগুলো ছুটে যাবার সময় ওদের পায়ে লেগে কি যেন একটা ঝটাং করে লাফিয়ে উঠল। কি ওটা! কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম জিনিসটার দিকে। কেমন যেন চকচক করছে। ঝলমলে।

'আর তখন চোখ ফেরাতে পারি না। অনেকক্ষণ ধরে সেটার দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলাম কি হতে পারে। কি ওটা! এ রকম বাজে বনে ওরকম একটা চকচকে জিনিস, কি হতে পারে!

'নাহ্, কাছে না এগোলে আর বোঝার উপায় নেই। ছইয়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে খুব ভালো করে একবার লক্ষ্য করে নিলাম, নাহ্, অন্য কোন ভয় আছে বলে মনে হল না।

'একটা কাটারি তুলে নিলাম হাতে। হারপর ধীরে ধীরে নৌকো থেকে নেমে এলাম। তখন জোয়ার চলছে। জল জল করে জল বাড়তে শুরু করেছে নদীর। নদীর দুধারে হাজার হাজার লাল কাঁকড়া, পাঙ্কের খেলা আর বক। আমি তীরে নামতেই দুটো চারটে পাখি উড়তে শুরু করল। কোথাও দূর থেকে একটানা একটা শব্দ ভেসে আসছিল। তীরের মাটি ভর্তি পা ডুবে যাচ্ছিল। পা টেনে টেনে কষ্ট করে তো উপরে উঠে এলাম।'

ধরনী থামল। ছইয়ের ভেতর দিকে মুখ ফেরাল, 'কি গো গজেন, শুনছো নাকি?'

গজেন যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল। বলল, 'আ।'

পঙ্কজী বলল, 'কেউ শুনোর নি। তুমি বলো।'

বাইরে জোনাক পোকার ভিড় এখন চারপাশে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও সাথার শুদ্ধ ঝোকা ঝোকা ঝিল্লিধ্বনি করছে। কোথাও আবার বেশ কিছুটা হালকা। জঙ্গলের আর আকাশের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না অল্পক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঠবে।

ধরনী আবার শুরু করল, 'আমি তো ধীরে ধীরে এগিয়েই গেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম একটা ঘাদুলি। বেশ বড়।'

—'ঘাদুলি!' পঙ্কজী ঝোরের দিক থেকে মেয়েটা খানিক ঝুলে বলল। এক হাতে মেয়ের ভর রাখল। খুব ভয় হয়ে গেছে ও।

—'ঘাদুলির সঙ্গে একটা চেন। চেনটা ঝুপোর কিন্তু ঘাদুলিটা ছিল সোনার।'

—'ওমা, কিচ্ছু বল নি তো আমাদের।'

—'বলি নি, হোসের সেটে কথা থাকবে না বলে।'

গজেন বলল, 'ওটা যে সোনারই কি করে বুঝলে বুড়ো কর্তা।'

—'মইবাড়িতে এসে সাকরাকে দিয়ে পরখ করিয়েছি। অর্ধেক ভাগে ওটা সাকরার কাছে বিক্রিও করে দিয়েছি।'

—'বিক্রি করেছ, অথচ তাইকে কিছু বল নি।' পঙ্কজীর গলায় কিছুটা যেন অভিমান ঝরে পড়ল।

—'ঘাদুলির কথা বলি নি ঠিক। সাইকারের কাছে মাত্র বিক্রি করে দেয়েছিলাম সেড় শ, আর ঘাদুলি বেচে পেয়েছিলাম শ' খানেক। তখন প্রায়ই আমি ভাবতাম, আমি কিনব, শুনিস নি?'

পঙ্কজী চুপ করে থাকে।

—'কিন্তু টাকাটা যে কি ভাবে খরচ হয়ে গেল কে জানে! আমি কেনা আর হয়ে উঠল না।'

গজেন বলল, 'হারপর কি হল বলো? ঐ ঘাদুলিটাই তো আর খুঁজতে নয়, খুঁজতের কথা বলো।'

নৌকোটাকে আর একবার ঘুলিয়ে নিল ধরনী। হারপর আবার শুরু করল, 'ঘাদুলি তো পেলাম। কিন্তু ঘাদুলি পাওয়াতে আশ্চর্য হওয়ার তেমন কিছু ছিল না। হয়তো কেউ সাহের হাতে ছাঁকল দিয়ে গেছে, তারই ঘাদুলি ওটা। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম অন্য কারণে।'

—'কি কারণে?'

—'দেখলাম, ঘাদুলিটা যেখানে পড়েছিল তার থেকে হাত তিনেক দূরে মাটির মধ্যে কি একটা জিনিস। হাত দিয়ে তুলতে গেলাম, মনে হল ঐ মাটির সঙ্গে আটার মতো কিছু একটা লাগান, সেটা মাটির মধ্যে সেঁধে রয়েছে। জিনিসটা যে কি, প্রথম দিকে ঠাহর করতে পারি নি। পরে খানিকটা মাটি খুঁড়ে ওর চোখা আলগা করে তুলতেই কেমন অবাক হয়ে গেলাম। আবলুশ কাঠের একটা হাতা বই তো নয়। এটা এল কি করে!

'হাতার মতন পড়ে থাকায় তোকার উপায় নেই, তাহলে হয়ে এটা ওখানে পড়ে আসে।

'তোরাই বল, একটা ঘাদুলি পেলাম, দু তিন হাত খুঁড়ে একটা লোহার হাতা পেলাম, আসলটা যে সন্দেহজনক তাতে ভুল আছে?

'হাতা বেশ খানিকটা ভাবনা জুড়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলাম। নাহ্, আর কিছু নেই। আর কিছু নেই ঠিক, কিন্তু তবু মাটি খুঁড়ে কিছুটা দেখে নিতে ইচ্ছে হল।

'হাতার আঁট দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে গর্ত করে করে দেখতে শুরু করলাম।'

—'তোমার সাহস আছে বাজান।'

—'আসার কেন, ও রকম অবস্থায় পড়লে তোমারও সাহস হত। তা ছাড়া আমি তখন একটা নৌকো পাহারা দিচ্ছি, ভয় নেই। বসে বসে ঘণ্টা খানেক মাটিই খুঁড়ে শেষ করি কি।

অবশ্যই মনে পড়ে হাত খুরপের মতো খুঁড়েছিলাম। হঠাৎ খটাস করে কিছুতে একটা যেন ঠোট লাগল। প্রথমে মনে হয়েছিল কাঠ, কিন্তু কাঠ নয়। আর একবার ঠোকা মারতেই মনে হল লোহা-টোহার মতো কিছু একটা হবে। কি হবে যে বলা! এ সময়ে কারে মনোবল ঠিক থাকে? সুন্দরবনের জঙ্গলে ওত কিছু, যে লুকোন থাকে হার তো আর লেখা-জোখা নেই। অমনি বাদ ঠাকুরের মুখে শুনেছি অনেকের দিশে ডাকাতরা নাকি ডাকাতি করে লোহার

সিন্দুকে সোনা থাকলে তবে ঐ সব জলজন্তু লুকিয়ে রেখে যেত।

'অসম্ভব কি! ভগবান বুঝি আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, অমনিতে ডেকে এনে ও ভক্ষণ একটা লোহার সিন্দুকের সন্ধান পাইয়ে দিয়েছেন। আমার তখন গয়া কাশীর কিরে কেবল ঘন পড়ছে। সিন্দুকই কি না জানবার জন্য মুখুয়ে কেবল ছটফট করছে। তাড়াতাড়ি আলো কিছুটা খুঁড়ে ফেললাম। মনে হল, লোহার একটা পাতের মতোই কিন্তু একটা পড়ে আছে। লম্বা চওড়ায় তত বড় হবারও উপায় নেই। লোহার হাতে কিরে ইচ্ছে মতো গর্ত খোঁড়াও যাচ্ছে না। ক্রমে ক্রমে মাটি সরিয়ে সরিয়ে বুঝতে হচ্ছে, লোহার পাত না ওটা সিন্দুকের ডালা। যদি ডালাই হয় তা হলে সিন্দুকটা মাটির কত নিচে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ওর ডালার মাপ দেখে বোঝাও কঠিন নয় কি পরিমাণ সোনা, গহনা তবে ওর ভেতরে।

'আমার মাথা বন বন করে ঘুরতে শুরু করল। ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে সব মউলিদের এখন জড় করি। এ সিন্দুক একা তোলার ক্ষমতা নেই আমার। ওরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে তোলা যেতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সামলে উঠলাম। লোহার সিন্দুকের কথা কাউকে বলব না। কাক পক্ষীকেও টের পেতে দেব না। পরে এক সময় আলাদাভাবে এসে সিন্দুকের রহস্যটা বার করতে হবে।'

—'ওরা মাটি খোঁড়া দেখে সন্দেহ করে নি?'

—'মাটি খোঁড়া দেখতে পেলে তো সন্দেহ করবে। ওরা ফিরে আসার আগেই আমি আবার মাটি চাপা দিয়ে সব কিছু ঢেকে রেখেছিলাম, বুঝতে দেই নি।'

—'আর হাতেরা?'

—'ওরা নদীর জলে মুখ ধুতে গেছিল।'

—'তা হলে মুখ্যে কর্তা নিশান পুঁতলে কখন?'

বক্সী একটু হাসল। 'নিশান পুঁতেছিলাম শেষ রাতে। শেষ রাতে ভাটা শুরু হওয়ার ক্রম একটু আগে। কিছুতে নিশান পুঁতলাম তা শোন।

'ওরা তো সব চৈ চৈ করে ঘরে ফিরে এল। অনেক চেক। ওরা কি বুঝি। আমার কথা এসে মুখে চাকের ক্রম শুরু করে দিল। লাফা-লাফি ঝাপাঝাপি। এত চাকের ওরা সন্ধান পেয়েছে যে, এক খেপে তা তোলা সম্ভব নয়। খুবার ডিঙ্গায় করে বেশ মালাল ওরা। আমরা গয়া যা এনেছিলাম তা-ও ফুরিয়ে ফুরুৎ হয়ে গেল। বরেন-মুখুয়ে বলল, এত মোম আর এক মণ-দেড়েক ছালাই করা। হাত বড় দাও পাওয়া যেতে সন্দেহ নেই।

'আমার কিন্তু তখন মোমের দিকে বা মধুর দিকে নজর নেই। আমার কোমরের বাঁশিতে তখন ঝোঁজা রয়েছে সোনার মাদুলিটা। তখনো অবশ্য পুরোপুরি সন্দেহ কাটে নি, ওটা সোনাই কি না। কিন্তু লোহার সিন্দুকটা তো আর মিথ্যে নয়। সিন্দুকের ভিতরে না জানি কি রয়েছে। সোনা গহনা থাকাটাই স্বাভাবিক। লোহার সিন্দুকে লোকে মুটে রাখে না, রাখি জিনিসই রাখে। আর এই সুন্দরবনে যখন মাটির তলায় পাওয়া গেছে তখন ও যে ডাকাতেরই সম্পত্তি তাতে সন্দ কি!

'সিন্দুকের চিন্তায় আমার মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল। অথচ কাউকে বলতেও পারি না। জলদেই তো এখন মুখোমুখি পড়ে যাবে। আমার ভগদের তাদের মা লক্ষ্মী পাবেনার দলাই হবে। মনে মনে ঠিকই করে নিয়েছিলাম, এদের বলব না। কিন্তু ফের যখন আসব, তখন আবার জায়গাটা চিনতে পারব কি না সন্দ হতে লাগল।

'আলে পালের কোন ঝাড় জঙ্গল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করে রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু তাতেও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। এমন কিছু একটা চিহ্ন রাখতে হবে যাতে পরে এসেই সেটা চোখে পড়ে।

'ভাবতে ভাবতে শেষটায় মাথায় এল সেই নিশানের কথা। লোকে যদি নিশান দেখে, তাহলে কোন আপদ বিপদ হচ্ছিল এখানে, তাই নিশান। এই যেমন আমরা এই হলুদে কাপড়ের নিশানটা দেখে এখানে নৌকো ভিড়িয়েছি। আমরা নিশান দেখে নৌকো ভিড়িয়েছি, লোকে কিন্তু তা জানবে কেন? জেনে শুনে কে আর বিপদের কাছে নৌকো ভিড়ায়।'

বক্সী একটানা অনেকক্ষণ কথা বলেছে, দম নেবার জন্য একটু থেমে থামল।

পক্সী বলল, 'তুমি যাজান যে নিশানটা পুঁতে ফিরেছিলে সেটাই যে এটা নয় ঠিক নেই।'

—'আমি হলুদে কাপড় মাথায় বাঁধি নি। মাথা একটুখানি বেরিয়েছিল। সে কাপড়টা হলদে হবে কি করে?'

'যাদের, তারপর কি হল বলি। আমি তখন নিশান পুঁতে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলাম। সূর্য উঠবার আগেই ভাটা শুরু হবে, ফলে রাত না ফুরুতেই আমরা পাঁচ-কাঁপি-মুখো নৌকো ছাড়ব। তুড়ো-তাড়ি এখন পাইকারদের কাছে মধু বিক্রি করে টাকা পয়সা ভাল নয়াজায়া করে যে যার ঘরে যাবো। সবাই খুশিতে ডগমগ। কেউ কেউ ফিরবার করে গান ধরে দিল। রাতে সবাই মিলে যে নৌকোয় ঘুমুবে, এমনও হতে পারে না। রাতে জেগে বসে কেউ না কেউ নৌকোর পাহারার কাজ করবেই।

'ঠিক হল, শেষ রাতের দিকে আমি পাহারা দেব। আমার সঙ্গে একজনের জাগার কথা। তাকে কিছুটা ঝোঁজা দিতে পারলেই কাজ হাসিল হয়। কিন্তু কি যে করি, তাকে তো আর বলা যায় না, ওহে, তুমি একটু চোখ বুজে থাক, নিশানটা আমি পুঁতে আসি।'

'ভাবতে ভাবতে শেষটায় মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সন্ধ্যে হওয়ার একটু পরে মধু খাওয়ার হুজুগ তুলে দিলাম। টাটকা চাক ভেঙে নেওয়া মধু, কি তার গন্ধ, কি তার স্বাদ; প্রথমে এক চাক করে সবাই খেয়ে নিল।

'রাতে খাওয়ার পাট শেষ উঠে। মধুতে ঘোর নেশা হয়। যে খেয়েছে সেই জানে।

'আমি এক ফোঁটাও ছিতে ছোঁয়ালাম না। খাব খাব করে মুখে নিয়েও চুপিচাপি তা আবার মধুর হাঁড়িতেই ফেলে দিলাম।

'আর তাইতেই যেন কাজ হল। গভীর রাতে যখি সবাই মাতলামী করল নৌকোয়, তারপর এক এক করে ঢলে পড়ল।

'মাঝ রাতের দিকে অবশ্য খুবে আবার আমি কমার নামলাম। পারে উঠে এসে সেই লোহার সিন্দুকের জায়গায় একটা লম্বা গরান ডালের খুঁটি পুঁতলাম। তারপর তার মাথায় লম্বা করে বেঁধে দিলাম এক টুকরো কাপড়।

'হ্যাঁ, সাদা কাপড়ই বেঁধেছিলাম, বেশ মনে আছে।

'তারপর ভোর হওয়ার অনেক আগেই সবাইকে জাগিয়ে ভাটার টানে নৌকো ছেড়ে দিলাম।'

বক্সী আবার থামল।

—'সজ্জন খুমুলে?'

সজ্জন মুখে কুলেই লম্ফ করল, না ও খুমোয় নি। তারপর হাই তুলে বলল, 'খুব খুম একটু পাচ্ছে।'

পক্সী ওকে একটা খোঁচা দিল আস্তে, 'খুমুলে চলবে কি করে! আবাটার এসে নৌকো বাধা হচ্ছে। খুমোন-টুমোন চলবে না।'

বক্সী বলল, 'না-হয় একটু খুমিয়েইনে তোরা। আমি কিছুক্ষণ জাগি। তারপর আমি খুমোব, তোরা জাগিস।'

সজ্জন টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল, সেই ভালো।

বক্সী বলল, 'একটু তামাক খেতে পারলে হত। শীত চলে গেছে তবে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজটা একদম কম নি।'

পক্সী উঠে বলল, 'ঠিক আছে আমি সেজে দিচ্ছি।'

হাইয়ের খা থেকে হুঁকো টেনে নিল। হুঁকোয় তামাক সাজতে সাজতে বলল, 'নোহার সিন্দুকেই ধদি রেখে থাক যাজান, আরো আগে এসে খোঁজ খবর নেওয়া তোমার উচিত ছিল।'

বক্সী হাসল। ছেলেদের বুদ্ধি এর চেয়ে আর বেশি হবে কি করে! একেবারে নিজের লোক ছাড়া এখানে আনা যায়! একা একা এই জঙ্গলে এলে খুনখারাপি হওয়াটা বেড় ঠিকই, কিন্তু ফিরে যাওয়া বেড় না।

বলল, 'আমার কোন উপায় ছিল না। থাকলে কি আর আসতাম না।'

—'এখন এক বছর পরে এলে, তোমার নিশান কিশান থাকে তখনো!'

—'থাকবে না কেন, ঠিক থাকে। আমাকেই একটু খুঁজে নিতে ভুল হতে পারে। কাল দিনের আলোয় ঠিক বার করে নেব।'

পক্সী হুঁকোর টিকা ধরিয়ে বসিয়ে দেয়। তারপর এগিয়ে ধরে বক্সের দিকে।

বক্সী হুঁকো হাতে উঠে দাঁড়ায়। তারপর খুঁকে কেঁচকিকে তুলে নিয়ে গলুইয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

—'তোরা একটু ঘুমিয়ে নে এ বেলা। আমি এই গলুইয়ে বসে আকাশ দেখি।'

—'তুমি একা বসে থাকবে, সেটা ভালো হবে?'

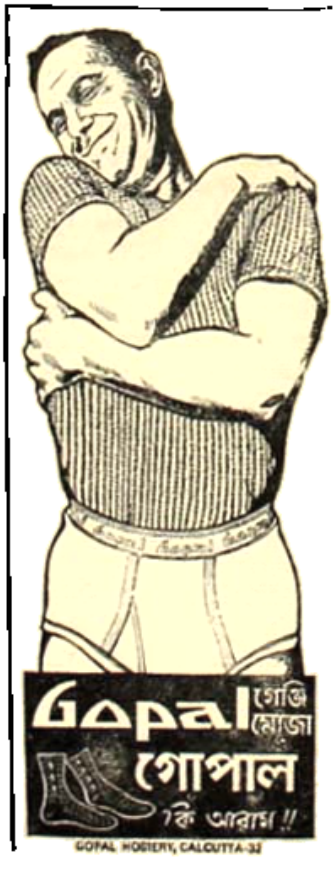

—খুব ভাল হবে। যা, ছইয়ের ভেতরে যা। বলতে বলতে ঝপ্‌ঝপিয়ে এসে বসে পড়ে।

তারা খানিকক্ষণ পরস্পরী বসিয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে ছইয়ের ভেতরে গলিয়ে দেয়।

ছইয়ের ভেতরে গজেনের চোখ দুটো যেন জ্বলছে। রাতের অন্ধকারে জন্তুর চোখ যেমন জ্বলে অনেকটা যেন সে রকম।

পরস্পরী ঝিল্লি করে একটু হাসে। তারপর ধীরে ধীরে গজেনের কাছে এগিয়ে এসে নিজেকে পুরোপুরিভাবে বিছিয়ে দেয়।

নৌকাটা দুলে ওঠে কিনা আর খেয়াল করে না ওরা। সুন্দরবনের রাতটা কিন্তু কেটে যায়।

সকালে সেই আলো কিরকম রোদ উঠল। ঘন জঙ্গলের মাথায় মাথায় আলো। কুয়াশার ভেজা পাতাগুলো যেন শির শির করে কাঁপছে। গত সন্ধ্যায় ভাটা সুরু হয়েছিল, মাঝরাত থেকে আবার জোয়ার সুরু হয়ে নদী এখন কানায় কানায়। এখনই আবার ভাটা সুরু হওয়ার কথা। জলের চেহারা দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, ভাটাই সুরু হয়ে গেছে কি না।

কাল বিকেল থেকে যেন উত্তেজনা নেই। রাতে অল্প স্বল্প যতটুকুই ঘুম হয়ে থাক এখন যেন ঝরঝরে লাগছে। গজেন গায়ে একটা হালকা কাপড় জড়িয়ে ছেঁচে গলুইয়ে বসেছে হুঁকো নিয়ে। এই ঠাণ্ডায় বসে হুঁকো টানতে বেশ একটা মেজাজ পাচ্ছিল ও। ছইয়ের ওপর বরনী পা ঝুলিয়ে বসেছিল। হলুদে কাপড়ের নিশানটা চোখের উপর তুলছে। শিশিরে ভিজে কাপড়টা এখন খুঁটির গায়ে জড়িয়ে আছে। কারা খুঁজতে বেরিয়ে ঐ নিশান, কবেই বা খুঁজতে, কিছুই বোঝার উপায় নেই। আর একটু রোদ উঠলে বরনী ডাঙায় নেমে খুঁটিটার কাছে যাবে। কত দিনের পুরনো নিশান বুঝবার চেষ্টা করবে প্রথমে। যদি সদা পোতা হয়ে থাকে বুঝতে হবে এখানে ওরা আসার আগেই অন্য কোন দল ঘুরে গেছে। এমনও তো হতে পারে, এই বছরে দলে দলে অনেক মউলিই এসেছে। তাদের যারা কেউ হয়তো সন্ধানে করে লাল কাপড়ের নিশান দেখে মাটি খুঁড়ে সিন্দুকটা তুলে নিয়ে গেছে।

অসম্ভব, হতেই পারে না। নিশান পোঁতা থাকলে ধারে কাছে কেউ মাটি খুঁড়বে না। মাটি খুঁড়লেই হাড়-গোড় পচা-গলা মানুষের দেহ বেরিয়ে পড়তে পারে। কে ঐ ঝামেলায় যায়।

কিন্তু নিশানটা গেল কোথায়? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গাঙ্গপাড়াগুলি জঙ্গলে [illegible] করল বরনী। কিন্তু এক বছরে জঙ্গলের কত পরিবর্তন। চেনা গাছটা আর চেনা থাকার কথা নয়। নতুন নতুন গাছ গাঁজিয়ে চেহারাটাই পুরো পালটে দেয়।

পরস্পরী একপাশে ছইয়ের বাইরে নৌকোর পাটাতনে বসে থালা বাসন পরিষ্কার করছিল। নৌকোতেই উনোন ধরাতে হবে। রান্না করবে, ভাতে আর ডাল। কিছু আলু খেয়াল সঙ্গে আনা হয়েছিল। পারলে এক সঙ্গে মিশিয়ে তেজে নেবে। উনোনের জন্য কয়লা আনে নি। কাঠেই রান্না বান্না সারতে হবে। কাঠের উনোনের কাছে সারাক্ষণ থাকতে হয়। পাগলা বাতাস নেই। বাতাস থাকলে আগুন যখন লাফায় তখন দুশ্চিন্তা থাকে মাথায়।

গজেন উঠে এসে হুঁকোটা এগিয়ে দিল বরনীকে। তারপর গা হাত পায়ের আলস্য ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'তা হলে কি করবে এখন বুড়ো কর্তা? একটা রাত তো গেল।'

নির্বিকারভাবে উত্তর দিল বরনী, 'কি আর করব, আমি একবার ডাঙায় নেমে চারপাশটা খুঁজে দেখব। সন্ধান পাই তো ভালো, না পেলে তখন ভাবা যাবে।'

—'একা একা জঙ্গলে ঢুকবে?' বিস্মিত চোখে তাকাল পরস্পরী।

—জঙ্গল আমার অচেনা নয়, কিছু হবে না।'

—তেরে হয় ওকেও সঙ্গে নিয়ে যেও।'

গজেন পরস্পরীর দিকে তাকাল, দরকার হয় আমরা তিনজনেই নামতে পারি।'

বরনী হুঁকোয় একটা লম্বা করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'তিনজনের দরকার হবে না। তোরা নৌকোয় থাকিস, আমি নিশানটা খুঁজে পেলে তখন তোদের নিয়ে যাবো।'

এবং বরনী যে একলাই নেমে পড়বে ওরা বুঝতে পারে নি।

পরস্পরী বলল, 'ওকি, তুমি এখনি নামছ নাকি?'

একটা লাঠি টেনে নিল বরনী। 'আগে ঐ নিশানটা দেখে আসি। তোরা কিন্তু খালি হাতে নামিস না কেউ। বুঝেছ গজেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নৌকোতেই থেক।'

এক হাঁটু কাদা। পা টেনে টেনে বরনী উঠে এল উপরে। খালি পা। কোমরে একটা গামছা শক্ত করে দুটির ওপর বেঁধে নেওয়া। ঘসঘসে সাদা পিঠ জুড়ে খড়ি উঠে আছে। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ঘাম নিতে যেন ভুলে গেছে লোকটা।

ডাঙার পা দিতেই এক ঝাঁক পাখি জলা জায়গাটায় চিৎকার করে উঠল। বরনী গ্রাহ্য করল না। পা ঝাড়া দিয়ে কাদা ছাড়াবার চেষ্টা করল। তারপর সোজা দুটো চোখে গাছের পাশ কাটিয়ে নিশানটার কাছে চলে এল।

নৌকোর বসেই গজেন তাকিয়ে ছিল বুড়োর দিকে। পরস্পরী একটু গলা তুলে বলল, 'কি দেখছ?'

বরনী বলল, 'নাহ্, এটা নয়। এ নিশান দেখে কিছুটি বোঝার উপায় নেই। আমি একটু ভেতরে ঢুকে দেখে আসি।'

একটা কেবল লাঠি সম্বল করে জঙ্গলে ঢোকাটা কি উচিত হচ্ছে বাজানের! এই বয়সে না জানি, একটা বিপদই ঘটিয়ে বসে। কিন্তু ওদের বারণ যে শুনবে না, তা ওরা ভালো করেই জানে।

নিশানটাকে পেছনে ফেলে জঙ্গলের আরো ভিতরে ঢুকে গেল বরনী। মাটিতে এত ঘুরে বেড়াবার কথা। গাছে জোয়ারের জল অবধি জঙ্গলের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে বোঝা যায়। ধারালো শব্দ শুনে জেগে আছে চারপাশে, একটু সাবধানে পা ফেলতে না পারলেই পা ছড়ে কেটে যায়।

বরনীর কোন তাড়াহুড়ো ছিল না। ধীরে ধীরেই ও জঙ্গলের ভিতর ছোটে চলে বেড়াতে সুরু করল। জঙ্গলের বেশি ভিতরে ঢোকাটা উচিত হবে না। নিশানটা ও নদীর কাছাকাছিই পুতেছিল। বাঁ দিকে ঘুরে নদী থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে ও হাঁটতে সুরু করল।

সামান্য একটা গরান ডালের খুঁটি এক বছরও দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, এটা বিশ্বাসই করা যাচ্ছে না। কাপড় না হয় নাও থাকতে পারে কিন্তু খুঁটিটা থাকবে না কেন! মাঝে মাঝে দুটো একটা গাছের ডাল ভেঙে যেমন যেন চুল হয়ে যাচ্ছে। নাহ্, এটা নয়, এটাও নয়।

নৌকোটার দিকে একবার তাকাল বরনী। জঙ্গলের ভিতে নৌকোটাকে দেখা যাচ্ছে না। একদিক থেকে যেন ভালই হল। গজেন আর পরস্পরীকে একটু একা থাকার সুযোগ তো দেওয়া গেল। কাল সারা রাত বড় অসুবিধা ঘটিয়েছে ও। নিজেও ঘুমুতে পারে নি, ওদেরও ঘুমুতে দেয় নি। ওরা হয়তো প্রাণ খুলে এখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে পারছে। গজেন ছোঁড়াটাকে খারাপ লাগে না বরনীর। জঙ্গলের কোন অভিজ্ঞতা ওর নেই। এক দিক থেকে এ রকম একটা ছেলেই যেন ও আশা করেছিল। মাছ মেরে খাবে, ব্যস কি! জীবনের ঝুঁকি কম তাতে। জঙ্গলে যারা আসে প্রাণ হাতে করেই আসে। জঙ্গলে এসে আবার ভালয় ভালয় বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত বিশ্বাস কি!

বরনী আবার একটু নদীর দিকে ছেড়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। বেশ আরাম লাগছিল ওর এই ভাবে একা একা ঘুরতে। আবার কবে এই জঙ্গলে আসতে পারবে ও তার ঠিকানা নেই। দূরে হঠাৎ একটা গাছের ডাল একটু দোল খেয়ে নড়ে উঠতেই ওর সারা গায়ে ঝাঁপুনি খেলে গেল। কি যে যাবা!

পাথরের মতো বসে কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে গইল ও।

বড় মিঞা হলে ঐ ভাবে একটা গাছের ডাল হঠাৎ কেঁপে ওঠার কথা নয়। বড় মিঞা কিছুমার চের পেতে দেরে না ও কাছে আছে। বড় মিঞা নয়। তবে কি— ও হুঁশ! বুকে আবার ভরসা ফিরে গেল বরনী। একটা নয় বাঁক বাঁক বানর।

ওদের দিকে কোন রকম অগ্রসর করল না ও। চুপ মেরে বসে চেষ্টা

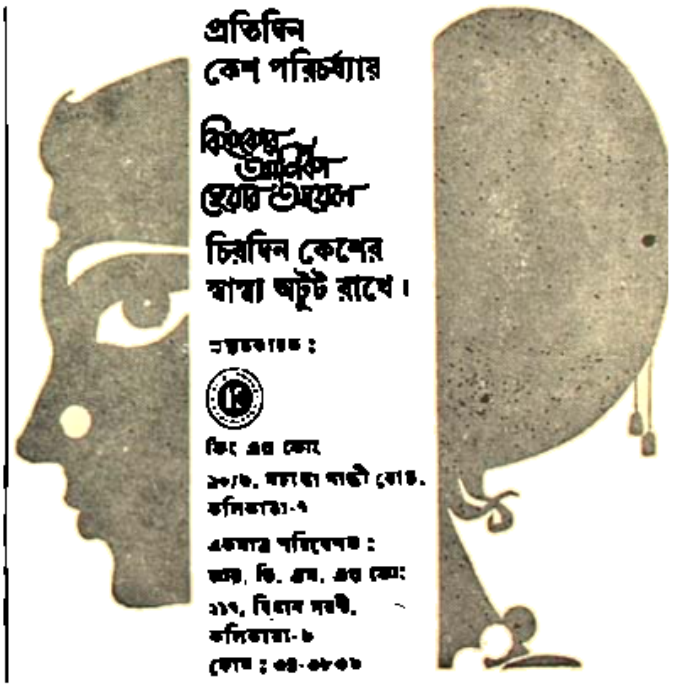

ওরকম না। তবে দেখাতেই পারে কি এমনি ভয় করে ও এগিয়ে চলল।

মানুষ দেখা ভালো। বড়ো মিঞা যার কাছে যাবেন একটা ছুঁচ ওকে তাকিয়ে দিতে পারবেন।

বড়ো মিঞা ওর খুশিমতোই ছোরা ওর কলজেটাই ছোক, ওর কৌশলই জানা থাক, ওকে ৬ জনে ঘিরে ফেলে কাজ আছে কি না, কি করে টের পেতে হয়। পাখিদের ভাব ভঙ্গিই পালটে যায় তখন। ওদের ভাবনে হেরে আসাই নেই। এখন মনে হয় যেন চারদিক এমন নিথর গাছের পাতা পড়লেও শব্দ হবে।

বরকী আবার কিছুটা ভয়ে উঠেছিল, হয়তো যেন চেতনা ফুড়ে একটা নিশান, পরান খুশিটাতে রাঙা লাল একটা কাপড়। উত্তেজনার এক রকম প্রায় ছুটেই ও নিশানটার কাছে এগিয়ে এল।

নাহ্, নিশান নয়। ৮৩৯টা গাছের পাতার সুখের আলো পড়ার ঐ রকম রঙের পড়েছিল ও। কাছে এগিয়ে যেন হতাশ হয়ে গেল। কি ভুলই ও করেছে! তারপরই নিশ্চয়তে টেনে তুলে নিয়ে সবাই সমানভাবে ভাগ করে নিলে তবু যা হোক কিছু পাওয়া যেত। কিন্তু ওরকম ভাবি নিয়ে নিজেই এখন ভাবে পড়ে গেছে বরকী। নিজের ওপরই যেন কিছুটা অভিমান হচ্ছিল ওর। নিজের নির্বুদ্ধিতায় ভাবনে ও অনেক ঘাইকেছে। এত বড় একটা সুযোগ ভাগ ও নিজের নির্বুদ্ধিতাতেই হারাল।

আরো কিছুটা এগোতেই ও দেখতে পেল, অনেক দূরে অর্ধেক খালের মতো একটা চোরাবালি। কতবার এই জলাপথে যাওয়া-আসা করেছিল ও, মনে করতে পারল না। নাহ্, কেউ ওকে এই আগে ওরা তো বলে নি। তবে কি নিশ্চিন্তিতে ভুল ঠিকানায় এগিয়ে এসে ও ফাঁদে পা দিয়েছে? কেমন যেন ঘোলাটে ধাঁধায় পড়ে গেল বরকী।

খালটার কাছে এগিয়ে এল। জল যে খুব ঘোলা তা মনে হল না। কিন্তু দুপারেই অসম্ভব কাদা। একপাশে জলের মাঝখান থেকেই জলজ গাছের উঠেছে। ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছিল জায়গাটা। এ রকম জলজ প্রচুর মাছ থাকার কথা। সাপও কিছু, যে না থাকবে এমন নয়। তা ছাড়া জোঁক। বছর আগে এ রকম একটা ডোবায় নেমে জোঁকের হাতে পড়েছিল বরকী, মনে পড়ে গেল। সারা গায়ে চাপ চাপ নুন ছাড়িয়ে জোঁকের হাত থেকে ও রক্ষা পেয়েছিল।

খালের ধার দিয়ে কিছুক্ষণ ওরে হাঁটল। এ দিকটার মাটি বেশ শক্ত। গাছপালাগুলিও বেশ মজবুত। জোয়ারের জল এতদূরে প্রবাহিত হয়েছে বলে মনে হয় না। মাটি অনেকটা স্থির।

এলোমেলো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি এক সময় ও স্থির হয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতের লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরল।

অনেকটা তাড়া গাছের একটা ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে অনেকটা ফোঁপরা মতো হয়ে আছে। ঐ ফোঁপরেই যেন কিছু, একটা জন্তু আশ্রয় নিয়েছে। তুলোর বলের মতো তার দেহটা ফুলে ফুলে উপর দিকে উঠে আসছে। কি হতে পারে ওটা?

ভালো করে না জেনে শুনে এগোন উচিত হবে না মনে করে বরকী ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

বেড়াল নাকি? বন বেড়াল হওয়া অসম্ভব নয়।

বন বেড়ালের কথা মনে আসায় যেন কিছুটা সাহস পেল ও। এক পা এক পা করে এগিয়ে এল। আরো কাছে আসতেই ওর সারা শরীরে চমকে এক শিহরণ খেলে গেল।

বন বেড়াল নয়। খাস বড় জিনিসের বেড়াল। একটা নয় দুটো নয়, বরকী গুনে দেখল চারটে। ভালো করে চোখও ফুটেছে কি না কে জানে। তুলোর বলের মতই নরম।

মাতা কাছে এগোন কি উচিত হবে! বাচ্চাটা হয়তো বাচ্চাগুলোকে ফেলে রেখে তার খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছে। চারপাশে একবার আঁতিপাতি করে চোখ বুলিয়ে নিল বরকী। লুকিয়ে থাকার মতো ঝোপ যেন ধানিকটা দূরে আছে বটে, কিন্তু আশেপাশে বাঘ বা বাঘিনী থাকলে তৈরই ওর চোখে পড়বে।

কেমন যেন লোভ সামলাতে পারল না ও। আরো এগিয়ে গিয়ে গাছটার কাছে দাঁড়াল। অবিকল মা বেড়ালের বাচ্চার মতো। এখনো পায়ে ওদের জোর আসে নি। একটা আর একটার গায়ে উঠে গড়াগড়ি খাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে একটা তুলে ধরল বরকী। আহ্ কি নরম! গায়ের কাঁচ কাঁচ নয়। কাঁচ দুধের দাঁত। অবিকল বাঘের মতো চোখে মুখে রাগ। টেনে বুকে তুলে আদর করতে ইচ্ছে করল।

বুকে তুলে নিল বরকী। গালে ঘষে নিল। একটা নিয়ে এখন পালিয়ে গেলে কেমন হয়! নৌকোয় নিয়ে গিয়ে পক্কীকে দেখালে কেমন অবাক হয়ে যাবে ওরা, ভাবতে বেশ মজা লাগল বরকীর।

কিন্তু বাচ্চাগুলোকে এভাবে ফেলে রেখে কোথায় যেতে পারে বাঘিনী। সত্যি সত্যি কি শিকারে বেরিয়েছে, না কি বরকীর দিকেই তাকিয়ে আছে।

বরকীর দিকে তাকিয়ে থাকে ভাবতেই আবার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। কিযাস কি! সুন্দরবনের বাঘ বই তো নয়।

বাচ্চাটাকে আবার ও ঘাস করে ঝোপের দিকে ছিল। নাহ্, এখানে এভাবে না দাঁড়ানোই ভালো। সেখে বিপদ ডাকার কোন মানে হয় না।

বাচ্চাটাকে ঝোপের ঢুকিয়ে এক পা পেছু, ও সামনে বাড়িয়েছে, হঠাৎ এক মনে হল জলজের ঝোরা যেন নিঃশব্দের মতো পালটে গেছে। পাখপাখালির শব্দ নেই, গাছের পাতায় আর বাতাস খেলছে না। কিংবা বাতাস খেললেও গাছের পাতার সাহস নেই আর নড়ে ওঠার। সব কেমন নিস্তব্ধ। সব কেমন মুহূর্তের জন্যেই জমাট বেঁধে গেছে।

এমন লাগছে কেন? অবস্থাটা আরো ভালো করে বুঝবার জন্য খুব দ্রুত পাঠাতে আবার চারপাশে একবার দেখে নিল বরকী।

মনে হল, ঘরের ঐ কোণের পাশে কিছু, একটা যেন নড়ে উঠেই আবার থেমে গেল।

হয়তো বরকীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি বড় মিঞা। বুকের রক্ত যেন নিজেরেই জমে স্থির হয়ে এল। আর দাঁড়ান যায় না। মাগো বলে চিৎকার করে বরকী তিন লাফে নেমে এল খালের দিকে।

আর সেই মুহূর্তেই বাঘটাও ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এক লাফে এগিয়ে এল তার বাচ্চাগুলোর কাছে।

এক মুহূর্ত দাঁড়াল গাছটার গোড়ায়, তারপর বিকট একটা চিৎকার করে লাফিয়ে এল বরকীর দিকে।

বরকীর মনে হল, ও আর সেই বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া বরকী নেই। খালের জলে প্রচণ্ড শব্দিতে ও লাফিয়ে পড়ে মাঝামাঝি জায়গায় চলে এল। বাঘটা এসেল খালের ধার অবধি। কি আক্রোশ!

জল দেখেই কি ও ফেরে গেল বুঝতে পারল না বরকী। না কি জলের মধ্যেই এখন ও লাফিয়ে পড়বে।

বরকী আর সময় জলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ডুব দিয়ে নিজেকে তলিয়ে দিল।

যতক্ষণ দম ততক্ষণ ডুবে থাকল বরকী। দম ফুরুতেই আবার মাথা তুলল। দেখল, আক্রোশে ফেটে পড়া হিংস্র এক জোড়া চোখ। ডোরা কাটা বসুত। আবার ডুবল। আবার মাথা তুলল, আক্রোশে মাটিতে যেন থাবা বসাচ্ছে ও। তাকিয়ে থাকা যায় না। নিজেকে এখন লুকিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই বরকীর।

আবার নিজেকে ডুবিয়ে রাখল। আবার মাথা তুলল।

বাঘের আবার ডুবল, মাথা তুলল।

বাঘের চোখের সামনে ধীরে ধীরে সব কিছু ঝাপিয়ে ফেতে শুরু করল। নাহ্, কিছুই যেন আর দেখতে পাচ্ছে না। জল, শুধু জল। আবার ডুবল বরকী। দম ফুরিয়ে আসার আগেই আবার মাথা তুলল। অন্ধকার। ঘোর অন্ধকার। আর তার মাঝে সেই চিৎকার। জন্তুটা যেন কিছুতেই ছাড়বে না ওকে। কিছুতেই ওকে প্রতিশোধ না নিয়ে ছেড়ে দেবে না।

আবার ডুবল বরকী, আবার মাথা তুলল।

কেবল ডুবে যাওয়া আর কেবল ভেসে ওঠার খেলায় যেন মেতে উঠল বরকী।

তখন নৌকোতে ওরা দু জন।

পক্কী কাঠের উনুন নিয়ে ব্যস্ত। হাঁড়িতে ভাত চাপিয়েছে। যতক্ষণ না ভাত নামে উনোনের পাশেই বসে থাকতে হবে। নৌকোতে বসেই জঙ্গলের দিকে সারাক্ষণ নজর রাখতে হচ্ছে।

ঘাটটা কিন্তুমাত্র খুশতে দেয় নি ওরা। এক দিকে গহেন অন্য দিকে ওর বাজান। দা জোরে জোরে নৌকো ঝাঁকাচ্ছিল গহেন, কে জানে ওর বাজান হয়তো সোটাটাই টের পেয়েছে। কি ভাবল ওরা বাজান, কে জানে।

গহেন এই ফাঁকে আবার ছইয়ের ভেতর ঢুকে কিছুক্ষণ বুঝি ঘুমিয়ে নিল।

—কি ব্যাপার, ঘুম ভাঙল?

গহেন ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, চোখ দুটো কমলার মতো লাল। একটু হাসল। তারপর সারা দেহটা শুকনো ছিলার মতো বাঁকা করে নিয়ে একবার আড় ভাঙল সেরে।

—বুড়ো কর্তা সেই যে জলের ভিতর ঢুকল আর দেখা নেই যে! গেল কোথায়?

পক্কী জানে, জঙ্গলের সোকা। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে পারলে আর কিছুই চায় না। সারা জীবন তো দেখে এলাম।

মডার্ন ডেকরেটর্স
সব ধরনের ও যে কোন উৎসবের পাকা ও কৃত্রিম ফুল
৬৩এ৬১, বি.বালাখানা স্ট্রীট, কলি-৬, ফোন

—কি আছে এই জঙ্গলে! কেবল গাছগাছালি কাদা আর পুলো!'

পঞ্চমী বলল, 'হয়তো তোমাকে দেখেছে। তার লোভন লোভন এখন ছোড়ছে।

—'তা হলে আর খাওয়া যাবে।'

—'তোমার আবার মাংস খাওয়া!' চোখের চাহনীতে মিষ্টি একটা ভঙ্গি করল পঞ্চমী।

—'কেন, আমার মাংস খাওয়া মানে?' যেন পঞ্চমীর কথার কিছুই বুঝতে পারে নি ও, এমনভাবে সরল দৃষ্টিতে তাকাল।

—'আহা, কিছুই যেন জানে না। সারাক্ষণই তো খাচ্ছ। এখনো মুখের চারপাশে লেগে আছে, চকচক করছে।'

গজেন মুখের চারপাশে হাত বোলাল, 'কৈ না তো!'

—'না তো, না। এবার চোখে মুখে একটু জল দুলিয়ে নাও। টিনের ভেতর মুড়ি আছে, খেয়ে নাও চারটি।'

—'তোমার বাজারকে কিছু খাইয়ে দিলে পারতে, না খাইয়েই বুড়োটাকে ছেড়ে দিলে।'

ধপ ধপ করে আগুন লাফিয়ে উঠেছিল, পঞ্চমী উনোনে ঘোঁচা দিয়ে আগুন সামলালো।

নদীতে এখন ভাঁটা চলছে। নদীর মাঝ বরাবর জল। দু'দিকে চরা পড়া দেখা যাচ্ছে। চমকন সোনার মতো মাটি। ঝিক ঝিক করছে সূর্যের আলো পড়ে। আর তারই মধ্যে অসংখ্য লাল কাঁকড়ার খেলা। কাঁকড়াগুলো কোন কাজেই আসে না মানুষের। ওদের দিকে ফিরেও কারুর খোলসেও নজর নেই। নদীর দু'ধার ঘিরে মাছ খাওয়ার জন্য হাজার হাজার পাখি বসেছে। হাতের মুঠো তুলে ঝিলিমিলি ঢিল ছোঁড়ার ভঙ্গি করলেই পাখিগুলো লাফিয়ে উঠছে।

মাত্র দু' তিনেক ওজনে পাখি মারলো গজেন। ডালের চোখে মুখে জল ছিটিয়ে, পরেরবার মুড়ি ভেজে নিয়ে খেতে বসল।

দু' পায়ে জঙ্গলের চেয়েও সবুজ। লম্বায় পাতার ঝালানো কোপ। কোপের ফাঁকে ফাঁকেও পাখির ভিড়। ছোট ছোট কি পাখি ও গুলো কে জানে! চড়ুই নয়, গলার কাছে সোনালী কাজ করা। চড়ুইয়ের মতোই ছটফটে। অনেকগুলো পাখি মারতে পারলে মাসে খাওয়া যেত।

কিন্তু পাখি মারার কৌশল জানা নেই। বুড়োর কর্তার কাছে নেই, কাছে থাকলে একবার দেখার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারত।

—'কি ভাবছ তো?' প্রশ্ন করল পঞ্চমী।

—'কি আবার ভাববো। বুড়ো কর্তা ফিরছে না কেন? যা খেয়ালী লোক, সেকেটার বিপদে পড়ল কি না কে জানে।'

পঞ্চমী একবার গজেনের মুখের দিকে তাকাল, 'কি তখন থেকে বিপদ বিপদ করছ, ও সব কথা ছাড়া যেন কথা নেই!'

—'লোকটাকে একা একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয় নি আমাদের।'

—'এখন তো খুব ওসব কথা বলছ, তখন সঙ্গে গেলে না কেন?'

—'তুমি একা থাকবে তাই। তোমাকে একা ফেলে কোথাও যেতে পারি আমি?'

—'ইস্ রে! বড় ভালো ভালো কথা!'

—'না পঞ্চমী; সত্যি বলছি কাজটা আমরা ভালো করি নি। এভাবে একা একা ওকে ছেড়ে না দেওয়াই উচিত ছিল আমাদের।'

পঞ্চমী জঙ্গলের দিকে তাকাল, ভাত ফুটতে শুরু করেছে। 'এখনও তো হতে পারে সেই লাল নিশানটা খুঁজে পেয়েছে বাজান।'

—'খুঁজে পেলে আমাদের এসে খবর দেওয়ার কথা ছিল।'

—'খুঁজে পাওয়ার আনন্দে নিজেই হয়তো মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে। লোহার সিন্দুক তুলে এনে আমাদের দেখাবে।'

—'লোহার সিন্দুকেই যদি হয়, ওটাকে বয়ানো বুড়োর একার কাজ নয়।'

পঞ্চমী চুপ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, 'তা হলে, না ফেরার কি কারণ?'

—'কি কারণ তা তোমরাই জানো। আসলে সেকেটার মাথায় কিছু গোলমাল আছে!'

—'তোমার মতো কি না', প্রতিবাদ করে পঞ্চমী। 'এই বয়সেও যা পরিশ্রম করতে পারে, অনেকেই পারে না।'

গজেন জঙ্গলের দিকে চোখ রেখে মুড়ি চিবোতে থাকে। বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, পাথরের গায়ে জোর বেশি থাকে, কিন্তু বলতে মুখে আটকাল।

পঞ্চমী ঘরের মাড় গালতে শুরু করল। সাদা ধোঁয়ায় মুখখানা ওর ঢেকে গেল।

গজেন আকাশের দিকে তাকাল, পরিষ্কার আকাশ, সূর্য যেন অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে। বেলা দুপুর হতে আর বাকি নেই। সেই যেন সকালে বুড়োটা বেরোল একলা না ফেরার লক্ষণটা ওর ভাল লাগছে না।

তবে কি যাচ্ছেই বলল ওকে। মনে যদি করে থাকে কিন্তুতেই টের পাবে না ওরা। এই জঙ্গল সম্পর্কে কিছুই জানে না গজেন। তা ছাড়া পুরুষ মানুষ বলতে ও একা। এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় ও খুঁজতে বেরোবে। সঙ্গে একটা বন্দুকও নেই। খালি হাতে পায়ে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার সাহস সত্যি সত্যি ওর নেই। তা পঞ্চমী যাই ভাবুক না কেন!

ভাতের হাঁড়ি পুঁছিয়ে রাখতে রাখতে পঞ্চমী বলল, 'রান্না তো হয়ে গেল। এবার বাজান ফিরে এলেই খেতে বসে যাও।'

গজেন কথা বলল না।

উনোনে জল ছিটিয়ে আগুন নেভাল পঞ্চমী।

—'ঘরে কাছে কোথাও মিঠে জল থাকলে চান করা যেত।'

গজেন বলল, 'আমার কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে পঞ্চমী। এত বেলা হল।'

—'কি সন্দেহ?'

—'এত বেলা হল, অথচ বুড়ো কর্তার না ফেরার কারণ কি! নিশান খুঁজে নাই পেয়ে থাকে, ফিরে এলেই তো পারে। মিছিমিছি আমাদের ভাবনায় ফেলছে।'

পঞ্চমী জঙ্গলের দিকে তাকাল, 'তা হলে চল না, কিছুটা ভিতরে ঢুকে দেখে আসি।'

—'ভেতরে রাস্তা ঘাট বলে তো কিছুই নেই। ফের আবার চিনে ফিরে আসতে পারবে তো? এমনও তো হতে পারে বুড়ো কর্তা পথ ভুল করে বসেছে।'

—'বেলি দূরে না এগিয়ে ঘুরে ঢুকে বাজারের নাম ধরে ডাকি চলো।'

ইচ্ছে না থাকলেও গজেনকে রাজি হতে হল। মাছ মারার কোঁচটা ও হাতে তুলে নিল।

এখন ভাঁটার প্রায় চরম অবস্থা। জোয়ার শুরু হতে বেশি বাকি নেই। বুড়োকে যদি পাওয়া যায়, এই জোয়ার শেষ হলেই পাঁচকাঠির দিকে নৌকো ছেড়ে দেবে গজেন। ডালের ডালার এখন পালাতে পারলে বাঁচে। লোহার সিন্দুক আর সোনা গহনা যেখানে আছে সেখানেই থাক। দরকার নেই বাবা রাতারাতি বড় লোক হয়ে।

—'কি, নামবে তো আগে?'

—'হ্যাঁ, নামছি।' আবার নেমে পড়ল গজেন। পরে ওর হাতের ওপর ভর রেখে পঞ্চমীও নামল।

—'ইস রে, কি কাদা!' পায়ের নিচু পাদুকে ভালো ঠেকল কি না কে জানে, বার বার নাড়াতেই ও পা টেনে নিল।

ডালার কাদায় আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল, গজেনই ওকে টেনে উপরে উঠিয়ে নিয়ে এল।

—'এই জঙ্গলে এখন কোথায় খুঁজি বল দিকি নি। বুড়োর যদি একটু আক্কেল থাকে।'

পঞ্চমী কথা ভুলে চিৎকার করে ডাকল, 'বাজান।'

কিন্তু শব্দটা কয়েকবারের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে চারপাশে ঘুরিয়ে আবার স্তব্ধ হয়ে গেল।

আবার ডাকল পঞ্চমী।

আবার সেই একই অভিজ্ঞতা। ডালার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ওরা। ওদিক থেকে প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই ফিরে এল না।

—'চিৎকার করে কোন লাভ নেই। চলো এগিয়ে দেখি।'

পাশাপাশি দুজনে এগোতে শুরু করল। শক্তি ফুরিয়ে আসছিল পঞ্চমীর। গজেন কোমরে গামছাটাকে শক্ত করে বেঁধে নিল। হাতের কোঁচ দিয়ে কোপের গায়ে ও আঘাত করতে শুরু করল।

—'এই!' পঞ্চমী দাঁড়াল।

চমকেই উঠেছিল গজেন, 'কি? কি হয়েছে?'

—'সেখানে নৌকোটাকে দেখা যাচ্ছে না।'

—'না দেখা যাক, আমরা পায়ের ছাপ দেখে রেখেই ফিরতে পারব।'

পঞ্চমী লক্ষ্য করল, পায়ের ছাপগুলো বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জোয়ার এসে জল ঢুকলেই এই ছাপগুলো আবার উবে যাবে। জোয়ার এসে ভাসিয়ে দেওয়ার আগেই আবার ফিরে আসতে হবে।

সামনেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা কোপ, এটাকে এড়াবার জন্য গজেন পঞ্চমীকে টেনে নিয়ে এল বাঁ দিকে। বাঁ দিক দিয়ে ওরা হাঁটতে শুরু করল।

হঠাৎ কেন পুলোর সংখ্যা কমে আসছে। মাটিও মনে হচ্ছে নদীর ধার ঘেঁষে অনেক বেশি মজবুত। জঙ্গল পরিষ্কার থাকলে এখানে চাষবাসও হতে পারে।

এ-পাশে ও-পাশে মাঝে মাঝে বিশ্রীভাবে পাখি চেঁচিয়ে উঠছে। গাছে কাঁটা দিয়ে উঠছে গজেনের। হঠাৎ এখন বাঘের মুখোমুখি পড়ে গেলে বাঁচার প্রায় আশাই থাকবে না ওদের। হাতের এই কোঁচ দিয়ে কি বাঘের সঙ্গে পেরে উঠবে গজেন? অসম্ভব।

গা ছম ছম করতে শুরু করল ওর। গায়ে একটু ভাল পাতা লাগলেই চমকে চমকে উঠতে শুরু করল। বাঘের মুখে নাই পড়ল, গায়ের গায়ে লাল কুলে থাকাও অসম্ভব নয়।

ব্যানার্জী টেইলার্স
২৩৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭
ফোন ৩৫-৫৬২১

জলরাশির সঙ্গে মিশে থাকলে সাপকে অনেক সময় চেনাই যায় না। না জানি ঝোপের ভিতরে কি কি কিলবিল করছে সাপ!

—"আমরা কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে এসেছি গো।" গজেন মিনমিন করে বলল।

পদ্মরী বলল, "আরো খানিকটা, সামনে একটা খালের মতো দেখা যাচ্ছে।"

সাঁতা সাঁতা একটা খালেরই মতো।

খালটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চন করল।

—"কি হল, চলো এগোই।"

—"আর কোথায় যাবে?" গজেন বলল, "আর না এগিয়ে এবার চলো ফিরে যাই।"

—"চল না, ঐ খালটা অবধি যাই। তারপর না হয়—"

—"এককাজ করলে হয়তো নৌকোয় ফিরে গিয়ে দেখব, বুড়োকর্তা ফিরে এসে বসে আছে।"

—"হুঁ থাক। কি সুন্দর টলটল করছে জলটা। মিষ্টি জল হলে চলে না চাল করে যাই।"

গজেনকে চুপ করে থাকতে দেখে খালের দিকে টেনে আনল পদ্মরীকে।

খাল থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় গজেনই প্রথম বলরীকে আবিষ্কার করে চিৎকার করে উঠল, "পদ্মরী!"

—"কি? কি হল?"

—"দেখছ না কি হল! ঐ দেখ।"

পদ্মরী প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। কি একটা বস্তু যেন জলের মধ্যে ডুবছে আবার ভেসে উঠছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে বুঝতে পারল, ওরা বাজান। চিৎকার করে উঠল, "বাজান! কি করছ জলে দাঁড়িয়ে?"

বলরী যেন বিড়বিড় করে কিছু বলছে। বুঝতে পারল না ওরা, কি বলছে বাজান। আর অমনভাবে ডুবছেই বা কেন! ভাসছেই বা কেন।

—"বাজান!" আবার চিৎকার করে ডাকল পদ্মরী।

—"বুড়ো কর্তা!" চিৎকার করে ডাকল গজেন।

কি হল ওর! কেবল ডুবছে আর ভাসছে। ওঁকি পদ্মরীর গলাও শুনতে পেল না, ওঁকি গজেনের গলাও শুনতে পেল না।

—"আবার ডাকল ওরা! যাহ্, কিন্তু একটা ঘোরালো হয়েছে গো। ওকে জল থেকে তুলে আনো না।"

গজেন এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর ছোটো পদ্মরীর হাতে দিয়ে বলল, "ধরো, দেখছি।"

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল গজেন।

বুড়োকে টানতে টানতে ডাঙায় তুলে আনল। পাকা জাফরাণ হয়ে গেছে চোখ মুখ।

—"অমন করছ কেন বাজান?" ঘুমিয়ে পড়ল পদ্মরী।

কিন্তু তাড়া দা জল, জ্ঞান নেই বুড়োর। ডাঙায় দাঁড়িয়েও ঢলছে ডোবার, আবার যেন ভেসে উঠতে লাগিয়ে।

—"এই, এই যাচ্ছে কর্তা।" সজোরে গজেন ওকে ধাক্কি দিল। কিন্তু সাড়া পেল না।

বলরী যেন ডুবছেই আর ভাসছেই।

—"এই, চল ওকে নৌকোয় নিয়ে তুলি।"

গজেন বলল, "সেই ভালো।" হাত দুটোকে ধরে ধরে বলরীর দেহটা ও পিঠের ওপর তুলে নিল। চলো।"

জীবনে কখনো এমনভাবে বাঘের মুখে পড়ে নি বলরী। তবু ভালো, ওর বাজানদের কোন ক্ষতি করে নি ও। তা হলে এই জলেই মাথিনীটা লাফিয়ে পড়ে প্রতিশোধ তুলে নিত। খালের ধারে দাঁড়িয়ে এখনো যেমন হিংস্রভাবে তাকিয়ে আছে। চোয়ালের ফাঁক দিয়ে শাদা ধবধবে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ছে। পায়ের থাবার মাটি আঁকড়ে থাকা নখগুলো যেন নাড়িয়ে দিচ্ছে।

বলরীর পক্ষে এ অবস্থায় এমন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা একেবারেই উচিত নয়। আবার ডুব দিল বলরী।

নৌকোর পাটাতনে ওকে শুইয়ে দিয়েছে গজেন। চোখ বুজে কেমন লাগে। যেন একটুকু ছন্দ নেই চিতরে।

পদ্মরী কপাল চাপড়ে কাঁদতে শুরু করল "বাজান তোমার কি হল গো?"

বলরী একটানা অনেকক্ষণ পানে ডুব দিয়ে থাকল, দম বন্ধ হয়ে আসছে। আবার বাতাসে ভেসে উঠে হাঁ করে বাতাস টানল।

চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা। দাঁত মুখ বিকৃত করে আবার যেন ঢোঁকিয়ে উঠেছে বাঘটা। কে জানে, এখনি লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়েছে কি না! বলরী ডুব দিয়ে আবার জলের নিচে তলিয়ে গেল।

জলের নিচে যেমন যেন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে আসছে, কর্তা। হাঁরে, ঐ মাথিনী যেন হাঁফিয়ে মরেছে নিচে। জলে জলে ভাসছে।

ঠিক হাঁফিয়ে, ঐ মাথিনীর ওপর শুয়ে আরাম করে একবার পা পাঁড়িয়ে নেব। বাঘটা ভাসছে ডাঙায়, জলের নিচে বলরী লুকিয়ে থাকলে বাঘটা ওকে দেখতেই পাবে না।

কিন্তু বেশিক্ষণ জলের নিচে থাকা সম্ভব নয়। দম ফেটে আসছে আবার, চকর করে জলের ওপর মাথা তুলে আনল বলরী।

আহ্, বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়েই আবার তলিয়ে গেল জলে।

—"বাজান গো, অমন করছ কেন! ও বাজান, দেখ তোমাকে আমরা জল থেকে নৌকোয় তুলে এনেছি।"

গজেন এ মুহূর্তে কি যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না। আরো অনেক ঘণ্টা ঝোরাবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ওদের। তাঁটা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকো ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে হবে এখান থেকে।

—"তখনি বলেছিলাম কাজ নেই আমাদের খুন্নত যাবে, এখন সামলাও।"

পদ্মরীর বুকের ভেতর আকুলি-বিকুলি করছে। অমন করছ কেন লোকটা। তবে কি পারে বাতাস ভেসেছে! এখানে কেঁদে ভাসালেও খুনীর পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটা খুনীর সোজাই কেন ভরসাটা উশুল করতে পারে পদ্মরী।

—"বাজান, ও বাজান!"

জলের নিচে হাঁরে প্রাণ মাথিনী। এত সব এখানে এল কি করে! টুল দেখছে না তো বলরী। না, মিলি দেখতে পাচ্ছে, জলে জলে ঘুরে সব জরিপ করছে। লাল, নীল, সবুজ, কত রঙের আলো; চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে ওর।

উত্তেজনায় অনেকক্ষণ পানে ডুব দিয়ে থাকল। দম ফুরিয়ে আসায় আবার ভেসে উঠল বলরী।

বাঘটা কি এখান থেকে যাবে না নাকি! কি বিশ্রী চিৎকার করছে বাঘটা। ডাইনে বাঁয়ে কি ভীষণ লম্ফ নিয়ে পায়চারী করছে। তাকিয়ে থাকা যায় না। বলরী আবার ডুবে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করল।

এত মাথি মাথিনী কেন! তবে কি সেই লোহার সিন্দুকটা কেউ টেনে এনে এখানে এই জলের তলায় ফেলে দিয়েছে। তবে কি কেউ, শাদা কাপড়ের সেই নিশানটাকে সাক্ষি রেখে সমস্ত খুনখারাবীর সন্ধান পেয়ে গেছে!

কে? কারা ওরা?

কেনই বা লোহার সিন্দুকটাকে টেনে এনে এই জলের তলায় মাথিনীগুলো ছড়িয়ে দিল? কেন?

উঁহু, দম ফেটে আসছে ওর। মাথা তুলে আনল উপরে।

গজেন বলল, "আর আমাদের দাঁড়াবার দরকার নেই, নোঙরটেই টেনে টেনে খানিকটা পারি এগোই। কি বল?"

পদ্মরীর গলায় কান্না ছাড়া কিছুই নেই, "বাজান! ও বাজান! তুমি অমন করছ কেন?"

গজেন নোঙরটি তুলে নিল। জলের টান উলটো বুঝে। তা হোক! বৈঠা নিয়ে বসটুইয়ে নিয়ে বসল। উলটো টানেই লড়াই করতে ক্ষতি কি! যতটা এগোন যায়, ততটাই লাভ।

বলরী আবার ডুব দিল জলে, সিন্দুক, আমার সিন্দুক.....

—শেষ—

সুরে ও কথায় : আকাশবাণী জলসার থেকে ছোটদীতি পরিবেশন করেন

# ছোটগল্প

# শৌখিন

## সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কান্না হাসির দোল—যাযাবর | ... | ২৩৩ |
| বসন্ত প্রলাপ—দেবেশ দাশ | ... | ২৩৮ |
| উপযাচিকা—গজেন্দ্রকুমার মিত্র | ... | ২৪২ |
| জননীর জন্ম—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | ... | ২৪৭ |
| তিন তাসের খেলা—কবিতা সিংহ | ... | ২৫০ |
| সিঁড়িতে ভয়ঙ্কর—শংকর চট্টোপাধ্যায় | ... | ২৫২ |
| নাম—মায়া বসু | ... | ২৫৬ |
| ভোরের আঁধারে ঝড়—আবদুল জব্বার | ... | ২৫৮ |
| জবানবন্দী—দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য | ... | ২৬১ |
| বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—আশা দেবী | ... | ২৬২ |
| বিবক্ষু সৌরবেদনা—প্রাণতোষ দাশগুপ্ত | ... | ২৬৩ |
| ক্ষণিকের সেই নর্তকী—দীপক খাস্তগীর | ... | ২৬৭ |
| অপসৃতা—আইভি রাহা | ... | ২৬৯ |

কালো পাট ও সুন্দর হাত। সোনা কথার কাঁসার ঘড়া ও মাটির হাঁড়ি। এ দুয়ের সম্মেলনে যে কী মারাত্মক পরিণতি ঘটতে পারে শিল্পপাড়া স্ট্রীটে তার সবকয়টি বর্তমান রয়েছে। কিন্তু ছেলেবেলার পড়া পদ্যের মরাল সিকিউরিটিও ধর্মি সবাই স্মরণে রাখতো তবে সংসারযাত্রাটা আদাপোড়া খাওয়ার মতো সুখকর গতিতে চলতো, কোনোখানে এতটুকু বাধা-বিঘ্ন বা বৈচিত্র্যের অবকাশ রইত না।

অর্থ, পদমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে সাবজজ সুখময় বাবুর মেয়ে সোনালী ও হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত বিধু মুহুরীর ছেলে সেখরের তফাতটা কাঁসার থালা ও মাটির বাসনের সঙ্গে তুলনা করলে অন্যায় হতো না। তবুও ঘটনার যোগাযোগে পাঞ্জিকার শুভদিন নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ফাল্গুন মাসের এক সন্ধ্যালগ্নে সুতীহবুকে লগ্নে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। পল্লবগ্রাহী নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করে আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধব যাঁরা উচ্চ দিবসে বিবাহ বাসর ও প্রীতিসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন তাঁরা স্বীকার করলেন, সোসাল স্ট্যাটাসের বিচারে বাই হোক না কেন, প্রজাপতির নির্বন্ধে বর-কনের জোড় মিলেছে বটে। সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ভাষায় বোধহয় একেই বলে, মেড ফর ইচ আদার। অথচ আপাতটা হাল ভাঙনের শুরু করে দিয়ে নয়। সনাতন হিন্দু পদ্ধতিতে অভিভাবক নির্বাচিত শুভ পরিণয়। ইংরেজীতে যার নাম এ্যারেঞ্জড ম্যারেজ। যাঁরা দু পক্ষেরই ঘরের খবর রাখেন তাঁরা জানেন, বর কনেতে পূর্বে পরিচয় ছিল, কিন্তু পূর্বরাগের সঞ্চার হয়নি। সে ইতিহাসটুকু মোক্ষাতেই বলে রাখা ভালো।

সোনালীর বি-এ পরীক্ষার ফরেম যাবার আগে সুখময়বাবু আলীপুরে কোর্ট থেকে হঠাৎ বদলী হয়ে গেলেন উত্তরবঙ্গের একটা জেলার সদরে। সেখানে কলেজ আছে এবং কো-এডুকেশনেও বাধা নেই। কিন্তু কোর্স শেষ হওয়ায় মুখে কোনো বিদায়বচনই নূতন স্থানী দিতে চায় না। সোনালী কিন্তু দিন আগে টাইফয়েডের জুজুর উঠোছিল। তাকে হোস্টেলে রেখে যেতে মায়ের বিশেষ আপত্তি। লেখা পড়ার একটা বছর নষ্ট হবে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া স্বাস্থ্যটা মাটি করা চলে না। মেয়েতো বিধু জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতে যাচ্ছে না।

মায়ের মনের মধ্যে মেয়ের ইচ্ছার প্রাধান্য চিরদিন থাকে না। প্রথমতঃ আই-এ-এসের লিস্ট বেরুবেই জানা যায়, মেয়েদের পক্ষে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হওয়াটা এযুগে কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়। তা ছাড়া তার ক্লাসের ধনিষ্ঠ কয়েরা বি-এ পাশ করে তাকে ছাড়িয়ে যাবে এ সম্ভাবনা সোনালীর পক্ষে অসহ্য। সে কিন্তের অশ্রুপাত, নির্বাক অসহযোগ ও সংসার অনশনের দ্বারা তার প্রতিবাদ জানাতে লাগল। সাবজজকে আদালতে নানা মোকদ্দমার রায় দিতে হয়। নিজের পারিবারিক মামলায় তিনিই একটা আপোষ নিষ্পত্তি করলেন। সোনালী মায়ের কথা শুনে তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গেই যাবে। সেখানে প্রাইভেটে ছাত্রী হিসাবে তার পরীক্ষা দেওয়ার কথাচিৎ ব্যবস্থা করা হবে।

দুই প্যাকিং কেস ঠাসা বই, খাতা, নোট, পুরোনো প্রশ্নপত্রের বান্ডিল, ইতিহাসের 'নোট-বুকী' ইত্যাদি পরীক্ষা পাশের নানা স্ট্রাটেজি উপকরণ নিয়ে সোনালী জেলা শহরের সরকারী বাংলোতে বসে এগজামীনের পড়ায় মন দিল। ইকনমিকসে বরাবরই সে ধাঁড়া। ক্লাসের লেকচার না শুনে শুধু টেক্সট বই পড়ে বেশী নম্বর এনতে পারল না। অঙ্কিলম্বে একজন প্রাইভেট টিউটর না হলেই নয়। সুখময় বাবুর কাছারীর সেরেস্তেদার লছমন পুরোনো লোক; অনেক খোঁজ খবর রাখেন। তিনি একটি তরুণ অধ্যাপক সংগ্রহ করে আনলেন। ছাত্রোটিকে তিনি ছোটবেলা থেকে জানেন। মেধাবী বলে সহরে তার খ্যাতি আছে। গাণিতিক থেকে পর পর সকয়টি পরীক্ষায় ডিসিংগুশ্ট রেজাল্ট। গতবছর এম-এতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। বর্তমানে স্থানীয় কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক; চাকরীর জন্য বিসিস্ দিচ্ছে।

ছাত্রী ও মাস্টারের বয়সের ব্যবধান অল্প। উভয়েরই দেহে ও মনে নবীন যৌবনের ছাপ: নাটক নভেলের নায়কের এ ক্ষেত্রে প্রথম দর্শনেই একটা প্রেমকাণ্ডের সূচনা হয়ে উঠিত ছিল। কিন্তু সংসারে সত্য ঘটনার মুস্কিল এই যে, সে ছক বাঁধা পথের নিশানা মেনে চলে না। পুঁথির পাতায় যা হওয়া কিংবা, বাস্তব জীবনে অনেক সময়েই তা হয় না। সেখর পাঁচ মাস ধরে প্রত্যহ নিয়মিত অনেকক্ষণ অনেক ঘরে সোনালীকে পড়িয়েছে। সে ছাত্রীকে সবিস্ময়ে বিকাশোন্মুখ যৌবনে ঘর বেশ খুঁজিয়েছে, সন্তর্পণে প্রশ্নের উত্তর বার বার করে লিখিয়েছে, মনোযোগের এতটুকু শৈথিল্য সেখানে চিরদিনার করেছে। কখনও তার কমল আননের দিকে অকারণে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকেনি। ছাত্রীটি অবশ্য মাঝে মাঝে অনেক বাজে জেগে কাটিয়েছে। তবে সে তার সুকুমারকান্তি মাস্টারটির জন্য হা-হুতাশ করে নয়; জ্যামার এ্যান্ড বেকী-কৃত চারটির অর্থনীতি বা ঐ জাতীয় বই মুখস্থ করার তাগিদে। ফলে একটা রোমান্টিক ঘটনার খাটা মারা গেল, কিন্তু সোনালী ডিস্টিংশান নিয়ে বি-এ পাশ করল।

সংস্কৃত শ্লোকে বলে, বর মুক্তাতে দিয়ে বরের বাপ চান মূল এবং মা চান বিদ্যুৎ। সাবজজ পরিবারে তার যাচিতম বেশী ছেলে। বি-এ পাশের অভিনন্দন ভোজ ইতিমধ্যে ছিড়িক ছেড়ে ছেড়ে। সোনালী এম-এতে কোন্ সাবজেক্ট নেবে চাওয়ে। এমন সময়ে দিল্লী একদিন কথাটা পাড়লেন। সোনালীর মাস্টার ছেলেটি

ধারণা : যেমন চোখ ঝলসানো চেহারা, তেমনি নম্র স্বভাব। জামাই করার মতো পাত্র।

স্কুল কলেজে সুব্রতর নাম ছড়ানো ছিল। চাকরি জীবনেও অনেক সরকারী অফিসারের চাইতে ভিন্ন। পড়াশুনার তাঁর অনুরাগ এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়নি। স্ত্রীর অনুরোধে তিনি সন্ধ্যেবেলা সান্ধ্য ক্লাস নিতেন। বলেছেন অর্থশালী মন কিন্তু নিশ্চিন্ত। ছাত্রদের কাছে এমন বৈষয়িক সম্পর্কে তাঁরা আকর্ষিত।

পাশের কোনো আপার্টমেন্ট থেকে সেতার ভেসে আসছে। পাশী মেয়েটি গলা সুরে বলল "ধাং"। পরে থেকে থেকে প্রত্যুত্তরে ঝিন্ ঝিন্ করে বাজতে লাগল। এবং তারও পরে গলায় লাল চেলী ও মাথায় সিঁথি-মৌর চড়িয়ে মেয়েরা ছিরে ধরে গাইতে সুরু করল।

রজতাভের যে ছোটখাট ফ্ল্যাট তাদের বাস তাতে স্নান করা, খাওয়া আয়োজনও পরিমিত। কিন্তু সেখানে নব-বিবাহিত দম্পতি প্রসন্ন যে সংসার তা হাসিতে, খুশিতে, যৌবনে চঞ্চল প্রাণের প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল। ঘরকন্নার ছোট বড় কাজে এই অভিজাত দম্পতি বারে বারে ভুল করে এক কথায় আর এক করে ফেলে। কিন্তু তবুও তাদের ঘরোয়াজীবনের আনন্দের চাঞ্চল্যের কোথাও এক কণা কম পড়ে না। বরং ভুল ছিদ্রপথে টিনা-টিনে-ওঠা যোগাযোগ জগতে নতুন সুখ চতুর্দশে ছড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সোনালী মা-বাবার একমাত্র সন্তান চলতি কথায় যাকে বলে আদরের দুলাল। সে পড়াশুনা করছে, অবসরের অধিকাংশ সময়ের সঙ্গে মিল না থাকলেও, দল বেঁধে ছবির সিনেমায়, গানের জলসায় বা এমনিতিবিনোদনে। ফরেন ব্যাঙ্কে তখনও তাদের হাত দিতে হয়নি। কিন্তু চাকরিজীবনের সতর্কতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মহলে সোনালীর ভাবী শ্বশুরকেই ঘিরে পরিচয়ীলতার একটা অতিরিক্ত পর্দা টানা আছে। সেখান থেকে সরাতে হবে, আসন্ন পরীক্ষার চিন্তায় মশগুল সে, ভাবীটিকে সে পরিচয়ছে এ সে চাঁর অফিসার সোনালী নয়। এমন কোথাও আঁচল গুছিয়ে সে উনানে আঁচ দেওয়া ফোলতে বটি পেতে কুটনো কোটে, কাচা জামা কাপড় পরিপাটি করে আলনায় সাজিয়ে রাখে এবং প্রয়োজন হলে আলমারিতে আলাদা ঝি এবং অন্যান্য পরিচারককে ডেকে আনতে পারেও বলে।

সেখরের মনে যে সোনালীর পূর্বপরিচিতির বাইরে আর একটি অন্য রূপের পরিচয়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, এ তথ্য আবিষ্কার করে সোনালীও খুশি হলো। সেখ ভেবে, মার্শাল বা কেইনসের সূত্রে অর্থনৈতিক তত্ত্বে তার প্রাক্তন অধ্যাপক মশায়ের বহুখানি দখল কলহ এ ছদ্মল পরিছয়ে বর্তমান যুগে আমাদিক তত্ত্বখানিই আছে।

সেদিন সকাল বেলা সেখর খবরের কাগজ পড়ছিল। সোনালী কী জানি কী কাজে সেখান দিয়ে অন্য ঘরে যাচ্ছিল। সেখর তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "ওকী, তোমার কানের কাছে কী হয়েছে?" তার কণ্ঠে অকৃত্রিম উৎকণ্ঠার আভাস।

সোনালী নিজের কর্ণমূলে হাত রেখে অনুভবের চেষ্টা করল। সাশঙ্কের সুরে বলল "কৈ, কিছু হয়নি তো।"

সেখর মাথা নেড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যুত্তর করল, "হয়নি কী রকম? বেশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। এখানে এস তো, দেখি।"

সেখরের কথার ভঙ্গিতে সোনালী কিছুটা বিস্মিত হলো। সেখরের কাছে এগিয়ে গেল। সেখর বিজ্ঞ ডাক্তারের মতো গাম্ভীর্যে সোনালীর কানের কাছে ঝুঁকে খুঁটি পরীক্ষাই করছিল। কিন্তু মুহূর্তে তার ঠোঁট দুটি সোনালীর কানের নীচে ছুঁয়েই নিমেষে সমাপ্ত হল চুম্বনের অর্থ পরিক্রমার হয়ে গেল। সোনালী সরে ছেতে ছেতে বলল, "যাঃ, কী করছ তো? চারদিকে জানালা খোলা, তোমার যদি এতটুকু লজ্জা শরম থাকতো!" সেখরকে শাসাল, "ছাড়ি-ছাড়ো আর কখনও আমি তোমায় ডাকা বিশ্বাস করব না।"

ভবিষ্যতের চিন্তায় সেখর যে খুব চিন্তিত এমন মনে হলো না। সে জবাবটা পরিপূর্ণে উপভোগ করল। মুখে যা-ই বলুক, সোনালী নিজেও যে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে এমন প্রমাণ নেই। বরং তার চোখের কোনে হাসি এবং অভিমানের মাঝখানে থেকে অন্য নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট মনে হবে।

আর এক দিনের কাহিনী। সোনালী বাথরুমে স্নান করতে ঢুকেছিল। সেখান থেকে সেখরকে ডেকে বলল, "এই, শুনছো, আমার ব্লাউজটা তুলে এনেছি। জানলা থেকে একবারটি এনে দেবে?"

সেখর জামাটা নিয়ে এল। কিন্তু সোনালী দরজাটা একটুখানি ফাঁক করে হাত বাড়িয়ে যেই নিতে যাবে সেখর অমনি সেটা তার নাগালের বাইরে টেনে নিল। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পরে সোনালী বিরক্ত হয়ে, "দুষ্টুমি করো না, লক্ষ্মীটি, জামাটা দাও। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।"

"দুষ্টুমি কিসের? এইতো তোমার ব্লাউজ। বেরিয়ে নিয়ে নাও"। না বোকা, না জানার ভান করে সেখর।

কিন্তু জামা না পেয়ে শুধু গায়ে বের হবে কী করে? অনেক অনুনয় বিনয়ে যখন ফল হলোনা তখন অগত্যা দাঁড়িটাকেই সারা গায়ে জড়িয়ে রাশ করে সোনালী বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। টান মেরে সেখরের হাত থেকে ব্লাউজটা ছিনিয়ে নিল। সেখরের পিঠে কোমল হাতের একটি চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, "অসভ্য"।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এ ধরণ কোতুকীর শাসনে অপরাধীর চরিত্র শোধন হয় না, উল্টো অপরাধের প্রবলতা বৃদ্ধি পায়। সেখর যখন তখন সোনালীর চাবির থোকা লুকিয়ে রাখে, আচমকা দোলা খুলে যায় এবং সোনালী যখন গভীর মনোযোগে খাতা খুলে বাজারের হিসাব মিলাতে বসে তখন চুপি চুপি এসে তার হাতের পেন্সিলটা তুলে নেয়। সোনালীকে তার পিছু পিছু এ-ঘর ও-ঘর ছুটোছুটি না করিয়ে কিছুতেই সেটা ফেরত দেয় না।

দুদিনের জন্য বাইরে কোথাও গেলে সেখর চিঠি লিখতে ভোলে না। একটা চলতির ইন্টারভিউই দিতে সে দিল্লী গিয়েছিল। নিরাপদে পৌঁছনোর খবর দিয়ে লিখল, "গাড়িতে একটি তরুণ দম্পতি আমার সহযাত্রী ছিল। ছেলেটির দিব্য স্মার্ট চেহারা। মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে তোমার নিষেধ আছে। তাই স্মার্টটি তন্বী কিম্বা বিদুষী, সুন্দরী অথবা কুৎসিত বলতে পারছিনে। তবে রাত্রিতে গাড়ির আলো নিভিয়ে নিজের বর্থে শুয়ে পড়তেই ওদিক থেকে মিঠি মিঠি পাখী ডাকার আওয়াজ কানে এল। তা থেকে অনুমান করছি, মুক্তাভার খুব ভাব আছে।" চিঠিটা সোনালী বার বার পড়ল। এত হাসাতেও পারে সেখর, মনে মনে বলে সোনালী।

কলেজ থেকে সেখর বোকিম তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, চা খেয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ে। চৌরঙ্গী পাড়ার দেশী ও বিদেশী দোকানের দো-কেল দেখে বেড়াতে ভালো লাগে সোনালীর। কোথাও সুটে, কোথাও জুতো কোথাও বা ঘড়ি ও ট্রানজিস্টর রেডিও। নানা রঙের শাড়ি ও নানা নামের প্রসাধন সামগ্রীরও কমতি নেই। তারা কেনে এতসব? রাজা মহারাজাদের রাজত্ব থেকে অনেক কাল, প্রীতি পার্সও নাকি হয়েছে এখন। বোঝবার কেনে কলাটাই ও ব্যবসায়ীরা হটাৎ টাকা কলা নুহোবিল-এর বলা। কিন্তুকে। সোনালীর আনন্দ ইউফোরিয়া-পর্যন্ত-এ। আজও তাই করছিল।

"সোনালী না?"

নিজের নামটা কানে যেতেই

ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ

সোনালী পিছনে তাকিয়ে দেখল, শিবানী। তার পুরোনো বন্ধু। সোমবারেতে একই সঙ্গে পড়ত অনেক দিন।

"অনেকক্ষণ ধরে ভেবে দেখছি। চেনা চেনা লাগছে, অথচ সিওর হতে পারছিলেনা। অনেক বদলে গেছিস", বলল শিবানী।

টৈল আলোকার স্বরে সোনালী বলে, "মুটিয়েছি, তাই না? কী করব বল? পরীক্ষার ভাবনা নেই, বাড়ি ফেলে মোট মুখস্ত করা নেই। শুধু ভবে বসে খাচ্ছি। না, আইসক্রীম আর খাব না।" কণ্ঠে দৃষ্টিতে সে দেখবের দিকে তাকায়। ভাবখানা এই যে, আইসক্রীমটা একমাত্র দেখবেরই অনুরোধেই তাকে বেশী করে খেতে হয়।

শিবানী বাধা দিয়ে বলল, "না, না, মোটা হবেছিস কে বলেছে? দেখতে আরও সুন্দর হবেছিস। সিঁথিভরা সিঁদুর দেখছি, প্রজাপতির নিমন্ত্রণের। কিরকম হলো বরে? চুলি চুলি বেরোছিস। খাওয়াটা না হয় ছেড়েই দিলেম, একটা ছাপানো কার্ড পাঠিয়ে খবরটাও কি দিতে নেই?" অনুযোগের সুরে যোগ করে শিবানী।

অবাক হয়ে সজোরে প্রতিবাদ জানায় সোনালী, "পাঠাইনি? কে বলেছে তোকে? আমি নিজ হাতে খামের উপরে ঠিকানা লিখেছি, মনে আছে। পাসনি বুঝি? ওমা, কী কাণ্ড! বিশ্বাস কর ভাই। সেদিনের চিঠি লিফাফই সোস্ট অফিসে ঘোরা ফেরা।"

অসম্ভব নয়। আজকাল ডাকের চিঠি কোনটা পাওয়া যাবে আর কোনটা পাবে না তার কিছু ঠিক নেই বটে। শিবানী মেনে নিল। বলল, "থাকগে, ভালোই হলো, তোর সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে গেল। তোমাকে আর পোস্টাল ক্লিক দিতে হবে না। হাতে হাতে চিঠিটা দিয়ে দিচ্ছি।"

খামের উপরে সোনার জলে ইংরেজীতে ছাপা — "এরেঞ্জিং"। সোনালী আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে "তোর বিয়ের চিঠি? কনগ্রাচু-লেশনস্। কবে? কার সঙ্গে?" খামটা খুলে চিঠি পড়বার তর সয় না তার।

শিবানী বলে, "দূর, আমার বিয়ে কে করবে? সেজদির বিয়ে। আমার বন্ধুদের অনেককেই চিঠি পাঠিয়েছি। তোর সঙ্গে তো সেজদির আমার চাইতেও বেশী ভাব ছিল। সেদিন দিয়ে তোর মু মুটো ইনভিটেশান পাওনা।"

কথাটা একটুকুও মিথ্যা নয়। শিবানীর সেজদি বয়সে সোনালীর চেয়ে কয়েকবছরের বড় তা জানা নেই। অন্তরে দু বছরের সিনিয়র ছিলেন। সোনালীকে নিজের ছোট বোনের

শিবানীর খাবার তাড়া ছিল। সোনালী তাড়াতাড়ি দেখবকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। শিবানী লজ্জিতভাবে তাকে নমস্কার করে বলল, "ছি ছি আপনাকে এতক্ষণ লক্ষ করিনি। মাপ করবেন। শনিবার আমাদের বাড়িতে বিয়েতে সোনালীকে নিয়ে আসা চাই। তখন কথা হবে।"

যাওয়ার আগে সোনালীর কানে কিস কিস করে বলল, "খুব বাগিয়েছিস যা হোক। এ চাইস কাচ।"

শিবানীটা এখনও কলেজের সেই কাঁচলি মেয়েই রয়ে গেছে। একটুকুও বদলায়নি। সোনালী মনে মনে হাসল। অথচ খুশিও হলো।

ভালোবেসে সাদরে ঘিরে বাড়ি ফিরে থেকেই চেনা যায়। দ্রুতিন ঝামেলা মোড়া ও সিলকের ফিতে দিয়ে বাঁধা সুদৃশ্য প্যাকেটে একজোড়া মোসলা-বাদী কুলবানি উপহার নিয়ে টাক্সি থেকে নামতেই সোনালীর খুটি খুই প্রাণেবার সহপাঠিনীর সঙ্গে দেখা। তারা অনেক করে সোনালীকে চায়ে না ডেকে ভুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে অন্তর্হিত হলো দেখবে তা জানে না। একমাত্র শিবানী ছাড়া অন্যান্যক বা অন্যদের বাড়িতেই সে আসে দেখেনি। শিবানীর সঙ্গেও পাঁচিশ মিনিটের—কম করে মিনিটের বলাই ঠিক। সেই শিবানীকেও এখন কয়ে পিঠে কোথাও দেখা গেল না। অথচ রোকার মতো সময় বরবাদ করিয়ে থাকাও চলে না। একটি সদা জাগ্রত সম্পত্তিকে অনুসরণ করে সে সামিয়ানার নীচে বেখানটায় গিয়ে পৌঁছল সেখানে বসু, নির্মলিতেরা আগের রাতেই জড় হবেছিলেন।

দেখব আসে পাশে তাকিয়ে দেখল, চিনার জ্যাকেটে অনেককে ইংরেজ বা এরোকিয়ান এবং ইন্ডিয়ান গাউনে সজ্জিতা। হালকাই পরিচারিকা। মাঝবয়সী কয়েকজনের মাথা অবশ্য সাদা-থোপা নিয়ন্ত্রণে। উচ্চ হিল ও লম্বা কাঁচলি পরিহিতা পরিচালিকা কথাবার্তা বা অঙ্গভঙ্গি সবই ইংরেজীতে। কে পাঞ্জাবী, কে সিন্ধি বা মহারাষ্ট্রীয় তা সহজে বোঝার উপায় নেই। বিচিত্র অর্থহীন এই পার্টি ও ফ্যাশন হুজুগের মধ্যে বাঁধি-পরা ছোকরী দেখব নিতান্তই বেমানান। তার অস্বস্তির সীমা নেই। হায়, এত বড় কলকাতা শহরের লক্ষ লক্ষ বাঙালীর মধ্যে এমন কি আর একজনও নেই যার কাছে সে তার বিয়ির সঙ্গে শাড়ির কথা বলতে পারে?

প্রতিষ্ঠানের পালটি পরিবেশন করছিল একজন ছোকরা। তাদের গায়ে লাল রঙ ঝুল ঝুঁটি, কোমরে লালপেড়ে-ধুতির ঢঙের কোমরবন্ধ এবং মাথায় সেইরকম রঙের পাগড়ি। অনেকটা-কটা শিখদের চারটি পিন দিয়ে আঁটা। অনুমান করতে কষ্ট নেই যে, সাহেবী পোষাক কোনো নামজাদা রেস্টোরেন্টের বেয়ারা। তাদের হাতে ট্রে-র উপরে সাজানো পাঁচ-ছটি কাঁচের গ্লাস। তার ভিতরে সিঁদুরের রঙিন তরল পদার্থ। অতিথিদের সামনে এগিয়ে ধরতেই তারা এক একটি হাতে তুলে নিচ্ছেন। বেয়ারা ফোরেন থেকে সোজা প্লেনে প্লাস পূর্ণ করে দিচ্ছে। দেখব অনুমান হলেও বুঝতে পারল, জিনিসটা আর যাই হোক, লেমন স্কোয়াস নয়। একজন বেয়ারা তার দিকে এগিয়ে আসতেই দেখব হাতাহাতি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, ওতে তার প্রয়োজন নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সারি সারি গ্লাসের আলো নিয়ে ও ছোপো, ছোপো শব্দে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বর ও বরযাত্রীরা এসে গেল।

দেখব ছোটবেলার পাড়া গাঁয়ে পালকী চড়ে বর আসতে দেখেছে। বড় হয়ে নগরে ভুলে নিয়ে সাজানো মোটর গাড়িতে বরাসনেও তার দেখা ছিল। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে ভর দিয়ে করতে আসছে এমন বর সে দেখা দূরে থাক কল্পনাও করেনি। আজকালকার এই ঢঙ, বাস, স্কুটার, ট্যাক্সির দিনে একমাত্র অফলনে পুলিসের মাউন্টেড ছাড়া আর কেউ ঘোড়সওয়ার আসে এমন সম্ভাবনা তার মনে ছিল না। তবে সাজটাই বা কী বরের? না মাথায় পাগড়ি কিংখাব পাঞ্জাবী না অন্তত মাথায় শোলার টোপর। ফুলের বালরে চোখমুখ ঢাকা। বর বুঝা কিন্তু স্ফীত, সুপুরুষ বা জমকার কিছুই দেখার বা ভাবার যো নেই।

বরের পিছনে পায়ে হেঁটে আসছেন বরযাত্রীর দল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন টালি বাড়ির অমল লাহাকেছেন কেন? সোনা গেল, তাঁরা বরের বাবা, কাকা, মামা, মেসো ইত্যাদি নিকটতম আত্মীয়। তাঁরা নাচছেন। অবাক কাণ্ড! লোকগুলি ভাঁড় না উন্মাদ?

শিবানীরা আসলে পাঞ্জাবী। অনেক পরুষে প্রায় পরিবারের স্থান নামাবলী দেবের সুদূর অতিবাসার এক খণ্ডগ্রাম থেকে জলকাতায় এসেছিলেন। তবলেই সম্পত্তিবান সম্প্রদায়। কী করে তিনি টাকা উপার্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে বিভিন্নপ্রকার জনশ্রুতি আছে। মোট কথা তিনি সর্বস্বান্ত এখানেই করে গিয়েছিলেন। তাঁর পরে, সোদর এবং পুত্রপৌত্রেরা নানা সময়ে তার সম্পত্তিকে অনুক্রমে বাড়িয়ে তুলেছেন। তাঁরা বাঙালার জলবায়ু ও বাঙালী পরিবেশে প্রানুষ। ক্রমে ক্রমে তাঁদের কথা বার্তা ও আচার ব্যবহারে পাঞ্জাবীর মেয়ে খুঁজে। শিবানীর বাবা এরোকিয়ান ইন্সিওরেন্সের ডিস্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র। মামারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। চার পাঁচটা এমন বড় কারখানায় মালিকানা ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যান যার সঙ্গে ছিলেন কোম্পানীর পাটছড়া বাঁধা, ইংরেজীতে যাকে বলে ফরেন কোলাবরেশান। ভদ্রাচারে ও চালচলনে তিনি অতি আধুনিক সমাজের উচ্চস্তরের বাঙালীদের সমান। কিন্তু ভিতরে যা অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়কর্মে এখনও পুরোনো কুলপ্রথা ও দেশাচার না মেনে পারেন না।

বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক রীতি নীতিতে বিস্তর পার্থক্য আছে, এ তথ্য দেখবের অজানা নয়। অন্য সময়ে পাঞ্জাবের বিবাহ অনুষ্ঠানের সমাবেশ দর্শনে দেখতে পাওয়াটাকে সে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বলেই গণ্য করত। কিন্তু অন্য অজানা অচেনা পরিবেশনে তার মনটা প্রথমেই বিমুখ হয়েছিল। সে মনে মনে ধরকে একটা সার্কাসের সং এবং ধরণক্ষীদের অঙ্গভঙ্গি আচরণকে হাসাকর ও কুরুচিপূর্ণ বলে ধিক্কার দিল।

কন্যা কর্তাদের একজন এসে সবাইকে অন্য একটা বসবার জায়গায় ডেকে নিয়ে গেল। সেটা যে হোজনস্থলের ভূমিকা সে বিষয়ে দেখবের অনুমান নির্ভুল। কিন্তু দেখবেরও তার জন্য অনেক অপরিচিতের বাড়া জন্য ছিল। বিয়ে বাড়ির খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে তার যে অভিজ্ঞতা অল্পে এখানকার সঙ্গে তার কিছু মেলে নেই। না আছে ছেলেদের জন্য পাতা পেতে প্রতি পরিচিত পঙ্‌ক্তি ভোজনের আয়োজন, না দেখা যেল আধুনিক কায়দায় লম্বা টানা টেবিলের উপরে কাগজের রোল বিছিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। এখানে একটি করে ছোট গোকো টেবিল, তার চার দিকে চারটি চেয়ার। টেবিলক্লথের উপরে ছুরি, কাঁটা, স্পুন, ন্যাপকীন ইত্যাদি বিলাতী ডিনারের সব সরঞ্জাম। দেখব একটা খালি টেবিল বেছে নিয়ে বসল। উদ্যোগপর্ব বেয়ারা সুদৃশ্য ছাপানো মেনুকার্ড ও পেন্সিল তার হাতে তুলে দিয়ে আদেশের অপেক্ষায় রইল।

কার্ডটায় ডিশের নামো পর পর লাইনে ইংরেজী বর্ণমালার বুঝিয়ে শব্দগুলি দেখবের পরিচিত নয়। 'Agneau বস্তুটা মেমন এবং legumes epices অর্থে glacea' Lavanille মনে কী হা সে জানে না। Poulet এবং Petits Pois ও সমান দুর্বোধ্য সে কী করবে ভেবে পেল না। জাইনে বসে তাকিয়ে দেখল, অন্যান্য অতিথিরা তাঁদের কার্ড তিন চারটে করে ফিরে দিচ্ছেন। বেয়ারা

সেন্ট্রাল নিয়ে চলে গেল। যদিও শিবানীর মেজাজ নিয়ে যারা ঘোরা ফেরা করেছেন তাঁরা জানেন কিসে সেখর রা জানে না। তবু তাঁদের পক্ষে অনুমানই সে নিরাপদ জ্ঞান করল। নিজের কার্ডে বলল্লা সেলিব্রেটের নাম লেখে দিল।

খানিকক্ষণ পরে সেখরের চৌকিতে যে চার পাঁচ ফোটো তোলা সাহসী উপস্থিত হলো তার সবগুলিই ফ্লোরোসেন্ট-ফিলামেন্ট জিনিসের অভিনব প্রয়োগের ফল। কোনো ফোটো কন্ট্রাস্ট, কোনোটায় সুক্ষ্মতা, একটায় চমৎকার সব কিছু নিয়ে একখানায় অনবদ্য ওস্তাদের সব কটারই সমাবেশ। বাঙালীর রুচি তোলনে যেমন দৈ, রাবড়ি, পান্তুয়া না হলেন।

সেখর চৌকিদার এক গ্রেট ভদ্রলোক যোগেশ সেখরের বিশ্ব অবস্থাটা ভাল অবোঝালেন। তিনি তোয়াকে কাছে ডেকে কী নির্দেশ দিলেন। সে ঐ পুঁটি-এর পর্যন্ত মাঝির তার পকেটে চাঁকেন ফোন্ট, দাড়ান ইত্যাদি এনে দিয়ে সেখরকে সাজে থেকে উদ্ধার করল।

জীবনে কখনও সেখর এমন অপদস্থ হয়নি। লজ্জায় ও অপমানে তার গলা দিয়ে ভাষার বলতে চায় না। সোনালীর উপরে তার খুব রাগ হলো। ডোকা থেকেই এ নিমন্ত্রণে আসতে সেখরের তেমন উৎসাহ ছিলনা। শুধু সোনালীর অনুরোধেই সে সেখরকে রাজী হয়েছে। তবে কি সেজন্যেই এতটা কি শুধু শুধুই লাঞ্ছিত হলেন?

—"ওমা, তুমি এখানে? আমি কখন থেকে তোমাকে খুঁজছি।" কিসফিসে সুরে বলল সোনালী।

সেখর পিছনে তাকিয়ে দেখল, সে একা নয়। সঙ্গে তার বান্ধবীরাও আছে।

—"আপনি বাচ্চা ছেলের মতো উইঙ্গের ঘরে হাঁড়ির মোহন ভরে করে সোনালী উঠলো হাঁসিল। তেবে তেবে তার ভালো করে খাওয়াই হলো না। আপনি খেয়েছেন তো?" শুধু করল শিবানী।

—"আপনাকে খুঁজে না পেয়ে আমরা তো এখন পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছিলাম" সকৌতুকে যোগ করল সখী পরিজন।

সেখর এ-সব হাসি ঠাট্টার কিছু মাত্র যোগ না দিয়ে বিরস মুখে সোনালীকে বলল, "এবার বাড়ি ফিরতে হয়।"

শিবানীর এই বান্ধবীর সঙ্গে গাড়ি ছিল। সে ও তার স্বামী সোনালী-সেখরকে একটা ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড অবধি এগিয়ে দিতে চাইলেন। সেখর সজোরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

ট্যাক্সিতে সারাটা পথ সেখর চুপ করে রইল।

অনেক কাল পরে তার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সোনালী খুব খুশি হয়েছিল। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাদের গল্প করতে লাগল। তার সবটাই মনোরম—অর্থাৎ একক উঁচু।

সোনালী জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ঐ ওরেস্টার্ন প্যাণ্ডেলে বসতে গেলে কেন? ওটাতো ছিল শিবানীর বাবার সহচর ও দায়েবী বন্ধুদের জন্য। এ পরদে ইণ্ডিয়ান রেকর্ডিংয়ে তার সবাইর জন্য বেলীচারে চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। আমরা তৈ তৈ করে খুঁজি, কালিয়া, তৈ সন্দেশ খেলাম। তুমি ভালো করে খেতে পেয়েছ তো?"

সেখর সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না।

নিজেদের ফ্লাটে পৌঁছেও সেখর কোনো কথা বলল না। ঘুমোতে যাওয়ার আগে ছিটকিনী, বাথরুম ইত্যাদি পরীক্ষা করা সেখরের অভ্যাস। আজও রুদ্ধ চালিতের ন্যায় সে-রুটীন নিঃশব্দে পালন করল। তারপর সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সোনালী অবাক হলো। সেখরের শরীর ভালো আছে তো? হঠাৎ মাথা ঘুরেনি তো?

শরীর ভালোই আছে। মাথাও ঘুরেনি। সেখর জানাল, স্যাঁ এবং না দুটি ছাড়া অন্য।

ফিরতে সোনালী তার জড়োয়া গহনা পরে ফিরেছিল। একে একে সেগুলি গা থেকে খুলে আলমারীতে তুলে রাখছিল। সেখান থেকে জানাল, শিবানীর মা দুঃখ করছিলেন, ফিরে বাড়ির কড়চ কর্মের চাঁড় খুনশুদ্ধ খুলে তখা করতে পারলেন না। তোমার সঙ্গে তো দেখাই হলো না। পরে একদিন আমাদের সুবিধা মতো তাঁদের ওখানে গিয়ে তা খেতে বলেছেন। অনেকে তোমার খোঁজ অ-চে—

কথাটা শেষ হতে পারল না।

—"যেখানে যেতে হয় তুমি একলা যেও। আমাকে আর কোনো দিন ওসবের মধ্যে টেনো না।" আগ্নেয়গিরির মতো সশব্দে ফেটে পড়ল সেখর।

সোনালী চমকে উঠল। সে কোনো দিন সেখরকে এমন চেঁচিয়ে কথা বলতে দেখেনি। বিয়ের আগে পরীক্ষার পড়া নিয়ে সেখরের কাছে দু একবার বকুনি খেয়েছে বটে। কিন্তু সে শাসনে থাকত সহানুভূতির প্রশ্রয়, নির্মম আঘাত নয়। আজ স্বামীর এই অকথ্য দুর্ব্যবহারে সে আশ্চর্যান্বিত অভিভূত হলো।

সেখর বাস করছে, বোঝা গেল। কিন্তু কেন? কখন, কোথায় কী ত্রুটি ঘটেছে শিবানীর? সে ভেবে পায় না। অনেকক্ষণ, সে আলমারীর তালায়-পরানো চাবিটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আলমারীটা বন্ধ করল। ধীরে ধীরে পাশের ঘরে গিয়ে জামা কাপড় বদল করল। তোয়ার ঘরে ফিরে সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল। বিছানার প্রান্ত দেহ এলিয়ে দিল।

বাইরে কলিকাতা শহরের শব্দ অনবরত। মাঝে মাঝে দু একটা ট্রিয়ার টুং টাং ও দ্রুত ধাবমান মোটর গাড়ির আওয়াজ ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ। পাশের ফ্লাট-গুলিতে আলো নিভে গেছে অনেক-ক্ষণ। ঘরের ছোট দুজনের কারুর চোখেই ঘুম নেই। উভয়ের পরিচিত দুঃখের অনীভূত বেদনা অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতাকে যেন আরও দুঃসহ করে তুলেছে। শুধু ফোন টেবিলের উপরে টাইমপীস ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দে জানাচ্ছে, তার কাটা হয়তো কোথে সেখার উপায় নেই। মিনিটকে মনে হয় প্রহর, ঘণ্টাকে এক একটা যুগ।

অন্ধকার ঘরে খোলা জানালা দিয়ে সেখর বাইরে নির্মেঘ রজনীর কিস্তব্ধতা অবলোকন করছিল। তারার তারায় ভরা। কৃষ্ণপক্ষের অবসানে চাঁদ উঠেছে একটু, চেয়ে। খানিক আলো, খানিক ছায়া পড়েছে অদূরবর্তী উঁচু বাড়িটার আলসেতে। সেখর পাশে তাকিয়ে দেখল, সোনালী বিছানার অনেকখানি যুড়ে ছেড়ে ঘুমোচ্ছে প্রায় কিনারায় পিছন ফিরে শুয়ে আছে। তার লতার মতো বঙ্কিম দেহের উপরে বিন্যস্ত নিটোল বাহুটি কবিতার ছন্দের মতো নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে মৃদু আন্দোলিত। সেখরের বুকের মাঝখানটায় কী যেন গুমরে উঠল। সে কি অন্যায় করেছে? অনুচিত কাহিনো স্ত্রীর কানে গিয়েছে?

শিবানীদের বাড়িতে ফিরে পরিবেশ তার ভালো লাগেনি। অপরিচিতের পরিচয়ে অনাবশ্যক আগ্রহের কারণ জানতে সে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছে তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু সোনালীর অপরাধ কী? অনেক বাঙ্গালী ফিরে বাড়িতেও স্ত্রী পুরুষের আলাদা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামিত্ব এবং নিরামিষাশীদের পক্ষে অসুবিধা নিশ্চিত্ত থাকে। শিবানীরা তাদের বিদেশী অতিথিদের জন্য যদি বিলাতী ধরনে ডিনারের আয়োজন করে তাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার কী আছে? সেখর যদি না জেনে বুঝে সেখানে গিয়ে ছোটে তবে সে

সিদ্ধেশ্বরী দেবী

যোক্তামির জন্য সোনালীকে দোষ দেওয়া কেন? আহা, কোমরীকে খামোকাই বকুনি দিয়েছে সে।

হাল ফেরে অপেক্ষার একটা ঘটনা মনে পড়ল। শেখরের এক মাসতুতো বোন থাকেন বর্ধমানের কাছে এক গ্রামে। তাঁর বর কলকাতায় মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন। অফিস পাড়ায় হঠাৎ একদিন দেখা হতেই শেখরকে খোঁটা দিলেন, "তারা, আমরা গ্রামবাসী গ্রামকন্যা ঘরে এনেছ বলে কি গরীব আত্মীয় স্বজনের একটি-বার খোঁজ নিতে নেই? তোমার দিদি দুঃখ করে বলেন, 'বিয়েতে যেতে পারিনি, তাই-এর বউকে আজ অবধি একবার চোখে দেখা হলো না।' টেনে দু'ঘণ্টারও পথ নয়; না হয় শনি-রবি করে একদিন আমাদের ওখানে বেড়িয়ে যেতে। তাতে তোমার এক পয়সার কিছু খরচ যাবে না।"

ছুটির দিনে সোনালীদের একটা বাঁধা প্রোগ্রাম আছে। তারা তার নাম দিয়েছে 'মিনি পিকনিক'। কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে দুপুরের আগেই দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। কোনো দিন যায় গঙ্গার ধারে, কোনো দিন বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা ময়দানে। ব্যারিটোন সো-তে সিনেমা দেখে সন্ধ্যা নামার আগে বাড়ি ফেরে। কিন্তু ডক্টরীপড়ার এত ঝামেলার পরে একবার তাঁর ওখানে না গেলে চলবে কেমন করে। এক রবিবারে সোনালীকে নিয়ে শেখর হাওড়া স্টেশনে বর্ধমান লোকালে চেপে বসল।

গ্রামের বাড়িতে বোন জামাই আদর যত্ন করলেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি শাশুড়ী থেকেলে মানুষ। এ-কালের মেয়েদের বলন-চালনের সঙ্গে তাঁর যেন ধারণা স্বভাবতই মেলে না। নতুন বউ-এর মাথার কাপড় না থাকাটা তাঁর কাছে বিশেষ নিন্দার বিষয় বলে মনে হয়। মুখ আছে বলেই কি কথা বলতে নেই? তিনি "সোনালীর জন্যে ঘোমটা বাঁধা পান-চিবোন খুলে চুলে জবজবে তেল দিয়ে মুখে পৌঁপ করে দিলেন। বাড়ির জামাতা স্ত্রী গুরুজনের সামনেই মেয়ে প্রণাম করলেন, "সে কী মো? বিয়ের পরে দু' বছর পার হতে চলল, এখনও কিছু হলো না!" পরে পাইঁয়ের উপদেশ দিলেন, "কলকাতায় ফিরে শাশুড়ীর জেঠী ডাক্তার দেখাও। ওষুধপত্তর যাদুমণি আনিয়ে পর।" মনে আছে, দুঃখে সোনালীর নয় শেখরেরও কান লাল হয়ে উঠেছিল।

সে-দিন শারীরিক ধকলও কম হয়নি। গ্রাম থেকে বাইরে যাতায়াতের একমাত্র বাহন সাইকেল রিক্সা। কোথায় পথে কিছুতেই পাওয়া যায়নি, অনেকখানি পথ পায়ে হেঁটে মেয়েরী স্টেশনে গাড়ি ধরতে হয়েছিল এবং ট্রেনে বাইরের দুজন ও নিজেদের বিরক্তিতা, পেলাপায় ভিক্ষুক ও চোর-চালানে কর্তৃদের চাল পাচারকারী দুষ্ট, খুচরা, বালক, যাত্রিকদের ভীড়ে ঠেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া অন্য গতি ছিল না।

সমস্ত অনুষ্ঠানের যাদারদুলি সোনালী অবিচলিতভাবে গ্রহণ করেছে। কোনো দিন একটুও অভিযোগ করেনি—এ কথা স্মরণ করে শেখর লজ্জিত হলো তুলনায় তার নিজের আচরণ যে অতদূর অমলিন ও দুঃখহীন সে-বিষয়ে তার কোনো সংশয় ছিল না। তার মনে গভীর অনুশোচনা দেখা দিল। সে সোনালীর ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল।

সোনালী বাধা দিল না। যেমন নির্বাক হয়েছিল তেমনি নিঃশব্দ নিশ্চল রইল। দুঃখ শেখরের সন্দেহ দুর্লভের মধ্যে তার সর্বাঙ্গ ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে কান্না ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল। শেখর এবার দু' হাতে দিয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে আনল। বুকের মধ্যে অভিমানের যে তীব্র বেদনা সোনালী এতদিন নীরবে বহন করছিল স্বামীর এই অনুরোধের অভিঘাতেতে তা যেন আরও দুঃসহ মনে হলো। তার দুঃখ কান্নার বেগ কিছুতেই আর বাধা মানল না। শেখরের বাহুবন্ধনের মধ্যে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অনুতপ্ত শেখরের বুকে সে অস্ফুট-ধ্বরে যেন কঠিন শপথের মতো বলল। সে বার বার নিজের অপরাধ স্বীকার করল। স্ত্রীকে আরও নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করল এবং তার কানের কাছে মুখ এনে চুপি স্বরে ডাকতে লাগল, "সোনা, সনু, সনী, সুনু—"

দু' অক্ষরের এই ছোট্ট ছোট্ট সম্বোধনগুলি সোনালী মায়ের মুখে-মুখে বা পাঠ্যপুস্তকে প্রত্যক্ষ কিনা তা কোনো সংস্কৃত বা বাংলা ব্যাকরণে লেখেনি। কিন্তু তারা যে যথাকালে যথাস্থানে যথাযথভাবে ফল দিতে সক্ষম তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে সোনালীর কান্না থেমে গেল। সে আপনি কাছে সরে এসে শেখরের বুকে মাথা রাখল। বিছানায় দুটো বালিশ বুঝি অনাবশ্যক বাহুল্য; একটিতেই দুটি মাথা অনায়াসে ঠাঁই পেল। শেখরের গালে নিজের গাল রেখে গাঢ় স্বরে সোনালী স্বামীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরল।

ঝিঁঝি ঝিঁঝি পাখী ডাকার শব্দ শোনা গেল। সে শব্দের উৎপত্তি যে কোথায় এবং অর্থ যে কী তা কেনো পক্ষীতত্ত্ববিদ জানেন না। কিন্তু প্রত্যেক প্রেমিক-প্রেমিকাই জানেন।

—শেষ—

সুচিত্রা মিত্র

## বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...

(২৬২ পৃষ্ঠার পর)

—'আরে নাম জানা নাম, ধাম জানি না, চিঠি লেখে কী করে?' বউকেন্দ্র বলে। 'তোমার মাথাটাই গণ্ডগোল আছে।'

—'তাও ভো ঘটে।' মোহবোর্ধন বলল। 'মাথাটা কেমন যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে।'

—'তবে চল কালাই যাই। শুভ কাজে আর দেরী করে কাজ নেই।'

—'তাই হবে।'—অসহায় ভাবে মোহবোর্ধন বলে।

পরদিন সকাল হতে না হতেই মোহবোর্ধন স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লো। সাবান-টাবান মেখে বেশ করে স্নান সেরে ফেরে-ফেরে একটু শিকনিয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু উত্তেজনায় তার চোখে ঘুম এল না।

ফিরতে হবেই মোহবোর্ধনকে। মোহবো-র্ধন একেবারে রেডি। মোহনবাঁশিতে ঠিক করে দেখা অহনার মেয়েটিকে দেখা চাই।

ওরা বেরুলো। এই তো কাছেই বাড়ী। শুধু বড় রাস্তাটা ছেড়ে গলিতে ঢোকা। ওরা গাছদের পাশাপাশি মেয়েদেরটা বাঁয়ে রেখে গলিতে ঢুকলো। গলির বাড়ী-গুলোয় তখন ছায়া ছায়া অন্ধকার নেমেছে। নির্দিষ্ট স্থানের বাড়ীটায় এসে মোহবোর্ধন থমকে দাঁড়াল।

বাড়ীর ভেতর থেকে মোটা কর্কশ গলার সাড়া এলো। কোন?

—'আমরা।'

—'আচ্ছা, ঠেহরিয়ে—' বলে দুম করে দরজা খুলে যে দাঁড়ালো, তাকে দেখে কঠ ঘরে মোহবোর্ধন ধ। খালি গোলমাল গায়ে অজস্রোহিত কেশ এবং লোক গাঁড়ির ছেলের দিয়ে লাইনের বাঁচির বট বাঁটন পাটি বাঁধ বার করে দাঁড়িয়েছে এক দিব্য যুবক।

—'কাকাবাবুরে বাবুজী কা চাহিয়ে?'

এক মুহূর্তেই বুঝতে পারল মোহবোর্ধন, বাড়ীতে দিব্য চতুলোকটি একাই থাকেন। বোধহয় অকৃতদার।

মামলা ঘোরাল দেখে সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই এ্যাবাউট টার্ন। দিব্য চতু-লোক ওদের কাণ্ড দেখে হতবাক্। ওরা গলির মুখে দিয়ে ছুটতে ছুটতে শুনতে পেল তিনি বলছেন—'আপরা কেঁও বাবুজী। শুনিয়ে না—'

শুনবে আর কে? মোহবোর্ধন আর বউকেন্দ্র দুজনেই গলি দিয়ে প্রাণপণে ছুটেছে। বড় রাস্তাটার পড়তে পারলেই মুক্তি। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। ওরা গলিতে ঢোকবার একটু পরেই একটি বিশালকায় ষাঁড় এসে গলির মুখ জুড়ে ছন বোধহয় কোন গভীর দুঃখদুঃখি জানতে জানতে চোখদুজে রোমন্থন করছিল। বউ-কেন্দ্র ছুটছিল আগে। প্রথমবার সে ঠাহর করতে পারেনি। ষাঁড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। হতভম্বও আচমকা ভড়কে গিয়ে সামনে মোহবোর্ধনকে দেখে তাকেই চার্জ করলো।

আদুর জোর ছিল। দুজনে একসাথে বেচে গেল।

—শেষ—

# সংক্রান্তি

দেবেশ দাশ

বিয়ে করছি। ওরই আগ্রহে আমাদের পরিচয়ের চারটে বছর পেরিয়ে বিয়েতে পৌঁছতে হয়েছে। তাই আমরা একটু ভাবপ্রবণ।

ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পরে কামরায় পাখার ঘোরা দেখতে দেখতে পুরোনো প্রসঙ্গটাই সুন্দরীমোহন এই প্রথমবার তোলেন ওর কাছে।

আমি শুধু বললাম, তা হলে এই ছেলে! এত বছর পরে?

আমার প্রশ্নের মধ্যে যে আমার কোন মন্তব্য লুকিয়ে আছে তা ও যেন বুঝতে পারল না। কিন্তু সুন্দরীমোহনের কথা আলাদা। তার একটা অতীত আছে।

তবু ওর বন্ধুর মনের মধ্যে যে-আমিটা ছাড়া। তার চেহারা বদলীগুলি প্রায় সবই মনে আছে। সে ওধারে মধ্যে মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে সব সময়। চুপ করে সে থাকতেই পারছে না।

সে সব আমি বেশী ওরে মনে আছে এজন্য যে তার শেষ চিঠিতে সে লিখেছিল মহান একটি বাণী। যে যেমনি ছিলাম। অর্থাৎ একেবারে আমার বন্ধু। তার প্রতি সবচেয়ে বড় অপরাধ, বড় পাপ হচ্ছে ঘৃণা নয়, উদাসীনতা। সেটাই সবচেয়ে বড় অমানবিকতা। আমি ওর প্রতি তাই অমানবিক উদাসীনতা দেখাচ্ছি।

কথাটা ওর নিজের নয়। বার্নার্ড শ'র নাটক থেকে সে আহরণ করে আমায় চুকিয়েছিল। কিন্তু অবশ্য ওসব ছোড়া খাতির বড় বড় সব সাহিত্যিকের বাণীগুলি আমি কোনদিন নিজের লেখায় আর আলাপে চালান করে দিই। এমনভাবে নিজস্ব করে চালিয়ে নিতে যে আমরা হয়ে যেতাম বাক্সে হলে কুলপ্লাবার। আজকের আলাপে পরীক্ষার খাতায়ে—সব কিছুতেই।

কিন্তু এই বাণীটিতে আমি চমকিনি। বার্নার্ড শ' আর সুন্দরীমোহন সাবেকী সংস্কৃত নয়। পরে উদাসীনতা দেখিয়ে, অমানুষের মত ব্যবহারের লিখেছিলাম যে তুমি জলপুরে আসতে পারবে না। আমার বাড়ীতে এসে ওই এটাও চাই না। যদি তবু

বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখা দরকারী না মনে হয়, তাই তুমি বন্ধুকে বরণ না দেবে, তেমন করে জলপুরে যেন স্টেশন যেতেই তোমার জন্যে ট্রেন ধরকাতে পড়ুম সম্ভব তা আমি জানি।

এই উত্তরের চার বছরেই সহপাঠী বন্ধুর কাছে সেবার উপযুক্ত নয় সবসেই প্রমাণ দিই ও ওরে। ধরতে নতুন চাকরি পেয়ে সেশনাল গার্ডনে মেয়েদের হস্টেল তৈরির কারখানায় ঘুরে ঘুরে আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। ওই সময় আর শুধুমাত্র উপর দৃষ্টিভঙ্গি যে সরকার তার চক্করে হস্টেল বোর্ডিংয়ে আমানীতা নিয়ে যে-আইনীভাবে উদাসীন ওরকম ভুল দেখাচ্ছি।

এই উপর সুন্দরীমোহনের মত চার বছর ধরে এক কালেজের সহপাঠীর কাছে এমনভাবে লিখেছিলাম বন্ধুর প্রতি সহানুভূতি ত নেই-ই। সমবেদনার ছটাকও আমাদের কাটুকুও নেই।

অথচই আরো অপেক্ষা দেবে। বলতে গেলে ও তুমি ওকে নিজের কাছে ডাই না পত্র ও ত কোন হোটেলে এসে উঠতে পারত। এমনকি, ওরে না হয় লিখে দিতে যে তোমার সময় হচ্ছে না ওকে এ ক'দিন। তুমি ভেবে না যে ওটুকু ভদ্র ব্যবহার এরে হচ্ছে প্রত্যাশা ছিলাম। অবশ্য এদের নিজের সব হচ্ছে একেবারে পুরোনো মত তবে পুরোনো মতই কোন প্রশ্ন ছিলাম্বরে সাদা মিলিয়ে দিলে এর মূল্য অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই সুন্দরীমোহনকে এরকম ভাবে চিঠি লেখা ঠিক হয়নি।

সেই সুন্দরীমোহন সমস্ত সামনে বসে।

সেবার অবশ্য ওইরকম ওর দেখা-নোর ফলে সে জলপুরে আসেনি।

আমিও দার্শনিক নিশ্বাস ফেলেছিলাম।

তার ফেলেছিল মোহিনী সান্যাল এবং গোটা সান্যাল পরিবার।

অবশ্য ওদের সবার কথাই আমাদের ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম মানে মনে আসত না। মনে রাখবার দরকার ছিল না। শুভ্রকান্ত সান্যালের মিস্টার সান্যালের মেয়ের বিয়েতে সময় সাহেবী বড়াচড়ুড়ি খসিয়ে বাঙ্গালী মতে মেয়ের বিয়ে দিলেন। তারপর বরণী হয়ে গেলেন। মোহিনী ছিল লাজুক মুখচোরা মেয়ে। মেয়েটই বাপের যোগ্য মেয়ে নয়। বলতে ঠিক নিচের ক্লাসে পড়ত। মেয়েটিকে দেখতে ভাল, ব্যবহারে ভদ্র অভদ্রের নয়।

প্রথাৎ সেই শ্রেণীর মেয়ে যারে সবাই নজর করবে, পছন্দ করবে কিন্তু সে নিজে জোর করে নজরে আসবে না, পছন্দ করিয়ে নেবে না।

আর বন্ধু সুন্দরীমোহন?

ওর নামকরণের সময় জ্যোতিষী নিশ্চয়ই মুখ টিপে হেসেছিলেন। উজ্জ্বল শ্যাম বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা

কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা, বেহায়া, ছোঁড়ারা হতে হতে ফুটবল হয়ে গেল। বিশদ বুঝে সে কলেজের জিমনাসিয়ামে রোজ ব্যায়াম শুরু করল। কোন লাভ হল না। ডাক্তারের কাছে গেল। কিন্তু ভিজিটের টাকা পকেটস্থ করে তিনি বললেন যে থাইরেড গ্ল্যান্ডের দোষ নির্ঘাত; কিন্তু তার ঠিক চিকিৎসা এখনো বের হয় নি। জন্তুতে এ দেখে।

সুন্দরীমোহন ডায়েটিং শুরু করল। অবশ্য সেটা অনেকই শুরু করেছিল। কিন্তু সুরাহা হয় নি। এখন আরো বেশী করে কম খেতে লাগল। এঁদিকে শুরুলো ব্যায়াম করছিল। ফলে দেহের দুর্বলতা আর নার্ভের অস্বচ্ছন্দতা আরম্ভ হয়।

ভক্তদেবীর হাসিটা যদি শুধু এক-পেশে হত তাহলেও রক্ষা ছিল হয়ত। কিন্তু কলেজে উঠে তৃতীয় বছরেই সুন্দরীমোহন ফার্স্ট ইয়ারে নবাগতা সোহিনীকে দেখে নিজের হৃদয়তন্ত্রীতে বাজনা শুনতে পেল।

পার্লামিয়ের ঘাস সুন্দরীমোহন একটা ছন্নছাড়া দেহের সীমান্ত জুড়ে ব্যাপক আক্রমণ সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। এহেন সময়ে দ্বিতীয় ফ্রন্টে মনের সীমান্তে সোফ্ট সিগনের আক্রমণ ঘিরে নূতন আক্রমণ শুরু হল।

ক্লাসে অধ্যাপকের বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে, কমনরুমে ঠাট্টামস্করার মাঝে মাঝে আমরা ওর দিকে তেরছা নজর মাঝতে শুরু করলাম। সুন্দরী-মোহনের মোহিনী সোহিনী।

বলা বাহুল্য সোহিনীর দিকে দৃষ্টিবাণ হানতে আমরাও কসুর করিনি। অবশ্য শুরু ওইটুকুই।

কারণ একে নারী, তায় তরুণী। তার উপর সে স্কুলের কো-এডুকেশন কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে করেক আধুনিক অবলাস্কুল ভরের মেয়ে পড়তে আসত। তাছাড়া আমরা মর্যাদা দিতাম। অনেকেরই মুখ ফুটে না বুকে ফেটে গেলেও। খেলার কবিতা আউড়িয়ে "তারকার প্রতি গোকার তাকনা" ধরে থেকে নিবেদন করেই তারা দাঁড়ি টেনে দিত।

শুরু উঠতে পারেনি সুন্দরী-মোহন।

এখানে দুটি কথা বলে রাখি যে ওর প্রতি সোহিনীর উদাসীনতা দেখে আমাদের মত হিংসুটে কিন্তু সহানুভূতিশীল সহপাঠীরাও মুখ ভোর করত। তার মনের খবরটা কমন আমাদের হাতে ছিল না। কিন্তু খবরটা যাতে ছিপ্রহরিণ্য বেশী ঘরা-ঘরা না যায় সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিয়েছিলাম। হাজার হোক ও তো আমাদেরই সহপাঠী। আর আমাদের বাইরের সম্বন্ধত সকলের মাথাওয়ালা ছিল। সব ছেলের এমন কি মাঝের সঙ্গে পরা দিতে হবে পরীক্ষার ডামেও সে অকৃপণভাবে নেটে ছিল, ফোরফোল খাইয়ের খবর দিয়ে সাহায্য করত। কমনরুমের আড্ডায় ওর মুখ থেকে যে-সব ফোটেশন, বড় সাহিত্যিকদের থেকে উদ্ধার করা লাইন ছড়িয়ে পড়ত তা টুকে রাখলে একখানা বই বাজারে ছাড়া যেত।

শুরু সৌন্দর্য মুখের কাল নয়। নিজের মুখের অনর্গল কথাবার্তার রসও কম উপভোগ্য ছিল না। বুদ্ধির চমকে, কথার ঝঙ্কে ও সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারত।

এর চেয়ে বড় কথা—মানতাম।

আমরা, বেশির ভাগরা ওর সঙ্গে পরীক্ষায় পাল্লা দেবার জন্য প্রাণপণ পড়াশুনো করতাম, সবাই ওর ঐ নিখুঁত গুণটা মানতাম।

সেজন্যই যখন দেখলাম যে ওর সোহিনীর প্রতি অনেবোগটা শুরুই "তারকার প্রতি কাকনা" স্তরে ঠেকে রইল না তখন আমরাই কমনরুমের কমন চেতনা একটা উদার মনের পরিচয় দিলাম। আমরা ঠিক করলাম যে এই অবস্থায় ওকে সুন্দরীমোহন বলে ডাকলে এটুকু আঁতে ঘা দেওয়া হয়। অতএব ওকে শুরু 'সুন্দর' বলে ডাকা হবে।

আমাদের এই ছাড়াই প্রস্তাবটা যে নিছক সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত সেটা বুঝবার জন্য সহপাঠী রামানাথকেও ছেটে রাজু বানিয়ে দিলাম। সোফিনী-দের জন্য মনে মনে ব্যাকুল ঘুমাসম্ভব পড়া সোফিনাথ খুবই আপত্তি তুলে-ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব বুঝিয়ে বলতে সে-ও স্বার্থত্যাগ করতে রাজী হয়েছিল।

প্রথম বেদিন ওকে আমরা সুন্দর বলে ডাকলাম ও খুব আপত্তি করে-ছিল।

ও বলেছিল, 'দেখ্, তোমার উপর বেমন খোদকারী করতে নেই, বাপ-মায়ের দেওয়া নামও তেমন ছাঁটতে নেই। পরমুহূর্তের গল্পের শেষের রায় আমি নই। আমার সম্মোলন বানিয়ে তোমার কি লাভ?'

ওর বুদ্ধিতে সর্বদা উজ্জ্বল চোখ দুটো যে কখনো একটা ঘোরটোপের ভিতর জলে চিক চিক করে উঠতে পারে তা দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না সেদিন।

গভীর ভাবে বললাম, 'তুমি শুরু মুখে বড় কিনায় না, ঠিক তাই তোমার নামটা ছেটে জানিয়ে দিচ্ছি। তা ছাড়া, মোহাইল্ড ইন এ রোজ? নামটা তো সামান্য কথা তাতে কিছু যায় আসে না।'

রামানাথ বুক চিরিয়ে ওর সোনালী বন্ধুকের নল দুটোর মত চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। বন্ধুরা জন্ত আত্মতাগের মহে আনন্দে তার কলমলে মুখ নিয়ে বলল, 'এই দেখ্ না, আমরা কখন সুন্দর নামটা ছেটে দিয়ে কিনা রাজু বানিয়ে দিয়েছে। মধুরা থেকে এক ধাক্কায় মথুরানাথ।'

তাতেই সুন্দরীমোহন যে খুব সান্ত্বনা পেল, এমন মনে হল না।

তা বুঝে রামানাথ আমায় বলল,—'বুঝে দেখ্ আমার কথাটা। রবি-ঠাকুরের ছোট গল্পের নায়ক সোপী-নাথ সেজে মনে মনে সম্মোবেলা খুব খুশ করতাম। যদি পাশের ঘর শুনতে পায় সেই আশায়:—

"সকলে সাক্ষী থাকুক বৃন্দাবনে
দাসখত লিখে দিলাম শ্রীচরণে।"

আর এখন?'

সুন্দরীমোহনের প্রশ্ন প্রশ্নটা চোখ দুটো যেন কথা কয়ে উঠল। সে-ও প্রশ্ন করল—'আর এখন?'

আর এখন ছাটলাম বই ছাড়া আর আমার নাম কোথাও খুঁজে পাব না। তবু আমি ওদের ছাটাই প্রস্তাবে রাজী হয়েছি।

ছাটাই কথাটা এতক্ষণে পাঁচজন বন্ধুর মনে ধরল। সে বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। অক্সফোর্ডেও ছাত্ররা আজকাল কলার-উল্টু ফোতাম-ওয়ালা জামাকাপড় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ছাত্রীরাও পাল্লা দিয়ে ফুল-ফুল ঢঙের ফ্রক আর ফুলে ফুলে লম্বা গাউন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।'

মোফস একখানা টিপ্পনী ছেড়ে দিল তখনি, 'অবশ্যই এসেছে। নির্ঘাত একেবারে গড়ের মাঠ হয়ে ইডেন। নিবিঘ্ন ফল ফেরে গড়ানাড়ি দিয়ে সেখানে। কিন্তু সে গাটছড়া বাধা।'

সুন্দর হাসি হয়ে উঠল। বেশ রসিয়ে বলল, 'ছাড়াই গাটছড়া। ওদের মেলেও গাটছড়ার ব্যবস্থা করতে ছেলে দুজনের সরকার। একটি কুমারী মেয়ে আর একটি কুমারী মা।'

তর্কিকা হাক ছেড়ে বাঁচল। আমাদের নামকরণের প্রস্তাবে যে সুন্দরের আর আপত্তি হবে না তা বোঝা গেল। এখন শুরু ওকে এই রকম কিছু চটকদার কথার চাট পরি-বেশন করতে দিলেই কাজ হাসিল হবে।

বেশ নিরীহের মত মুখ করে সে জানতে চাইল, 'তবে কি অক্সফোর্ড আজকাল বে-বার মোকা করে যাচ্ছে? সুন্দরজাই, তুমি তো এসব খাপারে ওয়াকিবহাল।'

হাসির হিলিক মেরে সুন্দর বলল, 'দূর বোকা। এ-যুগের ছাত্ররা, বিশেষ করে ওদেশে, খুব ভাল করেই জানে যে বিয়ে হচ্ছে একটা রোমান্স যার নায়ক প্রথম অঙ্কেই মারা যায়। কে মরতে চায় বল মোঘ? তুমি চাও? তুমি? ইউ? ইউ?'

ওর প্রশ্নের ইকোটাক একটু বেশি-রকম আক্রমণাত্মক মনে হল। আমরা একটু ঘাবড়িয়ে গেলাম। অত মাথা ব্যথা এই ঘটিতপতি?

সে নিজেই আবার শুরু করল, 'তবু ওরা ভাল। আই মিন, ওরা পড়ুয়া। আমাদের দেশে শিকারে বুনো হাতীর মত ওরা পড়ুয়া।'

আমি একটু অনুযোগ আক্রমণের লোভ সামলাতে পারিনি। বললাম, 'দেশে হাতীর মত বুনো মন নিয়ে?'

সুন্দর জবাব দিল, চোখে হেসে আকাশের তারা। তার দিকে উদ্ধু নজরে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তরুণরা বিশের ঘনাকাশে পড়ে। স্বাভাবিক পরিণতি।'

কথাবার্তার ভঙ্গী আমি একটু, যেন অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। সুন্দরের জবাব স্বাভাবিক পরিণতি। যে তরুণীর জন্য সুন্দরের মনে চলছে তোলপাড় তার চরিত্রের সম্ভবত হয়ে উঠছে টেনশন, সে বারবার ঘিরে ছেটে যাচ্ছে। পরক্ষণে দিকে মুখ করে হেসে ফেলাম বলে প্রত্যেকে নজরে পড়ে-ছিলাম। হাত তোল, প্রশ্ন নিয়ে কি টানাটানিই না তুমি কর।

আমার মুখে হয়ত কোন ভাবান্তর হয়েছিল। আমি টের পাইনি। কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি সুন্দরের নজর কিছুই এড়ায় না। পড়াশুনোর চৌকস ছাত্রের চোখ খোলা রাখতেই হয়।

সুন্দর বলে উঠল, 'দেখি, দেখি তোমার মুখের একস্প্রেশনখানা দেখি। হাঁ, ঠিক ধরেছি। একটু, বয়স হলে তোমার যা চেহারা হবে ফিজদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। বেন পাকা দেবদারু, আরব বেদুইন দলের সর্দার। বড় বড় গভীর চোখ, বাদামী রঙের চোখ, ভাল-মানুষীতে ভরা। গ্রাম সাহেবের মত মুখের ভাব। শুরু সেই লোকটির মুখের পক্ষে মোক্ষম জবাব মানানসই —যার মনে খুরপাক খাচ্ছে তার বিশ্লেষণের সাবাড় করে দেবার মতলব। এবং এমন সব পদ্যের বেদুলি একেবারে মধ্যরাতের সঙ্গে মোলায়েম খাদ খেয়ে যায়।'

ওর বর্ণনা শুনে বন্ধুদের ভাল আর কথার তোড়ে আমিও বেন ঘুর-পাক খেয়ে গিয়েছিলাম। বলে ফেললাম, 'এই মাত্র সোহিনীকে পাস করে যেতে দেখলাম। পিয়াজী রঙের শাড়ীতে কলমল করে পদ্মার ঢেউ তুলতে তুলতে চলে গেল। ভাব-ছিলাম তুমি দেখলে কি বলতে।'

সুন্দর কেমন বেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। আমরা জানতাম যে আজের দিন কয়েক বন্ধ হবার সময় সে লাইব্রেরী থেকে পাগলের মত হন হন করে বেরিয়ে গিয়েছিল। এটাও লক্ষ্য করেছিলাম যে ঠিক একটু আগেই সোহিনী লাইব্রেরী থেকে একটা বই নিয়ে গিয়েছিল। আন্দাজ করেছিলাম যে ও বোধ হয় মেয়েটির সঙ্গে কথা কইবার বা তার সঙ্গে কিছুটা পথ সঙ্গে যাবার চেষ্টা করবে। কি ফল হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। কারণ ফলটা জানাই ছিল।

কি ফল হয়েছিল তা এখন সুন্দরের চোখে মুখে ফুটে উঠল। তার বুদ্ধি-দীপ্তিটাই বোধ হয় শান্ত ছিল। আর সবই অশান্ত।

সে বলল, 'পিয়াজ? পিয়াজী রঙের শাড়ী? ঠিক। পুরোনো একটা জার্মান

সত্যজিৎ রায়

কবিতাটি এ সম্পর্কে বড় একটি ধাঁচি এরা আছে :—

"মেয়ে হয়ে দুঃখই পিয়াস,
শোনো সুহৃদ হয় সত্য।
দেখো তার আবরণখানি—
সেই দিয়ে, সেই ধরা,
কাঁদো তুমি কঠিন পরানী।"

এই আবহাওয়া আর ওই প্রবন্ধ প্রসঙ্গের মধ্যেই খুঁজতে হিমেছিলাম।

(২)

সেই সুদর্শনায়নের চিঠি ডাকঘরে চাকরীতে সবে যোগ দেওয়ার পরই পেয়েছিলাম।

প্রথমে জানতাম যে মোহিনীরাও জঙ্গলপুরে আছে। কলেজের পড়া শেষ করে চাকরী যোগাড়ের ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলাম যে কোথায় সুদর্শন আর কোথায় মোহিনী ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না।

মনে মনেও চাইতাম না। কিন্তু ওরে এ কথা যে সুদর্শনের মোহিনীর জন্য একটা উমাদনার সৃষ্টি করেছিল। সেটা ত কলেজে থাকতেই দেখে এসেছি।

পরে শুনেছিলাম যে সেই উমাদনা ওরে উন্মাদ করে দিয়েছে। মনে মনে প্রবল ভেবেছিলাম যে সম্ভবত সুদর্শনের বয়সে কারো পাগলামী ছিল। হয়ত উত্তরাধিকার সূত্রে কোয়াকে ওই রোগে পেয়েছে। একটি বিশেষ মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বড় জোর সেই রোগটা প্রকাশ হয়ে পড়বার কারণ হিসাবে এাক্সিলেন্ট হতে পারে।

আমাদের দেশ আর আমাদের চলন্তা তো। নারীঘটিত রসাল কাহিনীর একটু সুযোগ পেলেই হল।

সুদর্শন যে চিঠিটা লিখেছিল তার সবটা প্রথম হুবহু নকল এখানে তুলে দিলাম না। কোয়ার পক্ষিতে তাহলে আপনারা ওর ফেলতে পারেন।

তাহলেও তত কঠিন নেই। কিন্তু মোহিনীকে আপনারা চিনে ফেললে বড় লজ্জার কথা হবে।

বিশেষ করে কলেজ ম্যাগাজিনে আর পাঁচজন ছাত্রছাত্রীর মত আমিও কবিতা লিখতাম। এবং একটা কবিতায় একটি লাইন ছিল।

"মোহিনী মোহিনী তাই
সবেতেই বাদে।"

ওই সূত্রের উল্লেখ যে খুব ধ্বনির ঝঙ্কারের জন্যই করেছিলাম তা কখনো বিশ্বাস করতে চাস নি। কাজেই বুঝতেই ত বিপদটা?

সুদর্শন লিখেছিল যে সে বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছে যে জঙ্গলপুরে নর্মদার বুকে যেখানে মার্বল রক আছে সেই প্রস্তরের উপর রোদের আলো দাঁড়িয়ে নিজের ছায়া কিছুদিন নর্মদার ধারায় নিরীক্ষণ করতে করতে আমী যেন্দু ফেলে মানুষে নির্বাক হোলা আর সুদর্শন হয়ে যায়। অতএব মোহিনীকে পাবার শেষ চেষ্টা সে এই নর্মদা স্রোতের বুকে মনে করতে চায়। এবং আমার অভিধি হয়ে সে থাকবে। প্রতিদিন সে এই সাধনা করবে। প্রতি সন্ধ্যায় সে মোহিনীকে দেখবে। আর সাধনার শেষে সিদ্ধির জন্য সে তার হিরোয়ী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মোহিনীর বাড়িতে নিজেকে উপহার দেবে।

সে প্রেজেন্ট করবে নিজেকে—ঠিক এই কথাটাই চিঠিতে লিখেছিল। এবং যিনি তাকে এই ভৈষ প্রতিজ্ঞার মুক্ত করবার জানিয়েছেন তিনি বলেছেন যে সে সুদর্শন ও কলিসন্ নিশ্চয়ই হবে এইজন্যে। তিনি আরো জানিয়েছেন যে কেন্দ্র তার চেহারার বর্তমান অবস্থাই এই বিষের একমাত্র বাধা। কারণ মোহিনীও নাকি মনে মনে সুদর্শনকে গভীরভাবে ভালবাসে।

যে কোন যুবক মোহ থাকলে পাগল না হলে সহজেই মনে করে নেবে যে একটি তরুণী তাকে মনে মনে ভালবাসে।

কাজেই যে হিতৈষী তাকে এ হেন গোপনতথ্য প্রেরণ করেছে সে যুবিয়ে দিয়েছে যে মোহিনী ওর প্রতি মুগ্ধ। এবং তা শুনে বন্ধুটি আরো ক্ষেপে গেছে।

অবশ্য আমি জানতাম যে খুব যে ওই নিরীহ ছেলেটিই সুদর্শনের এই পাগলামীর জন্য দায়ী তা নয়। ওর বাবা যাও, আমি তার সাংঘাতী ছিলাম জেনে, অনুরোধ করেছিলেন। আর অনুরোধ করেছিলেন যেন আমি সুদর্শনের এই পাগলামীটা বন্ধ করার চেষ্টা করি। শহরে বড় নিন্দাচর্চা হচ্ছে।

প্রেম কাহিনী পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। দুরাপাতির চেয়ে বেশী রঙ্গদার। বিজলীর চেয়ে বেশী চমকদার। এবং সেটা যদি এক তরফা হয় তাহলে লেখকের কল্পনা আর রঙ্গনা তার রস শতগুণে বাড়িয়ে দেয়।

কলেজে থাকতেই সে কথা বলে বন্ধুকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম। সব শুনে ও আমার দিকে দুর্বোধ্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল খানিকক্ষণ। সত্যযুগ হলে প্রেম তপস্বীর রূপের আগুনে ছাই হয়ে যেতাম।

তার পর সে বলেছিল, মানুষের নিজের উপর বিশ্বাস নষ্ট করে দেওয়া খুব সহজ। সেই সুযোগ নিয়ে মানুষের জগতে যে ভেলো সেও যে কে জান? সে হচ্ছে শয়তান। সাক্ষাৎ শয়তান।

এই কথা বলেই সুদর্শন সরে পড়েছিল। আর আমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেনি। আমিও ওকে আর ঘাটাইনি। কলেজ বন্ধ হবার পর শুনেছিলাম যে ও নাকি মাথার চুলের ছিরীও লক্ষ দেখা দিয়েছে।

পরীক্ষাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। অন্তরের প্রগাঢ়তিত উমাদনা বা উমাদতার খবর রাখবার সময় কোথায়?

তারপর জঙ্গলপুরে এই চিঠি।

পাগলামীর সব লক্ষণ পরিষ্কার। নর্মদা দুর্নিবারা স্রোত দেখেছি; মার্বল রকের সৌন্দর্য দেখেছি। কিন্তু কয়েক ঢেউয়ের তাল হয়ে যাওয়া যা কোন তরুণকে তরুণতার পরিণত হতে দেখিনি বা শুনিনি।

তা ছাড়া একই কলেজের ছাত্রী মোহিনীর প্রতিও একটা কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্যের দাবী সহ-পাঠীর, সম্ভবত পাগল সহপাঠীর, প্রতি সহানুভূতির চেয়ে অনেক বেশী প্রবল।

তা ছাড়া নিজের মান সম্ভ্রমের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত আছে। সরকারী চাকুরের চাঞ্চল্য আর সুনাম কাঁচের চেয়ে বেশী ঠুনকো। কর্পূরের চেয়ে বেশী উবে যায়।

কাজেই জঙ্গলপুরে নতুন কলেজের জায়গা থেকে আমি সুদর্শনকে একটা বেল পড় চিঠি দিয়ে সেখানে আসতে বারণ করে দিয়েছিলাম।

ও তারপর আর আসেনি। আমার চিঠিতে যে ভয় দেখিয়েছিলাম তার জন্য হয়ত। অথবা ওর আত্মীয়-স্বজনরাও হয়ত বাধা দিয়েছিল। নর্মদার স্রোত পার হয়ে মার্বল রকে বাবার পুনঃসাহস যে কখনো পাবে হতাশ হয়ে আত্মহত্যাও সে করতে পারে।

সোজনে স্বীকার করছি যে ওই চিঠিটা পেয়ে সুদর্শনের প্রতি একটা মমতাও বোধ করেছিলাম। আহা বেচারা! প্রেমের স্পর্শে ওর প্রতিভা ধন্য হয়ে গেল। অন্তত প্রেমিকার প্রসাদ পেলে হয়ত তার জন্ম সার্থকতার ভরে উঠতে পারতো।

সেই সুদর্শন আজ তিনেক পরে আমার কাছে এসে হাজির। বিনা নোটিশে।

যদি নোটিশ দিত, আজ আসতে মানা করে দিতাম। অন্তত কয়েকদিন পরে এলে খুব ভাল হত। কারণটা ওকে মুখে বলা বোধ হয় ঠিক হবে

না। মোট কথা, আমরা একবার যে শব্দ ব্যবহার করেছি ওই রকম চিঠি লিখে, তার বদলে অন্তত আমরা আর কখনও দেখবার সুযোগ আর পাব না বলে মনে মনে উৎকণ্ঠা-ঠাট হয়ে উঠলাম।

তবু ওকে কথার তোয়াক্কা ছোটাতে গিয়ে হয়ত ওর মন খানিকটা হাল্কা হবে আমার প্রতি প্রসন্ন হবে।

ও প্রথমেই ঘরে ঢুকে বলেছিল, 'ঘটাটের স্মৃতিচারণটা বড় সুন্দর লিখিস। একটা মিষ্টি ব্যথা-কথা মনে বিষাদের আমেজ ভরে দেয়।'

কিন্তু ওর এই কথায় হঠাৎ বিয়ে করার সংকেতের বক্তব্যে একটা ধাক্কা খেলাম। তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'এই বয়সে? এত বছর পরে?'

উত্তরে ও যখন বলল যে ওদের মত মানুষের গল্পের চেয়ে মিষ্টি হেঁয়ালির গল্পে বিভোর হয়ে থাকা অনেক ভাল, তখন আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম।

তবু একবার ওকে এই পাগলামির হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা উচিত। হাজার হোক বন্ধু, এক কালে প্রিয় বন্ধু; পরীক্ষায় সুখে দুঃখে বন্ধু।

ভাবলাম—যদি ওকে সোহিনীর কথা মনে করিয়ে দেওয়া যায়, হয়ত এই বুড়ো বয়সে বিয়ে করার বদখেয়ালটা ছেড়ে দেবে। প্রাচীনকালে সংস্কৃতে বলত যে বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভিষ। কিন্তু বাংলার আধুনিক যুগে নতুন বিয়ের ধরণী বৃদ্ধের পক্ষে অনেক বেশী বিষ হতে পারে বলে অভিজ্ঞ লোকরা বলে থাকে।

মুখে মুখে ভাবে—কেন বন্ধু ঘটাটের দিকে আঁখি ফেলে জিজ্ঞেস করলাম, 'সোহিনীকে কি এখন আর ভালবাস না? সে-ই যে বলতে গেলে মুখে মুখে অনিবার।'

উত্তেজিত হয়ে বলল, সেই জন্যই তো বিয়ে করব। ওকে আমার চিত্তে মুক্তির অতীত করে রাখতে চাই বলে। ওকে আমি চিরকাল ভালবাসি। না হলে ওকে নিয়ে মনে মনে চন্দ্রসূর্যের সঙ্গে খেলা করেছি কেন? প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে অনন্তের আস্বাদ পেয়েছি কেন? ওর হৃদয় স্পন্দনের মধ্যে সপ্তসমুদ্রের কল্লোলধ্বনি আছে বলে মনে করি কেন?'

আমি তখন হাসিমুখে, চেষ্টা করে মুখে হাসি এনে বলেছিলাম, 'দেখ, তুমি খুব সুন্দর করে কথাগুলি বলছ। কিন্তু ওসব তো চতুর প্রেমিকই বলে। সম্প্রতি কোন সাহিত্যিকের লেখা থেকে শিখে নিয়ে। কিন্তু যে তোমার জন্য কিছুই অনুভব করে না তার সম্বন্ধে এসব চিন্তা ছাড়। না হলে সুখী হবে না।'

আমার এই উপদেশ শুনে সে আরো ক্ষিপ্তিয়ার হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'না, আমি সোহিনীকেই ভালবাসি। আমি তো বাংলাদেশের অনেক অরক্ষণীয়া মেয়েকেই বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে নিতে পারি। তার কানে কানে

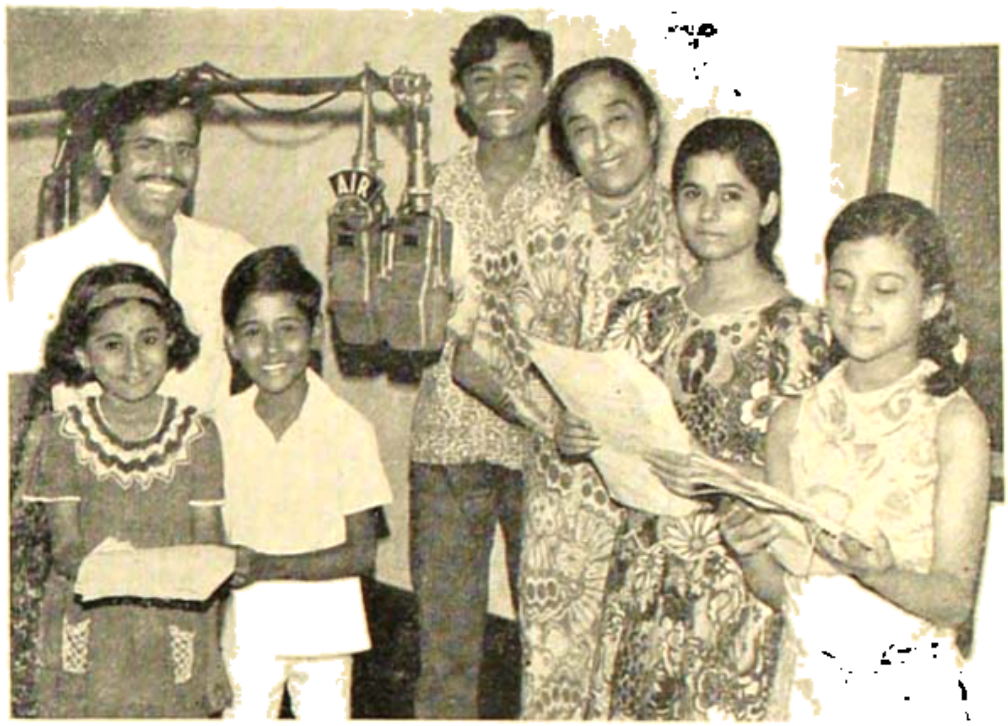

একজন জয় : শিশুমহল থেকে প্রচারিত রূপকল্পনাশ্রয়ী অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানকারী শিল্পীদের সাথে পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায় (প্রযোজক) ও দেবাশিস সৌম্য

শোনাতে পারি যে আমরা দুজনে সমস্যা পৃথিবী নিজেদের ঘরে মনে করছি। কিন্তু সে মাইনের টাকা কটি ছেড়ে কবে তার পরিবর্তে'। আমি যখন তাকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ জিনিসটি দেব, সে তখন সামান্য সামান্য জিনিস চেয়ে আমার দেওয়াকে ছোট করে তুলবে। আমি যখন আকাশ দিতে চাইব সে তখন শুধু মেঘটুকু নিয়ে খুশী থাকতে চাইবে। যে দিয়ে আমি এখন করব তাতে আশা-ভাঙার বালাই থাকবে না। শুধু তার কান্নাবোটা থাকবে।'

এ বয়সে যৌবনের বসন্ত প্রলাপ শুনতে ভালই লাগছিল। কিন্তু চোখ দুটো ত খোলাই ছিল। তাই প্রেমের মুখে কথাগুলি বড় বেমানান মনে হচ্ছিল। কেন সংসারে বেশী বয়সের বুদ্ধদের প্রেমে পড়বার অধিকার নেই।

তাই একটু অসহিষ্ণুর মত বলেছিলাম, 'তবু তুমি সোহিনীকে ভালবাসা এখনো বন্ধ কর। জান তো, প্রেম বুদ্ধের চেয়েও কম ঠুনকো হতে পারে। তোমার প্রিয় লেখক বার্নাড' শয়ের কথাই তোমার বন্ধু হিসাবে স্মরিয়ে দিচ্ছি—সোহিনীকে যদি না তুমি কোনদিন পেতে, এক সপ্তাহের মধ্যেই তার অভাব তুমি এক দেড় মহলার পিঠের চেয়ে বেশী বেদনা হয়ত খুঁজে পেতে না।'

—'অসহ্য, অসহ্য।' সুখের অস্থির হয়ে বলে উঠল,—'অসহ্য, অসহ্য। তুমি একটা রসকষহীন বস্তুসর্বস্ব বইয়ের পোকা। তাই তুমি সুখের এক সপ্তাহের পরমায়ুর কথাই বললে। জেনে রেখো বোতলের সুখ একটা অনশ্বর মুহূর্ত। অন্তত নরকবাসের চেয়ে কম নয়। তুমি চাও না যে আমি ক্ষণেকের জন্যও সুখী হই।'

বিব্রত হয়ে বললাম, 'না, না, তা বলছি না। বিয়ে যদি নেহাতই কর, সোহিনীর স্মৃতিকে বিয়ে করো না। ওই মিষ্টি হেঁয়ালির মধ্যেই মজে থাক। যে ফুল ফোটেনি, তার সৌরভের হদিস খুঁজে বেড়িয়ো না।'

মনে হল ক্লেন্ড, বার্থ হয়েছে যে বন্ধু, তাকে এর চেয়ে ভোলাবার আর কি বলতে পারি? অনেক আগেই বিদায় করে দিতাম। অন্তত তাহলে একটা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেত। কিন্তু ভাষা যে আমার চেয়েও বেশী নিষ্ঠুরতা করবে তা কে জানত?

প্রকাণ্ড একটা আমেরিকান মোটর আমার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বিপন্ন হয়ে পর্দা সরিয়ে দুষ্টিকর্তাকে খবর দিতে যেতাম। তিনি এসে যদি নতুন অতিথিকে চট করে ভিতরে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে হয়ত সব দিক রক্ষা হতে পারে।

এই অতিথি বহু বছর পরে জন্মলগ্নে আসছেন। মোটরে করে। আমেরিকান মেডের বিনা। ঠিক সময়ের বেশ আগেই ফড়ের বেগে এসে হাজির হয়েছেন।

ভয় উঠেছে সুখেরও মনেও। সামনে দাঁড়িয়ে কেন একখানা ঘনশ্যাম মহীরুহ। কলেজে শিক্ষিতা, সম্ভ্রান্ত ঘরের দুলালী, সমস্ত স্বামীর স্বত্ব। তার বর্ণনা কি ভাষে গাঠরে মাল দিয়ে ভরা সোজা পারে?

সুখের চুপ করে নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে চোখের ওলজলে ঘোরটোপের মধ্যে প্রদীপগুলো কি চিক চিক করছে?

ভদ্রমহিলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সুখের উঠে দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে সে সোহিনীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

মৃদু স্বরে নিজের-মনে-মনে বলে গেল, 'আমার এই পাগলামীও নাকচ করে দিলাম।'

শেষ


## জয়ন্তী

১১৬, ৩য় সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা-১৪

রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত (সঙ্গীত প্রশিক্ষণ) ও নৃত্যকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। ছোটদের জন্য। ভর্তি চলছে। শ্রীদেবব্রতরঞ্জন মজুমদার

শিক্ষক পরিষদ : শ্রীমতী সুচরিতা সেনগুপ্ত, শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীউদয়ন গিরি, শ্রীদেবব্রতরঞ্জন বসু মজুমদার (অবৈতনিক)।

অক্টোবর মাস হইতে শিক্ষারম্ভ হবে।

সম্পাদিকা
শ্রীমতী প্রীতি দিবেকর
ফোন : ৪৪-২৫০০

# উপযাচিকা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

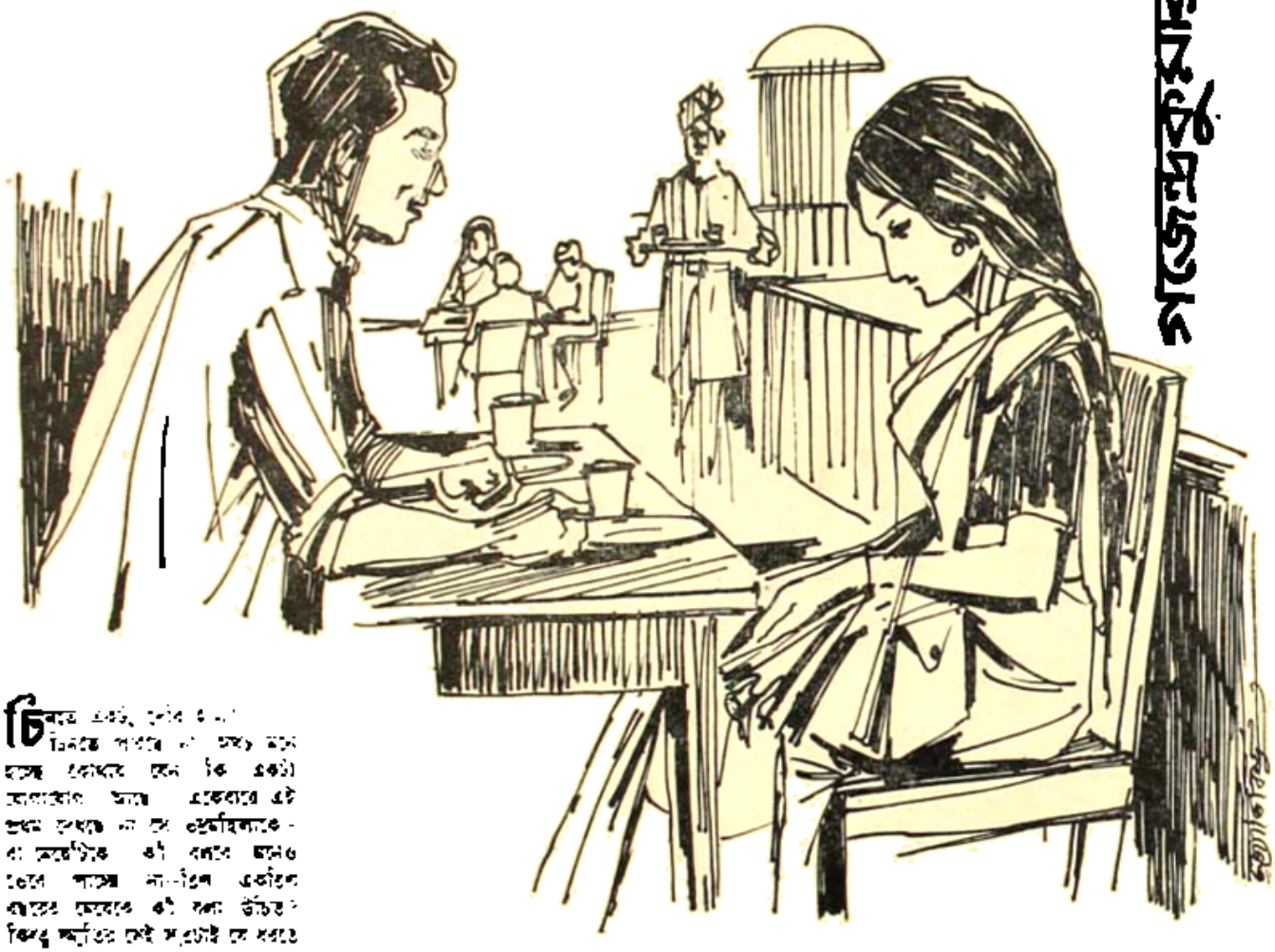

চিনতে এতটুকু দেরি হয় না। চিনতে পারার পর মনে হচ্ছে কোথায় যেন কি একটা গোলমাল আছে। একেবারে এই প্রথম দেখছে না সে এস্প্লানেডে—না সেটাই ঠিক। তা বলতে হলেও তেরো পনের না-হলেও একটি বছর তেরোর কথা কী বলা উচিত? কিন্তু স্মৃতির সেই সূত্রটাই সে ধরতে পারছে না।

অবশ্য প্রথমটায় সে খুব একটা সেরকম ভাবও নি। ট্রামলাইন এই পাঁচতলা বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে বিছানা থেকে সাত মাস আগে পুরোনো ভাঙাচোরা ঝড়ঝড়ে এই সুযোগ পেয়ে সেটা ছেড়ে দিয়ে রাজী হল বাড়িওলা হবিবুল্লা। খুব প্রয়োজন ছাড়া এ অফিসে বড় কেউ আসে না। যাদের টাকা পাওনা আছে কিংবা যারা কিছু পাওনার আশা রাখে, তারাই কেবল এই কষ্ট সহ্য করে ওপরে ওঠে।

তাই ছেলেবেলায় যাকে একদিন-দুদণ্ড না দেখলে চোখে অন্ধকার দেখতে হত, তাকে চোখের চেনা অনার প্রয়োজন নেই। পুরোনো সম্পর্ক হিসেবেও না, বাসাবাড়ির ভাড়াটে না। সে ক্ষেত্রে মোকাবেলা হবে, তাদের পার্টি। খুশিই তো হবে ওঠার কথা। উত্তেজও ছিল। তাতে ঢুকতে উৎসাহিত এই কারণে—অন্যটা একেবারে সম্ভাবনা মনে হয় নি এর চেহারাই তাদের যেন একবার দেখেছে। তার সেই থেকেই ছোটটা ঘাড়ে বেড়োনো পাকড়েছে। কিন্তু ওর বিয়ে ও বিলুটি বিয়েবাড়ি যত বিলুটিই হোক না কেন—প্রথম যে ভোটটা ছোট মিনিট দুই তিন।

ভেবেছিল প্রথমে বাইরে দাঁড়িয়ে-জলাটাই গাড়িটাই স্থির হয়ে গেলে থাকবে ও মনে মনে স্মৃতির বুকেদারে নামে ঢুকবে। প্রথমে খুঁজবে সুরেনা সেই মেয়েটা। অবশ্য কি অপরিচিত হয়, তবু, ঠিক জানার না পরিচয়ের ইতিহাসটাও মনে পড়ার না। শুধু কেন কেন প্রথম আলো মনে হচ্ছে সেই মোলাকোলটার মধ্যে একটা কি অন্তরঙ্গ ইতিহাস ঢাকা রয়েছে।

মেয়েটি ঘরে ঢুকতে চিনতে পারতে ভবেশ নীরবেই সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। মেয়েটির হাতে একখানা গোলানো খাতা, একটি পাশ ও একটা ছোট ফোল্ডিং ছাতা। চেয়ারে বসে প্রথম কয়েক মুহূর্ত লাগল হাতের সেই তিনটি জিনিস কোলের ওপর গুছিয়ে রাখতে—অন্তত সেই সময়টুকু কথা বলার সুযোগ পেল—তার পর সে মেজাজটাও যখন হল না, তখন মাথা হেঁট করে স্থির হয়েই বসল এবং বসেই রইল।

তার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো পরিচয়ের সূত্রটা পেয়ে গেল ভবেশ।

ডান কানের পাশে ঐ জড়ুলটা। সেদিনও ঠিক এই ভাবে মাথা নিচু করে বসেছিল প্রথম দিকে, ঐ জড়ুলটাই সামনে পড়েছিল। ছোট্ট জড়ুল, এমনি লক্ষ্য হবার কথা নয়, কিন্তু মুখের উজ্জ্বল শ্যাম-

বর্ণের সঙ্গে ওটা কেন মেলানো, আর এই তারকিক দিয়ে মুখটা ঢেকে পড়লে বয়সের চেয়ে বেশী বয়স্কা মনে হয়।

আহা'মিয়োলাও সেই মেয়ে। কী কেন নাম—হ্যাঁ, শুক্লা।

সন্ধ্যাবেলার ঝলমলে, ঝকঝকে-মার্জিত গ্রাম-অফিসার ঘরে ঘাট বাতির আলোতে দেখা—সেই জন্যেই এই বিশ্লেষণ-বিজ্ঞানটা, ভাল করে দেখা হয় নি বলেই। নইলে, সে তো বেশী দিনের কথা নয়, বেশ হয় মাসখানেক আগের ঘটনা। তবু, ঐ জড়ুলটাই লক্ষ্য পড়েছিল বলে আজ চিনতে পারল।

নিজের জন্যেই দেখতে গিয়েছিল ভবেশ।

যৌবন বয়সের অনেকখানি কাটিয়ে দিয়ে এসে, প্রায় সে বয়স অতিক্রম করে আজ তাকে অল্পবয়সীদের এই খেলায় নামতে হয়েছে—পাত্রী সন্ধানের এই অনুচিকর পর্বে। নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য হয়ে পড়ার ফলেই এই বয়সে বিয়ের প্রয়োজন হয়েছে, আর ঠিক সেই কারণেই নিজেকে পাত্রী দেখে বেড়াতে হচ্ছে। এখন নিজের অভিজ্ঞতাকে নিজেই—মাথার ওপর বাড়িয়ে পরখ করে নিয়ে দেবে এমন কেউ নেই।

এ ক্ষেত্রে যে পথে অগ্রসর হতে হয় সেই পথেই গিয়েছিল ভবেশ, বন্ধুর কাছে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। তার ফলেই একটি আধুনিক প্যান্ট-পরা ছোকরা ঘটক জুটেছে—সেই এনেছিল সম্বন্ধ। কেন খুঁজিয়েই পেয়েছিল কথাটা। মেয়ে এম. এ. পাস, গান বাজনা জানে, দেখতেও সুশ্রী। একটা ইস্কুলে মাস্টারী করে। বয়স প্রায় বত্রিশ হবে, তা ভবেশ-বাবুও তো এই বয়সের মেয়েই খুঁজছেন। এ যেন মনে হচ্ছে ওঁর জন্যেই বিধাতা এই মেয়েটিকে যাইবুড়ো রেখেছিলেন এতদিন ইত্যাদি—

যা বলেছিল তা কিছুই মিথ্যা নয়—এইটুকু সত্যের খাতিরে মানতেই হবে—যা বলে নি সেইখানেই ফোলা-ফাঁপা বাহুল্য। পাত্রির গুণ বলা গুণ কথাটা শোনাই ছিল—সে যে এই পদার্থ, তা জানা ছিল না কোনদিন। বোল ক্রোশ রাস্তা ভেঙে ছ ক্রোশে পড়তে হল, তা ছেড়ে চার ক্রোশ একটা স্ট্রাইক-লেন। দুদিকে বড় বড় বাড়ি, বিলাসনেও এসব গলিতে কোনদিন রোদ নামে না।

বাড়িও এ গলির সঙ্গে সমান-সই। প্রকাণ্ড তিন মহল বাড়ি—কিন্তু তার একটা ঘরেও মেঝেতে সিমেন্ট নেই বোধ হয়, মেওয়ালগুলোর এখানে ওখানে যা একটু আস্তর পলেস্তারা আছে—তা ফেকড়ো-ফুকো বছরের জমা কালিতে হাজেপোকা মারার পরম পুরু চটে পড়ে তারাবাহ বর্ণ ধারণ করেছে। ছাদের কড়ি বরগা গুণ-দশার শেষ সীমায় পৌঁচেছে। বেশিরভাগই ঝুলে পড়েছে, টালিও অনে পড়েছে দু চারখানা, কোথাও বা পাড়ো-পড়ো হয়ে আছে, উঁচাতে-বন্ধু মহাচেরের মতো—বরঞ্চ। জনলা, কোনটাই পুরোপুরি নয়, পাল্লাগুলো দাঁড় দিয়ে বেঁধে অথবা পেরেক পুঁতে আটকাতে হয়েছে কোথাও কোথাও।

এরই মধ্যে বহু পরিবার। সব পুরুষ। অপেরেশন থেকে বাড়ি ভাড়ার নোটিস দিয়েছে অনেক দিন। এঁরা কিন্তুর তাগিদে কেউটা ঠেকিয়ে রেখেছেন। টানাও যেন না কেউ। বাড়ি যখন থাকবেই না শেষ অবধি—জীবন যা মৃত একদিন এখান থেকে যেতেই হবে—তখন আর অকথা টানা দিয়ে লাভ কি? তা ছাড়া ভিসটা মটগেজ আছে, কে শেষ অবধি দখল করবে তাই বা কে জানে?...ইলেকট্রিক বোধির আলো জ্বলে নেই, কেরোসিনের ডিবে বা হ্যারিকেনের কাজ চলছে।

অবশ্য বাইরের দুটো উঠোন পেরিয়ে ওরা যেখানে গিয়ে পড়ল সেই অংশের চেহারার ঘরদুয়োর তত নৈরাশ্যময় নয়। ইলেকট্রিক আছে, দেওয়ালও পুরো পলেস্তারা খসা নয়, যদিচ তাতে চুনকাম হয়নি অন্তত পঞ্চাশ ষাট বছর। ঘাট বিছানা—যার চেয়ার আলমারীও আছে ঘরে।

কিন্তু হুঁচোরট কথার পর জানা গেল, এইটুকু যে এখনও বসবাস-যোগ্য আছে সে এই শুক্লার বাবার জন্যেই। তিনি বহু চটকলে কাজ করতেন, তাই এইটুকু ঠাঁই বজায় রাখতে পেরেছিলেন, অসময়ে যারা না ফেলে যোর কাঁর অন্য একটু আশ্রয়ও কোথাও করে নিতে পারছেন। সেটা হয় নি। হয়েছে কেটা—বাটি ছেলেমেয়ে রেখে অকস্মাৎ তাঁকে পরলোকগমন করতে হয়েছে। শুক্লার মা বুদ্ধিমতী—তিনি কোন-মতে এখানেই পড়ে থেকে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছেন। শিখেছেও তারা। বড় ছেলে এম. কম. পাস করে ভাল চাকরি পেয়েছে, তবে তার আগেই একটি বিবাহ করে বসেছিল—দিললীতে বৌ ছেলে নিয়ে বসবাস করে। মাকে মাসে এক আধবেলা টাকা পাঠানো ছাড়া কিছু করতে পারে না। মেজ বি. এ. পাস করার পর বিভিন্ন ব্যবসায়ে তাদা খেলাবার চেষ্টা করছে—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ছাড়া কোন ফল হয়নি। ছোটটি স্কুল ফাইনালের পর আর এগোতে পারেনি, সে ড্রাইভারী শিখে নেওয়াতে একটা চাকরি নিয়ে চলে গেছে, সেও নিজের খরচ চালিয়ে বিশ পঁচিশের বেশি দিতে পারে না। এবারে শুক্লার ঘার হাতেও একেবারে যাবে। বড় মেয়ে একটা ইস্কুলে চাকরি পেয়েছে সম্প্রতি, তাতে কোনমতে উপবাসটা বেড়েছে—কিন্তু মেয়ের বিয়ের টাকা জমোন। অর্থাভাবে শেষ দুটি মেয়েকে পড়ানোও যায় নি, একটা করে পাস দিয়ে বসে আছে।

মেয়ের এক কাকা এসেছিলেন, কথার ভাবে বোঝা গেল—যার অনিচ্ছায় ও অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে। দুই কাকাকে শুক্লার বাবাই চটকলে কাজ করে দিয়েছিলেন, তারা সেখানে কোয়ার্টার নিয়ে থাকে। এদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই, রাখতেও চায় না। ভদ্রলোকের মুখে মদের গন্ধ, কথাবার্তা অত্যন্ত রুক্ষ ও উদ্ধত। ইচ্ছে করে, এদের সম্পর্কে প্রাথমিক সাধারণ তথ্যও—যা না জানবার কোনই কারণ নেই—অত্যন্তের তান করে বার বার বৌদির কাছে জেনে নিয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন, অর্থাৎ ওকেদের জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে তিনি এদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখেন না, কোন খবর জানেন না। আজ যে এসেছেন নিতান্ত দায়ে পড়েই। ওরাই অবশ্য, প্রথম সুযোগেই এও জানিয়ে দিলেন যে এ বিবাহে—যদি বিবাহ হয়—এক পয়সাও সাহায্য করা তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে না—সে অনুরোধ আশা কেউ না করে।

সুতরাং বাইরে এসে ঘটককে সাফ জবাব দিতে হয়েছিল।

মেয়ে এমন কিছু অপছন্দের নয় হয়ত, এ বয়সে কিছু আহ্লাদের সুন্দরী তরুণী জুটবে না—কিন্তু স্বল্পবেতাড়ির পরিবেশ ও লোকগুলি অপছন্দের। এই বাড়িতে সে আর কিছুতেই আসতে পারবে না। কোন দিনই নয়। ঐ একঘণ্টা সময়েই তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। ঘটক বারবার বিয়ে বলল, 'বিয়ে তো অনাড়ম্বর ভাড়া বাড়িতেই দেবেন ওঁরা—'

'কিন্তু তার পর? শ্বশুরবাড়ি হলে সেখানে যাবে না, সে হতে পারে না। যেতে হবেই।...পরের দিনই যেতে হবে হয়ত—'

—'আমে থেকে বলে নেবেন না হয়—'

—'ওসব বাজে কথা বলেন কেন! তা যে সম্ভব নয় তা আপনিও জানেন। তা ছাড়া, আমি কিছু চাই না সত্যি কথা—কিন্তু এক্ষেত্রে যে অবস্থা দেখলুম, ঘর থেকে ওদের খরচও দিতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা—এই বড় মেয়ে, একে যে বিয়ে করবে, বড় জামাই—অভিভাবক হবে। ঐ দুটি আইবুড়ো শালী, শ্বাশুড়ি, আর অকর্মণ্য একটা শালা, বেকার অবস্থা—তার ঘাড়েই চাপবে।... ও আপনি বরঞ্চ যা বলুন, আমি ব্যবসা করে খাই, বয়সও মেয়ে মেয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে—অনেক লোক দেখলুম, যা বলছি আপনাকে—একেবারে নিজের আলোর মতো পরিষ্কার সত্য, বাস্তব, প্রত্যক্ষ। ও আপনি না বলে দিন।'

ঘটককে নিজের পরিষ্কার মতামত জানিয়ে এ প্রসঙ্গে ঐ খানেই যবনিকা ফেলে দিয়েছিল ভবেশ, মন থেকে এ প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ মুছে ফেলেছিল একেবারে। সেই জন্যেই আরও চিনতে দেরি হয়েছে। কিন্তু এখন চিনতে পারার পর ওর ভয় ভয় করতে লাগল। এ আবার কেন এসেছে, কী মতলবে? কোন রকম ব্ল্যাকমেল করতে আসেনি তো? সেই যাওয়া ঘটক কোন বদ করে জেনেশুনে ফাঁদে ফেলবার জন্যেই নিয়ে যায় নি তো সেদিন মেয়ে দেখাতে—যাকে বলে 'স্টেজসেট' করে এখন কিছু মিছে কথা লোকের কাছে বিশ্বাস-যোগ্য করা সহজ হবে বলে?

দেখতে দেখতে ভবেশের কপালে ঘাম দেখা দিল, হাতের তালু, মুঠো পর্যন্ত ঘামতে লাগল।

তবু, ভয় পেলেও সেটা দেখানো চলবে না। অতি কষ্টে গলার স্বর স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে করতে চুপ করল, 'কী বলুন!'

এবার শুক্লাও প্রতিবন্ধে গলা পরিষ্কার করল, 'আপনি আমাকে অপছন্দ করেছেন?'

ভবেশ এতক্ষণ, এই অল্প সময়ের মধ্যেই, ভাবছিল সেদিনের ঐ পাঁচ-ছটা একেবারেই অস্বীকার করবে। কিন্তু এর পর সে অভিনয় করতে লজ্জাবোধ করল। বলল, 'এ প্রশ্ন আপনার পক্ষে করা যত কঠিন, তার চেয়েও কঠিন আমার উত্তর দেওয়া—তাই নয় কি?'

—'আমাকে—আমাকে অপছন্দ করলেন কেন?..আপনি তো শুনেছি খুব সুন্দর চান নি!'

ভবেশের পিছন দিকে জানলা, তাতে পর্দা লাগানো থাকলেও ফিকের আলো আসে—সে আলো এসে পড়েছে শুক্লার মুখে, সেই সঙ্গে টেবিল ল্যাম্পের আলোর একটা রেখা কোমল-জড়ো-করা হাত দুটোর ওপর। লক্ষ্য করল ওরও কপালে বেশ বড় বড় ফোঁটায় ঘাম জমে উঠেছে, হাতের ওপরটাও চিকচিক করছে। কাঁপছেও হাত দুটো।

এবার সত্যিই ভবেশ নিজেকে বিদ্রূপ বোধ করল।

নির্জন ঘরে এ কি নাটক করতে এল মেয়েটা! উঠে ও বিরক্ত হয়ে উঠল মনে মনে। এ তো ভীষণ বেয়াদবি, ব্যাপিকা! জবরদস্ত চেয়ে যাকে বলে। একে সে বিয়ে করবে বলে দেখতে গিয়েছিল! কী ভয়ানক ফাঁড়াই কেটে গেছে!

সে একটু মুচকেছেই জবাব দিল, 'কেন অপছন্দ করলুম সে তো আমি

মিঃ সেনকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি। সে বলে নি আপনাদের?'

—'বলেছে ওরকমতো কারণ—কিন্তু সেগুলো ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় নি। যাকে কথা বলেই মনে হয়েছে। আমি আসল কারণটা জানব বলে এসেছি।'

—'আমি তাকে আসল কারণই বলেছি, সে প্রবঞ্চনা যদি তার ধাতে কথা বলে থাকে তো জানি না।'

—'সে বলেছে—ঐ বাড়ি ভূত, ঐ পাঁচিলের, আমার আত্মীয়রা—এই-গুলোই নাকি আপনার অমতের কারণ, ঠিক আমি নই?'

—'ঠিকই বলেছে সে।'

—'কিন্তু এ যে ছ্যাবলামি!' এবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে মুক্তা, 'আপনি কি ঐগুলোকে বিয়ে করতেন? ও বাড়িতলার আপনি কতদিন আর ছেলেন? ও বাড়ি তো ভাঙতেই হবে, আমাদেরও। আর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা না রাখা—সেও তো আপনার হাতে!'

—'বিয়ের আগে পর্যন্ত, তারপর সবটা আর আমার হাতে থাকবে না। তা ছাড়া নাকির! যে আপনাকে বিয়ে করবে—সুটি নার্সারী, একটি বেকার শালা ও একটি স্বাস্থ্যহীন চাকর তার ঘাড়ে চাপবে, এটা মানেন তো?'

—'আমার মার অত্যন্ত আত্ম-সম্মানজ্ঞান, তাইতেই কলকাতা আরও কিছু দেখতে পাবেন না। তিনি মরে গেলেও জামাইয়ের ঘাড়ে চাপবেন না।...আর, না হয় আমি আমার মাইনেটা কিছু বেশি করে দিতাম, এখন চাকরি ছাড়তুম না!'

—'দেখুন মুক্তা বসে বিয়ে করাই সবার সুখের জন্যেই। স্ত্রী চাকরি করবে, বিশেষ মাস্টারীর চাকরি—এক গাদা হোমটাস্ক, আর পরীক্ষার খাতা নিয়ে আসবে, সংসার থাকবে কি কি চাকরের জিম্মায়—ঠিক সে-গুলো আমি বিয়ে করছিনা। ইত্যে—মনে শুধু দৈহিক লালসা মেটানোর জন্যে বিয়ে করার আর বয়সও নেই আমার।' পছন্দ না করাটার সিদ্ধান্তটা যে চূড়ান্তে—কণ্ঠস্বরে ও উচ্চারণের দৃঢ়তায় সেটা যেন করে দুটিয়ে দিল ডাক্তার।

মুক্তার ছেলেটাও। অন্য একবার মাথা তুলেছিল কিন্তু এখন আবার আগের মতোই মাথা হেঁট করে বসে আছে। বসে রইল অনেকক্ষণ ধরেই।...

কপালের ঘামের ফোঁটাগুলো বড় হয়ে উঠেছে, একটা টপ্ করে ঝরে পড়ল হাতের ওপর। আগে ভেবেছিল চোখের জল, অর্থাৎ এও নাটকেরই অঙ্গ একটা—পরে দেখল তাই। আরও একটা ফোঁটা এসে ছিটকের প্রান্তে ঝুলছে, এখনই ঝরে পড়ে পড়বে।

এই তুচ্ছ লক্ষণ দেখে ছেলেটার ছিটকের গঠনটা বড় সুকোমল।

তার পর হঠাৎই মুখ তুলল আবার। বলল, 'আমি বেশীক্ষণ আর আপনাকে বিরক্ত করব না।...এই আপনার ফাইনাল কথা তা বুঝেছি। শুধু একটা প্রশ্ন করব, আপনি উত্তর দেবেন, কোন চক্ষুলজ্জা না করে?'

—'বলুন। চক্ষুলজ্জা করলে এত কথা বলতে পারতুম না মুখের ওপর, মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে বলতুম!'

—'আপনি এই যে কারণ দেখালেন —এই কি সব? না অন্য কোন কারণও আছে?...কেউ, ডাচি বেরানি কিছু? খুব ভয় করে এইটে বলুন—প্লেনলি টুমি!'

—'ডাচি! ও হেভেনস্। না না, ডাচি কেউ নেই। দেবার কোন কারণ আছে নাকি?' চেষ্টা সত্ত্বেও অন্যমনস্ক কৌতূহলটা চাপতে পারে না।

—'ডাচির আর কি করণ থাকতে পারে—জেলাসি ছাড়া? সবটাই ঐ একই কারণ! শুধু তার প্রকাশে আর রাসকেলটে কমলে রকমফের ঘটে। যারা ডাচি দেবে তাদের সে রকম কারণ খুঁজে বার করতেও দেরি হয় না।...ঐ বাড়িতে অনেকে থাকে আমাদের—তাদের কেউ, কোন ছেলেমেয়ে কোনদিন একটা পানও দেয় নি। কারও চাকরি করিও নেই—চুরি জুচ্চুরি ছিনে, এই জীবিকা—। ওর মধ্যে অমরা একটু, তফাতে থাকি, সে একটা পরের জন্যলার মস্ত কারণ। আমাদের কাকাদেরই গরজটা আছে—আমার মা তাঁদের অভাবের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন না—এই অপরাধ!'

একটু থেমে কেমন এক রকমের করুণ হাসি হেসে বলল, 'তেতিশ বছর কাটল হয়ে গেল—এ যা-ই বলুন না কেন, জানি ফিরে হবে না, কোন আশাই নেই। এক পয়সা খরচ করার সামর্থ্য নেই—অত লাইফ—তবু মা শোনেন না, তাঁর বাসনা মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন বিয়ে করা অবশ্য কর্তব্য, আর হয়েও যাবে একদিন, যেমন করে হোক—অন্তত সে জন্যে কেউ একটু, চেষ্টা করবে এমন লোকও নেই একটা—শেষে মরীয়া হয়ে কেলনের টাকা বাঁচিয়ে ঐ বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলেন মা,—কিন্তু জানেন, যে পাঁচ ছটা পার্টি দেখতে এসেছিল, তাদেরকে ডাচি দিয়েছে! তারা স্বীকার করে গেছে—আপনাদের মেয়ের নয়ন এই এইসব শুনেছি।... যদি দেখে সপ্রতিভ হতে তো কিছু কথার থাকত না—এই অপমানটাই আমার বেশী লাগে! আমাদের দেশের লোক মেয়েদের দুর্নীতি বিশ্বাস করার জন্যে যেন তৈরী হয়ে থাকে।'

তারপর হাতের তিনটে জিনিস গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, বলল, 'আচ্ছা, আসি, নমস্কার।'

ওস্তাদ আমীর খাঁ

কিন্তু তারপর দরজার কাছাকাছি গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল আবার। খুব আস্তে আস্তে, যেন স্বগতোক্তির মতোই বলল, 'আমার কিন্তু আপনাকে দেখে ভাল লেগেছিল, কেমন একটু আশাও হয়েছিল—আশা নেই জেনে-বুঝেও, প্রোপ এক্সেপ্টে প্রোপ—মনে হয়েছিল আপনার কাছে এবার আদর পাবো হয়ত, হয়ত এবার সুখের মুখ দেখব একটু,। কী পাগলই হয়ে ওঠে মানুষ এক এক সময়।'

আর দাঁড়াল না সে, দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

উঠে দাঁড়িয়েছিল ডাক্তারও। তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এসে পর্দাটা সরিয়ে দিল খানিকটা। আরও আলো চুকুক, সেই সঙ্গে বাইরের নির্মল হাওয়া...

আসেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল, দেহের এই নির্লজ্জ লোলুপতার যেন গা-ঘিন ঘিন করছে।

ছেলেটা শুধু কালই নয়, বোকাও। ও কি আশা করে এই কথাগুলো শুনলেই সে গলে জল হয়ে যাবে!

ঐ, সত্যি কী সাংঘাতিক প্রতারণা-বাজ মেয়ে যে যারা!

ধরাত ভাল ওরা, শুদ্ধুরা—তাই কোনদিন বেঁচে গিয়েছে। ঐ আটা সের তো ফিরেছিল আর একটু হলে ফাঁসিয়ে! ভাগিস সে তার ফোস-লানিতে ভোলে নি।

যাই হোক—না ওআর্ল্ড ইজ ওআর্থ—মনে মনে বলল ডাক্তার, ঝাঁট চুকে গেছে সেই ভাল। খাম দিয়ে জল ছাড়ল। একটা শিকারও হয়ে গেল খুব। ভোর দেখতে যাবার আগে তার কাল, পরিবেশ, অবস্থা এ সব ভেবে শুনে নিয়ে যাওয়া দরকার। 'স্ত্রীরূপ পুরুষস্য ভাগ্যং' এসব পুঁথি কেতাবেই ভাল। আমরা পাত্রে লাক্ষা ঘষে না, শুদ্ধুলে স্ত্রীরা জন্মায় না—তা যেমনই বলুন আর স্বয়ং মনুই বলুন..

আপিস থেকে বেরিয়ে ডাক্তার একটু হাঁটে রোজই। রাজ্যের ছেলে-পদ্মগুলা লোকের ভীড়ের মাঝা উঠে (মহিলারা আরও দুঃসহ, হাতকাটা জামার বদৌলত প্রকৃতির বাসের গন্ধ তো আছেই—আমার ভেলিটিই ফিতের সঙ্গে গন্ধ তেল ও ঘামের পচা গন্ধ মিশে যে এক নিদারুণ ইন্দ্রিয়াতীত সুগন্ধের ব্যাপার) চিড়ে চাপ্টা হয়ে—কিম্বা হাতেপায়ে ঝুলে ট্রাম হাতে করে ঝাদুড় ঝোলা হয়ে যাওয়া, তার থেকে একটু, হেঁটে ধর্মতলা পর্যন্ত গিয়ে মিনিবাস কিম্বা শেয়ারের ট্যাক্সী ধরা ঢের ভাল।

আজ কিন্তু ওসবেই ওঁদিকে হেতে মন চাইল না। রাস্তা পেরিয়ে বর্তমান কালের ভদ্রোবশিষ্ট গড়ের-মাঠে গিয়ে পড়ল।

কালই মনে করুক ওর কথা আর চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, ও পর্ব তো চুকে বুকেই গেছে—সহসা এক সময় আবিষ্কার করল ডাক্তার—সে এই এতক্ষণ ধরে ওর কথাই চিন্তা করছে, ছেলেটার কথা...

ছেলেটা কি সত্যিই ব্যাপিকা, গরে পড়া—স্বৈরিণী ধরনের মেয়ে হতে পারে? শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে এই ছেলেমানুষী পর্যায়তে খেলাতে এসেছিল ওকে?

সেইটেই সম্ভব। ভদ্রঘরের মেয়েদের, জলে মুখে কাটে তো মুখে ফোটে না। অবার্থ সম্বন্ধের মেয়ে হলে ঘরে ঘেরেও এমন ভাবে অপরিচিত একটা পুরুষের কাছে উপযাচক হয়ে আসতে পারত না।...ছিঃ!...একদিন একবার দেখতে পেয়ে একটা লোক, সে কী রকম লোক, স্বভাব চরিত্র কেমন —ওরাতে পারতে পারবে কিনা—কিছুই জানা নেই, তার কাছে এসে বলা, 'আপনাকে ভাল লেগেছিল,

ছেলেছোকরাদের আড্ডার মাঝে বেশ থাকবে" বলতে পারল কী করে। আশ্চর্য।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্যহীন ঘুরে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত একটা ঝিলপাড় ঘাসের ওপরই বসে পড়ল। একটা সিগারেটের জন্যে পকেট হাতড়াল—নেই। মনে পড়ল আপিসের ঘরটা থেকে প্যাকেটটা আনাই হয় নি। যাক্‌গে, এতক্ষণ যদি না খেয়ে কেটে থাকে, আরও দু ঘণ্টা বেশ কাটবে।

অথচ, মেয়েটা যা বলল, তা একেবারে মিথ্যা না-ও হতে পারে।

বাঙালী মেয়ের হোঁদেল বছর বারো, তার মানে তো বুড়ি। আর আট-দশ বছর পরে সন্তান বাবদের দায়িত্বই চলে যাবে। এতদিনেও বিয়ে না হলে মরীয়া হয়ে ওকেবারেই তো কথা। সব মেয়েই এমনি পাগল হয়ে উঠে, এ মেয়েটা অবশ্য সে চান্সটা খুইয়ে ফেলেছে। মানে, জীবনের বিনে কী সাংঘাতিক ইচ্ছে আছে তারা হত—আরও 'শাঁসালো' ধরনের মেয়ে হলে তাদের ওপর আলাদা। কিন্তু সে জন্য ওটা?

এ ক্ষেত্রে তো আরও। অবশ্য বা, বিয়ের কোন সুন্দরতম সম্ভাবনাও নেই। ওদের এ বিজ্ঞাপন-দেওয়া বা মেয়ে-দেখানো এইটেই তো দুর্ঘটনা। পাঁচটা লোক সংসারে—দৈনিক জীবন ধারণের খরচাই কি কম? এখনও হয়ে মাথার ওপর ছাদটা আছে, সেটা চলে গেলে এর ওপর ঘর ভাড়া টানতে হবে। একটা চাল ঘর মানেই একশো টাকা, কমপক্ষে। এই সবই তো নির্ভর করছে ঐ ছেলেটার একদম নড়বড়ে চাকরির ওপর। ওর বিয়ে দিয়ে সাঁতরে দিলে যাবে কি? কোন্ বরই বা ঐ দুটি মুখ্যু শালী, বেকার শালা, অথর্ব শ্বাশুড়ির দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে বিয়ে করতে যাবে ওকে? গান বাজনা জানে না, ষোটা ব্লাউজের কাজও নয়—তবলার জন্যে একটা সস্তা গাওনা মাস্টারী! কিছুতে এক পয়সা খরচ করতে পারবে না। পক্ষ পক্ষ যদি কিছু নাও চায়—মেয়ের চড়ি হার, বরাভরণ, বাসনের বাসন, ঘর গরস্তা সব জড়িয়ে কিছু না হোক ৫ সাত হাজার লাগবে। কে দেবে শুনি? ঐ জন্যেই তো কাজটা প্রথমে হাকতে শুনিয়ে দিলে—এক পয়সা খরচ করতে পারবে না—তবে, এ বিয়ের কথা তোলাই তো পাগলামী।

যদি সাঁতারই ছেলেটা ভাল, মানে, ভদ্র ঘর—কতখানি অভ্যস্ত সাধ আহ্লাদ সুখ কামনার এমন জানহারা হয়ে ছুটে এসেছে না জানি! কত দিনের লালন হয়ত বেচারীর—একটি ভদ্র আদরী, নিরাপদ সংসার। কোন্ মেয়ে চায় যে সে চিরকাল নিজের দুর্বল কাঁধে ঘরবার নির্বাস্থিতার ঝক্কাঝক্কি বয়ে যাবে—বোনের বিয়ে দেবে, ঘাকে দেখবে, ভাইয়ের সংসার টানবে। নিজের সাধ আহ্লাদ মেটার কোন আশা কোথাও নেই দেখেই এমন পাগল হয়ে উঠেছে হয়ত, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়েছে। কোনটা লোভন কোনটা সম্ভার সে বিবেক নেই।...

আচ্ছা, মেয়েটা কেমন? সাঁতারই কি অভিনয় করে গেল আগাগোড়া? না প্রথমে ভদ্রলোকেই এসেছিল? মুখ চোখের ভাব ইচ্ছেমতো পালটাতে পারে, ঘাচা ও বিচার পাকা। অনেককে লিখতেও হয় না পরীক্ষাটা নিয়ে জন্মায়—জন্মমতো বাপার। চোখের জলও মানসিক প্রক্রিয়ার প্রথা সহজ—কিন্তু যখন দেখতে দেখতে যে মেয়ে মেয়ে উঠল মেয়েটা—? হাতের ওপরটা পর্যন্ত যখন চিকচিক করছিল, দেহের কিছে লক্ষ্য করেছে, সেখানে সেটা বেশ কটা বিন্দুর আকার নিয়েছে। হাত দুটো ঘর ঘর করে কাঁপছিলও। এত কি অভিনয় হতে পারে?

অবশেষে একসময় দুরোও বলে উঠে পড়ে ভবেশ। তখনই বাড়ি যায় না, দুটোকা দামের টিকিট নাচে তিন টাকার কিনে, সো দুরুহ অনেক পরে একটা সিনেমায় ঢোকে। স্ক্রীনটার কী একটা ছবি, খানিকটা দেখে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে। বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে জোর করেই একখানা বই নিয়ে বসে।

কিন্তু খানিক পরে আবিষ্কার করে বইয়ের একটি কথাও তার মাথায় ঢুকছে না—যেমন খানিক আগে ছায়াছবির পাত্র-পাত্রীরা কী বলছে কী করছে দেখেও মাথায় ঢোকে নি ওর। কে জানে কেন, যে কামনা চুকে গেল, যার জন্য আর ভাববার দরকার নেই—যার শেষের কথাগুলোতে 'সংকল্প' মূর্তিত (শব্দটা সম্প্রতি অভিধানে পেয়েছে ও, ধন্যবাদ) নিষ্পন্দ পেয়ে আমায় ওর যা কিছু করে এসেছিল—সেই ভাবনা, তার ভাবনাই ভাবছে সে সর্বক্ষণ, সেই চিন্তাটাই মাথার চেপে বসে আছে।

তার ভাবনাগুলো, তার কথাগুলো।

কেবলই বাচাই করতে চায় মন, এ অভিনয় না প্রথমের জন্যেও।

মেয়েটা চরম বেহায়া না চরম দুঃসাহসিক?

না ঘরীয়া?

কোন মীমাংসাই হচ্ছে না সমস্যাটার। মনের মধ্যে কোন উত্তর পায় না এ প্রশ্নের—প্রমাণসিদ্ধ নিশ্চিত কোন উত্তর।

অনেক দেখেছে সে এই চল্লিশ বছর বয়সে, মানুষের বাইরের আচরণ দেখে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না সব সময়ে। ওর ছেলেবেলার কোন এক লেখক ওর অটোগ্রাফ বইতে সহোদর ভদ্রর কটা লাইন লিখে দিয়েছিলেন, "বুদ্ধি যাহা ভাব অসম্ভব, তাহা অন্তর লেখা হয়ে" লাইনটার মানে ছেলেবেলায় ও অনেক পরে। একাধিক মানে একাধিক লেখা। মানে হোক, বাড়িভাড়া ইলেকট্রিসিটির বিলের দাম নিয়ে দেওয়া নিয়ে—তাতেই জনসাধারণ বুঝে নেওয়াটা খুবই অসম্ভব। অন্ত মুখের সমর—সম্মুখ যুদ্ধে—অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের অন্তরে আঘাতেও ঐ ধরন দাগ পড়ত, ক্ষতচিহ্ন—সে চিহ্ন দেখবে, সনাক্তের—সেই তাদেই দেখবেও।

তেমনিই যদি অন্তর্দৃষ্টির সত্য হয় ঐ মেয়েটার অন্তরে?

কতখানি মানসিক যন্ত্রণাতেই না এতটা মরীয়া হয়ে উঠেছে?

বেচারী!

●

গতকাল রাত পর্যন্ত ও পরের সারাটা দিনই প্রায় মনে মনে ওকথাটা নিয়ে তোলাপাড়া করল ভবেশ। কিন্তুত সোমিন আপিসের ফোন বাজাই হল না। এক বন্ধুর এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে ওরা বন্ধুর অনেক টাকার 'ইন্সিওরেন্স' পলিসি তাঁর প্রকারেই কিনিয়ে উঠল। ওর একদম যে ওপরওলা সাহেব ঘরে বসেন তিনি বার দুই ডেকে পাঠাতে বলে ছিল ওর জন্যে মাথা ধরেছে এমনভাবে বার বার তার উঠে আসা সম্ভব নয়। তিনি বিদেশে চলেন। কিন্তু বহুবার পর্যন্ত জানবার বাসনা মাথাধরের লক্ষণ বলে ধরে নিয়ে সহানুভূতির সুরেই বলবেন, "তা হলে আপনি আজ একটু বিশ্রাম নিয়ে না কেন? সাঁতারই তো—মানুষ যা চলতে হচ্ছে! বরং বেড়িয়ে চলে যান, কাজ যা আছে আমি মানেজ করে নিতে পারব।"

এই প্রস্তাবে বেচে গেল ভবেশ। অবশ্য অত্যধিকের কাজকর্ম নিয়ে অনর্থক নাড়াচাড়া করে, যাঁরা কাজে এসেছেন তাঁদের কাজের ঘরে পাঠিয়ে—অন্তরীটা নামল ঘণ্টাই উঠে পড়ল সে।

কিন্তু তখনও ওর সেই অবেলা কেটে যাওয়া খানিকটা।

প্রথমতঃই বেশী স্ক্রীনিংএর

মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটুকু ভালো হতে পারে। নিজের কাছেই বেয়ারার সম্বন্ধে ও বিষয়ে খুঁটি প্রশ্ন করতে করতে এতটা অবস্থা হয়ে পড়েছিল, এবার এক সময় লক্ষ করল পাখাটা অনেকক্ষণই বেশী জোরে পড়ছে। হয়ত যে মন দাঁড় করা ছিল, এটা তারই কারসাজি, এক সময় এদিকে 'পাখাটা' চালিয়ে দিয়েছে খানিকটা—তবু এই অনবরত খুঁটি-প্রতিবৃত্তি প্রয়োজনের লাভ ও অতিরিক্তরূপের ফলটা থেকে খুঁটি দেখে বেরুতে পেরে যে 'পাখাটা' চালানো হয়েছে কি না—সে কথা অনুসন্ধানে ব্যস্ত হতে চায় না।

আপিস থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রীটের একটা নামী রেস্তোরাঁর অনেকক্ষণ ধরে পুরো এক পট অর্থাৎ দু কাপ কফি খেল সে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আরও একটা ট্যাক্সি ধরে করে ফেলল। একখানা ট্যাক্সী ভেকে পাইকপাড়া রওনা দিল।

যেদিন শুক্লাকে দেখতে যায় সেদিন—সে কোন ইস্কুলে মাষ্টারী করে সেটা জেনেছিল; ওঁরাই বলেছিলেন, আর সে ইস্কুলটা যে পাইকপাড়ায় সেটাও জানিয়েছিলেন সেই সঙ্গেই। এখন শুচরণ জানতে জিজ্ঞাসা করে করে সে ইস্কুলের সামনে এসে পৌঁছতে খুব অসুবিধে হল না।

সময় হিসেব করেই এসেছে তবেশ। ও ফটকের কাছে পৌঁছবার আগেই ছুটির ঘন্টা পড়ে গেল আর ছেলেরা হুড়মুড় করে বেরোতে শুরু করল।

তবেশের তাড়া ছিল না কিন্তু। ইস্কুলের ছুটি হলেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেরোতে পারেন না, তাঁদের একটু সময় লাগে। কতটা সময় লাগবে সেটাই ছিল চিন্তা। কিন্তু দেখা গেল বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হল না—ছাত্রীদের ভীড় সম্পূর্ণ কমবার আগেই খুব সিঁড়ি বেয়ে নেমে ফটকের দিকে যে এগিয়ে এল সে শুক্লা—প্রায়, যেন তবেশের মোতায়েনকারীই, একা।

—মিস চৌধুরী?

আগেই ছেকেছিল তবেশ, তবু শুক্লা কিরে চাইতে উঁচল। হয়ত কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল বলেই। সে চমকে ওঠার প্রবলতর পলেস্তা-খুসি খসে পড়ে যাবার ও চিনতে পারার পর। নিজেরই মুখের অনেক-গুলো বর্ণান্তর ফুটে গেল—যেন পর্যন্ত সব কটা মিলিয়ে গিয়ে বিবর্ণতাটাই স্থায়ী হল।

—তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল। কোথাও একটু নিরিবিলি বসা যায় না?'

মুখের বিবর্ণতা সত্ত্বেও শুক্লা তৎক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। পাও থামায় নি। চলতে চলতেই বলল, না, কি আর। এখানে কোন পরিচিত বাড়ি নেই, থাকলেও যে যেলাই কৈফিয়ৎ চেয়ে বসব। তা ছাড়া চারিদিকেই ছাত্রী, কে কি মনে করবে—। কোথাও দাঁড়িয়েও কথা বলা যাবে না।...আর কী দরকারই বা। আপনার যা বলার তা তো কালই লেখা হয়ে গেছে। আমারও।'

—'একটু,—একটু, অন্য কোথাও যাবে? কিছু খারাপ ভেবো না—ট্যাক্সী করেই যাবো—চৌরঙ্গীর দিকে কোন রেস্তোরাঁয়, কি পার্কে যাই? আমি আবার পৌঁছেও দেব যেখানে বলবে। বেশী দেরি হবে না, গ্যারান্টি দিচ্ছি। এক পেয়ালা চা খিতে আর ফেরার সময়ে।'

মুখের ভাবটা যে কঠিন হয়ে উঁচল সেটা লক্ষ করতে কোন অসুবিধে হল না তবেশের। সেই দৃঢ়ি দৃঢ়-বদ্ধ ওষ্ঠ থেকে কঠিনতর উত্তরেরই আশঙ্কা করছিল তবেশ। কিন্তু আবারও দেখল, প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলেই নিল শুক্লা, নিরুপায় ঘাড় নেড়ে বলল, চলুন। তবে ট্যাক্সীতে নয়, বাস-এই যাবো। নতুন চাকরিটা আমি কিছো দুর্নামে খোয়াতে চাই না। 'আপনি এগিয়ে চলুন, আমি আসছি।'

রেস্তোরাঁয় বসে চা আর স্যান্ড-উইচের অর্ডার দিয়ে কিনা জুনি-য়াতেই তবেশ কথাটা পাড়ল, 'আমি যদি হঠাৎ পরিবর্তন করি, তুমি—তুমি আমাকে সে সুযোগ দেবে?'

'তুমি' আগেই বলেছে। আপনিই বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। এখন হঠাৎ সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে বিষম লজ্জা পেয়ে বলে উঁচল—'তুমি বলে ফেললুম, কিছু মনে করলে না তো?'

—'আমি অবশ্য লক্ষ করিনি প্রথমটা উঁকিয়ে দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল, কিন্তু হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ? দয়া? অন্যায় সহানুভূতিলাভীনার ভীতি?'

ব্যাপারে সুবিধা করতে না পারার কোন কারণ নেই, তবে তবেশ সাফোপেশী উত্তর দিল, 'না। অন্য-লোনা। নিজের অভিজ্ঞতার জন্যে।'

—'ও এই কথা!' বলে একটুখানি চুপ করে রইল শুক্লা। মনে হল ওরও মনোরাজ্যে একটা তুফান উঠেছে, আশা নিরাশা, কর্তব্য-অকর্তব্য, লোভ ও অভিমানে চঞ্চল মনকে মেঘ দিয়েছে।

তারপর, বোধ হয় সে আবেগ-আলোড়নের প্রাথমিক প্রাবল্য কমে এলে আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু আমিও মন স্থির করে ফেলেছি। মত পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না, কেন না, এর অবাস্তব দিকটা আগেই আমার চোখে পড়েছিল, তবু মোহ-টাও বড় বেশী প্রবল বলেই যার ফেলবার বাধা দিই নি, ভালো হওয়াই একটা সুব্যবস্থা করে নেবেন এমনি একটা অস্পষ্ট সান্ত্বনায় ঘোর আড়ম্বর খুঁজেছি। কাল সেই মোহটা ভেঙেছে। সারা রাত ভেবে দেখেছি আপনার কথাই ঠিক, খুঁটো জাই-খুড়ো লেখাপড়া-না-জানা সাধারণ চেহারার বোন, একটা অসহায় বেচারা ভাই আর খুড়ো মা—এতগুলো বোঝা সুদ্ধ কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না। কিছুটা অন্তত ঠুল, কিম্বা কোন বিষের কেমারলি-ফিকেশন—যেমন গান বাজনা—থাকলেও যা কথা ছিল। কলেজও—যে কলেজে, হয়ত সব ছেলেগেঁচেতে, কিম্বা কলুষা করে—যেমন আপনি বলতে চাইছেন আজ—তার পর জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠবে, খাড় ভেঙে নামাবার জন্যে ছটফট করবে, আমাদের অভিসম্পাত দেবে। সে ক্ষেত্রে জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠবে আমারও। যদি তখন যে ব্যবহারটা তোমার আমরা নিল না, বড়, পুরুষ-মানুষ হয়েও—সে দাবির ঘাড় পেতে নেওয়ার তোমার অত ব্যথা কিসের? তার উত্তরে সেই ভালোবাসার কথাই বলতে হয়, তারা যেন নোংরা পাঁকটা ফেলে চলে গেছে, আমি আজও ফেলে পারি নি। এখন তার হাতে দিয়ে যাবো কেন? না, আমি মন ঠিক করে ফেলেছি, মাকেও বলে দিয়েছি, আজ সকালেই। তিনি আপত্তি করতে অনেছেন, কিন্তু ও কান্নার কান দিয়ে কোন লাভ নেই। তিনি ভবিষ্যতের ছবিটা দেখতে পেছেন না—দেখতে চাইছেন না—আমি দেখেও সেদিকে চোখ বুজে থাকি কী করে?'...

একটু থেমে, বাইরের ফুটপাতের দিকে চেয়ে আবারও বলল, 'এনি ওয়ে, আপনি যে অনুরোধ করতে ফেরেছিলেন এটা মনে থাকবে আমার, এজন্যে সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ। অন্তত একটা দিনের অভার তো হল এল জীবনে! আমাদের কাছে এটা কম কথা নয়। এটুকুও না এলেই বা কি করতুম—তবু মনে একটা ক্ষোভ থাকত।...আমি যা বোঝার আগে সার্টিফাইড করতুম, এ-সান্ত্বনাটুকু থাকত না।...আচ্ছা আসি, নমস্কার।' সে উঠে দাঁড়ায় একেবারে।

—'আরে—আর একটু, কফিটা না? চা বলেছি যে—?' তবেশ বিব্রত হয়ে ওঠে।

—'থাক যে চা। আপনি ওদের বাকীটা মিটিয়ে দেবেন। তাহলেই হবে। আমি যাই।'

সে সত্যি সত্যিই দ্রুত বেরিয়ে যায়। চা যে টেবিলে এসে হাজির হয়েছে, তাও লক্ষ করে না।

ক্রমশ

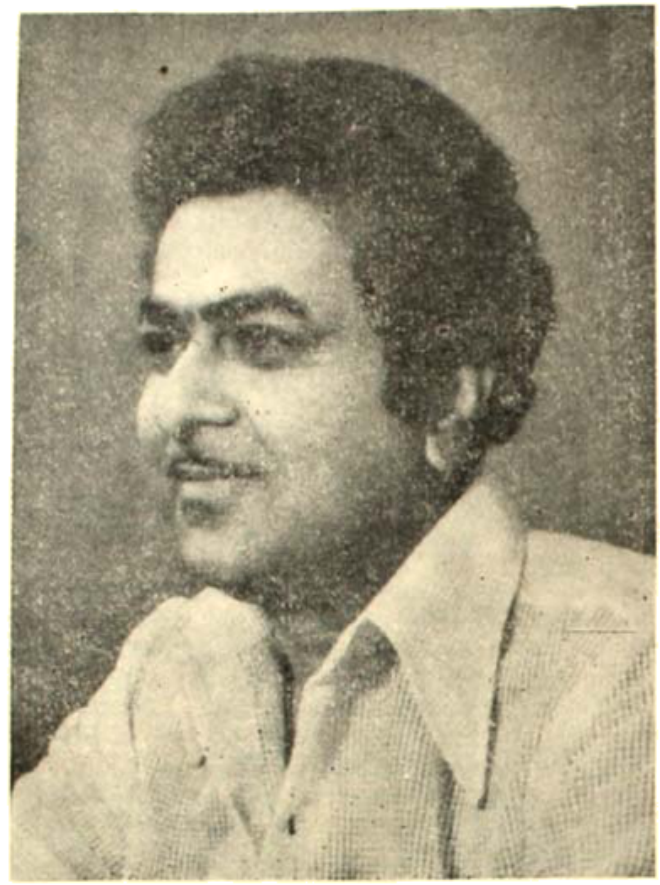

ষষ্ঠীক নন্দী । গীটার

জানলা দিয়ে নীলাভ হ্রদের খানিকটা দেখা যায়। পাইন আর দেবদারুর জঙ্গল। সামনের পাহাড় বেয়ে সাপিল পথের ইশারা।

আশা চুপটি মেরে কোলের বেলোন নিয়ে চুপচাপ পুতুল বুনছিলেন। পরনে ধবধবে শাড়ির ওপর কালো আলপাকার। সিঁদুরের রঙের একটা ব্লাউজের কালো চুল আবৃত।

কয়েকটি চলচ্চঞ্চল আলুনের চুড়ো। তাদের সারা গা উত্তপ্ত! আশার বুকের ওপর একটা ছোট উপুড় করা। মনে হয় পড়তে পড়তে কখন ছেলেটিকে উল্টে রেখেছেন।

—মেমসাব দরজার ওপার থেকে পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেল।

আশা চোখ বুজেই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'কে?'

—মেমসাব চায়।'

ও, আবদুল। চা নিয়ে এসেছে।

—'নিয়ে যাও।'

আবদুল ট্রেতে সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। টিপয়ের ওপর চা দিল, দুটি সাজিয়ে হালকা পেস্ট্রিসের একটা প্লেট আশার সামনে ধরল। ছোট চিঠি। ছোটা ছয়েক।

আশা ডাক তুলে নিলেন। প্রসপেক্টাস, চিঠি, রঙীন ক্যালেন্ডার।

চা পান করতে করতে আশা দ্রুত সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

বছরে একবার এই নির্জন শৈলাবাসে বিশ্রাম নিতে আসেন আশা চুপচাপ। এক মাসের বিশ্রাম, কিন্তু পুরো মাসের অবসর প্রায়ই হয়ে ওঠে না।

দুটো কাপড়ের কল। একটা কলকারখানার কারবারী। আর একটা প্রসাধন সামগ্রীর এজেন্সী।

ব্যবসাই করা লোক আশা। কিন্তু সব কিছুর ভার আশার ওপর। সেই কথা তাঁকেই দিতে হয়।

আর আজকাল মন্দা মানেই মন্দা। সোনালাল সেলসই বাড়ে। কল বিগড়ায়, মানুষ বিগড়ায়। সেই সেরেস্তায়।

চায়ের ডিসিপ্লন্ট সাজিয়ে নিয়ে যাবার সময় আবদুল দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল, 'মেমসাব, সেই বাবু দেখা করতে এসেছে।'

দুটি দ্রুত বাবদানে কুঞ্চন। 'কে বাবু?'

—'কদিন ধরে যিনি আসছেন।'

আশার মনে পড়ে গেল, আবদুল বলেছে বটে, পর পর কদিন ধরে একটি বাঙালী ভদ্রলোক দেখা করতে আসছে।

এত দূরে এসেও নিষ্কৃতি নেই, ঠিক খবর পেয়ে যায়। চাকরির উমেদার, কিংবা কলকারখানার জানোয়ার, না হয় কোন কিছুর এজেন্সী চায়। শরীর খারাপের অজুহাতে কদিন দেখা করেননি, কিন্তু রোজ রোজ ছলে যেতে কলাটাও তাঁর নিজের পক্ষে সম্মানের নয়।

—'বাইরের ঘরে বসতে বল।'

—জী সাব।'

আবদুল চলে যেতে আশা উঠে দাঁড়ালেন। বয়স হয়েছে। খুব তাঁরুণ্যে থাকেন বলে বয়স তাঁর গায়ে বসতে পারে নি। কিন্তু আশা বুঝতে পারেন ভিতরে ভিতরে একটু দুর্বল হয়ে পড়ছেন। উত্তেজিত হলে শরীর কাঁপে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে একটু দাঁড়ালেন। পাউডারের পাফ তুলে নিয়ে গালে বুলোলেন। নিজের প্রতিচ্ছবি দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দু চোখের কোলে যেন ক্লান্তির ছায়া।

মিস্টার চুপ্পানি চলে যাবার পর থেকেই মাঝে মাঝে নিজেকে অসহায় বোধ হয়। ঘনিষ্ঠ একটা মানুষের তুলনায় সম্পদ কিছু নয়।

বসবার ঘরে ঢুকে দেখলেন, ছেলেটি বোঠে বসে নি। জানলার দিকে মুখ, শিস্তন দিয়ে দাঁড়িয়ে সম্ভবত।

দীর্ঘ চেহারা। পরনে ধবধবে পাঞ্জাবি, তার ওপর শাল জড়ানো।

আশা গলায় একটা শব্দ করলেন।

ঘাড় ফিরল। ছেলেটি ঘুরে দাঁড়াল। মুখ দেখে মনে হল না বয়স খুব বেশী। দু চোখের দৃষ্টিতে, অবরোধের ওপারেও এখনও যেন বৈশাখের ঘ্রাণ।

ছেলেটি দুটি হাত যোড় করল। 'নমস্কার।'

আশা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। কৌচটা হাত দিয়ে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। এও কি সম্ভব! এত মিল হয় মানুষে মানুষে! এক রকমের মুখ চোখের তুলনা, বৈষ, এমন কি ডানদিকের গালের লাল তিলটি পর্যন্ত।

মনে হল, বেশ কয়েক বছরের ওলো পদা দু হাতে সরিয়ে সদ্যই যেন এসে দাঁড়িয়েছে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আশা বললেন, 'বসুন।'

ছেলেটি সোফার দিকে একটা হাত প্রসারিত করে বলল, 'আপনি?'

আশা চমকে উঠলেন। এক পলাশ ঘোর।

দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধা হচ্ছে বলে আশা বসে পড়লেন। ছেলেটিও বসল। বসে বলল, 'আমার নাম অভিতাভ বোস।'

বোস! সম্ভবও তো বোসই ছিল।

—'শুনলাম আপনি দেখা করতে এসে এসে ফিরে যাচ্ছেন। আমি খুব দুঃখিত। শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না।'

—'হ্যাঁ, আপনার লোক আমাকে সে কথা বলেছে।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা। তার মধ্যে আশা মন ঠিক করে নিলেন। প্রয়োজনের চেয়েও বেশী দৃঢ়তার প্রলেপ গায়ালেন কণ্ঠস্বরে।

—'আপনি বোধ হয় জানেন না, এই একমাসের অবসরে আমি ব্যবসা-সংক্রান্ত কোন কিছু আলোচনা করি না। এ সময়টা আমি পুরো বিশ্রাম নিই।'

সঙ্গে সঙ্গে অভিতাভ উত্তর দিল। সে কথা আমি শুনেছি। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে ব্যবসার কোন কথা বলতে আসি নি।'

—'তবে?'

—'আমার বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।'

—'আপনার বাবা?'

আশা বুঝতে পারলেন অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর স্বরের রূঢ়তা মুছে এসে গেছে। দূর কানে বোলতার গুঞ্জন শুনল। চোখের সামনে অন্ধকারের রেখা।

—'বাবার নাম শ্রীনিবাস বোস।'

ভাড়াটে চেষ্টার আশা শুনে ভদ্রলোক পারলেন, 'আমি তাঁকে চিনি?'

—'জানা চিনতে চাইবেন কিনা জানি না।'

প্রৌঢ় বয়সে সজল বোস হয়ে অর্থাভাবে পড়ে ছেলেকে সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছে। কি রকম যেন কঠিন হয়ে উঠল মন। আশা উঠে দাঁড়ালেন। মাথা ঝুলিয়ে, আমি ভদ্রলোককে ঠিক চিনতে পারলাম না। আপনি এবার আসুন।'

এতটার জন্য অভিভাবক ছোট হয়ে প্রস্তুত ছিল না। তবু শেষ চেষ্টা করল। 'বিশ্বাস করুন, আমি আপনার কাছে চাকরির বা অর্থ ভিক্ষা করতে আসি নি।'

ফিরতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন আশা। দৃঢ়নিশ্চয় কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আপনাকে বলায় তো আপনার বাবা সজল বোসকে আমি চিনি না। তাঁর কোন কথা শুনতে আমি বাধ্য নই। আপনি যেতে পারেন।'

ওপরের সিঁড়ির ধাপে পা রেখেই আশা থমকে দাঁড়ালেন।

—'মা।'

অভিভাত ডাকছে।

এ ডাক উপেক্ষা করার সাধ্য আশার নেই। কিন্তু এ ডাকে ধরা দিলেও সর্বনাশ। যে লড়াই মাথির ওপর আশা দাঁড়িয়ে আছেন, সে হার্ট হয়ে পড়বে। এত বড় ঘর তোলা সম্পদ, প্রতিপত্তি, ব্যবসা সব গুড়ো হয়ে যাবে।

সজলের গুরুত্বার শেষ নেই।

দুহাতে আশা ভিতরে চলে গেলেন।

তাদের কি নিষ্ঠুর অহং। যে চিন্তার কবল থেকে এত বছর ধরে তিনি বাঁচবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর অবচেতনে মুহূর্তে জমাট করে তুলেছিলেন অর্থাভাবের চেহারা, সেই চিন্তাটা পর আসলে তাঁকে গ্রাস করতে এল।

মেঝেকার পড়লেন সজল বোস। পিছনে কিসের ভিতির মালাটা শুধু নয়, আত্মসম্মানের দৃঢ়তাকে এক ঝোরায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে স্রোত।

আশার ইয়ারফ্রেন্ডে অনার্স ছিল, সেইজন্য সজল বোসের সঙ্গে তার যোগাযোগের সুযোগও বেশী।

আশা। আশা পালিত পড়লেন্দার ব্যাপারেই সজল বোসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

—'যাবার আগে তাঁর আমার বাড়ীতে ছেলে পড়ে আশা। যদিও তোমার আপত্তি বোঝ করি, তবুও সংকোচ করো না, চলে এস।'

প্রস্তাবে অনেক কারণ রেখে তারপর খুব জানতে আশা যেতে সজল বোসের বাড়ীতে।

এক সন্ধ্যায় সজলের বাড়ীর কাছা-কাছি আসতেই প্রচণ্ড বৃষ্টি। একেবারে অসহায়। আশা দ্রুত পা চালিয়েও বাঁচতে পারল না। একেবারে কাকভেজা অবস্থায় গিয়ে হাজির।

—'এমি, একেবারে ভিজে গেছ যে। যাও, যাও, পাড়ী ছেড়ে ফেল।'

কিন্তু জামাটা খুলেই সজল একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

পাড়ী ড্রাইভ ছেড়ে কি পরবে আশা? অভ্রতার অবাপকের বাড়ীর ছেলেদের পরিচ্ছন্ন থাকার কথা নয়। অথচ এভাবে ভিজে জামাকাপড়ে অসুখ করতে পারে।

আলমারি খুলে পাট ভাঙা পাজামা আর পাঞ্জাবি বের করে আশার হাতে তুলে দিতে সজল বলেছিলেন, 'নাও, বাথরুমে গিয়ে এগুলো পরে এস। তোমার পাড়ী ড্রাইভ ছেড়ে রাখ। আমি নিমাইকে বলছি শুকোবার ব্যবস্থা করে দেবে।'

মিনিট পনের পর আশা যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল তখন লজ্জায় সে মুখ তুলতে পারছে না।

আশার উপযুক্ত কম পুরুষের পোশাকে আবৃত করা অসম্ভব। নিজের দেহ নিজের কাছেই অসহনীয় ঠেকল। সজল বোসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগল।

চেঁচিয়ে ওঠার সজল বোস। সামনে খোলা বই। কিন্তু তাঁর চোখ বইয়ের পাতার ওপর নেই।

আশা নিশ্চয় নয়। এ ঘটনার অর্থ তিনি বুঝতে পারেন নি এমনও নয়। কিন্তু তাঁর কিছু করার ছিল না।

অন্তত দশ মিনিট কেটেছে মনে।

কাজেই বসুলাতে হবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বাড়ি নিয়ে গেল। অসহ্য অন্ধকার। মাঝে মাঝে শুধু বিদ্যুতের ঝিলিক...

...আশা অনুভব করেছিলেন বলিষ্ঠ দুটি বাহুর বন্ধনে তার দেহ বাঁধা...চীৎকার করার উপায় নেই। দুটি ওষ্ঠের চাপে তাঁর ওষ্ঠাধর নিষ্পীড়িত।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও আশা নিজেকে ছাড়তে পারেন নি। তার-পরে আশা অনেকদিন ভেবেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, সত্যিই কি তিনি ছাড়তে চেয়েছিলেন নিজেকে।

সেই শুরু।

সর্বনাশা খেলার নেশায় দুজনেই বিভোর।

তারপর একদিন দুই অসহায়ে আশা সজলকে ছাড়তে উঠলেন।

—'তাঁর আমাকে একা আর পালিয়ে হাত থেকে বাঁচাও।'

সজল হাসিমুখেই বলেছিল। হাতে ধরাছিল খোলা বইটা বন্ধ করে, বলেছিল, 'সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি পরীক্ষার জন্য তৈরি হও। আমি এক্সটারনাল পরীক্ষক হয়ে দিল্লী যাচ্ছি। ফিরবার পরে ফিরব। তারপর ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।'

আশা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু সজল আর ফেরেনি। দিল্লী থেকে অন্যেরিকা চলে গিয়েছিলেন।

পরীক্ষা শেষ হল। কি লিখলেন আশা নিজেই জানেন না। একটুও বুঝতে পারলেন আর কেরী করা সম্ভব নয়।

ডাক্তারকে ছেলেমেয়ে কেউ ছাড়া-হীন। মামার ব্যাপারে বাবা তোর থেকে রাত পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত। সেইজন্য আশার শারীরিক পরি-বর্তনের দিকে কারও দৃষ্টি পড়ে নি। কিন্তু আশা বুঝতে পেরেছিলেন, আর কিছুদিন পরেই কি-চাকরদের মধ্যে কানাকানি শুরু হবে। তার মুখে হাত চাপা দেবেন আশা!

ডিভানের অন্তর্বর্তিতে মুখে এ কথা একটা সমস্যাই নয়, কিন্তু আশা সাহস পেলেন না।

কিন্তু শুধুই কি সাহস। মাতৃত্বের অনুভূতি তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর দেহের প্রথা যে প্রাণ তিল তিল করে মুখ নিচ্ছে সে তো নিরাপদেরই।

কিন্তু স্থিরকে দাঁড়াতেই হবে না, তার একটা পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সমাজ সমর্থন করে এমন পরিচয়।

হাতের অন্ধকারে আশা বাড়ী ছেড়েছিলেন। উপেক্ষা পরিচিত পরি-বেশ থেকে দূরে সরে যাওয়া। তারপর কি করবেন জানা ছিল না।

মনের এই উপযুক্ততা নিয়েই যাত্র-পথে নেমে পড়েছিলেন। ছোট একটা স্টেশন। চারপাশে দূরের পাহাড় আর নিবিড় অরণ্যানী। নিজের ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহটা ট্রেন থেকে নিয়ে ওয়েটিং রুমের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছিলেন।

যখন ঘুম ভেঙেছিল, চোখের সামনে দেখেছিলেন, একটি ছাত্র স্রোত ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। পরনে সার্ট আর ফুল প্যান্ট। একটা সুটকেস খোলা চৌকির ওপর।

আশা উঠে বসে নিজের বিবস্ত্র বেশবাস ঠিক করে নিয়েছিলেন। এবার ভদ্রলোকের কি নিরীক্ষণ করছে শুনলেন। তার শরীরে অসহ্য মানুষের যে চিহ্ন ফুটে উঠেছে, তাকেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারই দর্শন করছে।

কথাটা মনে হতেই আশার দুটি ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপ কহতে, আপনি কি অসুস্থ?'

—'না, অসুস্থ নয়, ক্লান্ত।'

—'আপনার চোখ মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এই পরিত্যক্ত বর্জিত জায়গায় আপনি কেথায় এসেছিলেন?'

আশা প্রশ্নের উত্তর না দিলেও পারতেন। অন্য কারও কৌতূহল মেটাবার মতন মনের অবস্থা তাঁর ছিল না।

কিন্তু নিজের অবস্থার জন্য বিবেচনা করে আশা কঠোর হতে পারেন নি।

শুধু বলেছিলেন, 'ট্রেনে যেতে যেতে এখানকার পাহাড় অরণ্য খুব ভালো লেগে গেল, তাই নেমে পড়লাম।'

ভদ্রলোক হেসে উঠলো। তারপর বললো, 'আপনারা বাঙালীরা খুব ভাব প্রবণ হন।'

এতক্ষণ ভদ্রলোক বাংলাতেই কথা বলছিল। পরিষ্কার উচ্চারণ, বলার ভঙ্গী। এ কথার পর স্বভাবতই আশার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক অবাঙালী। আশা জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন তাঁর পরিচয়।

—'আমি সিন্ধি। আমার নাম রামকুমার চুগ। পেশায় জঙ্গলের ইজারাদার। নিবাস নাগপুরে। বছরে বেশ কয়েকবার এখানে আসি। শাল সেগুনের হিসাব রাখতে।'

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। ঠিক তার কি বলা যেতে পারে আশা ভেবে পেলেন না।

ভদ্রলোক বাংলা বেশ ভাল বলেন। সম্ভবত বাঙালীর রীতি নীতি সামা-জিকতার সঙ্গেও পরিচিত।

আশার সিঁথিতে সিঁদুর নেই, অথচ শরীরের এই অবস্থা, এই দুয়ের মধ্যে অসঙ্গতিটুকু যদি চোখে পড়ে...

—'আপনি যাবেন কোথায়?'

—'কলকাতা।'

—'কলকাতার ট্রেন তো রাত দশটায়।'

—'কলকাতায় আমি ফিরব না।' কিছু না ভেবেই আশা বলে ফেলেছিলেন।

—'ফিরবেন না?'

—'না, আমি চাকরির চেষ্টায় বের হয়েছি। একটা চাকরির আমার খুব প্রয়োজন।'

ভদ্রলোক দুটো চোখ কুঁচকে আবার কি নিরীক্ষণ করলেন। বুঝি যাচাই করতে চাইলেন আশার কথার সত্য মিথ্যা। তারপর বললেন, 'আপনি যদি নাগপুরে যেতে পারেন, তাহলে আপনার চাকরির একটা ব্যবস্থা হতে পারে। আমি বহুদিন ওখানে আছি। কিছু লোকের সঙ্গে জানা শোনাও রয়েছে।'

হয়তো উত্তাল সমুদ্রে সাদা একটা কুটো। সেই কুটোই আশা সম্বল করেছিলেন।

•

নাগপুরে রামকুমারের ছোট গোটা দুয়েক কারবার ছিল। সুতোর

বাঙালী, তখনকার সাধারণ এদেশী।

পরীর বিশ্বাসঘাতকতা কথায় আগেই আশা করেছিলেন। তবে কল্পনায় যা ভাঁড়ুরে। স্বামী বিদেশ ৭ মাস পরেই মারা গেছে দুর্ঘটনায়। স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে এতদিন ধরে মেরে বসে ছেলেছে।

রামকুমার এ কাহিনী বিশ্বাস করেছিল কিনা সে জানে, কিন্তু সে তার কোন প্রশ্ন তোলে নি। সন্দেহও করেনি।

আশাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়েছিল। আশা কথা সম্বন্ধে একটি পত্রে সন্তান প্রসব করেছিলেন। নবজাতকের বয়সের নাম দিয়েছিলেন গঙ্গার বোন।

ঠিক এমনই সময়ে আশা বুঝতে পেরেছিলেন, রামকুমার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। এ আকর্ষণ দেহের নয়, মনস্তত্ত্বের থেকে এর উৎপত্তি। যুবতী নারীর সব চেয়ে বড় শত্রু তার দেহ। এই পৃথিবীতে স্বামী-সুখের অভাব নেই, যারা আশার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাঁকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার জন্য উদগ্রীব।

একটা অবলম্বন হিসাবেই আশা এই অন্ধ বন্ধুর প্রস্তাবে নিরুৎসাহ করেন নি।

তারপর সময়ের হয়েছিল সন্তান।

রামকুমারের ইচ্ছা, সন্তান এ সংসারে প্রতিপালিত হবে। কিন্তু আশার তাতে ঘোরতর আপত্তি। একটা উচ্ছৃঙ্খল যৌনকামনার প্রতীক এই শিশু তার উপর যুবতীর কোমল বৃত্তি তিক্তিক নয়। সব চেয়ে বড় কথা, জীবনকে অস্বীকার করার জীবন্ত চিহ্ন একদিন তাদের সংসারে ঘোরাফেরা করবে, এটা আশা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবেন না।

ঠিক হয়েছিল এক অনাথ আশ্রমে কিশলয়ের তত্ত্বাবধানে সন্তান পালিত হবে। মাসে মাসে রামকুমার খরচ পাঠাবে।

তারপর অনেক বছর কেটেছে। রামকুমারের অকালে মৃত্যু হওয়ার কয়েকমাস আগে থেকে বম্বেতে উঠিয়ে আনা হয়েছে।

আশা অনেকক্ষণ বিভিন্ন অবস্থাটার সঙ্গে মিলে রামকুমার কাগজের মিলের পত্তন করেছেন। একটা কলারের উৎপাদনের কারখানাও।

এই সময়ে খবর এসেছিল। সন্তান বোনের বয়স বছরের সন্তান কিশলয়ের হেফাজত থেকে পালিয়ে গেছে। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন সুরাহা হয় নি। আশা ভেবেছিলেন এ সংবাদে, এবার একটা সংবাদে, তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করবেন। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর স্নায়ু শিরা যেমনার টান টান করে উঠেছিল। সন্তান শুধু সন্তান বোনের নয়, আশারও। এ সত্য অস্বীকার করা তো সম্ভব নয়।

কিশলয়ের লিখেছে, ছেলেটি তার পিতৃকুলের পরিচয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তাকে বলা হয়েছিল তার পিতা মৃত, মায়ের নাম আশার নির্দেশেই জানানো হয় নি।

তারপর সন্ধানের কথা আশা কিন্তুতে হয়েছিলেন। তারপরের দুর্ঘটনাতে নিজেকে বিশিষ্ট দিয়ে-ছিলেন।

এতদিন পরে পিছনের জীবন সামনে এসেছে। সন্তান বোনের ছেলে অভিতাভ বোস, জানি না এ নাম কে দিল তাকে, খুঁজে খুঁজে ঠিক মায়ের সন্ধান পেয়েছে।

তারপর সেই লম্পট, প্রতারকের প্রয়োজনার আশার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সন্তানের দাবী নিয়ে। জোটিপাতি আশা চুপানি নিজেকে। সে খবর সহজে কথা ঘুনাক্ষরে কিন্তু নয়। তাই সন্তানের হৃদয়হীন লোভের হাত বাড়িয়েছে।

আজ কেন অনেক বছর রামকুমার পর। হঠাৎ অফিসে কাজ করতে করতে মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল।

খুব শান্ত বিদায়।

লোকটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বন্ধনের চেয়েও কর্মজীবন বন্ধনই ছিল বেশী। কারবারের প্রয়োজনে তার উপদেশ, নির্দেশ খুব মূল্যবান।

সামলে নিতে আশা কিছু সময় নিয়েছিলেন।

এখন আশারও দেহে বয়সের ভার নেমেছে। বসিও বয়স, তোমাকে লালিত শরীরে প্রৌঢ়ত্বের ছোঁয়া, বয়সটা পড়া উচিত, পড়ে নি। কিন্তু বাইরের কর্মযোগাযোগ বজায় থাকলেও, ভিতরে ভিতরে যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

দেহ মনের ঠিক এমনই অবস্থায় অভিতাভর মা তার তাঁকে অনেক বিচলিত করে তুলেছিল।

বার বার অনেক সুযোগ করার চেষ্টা করেও পারেন নি। এমনই আত্ম-সম্মোহনের অপেক্ষাতেই বুঝি তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সারা জীবন।

কিন্তু এ মা তার উপেক্ষাযোগ্য। কোমল অনুভূতির কণ্ঠ পথে প্রকল্প করে ছেলে তার বাপের উপেক্ষা আশা চুপানির অর্থসম্পদ বুঝিয়ে দেয়া।

আশা সোজা ওপরে চলে এলেন।

অভিতাভ আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে। এক সময়ে এসে ফেরে তাকে যাবেই।

বার কয়েক মুখ প্রক্ষালন করলেই মুখটে পারবে এখানে সুবিধা হবে না। অকারণ দুশ্চিন্তার হতে যাবে।

দিন পনের আশা নিশ্চিন্ত। অভিতাভ নামের নির্লজ্জ ছেলেটা আর তাঁর ভিতের দৈবের নষ্ট করতে আসে নি। আশার স্থির বিশ্বাস, অভিতাভর সঙ্গে সঙ্গে বোসও এসেছে। আড়ালে থেকে কলকাঠি সেই নাড়াচ্ছে। কিন্তু কি করে বাপ আর ছেলের মিলন হল সেটাই আশার কাছে পরম বিস্ময়। বাপ হয়ত এই খবরই জানানো হয়েছিল অভিতাভকে। এমন হতে পারে বিদেশ থেকে সন্তান আশার জীবন-যাত্রার খোঁজ পেয়েছে। সুযোগ পেয়ে সেই হয়তো অভিতাভকে সাহিয়ে নিয়ে পেছে। উপেক্ষা, অভিমানে বাবার চেয়ে তাকে বন্ধুরা করবে।

কিন্তু আশার ভুল ভাঙতে দেরী হয় নি। চৌরাস্তার ওপর দেখিয়ে দেবার সময় চোখে পড়েছিল।

চলন্ত গাড়ীতে যা দেখে যে দেখে, তার ওপর অভিতাভ। দু হাতের তালুতে মুখ ঢাকা।

অনেকের জন্য আশা একটু স্থিরপ্রে হয়ে পড়েছিলেন। অভিতাভ অন্ধত্ব নয় তো! এভাবে বসে ছেলে।

অনেক পা এগিয়েই আশা তাকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। না, এগিয়ে দরকার নেই। দরকার নেই আবার তাকে পা বাড়িয়ে। দ্বন্দ্বদ্বন্দ্বের তারপরে এখনও অবসান হয় নি।

কিন্তু ফিরতে গিয়েই থামা। এই পাহাড়ী জায়গায় সন্ধ্যার অনেক আগেই অন্ধকার নামে। পথচারীর সংখ্যা কমে যায়। পথ যেন নির্জন। অভিতাভ কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—

—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার সম্পদ ঐশ্বর্যে কোন কিছুর ওপর আমার লোভ নেই। আর্থিক কোন সাহায্যই আমি চাই না। একটি খুব নিবেদন আছে।'

আশা নাকা বলবেন এবারে অভিতাভ একবারও মাত্র সম্বোধন করল না। তা ছাড়া টাকা পয়সার কথাও নয়, সেটা আবার স্পষ্টই স্বীকার করল। আশার মন কৌতূহলী হয়ে উঠল। ভ্রু কুঞ্চিত করে তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

—আপনাকে একবার রেবার কাছে যেতে হবে।'

—রেবা? কে রেবা?'

—রেবা আমার বাগদত্তা। অনেকদিন হল তার সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গতার বন্ধনে বাঁধা।'

—তা আমি যাব কেন? এতো তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

—'তবুও আছে মা। আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না।' এই প্রথম অভিতাভ মা বলল।

একটু থেমে, অনেক চিন্তা করে আশা বললেন, 'তোমার বাবাকে নিয়ে যাও তার কাছে। যা বলবার তিনিই বলতে পারবেন।'

আশাহত কণ্ঠ কণ্ঠে অভিতাভ বলল, বাবার কাছে রেবা ছিলেছিল। বাবা স্পষ্টই বলে দিয়েছে, আমি নাকি আপনাদের ছিলের বল নয়। এক অন্ধকার আমি জানাই। অন্ধকারই একা শুনে রেবা বেঁকে বসেছে।'

উত্তেজিত কণ্ঠে এতক্ষণে কথা বলল অভিতাভ একটু, সব নিল, তারপর অনেকে খুব্ বলল, 'খুব্তে পেরেছিলাম একবার আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন, তাই রেবাকে বুঝিয়ে ছিলাম, অভিমানে বাবা তাদেরকে হারিয়েছেন। কি বল-ছেন নিজেই জানেন না। আমার মা আছেন। তাঁর কাছ থেকে সঠিক কথাটা জানতে পারবে। খবর সংগ্রহ করেছিলাম, প্রতি বছর আপনি এখানে আসেন। তাই রেবাকে নিয়ে এখানে এসেছি। এটুকু কৃপা আমাকে করুন।'

অভিতাভর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আশা একেবারে খুব্ করেছিলেন।

এক অসহায় লোকানের আলোয় রাস্তা কলমল করছে। হঠাৎই অভিতাভ চেঁচিয়ে উঠল, রেবা।'

বিদায়ীর দিক থেকে যে তরুণী আসছিল, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রায় আশার মুখোমুখি।

আশা চোখ তুললেন, তারপর আর অনেকক্ষণ চোখ নামাতে পারলেন না।

বয়সে আশা খুবই সুন্দরী ছিলেন, এ গর্ব তাঁর ছিল। এখন যৌবনের যৌবনেও পার হয়ে এসেছেন। তাও মুখের অন্তরালে সারা দেহ ঝলমল করছে।

কিন্তু এ মেয়েটির মুখের তুলনা নেই, সৌন্দর্য আর অর্থাবা একাত্ম হয়ে রয়েছে। পদ্মবরণ বর্ণ, দীঘল উজ্জ্বল দুটি চোখ। কমনীয় লাবণ্যের নিষ্কলুষ।

অভিতাভ পরিচয় করিয়ে দিল 'এই আমার মা।'

রেবা এগিয়ে এসে নীচু হয়ে আশাকে প্রণাম করলো। 'মা, আপনার কাছে আসতে এসেছি। সঠিক কথাটা বলুন।'

মুখের ঠিক রাখবার চেষ্টা একটা কল্পনা। অনেক দিনের যৌবন কণের মুখ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে যেন। নাম, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি সবই পেয়েছেন আশা চুপানি কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পেয়েও পাননি। নিজের থেকে বয়সে অনেক বড় একজনের সঙ্গে খেলার বেঁধে-ছিলেন। তাঁর প্রতি যা ছিল, তা ভালবাসা নয়, কৃতজ্ঞতাবোধ।

এ মুহূর্তে তবুও মনের স্বপ্ন চুরমার করে দেবার অধিকার তাঁর নেই। ব্যবসার ব্যাপারে অনেক রকম মিথ্যা তো বলতে হয়, সে তুলনায় এ মিথ্যা প্রবল তুচ্ছ।

রেবাকে বুকে টেনে নিয়ে আশা বললেন, 'অভিতাভর বাবা যা বলেছেন, তা সঠিক নয় মা। অভিতাভ জারজ নয়। আমি তার মা।'

শেষ

# তিন তাসের খেলা

## কবিতা সিংহ

বেশ বেলা করেই আজ ঘুম ভাঙলো। ভাঙলো তো ভাঙলো, তাতে কী? জানবেন আমার জন্যতে আমি সব সময়েই কাজা। এই যে আমার বউ লক্ষ্মীর কাছে কিছুর মত দাঁড়িয়ে আছে, আপনারা ভাবছেন বুঝি রাত আড়াইটেতে ফিরেছি বলে ও আমার ওপর এক হাত নেবে? মোটেও না, বরং প্রাণি ওর ওপর দুশ্চিন্তা করছে।

কারণ ওই যে, আমি সব সময়েই কাজা। মেনে, আজা কথাটা ঠিক ঠেকল জোরালো হচ্ছে না এর আমাকে যদি হারমোনি, কিম্বা বোম্বেটে বলা যেত, তাহলে বোধহয় আরো ভালো শুনতে। কারণ আমি ওই রকমই। জোর করে আমার কাছ থেকে না পেলে কেড়ে-খুড়ে নিই। কি কুক্ষণেই যে ওই বউটিকে বেড়ে এনেছিলাম! —এখন কেবল আঙুল কামড়াচ্ছি! আর কী?

আপনারাই বলুন এই চার-পাঁচ বছরে যে আমার একটা আস্তুল ভুলে ফেলবার হবে তা আমিই বা জানবো কি করে? তখন গরীব, আমাদের না কি সব সাহেবরা বলেন আপনারা, আমি তাই। এক কোম্পানীর সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ। কোম্পানীটাও নেহাতই খার্ড ক্লাস। সুহাস বর্মনদের আমা মহলের ওই বাড়ন্ত স্কুলের মেয়েটাই তখন আমার কাছে আকাশের চাঁদ। ওর ঘরে আমাদের মধ্যে প্রেম হয়েছিল, আর আমার মতে ওর বাবা প্রেম-বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও ওকে দশ ভরি সোনা দিয়েছিল।

কিন্তু এই চার-পাঁচ বছরে আমি বেডরুমে ঢুকতে ঢুকতে ওপরে উঠেছি, সবকে সমঝে—বুঝলে না কেন চারটে চারকাঠি বললাম পাঁচটা ছাড়ে। এই যে লেটেস্টটা এখনে এসে আমার বউ সিলার আস্তুলে তার পর, ইলেকট্রিক ওভেন ছোবি না, এসে কি নিজের খেয়ে আমার লোভার ঘরও ছেড়েছে। এখন বোঝুন ও কতদূর ঘুরতে পারছে আমার বউ বলাবারও সময় এসেছে।

মানে। বউ আমি বলাম না। বউ আমার লাখি। আর লাখিলাখি। কাজের ঘরে না। বিয়ের পর আমার চেয়েও বছরে দশ বছরের ছোট হয়েও ও যা ছুটিয়ে ছিল, কখনো ভাবতে, ও হোয় বউ নয় তে—মোটর। আমি হেসে হেসে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথাটা ওকে বলা ছেড়েছিলাম। নতুন একটা ভালো চাকরির পাবার পর থেকে যখন বাড়িতে পার্টিতে এনজয়মেন্ট করতে বলতাম, ও তখন মেয়ে মেয়ে একলাম ছুরা করে ঘরে ঘিয়ে দাড়িয়ে একটা আইসক্রীমের মত মুখে লজ্জার ঘলাতে থাকত, তাহার সন্দু আমার তখন এক রাঁতি মনে-মনে পরামর্শ দিয়েছিল। বলেছিল এবার থেকে যা পার্টি দেবে সব নিজের বাড়িতে। খালি চাকা করে দিও, তারপর মেয়ে নিজে কি বাচ্চাও করে। সত্যি নিজের মত কিছু এন্টারটেইনিং মেয়েরা করে বলে আমাদের সমাজটা কিরকম করে ঘুণে টিকে আছে জানবেন। ভালো ছেলে নিয়ে আমরা কি করবো বলুন তো? ছাদে বসিয়ে দিলে আর কিছুই করবার উপায় নেই। ঘরে ঘুমে থাকুন লক্ষ্মণের ভালের মত। আর করো ছাদে যে পাঁচিয়ে দিয়ে বাঁচবেন সে উপায়ও নেই। সুতরাং মন্দ মন্দ করে বউ-এর কাছে মিন দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, "আমার বন্ধুরা তোমার মেলে টাপ্পা ছেলে যায়। তুমি একলা ওয়ার্ল্ড নও। এবার থেকে আমাদের সব পার্টি হবে নিজের বাড়িতে। তুমি যাবে, দেখবে, লিখবে।" সেই নিজারকেই তো একলার আমার জন্মদিনে খুব খুশি হয়ে আমার বউ-এর উপহার দেওয়া একটা দুশমি টাইপিনে ধান করে বিরোধিলাম।

একটু থামি। আমার বউ মেয়ের পক্ষপাত আনছে। মাথাটা ঘুরে গুরুত্ব ভার। আই নীড্ লাভ্, লুভ্!— শব্দটা আকাশের হাতে মিলায়। গলাটা আরো জড়কার। ভারী গলায় বললাম,—আজ রবিবার, আমি আর একটু ঘুমোবো, আমাকে ডিস্টার্ব করো না।" আমার বউ, মানে লতা, কোনো উত্তর না দিয়ে পিছন ফিরতেই হঠাৎ আমার মনে হলো ওর ডিমাকৃতি মুখে মাসুদ দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা কি? তিন মাসের জন্য মালিনা ছিয়ে-ছিলাম। তারপর মাসখানেক ছিলাম কুয়েত। ফিরেছি পরশু। পরশু সারা-দিন আফিসে। সারা সন্ধ্যা বসি আর ডিমিনের বাড়ি। খুব জিমখেলে স্বামী-স্ত্রী। খুশী জিমখেলে। আর কথা তো আমার জন্মদিনেই ছিল। পরশু এনাউন্স করেছি বাড়ি করে-ছিল ওদের ছাদটাই সেলিব্রেশনটা হবে। তাই কাল আফিস থেকে ফিরেই 'ডিমিনের বাড়ি। বাব আছ, ডিম। খুব্বই মিমি। মিমি এম মিমি এম মিমি। তারপর যে কখন বাড়িতে ঢুকেছি, ফিরবে নীচের বাহুরের গাড়ি দুটিকেই তা বউ-এর ঠিকুক মেরেছারাই জানে।

হ্যাঁ ওই জনেই বউ বলাম না। শ্রীলেকে বলাবো। ডিমিনের সঙ্গে আমার এখন তেমা হলে কথা বলি না। তিন আর আমে সে আফিস ছেড়ে আসবার সময় আমি ওকে একটা ডিমকাট দিয়ে এসেছি—ডিমু আর নয়। ডিমিনের পর লীনা, ডিমা, রেবা, ফেরদৌসী, মুক্তা কত এল, কত খেলা। আজ সমাজে এই সব জন্মুক মেয়েরা থাকে বলেই না সমাজটা এমন ভরে ঘুমে আছে। নাহলে আফিসে কাজ করতে করতে মোবে কার সঙ্গে দুটো মনের কথা জানা,

অফিস থেকে বেরিয়ে কার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কার আমি বড় দোস্তালি, কাকে কাটলেট খাওয়াতে খাওয়াতে হাত ধরে ফের আজ—খুশিই আমায় বাড়িয়ে দিল, —কাকে নৈশিহুতে ঘোরাতে ঘোরাতে আজ—তোমার মত আর কাউকে দেখলাম না।' কি, আরো বাড়বো? আরো আজ? কতদূর যাবো? চন্দ্রবিন্দু ছেড়ে দেওয়া?

আমি তাই অবিশ্বাস্য চোখাবার ওই মেরেটিকে মনে আনো অন্ধকারে চুল ওর সুখের দেখা আজার কটাটকে অন্যের সুরে আজার,—'কাল আমার জন্মদিন ছিল, কই তুমি তো কিছু বললে না।"

আমার যদি তেমনো উত্তর না দিলেই যেমন বেরিয়ে যাচ্ছিল তেমনি চলে যেতে। একবারও ফিরে তাকাল না।

বাথরুমটা খুলে ফেলে একবার। আমি হলাম আমার জন্মদিনের রাজা। আমার জন্মদিনটা এখন সেলেব্রেট করব। ডুবে আছিলাম। আমি আছিলে পা রাখলেই আমার লম্পটে সারা আছিল নাচতে থাকে। আমি কোনো প্রতিবেশীর আজ থেকেই সে সমুদ্রের দেখ ছোটটার মত আমার গায়ে আজড়ে পড়ে। আর আমার বউ?

যাকে গত আজও আমি বলেছি—আজো, তোমাকে আমার আসিয়া মনে হয়, বলেছি—'আমার সব গার্ল ফ্রেন্ড, প্রাক্তনেরা, তোমার মত এমনিক পাশ নয়,—বলেছি একেবারে নিজের বাসের বাড়ির বারান্দাটি পুছিয়ে ছেড়ি হয়ে থাকবে, যে কোনো মুহূর্তেই তাকিয়ে দিতে পারি, সেই রাখা পুছে সব সহ্য করা যাই, সব সহ্য করে আমার আমার সংসার, পুরো আজা একম জন্মদিনে নিজা নতুন উপহার দেওয়া যাই, যে উপহার পর্যন্তিতে হারিয়ে এল, কিংবা বিস্ময়ে দিলে হাসি মুখে সব সহ্য করা যাই.. হয়ে!

বাঁচান! বাঁচান! বাথরুমটা একটু খাঁচিয়ে বেরুতে দিন। আমি বিবাহের বন্ধু, ব্যক্তি পাতি সেই সালের বেলেঘাটার, ক্লিনটন নামটাকে পার্টি, ঠিক যেমন পার্টির মতোই-এর বিজ্ঞাপনের পুরোনোর দেখে তেমনি নটবর নজরানা আমার—কিন্তু আসলে তো আমি বেলেঘাটে। আমি হারমান।

আমি বেলুইন—আমি চেম্পিয়ন! আমার মুখে বেলানো থাকে অন্যরা চৌদ্দর মালা। কাঁধে ভারী বন্দুক। আমার হাত থেকে কিসমিসটা আসলে একটা লম্বি মোড়া কিংবা মুখে রাজহাঁসও হাতে পালায় সেই আমি...

আমি খাড়া হয়ে বসলাম। জন্মদিন আজা...! লতা! আজ কিছু না কেন?" আসলে যে আমার তা মুখে তে আমাদেও অনুমান করা যায় না তাই বলার না। এমন মুহূর্তেতে কার হয়। লতা এল। টাকা আমার আজ,—'আজো মেরে মুখ আজা? কেন? হয়ান? অনুভোজন কাঁচ করে নাচ কি?' —হলে কারণে উত্তর সেই কেন! আমার জন্মদিনে তুমি কি মুখোমুখিলে?'

হয়ান লতা বলে উঠল—'কাল তোমার সাঁচালের জন্মদিন নয়! ওটাতো কেবল চার্চকের সার্টিফিকেটের জিনো তারিখ।'

আমি ছড়কে গেলাম। চুপ করলাম —'তুমি কি করে জানলে?'—খানিকপরে তোমার বাড়ের একখানা পুরোনো খাতা খুলে দেখেছি।'

—আমে?'

—তোমারা হাসলও মত' সেটাও লেখা আছে—'

আমি একম উঠে দাঁড়ালাম। আমার দু হাতের আঙুল সাঁড়াশির মত বেঁকে বেঁকে যাচ্ছিল। লতা একটু পিছু হটে গিয়ে বলল 'পাশের ফ্লাটে এক আনমারেডের ইয়ং ডক্টরেট থাকেন। তোমার বন্দু বাঁধন মত। খুব নিমাজেন্ট! তাঁকে আমি ধরলার বাড়ি কাঁদিয়ে রেখেছি—'

আমি হতাশ হয়ে বসে পড়লাম। তাঁমিল ঠিক শিকারেই বিছানা ছিল। জানলার বড় বড় পর্দা সরিয়ে সরিয়ে লতা বলল,—'তোমার আরো তিনটা জিনো জন্মদিনে আমি যেন কী কী নিরেছিলাম,'—এর মু ফুলতে গেল।

আমার এই বন্ধুকালার ফ্লাটের কাঁচের জানলা দিয়ে উপরে সূর্যের পীচ ওর মুখে পড়াছিল। আমি দেখলাম ওর মু ফোঁচকানোর ভঙ্গিটা ঠিক জিনার মত লাগছে। কেন? কেন? আমার বিশ্বিত চোখ কেন জিনা লতা কি সর্বনিন্দী করছে। ওর মু মুছে যাওয়ানোর সেই চোখের মুখের দুর্দিটা আর নেই। সেই বিশ্বিত ঘন দুটি দুই নেই। নিটোল-সিমান্তের হাতে পড়ে ওর মু মুছে যাওয়ানো,ফুটে পাঁচমার একটি, কি নাম, কমলালেবু জানবা। দুদু দুটি দুধের মত সদু। আমি রেখে দিয়ে বললাম—'তুমি তোকলে দিয়ে মুছে আজ করেছ?'

লতা বলল —'মুছে মুছে? কেন্দা না আমি কি পার্টির মতে দেখি, আমার স্তনে পাউডার চর্চা করে দেয়,—আমার মুখে রাসিকিও কথা, দুদু সেই বন্দু, কিন্তু তোমাকে তো জানো?...এখন আর তোমার বন্দুরা আমার সেটা বলে না। আমি তোমার সব বন্ধুবী আর মেরে মেরিদুলের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছি। হাঁ এবন কি জিজার সঙ্গেও। পাশের ফ্লাটের ডেমনদুর কাছে আমি স্পেশলস ইঞ্জেকশন নিয়েছি।'

আমি বললাম—'যে তোমার অনুর্যামি নিয়েছে?'

লতা একটি হাত তোমার মুখের মত করে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'আমার বাচ্চা, আমার আমার নিজস্ব টাকে, মহীশ্রু। সেদিন তুমি একবারও প্রাণের প্রশ্নটে পার্টি না। আমেরী বলে দি, আমি কেবলই তোমারই পরম মত আর কাছে চেয়েছি আর কিছুই না কিছুই না।...হাঁ কি যেন বলছিলাম ' জন্মদিনের উপহার না? তুমি আমিকে চুলীর চৌদ্দিনটা দেওয়েল, তাই তুমি সেটা বিলিয়ে দিয়েছিল, তোমার অফিসের মত একটা চৌদ্দিন চাই—মাথে সোনার খাঁচে একটা পাখার পাখী বসে। তাই না? পরের বার তোমার দিয়েছিলাম একটা নাইলন উলের কার্ডিগান। তোমার পছন্দ হয়নি। তাই সেটা তুমি দিয়ে দিয়েছিলে মুন্নার আয়ী পুলকেশকে। পুলকেশের একটা কাশিরী শাল তোমার পছন্দ হয়েছিল তাই না? আর তার পরের বার, তুমি আজতেই ছিলে না তাই কিছু দেওয়া হয় নি। আর এবার? এবারও আমি তোমার কিছু দেব। বিশেষ জন্মদিন জেনেও কিছু দেবোই।

আমি কি বলব? আমি রাজা, আমি বোম্বেটে, হামলার, বেপরোয়া, চেঙ্গিস। কিন্তু মুখের বিষয়, আমি আজকাল একটা ন্যাড়ে। যার সঙ্গার কি না অফেন্স নিবারণের এক ব্রহ্মাস্ত্র দাঁড়িয়ে পারবো দিয়ে। না হলে ওই লতাকে—অবে ওর ওই কথার পাঁচ আঙুলের দাগ. ওর পাঁচুটে মুছে দেহ...নোয়ার আমি বলে, নোয়ার ওর পুরো আজা মত উপহারের জন্য আমার এত চিন্তা বলে...

—'কই কি দেবো খুলবে না, তোমার আশ্চর্য করে দেবো। কাল অফিস থেকে বেরিয়ে বাঁধন সাথে একটা এমন কাঁচ্চমন করা যেসেছো-ছের মনেছিলে না?'

—'হ্যাঁ, তুমি কি করে জানলে?'

—'বাঁধনকে বলেছিলে তিন শ টাকা দিচ্ছি, তোমার পছন্দমতো জোলা মেরের জন্য যাও!'

—'বলেছিলাম। কিন্তু তুমি?'

—'তুমি একম টাকার নোটে ছিঁড়ে করে রাখবা। সবচে তিনটে ন্যোটা হয়ে না?'

—'হ্যাঁ বাঁধ, কিন্তু...'

—'বাঁধ তিনম টাকার নোট নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর তুমি, তুমি গিয়েছিলে নিজির ঘরে, তাই না?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি?'

—'তোমার, লতা আমার জিজার মত মু ফোঁচকালো, পিতার মত হাসল ঠোঁট বেঁকিয়ে। —'আমি জেনেছি তোমার মুখে জেকে' অর্থাৎ বাঁধন মুখে। আমি তোমার বড় বড় কটিন, বড় অবাস্তব চাহনা নিয়েছিলাম। ওখানে কিছু নেই। ওরও না, বাঁধনেও না। তা ছাড়া তোমার মত স্বামীর সঙ্গে, ফেলুদের সঙ্গে থেকতে গিয়ে হারমেও আমি প্রস্তুত নই। তাই শুধু পছন্দটা বেছে নিয়েছিলাম। তোমার গার্ল ফ্রেন্ডদের পছ। নিয়ে তেমনার ও বাজারে আমি গিয়ে পড়লে কাঁপাটিশনে সবাই হেরে যাবে ..তোমার ওই পিতা, মাতৃ, নিজা, কেতকী, মুন্না, মিমি সবাই, সবাই

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার ভিতরে কি সব ভাঙচুর করে কেউ পড়াছিল।

হাত বাড়িয়ে বললাম—'দেরো লতা...'

লতা সোদু হাটতে হাটতে বলল, স্যাঁচিত, তোমার ঘর স্বাভাবিক কেবার মতও আর যে আমার কিছু বাঁও নেই। কেবল তোমার নিজো জন্মদিনের উপহার আমার বুধারে রাখি নিজে নিও .'

আমি আরো একিয়ে খেলাম—'দেরো, লতা, দেরো .'

লতার আঙুলের কোমলস্পর্শও তখন আমার সমস্ত থেকে মিলিয়ে গেছে।

লতা এখন কি প্রহরের আজরে?

আমি ছুটে খেলাম লতার দেবার ঘরে। তার কেরাজের ড্রয়ার খুললাম.

ঘরে ঘরে সাজানো ওকের আমি যা যা ফেরেছিলাম সব। সব. জলেরের পরার চৌদ্দিন, মুন্নার আয়ীর কাশিরী শাল প্রায় তিনখানা আমার ঠোঁটলেনের সঙ্গে ছিঁ। ওরা একম টাকার নোট

আমি ছুটে বাঁধিকোরে বেরিয়ে এলাম। অন্ধকার করে ঝাঁ ঝাঁ করছে পথ। পাশের ফ্লাটের ডক্টরেটও বেরিয়ে এলেন, একজন বৃদ্ধ ছাড়া এর বেওয়া লোক। নীচে ফাঁকা ট্রিকার টাঁয়ে। কারণ আমাদের লাক্সারি ফ্লাটটা চৌরঙ্গির অনবরুদ্ধে পাড়ার।

চাঁকি দিয়ে বেরোনোর আমার মেন্দুড়ে লতার সেইটা হেনেই মুটোপাশে আছড়ে পড়ল এবং একটা সিমুরে চলাচলের বেশবেগিন ভাঙ্গর ক্লাবে।

শেষ চলাটা হলেই লতাই ছিল।

শেষ

# সিঁড়িতে ভয়ংকর

## শংকর চট্টোপাধ্যায়

অলংকরণ — প্রণবেশ বিশ্বাস

ভর সন্ধেবেলা ছিল হলের ছাদটাই কি মনোরম লোভের! সারাদিনটা দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ী সিঁড়িতে পা রেখেই হাউমাউ করে উঠল। গ্রীষ্মকাল বলে ঘোলাটেলার মতো বলে সিঁড়িতে আলোর ব্যবস্থা নেই। প্রথম দিকে দুচারটে বাল্ব লাগানো হয়েছিল। লাগবেনার পর এক বেলার মধ্যে সেগুলো লোপাট হয়ে যাওয়াতে বাড়িওয়ালা আর পা করেনি। যাকে মধ্যে দু এক ঘর ভাড়াটে লখ করে নিজেদের দরজার মুখে লাগিয়েছিল। সেগুলোও দেছে সময় মত। চেনা সিঁড়িতে তাই আর এখন আলোর ব্যবস্থা নেই। শুধু তেতলার ভাড়াটে মধুসূদনরা নিজেদের দরজার মুখে জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছে একটা। বাইরের মানুষজন এলে জ্বালায়।

আজ সারাদিন কড় বৃষ্টি দেছে সমানে। দূরত্বে থেকে তাই সিঁড়িটা রহস্যময় হয়ে আছে। সিঁড়ির মুখে পা রেখে রেবার হিলহিলে ছায়াটা সড়াৎ করে ডুবে দিল আঁধারে। মনলা হাউমাউ করে উঠল। গলাটা এমনিতে খোনা মনলার। স্বরটা তাই উঁচু হয়ে না উঠে, হুড়হুড়ে করে ছেড়ে গেল দোতলার মুখে। ঘটনাটা চারতলা পর্যন্ত চাউর হতে তাই সময় নিল কিছুটা।

অন্য সময় ঐটুকুতেই একটা চৈ চৈ যেত। কিন্তু তার আগেই পর পর দুটো ঘটনা ঘটল। ঝুপ্ করে আলোটা নিভল প্রথমে, তারপর পর পর দুটো পটকা ফাটার আওয়াজ হল মোড়ের মাথার। পাড়ার নন্দুকে কেন্দ্র করে আগুনেটা সকাল থেকেই ধোঁয়াচ্ছিল। কড় বৃষ্টির দরুন বিকেল পর্যন্ত আটকে ছিল। বৃষ্টিটা কিপ্ কিপ্ হতেই পটকা দুটো ফাটল। সহরতলী বলে পটকা বাজপালার তেতর দিয়ে এসে চার-তলা পর্যন্ত লম্বালম্বি লাফিয়ে উঠে ফুরিয়ে গেল। শব্দের উৎস বসটানোর দিকটা বুঝতে অসুবিধে কেউটেরা কিন্তু ঠিক টাক টেঁচিয়ে সিঁড়িতে।

—বলব, বলব করেও তোমাকে একটা কথা বলা হচ্ছে না সুপ্রিয়াদি। চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না—'

সুপ্রিয়ার মনে হল, কথা বলতে গিয়ে তেতলার রেবার গলাটা কেন চিরে গেল।

চারতলার ফ্লাট বলে ছয়ের চিলতে সিঁড়ি ঘরটা সুপ্রিয়াদের দখলে। বাড়ির লোক দিয়ে ঘরটাকে নিয়ম করে পরিষ্কার করায় সুপ্রিয়া। ঝড়-বাদলার দিনে মাঝে মাঝে রেড়া দেতে এখানটায় বসে বৃষ্টি দেখে সে। অন্যকাল রেবা প্রায় বিকেলে ছাদে উঠে আসে। বাইরে না বেরুলে সুপ্রিয়াও তার সঙ্গে ছাদে বেড়ায়। চাটা আসিনে ঘরে। আজ ঝড় বৃষ্টির জন্যে তারা মোড়া পেতে ছাদের ঘরটায় বসে ছিল বৃষ্টির ছাট বাঁচিয়ে। ছয়ের ঘরজাটা খুলে রেখে খুব হাওয়া খাচ্ছিল। পটকা ফাটার শব্দটা ফুরিয়ে যেতেই রেবা কথাটা শুরু করল।

এমনিতে বড় চাপা মেয়ে রেবা। সহজে মুখ খোলে না। তার ওপর নিজের খারাপ চেহারার জন্যে একটু কুণ্ঠার ভাব আছে। কালো, গাঁট উঁচু আর ছিলছিলে লম্বা। টেনে-টুনে বি.এ.টা কোনরকমে পাস করে বাড়িতে বসে আছে। সুপ্রিয়ার তাই রেবার প্রতি একটু মায়া আছে।

নিজের ভাবনায় ডুবে ছিল সুপ্রিয়া। রেবার কথার উত্তরে হাল্কা-ভাবে বলল, 'বলা না। প্রেমে পড়েছিস নাকি?'

রেবা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

—'বল না। লজ্জা কি?' বলে অন্ধকারে টান করে তাকায় সুপ্রিয়া। নিরুপ রেবা এবার বোধ হয় মরিয়া হয়ে মাথাটা তুলে তাকায়। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না তবে আন্দাজ করে সুপ্রিয়া।

—'বাপাচাটা লজ্জার। তুমি আমার বন্ধু, সুপ্রিয়াদি। আমার ভালো চাও, তবু তোমাকে বলতেও লজ্জা করে।'

এতক্ষণ বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি সুপ্রিয়া। এখন একটু নড়েচড়ে বসল। বলল, 'আমাকে সব খুলে বল।'

—'কি যে বলব বুঝতে পারছি না।...তবে একজন তাউকে তো বলতেই হবে। কিন্তু...'

কান্না আর হতাশার গলায় স্বরটা ভারী হয়ে গেল রেবার।

—'মাত্র মাস তিনেকের চেনা সুপ্রিয়াদি...আমি যে পাড়ায় টাইপ শিখতে যাই সেই পাড়ার ছেলে। মাস্তান গোছের। টাইপ স্কুলে যাওয়ার সময় রোজ পানের দোকান-টার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে আওয়াজ দিত। প্রথম দিকে মনে হতো আমি তো খারাপ দেখতে আমাকে কেন বলবে। দিন কয়েক ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম ছেলেটার আওয়াজের লক্ষ আমিই। অবাক হলাম, আবার ভালোও লাগলো। জীবনে কোনো ছেলে তো কখনও আমাকে লক্ষ করেনি ঐ একজন ছাড়া।'

ঝিড় ঝিড় করে ঝিরঝিরে ঝরার নিজের কথা বলে যাচ্ছে রেবা। অন্ধকারে কিপ্ কিপ্ বৃষ্টির ফোটা পড়ছে এক নাগাড়ে। তার সঙ্গে হাওয়া।

—'সুপ্রিয়াদি, ছেলেটা কখন আমার কাছে চাইলো আমি কিছুতে বোঝাতে

পারলাম না। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, সব পরিস্থিতিগুলো জেনেও আমি ওকে বাধা দিতে পারলাম না। কেবলই মনে হল, ওর আগে কেউ তো আমাকে সামান্য নারী বলেও ভুলে যেতে কোনোদিন। যে দিল তাকে ফেরানো কোন মুখে। আমি পাগল হয়ে গেলাম।'

বেবার গলাটা কান্নায় ভারী শোনালো। নিঃশ্বাসটা রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সুপ্রিয়া নত চোখে কোনরকমে বলল,—ভুই, বুনি, আমার ছেলেটার ঠিকানা দে। আমি যে করে পারি একটা ব্যবস্থা করব। বাবার বন্ধুরা কু একজন বাইরে আছে। ঠিকানা দে আমি ওদের দিয়ে সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলব।'

—আর তা হয় না সুপ্রিয়াদি। ওতো আর বেঁচে নেই। পরশুদিন বেপাড়ায় হত্যে করতে গিয়ে মারা গেছে। আমি পাকা খবর পেয়েছি।'

খোলা দরজা দিয়ে হাওয়া এসে বেবার মুখের কথাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে আরো এক পোঁচ কালি জমেছে। কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়। হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সুপ্রিয়া। বোকা গেল না ঠিক কোথায় গিয়ে ঠেকল। ভেবা কুঁকড়ে পড়ে থাকা একটা হাত টানার মুখটা চেপে ধরল—

—কি করব সুপ্রিয়াদি...আমি কি করব?'

বুকের ভেতরটা আজ মাস দুয়েক ধরেই গুমোট হয়ে আছে সুপ্রিয়ার। বড়লোক শাশুড়ি আজ মাস দুয়েক ধরে বাড়ি ছাড়া। কী যে করবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অথচ ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল ছাত্র, ভালো কলেজের অধ্যাপক, সুখের জীবন। কিন্তু সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে কিসের টানে যে কোথায় উধাও হলো। শাশুড়ির চলে যাওয়ার পর থেকে একটা শৌক হয়ে গেল মার। বাবাও কেমন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে লাগল। বাড়ির মধ্যে একমাত্র সুপ্রিয়াই যা একটু শক্ত। ভেতরে ভেতরে ভাঙলেও বাইরে কিছু প্রকাশ করছে না। বেবার ফটোটা পাই আরো একটু নাড়িয়ে দিল তাকে।

—ভুই কি সিওর যে ভুই প্রেগনেন্ট?'

—লক্ষণগুলো সব তো ভালো করে বুঝি না।...মনে হয়...তবু করে।'

নিঃশ্বাসে ভেজা গলার স্বরটা এবার পুরোপুরি ভেঙে গেল বেবার।

—কাল ভুই আমার সঙ্গে হাসপাতালে চল...ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে নেব...অনেক সময় এসব ব্যাপার তো মিথ্যেও প্রমাণ হয়।'

—প্রার্থনা করো সুপ্রিয়াদি...আমার কপালটা যেন মিথ্যে হয়।'

আবছায়ার জলে লক্ষণগুলো ভালো করে শোনা গেল না। সুপ্রিয়া বেবাকে বলল—

—তুমি পাশের...সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নিজের মুখের কথাটা বড় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো সুপ্রিয়ার। হোক, তাই হোক, সব সেই আগের মত ঠিকঠাক হয়ে যাক। বাবা ফিরে আসুক, বেবার ভাঙা মিথ্যে প্রমাণিত হোক। কিন্তু হবে কি তা? হয় কি কখনও?

সাপটা কিন্তু বেকট বেকট ঘোরালো সিঁড়িতে গা বাড়িয়েছে। অনেক কালের চর্বিজমা ভারী শরীর টেনে তুলতেও কষ্ট হচ্ছিল তার।

আর বিকেলে খোকার খবরটা নিয়ে মিলনীদের আসবার কথা। কিন্তু দিনটা যা পড়েছে তাতে কি ও শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে। যা কড় বৃষ্টির হয়ে সকাল থেকে। আলোটাও নিভেছে তার উপর পাইকার শব্দও যেন শোনা যাচ্ছে একটু আগে। কি যে দিনকাল পড়েছে। কিছুই বুঝি না। এতকালের জীবনে ওলোট পালোট তো কম দেখলাম না কিন্তু এরকমটা দেখেছি বলে তো কই মনে পড়ছে না। চারপাশটাই কেমন বিঁধিয়ে যাচ্ছে। কিছুই যেন আর ঠিকঠাক নেই আজো। এ বাড়িতেই তো একসঙ্গে চারটে পরিবার পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু কোনো পরিবারের শান্তি মনে হলে তো মনে হয় না। সব যেন উল্টোটাই দেখি। অশান্তি আর গণ্ডগোল।

তবে এতকাল আমার ঘর সংসারটাই ছিল এপাড়ার আকর্ষণস্থল। শোক-তাপ বা দুঃখ দুর্দশা ছিল না বললেই চলে। লোকজন মনে মনে কত না হিংসে করত। মুখে কেউ বলে নি কিন্তু টের পেতাম। আমার বাপের বাড়ি বা শ্বশুরে বাড়ির লোকজন এ বাড়িতে এসে যেন ভালো করে মুখ খুলতে পারত না। মুখে চেয়ে চেয়ে চারপাশ দেখত, আমার ছেলে মেয়েদের কিসব খোঁজ খবর নিত। যেই আমি ওদের এক একটা ফরমাশের খবর দিতাম অমনি মুখ কালো করে বলত—তোমার মত সুখী আর এই বিশ্ব সংসারে কজন আছে। আমি ওদের সে কথার আর কি উত্তর দেবো? শুনে হাসতাম। মুখে যদিও বলতাম তোমরা অতখানি বলছ মুখ আমার ততখানি নয়। কিন্তু ছেলেটাকে তো বিদেশে রাজী করাতে পারলাম না এখনও। বাড়ির বড় ছেলে সে বছরই দুয়েক ছোক ফিরে একটা না দিতে পারলে খুড়ো একটা ছেড়েই যায়।

ওদের মুখে মেয়েই মিথ্যে সুখের কথাটা বলতাম। কিন্তু মনে মনে তো জানি খোকার পাড়ী ঠিক কবেই যাবে। মিলনীদের ঘিসিসটা দেওয়া হলেই ওদের ফিরে হবে। মাঝখানে মত মেয়ে জীবনে দু চারটের বেশী দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। খুকুটার বিয়ের? কথা এখন ভাবি না। সামনের বছর ফাইনাল দেবে। তারপর যদি বিদেশে যায় তাহলে তো আরো অনেকটা বছর পিছিয়ে যাবে। তা থাক। ফিরে হলেই তো পর ঘরে যাবে খুকী। তার থেকে যতদিন কাছে আছে ততদিনই লাভ। ছেলের আমার মুখে সুখে আছে ফিরে হতে কোনোদিন-ই আটকাবে না।

কিন্তু খোকাটা এমন করল কেন? কাজটা তো শত্রুর মত করল। সবার মুখে ছেলে নাকি আমার ধান্দাবাজ হয়েছে। লোকে ভালোবাসে গ্রহক। তা এই কি সে ভালোবাসার নমুনা। পাজীটা ফিরে আসুক একবার, আচ্ছা করে বকুনি দেবো, বলব, হাবির খোকা, এই কি তোর ভালোবাসার নমুনা।

ছেলে দেখেছি তো কত ফন্দাই কিন্তু খোকা চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে কি আর মুখ দিয়ে কথা বেরুবে আমার। তবে ও হলো চিরকেলে পাগল। সবাই যে পথে যাবে ও ঠিক তার উল্টো পথটা ধরবে। তার আমাকে রাজিয়ে দিতে পারলে ও আর কিছু চায় না। যা যেন ওর খেলার বস্তু। তবে খুকী সুন্দরে যে কথাটা বলল সে কথাটা ঠিক। এই কিছুদিন হলো ও কেমন পাল্টে যাচ্ছিল। লক্ষ্য যে করি নি তা নয়। বাড়িতে যতটুকু থাকত সারাক্ষণই গম্ভীর মুখে বই পড়ত। আগের মত গলা ছেড়ে গানও গাইতো না বা যখন তখন আড্ডা জমাতো না বন্ধুবান্ধবের। ভাবতাম ও হয়ত কোনো থিসিস টিসিস লেখার জন্য ভাবছে। এইটুকু বয়সের জন্যে কতগুলো মোটা মোটা বই নিল। বিদেশের কাজের ওর বই নিয়ে কত লেখালেখি হলো। আমি তো সব বুঝি না। অবশ্যিই আজকে আমি খালি চাল ডাল তেল নুনের দাম আর মাসের খরচা বুঝি। ওর বাবা আমাকে কত কিছু বোঝালো। কিছু বুঝলাম কিছু বুঝলাম না। তবে এটুকু বুঝলাম আমার খোকা বলজন পণ্ডিতের একজন হয়েছে।

মুখে গম্ভীর করেই থাকুক তবু বাড়িতেই তো ছিল। আমার চোখ ছাড়া তো হয়নি। কিন্তু তারপর কি হলো। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে দুম করে বাড়ি ছেড়ে উধাও হলো এক লফ্কায়ে। সেই যে গেল আর ফিরল না। চারপাশে কত খবর নেওয়া হলো। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। শেষে ওর বন্ধু রুদ্রবীরকে ছেপে ধরতে সব বেরুলো। শুনে তো আমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। বুকের ভিতরে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করলাম। অজ্ঞানে আমি জ্ঞান হারালাম।

সেই যে বিছানায় শুলাম আর উঠিনি। প্রায় ছেড়েক তো এই

রাজকিশ্ন কানন

বিছানায় শুয়েই আছে। শুয়ে শুয়েই বেশ্বের পাশ্বি আমার সুখের সংসারটা তছনছ হয়ে যাচ্ছে। তা যাক, কিন্তু খোকা ফিরে আসুক। খোকা ফিরে এলে আবার আমার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

জিপীসটা কিন্তু কথা দিয়ে খোকার খবরটা এনে দেবে তাকে। জিপীস ভালো ছেলে, কথার খেলাপ করবে না। কিন্তু এখনও তো আসছে না ও! আমার বুকের ভেতর পুরোনো আষাঢ়ী যে আবার টিপটিপ দিয়ে উঠছে। আর জিপীস, একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয় বাবা। তোর কাছে আমি কিছু শুনতে চাইনা জিপীস, শুধু বল, খোকা আমার ভালো আছে।

সকালের উঠে মাসটা হাঁফাতে লাগল। সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রমে তার চাঁপাজবা বরাবরটা ভারী হয়ে গেছে। চেনা জিনিটা মেলে সে বাড়ির আর-হাওয়াটা বুঝতে চেষ্টা করল।

—তুই, তুই একটা জানোয়ার।'

একটু কুজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাল হোসেনার আদি। জঠরের জ্বালার সারা দেওয়াল জুড়ে তার ছায়াটা সিকারের উপর বাঘ দেওয়ার মতন দাঁড়িয়ে।

—তোকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতেও ঘেন্না হয়।'

কথা বলবার সময় থরথর করে কাঁপছিল সে।

রবিও একটু একটু টলছে। দুপুরে বাসুরে বোঝাই সে ভয়ঙ্কর ট্রেন এসেছে। আজ খাল পাড়ের পক্ষতে মোটা টাকা দেবার কথা আছে। অনেকদিন আগে নয় কাল বলে ঘুরিয়েছে। টাকাটা আজ দেবে বলে দিবি ছেলে তবে কাল ছাড়া পেয়েছে। নইলে কাল রাতেই কথাটা যেমন ঘোরালো হয়ে পাকিয়েছিল তাতে রবিকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হতো না। কালাচাঁর খুন ধরেছে আজকে পাকিয়েছিল। পদ্ম মাঝখান থেকে এসে না পড়লে রবির আর নিস্তার ছিল না কিছুতে। আজ সকাল থেকে তাই বুড়োর কাছ থেকে টাকাটা হাতানোর ফিকিরে ছিল। কিন্তু বড় শক্ত পার্টি বুড়ো। কত ছেলেও সে আর রবিকে একটা পয়সা ছোঁয়াবেনা। ছেবে ছেবে শেষ পর্যন্ত মাথাটা গরম হয়ে গেল। তাই দুপুরে বেরিয়ে দু চোক গলায় ঢেলে তবে শান্তি। সেটে পড়তে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আর তখনই মনে পড়ল কথাটা। ষষ্ঠ বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় বুড়োর হাতে টিনের বাক্স ভরে গয়নাগুলো খুলে রেখে গিয়েছিল। ওদের বিশ্বটার নাকি খুব চুরি ডাকাতি হচ্ছে আজকাল। মা ছাঁড় গয়না নিয়ে বাপের বাড়ি যেতে ষষ্ঠ-এর ভরসা হয়নি। একলাকে বলে গিয়েছিল গয়নাগুলো কেন লকারে রেখে দেওয়া হয়।

রবির দড় বিশ্বাস গয়নার বাক্সটা এখনও বুড়োর কাছে বাড়িতেই আছে। বুড়ো বয়সে ছেলে নির্ঘাৎ খবর আসবে। ওখানে রবির বন্ধু পরিমল আছে। লাইনের লোক, দুজনে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। কথাটা ছেপে রাখতো না। নেশার ঝোঁকে কথাটা মনে পড়তে মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ষষ্ঠ-এর গয়নায় রবির হবে নিশ্চিন্ত জেলোআলা। বুড়ো কিছু-তেই তা আটকাতে পারে না। আর যদি জোর খাইন আদালতে বলে তো একটা কথা আছে। আর এ ব্যাপারে আইন রবির দিকে।

বাড়িতে পা দিয়ে তাই বেশ খুশ মেজাজে বুড়োর কাছে কথাটা পেড়েছিল রবি। জানে তো বুড়ো বড় আইনকানুন লোক। কথার ফাঁকে আইন আদালতের কথাটাও একবার শুনিয়ে দিয়েছিল। বুড়োকে জানতে তো আর বাকি নেই রবির। আচ্ছা চোঁইয়া লোক। কথাটা সে বেশ ধীর সুস্থেই সুরু করেছিল কিন্তু শুচার কথা শুনেই ভীষণ ক্ষেপে গেল বুড়ো। গালাগালির বান ছোটালো। রবিও আর সামলাতে পারলো না নিজেকে। খুনখুনে বেরে গেল।

—যেদিন বাড়ি থেকে ষষ্ঠ আর ছেলেটাকে তাড়ালি সেদিনই আমার বোঝা উচিত ছিল তুই কত বড় শয়তান।'

একরকম বিশাল স্বাস্থ্য ছিল অনাদির। এখন ছেলে ছেলেও ভাঙাচোরা ঠিক আছে। কথা বলবার ফাঁকে ফাঁকে হাঁফাচ্ছিল। ওর মা যতদিন বেঁচেছিল ছেলের কীর্তি কাহিনী ছেপে চুপে রাখতো। অনাদির ওসব ভুলতো না। জানতো সে রামী মানুষ। একবার ছেলে বলেও ওর কোনো বদমায়েসী ধরতেও করবে না সে। তা বরাবর ছেলের দুষ্ট দিয়ে সে ভরসাছিলো বরাবর। ষষ্ঠটা জুটেছিল ভালোমানুষ। শয়তানটার ফন্দি ফিকিরগুলো তেমন বুঝতো না। লোকলজ্জারও একটা ভয় ছিল। ছেপে যেত সব। অনাদি কাজের মানুষ। সারাদিন ধরলা-পত্তর নিয়ে খুব খাটতো। ছেলের দিকে লক্ষ্য রাখার তেমন ফুরসৎ ছিল না। আর লক্ষ্য রাখলেও খুব কিছু হতো না। শুধু জ্বালা কথাটা বাড়তো যা কমতো না। ছেলে তখন সব শাসন শৃঙ্খলার বাইরে চলে গিয়েছিল। ছলনা কলবার নামে অনাদির একশোটা টাকা চুরি করেছিল।

—কে বলেছিল আমার সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে? আমি কি ছেলেছিলাম?' গলাটাও অস্পষ্ট হয়ে আসছে, রবি বুঝতে পারল। কিন্তু একবার সুরু করলে চট করে থামা যায় না।

—বিয়ে দিয়েছিলাম কারণ বোর বিয়ে না দিলে পাড়ার ষষ্ঠ ঝিরা হিসেটতে পারছিল না। তুই তো আর মানুষ ছিলি না কোনদিন। কুকুর বেড়ালের মত নেমকা অভাব তোর চিরদিন।'

অনাদির গলার স্বরটা বাপে বাপে

চলছে। ফাঁকা প্রায় অন্ধকার ঘর-গুলোর ভেতর তার গলাটা ওস্তাদের শোনাচ্ছে।

—সে জন্য মোটেই কিরে যাওনি আমার।...ফিরে গিয়েছিলে শ্বশুরের কাছ থেকে এক কাড়ি টাকা পাবে বলে।'

চিৎকারে গলার শিরাটা ফুলে উঠেছে রবির। চেয়ারটা ধরে নিজেকে সে সামলাচ্ছিল।

—কি...কি বললি তুই...তোর শ্বশুরের টাকার লোভে আমি তোকে ফিরে যেতে বলেছিলাম?'

কথা বলতে বলতে দুঃখ উপচে উঠে এলো অনামি। তারপর রবির মুখের কাছে ডান হাতটা নাচাতে নাচাতে বলল।

—অকৃতজ্ঞ...পশু, কোথাকার...ঘর বড় দুঃখ নয় তত্তবড় কথা। বেরো, তুই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।'

রবির মনে হল শরীরের ভেতর সব রক্তকণা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। এখন নিজেকে চালু রাখার একটাই উপায় আছে। ডান হাতটা দুকুলের উপরদিকে তুলে সে অনামির ঘাড়ে বসিয়ে দিল।

চেয়ারটা ধরে নিজেকে সামলাতে গিয়েছিল। হাতটা পিছলে ছেতে অনামি মেঝের উপর পড়িয়ে গেল। অতবড় বিশাল কাঠামোটা পড়িয়ে যাবার সময় শব্দটা ওস্তাদের শোনালো রবির মনে।

সাঙ্ঘাতিক জল পড়ানো গেছল সিঁড়িতে নিজের পদক্ষেপটা ঠিক করতে পারছিল না বলে কেউটেটা তাই অনেকক্ষণ ধরে এক একটা ধাপ পা এলিয়ে শুয়ে থাকছিল।

মোমবাতির আলোয় একলোর ফাঁকা ঘরখানায় প্রায় একবার চোখ বুলিয়ে নেখল রতীন। তারপর মোড়াটা টেনে জানলার ধারে গিয়ে বসল। দেওয়াল জুড়ে নিজের হাত ছায়াটা ছাড়া এই ঘরে রতীনের নিজস্ব বলতে আর আছে ক্যাম্বিসের মস্ত থাকটা। ওটা কাল সঙ্গে যাবে। এই দিন দুয়েক আগেও জিনিসপত্র নিয়ে কত চিন্তা ছিল তার। এক এক করে কবছরে কম জিনিস তো জমেনি রতীনের। অবাবরই সে একটু সৌখিন ধাঁচের লোক। চোখে আর মনে ধরলে ছুটেছাট করে জিনিসপত্র কেনার স্বভাব তার। একলা মানুষ বলে পয়সাটও তেমন অভাব হয়নি। বাঁধা চাকরীর সঙ্গে বাজারের ছুটকো কাজ সে করাবরই সেরে এসেছে প্রচুর পরিমাণে। আর কিছুটা স্যারীজনে ভালবাসা করতে গেলে দু চারটে জিনিস আপনা থেকেই জমে যায়। রতীনেরও জমেছিল প্রচুর। বেতের নীচু খাট, সেকেলে কারুকার্য করা সোফাসেটি, নতুন ডিজাইনের অলমারী, বুকেলফ, ইজেলরাখার স্ট্যান্ড, বেতের ছাউনি দেওয়া কাঠের ভারী বাক্স, গাছের গুঁড়ি কেটে বানানো বসবার আসন আরো কত কি। হিসেব করে দেখতে গেলে মস্ত আয়োজন। মোটামুটি বড় একখানা ঘরের পক্ষেও বেশী জিনিস।

আজ সারাদিনের টানা হেঁচড়া, মালপত্তর সরানো, ওঠানো প্রায় ঘণ্টা খাটার রতীন খুব ক্লান্ত, অবসন্ন বোধ করছিল। মাথাটাও ধরেছে। এখন এক কাপ গরম চা পেলে মন্দ হতো না। কিন্তু এখন মালাকে ডেকে চায়ের কথা বলতে তার সাংকোচ হচ্ছিল। এ ব্যাপারটা নতুন বলে মনটা ভারী হয়ে গেল। তবে এক পক্ষে ভালোই হচ্ছে। নিত্য-দিনের অভ্যাসের থেকে এটা এক পক্ষে ভালো। রতীন আর মালাকে ছাড়িয়ে পরস্পরের মনে যে সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছে রতীন দূরে চলে গেলে সেটা দূর হবে। মালাকে রতীন পছন্দ করে। তাদের সম্পর্কটাও মধুর। কিন্তু তাই বলে পরস্পর যেমন ভাবছে তেমন নয়। না, তাদের দুজনের চাপা কোনো প্রেমের ব্যাপার নেই। যা আছে তা হলো মানুষের এক ছোটখাটো। ব্যাপারটা অদ্ভুত ওরকম। মুখে বলে সেটাকে বোঝানো যায় না। পরস্পর কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটামুটি চোখে দেখেছে। সেজন্য পরস্পরের উপর রাগ হয়নি রতীনের বরং চেনা মানুষটা ছোটো আর নোংরা হয়ে গেল বলে দুঃখ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অফিসের কাজাকাজি একটা ভালো ফ্লাট দেখে উঠে যাওয়াই ঠিক করল। আর মালপত্তরও ছুটেও গেল তাড়াতাড়ি। তারপর অফিসের একজন বেয়ারার সঙ্গেও কথাবার্তা করে রেখেছিল। রতীনের ফ্ল্যাটে থাকবে, দুবেলা রান্নাও করে দেবে সময় মত। ব্যবস্থাটা সব দিক থেকেই ভালো হলো। রতীনকে কোনো ঝামেলায় পড়তে হলো না।

কালকে ভারী ভারী মালপত্তর-গুলো যাবে। আজ টুকিটাকি জিনিসগুলো গেল। বেয়ারা জীবন-রাম এসে সব গুছিয়ে নিয়ে গেল গাড়িতে চাপিয়ে। লোকটা বেশ চটপটে আছে। বড় বৃষ্টির মধ্যেও নিজের কাজ করে গেল ঠিক।

আজ দুদিন ধরে এ বাড়িতে একটা গুমোট আবহাওয়া চলছে। কেউ কারো সঙ্গে তেমন বাক্যালাপ করছে না। রতীনের কাছে ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগছে। নিজেকে তার অবস্থাই দোষী বলে মনে হচ্ছে। অন্তত এ রকম কিছু হবে আগে কখনও সে ভাবতে পারেনি। পারলে নিশ্চয়ই সে নিজেকে সাঁচয়ে নিত। পরিচিত মানুষজনকে কোনোভাবেই

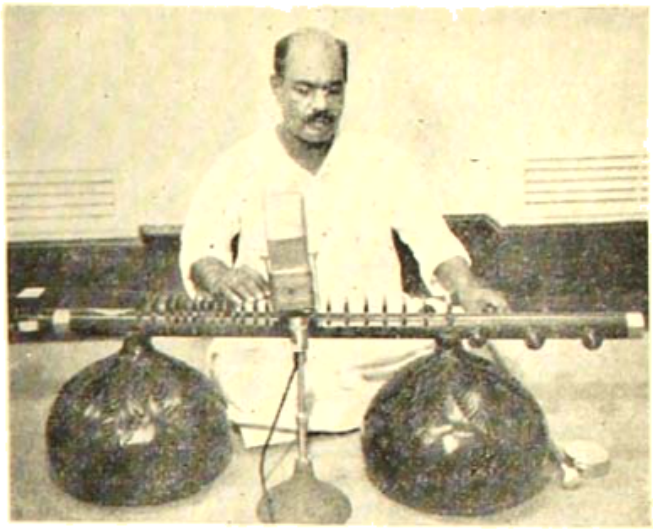

মহম্মদ হবীব খাঁ

আঘাত দেওয়া রতীনের স্বভাব বিরুদ্ধ। সমস্যাকে সুখী করে সে নিজে সুখী হতে চায়। নিজের ভাবনার ধাক্কা ছিল তাই সে মালার অবস্থাটা ঠের পায়নি।

মালা চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

—একটু বেশী ভাবছো বলে মনে হচ্ছে।...চা নাও।'

—যা তুমি দেখছি ঐ বিদ্যে জানো?'

—তার মানে?'

—মানে আর কি, চায়ের জন্যে প্রস্তাবটা অনুকূল বিকূল করছিল।'

গুমোটটা কাটানোর জন্যে হাল্কা গলায় কথা বলল রতীন।

—যাক, তবু জানা গেল তোমার গ্রাস জলে কোনো পদার্থ আছে।'

—কেন, এতক্ষণ কি আমার নিজেই বস্তু বলে মনে হচ্ছিল।'

—তা কি জানি।...তবে গ্রাস টাস যে আছে তার কোনো সাড়া পাইনি।' কথাটা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল মালা। রতীন তাকে ডাকল।

—তুমি যে দেখছি বড় নিষ্ঠুর। অভদ্রভাবে একতরফা বক্তব্য শুনেই আসামীকে ফাঁসির হুকুম দিচ্ছো। বিবাদী পক্ষের সওয়াল জবাবটাও তো শুনবে।'

—ফাঁকা সওয়াল জবাবে আমার কি কাজ।...আর আমার ঘরসংসারে তার বা কি এসে যায়।'

রতীন চকিতের জন্যে চোখ তুলে মালাকে দেখল। মালা তৎক্ষণে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, মোমবাতির আলোয় আবছাভাবে যতটুকু দেখা গেল তাতেই রতীন দেখলো মালার পুরো অবয়বে একটা বিপন্নতার ছাপ। দেখে একটু অবাক হলো সে। এমন ছোয়াচে মালাকে এখনও দেখেনি বলে মনে পড়ল না রতীনের।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরুলো।

—মালা। রতীন ডাকল।

—উঁ...।

—কালকেরাত, তেমন দূরে তো আর কোথাও যাচ্ছি না আমি।...দুকুলের ঘণ্টা বেজেকের পর।'

নিজের কানে নিজের গলাটা অদ্ভুত শোনালো। সে তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নিল।

অনেকক্ষণ পর নিজেকে খানিকটা সংযত করে নিয়ে রতীন আবার বলল।

—আমাকে কি কিছু বলবে মালা?'

প্রশ্নটা করেই সে চট্ করে মুখটা নামিয়ে নিল তারপর প্রতিশ্রুতিটাকে প্রখর করে ঘরের ভেতর ঘরে রাখল।

—না' বলেও দুঃখের আক্রমণের ঠোকরে নাড়িয়ে ছাইল মালা। তার বাঁকুনে সরুটা ছুরে পড়িয়ে বেতে লাগল।

মস্ত সিঁড়ি, একে বেকে অনেক পর এক ধাপ ফেলে উপরে উঠে গেছে। অন্ধকারে মালা ভুলে সিঁড়িটার পরিমাপ নিয়ে একটু হতাশ হচ্ছিল সারাটা। কতক্ষণ যা প্রাপ্তি কিছুই হচ্ছে নিশ্চিন্ত না হচ্ছে বুঝাই এই আয়োজনের পরিশ্রম। সোজোর সিঁড়ির মুখ থেকেই নিজের চারী সরীরটা টেনে টেনে নীচে নেমে যাচ্ছিল সে। ততক্ষণে ঝিপ্-ঝিপে বৃষ্টিটা থেমেছে। সমুদ্রের বাতাস ইতর প্রাণীকুলের চিৎকারে ভরে গেছে। অতলান্ত আন্ধ্রাদের সঙ্গে সেই শব্দের উৎসগুলোর দিকে সারাটা সিঁড়ির ধাপ খুনে খুনে নামছিল।

—শেষ—

# নাম

## মায়া বসু

অলংকরণ // মনোজ বিশ্বাস

ট্রেন ছাড়ার সেই সবুজ পতাকা এবার হলুদ হয়ে একবার হাওয়ায় দুলতেই ভদ্রমহিলা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওপরের বাঙ্কে শুয়ে থাকা মেয়েটিকে একটু ঠেলা দিয়ে ডাকলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল, মেয়েটি ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া রাত্রিবেলা আছে।

মেয়েটি অধীরভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। চোখের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া প্রাইভেট গাড়ি, টাকসি, মানুষজনের নড়া কি যেন, কাকে যেন, খুঁজছিল।

গাড়িগুলো সার বেঁধে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তারি মধ্যে একটা অতি মন্থর গতি টাকসির ভেতরে লোকটা বসে ছিল। মেয়েটির ব্যগ্র উৎসুক চোখে চোখ পড়তেই সে একটু হাসলো।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলল।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার গাড়িটা পার্ক করতেই, লোকটা নেমে মেয়েটির কাছে এসে দাঁড়ালো। একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করলো, 'লিফ্‌ট্ চাই?'

মেয়েটি চোখের অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নাবলম্বকে গোপন করে নিল। চেহারাটা মন্দ নয়। বয়স ত্রিশের ওপরেই হবে। চোখে মুখে শিক্ষা-দীক্ষার ছাপও আছে। তবে তার পরনের জামা-কাপড়, হাতের ঘড়ি, পায়ের জুতো, নেহাতই মাঝারি ধরনের। নিম্ন মধ্যবিত্তের।

লোকটার সম্বন্ধে মনে মনে একটা অনুমান করে মেয়েটি লজ্জা জড়িত গলায় বললে, 'আপনার অসুবিধে না হলে—'

—'আমার কোন অসুবিধে হবে না। আমি সঙ্গী খুঁজতেই বেরিয়েছি।'

—'সঙ্গী খুঁজতে বেরিয়েছেন?' মেয়েটির চোখের তারায় কৌতূহল দেখা দিল।

—'হ্যাঁ সঙ্গী খুঁজতে।' লোকটির গলার স্বর স্পষ্ট এবং দৃঢ়। 'অনর্থক বাজে কথা, মিথ্যে কথা বলতে আমি পছন্দ করি না।'

মেয়েটি মনে মনে একটু বিস্মিত বোধ করে ঘাড় নাড়লো।

—'দেখুন,' লোকটি বলল সেই একই স্বরে, 'আমি এ সহরের বাসিন্দা নই। অফিসের কাজে দিন পাঁচেক হল এসেছি। এ কদিন একলা থাকিনি মেয়ে আমার। নিঃশ্বাস ফেলতেও সময় পাইনি। কাজ সব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই এখান থেকে চলে যাব। কী রকম একা একা মনে হচ্ছে নিজেকে। কিছুই ভাল লাগছে না। সময় কাটানোর মতও কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। এখানে আমার এমন কোন বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনও নেই যে তাদের বাড়ি গিয়ে গল্প গুজব করে সন্ধেটা কাটাবো। আর সিনেমা? একা একা সিনেমা দেখতে আমি ভালবাসি না। আপনি যদি রাজী থাকেন, তাহলে আপনার সঙ্গে সন্ধেটা কাটানো যেতে পারে।'

লোকটা কেন যে তার কাছে এতগুলো কথা বললো, মেয়েটি বুঝতে পারল না। চোখ নীচু করে সে জবাব দিল, 'না, আমার কোন অসুবিধে হবে না। তবে, আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।'

লোকটা তার হাতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো : 'এখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। ঘণ্টা আড়াই সময় হবে কি?'

—'না—না। নটা হলেও কাঁটা নেই' মেয়েটি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল।

—'বেশ তাই হবে। কত নেবেন?'

লোকটার স্পষ্ট কথায় মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বললো, 'পঞ্চাশ টাকার কমে আমি কারুর সঙ্গে যাই না। তারপর আপনি যদি খুশী হন, তাহলে—'

—'বেশ, তাই হবে। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো? আপনার ছাড়া মনে বাড়িতে সুবিধে হবে কি?'

—'আমার বাড়িতে।' মেয়েটি চমকে উঠলো। ওর মুখ লাল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাঁপা গলায় বললো : 'আমার বাড়ি অনেক দূরে। তা ছাড়া সেখানে অসুবিধে আছে।'

লোকটা ভুরু কুঁচকে কপালে ভাঁজ ফেলে কি যেন ভাবলো কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বললো : 'আমি আপনাকে আমার সম্বন্ধে সত্যি কথাই বলেছি। এখানকার এই ধরনের কোন হোটেল টোটেলের খবর আমি জানি না। আমি যেখানে উঠেছি, সেটা একটা সস্তার হোটেল। যেমন হয়ি, তেমনই নোংরা—কম দামী হোটেলগুলো যেমন হয়, তেমনই আর কি। আমার ঘরটাও তেমন ভাল নয়। সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে আমার একেবারেই ইচ্ছে নেই। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোথাও—'

লোকটার কথার বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে উঠলো, না—না। আর কোথাও—অন্য কোথাও নয়। আপনার হোটেলেই চলুন। মাত্র ঘণ্টা দুই আড়াই সময়...আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

—'আপনার কোন অসুবিধে না হলেও, আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগবে মিস্—'

—'আমার নাম কাঁচা। আপনার?'

—'আমার নাম হরেন বন্দ্যোপাধ্যায়।'

—'তাহলে চলুন। দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

—'চলুন।'

লোকটার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চীৎকারিয়ে উঠলো।

পরক্ষণেই ওদের নিয়ে গাড়িটা চলে গেল।

•

সহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে 'নতুন জীবন কলোনীর' কাছে বাসটা থামতেই লোকটা নেমে পড়লো। তিনবছর পর আবার সে কলকাতায় এসেছে। সব কিছুই তার কাছে নতুন ও সুন্দর বলে মনে হচ্ছে।

সে কলোনীর সরু মেঠো পথ দিয়ে চলতে চলতে একজন পথচারী ছেলে কাছে দাঁড়ালো। তাকে জিজ্ঞাসা করলো; 'আচ্ছা, এটাই তো নতুন জীবন কলোনী?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা ভবতোষ চক্রবর্তীর বাড়িটা কোন্‌দিকে বলতে পারেন?'

—'ওঃ যাদু আর্কিটেক্টের যার পা কাটা গিয়েছিল, সেই ভদ্রলোকের বাড়ি?...আহা! ক বছর ভদ্রলোক কী কষ্টের মধ্যে দিয়েই না দিন কাটালেন...বড় ভাল লোক...আর ভগবান ভাল মানুষের কপালেই বত বিপদ আপদ দিয়ে রাখেন... সোজা চলে যান...ওই যে ফলগাছের কাছ আর কোলাঘাসের ঝাড়লের বাড়িটা...ওইটেই চক্রবর্তি মশায়ের বাড়ি।'

ভবতোষ চক্রবর্তীর বাড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো লোকটি। সামনেই একটা ছোট বাগান। বাড়িটা ইঁট কংক্রীটের পুরোপুরি নয়। খাপরাওলা অংশগুলো বাঁশ কাঁচা বরগা চাঁলি ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে যেন নিজস্ব তপোবনে কোন এক ঋষির আশ্রম।

আরো একটু এগিয়ে দেখলো, বাড়ির ভেতরেও ফুলে গাছের ছড়াছড়ি। সেগা সোঁদা রক্তকরবী মাটির উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা বাঁধানো তুলসী বৃক্ষ।

আস্তে ঠেলে ভেতরে ঢুকে লোকটি গলা চাঁড়য়ে ডাকলো, 'ভবতোষ বাবু বাড়ি আছেন?'

দরজার ওপর ভর দিয়ে একজন সৌম্য দর্শন ভদ্রলোক সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আমি ভবতোষ চক্রবর্তী। তা আপনি...কোথা থেকে আসছেন?'

পকেট থেকে একখানা পোস্টকার্ড বার করে লোকটি ভদ্রলোকের চোখের সামনে তুলে ধরলো। পরিচিতি থেকে আমি কলকাতায় এসেছি। আপনি কাজের যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—'

আর বলতে হল না। পলকে ভদ্রলোক উদ্বাসিতভাবে বলে উঠলেন, মনে পড়েছে। আর কিছু বলতে হবে না আপনাকে। যেদিন কিরোর মনে আমিই কাজের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আপনার চিঠি পেয়ে আপনাকে আমিই পোস্টকার্ড লিখেছিলাম। নিশ্চয় আপনার এত দূরে টিকানা খুঁজে আসতে কষ্ট হয়েছে। তা আপনি একা এসেছেন? কোন বন্ধু বান্ধব—'

—'আমি এখানে থাকি না। তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব এখানে আমার নেই। তাই একাই চলে এসেছি।'

—'আসুন আসুন। ঘরে আসুন।' সমাদরের সঙ্গে লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে ভবতোষ বাবু উঠোন-সংলগ্ন সামনের ঘরের দাওয়ায় উঠলেন। কিমোট বন্ধ খুলতে খুলতে বললেন, 'আমার বাড়িতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে কেউ নেই। আমি আর আমার বোন। আমার স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে তাঁর ভাসুরের ঘরে বেড়াতে গেছেন। আপনি বসুন। আমি ভেতরে আমার বোনকে খবর দিয়ে আসছি।'

ভবতোষ চক্রবর্তী দ্রুত ঠেলে ঠেলে ভেতরে চলে গেলেন।

লোকটি একখানা বেতের চেয়ারে বসলো। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো ঘরের মধ্যে তার কিছুই নেই। একপাশে একটা তক্তপোষের ওপর তোষক পাতা। একটা জীর্ণ রঙচটা টেবিলের ওপর কিছু খাতা বইয়ের স্তূপ। তারি পাশে দুটি বাঁধানো ছবি দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। একটি রাধাকৃষ্ণের। অন্যটি নীলকণ্ঠ মহাদেবের। ছবি দুটির গলায় টাটকা গাঁথা ফুলের মালা। ছবির পায়ের তলায় অজস্র ফুল। ছবির সামনে ধূপদানীতে কয়েকটি ধূপকাঠি পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে।

পরক্ষণেই লোকটার সারা মন যেন জুড়িয়ে গেল। ওর বাড়িঘর জীবনের অনেক গ্লানি, দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য, অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে কঠিন সংগ্রামের চিত্র বিস্মৃত হয়ে, এই মুহূর্তে মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল। সারা শরীর যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেল। ওর পোড় খাওয়া তামাটে কর্কশ মুখের রেখাগুলো নরম ও কোমল হয়ে এলো।

একটু বাদেই ভবতোষ বাবু ভাইনের পর্দা তুলে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে একটি তরুণীর তন্বী শরীরের আভাস পাওয়া গেল।

ভবতোষ সবিনয়ে লোকটিকে বললেন; 'এই আমার বোন। এই বলে তিনি অনেকদূর থেকে হোর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। এঁর সঙ্গে আলাপ করো।'

সলজ্জিত দুটিকুণ্ঠা-ঠোঁট মেয়ের হাত ধরে তার্পারিচয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তিনি আবার বললেন: 'আপনি কিন্তু মনে করবেন না। আপনারা আজকালকার দিনের ছেলেমেয়েরা। দেখাশুনা শিখেছেন। দুজনে আলাপ পরিচয় করুন। আমি মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

ভবতোষ চক্রবর্তী ওদের দুজনকে রেখে আবার বেরিয়ে গেলেন। লোকটা স্পষ্টই বুঝতে পারলো, বাড়িতে অন্য কেউ নেই। সেই জন্যে তিনি নিজেই কষ্ট করে দোকানে বাজার অভিমুখে সংবরের জন্যে মিষ্টি কিনতে। ওঁকে যাতা দিতে ইচ্ছে হলেও কিন্তু বারণ করতে মন চাইল না।

ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। দুজনে মুখোমুখি। একজন বেতের চেয়ারে বসে। অন্যজন দরজায় দাঁড়িয়ে।

লোকটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো। ওর পরনে একখানা সাধারণ কম দামী লালপাড় সাদা শাড়ি। সাদা কন্দই হাতা ব্লাউজ। মিটোল দু হাতে দুগাছা লাল গালার চুড়ি। কানে গলায় অন্য কোথাও কোন অলঙ্কার নেই। এই সাদা সাদাসিধে সাজের মধ্যে দিয়েও মেয়েটিকে যেন অদ্ভুত পবিত্র মনে হল।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটি যেন কি মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল।

লোকটির এই অস্বাভাবিক নীরবতায় বিস্মিত মেয়েটি এবার চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকিয়েই ভীষণ চমকে উঠলো। এক মুহূর্তে যেন, আতঙ্কে তার তন্বী মুখখানা নীল হয়ে উঠলো। তার মনে হল: সে যেন এখনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। সেই সম্ভাবনা পতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি দু হাত বাড়িয়ে সামনের চৌকিটাকেই প্রাণপণে চেপে ধরলো।

রামকৃষ্ণ ও মঙ্গলচণ্ডীর ছবির সামনে ছড়ানো কয়েকটা টাটকা পুজোর ফুল তার হাতের ধাক্কা খেয়ে ঘরে থাকা লোকটার পায়ের কাছে মাটিতে ঝরে পড়লো।

নীচু হয়ে লোকটা সেই ফুলের পাঁচটি ফুল একটি নিজের হাতে তুলে নিল। তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলো: 'আপনার নাম?'

মেয়েটি চোখ তুলল না। শুকনো ঢোকা ঢোকা গলায় উত্তর দিল: 'অনন্তী চক্রবর্তী।'

আর কোন কথা নয়। কোন প্রশ্ন নয়। কোন জিজ্ঞাসা নয়। এক অমাট নিস্তব্ধতার পুঞ্জিকে দুজনে শব্দ-হীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দুটি মুহূর্তের মত।

লোকটাই সেই প্রচণ্ডতাকে ভাঙলো।

—'আপনার নাম বললেন, কই আমার নাম তো জিজ্ঞাসা করলেন না?'

মেয়েটি কোন কথা বলল না।

ওর মুখ দেখে মনে হল: শুধু ওই লোকটার নাম জানার প্রয়োজনই নয়, জীবনে বেঁচে থাকার প্রয়োজনও যেন ওর ফুরিয়ে গেছে।

ব্যথাতুরা নির্বাক চোখদুটো তুলে পলকের জন্যে সে লোকটিকে দেখল। মুহূর্তের নির্জন দৃষ্টির সঙ্গে তার কেবলমাত্র দৃষ্টি মিলিত হল।

প্রশান্ত স্বরে লোকটি বললো, 'আমার নাম নীলকণ্ঠ মহোপাধ্যায়।'

শেষ

গান্ধর্বী হরপল

# ভোরের আঁধারে ঝড়

আবদুল জব্বার

রাতের স্নান করেছে পৃথিবী। বকুল গাছের পাতা কলমল করছে ভোরের আলো পড়ে। পাতা কলার মতো কটাদিন চাপার গন্ধে ঘরটা ভরপুর ছিলো। খালাটিকের জন্যে-মার্কা শীতল-পাটিতে এবার চেপে বসলেন হাজী হোসেনুর রহমান। ফজরের নামাজ শেষ করার পর তাঁর চা-নাস্তাপানি এলো হাওয়া-খানাতে। নওসাদ মোলভী এসে সালাম জানাবার পর রোজকার মতো সুর করে অনেকক্ষণ দুরুদের দুলে দুলে কোরআন শরীফ পড়তে লাগলেন।

হাজী সাহেবের দুপো-বাঁধানো দাড়ি, নকসাদার টুপি আর লাল-পেড়ার তসরি-ধানা পড়ে থাকে পাশেই। চিবে-ভরা ঘামান-জিস্তেতে-খেতো-করা জর্দা পান নিয়ে তিনি গালে পোরেন। দাঁত লাগাবার প্রস্তাব করতে মৌলভীর ওপরে তিনি চটে গেলেন, 'কেন, বয়স লুকোব আমার? ডাক্তারী? আল্লা কেন অবস্থা দিয়েছে মেনে নাও। এই যে আমার দাড়ির চাঁদের মতো টাক পড়েছে, পার্লামি সাহেবের মতো 'আকুপাংচার' করে, নকল চুল দিয়ে কি ঢেকে নোব? কাল ও-পাড়ার নেপার আলী এসে ফতোয়া চাইল, কি করব হাজী সাহেব, ছটা ছেলেমেয়ে ঘরে গেল, এখন কারখানার বাবুরা এসে জ্বালাতন করছে 'খাসী' হবার জন্যে। বললুম, হয়ে যাও, তাড়ি খাচ্ছ, মদ খাচ্ছ, মেয়েরা আর ভুলে টকি-বায়স্কোপ দেখতে যাচ্ছে—আর এটায় কেন হাজী সাহেবের ফতোয়া কেন?'

হাজী সাহেবকে যারা জানে সবাই মানা করত, ভয় করত। তিনি বাংলার মাস পর্যন্ত সই করতে না-জানলে কি হবে, বছরে প্রায় ছশো মণ ধান বেচেন, নারকেল বেচেন হাজার পাঁচেক, তারপর আম্র বাঁশ, পাট, সুপারি, কলা, উলু, পাকাটি—নানান ফসল। দুশো বিঘে জমি। ভাগচাষে দেওয়া থাকলেও কোনো চাষীই হার তাঁকে ঠকায় না। তিনি বলেন, তোমরা ইমান মারো বিও, বেইমেসেবী করলে আল্লাকে হিসেব দিতে হবে। যে পাল্লা ধরে ধান বা ফসল চুরি করবে সেই পাল্লায় আল্লাতালা তোমার গায়ের গোশ্ত কেটে নিয়ে আমাকে দেবে।'

দোতলা পাকা বাড়ি, দুদলা ফলকু আছে হাজী সাহেবের। ধানার বাবুরা মাঝে মাঝে আসেন তাঁর পুকুরে। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি বারোখানা গ্রামের সমস্ত মানুষকে খানা খাইয়েছিলেন। বই জমিয়ে-ছিলেন শাল্‌তিতে করে। অথচ তাঁর একদিন কি দুরবস্থাই-না ছিল! তালপাতার কুঁড়ের মধ্যে বাস করতেন। ভিজে সাঁয়সেঁতে মেঝে থেকে কে'চো উঠত বলে দুখানা বাঁশ কেটে এনেছিলেন মেঝে উঁচা-নোর করবার জন্যে। তা সায়বালী সেখ জানতে পেরে তাঁর ঠিক পাঁজরে সোটা দুই এমন গুঁতো মেরেছিল যে আমড়া আমড়া চোখ বেরিয়ে পড়েছিল। তাঁর মা পারে ধরে কাঁদতে তবে খানায় দেওয়া থেকে রেহাই দেয়। সেই সায়বালী সেখের সমস্ত সম্পত্তি আজ আল্লার ইচ্ছায় হাজী সাহেবের কব্জায় এসে গেছে।

সুতোর কলে কাজ লাগলেন তিনি। সাহেবের নজরে পড়ে গেলেন। সর্দার হলেন। তারপর টাকা আসতে লাগল। আঁজলা আঁজলা টাকা। জমি কবলা রাখলেন। তারপর কিনতে লাগলেন। মিল থেকে লোক ছেড়ে দিয়ে আবার কাজে নিলেন। ইংরেজ সাহেব তাঁকে খুব পিয়ার করতেন। মোসায় বাজার করে দিতেন। একদিন সাহেব এসে তাঁর ঘরের অবস্থা দেখে প্রায় কেঁদে ফেলবার জোগাড়! লাথি দিয়ে ভেঙে দেবেন, বললেন। তারপর তিনি সবর হয়ে এই পাকা-বাড়ি বেঁধে দিলেন।...

সবই কপাল! সবই আল্লার মেহেরবানী!

সুতোর কলের ম্যানেজার পর্যন্ত তাঁকে খাতির করতেন। মূল ওয়ার্কস ডাইরেক্টর, যাঁর জিমে হাক দেবার ছিল, সেই মারডিন্ সাহেব যখন তাঁর ওপরে সবার—আর স্বয়ং মেমসাহেব মদ খেয়ে বাঁকে 'মাই ডিয়ার' বলে জড়িয়ে ধরতেন আর কামড়াতেন, তাকে

খাতির না করে থাকা যায়! সাহেব তাঁর 'বাবা'—তাঁর ওপর বিশ্বাস-ভরসা করবেন না এটাই ছিল হাজী সাহেবের প্রতিজ্ঞা।

তা পরদিনই তাঁর ডাক পড়েছিল। আসমান কুড়ে উঠেছিলেন হাজী সাহেব। তখন তিনি নিউ সেপ্টাল কটন মিলের বড় সর্দার, এক হাঁক মারলেই সারা মিলের দশ হাজার শ্রমিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেত। যন্ত্রপাতিও ভয় করতেন। একটা লোক লাগাতে হলে ম্যানেজারের সার্টিফিকেটের দরকার হয়। তিনি লেখাপড়া না জানলেও সমস্ত আইন-কানুন জানতেন, কারখানার সব লোককেই চিনতেন, গায়েগতরে মালায় বাঘাতে।

নওসাদ মোল্লাকে বললেন, 'আপনি যে হজে গেলেন, খুব বা অসৎ উপায়ের টাকা নিয়ে গেলে নাকি হজ কবুল হয় না—উট পিঠে নেয় না—এসব কি ঠিক হুজুর?'

হাজী সাহেব বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ঠিক। এই বড় পুকুরটা খোঁড়ার সময় তিন ভরা সোনার মোহর পেয়ে গেলাম—মালিকের অসীম দয়া—স্বপ্ন দেখলাম—একজন দরবেশ যেন আমার মাথায় হাত দিয়ে বলছে, হোসেনুর, এবার তুমি মক্কায় যাও, হজ করে এসো। তাই আল্লার নাম নৌলত, আল্লার রাহে দিয়েই হজ করে এলাম। তাছাড়া আমার এই বস্তুতে একটা জিন আছে, সে টাকা খুঁড়িয়েছে তাঁর কোনো সময়। বাড়ি করার টাকা অবশ্য সবই সাহেবের।'

এখনো হাজী সাহেবের কাছে সকাল-সন্ধ্যায় নানান লোক আসে। কেউ ভিটার নিয়ে যায়, কেউ জমির কতোয়া চায়, কেউ ধান চায়, ধান-গরুও চায়। হাজী হোসেনুর রহমানকে বাদ দিয়ে দশ-বিশটা গ্রামের বিচার বা সালিসী চলতেই পারে না। যদিও তিনি সই-এর বদলে টিপ দিতেন, কিন্তু তাঁর বিচার ছিল সূক্ষ্ম, নিরপেক্ষ। পুরোনো হতদরিদ্র লোকেরা সবাই তাঁর পক্ষে।

কিন্তু কাল বদলে গেল। ইংরেজরা চলে যেতে বাধ্য হল। দেশ স্বাধীন হল। হজ করার পরই সর্দারী কাজ ছাড়তে হল তাঁকে। মাহ্‌মিল সাহেব তখন দেশে চলে গেছেন। হাজী সাহেবের ছেলে খানিকটা লেখাপড়া শিখে নিতে হবে। বিয়ে দিলেন। বয় বছর হয়ে গেল তবু তিনি নাতি-নাতনীর মুখ দেখতে পেলেন না। তিনটে অন্তঃসত্ত্বা বন্ধ্যা আছে এখনো—চারটেকে বিদায় করার পরও। চালু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে পাওয়া না। সবাই ডাক্তার চায়। কিন্তু ডাক্তার করে সোনা চায়। আধুনিক লেখাপড়া জানা মেয়েরা লেখাপড়া জানা মেয়ে চায়। তাঁর মেয়েরা লেখাপড়া করে নি। অগত্যা থাকে। আত্মীয়-কুটুম্ববাড়ি যেতে হলে ঘোমটা পরেই যেতে হয়।

হাজী সাহেব দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটু, শুলে তাঁর স্ত্রী আরেশা বিবি বলেন, 'হাসো, বউমার তো ছেলে-পুলে হল না, যদি ওকে হবে কি করে ছেবেহ? ডোবা-ডাক্তি, পানি-পড়া, ওঝা পীরের দরগার মানত করা, সবই তো ছেলেতে গেল! তুমি যে বলেছিলে, আজের বাজার সময় ছেলে-হাঁড়িতে চাল-ডি-পোস্ত ফেলে দিলেই কিনা আপনে টৈকেন্ করে ফুটতে লাগল আর যারোটা গ্রামের লোক যতক্ষণ খেয়েছিল মাল ফুরোয় নি—তা কুথাও এখন দেখাও না। বউমাটা যে একটা বাচ্চার আশায় কেঁদে কেঁদে মারা গেল! আর ছেলেকেই বা বিয়ে-সাদি দেবে কবে? নিজের মরণ করে হবে তার ঠিক নেই, এখনই তুমি পাকা 'ফকমর' তৈরি করিয়ে রাখলে?'

—'আরো তোমার কিছু বলার আছে?'

—'আছে। খোকার সঙ্গের হরিণা বকনাটার শুধু গা-গতর ভারী হচ্ছে। চর্বি গজাচ্ছে। চলা বন্ধ হয়ে গেল শুধু গাবিন হচ্ছে না—সেটারই বা কি হবে? খোকাকে নাকি একজন পাস করা সরকারী গো-বদ্যি বলেছে 'ইন্‌জেকশন' দিয়ে গরুকে গাবিন করাতে।'

'ও সব না-করমানী, বে-শরিয়তী কাজ করলে ছেলেকে আমি বাড়ি থেকে বের করে দোব। গরুকে ইন্‌জেকশন দেবে...ছিঃ! এ সব কথা উচ্চারণ করতে আমার ঘেন্না করে! তওবা আস্‌তাগফিরুল্লা নাউজো-বিল্লাহ্!' খোকার কথাতেই বাড়িতে বিজলী-বাতি আনা হল। পুকুরপাড়ে লাইনঘর বেঁধে তাকুটে বসানো হল। মাস্টারের সঙ্গে আবার ইস্কুল বসানো হল—সব আধুনিক হচ্ছে—সাহেব মেম হচ্ছে। শোনো, হরিণা গাইটাকে আমি এ বছর কোরবানীর জন্যে মানত করলুম।'

'ওগো না না। একি কথা বললে! খোকার সখের গরু যে!' আরেশা বিবি ডিউরে উঠে কপালে করাঘাত করলেন।

হাজী সাহেবের ছেলে ইনসান, বাবাজীর মানতের কথা শুনে বলে ফেলল, 'লোকটা হাজী সাহেব, কিন্তু মূর্খ তো! টাকা থাকলেই হজ করে এসে 'হাজী সাহেব' বনা যায়! ঠিক আছে আমিও গরুকে ইন্‌জেকশন দেওয়াব।'

আরেশা বিবি বললেন, খোকার কি হবে বাবা! শহরের ডাক্তার দেখাবি, নাকি আর একটা বিয়ে করাবি?'

—'দেখা যাক।' বলে ইনসান চলে আসে রহিম মাস্টারের বাড়িতে। রহিম সাহেব বুড়ো হয়েছেন। ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি। বি-এ, বি-টি পাস। অমায়িক লোক। একটু 'বাঙালী' ভাবাপন্ন। তিনি বুদ্ধি দেন। 'গরুটাকে আজই ইন্‌জেকশন দিয়ে আনো। আর বউমাকে আমার চেনাজানা একজন মুসলিম লেডি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। পরীক্ষা করে দেখা যাক, তার কারণে তোমরা নিঃসন্তান। পরীক্ষায় যদি দেখা যায় অক্ষমতা তোমার তাহলে তো বাবা দশটা বিয়ে করে আর তালাক দিয়েও কিছু হবে না।'

—'ধরুন যদি আমি অক্ষম হই?'

—'তাহলে বিয়ে করবে না।'

—'কিন্তু বংশ রক্ষা হবে কি করে?'

—'তামাসে বটে! আচ্ছা, আগে পরীক্ষা করাও তো। তুমি অক্ষম হলে পালক-সন্তান নিতে হবে।'

ইনসান সেই দিনেই বিকেলে—তার বাবাজীকে কারা যেন সালিসীতে ডেকে নিয়ে গেছেই—একটা লোক সঙ্গে নিয়ে তার হরিণানা গরুটাকে সরকারী ডেয়ারী ফার্মের ট্রেঞ্চিং কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ইন্‌জেকশন দিয়ে আনলে।

আর পরদিন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি বলে রহিম সাহেবের চিঠি আর তাঁর ছেলে বন্ধুর সঙ্গে বোরখা-মুড়ি-দেওয়া বউকে নিয়ে গেল কলকাতার নেতি ডাক্তার আলোয়ারার কাছে। কয়েকদিন পর জানা গেল ইনসান নিজেই অক্ষম পুরুষ। তার দ্বারা কোনো সন্তান উৎপাদন করা আদৌ সম্ভব হবে না।

হাজী সাহেবের কানে এসব ব্যাপার কে তুলল জানা যায়নি, তিনি গ্রামে সকলের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। নিজের কবরের ঘরে ঢুকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে শুরু করলেন। কড়া নির্দেশ দিলেন বোরখা আর কোথাও বেরুতে পারবে না। বোরখা না-পরে বাজারে বা পুকুরঘাটের দিকেও যেতে পারবে না। মাস্টারের ছেলে বন্ধুর স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন, পোষাক-আশাক তাঁর ভাল লাগে না।

এইভাবেই চলতে লাগল।

মাস ছয়েক পরে পবিত্র কোরবাণীর দিন এলো। হাজী সাহেব নামাজ পড়ে এসে নওসাদ মোল্লাকে বললেন হরিণানা গাইটাকে কোরবাণী দিতে।

ইনসান বাধা দিল। বলল, ও গরু কোরবাণী করা জায়েজ হবে না। এই পেটে বাচ্চা আছে।'

—'ঘোড়ার ডাণ্ডা আছে! ইন্‌জে-

উৎপলা সেন

...কিছু বাজনা হবে তারপর একটা ...হবে হাসির ও রঙ্গ চাঁদি বিলাস ...

...পরিচয় পর্ব, কিছু ঘোষণাদি হবে শুরুতেই যে এমন বাধলেন কি করে হাজী সাহেব।

ইলমান বলল, 'আমরা পর্ব কিনে ফেলেছি পর্ব।'

কিন্তু হাজী সাহেবের এক বন্ধু। তিনি সাদর এক ...হয়েছে, যার ওপরে মানা আছে, আসরে বসে তাঁরই উৎসর্গ করা উঠছে। যেমন অনেকদিন হতেই ইলমানের ইচ্ছে পুরবে

খুব কড় হাজার টাকার ইনসিওরেন্স পাইটাকে ফোরেজারী দেওয়া হল।

ইলমান বলতে লাগল: হাজী যে ...পর্ব কি মিস্টার চক্রবর্তী? নিজের ...এতদিন আমরা দুই ... কি ঘর ফেলে ফেলেছে তো—

কিন্তু ঠিক মুহূর্তটায় পর্বটাকে ...পর্ব দেওয়া হোক এবং তাতে ...ইলমানের বক্তব্য।

হাজী সাহেবের সাহেব একবার ...বলবেন? এত কি সম্ভব? ...ইলমানের সঙ্গত ওরাল ইলমান-...আসবাও এই বিজ্ঞানিক ব্যবস্থা ...নিলেন। তিনি মুসলিমদের ...এই রকম প্রপঞ্চান্ত নাকি ...হবেন। তবে নিজের চোখে ...কি বলে বিশ্বাস করবেন না।

তিনি অপেক্ষা হলেন সবার ...

এর নিজের কোরেজারে ...ঘর ...হাজী সাহেবের। আমীর পাড়া-...পাইটাকে ইলমান আগেই দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু, কিন্তু, সাদরি দিয়ে একটিমাত্র ইলমান-ইলমান দিয়ে। ...সম্বন্ধে এবং শেষ ...বক্তব্য হল।

এখন বাড়ি ঢোকা হাজী সাহেব ...বাবার বাবার কাছ, হয়ে ছিলে-...কোথাতেই পড়ে থাকেন। আগের ...বিশিষ্ট দৃশ্যটায় এবে পরদাতে ...ভাঙল ঘোরে শুরু হয়নাল।

ইলমান দুপুরে বিশ্রাম-ঘরে ...যাবার আগে ঘোষণা হবে যে ...জায়েদাকে বলতে গেলে, আমি একটু ...মিস্টার হয়ে যাচ্ছি, এই ...ঘরটায় আসবে। আমার সই ...সুজন একটু, মন খুলে গান-...ওঁর। তুমি যেন অবাক মিস্টার হয়ে ...যেও না ওর ভাঁজ লক্ষ্য।'

ইলমান একদিন উঠে ...ঘরে ...দেখল ওদের ঘোরেজা পর ...এতক্ষণ ঘরিয়ে পড়ের পাত ...এসে এসবে চলনের মধ্যে ঢুকল। ...ওদের আগে ...ঘরে একবার উঁকি মেরে দেখল। ...বসে আছে, গলায় হার ...ইলমান

ধীরে ধীরে ...জায়েদার ...ঘরে ঢুকতে লাগল। মাস তিনেক পরে ...যে বেশ ...হল। কিন্তু এবে ...হল এক ...তার ...নাকি সারাদিন।

...এলেই ...বন্ধ হয়। কিছুদিন পর ...যেন ...হবেন মা হবে ...

পড়ে গেল যেন। সে নাকি ...পড়েছে? তাহলে? পরীক্ষায় কি ভুল হল! অথবা নতুন করে তার সৃষ্টি-ক্ষমতা ফিরে এসেছে?

ভাবতে ভাবতে সময় গেল। ...জায়েদার একটি অপূর্ব সুন্দর ফুটফুটে পুত্র সন্তান হল।

হাজী সাহেব খুশীতে আত্ম-...করলেন। খানা খাওয়া-...গরিব-মিসকিনদের। বললেন, 'আল্লার দয়া হলে সব কিছুই সম্ভব।'

সম্ভব? হঠাৎ ইলমান তাদের বাড়ির সমস্ত বোরখাগুলো পোড়াতে শুরু করল। ভড়াটেদের বলে দিল তারাও যেন বোরখা পুড়িয়ে ফেলে।

মাস্টারের দ্বিধা ছেলেবার ছেলে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কামাল আতাতুর্ক বলেছিলেন, বোরখা তুলে দাও। ওটা হল পাপের উল্টো ঢোঙা...'

রহিম মাস্টারের বিশ্বাস করে ফেলার পর জায়েদার সই আর আসে না।

জায়েদাকে শুধোলে সে শুধু মাথা ছেট করে থাকে। বলে, 'কে জানে, কোথায় গেল সে, আর আসে না!...'

হাজী সাহেব বলেন, 'আমারই ভুল, ভাই গরুটাকে যদি ফোর-বানী না দিতুম তার মাংসের ...

নাতীও একটু, খুব খেত। পালা যেন ঠিক মাওমিলন সাহেবের মতো ...হয়েছে।'

শেষ

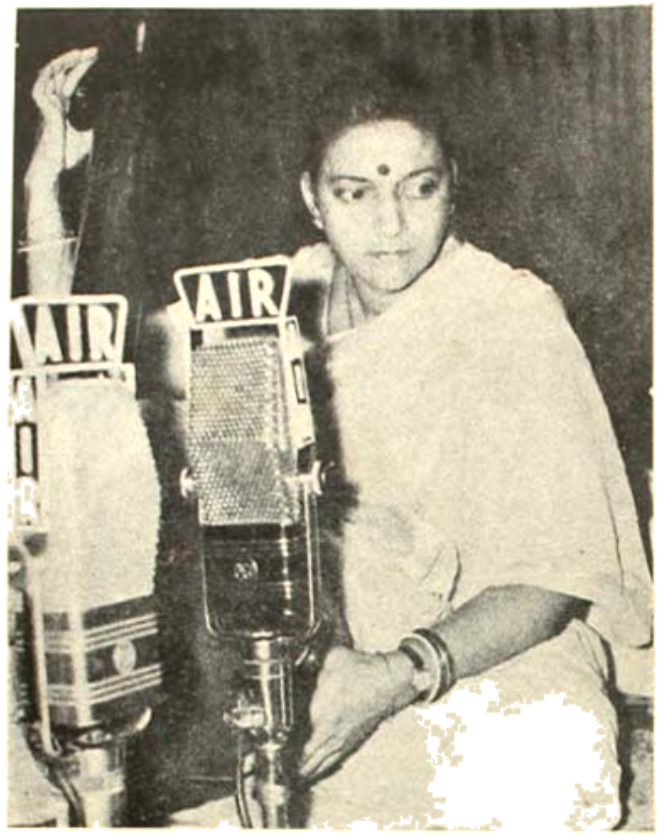

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

## জবানবন্দী

(২৯৯ পৃষ্ঠার পর)

খাটে তাকে শুইয়ে হাঁকডোল দিতে দিতে নিয়ে গেল ধরা ধৈ-পালা ছড়াতে ছড়াতে তারা নেহাৎ সাধারণ লোক নয়। আর বড়ো পালকী হবের বাড়িতেই—

আবার ডাক্তারিবনের কাছে দাঁড়ানো পালকীর দিকে তাকাই। আবার চমকে উঠি,—মনের আকাশে ভেসে ওঠে একটি মুখ। চোখের জল গড়ায় গালের উপর—এক ফোঁটা—দু ফোঁটা। শিউরে উঠি—কোথায় যেন ওকে দেখেছি—কিছুতেই মনে ওকতে পারছি না—কে ওই পাগলী?—কপালে সেই জখমের দাগটা! কপালে ছোবল গালে ছোবল মুখে ছোবল!

সাপে ছোবল মেরেছে? কি করে? কখন?

প্রাণপণে স্মৃতি হাতড়াতে থাকি... হঠাৎ একটা নাম ভেসে ওঠে।

নিজের মনেই হঠাৎ জোরে বলে উঠি, 'ভন্না—'

ডাক্তারিবন ছেড়ে কি যেন একটা তুলে পাগলীটা আমার দিকে ছুটে আসল।

শেষ

# জবানবন্দী

## দ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য

হিঃ—হিঃ—হিঃ...

উলঙ্গ এক পাগলী। চলতিপথে দাঁড়িয়ে আর বিড় বিড় করে বলছে, নেই, নেই, নেই...

বীভৎস চেহারা। তাকানো যায় না। রুক্ষ শুকনো। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে গেছে। কখনো বা ডাস্টবিন থেকে এটা-সেটা কুড়িয়ে ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে; কি খুঁজছে কেন! হাসছে কি কাঁদছে বোঝা যায় না। —'ওগো, তোমরা কি দেখেছো কোথা। সে? তাকে খুঁজে পাচ্ছি না যে।'

কাকে খুঁজে বেড়ায় যায় না। বিড়বিড় করে বকে, আর মনে মনে কয়েক পা হাঁটায়। পথ-চলতিদের কখনো বা ভেংচি কাটছে। আবার হাসছে সেই বীভৎস হাসি। গা শির শির করে ওঠে।

—'তাকে মেরে ফেলেছে, জানো, তাকে মেরে ফেলেছে...কোথায় লুকিয়ে রেখেছো!' হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। তারও বীভৎস রূপ আছে!

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য যে মেয়েটি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছিল...কি যেন নাম সেই মেয়েটির? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ভদ্রা!

কপালটার জখম! হাতে সিঠে কার্নাসটে! এ কী হল?—'আমাকে মেরে ফেলবে! বাঁচান, আমাকে বাঁচান।'—হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে ভদ্রা!

উজাড় করে মনের কথা, গোপন কথা বলছে ভদ্রা। ভদ্রার জবানবন্দী। শুনছি আমি!—'জানেন আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে সেই জানোয়ার।'

—'তোমার ছেলেকে!' আঁতকে উঠি।

—'ভালবাসা।—মোহে পড়েছিলাম আমি। বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু রঞ্জনই আমার সর্বনাশ করেছে। এই দেখুন, কি করেছে আমার?'

ভদ্রার হাত সিঠে আর মুখে সাজা দিয়েছে! আমি শ্রোতা! অনেকবারই এসেছিল ভদ্রা। তারপর আবার এসেছে। হয়ত, এবারই শেষ—'জানেন, জানোয়ার ছেলেকে মেরে ফেলেছে।'

—'চাবুকে চাবুকে তোকে মেরে ফেলবো! বল্, বল্ এই ছেলে কার?' রঞ্জনের জানোয়ার মূর্তি আমার চোখের সামনে। ভদ্রা বলছে, আর আমি শুনছি!

হতভম্ব আমি। ভদ্রা বলছে, নিশ্চয়ই আমার ছেলেকে নষ্ট করেছে ওই জানোয়ার। কিন্তুই মনে নেই। জ্ঞান হবার পর দেখি নার্সিং হোমে আমি...পরে বুকে সিঠে হাত দিয়ে দেখি সব জায়গায় জখম...' তারপরই আর্তস্বরে কেঁদে ওঠে ভদ্রা। বলে, আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম আমার স্বপ্নে দেখা সেই ছুটে ওঠা ফুলে আমার মুখ দেখার প্রস্তুতিই করে গেছে।'

ভদ্রা আসতো। কিন্তু সিন দিন তার এ কী পরিবর্তন? তখন আছি অসুস্থ। পায়ের কাছে বসে আমার পায়ে হাত বুলোতো! টপ্ টপ্ করে চোখের জল পড়ত আমার পায়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম একদিন, 'তুই কাঁদিস কেন মা? কি হয়েছে?' আমার মনে পড়ত এক অতীত জগতের কথা। ভদ্রার সেই মায়াবেরী মূর্তি—নৃত্যরতা সুন্দরী তন্বী ভদ্রা। কিন্তু তার সে রূপ কোথায়?

তারপর অনেকদিন আসে নি আর। তার কথা ভুলেই গেছি। এ রকম কতই তো আসে। সকলের নাম মনে থাকে না। চেহারাও।

রঞ্জনের কথা শুনেছি। এক বড়ো কোম্পানীর মস্ত বড়ো চাকুরে। বাবার একমাত্র ছেলে। বিলেতে গ্রেনিং। সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে ঝোঁকও আছে। নৃত্যনাট্যের একজন নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক!

কিন্তু ভদ্রা!—সামান্য ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে! ভদ্রার তালা দেখে অনেকেরই ঈর্ষা হয়েছিল! বড় ঘরের বউ! রঞ্জন নিয়েছে ভদ্রাকে!

সেই নৃত্যনাট্য ভদ্রার তালা ঝিকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কে জানত পটল ফাঁস দিয়েছে আমূলে?

কয়েক বছর কেটে গেছে! ভুলেই গেছি ভদ্রা-রঞ্জনের কথা। গলার পর করে চলেছি। উত্তর কলকাতা; হঠাৎ এক পাগলীর চিৎকারে তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।—মাঝারী স্বাস্থ্যবতী মেয়েছে! ঐ ধামাধো—কপালে ঘোমটা, গালে ঘোমটা, মুখে ঘোমটা!—সাদের বিবি! একটা নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে মুখটা মুছছে পাগলী!

রাস্তার পাগল পাগলী! বীভৎস তার চেহারা! কে-ই বা তাকায় ওদের দিকে! হয়ত নিতান্ত আপনজনও মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

এমনি এক যুবতী পাগলী ঘুরে ছিল আমাদের রাস্তায়। তারপর দেখি—হুপ-ধুলো জমালিয়ে ঠুলি-টুলি দিয়ে সিঁথি সাজিয়ে সুন্দর

(এর পর ২৬০ পৃষ্ঠায়)

# বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

আশা দেবী

# বিবস্ত্র সৌরবেদনা

প্রাণতোষ দাশগুপ্ত

বাচ্চাটা আবার জেগে উঠেছে। বেশ জোরে কাঁদছে সমানে। আওয়াজ শুনলে মনেই হয় না যে মাত্র তিন দিন হয়েছে...

...নিঝুম রাত। মাঝে দু-একটা গাড়ীর আওয়াজ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছে...

শরীরের অসম্ভব ক্লান্তি। তবু চোখে ঘুমের তারী ছোঁয়া। উঠবার দরকার হলেও, উঠতে পারছে না। কিন্তু নিস্তব্ধ রাতে একটানা ঐ কান্না...

...সন্তর্পণে টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। পাশে দেখল ঘুমোচ্ছে অঘোরে। দারুণ ক্লান্তিতে নিঃসাড়। বাইরে বাচ্চার নেচে এল সিঁড়ি দিয়ে। উঠতে নাচতে আজকাল কষ্ট হয়। কিন্তু উপায় কি! নিঃসঙ্গতার ঘর ঘর আওয়াজ এই কান্নার থেকেও অসহ্যকর।

...নার্সটাও ঘুমোচ্ছে...বাচ্চাটার এই চিৎকারের মধ্যে ঘুমোয় কি করে, আশ্চর্য...একবার ডাকবে ভেবে ফুলে ফুলি দেয়...কর্তব্যে অবহেলা। পরক্ষণেই ক্ষমা চেয়ে নেয়। রাতে ঘুম না হওয়া যে কি কঠিন শাস্তি সুনন্দা জানে...

...ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল...এয়ারকন্ডিশন ছাড়া এখানে এত রাতে আসার তো কথা নয়... নার্সটাও ঘুমোচ্ছে...জানালা...জানালা অবাক হয়ে গেছে...ভয়ও পেল... রাতে কান্না তো আজ তবের নয় বহুবার শুনেছে...কই এর আগে কখনও এভাবে নীচে তো নেমে আসেনি... আজকাল বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলে সব ব্যাপারে।

...প্রবলবেগে দরজার পাল্লা খুলল। দেখতে পেল বাচ্চাটাকে।

ভেতরে ঢুকল সুনন্দা...

...ইনকিউবেটরের ঘোরে অষ্টপ্রহর এত ঘুরে আছে রোগিনী। বাচ্চাটা পাশে এত চিৎকার করছে তাও ঘুম ভাঙছে না...চালাই...ঘুম ভাঙলে তো আবার বাচ্চার ছটফট করবে। এ যে কি জ্বালা মেয়েমানুষেরাই বুঝে বোঝে...আরও বেশী বোঝে সুনন্দা।

...সন্তর্পণে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল...কেমন এক অনাস্বাদের বোধ মনের মাঝে ঢেউ তুলল... পরের জিনিস, যার উপর লোভ আছে...লুকিয়ে চাখার মত এক অপরাজেয়ের নাড়চাড়া দিয়ে উঠল...

...বাচ্চাটা এত ভারী কেন। নিঃসাড়ে ঘুমোয় বাচ্চারা বেশী ভারী লাগে। বিশেষ করে রাতের দিকে। রাত-জাগা করলেই হয়। অনেক ভেবেছে। অনেক কোল নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছে, পড়াশুনো করেছে। কিন্তু উত্তর পায়নি।

...বাচ্চাটার কি খিদে পেয়েছে... খুবই সম্ভব...মায়ের দুধ তো এখনও পাচ্ছে না...সে কি ইনকিউবেটরে পড়ে থাকার জন্য...কিন্তু ইনকিউবেটর ছিল বলেই তো এত বড় একটা অপারেশনের পরও এত তাড়াতাড়ি সারে, আর রোগিনীও ঘুমোতে পারে।

না—ঘোলার উপর মেয়েমানুষীর জন্য প্রকৃতির প্রতিশোধ—

প্রতিটি কাজেই বোধ হয় হাত চলনার অভিজ্ঞতা অল্পতর কিছু প্রয়োজন হয়। না হলে ঐ সুনন্দা চৌধুরীও হাত যা অপারেশন-এর সময় একটুকুও কাঁপে না, বাচ্চাটাকে খাওয়াবার সময় এত কাঁপিল কেন?

ভিজিয়ে ফেলল নিজের কাপড়... বাচ্চাটার জামাও নোনা জলমাখা ভিজে গেছে...জামাটা প্রথমে খোলাল ...ভিজে জামাই কাঁপিয়ে তোলে...

জামা খুলে জল পর্যন্তেও তার হয় করলিল যদি কিছু হয়... নিজের মনেই হাসল...অবোধ... শুইয়ে দিল মাথার পাশে যাতে হাতে বোতলে কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ল বাচ্চাটা ছোট একটু চুমু খেতে ইচ্ছে হল, কিন্তু সংযত করল নিজেকে—

...কাঁধের উপরে হাতের ছোঁয়ায় চমকে দেখল নার্স এসেছে কখন এসেছে টের পায়নি।

—খেয়ে চলে এসেছ? এমি প্রসবোত্তরকালীন অসুবিধেগুলো?'

—এমনই। দেখ, কি সুন্দর দেখতে হয়েছে বাচ্চাটাকে।'

মৃদু হেসে সমর্থন করল দেখে।

—বাচ্চার মার চেয়ারটাও ভাল। দাম্পত্যিক ঘটনা ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অসুন্দর চেহারা চোখে পড়ে না।' দেখে বলল।

—বাচ্চাটার অবস্থা কি সুন্দর হয়েছে! কিন্তু রাখতে পারলে হয়। যারা আছে তাদেরই ভাল করে খাওয়াতে পারে কিনা সন্দেহ।'

—তুমি বুঝবে না সুনন্দা। আমি এক সময় বুঝতাম, যখন খুব ছোট ছিলাম। দেখতাম, হাতের নোনা টাকায় কি করে সংসার চলত।'

—কি সুন্দর ভাবে ঘুমোচ্ছে বাচ্চাটা।'

—তোমার তো সুন্দর লাগবেই। আসলে তুমিই তো ওকে জীবন দিয়েছ...চল।'

কাঁধের উপর হাত রেখে দেখর নিয়ে চলল সুনন্দাকে। নার্সটা তখনও ঘুমোচ্ছে। মুখে এক বিশ্রি হাসির আভা। বোধ হয় কোন স্বপ্নবিভোরে স্বপ্ন দেখছে।

উপরে উঠতে উঠতে মৃদুকণ্ঠে বলল সুনন্দা, তোমার কথা না শুনলে ভুল করতাম।'

—আজ পর্যন্ত কোনদিন তুমি

বিলায়েত খাঁ

আমার কথা শোনো নি?'

—হ্যাঁ না। আজকাল একটা বৌ একটা উপন্যাস মনের মতো করে লিখতে পারে। সর্বদা তার সঙ্গে থাকতে হয়। তোমার উপন্যাসকে মনে হয় অনধিকার প্রবেশ। মনে হয় তোমার থেকে আমি অনেক ভাল বুঝি। এবং সব ব্যাপারে—'

—থামাও বুঝি। তোমার এই বাজে কি মিথ্যা! আমার মত ডাক্তার পথে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তুমি সুনেত্রা চৌধুরীরা! খুঁজলে মন পাওয়া যাবে না। আমার উপন্যাস বন্ধুরা সিনেমায় যাবে, ইয়ের তিনদিন ইজ বাউন্ড টু বি সুপারহিট।'

হাসলে কি সুন্দর দেখায় লোকটাকে এখনও। বাঁচা যায় যে কোন মুহূর্তে একটিও নেই। গালে রক্ত লেগেছে। কিন্তু কি সুন্দর দেহ। বোজলে দেখায় সুন্দরই ছিল। এখন যেন আরও সুন্দর হয়েছে। সত্যিকারের বেঁচে থাকলে একবার ফিরে তাকিয়ে আসত। খুশী হতেন। বুঝ, তা যদি আবার আবদুল্লা হয়, তার সৌন্দর্য কি অপরূপ হয়ে পারে!

উত্তর দিল না। আলতোভাবে দেখবের হাতে হাত চাপ দিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল। ঘুম আসছে না। দেখর অবাক দৃষ্টিতে পড়ছে।

...লাইট জ্বালাল না। সন্তর্পণে উঠে এসে দাঁড়াল বাইরে। আকাশ থেকে চুঁয়ে একটা শান্ত চোখে পড়ে...নীচের বৌটি যেন হয় এ-রকম কোনো শান্তিতে থাকে...চুঁ-চাপটে মেয়ে-পুরুষে জমকাল পরনে ঘুরে বেড়াচ্ছে...ইলেকট্রনদের ভয় নেই, খাড়াইয়ে চোখ পড়ার ভয় নেই।

...চোখে পড়ল শান্তির জন্য কিছু লোক জড় হয়েছে...অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না...খুব শান্ত চোখেরা চোখে পড়ছে। কিন্তু কোনও আওয়াজও কানে আসছে না। কিছুক্ষণ পরে একটা গাড়িয়া এসে রাখল রাস্তার অন্যদিকে নীচে। চেকাল না সুনেত্রা। এ রকমই একটা কথা মনে এসেছিল। দেখরের কথা না শুনলে নীচের ঘরে যে বইটা পড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, তারও হয়ত আজ ওই অবস্থা হত। তার বাচ্চাটি—তাকেও ফিরে পেতাম সুনেত্রা।

—দেখবদা।'

—'এখন কিছু ভাবিস না।'

—দেখবদা।'

চুপ চুপচাপ তাকাল সুনেত্রা।

—নীচে একজন দাঁড়িয়ে আছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

—'এখন হবে না।'

—বলেছিলাম। শুনছে না। বলছে আপনার নিজের মুখ থেকে না শুনে যাবে না।'

—'বলে দে ডিসিপ্লিন অর্ডারস'-এ আছে। এখন হবে না।'

মুখের ভাব দেখে কথা বলতে তার সাহস হল না। কিন্তু চলে গেল না। একটু সরে দাঁড়িয়ে রইল।

এক-রে দেখটা আলোয় দেখতে পিছে চোখ পড়ল—'কি চাস? দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বড় জোড়া তো—'

—মানে—আমি বলেছিলাম। শুনছে না।

—কেন বলে রে।'

—ডাক্তারী করেছিলাম। ভাল না।'

—আমার জন্যে তোর করা রে।'

ভাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—'কি, কথা মনে আছে না?'

—দেখবদি জন্মে। মাঝে মাঝে ভাইপো করছে। ভাই—'

—'আমিও তো একটা মানুষ। সকলে দেখে তার পরিচয় পাইনি। তার কিন্তু তো কারুর দেখা পাইনি। না করলে শুনে আসবে।' হেসে ফেলে সুনেত্রা। সামলে নিল মুহূর্তেই মনে। 'যা ছেলে নিয়ে যায়।'

—'আমার কথা না শুনে নিজেই ফোন করে উপরে উঠে আসতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নেমে গেল। পারেনি। তোর খারাপ—'

—'তা যা আসছি।'

তাড়াতে বিরক্তি নিয়ে নীচে নেমে এল।

মেয়েরা কাপড় পড়া একটি বউ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কাকালে মুখ। চোখ গর্তে বসে গেছে। চোয়াল দুটো বেরিয়ে এসেছে। দেখের দিকে তাকিয়ে আছে অসহায়ভাবে।

ও সুনেত্রা চৌধুরীর সেক্রেটারী পাড়ী ছেড়ে আসে। সিঁড়ি দুটে ফিরে গিয়ে দিল দেয়। ছেট মা নামের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মা শিক্ষা-গত মর্যাদাও জানিয়ে দেয়। মোপ-দুরস্ত জামাকাপড়। পকেটে বড়-ছড়ো টাকা। কাল যার বাচ্চা হবে তারও থাকে পারে পাড়ী পাড়ী—অনেক ভাবনা ভরে পরা। মুখে চুপ-কথা।

—কি চাই।'

চমকে পরস্পর দেখে মুখ তুলল। ভয়ে মুখ পাংশু হয়ে গেছে। চোখ ছিলল। কথা বেরোচ্ছে না।

—তাড়াতাড়ি বল।'

—ছেলে ছেড়ে ডাক্তার বলা।' অনেক কষ্টে কাঁপা গলায় বলল।

—তা আমি তার কি করব। হাসপাতালে যাও।'

—বোঝেছিলাম। বলে দিল বলা—'

—আপারেশন।'

—আপারেশন করতে হবে। অনেক-গুলো বড় হাসপাতালে ফোনায়। তাদিয়ে দিল। বলছে আমরা নেই। বেরী হয়ে গেছে। ভর্তি করবে না।'

ফোন। তারপর।'

—ওরা যার কেকে কেকে বলছিল দিন কয়েকছি। অনেক করে বলায় পাড়ার ডাক্তারবাবু দেখলেন। বললেন, সময় হয়ে গেছে। তাই আপনার কাছে এসেছি। দয়া করে যদি পারে ভাই দেন।' বলে হাসপাতে বাচল। চোখ তুলে ভরে ভরে তাকাল —চিনতে পেরেছে তো।

—কত বলা হবে মনে?'

কথা বেরোল না। মুখে হাসা নামল।

—'তিন হাজার টাকা।'

চোখের সামনে মুখে দেখতেও বেশ হয় এর চেয়েও না—হাজার—' বলা আটকে গেল।

—হ্যাঁ। যদি ঔষধের জোগাড় করতে পার, এস। বিকেল ৪টার পর। তখনকার বিরক্ত করবে না।'

কোন ঔষধ বৌটি—হা-হাজার কেন, দশটা টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি আমাকে বাঁচান। আমাকে বাঁচাতে হবে না। বাচ্চাটাকে বাঁচান।'

মুখে মাথা। দুই মরলে বোধ বাচ্চাকে দেখবে কে? তবু মনটা কেন একটু নরম হল। চিন্তা করে দেখল আজ বৃটি সার্জিক্যাল কেস আছে। ঘড়ি দেখল। বেলা হয়ে গেছে। এর উপর এমারজেন্সী কেস। হাসপাতালে ভর্তি করতে গেলে অনেক ঝামেলা। ছুরী বেড পাওয়া অসম্ভব। টাকাতো দিলেই পাওয়া যায় না।

কাজ বোধ হয় পলায়ন। নীচু হয়ে বৌটি সুনেত্রার পা ছোঁয়ার চেষ্টা করল। পারল না। ধরলায় মুখে কুচকে উঠে দাঁড়াল।

—মাই আমার দ্বারা কোন সাহায্য সম্ভব নয়।'

চুলে ফেরোছল বৌটি। এ ফেরে বৃষ্টি হবে না। চাহনের শুকনো গলা নিয়ে বলল, 'আমি চলে যাব?'

—হ্যাঁ।'

—'আমি—যাব না। কোথায় যাব।' গলার ভেতর ফ্যাসফ্যাস করে আওয়াজ বের হল। 'বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে।'

বিরক্ত হল সুনেত্রা। 'তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নেই। আমি ছাড়া কি ডাক্তার নেই? পরীক্ষা করাতে চাও, হাসপাতালে এস। এর বেশী কিছু করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।' ফিরে চলল নিজের ঘরে।

কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ও নিয়ে কতবার হল?'

—দু বার।'

—দু-বার! আওয়াতে পার না, চালাতে পার না, তবে বাচ্চা হয় কেন? সে সময় মনে থাকে না?'

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল বৌটি। কি উত্তর দেবে জানা নেই।

উপরে উঠে এল সুনেত্রা। ঘড়ি দেখে তাকিয়ে উঠল। ঈষৎ চোখ বেলা হয়ে গেছে। হাসপাতালে সব রা করে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাড়া-তাড়ি আয়নার ঘরের দিকে এগোল সুনেত্রা।

—কেমন পাখির দিলে?'

চমকে উঠল। দেখর জানল কি করে। হেসে ফেলে। 'ডাক্তারি আপারেশন এই নাক কানের সব সময় ভাল লাগে না। আমার অবস্থায় পড়লে তুমি কি করতে।'

—তুমি হেসে দেয়।' মৃদু হাসল দেখর। 'তোমার আর আমার অবস্থা যখন পুরুষ হবে, তখন আর এ

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব না।'

'কি করব, ভিন রাত এত কল্পনা চিন্তা-ভাবনা পড়াশুনোর পরেও এ সব সমস্যার আমার স্বচ্ছ সমাধান নয়। আর তা ছাড়া ইউ আর এ সার্জিক্যাল কেস।'

'নার্সিংয়ের হোমে তো কেউ নেই। ওখানে রাখা যায় না?'

'যাবে না কেন। উপরন্তু লিখে তো তুমি খালাস। ঝুঁকি তো সব সময়েই সমানভাবে রয়েছে। খরচও তো কম হবে না।'

'কবে থেকে বলছি আমার এপেনডিসাইটিস করে নাও, আজকাল হচ্ছে না।' ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা দেয়। 'যা হোক সে-কথা। টাকার কি তোমার অভাব?'

'অভাব নেই বলেই কি দিনদিন ঢিলে দিতে হবে। বড় ভুল করা পরম। দেখ না সকাল থেকে কত পরিবর্তন আমার কি ভাবে যায়। তেমন কি যায়েও বিশ্রামের উপায় নেই। আমিও তো একটা মানুষ। আর তা ছাড়া ওজনকে তুমি করবে। এ রকম কত হাজার হাজার রোজ মারা যেতে। আমার কি ইচ্ছে করে না, কত হলেও তুমি পুরুষ মানুষ। তোমার থেকে এ-সব আমি ভাল বুঝি এবং জানি।' বাবার স্বভাবের এক ওদ্ধত হাসি ফোটে উৎপল সুনন্দার মুখে। 'কি করব। আমি যে আর পারছি না।'

'আমি তা জানি। কিন্তু রোগী সামনে থাকলে চিকিৎসার নৈতিক দায়িত্ব তো পড়বেই। কত রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। সে ছেড়ে দি চোখের সামনের রোগীকে ফেলে রাখা যায় তা হলেই পরিশ্রমের শেষ না কেন। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল দেখবার। বলল, 'ডিনারের দেরী হয়ে গেছে। তৈরী হয়ে নাও।'

একটু ভাবল সুনন্দা। তারপরে বেরে গিয়েছে।

'কবে হবে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। স্পেশালিস্ট কাউকে দেখাতে হবে।'

—তোকে বলে স্বামী ডাক্তার। তোর আবার চিন্তা কি। আর ডাক্তার স্বামী কেবল দেখে।'

—স্পেশালিস্ট।'

—স্পেশালিস্ট-এর পেছনে ছোটে।'

—'একটা সাধারণ কথা ঠিক মত উচ্চারণ করতে পার না?'

—পারি না। পারতেও চাই না। তুমি ভেবেছ কি বলতে?'

—সব বিষয়ের সমাধান কি আমি করতে পারি? সময় হয়ে গেল, অথচ ঠিকমত বাথা উঠল না।'

—নিজে ভাবছ। যাও ঘরে ফিরে। আমার ভাবিও না। বরং আমার মাথাটা দাও তো আর যাই হোক বাবা ছেলে ডাক্তার এর বেশী লজ্জা করে।'

—ডাক্তারদের সামনে আবার লজ্জা কি?'

'আহা! লজ্জার কি' কি একটা বর জড়িয়েছে' তোমার লজ্জা করে না তোমার সামনে তোমার বউয়ের—'

থাক হয়েছে। এখনে ভাল মেয়ে ডাক্তার খোঁজার? ওই যে একজনই আছেন' তাঁর উপর চলবে না। এত বাস্ত তিনি। ঠিকভাবে দেখবার সময় পাবেন কি না সন্দেহ। যাই হোক বাচাটাকে তোমার আমি আর রাখব না। কেন জানি না আমার ভাল বোধ হচ্ছে না।'

'তাহলেতো আমি একা থাকতে পারব না।'

'একা থাকবে কেন? আমি তো বেশীর ভাগ সময় থাকবই।'

প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও চারটি দিন সুনন্দা সবচেয়ে বড় শুটিংয়ে বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এল দেখবার। পরীক্ষা নিরীক্ষা, পরা-পরামর্শ চলল। তারপর অপারেশন থিয়েটারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

বেশ ভয় পেয়ে সুনন্দা। আগের ওর পেয়ে অপারেশন থিয়েটারে যেতে। অজ্ঞান হওয়ার আগে পর্যন্ত দেখেছে হাত পা ছুড়ে ছটফট করে ছিল। তখন হাতে যে আপনিই শিথিল হয়ে গিয়েছিল মনে নেই।

কখন জ্ঞান হয়েছিল তাও মনে নেই। সমস্ত জড়ানো বন্ধনা উপেক্ষা করে জোর করে পাশে তাকাতে চেষ্টা করল। আবার কাছে মনে ছিল দেখবে বলে ফেলল। সমান করে শুইয়ে দিল। ঈশারায় মনে করল একটা করতে। আবার ইঙ্গিতে হওয়ার জন্যে চাইল সুনন্দা-এর উত্তর পরে পরে।

পরে অনেক অনেকক্ষণ পরে— মনে হয় সুনন্দার অনেক অনেক পরে ওই বন্ধনা যাওয়ার বাঁধা শিথিলের মধ্যে অনেক অনেক ধৈর্য ধরার পরে জানতে পারল, ওর মেয়ে হয়েছে।

আরও পরে জানতে পারল ও। কোনদিন কোন- ও-দিন আর যা হতে পারবে না

শূন্য। শূন্য। চারিদিক ঘিরে শূন্য, নিরবীহ শূন্যতা। জীবনের পরতে পরতে যেন একটা তেওরাল এসে আটকে গেছে। পথ খোঁজার চেষ্টা করছে। পাচ্ছে না একেবারে। সমস্ত তেওয়াল বড় পর বড় উঁচু নিশ্চিন্ত।

'একটা কিছু কর তুমি'

'কি করব?'

'পড়াশুনো'

'এই ভাঙ্গা মনে কি পড়াশুনো হয়?'

'হবে। হতেই হবে।'

'আমার ভাল লাগে না।'

'লাগাবে। লাগাতে হবে। মনের এই কণ্ঠ নিয়ে তুমি যে কিসের পর ভিন ঝুঁকিয়ে যাচ্ছ। বেরিয়ে এসো ভীষন তোমার সমস্যে।'

'তুমি আমার মনের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারবে না। মন বসবে না পড়াশুনায়।'

'কিছু, তো বুঝতে পারছি অন্তত পাশ হতে হবে। এটা বুঝতে পারছি না তোমার কেন হবে না। নিশ্চয়ই হবে। কাছের পরীক্ষে হয়, কাছের ইন্টারভিউ'

'কি হবে পড়াশুনো করে'

'চাকরি হবে।'

চমকে উঠল সুনন্দা। 'চাকরি' বললেই হল চাকরি হবে। এর মুখের মধ্যেও হাসি ফোটে।

'আমিতো পাশ করতে পারব না'

'চেষ্টা করলে সব পারা যায়।'

'চাকরি হবে তুমি কী করতে পারলে'

'আমিনি বলেই তোমায় পারতে হবে।'

'না হয় না।'

'পারতেই হবে। কি নিয়ে কাটাবে সারা জীবন। পরীক্ষা পরীক্ষা করে নিজের দুঃখের কাহিনী না সুনন্দা পড়াশুনো তোমায় করতেই হবে। চাকরি যদি না হয়ে তাও তোর করবে না। তবু কিছু, হবে।'

তারপর একদিন, তারপর একদিন সারা পরীক্ষে তোমার ভরে, লজ্জার মাথা নীচু করে সুনন্দা ফিরে চলে যাচ্ছে ফোর্থ ইয়ারের ক্লাস ফোরে। পাশে থাকা বন্ধুরা তাদের সমবেত সংবর্ধনা দিচ্ছে।

তারপর নামে ট্রেন মাঝারি। ঘরে ঢুকে ঘর ঘরে ব্যবহারিক প্রতিটি পরীক্ষায়। তারপর চলল ঝাঁকানোর অবিশ্রান্ত মন মনন।

দু বছর পরে যখন ডিগ্রিগুলো বুটো ফোটের নিয়ে ঘরে এল সে কি

ছেলে ধরতে হবে সেকথা নিয়ে ছেলেই ওঁর হল সুনন্দা মেডিসিনের ডাক্তার।

তারপর চোখে চশমার ফ্রেম নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সুনন্দা যেন ঠিক এ রকম হয়েছিল চাকরে এসে কি কি এল ডিগ্রী

তারপর কি কি ও উপর এবং সমানভাবে চলল বিভিন্ন ভূমিকায় সাফল্য অর্জন করে চলল

বিয়ের পরে ও আর মেয়ের এ সুনন্দা ঠাঁইটি হল এর আর কি ও কি

কি যে চাকরে করে, হয়েছিল ছাড়ল নিয়ে বসিয়ে কত প্রস্তাব চলে গেল হাতের উপর দিয়ে ফাঁকি হেড়ে চলল হল পেছন ফেলল সাফল্য নিয়ে করল না

একদিন এও আর কি ও কি হল সুনন্দা কি হল চাকরি

একদিন কি হয়েছিল সুনন্দা ভাবে না আর ভাবতেও চেয়েছে করে ছিল না। মেয়েদের কাছ থেকে অনেক অনেকবার শুনে বুঝতে চেষ্টা করেছে কিন্তু হয়েছিল কাজ সবার মাঝখানে অনেক অনিবার্য হাসিতে মেতে অনেক অনিবার্য শুনে বুঝতে চেষ্টা করেছে কিন্তু হয়েছিল কাজ সবার মাঝখানে অনেক অনিবার্য হাসিতে মেতে অনেক অনিবার্য

যে কথা নিয়ে সুনন্দা কখনও কারও সামনে মেলতে এসেছিল সে কথা যেন সুনন্দাকে ঘরে শুনতে

বেনারসী ও সিল্ক শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
এ জে সিন্হা এণ্ড কোং
১২৯ এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

নাজির হোসেন

না হয়। সে কথা নিয়ে বৌদির একটিও নারী ফিরে যাবে না, সেদিন সুনন্দা ডাক্তারীর নামের পাশে ডাক্তার লেখা সার্থক হবে। সার্থক হবে দেশবাসীর সাধনা। তাদের অনুচ্চারিত শপথ।

কিন্তু সুনন্দার কান্না কি থেমেছে! কত বড় সমস্যা। অথচ কতটুকু মনে হয়। চোখের সামনে দিয়ে সব ঘটনা যেন দুর্বার বেগে চলে গেল।

—'আবার উঠে এলেন!' চোখ না খুলে সুনন্দা। খুব অতীত আবার হারিয়ে গেল। দিনের পর দিন মনের পর্দায় তো এ রকম আনাগোনা করবারই চলে। বাবা কবে ফিরে-ছিল। কবেক বছর ধরে আবার ফেরেনি। জীবনের কোন বাঁকেই যেন ধরা যায় না।

—'আমাকে ডাক না কেন?'

—'মনে পড়ে? সে ঘটনার পর আমরা কত ভাবে এভাবে ফেরেছি।' আস্তে বলল সুনন্দা। যেন কত বড় সেদিন এক কথা।

—'বকশ হয়েছে। স্বামীর মনকে এভাবে কষ্ট আর দিও না। সব আনন্দ আহ্লাদ তৃপ্তি কি আর সব সময় নিজের ঘরে ফিরে আসে। অন্যের ঘরে ফিরেও যেবার চেষ্টা করতে হয়। এ ভাবে নিজেকে ক্ষয় করো না, অন্ততঃ আমার দিকে তাকিয়ে।'

—'আচ্ছা খুব সুন্দর, না?'

—'হুঁ।' মৃদু অস্ফুটোক্তি করল দেবব্রত।

—'শোনো।' বলেই চুপ করে গেল।

বুঝতে পারল দেবব্রত। বুঝেছিল আগেই, বলল, 'ভেবে বৌদি। শোবে চল।'

—'রাজী যদি না হয়।'

—'বুঝিয়ে বলবে।'

আরও কত দিন চলে গেল। বৌদির মুখে এক অনাবিল প্রশান্তির ছাপ। তার মধ্যে মাঝে এক সুন্দর হাসি ফুলে ফুলে বেড়িয়ে আসে। সুনন্দা সামনে গেলে কথা ফুরিয়ে যায়। চোখ দিয়ে কর কর করে জল পড়ে। দুঃসহতা প্রকাশের ভাষা এর চেয়ে স্বচ্ছন্দতর যেন হয় আর হয় না। যদি সম্ভব ছোট নিজেকে সুনন্দার পায়ে লুটিয়ে দিত।

—'আমার ঘরে যেতে দেবেন?' সুনন্দাকে দেখে ভয়ে ভয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করল।

—'আজই ছেড়ে দেব।'

—'সত্যি?' আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৌদি।

—'হ্যাঁ, কিন্তু দিন খুব সাবধানে যাবে। পরিশ্রম এক দম করবে না। সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা-নামা করবে না। ভারী জিনিষ তুলবে না। খাওয়া-দাওয়া ভাল করবে।'

মুখ লুকিয়ে ফেলল।

—'তোমার স্বামী তো একবারও এল না?'

ভেবে ছিলাম—'অনেক দিন আগে খাকার পর একটা চাকরি পেয়েছে। তবে ছুটির দরখাস্ত করেনি। যদি চাকরি চলে যায়।'

—'তোমার কাজ করে?'

—'ফিলাসপুরে।'

—'এখানে তোমাকে যে দেখবে?'

—'বোন আছে...বাড়ীতে বাচ্চাদের রাখে।' চোখ নীচে নামিয়ে বলল, 'এখানে ঢুকতে সাহস পায়নি।'

—'এইগুলো বাচ্চা! খাওয়াবে কি?'

—'ভগবান যখন দিয়েছেন সব ঠিক হয়ে যাবে। লিখেছে কোয়ার্টার পেয়েছে। টেনের ভাড়া জোগাড় করতে পারলেই নিয়ে যাবে।'

—'কত মাইনে পায় তোমার স্বামী?'

—'এখন ভাল পায়।' চোখ বড় বড় করে উত্তর দিল বৌটি। 'আর একশ চল্লিশ টাকার মত। তার উপর বোনাসও পাবে।'

অবাক হল সুনন্দা—ছটি বাচ্চাকে কি খাওয়াবে তুমি একশ চল্লিশ টাকায়! তোমরা দুজন তার উপর তো আছই। তোমার নিজের এখন ভাল খাওয়া-দাওয়া দরকার।'

—'যে রকম করেই হোক চালিয়ে নেব।'

—'বাচ্চাদের ভাল ভাবে মানুষ করতে তোমার ইচ্ছে হয় না?'

চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ল। উত্তর দিতে পারল না কিছুক্ষণ। 'বাচ্চাদের বাইরে পাঠিয়েই আমি যাব।'

এ-ভাবে কথা বাড়ালে কথা চলতে থাকবে। ইতস্ততঃ করে বলল—'একজন ভদ্রমহিলা—' কথা কেড়ে নিল—'বলছিলেন যে তুমি যদি রাজী থাক তাহলে তোমার বাচ্চাটিকে দোষ নেবেন। ভাল অবস্থা। ভাল থাকবে। লেখাপড়া শিখবে। ধন জনের একজন হবে।' চাপ দিয়ে কথাগুলো বের করতে হল।

—'না, না।' এক ভীষন ভয়ে বুকের উপর চেপে ধরল বাচ্চাটিকে। ভয় হল সুনন্দার। ছুঁইতে আরম্ভ না করে।

—'সে তোমার ইচ্ছে। সন্তানের যদি ভাল চাও, তোমার রাজী হয়ে যাওয়া উচিত।'

—'আপনি দেবতা। এ কথা আমায় বলবেন না। কথা দিচ্ছি, নিজে না খেয়ে থেকেও এ ছেলেটিকে যে রকম করেই হোক মানুষ করব। আপনি আমাকে অন্য যা বলবেন আমি মেনে নেব। শুধু এ-কথা আমাকে বলবেন না।'

চুপ করে রইল সুনন্দা। অন্তর্দ্বন্দ্ব, যন্ত্র ভেবে মনে হল নিজেকে। অভিনয়টা আশ্চর্যজনক ঘটে। আর কথা বলতে ইচ্ছে করল না। চলে আসার জন্য উঠল।

কিন্তু হঠাৎ ভাবান্তর! সুনন্দার মুখের ভাব দেখে ভয় পেল—

—'আমি আপনার দোষার। আপনি যদি ছলেন নিশ্চয়ই যেব। আপনি দেবতা। আপনার কথা নিশ্চয়ই শুনব। দেখেছেন! কি আনন্দ পাচ্ছি। আমার ছেলে সুখে থাকবে, ভাল খাবে, ভাল পড়বে, লেখাপড়া শিখবে, মানুষ এক হবে, আর আমি রাজী হচ্ছি না!' বাচ্চাটিকে বুকের মাঝে চেপে ধরল একবার। 'আপনি আমার জন্য যা করছেন, আমার বাবা-মা স্বামী তিনজন একসঙ্গে হলেও পারত না। আপনি ভগবান। আপনি যদি বলেন নিশ্চয়ই যেব। বাচ্চার ভালোর জন্যেই তো আপনি বলছেন, আমি রাজী। হ্যাঁ, আমি রাজী। আমি রাজী।' নিস্তেজ হয়ে পড়ল বৌটি।

কথা খুঁজতে ব্যস্ত ছিলেন সুনন্দার। কি যেন ভাবছিল। —'তোমার মন যা বলবে সেটাই এ ক্ষেত্রে বড় কথা। তোমার ছেলে তোমার কাছেই থাক।' বেরিয়ে এল। নার্সটিকে বলল ছেড়ে দেওয়ার কাগজপত্র করতে।

বারান্দায় এসে দাঁড়াল সুনন্দা। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল—গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়েলোক। সন্তর্পণে হেটে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখল বৌটি ফেলে যাচ্ছা নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে। বাচ্চাটিকে পাশের মেয়েলোকটির হাতে দিয়ে মাথা নীচু করে জোড়হাতে প্রণাম করল বাড়িটির দিকে মুখ করে। তারপর এগিয়ে গেল।

ঘরে ফিরে এল সুনন্দা। ফোন টিপে ডাকল দারোয়ানকে। তার হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বলল, 'ওই যে বৌটা ছিল এখানে, তার হাতে দিয়ে আয়। বলিস, আমি টেনের ভাড়া দিয়েছি বলে আবার দিকে গেল।

কিন্তু টেলিফোনে বেজে উঠতে ঘরে ফিরে এল।

...হ্যাঁ, আমিই তো চৌধুরী... ও রকম করছেন কেন? পরিষ্কার করে বলুন...আচ্ছা আমি আসছি। হ্যাঁ এক্ষুণি।'

টেলিফোনের অন্য রোগীরা টিপল। নীচে নার্স বলল, 'ডিসিসান্স পৌঁছে নাও, ছুইক। এ কেস অব এমারজেন্সি। ড্রাইভারকে বল গাড়ী বার করতে। আমি নামছি।'

বারান্দার দিকে তাকাল। এক পা এগিয়ে ফিরেও ফিরে এল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নীচে। তাড়াতাড়ি।

শব্দ নেই।

সময় নেই।

অনেক দূরে যেতে হবে।

—শেষ—

# শূন্যিকের সেই সতী

দীপক খাস্তগীর

পাকটা ছেলের হাতেই মুখের ঘেরে ঘেরে সরিয়ে ফেলেছে বেলবেটা। এরপর সবখানে এক-দিনের বাসী একটু মুখে একটা চোখে সেই ঘাসটুকুতে বাকলে। পাকটা অবশ্যেষেই পাকলালি হেঙ্গী আরেকী চোখের চোখে চকেছে এক দিনিক। সবসে ছেলেরও মোড়ার খুরের শব্দ। মুখমুখ চাকা চকেছে। ঠিক এরপর মুখের পারেনা না হেলমা।

বাকের ছোকরাগুলো এখনও হেল অবধানে আসার উৎসাহ বোধহয়ে সেই চারদিকে হেল দিল্লী। এটা খুটিয়ে হেলে একের দিনিকটার মুখের ঘিক চকেছে। মুখের দীঘিতে আরো এসে পড়েছে ঠিকই, তবে তা ঘিকটা চমকের ঘিলেছে যত তেজী হেল মরমের ঘিরে মুখ করে চকেছে। ছোকরাগুলির আরো বার-বার এসে তার ছবিটার পাকটার পাকে ঘেরেছে। ছবিটা একবার ঘুরি, একবার পাকটার পাকের ছেলের চোখের ওপর ঘিরে মুখ ঘুরে যাচ্ছে।

ছেলের চোখের সবসে ছবিটার মুখটাই হেল ছেলে ছেলেই মন পড়ল, ছেলিনও এর চোখের ওপর একটা ছবি ছেলেটির আরেক ছোট ছেলে বড় এবং তারপর বড় ছেলে ছোট হয়ে পাকটার ওরে ছেলেছিল ছবার ঘটনাগুলি ঘিক মনের ওরে একবার পড়লেন। ঘিক-ঘিক এই একটিবার যত বাঁচার তাগিদে ঘটনাগুলির একটির ওরে ছেলেছিল বাকলাটা মনে মনে ছেলের মুখটা পর ওরে পড়ল এর উল্লাস। ছেলো মনে...

অনেকক্ষণ ধরে সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করেছিল রেশমা, "আমি কি কিছু করতে পারি না?"

—"তুমি? তুমি কি করবে?" বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়েছিলেন তিনি। "তুমি নারী, তুমি আমার এ অপমানের প্রতিশোধ কি করে নেবে!" একটু থেমে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, "নিতে পারতো, যবনের এতোবড়ো অপমানের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে পারতো—ছেলেটা। কিন্তু তিনি যে শান্তিপ্রিয়!" দেবের দিকে ঘৃণায় ঠোঁট বেঁকে গেল। "এতোবড়ো যোদ্ধা, কিন্তু কোনো উচ্চাশা নেই, কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই—অপদার্থ!" ক্ষোভে ঘৃণা বুকে এলো তাঁর।

"অথচ তুমি তো জানো না, এরকম একটা প্রস্তাব নিয়ে আমার সভাসদ পরশু বসেছিলো নবাব। কিনা কারণে বরখাস্ত করার আগে একবার দেখতে চাইলো না পর্যন্ত! এতখানি অবিচারী হবে বাংলার নবাব সিরাজুদ্দিন।"

"মি-হা-স-উদ্দি-ন"—সামনের দাঁত-ভাঙা ঠোঁটের ওপর চেপে বসলো রেশমার। তার দিন এসেছে। চিবিয়ে চিবিয়ে নিখুঁতভাবে উচ্চারণ করলো রেশমা। এই মিনিটার জন্যে দিন মাস ধরে অপেক্ষা করেছি। তিল তিল করে নিজেকে তৈরী করেছি। নিজের কথা ভুলে গেছি। বছরের সুখ-সাধ জলাঞ্জলি দিয়েছি শুধু আজকের দিনটার জন্যে। খিয়াসউদ্দিন, আজ তোমার

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলো রেশমা। পাল্কীর গতি মন্থর হয়ে এসেছে। তার সেই সৈনিকটি ঘাড় বাঁকিয়ে একদৃষ্টিতে পাল্কীর ফাঁকটুকুর দিকে চেয়ে আছে।

সাধারণ সৈনিকের তো এমন করে তাকিয়ে থাকা রেওয়াজ নয়। তবে কি রেশমাকে সামান্য ফাঁকটুকু দিয়েই ও দেখতে পেলো? না, পরীক্ষা করে দেখল রেশমা—তা সম্ভব নয়। তবে কি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পেল, সামান্য ফাঁকটুকুতে একটা কালো চোখ দেখতে পাচ্ছে!

একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো রেশমা, "রেশমা।" কোমরে লুকোনো ছুরিটা একবার শক্ত করে চেপে ধরলো।

পাল্কী থেমে আছে। সম্ভবতঃ নগরীর প্রধান ফটকে তাদের প্রবেশের উপযুক্ততা পরীক্ষা করা হচ্ছে—আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো সে। তাই হবে, তেমন না পাল্কী আবার চলতে শুরু করলো।

সুবে বাংলার সুলতান সিরাজুদ্দিন আক্রমণাত্মক ভিসাসম্পন্ন। রাজ্যের বাজনা পিছনে বসে পাল্কীসহ বাহকরা দেখতে পেয়েছে। হাতে হাতে সুরাপাত্র। সুলতানের সঙ্গে আছেন পারিষদরা। সুরার নেশায় সুলতান সকৌতুকে চর্চিত কণ্ঠস্বরে কথা বলে চলছে উঁচুস্বরে হাসি, কণ্ঠস্বরের ভেতরে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে—এখন থেকে সব কিছু দুনিয়ার বাইরে যাওয়া নিষেধ।

খোজা এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

—"কি চাও?" বিরক্ত হলেন সুলতান।

সন্ত্রস্তকণ্ঠে খোজা জানায়, "বেগমা-বাঈ!"

ঘুমুতে যায় সুলতানের চোখ। একজন অপরীর তাকে রেশমার দুঃখের কথা বলেছিলো। তাকে একদিন পাঠানোর ব্যবস্থাও করেছিল—মনে পড়লো সুলতানের। আস্তে আস্তে পাতলা একটা হাসি আবছাভাবে ঘুরে যায় তাঁকে। আত্মসচেতনভাবে উচ্চারণ করেন, "সুলক্ষণ হুসন্ কী পরী।" তারপর খোজাকে বলেন, "উসে, যা-ইচ্ছা ইহাঁ ভেজো।"

খোজা চলে যেতেই অত্যন্ত গাম্ভীর্য টেনে আনলেন সুলতান, "তখ্‌লিয়া," অর্থাৎ সবাইকে এবার যেতে হবে। সুলতান এখন একা থাকবেন। একেবারে একা।

সরু একটা ভালো বোরখা আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে আসছে। সুলতানের মন একটু দুলে উঠলো, "রেশমাবাঈ!"

—"জী"—বোরখার ভেতর জল-তরঙ্গ খেলে উঠলো। তৎক্ষণে সে সুলতানের হাত দুটোকে তফাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সুলতান। সারা শরীর ঢাকা। মহর্বৎ পাথরকে স্নান করে দিয়ে তার ওপর পা দুটি খোলা। কেউ কোনো কথা বলছে না। সুলতান ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন।

—"আরে, খোলো বোরখা তো হাঁহা।"

বোরখা তবু নিশ্চল। টান মেরে সুলতান মুখ থেকে বোরখা সরিয়ে দিলেন।

—"লোভনাল্লা।" অবাক হয়ে গেলেন সুলতান। "কয় সরেত!" কী রূপ! কাজলা বোরখার ওপর সাদা-কোটা খোলাপের মতো ফুটে আছে। সুলতান নির্বাক, নিষ্পন্দ।

রেশমাও তাকিয়ে আছে। এই সুলতান? এই মুহূর্তেই হাতে তার এতদিনের সাধনা? হঠাৎ একটা ভয়ে যেন সুলতানের পিঠ ঘেঁষে ওর চুকে পড়লো—মনে হলো রেশমার। দীর্ঘ ঘাগরার পাতলা ছায়ার গতীর ছায়া হয়ে দাঁড়ালো। এবার ওর দেখা রেশমা—ছায়ামূর্তির দেখাবাড়ী সেই সৈনিকের মতো না?

—"ওয়া, না জবান...জেনা-খাতু।" তৎক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন সুলতান। মুহূর্তমধ্যে বিলাস-কক্ষের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায় বাইরে এলো তাঁর। এবার বরফার ওপর তারা পাঁপড়গুলো ভেজে আনবে সুলতান জানেন। এবার তাঁর উত্তেজিত হতে বাধা নেই।

—"মর যাউঁ তুহারহে হুসন্ পর"—আরো একপা এগিয়ে এলেন সুলতান। "বলয়...তুমি, তুমি এমন সুন্দরী হবে কেন? আরে পিয়ারী, দুনিয়ায় যাওপিও তাঁর জিরো।" একটু থামলেন সুলতান। "যাও যাও, নাচো, এখানে তোমার কোনো কিছুর অভাব হবে না।"

চোখ ফিরিয়ে খাটটার দিকে তাকালো রেশমা। সেই খাটটা ছায়াটা নিশ্চল। সুলতানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, "আরে, নাচো পিয়ারী, যাও!"

চাঁকতে ফিরে তাকালো রেশমা। হাঁ, নাচতেই তো! গাইবেও। এতদিন ধরে নাচ-গানের চর্চা তো শুধু আজকের দিনটার জন্যেই।

নাচ শুরু করলো রেশমা। দীর্ঘ দিনের সাধনা তার সুলতানকে ধীরে ধীরে বিহ্বল করে তুললো। মুগ্ধচোখ তাঁর অর্ধনিমীলিত। নেশার ঘোরে সেখানে আস্তে আস্তে আর একটা ইচ্ছা ছাপ ফেললো।

এবার গান ধরলো রেশমা। কোকিলকণ্ঠ। পরে পরে এগিয়ে আসছেন সুলতান। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল রেশমার। সুলতান জড়িয়ে ধরেছেন রেশমাকে। রেশমা বাধা দিচ্ছে না। আরো একটু, অবশ হয়ে আসছে সুলতান—রেশমা অপেক্ষা করছে।

আবেশে সুলতানের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। চোখে নিমন্ত্রণের ভাষা ফুটিয়ে তুললো রেশমা।

এবার আস্তে আস্তে কোমরে হাত দিল সে। ছুরির বাঁটটার হাত ঠেকেছে। কিন্তু সুলতানের শরীরের চাপে আর তুলতে পারছে না সেটা। একটু চাপ দিয়ে সুলতানকে সরাতে চেষ্টা করলো রেশমা। পারলো না। সুলতান তাকে আরো জোরে চেপে ধরেছেন।

হঠাৎ মনে একটা ভয় রেশমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। তার নারীসত্তা বিপন্ন। ধরা পড়ে উঠলো রেশমা। আপ্রাণ চেষ্টা করলো। কিন্তু পারছে না সে। সুলতানের শরীরে এখন আরো একটা শক্তি যেন ভর করেছে। কাঁকিয়ে উঠলো রেশমা। হাত-পা কাঁপছে—হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে শ্বাস নিচ্ছে সে।

দেয়ালকে টান লাগছে। ঝিমোয়ো হয়ে পড়লো রেশমা। গলা ঘিরে ঘুইঘুই করে একটা গন্ধ বেরিয়ে এলো তার। চারদিক যেন অন্ধকার হয়ে আসছে।

—"ইয়া," হঠাৎ আর্তনাদ করে ছিটকে পড়লেন সুলতান।

আক্রোশ আর কাটিয়ে রেশমা তাকালো। সুলতান মেঝের পড়ে ছটফট করছেন, বুকে আমূল বসানো একটা ছোরা। পাশে দাঁড়িয়ে সেই সৈনিক। সুলতানের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের একপাশটা দেখতে

(এর পর ২৭১ পৃষ্ঠায়)

অনিলেন্দু মুখোপাধ্যায়

# অপসৃতা

## আইভি রাহা

এমন কোরেলাকে বাড়িতে পেয়ে ভাবেনি অরুন। টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে ও ভাবছিল —কি জানি কে এসে আবার ধরে। হয়তো কোরেলার মা, মেজো শরীর নিয়ে এসে ঘুমজড়ানো গলায় কেন ধরে বলবেন,—'কাকে চাই?...ও কোরেলা?...ও তো এখন বাড়ি নেই ...না...কখন আসবে বলতে পারি না আর কিছু শোনার আগেই উনি কেন ছেড়ে দেবেন।

নয়তো কোরেলার বিধি সাঁমাদি এসে ধরবে। আর অরুনের গলা পেয়ে এক ঘন্টা ধরে বক্ বক্ করবে। অরুনের ভীষন বিরক্ত লাগবে। কিন্তু কিছু বলতে পারবে না।

হবে না। অরুনের ভাগ্য ভাল। এ সব কিছুই হয়নি। কোরেলা এসেই ফোনটা ধরেছে। আর আশ্চর্য গলায় বলেছে — 'তুমি!...এতদিন পরে!...কেমন আছ?...'

কোরেলার মুখের মধ্যে বাস্প না বিস্ময়—কি আছে, অরুন ঠিক বুঝতে পারেনি। বোঝবার জন্যে সময় না নিয়েই বলছে 'এই...আজ একবার আসবে?...তী—ব—ব দরকার..'

'...কোথায়?'

কোরেলা এমনভাবে 'কোথায়' বললো কেন এমন আশ্চর্য ও এই প্রশ্ন পেলো অরুনের কাছ থেকে।

গ্রাহ্য না করেই অরুন বললো—বেখনে আসতে।'

—'কিন্তু কবে? আজকে?'

—'হ্যাঁ। আজ।'

—'ওরে বাব্বা...না,...আজ হবে না ...আজ বিকেলে আমার একটা কাজ আছে...আজ কিছুতেই সম্ভব নয় ...না...না...অন্যদিন চেষ্টা কোরব... তুমি পরে ফোন কোর...'

'কোরেলা' -অরুনের গলায় ক্লান্তি ফুটে উঠলো। কোরেলা...লক্ষ্মীটি... একবার এসো...তোমাকে চা—ব—ব দেখতে ইচ্ছে করছে...কতদিন দেখিনি বলতো?...আমি কিন্তু অফিস থেকে ওখনে চলে যাচ্ছি... তুমি দেরী কোর না কেমন...আমি চিন্তা কোরব...'

—না-না। আজ হবে না। আজ অন্যত্রকে এক জায়গায় যেতেই হবে। ভীষন দরকার।' নির্লিপ্ত গলায় বললো কোরেলা।

অরুন এবার একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, 'আমি ওখনে আছি কোরেলা। তোমার জন্যে অপেক্ষা কোরব যতক্ষন তুমি না আস তারপর ফোন ছেড়ে দিও অরুন।

অফিস থেকে বেরবার আগেও ফোন রাখলো অরুন। সারা আকাশ কালো মেঘে থমথম্ করছে। ঠান্ডা হাওয়ার মাতিয়েকা গন্ধ। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে হয়তো।

অরুন সিগারেটের জন্যে পকেট হাতড়ালো। কোরেলার সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি। অফিসে কাজের চাপে পাঁচটার পরও অনেক দিন থেকে যেতে হয়। তবু অরুন ফোন করেছে বহুদিন। পায়নি কোরেলাকে। ওর মিসি এসে বলেছে। বলেছে—'কোরেলা তো বাড়ি নেই ভাই। বোধ হয় সুব্রতদের ওখানে গেছে।'

—'সুব্রতদের ওখানে মানে? সুব্রতদের বাড়ি? কেন ওখানে কি?'

—'ওই আড্ডা-টাড্ডা দিতে হয়তো। যায় তো প্রায়ই। সুব্রতও তো প্রায়ই আসে...আহা ফোরা...দেখলে এমন খারাপ লাগে। অমন রাইট ছেলে, লেখাপড়া শিখে...কি যে হোল... চাকরী নেই, বাকরী নেই...'

অরুনের ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, চাকরী না থাকটাই এখন সুব্রতর একটা কোয়ালিফিকেশন হল নাকি? কিন্তু কিছু বললো না। সাঁমাদিই বলতে দিলেন না। উনি একাই বলে যেতে লাগলেন—তা তুমি কেন আর বল...চাকরী পেয়ে যাওয়ার না যে...আমি কোরেলার কাছে সব শুনেছি...তুমি খুব ভাল চাকরী পেয়েছ...খুব খুসী হয়েছি শুনে... যা দিন কাল...এ সময় একটা ভাল চাকরী পাওয়া...বেশ না...সুব্রত, অরুন, কমল...ওরা...এখনও কিছু করতে পারল না...তাও তো শুনেছি সুব্রতর মামা একজন হোমরা-চোমরা লোক...ওদের সামান্য একটা টেলিফোনের কথাতেই অনেক কিছু...'

—না সাঁমাদি' অরুন বলে, 'আপনাদের ভুল ধারণা...আজকাল ওরকমে আর কারো চাকরী হয় না...এই তো দেখুন না, আমার তো ধরা করার কেউই ছিল না তবু তো পেয়ে গেছি...'

—তোমার কথা জানি না অরুন... কিন্তু তুমি যাই বল না কেন, নিজের জন কেউ না থাকলে আজকাল চাকরী-বাকরী পাওয়া...এই তো আমাদের প্রদীপকেই দেখ না, অমন কোয়ালিফায়েড ছেলে কোরা কত চেষ্টাই তো করল...এখন একেবারে মুষড়ে পড়েছে...বাড়ি থেকে বেরোয় না... কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না...আমি কত বোঝাই কিন্তু কি হবে বল...'

অরুন সাঁমাদির সঙ্গে অনেকক্ষন কথা বলে ফোনটা ছেড়ে দিয়েছে। চন্ড কাজের চাপের মধ্যেও অরুন আরো কদিন কোরেলাকে ফোন করেছে। কোনদিনই পায়নি। নতুন চাকরী তাই কাজের দিকে বেশী মন রাখতে হচ্ছে। তবু কোরেলার চিন্তা ওকে অস্থির করেছে বার বার।

এর মধ্যে অরুন একদিন সুব্রতদের ওখনে গেছে। ওদের সেই পুরোন আড্ডার। টিনের চাল দেওয়া চায়ের দোকানটার পাশে রাস্তার ধারে একটা ভাঙা সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চও। সেখানে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা। রাস্তার লোকরা যাবার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে যায়।

মাঝে মাঝে চায়ের দোকানের রোগা ফর্সা বাচ্চা ছেলেটাকে চীৎকার করে ডাকে সুব্রত—'এই নান্টু, ভাঁড়ে জল হচ্ছে যে। একটা ফুলছে। ভাল করে ফুলাবি।'

অরুন বলতো—'গরম থাকে যেন। না হলে কিন্তু পয়সা পাবি না। খুব সরু চাই।'

—'এাই, খুব চা খলাল, মাইরী? লাঞ্চে কিছে খেয়েছে অমন বাঁকিয়ে কেন! বলো কিছু বল না!' অমল কাতর হয়ে বলল।

ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে সুব্রত বললে—'অন্য কিছু আছে? তোর যে চলবে তা পকেটে মালকাল আছে? থাকে তো খলাও, ডিনিক পরে—'

—'ধুর মাইরী! ও সব কথা বলে বিধি তো মাহলা খারাপ হবে। মেজাজটা আউট লাইন হয়ে গেল। তা তুমি তো যাওয়া খাসা আছ! বাড়ির এক ছেলে। মার কাছ থেকে টু-পাইস রোজই খলাচ্ছ। তা ছুটি একটু আলগা কর না বন্ধুদের কলাবে—'

—'আমি অমন ইলাত্রে ধান করি না।' সুব্রত বললো।

ঠোঁট বাঁকালো কমল। 'হ্যাঁ আমরা তো ঘলাস্তর তোমার কাছে। তা হেমার সুপারভাইজ কে? সালাবাড়ির কোম্পানিটি? সেখানে তো যাওয়া বেন ঘনাং ঘনাং করে শুনছি। কোন কাপশা বেঁধে না। চলল সেদিনই তো মিনি বাস নয়তো ট্রাক্টিতে পাড়ি জমাও বাপধন।

অরুন হাসলো। —'আমার পার্টি খুঁজি তোদের কেউ নয়? কোরেলা তো তোদেরও বন্ধু'।

—'ওটা মুখে বলছিস। মনে মনে তো চাস যাওয়া কোরেলা শুধু তোর একার দুর্গোপভোগ্যই হয়ে কোরনারি কেস হয়ে থাক। তোর সঙ্গেই কথা বলুক। তোর সঙ্গেই মিলুক—'

—'কি রে বাবা! তোরা শুদ্ধু এই সবই করবি, না চা-টা খাবি?' অরুন এবার সাঁতা ভেবে নেয়।

—চা খাবে না তো বলছে? তবে শুদ্ধু চা হলে, ওর মধ্যে আমি নেই। চায়ের সঙ্গে টা-এর ব্যবস্থা কর, আমি।'

অরুন বেঞ্চ-এর মাঝা থেকে লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়ালো। বললো—'কে পয়সা দে? তার কাছে কি আছে? ধুড়ি আর হেলেধাক্কা দিয়ে আসি।'

সুব্রত, অরুন—ওরা পয়সা দিলো অরুনের হাতে।

অমল বললো—'যাচ্ছিস যখন তখন ওটা সিগ্রেটও নিয়ে আসিস। চা-এর পর দু'য়েকমুখ না করলে ঠিক জমবে না।'

—'ইস্! ভেতে পেলে শুতে চায়। আবার সিগ্রেট! ঘন্টা সব—'

অরুন এমনভাবে কথাগুলো বললো, যে সকলেই হেসে উঠলো। অরুন হাসতে হাসতে বললো—'কমল-কে তোরা এখন ওরকম করিস না, যা! ডোক্তার কি মাথার ঠিক আছে? তোরা জানিস না তো, ও এখন নীল শাড়ির পাঠ ছড়িয়ে পড়েছে। নীল শাড়িপরা সিনেমার ট্রু সিগ্রেট ফাইকে দেখলেই তার পেছনে ছুটছে। তবে নাকি নীল শাড়িপরা একটা মেয়ে ওকে বেকে একটু হেলেছিল। ব্যাস। কমল হেসেছিল। সেই সময় তাগিদে আমি কাছে ছিলাম, তাই কোন রকমে সে যাত্রা উদ্ধার করলাম। কিন্তু এরপর কি হবে। সব সময় তো আমি কাছে থাকতে পারি না। কোথায় যে কখন ফাড়ং হবে। আমার ভাবনা হয়।'

—'কেন ফাড়ং-এর কথা কেন? ছেলেটা হাঁটু ছেলেই থাকে তা হলে আর খাবার কথা আসছে কোথা থেকে?' সুব্রত বললো।

—'আরে যে ছেলেদের সে তো ওকে ভাসিয়ে দিয়েই ফর্সা। কিন্তু এদিকে কমলাকে সামলাবে কি করে? ওর চোখ না তো, যেন রাস্তার। তাতে চেখে নীল শাড়ির ছাপ পড়লেই ও প্রায় বুঝে করে তার পিছনে ছোটে। ওর ভয়ে মেয়েরা নীল শাড়িপরা ছেড়েই দেবে এর পর মনে হয়।'

কমল এবার মুখ খুললো। 'ও, তোমরা সাদু...তেলা বকিস নি...যা করে ফেলেছিস, করেছিস। সবাই জানে। চেপে যা। তাতে সকলেরই ভালো—'

সুব্রত অবশ্য নিজের কথা নিজেই খুঁড়েছে। বন্ধুদের কাছে সামা-

বাড়ির বাগানটা কোঁকের মাথায় বলে ফেলেছে। সেই থেকেই ওরা সুব্রতকে খ্যাপায়।

সুব্রতদের বাড়ির গলিতে ঢুকতে বাঁ হাতি সাদা রঙের বাড়িটা—ওই বাড়ির মেয়ে কৃষ্ণকলি। অবশ্য কৃষ্ণকলি ওর নাম নয়। মেয়েটি শ্যামলা। বন্ধুদের কাছে সে কথা বলেছিল সুব্রত। ওরাই তাই নাম দিয়েছে 'কৃষ্ণকলি'। বাড়ি ফেরার সময় রোজই দেখতো সুব্রত, মেয়েটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। সুব্রতকেই দেখে। একদিন বাস স্টাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুব্রত কথা বলেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল—'কোথায় যাচ্ছেন?' মেয়েটা প্রথমে লজ্জায় মাথা নীচু করেছিল। পরে নরম গলায় বলেছিল—'কলেজে। আপনি?'

এরপর অনেকদিন সুব্রত লক্ষ্য করেছে, বাস স্টাণ্ডে সুব্রত না আসা পর্যন্ত মেয়েটা তার বাসটাকে ছেড়ে দেয়। যেন ওর বাসটা আর কিছুতেই আসছে না এ রকম একটা মুখের ভাব করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

সুব্রত একদিন বন্ধুদের আড্ডায় এসে বললো—'আচ্ছা কি ব্যাপার বল তো? মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে যে ভালবেসে ফেলেছে।'

অজয় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সুব্রতর মুখের কাছে মুখ এনে বলেছে, 'বুঝেছি মামলা খারাপ। তা ও বড় খুসী ভালবাসুক, কাট নেই। কিন্তু ব্রাদার; তুমি ও পথ মাড়িও না। এ ব্যাপারে আমরা তোমাকে হেল্প করতে পারছি না। কারণ এ রকম অনেক কেস্-কেস্ দেখা আছে, তাই বন্ধু হিসেবে সাবধান করে দিলাম। কারণ তোমার চেহারা মানুষের মত হলেও, মানুষের মত কাণ্ডজ্ঞান তো নেই। প্রেমে পড়েই হচ্ছে: বিয়ে করার জন্যে ঐ সামনের বাড়ির বাবার কাছে ছুটবে। আর কাঠের উল্লুকের মত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলে বসবে—দেখুন আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। তখন সামনেবাড়ির বাবা তোমার মুখের দিকে চাঁদে অন্বেষণের কিরকম দেখার মত অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বলবেন—বিয়ে? তুমি করবে? কাকে? আমার মেয়েকে? মানে মিনুকে? তারপর উনি কড়িকাঠে মুখ রেখে অট্টহাসি হাসবেন। কিছুক্ষণ বাদে অতি কষ্টে হাসি থিসে জিজ্ঞেস করবেন, তা কি করা হয়? পড়াশোনা না চাকরী? তুমি একটু ইয়ে টিয়ে করে বলবে, আজ্ঞে, এখনও কিছু করি না। চাকরীর চেষ্টায় আছি। পেয়ে যাব...। তিনি শুধোবেন, পেয়ে যাব মানে? চাকরী কি বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে নাকি আজকাল? তুমি সামলাতে না পেরে বলবে আজ্ঞে না ...মানে চেষ্টা করছি তো...তাই...।'

কমল বললো—'তুমি তখন হোতে-লাতে থাকবে। আর উনি মনে মনে সাধা-বাড়ির বাবা গম্ভীর হয়ে মাথা নীচু করবেন। মোটা চুরুটে আগুন ধরিয়ে বলবেন,—হুম্! তুমি এ পাড়াতেই থাক তো? তাই না? তুমি তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে বলে বসবে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ওই সামনের সেউগুলা বাড়িটায় থাকি। ওই যে হলদে রঙের বড় বাড়িটা। ওই বাড়িতেই... ব্যস হয়ে গেল তোমার। ক্যাবলা কার্তিকের মত নিজের কাঁধে নিজেই পা দেবে। আর তোমাকে বাঁচানো যাবে না। সামনেবাড়ির বাবা গম্ভীর গলায় বলছেন—হলদে বাড়ি! সেউগুলা? কোন্‌টা বলছো?—ও ওই অবিনাশ-বাবুর বাড়ি? তুমি ওই বাড়িতে... মানে তুমি অবিনাশবাবুর ছেলে? হাই রুল। অবিনাশবাবু তো কোথায় যেন...কোথায় চাকরী করেন যেন... তুমি তখন তাও বলবে। আর গিন্নীমা বলবেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি জানি। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু ছি ছি ছি—তুমি ওনার ছেলে ...তুমি তো শুনেছি এম.এস.সি. পাস করে বসে আছ। চাকরী বাকরীর চেষ্টা করছো না কেন? তুমি তোমার বাবার লোমে হাত বুলিয়ে দেবে, আজ্ঞে করছি তো। অনেকগুলো ইণ্টারভিউও দিয়েছি। আর তার উত্তরে তিনি নির্ঘাৎ বলবেন চেষ্টাটা কেমন করছ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কড় নেই, জল নেই, দিন নেই, রাত নেই দেঁশি কটা ছেলেরা ঐচা ছেলের সঙ্গে সব সময় হয় চায়ের দোকানে, নয় কারো রুমে, নয় তো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছ। রাজা উজীর হাতি ঘোড়া কত মারছ। কথা শুনলে রাস্তায় কালপাতা যায়...তা বাপু এসব করলে কি আর হয়। চেষ্টা করতে হয়। চাকরী কি কেউ তোমাকে ঘরে বসে দিয়ে যাবে? এই দেখ না আমাদের সময়...তোমাদের মত এমন অলসভবে দিন কাটানোর কথা ভাবতেই পারতাম না—'

কমল মাঝখানে থামা দিয়ে বললো—'আর কেউ এসে জ্ঞান দিতে আসবে, নিশ্চয় তুই বরদাস্ত করতিস না। কিন্তু ভদ্রলোক যেহেতু কৃষ্ণকলির বাবা, সেই জন্যে তুই নাইকো মাথার মত মাথা নীচু করে অপমান স্বীকার করবি। ভদ্রলোক হয়ত আবার সুযোগ করবেন চাকরী বাকরী না জুটিয়েই বিয়ের কথা ভাবতে পারলে—বলিহারি। তারপর একটু দম নিয়ে সামনেবাড়ির বাবা হয়তো আবার বলবেন—তা ছাড়া, তুমি অবিনাশ-বাবুর ছেলে হয়ে...'

অজয় হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তোর এ কথা শুনে নিশ্চয় কারুর ইচ্ছে করবে—কেন অবিনাশবাবুর ছেলে তো কি হয়েছে? বেদ-উপনিষদে কিংবা ভারতের সংবিধানে কি লেখা আছে যে—যেসব অবিনাশবাবুর পুত্রেরা কখনও কাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে না। অথবা ভালবাসিয়া কখনও বিবাহাদির মত দুষ্কর্ম করিতে পারিবে না? কিন্তু তুই তো বোকা পাঁঠা। এ সব কিছুই বলতে পারবি না। কৃষ্ণকলির আশা পরিত্যাগ করে বাড়ি চলে আসবি। আর বর্ষা শ্রেণিকক্ষের যে সব সিমটেম্ দেখা যায় সেই সবে ডুবাবি। যেমন সারা রাত জেগে জেগে পাহাড়ায় করা, ঘন ঘন সিগারেট্ খাওয়া। মাথার চুলে তেল না দেওয়া, কারো সঙ্গে ভাল করে কথা না বলা, দাড়ি না কামানো, দীর্ঘদিন জামা না পাল্টানো, মাসের শুরুতে কাউন্সুক্লের মত চোখ করে যখন তখন দর্শন আওড়াবি। এই আর কি। —হাই জাম্পিলাম,—ও সব কৃষ্ণকলির বাপ্পা ছাড়ু। ওদের পিছনে ছুটলে কপাই বাড়বে। তার চেয়ে...'

অজয় আর কমলের এ সব কথা শুনে সুব্রত হাসতো না। সিগারেট টানতে টানতে হাসতো।

সন্ধ্যে পেরিয়ে গেলেও ওরা কেউ ওখান থেকে উঠতো না। বেঞ্চ-এর গায়ে ঝাঁকড়া গাছটার আরও অন্ধকার জমাট বাঁধতো। পাখীগুলো লণ্ডভণ্ডগোল করতো রাতের আশ্রয় নিশ্চিত করার জন্যে।

এই সময়ে সামনের বাস স্টাণ্ডে কোন মেয়ে এসে দাঁড়ালেই ওরেকটা চোখ টান হয়ে যেত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শরীর দেখতো মেয়েটার। নিজেদের মধ্যে অশ্লীলতা করতো। নিজেদের মধ্যে অশ্লীলতা করতো। নিজেদের মধ্যে অশ্লীলতা করতো

কত ডাকতো কোরেলা ওর জন্যে। অঞ্জনের কণ্ঠটাকে, কলশোকে নিজের করে নিতে চাইতো। অঞ্জনকে আশ্চর্য হতে দেখলে ছেলেমানুষের মত ওকে ভোলাতো। ওকে শান্ত করতে চাইতো। ভীষণ আশ্চর্যরকম হয়ে অঞ্জনের হাতে নিজের গাল ছুঁইয়ে বলতো—'তুমি যদি এমন আশ্চর্য হও, তাহলে আমি কি করি বলতো?'

—কিন্তু কোরেল, তুমি বুঝতে পারছ না, একটা কিছু না করতে পারলে, মানে, একটা...'

অঞ্জনকে থামিয়ে দিয়ে কোরেলা বলেছে—'জানি, সব জানি। কিন্তু কি করবে বল? আশ্চর্য হয়ে তো কোন লাভ নেই। কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অঞ্জন কোরেলার কথা শুনেছে। ওকে কথা দিয়েছে, এমন আশ্চর্য হবে না। হতাশ হবে না। কিন্তু এর জন্যে অঞ্জনের কিছু অন্যায় আব্দারের কাছে কোরেলার কুমারী মনকে ভীষণ হতে হয়েছে। কোরেলা তাতে রাজি হয়নি একটুও। অঞ্জনের বলিষ্ঠ বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে দূরে কণ্ঠ গানের ভঙ্গিমায় ওকে বলেছে—সব সময় কেবল বুদ্ধিহীন বুদ্ধি। আর ইন্টারভিউ দিতে গেলে শুধু মাথার একটুও বুদ্ধি খেলে না। না?'

কোরেলায় ডাকিনো ভরপুর হয়ে ফিরে এসেছে অঞ্জন। কোন দুঃখে আর ভাবে হয়নি। সারা রাত কোরেলাকে ভেবেছে। কিন্তু ওকে একটা কিছু করতেই হবে। হতাশ ও হবে না ঠিকই। তবে চাকরী ওকে পেতেই হবে। কোরেলার জন্যেই পেতে হবে। কোরেলাকে পেতে।

এতক্ষণের ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা চেপে নামলো।

...কোরেল ফোনটা পেয়ে খুশী হতে পারেনি। ও আসতে চাইছিল না। বলেছে কাজ আছে। কি এমন কাজ থাকতে পারে কেরী অঞ্জনের কাছে আসার চেয়ে জরুরী? সাঁঝাদি বলছিল—কোরেলা নাকি সুব্রতদের বাড়ি প্রায়ই যায়। সাঁঝাদি খুব সহজভাবেই বলেছে কথাটা। 'এই আড্ডা-টাড্ডা দিতে যায় হয়তো।' কিন্তু যে কণ্ঠস্বরে মধ্যে অঞ্জন অনুপস্থিত...সেখানে কোরেলা আড্ডা দিতে যায়। অঞ্জন ঠিক মেলাতে পারে না ঘটনাটা। কি করে এমন হয়। কোরেলা...যে কোরেলা ওর হাতে গাল ছুঁইয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতো, ভবিষ্যতের আশ্বাস দিতো, উৎসাহিত করতো, সেই কোরেলা...

বৃষ্টি থামার অনেক পরে কোরেলা আসে। অঞ্জন লক্ষ্য করে, ওর চোখের দৃষ্টিতে একটুও স্নিগ্ধতা নেই।

অঞ্জন কোরেলার চোখে চোখ রাখলো। মুহূর্তে খুব দামের মানুষ হয়ে গিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল —'কেমন আছ?'

—'ভাল'। এক কথায় উত্তর দিয়ে কোরেলা বললো, 'ডেকেছ কেন? যা বলবার ফোনেই বলতে পারতে।'

অঞ্জন ঠোঁট ছড়িয়ে হাসলো। বললো —'চলো কফি।'

—কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবে?'

—কেন, বৃষ্টির মধ্যে কি আমার সঙ্গে কখনও কোথাও যাও নি? আজ কি নতুন কিছু করছ?'

—তা নয়। তবে আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। তাই বলছি।'

অঞ্জন কথা না বলে শুধু হাত মেলে বৃষ্টি মেখলো। তারপর হাঁটতে সুরু কোরেল। কোরেলা পাশে। একটু ছেঁটে ওরা সেই পুরোনো জায়গায় এসে গেল। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় জন্যে আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। হাওয়ায় হাল্কা শীত। অঞ্জন কোরেলার জলে ভেজা ঠান্ডা হাতটা তুলে নিল হাতের কাছে। উষ্ণতা খুঁজলো। কোরেলা অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

ওর চুলে কাঁচের টুকরোর মত বৃষ্টির কুচি। কানের লতিতে ঝলার এখনও জল। জেলা ঘিরে আশ্চর্য স্নিগ্ধতা। অঞ্জন কোরেলার জেলা মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আস্তে ডাকলো—'কোরেল'।

কোরেলা মুখ ঘোরালো। চোখ টান করে দেখলো অঞ্জনকে। অঞ্জন আবার বললো—'আমার কিছু ভাল লাগছে না কোরেল। কিছু ভাল লাগছে না।'

—কেন, ভাল লাগছে না কেন? এখন তো চাকরী পেয়ে গেছ।'

—চাকরীটাই কি জীবনে সব কোরেলা?'

—'বর্তমান সময়ে সব বই কি।'

—না,—কোরেলা না। আমার তুমিই "সব"। চাকরী নয়।'

—কিন্তু আমি যখন সব সময় তোমার পাশে থাকতাম তখন তো তুমি চাকরীই খুঁজতে।'

—খুঁজতাম। সে তো তোমারই জন্যে কোরেল। তোমাকে পাবার জন্যে।'

কোরেলা সরে দাঁড়ালো। ঝলা কোরেলা, 'সৌজন্য মুখ? চাকরী পেয়েছো ভাল। ভাবনা নেই। চিন্তা নেই। কোন কল্পনাও নেই। বেশ সুখে আছ। এখন আমার...' কথাটা শেষ না করে বিদ্রূপের হাসি হাসলো কোরেলা।.

বৃষ্টি আর নেই। কিন্তু সারা আকাশে থমথমে কালো মেঘ জমাট বেঁধে রয়েছে। নীচু জমিতে জল জমে গেছে। যেন, ছোট ছোট পুকুর।

অঞ্জন স্থির চোখে কম্পমান কোরেলাকে দেখে নিয়ে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। কোরেল শক্ত হয়ে রইলো। অঞ্জন কোরেলার মাথাটা বুকের কাছে ঝুইয়ে রেখেই বললো, 'কোরেল, আগের মত তুমি কি আমার দুঃখ আর বুঝতে পার না? আমার কথা মনে পড়ে তোমার কি কষ্ট হয় না?'

কোরেলা এবার ছিটকে সরে এলো। রুক্ষ গলায় বললো, 'কেন কষ্ট হবে কেন? তোমার তো এখন আর কোন কষ্ট নেই। তুমি তো এখন বেশ দিব্যি আছ।'

—না কোরেলা, তুমি বিশ্বাস কর আমার ভীষণ কষ্ট...'

—তোমার একটা যাচ্ছেতাই কষ্টকেই তুমি বড় করে দেখছো। কই আর কারো কথা তো তুমি ভাব না? জানো, সুব্রত দিন দিন কি রকম আপসেট হয়ে পড়ছে। ওর মা সেদিন বলছিলেন ওঁর নাকি খুব ভয় করে। যা ছেলে কোনদিন না কিছু একটা করে বসে। কথাটা শুনে আমারও খুব ভয় হয়ে গেছে। তুমি তো ওদের কথা ভুলেই গেছ। একবার যাবারও সময় পাও না।'

অঞ্জন বিরক্ত হোল। বললো, 'ভুলিনি কোরেল। ওরাই আর আমাকে নিজেদের মতো ভাবতে পারে না। আমি অনেকদিন ভিরেছি, মনে হোল কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব। আগের মত নেই কেউ। আমাকে হয়তো ওরা আর পছন্দ করে না। চায়ও না। কারণ কি জানি না। তবে বুঝতে পারি। একদিন আমি নিজে সিগারেটের খাবার সময় সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম ওদের দিকে, যে অঞ্জন রোজ আমার কাছ থেকে নিয়ে সিগারেট খেত, সেই-ই আমার প্যাকেটটা বিশ্রিভাবে করে ঝিড়ি ধরালো আমার সামনে। এ অপমানের পরও তুমি আমাকে...'

অঞ্জনের দুঃখের কথা কেড়ে নিল কোরেলা। 'এ সব তোমার বলা উচিত নয়। নিজে এখন নিশ্চিন্তে আছ তো তাই ওদের দুঃখটা আর বুঝতে পারছ না। বুঝতে চাও-ও না।'

—ওদের নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না কোরেলা। তুমি আমাদের কথা বল। তোমার আমার কথা।'

—আমার এখন সময় নেই। একুনি যেতে হবে। ওরা আমার জন্যে ওয়েট করে থাকবে।'

অঞ্জন কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করে —'ওরা মানে? কারা?' নির্লিপ্তভাবে কোরেলা বলে—'সুব্রতরা'। কথাটা বলেই কোরেলা শাড়ি গুছিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। তারপর জমা জলে পা ফেলে সাবধানে শাড়ী সামলেই হনহন করে পথ চলে এগিয়ে চললো।

এতক্ষণের থমথমে কালো মেঘটা হিংস্র নেতো হয়ে হাওয়ায় দুলছে শুধু। মাঝে মাঝে গুঁড়ো গুঁড়ো জলের মত ভেসে যাচ্ছে বাতাসে। মেঘলা দিনে যায়। গাছের পাতায় সরসরে জল। বুকে টান জমাবতী ফুল— এ সব এখনি অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু কোরেলা হতে দিল না। সব মাবারুল করে দিল।

অঞ্জন কোরেলার সঙ্গে এলো কিছু-দূর। যদি কোরেলা কিছু বলে। যদি কোরেলা ফিরে আসে। কিন্তু না, কোরেলা ফিরলো না। কিছুদূরে গিয়ে ও হাত তোরালো। মমতাহীন গলায় শুধু বললো, 'চলি অনেক দেরী হয়ে গেল।'

...সুব্রত ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। সুব্রত নাকি খুব আপসেট হয়ে পড়েছে। কোরেলার ভীষণ ভয়, যদি কিছু একটা করে বসে সুব্রত...

কোরেলা সুব্রতর জন্যে ভাবছে।

অঞ্জনের মনে হোল সুখের মধ্যে থেকে কোরেলা দুঃখের জন্য ভাবছে। সুখের মধ্যে গিয়ে দুঃখকে হারাবে না। কোরেলা, বুঝতে জানো। কিন্তু কোন্ দুঃখ? কেমন দুঃখ? অঞ্জন বুঝতে পারল না।

—ক্রমশ—

## ক্যাপ্টেনের সেই নর্তকী

(২৬৮ পৃষ্ঠার পর)

পড়ছে রেখার। চকচকে হাসি মুখ।

হঠাৎ সেই সৈনিক ফিরে তাকালো। আস্তে আস্তে বললো, "জনতার, পরাজয় নয়, মনোবলের নিয়ে সব কাজ হয় না। কিন্তু তারা পারিজেছেন—তাই কিছু বলিনি।"

সারা শরীরে রক্ত ছুটে গেল রেখার, "তুমি—"

সুলতানও থোঁতাতে থোঁতাতে বললেন, "কোন্ দো তুম্?"

এতক্ষণে রেখার মুখ খুলে এসেছে, "কে? আপনি কে?" চার-পাশটা একবার চোখ বুলিয়ে নেয় সে। "শেল শিয়াল্‌ডিন, বেহেতু তুমি আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র এ পৃথিবীতে আছো, তাই শুনে যাও —ইনি বঙ্গসেন রায়। তোমার হিন্দু সন্তানের অধেক রায়, যাকে তুমি অপমানিত, লাঞ্ছিত করে বিনাদোষে বরখাস্ত করেছিলে, ইনি তাঁর একমাত্র পুত্র। আর আমি এঁর বান্ধবী বন্ধু পদ্মা। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন বলে অধেক রায় দীর্ঘদিন ধরে আমায় তৈরী করেছেন। আজ আমার কাজ শেষ। তোমার বাঈজী রেখাকে মাকরাস্তা থেকে সরিয়ে আমি এসে ঢুকেছি। তার পোশাক বদলে বাঈজীর সাজে সেজেছি। আর ইনি এসেছেন..."

—"প্রচুর উৎকোচ দিয়ে এক সৈনিক আর খোজাদের বশীভূত করে।" শেষ করলেন বঙ্গসেন রায়।

শেষ কথাটা আর সুলতানের কানে পৌঁছালো না।

—শেষ—

# "দিনশেষের শেষ খেয়ায়"

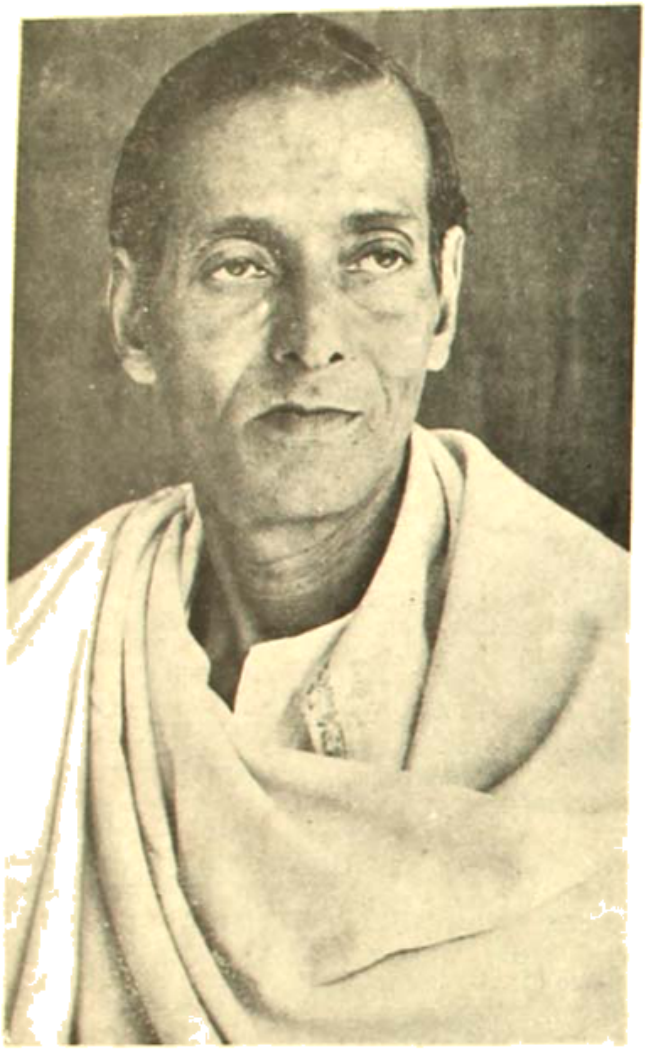

অমাপদ চক্রবর্তী

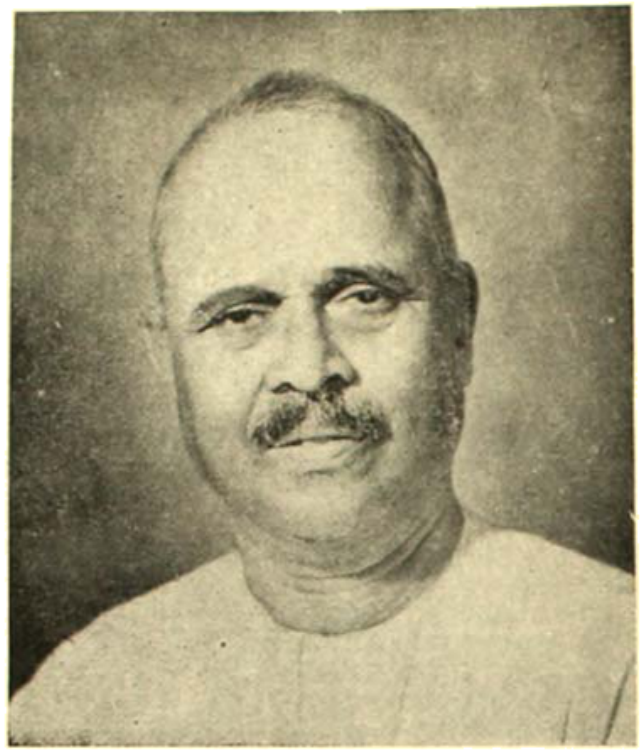

বিনায়কবাও পটবর্ধন

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫। ২৬২ ডিগ্রি ফারেনহাইট গা পোড়ার জ্বালা হিন্দোল-এ এখন বিশ্রামের ছায়া নামছে। এমন সময় এক সংগীতজ্ঞ তাঁর অন্তরঙ্গদের সংগীতবাসর হাসি করে আর এক জগতের সুরসভার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

মাত্র উনি করেই গেলেন এক বেশ ঝিমধরানো চেহারাই। পূর্বপুরুষরা তাঁর ধমনীতে সুরের বীজ কতোটা নিয়েছিলেন, সে তুলনায় কণ্ঠটি তাঁকে তুলে নেবার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন অনেক কম। এই প্রতিকূল পরিবেশের কাছে মাথা নীচু করেনি সেদিনের সেই ছেলেটি—নাড়ু। কাঁকিনাড়ার ভেটারিনারি ডাক্তার থেকে পাড়ি দিয়েছে সোজা কলকাতা। প্রথমে ঠিকে মাথা গোঁজবার ঠাঁই তবু একটু জুটেছিল—তারপর কেবল তব কুটপাথ। কুটপাথে থাকে তার গান শুনে বেতার ঘোষিকা ঘোষাই, মৈত্রীশিল্প, শিক্ষিকা চক্রবর্তীর। শোনে আর গলায় তুলে নেয়। শ্রুতিধর।

তখন কতই বয়স, কতটুকুই বা শিক্ষা: সেই বৈদ্যবাটি যাবা-কালা। কৃষ্ণচন্দ্র ও রামচন্দ্র। মাত্র সাতকড়ি মালাকার। পরে অবশ্য শিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে নিয়মিত তালিম নেন। সময়ে মাত্র উনি করেই একদিন সংগীতসমাজে প্রবেশ করেন। উপাধির ওপর দুর্বলতা তাঁর ছিল না। তবু চব্বিশপরগনা সংগীত-সমাজ 'সংগীতাচার্য', কিন্তু সম্মিলনী 'সংগীত রত্নাকর' এবং কৃত্তিবাস সংগীত পরিষদ তাঁকে 'সংগীতবিনিধি' উপাধি দিয়ে সম্মান জানান। সম্মান জানান পশ্চিমবঙ্গ সংগীত নাটক একাডেমী, দিল্লী সংগীত নাটক একাডেমী 'ফেলো-শিপ' দিয়ে।

সাতষট্টি বছর বয়সে চলে গেলেন বাংলা ঠুমরি গানের প্রবাদতুল্য শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। কিন্তু রেখে গেলেন অনেক। একটি সংগীত পরিবার, যেখানে পুত্র-কন্যা-জামাতা সকলে শিল্পী। রেখে গেলেন চারশত ক্যাসেট অব মিউজিক, সুরতীর্থ সংগীত প্রতিষ্ঠান, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এবং সেই কণ্ঠ সৃষ্ট রাগ—ছায়া হিন্দোল, নন্দনী, নবমালিকা ও মহলার ঘরানার জনয়িত্র।

হরীন-হরীন কিছু মানুষ চোখে পড়ে ভিন্ন-সংস্কৃতি যাঁদের জীবনের ভিত্তিমূলে। একে আশ্রয় করেই যাঁদের জীবন শাখা-প্রশাখা মেলায়—শিকড় চালিয়ে যায় মাটির গভীরে। সম্প্রতি পরলোকগত সংগীতশিল্পী বিনায়কবাও পটবর্ধন এই বিরল সাধকদের একজন।

হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের একজন খ্যাতিমান হয়েও সেখানেই আটকে থাকেন নি তিনি। সুকুমার কলার বেশ কটি শাখায় বিচরণ করেছেন সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যে। অভিনয় করেছেন, নাটক লিখেছেন, এমন কি চলচ্চিত্রে নেপথ্য কণ্ঠে গানও গেয়েছেন।

কিন্তু তাঁর আজীবন সাধনার সবচেয়ে উজ্জ্বলতম ফসল হলো সংগীত। খেয়াল, ঠুমরি ও ভজনে তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক। বিষ্ণুদিগম্বর পালুসকরের মতো আসরের শিল্পী বিনায়কবাও পুত্রের নামে 'বিষ্ণুদিগম্বর সংগীত মহাবিদ্যালয়'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা করেন পুণার 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়'-এর।

শুধুমাত্র কণ্ঠসাধনে নয়, সংগীতকে বেশবার ছড়িয়ে দিতে কলমও ধরেন তিনি বেশ শক্ত হাতে। সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ হয় 'রাগবিজ্ঞান', তিন খণ্ডে 'বালসংগীত'। এছাড়াও আছে 'তবলা মৃদঙ্গ বাদন পদ্ধতি' এবং দুখণ্ডে শুধু পালুসকরের জীবনী।

ঐতিহ্যপূর্ণ মোরালির ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা এই শিল্পীর জন্ম ১৮৯৮ সালে মহারাষ্ট্রের মীরজে। মাইল পড়তে পড়তে সংগীত জগতে প্রবেশ। সংগীত নিয়েই বেশ-বিদেশে সফর। এরই কারণে ১৯৭২ সালে 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ।

কলকাতাবাসীদের একজন অত্যন্ত প্রিয় এই সৃষ্টিশিল্পী বিনায়কবাও পট-বর্ধন পুণার ২৩ আগস্ট, ১৯৭৫ সকালে মহাপ্রস্থানের পথে যান একনিষ্ঠ সাধনার এক অনির্বাণ ধারা বুকে জ্বেলে ভরে এগিয়ে দিতে অনাগত দিনের সুরপিপাসু পথিকদের মত শুদ্ধ কৃতি শিল্প-শিল্পার।

[১১ আগস্টের সন্ধ্যায়, ঠিক ১-৩০ মিনিট ব্যাপী আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে বিনায়কবাও পটবর্ধনের সংগীত পরিবেশিত হবে।]

—বিজনকুমার

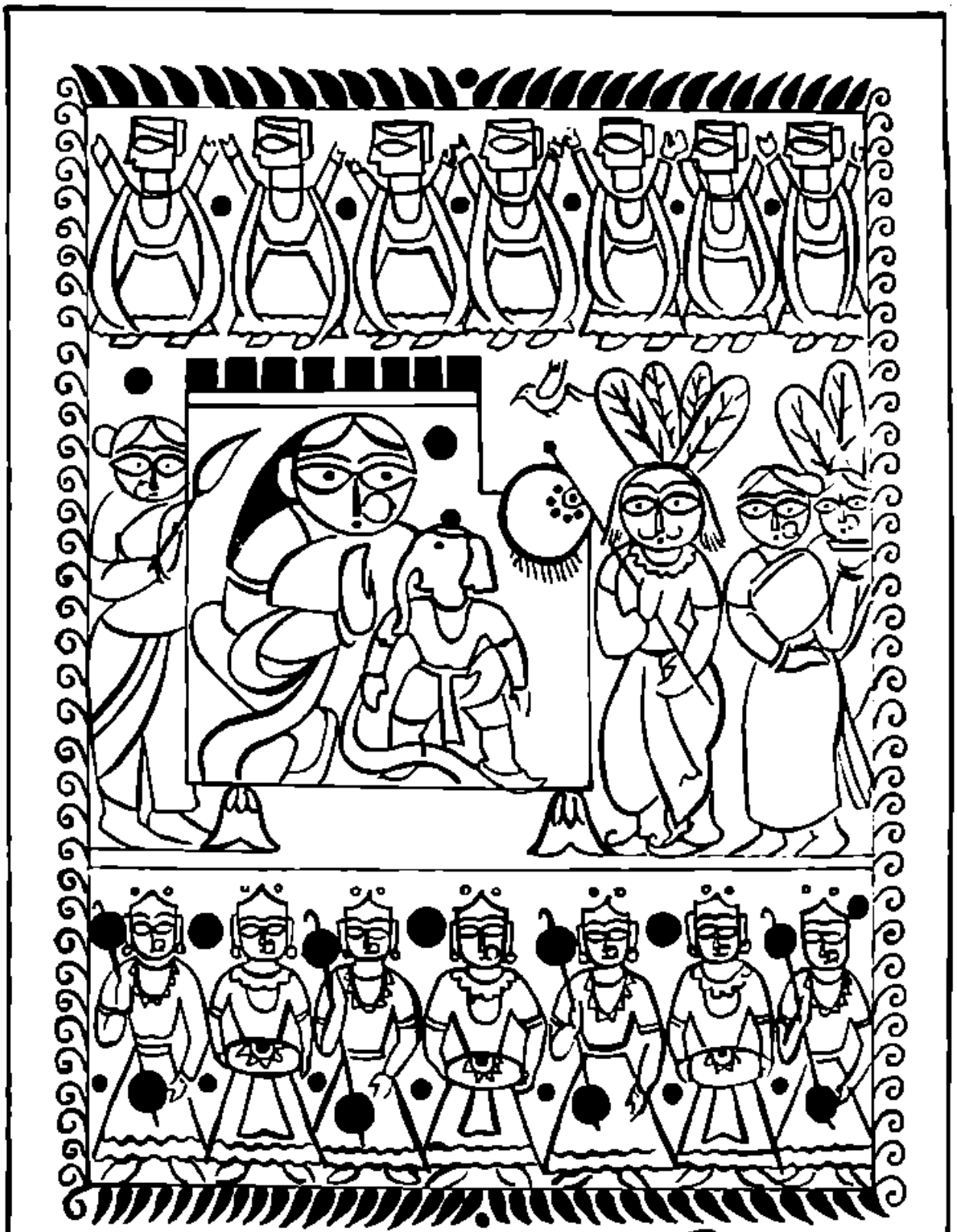

সীতেশ রায়

# কবিতা

## সূচীপত্র


ঘড়িটা—প্রেমেন্দ্র মিত্র
বৃষ্টি?—দিনেশ দাস
হাওয়ায়-হাওয়ায়—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
অরণ্যপুরী—পূর্ণেন্দু পত্রী
বকুলের সঙ্গে—শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
ভারত—বিমলচন্দ্র ঘোষ
কালশিরা—লোকনাথ ভট্টাচার্য
ভালোমন্দ, পাপপুণ্য—বটকৃষ্ণ দে
হঠাৎ একদিন—বিজয়া মুখোপাধ্যায়
সীমানা পেরোনো—মণীন্দ্র রায়
কাসান্দ্রা—প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
নিয়মের বাইরে—দক্ষিণারঞ্জন বসু
সীমানায় শেষ সম্বোধন—বিমল সেন
এক উল্টো পাজামার কাহিনী—গোবিন্দ চক্রবর্তী
বৃষ্টির গান—দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়
বিকেলের ব্যক্তিগত—ফণিভূষণ আচার্য
'বামী' ও 'আমি'—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
অনন্তকে শুধু অনুভব—রামেন্দ্র দেশমুখ্য
সবাই মিলে করবো কাজ—স্বপনবুড়ো
সিঁধ কেটেছে বনমালী—শান্তনু দাস
নাগরিক—সুশীলকুমার গুপ্ত
রোদ বাড়ছে—প্রভাকর মাঝি
পাগলা-গারদী ছড়া—অজিতকৃষ্ণ বসু
প্রতীক্ষা বা প্রেমিকা হে—রত্নেশ্বর হাজরা
আত্মসাৎ—সাধনা মুখোপাধ্যায়
পোস্টম্যান—কৃষ্ণধর
শ্লোক—কুমকুম দে
লিমেরিক—উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
ছদ্মবেশে—জগন্নাথ চক্রবর্তী
আমার দুঃখ/আমার দেশ—পরমানন্দ সরস্বতী
লিমেরিক—সৌম্যেন সিকদার
স্মরণে—গোপাল ভৌমিক
শুধু নাম—নবনীতা দেবসেন
দাও কিছু উষ্ণ রূপ—পলাশ মিত্র
কথা ছিল—শোভন পাঠক

# ঘড়িটা

হেমেন্দ্র বিশ্ব

সময় থাকার নয়,
এ ঘড়িটা,
নয়, নির্ভুল হিসেবের ছকে
সূর্য ওঠা থেকে ডোবা,
আর সন্ধ্যাতারায়
শুকতারা হয়ে ফেরার হিসেব
পল বিপল ঘরে শুধে যাবার জন্য।

বন্ধ হলেই ঘরে ঘড়িটা
—চলে আর চলে।
শুধু ঘণ্টা মিনিটের কাল-কাঁটা
কাঁচে ঢাকা এর মুখটা
কেমন যেন কৌতুকের মাখন হাসি নিয়ে
ওপর দিকে ঘরে ওল্টানো।

মেরামত করানো যায় ঘড়িটা।
করাই না।
যে দিকে চাই,
শুধু তো হাতঘড়ানো
হিসেবের নিকষের কষনা।
পরমাণু থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
অনাদি অনন্ত অবিরাম
চক্রগতির মধ্যে,
থাক না এ ঘড়িটা
সব অঙ্ক-এড়ানো
সৃষ্টিছাড়া স্বতন্ত্রতার
একটা অলীক 'ওরোসিস' হয়ে।

# বৃষ্টি ?

বিনোদ দাস

ঘুমের আকাশ
শুধু বৃষ্টি পড়ে একাদশ,
ঘরে আছে কল্পনার ধারা
ঘুমের আকাশ আর ঘুমের তারারা।
বর্ষণের প্রহরের পাখির মতই
একটি নীড়ের কোণে আমিও ঘুমোই।

হঠাৎ কখন জাগি ঃ মেঘে মেঘে ঝড়,
হাওয়া যায় সহসাই সাগরের মতন যেন
মাঠের উপর দিয়ে বনের উপর।
ঘুরন্ত বৃষ্টির ঝোঁটা ঝাপটায় নিখিলে ছেয়ে ঘুরে
ঘুরে ঘুরে শুনি তার অশান্ত আকাশ ঃ
এখনো কি বৃষ্টি হয়?
বৃষ্টি কি হয়েছে একেবারে?
মনে আসে বিস্ময়, সংশয়,
হয়তো নিঃশেষ হতে পারে কখনো সহসা অকস্মাৎ।
মানুষের নিষ্ফল কামনা যেন কখনো নিভৃতে,
কখনো মস্তিষ্ক দিয়ে
কখনো বা ক্ষিপ্ত হিয় আকাশে হাঁপায়ে॥

# হাওয়ায়-হাওয়ায়

শীতলকুমার চক্রবর্তী

ভাল লাগবে বলেই বারবার ছুটে আসি।
অথচ লাগে না, তাই
ফিরে যাই।
এই যে উৎকণ্ঠা, এই ব্যাকুলতা, ভালবাসাবাসি,
এ কি তবে মিথ্যা, এ কি মায়া?

অতলান্তে জমেছে মেঘ, মনের উপরে তারই ছায়া
শুয়ে আছে।
অনেক দূরে ও দূরে কারা
যেন খুব শলাপরামর্শে কথা-চালাচালি হয়ে যায়।
হাওয়ায়-হাওয়ায়
ভাসে তার একটুখানি রেশ।

খুব নির্বিরোধ
এই মেঘাচ্ছন্ন দিন, এই যাওয়া-আসা
রোদ্দুরে ও মেঘে, মিথ্যে হাওয়ার ভিতরে
দুরুদুরু
এই শান্ত ভালবাসা, এই ভালবাসা।

# অরণ্যপুরী

সুধেন্দু পাত্রী

মানুষের সুখী হওয়া উচিত এখনে।
অনন্ত ছড়ানো এই অরণ্যপুরীতে
সুখে আছে গড়নো বুকিতে
ফুটছে পাকা আলুথালু খোকা খুকু, লতায় ঝুলিছে।
অহেতুক বালি খুড়ে খুড়ে
সুখ পাবে শুনো হুক ছুড়ে।
ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ঘুলো ওড়া পথের ধুপদে
ডাকলেই বুঝি কাছে আসে
খাল ও সেখানে, দীর্ঘ ইউকেলিপ্টাস
সুখের ঠিকানা তারা আরো জানে, অনেক বছরের বাস।
ছোট টিলা, বড় টিলা কেনোটা অরণ্যে কেউ কালো
পা এলিয়ে গলল কিংবা
গোপন চোখের পক্ষে ভালো।
রাত্রিতে অনেক, নয়, বাঁশী হয়ে ঘুমে সাওতাল
মহুয়ায় ঘোতাল ঘাতাল।
ঘুমে পাবে, ক্লান্ত ঘুম, স্বপন ও শরীরে মাখামাখি
ভোর হলে ডেকে দেবে কেনো খন্ত
কিংবা কেনো পাখি।
ঐখানে নৈঃশব্দ কেন
ঐখানে কোলাহলে উঠোন
একদা যা ঘুরে গেছে গোধূলির ঘাটে এলোচুলে।
সমস্ত দিনের শেষে সূর্য তার লাল জামা খুলে
নদীর কিনারে শোয়, সন্ধ্যারত বালির বিছানা।
আকাশ এখনো তার প্রতিটার স্পর্শে গায় রাঙা।
পরপরে সরল পাহাড়।
দাঁইয় যেমন গাছে লোকে রাখে আকাশের উদাসীন ঘাড়
মানুষের সেই মত সুখী হওয়া উচিত এখানে।

# বকুলের সঙ্গে

শকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

দুটি ছেলে-মেয়ে এসে নিচের বোঁজাতে বসেছিল।
ওদের সাহস কম, ইচ্ছেটা প্রবল;
নিজেদের মধ্যে ওরা বকুলের কাছেই দিয়ে মেয়ে।
ছায়া ও চন্দন।
সেই ছেলে অন্যমনস্ক বিষণ্ণ
যখন তখন গাছে কাঁটা বিঁধে, বকুলের
ফুল ঝরে যায়।

"বড়-মা মনের মধ্যে পালাপালি,
ভালোবাসাবাসি করে, গাছেরা পারে না।"
এ কথা শুনেই কাল কৃষ্ণচূড়া হঠাৎ কেমন
অন্যমনা হয়ে
ছুঁয়ে দিল বকুলের পাতা।

ওরাও বিষণ্ণ, তবু শিউরে শিউরে
বকুলের ফুলে পরে কৃষ্ণচূড়াটির.....
অন্তরে ওরাও পাশ-বাঁধনো কলকাতা।

# ভারত

বিমলচন্দ্র সেন

(ফ্রান্সেসকান মোনাস্টরি মুখে মহাত্মার অবস্থান।)

সন্ধ্যার ঘুমন্ত পকৃতলা স্তব্ধিতা
চক্ষু চঞ্চল, ওষ্ঠ স্ফুরিত;
বক্ষতটে হিনি যেন রক্ষা সুকুমারে
ন্যস্ত করতে লাগলেন।
গুরুগম্ভীর স্বরে ও যেন ধ্বনি করে বললেন,
"তোমার অতুল থাকলেও ইতরজনের মতো
কথা বলছ কেন?
সহ্য করো, নিজেকে বলে নিজেকে
অসম্মানিত কোরো না।
আমি তোমার কাছে
ধর্মসম্মত ন্যায়সঙ্গত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের
প্রার্থনা নিয়ে যাচিকা হয়ে এসেছি।
আমার কথা যদি না শোনো
তোমার মস্তকে শতধাবিদীর্ণ হবে।
আমাকে ত্যাগ করো সুখ নেই
কিন্তু এই হতভাগ্য ছেলেটিকে তোমরা
ওকে তুমি ত্যাগ করতে পারো না।"

দুষ্মন্ত বললেন,
"তোমার গর্ভে আমার পুত্র জন্মগ্রহণই পারে না।
নারীশ্রেষ্ঠা মিথ্যাবাদিনী!
তোমার মা যেমনি অসতী ও নির্লজ্জা,
তোমার ধর্মা ন্যায়পরায়ণা, কামুক, হৃদয়হীন।
তুমি দুষ্টা তপস্বিনী
আমার সামনে থেকে দূর হও।"

শকুন্তলা বললেন,
"তুমি দুর্জন তাই সজ্জনকে দুর্জন বলছ
তোমার ধিক্কার জবাব দিতে আমার ঘৃণা হয়!
আজ আমি তোমার রাজসভায়
পত্নী নিয়ে পরিত্যক্তের সম্মানে
উচ্চস্বরে বলে যাচ্ছি :
আমার এই সিংহশিশুর পুত্রই একদিন
আসমুদ্র হিমাচল জম্বুদ্বীপ শাসন করবে।"

শকুন্তলাপুত্র ভরতই ভারতবর্ষের প্রথম
ভারতের মহাসম্রাটই ভারত।

বাণিনী মুখোপাধ্যায়

# কাশ্মিরা

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বেশ হয়েছে, খুব ঘোরাঘুরি করা যাবে, চোখের কোণে কালি, জানছ না অন্যকে নির্বাসন দিয়েছ তোমার কথা ভেবে ঘর ভেবে, নিজেরি অন্তরের অন্তরীক্ষ হয়ে, শুধু শহরটার চোকাতে ফিরে-ফিরে আসা মাতালের মতো ইচ্ছার অত্যাকাঙ্ক্ষী দেহে উন্মন হয়ে ওঠবে, সাপ কিলবিল করছে শিরায়, তাই যেখানে শান্তি নেই তোমার

সংসার স্নেহের যা-কিছু নিয়ে এই ঘরে, মেয়েদের ছবি যা কুলুঙ্গির কৌটো, সবই একটা অভিমানের পুনরুক্তিতে এবার চাবি-চাবি তাল হারাবে, মুখে-চোখে তাদের শপাং-শপাং চাবুক, উদ্বৃত্তে কালশিরা, যা ছিল একদিন প্রীতিভাজনের কালি, প্রীতি চেয়ে ছন্দ, ঘাড়ে সোহাগির মহুল,

আজ তা রসকষহীন ঠাটার ছিবড়ে।

তবু যাবও, তোমারই মতো, যেহেতু অভ্যাসের জল ফিকেছে বলে-বলে, তাই চাইত্রে আজও আমি কাঁর যা করতে বেরোই আমি ঘরে।

যেন তোমার নেই, তাদেরও নয়, হয়তো আমারও নয়—কিন্তু খেলার একাধারে নায়ক-প্রযোজক-পরিচালক হলেই আমি যে খানি বৃষ্টির জন্য চাই-ই চাই, শুধু দানই নয়, একটা সিঁড়িতে ওঠা, একমাত্র যেখান থেকেই সম্ভব উদ্ধারণ বা তাকানো নতুন চোখে।

ভুলে গেছ, তুমিও একদিন সৃষ্টি চেয়েছিলে।

আজ তাই এসেছি ফিরেই যাব বলে, কিছু না করে, ক্লান্তি চোখে দেখতে নেশার খানা না পাওয়ায় তোমার হাইকোর্টানি, মেয়েলে-মেয়েলে ঝাঁকিয়ুলো খাত-বিক্ষিপ্ত। যাবার সময় যাওয়া ফেরাবে না, অন্তে তোমরা যাবা কিছুতে ফেরাবে না, শুধু আমারই গায়ে-মাখা হাওয়া পড়বে বসে-বসে, তারও পাও কলাবীর সহকেত, যাতে জলা অন্তরের গ্রাম উঠেকো অঙ্কে ঘুঁটি-একটি বিচ্ছিন্ন কথা ছেয়ে যায় তার সুখ দুঃখের—যাওয়া খোলা যাক, অন্তত তর্তমান ঘর্তমান-না আবার ফিরে আসে যত ঘরে।

আমি অবশ্য কলাবীতি আসবেই যাবব, মেয়েই সন্ধ্যায়, নেশার খানা যেখানে নয়, শুধু উসকানি দিয়ে নেশাকে জীইয়ে রাখতে, তবু কলাবীই তো, চাই না চাই না দেখতে আর উদ্বৃত্তে কালশিরা, চোখের কোণে কালি, ঠাটার ছিবড়ে।

সব যায় মুছে ছেলে শপাং-শপাং চাবুকের, নিন্দার, আমার খেলার।

# ভালোমন্দ, পাপপুণ্য

অরুণ সে

ভালো কী, যা ভদ্র কে, তা তো জানি না।
পাপ করে বলে, পুণ্য মহান আছে কিনা
তা-ও জানা নেই।
জানা আছে,
ভালো লাগে, কি লাগে না—
শুধু এ-টুকুই, এর বেশী না।
এর বেশী বর্ণন ধর্মের কাজ, শতাব্দীর বিষয় এবং
দুর্বোধ্য ভাবনা ;
তার সঙ্গে মিশে যাস নেই—
মন, তুমি এই সব জটিলে যেও না,
জটি-ও বুঝো না।
যদি,
কোনোদিন
নির্জনতে নিজের এ'কে আড়ালে খোলুলি বসে
অপরূপ সাজে,
অথবা,
হঠাৎ
কান পেতে শোনো যদি অন্তরালে
দুর্বোধ্য-ই করে,—
কিংবা,
অকস্মাৎ
জানালার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে
স্মার্ট ঠাঁক ঘরে;
আর,
সেই ক্ষণে
মুখে নীল উতল নিজনে মন যাযাবর
উন্মন, হারাতে চায়—
তবে,
প্রাণ
যুক্তি-তর্কশাস্ত্র দিয়ে উচিত কিনা, কি, ছিল না সে-
বিচারের ভার—
না আমার, না ভালো লাগার!

পাপ-পুণ্য ভালো-মন্দ ইত্যাদির সংজ্ঞাতা, গুরুত্ব
নিয়ে, যার মাথা আছে, সে মাথা ঘামাক।
আমার হৃদয় আছে—মাথাব্যথা নেই
পাপপুণ্য, ভালো-মন্দ নিয়ে—

ভালো লাগা আর তুমি
এই মন্ত্র-জোরেই নিরত
আমার পৃথিবী সুখ, সুখের, নির্বাক!

# হঠাৎ একদিন

বিমলা মুখোপাধ্যায়

বসে ভয়ে থাকা
হঠাৎ একদিন তবু মনে হয় দীর্ঘদিন পরে দেখা হল।
"এই যে, খবর ভালো? কতদিন পর—"
"কতদিন, তুমি?"
চলতে যেমন চলে যায়, চলে তার বিন যায় বছর ঘুরে
কখনো—আজ যেমন দীর্ঘদিন বিরহীর?
উত্তাল ঢেউয়েই ওঠে জল স্থলে তরঙ্গায়িত হয়ে?—
কিংবা চাওয়া দুই, একদিন হওয়া।

একদিনই দেখা হয় যখন যেমন, তা ছাড়া কিছু না
তারিখেরা হেঁটে যায় নির্নিমেষ—লক্ষ্য সারি রেখে।

শিপ্রবরণা বন্দ্যোপাধ্যায়

# সীমানা পেরোনো

অরীন্দ্র রায়

সারাজীবন বয়েই বাড়ি টানি
আর পালের বস্তিবাড়া নিয়ে
হিমসিম খাই,
সমুদ্রের ভালোবাসা বিস্বাদে
সামনে এসে দাঁড়ালে
সমস্ত ব্যাপারটাই মনে একেবারে বদলে।

প্রত্যেকটি মানুষের ঘেরে থাকা তখন
প্রবাহিত হতে থাকে
অন্য মানুষের ঘেরের দিকে—
ঠিক যেন একটি ক্যালিডোস্কোপের ভিতর,
যার যে কোনো ঘেরে ছাঁচড় বসলেই
খসে পড়বে নির্ঘাত
দোটা কাঠামোটাই।

তাই
সমুদ্র এসে যখন সামনে দাঁড়ায়
উদ্যত তর্জনী প্রতিশ্রুতীর মতো,
আমাদের এই পদ্মের ঘেরের ঘেরেই
বেরিয়ে আসতে থাকে
নতুন এক অনুভব;
আর আমরা তখন ঘাবড়াও না,
মুখে আর মাটির কী ভালবেসেছে
কাঁটায় কন্টকালের ঘেরা কাঁটাতারের তলেও
ফুটে উঠতে থাকে
সীমানা পেরোনোর উল্লাস।

দয়া নরেশকর

# কাসান্দ্রা

প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বয়ং আপোল্লো তোমাকে ভালোবেসেছিলেন,
তুমি তাঁকে ফিরিয়ে দিলে।

আপোল্লো তোমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন :
তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবে,
কিন্তু কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না

তুমি বলেছিলে : ঘোড়াকে ঘরে এনো না,
কেউ তোমার কথা শোনেনি।
তার পরের ইতিহাস আমাদের জানা।

আজ তোমাকে দেখছি, হাওড়া-ব্রীজ দিয়ে
তুমি দ্রুত কলকাতার দিকে আসছো,
তোমার টিউনিক হাওয়ায় উড়ছে—
সূর্যাস্তের আলোয় তোমার চোখমুখ সজীব, উত্তেজিত।

তুমি বলছো—ভালোবাসার অভাবে
এই শহর একদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।
এখানে তাই তাইকে হত্যা করছে, বন্ধু বন্ধুকে,
চলেছে শুধু ঘৃণা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতর গুজব—

কিন্তু, কাসান্দ্রা,
তোমার কথা কেউ শুনছে না॥

# নিয়মের বাইরে

বাজিনারঞ্জন বসু

সমস্ত পাহাড় পর্বত এবং নদী সমুদ্রই
আমার চেয়ে বড়ো, আমি নিঃসন্দেহে ছোট।
তবু ওদের কাছে গিয়ে বসতে কেমনো মানা নেই,
ওদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতেও বাধা নেই।
নদীর পরে সমুদ্র সৈন্যদের ও পাহাড়ের বয়ে
জোড়া জোড়া ছেলে মেয়েরা অবয়বে ঘুরে বেড়ায়,
গান গায় গলা ছেড়ে, আনন্দে হাসিয়ে ফেলে
নিজেদের। ওদের সমর্থনে সহসা প্রতিধ্বনিও
ওরা শুনতে পায় পাহাড় পর্বতের কন্যা থেকে এবং
নদী আর সমুদ্রের কাছ থেকেও একইভাবে।
সকালে সন্ধ্যায় যখনি আকাশের দিকে তাকাই
বেড়াতে বেরিয়ে, তখনি দেখি সূর্য এবং চন্দ্রও
আকাশে পরিক্রমা করে চলেছে যথানিয়মে।
নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই বহুরক্তে গোলমাল,
তা জানা বলেই প্রকৃতির জগতে কাটা করে যায়।
দিনমণি সূর্য এবং চন্দ্রও প্রাচীন কালের দেবতা;
আমার চেয়ে তের বড়ো তারা, আমি নিশ্চয়ই ছোট।
যারা আমার চেয়ে বড়ো তারা নিয়ম মেনেই চলে,
আমার চেয়ে যারা ছোট তারা কিছুই মানতে চায় না।

# সীমানায় শেষ সম্বোধন

বিমল সেন

সন্ন্যাসী, আমারও হৃদয়ে আছে
একতারা। বাসনার রক্তদলে
বিচ্ছুরিত সূর্যের আভায়
বিকশিত ভালবাসা
আমারও হৃদয় আছে
ছিন্ন অর্ঘ্য এবং আবরে।

সে ভালবাসার জন্য
লাভ করে একদল খোদ্দেল,
তাদের মৃদু পদরে
পথ হাঁটে আমার জোছনায়।

আমাকে অলক্ষ্যে করো কেন তুমি।
দূরে রাখো উদাসীন হাসির আড়ালে
অথবা ভ্রূকুটি চিহ্নে
অবাহত করো বাধান!
আমি কি তোমার কাছে
ভিক্ষাপাত্র হাতে
কখনো চেয়েছি শুধাজল!
বলেছি, এ পাত্র ভাও
ভিক্ষাদান একটু প্রসাদ।

জীবনের পাত্রখানি, অর্ঘ্য উদাস
দিয়েছে যে সমর্পণ আমাকে।
অন্যের আসনে আমি
সহজে, যে অর্ঘ্য দূরে নিয়ে
সুখেরই করেছি সন্ধান।

তবুও অলক্ষ্যে করো কেন তুমি,
দূরে রাখো উদাসীন হাসির আড়ালে।

# এক উল্টো পাজামার কাহিনী

শৈবিলা চক্রবর্তী

সূর্যে, সমুদ্রে, মরু ও মধুর পাশে,
অন্ধকারে, অন্ধকারে
চিন্তাবাহে, চিন্তন হরিণে কি চন্দনবনে
বাস্তবান ইতিহাসের কখনো পদচারণায়
কখনো সে প্রহরী
এক বন্ধুকের আতঙ্কায়ী আমাকে
নিজের অদৃশ্য সুতোয়—
এক উল্টো পাজামার মত,
কতদিন একভাবে বুলিয়ে রেখেছে!

জোৎস্নার পাইনবাথা
তার দীর্ঘ ছায়া। চৈতালী কখনো স্থির,
কখনো ঈষৎ আন্দোলিত।
আমার কবিতায়, স্বাধী আমাকে
নিহিলে, মরমনে, ছায়ার ঘরানায়—
সেই কোমল, মরু,
চতুর পদচারণা—
সকল ধরাছোঁয়ার বাইরে
নিরুদ্বেগভাবে অপলক্ষে, হেঁটে চলে যায়।

মধ্যরাতির বৃষ্টি-ধোয়া জুইয়ের গন্ধে
দুরন্তায় বিন্দর
অস্তিত্বলোকে স্তব্ধতরীভূত স্থিরে পড়ে।
আমার ভুলটিকে
আর আমি চিনতে পারি না।
কোন অতল থেকে তুলে-আনা
অপলাপ পদ্ম
এক জলনীল দুঃখ
কে কেন পাশে সাজিয়ে রেখে গেছে!

সব থেকে সহজ বন্ধুরা,
আজন্ম,
বন্ধুরে, দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে।
উৎসবের মধ্যে কিউবিক পড়ে
হঠাৎ কেন জলনা অন্ধকার।
মধ্যাহ্নে সূর্যোদয় হয়
অবারিত অমাবস্যার
লক্ষ নির্ঘোষ।

ঘাসির দুঃখে এসে,
নদীরা হঠাৎ জলশূন্য মনে হয়।
কারণ,
একেবারেই অকারণ
রাজপথে অগ্নিবর্ষণ করছে শৃগাল,
সিংহী শাবক প্রসব করছে তখন।
পুষ্পতোরণে শকুন,
উর্ধ্বে নতমুখে অন্ধকার।
ঠিক জানি না,
এও সেই বন্দুকেরই ভোজবাজী কিনা!

অথচ,
তখনও এই হানাদারের হাতেও
মারণাস্ত্র কোনো অস্ত্র নেই।
দুরন্তক্ষেত্রে, দুরন্তের হাতেও, যেমন ছিল না।
শুধু একটি শাখে ছিল তার।
একটি সত্যেই বিশ্বাস, সেই
বীর্যবান সাধি
দীর্ঘস্থায়ী এক জলন্ত দুঃখকে,
প্রাণ ঘাটতো দিনে,
বিজয়ে,
সাঙ্কেতিক করে দিয়েছিলেন বিদায়ীশিবে।

সাহারা বেবী

পার্থ, সুকৃতিমান পার্থ!
আমি তোমাকে লক্ষবার অনাদ্য ঈষা করি।
কেননা,
প্রতি মুহূর্তে তুমি
অমল, অসাধারণ, নির্মিত,
পরিচালিত হতে পেরেছিলে।
অথচ কে পার, কে এত
বলিষ্ঠ করে পেরেছে!

আর আমাকে দেখ,
আমার ঘাতকের ঘান, নির্বাস, সম্পাদনা
চুরোল ও নির্বাচন
কিভাবে ছড়েছে, ছড়মান হয়ে যায়।
ঘর স্বপ্ন, সাধনা, ধারনা, জনমুর্তি—যা কিছু।
আমাদের দুজনের
অনুকরণীয় অরেক লক্ষ মাইল যাবখানে
তোমাকে যখন অলৌকিক উপাসনে
ইতিহাস,
ত্রেতার কালজয়ী মহিমা দেয়—

হে অপরাজের তৃতীয় কৌন্তেয়!

আমি,
এক উল্টো পাজামার মতো
অদৃশ্য সিল্কের সুতোয় ঝোল খাই।
বেলা যায়,
দুমূল দখিন হাওয়ার
কখনো নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে
অবাক উদ্ভাসিত, অবলীন।
হাওয়া পড়ে যায়—
আবার অবলম্বনহীন পাতালঘাসী,
ভঙ্গুর ও পতনশীল।

পূর্ণচন্দ্র দাস

# বৃষ্টির গান

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

টুপ-টাপ টুপ-টাপ
আকাশের বেহালায় কি এলো বর্ষার গান?
আহা কি সুরের বোল
ঝিম ঝিম হিল্লোল!
অনেক পরানে বুঝি বর্ষা এলো!
উদ্‌ উদ্‌ সবুজের অরণ্যের পাখনায়
কি জানি কি আহ্লাদের ঢেউ এলোমেলো!

কলেজা কদমে পরে পালকির ঝিমে ঠোঁটে
ঝিম-ঝিম ঝিম-ঝিম
বৃষ্টি-সুরে
সন্ধ্যায় এলো চুল ঝিলমিল ঝড়-ঝলে
ঝরে ঝরে দুপুরের
ঘুম পড়ে।

মন কেন মন নয়
চকিত হিরণ
অবচেতনে কোনো ঘুমা স্বপ্ন—
ছায়া-ছায়া ঘুমে পরে
একটি ফুলে একাকার
একটি মেঘে মগন—

চৌমুহনী আকাশের ঘর বড় হোপনাই
বাইরে দেখার চক্ষু বাইরে তো কেউ নাই
জলেই তা ভরাভর
ঘুমে ঢলে ঢলকায়
অনেই সে ঘরিবর, ঘরের আড়,
অনেই মেঘের ঢল
তারই মেঘে চলন
বাইরের ঘরে বসে অনেকই সমর!

বৃষ্টির চিত্ত ভুলে
নিজেকেই সব ভুলে
সেখানে আমার ঘরে, আমিও নিজেকেই—
অনুভবে ম' ম' করে
সুরে এক অজ-জেনা অজকের ঘ্রাণ,
ঘুম-ঘরে ঘুম-ঘরে
আর নাই নিজেকে
সবাই হলো বৃষ্টি বরষার গান।

# বিকেলের ব্যক্তিগত

অমিতকুমার সরকার

কোন কোন নারী  কী বিশাল নির্জনতা ফেলে রেখে যায়
কোন কোন নারী  কেন জানি মুক্তকণ্ঠে নির্জনতা পছন্দ করে না
কোন কোন নারী  পুরনো আয়নার থেকে তার মুখটা
তুলে নিয়ে যায়  অন্ধকার অসংলগ্ন ঘরে
যেখানে বকুল ঝরে সেখানে প্রেমের মতো
অনেক অশ্রুর বৃষ্টি হয়
বাকানো সাঁকোর মতো তোমার নির্জন তুমি
তার নিচে হাঁটু ছেড়ে প্রান্তরাদিক সূর্য নেমে যায়
হিম্‌ছিমে নদীর চরে ঝিনুকের স্মৃতির মতো পড়ে থাকে
পড়ন্তবেলা  বিকেলের কিছু কিছু বাসিমড় আলো

একান্তই বাসিমড়  কয়েক হাজার পয়সায়
হাতের মুঠোয় আমি তবে কেন জমিয়ে তুলেছি
অনায়াসে তবে কেন একটি রাত্রিকে আমি
জয় করেছিলাম সহজে
সুর-সুন্দরীর মতো পাখনার ঠোঁটটি তুমি
কেন দেয় ঈশ্বরীর হাসি

অন্তরে সূর্যের দিকে মুখ তুলে দু চোখের জল
অন্তরী শুকিয়ে নিতে হয়
এর চেয়ে খাঁটি এক প্রেমিকের মতো মৃত্যু ভালো
কোন কোন নারী  পুরনো আয়নার থেকে তার মুখটা
তুলে নিয়ে যায়  অন্ধকার অসংলগ্ন ঘরে
কোন কোন নারী  কেন জানি মুক্তকণ্ঠে নির্জনতা পছন্দ করে না
কোন কোন নারী  কী বিশাল নির্জনতা ফেলে রেখে যায়
যেখানে বকুল ঝরে সেখানে নির্জনে
হিম্‌ছিমে নদীর মতো পড়ে থাকে পড়ন্তবেলা
বিকেলের কিছু কিছু বাসিমড় আলো।

# 'বামী' ও 'আমি'

কার্তিকচন্দ্র সেনগুপ্ত

হাতের চশমা নিয়ে খেলে
'বামী' এই কোনে,
আমার আমি কী অবাধি
হাজার ভুমি বেনে!

আমার মনের অন্ধকারে
আমার খুঁজে পাইত না যে,
(তবু) আমরা দেখে করি সুখের
বিদায় প্রদান।

যাদের আমি আপন জনা,
তারা আমায় চেনে তো না।
দুখেল পরে নিত্য করি
নূতন অভিনয়।

কুশলিদের সেরেরি 'বামী'
ভুলেই গেছি কি ছিল নাম,
কোথা হতে কোথা এলাম
আমার ঘরে কোথা।

আর সহে না সাহের সজ্জা,
নিজের পরনে চাইতে লজ্জা।
ইচ্ছা নাইকো হাজার বছর
পরাই ঘরিয়ে সাজ।

পাও না ফেরালে ফিরে আসে,
সেখাও আমার আমি—
ঘুরে ঘরে ছুরে এ-মুখে
স্বরূপে সেখাও স্বামী।

তোমার পরনে চাইতে ফিরে
চক্ষু করি নত,—
মনের কথা বলতে যা চাই
হয় না মনের মত।

কণ্ঠ ফুটে বলতে নারি
যেমন পরে 'স্বামী'*
ধরিও ঠিক হয়তো পরি
হারিয়ে ফেলি আমি।

*আমিনাদের ধর্মীয় বাক্যে ব্যবহৃত শব্দটি স্বামী

# অনন্তকে শুধু অনুভব

অমলেন্দু চক্রবর্তী

কিছুই সেদিন আমি চেয়েছিনু কিংবা পেয়েছিনু,
জীবনে অনেকদিন, অনেকদূরে, দূর দেশান্তরে,
অনাত্মজ বন্ধুকে শহরের বাইরে ঈশা,
প্রবল শীতের দূরে অতলান্ত অন্ধকার বিদেশী,
অনন্ত বহমানী নৈঃসঙ্গী একলা সেদিন।

রেখেও সূর্যকেতু আলোকার নিবিড় তুষারে
সোনালী ঝুরার নত ধ্বনীর শ্রবণ ছিন্নিকে
সন্ত সকাল যেন নীলচক্ষু কুলের ছিন্নিকে
করে ওরে পূর্ণে হয় দুপুরে প্রসারিত গগনে
মনোলোভা ছেলেনীর জরকিরকাটা কুলের বাগানে।

কিছুই সেদিন আমি ভোট নক্ষত্রের মায়াকর,
দূরের ঘাসাগরে একলা অনুপ্ত বুদ্বুদ,
নদির কলস্বরকলে নিস্তব্ধানি চাঁদের কপোলে
কিছুই সেদিন আমি, কেবল সহজবল মেলে
সহজায় অবোধ্যে মায়ার ভিতরে ফুটে আছে।

ওরে বনে দুরন্ত বর্ষক,
গ্রহান্তরাটিকে সৃষ্টি ছেলে অন্তরালে
ছেলের পরম শোভা সকল সৃষ্টিরে
অনন্তরে শুধু অনুভব।

# সবাই মিলে করবো কাজ

অপদবন্ধু

বিশ্ব-বিজিনা রোদ ঝিলমিল্ ছেলেমেয়েরা বলে—
নতুন কালের বেলায় আজি চল হে চলল।
লক্ষ কিশোর জাগছে আজি নতুন আলোতে—
জাগছে মনে নতুন কথা—নতুন চেতনাতে।
লক্ষ প্রদীপ জ্বলছে যেথায় সেথায় সবে চল্—
সবাই মিলে করবো যে কাজ, চল হে চলল।

নিম্নে হতে সৃষ্টি করি শিল্প-কলা যত
তুলিতে তাই চিত্ত আঁকি,—পুতুল তাতিমাই।
ছন্দে-ধ্বনি ভাবনাহতে মুগ্ধ করি প্রাণ
সবার সবে গাইবে কি তাই শিল্প-কলার গান!
লক্ষ প্রদীপ জ্বলছে যেথায় সেথায় সবে চল্
সবাই মিলে করবো যে কাজ,—চল হে চলল।

জ্ঞানের বাতি সবাই মিলে পড়বো পাঠশালায়
শিখবো কত নতুন কথা, জানবো নানান হায়।
দেশ-বিদেশে কুড়াই যেথা জ্ঞানের যতনী যে—
সকল শিখে, সকল জেনে ধন্য মানি সে।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে যেথায় সেথায় সবে চল্—
সবাই মিলে করবো যে কাজ চল হে চলল।

অবাক জলে সাঁতার কাটি আজকে দাঁড়াতে
সলিল বাহে ভাসার আগে যায় ডাকিনে কাহু।
ধন্য মনে নতুন হাওয়া নতুন পাওয়া রে—
জানবারে জানবো ভবে করবো হবে রে!
সন্তরণে মাতৃবি যে আর সবে শিখাব বল—
সবাই মিলে করবো যে কাজ, চল হে চলল।

রোদনীর মেয়া ধর্ম মেয়েরা, তাই তো আমি আজ
লক্ষ তারা চল্ল যে রে জানবে মেয়েরা সাথ।
ঔষধেতে সকল রোগীর আঁচাই যোগ্য চল
সেবায় ভরে সাজাবে তাই সেবো সকল ধন।
আর পাহাড়ে গুহ অনুপা সেথায় সবে চল্—
সবাই মিলে করবো যে কাজ, চল হে চলল।

হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

*প্রকাশিত হয়েছে*

**শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর**

১০০টি

**চতুর্দশপদী কবিতা ৫.০০**

কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

ঈশ্বর থাকেন জলে ৫.০০
ধর্মে আছো জিরাফেও আছো ৪.০০
পাড়ের কাঁধা মাটির বাড়ি ৩.০০
মেঘদূত ৬.০০
ওমর খৈয়ামের রুবাই ৬.০০
গালিবের কবিতা ৮.০০

॥ শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর
কাব্যসংগ্রহ প্রকাশিত হচ্ছে ॥

বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ৭৯।১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯

বলরাম পটেল

# সিঁধ কেটেছে বনমালী

শরদিন্দু বসু

ভেবেছিলাম তুমি আসো,
তুমিই আসো।
ভাবতে ভাবতে ভাবতে ভাবতে—
আসছে ভুবন ভাসতে ভাসতে,
হেসে গেলাম—
পরানি যা পেলাম এবং কুড়িয়ে নিলাম দুহাত ভরে,
রাখছি এবং চলছি কঠিন চাঁদে করা হাঁদের চাবি,
বুকের ভেতো খুনেরঙ্গাসী, ২৪ ছোপা লাল
জুইয়ের সকল।

হাঁটতে হাঁটতে...হাঁটতে হাঁটতে...
কৌচকানো গন্ধ নিলাম,
চোখের ভেতো বিয়ে থাকা রাঙিন হাঁস,
একটা আর পাদাড় এসে সাজিয়ে রাখি
যেমন তেমন নামধারিকী জড়িয়ে থাকে, সেই আসলে-ই।

হাঁটতে হাঁটতে...হাঁটতে হাঁটতে...
পায়ের খাঁজে বুকে বসল,
পাঁজরে ঝিল, ঠোঁটা-বসন
চাঁদির ভরা তুলি হোলো অর্থাচ্ছন্ন,
স্মৃতি হলো চিত্রহীন,
বুক হলো পর্যবেক্ষী,
খোলামকুচি, ঘেনা, পাথর, ভাঙতে ভাঙতে—
ভাঙতে ভাঙতে ভাঙতে ভাঙতে
চমৎকার হেসে।

ভেবেছিলাম তুমি আসো,
তুমিই আসো ;
নক্ষত্তর, উঁচাও করে খোলস চাবি।
সমস্ত হাসে।
দেখি ভরের ঘোলাটানি—
হাসতে হাসতে সমস্ত খোলস মিশ ভেঙেছে ভয়ানক।

# নাগরিক

সুধীরকুমার গুপ্ত

এত বড় নগরের ভিতরে কোথাও দাঁড়াবার
সুনির্মল স্থান নেই; সেই স্থান যেখানে ঘরের
সঠিক খুঁটিয়ে দেখি, বুকের আবাসখানি চিনে
সুস্থভাবে যেতে পারি, বিবর্ণ অক্ষর মেরেছেরে
পেয়ে ওই বসন্তের হারানো হরিণ, নিরিবিলি
দুহাত কবিতা পড়ি সকলের চেয়ারে শান্তির,
স্মৃতির চিত্রিত কাঁথা মেলে ধরি রোদে খোলা ছাদে,
গভীর প্রত্যয়ে খুঁজে আসিল ক্লান্তির বিস্মৃতিতা
সহজ সরল হই, বোধিতে মেলাই অনন্তর্যাত।

চারিদিকে ধাঁকা স্রোত; লাল আলো অনেকের পথ,
ওভারনো ঘুড়ির মেলো বড়শিতে গেঁথে গেঁথে যায়
অন্ধকার পাখির বুক, রক্তাক্তার মহানের আরাম
এস. ও. এস. ধ্বনি ভেসে যাঁকিকে মেতারে ট্রেলিফোনে,
চড়া দরে চতুর্বর্ষ বিকায় নিলামে, ভাসা স্রোতে
বেনকেসে, হৃদ্য প্রেম মেলা মেয়ে ধারে ভাসিভাসে
অথবা অন্ধনক্ষে মাঘির স্বপ্নে; ঘেরে ঘুরি
পোনাকের অন্তরালে, অবিশ্বাস ভরের কবাত
চিরে ফেলে স্নেহমায়া, বিষাদিত পার্ক বীথিপথ।

নগর সুন্দর হোক; হৃদয়ের প্রকৃত সন্ধান
যদি না সে ফের তবে কবে যাব কোথায়, সভাতা?

# রোদে বাড়ছে

প্রভাসচন্দ্র সাহি

চনচন করে রোদ বাড়ছে.....
দুহাতের কাজগুলো চটপট সেরে নাও যে।
ভেবেচিন্তে যেন খুব কললে।
দুপুর এসেছে ঘিরে বলে তিন পা পেয়েছেলে।
এখন ভাবনার মুখে আড়ু ঘেরে
হাতের কাছে যা পাও
তাই মরে ফেলে পড়ো।

ছোটাই-উতরাই পথ।
সমলে সুমলে চলতে পারো, চলো—
কিন্তু চলাটা থামিও না।
কেন না, ঘন-পত্র ঢেকে লম্বা লম্বা ঠাঁস ভুলে
রাতী রোদ্দুর ছেড়ে আসছে।
যাবো, ছায়াটাও একটু একটু করে
সরমে ছোট হয়ে গেল, না?
এখুনি মুই করে আমি আসছে পারে।
তখন ঘুনো ছোঁয়াচির মতো
স্মৃতির নামে কিন্দুটি ছেড়ে যাবে।
উৎসে প্রেমার ভরে হাসিমেলাও
খুঁজে পাবে না কখনো।
হাতড়াতে হাতড়াতে কেবল হা-হুতাশই সার হবে।
তাই.....

# পাগলা-গারদী ছড়া

অজিতকৃষ্ণ বসু

(১)

সভায় দুই ছেলে
বলে ভো ভো রবে
"ভাগিস লেখেছিল
পাণ্ডবে-ভৌছবে!
তা না হলে শুনতে কে
হতো আগ্রহবান
মহাভারতের কথা
অমৃত-সমান?"

(২)

অথো অযোধ্যার
মেজো রানী কৈকেয়ী
করেনি কেবল কোনো
নীতিকথা-টইকেই!
সতীনের ঘাটটকে সে
দিল বনবাস,
তাই আজো বেঁচে আছে
কবি কৃত্তিবাস।

(৩)

কেমন করে পরব জুতো?
ফিতেকোঁড়া যে নাবে।
সুবিমামা, দাও না সাড়া
কেন মোদের ভাবে?
ভেব যে তোমার কেন্ত চেকে,
সে কি তোমার খেরী?
মামা বলেন, "হবে না ভাই?
সে যে আমার তেরী।"

(৪)

মুখে তোর খই কেটা
বামা ভাই মুখপো রে!
বাজতে যে ভুলে যাস্
এই বড় দুখপো রে।
শুধু বড় সোজা মোজ,
সমস্যাও জন্ত যে,
পুবে-ওঠা সূর্যের
পশ্চিমে অস্ত যে।
ভাঁটা আছে, জোয়ারের
আশা আছে তাই রে,
বাড়িকেরা ফিরে আসি,
তাই বাঁধি বাসরে।
সুখে দুখে হাসে, তাই
দুখে চোখ সিক্ত,
বিশ্বি যে বিচ্ছিন্ন হয়
না থাকিলে ভিক্ত।

(৫)

ছেলেবেলা থেকে কবি খেলার পক্ষপাতী
জলে পড়া আদুলের ছোঁয়া ছোঁয়া মাখা,
উড়ুনচুঁ বাতাসের ধাক্কাতোয়া ঠাণ্ডা,
দুপেরো রোদ্দুরে তালিমারা আকাশ,
বেরোনিন ছেলে ভাসা ভাসের মোহনা,
এলোমেলো কাঁদি দিয়ে কিনু কলা মোচা,
হরেক রকম মাছ নিয়েছেনী চোখেতে,
চোখেলা চাকা আঁটা হলেভাসী একতা।
ভাসা দিনু কলাগাছ, ভালপুরী, অদ্ভুত
খুব করে ভালোবাসে খেয়ালের বশবর্তী।

(৬)

আপন ভাবে কণ্ঠ সাধা
আপন গানে মুগ্ধ গাধা।
ঘণ্টা নাড়ি পড়ুক পিঠে,
নিজের কণ্ঠ তবুও মিঠে;
সুরের খেলায় ভুলে ভুলে
পিঠের জ্বালা বেমালুম ভুলে
আবার গাধা নির্বিবাদে
কণ্ঠ ছেড়ে কণ্ঠ সাধে।

(৭)

জলপাই গড়ের
জলপাই ভাণ্ডার
টাকার কুমীর বলে
তাঁর নামডাক ভার।
তাহাঁর আবিষ্কৃত
নামে নামে বিক্রীত
টাকা সারাবার তেলে
টাকা নাম নাম তার;
আবার সোনার টোপ,
এমনি চুপি চুপি
চট্ করে ভুলে নেঁথে
বাঘাডরা টাক তার!

(৮)

কলমা দিয়ে ঢেকে বাঁকন হস্তকে
চিত্রুনি চালায় সে যে টাকেডরা মস্তকে;
পঞ্চম বাঁশী করে বারকতায় গান গায়,
শুনে পাড়াপড়শীর জনমন প্রাণ ধায়;
বিছিরি লাগে চোখে নিজের শ্রীমুখকেই,
চোখ বুজে লেচ্ করে আয়নার সামনেই।
এমনি সে অদ্ভুত আপনহারা খেয়ালী।
নাম তার বলব না, থাক সেটা হেয়ালি।

(৯)

সাপ খেলাবার বাঁশী বাজাই
বাঘ খেলাতে সখ্যে মরে।
এই আশাতেই সময় কাটে ;
চাঁদমামাকে দেখতে পাবো
সুবিমামা বললে পরে।

(১০)

রামচন্দ্রের হয়েছিল
চোদ্দ বছর বনবাস,
পরান্নের তাই চোদ্দ বছর
লাখিয়েছিলেন কৃত্তিবাস,
তাই তো সবেই লিখেছিলেন
সেতারে এবং মহৎ
চোদ্দ লাইনে। এ সব কথা
তোমরা কি কেউ জানতে?

(১১)

কখনো করেছিলেন
কখনবের ছেলের হরতে।
হরতো তখন ঘণ্টা বাজে
অতীতে সেই পাকা প্রাচে।
কখনকে মারতে শ্রীরাম
করেছিলেন যাহার পূজা,
তিনি ছিলেন এবং অজও
অজেয় ভোলা মহাবুজা।

প্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

# প্রতীক্ষা বা প্রেমিকা হে

রচনা: হরিদা

হেমন্তকালের তুলতুলিছে নামছে সন্ধ্যা কোলাহল থেকে কোলাহল
ডুবছে নিঃশেষে হে প্রতীক্ষা, যাবে এখন? শেষ হলো সময়
একটানা তো ঘণ্টা বাজবে! ভেঙে হলে—যাও—

বয়স বেড়ের সঙ্গে যৌবনের পার্থক্য অনেক। অনিচ্ছায়
বর্ষেছে বাস্তব। মুহূর্মুহু ঘণ্টা কেঁদে উঠছে—
সময় আমার দেয়া-নেয়া কারবারের নয়। যাবে এখন যাও—

উৎসবের সোরগোল সবার থাকে না সবার বুকের মধ্যে
উৎসব নতুন হয় না নিজের দিনে—ভেলেন্টাইন বা বারফাস্টন
তুলে না অনেক দীর্ঘশ্বাস আজকাল তবু
ফিরে চোলা এবং চলে যাওয়া সময়ের শব্দ বুকের মধ্যে যেন যাকৃতমা—
হে প্রতীক্ষা, যাবে এখন? যাও—

পাতা বেয়েছেন খোলার মতো দাদা চেহারা মধ্যে প্রাচীন আকাশ
যেন অবসর কিন্তু কোনো কথাতে তার স্থিতি দীর্ঘ নয়। নাম্বো
পালিয়ে যাচ্ছে কোলাহল তাকে ধরতে
আর যৌবনের বিপরীতের দিকে—
হে প্রতীক্ষা, কেন দাঁড়িয়ে রইলে! তুমিও যাও
বয়স আর যৌবনের মধ্যে পার্থক্য অনেক.....

# আত্মসাৎ

রচনা: মুখোপাধ্যায়

আমার নিজস্ব কিছু নেই
যা কিছু নিজের আছে
সব কিছু পরস্ব আহৃত
আমি এক পরভৃত প্রাণী
তবু আমি চৌর্য অপরাধে নই
লজ্জিত পীড়িত
চাঁদও যখন করে
সূর্যের গচ্ছিত সম্পদ
যে আলোক জ্যোৎস্নাময়
কঠিন মিত্তি ভেদে
মধু হয়ে দ্রবিত গলিত
পরস্ব নিজস্ব করা
সেও এক গুণ
যে জানে না আত্মসাৎ
করে নিতে
এই যাদু এই ছল
পৃথ্বী তার কপালেতে
জেলে দেয় মৃত্যুর আগুন

# পোস্টম্যান

রচনা: হর

দুটাকের উৎসব রেখে পরস্পর কড়া নেড়ে
পোস্টম্যান ডেকে যায় : চিঠি আছে চিঠি
সে এক আশ্চর্য সুর যেন অলৌকিক কোনো কণ্ঠস্বর
বাড়ি বাড়ি ফিরি করে, নাড়া দেয় মনের ভিতর
পোস্টম্যান আর তার চিঠি।

কার চিঠি, কার হাতে লেখা!
কোথায় ঠিকানা তার কেনোদিন হবে না তা লেখা
রৌদ্রের লেফাফা ভরে অক্ষরের এই আকুলতা
প্রতিদিন পোস্টম্যান তুলিতেছি বয়ে নিয়ে আসে
কেন আসে? এ বৈশাখে কার কাছে ছিল তার কথা?

চক্ষুহীন মৃতব্যক্তি পাখিদের ডাকে আজ ঘুমে
অসংখ্য পাতার মতো মর্মান্তিক চিঠিগুলো
এলোমেলো পড়ে থাকে পথে।

# শ্লোক

রচনা: মুকুল দে

অনেক জলের দাম মুছে ফেলা যায়
কত চিহ্ন ওঠে না বর্ষাও
কিছু দাগ অকলঙ্ক বিবিক্ত আত্মার
স্মৃতিময় স্মৃতিতে অকীর্ণ।

অনেক অতলী থেকে তুলে আনা ফুল
পড়ে থাকে হৃদয়ের সোপানে
অন্ত মানুষী তার আশ্চর্য নির্ভুল
এনে দেয় চিত্র-সন্নিধানে।

অনেক আদর কথা ভুলে থাকা যায়
উদাসীন, নির্মম শরীরে
একটি আশ্চর্য স্তব কি ভালোবাসার
ঢাকা থাকে বুকের গভীরে।

# লিমেরিক

ঊষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

লিমেরিক জানতে চেয়ে হলে আইরিশদের এক বয়সের ইংরেজী ছড়াগুলো যা অবশ্যেষে নিলেছে। অবশ্যি তাদের জাতীয় ছেলে ভুলানো ছড়া থেকেই এর উৎপত্তি। ফ্রেঞ্চ তাঁর মার্সিয়ারের (৪০—১০৪ খ্রি) সেরা ছোট ছোট অংশ প্রথম 'এডিপাস' লিমেরিকের প্রধান প্রেরণা। আমাদেরকের এক পুরনো পত্রিকায় এর লিমেরিক। সেখানে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মার্কাটির ব্রহ্মদিল ভাইরিল চিত্রের। তবে পড়াই করতে হয় অবশ্যি ছেলে। তবেই ই ছেলে থেকে মার্কি প্রথম আমাদের আর্থিক ই ছড়া। আমরা আরও পড়ে, লিমেরিক পড়ার ছিলের পরে উপলক্ষে সভার প্রথম মুখপেরে এমন পান আইরো—'আরা, লিমেরিক পর্শন আমরে ছো? তার থেকেই মার্কি লিমেরিকের উৎপত্তি। ইংরেজী ভাষায় প্রথম ছেলে অবশ্যেই লিমেরিক লেখার পাওয়া যায়—বি হিপ্পী এর লিমেরিক ইয়োরেন্ট' প্রকাশ সংখ্যায় (১৮৭০ খ্রি:)। এর লিমেরিকের অনুকরণীয় প্রথম এডওয়ার্ড লিয়ার (১৮১২—৮৮ খ্রি)।

•

মেলায় কিনু বড়ো টাকায় কিনলো হোয়াপাখি;
মত দেখল "ভয়ে ভূত", কয় না কিছুই ডাকি,
রাজার হকম করে চেষ্টা
হাল ছেড়েছে যেই শেষটা
অম্ল হঠাৎ—"এত কমে বাকি কোটে নাকি"?

•

চেনেন বাকি সাতেরাদাহির বিদ্যাবাগীশ অনুকে?
ঠিকটে দেখেন চিকোমো আর তিনি এঁড়ে হকে!
মুখের ছেরেও তাই তো শুনি
আসল মনে কী বকুনি!
শিল্পী বলেন, "অনেকও যে ছড়েন নাকো পড়ে!"

•

কিনে এনে ছইবোল ভাবছিল চন্দ
চিনিয়ে দেবেক খান, মুখুয়ে, আকন্দ,
কুকুরে হলে শব
খেতে দিয়ে চিপিটক
গলায় আইকে, অহো, হল হয় বন্ধ!

•

বেয়াল্লিশের ইয়ালি বাবার অনেক শুনি কিরা
ইয়ালি ছাড়া অন্য বাবার বাবার যে অপত্যা
তাবৎ গালা তাই সকালে
তোফুলে পড়ে তালে চলে
অমুরেরা বলে, 'চালা, আপদুলে কি নয় মুখো!'

•

নামজাদা পালোয়ান ছমরুদ্দ তেওয়ারী
কিনেছিল নানা পাঁচ খানদানী রেওয়াজ-ই
মনে ছিল তবু দুখ
হয় না বহুৎ সুখ
খায় তাই সরষে পাঁচ কিলো রেওয়াজই!

•

বলো তো হে, কোনটা আগে, কোনটা এলো পোড়ায়—
মুরগি? না তার আন্ডা? ওহে, ছাপার মাথা ঘোরায়!
তর্ক বাধায় শিখা গুহে
কোনটা ডিমে কোনটা মুহে
পায় না হদিস, তাই কি দেবে ঘুরেই মাথা মোড়ায়?

ভাঁড়ুদত্ত বোসী

•

কলমের কোন কালে ছিল কি কল রব?
সীতা এবা সুপর্ণখার ভাই ছিল নয়?
এরাবিব গবেষণার
তিনি দেখেন ছবিটা ঘর
আপাতত খুঁজে বেড়ান কিংকলার পথ!

•

ঘুরে ঘুরে চার ঘর, হতে পারে দুই,
বার দিলে দুইই বড়ো—তাঁকিঝুঁকি, সুধ!
কখন কোনটা মনে
পাবো কেন্দ্র প্রতিবনে
ঠাওর কি বাবস্থা—লেপ, না ওয়ুধ?

•

দুরুদুরু, দুরুদুরু, দুরুদুরু, বক্ষমাঝ
পড়লো কি বজ্র তবে? এ কি তার গর্জন?
বোতলের ভাঙাটা
নিছেন কাছেটা
এটা তার প্রাকটিস্, সকলে নিশ্চুপ!

•

দেখিয়ে বকলমির এক পোলভল্টে
কেউ ভয়ে শুনি হাসেন অলটে,
তাঁর মত খুঁজে
তাকে নি তো মুনিয়ে
খানিক তাঁর জন্য তবু ডিপার্টমেন্ট ভল্টে!

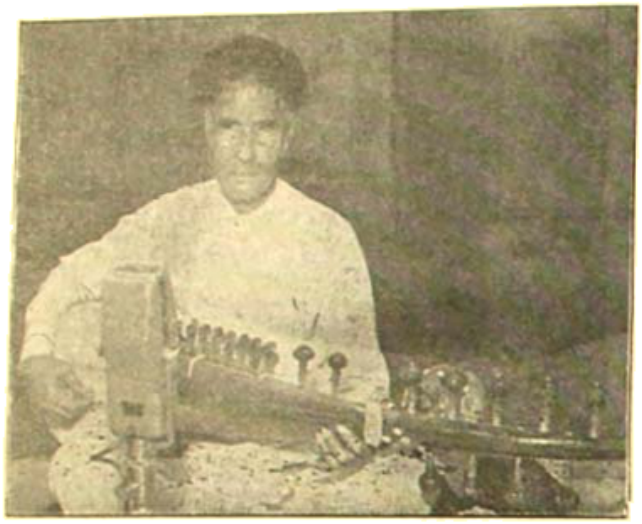

ত্রিদিবরঞ্জন

# ছদ্মবেশ

অমলাদ চক্রবর্তী

খুব সামান্য একটা জিনিষ
লুকোতে চেয়েছি। কিন্তু তার ফলে
প্রকাশ হয়ে পড়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
সামান্য শব্দোচ্চারণে—
উচ্চারিত সামান্য কয়েকটি শব্দ
বা উদ্ভাসিত হবেই—
তার ফলে সৃষ্টি করছি
সহস্র অভিধান-উচ্চারণ শব্দ,
এবং হাত পাচ্ছি ঘরে ঘরে
শব্দোবাহুল্য উপমা ও চয়ন উদ্রেককর কাব্য.
যেন বিদেশিনী কথামালার দেশে
এক বিদেশী।
অসংখ্য ধ্বনির মধ্যে প্রবেশ
একটি সামান্য প্রতিধ্বনি আকাশ থাকবে ভেবে
পাহাড় মেঘ সমুদ্র এবং সমুদ্রফেনা
কুয়াশা এবং আকাশগঙ্গার নির্ঘোষ পর্যন্ত
সর্বত্র আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি
হয় পায়ে, নয় স্কুটারে, নয় ট্রেনে, নয় এরোপ্লেনে,
বেশির ভাগ যাচ্ছি
বৃষ্টির সঙ্গে জলাবাড়ি খেলতে,
শিশুদিনের জন্যেতে ঢোল বেলতে আজও—
আমরা কী করছি তার কী করছি না!

আসলে ধরা দেবো না পণ করে
ধরা দিচ্ছি সর্বত্র, এমন কি
পাঠশালায় ঘুড়িটাও গানগান এগিয়ে
সন্তানদের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে
সমবেত হাসি—যেন এক টুকরো নির্ঝর।

এই পথ এই চিরকালীন নিরিখেরী
এদের কাছে লুকোনো থাকেনি কিছুই,
এরা আমরা এটাই বোঝা যে
নির্জনতাকে নিরাপদ ভেবে ঠিক এইখানে
এই চিরকালীন নিরিখেরী ও অরণ্যের মধ্যে,
যেখানে ঘুমন ও প্রতিধ্বনি মুখোমুখি
এসে দাঁড়িয়েছি। এখন
বুকের মধ্যে নিজস্ব ছাড়া অন্যজনের
আর কোনো ছদ্মবেশ নেই।

সামান্য এই যে
যা লুকোতে চাইনি
তাও খুব সামান্য একটা জিনিষ নয়।



# আমার দুঃখ/আমার দেশ

পরমানন্দ সরস্বতী

১

আমার বন্ধুর নাম
—দুঃখ।
চোখ নেই
কান নেই
হাত-পা নেই তার
নেই রক্ত মাংস হাড়
সে আমার
শিশু শিশু ঘোরে
কখনো বিশাল বৃক্ষের মত
বুকে ভয় করে।

২

চোখ নেই কান নেই
বিকলাঙ্গ সভ্যতার
বুকের গভীর খোঁড়া গোয়ার
এক জোড়া ঘোর অন্ধকার
রাস্তার ভুতুরে চিৎকার
চতুর্দিকে দুর্নীতির হাড়
প্রতিটিকের নষ্ট ঘুমে
অসংখ্য মাছির সংসার।

# লিমেরিক

সৌভেন বিশ্বাস

গহনের বাড়ীর বিলাসঘরে ফ্রেঞ্চ্‌উইন্ডোর পর্দাগুলো
শহরের আধো ঘুমের মধ্যেও হাতোধানেক গহনের খোলা
হাওয়াতে লাফিয়ে ওঠেন
গায়ত্রী পরে আঁকেন ফ্রেঞ্চেন
বৃষ্টি হলে গহন চড়ে কেতন গান বাজিয়ে খেলা॥

•

কামনার দিবিয়ার কি তীব্র হুঁচোনাই
ফকীর সাহেবের কাছেও যাওয়া চাই
একদিন শীতকালে
কি একটা ঘুরে ফেলে
সেই যে নদীতে যাওয়া, তারপর খোঁজ নাই॥

•

কলকাতা শহরের নিয়মগুলো নামচাক,
দেরো লোক সিদ্ধ তবে—একবার যাওয়া যায়।
গাড়ী হাওড়ার ধারে
সিদ্ধ ওরে ওরে নারে—
ঝাইরে বোঝাই দেখে ঘরে গেছে টাকা তার॥

# স্মরণে

দেবপ্রসাদ ঘোষিক

সন্ধ্যেবেলা ডাকবাড়ি
বিশ্বজোড়া ছিমছাম শিশুর তোলানাম
ভেসে না সে অন্তর্দাহে
কিংবা কোন বিষের জ্বালায়
এমন কি বেদনায়ও নয়।
সব তার জানা ছিল বিশ্লিষ্ট সময়।

সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফেরে
বৈশাখ-সোনালু লাগে গায়।
বুঝি আমি সেখানে দাঁড়িয়ে
সেখানে পৌঁছতে যদু ঘাম পরিষ্কার
ধারা করে নেয়া তার।
নিবেদনী হয়ে আসে অনেক প্রমাণ।

সেদিনের মালা নেই
তোলা সাজিতে আমি কত মিথ্যে আলা পথ চেয়ে।
সন্ধ্যেবেলা ডাকবাড়ি
ঘরের সন্ধ্যার শান্তি মেয় ছেড়ে
এবং কৃষ্ণচূড়ার টিহিতে বিশেষ কোন দিনে
অতীতের আজন্মরা বর্তমানে নিতে চায় কিনে।

# শুধু নাম

অনীতা সেনগুপ্ত

যা দিয়েছো তাই থাক,
যা দিয়েছো অনেক তো সেই—
সংযোজন অকারণে, মনের-ভবনে
পুনর্লেখার প্রয়োজন নেই।

তোমার প্রচণ্ড ঝড়ে ঘরে পড়ে গেছে প্রাঙ্গণের—
একটু বকুল
এ ঘর কিছুই নেবেনি, স্বর্গে না চলে যা।
তারপরে, কী ফেলো চুরি?
শুধু এসে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে—
জীবন, মরণ, পাঁচের মজবুরি
ঘরে নেয়। অনন্ত বাড়ায়
ঠিকানা-বদলানো যায়
ভুল মনে, ভুল ঠিকানায়—
একটু বকুল।

এ আর এমন কি চেয়ে? শুধু নাম।
স্বর্গে না, চলে না।

# দাও কিছু উষ্ণ রূপ

পলাশ মিত্র

ঈশ্বর, পারো যদি আরো কিছু আজ দিতে পারো
আজ মনে হয় চোখের কোলে যেন থাকে লুকানো মন কেমন যায়
বন্ধ ঠোঁটেরা যেন শব্দে-শব্দে হয়ে যুক্ত
আজ মনে কিছু প্রেম অবশ্যই কিছু বাঁচোয়া।

জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ

ঈশ্বর, ক্ষমা করো ভুল নয় : মনে-মনে তারা বড় প্রত্যাশার সাথে
বুকের ভিতরে বসে রক্তে-রক্তে সব কুরে খায় :
ঈশ্বর, আজ মনে কিছু-কিছু বিবেচনা দাও
দেখে যেন কিছু বুঝি কি যে আছে সুখের বেসাতে।

ঈশ্বর, আরো কিছু আজ দাও সহজ বিচার
শিরায় স্পন্দনে যাও, নড়াতে হবের সফলতা
এত কাল অহংয়ের নেশা দিয়ে সাজানো মানুষ
শুধুই কঠিন বোকা আজ যেন ঠকবার খেলা :

যাও কিছু উষ্ণ রূপ দে ঈশ্বর, যাও এইবেলা।

# কথা ছিল

শোভন পাঠক

কথা ছিল সব ফেলে : সে কিছুটা সুগন্ধি নিশ্বাস
চুলেচুলে ভরে দিয়ে চলে যাবে, এই প্রত্যাবর্তে;
এই আয়োজন নাম ভালবাসা—ফুল, নদী, ঘাস
এর জন্যে জীবনব্যাপী, এই জন্যে সহজে বাঁচাবো।

কথামতো সব ফেলে চলে সে আমার হাত ধরে
শরীর নদীর সেই লজ্জাবতী সুখঘাট বানাবে
নিয়ে গেল; আর আমি প্রণামত সুখের অসুখে
প্রাণপ্রদীপের জীর্ণ খোলস ছোটোটো ভুল করে

কপালী আঁচলে তার নিজেই দিয়েছি ঢেকে। সেই
মোহনের তাপটুকু সন্ধ্যাতীর মতো নিয়ে হৃদয়ে
সে চলেছে। এই স্পর্শ, শুধু তার শুধু তোমাদেরই
সন্দেহে বিরোধ ভুলে সময়ের নয় অপব্যয়ে।

যেতে যেতে এলোচুল বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে তার
চলে গেল। এই আজ, এই মেঘ, এই অন্ধকার।

মেঘ

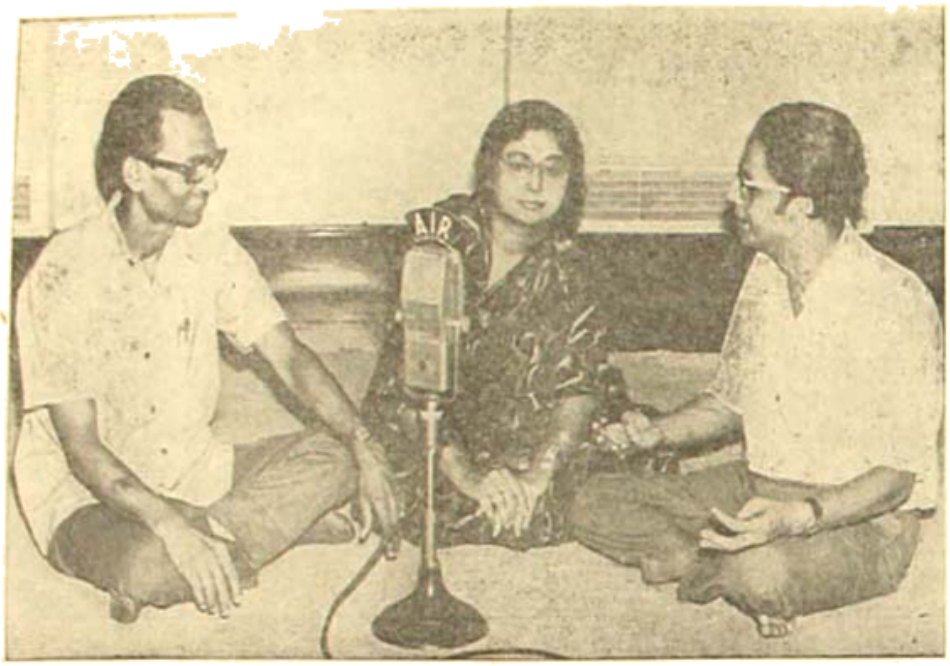

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করছেন (বাঁ দিক থেকে) অমলেন্দুবিকাশ রায়চৌধুরী, অনীমা ভট্টাচার্য এবং বিমলভূষণ

# আকাশবাণী কলকাতা ঃ বিবিধ ভারতী

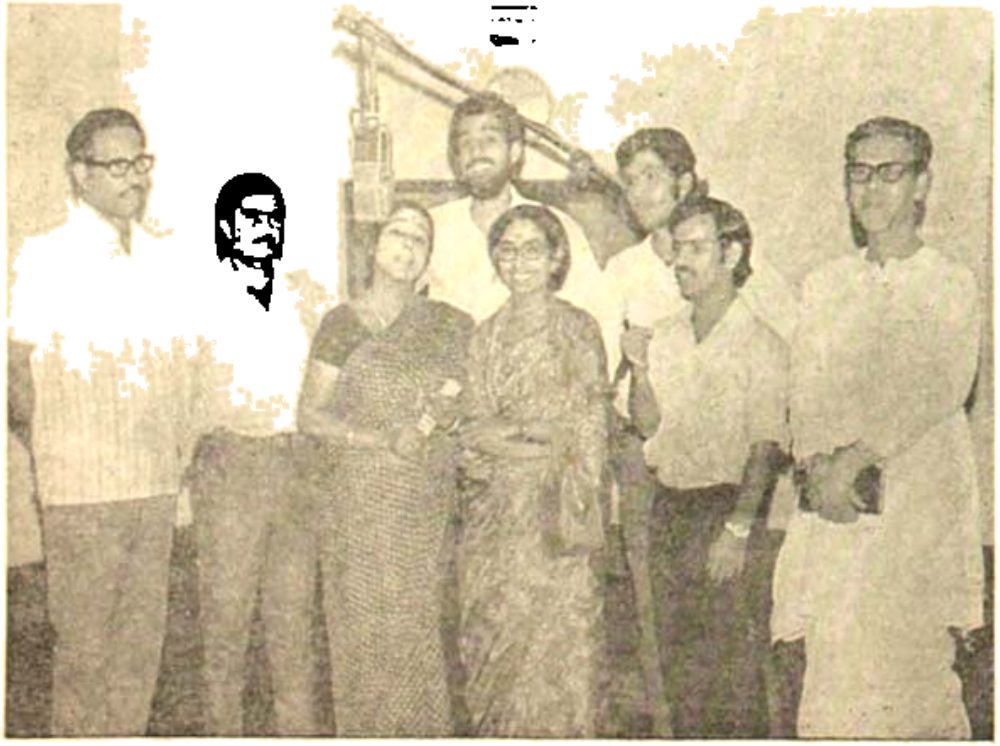

আনোনানুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটকে অংশগ্রহণ করেন (বাঁদিক থেকে) বিশ্বদেব শাহা, অনীশ রায়, কৃষ্ণকুল দে, তরুণ চক্রবর্তী, ইন্দ্রা সেন, মোহনলাল মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস মৌলিক ও রমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (প্রযোজক)

## পরলোকে প্রণব রায়

কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে 'ও বিদেশী বন্ধু' গানটি এককালে লোকের মুখে মুখে ফিরতো। এই গানটি নিয়েই তিরিশের দশকের প্রথম দিকে গীতিকার হিসেবে প্রণব রায়ের সংগীত জগতে প্রবেশ।

বাঁড়শার বিখ্যাত সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশে প্রণব রায়ের জন্ম ১৩১৮ সনের ১৯ অগ্রহায়ণ। শিক্ষা রাজা বয়েজ স্কুল ও সিটি কলেজে। ছাত্র হিসেবে সুনাম ছিল যথেষ্ট। কিন্তু গানবাজনা এবং একই সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির তাগিদ তাঁকে আকর্ষণ করে। 'বিশ্বদূত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কমরেড' কবিতাটির জন্যে কারাবরণ করতে হয় প্রণব রায়কে। আর এই স্বদেশী আন্দোলনের যোগসূত্রেই কাজী নজরুলের সঙ্গে পরিচয়। তিনিই, বলতে গেলে, প্রণব রায়কে গানের জগতে নিয়ে আসেন।

পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন, চিত্রনাট্য লিখেছেন। রেকর্ড ও ছায়াছবির জন্য লিখেছেন অজস্র জনপ্রিয় গান। পুরস্কার পেয়েছেন বি, এম, পি, এ, ও বি, এস, এফ, এ-র শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে। পেয়েছেন 'উদয়োরথ' পুরস্কারও। গত ২২ শ্রাবণ ১৩৮২ বিকেলে, প্রায় আড়াই হাজার গানের রচয়িতা, রহস্যরোমাঞ্চ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রণব রায় পরলোক গমন করেন।

—বিমলভূষণ

রম্যরচনা

# শারদীয়া

## সূচীপত্র


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| দেব না পণ দেব না পণ—প্রমথনাথ বিশী | ২১১ |
| মাইকাবতার—কুমারেশ ঘোষ | ২১৪ |
| বড়লোকের বড় আরাম—শ্রীবিরূপাক্ষ | ২১৬ |
| পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ—সবিতা সেনগুপ্ত ... | ২১৮ |
| স্বপ্নদর্শন—তারাপদ ভট্টাচার্য | ৩০৬ |
| নারীমূর্তি—দিলীপকুমার সেনগুপ্ত | ৩০৯ |
| অন্তরে পেয়েছি লাজ—নির্মল সেনগুপ্ত | ৩১০ |


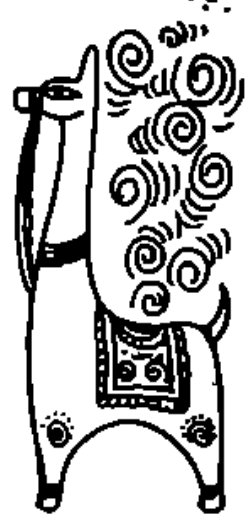

পাত্রী সুশিক্ষিতা ও সুরূপা কাজেই এক বাক্যেই পছন্দ হয়ে গেল, পাত্রের পিতা বললেন, 'মা লক্ষ্মী, তুমি এবার এসো, আমরা ঘরেই তোমাকে নেবো, বাইরে চিনে রাখো।'

পাত্রী মৃদু হেসে পাত্রের পিতাকে ও নিজ পিতাকে প্রণাম করে প্রস্থান করলেন, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। পাত্রের পিতাকে আগেই জবাবদিহি করানো হয়ে গিয়েছিল—বাক্যের কথা উঠতে বাধা ছিল না।

পাত্রের পিতা কনকবাবু বললেন 'আপনার মেয়েটি একদম লক্ষ্মী সরস্বতী। এ মেয়ে আমি নেবোই, দিন চটপট কথাবার্তা সেরে নিন।'

পাত্রীর পিতা হরিচরণবাবু বললেন, 'মেয়ে যদি নেন, নিশ্চয়ই নেবেন। তবে আমার একটু অনুরোধ আছে।'

—আবার অনুরোধ কি? এর মধ্যে অনুরোধের বিষয় আসছে না।'

হরিচরণবাবু বললেন, 'অনুরোধ না বলে অনুনয় বলা উচিত ছিল। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে যে পণ দেবার পক্ষে আমার বাধা আছে, আমার স্ত্রী এই মহল্লার 'পণ নেবো না, পণ দেবোনা' সমিতির সেক্রেটারি।'

—কি আশ্চর্য, কি রকম যোগাযোগ দেখুন না প্রজাপতির। আমার স্ত্রীও আমাদের পাড়ার 'পণ নেবো না, পণ দেবো না' সমিতির, অবশ্য সেক্রেটারি নন, সভাপতি। তিনি আবার ঘটা করে লেটার হেডিং-এ ছেপে দিয়েছেন, "বিনা পণে বিয়ে দিয়া, এ কোন্ বাজারে! কোন্ মুখে চাও এবে দশটি হাজার।"

—বাঃ চমৎকার মানিয়েছে। কবিগুরুর লেখা বুঝি।'

রামদয়ালবাবু বললেন, 'হয়েছে ঠিক। বুঝলেন হরিচরণবাবু এবারে পণ প্রথা না উঠে যায় না, পাড়ার পাড়ায় 'পণ নেবো না পণ দেবো না' সমিতি, সমস্ত মেয়েরা সভ্য। পুরুষদের সাধ্য কি পণ দাবী করে!'

তারপর তিনি হেসে উঠে বললেন, 'এবারে মায়েদের পড়তা লেগে বিয়ের বয়সী ছেলেদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।' আবার হেসে উঠে বললেন, 'তাহলে ভালই আমাদের বিয়েটা অনেক আগে হয়ে গিয়েছিল নইলে ফাঁকিতে পড়তে হতো।'

হরিচরণবাবু বললেন, 'পণের টাকা তো কাজ করে—সাজের কেবল সাক্ষী গোপাল সাজা।'

—তা বটে' তাহলে আমাদের দু পক্ষেই নীতি এক, তা ছাড়া আপনার মেয়ে, ঐ তো কোলাজ, এক নম্বর লক্ষ্মী সরস্বতী।'

—কিন্তু কিছু তো দিতে হবে।'

—তা হবে বই কি! একশবার সুনাম আছে, মেয়ের সমাদর আছে, তবে কি না নগদ নারায়ণ।'

এত স্পষ্ট স্বীকারোক্তির পরেও হরিচরণবাবু স্বস্তিত পারিলেন না। মধুর বাক্যের জন্য তাঁর অজানা নয়—এই রকম মধুর বাক্য বর্ষণ করেই তিনি অর্থ মুদ্রা সঞ্চয় করেছেন। তা ছাড়া নিজের পুত্রের বিবাহের জন্য সস্ত্রীক ঘরে বৌভাত, আদরআর ও প্রথমী প্রভৃতির যে তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন সে একখানা হাজোতিহাসিক কেতাবের চেয়ে কম দীর্ঘ নয়। অবশ্য পণের দাবী নেই, তবে না, "পণ নেবো না পণ দেবো না" সমিতির সেক্রেটারি তাঁর পত্নী, অর সুবিধা মতো জোগান খুঁজে না পেয়ে সাজোপে লেটার হেডে ছেপে দিয়েছেন "আবার পণ! ছিঃ!"

হরিচরণবাবু যখন এই সব কথা ভাবছিলেন, রামদয়াল তখন পকেট

[illegible] দিয়ে তিনি পরে বিবাহের চাহিদার তালিকাখানির সংশোধন করছিলেন, এক একবার মনে হচ্ছিল দুটি ছোট একখানি পাখের জিজ্ঞাসারী। কিন্তু বুঝা সম্ভোচ ভালুকের লক্ষণ—আর রামধরালবাবু আর যাই হোন ভালুকের মন বুঝতে ইন্দ্রিজবাবুর কাছে।

'এই যে মেয়েরা' বলে রামধরালবাবু যেই পাতটি জিজ্ঞাসারীর কাছে সম্পাদনটি যেন করলেন সেই কাগজটি নেবে নিজের অজ্ঞাতসারে ইন্দ্রিজবাবুর মুখ দিয়ে যেন হয়ে গেল (না জিজ্ঞাসারী নয়) দুটি বাক্য!

চশমাটাকে উজ্জ্বলের ঘটিকরা করে ঘরে ঢোক গিলে পাশে বসে ছিলেন পাত্রের পিতা, 'যত যেন বলেছেন।'

চশমাটা পকেটে ফিরে গেছে রামধরালবাবু বললেন, 'সামান্য দাবী দাওয়া না করলে নয়—তাই কিছু করা হয়েছে, ২/১ হাজার বাদ দিয়ে চান তো আপত্তি নেই।'

এই বলে তিনি ভদ্রলোকের হাতে দিলেন। ইন্দ্রিজবাবু তালিকাখানি খুঁটিয়ে পড়বার আগে এক নজরে তাকিয়ে দেখলেন চাহিদার ধারা "ক" অক্ষর থেকে নামতে আরম্ভ করে "ঙ" পর্যন্ত গেছে। ইন্দ্রিজবাবুর মনে হল আর কটা বাঞ্জনবর্ণ বাকি থাকে কেন? ঠিক সেই সময় রামধরালবাবু তাবছিলেন অবশিষ্টগুলো বাদ পড়ে গিয়েছে—তাদের সে-সব না হয়ে পারিশিষ্ট আকারেই দেওয়া যাবে, তাতে খুব অসিধিতা হবে না, অর্থেক হাতে কিছু শেষ হয়েছেও জানো অবশিষ্ট রাখা ভালো। সত্য কথা বলতে কি পছন্দের প্রসঙ্গ তোলাও নাই।

সেই সুদীর্ঘ তালিকা এখানে সন্নিবেশ উপায় করে দিলে অনেক পণ্ড দেবো না পণ্ড দেবো না' সমিতির সদস্যদের উপকার হতো, তবে যাঁরা নিঃসন্তান, বা যাঁদের সন্তানের বিবাহ হয়ে গিয়েছে তাঁদের বিশেষ উপকার করবে তবে অবশ্যই মাত্র বিয়ের উপকার করবো।

(ক) অলঙ্কার — যিনি সোনার পক্ষপাতী। অবশ্য গহনা চলবে না, তবে ঐ পক্ষপাতী ভদ্রের উপরি বিয়ে আপত্তি নাই
(খ) গরদের আলমারি ২টি
(গ) ড্রেসিং টেবিল
(ঘ) সোফা সেটি
(ঙ) পালঙ্ক সেট
(চ) রেডি ক্যাশ (আলমারি সরকারী হিসাবে)
(ছ) বাসন তিন সেট, ফুলদান, কাঁসার এবং উৎকৃষ্ট চীনামাটির
(জ) ঘরের ঠাকুর ও গ্রাম সুদ্ধ, তিন জোড়া
(ঝ) সোনার হাত ঘড়ি
(ঞ) মুক্তার মোহার
(ট) মোটর গাড়ী ২ খানা
(ঠ) মোটর বাইক ১ খানা
(ড) রবীন্দ্র রচনাবলী এক সেট (চামড়ার বাঁধানো)
(ঢ) ঐ শরৎ গ্রন্থাবলী (তর্কালিত হলে)
(ণ) রেডিও যন্ত্র
(ত) টেপ রেকর্ডার
(থ) টি. ভি. সেট
(দ) পুস্তকাবলীর আলমারী (মেহগনি কাঠের) ১০টি
(ধ) ঐতিহ্যের জন্য পাতের পছন্দ মতো পুস্তক
(ন) প্রসাধনী পছন্দ সেট—
দিবি শাড়ুড়ী, শাড়ুড়ী, খুড় শাড়ুড়ী, ভেঠ শাড়ুড়ী প্রভৃতি এবং আদি পিসি, বুড়ি ভেঠি প্রভৃতি তথা পাতানো মাসি পিসি বুড়ি ভেঠি দিদি
(প) নগদ পাঁচলিশ ৮০ হাজার
(ফ—ঙ) অজানা

সর্বশেষে মন্তব্য 'পণ নেবো না, পণ নেবো না।'

যখন ইন্দ্রিজবাবু এই তালিকা পাঠ করছিলেন তখন সম্মুখে আসনা না থাকায় নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছিলেন না বটে, তবে রামধরালবাবু দেখছিলেন। তাঁর মনে হল বোধ করি অকস্মাৎ চাপানো হয়নি, আরও কিছু তার সজ্জা হতো। অবশেষে প্রশ্ন সুপ্তোত্থিত ইন্দ্রিজবাবুর ভেটুর চিকিৎসাধিন অবশিষ্ট ছিল তাতে নূতন কিছু-দর্শন সোফার তাঁর পুত্রের বিবাহের তালিকায় আরও কয়েকটি আইটেম যোগ করবার অবকাশ এখনো আছে।

রামধরালবাবু বললেন, 'খুব হাল্কা করেই তৈরি করেছি, যা দাবার।'

—না এসব কিছু বেশি হয়নি, তবে জিনা এখনো ওঁদেরকে সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।'

—তা হবে বৈকি। বিশেষ তিনি যখন 'পণ নেবো না পণ দেবো না' সমিতির সেক্রেটারি। আর এ তালিকাখানাও আমার স্ত্রীর বিনি নাকি 'পণ নেবো না পণ দেবো না' সমিতির সভাপতি। এই দেখুন তাঁর স্বাক্ষর! আপনার স্ত্রী হলেও একটা সই করে দাও, তবে তো লোকে বিশ্বাস করবে যে হাল্কা করে তৈরি করেছ।'

এই বলে নিজের রসিকতায় হেসে উঠে বললেন, 'যাক তবে উঠি, তবে নিশ্চয় জানবেন ইন্দ্রিজবাবু এ ছেলে আমার ঘরে আসবেই যাবে—তদ্বাপত্তির সম্ভাবনা লিখিত বিধান।'

রামধরালবাবু বিদায় হয়ে গেলে ইন্দ্রিজবাবু টেনেনে টেনেনে পাশের ঘরে শয্যায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। পাঠক বিস্মিত হবেন না, ইন্দ্রমতী সামান্য ফুলের আঘাতে নাকি দিয়েছিল, আর ইন্দ্রিজবাবুর তো যায় মূর্ছা, তার কারণ এই তালিকা ফুলের চেয়েও হাল্কা। ইন্দ্রিজবাবুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পড়ে জলা জল ও স্মেলিং সল্ট নিয়ে ছুটে এলো। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন 'কি হয়েছে?'

দুর্বল ইন্দ্রিজবাবু সংক্ষেপে কাতরতার কেবল একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন—'চ ও কিন্তু ন।'

জিনা অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে, রাত্রের হাতের আর সব সম্বল যখন ফুরিয়ে যায় তখনো ফুরোয় না চোখের জল। দুর্ঘটনার পরে ইন্দ্রিজবাবু যখন পণ্ডদীন বিবাহের তর্কথানা স্ত্রীকে বোঝিয়ে সমস্ত বিকল সোনাদিয়ালের আড়াল থেকে সব শুনেছে জিনা আর বুঝেছে লক্ষ টাকার উপর পক্ষ করে বিবাহ দেওয়া তার বাবার পক্ষে সম্ভব নয়, আর উচিতও নয়। তারপরে তার ঘরের মুখে মহিলা সমাজে প্রচলিত অভিধানের সুস্রাব্য অসংলগ্ন গালা-গালির বহর যখন শুনেছে তখন এখানে বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছে। তখন মনে পড়লো অমিয়র কথা। অমিয় এ কী করলো। তারা দুজনে একসঙ্গে এক কলেজে পড়েছে, অবশেষে এক সঙ্গে পাশ করেছে এম-এ: স্পষ্ট করে না বলেও আড়ালে দুজনের মধ্যে বিয়ের কথা হয়েছে। তারপরে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের লোভনীয় চাকরি যখন পেলো অমিয় স্পষ্ট করে প্রস্তাব করলো মিনার কাছে।

মিনা বলে, 'তোমার বাবা যা যে পণ দাবী করবেন, বাবার পক্ষে দেওয়া তা সম্ভব হবে না।'

—এক পয়সাও যাতে দাবী না করতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছি। পাড়ার মেয়েদের মধ্যে ক্যানভাস করে মাকে জোগাড় "পণ নেবো না পণ দেবো না" সমিতির সভাপতি করে দিয়েছি, এখন তাঁর পক্ষে পণ দেওয়া অসম্ভব।'

উজ্জ্বলে হয়ে উঠল মিনার মুখ। বলে, 'তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো।'

অমিয় নিশ্চিন্ত হল। মায়ের কাছে মিনাকে বিবাহের ইচ্ছা জানালো। মা রাজি হলেন কারোই বাধাও রাজি হলেন। সুসংবাদ নিয়ে অমিয়ে এলো মিনাকে। দুজনে মেয়ের ঘরে বসে ফুলেদের ফুলের বাহার দেখতে দেখতে অমিয় হঠাৎ বলে উঠল, 'মিনা আমার কি মনে হয় জানো, ফুলেদের ফুলগুলো দেখেই ঈশ্বর আকাশ কুসুম কল্পনা করেছেন।'

মিনা বলে, 'কেমন করে বলবো ঈশ্বর নই, আর আকাশ কুসুম কখনো দেখিনি।'

—তবে না হয় আমার চোখ দিয়ে দেখো, এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু আছে কি?'

মিনা জানে না সত্য কিন্তু সবলেই কবি, আর তখন তার চোখে চন্দ্রের সুন্দর।

ওরা দুজনে যখন চার চোখ এক করে ফুলেদের ফুলে আকাশ কুসুম দেখছিল তখন অমিয়র পিতা মাতা চার চোখ এক করে পণ্ডদীন বিবাহের তর্ক করছিলেন।

তার মা বললে, 'পণ নেবো না, পণ নেবো না ঠিক। কিন্তু তাই বলে যৌতুক, অলঙ্কার, প্রসাধনী ছাড়বো কেন!'

দুশ্চিন্তায় রামধরালবাবু বললেন, 'তর্কথানা কিছু লম্বা হয়ে গেছে! এবে ৫ কিন্তু পর্যন্ত নামিয়েছে।'

—তবে তো সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।'

সত্য কথা বলতে কি, পণ প্রথার মূলে ওঁনারা, আর তা প্রচার করেন এঁনারা।

মিনা ভাবছিল আর ভাবছিল অমিয় কি সব জানে? নিশ্চয়ই জানে না। আবার ভাবলো আমি যেভাবে মেনেছি সেইভাবে সম্ভবত মেনেছে। তবে আমার মতো নিশ্চয় কাঁদিয়ে না, কাঁদবার ছেলে সে নয়, আবার নিজের জন্য ভিজিয়ে নেবার ছেলেও সে নয়। কিন্তু কি করতে পারে অমিয়, কতদূর যেতে পারে, বাপ মায়ের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে করতেও কি পারে? সে কি সম্ভব, সে কি উচিত? তার নিজেরও তো ভাই আছে, সে যদি বাপ মায়ের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে করে তবে কেমন লাগে তাদের। আহা এই সময়ে অমিয় যদি থাকতো, সব তার সব ভাবনা ফুলে দিত তার হাতে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখবার সময়ে মানুষের স্বপ্ন বলে বুঝতে পারে না, মাইলে আর স্বপ্ন বলবে কেন। একটি মেয়ে, বয়সে তার চেয়ে কম হবে, সুন্দর, আর কি চমৎকার শাড়িখানা যেন আগুনের সুতো দিয়ে বোনা, মুখমণ্ডল সেই আগুনের আভায় উজ্জ্বল, তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মিনা চেনে না মেয়েটি কে কিন্তু তবু যেন অচেনা নয়, তবে তবে এক সংস্কার যেন দুজনের হৃদয় বাঁধা। সেও তাকিয়ে রইলো মেয়েটির দিকে। এবারে মেয়েটি হাসলো, সে হাসিতেও যেন কোমল আগুনের শিখা।

মেয়েটি শুধোলো, 'তুমি কি ভাবছ?'

মিনা যেন যেন সাহস পেয়েছে—বলে, 'ভাবছি আমার মনের কথা।'

—ওটা কি একটা উত্তর হল। সবারের সব কথাই মুখের, সুখের কথা আর কই?'

—'কেন, অত লোক তো সুখী।'

—'তারা সুখের ভান করে।'

—'আপনিও কি অসুখী?'

আবার সেই খিন্নতে কোমল হাসি। তবে উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'তোমার মুখে আমি সুখের।'

—'কি সুখ বলুন তো।'

—'বিবাহের পর ওঠে উঠছে না—এই তো।'

চমকে উঠে মিনা বলে, 'আপনি কি অন্তর্যামী?'

—'মৃত্যুর পরে সবাই অন্তর্যামী।'

—'মৃত্যুর পরে! মরছে কে?'

—'আমি।'

—'আপনি? আপনাকে তো চিনতে পারছি না।'

—'পারবে কেমন করে; দেশের লোকে আমাকে ভুলে গিয়েছে।'

—'কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

—'পারবে না, অনেক দিন আগেকার কথা, তবে মন দিয়ে শোনো। আমার নাম স্নেহলতা। ঘাট বছর আগেকার কথা। যখন আমার চোদ্দ বছর বয়স হল, তখন ঐ বয়সে বিয়ে না হলে মেয়েদের নিন্দা হতো, পঞ্চাশ টাকা সত্তরের আশায় আমার বাবা হন্যে হয়ে বেড়িয়ে পড়লেন। বাবা ছিলেন গরীব, গরীবকে লোকে উপদেশ দেয় টাকা দেয় না। এমন সময় বাবা ও মায়ের কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনতে পেলাম—চড়াদর ছাড়া নাকি উপায় নাই। চমকে উঠলাম। বাবা মা ছোট ছোট ভাইবোন সব নিস্তব্ধ হয়ে শুধু আমার জন্যে। তখনি অন্তর্যামী করলাম আর সেই রাত্রেই কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে জেলে আগুনে লাফিয়ে পড়ে সব সমস্যার সমাধান করে দিলাম।'

দুঃস্বপ্নের মিনা শুধায়, 'তারপরে?'

—'তারপরে আর কি। এ রকম অবস্থায় বাঙালী সমাজে যা হয়ে থাকে তাই শুরু হয়ে গেল। কবি কবিতা লিখলো, বাগ্মী বক্তৃতা দিল, চিত্রকর ছবি আঁকলো, সম্পাদক সম্পাদকীয় লিখলো, ছাত্রেরা মিছিল করলো, সমাজসেবীরা আর কিছু ভেবে না পেয়ে সরকারকে গাল দিল। পাঁড়াও আরও আছে। শোনো, গ্রামে গ্রামে স্নেহলতা কাণ্ড উঠলো—

—'সে টাকা পৌঁছলো আপনার বাবার হাতে।'

—'হাতের এক পয়সাও নয়। পাঁড়াও, তামাসার এখানেই শেষ নয়। তারপরে কতদিনে হাজারে হাজারে দুঃখ ছিনের মায় বালক অর্বাচীন গ্রামের আমার করলো পণ যে যো না, পণ দে যো না। আর আমার চিতাভস্ম নিয়ে শ্মশানে এমন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল যে কলার মেয়ের মতো এক কণাও অবশিষ্ট রইলো না।'

—'তবে এখনো কেন পণ প্রথা চলছে?'

—'কেন চলবে না। বাঙালী মনকে যদি প্রেত করে তবে।'

—'কিন্তু এবারে পণ প্রথা বেআইনি ঘোষণা হবে, পাড়ায় পাড়ায় "পণ নেবো না, পণ নেবো না" সমিতি।'

—'সেবারেও হয়েছিল। মুরুব্বরা মুখের হুকুম দিয়ে লিখে লেখা করেছিল যা কালীর কাছে, ছেলেরা যত চাইতে সাহস করতো না এখন অভিভাবকের তার চেয়ে অনেক বেশি চায়। আর তা ছাড়া দেখা দেবে পণের বাজারে কালো বাজার, তার ফলে ছেলে বেচে যাবে। আর নগদ টাকা নিলেই পণ, আর ঐ যে তোমার আড়াই হাত নারী কর্মের প্রয়োজনে ও বুঝি কিছু নয়।'

—'এখন কি কর্তব্য,' শুধোয় মিনা।

—'কর্তব্য মেয়েদের হাতে।'

—'না, না, আমার পারবো না!'

—'মরতে কে বলছে তোমাকে। তবে আমি ভুল করেছিলাম, সেই ভুল সংশোধনের জন্যে বাঙালীর নিদ্রায় আমি দেখা দিয়ে যাই, বাঙালী স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেয়।'

—'কিন্তু উপায় তো বললেন না।'

—'উপায় জিজ্ঞাসা করো অধিকারে।'

—'আপনিতো সব জানেন দেখছি।'

—'মৃত্যুর যে ঠিকানায়, এখন আমি চেলাম অধিকারে দেখা দিতে।' এই বলে ছায়া স্বরূপিনী অন্তর্হিত হল।

ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসে মিনা। জানলায় দিকে তাকিয়ে দেখে ভোর হয়ে এসেছে। এমন সময়ে টুক করে একটা কাগজের মোড়ক এসে পড়ে কোলের উপরে। বিস্মিত মিনা খুলে দেখে লেখা আছে—"আজ দুপুর আড়াইটার সময়ের সেই ঝাউ গাছটার তলায় উপস্থিত থেকো। অবশ্য অবশ্য। মা।"

মিনা কিছু বুঝতে পারে না, মায়ের কথা মনে পড়ে যায়, সব কেমন ঘোলাটে ঠেকে। চিঠির টুকরোখানা আবার ভিতরে মুড়কের মধ্যে রেখে দিয়ে উঠে পড়ে।

সেই ঘট গাছতলায় বেঞ্চির উপরে পাশাপাশি অমিয় ও মিনা উপস্থিত। দুজনেই নীরব। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে অমিয় বলল, 'কি ভাবছ?'

—'ভাবছি বাড়ীতে মা বলে এসেছি, বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না।'

—'আমিও এসেছি আফিস পালিয়ে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়—অতএব শীঘ্র চলো রেজিস্ট্রি আফিসে।'

কথা বাড়লেও অমিয় বুঝেছে মিনা

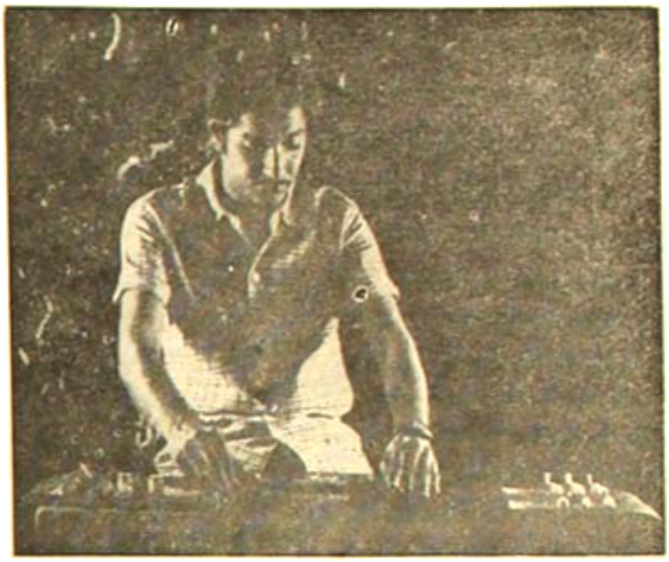

ঘুরবীন মুখোপাধ্যায়

মাতার কর্মপদ্ধতির কথা। বুঝেছে এ ছাড়া উপায় নেই।

মিনার উত্তর না পেয়ে অমিয় শুধালো, 'কি পিছিয়ে গেলে না কি?'

—'মেয়েরা অত সহজে পিছোয় না।'

—'তবে আর বিলম্ব কেন?'

—'শুনেছি রেজিস্ট্রি আফিসে নোটিশ দিতে হয়।'

—'অর্ডিনেন্স কি দিলে নোটিশের প্রয়োজন হয় না।'

—'কিন্তু তোমার বাবা মাকে কি বোঝাবে।'

—'সে ভার আমার।'

মিনা সন্তুষ্ট অমিয়র হাতখানা চেপে ধরলো। (এই প্রথম। মিনা মোটেই দুঃখের যোগ্য মেয়ে নয়)।

রেজিস্ট্রি আফিসের কাজ সারা করে যখন তারা বাড়ীতে এসে পৌঁছালো দেখল বাড়ীতে কেউ নেই। মিনা মনে মনে স্বস্তি অনুভব করলো।

"পণ নেবো না পণ নেবো না" সমিতির উদ্যোগে অদ্ভুত সভার অমিয়র মা তখন জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করছিল—"দেশের তরুণ তরুণীদের উদ্দেশ্যে হাতে হাতে পণ করতে হবে পণ নেবো না, পণ নেবো না, তরুণ তরুণীদের বাবা থাকেও। পণ অমর, অবাধ্য, অদম্য। প্রয়োজন হলে বাবা মায়ের অবাধ্য অমান্য করে বিয়ে করতে হবে তরুণ তরুণীদের।'

এমন সময়ে বাড়ী থেকে লোক এসে এক টুকরা কাগজ দিল সভাপতির হাতে,—'শীঘ্রই বাড়ীতে এসো।'

অমিয়র বাবা ইতিমধ্যে বাড়ীতে ফিরে সমস্ত অবস্থা অবগত হয়ে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

'আজকের মতো সভার কাজ শেষ হল—বলে সভার দায়িত্ব নিয়ে অমিয়র মা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলেন।

—'এই নাও মা তোমার বউ। সোজা রেজিস্ট্রি আফিস থেকে আসছি,' এই বলে অমিয় মিনাকে নিয়ে প্রণাম করলো।

তখন অমিয়র মায়ের মুখে যে ভাবান্তরের লীলা চলছে তা উপভোগ্য হলেও বর্ণনার যোগ্য নয়। এক সঙ্গে রৌদ্র ছায়া, ঝড়ো কাশুন, চড়াই উতরাই, আশা নৈরাশ্য, প্রতিষ্ঠা বিসর্জন, হিংসে প্রেম ক্ষণে ক্ষণে ওলট পালট হতে লাগল।

রামদয়ালবাবু বললেন, 'আও, আশীর্বাদ করো।'

মায়ের মুখে চলছে ঝড়, স্তব্ধতা ভঙ্গ—সোজার মুখো রেজিস্ট্রি আফিসে বুঝি সিঁদুর দেওয়ার ব্যবস্থা নেই।

অমিয় বললে, 'অন্যায়। তবে আমরা ভাবলাম তুমি নিজে গিয়ে দেবে।'

এবারে তিনি চকিত স্নেহদৃষ্টিতে মিনাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওসো মা, এসো। এ তো তোমার বাড়ীরই সামিল তো তোমার চেনা।'

মিনাকে তিনি আগে দেখেই ছিলেন, এ বাড়ীতে সে অনেকবার এসেছে।

তারপরে হঠাৎ সহর্ষে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'ওরে মাখী এখনি করেই চলতে হয়!'

পর মুহূর্তে কণ্ঠস্বর তাঁর সপ্তম থেকে কোমল গান্ধারে নামিয়ে এনে (তেমন করে মিনা নোটিসে কণ্ঠস্বরের স্নেহ কেন কেউ কখনো কেড়েই পারে) বললেন, 'তোমার মাকে বলিনি মা, বলেছি আমার বেয়ানকে।'

—শেষ—

আমি বলি কি, এ সুখের পরম-পূর্ণ কীর্তি—মাইক।

আর কি কীর্তিই না করেছে—এই মাইক, না কেষ্টা।

প্রথমে ভাববনের একখানা সাটিফিকেট ছিলো, মুখে অরোটি বসানো। এখন সেখানা ফেড়ে নিয়েছে ঐ মাইক। মাইক-ই এখন মুখকে মুখ বানাল না, মুখর করে তোলে। মাইক দেখলে ঘুমিয়ে ওঠে না, এমন লোক খুব কম। আর মাইকের সামনে দাঁড়িয়েও যে মুখর হয় না, সে হয় মূক, না হয় মূর্খ!

মাইক মুখের। মনের কথা মুখ দিয়ে বের করে নিয়ে কিনা সবাইকে হাততে বেড় সব ঘরে! ছোট্ট কথাকে বড় বড় সবল তরে লাগানো—এমন চালাকি আর কারো মুখে সম্ভব? প্রথম আমলের সভা জগতে এই কলা-কৌশলের ব্যবস্থা না থাকলে, অর্থাৎ না-মাইক বক্তৃতার কোন কিছুই জমজমাট নয়। সব আয়োজনই ফিকে যায়।

ধরা যাক, একটা বিয়েই সভার আয়োজন করা হয়েছে। টাকাপয়সা খরচ করে প্যান্ডেল-ট্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে। রঙীন কাগজে সে প্যান্ডেলে ফুল-এ কতগুলি ঝোলানো হয়েছে। বাজনা বসেছে। কিন্তু মাইক-ওলা তখনো এসে পৌঁছোয় নি। সর্বনাশ! কর্তাপক্ষের মাথায় হাত! ভিটে মাটি হবার জোগাড়! ছোট্ট-ছোট্ট এবি গড়াচ্ছে-অনবরতো যে বাজা! হতে-পরে ধরে নিয়ে আয় শীগ্গী মাইকওলাকে এই সন্ধ্যার জন্যে। জাত-টাত বাঁচুক। কিন্তু, তবুও সে-মাইক করে আসা ফেলো কার কেছিয়ে নয়, কেন অনাবিল আনন্দ করে! তারপর তিনি মাইক আবিষ্কারকের ছিঁড়ি করে মাইকের সামনে মুখ রেখে মুখ কললেন, হ্যালো...টেস্টিং...ওয়ান-টু-থ্রি' তখন সাঁতাই মনের ভারে একটা ছিলিং ভাব জাগে! যাক, মাইকের কথা তো কলাবার একটা সমস্যা হলো। বিটিং চললো। একজন বক্তা মাইকের সামনে হাত-পা নেড়ে কথলো বা মাইকের টেস্টি চেপে, আর অবশেষে সভাপতি কণ্ঠ-বাঁশি করে মাইকের মুখ থেকে ছিনিয়ে নেবেন, সারা প্যান্ডেলে ধন্যধন্য কলকে—এমন সময় মাইক ফেল কললো। মাইকের টেস্টি চেপে ধরায় আর তার মুখে অনবরতে মন্ত্র দেওয়ার মাইকটি রহস্যে কিলিয়ে গেলো।...ধস! সারা প্যান্ডেলে পাণ্ডিত্যনিরুদ্ধ। হৈ হৈ! মাইক-মাইক! কথা শোনা যাচ্ছে না। মাইক মুকে প্রতিবার বক্তা নীরব, শ্রোতারা মুখর।

মাইকের সামনে! অমনি উনি ঘাড় উঁচিয়ে লম্বা হয়ে তোমার মুখের সমনে মুখ রাখলেন। তারপর তোমার পরে আমার হাততো ধাক্কা দেবার পালা আর আমি একটু বেটে খাটো মানুষ! অমনি উনি ঘাড় নামিয়ে নীচু হয়ে দেখলেন, বাপস, লোকটা কী বেটে! সামনের পাঁচ-মাইকের অত্যাচার, অনাচার! আমি কী কলছি বা আমরা কী কলছি—তারই কাহিনী পাঁচজনা করে পাঁচ-জনকে শোনাবার জন্যেই এই মাইকের কাছে অমাবিক হয়ে থাকতে হয়! তা ছাড়া আজকাল চিঠি কলি বলেই চাঁদকরা কলবার জন্যে একটা অবলম্বন চাই তো। তাই এই মাইক।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে যে মুখর হয়ে ওঠে, তার মুখে কথা ফোটে, তার মুখে ভাষা আসে, তার মুখে ভাব জাগে, তার মুখে ভঙ্গি

ছেলের চুলটা বেওড়া জামাটা দিয়ে। তাছাড়া আজকাল নাকি চেঁচিয়ে কথা বলা অভদ্রতা। মিহি গলায় চিঁচিয়ে, মনে রেখেছেন করে ছেলে ছেলে কথা বলাই নিয়ম! আমার ছেলেকে গান শেখাবার জন্যে এক গানের মাস্টার-মশায়কে রেখেছিলাম! কিছুদিন যাবে ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, একটা গান গা তো বা শুনি কেমন শিখছিস। সে তো হারমোনিয়ম নিয়ে বসলো। কিন্তু দেখি তার গলায় স্বরই ওঠে না। আমার আবার নজরুলের গান শোনা-কান। বললাম, ও কিরে, একটু গলা ছেড়ে গা। উত্তরে ছেলে বললো, মাস্টারমশায় বলেছেন, গাইতে গিয়ে ষাঁড়ের মত চেঁচাবে না, গলা ছেড়ে গাইবে। আরো নাকি বলেছেন, তা হলেই নাকি গলা মাইক-ফিট হবে। হয়তো। ছেলে বেজায় ফিকাই। গলা ছাড়াটাও ঠিক নয়। মানে, কোন কিছুই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় তত্ত্বকথার দিনে।

আজকের দিনে আমাদের জীবনে মাইকের যতটা ছেলেমী রয়েছে। তত্ত্ব মন্ত্র ছিছি, তিন বিবাহের দিনে। তেমনি জলসায় এখনও মাইক চলবার হয় না যদি, (যদিও পাঁচ বছরে!) তবে মন্ত্রটা আর বিয়ে দুই-ই মাইক দিয়ে। মন্ত্রটা হলে ছাদনাতলার যে কীর্তনটা গাওয়া হয়, তাতে মাইক না হলে জমে না। আমি যে অবাক হচ্ছি, আমার যে ছেরাদ্ধ হচ্ছে, সেটা সকীর্তনে সঙ্গত মাইক ব্যবহৃত দেখলা না করলে আমার আত্মীয়ই হয়তো মাফলুম্বে ভুলতে থাকবে! তাছাড়া আমি যে একটা হেজিপেজি ছিলাম না, যা আমার ছেলেরা যে কেন্ট-বিষ্টু, সেটা আমার ছেরাদ্ধের লাল সন্ধ্যা, কীর্তনীয়ার গলায় কন্ঠহার আর সবার ওপরে মাইকের গাঁক্‌গাঁক্‌ আওয়াজেই তো প্রমাণ করবে! নইলে তো শ্রোতিয় পাড়ায়। মাইক যদি পাড়ার লোকের কানের শিগ্‌ড়িই না ছেঁড়ালো, তো আমার ছেরাদ্ধ কিসের। কিন্তু সেকালের কিসনু বলতে বা করতে পারে না তারা। জানি, এটা ফিল্ম-এর গান নয়। আর আপত্তি করলে বুঝতে হবে, পাকিস্তানিকেনীরা কীর্তন থেকে না এবং মীটিংয়ে নির্ঘাত বিপ্লবের! কেন বলব না? আমার আত্মা ওপরে উঠে না গিয়ে গানের মেরে ছোঁড়া ছেলে কেলাই নীচে আসতে চাইছে আর মাইক তার আওয়াজে ইথারে বাজা মেরে মেরে তাকে ওপরে দিকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে, আর সে সময়ে কি না ফল পাকিয়ে এসে মাইক আমাদের গ্রামে হিন্দুদের বিরোধী কথা! মাইক আমাদের পারলৌকিক কাজে পর-পরে ঠেলে দেবার কান্ডারি!

আর বিয়ের ব্যাপারে মাইক? তাও আমায় খুলে বলতে হবে! আমি যে আমার ছেলের বিয়েতে বাদী মামী সানাইয়ের দল নিয়ে এলাম, সে কথা তারস্বরে কে জানাবে? আর যদি সানাই না-আনাই—সানাইয়ের রেকর্ডই বাজাই—সেটাও তো সম্ভবে মোকাবেলা করা পড়তো ঐ মাইকের মারফত। আমার তো মনে হয়, বিয়েতে আমার ঠোঁপর মত ছেলে ঠোপর না হলেও চলে, পাঁচটা বাড়ি ঘুরে ঘুরে ভূত-খোজন না করালেও ক্ষতি নেই; কিন্তু বিয়েতে মাইক চাই-ই। বিয়ে মাইনাস মাইক=একটা ইয়ে, তার্স, মানাই তার্স।

তবে ঐ বিয়ের ব্যাপারেই মাইক যে ভয়ংকর সংঘোনাশা হয়ে পারে, তা বুঝি জানা নেই। মানে, ব্যাপারটা ঘটলো আমার ছোট সম্বন্ধীর বিয়েতে! আমার এক ভায়রাভাই ঐ মাইক-ফাইকের ব্যাপারে বেশ বোঝে! সে বেহেতেকে এক মাইক ভাড়া করে এনে অনেকক্ষণের ঘাটের মাথার দিকে তুলের আড়লে ফিট করে দিলো আর তার সাথে তার তুলের আড়াল দিয়ে এনে পাশের ঘরে জুড়ে দিলো আমাদের সবার! বাস, শুরু হয়ে গেলো খেল! কেলোর কীর্তি! চতুর পয়লক তো ঘাটের তলা টলা, আলমারির পেছন, পর্দার আলনার আড়াল আবডাল হৈচৈয়ি জাল করে পরীক্ষা করে দেখে নিলো বন্ধ করলো দরজা বন্ধ করলো। ব্যস, কেউ তাহলে আড়ি পাতছে আসেনি। ওদিকে পাশের ঘর থেকে তার বোন জলসাশিক্ষার ট্রেনিংটিনিং নেবার মত (আহা! হেল্পটাও হবে হয়তো!) আমাদের-কারুরের চেয়ারে বসে আছি। একটু, পরেই শোনলাম শুরু হলো—তোমার নাম কি?'

প্রথমি মুখোপাড়া মাইক আমাদের ঘরে চেঁচিয়ে বলে দিলো, 'তোমার নাম কি?'

কোন উত্তর নেই।

—'ও, তোমার কোন নাম নেই বুঝি!'

—(মাইকে) 'ও, তোমার কোন নাম নেই বুঝি?'

এবার উত্তর, 'না।'

(মাইকে) 'না।'

—তোমাকে কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে!'

—(মাইকে) তোমাকে কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে!'

'থাই!'

—(মাইকে) থাই!

—আমি তোমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছি। বুঝি!'

—(মাইকে) 'আমি তোমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছি। বুঝি!'

—জানিনে, যাও!'

—(মাইকে) 'জানিনে, যাও!'

এইভাবে প্রায় সারারাত চললো প্রেমালাপ। আর কত সব অন্তরঙ্গ কথা। আর মাইকটার মুখে যদি কেউ আগুন ধরিয়ে যেতো। সব আমাদের কাছে ফেলেন করে দিতে পারতো। আর চাপা হুকহুকে হাসিতে আমাদের পেট্টা খিল ধরে অবস্থা ফেলোড়।

অথচ এই মাইকের আবিষ্কার তো দেখছি সবার। আর ইনি যদ্দুরুপে সম্মুখে তোমার! বড় বড় অনেক সভার মঞ্চতায় সভার ওদের মুখের সামনে সাজানো থাকে গুচ্ছ আর-জনক মাইক। ওদের বলা চেপ-রেকর্ডারে টুকে নেবার জন্যে বলে বলে রিপোর্টাররা ওদের মুখের সামনে ধরেন খাঁজার জন্যের মত লম্বাটে মাইক। সেদিন টালিগঞ্জে একটা স্টুডিয়োতে শুটিং দেখতে গিয়ে দেখি অভিনেতার মাথার উপরে কাঁপকলে ঝুলছে একটা মাইক, ঠিক যেন মুকুমার রায়ের সেই 'হুকোর কল'-এর মতো। তাছাড়া পুজা মন্ডপে বেজা-কির্তনে কিসিম রকমের মাইক, ছোট্ট কল-এর জন্যে হাত-ঢোকা মাইক, মেলা-প্রদর্শনীতে হারানো-প্রাপ্তির জন্যে মাইক, ঘুড়ি-বল খেলার ঘরে বসে দিলে খেলবার জন্যে মাইক, জলসায় গানের জন্যে মাইক, নাচে পায়ের ঘুঙুর খেলবার জন্য মাইক, মফস্বলে সাইকেল-রিক্সার সিনেমার বিজ্ঞাপনে মাইক, আমেচার-থিয়েটারে নায়কের সমনে মাইক—মাইক কোথায় নেই?

এই সব দেখেই তো মাইকের মতই চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, মাইক মহীরুহ কথা! সন্দেহ হয়, মহত্তের পরেই মাইক, না, মাইকের পর মা। এখন মহত্বের কথার জোর নেই, কিন্তু মাইকের আছে!

তা জয়-ধ্বনি দেওয়া যায় মাইককে। মাইকের অনেক দোষ থাকলেও, খুব বড় গুণ নেই। মানে, দেখে খুশে যেমন মানুষ, তেমনি মাইকও। দেখো, মাইক তার মালিকের জন্যে ভাড়া খাটে, গলায় দড়ি দিয়ে তার নয় প্রচার করে, মালিক যেখানে নিয়ে যায় সেখানে মুখটি বুজে যায়, আর তার ফলাফল সব রকমের লোকেরই কেন করে, অথচ কখনো পুরস্কার পায় না। বড়া কেউকে নাড়ু খাওয়ায় বলে, মাইক ঠিক সেইটুকু সময়ে উঁচু গলায় সবাইকে জানিয়ে দেয়। এবে যদি বলো তিল থেকে তাল করা—তা বলতে পারো, তবে কথাটা অন্যায় হবে। তাহলে সোপানেই বলি, আমার মোপলের মা, (কার কথা জানি, বুঝতেই পারছো) তাঁর গলাটা ঠিক মাইকের মতোই। বেশ ভারালো আর সুর-জ্ঞানও। তা ছাড়া মাইকের মতই মুখসর্বস্ব, আর পেটে কোন কথা থাকে না। তা এক-এক সময় তাঁকে, মাইক-ওয়ালার মত সভা-সমিতিতে ডেকেও তাকা যেতো কেমন হয় ওঁর গলার জন্যে? অন্তত দুটো পয়সা তো ঘরে আসে! কিন্তু তা কী আর হবার যো আছে! আমি যদি ভাইনে ছেড়ে বলি উনি যাবেন বাঁয়ে। আমি যদি চুপ করতে বলি, উনি গাইবেনই করবেন। কয়েকই বলা যদি একটি কথা ওঁর কানে যেন, অমনি উনি পঞ্চমসুরে করে আমাদের পাঁচ কান করতে থাকবেন! তিলকে তাল করবেন। মানে, অনেক মানুষের গলা মাইকের মত হলেও, মাইকের মত কান মানুষকে দিয়ে করানো যায় না। এখানেই মাইকের কাছে মানুষের জয়। মুখসর্বস্ব মাইক অন্তঃসারশূন্য আমাদের, মানুষ আমাদের মৌখিকভাবে। মাইক পরের কথা পরকে শোনার পরের মত করেই, নিজের মত নয় কয়।

এ হেন মাইককেও লোকে নিয়ে করে। গতবার পুজোর সময় পঞ্চিম-পাড়ার আমার সহপাঠীর বন্ধু সন্তোষ সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। গিয়ে দেখি তার বাড়ির ঠিক সামনেই দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল আর তার বাড়ির দিকেই মুখ করে আর্মাচাকারাকারী, আর মাইকে ফিসিয়ানের কারবার চলছে—সে হামলুয়া, সে পোলোয়া! নাচও ছেলে কাবার। কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়! আমি তেতো আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বললে, ব্যাপার আমার দুর্গতি! জানিস, আমি এ জন্যে দশ টাকা চাঁদা দিয়েছি! তাছাড় বছর একবার মাইকের জন্মজন্মকার। সুর কেমন জমুর হয়ে বেজেছে! আমি কী ভাবছি জানিস? —চেঁচিয়ে বললাম, কী? বললে, পুজোর মেজাজ হাত খালি হয়ে গেছে, নইলে টিঁচিঁ ফেটে চলে যেতাম জোথাও, যেখানে মাইক নেই, মাইক নেই, মাইক নেই! আমার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোর কথা বুঝেছে না। নাকে বললে, আঁত সহজ কথা। যেখানে ঐ মাইকের ঐপাত নেই যেখানে মাইক মানে মানবাহার চাপ-পড়বার ভয় নেই আর যেখানে পাঁচ মানে কয়েক ঢোপ্পাঙানি নেই। বুঝলি? বললাম, বুঝলাম। তবে বুঝে রাখ, ইহসংসারে হেন জন কেন জন্মায় নেই। কখনও নেই। কখনও সব সময়ে হয়ে থাকে! আচ্ছা, তুই যেতে। আজ বেশি গল্প করা যাবে না। অন্যদিন আসবো।—বলেই উঠে পড়লাম।

ফেরবার সময় বাসের হ্যান্ডেল ধরে দুলতে দুলতে ভাবতে লাগলাম, এই মাইক তো সত্যিই যা-তা জিনিস নয়। মনে হয় যেন বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের হাতের বাঁশীর আধুনিক রূপের এই মাইক। শ্রীকৃষ্ণ যেন-তিনেন, সকলকাম বুঝে বুঝে। তেন-তিনেন বৃন্দাবনের বনের আর নিজের পালনের জন্যেই তিনি বুঝে বুঝে আবির্ভূত হবেন আজ বুঝি এই মাইক এ যুগে অবতাররূপে অবশ্য আবির্ভূত হয়েছে। অবশ্য নন্দরাজের মতে বৃন্দাবনের রক্ষা আর নিজের সাজা-র জন্যে! তবে এ-ও তো ঠিক, শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁর মনের কথা বাঁশীর মারফতে শ্রীরাধার কানে পৌঁছে দিতেন, ঠিক তেমনিই আজ মাইক তার মনের মনের কথা পৌঁছে দিচ্ছে হাজার মনের কানে।

- প্রবোধ মালাকার চিত্রায়ন

শ্রাদ্ধের বাড়ির সামনে বুড়োদের একটা আড্ডা বসে। সেখানে রিটায়ার হবার টাইম বাঁধের ধারিয়ে আসছে কিম্বা যাঁরা বহুদিন চাকরি ফাঁকিয়ে এখন জন্মাবধির অজ্ঞান অসুখ হয়ে বাঁচিয়ে পড়েছেন যা বাইরে চেহারাখানা প্রোস্টেট দিন বাঁধিয়ে আসছে—তাঁরাই সকাল সন্ধ্যে এখানে এসে জমেন, আর পৃথিবীর সর্ব-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে যান যেন। কেউ একজনের মতে মত দেন, কেউ ভিন্ন মত আবধানি করে সভাকে উত্তপ্ত করে তোলেন। কোনদিন আ ঢাক্কা হয়, কোনদিন গরম হয়, আর ঠিক নেই।

ঘুনু ঘোষাল মশায়ের বাড়ীর শ্রাদ্ধ—তিনি এখনও বেঁচে আছেন—তাই বৃদ্ধরা ওখানে বসে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। ঘোষাল মশাই বোধ হয় ধরাতলের মানুষ, তাই ওকটাকে এখনও ছেড়ে যেতে পারেনি। হিসেবী লোক হলে বোধ হয় ওখানে মোকদ্দমা করে দিতেন।

সে যাক ঘোষাল মশাই লক্ষ, এ ছাড়া আড্ডার সদস্যদের আরো—ঘটক, ঘটক, বাঁধিক, ঘুনু ভট্টাচার্য্যি, দুখোড়ে ঘুনুরো, চটা চাটুয্যে, বকশেরে বাঁড়ুয্যে ও আরও দুচারজন ভদ্রলোক বসেন। আমিও বিনুভূষণ বিনুপোক্ত হিসেবে ঐ সোসিটির সদস্য হয়ে বসবার অধিকার পাই। কথা থাকলো যে নামগুলি বলবুম, এগুলি পাড়ার লোকে জন্তরালে বলে—বিরূপাক্ষকুলের চিহ্নিত নাম নয়।

সেদিনকার নানাবিধ আলোচিত আলোচ্য বিষয় নিয়ে নানারকম মন্তব্য করতে করতে হঠাৎ মেরুন্দ্রের লোড়া কপাল নিয়ে আলোচনা সুরু হল। অনেকক্ষনার সুচেতন্য করলেন চটা চাটুয্যে মশাই।

তিনি বললেন, যে-কাই বলুন মশাই এ যুগে আমাদের মত মেরুন্দ হওয়া একটা পাপ। কত বড়লোক দিবি গাড়ি, বাড়ী, টাকার বাণ্ডিল নিয়ে মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ আমাদের সেই চিরন্তন হাঁড়ি ঠনঠন অবস্থার আর হেরফের হল না। ওঃ! আমরা যে পূর্বজন্মে কত পাপ করেছিলুম যার ফল এ জন্মে ভোগ করছি। একটা বাড়তি পয়সা রোজ-গার করতে পারলুম না। এ সবই পূর্বজন্মের কর্মফল—কি বলেন?

অধিকাংশ সদস্যই, তাতো বটেই, তাতো বটেই বলে সমর্থন করলেন কিন্তু বকশেরের বাঁড়ুয্যে মশাই রাশভারী লোক বলে উঠলেন, ও পূর্বজন্ম পরজন্ম বলে কিছু নেই মশাই, এ জন্মেই বড়লোক হওয়া যেতে কিন্তু ওর টেক্‌নিকটা আমরা ঠিক প্রয়োগ করতে পারছুম না বলে তাদের পায়ে ধরতে হয়।

চটা চাটুয্যে মশাই তাঁর কাটা গলায় একটু চটা সুরেই বলে উঠলেন, আপনি পূর্বজন্ম পরজন্ম মানুন না মানুন, ওসব টেক্‌নিক ফেক্‌নিক বুঝিনা। পূর্বের ফলেই মানুষ বড়-লোক হয়, বড়ঘরে জন্মায়, এ কথা আমার গুরুদেব বলে গেছেন।

বাঁড়ুয্যে মশাই বললেন, আপনার গুরুদেব, বড়লোক-শিষ্যের কাছ থেকে কেন মোটা দক্ষিণা আদায় করার জন্যেই ঐ-সব জন্মান্তর কথা বলতেন বোধ হয়।

এই কথা কানে সঙ্গে সঙ্গে চাটুয্যে মশাই এমন চেঁচাতে লাগলেন যে তাঁর গ্লাড-প্রেসার চড় চড় করে চল্লিশে তিরিশে নেমে গেল। সবাই মিলে তাঁকে থামাতে পারে না। অবশেষে আমি অনেক কৌশল করে তাঁকে থামাই। তিনি আমায় বললেন, বিনুপোক্ষবাবু, আপনি তো অনেক সাঁচ্চা কথা বলেন, আপনিই বলুন, বড়ঘরে জন্মানো, বড়লোক হওয়া, ঈশ্বরের কৃপা না থাকলে হয়?

আমি বললুম, দেখুন, ঈশ্বরের কৃপা নিশ্চয় থাকে। আপনি আমি যে চেলাচ্ছি, হাত-পা ছুড়ছি, এও তো তাঁরই কৃপায়। কিন্তু বড়লোকরা আমাদের থেকে দূরে থাকে বলে ভাবকে না। তাদের অনেকের অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হয়েছে, তারাও বড়লোক হয়ে হাঁস-ফাঁস করছেন—বড়টা শান্তি পাবেন বলে তাঁরা আশা করেছিলেন সে শান্তি চুলোর গোরে গেছে বড়লোক হয়ে।

এখন বড়লোক কাকে আপনারা বোঝেন, পয়সা কাঁড়ি যার অঙ্কে সে। কিন্তু এ ছাড়াও বড় নাম, বড় নেতা, বড় অভিনেতা, বড় চাকরে, বড় লেখক, মাত্র বড় মহাপুরুষ ঘুনু কেউ অবশ্য শান্তির অধিকারী নন—নিজের চোখে দেখেছি মশাই।

আপনি যত বড় হবেন, দেখবেন তত আপনার ঘাড়ে বোঝা চাপবে, আর সেই বোঝা টানতে গিয়ে তাড়াতাড়ি চক্ষু বোজার চান্সও বাঁধিয়ে আসবে—অঙ্ক ঠিক আপনি যা চেয়েছিলেন তা পাবেন না।

বড় লেখক হন। আমি দেখবেন আপনার লেখার সুখ্যাতি করতে করতে আপনার হাজার পাঁচেক শত্রু জুটে যাবে। তাঁরা কিছুদিন পরে পুরু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন, আর উঠবেন না, গ্রাম অতিথি করে তুলবেন। তারপর আপনার একটা লেখা বিনা পয়সায় তাদের একটা নতুন কাগজে ছাপাবার জন্যে লিখে দিতে হবে। সেটার ছাপা

না হবে, আমের গন্ধার দিয়ে একটু, লেখার কায়দা ও সাহিত্যে মিশিয়ে বাঁচিয়ে দিতে হবে। অতঃপর লোকে হাঁ মুখে বিশ্বিচয়ে থাকিয়ে থাকে দিন, তারা আপনার জন্য-মৃত্যু হয়ে যেখানে-সেখানে আপনার নামে যা তা বলে বেড়াবে। আপনার লেখার চেয়ে অন্যের লেখা ঢের ভাল বলে প্রচার শুরু করে দেবে। আপনি জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবেন। ঈর্ষাকে ব্রহ্মেটি সেলেও, নক্সেটির এই বাড়িতলের কথা ভাবতে ভাবতে ঈর্ষাবাটিস্ বা ব্লাড প্রেসার বাড়বেই।

বড় অভিনেতা হলে তো কথাই নেই। পথে, ঘাটে বাজারে যারা আপনাকে দেখবার জন্যে আটখানা ছেড়ে বাপিয়ে পড়বার চেষ্টা করে, পথে, ঘাটে চলতে থেকে যারা আদরে মাতৃগোপাল করে ধরে ধরি টানার, অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাতে পক্ষাঘাত হবার অবস্থা ঘটায়, শুধু একবারটি আলিঙ্গন দেবার জন্য ছুটে আসে—তারা বিষ্ণু বা বিজ্ঞান হলেও কি করে জানবেন? তিন ঘণ্টের, ঘন্টার কাঁচ ভেঙে সেই মহাপুরুষেই নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দেয়। পুলিশ এসে বাঁচালে হয়তো রক্ষে পায়। এঁদের কোথাও যাবার উপায় নেই, খোলা ছেড়ার উপায় নেই, শুধু অভিধিতে চুপ করে পর্দানশীন হয়ে বসে থাক। তাতেও রেহাই নেই,—নয় তাকালে হাসবে তুমি কজনের সঙ্গে প্রেম করেছ। তোমার কবে শুরু চেলে হয়েছে, কবে তোমার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে তা তুমি না জানলেও তারা জানে। ছেলে যাচ্ছে, পাঠক পাঠিকারা বিদেয়। তুমি বাঁচ ভক্তরা ভক্ত। আবাহতে দিয়ে নালিশ করার উপায় নেই—এক বলে লোক ছুটে আসবে কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে।

তারপর ধরেন হলে তিনি সেকেন্ড ক্লাস ট্রেনে চেপে দারা জলকাতাটা ঘুরে আসুন, তাঁর দিকে কেউ চাইবেও না যদি বা কেউ নাম শুনিয়ে পরিচয়ও দেয় তখন বহুতাইদেরই অনেকে হয়তো ফিস্ ফিস্ করে আপনাকে দেখিয়ে বলবে, ও বাবা, এ তোর এখন এই হাল হয়েছে না কি?

বড় খেলোয়াড়, যাকে এক সময় সবাই কাঁধে নিয়ে নেচেছে, তার ডাকাত একটু, অসুক, ঐ অঞ্চলের দলই তাকে চিকিৎসার মতো টেক করে হয়তো পথে ঘাটে এক ধাক্কা কি লাথি মেরে চলে যাবে।

অতএব এঁদের সুখ নেই। বড় বড় মহাপুরুষেরও তাই গতি। ভক্তদের প্রতিনিয়ত আবদারের ঠেলায় শেষ পর্যন্ত নির্জন গুহায় পালিয়ে না গেলে, ঢের পারে থাকতে থাকতে হয় বার করে ছাড়বে। শেষে গায়েবীন হয়ে যেতে হবেন।

অতএব জীবনের কোনক্ষেত্রে বড় হয়ে সুখী হবার কল্পনা? নারায়ণ দেবতার জীবনেই বলুন বা কেন—বাড়ির বড় কর্তাদের অবস্থাটা কি হয়? যুধিষ্ঠির তাঁর ছেলে যখন সার্কাসের খেলা দেখার বায়নের পর বায়না—তখন হয়িনাম, রামনাম করেও কি বাঁচা যায়?

অত কথা কি, বড় চাকরে হলেও সুখ নেই। পরিবারের গরজ বড়ও, অফিস কেন, বড় বড় ইস্কুলে, কলেজে ছেলেদের পড়ানোনা করাও, মোটর রাখ, ছিপ কেন, বেটিও কেন, টেলিফিশন নিয়ে এস, টাকুর রাখ, বাবুর্চি রাখ, আয়া রাখ, সিনেমা, থিয়েটার, ফুলদার টিকিট কিনে দেখাও। পার্টিতে চল, বিয়েতে এই দাও, তাই দাও, অসুকের নেকস্টের সব চেয়ে বড় আর বাকী একটা ফ্রাক্ লাগবেনা জিনিস কিনে শিগ্গীর হাত দিয়ে পাঠাও! অসুকের চাকরি করে দাও, এই চাঁদা দাও, এই শিক্ষনিকে চল, ক্রিকেটে চল, এরো কালেকা আছেই, এতে যদি আরেকা হয়ে যায় বন্ধুকে—প্রেস্টিজটা তো থাকবে? খাতির তো বাড়বে?

নইলে আবার বড় অফিসার কি! তিন হাজার চার হাজার মাইনে পেলেও প্রত্যেক মাসে হাজার টাকা যায়। সময় সময় আপিসের ফরোয়ার্ডের কাছ থেকেও ধেটা নিতে হয়, শুনেছি। কিন্তু এতে সুখ কোথায়?

পরিবারে স্বামীর সুখে ঝগড়া করে বলছেন, তারি তুমি অফিসার। জন্মে তো কখনও সবাই মিলে তোমার ঘেরাও করলে না। তাদের নামও ফেরোলো না, অথচ রবীন্দ্র আমাদিকে তিনদিন ধরে পুলিশ দিয়ে ঘর করে নিয়ে এল—পরশু পার্টিতে সবাই ভদ্রলোককে কত খাতির করলে দেখলে না?

স্বকর্ণে শোনা।

আবার সোনাদানা নিয়ে যে-সব লোক বসে আছেন তাঁদের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। এই বুঝি ডাকাতি হয়, এই বুঝি ছুরি মেরে দেয়। সেই ভয়ে তো সবাই অস্থির।

বাড়ী ভাড়ার কত কেলেঙ্কারী কথা যায়, কত কম দামে জমি কিনে তত কম খরচায় বাড়ী তোলা হয়েছে তা নিয়েও যদি খোঁচা মারে? আসলে, দিলি, বিধি ভাইকে বিশ্বাস করে কোনদিনও কিছু রাখলে তারাই যদি মেরে দিয়ে বসে। ওরে বাবা! এত কারবার করে টাকা করা সব যে-কারদা চলে যাবে?—এই ভাবনায় কত বড় বড় লোকের ব্লিড্ প্রেসার বেড়ে গেল।

যাঁরা বা এ ছাড়াও কথার কারবার না-থাকলেও আবার শ্রেণিভেদ থাকে না। ভিখারী বলবেন, ভাত দে, ভিক্ষে পাইনাই, একটু সালাজ আর সুপ্ তৈরি থান—একটা যদি প্রচার না হয়, তাহলে কি হল? ফ্লোটেলোমেরের আসি হয়, জ্বর হয়, ভাল ওষুধপত্র করে, পেটে ছেলে দেয়—এসব বড়-লোকদের হলেও ঐ-সমাজে তো বলা যায় না! পেটে আলসার হলেও এ সব ভদ্রলোকের ধারণার—ব্লটারের খবরে প্রকাশ করার ঘুণ্যি নয়।

গঙ্গারামবাবু কোটিপতি লোক, তাঁর যে কী ব্যাধি হল সেটা বুঝতে কজন ডাক্তার এল তার সংখ্যা আমি বলতে পারি না। শুটো চোখের ডাক্তার বলেছে ওষুধ দিয়ে গেল—তাও কন্সাল্টেশন দিলে হবে না, ডাক্তারবাবুদের এসে দিতে হবে। তাঁরা এক একজন প্রত্যহ মোটা ফিস্ নিয়ে গেলেন। মাথার ব্যামের স্পেশালিস্ট এলেন, তিনি মাথার খানিকক্ষণ হুঁতোহাত্ করলেন, বলে গেলেন, আপাতত একটা ওষুধ দিচ্ছি, এটা জার্মানী থেকে আনিয়ে নিন, খাওয়ান। চামড়ে একরে নেওয়ান, সামনে, পেছনে, ওপরে, পাশে, তারপর আমার খবর দেবেন। মনে হয় ওষুধগুলো আনানো হয়ে গেছে, আপাতত আমি কাজ চালাবার মত ব্যবস্থা করে গেলুম। কোন ভয় নেই। একজোড়া করে আমায় দেখবেন। এই বলে তিনিও মোটা ফিস্ নিয়ে গেলেন। এরপর বুক ধড়ফড় করার বারণ করতে একজন কার্ডিয়োলজিস্টকে ডাকা হল। কানে হাতুড়ি ঠুকে দেওয়ার পর থেকে ভদ্রলোক একটু কম শুনছিলেন, তার জন্যে ইয়ার, নোজ, থ্রোটের স্পেশালিস্ট এসে পরীক্ষা করে একটা ওষুধ দিয়ে গেলেন। তারপর পেটটা খুলতে লাগল তার জন্যে পেটের রোগা কমাতে ডাক্তার বদ্যি এসে গেল। ডায়াবেটিসের আক্রমণ থেকে গঙ্গারামবাবুর এক একটি অঙ্গকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় দেশ গেলেন।

গঙ্গারামবাবুর তখন বোধ হয় ভেতরে ভেতরে রাগ হচ্ছিল—তিনি পা ছুঁড়তে লাগলেন। শুটো নার্স তাঁর পা-দুটো চেপে ধরে থাকবার চেষ্টা করলে। তারা চিৎপাত হয়ে শোওয়ায় পড়ে গিয়ে ওঁর বাবারে মোছি মোছি করে উঠল। গঙ্গারাম-বাবু তখন বোধ হয় ধাই ধোবে উঠে নিস্কৃতি পাবার জন্যে ছোটবার সঙ্কল্প করেছিলেন কিন্তু পারলেন না। মাথা ঘুরে ঠ্যাং উল্টে তিনিও পড়লেন। ফলে শোওয়ার হাত থাক-লেন, একটা ঠ্যাংও ভগ্ন হল।

এবার ঠ্যাং বেরে ফেলবেন আর এও স্পেশালিস্ট এলে। এইভাবে হুমায়। বেশ বোঝা গেল, এইবার ভদ্রলোক সত্যিই কাহিল হয়ে পড়েছেন।

তখন বলে বলে আত্মীয় অজন বন্ধু বান্ধব বাড়ী করে আসতে লাগলেন। প্রত্যেকে দুঃখীর ঘরে

বাসবী নন্দী : আকাশবাণী কলকাতার নাট্যশিল্পী

চুকে কেমন বুঝছেন জিজ্ঞাসা করে যেতে লাগলেন। গঙ্গারামবাবুর মুখে রা নেই।

পিসিমা, মাসিমারা এসে হলহল চোখে কত কথাই বলতে লাগলেন—গঙ্গারামবাবু চোখ বুজিয়েই শুয়ে থেকেন।

শেষে তাঁর চোখের পাতা তুলে তুলে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন, হ্যাঁরে কল্পা, কেমন আছিস? আমায় চিনতে পাচ্ছিস তো? আমি তোর নোনা পিসি। অত আমায় চিনিস তো—সেই ছেলেবেলা থেকে।

গঙ্গা সাড়া দেবে কি! নাকে নল বসানো—খাবার গলাধঃকরণের ব্যবস্থা হয়েছে। হাতে ছুঁচ ফোটানো, গ্লুকোজ দেওয়া হচ্ছে। কঙ্কিকাঠের সঙ্গে ঠ্যাং ঝোলানো এবং বাকি একটি অঙ্গে কেণ্ড পরিষ্কারের জন্য ড্রেসের পাইপ লাগানো—এই অবস্থায় কোটি-পতি মহাপুরুষকে স্বর্গে যাবার আয়োজন করছেন। কল্পনেও—কিন্তু কত সুখে ফেলেন বলুন তো? পয়সা ছিল বলেই তো অত সুখে গেলেন? বিধাতার কী আশীর্বাদ ভাবুন তো?

এ সবই পূর্বজন্মের পুণ্যফল কি বলেন? তবে আমি আজ ছেড়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। শেষমুখে কাহুর মুখে কথা নেই।

মনে মনে সবাই ভগবানকে দেয়ার জানাচ্ছেন, না তাঁর প্রাপ্য কল্পনা—তা ভগবানই জানেন।

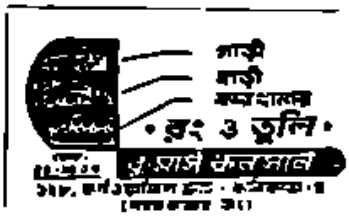

# পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ

সবিতা সেনগুপ্ত

নর্থ এভিনিউ থেকে পার্কস্ট্রিটে যাবো। কতটুকুই বা পথ। বাড়ি না হলেও চলে, হেঁটেও যেতে পারি। কিন্তু যাবো না।

আজ হোলি নয়। আজ তাড়াতাড়ি পৌঁছাবার জন্য দ্রুতগামী যানবাহন চাই আমার।

নারী অধিকারের ওপর যে বিলটি পাস হবার মুখে তার ওপর আজ জোর আলোচনা চলবে পার্লামেন্টে। মুখ্য ভূমিকা আমাকেই নিতে হবে। আমি জানি, আমি খুব ভালভাবেই তা নিতে পারবো। এমন কিছু কঠিন নয় সেটা। এই পুরাতন ইতিহাসের অন্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত নবীনদিনীর পার্লামেন্টে পৌঁছতে কত পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, সেই পথ চলার প্রহরে প্রহরে কম নাটক? তার প্রচণ্ড আঘাত সন্ধাত অভিঘাতে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বারেই জর্জরিত হোক না কেন আমি এতটুকু বিচলিত কখনো হইনি।

আমি কি ভুলে গেছি কোন কিছু? ইতিহাসের পর্বে পর্বে যত দুঃখ যাতনা আমার জন্য সঞ্চিত ছিল, আমি সব আলা করে গ্রহণ করেছি।

তোরব না?

এই স্নিগ্ধ কোমল আবার ঘিরে পৃথিবী আমার সৃষ্টির বজ্রাগ্নি থেকে তার দুর্গমোদ্যম তীর্থ বরের পথে পথে কত অসংখ্য ক্ষত ইতিহাসের হাতিয়ে যাওয়া অন্তরালকে বিনা বাধায়, বিনা বেদনায় ছড়িয়ে দিতে দিতে এগিয়েছে, কে তার হিসেব রাখে? এই নিরবধি কালে, অন্ত বিহীনা পৃথিবীতে?

আমি ঘাঁটিহীন ঘর সাঁইহারা ছন্নছাড়ার নারী। কেমন ছিল মরুভাস্কির দুঃখের ভারতীয় নারী? প্রবোধে যে নারী শাসন করত বলিষ্ঠ হাতে?

তখন আমি দিবসনা হয়ে ঘিরি-ফেরার ঘুরে বেড়িয়েছি। দুঃখ-গহনের ছিল আমার অন্তর্মন্দিরা। অন্তরের অন্তর্গত বুঝি ছিল আমার কাছে, তাইরাতি নদীস্রোত উৎকিপ্ত হত আমার তুঙ্গ স্তনের শক্তি আস্ফালনে।

আমার সর্বাঙ্গে তখন ছিল শক্তির অন্তর লীলা। মুহূর্মুহুঃ প্রতি ছিল আমার নির্ভর উপহাস। পদ্মুহূর্তের কেলার ছিল বলাবের সিন্দুর খেলনা। আমি ছিলাম তখন নিয়ন্ত্রাধিনী। সাঁইকারের চণ্ডী। সেদিন আমার দুঃস্কারে অরণ্য কাঁপতো, সিংহ বরাহ আমার পথ ছেড়ে দিত। অরণ্য-গজ আমার কাছে আসা নাছি, করত। বিস্ময়ে বিস্ময়ে আরণ্যক পশুরা তাকিয়ে দেখত আমাকে।

আর পুরুষ? সে ছিল আমার দাস। আমারই অর্জিত আহারে প্রতিপ্রত। আমার প্রতি অঙ্গে সেদিন শক্তির স্ফুরণ, প্রতি রোমে জীবনের স্পন্দন। দেহের শিরায় শিরায় ছুটে বয়ে যেত বলিষ্ঠ বাহুতে শাণিত ধার; সুপুষ্ট জঙ্ঘার বিস্তারে গর্ব শোভা।

ঘুমন্ত থেকে ফিরে ফাঁদে পদ্ নিয়ে উষার উজ্জ্বলতায় মেঘমন্দ্র দেহে পার্বত্য উপত্যকার পথ দিয়ে নীচে নেমে আসতাম গৃহের পথে। তখন আমার পরিবারের সবাই আমাকে আনতে অভ্যর্থনা করে প্রত্যুদ্গমন করে নিত। শ্বাসতম জানাতো ঘরে থাকা আমার পুরুষ, আমার শক্তির সন্তানরা।

পুরুষকে সেদিন আপন ইচ্ছায় আমার পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারতাম। ওকে ভাল না লাগলে ওকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারতাম। পুরুষ পুরুষে ওর স্বজাতিত্বের কতটুকু আর আপন আপন শিকার ছাড়া খুঁজতে পারতাই শক্তিধরী তরুণী কন্যার পথ থেকে সরে দাঁড়াতো।

কন্যা ছিল স্বাভাবিক উত্তরাধিকারিনী। আমার বলিষ্ঠ পুরুষে স্নেহের দিকে ও অপলকে তাকিয়ে থাকত। বোধ হয় ভাবত এক অন্তহীন স্পর্ধিত জয়যাত্রা জননীর?

কিন্তু জীবনের বড় শিক্ষা যে পথ ছেড়ে থামতে হয়। নবজাতকের হাতে সমস্তই সব সমর্পণ করে হয়ে যেতে হয় ইতিহাসে।

যখন আমার শক্তি বিধায়ী সূর্যের মত চলে পড়ছে বলে মনে হত তখন বলিষ্ঠ দেহী যুবতী কন্যাকে সংসারের সিংহাসনে বসাবার কথা ভাবতাম। আমিও তো আমার জননীর শক্তিময়ী তনুর দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়েছি।

তখন কিন্তু ভালাহীন ছিল ওই পুরুষ, অবহেলিত নগণ্যদিন। সেদিন পরিবর্তনশীল ক্ষমতা ও শক্তির শাসনের জন্যে ওর অক্ষমতা ছিল বড় দুঃখ। ওর জীবন ছিল বড় বেশি সাবাসল; অন্তহীন, ভবিষ্যতশূন্য।

(২)

কিন্তু জীবনের ধর্ম অন্তরতা, প্রচণ্ড গতিশীলতা। এক জায়গায় থেমে সে থাকে না। প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনও বদলায়। ইতিহাসের সেই বিপ্লবে ভাঙা-গড়া পতন-উত্থানের পরিপূর্ণে হিসাব তার কন্যে কে জানে।

আমারও পরিবর্তন হয়। সহস্র বছর পর নিজেকে নিজে চিনতে

পারি না। কি ছিলাম আর কি হলাম!

ইতিহাসের একদা আর এক পর্ব সুরু হয়েছে। নিরবধি কালের সমুদ্রে শতাব্দীর নিরন্তর ঢেউ মিশে যেতে লাগল, কত শৈলশ্রেণীর পতন-উত্থান হল, সাগরে মরুতে কত পরিবর্তন হল, সেই সঙ্গে আমিও বদলে গেলাম। মাতৃতান্ত্রিকে পুরুষের মহত্বহীন ভবিষ্যতশূন্য জড় পুরুষের অবলম্বিত হলাম আমি, একদা যাঁর বন্দিনী নারী। পুরুষের শৌর্যের সূর্য অবলম্বনে এল। আমি হলাম কৃপার পাত্রী। পুরুষ হল সর্বময় কর্তা।

একদা এক যুগ, যুগ নিয়ে কুল, কুল নিয়ে গ্রাম।

আমি তো সবার দাসী—যুগের, কুলের, গ্রামের। কিন্তু আমি ছিলাম অবিবাহিতা, পুরুষ আমাকে রাখত। এই রাখতে পারার মধ্যে ছিল আমার শক্তির পরিচয়। কখনো বা আমি পালিয়ে বেড়াম আরো শক্তিমান পুরুষের আশ্রয়ে। লোকে দেখত মোহিনী ধারায় আমি বয়ে যাই না।

ক্রমে অনেক বদল, অনেক জন-সমষ্টি দেখা দিল। সুরু হল এদের মধ্যে সংঘাত। কখনো নারীর জন্য, কখনো বসতি, কখনো বা ক্ষেতের জন্য।

সে কি আর ছোটখাটো যুদ্ধ! গ্রাম জনপদ কত যে ধ্বংস হবে তার ঠিক নেই। গ্রামের আমি নিত্যই এই। যুগের সুরুতে সন্ত্রাসে জীবন দোলায়িত। সেখানে কৃপা নেই —নেই কোন তাদ্বয়া পৃথিবীর এই ক্ষমাহীন রূপরূপ ভূমিতে। সভ্যতার জয়-তোরণ ইতিহাসের নিবর্ততার ভিত্তিতেই ওঠে, ধরে হয়।

দল বেঁধে গ্রামের অন্ধকারে লুকিয়ে এসে পুরুষেরা হামলা করত। আমি নারী একদা যখন আপন শক্তিতে শক্তিমতী ছিলাম, আমি এমন ভোরের মত অচেতন ঘুমাইনি।

রাতের অন্ধকারে পুরুষ এসে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে দিত। বিজিত গ্রামের ধ্বংসস্তূপে শ্রান্ত-শিথার আলো বিজেতা পুরুষ বন্ধ বালকদের আহুতি দিত। কেউ বাঁচত না, বাঁচত শুধু নারী, মাসে বাঁচানো হত। পুরুষের শাসন আর ন্যায়-নীতিতে জীবন ছিল না, ছিল মৃত্যু। শান্তি ছিল না, ছিল জ্বালা। বলার কিছু নেই। কারণ গ্রামের অসোষ নিয়ন্ত্রণ কোন বিচারালয়ের স্থান নেই। কিংবা উঠলেই তার পূর্ণ মূল্য দিতে হয়। আমাকেও দিতে হয়েছিল। আমার বিচ্ছুতি, আমার স্খলন হল; জীবন-সংগ্রামে আমার পরাজয় ইতিহাসের অধিপর্বে।

যা বলছিলাম। নারীকে বাঁচতে হত পশুর মত প্রয়োজনবোধে। পশুর দুধ, পশুর মাংস আর পশুর শাবকের প্রয়োজন ছিল। তাই তাদের ধরে নিয়ে যেত। নারীরও তাই। তবে শ্রম তার বদলে তার শিশুদের প্রয়োজন ছিল। তাই পশুর মত তাদেরও ধরে নিয়ে যেত।

পুরুষের কামনা একটি নারীতে চরিতার্থ হত না। সে ছিল বহু-বল্লভ। বলাবাহুল্য ছিল একটি বৈধ বিবাহ। অবশ্য নারী সেক্ষেত্রেও তার ভোগেচ্ছা মিটত না। ওই বহু-ভোগী পুরুষের পরিবার ছিল না।

নারী তার শরীরের আরাম আর পুরুষের কামিত দেহ কখনো পেলেও তার কি বা দাম ছিল। দেহে যৌবনের মাদকতা যতক্ষণ থাকত, ততক্ষণ তার প্রয়োজন। তারপর তার অবস্থা দুঃখহীন থাকার চেয়েও হত দুঃখ।

৩

চাঁদ—আমি চাঁদ।

তিন লাখ বছর পার হতে হতে যুগ-যুগান্তের মিশে যায় কালের পারাবারে। এই যখন আবার যুগান্তর—নতুনের একটি ইশারা।

আদিম ক্ষেতখেতে এক নতুন শ্রমিকের আবির্ভাব হল। পুরুষ বটে, কিন্তু পৌরুষ ছিল না তার। তার মধ্যে আর ভারবাহী পশুর মধ্যে কোন অন্তর ছিল না। আমি তবু পুরুষের বিলাসে রসের যোগান দিতাম, কিন্তু ওই মনুষ্যকৃতি জীবের বাহাদুরি এই ছিল যে, ক্ষেতের শ্রমে ও পশুকে হার মানিয়ে দিত। কদাচিতেও সে দুঃখ ভুলত না। এত দুঃখ, এত অসহায় ছিল সে।

ভারবাহী জীবের বংশ বৃদ্ধি করতে ও কি করে এল?

যখন কোন জেতী কোন গ্রাম আক্রমণ করত, পরাজিত দলের দুঃখ আর পশুদের তারা পুড়িয়ে মারত, তরুণদের বেঁধে নিয়ে যেত। তারা হত বিজেতা দলের দাস।

এখনো বিবমস্তিষ্কা চাদ্ হরনি। তবু আমি গ্রামস্থ একজনেরই তৃপ্তি সাধন করতাম।

এরই মধ্যে এল আর এক বিপত্তি।

এল এক নতুন অভিযাত্রী দল। তারা নিজেদের বলত আর্য। নিজেদের ভাবত খুবই উন্নত আর সভ্য।

আমি তো ওদের আচরণ দেখেছি। আমাদের স্থানীয় পুরুষের সভ্যতাকে ওরা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

নিজেদের সেবা ও ভোগতৃপ্তির এরা সুখের নগর নির্মাণ করে এক উৎকৃষ্ট সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু নবাগন্তুক আর্যরা সেই সভ্যতা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল।

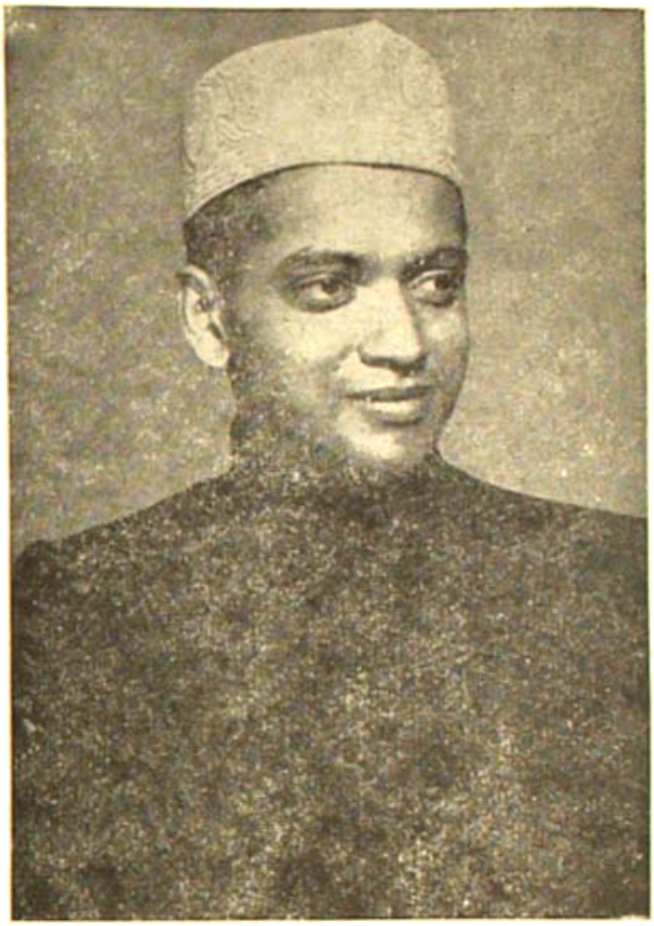

ভি. ভি. পাল্‌সেকর

ওরা এসেছিল রিক্ত হাতে, তবু-পৃষ্ঠে আপন ঘর-সংসার চাপিয়ে। স্থানীয় পুরুষের ওপর নিষ্ঠুর বল প্রয়োগ করেছে, হিত্ত সভ্যতার লোপিয়ে দিয়েছে সমূলে।

ওদের পৌরুষ, ওদের রক্তকোশল সবই খুব উন্নত ছিল। ওরা অনায়াসে জয়ী হয়ে এ দেশে আপন সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

কিন্তু আমার কি আসে যায়, কে হারল আর কে জিতল, শুনতে? আমার তাতে বয়েই তো গেছে।

তখন পর্যন্ত কঠোর শ্রমে আমার দিন যেত। কিন্তু তবু দিন কাটত এক ভাবে। বাঁধন জীবন ছিল বড় দুঃসহীন, অবমাননার জন্য।

কিন্তু নবাগতদের সাম্রাজ্য স্থাপিতে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল।

ওরা ছিল বলশালী এবং অহঙ্কারী। প্রথম ওদের আধিপত্যবোধ। এদের ভোগ করা নারী অপরে ভোগ করবে, এ ওদের অসহ্য ছিল। ওদের এক বিধান ছিল, পুরুষ ভোগী, নারী ভোগ্যা। ভোগীর জীবনান্তে ভোগ্যা নারীর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

এর পর যে সমাজ নিজন আমার সামনে এল তা মর্মান্তিক। নতুন আর্যজাতির পুরুষ মরলে তার চিতায় তার নারীদেরও পুড়ে মরতে হত। যদু নারী ওদের জীবনে থাকত। সম্মত ছিল না তার মৃত্যুর পর তারা বেঁচে তাদের ভোগ করে। আবার মরলের পরও তার আর একটা সংসার ছিল, তাকে ওরা বলত স্বর্গ। সেখানে ওদের দেবতা ইন্দ্র বহু বারনারীর সঙ্গে আনন্দে বিহার করত। সেখানে তাকেও যেতে হবে, আর আপন বিলাসের সব উপকরণ নিয়েই যেতে হবে।

তাই মৃত্যুর পর নারীকে তারা জীবিত চাইত না। চিরসঙ্গিনী করে নিত। জীবন্ত চিতারোহণে আহুতি দেওয়া হত তাকে।

আমি তো একাই ওদের নারী ছিলাম না। আমার মত আরো অনেক নারী ওদের ছিল। এই অভাগিনীদের একসঙ্গে পুড়ে মরতে হত। এই আর্যরা নিজেদের জাতি বলত। তারা জানত ছিল সভ্যতা-সংস্কারকারক।

বোধ হয় ওদের মধ্যে বিবেকের দীপ্তি তখনো ছিল না। এতে আমার জীবন আরো সঙ্কটপূর্ণ হল।

আমে এ শ্রেণীর পুরুষের অভাব নারী থাকায় আমার আর কখন তখন সম্ভোগ-সামগ্রী হতে হত না।

কিন্তু আর্যদের নয়া দুনিয়ায় আমার নতুন দশা হল। আমি শুধু একজনের রক্ষিতামাত্র ছিলাম না, সভা সর্বদা ওদের সামনেই যেতে আমাকে ট্রেনে নিয়ে যেত। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। নতুন অনুভূতি। অনেকের মধ্যে একজন হওয়া বিশেষ কিছু মনে হত না। কিন্তু এ বড় বিচিত্র লাগতো যে ওদের সামনেই কেউ না কেউ এসে বারে বারে তুলে নিয়ে যেত।

একদিন চুপচাপ বসেছিলাম।

কবি ইন্দ্রাণীরও পাঠ বিশ্লেষণ করেন। এমন সময় এক কবি এল। এসেই আমাকে টেনে নিয়ে গেল পাশের আড়কুঠরে।

এই তো জীবন। কেউ শুধাত না আমার অভিপ্রায়। কেউ অনুমান করত না আমার রুচি-অরুচি। আমার কোমল মৃদু ভাবনায় অনুভূত কুসুমকলিকে বাসিত রাখিত করতে শুধু। যখন তখন ঘরে নিয়ে যাওয়াতে একথা এক কবি মুখে হয়েছিল। সেই আমার বিবাহের বিধান ছিল। এর পর থেকে কিছু কর্তব্যের জন্যে এক পুরুষের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতে হত। একজনের সঙ্গে জীবন-যাপন জড়িয়ে গেল। কি আছে ভবিষ্যতে সেদিন ভাবতে পারিনি। আমার কথার কি আর অন্ত আছে!

৫

আর্য প্রাচীন ভারতে এক নতুন যুগ ধারণ করল।

আমার বিবাহ হয়ে গেল।

আমি খুশি হলাম। মুগ্ধচিত্ত হলাম। আমাকে বলা হত অন্তঃপুরের সম্রাজ্ঞী। অন্তঃ শান্তি দেবার নাম আজ দাসী, সকলের সম্রাজ্ঞী।

কিন্তু অধিকার ছিলোছিল বটে। পিতার সম্পত্তে নাম মাত্র ভাগ ছিল। কিন্তু বাস্তবে ওই ভাগ আমার বিবাহের যৌতুক ছিল। তাছাড়াতে একেই বলা হল স্ত্রীধন। আমার স্থান পতির হৃদয়ের নিকটে হল। তার সঙ্গে তার আসনে বসার অধিকার ছিল। আমি নিজেই নিজের পতি নির্বাচন করতাম। আমি তার প্রেয়সী নারী হলাম। এর চেয়ে বেশি হল। আমি তার পুত্রদের মাতা হলাম। অন্তঃপুরের জননী। আমার অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হল। তাছাড়া আমাকে দাসবনিতা হতে কেউ বাধ্য করত না। আমার সন্তান আমার পতি জীবন ঘিরে বাঁচাত।

ক্রমে আমি বিদ্যা শিক্ষা করতে শুরু করলাম। শাস্ত্রালোচনা হলাম নানা দিকে। ক্রমে আয়োজন করে পতির সঙ্গে ব্রহ্মক্ষেত্রে যেতাম।

আমি একবার ক্রমে নিয়েছিলাম বিদ্যুপ্রা নয়ন। বাঁয়াপ্রা আমি। দুঃখে পা ঘাটা খেল। কিন্তু আমি একটুও বিচলিত হইনি। তোমার পা আমার গায়ের অভাব খুঁচিয়েছিল।

কেমন যেন অন্যমনস্কতায় আমি একবার। রাজা দশরথের বলী হলাম। ব্রহ্মক্ষেত্রে একবার পতির সহধর্মিণী হয়েছিলাম। রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে যজ্ঞমান নির্দিষ্ট হয়ে গেলে অন্তঃ আহ্বান প্রথম হল, আমি যজ্ঞক্ষেত্রে হাতে নিয়ে অশ্বটাকে সামলে ছিলাম। আমার পতির মান রক্ষা হল।

কত রূপে আমার প্রকাশ, কত সব নব নব কলেবর ধারণ করেছি আমি।

ক্রমে নিয়েছি দীক্ষাগ্রহণের জনক রাজার পুত্র। পুরুরোজ্জ্বল শ্রীরাম-চন্দ্রের ঘরনী হলাম। উত্তরকালে ঘরে ঘরে পূজিতা হয়েছি।

কিন্তু তবু আমি কি ছিলাম? ছিলাম এক বস্তু যা অনায়াসে কেনা যায়। সৌন্দর্যে ফুলের ঘ্রাণের সাথে রাজন আমাকে হরণ করে নিয়ে-ছিল। দীর্ঘকাল আমি রাজন রাজার বন্দিনী হয়ে ছিলাম।

হ্যাঁ, এ কথা ঠিক আমার সঙ্গে ওই লোকটা কোন অভদ্র ব্যবহার করেনি। অমার অন্তরঙ্গ সভায় ওই অসামান্য যোদ্ধাও এসে-ছিল। কিন্তু আমি বরমালা দিয়ে-ছিলাম বন্দনী বিজয়ী রামচন্দ্রের গলায়।

একপত্নীব্রত রাম পূর্বপুরুষের অনুসরণীয় ঐতিহ্য ভঙ্গ করে আমাকে একপত্নীত্বে গ্রহণ করে-ছিল এবং রাবণ আমাকে হরণ করার পর অশোক শোকাতুরচিত্তে বিলাপ করে বলে ফেলেছিল, ঊর্মশীর বিরহে কাতর পুরুরবার মত। কিন্তু তার বিলাপের কথা এই রাজসের রাজা থেকে উদ্ধার করার পর অগ্নি-পরীক্ষার জন্যে সে আমাকে গ্রহণ করেছিল।

অশোক বনে আমার প্রতি কত পল কেটেছে তাদের হিসাব। নিজের দেহের অনুভূতি পর্যন্ত ছিল না। রাক্ষসেরা কোন কোথে পরপুরুষের কথা ভাবাও কল্পনা পারেনি। কিন্তু তখন সব প্রকোষ্ঠেই কি পরিষ্কার ছিল। বিকৃত প্রেমের প্রকাশ কি ছিল না? খুবই ছিল। আমার সম-কালীন সাহিত্যে তার সাক্ষীর অভাব নেই। তবু এই বিকৃত প্রেমের চর্চাতির মধ্যে মহিমারও ছিল। রাম, তাদের ভাইয়া, নারীর মধ্যে আমি, আকাশের উপেক্ষিতা ঊর্মিলা, দুষ্কৃতকীর্তি মন্দোদরী। তবু এই সব প্রেমেদ্রনেও আমাকে গ্রহণ করেছিল অগ্নিপরীক্ষা করে। এই গ্রহণ যে কত বড় কঠিন কাজ ছিল!

তখন শাসনব্যবস্থা জনতার হাত থেকে ক্রমে রাজন্যদের হাতে এসে-ছিল। রাজা নিজের ব্যবহারের সুবিধার জন্যে চাইত বহুর শাসনের চেয়ে একের শাসন অনেক ভাল, অনেক আয়াসসহজ। কিন্তু আসল অভিপ্রায় ছিল স্বেচ্ছাচারিতা, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। তাই তার আচরণের অন্তরালে সইতে হয়েছিল। রাবণ যে বিজয়ের সৃষ্টি করেছিল তা মহত্ত্বের চেয়েও ভয়ানক। কে এক ধোবী উপহাস করল আর স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করল। আমি যে গর্ভবতী ছিলাম তার সে খেয়ালও ছিল না।

সৌমিত্র আমাকে বিজন বনে পরি-ত্যাগ করে এল। কবি ভালিমাল আমার মুখ দিয়ে বলেছেন, আমি যা বলছি তুমিকে বোলো। রামের দোষ নয়। আমার কর্মের দোষ।

কিন্তু এ হল কালিদাসের কথা। আমার কথা নয়। ওই ভীরু বিজন বনে আমি যা বলেছিলাম তা সৌমিত্রি বা বাল্মীকি বা কবি কালিদাস কেউ শুনতে পায়নি। কেউ দেখতে পায়নি আমার অন্তর অন্তরে সন্তানদ্বয়ে যাবার জন্যকরণ কিভাবে অন্তঃকরণে টানাপোড়েন করছিল। আমার নিকৃষ্ট অন্তরে-দেবের কথা কেউ শোনেনি। আমি বলেছি, ওই রাজাকে বলো

সাধন করেছিলেন। আমার দুঃস্থতিতার ধারের কোনোও স্পর্শ করতে পারেনি। সেদিনকার পুরুষশাসিত সমাজের বাস্তবতা থেকে তাদের সব পাপ ভেসে গেছে।

দুঃশলকন্যা তুকার কথা মনে পড়ে। সেই বহুভর্তৃকার বেদনাময় স্মৃতি। এতদিন আমারে অনেক সপত্নীদের মধ্যে একজন ছিলাম। তাতেই অভ্যস্ত হয়েছিলাম সেই উপেক্ষিতা বহুভূমে। কিন্তু এ যে এক নতুন অভিজ্ঞতা, দুঃখি বা এর আর তুলনার নেই। সত্যি বলতে কি, যেন জীবন্ত নরক মনে হত আমার একই সঙ্গে অনেক পতিকে সেবা করতে আর তাদের সামলাতে। অবাধ্যচারিণী ভার্যা আর নিষ্ঠুর সপত্নে পঞ্চজন স্বামীকে স্বীকার করে নেওয়া একই সময়ে কি সহজ কথা? কি কঠিন, কি দুঃসহ যে এই কাজ কেউ কি তা বুঝেছিল? বলতে আমার একটুও লজ্জা নেই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকেই আমার বেশি পছন্দ ছিল। প্রথম প্রেমের রঙ-ছোঁয়া তার জন্যই তো ছিল আমার মনের সংগোপনে।

বাকি চার জন?

ওই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তাঁকে কথার যায় দুঃখ তুমা? পাশার ছেরে বসে গেলেন, ছিয়ে কি বিলাস, আমি তো জনবাসী। দুনিয়া সাজনা দিয়ে বলেন, তুমি যদি জনবাসী, খুদী তবে কে?

আর ওই মহাবল ভীম? যার চেহারা দেখে দুঃশলা উপাধিত হত। প্রেম সঞ্চার আর হবে কি করে।

আর পাণ্ডুরির কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় অশ্বিনের মধ্যে দুই বালক নকুল আর সহদেব? ওদের নিতান্তই আমার বালিকা মনে হত। মনে যাবার আছে, আমার নিতান্ত হাসি পায় তাদের, পাণ্ডুরি আমাকে কেপে বলতেন, বৌমা, সহদেব আমার বুকের বাছা। ওকে তুমি পুত্রস্নেহে দেখো।

পাণ্ডুরি যাকে পুত্রস্নেহ দেখতে বলেন, সে নাকি পতি? হাসির কথা, হাসির লজ্জা!

—না, আজ আর বলতে সঙ্কোচ নেই, এই বহু দুঃখের এপার হতে, সেই আমার নিঃস্বপ্ন, সর্বংসহে ঐশ্বর্যবান আমার পুরুষ, সে আমার পাণ্ডবিকারী কামনা, সেই আমার পরমপুরুষ ছিল। তাই প্রতি ক্ষেত্রে এসেছি আমার হৃদয়ের অপরিবর্তন অর্ঘ্য।

কিন্তু এর জন্য আমাকে কি কম ভোগ করতে হয়নি? অন্তঃপুরের কাজে দিবারাত্রের দুর্বহ শ্রমে যখন আমার পতন হয়েছিল, তাঁদের প্রত্যেক উত্তরে সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির যখন ছিলেন, এই নারী সপত্নীর স্বার্থে ভেবে পারলো না এই কারণে যে, আমাদের সবার চেয়ে অর্জুন ওই কাজে প্রিয়তর ছিল।

৬

এই অপমানিত কয়েদের অন্তে (ভেতা স্বয়ম্বর সভার পর) আমার সামান্য সত্তা যা অবশিষ্ট ছিল তাও বিনষ্ট হয়ে গেল।

আমার অবাধিনী ছিলাম। সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম আমি পতির সঙ্গে সম্পন্ন করেছি আমি। কিন্তু অন্তরের গুপ্তের স্বাধীনতার কথা তাহলে আমি মরমে মরে যাই। অন্তরে নবরত্নের প্রাত পাত্রেরও ও সংগোপনের কত উপকরণ আছে।

দুঃখ যার প্রার্থনা ও দেবতা হত।

কিন্তু আমি কি দুঃখই প্রার্থনার বস্তু? মানুষ নই? অন্তরের মৃত্তে অন্তর সঙ্গে মনীষা সম্পদের কথা আছে। আমি উত্তরের মেয়ে আবরণে আবৃত করার কথা। কি করে এ সব লেখা হয়েছিল ঐতরের ব্রাহ্মণ ও আরো নানা শাস্ত্র ও পুরাণে? সমালোচক কি করে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন? হতে পারে সমস্ত প্রাচীনতে কাহিনের জন্য সুচেতনদের ধ্যান হয়েছে।

তেজ, সৌন্দর্য, গতি ও জ্যোতি—এই চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামের কত না স্তুতি তাঁরা করেছেন। হয়ত এটি ঠিক যে, বল, বীর্য, সাহস ও দুঃখাদি করের উপযোগিতার জন্য অন্তরে পদ্মজন্মতে কাহিনের স্থান দেওয়া যায়। অন্তরে অন্তর্দৃষ্টিতে সূর্যের অনেক অন্তর জন্ম বলা হয়েছে; এবং তার সৌর্য বীর্য গতি ও সৌন্দর্যের প্রকৃত সুখ্যাতিও আছে।

অন্ত শাস্ত্রে প্রতীক, গতির প্রতীক। গতি ও গতির একটা মহিমা ও সৌন্দর্য আছে। অন্তরের বজ্রাস্ত্র ঋচির দ্বারা বীর্যবান সন্তান লাভ তরে এই যোজনা হয়ত ঋণাত্মকীয় আছে। তা হতে পারে। কিন্তু তবু সমস্ত ভিন্নিসটার মধ্যে নারীর প্রতি প্রচণ্ড একটা সন্তর্যহীনতা ছড়েছে।

নারীর লজ্জার দিকে দৃষ্টিপাত করবে না অথচ অবমত অহঙ্কারী পুরুষ নিজের মোহ মোহ রূপের জন্য? লজ্জাহীন প্রবল পুরুষই আবার বলে লজ্জা নারীর ভূষণ। হায় নারী, হায় নারীর ভূষণ লজ্জা। কবি আবার স্তব রচনা করেছিলেন রেবী চণ্ডীর উদ্দেশে, যা রেবী সর্বভূতেষু লজ্জা রূপেন সংস্থিতা।

জানি না কবকে দোষ দেব। অন্তরের বজ্রাস্তরীয়ের, না তাঁদের পুরোহিতদের? সেই মৌলিক যুগে আমি পতির ছায়ামাত্র ছিলাম। তা আমি ইন্দ্রাণীই হই বা সীতা সাবিত্রী বাসুদেবীই হই। অথবা আমি কেন দেবীই হই, সর্বংসহে

জ্যাঁ দ্রেজেন

আমি পতির ছায়া হয়েই পতির ঘরে দাস হয়েছিলাম। অন্তরে অন্তর আমার ছিল না। কলা-কাঠামোদের পরিণাম প্রবাসী অজ্ঞাকাল গর্ভে সে সব দিন ডুবে গেলেও আমি ভুলিনি সে-সব দিনের স্মৃতি!

৭

ভগবানের যুগে আরো নীচে নেমেছিলাম। হ্যাঁ, সাত্য কথা বলি, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা, মেরেরাজ্যের আমি ছিলাম, কিন্তু কাজেকর্মে তো অন্যের আমিই ছিলাম।

পাণ্ডবরা যেখান সপত্নতার বজ্রদূত তাঁদের পত্নী হয়েও আমি নিঃসঙ্গা ছিলাম কেন? কে মেরে এই অন্তরের প্রেমের জগৎ যে নিজের অন্তরকে অন্তর্যামিনী করে মোন নিয়েছিল, সে কেন তার অন্তর্যামিনীকে দুঃখে রেখে নিজে বিশ্বাস হয়েছে? তাই তো পরবর্তী যুগের বাহিনী কবি কাজনা রাজের মুখে আমাই অন্তরে অন্তরের অন্তরেকে নাম তুমি হলে অন্তরের, অন্তরালের অন্তরকারে আমি যে বেরোই ঘর'।

দ্রুপদ রাজের প্রতিষ্ঠিত সেই সব আজন্ম কবিদের পত্নী হয়েও কেন আমি অন্তরকার হইলাম? তাদের, ইন্দ্রির নিয়ন্ত্রকারী অন্তরাত্মা ইন্দ্রবাদী ভবি বাসুদেবকেও তো এক পত্নী ছিল না? সেই মহাত্মাদী বাসুদেবকে, যিনি বলেছিলেন, হে মৈত্রেয়ী, অর্থ, বিত্ত, বস্তুসামগ্রিকে জগতে কেন কিছুই তোমাকে অন্তর দেবে না, তিনিও বিজন সপত্নীর জ্বালা। কাকে? সাধারণ নারী তো ছিলেন না সেই নারী। নিজের কাছে নিজের কণ্ঠস্বর অচেনা লাগতো, শাশ্বতকাল ধরে সেই আমার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে অনাদ্যন্ত মানবের মত—বেদনায় নীলতাসায় ক্ষিপ্তার হেন কুরুক্ষেত্র—যা ঘিরে আমি অন্তর হবো না, তা ঘিরে আমি কি করবো? তাতে আমার কি আসবাব? এই হল সনাতন ভারতবর্ষের শাশ্বত মর্মকথা। চিরকালের সত্তা বাণী, অর্থ বিত্তে সম্পদে কোন কিছুতে সুখ নেই। সুখ শুধু অন্তরে। সুখ শুধু আত্মবশনের অন্তরতর অন্তরে। এ বাণী ধ্বনিত হয়েছিল একটি নারীকণ্ঠে। আমিই মৈত্রেয়ী, আমিই সেই জননী অমৃতসা, যেতার বেদনার বোল দিতে দিতে যে তার হৃদয় ঘরো ধারিত্রি বির বৈরাগ্যের সুরে। এ নয়, এ নয় মোতা, অমৃতের পিয়াসী হ' তুই।

কিন্তু কে তা মনে রেখেছে, শাশ্বতকালের বক্ষ বিদীর্ণ করে চিরকালের মানবাত্মার আর্তক্রন্দন আমার মত এক নারীর মুখ দিয়ে নির্গত হয়েছিল—ওগো অমৃত চাই,

সম্মানের কোন উপকরণ বা বস্তু নয়, আমি অমৃত চাই! মহিলা নারীর কথা কে মনে রেখেছে? সেই মৈত্রেয়ীও ছিল সখারী।

আবার আমি সভাতলে কারাগারে ঘাড়ে হলাম।

গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমার পিতা বলেছ? ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়? তখনকে জিজ্ঞাসা করে সেই সময় বলেছ কি হবে?

আর আমি বা আমার আত্মজকে কি বলব? নিজের সেই লোপন কাহিনী? সেই নিতান্ত ব্যক্তিগত পরিবেশনের কুন্তী যাজ্ঞসেনীর কথা বলা কি হবে?

পিতৃগৃহে আমার বহু অতিথির সমাগম ছিল। তাদের নারায়ণ পূজা করতে হতো, বিমুখ করার উপায় ছিল না। ইচ্ছাসুখে উপকরণ করব তেমন ক্ষমতা নেই।

হায়, আমিই কি জানি এই বর্ণহীন জাতিহীন গোত্রপরিচয়হীনা জীবনের জন্মবার্তা কেন মহাপুরুষ? রবীন্দ্রনাথ তার জবাব অবশ্য অনেকদিন দিয়েছেন আমার মুখে দিয়ে। বড় বহুদ, বড় সুদূর সেই পরম সত্য কথা, "জন্মেছিল অন্তর্যামী জন্মের ছোড়ে; সেই হতে নাহি জানি, তাহে"।

৮

আমার জীবন ছিল বড় কঠোর। অন্যের জন্যই জীবন। অন্যের সেবার জন্য। আমে বিবাহ হত একটি মেয়েটে। এবং আরম্ভ হল জল তোলাই। অষ্টম বর্ষে খোরী যান করে পূজা করতেন পিতা!

সব অধিকার কেমন করে যেন লোপ পেয়ে গেল, ছুমি সম্পত্তি আদি কেমন করে সব স্বামীর অধিকারে গেল। স্বামীর মৃত্যুর পর তার মৃত সম্পর্কের আত্মীয় সম্পত্তি পেলেও আমার তাতে কোন অধিকার থাকত না। অর্থবিহে অনধিকারিণী নারীর স্থান ছিল কোথায় তা তো সহজেই অনুমেয়।

আমি হলাম অবলা নারী। কুমারীকালে পিতা, যৌবনে পতি আর বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীন থাকার ব্যবস্থা হল আমার। আমার চোল জন আশ্রয় হয়ে অন্তর্হিত এ সব যে আমার তা মনে রাখার বার পুরুষের ছিল না।

বৈবিকল্পে ইন্দ্র হয়েছিল, নারীর দুখের হল মৃত্যু, মনে ভেঙ্গার দুখের। বিশ্বাসের অযোগ্য। এতদিন বয়েও একথা মনে হলেই আমার মনে বিদ্রোহের দুন্দুভি বাজে।

এখন নিয়ম হল বিবাহের পূর্বেই পরতে হবে কন্যা বয়সে, সম্পত্তিতে অধিকার থাকবে না। মনু একদিকে বলেছেন, স্ত্রী-রত্ন দুষ্কুলাদপি। নারী পূজার্হা তাও বলেছেন। কিন্তু তার পুনর্বিবাহ নিষেধ করেছেন।

এর পর যে বর্ণশঙ্কর হল তাতে আমি হলাম দাসী। অন্তরজের পরিচয়ে স্থান হল আমার। বেদ পাঠের অধিকার ছিল না, শোনারও নয়।

চার বর্ণ না এসে কথা এখন এই দুটো। কিন্তু তাই কি? নিরক্ষরতার কথা কি এই যুগেও বলবার?

সংবিধানে ভারতীয় নারীদের অনেক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু এখনো ভারতীয় নারী কি শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে নেই? বাস্তি বিশেষের সাধনা বা প্রতিভা ছোটা নারী সমাজের অগ্রসরতার সূচক নিশ্চয়ই নয়। আজও মৈত্রেয়ীর মতই একালের বিশিষ্ট মহিলারা বাতিক্রম মাত্র।

ভারতে পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার যদি শতকরা চল্লিশ, নারী হবে শতকরা মাত্র আঠারো জন।

এযুগে আধুনিক যুগে রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা গান্ধী, নেহরুর পরও প্রতি তিনটি ভাই ছেলের মধ্যে একজন কেন বিদ্যালয়েই যায় না। এখনো এযুগে অর্থাদত নারী পর্দা-নসীন। অসংখ্য নারীর যাত্রা এখনো হলো পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে নিশ্চয়ই পুত্রের আশ্রয়ে থাকাই তার নিয়তি।

মনুর যুগের এই সব যান যাবার পরিবর্তন হতে পারে খালি জানালুন শলাকা। এই শলাকাই নারীর মুক্তির ও যন্ত্রণার হাতিয়ার হবে।

আবার ফিরে যাই সেই যুগে যখন আমি বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলা করেছি। তাদের এখন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা হবার অধিকারও রইল না। এখন আর আমি ইন্দ্রাণী বা অরুন্ধতী বা অন্য কোনদেবের দেবী সূক্তের অধিকর্ত্রী ঋষিকল্পা বার ছিলাম না যে বলেছিল অহং রুদ্রায় ধনু-রাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তা বা উ।

আমিই রুদ্রের ধনুকে জ্যা রোপণ করি। ব্রহ্মদ্বেষীকে পরাভবতে হবন করি।

জীবনের নাটমঞ্চে এবার নতুন রঙ্গ সুরু হল। আমি পর্দার বেরা-টোপে আবদ্ধ হলাম। অন্তঃপুরের অন্ধকারের বাইরে যাবার আর উপায় রইল না।

পরবর্তীকালে যত দুর্দশা আমি ভোগ করেছি সে সবের শিলান্যাস যেন এই সময়েই হয়েছিল। ধর্ম-সূত্র আর ধর্মশাস্ত্রের তন্তুতি এই সময় হয়েছিল। ভাবী হিন্দুসমাজের ভিত্তি এই সব বিধানসূত্রেই নির্দিষ্ট হয়েছিল সন্দেহ নেই।

সেদিনকার দেখল পূজার বলি আমাদেরই হতে হল।

বৈবেদের কল্পনা ভোগ করেছি, কখনো পণ্ডিতাভিমানী হইনি। কিন্তু স্বামী আমাকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারত ছাগ মুখলাভের মত, আর ইচ্ছে হলেই পুনর্বিবাহ করত।

৯

নিরবধি কাল আর অনন্ত সমস্যা। কঠিন পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হয়ে, উপায়ান্তর না থাকায় আমি অর্থের বিনিময়ে শরীর ভোগে বাধ্য হয়েছি! আর তা অতি প্রাচীন কাল থেকেই।

লিঙ্গবিহে, কোশলে, মালবে, সব জায়গাতেই আমার চাহিদা ছিল। বেশ্যা, বুদ্ধোপজীবিনী, বারাঙ্গনা, পণ্যনারী—এই সব আমার উপাধি হল। ছোটিলা আবার আমার উপর জর ধার্য করে আমার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি করলেন। প্রতি রাতে আমার গ্রাহক ছিল পাঁচশত মুদ্রা।

আর আমার কি করার ছিল? চারটি রাস্তা ছিল আমার সামনে। ঘর বিধবা হয়ে থাকো, অথবা মৃত পতির প্রজ্বলন্ত চিতায় অরোহণ করে সতী হও। নয়ত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন কর, কিম্বা যৌথ সংঘে ভিক্ষুণী হয়ে যাও।

কনুখার সামন, ধরার সামন ভগবান তথাগত, জন্মের বার বিম্বের পরবর্তী কালে গেছেলেন, সমস্ত দর্শিত পশুহত্যা ইত্যাদি। নিখিল জীবের প্রতি যার অন্তর করুণায় প্রবাহমান ছিল। তিনিও বলেছিলেন, সংঘে নারী ঢুকলে সংঘের আয়ু হাজার বছরের আয়ুষ্কাল পঞ্চশত বছর হবে। সেই কনুখাসাগর সর্বশক্তি দিয়েই আমার সংঘে প্রবেশে বাধা দিয়েছিলেন।

কিন্তু আমাকে সংঘের প্রয়োজন ছিল। কারণ সেই পর্যন্ত আমারই জন্য সম্বলহীন অসহায় জীবন ছিল। আমারই কারণে সংঘ প্রতি দিন ভিক্ষুর সংখ্যা বাড়তে লাগল। আর আমাকে যা সইতে হয়েছিল সে কি আর বলার মত কথা? বহুই দুরন্তহীন দিন কেটেছে আমার। সেখানেও আমার জীবনের করুণ "ভলাডলিতে নিজের বাহু নিজেকে বড় দীন মনে হয়েছে আমার। সমস্ত অন্ধকারে একলাই গলাছল গান করেছিলেন দেবাধিদেব মহাদেব, হলেন নীলকণ্ঠ। আর আমি নিরবধি কাল ধরে আমার সমাজের সতীত্ব গলাছল পান করতে থাকি!

১০

কিন্তু অন্তর আমার পরবাসে, দুরের আমার প্রার্থনায়। চলতে হবে অন্তহীন পথ, বর্ষসূত্র আর ধর্ম-শাসনের এত আঘাত সহ্য করেও মরে যাইনি আমি।

ইতিহাস সূত্রে নামের অনুসন্ধানকে আমি তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেছিলাম। দেখেছিলাম এই সমস্ত জীবনের পরম অনুভবের বস্তুর পথে আমারও অনুভব।

আমার বেলায় ব্রাহ্মণ সূত্রে সবই এক রকম ছিল।

সমাজের সীমা লেখ হয়ে যাবার পরই 'নিন্দ্য সূত্রে একেবারে বিন্দার এসে ফেলেছিল। কিন্তু তাকে সহ্য করবে কে! কাঁদাকে নীচু করার জন্য ব্রাহ্মণই সব করতে পারত, আর করেও ছিল।

ভাত্যাচল আর মুদ্রারাক্ষস যুগের মহামন্ত্রীদের মহাসচিব ছিলেন। কিন্তু চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্রাহ্মণ কাঁদের সাহায্যে পর্বতে নন্দকে শেষ করে দিয়েছিলেন।

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তে অনেক এসেছেন। আপন আপন ভাষিকের মাঝিমার সকলেই ভারত ইতিহাসকে উজ্জ্বল করেছেন। চাণক্য তাঁর ধর্মশাস্ত্রে অনেক ব্যবস্থা দিলেন। চিরন্তনী অনেক ধর্মযুদ্ধে হাতে প্রকৃত জনের অনেক উপকার সাধন করলেন। কিন্তু আমার জন্য কি করলেন? কিছু না। আমি অন্তরাত্ম হয়েই রইলাম। নব নব বিধানের শৃঙ্খলে আমার বন্দীদশা আরো সুদৃঢ় হতে লাগল।

আমি আমার প্রাত্যহিক জীবনের পথে কোনমতে চলেছি তখন। আমার চলার পথের বিধানদাতা ছিলেন একদিকে ভূত ভূটিল, অপর দিকে ভাঁড়ু।

গুপ্ত থেকে মৌর্যাব্দের পাটলিপুত্রে এল। মৌর্যরা ওদের সঙ্গে পারল না।

গুপ্তদের সামনে লোকেরা কন্যা দান হয়ে গেল। অনেকে রাজমহিষীর মুখের মধ্যে ঘিরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আমি কন্যাহীনা নারী, আমার হাতে পড়ল হাতকড়ি, পায়ে পড়ল বেড়ি। আমি পলায়ন করতে পারলাম না পাটলিপুত্রের নির্বীর্য পুরুষদের মত। আত্মহত্যাও করতে পারলাম না। আমি বাদের হাতে শিকার হলাম।

আমার নিজের বলতে কিছুই ছিল না। কর্মবিপাকে সবই গিয়েছিল। এখনো যাচ্ছে। আমি কি আমার নিজের ছিলাম? ছিলাম না। ছিলাম অন্যের। দুখই যার জীবিকা তার জন্য প্রকৃত ভাল আর হবে কি করে? তাই আমি পাটলিপুত্রের বিরাট নগরে মৌর্যাব্দের সৈনিক-দের হলাম।

কিন্তু সাম্রাজ্য আরো বৃহৎই ছিল। তখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য মালবের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন।

লৌহতোক শক্ত অনাই মালবে এল তলোয়ার তরবারী হাতে। সে কি ভয়ানক ব্যাপার। লোহতে পালাতে পর্যন্ত পথ পেল না। ওই মালবের

আসি সবার মুণ্ড কেটে রাজপথে রক্তস্রোত বইয়ে দিল, পৃথুবক্ষনো হল নগরী। আর অসহায় আমাকে ওই ভয়ঙ্কর পিশাচের লালসা তৃপ্ত করতে হল।

আমার যে প্রাণ ছিল আত্মা ছিল কিছু আজ তাই আমি ভুলে গেছি। অন্তর্হীন কাল যেন আমি যাচ্ঞাকারী প্রবল পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়ে আছি। মৃত্যু ভাবিবার বর্তমান কিছুই আমার নেই।

তবু তাদাই জানে যে শত পীড়ন প্রপীড়ন করল।

কিন্তু নিশার জীবনদেবতা আমার কপালে শান্তি লেখেন নি। পৃথুবক্ষনো নগরীর শাসনভার আমারই কাঁধে পড়ল।

আমার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছি। কিন্তু অদৃষ্ট আমার এমন যে, পুরুষ খুশি হয়নি এই ব্যাপারে। পুরস্কারের বদলে জুটেছে তিরস্কার। আপন হাতে ক্ষমতা নিয়ে বিধিনিষেধের বন্ধনে আমাকে আরো জর্জরিত করে তুলেছে। পুরুষের মত শক্তির অপব্যবহার সব আমার মত অসহায়া নারীর ওপর। শক্তিমান বিদেশীর সামনে সে ভীরু, কাঁটাঁরও অধম।

১১

এবার যে কালে আমার জন্ম হল ইতিহাসে সেই যুগকে স্বর্ণযুগ বলা চলে। কলা, সাহিত্য, শক্তি, সেবা সমস্ত দিকে দেশ তখন উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছেছে। কিন্তু আমার অবস্থা সেই আগের মতই রইল। আমার জন্মই নব যুগের আবির্ভাব হল দেশে। সে তার বিধি-বিধানে আমার ললাটে হানল বজ্রাঘাত।

অনুলোমে প্রতিলোম বিবাহের জটিল জালে আমার জীবনকে জড়িয়ে দিল আর পুরুষকে দিল তার স্বার্থসিদ্ধির অপার সুযোগ।

কিন্তু তবু এরই মধ্যে একটি আলোর ঝলকানি আমার আকাশে দেখা দিত।

সেই যুগে আমি দ্রুহেবী নামে জন্ম নিয়েছিলাম। মগধের সিংহাসনে তখন গুপ্তবংশের সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পুত্র রামগুপ্ত। এই নগণ্যির সৌভাগ্যের সুখ বা দুঃখ সবই আমাকে ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু এমন একটি কাজ ওই গুপ্ত-কুলপুরুষ করেছিলেন...

সে আমার ললাটলিপি। আমার রূপের খ্যাতি দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। মনে হয় সেই লোভেই শকরাজ এসে হামলা করেছিল মগধে।

কিন্তু রামগুপ্ত যুদ্ধ করলেন না। রাজস্থানীয়ের অন্তঃপুরে আশ্রয় নিলেন।

মগধে কি বীরের অভাব ছিল? সমুদ্রগুপ্তের সেনারা এক সময়ে আর্যাবর্ত থেকে অশ্বমেধের ঘোড়া-দের তাড়িয়ে দিয়েছিল। কত রাজা তাদের পদানত হয়েছিল, পঞ্চনদ-পত্তনের রাজারাও বশ্যতা স্বীকার করেছিল, সেই প্রচণ্ড রণ সৃষ্টিকারী সেনাদলকে নেতৃত্ব দেবার এখন কেউ নেই, সেই বিজয়বাহিনী এখন বহুকুলবধূর হাহাকারে নিস্তেজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, রামগুপ্ত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন।

শকরাজ ঘরে পড়লেন দুর্বলেরই দিকে ফিরে যায়।

এমন সময় রাজপুতেরা বীরের মত রণক্ষেত্রে প্রাণ দিত, রাজ-পুতানীরা জহরব্রত করে মান বাঁচাত।

কিন্তু ভীরু রামগুপ্ত শকরাজের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আমার ইজ্জতের দাম তাঁর কাছে ছিল না; আমি তো অপরের লালসা-বাসনা তৃপ্ত করার জন্যই জন্মেছি। আমাকে পাবার মত চরিত্রের অভাব চলে।

রামগুপ্ত তো আমাকে দিয়েই বিরোধিলেন। কিন্তু তাঁর ছোট ভাই চন্দ্রগুপ্ত শকরাজ এবং রামগুপ্ত দুজনকেই মেরে সাম্রাজ্য বাঁচালেন, আমাকেও গ্রহণ করলেন।

এল কাব্য-মহাকাব্যের যুগ। নাটক ছোটদের যুগ, যখন কালিদাস আর বিশাখ দত্ত লিখতেন। সরস্বতী নৃত্য করতেন তাঁদের অন্তর্লীন সঙ্কেতে।

কিন্তু সমাজে আমার স্থান ছিল পশু, ভোগের পাত্রে, ওই কাব্য নাটক রচয়িতারাও আমার স্থান তাই রেখেছিলেন।

ভরতের বিধান—ও'রা কি করবেন।

ভরতের বিধান ছিল যে নারী নাইকে, তা সে জনকরাজার কন্যাই হোক বা বিশ্বামিত্র-কন্যা শকুন্তলাই হোক, সম্রাজ্ঞী পৃথ্বীর অধীশ্বর দুষ্মন্তের পত্নী বা ভরতের জননী হোক, সংস্কৃত তারা সে বলতে পারবে না, তাকে বলতে হবে প্রাকৃত। যে ভাষা ভৃত্য, বালী ইত্যাদিরা বলে।

তাহলেই বোঝা যায় আমার অবস্থা কি ছিল। কোন্ দৃষ্টিতে আমাকে সবাই দেখত। আমি তো কামিনী মাত্র, কামনা নিবৃত্তির উপায়। রমণী, যে হল রমণের সাধন। মানুষ বলে তো মনে হত না আমাকে, আর স্বামীর প্রাণ এর আগে আসে।

নায়িকা—পরবর্তী কালে যে কথাটা ঠিকই কুটনীরা লোচক হয়েছিল, তখন যখন আমার কলাবতের অনেকেই গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল সমাজপতিদের ব্যবস্থানুসারে।

যাহোক যুগ তার কামধেনী পণ্ডিত কেদেন্দ্র কুটনীমতম আর সমরমোকো বলে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নারীকে কি ভেবেছেন পুরুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে হবে, বেশ্যাবৃত্তিকে কিভাবে অর্থ-করী করতে হবে এর উপর এই গ্রন্থ দুখানি রচিত।

১২

আমি জন্ম নিলাম বিজ্ঞিকা হয়ে।

আমিই রচনা করেছি কৌমুদী মহোৎসব। কিন্তু আমি নিজে ওই গ্রন্থ প্রাকৃতে বলেছি। কারণ প্রচলিত সমাজব্যবস্থা।

আমার জীবনে কে না পদার্পণ করেছে? কবি কালিদাস, কুমারদাস, বিশাখ দত্ত, কে নয়? কে না আমার অঙ্গসঙ্গের জন্য লালায়িত ছিল? ইতিবৃত্তে যদি তার মূখর ভাষণ স্তব্ধ করে তবে সঠিক উত্তর তার কাছে ঠিকই পাওয়া যাবে। কত রচনা, কাব্য, নাটক আমারই সমাদরে ভরা।

অজন্তা ইত্যাদি গুহাচিত্রে, বিভিন্ন ভিত্তিচিত্রে আমার যে রূপ ঘোষিত তাও সবার বিদিত। দৃষ্টিপথ, সম্বর্ত থেকে বিভ্রান্ত হয়ে খুব বেশি সময় পুরুষের লাগে না। অন্তঃপুরের প্রাচীর তাদের সুন্দরীর কথা রটিয়ে দিয়েছে। এই সুন্দরীর প্রতি আকর্ষণেই নন্দ কমলপুর হয়ে উঠেছিল। অন্তঃপুরের যুদ্ধ আর তুলনা চন্দ্রহীনা রজনীর সঙ্গে করেছেন।

এই অন্তঃপুর নিয়ে উদাসীন, বৈরাগী, বিরক্ত, সন্ন্যাসীর মত। প্রত্যক্ষত, দার্শনিক আর ভাবাবেগে কবি। তাঁর যুদ্ধবিগ্রহ থেকে কালি-দাসেরও বিতৃষ্ণার কথা আছে বলে আমার মনে হয়।

এ হল ভবভূতির যুগ, ভর্তৃহরি, বাণ আর কল্হণের কাল। সমস্ত সাহিত্য আমারই গুণগানেতে ভরা। ভবভূতি আমার উপকার করেছেন।

ভর্তৃহরি আমার বন্ধনদশা দূরীকরে হয়ে সাতবার সংসার ত্যাগ করে, সাতবার গৃহস্থ হন। সে গল্প অনেকেই জানে।

বাণ রচনা করেন কাদম্বরী। রোমান্টিক উপন্যাস রচনা তিনিই প্রথম সুরু করেন। কিন্তু ও'র নায়িকারা মাটিতে পা রাখতে পারেন না, যেন অবাস্তব জগতের বাসিন্দা ও'রা।

আর কল্হণের কথা কি বলব। যিনি সাহিত্যের মানদণ্ড প্রস্তুত করেছিলেন; কিন্তু নিজের কলমুখর

অধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্রে আমার চরিত্রকে উজাড় করে ঢেলেছিলেন। সম্ভবত সেই তখন চারণীর সমাজ ওই রকমই ছিল। সাহিত্য তো সমাজের দর্পণ মাত্র! দর্পণে আমার প্রতিবিম্ব আমলাকে অনুসরণ করেছি।

সাহিত্যকারের দোষ কি? সমাজে আমি দূষিত তাজা ছিলাম অং রকমে। কিন্তু কে আমাকে দূষিত আর পরিত্যক্ত করেছে? কে আমার মুখ থেকে শেষ পর্যন্ত লিখেছে? কে আমার প্রতি অঙ্গের চাহনি লক্ষ্য করে আমাকে বিদ্ধ করেছে? লক্ষ্মণের চরিত্রের প্রচণ্ড বিশ্লেষিতার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু তো আমিই?

১৩

এখন সমাজে এক নবীন চিন্তাধারা এল। ইন্দ্রিয়বাদ, অহমবাদ, মনুষ্যবাদ, বহুবাদের ক্রমবিকাশ হয়ে গেছে। উঠিছায় বহুপর্বতে বহুবাদের সিদ্ধসাধক যোগেরা জন্মল, সংসারে নয়, বনেরা চূড়াতেই সিদ্ধিলাভ হতে।

ব্রহ্মকিনী যে সিদ্ধির সাধন করতে পারে—সে স্বর্গ-মর্ত্যের বিধান দিয়ে কি করবে? আমার তখন খোঁজ পড়ল। অতিথি সাধুসজ্জনের সৎকারের জন্য আমাকে অর্পণ করা হত।

উচ্চের যোগিনী আর নীচকুলে সেবদাসীরূপে বর্তী-রতীর যজনের জন্য আমার প্রয়োজন হল। কলিঙ্গ থেকে কামরূপ, আর কামরূপ থেকে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত নারীরূপে, বিশ্বম্ভরী রূপে আমি পূজিতা হতে লাগলাম। নাম হল আমার কুমারী।

যে অত্যাচার আমি সহ্য করেছি বর্তী-রতীদের কাজ, যে অমানুষিক অত্যাচার বরদাস্ত করেছি তার হিসাব কি ইতিহাসে রয়েছে? পুরুষের রচিত ইতিহাস?

উঁচুজাত ব্রাহ্মিকাদের আমার রূপের মূর্তির ছিল করা হল। যা সোনার ছিল, পুরুষেরা পুড়ে ছিল, তাই বাহির প্রাচীর অস্তিত্ব হতে লাগল। নারীকে কোথায় নামিয়ে আনল পুরুষ?

মাঝে স্মৃতিকারেরা আমাকে সামান্য একটু অধিকার দিয়েছিল।

বিবাহের আর দায়ভাগ। কোন কোন অবস্থাতে আমাকে নিজের স্বামীকে জন্যই একটু উপরে উঠিয়েছিল।

যৌথের লক্ষণাচারের প্রভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল। কারণ ওই মহাপুরুষের দেশে নারী তখনো অর্ধের অধিকারিণী ছিল, এখনো আছে, নারী সেখানে অবহেলার পাত্রী নয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের আর জীবন্ত-বাহনের এই সামান্য উদারতা সমাজপতিদের সহ্য হল না। সম্পত্তির ভাগীদারদের কথা ছিল সাম্যাতিক। সম্পত্তির ভাগ কোন বিধবা পাবে এ তাদের সহ্য করা দুষ্কিল হল। তাই তারা দ্রুত পুরাতন সতীদাহ প্রথা বিধিয়ে আনল। বিধবাকে পুড়িয়ে মারলে তো সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়। তাই সতীদাহের প্রবর্তন দ্রুত হল। আমি আবার অগ্নি-বেদেরার আহুতি হলাম।

পুরুষের প্রতিহিংসার পাল আর রাষ্ট্র-কূটে সম্বর্ধ চলতে লাগল কনোজের স্থাণীক নিয়ে। পরমারদের রাজধানী উজ্জয়িনী আর ধারাতে। দুজন আর কেরলের রাজসভাতে বলদেবদীক্ষে বিতর্কসভা করে নারীসত্তা করা হতে লাগল। নারীদেহ আগাগোড়া উন্মোচিত করে তাদের লালিতকলার চমক সৃষ্টি করা হতে লাগল। কিন্তু আমার যে নিজের কিছু প্রয়োজন আছে—শরীরের, মনের, আত্মার, তা তাদের বোঝার বাইরেই রয়ে গেল।

শেষ অধ্যায়ে আমার অগ্নিতে সমর্পিত হওয়াতেই সমাজপতিদের আনন্দ ছিল। কালিদাসের কাব্যেও সতীদাহের প্রসঙ্গে সেই ইঙ্গিত পরিস্ফুট।

রাজপুত শৌর্য বীর্যের আমার পৃথ্বিরাজ অনেক লড়াই করেছেন আমারই জন্য। পিতার স্নেহছায়া থেকে পৃথ্বীরে ছিনিয়ে নেবার জন্য। আমারই কারণে হানাহানি।

এই হানাহানির মধ্যে আমার গতি কি হল তা কে দেখেছে?

আমি সমাজের আনুষ্ঠানিক বিধানের বলি হলাম। ধানের কণ্ঠে হলাম আমি সহ্য, ভোগ্য, ধনসম্পদ ভূমির মত। ধানের কণ্ঠের কি ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকে? থাকে না। আমারও ছিল না।

দেশের অবস্থা যেমন হয়েছিল তাতে এই-ই স্বাভাবিক ছিল। অনেক বিজয়ী জাতি এদেশে এসেছিল, এই সমৃদ্ধিশালী সমাপালিনী দেশে। এল, জয় করে নিল। নিজের ভূমি আর নারী রক্ষা করার ক্ষমতা এ-দেশীয়দের ছিল না। তবে আর কি হতে পারত? সতীদাহ প্রথা পুরোদমে চলতে লাগল।

বিধবারা স্বামীদেহের অগ্নিতে আহুতি হতে লাগল।

এই তো আমার ভাষা। কামার্ত পুরুষের প্রভু বানানোর জন্যেই, এখন অগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হতে লাগলাম।

১৪

আমার হাজার, আমার লক্ষ-মৃত্যু।

ভারতের শাসন দ্রুত বারবারেই মুসলমানের হাতে এল। নগর বিধ্বস্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মানভঙ্গও।

আমার হাজার হাজার ভগ্নীদের ধরে নিয়ে গেল ঘর এশিয়ার বাজারে বিক্রয়ের জন্য।

কখনো বা ভারতও পুরুষ সঙ্গের সঙ্গে নারী বাসীও রপ্ত করে নিত। প্রাচীন কালেও ভারতীয় রাজা জমিদারেরা বহুনীবাসী রপ্ত করত। রাজবের অন্তঃপুরিকা তো বহুনী-বাসীরাই হত। কৌটিল্যের বিধানে ছিল যে রাজা প্রজাতে উঠেই ও-মুখ দেখবে, মানে এদের মুখ দেখবে। অনেকে আবার বাসী-জীবন থেকে মুক্ত হয়ে এদের পত্নী হয়ে পরিবারের শোভা বৃদ্ধি করত।

ফিরোজশাহ তুঘলকের মন্ত্রী মকবুল খাঁর হারেমে নারীর সংখ্যা ছিল অগণিত। সারা বিশ্বের সব দেশের নারীরাই তার কামকলা হয়ে কলত।

বিজয়নগরের রামরাজার অন্তঃপুরেও অসংখ্য নারী ছিল। এদের সাঠক হিসাব রাখাও ছিল কঠিন।

আমার বলি—হারেমে নারী, হারেমে আমার করুণ কলাকৌশল। এই সব বড় বড় হারেমের অন্ধ অন্ধকারে আমার দশা কি হতে পারে তা আর ব্যাখ্যার কি আছে? হাঁ, একবার স্বামীর নজরে পড়লে তবু এক রকম ঠিকই ছিল। সেই এক পুরুষের হাজার কামনো ছিল। কামনো জীবন। কিন্তু একবারের বেশি নজরে কি পড়তাম ওই অসংখ্য নারীর মধ্যে? তা কি সম্ভব ছিল? ছিলই না।

সতীদাহ ছিল, ছিল জহর ব্রতও।

সতীদাহের মধ্যেই জহর ব্রত। কিন্তু এত প্রাচীন নয়। মেবারের পদ্মের সময়ে কতবার আমি জহর ব্রত অনুষ্ঠান করে নিজের মান বাঁচিয়েছি। দুটি পথ ছিল। হয় জহর ব্রত করে নিজেকে বাঁচাও, নয়তো তরুণীলার বাজারে বিক্রীত হও।

জহর ব্রত সত্যিই জরুরী ছিল।

বিদেশীর অত্যাচারে উপরন্তে ভারতবাসী নিতান্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। নিজেকে রক্ষার ভার আমার নিজেরই নিতে হয়েছিল।

কতবার যুদ্ধে আমি জহরব্রতে বাদল করেছি, কতবার অগ্নির আঘাতে ভস্মসাৎ করেছি, কিন্তু আজকার মোক্ষম উপায় শেষ পর্যন্ত ওই জহর ব্রতের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি।

সেই আলাউদ্দিনের সময় এক তারমাত্রও কত পদ্মার অনন্ত সংখ্যার নিজেকে আমি সর্বত্যাগী ভয়ঙ্কর বৈশ্বানরের লেলিহান শিখার ভস্ম করেছি। আকাশে উড়ে যাওয়া আমার ভস্মরাশির উজ্জ্বলতা থেকে রাজপুতদের বিজয়স্তম্ভের উজ্জ্বলতা বাড়া হয়েছিল। একি সোজা কথা?

জহর ব্রতের ঐতিহ্য চলেছে লাগল।

১৫

কত না পট পরিবর্তন। কত না রূপ, কত না রেখার খেলা।

বারাঙ্গনারূপে জন্ম হল আমার। বারাঙ্গনারা এক সময় ভারতীয় সংস্কৃতির কলা আর সঙ্গীতকে রক্ষা করেছিল।

আমি তখন আমব দেশে। উজ্জয়িনী আর ধারার আকাশে আমার সঙ্গীতের সুরেলহরী ছেয়ে বেড়াত। আমার কবিতার মাদকতা অনেককেই উন্মত্ত করেছিল।

আমি ছিলাম তখন রূপমতী, সেই বিখ্যাত রূপ-নটী। সেই উজ্জ্বল জন্য নিয়েছিল মাণ্ডব্য বাজবাহাদুর হয়ে। আর বাজবাহাদুর কি রূপ ছিলেন? তাঁর কথাও জনপদের মুখে মুখে কথা-কোবিদ, উজ্জয়িনীতে, ধারাতে আর মাণ্ডব্যে ছেয়ে বেড়াত। ওই কবি বাজবাহাদুর আমাকে নয়নের মণি করে মাণ্ডুর নয়নাভিরাম প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন। কিন্তু আমার যবে আক্রমণে আর উন্মাদে সেই জনশ্রী আর ধনশ্রী কবির কি দশা হয়েছিল তা ইতিহাস জানে, আমি আর নতুন করে কি বলব? আমি বিষ খেয়ে নিজের মান রক্ষা করলাম আর গুপ্তপুরিধারা অগ্নিতে প্রবেশ করে মরলাম।

পর্দার ঘোমটা তো আগেও কম ছিল না। এখন আমি একেবারে অন্তর্ধম্পশ্যা হলাম পুরুষের বিধানে। আমি নিজের ভ্রাতা বা পিতার সামনেও আসতে পারতাম না। কোন আত্মীয়স্বজনের সামনে বের হওয়া আমার পক্ষে ঘোর অধর্মাচারিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

আগে তো এ জিনিস ছিল না। সেই বৈদিক যুগে তো আদৌ ছিল না। সে-যুগে কন্যাকে বিবাহ-অনুষ্ঠানের পর সমবেত অতিথিদের সামনেই বের করা হত—এই সুকেশনী বধূকে দেখুন।

সামাজিক ও বাইরের জনসমাবেশে নারী বের হত, বের হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। পর্দার উল্লেখ পাওয়া যায় মহাকাব্যের যুগে। রামায়ণে আছে নারী বিবাহ কালে, স্বয়ম্বর সভায়, যজ্ঞস্থানে এবং সর্বজনীন আপদকালে বাইরে এলে তা দোষের হবে না। এতে বোঝা যায় এরকমের নারী আছের অন্তরালে থাকবে, শুধু এই সব উপলক্ষেই বাইরে আসতে পারবে। কিন্তু সীতা-রূপে আমি তো রামচন্দ্রের সঙ্গে অযোধ্যা বাজাকালে অযোধ্যার রাজপথ দিয়ে গিয়েছিলাম, কেন আড়ম্বরে তো বোধ করিনি। শুধু ও রাক্ষস পরিবৃতে অশোক আমি পর্দানশীনা নারীর মত পরিচ্ছন্ন করিনি। তাহলে সুপণখা কি আমাকে

দেখতে পেত, আর রাজাকে রাত্রে ব্যাখ্যা করে বলতে পারত?

কিন্তু রাজার নাটকে রাত্রে সাঁতা অবগুণ্ঠনাবৃতা হয়ে অঙ্কে আসছেন। রাত্র পূর্বে পূর্বে রাজারা কখনো বা অন্তঃপুরে একটা অবরোধের প্রচলন করতে চাইতেন। কিন্তু আমার রূপসীদের প্রথম ও সার্থক বাধা যদি তা আর সম্ভব হত না। রাজপ্রভার পরশে আজ নিজের রূপকে পর্যন্ত অন্তঃপুরে আসতে পারবে না, আমারই এই যুগের বিরুদ্ধে নায়িকা প্রথম প্রতিবাদ করছে। কলঙ্কে, দুঃখে চাঞ্চল্যে নারীর আসন চাঞ্চল্যই তার রক্ষাকবচ। তাকে অবগুণ্ঠনে করে রাখার প্রয়োজন কি?

মুসলিম শাসনের সময় থেকেই আমি পর্দার বেরোটোপে বন্দী হলাম। আকাশ এসে ঠেকল আমার মুখ কয়েক সন্নিকটে। আমি শিকার হলাম অবিদ্যা, অন্ধকার, ব্যাধি আর ব্যভিচারের। অত্যাচারের আর উৎপীড়নের।

কত রকমের অত্যাচার। রাত্রির অন্ধকারে কোন পুরুষ পা টিপে টিপে আসবে আর আমার মুখে হাত চেপে ধরবে যেন শব্দ না করি আর ঘরের বৌ-এর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। নিজের কাজ সাঙ্গ করে সে ওই রকম নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবে। জন্ম পুরুষের সাধ্য কি তাকে চিনতে পারতাম? পারতাম না। হয়ত সে আমার স্বামীই। লোকে তো তাই জানবে, সতী সাধ্বী থাকে। সতের হিসেবের খাতায় আকাশ খোলবার যায় বা পরদা পড়েছে কার?

আকবর বাদশার কথা মনে পড়ে? ওই মুসলমান শাসক প্রকৃতপক্ষে ছিলেন দেশী লোকেরা তা করেনি।

কালিদাস লিখেছেন, পদ্ম ধরবার হাতেও আঁশপাতরীর পদ্মপাতের মত নাকি অবগুণ্ঠন কাজ করছে। ভারতীয় অভিনয়ের কায়দাও বোধহয় এই রকমই। নাকে নিশ্বাস বন্ধ হলেও সতীত্বনাশের মত প্রমাদ সাত দিতে হয় তবেও করবার কাজ নয়। পরম পবিত্র কর্তব্য বলে। কিন্তু সম্রাট আকবর ওই কাজের বিরুদ্ধে নিজের নায়িকাদের পক্ষে প্রচার করেছিলেন। বাঁধও সতীত্বে বন্ধ উনি করতে পারেননি। তবু কিন্তু উপকার সাধন উনি আমার করেছিলেন বৈকি। আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে।

১৬

আমার ইতিহাসের পট পরিবর্তন হল। বণিকরা করতে এল ইতিহাসের বণিকরা।

সেও আমারই মত বিশাহারা আমার। আমি কি পদ্মের উপকোচের সামগ্রী হইনি? হয়েছিলাম বৈকি।

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে কি করে দেখা দিল সেও দেখেছি।

তবু নতুন যুগের পরিবর্তে রাজা রামমোহনের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগের প্রতিও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। প্রজাসত্ত্ব চিরস্থায়ী বিলাতীবিধা থেকে আইন পাশ করে আমাকে মুক্তি দেওয়া হল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে রানী লক্ষ্মীবাঈ হয়ে আমি যুদ্ধ করে আত্মহত্যা করেছি। ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের জয়জয়কার চতুর্দিকে। কিন্তু লাভ তার তাতে কি হল।

সমাজ চলতে লাগল স্মার্ত রঘুনন্দনের শাসনের কঠিন বন্ধনে, আষ্টেপৃষ্ঠে পীড়িত হতে লাগলাম আমি।

যুগে যুগে করে যে আন্দোলন আমি করেছি, যে অত্যাচার আমি সহ্য করেছি, তার সঠিক পরিমাপ করব লোক আজো আমি জন্মাইনি। আজও শিক্ষিত সুশিক্ষিত অতীতের দিকে তাকিয়ে কোপে উঠি, বিরাট দুঃখি-কল্পে সব উল্টে আবার অতীতের পুনরাবৃত্তি হবে না তো? না হলেই বাঁচি।

ভারতের ইতিহাসের পর্বে পর্বে পরিবর্তন এখানেই থেমে থাকল না। ইংরেজের অধীনতা পাশ ছেদন করার জন্য ভারতবাসী জোর কদমে এগিয়ে চলল। আমরাও ডাক এল। ডাক নয়, আহ্বান। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী কণ্ঠস্বরে আহ্বান জানালেন দেশের নারীদের। এ যেন কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষ। দিগ্-বিদিগন্তরে ধ্বনিত হল সেই শঙ্খধ্বনি, দলে দলে নারীরা বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এল পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার মহান দায়িত্বের অংশ নিতে।

মুক্ত হল নারী-মুক্তি বা ইমান-সিপেশান অফ উওম্যানহুড, যা নারীর প্রতি জাতির পিতার শ্রেষ্ঠ দান। কত পত্র পত্রান্তরে পরামর্শ-তলে যা বিলীন ছিল, মহাত্মাজী তাকে উদ্ধার করলেন, তাকে মুক্তি দিলেন মহূর্তপূর্বে উপায়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আর তুলনা নেই।

একই সঙ্গে আমার কথা আমি রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের কাছে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমি বলেছি, আমি নারী, আমি মহীয়সী। ওরা বলেছি, আমি দেবী নই, সামান্যা নারীও নই, আমাকে পূজা করে মাথায়ও রাখতে হবে না, পায়ের নীচে দলিতও করবে না অবহেলায়। আমি পুরুষের সহ-ধর্মিণী হয়ে প্রতিটি কাজে নিজের যুক্তি পাঞ্জির দেব।

তাই আমি বিশ্বি, সেই পুরা-কালের অন্তঃপুর বন্দিনীর কথা যার মূলে আমি যা বলেছিলাম সবারই তা বিদিত। আর রাণী সংযমনী বলেছে, চিরন্তনী প্রভাত বন্দিতা-নাম্। তার মা যেন বলছে, পুরুষ সূর্য স্বরূপে ফুটাবেন্দ্রকৃতীম। আমিই তো সমস্ত জগতের ইশ্বরী, অন্ন-সম্পদের প্রাণশক্তি, আমি কুলজন-বধূ, বজ্রাবর্তনের মতো আমি সর্ব-প্রেষ্ঠা। আমি প্রলয়ঙ্করূপে মহাভাবে অবস্থিতা, সর্বভূতে জীবভাবে আমি প্রবিষ্টা। আমাদেই সকল দেশে সকলে বিভিন্নরূপে আরাধনা করে।

আজও এই আমার নতুন অন্বেষণপর্যায়। কত যুগের কত পথ চলার পর আমি বর্তমান পথ পরি-ক্রমার রত হয়েছি।

দেশের রাজনৈতিক জীবনে তো আমি আজ অপরিহার্য। মন্ত্রী হয়েছি, রাজ্যপাল হয়েছি, সংঘের রাষ্ট্রপতিরূপে প্রধানা, আর রাজ্যের নিয়ন্ত্রিকা, প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত।

প্রথম ইতিহাস বিধাতাকে, দ্বিতীয়ের বেদিতলে নিবেদিত শেষ পূজার নয়। নতুন দিনের সূর্যতে তমিস্রা সূর্যের নব আবির্ভাব হোক, শেষ এষিত্র যাক সম্ভাস্ত বাহিত সূর্যের রথ। আমিও যাই।

• আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ রচনা।

সুনিশ্চিত সাফল্যের জন্য সর্বদা ব্যবহার করুন।

এস, অশোক, চাণক্য, বেটার, চক্র, রাজা, গুরুজী ও লাভলী মার্কা একসারসাইজ বুক।

প্র্যাকটিক্যাল ও লাবরেটরী নোটবুক ও বাঁধান খাতা।

অফিস, ষ্টেশনারী—ক্যাশ, লেজার জার্নাল, রেজিষ্টার প্রভৃতিরও ও মকসল সাপ্লাইয়ার্স।

Contractor:
BANGALIPI EXERCISE BOOKS

গুরুদাস ষ্টেশনার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪০, বহু বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১ ফোন—১২-৬৪৫১

# স্বপ্নদর্শন

তারাপদ ভট্টাচার্য

আট বছর পরে একদিন প্রাতঃকালে দেবর্ষি নারদ স্বর্গের দরজায় আসিয়া চৌকি দিতে লাগিলেন। দ্বারী সিঙ্কা ঘুমিয়া ঘুমিয়া জানাইয়া দিল—নারদ ফিরিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে দুজনের দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব পিলপিল করিয়া স্বর্গ বাহির হইয়া এক বিরাট জনতারূপে আসিয়া জমায়েত হইলেন। নারদ প্রথমে বাহির হইলে ইন্দ্রাণী বজ্রশক্তীর মত চাহিয়া থাকেন তবে ভিন্নরূপ।

নারদ প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া জনতার আসিয়া বসিলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া দেখাইতেছিল। এক কিনারে দুইটি সতীন দেবী অরুন্ধতী আসিয়া বসিলেন—'আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া সুরভি এই দুধ এবং দুগ্ধ দিলেন।' নারদ দোহনের পর তখনই ঠেকাইয়া দুধে দুধের সাদ মিটাইয়া বসিয়া রহিলেন। কণ্ঠের সুপারী টেট-এর নারদ কারকরের ওঁ-আমা করিল। অতঃপর অরুন্ধতী ঋষি উপবেশন করিলে জনৈক দেবতা বলিলেন—'হে দেবর্ষি, আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?'

—কালীঘাটে।

—কি কারণে?

—মা কালী দর্শন করিতে।

—আপনার কি তাঁহার চরণে দর্শন হয় নাই?

—তাহার বয়া হইবেছে।

—তবে আপনার দুধ অরুন্ধতীর মতন চক্ষুবিশিষ্টার দুধের নাম দেখাইতেছে কেন?

—যদ্যা চৌধুরাণি তাহা দেখিলে আপনার বলেও ধরকড়া ঘায়া আরোহ মত হইয়া যাইত।

নারদের সকলের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সভায় আরোহন চারি ভাগের এক ভাগ কমিয়া গেল। নারদ পলা ভাঙিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রাতঃকালে দেবার্চনা করিয়া সারা-বিশ্ব ঘুরে, বঙ্গদেশে, সন্দ্বীপে এবং পরক্ষণেই দুনিয়া নানা বস্তু দেখিলাম, নানা কথা শুনিলাম।

সভা—কি কি বস্তু দেখিলেন?... কি কি বস্তু শুনিলেন?'

দুর্বাসা বলিলেন—'তো চে নারদ, কক্ষনাত হইও না।'

ধমক খাইয়া সকলে চুপ করিলেন। নারদ বলিতে লাগিলেন—প্রথমতঃ পুনরায় কলাঘাটে জাহ্নবীর তীরে গিয়া বসিলাম। অর্ধরাত্রি দেখিবার সাধ ছিল। এমন সময়ে ছেলেরা দুইটে চড় নারী নৌকা করিয়া আগমন করিলেন। তাঁহারা যখন নৌকা বাহির উঠিতেছিলেন তখন একজন বলিলেন—'মেয়ের আবার রূপ দেখে কে?' আর একজন বলিলেন—'আরে দূর দূর, ঘর মেকেলে বাপার।' আমার কৌতূহল জাগিল। বুঝিলাম একটা বিবাহ আসন্ন। কিন্তু রূপের বিষয়ে আমরা তো চিরকাল নারীকেই প্রাধান্য দিয়াছি। হে দেবগণ, আপনারা কি ঔর্বশীর রূপ অধিক দেখিতে চাহিয়াছেন অথবা ক্যাটিকের?

সভা—সত্য সত্য।

দুর্বাসা বলিলেন—হুমো নারদ, এখনে আমি আছি।'

নারদ বলিলেন—মহর্ষি কালিদাস প্রমিত 'সত্যক্রিয়াধরোষ্ঠী,' 'বিম্ব-নাভি' ইত্যাদি বলিয়া রমণী নারীর স্তুতি করিয়াছেন তাহাদের 'এলকেশ উন্নত,' 'চক্ষের বিস্তৃত' বলিয়া নারের প্রশংসা করেন নাই।

অরুন্ধতী মৃদু প্রতিবাদ করিলেন—'প্রাচীন কবিদের বস্তু না জানিলে প্রাচ্য করিবে কিরূপে?'

নারদ বলিলেন—আমি ইন্দ্রলোকের পিছু লইলাম। পরস্পরের আলাপে বুঝিলাম ইন্দ্রাণী সহোদরা, পত্নী দেখিতে যাইতেছেন। রাজপথে আসিয়া তাঁহারা একটা মোটরে উঠিলেন, আমিও পক্ষী নিয়া চৌকি চালাইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে করিতে এক বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে থামিলাম। তাঁহারা প্রবেশ করিলে আমিও প্রবেশ করিলাম। সংবাদ পাইয়া পাত্রীর মাতা আসিয়া দ্বিপাদলোহিতের উপরে একটি কার্পাস বিস্তৃত বসিলেন, পাত্রের মাতা ও মাতুলসহ মেহের ঔর্বশী মূর্তিকার সহিত সমস্তরাল করিয়া করজোড়ে বসিলেন—নমস্কার।' পাত্রীর মাতা অনুমতি করিলেন—'বসুন'। দুইজনে উপবেশন করিলে পাত্রীর মাতা বলিলেন—'আমার মেয়েকে দেখবার দরকার ছিল না। মানুষের দেহে লাভ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে কি সুবিধা না অসুবিধা হতে পারে এই নিয়ে গবেষণা করে সে ডক্টরেট পেয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা মাইনে।

সভা—'ডক্টরেট কি?'

নারদ—'বিদ্যমন্তুক্। কিন্তু হে শ্রোতৃবৃন্দ, এইরূপ শব্দ আরও আসিবে। বারে বারে যদি পাইলে সব ভালোলাগ পাকাইয়া যাইবে। আমি বলি চিরন্তন এই জাতীয় শব্দগুলি লিখিয়া রাখুন। সব শেষ হইলে আমি বলিয়া দিব।'

সভা—'উত্তম, উত্তম।'

নারদ—পাত্রের মাতা বলিলেন—হাঁসের টুকরো মেয়ে।'

পাত্রীর জননী—'আপনার ছেলেটি কেমন?'

—ফর্সা রঙ, বি. এ. পাস করেছে। আপনি ও দেখেই নেবেন।

—আমার আর দেখবারটি কি, মেয়ের পছন্দ হলেই হল। মোবর্ধন!

জনৈক মুনি—'পর্বতকে ডাকিলেন! গরু কি বৃন্দাবনে?'

নারদ—'এই তো শুনিলেন ঋষিকাতার।'

—তবে?

—মোবর্ধন ভূতের নাম।

—পর্বতের নাম ভূতের হইল কি প্রকারে?

—মহলোকে মনুষ্যের নাম অর্থের অপেক্ষা করে না। ধনসব যার কাছে, মনুষ্যের বাঁধিয়া যায়।

দুর্বাসা—হে নারদ, যাহারা ধর্ম ও অর্থের সম্বন্ধ স্বীকার করে না তাহাদের কাহিনী শুনাইতে গিয়া তুমি বৃদ্ধ মহাপাতকে ডাকিলে। তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চিরন্তন্ত!'

—যে আজ্ঞা।

—নারদের নাম মনীনির্দিষ্ট কর।

নারদ—হে মহামুনে, কেবল ধর্মনাম যদি ঘোষ হয় তবে তো স্বর্গদ্বার নামাকর্ণমেহন বন্ধ পড়িয়া যায়। ব্রাহ্মণ অসম্পূর্ণ থাকে।

—ব্রাহ্মণের তাৎপর্য তুমি ভুল বুঝিয়াছ।

নারদ ঈষৎ হাসিয়া মাথা নোয়াইলেন। দুর্বাসা শান্ত হইলেন।

নারদ বলিলেন—মোবর্ধন আসিলে পত্নীর মাতা আদেশ করিলেন—'সৈরিন্ধ্রীকে খবর দে।' সৈরিন্ধ্রী আসিল। যে কালো মেঘিলায় তাহাতে আমার চক্ষু অন্ধকার হইয়া গেল।'

—কৃষ্ণের মত?

—উঁহু।

—কষ্টিপাথরের মত?

—সে কালো হইতে তো আলো ঠিকরাইয়া বাহির হয়। এ কালো আলো শুষিয়া লইতেছিল।

দেবপক্ষ—সর্বনাশ!'

নারদ—যেন মূর্তিমতী অমাবস্যা।'

তরুণ দেবতারা ঊর্বশীদের দিকে চাহিলেন। তাঁহারা ভ্রূকুটি করিলেন।

নারদ—সৈরিন্ধ্রী দুই ওষ্ঠের মধ্যে একটি পাকা তেলাকুচ ধারণ করিতেছিল। সে কার্পাস নির্মিত একটি বৃহৎ চন্দুতে বসিয়া কহিল—'বদনে!'

পাত্রের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কাজ কর?'

—মল-বাসর পরেলা মাখিয়ে।

—সেখানে কি হয়?

—এক কথায় বোঝান যাবে না। তবে জানই নাই আমরা মানুষ এবং বানরের মিল কতটা তাই নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছি। পশুলোকের ওপর এর একেবারে বোঝা যাবে।

পাত্রের মাতা—'একটু মূর্তিমতী কাজ না।'

সৈরিন্ধ্রী—'আমাদের দেশে পশুলোকান হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে চেষ্টা করছি মানুষ এবং বানরের জবো মিল কতখানি এবং ওই রোগটা ইউনিভার্স না ভাবি করে। এর পরে আমরা দেখব মিল কতখানি হলে ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের দ্বারা নরকে বানরে কিংবা বানরকে নরে পরিবর্তিত করা যায় কি না। দুটো বিষয়ই দেখতে হবে আমাদ আজ যখন জনসংখ্যা বেড়েছে আমরা কিছু লোককে বানর করে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলাম। আমার যদি ভবিষ্যতে জনসংখ্যা কমে, কিছু বানরকে মানুষে করে সমাজে আনতে পারব।'

পাত্রের মাতা—'ও!'

সৈরিন্ধ্রী—'কিন্তু আমার আবার সবচে ঘটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। উঠতে হচ্ছে।'

পাত্রের মাতা—'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

সৈরিন্ধ্রী চলিয়া গেল। পাত্রের মাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অনাদিকে তপস্বীকে বলিলেন—'এসব ছেড়ে কি আমাদের কপালে আছে?'

তপস্বী বলিলেন—'আঁ?'

পত্নীর মাতা—'কেমন দেখলেন?'

—এ আর দেখবার কি আছে? এবার আপনি একবার দয়া করে—

—যান, যাব। রোববার দিন আসুন।

—তাহলে উঠি?

—একটু চা—

—থাক্ থাক্। আবার হাঙ্গামা।

—আচ্ছা, আচ্ছা। রোববার পাঁচটা।

নারদ বলিতে লাগিলেন—রবিবারের তখনও দুই দিন বাকী। তাহাদের শেষ না দেখিয়া ফেলে নয়। দুই দিন ঘুরিয়া কাটাইলাম।'

সভা—'তাহে কোথায় থাকিতেন?'

—একটা কটেজে।

—অপ্সরাদের তরফে একটা হাসি শোনা গেল। এক তরুণ দেবতা কটেজ করিয়া সোঁবকে চাহিয়া বলিলেন—কোরেলমলয়সমীরে সব কর্ম হয় না।'

মিত্রকেশী—'অহহ।'

নারদ বলিলেন—রবিবার পাত্রীর বাড়ীতে হাজির হইলাম। যথাকালে পাত্রীর মাতা পাত্রের মাতা ও মাসী সমভিব্যাহারে পাত্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পাত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক-রাশি ডিকেন্স আনিয়া পাত্রীর মাতার সম্মুখে ডেস দিল। 'আরে এসব কি, আবার আবার একটু ঝুলোর আয়োজন'—বলিয়া তিনি দুই চারিটা ঝাঁইয়া ফেলিলেন। পাত্রের মাতা শশব্যস্তে বলিলেন—'তবে আপনাকে নোনতা এনে দিক।' বলিতে বলিতেই লুচি, কেনেভাজা, পটলভাজা আসিল।

এক নবীন দেবতা—'আবার লুচি!'

অপ্সরীরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দেবতা লজ্জিত হইয়া বলিলেন—'উদরস্পর্শ না হইলে কটকে কাজ হয় না।'

উর্বশী—'কি বিপদে পড়লাম।'

নারদ—পাত্রীর মাতা লুচি খাইলেন। প্রয়োজনমত বস্ত্রখণ্ড বাহির করিয়া হাত মুছিলেন।'

দুর্বাসা — 'হস্তপ্রক্ষালন করিল না?'

—না।

—নারদ।

নারদ—'পাত্রের মাতা বলিলেন—'এবার ছেলেকে ডাকি?' নিশ্চয়—বলিয়া পাত্রীর মাতা অনুমতি দিলেন। পাত্র আসিয়া অভিবাদন করিয়া বসিল। সৌরভ ছড়াইতেছে দেহ। পিছনে পিছনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পাত্রীর মাতা

কাদোবরণ ঘাস

প্রশ্ন করিলেন—তোমার নামটি কি বাবা?'

—অমলকোরক মুখোপাধ্যায়।

—পড়াশুনো কদ্দুর করেছ?

—বি.এ. পাস করেছি।

—কি কি নিয়েছিলে?

—এডুকেশান,পলিটিক্যাল সাইন্স।

—বা বা।

পাত্রের মাতা—'আজ্ঞে হাঁ। অঙ্কে-কর্মে ও চৌকস। ঐ যে দেখছেন রজনীগন্ধার তাড়, ও-ই সাজিয়েছে। এই যে দেখছেন লুচি, ও-ই ভেজেছে।'

—ঐটেই তো দরকার। আমার মেয়ে আমার অবোধ বলতে কিছু বোঝে না।

দরজার বাহিরে একটা টুক্ টুক্ শব্দ হইল। পাত্রের মাতা ভ্রূকুটি করিলেন। চাবির মৃদু কন্‌কন্ ধ্বনি হইল। পাত্রের মাতা মুখটা কাষ্ঠ-মার্জারীর ন্যায় করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—'কি জ্বালা!'

পাত্রের পিতা—'সঙ্গে পিসির মেয়ে বলে দিও।'

পাত্রের মাতা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—'কেমন দেখলেন?'

—বেশ ছেলে। আচ্ছা উঠি। পরশু ফিকেলে মেয়ে আসবে।

নারদ বলিয়া চলিলেন—হে দেব, হে দেবি, শুনি এবং অপ্সরাগণ, যথা-সময়ে চেতলার পাত্রের বাড়ীতে হাজির হইল সৌরভ সৈরিন্ধ্রী অবশ্য দুইটি সখী লইয়া ইতিমধ্যেই আমাদের সমস্ত করিয়াছে। অনেকক্ষণ পরে পাত্র ভ্রাতাদের নতমুখে প্রবেশ করিল। বাসর ঘি. যেন কটেজী চতুর্দশপদে চলেছে উল্ট হইল।

দেবপক্ষে হাহতোস্মি পড়িল। অপ্সরাপক্ষে হুল্লরা হইল—যেন কোকিলার সম্মুখে বক বসিল।'

নারদ—'পত্নী আপাতদৃষ্টিতে পাত্রকে দেখিয়া লইল। পরে অপাঙ্গে পাত্রীকে দুই একবার দেখিবার চেষ্টা করিল। পত্নী প্রশ্ন করিল—'বি.এ. পাস করে কিছু করছেন না?'

—পড়ছি।

—কি পড়ছেন?

—পার্সোনাল সেক্রেটারী কোর্স।

—ভাল জিনিস। স্কোপ আছে। চিনের চোলকুর্তা একজন খুজ-ছিলেন।

প্রথম সখী—'পান জর্দা?'

—একটু আকটু।

—মদ?

—শিবরাত্রি।

দ্বিতীয় সখী—'আপনার হবি কি?'

—ফরেন ষ্টাডিজ।

—খেলাধুলো?

—সুডো।

প্রথম সখী—'একেবারে ইনডোর টাইপ'।

দ্বিতীয় সখী—উত্তরগুলো খুব চেনাচেনা।

প্রথম সখী—আপনি কি শর্টহ্যান্ড শিখছেন?

—সি-এস-সি-তে তো ওটা চাই।

পত্নী—আপনার ছেলে সিকসেস নেই তো?

—না।

—মনে, আমি একটা অফার পেয়েছি ডিকেন্সের-এ। যদি ছিঁড়ে হয় তো—

—আমার কেন অসুবিধা হবে না।

—মাসের কতদিন পারেন?

—বাড়ীতে আমিই তো করি।

—আপনি কি রঁধে পায়স করেন?

—হ্যাঁ।

—কতো।

অপরাধী হাতজোড় দিলেন।

পত্নী—আমিও তাই।

নেপথ্য হুন্ড অসন্তোষসূচক করিয়া বলিলেন—উপায় কি?

পত্নী—ফল ভালবাসেন না ফুল?

—ফল।

—কোন্‌টা?

—কালোজাম।

নারদ বলিয়া চলিলেন—এক মুহূর্ত সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকিবার পর পত্নী তোলানাথের প্রশ্ন করিল—'আপনি তো কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না?' উত্তরে কয়লকোকের মৃদু হাসিল। তাহার পর দুই সখী পরিচয় হইল সৌরিন্দ্রী চলিয়া গেল।

নারদের বক্তৃতার ফেঁপে পণ্ডিতেই পরম পণ্ডিত কবি অনুপাম বলিলেন—হে নারদ, আপনি কি ইহার মধ্যে বৈতরণীর পুরুষের একটা অবকাশ দেখিতে পাইতেছেন না?

—আজ্ঞা হাঁ। খুঁজিতে খুঁজিতে যেখানে গিয়াছি সেখানেই নারী উপরে নর নীচে।

—উপকার নর হইয়া কারণ অনুসন্ধান করে না?

—বর্তমানে এ বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তি তাহাদের নাই।

—আশ্চর্য!

—তবে সমবেতদের এক আমাকে অনেকের মত দেখিয়াছি।

—তাহারা কি বলেন?

তাহারা যে বহুযুগ পূর্বে বৈতরণীতে এক চরকার ভাইরাস আসিয়াছিল যাহা মন্ত্র অপরিণতবয়স্ক নরকেই আক্রমণ করিয়াছিল।

—আহা!

—অল্পবয়স নারীদেহে ইহার প্রতিষেধক শক্তি ছিল, নরদেহে ছিল না।

—অনুমান করিতেছি ভাইরাস কোন রোগবীজ হইবে?

—যথার্থ বলিয়াছেন।

—তাহাতেই গেল?

—তাহাই নরের শক্তি বৃদ্ধের মত ছিন্ন করিয়া দিল।

—এই প্রয়োগিকল ভাইরাসের নাম কি?

—রাজনীতি।

সহসা সভা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—হে দেবর্ষি সভা কি আপনাদের দুইজনের?

—না না। আমি সেই রাত্রি কটি থাকিতেই বাপন করিলাম। দুইদিন এই ভাবে কাটিল। তৃতীয়দিন পায়ের ঘাটে এসে মাতৃস্নসা এই পথে অবশ্য সংবাদ লইতে পত্নীর গৃহে যাইবেন। তৃতীয় দিন তাহাই ঘটিলে আমিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সৌরিন্দ্রীর গৃহে যাইলাম। তাহার মাতা বাহির হইয়া বলিলেন—'পাত্র অন্নারও পছন্দ, মেয়েরও পছন্দ।' পত্নীর মাতা চাঁৎকারে নমস্কার করিয়া কহিলেন—'এবার তাহলে একটা শুভদিন—'

—হ্যাঁ তো বটেই। তবে জেনাপাওনা একটা আছে তো?

—আমার যা সাধ্য সে ত মা জননীকে দেখেই।

—হ্যাঁ তো বটেই, তা তো বটেই। আমার বড় ছেলেটি 'মা-ফিরোজ সমবায় সমিতি'র ম্যানেজার। ও সব মিলিয়ে ছেলেছিল পঞ্চাশ হাজার। এটি অবশ্য ওর চেয়ে সরেস।

—তেমে আপনার দাবী করবার নাই, তবে—

—আপনি একটু চলা বলেন?

সভা—কথার মধ্যে হঠাৎ জলের কথা উঠিল কেন?

নারদ—পত্নীর মাতার মুখ দর্পণ হতের মত শুভ্র হইয়া গিয়াছিল।

সভা—তত্ত্ব কিছু?

নারদ—পাত্রের মাতা যখন কাঁদিলেন জল পাইলে একটু খান, তখন জল আসিল। তিনি এক ঢোক পান করিয়া বলিলেন—আমার সামান্য আর এত তো পারব না।

পত্নীর মাতা—একবারে বই ত নয়।

পাত্রের মাতা নিরাবরণমাত্রে সজিনার ডাঁটার মত স্থির হইয়া রহিলেন। পত্নীর মাতার দয়া হইল। বলিলেন—'এখনও তো দেরী আছে।'

—মেয়েতে কি টাকা হয়?

জনৈক নবীন দেবতা—তাহা হইলে তো আমা যদুরায় কন্যা অবশ্য আমার ঘর হইত।

আর একজন দেবতা—'কাল পুরোহিত, সে অর্থ তখন করিবে কি চলবে?'

পত্নীর মাতা—'এইবেলা দোহাতে পড়ে থাকুন।'

পূর্বোক্ত দেবতা—'এ সৌদেহেই মহা ঝঞ্ঝিল। এ কি নারীর কেশ, যে জন্মকেই আসে, কাঁচিতে বিসর্জিত হইয়াছে প্রাতঃকালে খুঁজিয়া লইবার অপেক্ষামাত্র?'

পাত্রের মাতা—'আছে তো এক আসন।'

—বেচে দিন।

—বাজুবে তোমার?

—ছেলে তো আমার বাড়িতেই আসছে। আর আপনার কজন?

—ছেলে মেয়ে আর আমরা দুজন।

বাহাদুর খাঁ

—একখানা ঘরেই হয়ে যাবে। কত আর তাড়া?

মাতৃস্নসা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। সহসা পত্নীর জননীর হাতে একটা শক্তিশেল হানিবার আশায় বলিলেন—'আর একটি ছেলেও তো আছে।'

পত্নীর মাতা—হে হে ঘরে জামাই কি চলে?

নারদ—পাত্রের মাতাকে ডাকিতে নিষেধ করিয়া পত্নীর জননী বলিলেন—ঠিক আছে, ছেলে দেখুন।' এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। মাতা ও মাতামাতার তৎকালে কথেক শক্তি ছিল না, উঠিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে পত্নী ফিরিল। মাতা হস্তে চন্দ্র লাভ করিয়া ডাকিলেন—'মা!' মাতৃসম্বোধনে সৌরিন্দ্রী বিরক্ত হইল। ধমকিয়া বলিল—'বলুন!' পাত্রের মাতা কহিলেন—'তোমার মা অবশ্য ঠিকই বলেছেন কিন্তু আমার তো অত টাকা নেই।'

সৌরিন্দ্রী পাকা মেয়েমুহে কামড় দিল। বলিল—দেখুন, বিয়ের ব্যাপারে আমি মায়ের সঙ্গে তর্ক করতে পারব না। অতান্ত ডোমকেট ম্যাটার।'

দেবতারা সমস্বরে বলিলেন—'ঠিক্ ঠিক্।'

অপ্সরীরা বলিলেন—'ঠিক্ ঠিক্।'

সরস্বতী বলিলেন—হে দেবর্ষি, বাহা শুনাইলেন তাহা পূর্বে শুনি নাই। তবে অতীতে ইহার বিপরীত ঘটনা আমার জানা আছে। আমার এক সেবিকা পড়িতে পড়িতে আমার হতের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। পাত্রের পিতৃস্ত মেয়েকে তাহার বিবাহ হইল না। অবশেষে পড়িয়া পড়িয়া কুব্জ হইয়া গেল।'

দেবতা বলিলেন—'পূর্বোক্ত কন্যাটি আমার নামে এক কন্যা ছিল। সে চক্ষে কাজল না দিলেও মনে হইত যেন কাজল দিয়াছে। চমরী গাই-এর পুচ্ছে মাল্‌কাওরা মাখাইলেও তাহার কেশের সমান পাওয়া যাইত না। সেই চক্ষু সাদা হইল, সেই কেশ করিয়া গেল।'

দ্বিজকেশী—কি কারণ?'

—তাহার পিতার অর্থ ছিল না কিন্তু পাত্রপক্ষ কেহ অবশেষে কন্যা লইতে রাজী হন নাই।'

চিত্রগুপ্ত বলিলেন—আমার কাছে এইরূপ অনাথা দুষ্টান্ত ঢের আছে। পড়িতে ছেলে সম্বন্ধেরও কুলাইবে না।'

অনুপাম—নারদ, কালীঘাটে কি নরবিক্রয় চলে ছিল?'

নারদ—চিন্তার বিষয়। তবে হালদের মোকাল মেলিয়াছি।'

সভা—তাহার পর?'

নারদ—'পাত্রের মাতা যদি পরশুরাম হইতেন তবে বলিতে পারিতেন—'পৃথিবী নারায়ণীন করিব।' তাহা নহেন বলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং পাত্রীর মাতার উপদেশমত বাড়ী বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত পাত্রীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন।'

সভা—তবে বিবাহ হইল?'

—শতবর্ষ।

জনৈক দেবতা—আপনি কি এতদিন পর্যন্তই ছিলেন?'

—অবশ্য।

—তবে তো আপনার পক্ষতে ঝঞ্ঝা পড়িয়া গিয়াছে।

—এই অস্থিতে অত সহজে ঘাস লাগে না।

—তা কি হয়? অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, দেবর্ষিকে অবিলম্বে এক প্রেসী ইন্দ্রাণী তৈল পাঠাইয়া দিন!

শেষ

# নারীমুক্তি

## দিলীপকুমার সেনগুপ্ত

সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সন্তোষের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর ইচ্ছায় দেবলোক, অসুরলোক ও নরলোকে সুখস্বচ্ছন্দ উৎসব হোল।

দেবরাজ ইন্দ্রকে পুরোভাগে নিয়ে প্রজাপতির কাছে এসে নিবেদন করলেন, 'প্রভু, অমরদের মুক্তির উপায় নির্দেশ করুন।'

প্রজাপতি বললেন, 'ক'।

—'আজ্ঞে?' ইন্দ্রর কণ্ঠে জিজ্ঞাসু প্রার্থনা।

কিন্তু উত্তর পুনরুক্ত হোল, 'ক'।

'ক'? দেবরাজ চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁদের এক সময় প্রণাম করে বিদায় নিতে চাইলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুঝেছ?'

দেবরাজ বললেন, 'আজ্ঞে হাঁ, আপনি মন্ত্র করতে বলেছেন।'

—'ঠিকই বুঝেছ, যাও।'

ইন্দ্রের জয়-ধ্বনির বিনিময়ে বাণী প্রতিধ্বনিত হোল : দেবতারা ভোগ-বিলাসে, তাদের ভোগাবস্তুর ও ভোগ-লিপ্সার অবধি নেই। তাই তাঁদের মুক্তির বিধান ভোগবাসনার দমন।

অসুররাজও বিরোচনকে মুকুলাট করে ইন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হোল। প্রার্থনা করলো মুক্তির উপায়।

প্রজাপতি বললেন, 'ক'।

প্রণতিপাত বিনয়।

কিন্তু 'ক'? অনেকক্ষণ মননের পর অসুরেশের ধারণা হোল।

প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুঝেছ?'

বিরোচন বললো, 'আজ্ঞে হাঁ, আপনি দয়া করতে বলেছেন।'

তিনি বললেন, 'ঠিকই বুঝেছ, যাও।'

বিরোচনের কণ্ঠে বিনয়ের বাণী ধ্বনিত হোল, অসুরেশ অন্তরঙ্গেই তামসিক, রুক্ষ, নির্দয়, হিংসেক। তাঁদের মুক্তির বিধান দয়া, সত্য-ধর্মের সাধন।

ক্রমে নরলোক গিয়ে প্রজাপতির কাছে উপদেশ ভিক্ষা করলো।

প্রজাপতি বললেন, 'ক'।

নরলোক গভীর ধ্যানে বুঝতে পারলো এর অর্থ কী।

বলল।

প্রজাপতি বললেন, 'ঠিকই বুঝেছ, যাও।'

নর-দেহের অন্তরে দয়া-ধর্ম উদ্ভাসিত হোল, সহযোগে নরের সত্যত্বের। সত্য, ধন, সম্পত্তি। এই আহরণ প্রবৃত্তির আর শেষ নেই। তোমাদের মুক্তির বিধান তাই বন্ধন-নাশের সংযোগ আর দান।

অবশেষে নারীলোক গিয়ে সৃষ্টি-কর্তাকে বললো, 'আমাদেরও মুক্তির উপায় বলে দিন।'

ব্রহ্মা বিস্মিত হলেন, 'এই যে নরলোক উপদেশ নিয়ে গেল।?'

—'প্রভু, সে ছিল পুরুষের মুক্তির উপায়, আমরা নারী।'

—'অ' ব্রহ্মা বুঝলেন। বললেন, 'তোমাদেরও কর্তব্য 'ক'।'

নারীলোক বোধ হয় এই সম্ভাষণে ভয় করে এসেছিল। কাজেই কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে বিলম্ব হোল না। বললো, 'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?'

—'আজ্ঞে আপনি অমরলোকে বলেছেন পুরুষদের দমন করতে।'

'ঠিক বুঝেছ যাও।' প্রজাপতি সৃষ্টি মনোনিবেশ করলেন।

নারী-মুক্তির কর্তব্য বিধানের বাণী মুখরিত হোল। তোমাদের আমি মুক্তিদত্ত বিধান দিলাম না, কারণ তোমরা পুরুষ সম্পর্কে এমনিতেই নিতান্ত। এমনকি যখন ধৈর্যের বাঁধন পুরুষের থাকে শিথিল হও তখনও প্রত্যক্ষেই তোমরাই কারাগারী। নারী সর্বাবস্থায় পুরুষ-অধীনা। এই ভূমিকা দৃঢ় ও বিস্তৃত করো। তবে সার্বিক মুক্তি পাবে না, তৃপ্তি পাবে।

অসংকোচিত নারী-দেহে বিনম্র ধ্যান।

দৈব আশীর্বাদের মত

পূর্ণাপুজো হলো নানারঙের আলো-ঝলমল খুশির উৎসব। কিন্তু যাঁরা প্রতিমা গড়েন, উৎসবের শুরুতেই সেই মৃৎশিল্পীদের দিন কাটে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে। বাবসার মরশুমে পুঁজির জন্যে বেশীর ভাগ মৃৎশিল্পীকেই হাত পাততে হয় মহাজনের কাছে। ফলে, আসার মুখে যাকে ফেলে উপার্জিত টাকার অনেকটাই চলে যায় চড়া সুদের খাতে মেটাতে। পরিশ্রমের অনুপাতে লাভ থাকে না।

একটা বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬৯ সাল থেকে ইউবিআই মৃৎশিল্পীদের সাহায্য করে আসছে। ইউবিআই-এর আর্থিক সহায়তায় এখন তাঁরা ব্যবসার মরশুমে প্রতিমা-নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ একবারেই কিনে নিতে পারেন। মাটি, খড়, রঙ, সাজপোষাক, অলংকার —এমনি কতকিছুই তো সময়মত কিনে রাখতে পারলে ভালো। পুজোর বিক্রির পর ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করতে হয়।

পুজোর সময় ইউবিআই-এর সাহায্য তাই মৃৎশিল্পীদের কাছে দৈব আশীর্বাদের মত নেমে আসে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBI-8-748

# অন্তরে পেয়েছি লাজ

## নির্মল সেনগুপ্ত

লাজুকতার বিরুদ্ধে যে যাই বলুন, ভেবেচিন্তে কিন্তু এর মূল্য অপরিসীম।

কল্পনা করুন, একটি মেয়েকে যার সব সময় কাটা কাটা কথা বলার অভ্যাস। আপনি বইই লাজুকতার বিরোধী হোন না কেন, এই মেয়েটিকে আপনি নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন না। একবার তাকিয়ে দেখুন ছটফটানো নববধূর দিকে। পৃথিবীতে এমন কোন্ বস্তু আছে যার সঙ্গে এই লাজুকতার তুলনা হতে পারে? রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, 'লজ্জার অবগুণ্ঠন টেনে তবু বেরিয়ে আসতে পারছে না।'

বেলা হয়ে আজ
অন্তরে পেয়েছি বড় লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,
যেতে ফিরেছিনু ঘরে।
ছিল না কিসের ভেলা সাজ।'

কী চেয়ে? কোনো অভাবীর কোনো বাড়ি আপনি পর দেখতে যান, তবে ছেলেরা লাজুক ভাবটি দেখে আপনি খুশি হবেন। বলবেন, বাঃ, বেশ ছেলেটি।' সার্টিফিকেট লাজুক ছেলেটিকে দেবে আপনি যদি খুশী না হন, তাহলে বুঝতে হবে, আপনার স্বভাবে কিছু নিষ্ঠুরতা।

আমি বলতে চাইছি, এবং ছেলেরা জানেই, লাজুকতা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একটা বিশেষ গুণ এবং পরিচিত গুণ। আত্মানুসন্ধান যদি প্রয়োজন হয়, তবে লাজুকতারও প্রয়োজন আছে। লাজুক স্বভাবের লোকদের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের প্রবণতা বেশী। সে জানে জীবন-যুদ্ধে জোরার ঘাঁটি টলতে হয়। যদি না জানে তার স্বভাবটাই তাকে জানিয়ে দেয়। যে কথা সে মুখে বলতে পারে না, সে কথা যাবতীয় তার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসে এবং তাই মুখ পায় তার আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে।

গান্ধীজীর কথাই ধরি। প্রথম জীবনে তিনি খুব লাজুক ছিলেন। লন্ডনে যখন পড়াশোনা করতেন, তখন তিনি ছিলেন সেখানকার ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির সদস্য। সেই সূত্রেরই মধ্যে মধ্যে তাঁর ডাক পড়তো কিছু বলবার জন্যে। কিন্তু বলতে গেলেই তাঁর কথা জেতো আটকে। তিনি লজ্জায় লাল হয়ে যেতেন, হাঁটুতে কাঁপুনি ধরতো। অবশেষে অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়তেন। শ্রোতারা হেসে গড়াগড়ি খেতো। সেটা পরিবেশটাই হয়ে পড়তো খানখান।

পরবর্তী জীবনে গান্ধীজী যেসব ছিলেন, সেটা তাঁর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছে। জাতীয় জীবনে নানির বন্ধের ঘটার, বক্তৃতার তাঁকে একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, লাজুকতা তাঁকে বক্তৃতার শিখিয়েছে। তিনি লিখেছেন,

'My shyness has been in reality my shield and buckler. It has allowed me to grow. It has helped me in my discernment of truth.'

মার্কিন জাতে লিংকনেরও হুচোট বিরল। তাঁর জীবনে টেনাপোড়েনের অন্ত ছিল না। ঘৃণ্যবাদী বলে ইহুদিরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল, জগৎও তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। তিনি ছিলেন একান্ত নিঃসঙ্গ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত। সবের ওপর তিনি ছিলেন অত্যন্ত লুচোচোরা।

লিংকনেরা ছদ্মবেশে বসে ল্যাটিন পড়তেন ভাঙ পণ্ডিত তাদের কি প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠা প্রবন্ধ হলে রাজা চতুর্দশ লুইয়ের অধীনে। প্রতিষ্ঠা কন্যা ছিলেন বিদুষী। পিতার মৃত্যুর পর কন্যা নিলেন পিতার ছাত্রদের শিক্ষার ভার। লিংকনেরা পড়তে পড়তে তাকিয়ে থাকতেন পুরুষপুরীর মুখের দিকে। একদিন মরিয়া হয়ে তিনি তাঁর পাণিপ্রার্থনা করে বসলেন। পুরুষপুরী তাঁকে শুনিয়ে দিলেন বেশ কড়া কথা, সকল করিয়ে দিলেন তাঁর দারিদ্র্য আর ইহুদিদের কথা। পুরুষপুরে থেকে তিনি পুরুষপুরীকে প্রণয় জানিয়ে ফিরে গেলেন আপন পুরুষপুরে।

সেই ছিল লিংকনেরা প্রথম প্রেম, আর সেই শেষ। তাঁর জীবনে মারীর সংস্পর্শ সেই প্রথম, সেই শেষ। মনে মনে তিনি চেয়েছিলেন, তবু প্রাণ খুলে দিতে পারেননি কোনো অভিযান, কোনো অনুযোগ। প্রেমিক হয়ে গেলেন পুরোপুরি দার্শনিক। লুচোচোরা দার্শনিক নিজেকে খুটিপোকার মতো গুটিয়ে ফেললেন নিজের আয়নার মধ্যে। উপলব্ধি করলেন নিজের সীমাবদ্ধতাকে। মানুষকে তিনি ভালবাসলেন, তবু কাছের তুমি হলেও পাওনা তোমার সীমিত।

লিংকনেরা উপলব্ধির ছাপ রয়ে গেল তাঁর সমগ্র জীবনে, তাঁর দর্শনের প্রতিটি ছত্রে।

জানি, সবাই গান্ধী নয়, সবাই লিংকনেরা নয়। কিন্তু তাঁরা তো জীবনের শুরু থেকেই গান্ধী লিংকনেরা হয়ে যাননি। আর পাঁচ জনের মতো তাঁদের জীবনও গড়ে উঠেছিল সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা প্রকৃতির নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। বিরাটত্বটুকু বাদ দিলে তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার কোনোই পার্থক্য নেই।

একজন গর্ব করে বলেছেন, 'বড় বড় লোকদের কৃতিত্বের চাইতে আমার কৃতিত্ব কিছু কম নয়। বরং আমার কৃতিত্ব আরও বেশী, কারণ আমি সেই কৃতিত্বকে গোপন রাখতে পেরেছি। এইখানেই আমি সবার চাইতে বড়।'

কিন্তু লুচোচোরা সবাই এত খাপছাড়া কথা বলতে পারে না। তাদের মন সময় ভয় থাকে, এই বুঝি তাদের কেউ হাল্কা ভাবলো, এই বুঝি তাদের নিয়ে কেউ মনে মনে হাসলো, এই বুঝি তাদের কথায় কেউ আঘাত পেলো। লুচোচোরা যেন সবাইকে ইন্দিতে বোঝাতে চায়—'ওগো, তোমরা আমার ওপর অভিমান করো না। তোমরা জান না, আমি আমার রাশি রাশি অক্ষমতার ওপর নিজে নিজে একা একা চোখের জল ফেলেছি। আমার যা দেবার সবই তো আমি দিয়েছি।

'আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করেছি দান
কেবল শরমখানি রেখেছি।
চাহিয়া নিজের পানে
নিশিদিন সাবধানে
সবখনে আপনারে ঢেকেছি।'

জীবনটাকে তুলনা করা যাক নরম মাটির সঙ্গে। সেই মাটির বুকে জন্মায় সবুজ ঘাস। তার মধ্যে ফোটে বিচিত্র রঙের বিচিত্র গন্ধের ফুল। সবই সোনাদা নয়, সবই সুগন্ধী-গন্ধা নয়, সবই বেল নয়, চম্পা নয়। তারা সবাই লালিত, তারা সংখোপন। তারা সব যেন সেই লুচোচোরা পোকোকার মানুষগুলির মতো। তারা প্রকৃতির সোকাবুদ্ধি করে, তারা সৃষ্টির জোগান করে। নানা রঙের অজানা অচেনা ফুলের মতোই তাদের সমমর্যাদাকৃত জনের লাজুকতা প্রকাশ পায় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সেই সব ফুলের মতোই তারা ঝরে যায় পরবর্তিত হয়, উৎসবে আনন্দে তারা থাকে অনাহূত। তবু তারা ছিল, তারা আছে, তারা থাকবে।

একজন বিদেশী লেখক জোর দিয়ে বলেছেন, লুচোচোরার বল লুচোতে শিখলে তাদের অক্ষমতার সঙ্গতই লোকসানের নয়। খানিকটা লাভেরও বটে। তাদের দুঃখ করবার কারণ নেই। তাদের লাজুকতা তাদের আশীর্বাদ।

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

# স্বরলিপি

স্বাধীন মাটির মতো আমরা
স্বর্গ রচনা করেছি
মহামিলনের সাগরতীরে
মৈত্রীর সেতু বেঁধেছি।

শান্তির পদ্মবনে
ঠুঁটি আমাদিগারাটি -
সেনানী সকাল উষার আলোকতীর্থে
অমরা এসেছি॥

নতুন যুগের জয়রথের
দিকে দিকে বেলা হবে,
ভাবতমাতের ললাট ছুঁয়েছে
পূবের সকল রবি।

পরিবারে নব ছন্দে
সবের আনন্দে
নব মুক্তিতে মানবের মুখ পড়বে
কলম্ব নিঃশেষি॥

কথা: অমিয় চট্টোপাধ্যায়  সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়  স্বরলিপি: বিমলভূষণ

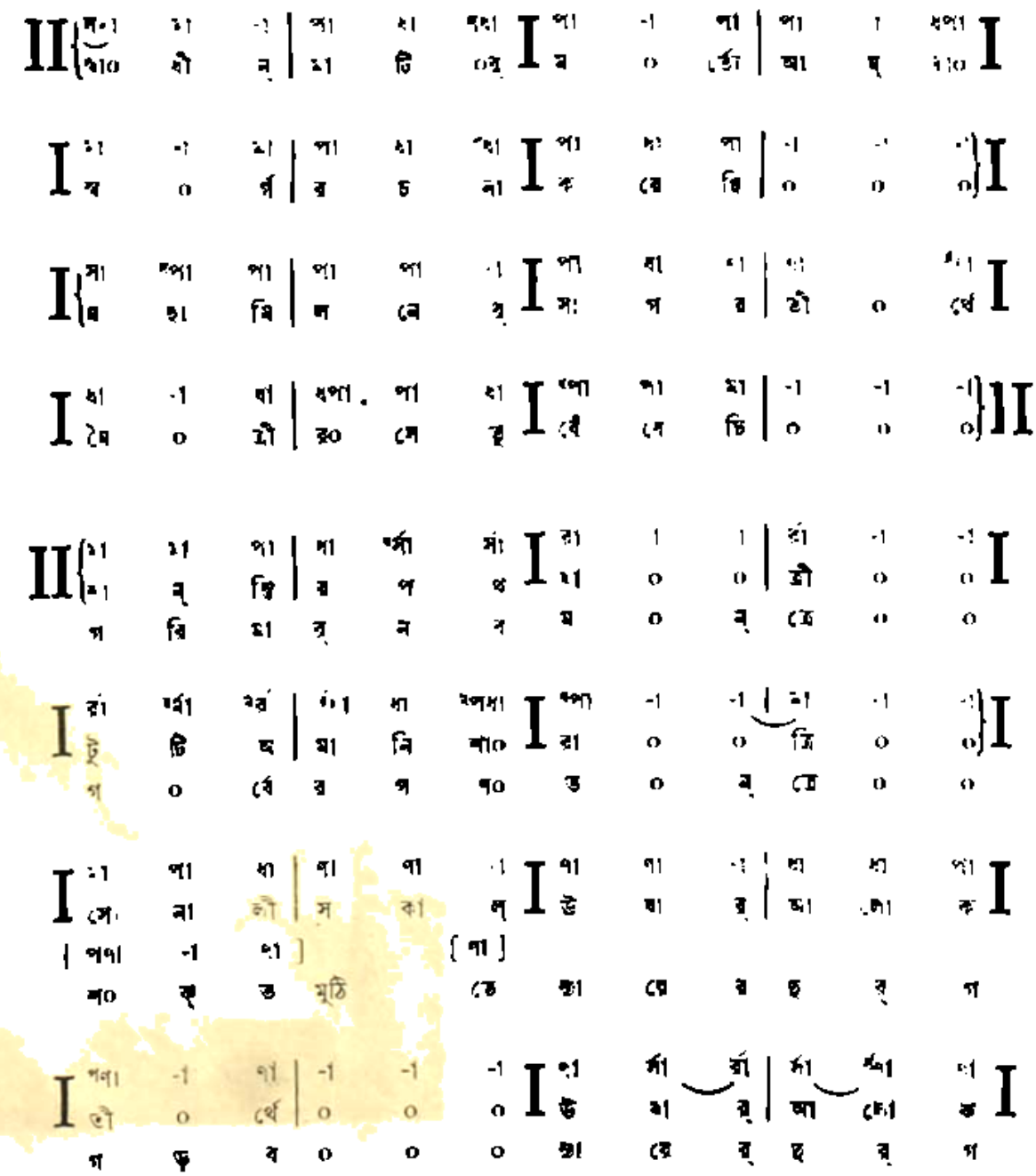

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ধা | -। | ধা | পা | পা | ণ্ধা | I | ণ্পা | পা | মা | -। | -। | -। | II |
| | ভী | ০ | র্থে | আ | ম | রা | | এ | সে | ছি | ০ | ০ | ০ | |
| | গ | ড়্ | ব | শ | প | থ্ | | নি | য়ে | ছি | ০ | ০ | ০ | |

এর পর "মহা মিলনের সাগরতীর্থে
মৈত্রীর সেতু বেঁধেছি" আগের মত II

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | সা | গা | -মা | ণ্ধা | ধা | -। | I | ধা | -। | দা | -। | দা | -। | I |
| | ন | ভূ | ন্ | আ | শা | র্ | | জ | র | বা | ০ | র্ত্তা | র্ | |
| I | পা | দা | পা | দা | পা | মা | I | পা | -। | পা | -। | -। | -। | I |
| | দি | কে | দি | কে | লো | লো | | ভূ | ০ | র্য | ০ | ০ | ০ | |
| I | পা | দা | র্সা | র্সা | র্সা | -। | I | না | র্সা | র্রা | র্সা | মা | দা | I |
| | ভা | র | ত্ | মা | তা | র | | ল | লা | ট্ | ছুঁ | য়ে | ছে | |
| I | পা | দা | না | দা | পা | মা | I | পা | -। | পা | -। | -। | -। | II |
| | পু | ণে | র | স | ফ | ল | | স্ব | ০ | র্গ | ০ | ০ | ০ | |

ডক্টর হে

ডক্টর মিল

# কলকাতা

•

## শিলিগুড়ি ও জায়রবন্ধ

কুমকুম দেবী : রবীন্দ্রসংগীত ৪ ৫ মিনিট ৫-২০ মিনিটে এবং শ্রীরামপুরের অনুষ্ঠানের সময় ১-০৩ মিঃ ৬ ৭.৫ ২-১০ মিনিট

•

### প্রথম অনুষ্ঠান

৫-১৫ মঙ্গলারতি
৬-০০ সুপ্রভাত
৬-০৫ মাঙ্গলিকী
৬-২৫ রবীন্দ্রসংগীতের ধারা : আলোচনা
৬-৫০ সুপ্রভা সরকার ।
ওস্তাদ আবদুল্লাহ খিয়ালকার । তবলা : বিনোদলাল, বাঁশরীতে, একতারা ও হারমোনিয়ামে
৭-৫৫ সংবাদ-বিচিত্রা
৮-১৫ প্রবীণ চক্রবর্তী : কবিতা
৭-০০ চন্দ্রশেখর দাস : গজল
৭-১০ জায়রবন্ধ ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও হিন্দী)
৭-২৫ বাংলা সংবাদ
৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৭-৪০ সুমা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ শীলালি বন্দ্যোপাধ্যায় । লোকসংগীত
৮-১০ সঙ্গীতের মূলোপাধ্যায় আধুনিক
৮-০০ কথা কিন্নাম : সেতার :
৯-০৫ সুনীল বন্দিত রবীন্দ্রসংগীত
৯-১৫ দোহারী সেন । আধুনিক
৯-৩০ রবীন্দ্রসংগীত দাস । হিন্দী
৯-৪৫ অমলারী ঠাকুর রবীন্দ্রসংগীত :
১০-০২ অমলারঞ্জন ।
১০-০৫ রমিলা ঠাকুর : সেতার
১০-০৫ পরমেশ্বর মাজিক । বাঁশী
১১-০০ সমাপ্তি

### দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

১২-৩০* রবীন্দ্রসংগীত ।
(গীতিনাট্যের গান)
১২-৩০ আলোচনা ।
১-০০ সেতার মুখোপাধ্যায় বাঁ
সেতার (রৈকার)
১-৩০ বাংলা সংবাদ
১-৩০ সুপ্রভা সরকার
১-৩০ বাঁশিবাদন ।
বাদ্যযন্ত্রের কথা : প্রভাতিকা বেদোনা; তবলা -
রবীন্দ্রসংগীত পাঠ : সন্ধ্যা সেন ও দোহারী সেন
২-২৬ জায়রবন্ধ
২-৩০ শিলিগুড়ির জন্য (অঞ্চল শ্রেণী)
২-৩০ গীতা নন্দী : লোকসংগীত
৩-০০ প্রবীণ চক্রবর্তী : কবিতা
৩-১০ দোহারী বন্দ্য রবীন্দ্রসংগীত
৩-৩০ সমাপ্তি

### তৃতীয় অনুষ্ঠান

৫-১৫ লোকসংগীত শাস্ত্রিক
৬-০০ স্থানীয় সংবাদ ও জায়রবন্ধ
৬-০৫ আঞ্চলিকদের জন্য অনুষ্ঠান
৬-৫১ বিচিত্রানুষ্ঠান ।
নকল সিরাজ : বাহা: বক্তা: মুখোপাধ্যায়ের আলোচনায়, পরিচালনায় : অনিন্দিতা সেন ও সম্প্রদায়
৭-১৫ সুবোধ মুখোপাধ্যায় লোকসংগীত
৭-৫১ বাংলা সংবাদ
৭-৫৫ আবহাওয়া
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ দোহারী সেন । আধুনিক
৮-১৫ সঙ্গীতের মুখোপাধ্যায় রাগপ্রধান
৮-৩০ সাপ্তাহিক প্রসঙ্গ/সংবাদ
৮-৪৫ বাংলা সংবাদ
৯-০০ কথা কিন্নাম । সেতার
১-৩০ অনুষ্ঠানের ভাষণ -
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০-০৫ বাংলা সংবাদ
১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা
১০-৩০ সুনীল বন্দিত রবীন্দ্রসংগীত
১০-৫০ শীলালি বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসংগীত
১০-৩০ সঙ্গীতের মুখোপাধ্যায় আধুনিক
১১-০০ আবহাওয়া ও সমাপ্তি

## কলকাতা ব

### প্রথম অনুষ্ঠান

৫-১৫ কলকাতা ৪-৪৫ অনুষ্ঠান :
৬-০১ সুবোধ মুখোপাধ্যায় লোকসংগীত
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৩৫ সুপ্রভা সরকার
৬-৫০ সুপ্রভা সরকার
৬-৫৫ হিন্দী বিভা :
৭-১০ চন্দ্রশেখর দাস : গজল
৭-৫০ কলকাতা ৪-৪৫ অনুষ্ঠান
৮-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৮-০০ বিভিন্ন ফোরাম ইন ইন্ডিয়া
৮-১০ সমাপ্তি

### দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ রাইসমাইল অব ওয়েলস বিষয়ক
১-০৬ গানরাজ সংবাদ
১-১০ গানরাজ সংবাদ
২-৩০ অন্তর বাহির ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

### তৃতীয় অনুষ্ঠান

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় সংবাদ ও জায়রবন্ধ
৬-১০ বিজয়কুমার দাস ফ্লোকসংগীত
৬-২০ সুবোধ মুখোপাধ্যায় ফ্লোকসংগীত
৬-৫০ চন্দ্রশেখর দাস : গজল
৬-৫৫ জয়ন্তীকথা
৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা
৭-৩০ সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় গীতি
৭-৫৫ অরিন্দম দাস : হিন্দী
৭-৪০ সুমা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
৮-০৫ হিন্দী কথিকা
৮-৩০ কীর্তন -
৮-৫৫ সুনীল বন্দিত : আধুনিক
৯-১০ নিয়মিত অনুষ্ঠান
৯-২০ অমলারঞ্জন -
১-৩০ ইংরেজী বার্তা
১-৫৭ সিনেমার প্রেমিক ইন কলকাতা) ।
পরিচালনায় : অনিন্দিতা সেন
১০-৩০ রমিলা ঠাকুর সেতার ও হিন্দী
১১-০০ আবহাওয়া ও সমাপ্তি

## কলকাতা গ

### বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ, ১০-১৫ মিঃ ১২-৩০ মিঃ, দুপুর ২টা—৫টা ১১-১০ মিঃ

কলকাতা ক : ৫৫ [illegible] কলকাতা ৪ ৫ মিনিট ৫-১০ মিঃ ও বিভিন্ন ১-১০ মিঃ [illegible] ৪ ৫ মিনিট ১-১০ মিঃ)

### পূর্বাঞ্চলীয় প্রোগ্রামের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

### প্রথম অনুষ্ঠান

৬-১০ সুপ্রভাত
৬-১৯ সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় গীতি
৬-১০ বিজয়কুমার দাস ফ্লোকসংগীত
৬-৩০ কলকাতা ৪-৪৫ অনুষ্ঠান
৬-১১ বিজয়কুমার চক্রবর্তী সেতার
৬-৫০ দোহারী বন্দ্য : রবীন্দ্রসংগীত
৬-৫০ প্রবীণ চক্রবর্তী : কবিতা
৬-৫৩ শীলালি বন্দ্যোপাধ্যায় : লোকসংগীত
১০-০০ সমাপ্তি

### দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

৯-৫৫ দোহারী বন্দ্য : রবীন্দ্রসংগীত
১-১০ বিজয়কুমার দাস ফ্লোকসংগীত
১-৫০ সেতার
১-৫০ পরমেশ্বর মাজিক : বাঁশী
১-৫০ শীলালি বন্দ্যোপাধ্যায় : লোকসংগীত
১-৫০ রমিলা ঠাকুর সেতার ও হিন্দী
১-১০ বিজয়কুমার চক্রবর্তী সেতার
১-১০ আধুনিক
১-১০ শীলালি বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসংগীত
১-৫০ কথা কিন্নাম : সেতার
১-০০ সমাপ্তি

WOOL ★ WOOL
for modern fashion and latest design
Y. O. WOOL & HOSIERY HALL
171/1/1A, Rash Behari Avenue, Calcutta-19
Ph. 46-8948
Y. O. WOOL HOUSE
148 Rash Behari Avenue, Calcutta-29
Ph. 47-7058

# কলকাতা

ক

## বিবিধগীতি ও আবহসঙ্গীত

পরিবেশন রীতি : আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পী

*

প্রথম অধিবেশন

১-১১ বন্দেমাতরম্
১-০০ সুপ্রভাত
১-০৫ সংবাদ-বিবরণী
১-২৫ চলচ্চিত্রের কথা : আলোচনা
১-৫০ সুরের সংসার
ইন্দ্রাণী সেন ও সমবেত শিল্পী
(সুরের ঐক্য, ছন্দের ঐক্য ও ভাবগত ঐক্য)
১-৫৯ শ্রোতব্যবস্থা
২-১১ আজ জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি
২-০০ ঈশারা : গল্প
২-১০ আবহবাণী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
২-১১ পঞ্চানন বসু : গল্প
২-২১ বাংলা সংবাদ
২-৫৯ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
২-৫০ আশা দোষাল
রবীন্দ্রসংগীত
৩-০০ দূরদর্শন বাস : লোকসংগীত
(শিলিগুড়ি : হিন্দী সংবাদ)
৩-১০ বন্দনা সেনগুপ্ত : আধুনিক
(শিলিগুড়ি : ৩-১০ মিঃ ইংরেজী সংবাদ; অনুষ্ঠান সম্পর্কে -)
৩-২৫ ফেলানো ছিঁড়ে : চিন্ময় চক্রবর্তী। অভিনয় বাস
৩-৫০ আজি অনুষ্ঠান প্রচারের সময়ই
(শিলিগুড়ি : সমাপ্তি)
৪-০০ আশা সংবাদ
৪-০৫ পূজা মিত্র : রবীন্দ্রসংগীত
৪-১৫ ইন্দ্রাণী সেন : আধুনিক
৪-৩০ সংবাদ বিচিত্রা
৪-৪৫ ছবি বোস : রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ আবহসঙ্গীত +
১০-০৫ আজকী ফটোগ্রাফ : খেয়াল
১০-৫৫ অনাদিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁশী
১১-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-০৫ রবীন্দ্রসংগীত +
(সূত্র: অনুষ্ঠান শুরু)
১-০০ কলকাতা পঞ্চাশ : বেতার ফিচার
১-৩০ বাংলা সংবাদ
১-৫০ সুরের সংসার
১-৩০ অনুষ্ঠান সমাচার : পরিচয়
২-০০ আধুনিক +
২-২৯ আবহবাণী
২-৩০ আভিজাত্যের বন্ধন
লোকসংগীত
২-৫০ বিকচের গান : বাঁশী
৩-৪০ ঈশারা : গল্প
৩-০০ দূরদর্শন বাস
-লোকসংগীত
৩-১০ অনুষ্ঠান সমাচার : পরিচয়
৩-২০ প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
৩-৩০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-১১ স্পোর্টস সমীক্ষণ
৬-১০ ঈশারা : গল্প
৬-০০ স্থানীয় খেলা ও আবহবাণী
৬-০৫ গাইডলাইন ফর অ্যাডাল্টস
৬-৫৫ আজকের খেলা সম্পর্কে
৬-১৫ কৃষিজগৎ আজ :
কৃষিবিদ ডক্টর বিভূতি বসুর সঙ্গে : আলোচনা;
সংবাদ; চিঠির উত্তর;
কৃষিজ বাজার দর;
আবহাওয়ার খবর
৭-২১ দূরদর্শন বাস : লোকসংগীত
৭-৩১ বাংলা সংবাদ
৭-৪১ সমীক্ষা
৭-১০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ আশা কবিতা
(আবহবাণী ও শিলিগুড়ি : ৮-১৫ মিঃ হিন্দী সংবাদ; ৮-২৫ মিঃ কলকাতা ৭-এর অনুষ্ঠান)
৮-৩০ সাময়িক প্রসঙ্গ/সমীক্ষা
৮-৫০ বন্দনা সেনগুপ্ত
আধুনিক ও গজল
৯-০০ মধু বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
৯-১৫ ঈশারা
৯-৩০ আভিজাত্যের বন্ধন
লোকসংগীত
৯-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ ঈশারা : গল্প
১০-০১ সমাপ্তি

## কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৩-৩৪ কলকাতা ৭-এর অনুষ্ঠান
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-০১ আভিজাত্যের বন্ধন
লোকসংগীত
৮-২০ বাংলা সংবাদ
৮-৩০ কলকাতা ৭-এর অনুষ্ঠান
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-০১ স্টীরিও অনুষ্ঠানমালার পাদ্মাবলীত
৯-১০ কলকাতা ৭-এর অনুষ্ঠান
৯-৪০ কিকচের গল্প : বাঁশী
৯-৫১ হিন্দী শিক্ষা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-১০ ইংরেজী সংবাদ
৮-২০ স্টীরিও অনুষ্ঠানমালার পাদ্মাবলীত
৮-৫০ কলকাতা ৭-এর অনুষ্ঠান
১-০০ সাপ্তাহিক সংবাদ
১-০১ নিউজ রিলেজ ইন ইংলিশ
১-১০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০১ ব্রডকাস্টিং অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক
১-০১ সাপ্তাহিক সংবাদ +
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ সাপ্তাহিক সংবাদ +
২-৫০ সন্ধ্যার পাতায় ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০১ স্থানীয় খেলা ও আবহবাণী
৬-১০ অনাদিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁশী
৬-৫০ পূজা মিত্র : রবীন্দ্রসংগীত
৬-৫০ পঞ্চানন বসু : গল্প
৬-১১ চলচ্চিত্রসঙ্গীত : আধুনিক +
৭-১৫ ঘোষিকাবাণী
৭-৫০ বিকচের গল্প : বাঁশী
৭-৫১ মধু বন্দ্যোপাধ্যায়
(গ্রামোফোনের গান
৭-৩০ ফায়ারী ফটোগ্রাফ : ট্রেলী
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০১ আশা দোষাল
রবীন্দ্রসংগীত
৮-১৫ খেলার সংবাদ বিচিত্রা (ইংরেজী)
৮-২৫ আজি অনুষ্ঠান প্রচারের সময়ই
৮-৫৫ হিন্দী সংবাদ
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-১৫ ঈশারা অনুষ্ঠান
৯-২৫ অনুষ্ঠান +
৯-৫০ পাপ্তাহিক সংবাদ +
১০-৫০ ঈশারা সংবাদীক্ষণ
অনুষ্ঠানের আলো -
১১-০০ আবহবাণী ও সমাপ্তি

## কলকাতা গ

বিশেষ আকাশী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-০০ মিঃ; ১০-১০ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিঃ

পূর্বাঞ্চলীয় প্রোগ্রামের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন ৫০৮-৪ মিঃ)

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ (৭-২৫ মিনিট প্রাদেশিক সংবাদের পুনঃপ্রচার)
৮-৩০ খেলাধুলা

অনুষ্ঠানী মুখোপাধ্যায় : আকাশবাণীর আধুনিক গীত এবং চলচ্চিত্রের শিল্পী

৮-৩০ অনুষ্ঠানী মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
৮-৫০ সুনীলকুমার বেরা
লোকসংগীত
১-০০ কলকাতা ৭-এর অনুষ্ঠান
১-০১ পূর্বাশা গান : আধুনিক
১-১১ অনাদিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঁশী
১-৩০ পূজা মিত্র : রবীন্দ্রসংগীত
১-৪০ সুনীলকুমার বেরা
লোকসংগীত
১-৫০ নাজিরা ফটোগ্রাফ : আধুনিক
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-০০ ইন্দ্রাণী সেন : আধুনিক
২-৪০ অনুষ্ঠান বাদ্যানুষ্ঠান : রবীন্দ্র
২-৫০ পূর্বাশা গান : নজরুলসংগীত
৩-০০ নাজিরা ফটোগ্রাফ : আধুনিক
৩-১০ খেলাধুলা
৩-২০ কৃষ্ণা বোস : রবীন্দ্রসংগীত
৩-৩০ বিকচের গান : বাঁশী
৩-৪০ নাজিরা ফটোগ্রাফ : আধুনিক
৩-৫০ সুনীলকুমার বেরা
লোকসংগীত
৪-০০ অনুষ্ঠানী মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
৪-১০ পঞ্চানন বসু : গল্প
৪-২০ ফায়ারী ফটোগ্রাফ : খেয়াল
৪-৫০ আজি অনুষ্ঠান প্রচারের সময়ই
৫-০০ সমাপ্তি

* সমস্ত-সংক্ষত + অনুষ্ঠানের ক্রমিক ‡ এই পর্ব সংবাদ

# কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আশপাশ

প্রদীপ সেন : অনুষ্ঠানপরিচালক ও ঘোষণাকারী

ক

প্রথম অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ৬-৩৫ | জাগরণী |
| ৬-০০ | সুপ্রভাত |
| ৬-০৫ | সংবাদশিরোনাম |
| ৬-২৫ | চায়ীভাইদের জন্যে । কথিকা |
| ৬-৩০ | সুস্বপ্ন সংগীত : কলাণী রায় । সেতার (ললিত যোগিয়া, ভৈরবী ও ঝিঁঝোটী) । (শিলিগুড়ি । কলকাতাকেন্দ্র: প্রত্যুষের সংগীত ।) |
| ৬-৫৫ | পাখোয়াজী |
| ৬-৩৫ | অনুষ্ঠান সূচী ও ঘোষণা |
| ৭-০০ | সংবাদ |
| ৭-১০ | আবহবাণী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী) |
| ৭-১৫ | আশা রায় : পল্লীগীতি |
| ৭-২৫ | বাংলা সংবাদ |
| ৭-৫০ | স্থানীয় সংবাদ (বাংলা) |
| ৭-৪০ | সংবাদ ঠাকুর ও সমাপিনী-সুর : রবীন্দ্রসংগীত |
| ৮-০০ | প্রভাতী : লোকগীতি (শিলিগুড়ি । হিন্দী সংবাদ) |
| ৮-১৫ | পরিচালক মনোনয়ন অনুষ্ঠান (শিলিগুড়ি । ৮-১০ মিঃ ইংরেজী সংবাদ; প্রত্যুষের সংগীত ।) |
| ৮-৫০ | ডি. ডি. ঘোষ : বেহালা (শিলিগুড়ি : সমাপ্তি) |
| ৯-০০ | বাংলা সংবাদ |
| ৯-০৫ | শিশুমহল মনোনয়ন অনুষ্ঠান |
| ৯-১৫ | গুরু সক্সেনা : অনুষ্ঠান |
| ৯-৩০ | ওয়াশিংটন থেকে : ইংরেজী |
| ৯-৫০ | অনুষ্ঠান সূচী ও ঘোষণা |
| ১০-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১০-০২ | অনুষ্ঠানসূচী । |
| ১০-০৫ | পরীক্ষা পাল । বেহাগ |
| ১০-৩০ | ওয়াশিংটন ডিসি । মনোনয়ন |
| ১১-০০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ১২-৩০ | বিকেল (রাজধানীর) । (শিলিগুড়ি । ১২-৩০ মিঃ ১২ মার্চের বিকেলী প্রসঙ্গে অনুষ্ঠান। |
| ১২-৩০ | অনুষ্ঠান । |
| ১-০০ | রবীন্দ্র বৈকালী বাঁ । বেহাগ (একক)। |
| ১-৩০ | বাংলা সংবাদ |
| ১-৩০ | সুস্বর সংগীত |
| ১-৫০ | রবীন্দ্রসংগীত : সাবিত্রীপ্রসন্ন: খাম । সুচন্দ্র ঠাকুর: কবিতা । বীণা ৮৫; এই বছরে রবীন্দ্রসদনে নেতা সুচরিতা ও পত্র-পত্রিকা । প্রভাত চৌধুরী |
| ২-২৫ | অনুষ্ঠানসূচী |
| ২-৩০ | বিদেশীদের জন্য |
| ২-৩০ | অনুষ্ঠান ঘোষণা । পরিচয় |
| ৩-০০ | শিশুমহল মনোনয়ন নজরুলগীতি |
| ৩-১০ | আজ বৈকাল । লোকগীতি |
| ৩-২০ | কৃষ্ণা ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত |
| ৩-৩০ | সমাপ্তি |

তৃতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ৫-১৫ | লেডীজ মার্কেট |
| ৫-৩০ | আশা রায় । পল্লীগীতি (শিলিগুড়ি ও আশপাশ) । ৫-১০ মিঃ সেনাবাহিনীর জন্য অনুষ্ঠান; অনুপম সংগীত ।; ৬টার ইংরেজী সংবাদ; ৬-০৫ মিঃ হিন্দী সংবাদ; শিলিগুড়ি । ৬-৫৫ মিঃ স্থানীয় ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি) |
| ৬-০০ | স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবাণী |
| ৬-০৩ | সাঁইত্রিশজনের জন্য অনুষ্ঠান |
| ৬-৫৩ | সমাপ্তির ঘোষণা নিয়েই অনুষ্ঠান । প্রত্যুষের গুরুগীতির চিত্রিতরূপ । কথিকা |
| ৬-৫০ | সংবাদের বাকী |
| ৬-৫৫ | আঞ্চলিকভাষাভাষীদের অনুষ্ঠান: সমস্যার বীজতলা তৈরী । অংশগ্রহণ: নাসিকা; তুলসী উইং; সৈনিক বাজার থেকে আমেরাওয়ার অবধ |
| ৭-২৩ | অমলকুমার বসু । লোকগীতি |
| ৭-৩৩ | বাংলা সংবাদ |
| ৭-৪৩ | আলোচনা |
| ৭-৫০ | স্থানীয় সংবাদ (বাংলা) |
| ৮-০০ | সন্ধ্যার আসর : বাংলা নাটক: কাহিনী । রবীন্দ্রনাথ: বেহালাবাদন ও আলোচনা । প্রীতম আঢ়ক |
| ৮-৫৫ | আগামীকাল প্রসঙ্গ/সমাপ্তি |
| ৯-০০ | ডি. ডি. ঘোষ । বেহালা |
| ৯-৩০ | আজকের প্রথম খবর । |
| ৯-৩০ | পরিচালক মনোনয়ন অনুষ্ঠান |
| ৯-৩০ | বৃত্তান্ত । পরিবেশনায় । অংশগ্রহণকারী সমূহ-শিল্পীকণ্ঠ । পরিচালনা: কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় |
| ১০-০০ | সংবাদ পরিক্রমা |
| ১০-০৫ | আশা রায়ের |
| ১০-১৫ | বেতার জগৎ বিচিত্রা |
| ১০-৩০ | অনুষ্ঠানের আজ । (রবীন্দ্রসংগীত) |
| ১১-০০ | আবহবাণী ও সমাপ্তি |

খ

প্রথম অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ৬-১১ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৬-০০ | হিন্দী সংবাদ |
| ৬-০১ | অমলকুমার বসু লোকগীতি |
| ৬-২০ | বাংলা সংবাদ |
| ৬-৩০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৭-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৭-০১ | অনুষ্ঠানসূচী । |
| ৭-১০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৭-৫০ | খবরাই বসু : বাঁশী |
| ৭-৫১ | হিন্দী শিক্ষা |
| ৮-০০ | হিন্দী সংবাদ |
| ৮-১০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৮-২০ | ঘোষণা । |
| ৮-৫০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৯-০০ | সংস্কৃত সংবাদ |
| ৯-০০ | নিউজ রোলের ইন ইংলিশ |
| ৯-১০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ১-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১-০১ | ওয়েদারটাইপ: ফর এভিয়েটর্স বিটিফক |
| ১-০১ | পল্লীগীতি সংগীত । |
| ১-৫১ | পল্লীগীতি সংগীত । |
| ২-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ২-১০ | পল্লীগীতি সংগীত । |
| ২-২০ | প্রথম পাঠের ইংরেজী সংবাদ |
| ৩-০০ | সমাপ্তি |

তৃতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ১-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১-০৫ | স্থানীয় ঘোষণা ও অনুষ্ঠানসূচী |
| ১-১০ | রাজধানী পাল । লোকগীতি |
| ১-২০ | কৃষ্ণচন্দ্রপাল দাস : হিন্দী |
| ১-৩০ | বিবিধিরা মনোনয়ন গীত ও চেক |
| ১-৪০ | সংবাদ ঠাকুর ও সমাপিনী-সুর : রবীন্দ্রসংগীত |
| ১-৪৩ | অনুষ্ঠানসূচী |
| ৭-২১ | বাণিজ্যসংবাদ |
| ৭-৩০ | অনুষ্ঠান ঘোষণা । পরিচয় |
| ৭-৩১ | পরিচয় পাল : বেহাগ |
| ৮-০০ | ইংরেজী সংবাদ (বেতারসূত্র) |
| ৮-০১ | হিন্দী সংবাদ |
| ৮-২১ | পরিচালনা মনোনয়ন অনুষ্ঠান |
| ৮-৫১ | আশা রায় : পল্লীগীতি |
| ৮-৫১ | হিন্দী সংবাদ |
| ৯-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৯-২১ | ইংরেজী অনুষ্ঠান |
| ৯-২১ | অনুষ্ঠানসূচী । |
| ৯-৩০ | ইংরেজী কথিকা |
| ৯-৫১ | ইংরেজী সংবাদপত্রের অনুষ্ঠানের আজ । |
| ১০-৩০ | রবীন্দ্র প্রসাদ : বেহাগ |
| ১১-০০ | আবহবাণী ও সমাপ্তি |

লীলাল সরকার : প্রযোজনাকারী অনুষ্ঠান ও বেতারনাট্যশিল্পী

কলকাতা খ

বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা ১-৩০ মিঃ, ১০-১১ মিঃ — ১২-৩০ মিঃ; অনুষ্ঠান ১৫-৫৫ ১১-১০ মিঃ

পূর্বাঞ্চলীয় প্রোগ্রামের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রথম অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ৮-২০ | বাংলা সংবাদ (৮-২১ মিনিটে ৪৬তম সংবাদে পুনরাবৃত্তি) |
| ৮-৫০ | সেতারাম |
| ৮-৫০ | প্রভাতী মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠান |
| ৮-৩০ | সময় বৈকাল : লোকগীতি |
| ৯-০০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৯-০১ | কৃষ্ণা ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত |
| ৯-১১ | পরিচয় পাল : সেতার |
| ৯-১০ | প্রভাতী মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠান |
| ৯-৫০ | অমলকুমার বসু : লোকগীতি |
| ১-১০ | খবরাই বসু : বাঁশী |
| ১০-১০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ২-১০ | কৃষ্ণা ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত |
| ২-৫০ | সময় বৈকাল । লোকগীতি |
| ২-১০ | প্রভাতী মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠান |
| ৫-০০ | ধীরেনলাল বিশ্ব : সমবেতী |
| ৫-১০ | কবিতা মেন । রবীন্দ্রসংগীত |
| ৫-৫০ | প্রথম সমাচার । অনুষ্ঠান |
| ৫-৩০ | সেতারাম |
| ৫-০০ | খবরাই বসু : বাঁশী |
| ৫-১০ | রমাপতি পাল : লোকগীতি |
| ৫-২০ | কৃষ্ণচন্দ্রপাল দাস : হিন্দী |
| ৫-৩০ | ডি. ডি. ঘোষ : বেহালা |
| ৬-০০ | সমাপ্তি |

*MANUFACTURERS OF :*
'Rex' Batteries & Battery Plates.
**DESHBANDHU MOTOR & ELECTRICAL WORKS**
115, Bidhan Sarani, Cal. 4
Gram: REXBATRY Phone: 55-1864

# কলকাতা

ক

## সিলেক্ট্রাড্রি ও আমরতলা

### বিশেষ প্রসারী অনুষ্ঠান

৭-০০ মঙ্গলধ্বনি : সুপ্রভাতম্ উপনাদক : রচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতকুমার মল্লিক : কণ্ঠে ও সেতারে : রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

৭-৩০ সমাপ্তি

### দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

১-১১ বন্দেমাতরম্

১-০০ সুপ্রভাত

১-০১ সংবাদ বিচিত্রা

১-২১ রেডিওগ্রামের আসর : কণ্ঠিকা

১-৩০ সুরের ঝরণা । সংগীতে : সেতার (বুদ্ধদেব, আসির হোসেন, টোড়ি ও বহুদূর সরে

১-৫১ বেলাবসান

১-১১ আজি হে : গীতিনাট্য

৭-০০ রবি অনুরাগে : রাগপ্রধান

৭-১০ আমরতলা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)

৭-১১ প্রবীর মজুমদার : আধুনিক

৭-২১ বাংলা সংবাদ

৭-৩১ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)

৭-৪০ ইবিরবীন্দ্র । রবীন্দ্রসংগীত

৮-০০ লোকগীতি

৮-১১ সুপ্রভাত চারী : আধুনিক (সিলেক্ট্রাড্রি । ৮-১৫ মিঃ ইংরেজী সংবাদ: আগরতলা সংবাদ ।

৮-২১ ছেলেদের আসর : শ্রীমতী মিত্রের সঙ্গে : রবীন্দ্রনাথের ছোটদের কবিতা : প্রসাদকুমার ভট্ট : সেতার (সিলেক্ট্রাড্রি : সমাপ্তি)

৯-০০ বাংলা সংবাদ

৯-০১ গীতা সুপ্রভ : রবীন্দ্রসংগীত

৯-১৫ প্রবীর মজুমদার : আধুনিক

৯-৩০ সেতার সংগীত বিচিত্রা

৯-৪১ রবীন্দ্রসংগীত

১০-০০ ইংরেজী সংবাদ

১০-০২ আকাশবাণী -

১০-০৫ আসর বসে । বেতার

১০-৫০ রেডিও স্টেশনারি : রাঁচী

১১-০০ সমাপ্তি

### দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

১২-৫০' শ্রবণ আকাশবাণী সংবাদ -

১-০০ ঘোর দেওয়ানী : রাঁচী (রিলেরী)

১-৫০ আজ্ঞা সংবাদ

১-৫০ সুরের সংবাদ

১-৫০ আজি হে । গীতিনাট্য

২-০০ রাগপ্রধান গান -

২-২৯ আকাশবাণী

২-৩০ হিন্দী সংবাদ

৩-০০ পুরাণ বেতার । বাংলা নাটক: ছলনা । কালীপদ চক্রবর্তী: পরিচালনা : প্রবীর মুখোপাধ্যায়

৩-৫০ সমাপ্তি

### তৃতীয় অনুষ্ঠান

৫-৫১ কণ্ঠসঙ্গীত আসর : ভবেন্দ্র চৌধুরী বেতার : কণ্ঠিকা : রবীন্দ্রসংগীত বেতার : বেতারের গল্প ও তার বিচার— বিষয় ৪৫ : কণ্ঠিকা : শ্রীমতী সেন

৬-১১ লেখাপড়া সাপ্তাহিক

৬-৩০ রবীন্দ্র সেন । শ্রুতিনাটিকা

৬-৩০ স্থানীয় সংবাদ ও আগরতলা

৬-৩১ সাঁওতালদের জন্য অনুষ্ঠান

৬-৩১ লোকগীতি

৬-৫০ কৃষক ও তার পরিবার

৬-৫০ আজি হে : গীতিনাট্য

৭-১১ ফরিদপুরের আসর : ঐতিহ্যের কথা; হারান সরকার সংগীতের সমীক্ষা; কণ্ঠিকা; আসরটি সম্পর্কে অনুষ্ঠান, চিঠির উত্তর; বিশেষ বাজার দর; আবহাওয়ার খবর

৭-২১ গীতিকুমার চক্রবর্তী শ্রদ্ধাঞ্জলী

৭-৩১ বাংলা সংবাদ

৭-৪১ সমীক্ষা

৭-১০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)

৮-০০ বিচিত্রা : বাংলা সুপ্রভ

৮-১১ সুপ্রভাত চারী : আধুনিক

সোনালী রঙ : কিশোরদের জন্যে নজরুলগীতি থেকে বাছা

৮-৫০ সাপ্তাহিক প্রসঙ্গ/আগরতলা

৮-৪৯ নয়া পরিকল্পনায় নতুন চিত্রমালা : বাংলা কণ্ঠিকা : ডঃ মিত্র চৌধুরী (সিলেক্ট্রাড্রি ও আগরতলা : হিন্দী সংবাদ)

১-০০ গীতা সুপ্রভ । রবীন্দ্রসংগীত

১-১৫ সংবাদ পরিক্রমা

১-৩০ আজি আকাশবাণী সংবাদ কলকাতা । ইংরেজিনবিশ চারী । বীণা, বিলেরী, আহমেদের । রবীন্দ্রসংগীত পরিচালনা : শ্রীমতী (হিন্দী ভাষে পুনঃপ্রচার)

১১-০০ আকাশবাণী ও সমাপ্তি

## কলকাতা খ

### প্রথম অনুষ্ঠান

৩-১৫ বন্দেমাতরম্ ক-এর অনুষ্ঠান

৩-০০ হিন্দী সংবাদ

৩-০১ গীতিকুমার চক্রবর্তী লোকগীতি

১-২০ বাংলা সংবাদ

১-৩০ বন্দেমাতরম্ ক-এর অনুষ্ঠান

৭-০০ ইংরেজী সংবাদ

৭-০১ এয়ারমেল ইনটু ইংলিশ (ইংরেজী)

৭-১০ বন্দেমাতরম্ ক-এর অনুষ্ঠান

৭-৪০ প্রথম পত্র : শরীর

৭-৪৫ সংস্কৃত শিক্ষা

৮-০০ হিন্দী সংবাদ

৮-১০ ইংরেজী সংবাদ

৮-২০ রবীন্দ্র সেন । শ্রুতিনাটিকা

৮-৩০ বন্দেমাতরম্ ক-এর অনুষ্ঠান

১-০০ সংস্কৃত সংবাদ

১-০৫ মিউজ ফ্রোজেন ইন হিস্ট্রি

১-১০ সমাপ্তি

### দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

১-০০ ইংরেজী সংবাদ

১-০৫ হাইলাইটস্ অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক

১-০৮ গানগুলি সংগীত ।

২-০০ ইংরেজী সংবাদ

২-১০ গানগুলি সংগীত ।

২-৩০ রবীন্দ্র সংগীতে ইংরেজী সংবাদ

৩-০০ সমাপ্তি

### তৃতীয় অনুষ্ঠান

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ

৬-০৫ স্থানীয় সংবাদ ও আগরতলা

৬-১০ আজ্ঞা রাম । বেতার

৬-৩০ সুপ্রভাত চারী । আধুনিক

৬-৪০ রবি অনুরাগে । রাগপ্রধান

৬-৫৫ আকাশবাণী । হিন্দী অনুষ্ঠান: আধুনিক ।

৭-১৫ গানিকলকাতা

৭-৩০ রবীন্দ্র সেন । শ্রুতিনাটিকা

৭-৫৫ বেতু স্টেশনারি । রাঁচী

৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (বেতারভাষ্য)

৮-০৫ গীতা সুপ্রভ । রবীন্দ্রসংগীত

৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা

৮-২৫ লোকগীতি ।

৮-৫০ রবি অনুরাগে । রাগপ্রধান

৮-৫০ হিন্দী সংবাদ

৯-০০ ইংরেজী সংবাদ

৯-১৫ উচ্চাঙ্গ অনুষ্ঠান

৯-২৫ আকাশবাণী -

৯-৩০ ইংরেজী কণিকা

৯-৪৫ গানগুলি সংগীত

১০-০০ লোকগীতি

১০-৪০ আমির আজী নজরুলগীতি

১০-৫০ রবিরশ্মি । রবীন্দ্রসংগীত

১১-০০ আকাশবাণী ও সমাপ্তি

## কলকাতা গ

### বিশেষ আসরী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—১-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিনিট

পূর্বাঞ্চলীয় বেতারের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

দীপালি বিশ্বাস: আকাশবাণী কলকাতার লোকগীতি শিল্পী

### প্রথম অনুষ্ঠান

৮-১০ বাংলা সংবাদ (৭-২৫ মিনিট স্থানীয় সংবাদের পুনঃপ্রচার)

৮-৫০ বেলাবসান

৮-৫০ আজ্ঞা চক্রবর্তী : আধুনিক

৮-৫০ রবীন্দ্র সেন । শ্রুতিনাটিকা

১-০০ বন্দেমাতরম্ ক-এর অনুষ্ঠান

১-০৫ কল্যাণী মুখোপাধ্যায় লোকগীতি

১-১৫ বাংলা গান : ঠুংরী

১-৫০ প্রথম পত্র । শরীর

১-৪০ আজ্ঞা চক্রবর্তী : আধুনিক

২-০০ কল্যাণী মুখোপাধ্যায় লোকগীতি

১০-০০ সমাপ্তি

### দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

২-৫০ প্রথম পত্র । শরীর

২-৪০ আধুনিক

২-৫০ কল্যাণী মুখোপাধ্যায় লোকগীতি

৩-০০ রবীন্দ্র সেন । শ্রুতিনাটিকা

৩-১০ বেলাবসান

৩-২০ রাগপ্রধানগীতি

৩-৩০ লোকগীতি

৩-৪০ রবীন্দ্রসংগীত

৩-৫০ আজ্ঞা চক্রবর্তী । আধুনিক

৪-০০ আজি হে । গীতিনাট্য

৪-১০ গীতিকুমার চক্রবর্তী লোকগীতি

৪-২০ রবীন্দ্র গান । রাগপ্রধানগীতি

৪-৩০ প্রসাদকুমার ভট্ট : বেতার

৪-৩০ সমাপ্তি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
(শ্রীম কথিত)
সাধারণ ৩০ টাকা, কাপড় ৪৫ টাকা
(প্রতি সেট) (প্রতি সেট)
কথামৃত ভবন
১৩/১, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা-৬

* নয়া-নজরুল + রাগপ্রধান বেতার । এই গল্প সংবাদ

# কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আগরতলা

•

প্রথম অনুষ্ঠান

৯·০১ বন্দেমাতরম্
৯·০৩ সুপ্রভাত
৯·০৩ বাণীবিতান
৯·২৭ চার্টার্ড ব্যাঙ্কের বার্তা : কথিকা
৯·৩০ সুরের সন্ধানে :
প্রবাসীর ভূমিকা : বেহার (মুজফ্ফরপুর, চম্পারণ, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর)
৯·৫৩ বেতারবার্তা
১০·১০ লক্ষ্মীকান্ত ঝাঁপাধ্যায়ের গান
১০·৩০ বৃক্ষরোপণ : আলোচনা : অংশগ্রহণ করবেন : শ্রীমতী [illegible], শ্রীঅমিয়ভূষণ [illegible], শ্রীসুধাংশুশেখর চৌধুরী
১০·৫০ আবহবার্তা ও কৃষিসংবাদ
১১·০০ রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসঙ্গীত
১১·১২ বাংলা সংবাদ
১১·৩৩ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
১১·৪০ রবীন্দ্রসঙ্গীত
১২·০০ ক্ষণিকা : লোকগীতি
[illegible] : [illegible]
১২·১৩ লোকগীতি আলিম্পন
১২·১৫ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
লোকসঙ্গীত
১·০০ স্থানীয় খেলা ও আবহবার্তা
১·০৩ মহিলামহলের জন্য অনুষ্ঠান
১·৫১ প্রীতিদান :
গার্হস্থ্যবীমার প্রসঙ্গে :
স্থানীয় অভিজ্ঞতার :
আলোচনা : ঐ-ঐ-বিশেষজ্ঞ :
কথিকা; অংশগ্রহণ ও পরিচালনা
[illegible]
২·১১ কৃষিকথার আসর :
বেহারের কৃষক সুহৃদগণ :
বিষয় : বৈজ্ঞানিকের চক্ষে
ক্ষেত খামারের সমস্যা, চিঠিপত্র
উত্তর, আবহাওয়ার খবর
২·২৯ বুলবুলী ক্লেজ
২·৩১ বাংলা সংবাদ
২·৫৩ সমীক্ষা
২·৫৬ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৩·০০ বাছাই বিতরণ
৩·২১ এ যুগের গান :
বাংলা : [illegible] [illegible]
সুরে : অমিয় [illegible],
হিন্দী : [illegible]
৩·৫০ ভজনী বাঈ : লোকগীতি
৩·৫৩ পরবর্তী প্রোগ্রাম : রবীন্দ্রসঙ্গীত
৩·৫৪ রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসঙ্গীত
(শিলিগুড়ি ও আগরতলা : হিন্দী সংবাদ)
৪·০০ বাছাই বাঈ : সরোজ
৪·৩০ রাজাবাবুর গান
১০·০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০·০৫ বাংলা সংবাদ
১০·১৫ সংবাদ বিচিত্রা

অমানুষোহন সিংহ : লোকগীতি
আসনী ও রামপ্রসাদী

[illegible], [illegible] :
[illegible] ১৫

১·২০ লক্ষ্মীকান্ত ঝাঁপাধ্যায়ের
গান
১·৩০ সমাপ্তি

তৃতীয় অনুষ্ঠান

৬·১৫ বন্দেমাতরম্ আসর :
এবার একটি নতুন গান শিখি
গানের বেতার আসর
লোকগীতির সংগ্রহ ও
৬·২৩ লোকগীতি আলিম্পন
৬·২৫ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
লোকগীতি
৬·৩০ স্থানীয় খেলা ও আবহবার্তা
৬·৩৪ মহিলামহলের জন্য অনুষ্ঠান
৬·৫১ প্রীতিদান :
গার্হস্থ্যবীমার প্রসঙ্গে :
স্থানীয় অভিজ্ঞতার :
আলোচনা; ঐ-ঐ-বিশেষজ্ঞ :
কথিকা; অংশগ্রহণ ও পরিচালনা
[illegible]
৭·১১ কৃষিকথার আসর :
বেহারের কৃষক সুহৃদগণ :
বিষয় : বৈজ্ঞানিকের চক্ষে
ক্ষেত খামারের সমস্যা, চিঠিপত্র
উত্তর, আবহাওয়ার খবর
৭·২৯ বুলবুলী ক্লেজ
৭·৩১ বাংলা সংবাদ
৭·৫৩ সমীক্ষা
৭·৫৬ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮·০০ বাছাই বিতরণ
৮·২১ এ যুগের গান :
বাংলা : [illegible] [illegible]
সুরে : অমিয় [illegible],
হিন্দী : [illegible]
৮·৫০ ভজনী বাঈ : লোকগীতি
৮·৫৩ পরবর্তী প্রোগ্রাম : রবীন্দ্রসঙ্গীত
৮·৫৪ রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসঙ্গীত
(শিলিগুড়ি ও আগরতলা : হিন্দী সংবাদ)
৯·০০ বাছাই বাঈ : সরোজ
৯·৩০ রাজাবাবুর গান
১০·০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০·০৫ বাংলা সংবাদ
১০·১৫ সংবাদ বিচিত্রা

১০·২০ পরবর্তী প্রোগ্রাম : রবীন্দ্রসঙ্গীত
অংশগ্রহণ : সন্ধ্যা
১০·৫০ রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসঙ্গীত
১১·১০ রবীন্দ্রসঙ্গীত
১১·৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অনুষ্ঠান

৭·১১ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭·৩০ হিন্দী সংবাদ
৭·৩১ কিষানদের চট্টোপাধ্যায়
লোকগীতি
৭·৪৩ বাংলা সংবাদ
৭·৫৩ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৮·১৩ ইংরেজী সংবাদ
৮·১৫ লীলা দেবী : গল্পগানগীতি
৮·২৩ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৮·৫৩ লীলা দেবী : গল্পগানগীতি
৯·১৩ সংস্কৃত শিক্ষা
৯·৩০ হিন্দী সংবাদ
৯·৩৩ ইংরেজী সংবাদ
৯·৪৩ রবীন্দ্র অনুষ্ঠান : বাংলা
৯·৫৩ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
১০·০৩ সংস্কৃত সংবাদ
১০·১৩ নিউজ রেলের ঐ ঐ হিন্দি
১০·২৩ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

১২·৫৩ কলিং অল ইয়ংস্টার্স
১·০৩ ইংরেজী সংবাদ
১·০৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক
১·৩৩ মিউজিকাল কাপ্ল বক্স :
২·০০ ইংরেজী সংবাদ
২·১৩ গানগুলি সবাই :
২·৩০ রবার্ট বার্নসের ইংরেজী সংবাদ
২·৩৩ সমাপ্তি

তৃতীয় অনুষ্ঠান

৫·০০ ইংরেজী সংবাদ
৫·০৩ স্থানীয় খেলা ও আবহবার্তা
৫·১৩ লীলা মজুমদার
৫·২৩ রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়
লোকগীতি
৫·৩৩ পরবর্তী প্রোগ্রাম
রবীন্দ্রসঙ্গীত
৫·৩৪ রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসঙ্গীত
৫·৪৩ রাজাবাবুর গান
৫·৪৬ লীলা দেবী
৫·৫৩ ভজনী বাঈ
৬·০৩ ইংরেজী সংবাদ
৬·০৫ লীলা মজুমদার
৬·২৩ পরবর্তী প্রোগ্রাম : রবীন্দ্রসঙ্গীত
৬·২৪ রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসঙ্গীত
৬·৪৩ বাংলা সংবাদ
৬·৫৩ হিন্দী সংবাদ
৭·০৩ ইংরেজী সংবাদ
৭·১৩ ঐতিহ্য অনুষ্ঠান
৭·২৩ কথকসমরেন্দ্র
৭·৫৩ খবর শুনবে
৮·০০ শাস্ত্রীয় সংগীত
৮·৫৩ সুধেন্দু ঘোষাল : বেহার
৯·০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

[illegible] ১২·৫০ মিঃ, ১·০৩ মিঃ
১২·৩০ মিঃ, ১·০৩ মিঃ
১১·১০ মিঃ

পূর্বাঞ্চলীয় প্রোগ্রামের ৯·৩০
বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রথম অনুষ্ঠান

৯·২০ বাংলা সংবাদ [illegible]
[illegible] [illegible]
৯·৩৫ বেতারবার্তা
৯·৩৬ সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রেকর্ডে
৯·৫৩ রবীন্দ্র সুধা
রবীন্দ্রসঙ্গীতে
১০·০০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
১০·৩০ রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুষ্ঠান
১০·৫৩ বেতারবার্তা
১০·৫৪ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

১১·০৩ রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুষ্ঠান
১১·৩৩ সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রেকর্ডে
১১·৫৩ রবীন্দ্র সুধা
রবীন্দ্রসঙ্গীতে
১২·১৩ ঐতিহ্য অনুষ্ঠান
১২·৩৩ বেতারবার্তা
১২·৩৪ সমাপ্তি

তৃতীয় অনুষ্ঠান

৫·১৩ সুধেন্দু ঘোষাল : বেহার
৫·৩৩ ইংরেজী সংবাদ (বেতারবার্তা)
৫·৩৪ রবী দত্ত : শ্রুতিসঙ্গীতে
৫·৫৩ লীলা দেবী : গল্পগানগীতি
অনুষ্ঠান
৬·২১ প্রবোধ মুখোপাধ্যায় : বাঁশী
৬·২৩ রবীন্দ্রসঙ্গীত
৬·৫৩ হিন্দী সংবাদ
৭·০৩ ইংরেজী সংবাদ
৭·১৩ ঐতিহ্য অনুষ্ঠান
৭·২৩ কথকসমরেন্দ্র
৭·৫৩ খবর শুনবে
৮·০০ শাস্ত্রীয় সংগীত
৮·৫৩ সুধেন্দু ঘোষাল : বেহার
৯·০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

# কলকাতা

## ক

### শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি

•

**প্রথম অধিবেশন**

| | |
|---|---|
| ৬·১৫ | বন্দেমাতরম্ |
| ৬·২০ | সুপ্রভাত |
| ৬·৩০ | মঙ্গলারতি |
| ৬·৪৫ | ছড়ার আসরে বসন্ত : অমিতা |
| ৬·৫০ | সুপ্রভ সঙ্গীত : |
| | [illegible] |
| ৭·০০ | বেতারবার্তা |
| ৭·০৫ | অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় |
| | [illegible] |
| | কথিকা : ভজন |
| | [illegible] |
| | ১·৫০ [illegible] ১·৫৫ |
| | চলচ্চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে |
| | সঙ্গীত : বাংলা ও হিন্দী |
| ৭·৫৫ | শচীন চট্টোপাধ্যায় |
| | ১·৫০ |
| ৮·১৫ | বাংলা সংবাদ |
| ৮·২৫ | স্থানীয় সংবাদ (বাংলা) |
| ৮·৩০ | রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৮·৪৫ | কথিকা : নজরুলগীতি |
| ৮·৫৫ | সংবাদ সমীক্ষা |
| ৯·০১ | দোলা দোল : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৯·১৫ | হিন্দী সংবাদ |
| ৯·২৫ | চলচ্চিত্রগান |
| ৯·৩০ | বেলা বয়ে : বেতার |
| ৯·৪৫ | রফিক খাঁ : সাহেবগঞ্জ |
| ৯·৫৫ | সমাপ্তি |

**দ্বিতীয় অধিবেশন**

| | |
|---|---|
| ১২·০০ | রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| | [illegible] |
| ১২·১৫ | নজরুলগীতি • |
| ১২·৩০ | মিঠেরা দেবী |
| | [illegible] |
| | ও টপ্পা বিশেষজ্ঞ |
| | গীতি ও ঠুংরী |
| ১·৫০ | বাংলা সংবাদ |
| ১·৫৫ | আঞ্চলিক সঙ্গীত |
| ১·৩০ | মঞ্জিলোগাস : |
| | [illegible] : |
| | সুরবাণী [illegible] : |
| | কথিকা : শিল্পী বেতার, |
| | সঙ্গীত আকাদেমি ও |
| | সম্মেলন : আলোচনা : |
| | শিল্পী মহ; শিল্পের সমিতি |
| | শাসন করুন যেন শত্রু কিংবা |
| | শিল্পিজন না কিংবা : সুপ্রিয়া |
| | মুখোপাধ্যায় |
| ২·২৬ | আবহবার্তা |
| ২·৩০ | আঞ্চলিক • |

চিত্রা সেনগুপ্ত : [illegible]
[illegible]

| | |
|---|---|
| ২·৫৯ | সমাপ্তি • |
| ৩·০০ | অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় |
| | [illegible] |
| ৩·০৫ | জন্মদিনের জলসা • |
| ৩·৫৫ | সমাপ্তি |

**তৃতীয় অধিবেশন**

| | |
|---|---|
| ৫·১৫ | ফোকাস সাউন্ড |
| ৫·২০ | শচীন চট্টোপাধ্যায় |
| | [illegible] |
| ৫·৫০ | স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা |
| ৫·৫৩ | অভিজ্ঞানের জন্ম জন্মদিন |
| ৬·১৩ | ভজনা : |
| | [illegible] ও শ্রী Sinha |
| ৬·১৯ | চলচ্চিত্রের জগৎ : |
| | [illegible] |
| | [illegible] : চলচ্চিত্র, |
| | [illegible] |
| | [illegible] : |
| | [illegible], চিত্রে উত্তর, |
| | [illegible] |
| | [illegible] |
| ৬·২৯ | কার্তিকচন্দ্র রায়কবী |
| | [illegible] |
| | [illegible] : [illegible] |
| ৬·৫৯ | বাংলা সংবাদ |
| ৭·১৯ | সমাপ্তি |
| ৭·২০ | স্থানীয় সংবাদ (বাংলা) |
| ৭·৩০ | সুজয় মুখার্জি অর্কেস্ট্রা : |
| | [illegible] : |
| | [illegible] [illegible] |
| | [illegible] : [illegible] • |
| | ৮·০১ থেকে কলকাতা ৬·৫৫ |
| | [illegible] |
| ৮·১৫ | কথিকা : |
| | [illegible] • |
| ৮·৫০ | বার্ষিক পুরস্কার/সংগীত |
| ৮·৫১ | সভার অধিবেশনের |
| | [illegible] |
| ৯·০০ | মুকুল মার্চ খাঁ : বেতার |
| ৯·১০ | জন্মদিনের জলসা • |
| | [illegible] |
| ১০·০০ | সংবাদ পরিক্রমা |
| ১০·০৫ | বাংলা সংবাদ |
| ১০·১৫ | কীর্তন |
| ১০·৫০ | আঞ্চলিক |
| ১০·৫০ | সোকগীতি |
| ১০·৫০ | রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ১১·০০ | আবহবার্তা ও সমাপ্তি |

**কলকাতা খ**

**প্রথম অধিবেশন**

| | |
|---|---|
| ১·১১ | কলকাতা ক-এর অনুরূপ |
| ১·১৩ | হিন্দী সংবাদ |
| ১·১৯ | কার্তিকচন্দ্র রায়কবী |
| | [illegible] |
| ১·২৯ | বাংলা সংবাদ |
| ১·৩০ | কলকাতা ক-এর অনুরূপ |
| ৭·০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৭·০৩ | সোভিয়েত ফিল্ম : গীতার |
| ৭·২০ | কলকাতা ক-এর অনুরূপ |
| ৮·৩০ | প্রবাসবন্ধুরা • |
| ৮·৩১ | হিন্দী শিক্ষা |
| ৮·৫০ | হিন্দী সংবাদ |
| ৮·৫৩ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৮·৫৯ | বার্ষিক প্রতিযোগিতার |
| | [illegible] |
| ৯·৫০ | কলকাতা ক-এর অনুরূপ |
| ১০·০০ | সংস্কৃত সংবাদ |
| ১০·০১ | বিটিশ লেখার ইন ইন্ডিয়া |
| ১০·১০ | সমাপ্তি |

**দ্বিতীয় অধিবেশন**

| | |
|---|---|
| ১·০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১·০১ | ব্রাইলাইটিং অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক |
| ১·১৫ | সাপ্তাহিক সংবাদ • |
| ১·৩০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১·৩৩ | সাপ্তাহিক সংবাদ • |
| ১·৫১ | সন্ধ্যা আঁধারে ইংরেজী সংবাদ |
| ৫·০০ | সমাপ্তি |

**তৃতীয় অধিবেশন**

| | |
|---|---|
| ৯·০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৯·০১ | স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইংরেজী) |
| ৯·১০ | বাসন ঘাইন [illegible] |
| ১·২০ | রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ১·৫১ | মুকুল খাঁ : সাহেবগঞ্জ |
| ১·৫৩ | মঞ্জুলা-অমলা |
| ৭·১৩ | বার্ষিকবার্তা |
| ৭·৫০ | অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় [illegible] |
| ৭·৫১ | বেলা বয়ে : বেতার |
| ৮·০০ | ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলো) |
| ৮·০৩ | মঞ্জুলা দত্ত : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৮·১১ | সংবাদ সমীক্ষা (খেলাধুলো) |
| ৮·২১ | ভজন • |
| ৮·৫১ | হিন্দী সংবাদ [illegible] |
| ৮·৫৩ | হিন্দী সংবাদ |
| ১·০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১·১৯ | উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত |
| ১·২১ | প্রবাসবন্ধুরা • |
| ১·৫০ | ইংরেজী কবিতা |
| ১·৫৯ | আবহবার্তা ও সমাপ্তি |
| ১০·০০ | সাপ্তাহিক সংবাদ • |
| ১০·৩০ | স্থানীয় সংবাদ/বাংলার আলোচনা |
| ১১·০০ | আবহবার্তা ও সমাপ্তি |

**কলকাতা গ**

**দ্বিতীয় আকাশ অনুষ্ঠান**

সকাল ৭টা—১·৩০ মিঃ ১০·১৫ মিঃ—১১·৩০ মিনিট; দুপুর ২টা—রাত ১১·১৫ মিনিট

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

শিউলি চট্টোপাধ্যায় : [illegible]
কলকাতার আধুনিক গানের শিল্পী

**প্রথম অধিবেশন**

| | |
|---|---|
| ৮·৩০ | প্রেমধ্বনি |
| ৮·৫০ | সোভিয়েত ফিল্ম : গীতার |
| ৯·১০ | মঞ্জুলা দত্ত : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৯·৩০ | কলকাতা ক-এর অনুরূপ |
| ১·০১ | শচীন দেব : আধুনিক |
| ১·১১ | মঞ্জুর খাঁ : সাহেবগঞ্জ |
| ১·৩০ | রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ১·৫০ | শাসন পাইন : লোকগীতি |
| ১·৫৩ | ইন্দিরা আঞ্চলিক [illegible] |
| ১০·০০ | সমাপ্তি |

**দ্বিতীয় অধিবেশন**

| | |
|---|---|
| ২·৩০ | শচীন দেব : লোকগীতি |
| ২·৫০ | সোভিয়েত ফিল্ম : গীতার |
| ৩·১০ | রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৩·৩০ | কলকাতা ক-এর অনুরূপ |
| ৩·৩০ | সোলা দোল : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৩·৫০ | অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় [illegible] |
| ৪·১০ | কার্তিকচন্দ্র রায়কবী |
| | [illegible] |
| ৪·৩০ | শচীন দেব : আধুনিক |
| ৪·৫০ | প্রেমধ্বনি |
| ৫·২০ | ইন্দিরা আঞ্চলিক [illegible] |
| ৫·৩০ | মঞ্জুলা দত্ত : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৫·৫০ | মুকুল মার্চ খাঁ : বেতার |
| ৬·০০ | সমাপ্তি |

মেসিনে প্রস্তুত
সুস্বাদু ও পুষ্টিকর
পাঁউরুটি
শ্রীরামকৃষ্ণ বেকারী
টালিগঞ্জ-কলিকাতা ৩৩
ফোন: ৪৬-৪৩৫৭

# কলকাতা

ক

## শিলিগুড়ি ও আশপাশ

শুভাশিস পালিত : গানটিকে আমরা নতুন ও প্রাণবন্ত করে পাব

খ

প্রথম অধিবেশন

১-১৫ অনুষ্ঠানসূচী
১-০০ শুভারম্ভ
১-০১ মঙ্গলধ্বনি
১-২৫ চলচ্চিত্রগীতির ঝলক : কণিকা
১-৩০ সুমন মজুমদার :
রাজস্থান ফোকে : সেতার, তবলা, হারমোনিয়াম ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে। শিলিগুড়ি। অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করবেন।
১-৫১ ঘোষণা
১-৩৩ শঙ্করকুমার চৌধুরী : বাঁশীতে
৭-০০ রবীন্দ্র সঙ্গীত। শিল্পী : অনিমা ভট্টাচার্য
৭-১০ আবহাওয়া ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
৭-১৫ বাণী ঘোষ : আধুনিক
৭-২১ বাংলা সংবাদ
৭-৩১ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৭-৫০ সুবিনয় রায় : রবীন্দ্রসঙ্গীত
৮-০০ বীণা মজুমদার : লোকগীতি
৮-১৫ প্রসাদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক
৮-২৫ ছোটদের আসর
বক্তব্য : জোছনার ঘর
৮-৫০ সুধাময় মুখোপাধ্যায় বাঁশী
শিলিগুড়ি : সম্প্রচার
৯-০০ বাংলা সংবাদ
৯-০৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত
৯-১৫ বাণী ঘোষ : আধুনিক
৯-৩০ বিচিত্রা (বাংলা খবর)
৯-৪৩ আবহ সঙ্গীত : রবীন্দ্রসঙ্গীত
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ অনুষ্ঠানসূচী
১০-০৪ বীণা মজুমদার : সেতার
১০-০৪ সেবাব্রতী আজি : সেতার
১১-০০ সমাপ্তি

১২-০০ রবীন্দ্রসঙ্গীত
(রেকর্ডে)
১২-৪০ আধুনিক
১-০০ জাতীয় বা। সংবাদ
(রেকর্ডে প্রচারিত)
১-৩০ বাংলা সংবাদ
১-৫১ সুমন মজুমদার
১-৫০ শঙ্করকুমার চৌধুরী
১-৫০ শঙ্করকুমার চৌধুরী
২-০০ রজনীগীতি
২-৩০ সমাপ্তি

বৃহস্পতি অধিবেশন

৫-১১ স্পোর্টস আওয়ার
৭-১০ কথা বলু : লোকগীতি
৮-০০ স্থানীয় খেলা ও আবহাওয়া
৮-০১ মাঝারিদের জন্য অনুষ্ঠান
(রচনা ও সংগীত)
৮-৩১ ছোটদের আসর :
প্রসাদের কলকাতা। কবিতা, সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা : বক্তব্য : নিবেদন বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল চক্রবর্তী : কবিতা : একলব্য বন্দুক, পুতুলের বাড়ি বেজেছে ঘন্টা। কবিতা
৯-১১ শরদিন্দুবন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠান : ১৯৫ সালের ডায়েরি থেকে কিছু অংশের : অনুষ্ঠানে নলনকথা; প্রসঙ্গ উত্তর, দৈনিক বসুমতী পত্র, প্রবাসীতে প্রকাশ
৯-২১ উৎপল চক্রবর্তী : বাংলা কবিতা
৯-৩১ বাংলা সংবাদ
৯-৫৩ সমাপ্তি
৯-৫৩ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৯-০০ একক শিল্পীদের :
রবীন্দ্রসঙ্গীত
৯-১৯ আবহ সঙ্গীত : রবীন্দ্রসঙ্গীত
৯-৩০ সাপ্তাহিক প্রসঙ্গ/সংগীত
৯-৫৩ ইসমাইল মজুমদার
আধুনিক
(শিলিগুড়ি ও আশপাশ : হিন্দী সংবাদ)
১০-০০ প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁশী
১০-১১ সংবাদ পরিক্রমা
১০-২০ বাংলা সংবাদ
১০-৫০ বীণা মজুমদার
লোকগীতি
(শিলিগুড়ি ও আশপাশ : ১০-৫০ মিঃ অধিক ঘনশ্যাম বসাকের বক্তব্য, ১০-৫৯ মিঃ সমাপ্তি)
১০-৪০ সুবিনয় রায় : রবীন্দ্রসঙ্গীত
১০-৫০ বাণী ঘোষ : আধুনিক
১০-০০ ফ্রান্সিসকান মিশনারিজ কনভেন্ট বীণা মজুমদারের : কনসার্টে
১১-০০ আবহাওয়া ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৩-৩৪ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৩-০০ হিন্দী সংবাদ
১-০১ বন্দনা মজুমদার : লোকগীতি
১-২০ বন্দনা সংবাদ
১-৫০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-০৫ স্বপনকুমার গুপ্ত : গীতিকা
২-১০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
২-৫০ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের লোকসঙ্গীত
২-৫১ হিন্দী খবর
৩-০০ হিন্দী সংবাদ
৩-২০ ইংরেজী সংবাদ
৩-৩০ বন্দনা মজুমদার : উদ্ভব
৩-৫০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৪-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৪-০১ মিউজিক মেকার্স অব ইন্ডিয়া : ১ : ১০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০১ হাইলাইটস্ অব এডেনটার সিরিজ

অরুণকুমার মৈত্র : রবীন্দ্রসংগীত ও অতুলপ্রসাদের গান

১-০১ পাঞ্চালক সংগীত
১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-১০ পাঞ্চালক সংগীত
১-১৫ কলকাতা কেন্দ্রের ইংরেজী সংবাদ
১-০০ সমাপ্তি

বৃহস্পতি অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০১ স্থানীয় খেলা ও আবহাওয়া
১-১০ রজনীকান্ত সেন
আধুনিক
১-১০ সৌমিত্রকান্তি আঢ্য : সেতার
১-৩১ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের
লোকসঙ্গীত
১-৩১ রজনীকান্ত সেন
১-১৭ রজনীকান্তগীতি :
হিন্দী অনুষ্ঠান; আধুনিক
৭-১১ বাণীকুমারী
৭-৩০ ভাষণ
৭-৩১ প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁশী
৭-৩০ বন্দু চট্টোপাধ্যায় : তবলা
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (বেতারশ্রুতি)
৮-০১ বন্দনা বন্দু। লোকগীতি
৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা
৮-২১ গজল
৮-৩১ বন্দু চট্টোপাধ্যায় : তবলা
৮-৫১ হিন্দী সংবাদ
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-১১ উৎপল মজুমদার
১-২১ অনুষ্ঠানসূচী
১-৩০ জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে ভাষণ
১-৫১ অনুষ্ঠানসূচী
১০-০০ পাঞ্চালক সংগীত
১০-৩০ বীণা মজুমদার
রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর
১০-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
১০-৫০ আবহ সঙ্গীত : রাজস্থান
১১-০০ আবহাওয়া ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

দ্বিতীয় অধিবেশন মধ্যম তরঙ্গে

১৯৫ মিঃ—১-৩০ মিঃ, ১০-১৩ মিঃ ১২-৩০ মিঃ, ৮-৩৫ মিঃ ১১-১০ মিঃ)

পূর্বাঞ্চলীয় ছোটদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন
১৩৮ মিঃ)

প্রথম অধিবেশন

৮-১০ বন্দনা সংবাদ ৮-২১ মিঃ পর্যন্ত সংবাদ অনুবাদ
৮-৫ বেতারশ্রুতি
৮-১০ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের লোকসঙ্গীত
৮-১০ আমরা কলকাতার বেতারকেন্দ্রে
১-০০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
১-০১ স্বপনকুমার গুপ্ত : গীতিকা
১-১১ পুতুলের বেলা : খেলা
১-১০ আমরা কলকাতার বেতারকেন্দ্রে
১-১০ ছড়ার ছন্দে : গীত
১-১০ খেলা বন্দ্যোপাধ্যায় বেতারকেন্দ্রে
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ খেলা বন্দ্যোপাধ্যায় বেতারকেন্দ্রে
১-০০ ছড়ার ছন্দে : গীত
১-১ স্বপনকুমার গুপ্ত : গীতিকা
১-১০ লক্ষ্মীকান্ত
১-১ খেলা বন্দ্যোপাধ্যায় বেতারকেন্দ্রে
১-১০ ছড়ার ছন্দে : গীত
১-১০ আমরা কলকাতার বেতারকেন্দ্রে
১০-০০ গল্পদাদা সংগীত
১০-১০ রীতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানসূচী
১০-১০ লক্ষ্মীকান্ত
১০-১০ আবহ সঙ্গীত : রাজস্থান
১১-০০ আবহাওয়া ও সমাপ্তি


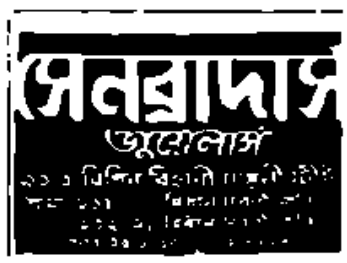

# কলকাতা

বিভিন্নমুখি ও আকর্ষণীয়

অঞ্জলি ঘোষ : আজ অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন তাঁর এক নতুন শ্রুতিনাটক 'পুর্ণিমার অনুষ্ঠানে' শুরু ১-৩০ মি: ও দ্বিতীয় ৩-৩০ মিনিটে

•

প্রথম অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ১-১১ | বন্দেমাতরম্ |
| ১-০০ | সুপ্রভাত |
| ১-০১ | সমবেতসঙ্গীত |
| ১-২১ | রবীন্দ্রসঙ্গীতের বর্ষায় : কথিকা |
| ১-৩০ | সুরেন সরকার : সুরেন সরকার ; রেকর্ড বাজিয়ে শুনাবেন অনুষ্ঠান পরিচালনা ও বিশ্লেষণ। |
| ১-৫১ | বেতারজগৎ |
| ১-৩১ | পুর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় : ঘোষণা |
| ৭-০০ | আজ । |
| ৭-১০ | আবহসঙ্গীত ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী) |
| ৭-১১ | গজলগীতি |
| ৭-২১ | বাংলা সংবাদ |
| ৭-৫১ | স্থানীয় সংবাদ (বাংলা) |
| ৭-৫০ | বন্দেমাতরম্ : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৮-০০ | অনুপম মুখোপাধ্যায় : রোমান্টিক |
| ৮-১৫ | ঘোষণা লিপি : আধুনিক |
| ৮-৫০ | পল্লী সংবাদ : সংবাদ |
| ১-০০ | বাংলা সংবাদ |
| ১-০৫ | সুবীরকুমার ঘোষ : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ১-১৫ | প্রভাতী চট্টোপাধ্যায় : আধুনিক |
| ১-৩০ | বহিরঙ্গ বঙ্গ । ট্রেবেরী |
| ১-৫৪ | বাঁশির গান । রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ১০-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১০-০২ | আবহসঙ্গীত + |
| ১০-০৫ | আজ কাল । ঘোষণা |
| ১০-০৫ | রেখা মুখোপাধ্যায় : ঘোষণা |
| ১১-০০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ১২-০০* | রবীন্দ্রসঙ্গীত + (শ্রেষ্ঠের গান) |
| ১২-৩০ | আধুনিক । |
| ১-০০ | ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় : বিভিন্ন বিষয়ে কথা ও আলাপচারিতা |
| ১-৩০ | বাংলা সংবাদ |
| ১-৪০ | সুপ্রভাত সংগীত |
| ১-৫০ | রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ২-০০ | আলোচনা । কবিতা : সুবোধ সরকার ; নতুন দিগন্তের সন্ধানে বেরোবা : বৈজ্ঞানিকদের ও সাহিত্যিক সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকার অধিবেশন : রামকৃষ্ণদেবী সরকার-এর সঙ্গে বেলা দেবী সাক্ষাৎকার |
| ২-২১ | আবহসঙ্গীত |
| ২-৫০ | অনুপমপ্রসাদের গান + |
| ২-৫০ | রজনীকান্তের গান + |
| ২-৩০ | পুর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় : বেতারজগৎ |
| ৩-১০ | গীতবিতানী : লোকগীতি |
| ৩-২০ | প্রতিমা ঘোষ : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৩-৩০ | সমাপ্তি |

তৃতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ৬-১০ | সন্ধ্যারতি আরতিক |
| ৬-৩০ | রবীন্দ্রসঙ্গীত : লোকগীতি |
| ৬-৩০ | স্থানীয় ঘোষণা ও আবহসঙ্গীত |
| ৬-৩১ | পরিচালনার গান অনুষ্ঠান |
| ৬-৩৯ | বিভিন্নমুখীন : সংবাদ পরিক্রমা । বিষয় : গল্প । প্রসঙ্গ কি; পরিক্রমার : মোহন অনুপমা; বৈদিক বাজার খবর; আলোচনার খবর |
| ৭-২৩ | রবীন্দ্রসঙ্গীত ঠুমরীর গান |
| ৭-৫১ | বাংলা সংবাদ |
| ৭-৫১ | সমাপ্তি |
| ৭-৫০ | স্থানীয় সংবাদ (বাংলা) |
| ৮-০০ | সংস্কৃত ও সংস্কৃতি |
| ৮-৩০ | সমাজিক প্রসঙ্গ/সমাজী |
| ৮-৫১ | আজকের আবহসঙ্গীতের আয়োজন করছেন :(১) সুচন্দ্রসঙ্গীত রেখা হালদার : বাংলা কবিতা : ও অন্যান্য গান |
| ১-০০ | গল্প অপেক্ষাগারের : সংবাদ |
| ১-৫০ | অনুষ্ঠানের আজ + |
| ১০-০০ | সংবাদ পরিক্রমা |
| ১০-০১ | বাংলা সংবাদ |
| ১০-১১ | সংবাদ বিচিত্রা |
| ১০-৩০ | আজকের । বাংলা সাহিত্য; কাহিনী । সুরেন ঘোষ; রেডারঙ্গ । উপন্যাসের ঘোষণা; প্রযোজনা : ইন্দ্রাণী ভৌমিক |
| ১১-০০ | আবহসঙ্গীত ও সমাপ্তি |

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ৭-০০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৮-০০ | হিন্দী সংবাদ |
| ৯-০৫ | বন্দেমাতরম্ : লোকগীতি |
| ৯-১০ | বাংলা সংবাদ |
| ৯-৩০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৯-৫০ | বেতারনাট্য : পরীক্ষা |
| ১০-০০ | গীতবিতানী । লোকগীতি |
| ১০-০০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ২-৪০ | রেখা মুখোপাধ্যায় : রোমান্স |
| ৩-০০ | লোকগীতি |
| ৩-১০ | বিভিন্ন ঘোষ । আধুনিক |
| ৩-২০ | রেখাচিত্র বঙ্গ : পরীক্ষা |
| ৩-৪০ | সুবীরকুমার ঘোষ : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৩-৫০ | প্রভাতী চট্টোপাধ্যায় : অনুপমপ্রসাদের গান |
| ৪-০০ | অনুপম মুখোপাধ্যায় : আধুনিক |
| ৪-১০ | পুর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় : রোমান্স |
| ৪-২০ | বাঁশির বঙ্গ । রোমান্স |
| ৪-৪০ | গান অপেক্ষাগারের : সংবাদ |
| ৪-০০ | সমাপ্তি |

প্রযোজনা : রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুষ্ঠান, বিকেলসঙ্গীত, আধুনিক, বাঁশি ও ৯৯৮

| | |
|---|---|
| ৮-৫০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ১-০০ | সংস্কৃত সংবাদ |
| ১-০৫ | নিখিল দেশের ঐ ইতিহাস |
| ১-১০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ১-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১-০৩ | ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ |
| ১-০১ | পাশ্চাত্য সংগীত । : |
| ২-১০ | পাশ্চাত্য সংগীত । |
| ২-৫০ | বন্দর বাজারে ইংরেজী সংবাদ |
| ৩-০০ | সমাপ্তি |

তৃতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ১-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৬-০৫ | সন্ধ্যারতি ঘোষণা ও আবহসঙ্গীত |
| ৬-১০ | রূপায় বন্দ্যোপাধ্যায় : পল্লীসঙ্গীত |
| ৬-২০ | বাঁশির গান অনুপমপ্রসাদের গান |
| ৬-৩৫ | সুবীরকুমার ঘোষ : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৬-৬০ | প্রভাতী চট্টোপাধ্যায় : আধুনিক |
| ৬-৫৫ | আজকাল : বিশেষ প্রতিবেদন : ইন্দ্রাণী ভৌমিক |
| ৭-১৫ | গীতবিতানী । |
| ৭-৫০ | সুবীরকুমার ঘোষ : রোমান্স |
| ৭-৫১ | হিন্দী সংবাদ (ঘোষণা) |
| ৮-০০ | হিন্দী সংবাদ |
| ৮-০৫ | ঘোষণা + |
| ৮-০৫ | বন্দেমাতরম্ । লোকগীতি |
| ৮-৫৫ | হিন্দী সংবাদ |
| ১-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১-১৫ | ঐতিহ্য অনুষ্ঠান |
| ১-২৫ | অবসরবিনোদন - |
| ১-৩০ | ইংরেজী কবিতা |
| ১-৪৫ | পাশ্চাত্য সংগীত |
| ১০-৩০ | বাঁশির বঙ্গ । রোমান্স |
| ১১-০০ | আবহসঙ্গীত ও সমাপ্তি |

কলকাতা খ

বিভিন্ন ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—১-০০ মি: ১০-১৫ মি—১২-৩০ মি: দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিনিট


**SWAR SANGAM**

(Bi-weekly Art Education)

108-109 Southern Avenue, Calcutta 29, Phone : 46-9802

PAINTING : Sri Sunil Madhav Sen (Deptt. Head)
VOCAL : Smt. Meera Banerjee (Deptt. Head)
INSTRUMENTAL :
SARODE & SYMPHONY : Sri Santosh Chander (Deptt. Head)
VIOLIN : Sri V. G. Jog
SITAR : Sri Bimalakanta Roychowdhury
GUITAR : Sri Dipen Baller
TABLA : Pandit Nanku Maharaj
DANCE : Sri Prahlad Das (Deptt. Head)
KATHAKALLI & BHARATNATYAM : Sri N. K. Sivasankaran
FEES : Rs. 15/- p.m. FOR ADMISSION : CONTACT.

# কলকাতা

ক

## শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি

•

প্রথম অনুষ্ঠান

৫-৫৫ অনুষ্ঠানারম্ভ
৬-০০ সুপ্রভাত
৬-০৫ সমবেতসঙ্গীত
৬-২৫ চলচ্চিত্রগীতির ঝঙ্কার : বাছাই
৬-৫০ সুপ্রভ মজুমদার ।
শ্যামল বসু । উষা
(ক্লিনেট, হুইসল ও
কাস্টানেট)
৭-৪৫ সেতারবাদন
৭-৫৫ জৈমাপ্রসাদ সেন : বাঁশীর
৭-০০ ইন্দ্রা বসু । রামপ্রসাদ
৭-১০ আকাশবাণী ও অনুষ্ঠান
পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
৭-১৫ আকাশবাণী
৭-২৫ খবরা সংবাদ
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৭-৫০ বৈচারিক । রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ লোকসংগীত
৮-১৫ বৈচারিক মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
৮-২৫ খেলার চিঠি
বর্ণনা । বিভূতিভূষণ কুমার
৮-৩০ প্রীতা বন্দ্যোপাধ্যায় । খেয়াল
৯-০০ খবরা সংবাদ
৯-০৫ মুকুল বসু : রবীন্দ্রসংগীত
৯-১৫ জলাল খাজাঞ্চী
লোকসংগীত
৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা
৯-৪৫ পুলিনা চট্টোপাধ্যায় :
রবীন্দ্রসংগীত
১০-০২ জয়ন্তপ্রসাদ ।
১০-০৭ কৃষ্ণদাস ঘোষ । দ্রুপদ
১০-৩০ জি. এস. খোন্দকারী : খেয়াল
১১-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

১২-৫০ রবীন্দ্রসংগীত -
১-০০ জি. এস. খাঁড়ে । খেয়াল
(বেবারিখাঁর বিলাবল)
১-৩০ খবরা সংবাদ
১-৪০ যুক্ত সংগীত
১-৫০ জৈমাপ্রসাদ সেন : বাঁশীর
২-০০ সৈয়দমুস্তাফা খাঁ ।
(নির্বাচিত আধুনিক গান)
২-২৬ আকাশবাণী
২-৩০ সংগীত
৩-০০ সেবায়নী বিশ্বাস
শ্যামাসংগীত
৩-১০ জৈমাপ্রসাদ সেন । বাঁশীর
৩-২০ উপেন্দ্রা বসু । আধুনিক
৩-৩০ সমাপ্তি

তৃতীয় অনুষ্ঠান

৪-১০ স্পোর্টস আওয়ার্ল্ড
৪-৩০ বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী । লোকসংগীত
৪-৩০ স্থানীয় সংবাদ ও আকাশবাণী
৪-৩৫ শিক্ষাপ্রসারের জন্য অনুষ্ঠান
৪-৫১ কলকাতা । দেবী দুর্গা
৪-৩৩ চলচ্চিত্রের আসর
ভালো ভালো গান কিভাবে
রেকর্ড পাই । অজয়কান্তা;
সত্যেন্দ্রা; চিত্রিত উৎসব;
বৈচারিক বাজার দর;
আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ ইন্দ্রা বসু : সমবেতসংগীত
৭-৩১ আজ সংবাদ
৭-৪৩ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ বিজ্ঞান বিচিত্রা
৮-২০ সমাপ্তিক ঘোষণা/সংবাদ
৮-২৫ কথার আসর । আধুনিক
১-০০ আবহাওয়ার সংগীত
১-১৫ সংবাদ পরিক্রমা
১-২০ খবরা সংবাদ
১-৩০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রম
দূরদর্শন (বাংলা দূরদর্শন)
১০-০০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রম
আন্তর্জাতিক সংগীত
(লোকগীতি ও লঘুসংগীত) :
কার্যক্রমের
(দিল্লী থেকে দূরদর্শনযোগে)
১১-০০ জাতীয়তাবাদী ও সমাপ্তি

খ

## কলকাতা ক

প্রথম অনুষ্ঠান

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান :
৬-০৫ বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী : লোকসংগীত
৬-২০ খবরা সংবাদ
৬-৩০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৭-০০ ইন্দ্রাণী সংবাদ
৭-০৫ সেবায়নী বিশ্বাস
শ্যামাসংগীত
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৭-৪০ উপেন্দ্রা বসু : বাঁশীর
৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা ।
৮-২০ অজয় খাজাঞ্চী । রামায়ণী
৮-৩০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৯-০০ সমস্যা সংবাদ
৯-০১ শিশুর মোহ যে ইংলিশ
৯-১০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

১-০০ ইন্দ্রাণী সংবাদ
১-০১ ইন্দ্রোডাক্টস্ অব এক্সপোর্ট
রিসেপ্টিভ
১-০১ শ্যামাসংগীত - :
২-১০ শ্যামাসংগীত +
২-৩০ কথার আসরে ইন্দ্রাণী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অনুষ্ঠান

৬-০০ ইন্দ্রাণী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় সংবাদ ও আবহাওয়া
৬-১০ প্রীতা বন্দ্যোপাধ্যায় । খেয়াল
৬-৩১ সৈয়দমুস্তাফা মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
৬-৫১ সেবায়নী বিশ্বাস
শ্যামাসংগীত
৬-৫৫ সমবেতসংগীত ।
হিন্দী অনুষ্ঠান: আধুনিক -
৭-১৩ সাহিত্যসভা
৭-৩০ লোকসংগীত
৭-৫৫ কৃষ্ণদাস ঘোষ । দ্রুপদ
৮-০০ সুচিত্রা বসু : সমবেতসংগীত :
৮-০৫ জলাল খাজাঞ্চী : আধুনিক
৮-১৩ খেলার মাঠের বিচিত্রা
৮-২৩ ইন্দ্রা বসু : বাঁশী ও সমাপ্ত
৮-৩৫ সুচিত্রা ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত :
৯-০০ ইন্দ্রাণী সংবাদ
৯-১৫ উপেন্দ্রা অনুষ্ঠান
৯-২৫ অজয়কান্তা -
৯-৩০ পাশ্চাত্য সংগীত -
১০-৩০ বৈচারিক :
লোকসংস্কৃতির উৎসবের খবর
১০-৪০ আধুনিক
১০-৩০ বলার আছে : আজকাল
১১-০০ আবহাওয়া ও সমাপ্তি

## কলকাতা খ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—
১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত
১১-১০ মিনিট

পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান

কমলা রায় : আধুনিক ও
চলচ্চিত্রগীতি

প্রথম অনুষ্ঠান

৮-২০ খবরা সংবাদ (৭-২৫ মিনিট
ছাপাতে আকাশে পুনর্প্রচার)
৮-৩০ সেবায়ন
৮-৫০ সুচিত্রা ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত
৮-৩০ অজিতকুমার ভট্টাচার্য
লোকগীতি
১-০০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
১-০১ উপেন্দ্রা বসু : আধুনিক
১-১৫ সমস্ত যে : রামায়ণ
১-৩০ সুচিত্রা ঘোষ । রবীন্দ্রসংগীত
১-৫০ বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী : লোকগীতি
১-৫০ সুচিত্রা বসু : আধুনিক
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

২-৩০ অজিতকুমার ভট্টাচার্য
লোকগীতি
২-৫০ সুচিত্রা বসু : আধুনিক
৩-৩০ সমস্ত যে : আধুনিক
৩-০০ মুকুল বসু । রবীন্দ্রসংগীত
৩-১০ সেবায়ন
৩-১০ অজিতকুমার ভট্টাচার্য
লোকগীতি
৩-৩০ জয়ন্তপ্রসাদের সরোদ
৩-৫০ আধুনিক
৩-৩০ পুলিনা চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
৪-০০ সৈয়দমুস্তাফা মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
৪-১০ উপেন্দ্রা অনুষ্ঠান : বাঁশীর
৪-২০ কৃষ্ণদাস ঘোষ : দ্রুপদ
৪-৪০ জি. এস. খোন্দকারী : খেয়াল
৫-০০ সমাপ্তি


## !! গীতায়তন !!

চলতি শিক্ষাবর্ষ হতে জুলাই থেকে। শাস্ত্রীয় সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত ও প্রথম সংগীত পূর্ণাঙ্গিকরূপে ৭ম ও ৫ম মাসিক ভিত্তিমূল্য/৬ ও ৯ম মাসিক ভিত্তি পাঠ্যের অনুযায়ী নেতৃত্বে প্রবীণ/নবীন। প্রশাসনিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক ভিত্তি ভিত্তিমূল্য রাগ সংগীত ও প্রাচীন গান ভিত্তিমূল্য ও ভিত্তি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা পরিচালনা: সংগীত চিত্র লাহিড়ী (ওস্তাদজী), সরোজ দেব (খেয়াল সংগীত), পঙ্কজকুমার ভট্টাচার্য (তবলা), এস. ঘোষ (রবীন্দ্র সংগীত), সুধাময় মজুমদার (ভিত্তিমূল্য/রবীন্দ্র/নজরুল/আধুনিক/ভিত্তিমূল্য/পুরাতনী সংগীত), দেবযুমার লাহিড়ী (আধুনিক/আধুনিকসংগীত), প্রবীন গুহ (রবীন্দ্র সংগীত), অনিল পাল (তবলা/পাখোয়াজ/এস্রাজ), সুনিলকুমার মজুমদারের তত্ত্বাবধানে/পরিচালনায় সৌজন্যে, সরোজনাথ ঘোষ (তবলা), অনিল পাল, কমলেশ দে ও অশোক রায় সৌজন্যে, বিভূতি ভট্টাচার্য ও নবী দাসগুপ্ত (তবলা), দুলাল মজুমদার (বাঁশী)।

যোগাযোগ করুন—২/১, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া ( ব্রহ্মস্থানের পাশেই )



নিত্যকর্মে ও শুভকর্মে
গোদরেজ অফ হিন্দ
ধূপ
সকলের ব্যবহারে সন্তোষ

গোদরেজ প্রোডাক্টস, কলিকাতা-৪

# কলকাতা

ক

নিলিমুড়ি ও আবহরচনা

সুচরিতা চৌধুরী : আকাশবাণী কলকাতার রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী

•

প্রথম অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ১-১১ | অনুষ্ঠানসূচী |
| ১-০০ | সুপ্রভাত |
| ১-০১ | দাবাড়ীরাজ্যে |
| ১-২১ | রেডিওগ্রাফের ভাষায় : ভাষণ |
| ১-৩০ | সুরের সাথী : বেলা দেবী, আরতি চৌধুরী, হেমন্ত মুখার্জি ও শ্যামল মিত্র। |
| ১-৫১ | বাণীবিতান |
| ১-৫৩ | ঘোড়শ্বর দেব : খেয়াল |
| ৭-০০ | সেতারবাদন |
| ৭-১০ | আলাপচারী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী) |
| ৭-১৫ | বীথিকার দে : আবৃত্তি |
| ৭-২৫ | বাংলা সংবাদ |
| ৭-৫৫ | স্থানীয় সংবাদ (বাংলা) |
| ৭-৫০ | শারদীয়া মেলা : রবীন্দ্রসংগীত |
| ৮-০০ | আলাপচারী পাঠ : হেমন্তকুমার (নিলিমুড়ি : হিন্দী সংবাদ) |
| ৮-১৫ | জয়ন্তী সেন : আবৃত্তি |
| ৮-৩০ | কলকাতার মুখোপাধ্যায় সেতার |
| ১-০০ | হিন্দী সংবাদ |
| ১-০৫ | নিলীথ সাহু অনুষ্ঠানসূচীর গান |
| ১-১৪ | বীথিকার দে : আবৃত্তি |
| ১-৩০ | ঠুংরী |
| ১-৪৫ | রবীন্দ্রসংগীত |
| ১০-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১০-০২ | অনুষ্ঠানসূচী + |
| ১০-০৫ | সেতার |
| ১০-৩০ | ঘোষ মোশায়ী ও বাঁশী |
| ১১-০০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ১২-৩০* | নিউজ (রাত্রিকালীন) + |
| ১২-৪০ | আবহসংগীত + |
| ১-০০ | মডার্ন ফটোগ্রাফি : সংগীত (রেডিও কিরণী) |
| ১-৩০ | বাংলা সংবাদ |
| ১-৪০ | সুপ্রভাত সাথীরা |
| ১-৫০ | রবীন্দ্রসংগীত : কবির কথা : সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা কেন্দ্র); কবিতা ও আবৃত্তি : সুবর্ণা বাগচী; সাহিত্য পাঠ : বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে পাঠ। সাহিত্য পাঠ |
| ২-২৮ | আবহসংগীত |
| ৩-০০ | ভজন |
| ৩-৩০ | ঘোড়শ্বর দেব : খেয়াল |
| ৩-৪০ | শারদীয়া পত্র : আবৃত্তি |
| ৩-৪০ | সুধাময় মুখোপাধ্যায় লেকসংগীত |
| ৩-১০ | ঘোড়শ্বর দেব : খেয়াল |
| ৩-২০ | কবিতা মিত্র। রবীন্দ্রগান |
| ৩-৩০ | সমাপ্তি |

তৃতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ৮-১৯ | ফোকাস মার্কিন |
| ৪-৩০ | ঘোড়ী সুর : শাস্ত্রীয়সংগীত |
| ৪-৩০ | স্থানীয় ঘোষণা ও আবহসংগীত |
| ৪-৩১ | মন্ত্রিসভার ঘরে অনুষ্ঠান |
| ৪-৫১ | যন্ত্রসংগীত : সুপ্রভা : বাংলা : সুবীর সরকার |
| ৪-৫৫ | স্বামী বেদাত্মানন্দজীর অনুষ্ঠান। রবি অনুষ্ঠানে যো-যোগদান চান : আলোচনা; আলোচনা; শুনলেন উইন: মিশ্রি বাজার ধর; আবহাওয়ার খবর |
| ৭-২৫ | জয়ন্তী সেন : আবৃত্তি |
| ৭-৩৫ | বাংলা সংবাদ |
| ৭-৫৫ | ক্রীড়া |
| ৭-৫০ | স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)' |
| ৮-০০ | নিবেদন সংবাদ। বাংলা নাটক; কাহিনী : হৈমন্তী দে; বেতাররূপ। অভিনয় দে; পরিচালনা : পঞ্চু মুখোপাধ্যায় |
| ৮-৫১ | সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র/সংগীত (নিলিমুড়ি ও আবহরচনা। হিন্দী সংবাদ) |
| ১-০০ | ঘোষ মোশায়ী : বাঁশী |
| ১-০০ | নিলীথ সাহু অনুষ্ঠানসূচীর গান |
| ১-৩০ | বাদলী চক্রবর্তী। রবীন্দ্রসংগীত |
| ১-৫০ | মুখোপাধ্যায় : পরিচালনায়। আবহসংগীতে অনুষ্ঠান-সংগীত-কণ্ঠ; পরিচালনা। সুধা মুখোপাধ্যায় |
| ১০-০০ | সমাপ্তি পরিচালনা |
| ১০-০৫ | বাংলা সংবাদ |
| ১০-১৫ | সেতার সংগত বিভিন্ন |
| ১০-৩০ | অনুষ্ঠানের আজ + (রবীন্দ্রসংগীত) |
| ১১-০০ | আবহসংগীত ও সমাপ্তি |

খ

প্রথম অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ৫-৫৫ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৬-০০ | হিন্দী সংবাদ |
| ৬-০১ | অনুষ্ঠান পরিচালনা। লোকসংগীত |
| ৬-২০ | বাংলা সংবাদ |
| ৬-৩০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৭-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৭-০৫ | আবহসংগীত + |
| ৭-১০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৭-৩০ | কবিতা মিত্র। ভজন |
| ৭-৪৫ | হিন্দী শিক্ষা |
| ৮-০০ | হিন্দী সংবাদ |
| ৮-১০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৮-২০ | প্রমথী চক্রবর্তী : রবীন্দ্রসংগীত |
| ৮-৩০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ১-০০ | সমাপ্তির সংবাদ |
| ১-০৫ | নিউজ রেডিও ইন ইন্ডিয়া |
| ১-১০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ১-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১-০৫ | ব্রাইটার্ড্স অব এডেন্টার্স বিভাগীয় |
| ১-০৬ | পল্লীগীতি সংগীত + |
| ১-৪৫ | পল্লীগীতি সংগীত |
| ২-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ২-১০ | পল্লীগীতি সংগীত + |
| ২-৩০ | রবীন্দ্র সংগীতে ইংরেজী সংবাদ |
| ৩-০০ | সমাপ্তি |

তৃতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ৬-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৬-০৫ | স্থানীয় ঘোষণা ও আবহসংগীত |
| ৬-১০ | ভজন |
| ৬-২০ | বীথিকা দে : আবৃত্তিসংগীত |
| ৬-৩৫ | নিলীথ সাহু : আবৃত্তি |
| ৬-৪৩ | জয়ন্তী ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত |
| ৬-৫৫ | আবহসংগীতী : পারিবারিক্যা (রায়বাহিনী খান) |
| ৭-১৫ | বাণীবিতানী |
| ৭-৩০ | ঘোড়ী সুর : শাস্ত্রীয়সংগীত |
| ৭-৫৫ | ঠুংরী |
| ৭-৫০ | রবীন্দ্র সংগীতসংগ্রহ : লোকসংগীত |
| ৮-০০ | ইংরেজী সংবাদ (ঘোষণা) |
| ৮-০৫ | হিন্দী চলচ্চিত্র |
| ৮-২৫ | বীথিকা দে : রবীন্দ্রসংগীত |
| ৮-৩৫ | আলাপচারী পাঠ : লোকসংগীত |
| ৮-৪৫ | হিন্দী সংবাদ |
| ৯-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৯-১৪ | ঈষৎ অনুষ্ঠান |
| ৯-২৫ | আবহসংগীত + |
| ৯-৩০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৯-৪৫ | ঈষৎ সংগীতের অনুষ্ঠানের আবহ + |
| ১০-৫০ | আবহসংগীত সেতার |
| ১১-০০ | আবহসংগীত ও সমাপ্তি |

গ

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—১-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-০০ মিনিট; দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিঃ

পূর্বাঞ্চলীয় ছোটদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

(চতুর্থ ও দ্বিতীয় অধিবেশন ৪০৮-৫ মীঃ)

প্রথম অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ৮-২০ | বাংলা সংবাদ (৭-২৫ মিনিট প্রচারিত সংবাদের পুনঃপ্রচার) |
| ৮-৩০ | সেতারবাদন |
| ৮-৪০ | ঘোড়ী সুর অনুষ্ঠানসূচীর গান |
| ৮-৫০ | সুধাময় মুখোপাধ্যায় লোকসংগীত |
| ১-০০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ১-০৫ | শারদীয়া পত্র। আবৃত্তি |
| ১-১৫ | কবিতা মিত্র। রবীন্দ্রগান |
| ১-৩০ | যন্ত্রসংগীত |
| ১-৪০ | বাঁশী |
| ১-৫০ | আবৃত্তি |
| ১০-০০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় অধিবেশন

| | |
|---|---|
| ২-৩০ | যন্ত্রসংগীত |
| ২-৪০ | আবৃত্তি |
| ২-৫০ | কথা সুর অনুষ্ঠানসূচীর গান |
| ৩-০৪ | রবীন্দ্রসংগীত |
| ৩-১০ | যন্ত্রসংগীত |
| ৩-২০ | ঠুংরী |
| ৩-৩০ | শারদীয়া পত্র। আবৃত্তি |
| ৩-৪৩ | সেতারবাদন |
| ৩-৪৩ | কথা সুর : রজতসংগীত |
| ৪-০০ | ঘোড়শ্বর দেব। খেয়াল |
| ৪-১০ | বাদলী চক্রবর্তী : আবৃত্তি |
| ৪-২০ | আলাপচারী পাঠ : লোকসংগীত |
| ৪-৩০ | খেলাধুলা |
| ৪-৪০ | সুধাময় মুখোপাধ্যায় আবৃত্তি |
| ৫-০০ | সমাপ্তি |

মাণিকলাল দাস : আকাশবাণীর গীটার-শিল্পী

# কলকাতা

ক

## সিলেক্ট ও আসরতলা

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৩ অনুষ্ঠানসূচী
৬-০০ সুপ্রভাত
৬-০৫ সংগীতগুঞ্জন
৬-২৫ রামকৃষ্ণদেবের বাণীর । কবিতা
৬-৩০ সুপ্রভাত সংগীত ।
বিশ্বজিৎ খাঁ । সানাই
(লালত, প্রভাত ও আশাবরী)
(সিলেক্ট । অনুষ্ঠানসূচী;
অরুণের সংগীত +)
৬-৪৫ সেতারবাদন
৬-৫৫ ভজনসংগীত
৭-০০ বন্দে মাতরম্ । উদয়ন
৭-১০ আজকের কথা । সংবাদ
পরিক্রমা (বাংলা ও ইংরেজী)
৭-১৫ শাস্ত্রীয়সংগীত
৭-২৫ বাংলা সংবাদ
৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৭-৪০ রবীন্দ্রসংগীত । রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ লোকসংগীত
(সিলেক্ট । হিন্দী সংবাদ)
৮-১৫ রবীন্দ্র অনুষ্ঠানমালা । আধুনিক
৮-২৫ ফোনের চিঠি
কলকাতা । সুধীজনের মন্দ
৮-৩০ আলি হোসেন ও সহশিল্পি-
বৃন্দ । সানাই
(সিলেক্ট । সমাপ্তি)
১-০০ বাংলা সংবাদ
১-০৫ বিদ্যা মেলমুক্ত
রবীন্দ্রসংগীত
১-১৫ আজকাল অনুষ্ঠানমালা
আধুনিক
১-৩০ সংবাদ বিচিত্রা
১-৪৫ সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ প্রবচনপ্রসঙ্গ –
১০-০৫ সন্ধ্যারতী ঠাকুর : মেলার
১০-৩৫ কবীর চট্টোপাধ্যায় । মেলার
১১-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-০০* দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত +
(সিলেক্ট : ১২-০০ মি:—
১টা পর্যন্ত বেতারী বাংলার
অনুষ্ঠান)
১-০০ আজীর খাঁ : মেলার
১-৩০ বাংলা সংবাদ
১-৪০ সুরমা সংগীত
১-৫০ পরিচয়
২-০০ রামায়ণের কথা +
২-২৬ প্রবচনপ্রসঙ্গ
২-৩০ হিন্দী সংবাদ
৩-০০ নিখিলেন্দু চট্টোপাধ্যায়
আধুনিক গান
৩-১০ নিমাই মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
৩-২০ পরিচয়
৩-৩০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৩-৪৫ কথাপ্রসঙ্গে ভারত ।
পুরাতন কাল সোনাবেন ।
মোগলাই গল্প: সমবেত হাস্য
ভারতের গল্প : কালের গতি
তেই নিল কে? কথা :
সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়;
সুর । সন্ধ্যারতী
মুখোপাধ্যায়; প্রথম বেতার
স্কুলে ভর্তি হলাম ।
গৌতম মুখোপাধ্যায়
৪-১৫ সেতারবাদন সাহিত্যিক
৪-৩০ শাস্ত্রীয়সংগীত
(সিলেক্ট ও আসরতলা :
৫-১৫ মি: সেরাবাহিনীর
গুরু অনুষ্ঠান; অরুণের
সংগীত ।; ৬টায় ইংরেজী
সংবাদ; ৬-০৫ মি:
হিন্দী সংবাদ; সিলেক্ট :
৫-৫৫ মি: স্থানীয় বোলা
ও অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৬-০০ স্থানীয় বোলা ও আবহবাণী
৬-০৩ সাঁইত্রিশের ডাক অনুষ্ঠান
৬-৫৪ লোকগীতি
৬-৫০ কলকাতা : সাঁঝপ্রদীপ
৬-৫৩ প্রবচনপ্রসঙ্গ +
৬-৫৫ কৃষিকথার আসর :
প্রামাঞ্চলের কথা; বাজার দরের
সাপ্তাহিক পর্যালোচনা ।
কবিতা; আমাদের অতিথের
অনুষ্ঠান; চিঠির উত্তর;
দৈনিক বাজার দর;
আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ কীর্তন +
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৪৩ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ বিচিত্রা । বাংলা হুকুম
৮-১৫ আজকাল অনুষ্ঠানমালা
আধুনিক
(আসরতলা ও সিলেক্ট :
৮-১৫ মি: বিদ্যা ঘ-এর
অনুরূপ; ৮-২৫ মি:—
৮-৪৫ মি: পর্যন্ত কলকাতা
ঘ-এর অনুরূপ)
৮-৫০ সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত
৮-৪৫ বাংলা কবিতা
৯-০০ বিদ্যা মেলমুক্ত
রবীন্দ্রসংগীত
৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা
৯-২০ বাংলা সংবাদ
৯-৩০ রাত্রির রাগসংগীত
অবসান
১১-০০ আবহবাণী ও সমাপ্তি

## কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০৫ লোকসংগীত
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-০০ ইংরেজী সংবাদ
৭-০৫ প্রবচনপ্রসঙ্গ ছন্দ ও মেলোডি
(ইংরেজী)
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-৫০ নিখিলেন্দু চট্টোপাধ্যায়
শ্যামাসংগীত
৭-৪৫ সংস্কৃত শিক্ষা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-১০ ইংরেজী সংবাদ
৮-২০ আজ অনুষ্ঠানমালা । উদয়ন
৮-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
১-০০ সংস্কৃত সংবাদ
১-০৩ নিউজ রিলেস ইন ইংলিশ
১-১০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ ব্রাইটার্স অব টুমরোজ
ডিরেক্টরি
১-৫৪ পাল্লাজ সংগীত +
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ পাল্লাজ সংগীত +
২-৩০ জনপদ পরিক্রমা ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় বোলা ও আবহবাণী
৬-১০ আলি হোসেন ও সহশিল্পি-
বৃন্দ : সানাই
৬-৫০ নজরুলসংগীত
৬-৫৫ রবীন্দ্রকাহিনী : রবীন্দ্রসংগীত
৭-১৫ আজকালকার বৈজ্ঞানিক আলোচনা
৭-২০ বাণিজ্যবার্তা
৭-৩০ কীর্তন
৭-৫১ সন্ধ্যারতী প্রবন্ধ : মুখরী
৭-৫০ আজ অনুষ্ঠানমালা
আধুনিক ও গীত
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (ঘোষণা)
৮-০১ লোকসংগীত
৮-২৭ বেতার সংবাদ বিচিত্রা
৮-২৭ আধুনিক +
৮-৫০ রবীন্দ্র অনুষ্ঠানমালা
রবীন্দ্রসংগীত

বিদ্যা মুখার্জি : কলকাতা থেকে
গাইবেন রাত্রির রাগসংগীত

৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-১৫ উদ্বোধন অনুষ্ঠান
৯-২৫ আবহবাণী +
৯-৩০ ইংরেজী বাণিকা
৯-৪৫ শাস্ত্রীয়সংগীত +
১০-১৫ নজরুল চৈতালি ইন সাউন্ড
১০-৩০ বিদ্যা মেলমুক্ত
রবীন্দ্রসংগীত
১০-৫০ লোকগীতি
১০-৫০ রবীন্দ্র অনুষ্ঠানমালা
আধুনিক
১১-০০ আবহবাণী ও সমাপ্তি

## আকাশবাণী ঘ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—১-৩০ মি:; ১০-১৫ মি:—
১২-৩০ মিনিট; দুপুর ২টা—রাত
১১-১০ মিনিট

পূর্বাঞ্চলীয় প্রোগ্রামের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান
(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন
৫০৮-৫ মি:)

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
৮-৩০ খেলাধুলা
৮-৫০ কৃষ্ণা বিশ্বাসী : রজনীগন্ধা
৮-৫০ প্রবাস পত্র । আধুনিক
১-০০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
১-০৫ সন্ধ্যারতী প্রবন্ধ : মুখরী
১-২০ আজিম চৌধুরী : লোকগীতি
১-৩০ নিমাই মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
১-৫০ নিখিলেন্দু চট্টোপাধ্যায়
রেকর্ডীকৃতের গল্প
১-৫০ কৃষ্ণা বিশ্বাসী : কীর্তন
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ প্রবাস পত্র : আধুনিক
২-৪০ নিমাই মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
২-৫০ আজিম চৌধুরী : লোকগীতি
৩-০০ কবীর চট্টোপাধ্যায় : সেতার
৩-৩০ প্রবাস পত্র : আধুনিক
৩-৪০ সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
৩-৫০ আজিম চৌধুরী : লোকগীতি
৪-০০ কবীর
৪-১০ কৃষ্ণা বিশ্বাসী
নজরুলসংগীত
৪-২০ লোকগীতি
৪-৩০ আলি হোসেন ও সহ-
শিল্পিবৃন্দ : সানাই
৫-০০ সমাপ্তি

* সমর-সংকেত + রাত্রিকালীন রেকর্ড ‡ এর পর সংবাদ

# কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও জয়রামবাটী

শিপ্রা চক্রবর্তী : রবীন্দ্রসঙ্গীত ৭-৫ মিনিটে এবং নজরুলগীতি পূর্বাঞ্চলীয় অনুষ্ঠানে সুযোগ ২-৩০ মিনিট)

•

প্রথম রাজধানী

| | |
|---|---|
| ১-১১ | বন্দেমাতরম্ |
| ১-০০ | সুপ্রভাত |
| ১-০১ | সংগীতমালিকা |
| ১-২১ | রবীন্দ্রসঙ্গীতের বর্ণালী : কাকলী |
| ১-৩০ | সুরভি সভাগীত : |
| | বন্দনা দাস : টোডি (একতালা) |
| | বিপ্লব মুখার্জি : বেহাগ (একতালা) |
| | শিপ্রা চক্রবর্তী : ভূপালী (একতালা) |
| | শিলিগুড়ি : বৃন্দসঙ্গীত, তত্ত্বাবধান সংগীত ... |
| ১-৫১ | স্পোর্টস্ মার্কেট |
| ১-৩১ | বন্দনা দাস : |
| ৭-০০ | সুপ্রভাত । পরিবেশনা : রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনী ৬৭; পরিচালনা : সুধা গুহঠাকুরতা |
| ৭-১০ | সমবেত সংগীত ● অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী) |
| ৭-১৭ | বেবী হোম : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৭-২১ | বাংলা সংবাদ |
| ৭-৩১ | স্থানীয় সংবাদ (বাংলা) |
| ৭-৫০ | হিন্দী : রবীন্দ্রসঙ্গীত |
| ৮-০০ | লতিকা বসুচৌধুরী লোকগীতি |
| ৮-১৫ | শিপ্রেন মুখোপাধ্যায় অনুদিত |
| ৮-২৫ | ছোটদের চিঠি কুড়িয়েছে : বৈদেশিক চক্রবর্তী |
| ৮-৫০ | বেবী হোম : সমবেতসংগীত |
| ৮-৫৯ | হিন্দী সংবাদ : খবরী |
| ৯-০০ | বাংলা সংবাদ |
| ৯-০৫ | সংগীত বিচিত্রা । পরিচালনা : পঞ্চজকুমার মল্লিক |
| ৯-৩০ | বিশ্বভারতী : সুরেশ বিনে সংগীতে আলিম্পন : সংগীতালেখ্য; রচনা : রমেন চৌধুরী; সুর : লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রযোজনা : পুষ্পা বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ১০-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১০-০২ | সমাপ্তি ঘোষণা । |
| ১০-০৩ | হিন্দী সাহিত্যী : খেয়াল |
| ১০-৫১ | সাজ্জাদ হোসেন খাঁ ও সহযোগিবৃন্দ । সানাই |
| ১১-০০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় রাজধানী

| | |
|---|---|
| ১২-৩০' | অনুষ্ঠানের আজ । (নজরুলগীতি, রবীন্দ্রগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী ও রজনীকান্তের গান। |
| ১-০০ | অনুষ্ঠানের আজ । |
| ১-০৩ | বাংলা সংবাদ |
| ১-৫০ | হিন্দীর গল্প : বেহালা |
| ১-৫০ | সুর ● বাণী : অনুষ্ঠানের পর |
| ২-০০ | পরিচালনা : (নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত) |
| ২-২১ | আবহবাণী (ইংরেজী ও বাংলা) |
| ২-৫০ | সম্প্রচারীয় রাত্রি : বাংলা সাহিত্য (প্রথম পর্ব), কবিতা : রবিন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রযোজনা : প্রীতি গুহঠাকুরতা |
| ৩-২০ | হিন্দীর গল্প : বেহালা |
| ৩-৫০ | সমাপ্তি |

তৃতীয় রাজধানী

| | |
|---|---|
| ৫-৫১ | বন্দনাগানের আজ : গল্প বলেন : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র; সুরকার হালিদার্স : সংগীতালেখ্য; রচনা : কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুর: হিরণ্ময় চৌধুরী, পরিবেশনায় : নবীনা চৌধুরী ও সম্প্রদায় |
| ৬-১১ | স্পোর্টস্ মার্কেট |
| ৬-৩০ | অনুষ্ঠানের চতুর্থাংশের লোকগীতি |
| ৬-৩০ | স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবাণী |
| ৬-৩১ | মহিলামহলের জন্য অনুষ্ঠান |
| ৬-৫০ | জীবনের যে আমার এসেছে । সংগীতচক্রক: রচনা : বুদ্ধী বাগচী; রূপায়িতকরণে সর্বশ্রীর বাসনা সরকার, রবীন্দ্র মজুমদার : আলোচনা |
| ৭-৩০ | ছবিঘরের আজ : বেহাগে কুমার চালিয়ে : বিষয় । রবি মজুমদার বৈদেশিকের চর; ফেরে পালাবে সাজন; চিঠির উত্তর |
| ৭-২৩ | খুশবাসী ছেড়ে |
| ৭-৩১ | বন্দনা সংবাদ |
| ৭-৫১ | সমীক্ষা |
| ৭-৩০ | স্থানীয় সংবাদ (বাংলা) |
| ৮-০০ | সাঁঝের বিচিত্রা (ছোটদের চিঠির উত্তর) |
| ৮-১১ | এ যুগের গল্প রচনা । পুষ্পেন বন্দ্যোপাধ্যায়; সুর । অসীম ভট্টাচার্য; শিল্পী । মান্না দে |
| ৮-২০ | বেবী হোম । সমবেতসংগীত |
| ৮-৫০ | শিপ্রেন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত |
| ৮-৫৫ | আবহবাণী ও অনুষ্ঠান অনুদিত |
| ৯-০০ | হিন্দী সাহিত্যী : খেয়াল |
| ৯-৩০ | হরিজনের গান + |
| ১০-০৫ | বন্দনা সংবাদ |
| ১০-১৩ | সংবাদ বিচিত্রা |
| ১০-০০ | হিবেণী : রবীন্দ্রসংগীত (অনুষ্ঠানের : সমাপ্তি) |
| ১০-৫০ | আবহবাণী চট্টোপাধ্যায় নজরুলগীতি |
| ১০-১০ | শিপ্রেন মুখোপাধ্যায় অনুদিত |
| ১১-০০ | আবহবাণী ও সমাপ্তি |

কলকাতা খ

প্রথম রাজধানী

| | |
|---|---|
| ৩-১১ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৩-০০ | হিন্দী সংবাদ |
| ৩-০১ | অনুষ্ঠানের চট্টোপাধ্যায় লোকগীতি |
| ৩-২০ | বাংলা সংবাদ |
| ৩-৩০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৭-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৭-০৩ | হিমাদ্রি রায় : বেহালা |
| ৭-১০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৭-৫০ | খেলার গল্প : ধীরাজ |
| ৭-৫৩ | সংস্কৃত শিক্ষা |
| ৮-০০ | হিন্দী সংবাদ |
| ৮-১০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৮-২০ | অনুষ্ঠানের চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রগীতি |
| ৮-৩০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ৯-০০ | সংস্কৃত সংবাদ |
| ৯-০১ | বিচিত্র মেহার ইন ইংলিশ |
| ৯-১০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় রাজধানী

| | |
|---|---|
| ১২-৩০' | আজ: জন ডিক্সন |
| ১-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১-০১ | হাইলাইট্স্ অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক |
| ১-৩৩ | পাশ্চাত্য সংগীত । |
| ২-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ২-১০ | পাশ্চাত্য সংগীত + |
| ২-৩০ | জন্মর পরিচয়ে ইংরেজী সংবাদ |
| ৩-০০ | সমাপ্তি |

তৃতীয় রাজধানী

| | |
|---|---|
| ৬-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ৬-০৩ | স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবাণী |
| ৬-১৩ | লোকগীতি |
| ৬-২০ | গীতা মৈত্র : রবীন্দ্রসংগীত |
| ৬-৩১ | আধুনিক |
| ৬-৫১ | লতিকা বসুচৌধুরী লোকগীতি |
| ৬-৩৩ | রজনীকান্তগীতি |
| ৭-১১ | কীর্তন |
| ৭-৩০ | খেলার গল্প । ধীরাজ |
| ৭-৫০ | লোকগীতি |
| ৮-০০ | ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা) |
| ৮-০৫ | মিলা কর : রবীন্দ্রসংগীত |
| ৮-১৫ | বেলা গুহ : আধুনিক |
| ৮-২১ | অনুভূষণ চট্টোপাধ্যায় লোকগীতি |
| ৮-৫৩ | লতিকা বসুচৌধুরী । আধুনিক |
| ৮-৮৩ | হিন্দী সংবাদ |
| ১-০০ | ইংরেজী সংবাদ |
| ১-১৩ | উদ্যোগ অনুষ্ঠান (দিল্লী থেকে পুনঃপ্রচার) |
| ১-২৩ | ভবনসঙ্গীত + |
| ১-৩০ | খবরী প্রবাহ |
| ১০-০০ | পাশ্চাত্য সংগীত । |
| ১০-৩০ | সাজ্জাদ হোসেন ● সহযোগিবৃন্দ : সানাই |
| ১১-০০ | আবহবাণী ● সমাপ্তি |

কলকাতা গ

বিবিধ রাজধানী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—১-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিনিট; দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিঃ

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রথম রাজধানী

| | |
|---|---|
| ৮-২০ | বাংলা সংবাদ (৭-২৫ মিনিটে স্টার্টিং সংবাদের পুনঃপ্রচার) |
| ৮-৫০ | খেলাধুলা |
| ৮-৫০ | লোকগীতি |
| ৮-১০ | গীতা দত্ত : রবীন্দ্রসংগীত |
| ১-০০ | কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান |
| ১-৩০ | লোকগীতি |
| ১-৫০ | খেলার গল্প : ধীরাজ |
| ১-১০ | বেলা গুহ প্রফুল্লপ্রসাদের গান |
| ১০-০০ | সমাপ্তি |

দ্বিতীয় রাজধানী

| | |
|---|---|
| ২-৩০ | আধুনিক |
| ২-৫০ | খেলার গল্প : ধীরাজ |
| ৩-০০ | কীর্তন |
| ৩-১০ | খেলাধুলা |
| ৩-২০ | লোকগীতি |
| ৩-৩০ | মিলা কর : রবীন্দ্রসংগীত |
| ৩-৫০ | আধুনিক |
| ৩-৫০ | বেলা গুহ প্রফুল্লপ্রসাদের গান |
| ৪-০০ | হিমাদ্রি রায় । বেহালা |
| ৪-১০ | লোকগীতি |
| ৪-২০ | মিলা কর : রবীন্দ্রসংগীত |
| ৪-৩০ | বেহাগ |
| ৫-০০ | সমাপ্তি |


সহরের সুপরিচিত নিলামঘর

উচ্চাঙ্গের আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জার প্রতি রবিবার নিলামে বিক্রয় করা হয়। নানা ডিজাইন ও নানা রুচিসম্মত জিনিস এখানেই পাওয়া যায়। নিলামের জন্য জিনিস লওয়া হয়।

ষ্টেনর এণ্ড কোং

কমার্শিয়াল এমপোরিয়াম, ২৫বি, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

ফোন ঃ ২৪-১৩০২


• সমর-সংকেত + রাজধানী বেহাগ ঃ এর পর সংবাদ

# কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি

পাহাড়ী বন্ধু : নজরুলগীতি পরিবেশন করবেন আজ ক-এ দুপুর ২-৩০ মিনিটে এবং পূর্বাঞ্চলীয় অনুষ্ঠানে বিকেল ৫-৩০ মি: এবং ৯-২০ মিনিটে

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ বন্দেমাতরম্
৬-০০ সুপ্রভাত
৬-০৫ সংগীতমালা
৬-২৫ চলচ্চিত্রগীতির ঝলক । অধিকা
৬-৩০ সুরের সংগীত
পণ্ডিত রবিশঙ্কর : বেহাগ (বিলম্বিত, মধ্যলয় ও দ্রুতলয় ঝিঁঝিট তেওরা ও বিলম্বিত ঝিঁঝিট ঠুংরি)
(শিলিগুড়ি : বন্দেমাতরম্; অতঃপর সংগীত +)
৬-৫৫ বেদবন্দনা
৬-৫৫ বন্দেমাতরম্
৭-০০ পূবের বন্ধু : রামপ্রসাদ
৭-১০ জাগরণী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
৭-১৫ বিজন মুখোপাধ্যায় শ্যামাসংগীত
৭-২৫ আলো আমার
৭-৩০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৭-৪০ খবরবিচিত্রা : রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ রবিন ভট্টাচার্য ও সহশিল্পিবৃন্দ । সোকসংগীত
(শিলিগুড়ি : ৮-১০ মি: ইংরেজী সংবাদ, সংগীত +)
৮-১৫ অমলা ব্রহ্মঠাকুর । আবৃত্তিক
৮-৩০ হাসিকান্নার মেলা । সংবাদ
১-০০ বাংলা সংবাদ
১-০৫ পূবের বন্ধু : রবীন্দ্রসংগীত
১-১৫ শ্যামসুন্দরীতি
১-৩০ সংবাদ বিচিত্রা
১-৪৫ দুন্দু ঘরাল । রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ রাত্রিকালীন +
১০-০৫ চন্দ্রিমা চৌধুরী । বেতার
১০-৫৫ আজ অনুষ্ঠানসূচীর মেহার
১১-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৫০* রবীন্দ্রসংগীত +
(পূজা অংশের গান)
(শিলিগুড়ি । ১২-৩০ মি:—১টা পর্যন্ত মেলালী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান)
১-০০ বন্দেমাতরম্ (বৈদ্য)
ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সরোদ (পাহাড়ী মল্লার)
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় । বেহাগ (খেয়াল ঠুমরী ও ঝালি)
১-৩০ খবরা সংবাদ
১-৪০ সুরের সংগীত
১-৫০ রবীন্দ্রসংগীত । আজ সবারি: টেরা কি অজনে এলো ।
সংগীতরচনা: রুমা ।
রবিন ভট্টাচার্য; সংগীত পরিচালনা । রবিন ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায়
২-২৫ জাগরণী
২-৩০ ভাটিয়ালী
২-৫০ সুধীন্দ্রকুমার রায় । খাটীর
৩-০০ রবীন্দ্রসংগীত
৩-৩০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৭-১৫ স্পোর্টস্ আরিনা
৭-৫০ গানের ডালি : সোকসংগীত
(শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি । ৫-১৫ মি: সেনাবাহিনীর জন্য অনুষ্ঠান; অতঃপর সংগীত +; ৬টার ইংরেজী সংবাদ; ৬-০৫ মি: হিন্দী সংবাদ; শিলিগুড়ি : ৫-৫৫ মি: স্থানীয় ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৮-০০ খুশির মেলা ও জাদুকরী
৮-০৫ কবিতাবলীর জন্য অনুষ্ঠান
৮-৩৫ পরিচালী গান
৮-৫৫ কৃষিভিত্তিক আলাপ । গ্রামাঞ্চলের কথা । স্পট রেকর্ডিং; কৃষিজীবন সাপ্তাহিক পর্যালোচনা : অংশগ্রহণ; চিঠির উত্তর; দৈনিক বাজার দর, আবহাওয়ার খবর
৯-২০ মরুপথী বাস । কীর্তন (শিলিগুড়ি। বেলালী সংবাদ)
৭-৫৫ খবরা সংবাদ
৭-৪৫ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ বন্দেমাতরম্ দুটি ভিন্ন : অরুণা ভাটিয়া । রবিন্দ্রসংগীত
(শিলিগুড়ি । সংগীত +; ৮-০৫ মি: জলপাইগুড়ি ক-এর অনুষ্ঠান)
৮-১৫ বিজন মুখোপাধ্যায় পুরাতনী
(জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি : ৮-১৫ মি: বিদ্যী ক-এর অনুষ্ঠান: ৮-২৫ মি: জলপাইগুড়ি ক-এর অনুষ্ঠান)
৮-০০ সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত
৮-৫০ দুন্দু ঘরাল । সুরেন্দ্রসংগীত
(শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি । হিন্দী সংবাদ)
১-০০ রাত্রিকালীন মেহার । সংবাদ
(শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি । ইংরেজী সংবাদ; শিলিগুড়ি : ১-১৫ মি:—১-২৫ মি: পর্যন্ত বিদ্যী ক-এর অনুষ্ঠান: জলপাইগুড়ি । ১-১৫ মি: সংবাদ +)
১-৩০ অনুষ্ঠানের আজের + (রবীন্দ্রসংগীত)
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০-০৫ খবরা সংবাদ
১০-১৫ রবিন ভট্টাচার্য ও সহশিল্পিবৃন্দ : সোকসংগীত
১০-০০ সুধীন চক্রবর্তী । আবৃত্তিক
১০-৪০ পূবের বন্ধু
রবীন্দ্রসংগীত
১০-৫০ পরিচিতি : রবীন্দ্রসংগীত
১১-০০ জাগরণী ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০৫ সমবেত গৈত্র : সোকসংগীত
৬-২০ খবরা সংবাদ
৬-৩০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৭-০০ ইংরেজী সংবাদ
৭-০৫ আজ যোগ । খাটীর
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৭-৪০ অনুষ্ঠানসূচনা +
৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-১০ ইংরেজী সংবাদ
৮-২০ বিজন মুখোপাধ্যায় শ্যামাসংগীত
৮-৩০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৯-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৯-০৫ বিজ্ঞান মেলার ঐ ইতিহাস
৯-১০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ রাইসহাইড্রো এর ওয়েস্টার্ন রিটার্নিক
১-৩৫ পাশ্চাত্য সংগীত
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ পাশ্চাত্য সংগীত +
২-৩০ কলকাতা খাটীর ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ খুশির মেলা ও জাদুকরী
৬-১০ সুধীন্দ্রকুমার রায় । খাটীর
৬-২০ সংবাদী গান : কীর্তন
৬-৫৫ রাত্রি অনুষ্ঠানসূচীর মেহার
৭-১০ রাত্রিকালীন
৭-৩০ সুধীন্দ্রকুমার রায় । খাটীর
৭-০৫ রাত্রুল চৌধুরী : বেতার
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (বেতারজগৎ)
৮-০৫ গানের ডালি । সোকসংগীত
৮-১৫ সংবাদ বিচিত্রা (বেতারজগৎ)
৮-২৫ রাত্রিকালীন +
৮-৩৫ দুন্দুর চক্রবর্তী
রবীন্দ্রসংগীত
৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ
১-০০ ইংরেজী সংবাদ

১-১৫ চিত্রলেখা অনুষ্ঠান
১-২৫ অনুষ্ঠানসূচনা +
১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-৪০ স্থানীয় খাটীর
১০-০০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১০-৫০ ডিস্কে বি ইন্দ্রে
১১-০০ জাগরণী ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—১-০০ মি: ১০-১৫ মি:—১২-৫০ মিনিট; দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মি:

পূর্বাঞ্চলীয় ছোটদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন ৩০৮-৩ মী:)

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ খবরা সংবাদ (৫-২৫ মিনিট স্থানীয় সংবাদের পুনরাবৃত্তি)
৮-৩০ বেদবন্দনা
৮-৪০ খবরা সংবাদ
রবীন্দ্রসংগীত
৮-৫০ কবিতা বিতান : সোকসংগীত
১-০০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
১-০৫ ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায় বেতারে
১-২০ রবীন্দ্রসংগীত
১-৩০ আজ যোগ : খাটীর
১-৪০ সংবাদী গান : কীর্তন
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-০০ আজ যোগ : খাটীর
২-৪০ কবিতা বিতান : সোকসংগীত
২-৫০ খবরা সংবাদ
রবীন্দ্রসংগীত
৩-০০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৩-৪০ কবিতা বিতান । সোকসংগীত
৩-১০ বেদবন্দনা
৪-০০ খবরা সংবাদ
রবীন্দ্রসংগীত
৪-১০ প্রবীণকুমার রায় : খাটীর
৪-৩০ রাত্রিকালীন মেহার : সংবাদ
৫-০০ সমাপ্তি


## গীত বীথিকা

প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী অনুমোদিত ৬৩, বালিকা মহাবিদ্যালয়, কলি-১৯ সংলগ্নে—মানবেন্দ্র মুখার্জী, অনুপ ঘোষাল, অনুপ ঘটক, অরুণ ভট্টাচার্য, প্রবীণা বিশেষজ্ঞ, অমল গুপ্ত, সুবোধ গাঙ্গুলী, প্রসেনজিৎ মজুমদার, অমলী ঘোষ, মহেন্দ্রদেব মিশ্র, প্রভাতের নদী (টেকনো ও অনুরূপ) গীতির ও শিক্ষায় আধুনিকতম মান সরবরাহ।

মুহূর্তে—প্রতিশব্দের।

ক্রিয়া শিক্ষালয়ের ক্রিয়ারে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা আছে।

বিকাল : ৫টা—৮টা

৬৩ বালিকা মহাবিদ্যালয়

ফোন : ৪৪-০০১৮


* সমস্ত সংগীত + রবীন্দ্রসংগীত বেতার ‡ এর পর সংবাদ

# কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আসরবরলা

ঘুনিরাম মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করবেন আজ পূর্বাঞ্চলীয় অনুষ্ঠানে সকাল ১-৩০ মিঃ, দুপুর ২-৩০ মিঃ ও বিকেল ৩-৩০ মিনিটে

•

প্রথম অধিবেশন

৭-১১ বন্দেমাতরম্
৭-০০ সুপ্রভাত
৭-০১ সংবাদবাহার
৭-১৫ চলচ্চিত্রের জগৎ : আলোচনা
৭-৩০ সুপ্রভ সংগীত :
শিল্পীঃ রবিশঙ্কর ঃ সেতার
(ইমন, আলম, ভৈরব, চন্দ্রকৌশী ও দুরবেশী)
৮-৫৪ সেতারবাদন
৮-১৫ বন্দনাসংগীত
৭-০০ প্রতিভা অন্বেষণালয় ঃ ভজন
৭-১০ আসরবাড়ী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
৭-২১ শিক্ষামূলক ঃ ব্যায়াম
৭-২৭ বাংলা সংবাদ
৭-৩১ আঞ্চলিক সংবাদ (বাংলা)
৭-৫০ আজকের কোলকাতা
রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ সুপ্রভাত গান ও সমবেতনৃত্য : লোকগীতি
৮-১১ প্রতিভা অন্বেষণালয় অনুষ্ঠান
৮-২৫ ফ্লোরা ডিটে
বাঙালীনা ঃ নিলীন বসু
৮-৫০ সুপ্রভাত বন্দনাগান ঃ ভজন
(শিলিগুড়ি ঃ সমাপ্তি)
১-০০ বাংলা সংবাদ
১-০৫ সুপ্রিয়া গুহ ঃ রবীন্দ্রসংগীত
১-১৫ আঞ্চলিক
১-৫০ বিচিত্রা ঃ বাংলা ভূমিক
১-৪৫ শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম
রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ আবহসংগীত +
১০-০৩ আজকের শিল্প
আলাপ ও ভূমিকা
১০-৩১ সুপ্রভাত বন্দনাগান
ভজন
১১-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৫০* রবীন্দ্রসংগীত +
(বাজে বিকাশ সূত্রে)
১২-৫০ আঞ্চলিক +
১-০০ ভাঁজনের ঘোলা
বেতার (আসরবরলী চৌরি)
১-৩০ বাংলা সংবাদ
১-৫০ সুপ্রভ সংগীত
১-৫০ রঙিন গান : মেহেদা
২-০০ বিচিত্রিতা +
২-২৬ আসরবাড়ী
২-৩০ আমার বন্ধু ঃ আজকালকার
২-৫০ আজকালকের গান
২-৫০ রঙিন গান : মেহেদা
৩-০০ আলোচনা
৩-৩০ সমাপ্ত

তৃতীয় অধিবেশন

৬-১৫ স্পোর্টস্ আওয়ার্ল্ড
৬-৩০ আমার বন্ধু : আজকালকার
৬-০০ স্থানীয় সংবাদ ও আসরবাড়ী
৬-০১ শাঁখবাজনের জন্য অনুষ্ঠান
(আসরবরলা ঃ সমাপ্তি +)
৬-১১ ছোটদের আসর :
বিষয় : বুদ্ধদেব ঃ কথা ও
পরিকল্পনা : নির্মল বসু;
বুদ্ধদেব কথা; চিঠির উত্তর
৬-৪৫ শ্রীমতী বেতারবাণীর অনুষ্ঠান।
আজ বেলের সরবত তৈরি
করবেন রত্না। আলোচনা;
সমবেতা; চুটকির উত্তর;
চিঠির উত্তর এবং;
আজকালের খবর
৭-২৫ জীবনমুক্ত কথার পুরোহানী
৭-৫০ বাংলা সংবাদ
৭-৫১ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ শিল্পী সংঘ : সোকগীতি
৮-১৫ আজকের দেশ : রবীন্দ্রসংগীত
(আসরবরলা ও শিলিগুড়ি।
৮-১৫ মিঃ শিল্পী ঘ-এর
অনুষ্ঠান; ৮-২৫ মিঃ
কলকাতা ঘ-এর অনুষ্ঠান)
৮-৩০ সমাজিক প্রসঙ্গ/সংবাদ
৮-৪৫ সুচিত্রা গান ঃ আজকালকার
(শিলিগুড়ি ও আসরবরলা।
হিন্দী সংবাদ)
১-০০ শিক্ষামূলক দেশ
আজকাল
(শিলিগুড়ি ও আসরবরলা।
ইংরেজী সংবাদ; শিলিগুড়ি।
১-১০ মিঃ—১-২৫ মিঃ
পর্যন্ত শিল্পী ঘ-এর অনুষ্ঠান;
আসরবরলা ঃ ১-১৫ মিঃ
সমাপ্তি —)
১-১৫ সংবাদ পরিক্রমা
১-২০ বাংলা সংবাদ
১-৩০ আমার সেরাগুলি
রবীন্দ্রসংগীত
(শিলিগুড়ি ও আসরবরলা।
১-৩০ মিঃ আমার তমরটীর
বাসরঘরে কবিতা; ১-৪৫ মিঃ
সমাপ্তি +)
১-৪০ বিচিত্রা ঃ
নির্বাচিত লোকগীতি;
পরিচালনায় ঃ বুদ্ধদেব গুহ
ও সন্ধ্যামিত্রা বসু
১-০০ ক্রমবিকাশ মিউজিক কনসার্ট
মানসী দাস ঃ কণ্ঠসংগীত
(শিল্পী থেকে পুনঃপ্রচার)
১১-০০ আসরবাড়ী ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৩০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০১ শিবানী বসু ঃ লোকগীতি
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৫০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৭-০০ ইংরেজী সংবাদ
৭-০১ রঙিন গান ঃ মেহেদা
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৭-৫০ শ্রীকান্তকুমার গান : পরিচয়
৭-৫৫ হিন্দী শিক্ষা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-১০ ইংরেজী সংবাদ
৮-২০ আমার বন্ধু
অতুলপ্রসাদের গান
৮-৫০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান
৯-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৯-০১ বিষ্ণু ঘোষের হিন্দ ইংরিশ
৯-১০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০১ হাইলাইটস্ অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক
১-০৮ গানগুলি সবটার +
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ গানগুলি সবটার +
২-৫০ কথার পরিবর্তে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০১ স্থানীয় ঘোষণা ও আসরবরলী
৬-১০ কলকাতা কিছু
আলাপ ও বাজনা
৬-৫০ ভাঁজনগীতি
৬-৫৫ বিশিষ্টজনের সঙ্গে
আলাপচারী
৬-৫৫ কলকাতা/কলকাতা।
হিন্দী অনুষ্ঠান; আঞ্চলিক +
৭-১৫ আসরবাড়ী
৭-০০ আজকালকার +
৭-০৫ বুদ্ধদেব গুহসংগীত। সংবাদ
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (ঘোষণা)
৮-০৫ ঘোষণা কিছু। ঠুংরী
৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা
(ইংরেজী)
৮-২৫ আঞ্চলিক +
৮-৩৫ ভাঁজনগীত কলকাতা
পরিচালনায়
৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-১৫ উচ্চাঙ্গ অনুষ্ঠান
৯-২৫ আজকালকার +
৯-৩০ আমার তমরটীর বাসরঘরে কবিতা
(হিন্দী থেকে পুনঃপ্রচার)
৯-৪৫ কলকাতা/কলকাতা +
১০-০০ আজকাল সংবাদ +
১০-০৩ সুচিত্রা গান ঃ রবীন্দ্রসংগীত
১০-৫০ ভাঁজনগীত কলকাতা
পরিচালনায়

১০-৩০ প্রতিভা অন্বেষণালয়
আঞ্চলিক
১১-০০ আসরবাড়ী ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

শিশু আসরী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিনিট; দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিনিট

পূর্বাঞ্চলীয় প্রোগ্রামের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
(৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি)
৮-৩০ ঘোষণা
৮-৪০ আজকালকার
৮-৫০ পরিমল চক্রবর্তী ঃ লোকগীতি
৯-০০ কলকাতা ক-এর অনুষ্ঠান

আলো হাতে ঃ আঞ্চলিক, ব্যায়াম-সংগীত ও কীর্তনশিল্পী

১-০৫ নির্মাল ঘোষ ঃ আঞ্চলিক
১-১৫ ঘোষণা কিছু ঃ ঠুংরী
১-৪০ শ্রীকান্তকুমার গান ঃ পরিচয়
১-৫০ লোকগীতি
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৪০ শ্রীকান্তকুমার গান ঃ পরিচয়
২-৫০ পরিমল চক্রবর্তী ঃ লোকগীতি
৩-০০ নির্মাল ঘোষ ঃ আঞ্চলিক
৩-১০ ঘোষণা
৩-২০ ভজনীকান্তর গান
৩-৪০ নির্মাল ঘোষ ঃ আঞ্চলিক
৩-৫০ পরিমল চক্রবর্তী ঃ লোকগীতি
৪-০০ রঙিন গান ঃ মেহেদা
৪-১০ আঞ্চলিক
৪-২০ ঘোষণা
৪-৫০ ঘোষণা কিছু ঃ ঠুংরী
৫-০০ সমাপ্তি

শ্রীতি বালা
১০-বি, ডাফ, ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
সকল প্রকার কটকারী, সেলাই ও মিহিকলা শেখানো হয়।
পত্রদ্বারা যোগাযোগ করুন।
পরিচালিকা—
শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

* সমর-সংকেত + অনুষ্ঠান ঘোষণা ‡ এই পর সংবাদ

# কলকাতা

ক

## শিল্পিসংঘ ও আকাশবাণী

জ্যোৎস্নেশ্বর খান : আকাশবাণী কলকাতার লোকগীতিশিল্পী

•

**প্রথম অধিবেশন**

৫-৫৫ বন্দেমাতরম্
৬-০০ সুপ্রভাত
৬-০৫ সংবাদশিল্পাঞ্জলি
৬-২৫ রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি : কণিকা
৬-৫০ সুরেশ সমাদ্দার ।
জন্মদিন সভা : বেসরা (মেঘ ছৈরব, সভাঁ টোড়ি, সোহিনী ছৈরব ও ছৈরবী)
৮-৪৫ বেদমন্ত্রপাঠ
৮-৫৫ রেডিও কর্মচারী সংঘের গীতিনাট্য
৭-০০ রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী
৭-১০ রামবরাটী ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
৭-১৫ মজহারুলহক্ •
৭-২৫ আজকের আবহাওয়া
৭-৩৫ শ্যামলী সংঘের (বাংলা)
৭-৪০ গীতা বসু ও রবীন্দ্রসঙ্গীত
৮-০০ গীতিনাট্য : লোকগীতি
৮-১৫ রামায়ণিক
৮-৩০ শিপ্রিসেনা বন্দ্যোপাধ্যায় বেহালা
৯-০০ বাংলা সংবাদ
৯-০৫ রেডিও বিশ্বাস রবীন্দ্রসঙ্গীত
৯-১৫ পঙ্কজ বসু : রামায়ণিক
৯-৩০ গোরক্ষনাথ । হাস্যকৌতুক
৯-৪৫ বিভা চক্রবর্তী । রবীন্দ্রসঙ্গীত
১০-০২ প্রসঙ্গকথন +
১০-০৫ মুকুলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ
১০-৫৫ ইন্দিরা দেবনাথ । সেতার
১১-০০ সমাপ্তি

**দ্বিতীয় অধিবেশন**

১২-০০* রবীন্দ্রসঙ্গীত + (ঘন্টার ও কীর্তনাঙ্গের গান)
১২-৫০ রামায়ণিক •
১-০০ রেডিও চৌধুরী । সেতার
১-৫০ বাংলা সংবাদ
১-৫০ সুপ্রভা সরকার
১-৩০ রবীন্দ্রসঙ্গীত ।
সবিতেন্দ্র পাঠ । রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা; রেকর্ডে বিভিন্ন শিল্পীর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের তুলনামূলক বিচার । সিলেক্ট ও সংকলিতে: সবিতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় । কানন দেবী ও সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়
২-২৯ রামবরাটী
২-৩০ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায় গীতিনাট্য
২-৪০ পম্পা বসু । রবীন্দ্রসঙ্গীত
২-৫০ প্রসঙ্গকথন বন্দ্যোপাধ্যায় লোকগীতি
৩-০০ নন্দিতা বসু : রামায়ণিক
৩-১০ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের গীতিনাট্য
৩-২০ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায় লোকগীতি
৩-৩০ সমাপ্তি

**তৃতীয় অধিবেশন**

৪-১৫ সেতারিন্ বাদ্যিকম
৪-৫০ রবীন্দ্র গান ও সবিতেন্দ্রসংগীত : লোকগীতি
৫-০০ শ্যামলী যোগেন্দ্র ও রামবরাটী
৫-০৫ বাঙালীজীবনের ছন্দ অনুষ্ঠান
৫-৫৫ বিচিত্রানুষ্ঠান ।
তুলসীদাস । বিদ্যা: জ্ঞানী । সুবিনয়ের মুখোপাধ্যায়; পরিবেশনায় । যোগীন্দ্রের অধিকারী ও সম্প্রদায়
৭-২৫ রেডিও বিশ্বাস রবীন্দ্রসঙ্গীত
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৫০ শ্যামলী
৭-৫০ শ্যামলী সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্তন
৮-১৫ গীতা বসু । রবীন্দ্রসঙ্গীত
৮-৫০ সামাজিক প্রসঙ্গ/সংগীত
৮-৫০ শ্যামলী সাহিত্যে বাঙালি । বাংলা কবিতা । ঃ অবলম্বনে যোগমন্ত্রী
১-০০ শ্যামলী সংগীত
১-৫০ অনুরোধের আসর •
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০-০৫ বাংলা সংবাদ
১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা
১০-৫০ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায় লোকগীতি
১০-৪০ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণিক
১০-৫০ রেডিও বিশ্বাস রবীন্দ্রসঙ্গীত
১১-০০ রামবরাটী ও সমাপ্তি

## কলকাতা খ

**প্রথম অধিবেশন**

৫-৫৫ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ
৬-০৫ সবিতেন্দ্র গান ও সবিতেন্দ্রসংগীত লোকগীতি
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৫০ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ
৭-০১ হিরণ্ময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গীতিনাট্য
৭-১৫ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায়
৭-৪০ চৌধুরী মুকুলরঞ্জন মুকুলরঞ্জনের গান
৭-৫৫ হিন্দী বিভা :
৮-২০ পঙ্কজ বসু : রবীন্দ্রসঙ্গীত
৮-৫০ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায়
৯-০০ সংক্ষিপ্ত সংবাদ
৯-০৫ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ইন্দ্র ইন্দিরা
৯-১০ সমাপ্তি

**দ্বিতীয় অধিবেশন**

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায়
১-০৯ সমাজের সংগীত ।
১-১০ সমাজের সংগীত •
২-০০ রবীন্দ্র গীতিনাট্যে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

**তৃতীয় অধিবেশন**

৪-০০ ইংরেজী সংবাদ
৪-০৫ শ্যামলী যোগেন্দ্র ও রামবরাটী
৪-১০ মুকুলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন্দ্র
৪-৫৫ গীতিনাট্য : লোকগীতি
৪-৫৯ অনুষ্ঠান ভাইরেক্ট । রেডিও
৪-৫৯ রেডিওনাট্যকারী ঘোড়াগাড়ির ঘন্টা : রবীন্দ্রসঙ্গীত ঘন্টা: গীতিনাট্য •
৭-১৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত
৭-৩০ নন্দিতা বসু । রামায়ণিক
৭-৩৫ যোগেন্দ্রনাথ । হাস্যকৌতুক
৭-৩০ সুপ্রভা বসু । রেডিও
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (বেতারজগৎ)
৮-০৫ হিন্দী কার্যক্রম
৮-৫০ লোকগীতি •
৮-৫৫ বিভা চক্রবর্তী : রবীন্দ্রসঙ্গীত
১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-১৫ উচ্চাঙ্গ অনুষ্ঠান
১-২৫ রেডিওনাট্যকারী +
১-৩০ ইংরেজী আধুনিক
১-৫০ শ্যামলী সংগীত •
১০-০৫ শ্যামলী সংগীত +
১০-৫০ শিপ্রিসেনা বন্দ্যোপাধ্যায় বেহালা
১১-০০ রামবরাটী ও সমাপ্তি

## কলকাতা গ

**বিভিন্ন ভাষার অনুষ্ঠান**

সকাল ৭টা—৯-৫০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৫০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-১০ মিঃ

**অনিবার্য কারণবশতঃ বিজ্ঞাপিত কয়েকটি রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। এজন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।**

**পূর্বাঞ্চলীয় ভ্রাতৃসংঘের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান**

**প্রথম অধিবেশন**

৮-২০ বন্দনা সংগীত
৮-৩০ বেদপাঠ
৮-৪০ ভাষিকা চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত
৮-৫০ প্রসঙ্গকথন বন্দ্যোপাধ্যায় লোকগীতি
৯-০০ রেডিও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ
৯-০১ পম্পা বসু অনুষ্ঠানের গান
৯-১৯ নন্দিতা বসু : কীর্তন
৯-৩০ ভাষিকা চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত
৯-৫০ জগদীশ খাস ও সহযোগিবৃন্দের । লোকগীতি
১-১০ হিরণ্ময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গীতিনাট্য
১০-০০ সমাপ্তি

**দ্বিতীয় অধিবেশন**

২-৩০ গীতিনাট্য । লোকগীতি
২-৫০ বিভা চক্রবর্তী : কীর্তন
২-৩০ হিরণ্ময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গীতিনাট্য
৩-০০ বেদপাঠ
৩-১০ ইন্দিরা দেবনাথ : সেতার
৩-৩০ প্রসঙ্গকথন বন্দ্যোপাধ্যায় লোকগীতি
৩-৫০ পম্পা বসু । রবীন্দ্রসঙ্গীত
৩-৩০ চৌধুরী মুকুলরঞ্জন মুকুলরঞ্জনের গান
৪-০০ ভাষিকা চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত
৪-১০ প্রসঙ্গকথন বন্দ্যোপাধ্যায় : গীতিনাট্য
৭-২০ মুকুলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লোকগীতি
৭-৩০ শিপ্রিসেনা বন্দ্যোপাধ্যায় বেহালা
৪-০০ সমাপ্তি


শুধুমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের একমাত্র শিক্ষায়তন

গীতবাণী

৫, উমেশ মুখার্জী রোড, বেলঘরিয়া
কলিকাতা-৫৩
ফোন : ৫৮-১৪১৬

শিক্ষকবৃন্দ : কমলা বসু • অমূল্য খাস • অশোক মুখার্জী অমল মুখোপাধ্যায় • বিশ্বনাথ বসু ও মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়

উপাধি : গীতবাণী


• প্রথম-সম্প্রচার + প্রযোজনা বেতার ঃ এর পর সংবাদ

# যুববাণী

২৭৫-২ ফ্রিকোয়েন্সি

তপতী চট্টোপাধ্যায় : যুববাণীর আধুনিক গানের শিল্পী

### ১ অক্টোবর, ১৯৭৫

প্রত্যূষী অধিবেশন

৭·০০ জাগরণ গান :
ধূর্জটি : রবীন্দ্রসংগীত
৭·০৫ দিনের জাগরণ
৭·১০ রাস-বন্ধু :
শঙ্কর মুখোপাধ্যায় : সেতার
উমেশ সংগীতশ্রী : বিজয় মুখোপাধ্যায়
৭·৫০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·৫৫ সুরের আসর :
কুমার মুখোপাধ্যায় : পঞ্চীত
৭·৫০ জাগরণের গান :
শ্রীদীপ মজুমদার :
আধুনিক ও রঙ্গন
৮·০০ বাংলা কবিতা
৮·১০ গীতিআলেখ্য :
ধূর্জটি : রবীন্দ্রসংগীত
৮·২০ সুরলহরী ।
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় : পঞ্চীত
৮·২৫ বিহঙ্গের গান :
বিজলী সেনগুপ্ত : আধুনিক
৮·৫১ বাংলা সংবাদ
৮·৫০ ভজনগীতি +
৮·৫১ যুবমঞ্চ
১·০০ সমাপ্তি

মধ্যম অধিবেশন

৭·০০ আজ ও আগামীর যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·০১ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭·৫০ ফ্রেঞ্চহর্ন
৭·৫০ তবলাবাদ্য
৮·০০ ইংরেজী সংবাদ (ফেলারুদ্ধা)
৮·০১ চিত্রিতা
৮·২০ সাহসিক কথিকা
৮·০০ সুরভারতী :
কুমার মুখোপাধ্যায় : পঞ্চীত
৮·০১ বাংলা সংবাদ
৮·৪০ ছায়া-বন্ধু :
সন্ধ্যারিতা মিত্র । সেতার
৯·০০ কবির সুরে গান । সুরবীথি ।
নজরুলগীতি
৯·১৫ সংবাদ আলোচনা
৯·৩০ সংগীত বৈচিত্র্য । সুরবীথি ।
লঘুসংগীত
পত্রী অনুষ্ঠানমালার :
চলচ্চিত্রম
১০·০০ সমাপ্তি

### ২ অক্টোবর, ১৯৭৫

প্রত্যূষী অধিবেশন

৭·০০ জাগরণ গান ।
ধূর্জটি মেত্র : রবীন্দ্রসংগীত
৭·০১ দিনের জাগরণ
৭·১০ রাস-বন্ধু
৭·৫০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·৫১ সুরের আসর
৭·৪০ জাগরণের গান :
শ্রীদীপ মজুমদার :
আধুনিক ও রঙ্গন
৮·০০ বাংলা কবিতা
৮·১০ গীতিআলেখ্য ।
ধূর্জটি মেত্র : রবীন্দ্রসংগীত
৮·২০ সুরলহরী
৮·২১ বিহঙ্গের গান :
শ্রীদীপ মজুমদার । আধুনিক
৮·৫১ বাংলা সংবাদ
৮·৪১ ভজনগীতি +
১·০০ সমাপ্তি

মধ্যম অধিবেশন

৭·০০ আজ ও আগামীর যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·০১ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭·৪০ ফ্রেঞ্চহর্ন
৭·৫০ তবলাবাদ্য
৮·০০ ইংরেজী সংবাদ (ফেলারুদ্ধা)
৮·০১ বিষয়ের ছিন্ন গান +
৮·৫০ সুরভারতী
৮·৫১ বাংলা সংবাদ
৮·৪০ ছায়া-বন্ধু
১·০০ কবির সুরে গান :
ধূর্জটি মেত্র ।
অরুণাচলমের গান
১·১১ আজার পড়া আছে ।
বিমলাংশু মুখোপাধ্যায়
১·২১ সুরভারতী
১·৫০ আজের বৈচিত্র্য :
ধূর্জটি মেত্র । রবীন্দ্রসংগীত,
শ্রীদীপ মজুমদার । আধুনিক
ও রবীন্দ্রসংগীত
১০·০০ সমাপ্তি

### ৩ অক্টোবর, ১৯৭৫

প্রত্যূষী অধিবেশন

৭·০০ জাগরণ গান
৭·০১ দিনের জাগরণ
৭·১০ রাস-বন্ধু
৭·০০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·৫১ সুরের আসর ।
বিজেন্দ্রনাথ রায় । পঞ্চীত
৭·৪০ জাগরণের গান
৮·০০ বাংলা কবিতা
৮·১০ গীতিআলেখ্য
৮·২০ সুরলহরী
৮·২১ বিহঙ্গের গান
৮·৫১ বাংলা সংবাদ
৮·৫০ সান্ধ্যসংগীত +
১·০০ সমাপ্তি

মধ্যম অধিবেশন

৭·০০ আজ ও আগামীর যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·০১ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭·৫০ ফ্রেঞ্চহর্ন
৭·৫১ তবলাবাদ্য
৮·০০ ইংরেজী সংবাদ (ফেলারুদ্ধা)
৮·০১ বাংলার আলোচনা
৮·৫০ সুরভারতী :
বিজেন্দ্রনাথ রায় : পঞ্চীত
৮·০১ বাংলা সংবাদ
৮·৪০ ছায়া-বন্ধু
১·০০ কবির সুরে গান
১·১১ বেতারশ্রুতির উত্তর
১·২১ সুরভারতী ।
বিজেন্দ্রনাথ রায় । পঞ্চীত
১·৫০ আজ রাত্রিজাগরণ
১০·০০ সমাপ্তি

### ৪ অক্টোবর, ১৯৭৫

প্রত্যূষী অধিবেশন

৭·০০ জাগরণ গান
৭·০১ দিনের জাগরণ
৭·১০ রাস-বন্ধু :
সন্ধ্যারিতা মিত্র । সেতার
৭·৫০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·৫১ সুরের আসর
৭·৪০ জাগরণের গান । সুরবীথি :
নজরুলগীতি ও লঘুসংগীত
এষা পত্রী অনুষ্ঠানমালার :
আধুনিক ও রঙ্গন
৮·০০ এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন । তারা কথা কয়ে না, কেবল ব্যথার কথা ভেবে । কথিকা—প্রবীর ঘোষ
৮·১০ গীতিআলেখ্য
৮·২০ সুরলহরী
৮·২১ বিহঙ্গের গান ।
পত্রী অনুষ্ঠানমালার ।
আধুনিক
৮·৫১ বাংলা সংবাদ
৮·৪০ তবলাবাদ্য গান +
১·০০ সমাপ্তি

মধ্যম অধিবেশন

৭·০০ আজ ও আগামীর যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·০১ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭·৪০ ফ্রেঞ্চহর্ন
৭·৫০ তবলাবাদ্য
৮·০০ ইংরেজী সংবাদ (ফেলারুদ্ধা)
৮·০১ চিত্রিতা উচ্চর
৮·১০ চেকিত
৮·৫০ সুরভারতী
৮·৫১ বাংলা সংবাদ
৮·৪০ ছায়া-বন্ধু :
সন্ধ্যারিতা মিত্র । সেতার
১·০০ কবির সুরে গান । সুরবীথি ।
নজরুলগীতি
১·১১ সংবাদ আলোচনা
১·৩০ সংগীত বৈচিত্র্য । সুরবীথি ।
লঘুসংগীত
পত্রী অনুষ্ঠানমালার :
চলচ্চিত্রম
১০·০০ সমাপ্তি

প্রবীর ঘোষ : যুববাণী-তে কথিকা বলবেন আজ সকাল ৮টায়

### ৫ অক্টোবর, ১৯৭৫

প্রত্যূষী অধিবেশন

৭·০০ জাগরণ গান
৭·০১ দিনের জাগরণ
৭·১০ রাস-বন্ধু :
জয়ন্তী সিংহ । সেতার
৭·৫০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·৫১ সুরের আসর :
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : বেহালা
৭·৪০ জাগরণের গান :
সবিতা দত্ত : রবীন্দ্রসংগীত ও আধুনিক এবং হালকা-লহরী । তালবাদ্য
৮·০০ বাংলা কবিতা
৮·১০ গীতিআলেখ্য
৮·২০ সুরলহরী ।
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : বেহালা
৮·২১ বিহঙ্গের গান :
সবিতা দত্ত । আধুনিক
৮·৫১ বাংলা সংবাদ
৮·৪০ ছায়ালোকা গান +
১·০০ সমাপ্তি

মধ্যম অধিবেশন

৭·০০ আজ ও আগামীর যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·০১ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭·৪০ ফ্রেঞ্চহর্ন :
লায়লাবেগম : লোকসংগীত
৭·৫০ তবলাবাদ্য
৮·০০ ইংরেজী সংবাদ (ফেলারুদ্ধা)
৮·০১ সংবাদ আলোচনা
৮·০০ সুরভারতী ।
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : বেহালা
৮·০১ বাংলা সংবাদ
৮·৪০ ছায়া-বন্ধু :
জয়ন্তী সিংহ । সেতার
১·০০ কবির সুরে গান
১·১১ বুকের ভাষা ধ্বনির ভেতর ।
ইংরেজীতে পশ্চাতে পর্যালোচনা
১·২১ সুরলহরী ।
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ।
বেহালা

* সমর-সংকেত + রেকর্ডের ‡ এর পর সংবাদ

১-৩০ গানের রেকর্ড
শ্রোতাসাধারণী : রবীন্দ্রসঙ্গীত
শিল্পীর নাম : নজরুলগীতি
ও অতুলপ্রসাদ এবং রজনী
সিংহ : ভজন
১০-০০ সমাপ্তি

**৬ অক্টোবর, ১৯৭৫**

**প্রথমী অধিবেশন**

৭-০০ আলোর গান :
শ্রোতাসাধারণী নাম : রবীন্দ্রসঙ্গীত
৭-০৫ দিনের আলোয়
৭-১০ বাক-চিত্র :
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের : শ্রোতৃবৃন্দ
৭-৩০ খবরাখবর (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-৩১ সূর্যের আলো
৭-৫০ নামকরণের গান :
শিশু নজরুলের :
নজরুলগীতি
৮-০০ বাংলা কবিতা
৮-১০ পরীক্ষাগার :
শ্রোতাসাধারণী নাম : রবীন্দ্রসঙ্গীত
৮-২০ সূর্যমহরী
৮-২৫ বিশ্বসংবাদ গান :
শিশু নজরুলের : অতুলপ্রসাদ
৮-৩১ বাংলা সংবাদ
৮-৫০ বন্দেমাতরম্ -
৮-৫৫ সূর্যস্তব
৯-০০ সমাপ্তি

**সন্ধ্যা অধিবেশন**

৭-০০ আজ ও আগামী রবিবারী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০১ পাশ্চাত্য সঙ্গীত
৭-৫০ ফ্রেঞ্চহর্ন
৭-১০ রবীন্দ্রসঙ্গীত
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (ফেলারুদা)
৮-০১ ইংরেজ জাট ওয়ার্ক
৮-১০ সূর্যবন্দনা
৮-১৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ বাক-চিত্র :
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের : শ্রোতৃবৃন্দ
৯-০০ কবির সুরে গান :
শিশু নজরুলের : রবীন্দ্রসঙ্গীত
এবং রজনীকান্ত সেন :
নজরুলগীতি
৯-২৫ ফেলারুদার কথা
৯-২৫ সূর্যকরোজ্জ্বল
১-৩০ আজকের সংবাদ
১০-০০ সমাপ্তি

**৭ অক্টোবর, ১৯৭৫**

**প্রথমী অধিবেশন**

৭-০০ আলোর গান
৭-০৫ দিনের আলোয়
৭-১০ বাক-চিত্র
৭-৫০ খবরাখবর (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-৫১ সূর্যের আলো
৭-৫৯ নামকরণের গান :
শিশু বন্দে : নজরুলগীতি ও
আতুলপ্রসাদ এবং উচ্চ
সঙ্গীতের : শ্রোতৃবৃন্দ
৮-০০ বাংলা কবিতা
৮-১০ পরীক্ষাগার
৮-২০ সূর্যমহরী
৮-২৯ বিশ্বসংবাদ গান :
শিশু বন্দে : অতুলপ্রসাদ
৮-৩১ বাংলা সংবাদ
৮-৫০ বন্দেমাতরম্
৮-৫৫ সূর্যস্তব
৯-০০ সমাপ্তি

**সন্ধ্যা অধিবেশন**

৭-০০ আজ ও আগামী রবিবারী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০১ পাশ্চাত্য সঙ্গীত
৭-৫০ ফ্রেঞ্চহর্ন
৭-১০ রবীন্দ্রসঙ্গীত
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (ফেলারুদা)
৮-০১ ইংরেজ জাট ওয়ার্ক
৮-১০ সূর্যবন্দনা
৮-১৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ বাক-চিত্র :
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের : শ্রোতৃবৃন্দ
৯-০০ কবির সুরে গান :
শিশু নজরুলের : রবীন্দ্রসঙ্গীত
এবং রজনীকান্ত সেন :
নজরুলগীতি
৯-২৫ ফেলারুদার কথা
৯-২৫ সূর্যকরোজ্জ্বল
১-৩০ আজকের সংবাদ
১০-০০ সমাপ্তি

**৮ অক্টোবর, ১৯৭৫**

**প্রথমী অধিবেশন**

৭-০০ আলোর গান
৭-০৫ দিনের আলোয়
৭-১০ বাক-চিত্র :
ইন্দিরা গান্ধী : শ্রোতৃবৃন্দ
৭-৫০ খবরাখবর (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-৫১ সূর্যের আলো
৭-৫৫ নামকরণের গান :
শিশু বন্দে : অতুলপ্রসাদ
ও নজরুলগীতি

প্রতিভা দাস : যুববাণীর অনুষ্ঠান-প্রযোজনা ও নামসংগীতশিল্পী

৮-০০ বন্দনা অধিকারী
৮-২০ গীতিআলেখ্য
৮-২০ মুখোমুখী
৮-২৫ নিবন্ধের গান।
শ্রীপতি মাহুড়ী : অর্ঘ্যনিবেদন
৮-৩৫ বন্দনা সংঘের
৮-৪০ ভজনামালা গান +
১-০০ সমাপ্তি

সন্ধ্যা অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০৫ পল্লীগীতি সংসদ
৭-৫৫ রেডিওনাটক। নিবন্ধ গান : লোকগীতি
৭-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলো)
৮-০১ ওয়েদার রিপোর্ট +
৮-১০ মুখোমুখী
রমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য : গীতিনাট্য
৮-৩১ বন্দনা সংঘের
৮-৫০ ছায়া-ছবি :
বন্দনের সাঁঝে : খেয়াল
১-০০ কবির সুরে গান :
তাপসী সেন এবং নিবন্ধ গান:
রবীন্দ্রসংগীত
১-১৫ সমাপন ঘোষণা
১-২৫ মুখোমুখী।
রমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। গীতিনাট্য
১-৩০ গানের মৈত্রী।
নিবন্ধ গান। রবীন্দ্রসংগীত,
গীতি নাট্য। শ্যামাসংগীত ও
আধুনিক এবং তাপসী সেন:
রবীন্দ্রসংগীত ও ভজন
১০-০০ সমাপ্তি

## ১০ অক্টোবর, ১৯৭৪

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আজের গান।
সুদীপ্তা চৌধুরী :
রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ দিনের আলোয়
৭-১০ ছায়া-ছবি :
রবীন্দ্রসংগীত। নিবন্ধ গান। সেতার,
তবলা সহযোগিতায় :
রমেন্দ্রনাথ পাল
৭-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-৩৫ মুখের আলো।
রমেন্দ্রকান্তি চৌধুরী। গীতিনাট্য
৭-৫০ শ্যামাসংগীত গান।
নিবন্ধ গান : অর্ঘ্যনিবেদন
৮-০০ বন্দনা অধিকারী
৮-১০ গীতিআলেখ্য :
সুদীপ্তা চৌধুরী :
রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ মুখোমুখী।
রমেন্দ্রকান্তি চৌধুরী। গীতিনাট্য
৮-২৫ নিবন্ধের গান।
নিবন্ধ গান : অর্ঘ্যনিবেদন
৮-৩০ বন্দনা সংঘের
৮-৪০ পল্লীগীতি সংসদের +
১-০০ সমাপ্তি

সন্ধ্যা অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০৫ পল্লীগীতি সংসদ

৭-৫০ রেডিওনাটক
৭-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলো)
৮-০১ ইংরেজী আবহসংগীত
৮-৩০ মুখোমুখী।
রমেন্দ্রকান্তি চৌধুরী : গীতিনাট্য
৮-৩১ বন্দনা সংঘের
৮-৫০ ছায়া-ছবি :
অর্ঘ্যনিবেদন : মেহতাব, তবলা
সহযোগিতায়। রমেন্দ্রনাথ পাল
১-০০ কবির সুরে গান।
সুদীপ্তা চৌধুরী।
রবীন্দ্রসংগীত
১-১৫ খেলাধুলোর আসর
১-২৫ মুখোমুখী :
রমেন্দ্রকান্তি চৌধুরী। গীতিনাট্য
১-৩০ আজকের আলো
১০-০০ সমাপ্তি

## ১১ অক্টোবর, ১৯৭৪

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আজের গান।
সুদীপ্তা চৌধুরী :
রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ দিনের আলোয়
৭-১০ ছায়া-ছবি
৭-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-৩৫ মুখের আলো :
রমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। গীতিনাট্য
৭-৫০ ভজনামালা গান।
নীলকমল সরকার।
লোকগীতি ও নজরুলগীতি
এবং অজয়কুমার চক্রবর্তী।
তবলা
৮-০০ বন্দনা অধিকারী
৮-১০ গীতিআলেখ্য।
তপতি চৌধুরী ও সুদীপ্তা
অন্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ মুখোমুখী :
রমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। গীতিনাট্য
৮-২৫ নিবন্ধের গান।
তপতি চৌধুরী।
শ্যামাসংগীত গান
৮-৩৫ বন্দনা সংঘের
৮-৪০ ভজনামালা গান +
১-০০ সমাপ্তি

সন্ধ্যা অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০৫ পল্লীগীতি সংসদের
৭-৪৩ রেডিওনাটক :
নীলকমল সরকার : লোকগীতি
৭-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলো)
৮-০৫ ফিচার ফিচার।
৮-১৫ মেহতাব :
সুদীপ্তা অন্যোপাধ্যায় ।
তবলা
৮-৩০ মুখোমুখী
৮-৩৫ বন্দনা সংঘের
৮-৪০ ছায়া-ছবি
১-০০ কবির সুরে গান।
তপতি চৌধুরী।
রবীন্দ্রসংগীত ও
অনুষ্ঠানের গান এবং
নীলকমল সরকার।
নজরুলগীতি
১-১৫ বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠান
১-২৫ মুখোমুখী
১-৩০ গানের মৈত্রী
সুদীপ্তা অন্যোপাধ্যায় :
রবীন্দ্রসংগীত, নীলকমল
সরকার : নজরুলগীতি ও
লোকগীতি এবং তপতি
চৌধুরী : অনুপমসংগী ও
দেশাত্মবোধক গান
১০-০০ সমাপ্তি

## ১২ অক্টোবর, ১৯৭৪

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আজের গান :
শিবা ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ দিনের আলোয়
৭-১০ ছায়া-ছবি
৭-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-৩৫ মুখের আলো।
সুচরিতা বসু। গীতিনাট্য
৭-৪৩ ভজনামালা গান।
শিবা মাহুড়ী। নজরুলগীতি
ও ভজন
৮-০০ বন্দনা অধিকারী
৮-১০ গীতিআলেখ্য।
শিবা মাহুড়ী : অর্ঘ্যনিবেদন
৮-২০ মুখোমুখী।
সুচরিতা বসু। গীতিনাট্য
৮-২৫ নিবন্ধের গান।
শিবা মাহুড়ী। অর্ঘ্যনিবেদন
৮-৩৫ বন্দনা সংঘের
৮-৪০ ভজনামালা গান +
১-০০ সমাপ্তি

সন্ধ্যা অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০৫ পল্লীগীতি সংসদের
৭-৪০ রেডিওনাটক
৭-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলো)
৮-০৫ মিউ দি ইয়ুথ

+ অনুষ্ঠান রেকর্ড

অলোককুমার লাহিড়ী। যুববাণী থেকে সরোদ বাজিয়ে শোনান

**চন্দ্রা চক্রবর্তী** : মুক্তধারা-র 'তন্ত্রসঙ্গীত' ও 'দিনের আলোর' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন

৮·৫০ সুপ্রভাত ।
সুপ্রভাত বন্ধু : শচীন
৮·৫৫ বাংলা সংবাদ
৯·৪০ ব্যায়াম-৪
১·০০ কবির সুরে গান :
নিশা অবসান : রবীন্দ্রসংগীত
১·১৫ বিজ্ঞানকণা
১·২৫ সুপ্রভাতম :
সুপ্রভাতম বন্ধু : শচীন
১·৩০ গানের বৈঠক :
নিশা পাহুই । শ্যামাসংগীত
১০·০০ সমাপ্তি

### ১৩ অক্টোবর, ১৯৭৫

প্রভাতী জাগরণ

৭·০০ আজানের সুর ।
শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত :
রবীন্দ্রসংগীত
৭·০৫ দিনের আলোয়
৭·১০ ব্যায়াম-৪ :
প্রীতি মিত্র : গুরুদেব
৭·৫০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·৫৫ সুরের আলো :
প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় । শচীন
৮·৪০ সমসাময়িক গান :
সন্ধ্যারাগ । লোকগীতি
৮·০০ বাংলা কবিতা
৮·১০ গীতিআলি ।
শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত :
রবীন্দ্রসংগীত
৮·২০ সুরলহরী :
প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় । শচীন
৮·২৫ বিজ্ঞানের গান
৮·৩৫ বাংলা সংবাদ
৮·৪০ বন্দেমাতরম ।
১·০০ সমাপ্তি

গান্ধী জাতিবেদন

৭·০০ আজ ও কালকের যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·০৫ পল্লীগীতি মাধুরী ।
৭·৪০ রেডিওস্পোর্ট ।
সন্ধ্যারাগ । লোকগীতি
৭·৫০ ভক্তিসংগীত

৮·০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮·০৫ আইডিয়া ফর লিভিং
৮·৩০ সুপ্রভাত ।
সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় : শচীন
৮·৫১ বাংলা সংবাদ
৮·৫০ ব্যায়াম-৪ :
প্রীতি মিত্র : গুরুদেব
১·০০ কবির সুরে গান :
শান্তশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় :
রবীন্দ্রসংগীত
১·১৫ খেলাধুলোর জগৎ
১·২৫ সুপ্রভাতম
১·৩০ গানের বৈঠক :
প্রীতি মিত্র : ঝুমুর, সারিগান :
লোকগীতি এবং শান্তশ্রী
বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রসংগীত
১০·০০ সমাপ্তি

### ১৪ অক্টোবর, ১৯৭৫

প্রভাতী জাগরণ

৭·০০ আজানের সুর
৭·০৫ দিনের আলোয়
৭·১০ ব্যায়াম-৪
৭·৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·৩৫ সুরের আলো
৭·৫০ সমসাময়িক গান :
বাংলা কবিতা
৮·১০ গীতিআলি
৮·২০ সুরলহরী
৮·২৫ বিজ্ঞানের গান
৮·৩৫ বাংলা সংবাদ
৮·৪০ বন্দেমাতরম
৯·০০ সমাপ্তি

বাংলা জাতিবেদন

৭·০০ আজ ও কালকের যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭·০৫ পল্লীগীতি মাধুরী ।
৭·৫০ রেডিওস্পোর্ট
চন্দ্রা চক্রবর্তী : লোকগীতি
৭·৫০ ভক্তিসংগীত
৮·০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮·০৫ আজ্ঞা
৮·৫০ সুপ্রভাত
৮·৫১ বাংলা সংবাদ
৮·৫০ ব্যায়াম-৪
১·০০ কবির সুরে গান
১·১৫ স্পোর্টস্ ওয়ার্ল্ড
১·২১ সুপ্রভাতম
১·৩০ গানের বৈঠক :
উমা চক্রবর্তী : ঝুমুর, সারি
এবং ভক্তিগীতি বিকেল :
লোকগীতি
১০·০০ সমাপ্তি

সন্ধ্যারাগ সেন : যুববাণীর পল্লীগীতি মাধুরীতে অংশগ্রহণ করে থাকেন

"জাগো জাগো যোগেশ্বরী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী..."

পরশুরাম এসেছে আর চিরতরে আঁধার নিয়ে। শুধু এসেছে—পুরো একটি বছর পরে মা আবার এসেছেন। এই বিশেষ ক'টি দিনের জন্য সারা বছরের বাধাবিঘ্ন, চাওয়াপাওয়া উপেক্ষা করে উৎসবে মেতে ওঠেন। আজ ঘুচিয়ে দুঃখ সারা বেলা, কোটির কাছে সকলেরই প্রার্থনা দেবী তাঁদের নিকট আসা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন।

এই বিজ্ঞাপনে আমাদের যেসব আশা সফল হোক, আমাদের পরিপূর্ণ হোক এই কামনায় করেন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

৪৩৫৩৩

# দিল্লী

## ১ অক্টোবর, ১৯৭৫

ক

৬-০১ সকাল : বন্দনা
৬-০১ সংগীত মূর্ছনা
বিভিন্নকণ্ঠ সঙ্গীতানুষ্ঠান
৮-১০ বাদ্যযন্ত্রে হালকা : বেতার
১০-০১ রাত্রিকে বা : সংগীতানুষ্ঠান
১২-০২ দুপুরে : শোভনা রায়চৌধুরী
রবীন্দ্রসংগীত
২-০০ খবরাখবর মিক্স -
৩-৩০ বিকেলে : শোভনা রায়চৌধুরী বা বেতার
৮-২১ রাত : শোভনা রায়চৌধুরী বা বেতার
১০-০০ রবিশঙ্কর : বেতার

খ

৬-৫০ সকাল : অরবিন্দ মিত্র
ট্রেন্ডী ও সঙ্গত
৩-৩০ বিকেল : শোভনা রায়চৌধুরী
রবীন্দ্রসংগীত
৬-০১ রাত্রিশেখর পাল
গীত ও বন্দন
৯-৫৩ রাত : অম. ভাইস
গীত ও বন্দন

## ২ অক্টোবর, ১৯৭৫

ক

১-০৪ সকাল : বন্দনা
১-১১ সংগীত মূর্ছনা
নিবেদন হেমন্ত বা
৮-২০ রাত্রি বন্দ্যোপাধ্যায় : বেতার
১০-৫০ অমরকুমার বসু : বেতার
১১-০২ অনীতা রায় : বেতার
১১-৩০ মজহার ও গাওয়ার : বেতার
২-০০ দুপুরে : সরবীন সুলতানা -
২-২০ বি. এইচ. ভাবা -
৩-৩১ বিকেল : মজহার ও গাওয়ার বেতার
৮-১০ রাত : অমরকুমার বসু বেতার
১০-৩০ এস. মজুমদার : রবীন্দ্রসংগীত

খ

৭-৩০ সকাল : বাঙালী গায়ক : ট্রেন্ডী
৩-০৫ বিকেল : মজহার সরকার রবীন্দ্রসংগীত
৩-১৫ অনীতা রায় : বেতার
৩-৫০ এস. মজুমদার : রবীন্দ্রসংগীত
৬-০২ সরলার সরকার রবীন্দ্রসংগীত
৮-৫১ রাত : রবিন মজুমদার : গজল
৮-৩০ রবিন মজুমদার : গজল

## ৩ অক্টোবর, ১৯৭৫

ক

১-০১ সকাল : বন্দনা
১-০১ সংগীত মূর্ছনা
বাদ্যযন্ত্রে বন্দনা

অঞ্জনা রায় : যুববাণীতে রবীন্দ্র-সংগীতানুষ্ঠানটি

৮-১০ রাত্রিশেষ কথা : বিভিন্নকণ্ঠ
১০-৩১ রবীন্দ্রসংগীত বেসপাতে বেতার
১১-০২ রাত্রিশেষে কথা : বিভিন্নকণ্ঠ
১১-৩০ মাসুদার মজহার : বেতার
১২-১৯ দুপুরে : মঞ্জুল পঙ্কজ : কাওয়ালী
২-০০ পঙ্কজ রাত্রিক -
২-২০ সুলতানা পাঞ্জাব -
৮-৩০ রাত : মাসুদার মজহার বেতার
১০-৩০ এ. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠসংগীত

খ

৩-৩০ সকাল : মন্দ্রোবাজী ট্রেন্ডী ও সঙ্গত
৩-০৩ বিকেল : বিনোদকুমার সুরঞ্জন : গীত ও বন্দন
৩-১১ বাদ্যে বা ওয়ার্ল : বন্দনা
৬-০১ বিনোদকুমার সুরঞ্জন গীত ও বন্দন
১-৫১ রাত : অমরজীৎ গীত ও বন্দন

## ৪ অক্টোবর, ১৯৭৫

ক

১-০৩ সকাল : বন্দনা
১-১৩ সংগীত মূর্ছনা
কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
৮-২০ সাবির আহমেদ খাঁ : বেতার
১১-০২ রাত্রিশেষ বেতার ট্রেন্ডী ও সঙ্গত
১১-৩০ নিখার হোসেন খাঁ । বেতার
১২-১১ দুপুরে : বাঁশির বাদ্য : বন্দন
২-২০ দুর্বাসা বন্দ্য -
২-২০ বিকেল : মহিলার আহমেদ খাঁ বেতার
৮-৩০ রাত : নিখার হোসেন খাঁ বেতার

## ৫ অক্টোবর, ১৯৭৫

ক

৬-০১ সকাল : বন্দনা
৬-০৩ সংগীত মূর্ছনা +
নিবেদন আহমেদ ও হৈমন্তী আহমেদ । বেতার
৮-২০ রবিশঙ্কর যন্ত্র । বেতার
১১-০২ চন্দন রায় । বন্দন
১১-৩০ রাত্রিশেষ ভাইরাস । বেতার
২-০০ দুপুরে : আহমেদ খান +
২-২০ বিকেল : রাত্রিশেষ ভাইরাস বেতার
৩-১১ চন্দন রায় : বন্দন
৮-০০ রাত : রবীন্দ্রসংগীত
৮-৩০ রাত্রিশেষ ভাইরাস : বেতার

## ৬ অক্টোবর, ১৯৭৫

ক

১-০১ সকাল : বন্দনা
১-১১ সংগীত মূর্ছনা
নিবেদন হেমন্ত বা
সংগীত ও সঙ্গতানুষ্ঠান : বেতার
৮-২০ দেবব্রত চৌধুরী : বেতার
১০-৩০ বি. আর. দেবব্রত : বেতার
১১-০২ বি. বি. মুখার্জি : বাঁশী
১১-৩০ রাত্রির নিঃ সৈনিকরা : বেতার
২-০০ দুপুরে : অমলাক মুখোপাধ্যায় +
২-১০ পঙ্কজ রাত্রিক -
৩-৫০ বিকেল : দেবব্রত চৌধুরী বেতার
৮-১১ রাত : দেবব্রত চৌধুরী বেতার
১০-০০ রাত্রী চক্রবর্তী ও কৃষ্ণা বিশ্বর । বেতার

## ৭ অক্টোবর, ১৯৭৫

ক

৬-০১ সকাল : বন্দনা
৮-২০ বিলিরঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় বেতার
১০-৩০ বেলাজির বেতার ট্রেন্ডী ও সঙ্গত
১১-০২ রাত্রী চক্রবর্তী অনাদি ও দুপুর
১১-৩০ নন্দা বাজার : বেতার
২-২০ দুপুরে : সুধা রাত্রিরেখা -
৩-৩০ বিকেল : পরমেশ্বর দাস পাঞ্জাবক
৮-৩০ রাত : বেলাজির বেতার সঙ্গত
১০-০০ সংগীত সভা
হাঁটা গলোপাধ্যায় : ট্রেন্ডী ও সঙ্গত এবং হৈমন্তী মুখোপাধ্যায় : বেতার বেতার

## ৮ অক্টোবর, ১৯৭৫

ক

১-০৩ সকাল : বন্দনা
১-৩৫ সংগীত মূর্ছনা
কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় : সানাই
৮-২০ এ. আলম : বেতার
১০-৩০ রবীন্দ্র ভট্টাচার্য । বেতার
১১-০২ রবীন্দ্রসংগীত বন্দনা । বেতার
১১-৩০ বর্মন মিঃ : ফ্রান্সিসকো হৈমন্তী মুখোপাধ্যায় : আলোচনা হেমন্তের
২-১০ দুপুরে : কৃষ্ণা বন্দ্য -
৮-১৫ রাত : বর্মন মিঃ : ফ্রান্সিসকো
১০-০০ সংগীত সভা

## ৯ অক্টোবর, ১৯৭৫

ক

৬-০৫ সকাল : বন্দনা
১-৫১ সংগীত মূর্ছনা
গাবে সোলাম আলি খাঁ । বেতার
৮-২০ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বিলাসবাদি চৌধুরী
সংগীতানুষ্ঠান : বেতার
১১-০২ একনাথ মজুমদার : বেতার
১১-৩০ বৈদ্যনাথ চৌধুরী । সঙ্গত
১২-১৫ দুপুরে : হরিণ পাঞ্জাবী । গীত
২-২০ খাঁটা বন্দ -
৩-৩৩ বিকেল : মেজর মুখোপাধ্যায় বেতার
১-৩০ রাত : হৈমন্তী মুখার্জি একনাথ কণ্ঠসংগীত

## ১০ অক্টোবর, ১৯৭৫

ক

১-০১ সকাল : বন্দনা
১-১১ সংগীত মূর্ছনা
নিবেদন : বাসু : বেতার
৮-২০ বন্দ্যোপাধ্যায় মজুমদার বেতার
১০-৩০ রবীন্দ্রসংগীত বন্দ : বেতার
১১-০২ বিভিন্নকণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে সমাপ্তি

- শুভেন্দু বেতার

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

ভয়েস অব আমেরিকা

বাংলা অনুষ্ঠান শুনুন

৭৩-এর ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড
২৫, ২৫, ৪৯ ও ৫১
মিটার
ফ্রিকোয়েন্সি-এর মিটার ব্যান্ড ১৩৩

ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠানসূচীর জন্য লিখুন :
ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস
৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা-১৩



আকাশবাণী ও যে কোন অনুষ্ঠানে
শ্রীমতী শেফালী সাহা
ও সম্প্রদায় নীলা কীর্তন পরিবেশন করেন
শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউর মন্দির
৫৮-১১৬ সেক টেরাস, কলি:-১১
ফোন : ১৬-১৩৬।

১২-১৫ দূরদর্শন : হৈমন্তী শুক্লা ও সঙ্গীত
২-০০ সেতারী মেল +
৩-২০ বিবেণী : সমরেশচন্দ্র বসু ও সঙ্গীত
৫-০১ বিচিত্রানন্দ ও সর্বানন্দপুরের সানাই
৮-০০ ছাট : সন্ধ্যারিত্রী
৮-৫৫ হিন্দী সংবাদ

ম

৭-৩০ সকাল : বিভিন্ন সেবী : ঠুংরী
৩-০৫ সাধিত্রী জানা : গীত
৩-৪১ ছাট : এস. ব্যানার্জির গীত ও গজল
৮-৫০ এস. ব্যানার্জির : গজল

## ১১ অক্টোবর, ১৯৭৫

ম

৬-০৫ সকাল : বন্দনা
৬-৩৫ সংগীত সূচনা
হুসেনারা আলি খাঁ
৮-২০ রাজকীকান্ত ডি. সেনাই সেতার
১০-৩০ সুরজিৎ এস. বাকসেনা বাঁশী
১১-০২ বন্দনা সাঁতরা : সেতার
১১-৩০ কল্যাণী রায় : সেতার
১২-১১ দূরদর্শন : উমা আয়ার গীত ও গজল
২-২০ তপনজিৎ কর্মকার +
৩-২০ বিবেণী : তপনজিৎ ডি. সেনাই সেতার
৮-৩০ ছাট : সুরেশ বৈদ্যনাথ : বাংলা

ব

৭-৩০ সকাল : অমরেশ সাহু ঠুংরী
৩-০৩ বিবেণী : এস. এস. হাজরা গীতিনাট্য
৩-৩০ সুরজিৎ এস. বাকসেনা : বাঁশী
৬-০২ এস. এস. হাজরা : গীতিনাট্য
৬-৫৪ ছাট : ডি. এইচ. মাস্টার গজল
৮-৫০ ডি. এইচ. মাস্টার : গজল

## ১২ অক্টোবর, ১৯৭৫

ম

৬-০৫ সকাল : বন্দনা
৬-৩৩ সংগীত সূচনা +
৭-০০ ছন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
২-০০ দূরদর্শন : কণ্ঠসংগীত +
৬-১৫ সন্ধ্যা : ছন্দা বসন
৭-০০ ছাট : ফিচারধর্মী
৭-৪৫ বন্দনা বসন
৭-৫০ প্রাসঙ্গিক সংবাদ

## ১৩ অক্টোবর, ১৯৭৫

ম

৬-০৫ সকাল : বন্দনা
৬-৩৩ সংগীত সূচনা
৭-০০ ছন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়
৭-৩০ দূরদর্শন
১১-০০ হিন্দী সংবাদ
২-০০ দূরদর্শন : কণ্ঠসংগীত -
৫-০০ ছাট : ফিচারধর্মী
৭-৩০ প্রাসঙ্গিক সংবাদ
৮-৩৫ হিন্দী সংবাদ

## ১৪ অক্টোবর, ১৯৭৫

ব

৬-০৫ সকাল : বন্দনা
৬-৩৩ সংগীত সূচনা
৭-০০ ছন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়
৭-৩০ দূরদর্শন
১১-০০ হিন্দী সংবাদ
২-০০ দূরদর্শন : কণ্ঠসংগীত -
৫-০০ ছাট : ফিচারধর্মী
৭-৩০ প্রাসঙ্গিক সংবাদ
৮-৩৫ হিন্দী সংবাদ

## ১৫ অক্টোবর, ১৯৭৫

ব

৬-০৫ সকাল : বন্দনা
৬-৩৩ সংগীত সূচনা
৭-০০ ছন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়
৭-৩০ দূরদর্শন
১১-০০ হিন্দী সংবাদ
২-০০ দূরদর্শন : কণ্ঠসংগীত -
৫-০০ ছাট : ফিচারধর্মী
৭-৩০ প্রাসঙ্গিক সংবাদ
৮-৩৫ হিন্দী সংবাদ

## ১৬ অক্টোবর, ১৯৭৫

ব

৬-০১ সকাল : বন্দনা
৬-৩৩ সংগীত সূচনা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
১-৩০ দূরদর্শন : ঘরোয়ানা
২-৩০ কণ্ঠসংগীত +
৬-১৩ সন্ধ্যা : ছন্দা বসন
৭-৩৩ ছাট : সাধারণী

কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় : আকাশ-বাণীর তরুণ গানের শিল্পী

৭-১০ প্রাসঙ্গিক সংবাদ
৮-৪১ হিন্দী সংবাদ
১০-০০ সংগীত সভা

# বক্সিং

(৩১ ২১ মীটার)

## ১ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৫ সকাল : ভক্তিগীত
৭-১৩ ঈশ্বর গান
৭-৫৩ পুষ্পলাল গাঙ্গুলি +
নেপালী আধুনিক
৮-২০ ভেরেলী মেল +
শ্যামসংগীত
৮-০০ প্রভাতরঞ্জন বসু : বাঁশী
৮-৩৫ মেঘবর্ণা গীত (নেপালী)
১২-০২ দূরদর্শন : অরুণকুমার রায়
নেপালী লোকগীত
১২-১৪ সাবিত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় +
বাংলা আধুনিক
২-২০ প্রভাতরঞ্জন বসু : বাঁশী
২-৩০ বিবিধ আসরী
৩-৪৩ ছাট : রামপ্রসাদ গান +
৭-০০ নেপালী আধুনিক -
৭-১৩ আজ বাদ : রবীন্দ্রসংগীত
৮-০৩ রাজা হেমন্ত
নেপালী আধুনিক
৮-২০ সাইকা কা : গীত
১-৩০ দূরদর্শন বন্ধ

## ২ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৩ সকাল : ভক্তিগীত
৭-১৩ ঈশ্বর গান
৭-৫৩ নেপালী আধুনিক -
৮-১৩ নেপালী আধুনিক ও লোকগীত +
১১-০০ বিবিধ আসরী
১২-০২ দূরদর্শন : অরুণকুমার রায়
নেপালী লোকগীত
১২-১১ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় -
বাংলা আধুনিক
১-১৩ গাঙ্গুলি সংগীত +
২-২০ কাজী অনিরুদ্ধ : গীতিনাট্য
৩-৩০ বিবেণী : অরুণকুমার রায়
নেপালী লোকগীত
৩-১৩ ছাট : দুর্গাবাণী
৭-১৩ রবীন্দ্রসংগীত -
৭-১৩ সুরজিৎ সিং
বেহালা, মাণ্ডোলিন ও গীতিনাট্য
৮-০০ নেপালী আধুনিক -
দুর্গা গীত
৮-১১ সুরজিৎ সংগীত
৮-৫৩ বাজারুম
১-১১ ঈশ্বরের অনুশাসন
১-৩০ বিবিধ ভারতীয় কার্যক্রম
অংশবিশেষ লোকগীতি ও গান সংগীত

## ৩ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৩ সকাল : ভক্তিগীত
৭-১১ ঈশ্বর গান
৭-৪১ বাদ্যবিচিত্রা
৮-২০ ভক্তিরঞ্জক গান (বাংলা)
৮-৩০ সুরজিৎ পরিচালক : বেহালা +
৮-৪১ নেপালী আধুনিক +
১২-০২ দূরদর্শন : এস. কে. সিনহা
নেপালী লোকগীত
১২-১১ বাংলা আধুনিক -
১-১১ গাঙ্গুলি সংগীত +
২-২০ অরুণ ভাদুরি +
মাণ্ডোলিন
৩-১০ বিবেণী : এস. কে. সিনহা
নেপালী লোকগীত
৭-১৫ ছাট : ঐকতান পরিচালনা +
রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ নেপালী আধুনিক -
৮-২৫ সিদ্ধেশ্বরী দেবী : টপ্পা
৮-৫০ বাদ্যযন্ত্রে

## ৪ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৩ সকাল : ভক্তিগীত
৭-১৩ ঈশ্বর গান
৭-৫১ এস. বিশ্বাস -
নেপালী আধুনিক
৮-৫৩ নেপালী লোকগীত +
১২-০২ দূরদর্শন : শ্যামী রায়
১-০৩ হিন্দুস্থানী অনুষ্ঠান
১-৫৩ গাঙ্গুলি সংগীত +
২-২০ অজানাকে ও লোকী : বেহালা
৩-১৩ বিবেণী : বিনয় ঘোষাল
নেপালী লোকগীত
৬-৪৩ ছাট : দুর্গাবাণী
৭-১৩ রবীন্দ্রসংগীত -
৮-০০ বিভিন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়
নেপালী আধুনিক
৮-১১ বেতার নাটক বিচিত্রা
৮-২৭ নাটক
৮-৫০ ইন্দ্রাণী মেহেরা বা : গজল
১-১১ ঈশ্বরের অনুশাসন
১-৩০ বিবিধ ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম

## ৫ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০১ সকাল : ভক্তিগীত
৭-১৩ ঈশ্বর গান
৭-৪৩ যদু মৈত্রান +
নেপালী আধুনিক
৮-২০ অমরনাথজী +
৮-৩০ দূরদর্শন : দুর্গাবাণী
১-০৩ হিন্দুস্থানী অনুষ্ঠান
১-৪৩ গাঙ্গুলি সংগীত -
২-২০ বিজয় অমরনাথ : বাঁশী +
৩-২০ বিবেণী : সিকিমী অনুষ্ঠান
৩-৪৩ ছুটানী অনুষ্ঠান
৬-৪৩ ছাট : রামপ্রসাদ +
৭-০০ অন্তর্জাতিক ফুটবল
নেপালী আধুনিক ও লোকগীত
৭-১৩ রবীন্দ্রসংগীত -
৭-৪১ রবীন্দ্রকুমার বাজনা : বাঁশী
৮-০০ যদু মৈত্রান +
নেপালী আধুনিক
৮-১১ ফরাসার বর্ষণ
৮-২৩ কে. এম. সরাফত : গজল +
+ গ্রামোফোন রেকর্ড

## ৬ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৩ সকাল : ভক্তিগীত
৭-১৩ ঈশ্বর গান
৭-৪৩ নেপালী আধুনিক -

অন্তরা

অন্তরা মিউজিক এণ্ড আর্ট কালেজ

৩৩৪ রাজেন্দ্রলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বিক্রয়ালয়ে :—
নারায়ণ গাও যোশী, রঙ্গৎ নন্দী, আমুর বালা দেবী, হৈমন্তী শুক্লা, অনিল ভট্টাচার্য, সুধীর সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস, সুধীর সিংহ, গোকুল নাগ, ভেরি কমবুরো, সুধীর সিংহ, মায়া চাটার্জি, রেবু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ চাটার্জী, পল্লু মিত্র, নিলাম্বরী দেবর বহু, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারিত্রা দে।

৮·২০ শ্যামশ্রীতি ·
৮·৩০ দূরী নামা : বেহাগ
৮·৪১ বেলালী আধুনিক ও লোকগীত ·
১১·০০ বিবিধ ভারতী
১১·০২ দূরত্ব : অনুরাধা ঠাকুর বেলালী লোকগীত
১২·১৫ বাঙলী ছেলেদের · বাংলা আধুনিক
১·০১ হিন্দুস্থানী ভজনগান
১·৫৪ পাঞ্জাবী সংগীত ·
২·২০ দূরী নামা : বেহাগ
৩·১০ বিবেচনা : অনুরাধা ঠাকুর বেলালী লোকগীত
৩·৫১ গীত : সবকীল মুখোপাধ্যায় · বেহাগ
৭·০০ বেলালী আধুনিক · হৃদয় পীত
৭·১১ রবীন্দ্রসংগীত ·
৮·০০ বেলালী হৃদয় পীত ·
৮·২১ ভজন ·
৮·৩০ বাদ্যযন্ত্র
১·১০ বিবিধ ভারতী

### ৭ অক্টোবর, ১১৭৫

৭·০১ সকাল : ভক্তিগীত
৭·১৫ ঈশ্বর গান
৭·৫১ দূরত্ব বেলালী · বেলালী আধুনিক
৮·১০ পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র : বেহাগ ·
৮·৫১ বেলালী আধুনিক ·
১১·০০ বিবিধ ভারতী
১২·০১ দূরত্ব : বীরেন্দ্রকুমার দেবশর্মা বেলালী লোকগীত
১২·১৫ রবীন্দ্র বেলজ · বাংলা আধুনিক
১·৫১ পাঞ্জাবী সংগীত ·
২·২০ আজ জানিয়ে : গীতিনাট্য ·
৩·১০ বিবেচনা : বীরেন্দ্রকুমার দেবশর্মা বেলালী লোকগীত
৩·৫১ বাঙলা : চড়কী
৭·১১ সংগীতা মিত্র · রবীন্দ্রসংগীত
৮·২১ বি. এইচ. আরা : গজল ·
৮·৫০ বাদ্যযন্ত্র

### ৮ অক্টোবর, ১১৭৫

৭·০১ সকাল : ভক্তিগীত
৭·১৫ ঈশ্বর গান
৭·১৫ কুমার মুখার্জী বেলালী আধুনিক
৮·২০ ভজন গান : শ্যামশ্রীতি ·
৮·৫০ এস. বাস ও বজলা
৮·৪০ বেলালী গীত (হিন্দী) ·
১২·০২ দূরত্ব : শান্তিকুমার ঠাকুর বেলালী লোকগীত
১২·১৫ বাদলী গ্রামোফোন · বাংলা আধুনিক
১·০৫ হিন্দুস্থানী ভজনগান
২·২০ ভোজন ·
২·৫০ বিবিধ ভারতী
৩·১০ বিবেচনা : শান্তিকুমার ঠাকুর বেলালী লোকগীত
৩·৪৫ গীত : রমাপতি ঘোষ ·
৭·০০ নারায়ণ ভোজন · বেলালী আধুনিক
৭·১৫ রবীন্দ্রসংগীত ·
৭·৪৫ সাপ্তাহিক প্রসঙ্গ/সংবাদ
৮·০০ কুমার মুখার্জী বেলালী আধুনিক
৮·১৫ সমাজের দর্পণ
৮·২৫ বাদ্যযন্ত্র ·
৮·৩৩ বাদ্যযন্ত্র
১·৫০ বিবিধ ভারতী

### ১ অক্টোবর, ১১৭৫

৭·০১ সকাল : ভক্তিগীত
৭·১১ ঈশ্বর গান
৭·১১ শচীন্দ্রকুমার সাহা বেলালী আধুনিক
৮·২০ ভজনসংগীত ·
৮·৪১ বেলালী আধুনিক ·
১২·০২ দূরত্ব : চন্দন সিং বিরিঞ্চাই ও সুশীলাসুন্দর : মানস পীত
১২·১৫ শচীন দেবশর্মা · বাংলা আধুনিক
২·২০ আলোচনা ·
৩·১০ বিবেচনা : মানু ভট্টাচার্যী বেলালী লোকগীত
৩·৫১ গীত : সুধেন্দুবী
৭·১১ বেহাগ সিম্ফনি · রবীন্দ্রসংগীত
৭·৩০ বেলালী আধুনিক · হৃদয় পীত
৮·২১ রবীন্দ্রসংগীত ·
৮·২৫ শ্রেষ্ঠকুমার : গীত ·

### ১০ অক্টোবর, ১১৭৫

৭·০১ সকাল : ভক্তিগীত
৭·১৫ ঈশ্বর গান
৭·৫১ বাদ্যবিদ্যা
৮·২০ ভক্তিমূলক গান (বাংলা)
৮·৩০ পাশ্চাত্য ওস্তাদদের ঐকতান · বেহাগ
৮·৭১ যোগেন্দ্রনাথ সাহা বেলালী আধুনিক
১২·০২ দূরত্ব : প্রেমেন্দ্রকুমার সাহা বেলালী লোকগীত
১২·১১ ভাদরী অনুষ্ঠান · বাংলা আধুনিক
২·২০ সুবীর মুখোপাধ্যায় · গীতিনাট্য
২·১৩ বিবেচনা : প্রেমেন্দ্রকুমার সাহা বেলালী লোকগীত
২·২০ হিন্দুস্থানী অনুষ্ঠান
৩·১৭ বাঙলা : সুবিনয় রায় · রবীন্দ্রসংগীত
৩·৬৩ বেহারাজনুর সুযোগ্য বেহারা বেলালী লোকগীত
৮·০০ বেলালী আধুনিক ·
৮·২৩ সমাজের দর্পণ
৮·৫৪ গীতা দত্ত : ভজন ·
৮·৫৫ বাদ্যযন্ত্র
১·৫০ বিবিধ ভারতী

### ১১ অক্টোবর, ১১৭৫

৭·০১ সকাল : ভক্তিগীত
৭·১৪ ঈশ্বর গান
৭·৫১ বিজনবন্ধু · বাংলা আধুনিক
৮·২০ ভজনসংগীত ·
৮·৪১ বেলালী আধুনিক ও লোকগীত
১২·০২ দূরত্বের সাথী অনু
১·০১ হিন্দুস্থানী অনুষ্ঠান
২·২০ বাঁশী ·
৩·১০ বিবেচনা : সুবিনয় মুখার্জী বেলালী লোকগীত
৩·৫১ রাত : দূরত্বী
৭·১৫ রবীন্দ্রসংগীত ·
৮·০০ সেতারবাদ্যে বাঁশী বেলালী আধুনিক
৮·১৩ বেহার সংবাদ বিভিন্ন
৮·২৩ দূরত্ব সংগীত
৮·৫০ যোগাসন শিক্ষা : অনন্ত
১·৫০ বাঁশরী ভারতীয় সংগীত সম্মেলন

### ১২ অক্টোবর, ১১৭৫

৭·০৫ সকাল : ভক্তিগীত
৭·১৫ ঈশ্বর গান
৭·৫৫ যোগেন্দ্রনাথ সাহা বেলালী আধুনিক
৮·২০ ভজনসংগীত ·
১১·০০ বিবিধ ভারতী
১·৪৪ দূরত্ব : পান্নালাল সংগীত ·
১·৫৫ রাত : শচীন দেবশর্মা · বাংলা আধুনিক
৭·০০ প্রেমেন্দ্রের প্রবন্ধ · বেলালী আধুনিক
৭·১৫ রবীন্দ্রসংগীত ·
৭·৫৫ প্রবীণকুমার বসাক হৈলেকটিক গীটার
৮·০০ বেলালী আধুনিক · হৃদয় গীত
৮·১৫ সমাজের দর্পণ
৮·২৫ সমাচার জগৎ : গীত ·
৮·৫০ বাদ্যযন্ত্র
১·১৫ উদ্বোধন অনুষ্ঠান
১·৩০ বাঙলা প্রবন্ধ

### ১৩ অক্টোবর, ১১৭৫

৭·০৫ সকাল : ভক্তিগীত
৭·৫০ খোকী দেবী বেলালী আধুনিক
৮·২০ ভজনসংগীতের গান ·
৮·৫০ এপ্রিল মাসির আহ্বানে বা · বেহাগ
১২·০২ দূরত্ব : অনাদিকুমারী মিত্র বেলালী লোকগীত
১২·১৫ বাংলা আধুনিক ·
২·২৩ এস. সি. মুখার্জী : বেহালা
৩·১৩ বিবেচনা : এস. সি. মুখার্জী বেহালা
৩·৫১ রাত : আবদুল আজিজ খাঁ · সরোদ
৭·১৫ রবীন্দ্রসংগীত ·
৮·০০ ভজনসংগীত বৃন্দ বেলালী আধুনিক
৮·২৫ কে. এল. সায়গল : গজল ·

ছন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় : আকাশ-বাণীর আধুনিক গানের শিল্পী

### ১৪ অক্টোবর, ১১৭৫

৭·০৫ সকাল : ভক্তিগীত
৭·১৫ ঈশ্বর গান
৭·৪৩ বর্ষাবন্ধুর রায় বেলালী আধুনিক
৮·২০ ভজনসংগীত ·
৮·০০ পন্নালাল ঘোষ : বাঁশী ·
৮·৪৫ বিজয়কুমার শর্মা · বেলালী আধুনিক ও লোকগীত
১২·০২ দূরত্ব : দূরী মজুমদার বেলালী লোকগীত
১২·১৫ অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় · আধুনিক
২·২০ দূরত্ব : সুবীর মুখোপাধ্যায় · গীতিনাট্য
৩·১০ বিবেচনা : দূরী মজুমদার বেলালী লোকগীত
৩·২০ সিম্ফনি অনুষ্ঠান
৩·৪৫ রাত : দূরত্বী
৭·১৫ ভক্তিগীত সন্ধ্যোপাধ্যায় · গীতিনাট্য
৮·১৫ বেহার সংবাদ বিভিন্ন
৮·২৫ গীত
৮·৩০ বাদ্যযন্ত্র
১·০০ অখিল ভারতীয় ভারতীয় সংগীত সম্মেলন

· চলচ্চিত্রে বেতার'


# হাসিখুসির আসর

## সরগম পরিচালিত শিশুদের আনন্দমেলা

আমাদের ছেলেমেয়েরা মনে প্রাণে বড় হয়ে উঠবে, একথা ভেবেই হাসিখুসির আসরের পরিকল্পনা। এর সব আয়োজনও শিশুদের এবং একান্তভাবে শিশুদেরই কথা মনে রেখে। শিশুদের সেই আশার রহস্যের রাজ্য, যেখানে বাস্তব আর কল্পনা অবাধেই হাত ধরাধরি করে চলে—সেই আনন্দরাজ্যের চাবিকাঠি ওদের হাতে তুলে দেবে হাসিখুসির আসর। এখানে বাচ্চা ছাত্রদের ছবি আঁকা লেখাপড়া সবকিছুরই প্রথম পাঠ দেওয়া হয় হাসিখুসির পরশ মাখিয়ে। এ যেন বড় হয়ে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাবার আগে শিশুবেলার সলতে পাকানোর মহড়া। আপনার ছেলেমেয়েকে আজই হাসিখুসির আসরের সভ্য করে নিন। দেখবেন ওরা মনে প্রাণে কত তাড়াতাড়ি বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠছে। আজাই থেকে আট বছরের ছেলেমেয়েরা আসরের সভ্য হতে পারবে।

**সরগম ৭, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ । ফোন ৩৪-৬২১১**

**১৫ অক্টোবর, ১৯৭৪**

৭-০৫ সকাল : ভক্তিগীতি
৭-১৫ উষা গান
৭-৪৫ বিশ্বনাথপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেসুরো রাগাধুনিক
৮-২০ অনুপমা রায়ের গান ।
৮-৩০ মার্চিক ক্লাব । খেয়াল ।
৮-৫০ দেবব্রত বীর (বেসুরো)
১২-০২ দুপুর : অনেক রাত বেসুরো লোকগীত
১২-১৫ নির্মলা মিশ্র ।
বাংলা আধুনিক
১-৪৫ পাশ্চাত্য সংগীত ।
২-২০ অনুষ্ঠানের ।
৩-১০ বিকেল : অনেক রাত বেসুরো লোকগীত
৩-৫৫ রাত : হরপ্রসাদের গান ।
৭-০০ বেসুরো আধুনিক ।
৭-১৫ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।
৭-৪৫ সাপ্তাহিক প্রসঙ্গ/সংগীত
৮-০০ বিশ্বনাথপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেসুরো আধুনিক
৮-১৫ সমাজের দর্পণ
৮-২৫ কাওয়ালী ।
৮-৫৫ আলাপচারী
১-৩০ দুরন্ত ঘূর্ণি

# আগরতলা

(২৫১.২ মিঃ)

পাপিয়া মিত্র : রবিবারের আধুনিক ও ভক্তিসঙ্গীতশিল্পী

৬-৫৫ সকাল : মহাপুরুষের বাণী
৬-৫৮ আবহাওয়া ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৬-৫৩ দীপমালিকা
৬-৫৫ প্রভাত কমল
৭-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত
৮-২০ লোকগীতি
৯-১৫ আধুনিক
১-০৫ দুপুর : ধ্বনিসংগীত
১-১৫ লঘু সংগীত
১-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত
৩-১৫ বিকেল : খেলাধূলার জগৎ অনুষ্ঠান
৬-০৫ সন্ধ্যা : আবহাওয়া ও অনুষ্ঠান পরিচিতি/স্থানীয় সংবাদ
৬-১০ দীপবিতান
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী অনুষ্ঠান
৭-২০ পাশ্চাত্য সংগীত
বাংলা সংবাদ
৭-২৫ সকাল : বিদ্যুৎ থেকে পুনঃসম্প্রচার
১-০০ আকাশবাণী থেকে পুনঃসম্প্রচার
১-৩০ দুপুর : বিদ্যুৎ থেকে পুনঃসম্প্রচার
৭-৩৫ রাত : বিদ্যুৎ থেকে পুনঃসম্প্রচার
১০-০৫ কলকাতা থেকে পুনঃসম্প্রচার ইংরেজী সংবাদ
৭-০০ সকাল : বিদ্যুৎ থেকে পুনঃসম্প্রচার
৮-১০ বিদ্যুৎ থেকে পুনঃসম্প্রচার
১-০০ দুপুর : বিদ্যুৎ থেকে পুনঃসম্প্রচার
৬-০০ সন্ধ্যা : বিদ্যুৎ থেকে পুনঃসম্প্রচার
১-০০ রাত : বিদ্যুৎ থেকে পুনঃসম্প্রচার হিন্দী সংবাদ
৮-০০ সকাল : বিদ্যুৎ থেকে পুনঃসম্প্রচার
৮-৫৫ রাত : বিদ্যুৎ থেকে পুনঃসম্প্রচার তৃতীয় অধিবেশন
৩-৫৫ বিকেল : ভক্তিগীতি (প্রতিদিন)
৬-৩০ ক্রীড়াজগৎ (প্রতিদিন)
৮-০০ রাত : বাংলা কথিকা নাটকাভিনয় (রবিবার)
লঘু সংগীত : কণ্ঠসংগীত (শুক্রবার ও রবিবার বাদে)
বাংলা নাটক (শুক্রবার)
৮-১৫ লঘু সংগীত (বুধবার)
সাপ্তাহিক বিচিত্রা : খেলাধূলো (সোমবার)
বেতার জগতের বিচিত্রা (মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার)
এ রাতের গান (রবিবার)
৮-৩০ লঘু সংগীত : কণ্ঠসংগীত (প্রতিদিন)
১-১১ লঘু সংগীত : কণ্ঠসংগীত (রবিবার বাদে)
জলছবি (রবিবার)
সংবাদ পরিক্রমা (মঙ্গলবার, শনিবার ও প্রথম বৃহস্পতিবার)
৯-৩০ সভা প্রবাহ (রবিবার)
অনুরোধের আসর
রবীন্দ্রসংগীত (সোমবার)
যুববাণী (মঙ্গলবার)
অনুরোধের আসর
লঘু সংগীত (বুধবার)
অখিল ভারতীয় অনুষ্ঠান
চুম্বক (২য় বৃহস্পতিবার)
লঘু সংগীত
(১ম, ২য়, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ বৃহস্পতিবার)
হাসপাতাল (শুক্রবার)
অখিল ভারতীয় সংগীত
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা (মঙ্গলবার, শনিবার এবং ১ম বৃহস্পতিবার বাদে)
ক্রমাগতিক বিচিত্রানুষ্ঠান (মঙ্গলবার)
১০-১৫ লঘুসংগীত : কণ্ঠসংগীত
১০-৩০ আবহাওয়া ও সমাপ্তি

**১ অক্টোবর, ১৯৭৪**

৭-০৫ সকাল : ভক্তিগীতি বেতার
৮-২০ আজকের দিনে আগরতলায় এবং অনুষ্ঠান ও সাপ্তাহিকীর লোকগীতি
১-১৫ দুপুর : বিচিত্রানুষ্ঠান (হিন্দী)
৬-৩০ সন্ধ্যা : কৃষি জগৎ : আমন ধানের রোগ পোকা দমন করুন : বাংলা আলোচনা
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আসরের
৭-২০ বিজয়রাঘবগড় । খাঁদী
৮-০০ সোনালী অতীত : সাপ্তাহিকের
১০-১৫ পূরবী বন্ধ : নজরুলগীতি

**২ অক্টোবর, ১৯৭৪**

৭-০৫ সকাল : পণ্ডিত রবিশঙ্কর সেতার
৮-২০ আজ গান : লোকগীতি
১-১৫ বেসরকারীকরণ গান
১-১৫ দুপুর : সুরুচি সংগীত
৬-৩০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ : গ্রামীণ অর্থনীতি ঐতিহ্য সাপ্তাহিকীর বিশ্লেষণ : বাংলায় আলোচনা; লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের কথিকা
৭-২০ বিলায়েত খাঁ ও সহযোগিবৃন্দ সানাই
৮-০০ রবীন্দ্রসংগীত
৮-৫০ বি. বি. পালুসকর ও সুধীকুমারী : তবলা

**৩ অক্টোবর, ১৯৭৪**

৭-০৫ সকাল : মার্চিক ক্লাব বেতার ও ঐ
৮-২০ সুরেশ গান : লোকগীতি
১-১৫ দুপুর : সুরুচি সংগীত আধুনিক
১-১৫ দুপুর : সুরুচি সংগীত
৬-৩০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ : সাইট সারদুটী গ্রামের চাষ : বাংলা আলোচনা; লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের কথিকা
৭-২০ ভীষ্ম খাঁ : বেহাগ
৮-০০ কর্ণাট সঙ্গীত : বাংলা নাটক; রচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; পরিচালনা : প্রীধর চট্টোপাধ্যায়
১-১১ পর্বতী সেন অনুরোধের গান
১০-১৫ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত

**৪ অক্টোবর, ১৯৭৪**

৭-০১ সকাল : বিলায়েত হোসেন খাঁ ও কাঁকনবন চট্টোপাধ্যায় বেহাগ ও ঐ
৮-২০ জলতরঙ্গ : লোকগীতি
১-১১ দুরন্ত : আধুনিক
১-১৫ দুপুর : সুরুচি সংগীত
৬-৩০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ : সমাচার; লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আসরের
৭-২০ আবদুল করিম খাঁ : বেহাগ
৮-০০ আরতি মুখোপাধ্যায় ও প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । রাবণরাজ
৮-৫০ বিলীপকুমার রায় : ভক্তিগীতি
১-০০ অখিল ভারতীয় সংগীত অনুষ্ঠান : রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ আলোচনা : বাংলা এবং হিন্দী অনুষ্ঠানের কণ্ঠসংগীত

**৫ অক্টোবর, ১৯৭৪**

৭-০৫ সকাল : আরতি খাঁ : বেহাগ
৮-২০ নিখিলেন্দু চৌধুরী লোকগীতি
১-১৫ আজ ছোটদের । আধুনিক
১-৫০ বিদ্যুৎসেবা : পরিচালনা : নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; অংশগ্রহণ : শ্রীপতি চক্রবর্তী
২-২০ দুপুর : ভক্তিগীতি
৮-৫০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ : আদিবাসী ধান সংস্কারে হিন্দুদের বহুমুখী : বাংলার আলোচনা; লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আসরের
৭-২০ হিরণ্ময় কন্যা : ভক্তিগীতি
৮-০০ আজকে যে ও সুচিত্রা মিত্র অনুরোধের গান
১-৫০ খবরাখবর

**৬ অক্টোবর, ১৯৭৪**

৭-০৫ সকাল : নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বেহাগ
৮-২০ সুরা সুরেমকুলরা ও সলম মিত্র । লোকগীতি
১-১১ অলকানন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুপকুমার রায় : আধুনিক
১-১১ দুপুর : হরপ্রসাদের গান
৬-৩০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ : ভূমি সংস্কার আইন ও চাষকদের বিশেষ ব্যবস্থা : বাংলার আলোচনা
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের কথিকা
৭-২০ বাসবরাজ রাজগুরু : খেয়াল
৮-০০ হরি বন্দ্যোপাধ্যায় : কীর্তন
৮-৫০ রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিবেন্দ্রগীতি
১-১১ রামুরী চট্টোপাধ্যায় নজরুলগীতি
১-৫০ অনুরোধের আসর

**৭ অক্টোবর, ১৯৭৪**

৭-০১ সকাল : ইমরান হোসেন খাঁ বেহাগ
৮-২০ সলম মিত্র : লোকগীতি
১-১৫ গোবরাচাঁদ মুখোপাধ্যায় আধুনিক
১-১১ দুপুর : সুরুচি সংগীত
৬-৩০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ : ফসল বাজার পরিস্থিতি : বাংলার আলোচনা; লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আসরের
৭-২০ বৃন্দাবন গজগুরু : খেয়াল
৮-০০ অখিল মিত্র : গজল
৮-৫০ বাণী গুরু : রবীন্দ্রসংগীত
১-১১ সংবাদ পরিক্রমা
১-৫০ প্রবাসী
১০-০০ ক্রমাগতিক বিচিত্রানুষ্ঠান সমাপ্তি

**৮ অক্টোবর, ১৯৭৪**

৭-০১ সকাল : নির্মলা দেবী বেহাগ ও ঐ
৮-২০ রঙ্গ গান : লোকগীতি
১-১১ বীণা মুখোপাধ্যায় : আধুনিক
১-১১ দুপুর : চিত্রগীতি (হিন্দী)

। অনুষ্ঠান বেতার

পরিবার্তা মহেশ বিদ্যারত্নের
ছুলিজল
চুলির অব্যর্থ ঔষধ
হাবীল ড্রাগ কর্পোরেশন
২৩৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

৮-৫০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ
কৃষি সমস্যা চাষের প্রসারে
সেচের গুরু : বাংলার
আলোচনা : লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আলোচনা
৭-২০ গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষাল : বেহালা
৮-০০ রামায়ণী : কীর্তন
৯-২১ হিন্দির ছায়াচিত্রের
রবীন্দ্রসংগীত

### ১ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৫ সকাল : রঙ্গনাথাই
বেহালা, ফ্লুটে ও তবলা
৮-২০ নীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সহযোগ বৃন্দ : লোকগীতি
১-১১ অমিতা ঘোষ : আধুনিক
১-১৯ দুপুর : সুরেন সংগীত
৬-৫০ সন্ধ্যা কৃষিজগৎ
কৃষি সমস্যা ও সমাধান :
বাংলার আলোচনা, লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আলোচনা
৭-২০ রঘুনাথ সেঠ : বাঁশী
৮-০০ রবীন্দ্র সেন ও সহযোগিবৃন্দ
তাঁতগীতি
৮-৫০ বেলা আখতার : গজল
৯-১১ সেবায়ত বিশ্বাস
রবীন্দ্রসংগীত
১০-১৫ মধু বসু
অনুষ্ঠানসমূহের গান

### ১০ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০১ সকাল : দিলীপকুমার সেন
বেহালা
৮-২০ কেতকী বন্দ্যোপাধ্যায়
লোকগীতি
১-১১ বিনীত মধু ও সুহাসা
মুখোপাধ্যায় : আধুনিক
১-১৯ দুপুর : সুরেন সংগীত
৬-৫০ সন্ধ্যা কৃষিজগৎ
কৃষক ভাইদের চিঠিপত্রের
উত্তর : লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আলোচনা
৭-২০ সুকন্যা পাইনগুরু : বেহালা
৮-১৯ অর্ঘ্য সেন : রবীন্দ্রসংগীত
১০-১৫ নীরেন বসু : নজরুলগীতি

### ১১ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৩ সকাল : পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও
আলি আকবর খাঁ
সেতার ও সরোদ
৮-২০ রাধাবাঈচন্দাবরকর : লোকগীতি
১-১১ উমার মধু : আধুনিক

বীরেন মাইতি : এবার পুজোয় আকাশবাণীতে দুটি গান রেকর্ড করেছেন

১-১৯ দুপুর : সুরেন সংগীত
১-৩০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ
সমস্যা ও তার
বিভিন্ন দিক : বাংলার
আলোচনা : লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আলোচনা
৭-২০ প্রেম সোমজাদী : বাঁশী
৮-০০ লতা মঙ্গেশকর : গজল
৮-৫০ মাহমুদা বেগী
রবীন্দ্রসংগীত
১-৩০ অখিল ভারতীয় সংগীত
অনুষ্ঠান

### ১২ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০০ সকাল : বিলায়েত খাঁ ও
সহযোগিবৃন্দ : সেতার
৮-২০ প্রমোদ চক্রবর্তী : লোকগীতি
১-১৩ অমিতা মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
১-৫০ দুপুর : সুরেন সংগীত
২-২০ ভাটিয়ালি
৬-৫০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ
কৃষিতত্ত্বের পরিবেশ পরিচয়
উপকরণ ভূমিকা : বাংলার
আলোচনা : লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আলোচনা
৭-২০ নিখিল আহমেদ খাঁ ও
নিখিল আহমেদ খাঁ : সেতার
৮-৫০ ইলা চট্টোপাধ্যায়
নজরুলসংগীত

### ১৩ অক্টোবর, ১৯৭৫

৮-২০ সকাল : মুহম্মদ রফিকী
লোকগীতি
১-১৩ অরুণ বসু : আধুনিক
১-১৫ দুপুর : হেমন্তদার গান
১-৩০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ
নানা কথা; সুহৃদেন্দু চৌধুরী :
লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আলোচনা
৭-২০ শামসুল হোসেন খাঁ : সেতার
৮-০০ শান্তিদেব ঘোষ ও
বাংলা ঐকতান। অধিনায়কের হাত
৮-৩০ উত্তম সেন ও অমিতা ঘোষ
কীর্তন
১-১১ মৃণালিনী মিত্র ও সহযোগ
সেতারবৃন্দ
অনুষ্ঠানসমূহের গান
১০-১৫ মুহম্মদ রফিকী : লোকগীতি

### ১৪ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৪ সকাল : বিদেশের অনুষ্ঠানের
রেকর্ড
৮-২০ মুক্তাঞ্জন ব্যানার্জী
সরোদের সুরে : লোকগীতি
১-১৫ বিশ্বজিৎ : আধুনিক
১-১৯ দুপুর : সুরেন সংগীত
৬-০০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ।
ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ।
বাংলার আলোচনা : লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আলোচনা
৭-২০ হরিপ্রসন্ন মিশ্র
ফ্লুটে ও বাসরী
৮-০০ বাঈজা মুখুজ্জ ও অর্কেস্ট্রা
অনুষ্ঠান পরিচালনা : গজল
৮-৫০ পঙ্কজকুমার মল্লিক
রবীন্দ্রসংগীত
১-০০ প্রসারী

### ১৫ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৫ সকাল : পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ
ঠাকুর : সোলো

## অখিল ভারতীয় কার্যক্রম

এই প্রথম ৪ অক্টোবর, ১৯৭৫ রাত ১-৩০ মিনিটে অখিল ভারতীয় কার্যক্রম কর্নাটক এবং হিন্দুস্থানী সংগীত ছাড়াও পাশ্চাত্য সংগীত প্রচারিত হচ্ছে। কর্নাটক অনুষ্ঠানে বীণা পরিবেশন করবেন এম্মেনসঙ্কর শাস্ত্রী, হিন্দুস্থানী অনুষ্ঠানে ও'ঙ্কারনাথ পরিবেশন করবেন কিশোরী অমোনকর এবং পাশ্চাত্য সংগীত অনুষ্ঠানে **আর্থার গডফ্রে** পিয়ানো, **লালিতা দাস** পিয়ানো, **পারভেজ মেহদী**, **ফ্লিট্** পারকাশন ও **টেড্ মার্টিন** গজল চেম্বার সংগীত এবং **হামফ্রে আলবুকের** অর্গান পরিবেশন করবেন।

২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত অন্তর্জাতিক সংগীত সপ্তাহ ও'র উদ্যোগে বিশ্ব সংগীত সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই বিশেষ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংগীতের নেই কোন বিশেষ ভাষা, ধর্ম, ভৌগোলিক বা বর্ণ। সংগীতই একমাত্র সারা বিশ্বের মানুষকে এক মিলনসূত্রে গ্রথিত করতে পারে। এই সপ্তাহে সমগ্র পৃথিবীতে সংগীতের সাহায্যে মানুষ তার গভীরতম মনোবেদনা ও শ্রেষ্ঠতম আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে।

৮-২০ মো. নাগ : লোকগীতি
১-১৯ দুলেন মাইতি
আধুনিক
১-১৯ দুপুর : চিত্রগীতি (হিন্দী)
১-৫০ সন্ধ্যা : কৃষিজগৎ
কৃষি আলোচনাচক্র : লোকগীতি
৭-০০ রাত : হিন্দুস্থানী তালের আলোচনা
৭-২০ রঘুবীর চৌধুরী : সেতার
৮-০০ সজ্জার ভর্তৃ : সেতার
১-১৩ মো. নাগ : লোকগীতি
১০-১১ মধু বসু : রবীন্দ্রসংগীত

## শিলচর

### ১ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৫ সকাল : মোনা মিত্র
লোকগীতি
৭-৫১ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
১-২০ দুপুর : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
৭-২০ রাত : মোনা মিত্র : লোকগীতি
৭-৫১ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
১-৩০ ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য : সেতার

### ২ অক্টোবর, ১৯৭৫

১-৪০ সকাল : নিখিলী ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রসংগীত
৭-৫০ হুমায়রা বেগ : গজল
৮-৩০ শোভা ঘোষালী : বাঁশী
৮-৩০ সন্ধ্যা : হুমায়রা বেগ : গজল
৮-৫৪ ফ্লোর-জাম্পারের কথা
৮-০৫ রাত : নিখিলী ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রসংগীত

### ৩ অক্টোবর, ১৯৭৫

১-৪০ সকাল : ধামাইচা
৭-০৪ নিবেদিতা মিত্র : আধুনিক
১-২০ দুপুর : নিবেদিতা মিত্র
আধুনিক
৭-৪৫ রাত : নিবেদিতা মিত্র
আধুনিক

### ৪ অক্টোবর, ১৯৭৫

৬-০০ প্রত্যুষে : রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা
৭-০৫ সকাল : নিমাই দাস
লোকগীতি
৭-৫১ লতা দে : আধুনিক
৮-৩০ দুপুরের বাদ্যযন্ত্র : অরেঞ্জ
১-২০ দুপুর : লতা দে : আধুনিক
১-৪০ গীতিকা সম্মিলন
২-২০ রাত : নিমাই দাস : লোকগীতি
+ প্রয়োজনের রেকর্ড


## সমিতা

হোম বানের কাপলার ফেল-চেঞ্জিং হারমোনিয়াম্ প্রয়োজন হ'লে একমাত্র 'সমিতা'ই চাইবেন,

কারণ—

গানবৈশিষ্ট্যে সৌন্দর্যে সুর-মাধুর্যে সমিতা তুলনাহীন।

**রেডি টেক বাধা হয়।**

পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

**সমিতা মিউজিক্যালস্**

১২, চেতলা রোড
নিউ আলিপুর ( মহাবীর তলা )
কলিকাতা-৫৩, ফোন ৪৮-৪০১২

### ৫ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৪ সকাল : মৌলী চক্রবর্তী
লোকসঙ্গীত
৭-৩৫ শ্যামল মিত্র : আধুনিক
৮-২০ বিশ্বসেরা
১-২০ দুপুর : শ্যামল মিত্র
আধুনিক
৩-০০ বিকেল : বেহার চৌধুরী
সেতার
৭-২০ মৌলী চক্রবর্তী : লোকসঙ্গীত
৭-৪৫ শ্যামল মিত্র : আধুনিক

### ৬ অক্টোবর, ১৯৭৫

৬-০০ সকাল : সুধেন্দ্র দাস
সেতার
৭-০৪ লোকসঙ্গীত
৭-৩০ অনুপ ঘোষাল
আধুনিক
৮-১৫ সন্ধ্যা : সৌমেন্দ্র সেন
বাঁশি ও তবলা
৮-৩০ অনুপ ঘোষাল
আধুনিক
৮-৪৫ রাত : চর-আজাদের কথা
৭-২০ লোকসঙ্গীত
৮-০৫ আশী সেন : রবীন্দ্রসঙ্গীত
১-০০ সুধেন্দ্র দাস : সেতার

### ৭ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৪ সকাল : মীরাবতী চক্রবর্তী
লোকসঙ্গীত
৭-৩৫ অনুপ দত্ত : আধুনিক
৮-০০ প্রেমলতা সরকার : সেতার
৮-৩০ সন্ধ্যা : লোকসঙ্গীত সরকার
সেতার
৭-২০ মীরাবতী চক্রবর্তী
লোকসঙ্গীত
৮-০৫ আশী মুখার্জি : রবীন্দ্রসঙ্গীত

### ৮ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৪ সকাল : অরুণি বাগচী
লোকগীতি
৭-৩৪ অমিয়েন্দ্র মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
৭-৫০ কুলবালী মিত্র
অনুপ্রেরণার গান
১-১০ দুপুর : সৌরেন মিত্র
রবীন্দ্রসঙ্গীত
৬-৩০ সন্ধ্যা : কুলবালী মিত্র
অনুপ্রেরণার গান
৭-২০ রাত : অরুণি বাগচী
লোকসঙ্গীত
৮-০৫ সৌরেন মিত্র : রবীন্দ্রসঙ্গীত

### ৯ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০৫ সকাল : মিতা দাস
লোকগীতি
৭-৪৪ শিল্পী ভাইমর্স : আধুনিক
৭-২০ মিতা দাস : লোকসঙ্গীত
৭-৪৪ শিল্পী ভাইমর্স : আধুনিক
৮-০৩ কল্যাণী ঘোষ
রবীন্দ্রসঙ্গীত
১-৫০ নিবেদিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সেতার
১০-০০ রাত্রির ভারতীয় কার্যক্রম
ভারতীয় সংগীত :

### ১০ অক্টোবর, ১৯৭৫

৬-৩০ সকাল : সুধেন্দ্র ভট্টাচার্য
গীতার
৭-০১ উষা বন্দ্যোপাধ্যায় : লোকসঙ্গীত
৭-২০ সুধেন্দ্র ভট্টাচার্য : গীতার
৭-৩১ রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়
আধুনিক
১-২০ দুপুর : রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়
১০-০০ হিন্দুস্থানী সংগীত সভা :
রাত্রিকালী রাগ : ওস্তাদ
আধুনিক
৭-২১ রাত : সুধেন্দ্র ভট্টাচার্য
গীতার
৭-২০ উষা বন্দ্যোপাধ্যায় : লোকসঙ্গীত
৭-৫১ রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়
আধুনিক

### ১১ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০১ সকাল : ভবানীপ্রসাদ পাল
লোকগীতি
৭-২০ এস. ডালম : বেহালা
৮-৩০ নিবেদিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সেতার
১-১০ দুপুর : অরিন্দম বিশ্বাস
রবীন্দ্রসঙ্গীত
১-২০ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
আধুনিক
১-৫০ রবিশঙ্কর
৭-২০ ভবানীপ্রসাদ পাল
লোকগীতি
৮-০১ অরিন্দম বিশ্বাস
রবীন্দ্রসঙ্গীত
৮-২১ এস. ডালম : বেহালা

### ১২ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০১ সকাল : সূর্য লাল : লোকসঙ্গীত
৭-১১ পার্থসারথি চক্রবর্তী : তবলা
৮-২০ বিশ্বসেরা
১-১০ দুপুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
১-১১ সন্ধ্যা : পার্থসারথি চক্রবর্তী
তবলা
৭-২০ রাত : সূর্য লাল : লোকসঙ্গীত
৭-৫৫ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
আধুনিক

### ১৩ অক্টোবর, ১৯৭৫

১-২০ সকাল : প্রফুল্ল দাস : সেতার
৭-০১ বিমল মুখোপাধ্যায়
লোকসঙ্গীত
৭-৩১ মান্না দে : আধুনিক
৭-১০ মাধবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
লোকসঙ্গীত
১-২০ দুপুর : মান্না দে মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
১-২০ সন্ধ্যা : মাধবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
লোকসঙ্গীত
৭-২০ বিমল মুখোপাধ্যায়
লোকসঙ্গীত
৭-১১ মান্না দে মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
১-২০ প্রফুল্ল দাস : সেতার

### ১৪ অক্টোবর, ১৯৭৫

৭-০১ সকাল : প্রদ্যুম্ন চক্রবর্তী
লোকসঙ্গীত
৭-১০ সুবীর মুখোপাধ্যায়
১-৪০ দুপুর : রবিশঙ্কর চৌধুরী
১-২০ সন্ধ্যা : সুবীর মুখোপাধ্যায়
৭-২০ প্রদ্যুম্ন চক্রবর্তী : লোকসঙ্গীত
৮-২১ রবিশঙ্কর চৌধুরী : বাঁশী

### ১৫ অক্টোবর, ১৯৭৫

১-২০ সকাল : কুলবালী দুবে
৭-০১ নন্দ রায় : লোকসঙ্গীত
৭-২১ বিশ্বসেরা : আধুনিক
৭-২০ রাত : নন্দ রায় : লোকসঙ্গীত
৭-৫০ আধুনিক গান : আধুনিক
১-৫০ কুলবালী দুবে : এসরাজ


## কণ্ঠ সঙ্গীত

২৪শ—তাপস আদিত্য

( রেকর্ড শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক )

প্রথম খণ্ড প্রায় নিঃশেষ—মূল্য ৪৲
দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই

প্রকাশিত হবে ৭৲
দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত

হবে ৭৲

বহু আলোচিত ... আধুনিক গীতিকারের লিখিত এই ধরনের গ্রন্থের এই এই প্রথম প্রকাশিত হলো, সঙ্গীতের ইতিহাস, গঠন-রীতি এবং বাণিজ্যিক ... ধারণা ঠুংরি বিশ্লেষণ

ভূমিকা : ... টিকে ... লিখেছিলেন, যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা ... ভারতবর্ষের সমস্ত বাঙালি ... সেজন্যে এই বই একটি সাড়া ... যাবে।

বিশ্বের সঙ্গীত শিল্পী ... আধুনিক বাংলার সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশ ... এই বইয়ে স্থান দিয়েছেন। এমন কোন গায়ক বা গায়িকা নেই যাঁর ... প্রকাশিত হয়েছে—তিনি প্রকাশিত হয়ে আছেন সঙ্গীতে, সঙ্গীতজ্ঞরা, তাঁর গানে, তাঁর শিল্পীজীবনের সঙ্গীতে।

প্রাপ্তিস্থান :

**প্রকাশনি বুক হাউস**
৪/১এ/১ বিধান
কলেজ কলকাতা
... ... ... ফোন : ...

**কলেজ কোর্ট**
... কলেজ ষ্ট্রীট ফোন : ...
কলিকাতা-...

**এস, ডি**
... কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-...
ফোন : ...

বিসমিল্লা খাঁ ও সহবাদিন্দবৃন্দ

# আকাশবাণী কলকাতা টেলিভিশন কেন্দ্রের নির্দিষ্ট সময়সূচী

## সান্ধ্য অধিবেশন ঃ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ—রাত ৯-৩০ মিঃ

### রবিবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ দেশবিদেশের খেলা
৭-০০ কাহিনী চিত্র
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ কাহিনী চিত্র
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ ফিল্ম/সমাপ্তি

### সোমবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ চিলড্রেন ফিল্মস
৬-৫৫ বাংলায় যুব অনুষ্ঠান
৭-২০ উন্নয়নের শপথ
৭-৩৫ সাক্ষাৎকার
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ নাটক (বাংলা/হিন্দী)
৯-১০ কয়ার (অর্কেস্ট্রা)
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ সমাপ্তি

### মঙ্গলবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ শিশুদের অনুষ্ঠান (বাংলা)
৭-০০ লোকগীতি
৭-১০ পল্লীকথা
৭-২৫ অন্য কেন্দ্র থেকে
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ এফ ডি/প্রামাণ্য চিত্র
৮-২০ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
৮-৫০ পার্সপেক্টিভ
দিল্লী টি. ভি. অনুষ্ঠান
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ সমাপ্তি

### বুধবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ দেশবিদেশের খেলা
৬-৫৫ নৃত্য/লঘুসংগীত
৭-১০ শিল্প-জগৎ
৭-২৫ আমাদের কলকাতা (বাংলা)
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ দর্শকের দরবারে
৮-২০ দি অ্যাসেন্ট অব ম্যান
ডঃ জে. ব্রনোস্কি
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ সমাপ্তি

### বৃহস্পতিবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ বিজ্ঞান প্রসঙ্গ
৭-০০ বাতায়ন
৭-৩০ ঘরে বাইরে
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ চিত্রমালা/ছায়াছবির গান
৮-৫০ ইয়ুথ ফোরাম/ইংরাজী
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ সমাপ্তি

### শুক্রবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ শিশুদের অনুষ্ঠান (বাংলা)
৭-০০ লঘুসংগীত (বাংলা)
৭-১০ শিল্প-জগৎ
৭-২৫ হিয়ার ইজ নুসি
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ প্রাসঙ্গিকী
৮-৪০ এফ. ডি./প্রামাণ্য চিত্র
৮-৫০ উচ্চাঙ্গ সংগীত/নৃত্য
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ সমাপ্তি

### শনিবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ (ক) প্রশ্নোত্তর (বাংলা/ইংরেজী)
(খ) বিচিত্র
(গ) ফটো ফিচার
(ঘ) হেল্থ হিন্টস (বাংলা)
৭-০০ আঞ্চলিক কাহিনী চিত্র
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ আই. এন. আর
৮-২০ আঞ্চলিক ছায়াছবি
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ ছায়াছবি/সমাপ্তি

# বিজ্ঞাপন

**আকাশবাণী টেলিভিশন কেন্দ্রে প্রোডাকসন অ্যাসিস্টান্ট (কন্ট্রাক্ট স্টাফ) পদে নিয়োগের জন্য নয়াদিল্লীর টেলিভিশন কেন্দ্রের অধিকর্তা দরখাস্ত আহ্বান করছেন।**

**কার্যাবলী ঃ** প্রধানতঃ প্রযোজকের নির্দেশমত প্রতিটি প্রযোজনার জন্য বাজেট হিসেব তৈরি করা, স্টুডিও, সময়, রিহার্সাল এবং রেকর্ডিং প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনানুসারে মৌলিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, শিল্পীদের নিকট পাণ্ডুলিপি, রিহার্সাল চার্ট এবং ড্রয়িং পাঠানোর দায়িত্ব পালন করা, কাস্ট তালিকা, অর্ডার সিনারী, প্রপস্ কস্ট্যুমস্ ও সংগীত তৈরি করা এবং ফটোগ্রাফিক সেশনের ব্যবস্থা করা, ফ্লোর ম্যানেজার, ডিজাইনার (ওয়ার্ডরোব), লাইটিং বিশেষজ্ঞ এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করা, সেকসনের প্রচলিত কাজ এবং রেকর্ড পরিকল্পনার দায়িত্ব পালন ইত্যাদি।

**যোগ্যতা ঃ** রেডিও/টিভি/ফিল্ম/থিয়েটার অথবা অন্য যে কোন যোগাযোগ মিডিয়ায় প্রযোজনা বা অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় সহযোগিতার অভিজ্ঞতা-সহ অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী। অথবা, ন্যাশনাল স্কুল অব্ ড্রামা বা ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব্ ইণ্ডিয়া থেকে ডিপ্লোমা। অথবা, ইনস্টিটিউট অব্ ফিল্ম টেকনোলজি, মাদ্রাজ থেকে অনুষ্ঠান প্রযোজনার ডিপ্লোমা।

**বাঞ্ছনীয় ঃ** চলতি ঘটনা সম্পর্কে আগ্রহ। ইংরেজী/হিন্দীতে দক্ষতা।
**বয়স ঃ** ১.৭.৭৫ তারিখে ৩০ বছরের কম। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ মিডিয়ার কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

**ফি স্কেল ঃ** ২৩৫-১৫-৩৪০-২০-৪৪০ টাকা, তদুপরি কন্ট্রাক্ট স্টাফদের ক্ষেত্রে সময়ান্তরে প্রদেয় ভাতাসমূহ।

প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য নিজ-ব্যয়ে নয়া দিল্লীতে টিভি কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।

সরকারী পদে কর্মরত প্রার্থীগণ নিয়মানুগ দরখাস্ত করবেন।

নির্বাচিত প্রার্থীগণ আকাশবাণীর যে কোন বেস প্রোডাকসন কেন্দ্র/টেলিভিশন কেন্দ্রে বদলি করা যেতে পারে।

নির্বাচিত প্রার্থীগণ প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন সম্পূর্ণকরণ সাপেক্ষে প্রথমে নবীকরণযোগ্য ছয় মাসের চুক্তিতে নিযুক্ত হবেন। তারপর দুই বছর শিক্ষানবীশকালসহ তিন বছরের চুক্তিতে নির্দিষ্ট ফি স্কেলে কন্ট্রাক্ট স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত হবেন। শিক্ষানবীশকাল শেষ হলে ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির জন্য বিবেচিত হবেন।

সাদা কাগজে নাম, ঠিকানা, **জন্ম-তারিখ**, প্রার্থীত পদ, **শিক্ষা** ও পেশাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, কোন-পদে চাকুরী করেন কিনা (প্রমাণপত্র-সহ) এবং টিভি বা আকাশবাণীতে পূর্বে কোন পদে দরখাস্ত করে থাকলে তার বিবরণসহ দরখাস্ত ১০.১০.৭৫ তারিখের মধ্যে ডিরেক্টর, টেলিভিশন কেন্দ্র, আকাশবাণী, পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট, নয়া দিল্লী, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সর্বশেষ তারিখের পর আর কোন দরখাস্ত গৃহীত হবে না। পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বানকালে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। **কোন প্রকার তদবির তদারকি প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।**

### শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা

(পেশাদার)

ঈশ্বর, ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখা-পড়া চাই। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ করতে হয় তাহলে তার কখানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ এ সব জানার আমার অত খবরে কাজ কি? যে সে করে—অল্প করেই হোক্, আনা-যানের রাস্তা দেখেই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয়, তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে। খুব সহজে হয়ে যাবে। আগে রাম—তারপর রামের ঐশ্বর্য—অন্বয়।' লোকশিক্ষকের ভূমিকায় তিনি তাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে হাসতে হাসতে বলেছিলেন : '...অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মূর্খ! তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বললে, 'মহাশয়! আমি যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা করে সে সব পড়া বিদ্যা সব খু হয়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, খুব বিদ্বান হয়, বোঝার কথা কহে।...দেখ না, আমি ত খুব্, কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আমার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়।...আমিও যা কথা করে যাই, তাঁদের মনে আসে হয়, যা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার খুলে দেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে আত্মতত্ত্বের শিক্ষার ভিত্তিকরণ সার। এই ধর্ম অন্তরালের নয়, পঞ্চ-শরিয়তে সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম হচ্ছে আত্মবিদ্যা। প্রত্যক্ষানুভূতির উপর তার প্রতিষ্ঠা। এই ধর্ম বা আধ্যাত্মি-কতা জীবনের সকল অনুকরণের মূল ভিত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে বলতে হয়, ঈশ্বরকে খোটারূপে ধরে যত ইচ্ছা বন্ বন্ করে ঘুরে, খুড়ো খুরে যত ইচ্ছা কানামাছি খেল, তার-পর যত ইচ্ছা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা কর; লক্ষ্য স্থির থাকলে পতনের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে বিদ্বেষের স্থান নাই, আছে চিন্তধারার কোমলতা, স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য। এর প্রভাবে আবিল মানুষের মনে অবতীর্ণ হয়েছে এক নবীন বিশ্বাসের শ্যামলিমা।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি মৌলতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পাকা বৈদান্তিক। তাঁর মতে মানুষের অন্তরেই লুকানো রয়েছে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। মাটি চাপা সোনার মত জ্ঞানের রত্ন-মাণিক্য লুকিয়ে আছে মানুষের মনের গহনে। মনের খনি খনন করে রত্নমাণিক্য তুলতে হবে। লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের আবাহন-বাণী, মানুষকে মানুষ হতে হবে। মানুষ অমৃতের পুত্র, সে অমৃতের পুত্র নয়। প্রকৃতই সে সর্ব-ব্যর্থ সর্বজ্ঞ, সে অসহায় অসহায় নয়। মানুষের মধ্যে রয়েছে অজস্র সুপ্ত মহান চৈতন্যসত্তা। বাস্তবিকই সে সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। সে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। ভুল করে সে নিজেকে ক্ষুদ্র তাপী জীব সীমিত ভেবে করে কষ্ট পাচ্ছে। শিক্ষার উপেক্ষা মানুষের দীর্ঘকালের এই ভুলটি ভেঙ্গে দেওয়া, মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বেলান্তভিত্তিক এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাতত্ত্বটি ছোটদের হৃদয়ে গেঁথে দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন একটি গল্প। একদিন একটা ভরঙ্কর বাঘ একটি ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। বাঘ অবাক হয়ে দেখলে, ছাগলের পালের মধ্যে একটি বাঘ; সে ঘাস খাচ্ছিল, ওরে ওরা ছাগলের সঙ্গে মেঁড়ে পালাল। আতঙ্কগ্রস্ত বাচ্চা ছাগলের ছেড়ে দিয়ে বাঘটাকে ধরলে। সেটি তো ওরা ঘাস করতে লাগল। বাঘ তাকে জলের ধারে টেনে নিয়ে গেল আর বলল। 'এই জলের ভিতরে তোর মুখ দেখ। দেখ, আমারও কেমন হাড়ির মত মুখ, তোরও তেমনি।' তারপর তার মুখে এক টুকরো মাংস গুঁজে দিলে। সে প্রথমে খেতে চায় না, পরে স্বাদের একটু, একটু, আস্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। বাঘটা তখন তাকে বলল। 'ব্যাটা তুই ছাগলের সঙ্গে ছিলি, ওদের মত ঘাস খাচ্ছিলি, ওদের মত ভ্যা ভ্যা করছিলি, কিন্তু তোকে।' বাঘটাকের সন্দিহান ফিরে, তার বোধ হয় সেও প্রকৃতপক্ষে বাঘ, ছাগল নয়। সে বাঘের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গর্জন করে ওঠে, দেখে মনে হলে যায়। বাঘটাকো বাঘ মনে আত্মবিস্মৃত অমৃতের সন্তান। আতঙ্কগ্রস্ত বাঘ এখানে শিক্ষক, তিনি জ্ঞানদাতা চৈতন্যদাতা গুরু।

খুব কি তাই? মানুষ নিজের সত্যস্বরূপ ভুলে অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে থাকে, এতই ডুবে থাকে যে সে নিজের অস্তিত্ব হতে মুক্ত হবার চেষ্টা পর্যন্ত করে না, বরঞ্চ তার নিজের অস্তিত্বের অর্থই সাধনা পাবার চেষ্টা করে; আবার শ্রীরামকৃষ্ণের মায়া অতাধিক বেড়ে গেলে এবং সেটা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলে সে জ্ঞানালোকের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। সে বিশ্বাসই করতে চায় না যে তারই অন্তরালের অজ্ঞা-নের চেয়ে ঢাকা পড়ে রয়েছে চির-ভাস্বর জ্ঞানসূর্য। আত্মসম্মতি মূঢ় ব্যক্তির মত সে সূর্যকে দেখে মোহ-মুক্ত নিস্পৃহ। সে ভুলে যায় যে সর্বান্তর্যামী আত্মচৈতন্যই তার স্বরূপ। সে বিশ্বাস করে না যে জীবন্মুক্তই শিব। এই মূল্যায়ন তত্ত্বটি শিক্ষার্থীর হৃদয়ে গভীরভাবে এঁকে দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন অনেকগুলি গল্প। 'একজন তামাক খাবে, তো প্রতিবেশীর বাড়ী টিকে ধরতে গেছে। তখন অনেক রাত। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ জোর টেলাটেলি করবার পর, একজন জেগে খুলতে লেগে এল। লোকটির সঙ্গে দেখা হতে সে জিজ্ঞাসা করলে,


OVER
600000 INVESTORS STAND BY UNITS
BECAUSE
UNITS

Stand for : Safety of Capital
*Easy Encashability *Steady Return
*Tax Concessions : Units now enjoy exclusive

Income-tax Exemption upto Rs. 2,000 per annum and Wealth-tax exemption upto Rs. 25,000. These are in addition to the overall income-tax exemption of Rs. 3000 & Wealth-tax exemption of Rs. 1.5 lakhs already available.

No income tax is deducted at source in case of Resident Individuals

This year Unit Trust of India distributes 8.60% dividend which is equivalent to 11% gross even to people in the income bracket of Rs. 15000 to 20000

For further particulars, contact any of our
OFFICES
UNIT TRUST OF INDIA
45 Veer Nariman Road, Bombay-400023
9 Mathew Road, Bombay-400004
6 Parliament Street, New Delhi-110001
8 Council House Street, Calcutta-700001
Fort Glacis, Madras 600001

"কিসের, কি মনে করে?" সে বললে, "আর কি মনে করে, তামাকের নেশা ধরেছে, তাই এ; ভিক্ষে করতে এসেছ।" তখন প্রতিবেশী বললে, "যা তুমি তো বেশ লোক! এত কষ্ট করে আসা, তার মোর ঠেলাঠেলি। কেমন হয়েই যে লাগল বলেছে।" কথা শুনে ছেলে ওঠে প্রেতেরা, কিন্তু পরমুহূর্তেই তারা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ-কণ্ঠে গলের নীতি-সার। "যা হয়, তাই তার করে। অন্ত লোকে নিরাশ্বাস হবে।" আবার তার গান। যা চাবে তা খুঁজে পাবি, দেখ নিজ অন্তঃপুরে, নিজাধীর ফলের আধারটিকে রেখে দেয় সন্ধে ও অন্তরে সযত্নে।

ব্যবহার অন্তরের কারণ ক্রম বা বিশ্লেষণ এবং একত্ব, অজন বা মিথ্যাজ্ঞান হতে মুক্তির জন্য প্রয়োজন আত্মস্বরূপের উপলব্ধি— আত্মচৈতন্যই যে বিশ্বচরাচরে দ্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা ও ধারক, এই সত্যজ্ঞানের অনুভূতি। লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ এই দর্শনতত্ত্বটি শিক্ষকদের প্রয়োগ করে বলেছেন। মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা সন্ন্যাসই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমার আবার বাঁধে কে? বাঁধ সবলে কয়েদার, "বিধ নাই" জোর করে বললে বিধ ছেড়ে যায়! তেমনি "আমি বন্ধ নই, আমি মুক্ত," এই কথাটি জোর করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।'

কিন্তু কি প্রক্রিয়তে অজ্ঞানের অন্ধকার ভেদে আলোক প্রবেশ করে, এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে রামকৃষ্ণদেবের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য শুনতে হবে। তিনি পাতঞ্জল যোগসূত্রের 'তত্ত্ব জ্যোতিরেক' ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন। 'যখন কোন কৃষক ক্ষেতে জল সেচন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার আর অন্য কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না। ক্ষেত্রের নিকটবর্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, শুধু আল কাটিয়া দেওয়া ঐ জল মুক্ত করে। কৃষক সেই কথাই খুলিয়া দেয় এবং জল স্বভাবই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে ক্ষেতে প্রবাহিত হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার ঈর্ষিত ও শান্তি পূর্ব হইতেই প্রত্যেকের ভিতর রহিয়াছে। পূর্ণতা মনুষ্যের অন্তর্নিহিত ভাব, কেবল উহার দ্বার মুক্ত আছে, প্রবাহিত হইবার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ ঐ দ্বার সরাইয়া দিতে পারে, তবে প্রকৃতিগত শান্তি সহজে প্রবাহিত হইবে; তখন মানুষ তাহার নিজস্ব শক্তিগুলি লাভ করিয়া থাকে।' প্রত্যেক মানুষের ভিতরে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার; কিন্তু মানুষ দুর্বল আবার। তার অজ্ঞতা, মোহ ও আবিলতায় মন সেই অনন্ত শক্তির বিকাশে বাধা দিচ্ছে। অভ্যাস ও অনুশাসনের সাহায্যে মানুষের মন যতই সংকুচিত ও একাগ্র হতে থাকে, ততই সত্যদর্শনের অধিকারী হতে থাকে, ততই মনের অসীম শক্তি ও সুখের প্রকাশিত হতে থাকে।

শিক্ষার উপাদান সংগ্রহের চেষ্টাতে উপাদানের সন্ধানে, গ্রন্থে, বাজার ও আদালতকক্ষের ধুলো ধরা যে মন তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিক গুরুত্ব দিতেন। শিক্ষালাভের প্রধান হাতিয়ার মন। মনের স্বভাব হচ্ছে ধোপার ঘরের কাপড়ের মত। সেই কাপড়কে লালে ছোপালে লাল, নীলে ছোপালে নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে। মনের এই স্বভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : মনকে যদি কুপথে রাখো তো সেই রকম কথা-বার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্ত-সঙ্গে রাখো, তা হলে ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা—এইসব হবে।'

শিক্ষার্থীর সমস্যা, মন তার বশে নাই। সে বুঝিয়ে মত ইন্দ্রিয়গ্রামের বিভিন্ন মুখে মন-কাপড়কে রাঙাতে দেখে নি। সংস্কারবশে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তার মন যে রঙ ধরে সে সেই রঙের মন-চাদরকে গায়ে জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার বাসনা সে মনের কাঁধে চেপে চলে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় মন-ই তার কাঁধে চেপে বসেছে। সে অন্যায় করে লজ্জা করে, তার মন যেন সহজের পুতুলি পুতুলি ছিড়ে ফেলে যা তার বাঁধন খুলে ফেলেই সহজেরুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলি কুড়ন তার। তেমনি তার মনও যেন ছড়িয়ে পড়েছে, সেই মনকে কোন বিষয়ে স্থির করা এক কঠিন সমস্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন। মনটি পড়েছে ছড়িয়ে—কতক গেছে চাকা, কতক গেছে বিছানা, কতক গেছে কুটুম্বিতায়। সেই মনকে কুড়তে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি ঘোল আনা কাপড় চাও, তাহলে কাপড়ওয়ালাকে ঘোল আনা তো দিতে হবে।' ছড়ান মনকে গুটান ও লক্ষ্যে স্থির করাই সাধনা—শিক্ষার্থীদের প্রথম ও প্রধান সাধনা। উপায় সম্বন্ধে আলোচ্য শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার উপদেশ দিয়েছেন। 'অভ্যাস যোগ। অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যেদিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে।' নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করতে হবে। সেই অভ্যাসের সঙ্গে চাই অনুরাগ। অভ্যাস ও অনুরাগ এই দ্বিমুখী আক্রমণে মনকে বশে আনতে হবে, বশীকৃত মনকে একমুখী করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন। 'কথাটা এই; মন স্থির না হলে ঘোর হয় না, সে পথেই যায়। মন যোগীর কর! যোগী মনের বশ নয়।' অভ্যাস ও অনুরাগের সাহায্যে মনকে একাগ্র করতে হবে; সেই একাগ্র মনের লক্ষণ কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন। 'একাগ্র হলেই বায়ু স্থির হয়ে যায়, আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। বায়ু হয় সে নিশ্বে টের পায় না।' যেমন ধনুকে গুলি ছোড়বার সময় যে বাঁধ গুলি রাখে, সে বাঁধ্যুন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়।' শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবনাকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন। 'আমরা বলি, মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। বহির্বিজ্ঞানে যন্ত্রাদিবলের উপর মনকে একাগ্র করিতে হয়— আর অন্তর্বিজ্ঞানে মনের শক্তিসমূহকে আত্মাভিমুখী করিতে হয়। আমরা মনের এই একাগ্রতাকে 'যোগ' আখ্যা দিয়া থাকি।.....তাঁহারা (যোগীরা) বলেন, মনের একাগ্রতার দ্বারা জগতের সত্য—বাহ্য ও আন্তর, উভয় জগতের সত্যই করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মন একাগ্রতাসম্পন্ন হইলে এবং যে বিষয়ের উহার উপর প্রয়োগ করিলে অন্যের ভিতরের সমস্তই আমাদের প্রত্যক্ষ না হইয়া যাইবে।' তিনি রাজযোগ গ্রন্থে আরও বলেছেন। 'একাগ্রতার অর্থই এই—শক্তিসমূহের অসমতা দূর করিয়া সমস্ত শক্তিকে

পণ্ডিত বিকুশিক্ষর পাদুকেশ্বর


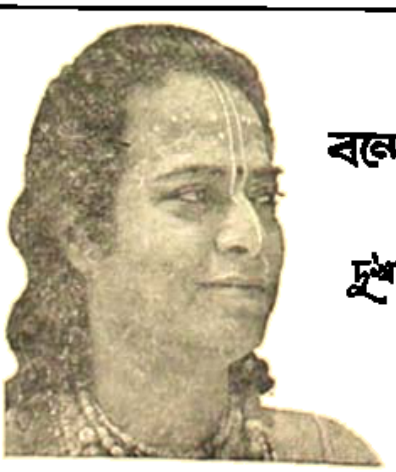

কীর্তন-রস-সাগর

কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রাণমিত কণ্ঠে দুখানি পদাবলী কীর্তন

ভারতী রেকর্ডে শুনুন

BHP.1018

করা। তার এক বিষয়ে একাগ্র হতে পারলে সেই মন যে কোন বিষয়ে ঢোকে না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়।' শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন কি ভাবে মনকে মনঃসংযোগ করতে হবে, কি ভাবে সেই মনকে একাগ্র ও শক্তিসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বড় হলেন তখন বহুপ্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতি খুবই সমস্যাকীর্ণ। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি টোলের পণ্ডিত জ্যেষ্ঠ রামকুমারকে মনের ভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন: 'এই চালকলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না, আমি এমন বিদ্যা শিখতে চাই যাতে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়, মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।' তিনি নিজের জীবনে দেখিয়েছেন সেই বিদ্যা যে বিদ্যায় বুদ্ধি শুদ্ধি করে, সেই বিদ্যা যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম ঈশ্বরের পথে লাভ হয়।' তিনি বলতেন যে সেই চাবুকটাই চাবুকী, যে চাবুকটিতে ভগবানকে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিও আহ্বান করেছিলেন এই পরমবিদ্যা। এই বিদ্যা সম্পর্কেই বৈদিক ঋষি বলেছিলেন, 'বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্', 'বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে'।

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পুথি-পাটার উপর জোর। কিন্তু পুথিপত্তর শক্তি সঞ্চারিত। এই সঞ্চারিত ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন না হলে শিক্ষার্থীর পুথিপাটার মোহজালে আটকে পড়ার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ এ বিষয়ে হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন, বলেছেন। 'পাল্লে বলিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধুমুখে গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?' তিনি আবার নিজেই একটি অনবদ্য উপমার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য। তিনি বলেছেন। 'চিঠিতে খবর এসেছে—পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা, আর একখানা কেল পেড়ে কাপড় পাঠাইবা।' তখন চিঠিখানা আবার কেলে দেয়। আর কি দরকার? এখন সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় করলেই হল।' গ্রন্থের শব্দার্থ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে মর্মার্থের উপর জোর দিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি চাইতেন, শিক্ষার্থী হবে গ্রন্থবেত্তা, গ্রন্থকীট নয়।

গ্রন্থের শব্দার্থের জেরে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ মূলে পরিশ্রমসাধ্য নয়, সময়ের সময়ে কুলোয়। তাছাড়া গ্রন্থের শব্দার্থের চাইতে মর্মার্থই যদি লক্ষ্য হয়, সেই-ক্ষেত্রে গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা আরও সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল; ভাসীর বিষয় পড়া, ভাসীর বিষয় শোনা আর ভাসীবিষয় জ্ঞানের হয়ার।' শাস্ত্র অজ্ঞাতসারেই হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তাঁর অনুরোধ-জ্ঞানলাভ অতিজ্ঞতাই ছিল জ্ঞান। ঘাচাইয়ের চূড়ান্ত মূল্যমান।

শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের সৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবধর্মী। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে পুথিপাটা থেকে যা পুরুমুখে থেকে বিদ্যার উপাদান সংগ্রহ করা কিন্তু কঠিন কাজ নয়। আসল সমস্যা প্রকৃতি বিদ্যার আয়ত্তীকরণ, শিক্ষার্থীর জীবনে বিদ্যার প্রতিফলন। সে কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ পুনঃপুনঃ বলতেন। 'দেখ, শুধু পড়া-শুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে—হাতে আনা বড় শক্ত।' মুখের কথা শুনলে হবে না, মুখ দেখলে হবে না, এমন কি মুখ ভোলাও করে ফেলেও হবে না, সেই মুখ হৃদয় করে মানুষকে ভক্তপুষ্ট করতে হবে। এমন বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষার্থীদের পরি-চালিত করতেন বলেই তাঁর শিক্ষা-দান ছিল মর্মস্পর্শী ও আশু ফলপ্রসূ। বাস্তবধর্মী শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে আমরা শুনতে পাই মনের বাণীর প্রতিধ্বনি। মনঃসংহিতা বলছে, 'মনঃপূতং সমাচরেৎ', মনঃপূতং ন্যসেৎ পাদং'। মনঃপূত কর্মের প্রেষ্ঠা, মনঃপূতো ধারিত্রী ধরত্র। ধারিত্রী জ্ঞানিনং শ্রেষ্ঠা, জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ।' অন্যান্য চাইতে গ্রন্থের পাঠক শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রমুখ অর্থবেত্তাকারীর চাইতে শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি পঠিত বিষয় বলতে করেছেন। তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ তিনি যাঁর জ্ঞান হয়েছে। তার এ'সবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই যিনি লব্ধ জ্ঞান অনুসারে কর্মানুষ্ঠান করেছেন। শিক্ষার সার্থকতা তখনই যখন শিক্ষার আদর্শ শিক্ষার্থীর জীবনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, শিক্ষা-শিক্ষার্থীর জীবনকে সার্থকভাবে প্রভাবিত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োগিক (Prag-matic) শিক্ষাচিন্তার উপর একটি বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার উপর বোল-আনা জোর। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান দোষ এই যে শিক্ষার্থীর মন ও মুখ সুসমন্বয়সূত্রে চলে না। মন ও মুখের স্বৈত প্রকৃতির শিক্ষার্থীর মনে সৃষ্টি করে দ্বিধা ও সংশয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টি-মুক্ত। তিনি শিক্ষার্থীর মনটি খুলে তোলার সময় লক্ষ্য রাখতেন, যাতে শিক্ষার্থীর মনের ভাব ও বাইরের আচরণে যেন মিল থাকে। শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক, মন ও হাত যেন একই ছন্দে সঞ্চালিত হয়; অর্থাৎ উপলব্ধি শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে বিকাশ। এটি আয়ত্ত করা কঠিন সাধনা। কিন্তু এটি আয়ত্ত না হলে বুদ্ধি পরিশুদ্ধ ও সক্ষ্য হওয়া সত্ত্বেও মানুষের হওয়ার শিক্ষার অনুসরণ হওয়া কঠিন। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: 'মন মুখ এক করাই শক্ত সাধনা। নতুবা মুখে বলছে, 'তুমি আমার সর্বস্ব' এবং মন বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে আছে, এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল।'

আধুনিকতার পথে একান্ত প্রয়োজন শিক্ষার্থীর অন্তরীণ প্রবণতা অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত অনুসরণ। শিক্ষকের অনাসক্ত শাসনে শিক্ষার্থীর শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অনেক সময়ই ব্যবা-প্রাপ্ত হয়, তার বিকাশোন্মুখ সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয়। বীজকে জল, মাটি, বায়ু প্রভৃতি তার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি জুগিয়ে দিলে বীজ নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে এবং নিজের স্বভাব অনুযায়ী বাড়তে থাকে; শিক্ষকও তেমনি শিক্ষার্থীর উপাদান সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা ও উদ্যমকে উদ্দীপ্ত করে দিবেন এবং তার বিকাশের পথে বাধাগুলি দূর করে দিয়ে তার অগ্র-গতির দিকে লক্ষ্য রাখবেন মাত্র। তিনি প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীকে ভুল করবার স্বাধীনতা পর্যন্ত দেবেন, নইলে সে যে সমস্যাটিতে পড়ে উঠতে পারবে না। এ বিষয়ে শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ আদর্শস্থানীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তার মূলসূত্র, শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশের উদ্বোধন। আত্মপ্রকাশের উপর নির্ভর করছে শিক্ষার্থীর অগ্রগমন। শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যই এই ছিল যে তিনি কারুরই বিশ্বাস নষ্ট না করে প্রত্যেককেই ভিন্ন মহৎ ভাব জুগিয়ে দিতেন। শিক্ষার্থী যে যেখানে আছে তাকে সেখান হতে অগ্রসর করিয়ে দিতেন। তিনি আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলকে-অসকলকেই নিজ নিজ জ্ঞানানুযায়ী গড়ে উঠবার জন্য এগিয়ে যাবার আদর্শ বা positive ideas দিতেন। মানুষ নিজেকে হীনহীন ভেবে কখন দুর্বল হয়ে পড়ে, নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, ফলে তার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি স্ফুরিত না হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ উদার ও মহান দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করে তাঁর অন্যতম শিক্ষার্থী স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: 'ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা ছোট মনে করতুম তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মহিমাটি চিনিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ন্যাপার।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে, মন লোককেও 'ভাল' 'ভাল' বললে সে ভাল হয়ে যায়। তাঁর লক্ষ্যই ছিল মানুষকে এগিয়ে দেওয়া। তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বলতেন অনুসরণ-কারী কাঠুরের গল্প। কাঠুরে জঙ্গলে এক চন্দনগাছ দেখতে পেয়েছিল, 'ওহ, এগিয়ে পড়ো।' তাঁর উপদেশ অনুসরণ করে কাঠুরে এগিয়ে যেতে থাকে; ক্রমে সে আবিষ্কার করে চন্দনের বন, তারপর খুঁজে পায় তামার খনি; আরও এগিয়ে গিয়ে পায় রূপোর খনি ও শেষ পর্যন্ত সোনার খনি। কাঠুরের দারিদ্র্য ঘুচে যায়, তার কুটিরে আসে ঐশ্বর্য।

জ্ঞানের পরিধি অনন্তপ্রসারী, মানুষের দেখারও শেষ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরিত করতেন এগিয়ে যাবার জন্য। নানা-ভাবে তাদের প্রলুব্ধিত করতেন জ্ঞান অজ্ঞানের পথে জ্ঞানচর্চাকে না করার জন্য। তিনি যেমন উপদেশ দিতেন তেমনি নিজের জীবনে আচরণ করতেন। তিনি জ্ঞানী-অজ্ঞানের এলাকা অতিক্রম করে বিজ্ঞানীর স্তরে উন্নীত হয়েও নিজে চির-শিক্ষার্থীর আদর্শ স্তরে নিজে-কে রেখেছিলেন। তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত, 'আমি যখন যাঁড় তখন শিব।' তাই শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ অনুপম; শিক্ষাজগতের একজন প্রথম বিদ্রোহী।

(শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকথামৃতের প্রতিটি পৃষ্ঠায় 'উদ্বোধন' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত)

বেনারসী ও সিল্ক শাড়ী
শ্রীগুরুধান সিল্ক শপ
কলিকাতা

ট্রুবাদুর নজরুলকে (দেশবাসী)

করেছেন, এবং সে প্রসঙ্গে অনুপ্রাণিত নিয়ে তাঁকে লিখেছেন দেশবাসীকে—

যা-কে তাকে বেঁধে—
তাকে তোরা আজ সবে বন্দন করে,
বেঁধে বান ছেয়ে বেঁধে, কবিকে
তাকতে পারে।'

দেশের প্রতি এই অকৃত্রিম অনুরাগ, এমন আন্তরিক টানের জন্যে নজরুল গীতিকে ফ্রান্সের চতুর্দশ শতাব্দীর ট্রুবাদুর (Troubadour) গানের সঙ্গে তুলনা করা চলে। 'ট্রুবাদুর' অর্থে "গায়ক"। ফরাসি শব্দটির অভিধানগত অর্থ হলো—যে ভক্তদের কীর্তিকথা গান করে, যা বীরত্বের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। আর ট্রুবাদুর হল যে নতুন ছন্দে নব নব ভাব-এ গান রচনা করে বেশ দেশান্তরে ছেড়ে বেড়ায়।

এই ট্রুবাদুরদের উদ্ভব হয়েছিল ফ্রান্সের পশ্চিম-পূর্ব অঞ্চল—প্রভান্সে। প্রভান্সে একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে ট্রুবাদুর নামে এমন এক গায়ক ও কবিকুলগুরুর আবির্ভাব হয়, যারা একেবারে নতুন ভাষার প্রেম সঙ্গীত রচনা করে প্রেমে প্রাণপ্রাচুর্যে মাইতেন। কাব্য ও সঙ্গীতকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন তাঁরা। একেবারে ট্রুবাদুরদের রচিত গান ও কবিতা থেকেই ইউরোপে মধ্যযুগে 'প্রভান্সাল' ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। সে কথা স্বতন্ত্র।

ব্যার্টান ছিলেন এমনি এক বিস্ময়কর প্রতিভাবান ট্রুবাদুর, মহাকবি দান্তে যাকে অভিহিত করেছিলেন 'দারিওর সোহাগে'। শুধু তাই নয়, রিচার্ডের মৃত্যুর পর তার ছিন্ন হৃৎপিণ্ডকে লন্ডনের বদ অনুচিত্তে ফিরে এনেছিল অবশেষে ছেড়ে ছেড়েছিলেন গাস্তে। ব্যার্টান ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরীর বুকে পরে হেনরীকে তাঁর ভ্রাতা রিচার্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উসকিয়ে করেছিলেন তাঁর গানের মাধ্যমে।

নজরুল গান তাঁর দেশবাসীকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিলেন তার মাতৃপূজার সেই আনন্দে ভরানো গানে—

'অসিমন্ত্রে বলে নাচ রে সকলে,
কৃপাণ লইয়া হাতে—'

মহাত্মা অগ্নিবীণাকার শুনেছিলেন সেই দেশপ্রেম কণ্ঠের সেই বলিষ্ঠ আহ্বান; নজরুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলেছিলেন, স্বদেশী যাত্রার দল তোকে করতেই হবে রে বন্ধু।'—একটু থেমে আবার বলেছিলেন, তোর এই কণ্ঠ আর প্রাণ নিয়ে তুই হবি নবীন যুগের ট্রুবাদুরের চারণ।' অগ্নিবীণাকারের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল।

নজরুল গান তাঁর রচিত বহুবার পালাগান মাতৃপূজা 'সমাজ' 'স্বদেশী-সেবা।' অভিনয়, কলকাতা ও গ্রামের মধ্যেও স্বদেশী যুগে বাঙালার জনসাধারণের মনে অনুপ্রেরণা এনেছিলেন। প্রবাসীতে (আশ্বিন, ১৩২০) রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'পূর্বে যাত্রার পালা কেবল রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি অবলম্বন করিয়া রচিত হইত। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে লোক-শিক্ষার প্রভূত উপাদান বিদ্যমান। কিন্তু কালক্রমে পূর্থিবীর ও ভারতবর্ষের যে সকল পরিবর্তন হইতেছে, তদুপযোগী নতুন নতুন শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। কিরূপে ভাব, চিন্তা প্রভৃতি প্রচারিত হইলে, সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানাদি কিরূপে হইলে আধুনিক পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে আমরা উন্নতি, শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারি তাহা...নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। এইদিকে যাত্রার পালার ভিতর দিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার প্রয়োজন আছে। বক্তিয়ারের প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা নজরুল দাস এই কার্য করিয়া সমাজসেবা এবং নিজের শক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। গান ও অভিনয় করিবার শক্তি তাঁহার আছে। আমার তাঁহার (নজরুল দাস) পালাগুলিতে কোন কোন প্রসিদ্ধ লেখকের রচনার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়.....কিন্তু তাহা বলিলে তাঁহার নিজের শক্তির কোন লাঘব হয় না। কারণ, একজন দক্ষ অনুকরী সম্বন্ধে উহা হইয়াছে যে তিনি বর্ণনা-শক্তিকে স্বর্গ হইতে আনিয়া হাটে বাজারে পথে ঘাটে জনসাধারণের মধ্যে মিলাইয়াছিলেন.....'

নজরুলের কোন কোন রচনা কোন কোন বিখ্যাত বাঙালি বা কবির দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর সেই অনুকরণীয় ভাষা-ভঙ্গি, রচিত কোরেই দেখবে। নেড়ো আলা, নেড়ো মাওলা, তবের খেলা সাঙ্গ হবে—বিখ্যাত গানের মত আরও অনেক গানে মায়াবাদী দর্শনতত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা নজরুল অন্তরের কবি, বাংলার প্রথম সার্থক ট্রুবাদুর, ভারতের অগ্নি-যুগের অন্যতম কবিকে। এর প্রমাণ-স্বরূপ তাঁর গানের অর্ধশতাব্দী ও অন্তর্দৃষ্টির সহজবোধ্য ভাষা, যেমন,

তু, ইহী মো বাঙ্গালীবাদ্
ইয়েস হেড ডিজিনী হুটেল
তোমার?

নজরুল বলেই বোধ হয় বন্ধ সাহিত্যের প্রথম অনুচ্ছে তিনি তাঁর গান ও বাদ্যকে রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। আশ্চর্য, খুব কম লোকই জানে এই গানটি এই

ফ্রেঞ্চের বিশ্বিদ্যুত 'মুর্দেশর্সাল্লিজী'

(দেশবাসী)

উপন্যাসের সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তটি মূর্তায়িত, যেখানে, দু'জনের ভাষায়, আরেকা ওসমানকে বলছেন—"ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।"

বলাবাহুল্য রোমান্টাইজেশন আন্দোলন যত শতকের শেষ তুর্যার বেগ প্রবলই ছিল। বর্তমান শতাব্দীতে, অনেকটা ক্ষীণবল হলেও, তা যে একেবারে লুপ্ত হয়েছে এমন নয়। অন্যান্যের মধ্যে, নজরুল প্রখ্যাত বাঙালী—জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সুহৃদ্যার সেন—একাও এ আন্দোলনের পুরো-ভাগে আছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের জর্নাল অব দি ডিপার্ট-মেন্ট অব লেটার্স' পত্রিকায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর 'এ রোমান অ্যালফাবেট ফর ইণ্ডিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে 'রোমান্টাইজেশন' সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা সর্বপ্রথম বিস্তৃত-ভাবে প্রকাশ করেন। দিল্লীর পিপলস্ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর 'সিলেক্ট পেপারস্'। আলো-নিবন্ধ চয়ন' নামক ইংরেজী গ্রন্থে উল্লিখিত প্রবন্ধটি সম্পাদিত ও পরিবর্ধিত আকারে মুদ্রিত হয়েছে (পৃঃ ২৫৭-৩১২)। একই ক্ষেত্রে সুহৃদ্যার সেনের বিশিষ্টতম অবদান, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর 'অ্যান ইটিমলজিক্যাল ডিক্শনারী অব বেঙ্গলী। সিকা ১০০০-১৮০০ এ. ডি.'। আশা করি, উৎসাহী পাঠক মূল রচনাগুলি পড়বার কষ্ট স্বীকার করবেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের উল্লিখিত প্রবন্ধটি ও অন্যান্য সূত্র থেকে দেখা যায়—কলকাতার 'রোমান অক্ষর সমাজ', 'রোমান অক্ষর সভা' বা রোমানীকৃত 'মুর্দেশর্সাল্লিজীর উদ্যোক্তাদের কিছুতেই ভারতবর্ষে রোমান্টাইজেশনের পথিকৃৎ বলা যায় না। তাঁদের অর্ধশতাব্দীর অনেক বছরেরও বেশী পূর্বে, ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে, লিসবন থেকে 'ক্রুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় রোমান হরফে। অষ্টাদশ বঙ্গ-দেশে ধর্মপ্রচারক খৃষ্টান মিশনারী-দের প্রয়াসে বাংলা ভাষার কিন্তু রোমান অক্ষরে মুদ্রিত অনুশাসন এবং সেই সঙ্গে প্রস্তুতি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাঁরাই প্রচলিত অবস্থায় সাঁওতালী লিপির পরি-বর্তে যে বহুকাল ধরে রোমান লিপি ব্যবহৃত হয়ে আসছে সে কথাও সকলের জানা। আরও সম্প্রতি কালে, ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দ থেকে, এলাহাবাদের প্রকাশন সংস্থা, রামনারায়ণ লাল, বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দুস্থানী (উর্দু) পুস্তকের 'রোমান্টাইজড্' সংস্করণ ও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'এ স্টুডেন্টস্ গ্রেমার অব কিলনারী কন্ভার্সেশন ইংলিশ ওয়ার্কস্ অ্যাণ্ড ফ্রেজেস হিন্দুস্থানী মর্ডার্ন ইন রোমান ক্যারেক্টার্স' প্রকাশিত করেছেন। এ ছাড়া পালি ভাষায় রচিত হীনযান বৌদ্ধদের বহু মূল গ্রন্থ, সংস্কৃতে লিখিত নানা বৈদিক পুস্তক এবং উভয় ভাষায় লিখিত অপরাপর আরও অনেক বই ইতিপূর্বেই রোমানীকৃত হয়েছে।

রোমান অক্ষরে মুদ্রিত 'মুর্দেশ-নাল্লিজীর কপিটি নিয়ে একদা যখন অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করি তখন সে-পুস্তকের শিরোনাম-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মানমন্দিরের উক্তি—"The multiplicity of alpha-bets, the worthless remnant of a by-gone civilization"—সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাই। আগেই বলেছি, তিনি কট্টর 'রোমান্টাইজেশন' পন্থী। রোমান লিপিতে, মুদ্রিত ও হাতে-লেখা অক্ষরের চেহারার পার্থক্য, 'ছোট-হরফের ও 'বড়-হরফের অর্থ তাৎপর্য প্রভৃতি মামুলি প্রতিবন্ধকতাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন না। কেননা সে লিপিতে সুবিধার সংখ্যা অজস্র। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মূলে ও টাইপরাইটার-এর ক্ষেত্রে এবং মুদ্রাক্ষরের ব্যবহারজনিত বহু মূল্যবান বাঁচা অতিরিক্ত অবসর ও অর্থের জন্য 'রোমান্টাইজেশনই সব থেকে সহজ ও বৈজ্ঞানিক উপায়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, ভারতীয় শিক্ষার্থীরা যদি আপাতত রোমান লিপির সঙ্গে পরিচিত হন, তা হলে তাঁদের নিজ নিজ ভাষার বিভিন্ন 'রোমান্টাইজড্' পুস্তকের সাহায্যে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ-গুলির সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান যোগা-যোগের পথটি প্রশস্ততর হবে।

শেষ

কলকাতা শহরের যে-কোনো হলে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে, দেশবন্ধুর বাড়ীতে (১৯১৬), আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে আরও কত আসরে গান করেছিলেন।

সে দিন সন্ধ্যা ফেরে, কালে ফেরে কলকাতাও। অনেক পুরোনো এবং বিস্মৃতে মিশে হয়ত ইতিহাসের কবিতা। কিন্তু নজরুল বেঁচে থাকবেন তাঁর রচিত গানের, সুরলহরীতে, উদাত্ত আহ্বানে এবং অকুণ্ঠিত স্বদেশানুরাগে।

শেষ

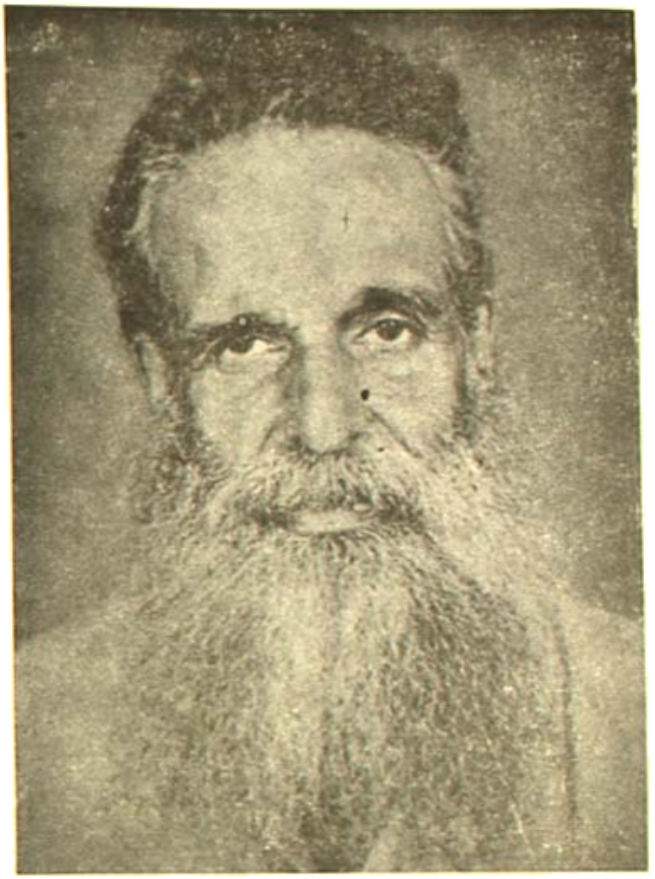

পাণ্ডুর বেতারবার্তা

ফরিয়াদরহমের আদালতের দৃশ্য
(বেতারে)

বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে—আমরা তাকে এমন কোনও অপরাধ করতে দেখিনি, যাতে বালিকার উপর আপনি এই ভয়ানক শাস্তির বিধান করছেন।

উঃ। আশ্চর্য হয়ো না রানী, রাজা অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে কখন কাউকেও শাস্তি দেন না।

শ্যামা। এ অপরাধ বালিকা কোথায় করেছে?

উঃ। এইখানে।

শ্যামা। কবে?

উঃ। আজ, এই কিছুক্ষণ পূর্বে।

শ্যামা। মহারাজ! আপনি কেন প্রতারক কর্তৃক প্রতারিত হচ্ছেন।

উঃ। কেউ আমাকে প্রতারণা করেনি।

শ্যামা। যদি শাস্তিই দিতে আপনার ইচ্ছা হয়েছে, তাহলে অপরাধ শুনিয়ে তাকে শাস্তি দিন।

উঃ। আমি আবার শোনাব কেন—তুমিই তো শুনিয়েছ।

শ্যামা। বিবস্ত্রা হয়ে সে জলে অবগাহন করেনি, এই কি তার অপরাধ?

উঃ। ঐ অপরাধ।

শ্যামা। আপনি কি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?

উঃ। সাবধান—দ্বিতীয়বার কথনে তোমাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করব। অনুরোধা! ঠিক বল তুমি অপরাধিনী কি না।

অনু। আর্য! আমি অপরাধিনী।

উঃ। শোন শ্যামাবতী, বালিকা নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করছে।

অনু। আমি বিষম অপরাধ করেছি—আমা হতে কৌশাম্বীরাজের অন্তঃপুরের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে।

উঃ। রানী, এ হতে অপরাধ কি আর আছে?

শ্যামা। না। কিন্তু, এ অপরাধ বালিকা কখন করলে, কেমন করে করলে—করতে পারে না। আপনার ভয়ে সে হতভম্ব হয়ে কি বলতে কি বলছে।

অনু। না দেবী, অপরাধী করেছি—এখন স্বীকার—বিষম অপরাধ।

শ্যামা। চুপ কর্ অর্বাচীনা, আমি রাজার সঙ্গে কথা কইছি, তুই উত্তর করছিস্ কেন?

উঃ। অর্বাচীনা তুমি—তুমি আমার সঙ্গে সিংহাসনে বসবার অযোগ্যা। এই শোন। অনুরোধা! অপরাধ রানীর কাছে ব্যক্ত কর। তুমি সে যুবককে দেখেছো?

অনু। দেখেছি।

উঃ। স্পষ্ট দেখেছো না—

অনু। দেখে স্পষ্ট হয়েছি।

উঃ। স্পষ্ট স্পষ্ট হওয়ার অপরাধ নেই। সে পরমসুন্দর যুবক, তুমি অনুঢ়া যুবতী—স্পষ্ট স্পষ্ট হলে দোষ ছিল না। তুমি আকাঙ্ক্ষা হয়েছিলে—তোমার মনে ভাবা উচিত ছিল তুমি রাজকুমারী। তোমার সম্মুখে রাজরানী। তিনি আমার্যা হয়েছেন। পরপুরুষ উদ্যানে প্রবেশ করেছে জানলে তিনি কখনও সেই অনাবৃত করতেন না। তুমি এতই আকাঙ্ক্ষা হয়েছিলে যে, তাকে সাবধান করলে না। তোমার ভ্রাতৃজায়াকে একটা তুচ্ছ প্রজার কাছে উলঙ্গ করালে।

শ্যামা। (উদয়নের প্রবেশ) যদিই তুচ্ছজনে কোনও অপরাধ করে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা করুন।

উঃ। ক্ষমা, অন্য প্রজা হলে করতে পারতুম—এ রাজকন্যার অপরাধ—আমার ভ্রাতা নিয়ে সংগ্রাম। কৌশাম্বী রাজকুলের বধূ তুমি—তুমি এ অন্যায় অনুরোধ কর না। আমি রাজদণ্ড হতে নিরোধি—আমার বুকের ভিতরে এক এক রক্তবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পতিত হচ্ছে—তবু আমাকে শান্তি দিতেই হবে। তুমি আমাকে আশ্বস্ত কর, কেঁদ না। অনুরোধা! তুমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও, এইখান থেকেই তোমাকে আমি মহাস্থানে প্রেরণ করে আসবো।

তৃতীয় দৃশ্য
ভাঁড়ু ঘর

ভাঁড়ু। বুকটা এখনও ঢিপ ঢিপ করছে—যত বেলা বাড়ছিল ততই প্রাণটা আমার আইঢাই করছিল। বুঝি ছোঁড়াটা এই এল—এই বাবা বলে ডাকলো। যাক্, সন্ধে হয়েছে, সন্ধের মুখেছে। আর সে আসবে না।

(কালীর প্রবেশ)

কালী. কালী! এখনও বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে।

কালী। আর বুক ঢিপ ঢিপ করছে বললে শুনবো না। ছোঁড়াটা যেদিন যাবে, সেইদিনেই আমাকে নগদ টাকা দেবে বলেছিলে। এখন আমাকে টাকা দাও।

ভাঁড়ু। ছোঁড়াটা তাহলে মরেছে—কেমন কালী?

কালী। মরেছে, তাতে কি আর সন্দেহ আছে? সন্ধের পরে কখনও কি তাকে বাড়ীর বাইরে থাকতে দেখেছ?

ভাঁড়ু। না কালী, এই প্রথম।

কালী। তবে? তাকে এবারে একেবারে জন্মের মতো ফেলে এসেছি। ব্যবসাই তাকে ফেলবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সে সব বারে আমেপাশে পড়ে ছিলুম, ঠিক সুযোগ তেমন চুকিয়ে দিতে পারিনি।

ভাঁড়ু। তাহলে তার মরা নিশ্চয়?

কালী। একেবারে নিশ্চয়। দাও, এইবারে আমার টাকা দাও।

ভাঁড়ু। তুই তাকে বাগানে ঢুকতে দেখেছিস্?

কালী। আমি নিজে হাই দিয়ে তাকে পাঁচিলে তুলে বাগানে ফেলে দিয়ে এসেছি। আবার দেখব কি? এখন মানুষ বাবু আমি কখনো দেখিনি। নাও, এইবারে আমার টাকা দাও।

ভাঁড়ু। বুকে যখন একবার হাত দিয়েছি, তখন কি আবার না করব! টাকা পাবি, নিশ্চয় পাবি—

কালী। কবে পাব?

ভাঁড়ু। তুই বলছিস বটে সে মরেছে, তবু এখনও কেমন বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে।

কালী। তোমার বুক ঢিপ ঢিপুনি তো বুঝিয়ে বলাই দেখে আছে। এমন দিন নেই যেদিন বুঁদিনি তোমার বুক ঢিপ ঢিপ না করেছে। জলজ্যান্তো ছেলেকে ধরে এনে, ছেলের মত বাইরে বাইরে মানুষ করে তাকে দেবকলে ফেলে দেবলে—বুক ঢিপঢিপুনির আর অপরাধ কি?

ভাঁড়ু। তবু—

কালী। আবার তবু কি দেখলি?

ভাঁড়ু। ধরে যে গেছে, এখন আর তাতে সন্দেহই নেই—কি বলিস?

কালী। ধরা ছিল তার আর অন্য উপায় নেই। সে বলবার রানী আর তার সখিনী ছাড়া অন্য কারও প্রবেশের অধিকার নেই। এখন কি স্বয়ং রাজাও রানীর বিনা হুকুমে সেখানে প্রবেশ করতে পান না। সেখানে ঢুকেছে তোমার ছেলে—

ভাঁড়ু। ধরে মরু, বাইরের লোকে বলে বলে তুইও ছেলে বলবি। একমাত্র তুইই তো আমলোড়া সমস্ত জানিস্। যেমন সম্বন্ধে তুই ঘর জানিস, আমার স্ত্রীও তত জানে না।

কালী। আমি কি এখন নিজের কথায় বলছি? বাইরের লোকে যা বলে তাই বলছি। সে মরেছে, তবে আর সন্দেহই কর না।

ভাঁড়ু। তাকে মরতে তো দেখলিনি?

কালী। রাজা বাগানে প্রবেশ করেছে—রক্ষীরাও তাকে দেখলো—হাজার করে একটা শব্দ হল, আবার কেমন করে দেখতে হয়, তাতো জানি না। তোমার হতভাগা কি বল দেখি, টাকা দেবে না?

ভাঁড়ু। আচ্ছা! হাসছিস্ কেন?

কালী। হাসবারই কথা এখনে কি আছে—টাকা যা দিতে হবে, দিলেই আমি চলে যাই।

ভাঁড়ু। বেশ, তুই আর একবার খবর নিয়ে আয়।

কালী। আবার আমি তার কাছে খবর নেব? খবর তুমি নিজেই নাও না।

ভাঁড়ু। ও বাবা, আমি খবর নেব কি কালী? রাজা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে আমি তাকে হল করে পাঠিয়েছি, তাহলে কি আমারও রক্ষে আছে? আমারও ফাঁসি হয়ে যাবে।

কালী। আর ছোঁড়াটা যদি তোর নাম করত?

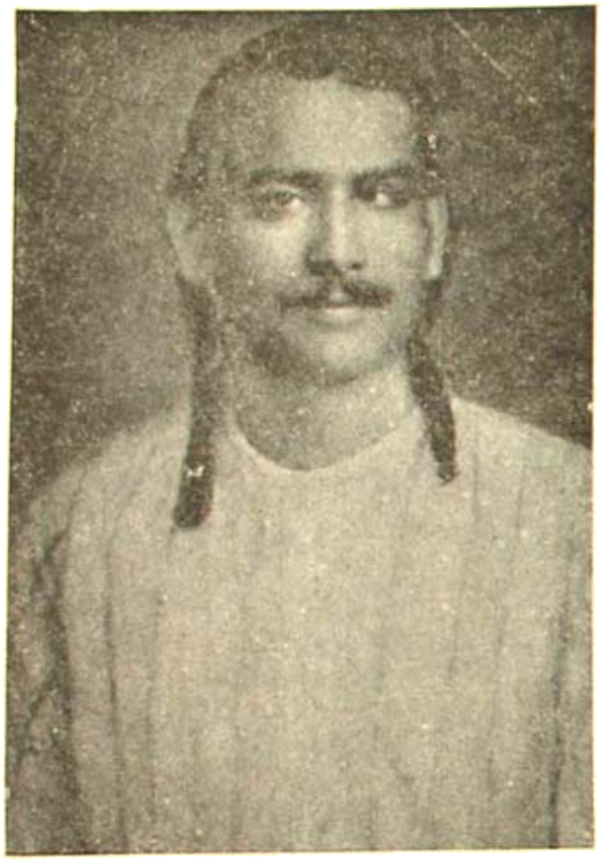

ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ

ভাঁড়ু। ওরে বাবা, তাহলে রাজা আমাকে গরুর টাঁড়িয়ে মারতো। ওপর বসে পা নেবে—

কালী। তবে? আমি যদি তোমার নাম করতে ছোঁড়াটাকে নিষেধ না করতুম? তোমার—আমাকে মুলোর টাকা দেওয়া উচিত। কুয়ে একশাে টাকা দেবে, তাও তুমি পাচ্ছ না।

ভাঁড়ু। হেরুবা—দেবো রে দেবো—অত উতলা হচ্ছিস কেন? সে কৌ আমাকে বাবা বলেই তো জানতো—দেবতার মতন ভক্তিও করত। আমিও যখন নাম করতে নিষেধ করেছি, তখন সে কখনও আমার নাম করবে না। ভাল, ততক্ষণ আমি টাকাটা বার করে রাখি, তুই আর একবার খবর নে।

কালী। ভালো আপদ।

ভাঁড়ু। দোহাই কালী—দোহাই কালী। এইবারে ফিরে এসে যেমনি বলবি ছোঁড়া মরেছে, অমনি তোর পাওনা আমি কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব। শোন কালী, শোন—আমি এ নগরের মহাশ্রেষ্ঠী—আমার তুলা ধনবান এ রাজ্যে নেই। রাজা কেন জানতে নেই, আর যখন জানতে নেই, তখন পৃথিবীতে নেই। তবু আমি ছোকরাটার তরে একদিন এক-দণ্ডের জন্যও সুখ পাইনি—একদিনও স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পাইনি—তুই আমাকে আজ মাঝিয়ে এক-দণ্ডের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দে—আর লাখটাকা মূল্যস্বরূপ নে। আমার একদণ্ডের লাখটাকা আর কালী, আমার একদণ্ডের ঘুমের লাভও লাখ টাকা। নিয়ে আয় ছোঁড়ার মৃত্যুসংবাদ—সংবাদ এনে টাকা নে।

কালী। তোমার এত টাকা?

ভাঁড়ু। আমার এত টাকা। আমি ধন-কুবের।

কালী। এত টাকাতেও তুমি ভাল করে খাও না—ভাল কাপড় পর না—

ভাঁড়ু। ওই ছোঁড়াটার তরে খাই না, পরি না।

কালী। এত টাকার মালিক হয়ে, তুমি আমার মত দরিদ্র গণিকার প্রতি আসক্ত!

ভাঁড়ু। ওই ছোঁড়াটারই তরে কালী আমি তোমাতে আসক্ত হয়েছি। তোমার রূপে আমি আসক্ত হইনি—আসক্ত হেনে, ভালবাসার ভেতর থেকেও স্বার্থের বিষ ছড়ায়। সেই দিন বছর পূর্বে কালী, একবার পূর্বাবস্থা স্মরণ কর। আমি সন্ধ্যার সময় পালকী করে রাজার বাড়ী থেকে যখন ফিরে আসছিলুম, সেই সময় রেকাবে তুমি বেশভূষা করে নিজের মুখটা আরে দাঁড়িয়ে ছিলে। তোমার মুখটা পালকী থেকে দেখে আমাকে ডাকা করতে এসেছিলে। তোমার সে ডাকে কতক আমি আজও পর্যন্ত ফিরতে পারিনি। তার পরেই আমি তোমাকে জানিয়েছি, আমার রক্ষিতা করেছি, ছোকরাটাকে থেকে বহু অট্টালিকায় তোমার স্থান দিয়েছি। তুমি মনে করেছিলে যে, তোমার নবযৌবনে বিশ্ব হয়ে তুমি আমাকে জয় করেছ। তা নয় কালী, আমি তোমার সেই রূপের পার্শ্বে দিয়ে তোমার ভেতরে প্রচ্ছন্ন কুবের জ্বালা দেখেছি। দেখে বুঝেছিলুম, কুবেরানল প্রেমানলের সঙ্গে মিশে তোমাকে এমন একটা ভয়ঙ্কর অন্ধ করে তুলেছে যে, তোমার দ্বারা আমি যে কোন অসম্ভব কার্য ইচ্ছা করলে করাতে পারি।

কালী। (স্বগত) পাপিষ্ঠের কথায় বুঝছি, এইবারে আমাকেও পরিত্যাগ করবে। ছোঁড়াটাকে যে-কোনও প্রকারে ফেরে ফেলবার জন্যেই ও আমাকে এতকাল রক্ষিতা করে রেখেছিল। এখন কাজ হাসিল হয়েছে বুঝে, আমাকে মর্মে মা দিয়ে কথা শোনাচ্ছে।

ভাঁড়ু। কি কালী, কথাগুলো বুঝলে?

কালী। বুঝছি। ওই ছোঁড়াটাকে মারবার জন্যেই তুমি আমাকে রেখেছিলে?

ভাঁড়ু। হ্যা হ্যা—কালী! শুধু ওই ছোঁড়াটাকে মারবার জন্যে!

কালী। ছোঁড়াটা মরেছে, কাজেই আর তুমি আমাকে রাখছ না—কেমন?

ভাঁড়ু। হয় হ্যা—থাক থাক তোমার ঘর—তোমার দোর—তোমার আমি—হাঁচড় হয় বল না হয় না বল—এলে, ছেলে ছইলে গেলে—কি জান কালী, এখন একটু আমাকে ভালো টাকার করবার সময় এসেছে।

কালী। বেশ তা হক—তবে একটি কথা আমাকে বল—টাকা নেবে না সেটা বুঝেছি—

ভাঁড়ু। অনেক টাকা তোমাকে দিয়েছি—একটা ভালো কুটুম্বদের মেয়ে মনে কর কালী, মনে কর। একশ বাড়িও তোমার দেহের মূল্য নয় তার জন্য তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি—

কালী। তা বেশ হয়েছে—টাকা না খাও বেশ তাতে ক্ষতি নেই—

ভাঁড়ু। সাত আছে—ক্ষতি কি কালী—লাভ। তুমি অবীরা, তোমার অত টাকা নেওয়া ভাল নয়—বুঝেছ—ভাকাত ছোরা টাকার গন্ধ পায়—তাদের নাক বড় প্রখর।

কালী। তোমার চেয়ে?

ভাঁড়ু। ওরে আমি তো নরকেশ্বরী বাঘ। আমি ইটকা টাকার গন্ধ পাই—আমার পচা টাকার গন্ধ পাই। ওরে নেই এই টাকাগুলি নিয়ে যাবে, অমনি রাতিকালে পরের ছেলের জন্যে চুকে খলাটা কাঁক করে দিয়ে যাবে, আর প্রসবযন্ত্রণাও অমনি কুকুর করে মেয়েমানুষের ভেতর থেকে উঠে যাবে।

কালী। ভাল, টাকা নিয়ে কাজ নেই—এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—উত্তর দাও—

ভাঁড়ু। বল—বল—জিজ্ঞাসা কর—জিজ্ঞাসা কর।

কালী। ওই ছোকরাকে মারতে তুমি যে এই পাপিষ্ঠাকে—

ভাঁড়ু। পাপিষ্ঠা! কেকি! তুমি যে অসদুপায় অবলম্বন করেছ, তাতে তুমি শ্রেষ্ঠা, জেষ্ঠা ব-বিষ্ঠা।

কালী। বিষ্ঠাই বটে—তবে আমি বিষ্ঠা, আর তুমি সেই বিষ্ঠার কীট।

ভাঁড়ু। কি বললি পাপিষ্ঠা?

কালী। এই—পাপিষ্ঠা বল—পাপিষ্ঠা বল।

ভাঁড়ু। যা-যা—খবর নিয়ে আয়।

কালী। আর খবর আনবার দরকার কি? তোমার কথাতেই বুঝতে পেরেছি, তুমি সেই বালকের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছ। নিশ্চিন্ত না হলে তুমি আমাকে টাকা দেব বলে, আবার না বলতে সাহস করতে না। যাক্—টাকা আর চাই না। তবে একটা কথা তোমাকে বলতেই হবে। ছোকরাকে হত্যা করতে তুমি যার-তার কেবল আমাকেই নিযুক্ত করেছ। আমিও স্থিরবুদ্ধি না করে তোমার হুকুম তামিল করতে চেষ্টা করেছি, দেখে সফল হয়েছি। কিন্তু বালকের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ, কেন তার প্রতি তোমার এই মর্মান্তিক ক্রোধ, তা আমি তোমাকে কখনও জিজ্ঞাসা করিনি, তুমিও বলনি।

ভাঁড়ু। জানতে চাস্?

কালী। চাই। ও বালক তোমার কে?

ভাঁড়ু। কেউ নয়।

কালী। কেউ নয় যদি, তবে তাকে বধ করে হয়েই বা আসলে হেনে—আর এনেই বা তাকে ফেরে ফেলবার এত চেষ্টা করলে কেন?

ভাঁড়ু। শুনবি কালী—শুনবি? তাহলে বোস্—তোকে শোনাই। প্রথম প্রহরের গজল থেকে দেখ—আর সে আসছে না। আমার বুকের কাঁদুনি এতক্ষণ পরে নিবার হয়েছে। এইবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তোকে শোনাবো। শোনাবার সময় এসেছে। তোকে দিয়ে যেদিন আমি ছোঁড়াটাকে কিনিয়ে আনি, সে আজ কত বছরের হলো কালী?

কালী। আজ হলে বিশ বছরের পূর্ণ হবে।

ভাঁড়ু। ঠিক-ঠিক—তাহলে বিশ বছর আগে—ঠিক সন্ধ্যেবেলায় এনেছিলি না?

কালী। তখন সন্ধ্যেবেলায়।

ভাঁড়ু। সেইদিন প্রাতঃকালে, আমি প্রাতঃস্নানটি সেরে, আহ্নিক করতে আসনটিতে বসতে যাচ্ছি, এমন সময় রাজার পুরোহিত আমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, ঠাকুর। আমাকে তিথি নক্ষত্রের ফোকটা কেমন? বুঝতেইতো পারছ

কালী, টাকা নিয়ে নাকচকলা দেখাই আমার ব্যবসা। কবেই বা কোন কাজ করার আগে বিনকড়ি ফেলে নিতে হয়—বুঝেছিস্?

কালী। খুব বুঝেছি। কোন্ দিন কার সর্বনাশের তালকম খুঁজিয়ে হয়, সেটা জানতে গেলে বিনকড়ি জানা দরকার বইকি! তারপর কি বল।

ভাঁড়ু। পুরোহিত বললে, "আজকে প্রভাতে এই নগরে যে বালক জন্মগ্রহণ করেছে, বয়সকালে সে সবার বড় শ্রেষ্ঠী হবে।" শুনেই মক্কী হাসি করে উঠলো। আমার স্ত্রী তখন পূর্ণগর্ভা। আমি তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে সংবাদ নিতে পাঠালুম, জানতে, সে পুত্র প্রসব করেছে কিনা। কেননা আমার বিশ্বাস ছিল, আমিই যখন নগরের বড় শ্রেষ্ঠী, তখন আমার পুত্র ছাড়া আর কে সবার বড় শ্রেষ্ঠী হতে পারে। কিন্তু জানলুম, আমার স্ত্রী তখনও প্রসব করেনি। তখন মনটায় ভয় হল—তবে তো নগরের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী আমার হবার নয়। এত বড় সম্ভ্রম, মনে করলুম কেউ না কেউ প্রভাতে জন্মেছে। তার অনুসন্ধান করতে আমি তোমাকে নিযুক্ত করেছিলুম। তুমি একটা হাজার মোহর খরচ করে সন্দেহজনায় শিশুটিকে কিনে আনলে। কেমন সফল হয়েছে কালী?

কালী। কেন সফল হবে না! সোনা তোলবার ধরনা। আমি ছলে ছেলে-টাকে খুঁজে বার করেছিলুম।

ভাঁড়ু। তা ঠিক—সে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবো। চক্ষে মারবো বলে ছোকটাকে আনাইনি। মনে করেছিলুম, যদি আমার কন্যা হয়, তাহলে ছোকটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে বরজামাই করে রাখব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। সাতদিন পরে আমার স্ত্রী এক পুত্রসন্তান প্রসব করলে।

কালী। ও! এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারলুম। এক গর্ভে দুই সিংহ কখনও বাস করতে পারে না।

ভাঁড়ু। এই! তুই ঠিক বুঝেছিস।

কালী। দেখুক বেঁচে থাকলে তোমার ছেলে বড় শ্রেষ্ঠী হতে পারে না।

ভাঁড়ু। ঠিক বুঝেছিস, ঠিক বুঝেছিস। একজনকে দুনিয়া ছেড়ে সরতেই হবে। কে সরবে কালী? আমার ছেলে, না দেখক?

কালী। তোমার ছেলে সরবে!

ভাঁড়ু। কি বলিস হারামজাদী, আমার ছেলে সরবে?

কালী। তোমার ছেলে সরবে—কেন সরবে শুনে নাও—যার ঘর থেকে এ ছেলেকে আমি এনেছিলুম, এ তার পুত্র নয়।

ভাঁড়ু। স্বপ্নিকদের পুত্র নয়?

কালী। না শ্রেষ্ঠীনী, এই বালক আমারি মতন কোন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিদের পুত্র।

ভাঁড়ু। ছেলে কে বললে?

কালী। আমি বলছি, আজকে ছেলে বলছি, যেবার মহেশ মনে করে, পুরন্দরের ছেলে মনে মনে উল্লাস করতে করতে আসছি, এমন সময় পথে সেই স্বপ্নকারের সঙ্গে আমার দেখা হল। আমি তাকে চিনতে পারিনি, কিন্তু সে চিনতে পারলে। দেখেই সে আমাকে সেই ছেলের খবর জিজ্ঞাসা করলে। আমি বেশ, অনাবশ্য রকমের ছলনা জানাই আমার কাজ। সে জিজ্ঞাসা করতে না করতে আমি চোখে জল এনে ফেললুম। আমার চোখের জল দেখে সে বললে, "আমি বুঝেছি, ছেলে মরে গেছে।" আমি বললুম—"আমার ওজনের নিধি আজই আমার ঘর আমার করে চলে গেছে।" এই কথা শুনেই সে মুখে না জানিয়ে হেসে উঠল। আমি তাই দেখে কিছু আশ্চর্য হয়ে গেলুম। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"কিছুই না হয় করেছ, কিন্তু সন্তান হো বটে, তার মৃত্যু শুনে কেমন করে হাসলে?" সে আরও জোরে হেসে উঠলো। বলে, "কার সন্তান? পথে পড়েছিল—সকালবেলায় পথে বেরুবে বোঝ, পথের ধারে এক-আধটার কতকগুলো কাক বসেনি একটা ছেলে—একটু আগেই বোঝার জন্মেছিল, তখনও নাড়ী কাটা হয়েছে। পড়ন্তিতে যার ফেলে তাকে বাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। ও মহতেই এসেছিল। তবে তোমার কাছে কিছু পাওনা ছিল নিয়ে গেল। আমার কাছে কিছু দেনা ছিল দিয়ে গেল"।

ভাঁড়ু। আ—কি বলছিস?

কালী। ছেবে দেখ নরাধম, আর কোথাও কেন ফুলবাগানে সর্বনাশ করেছ কিনা—এ তোমার ছেলে কিনা।

ভাঁড়ু। তাইতো—তাইতো—তাইতো!

কালী। তারপর এই ছেলেকে কত-রকমে মারবার চেষ্টা করেছি। তা তুমি সব জান। কেননা সে সমস্ত কাজ আমি তোমারই পরামর্শমত করেছি। মোসাহেবদের মোম দিয়ে যে সময় হাজার হাজন গরু ছেড়েছ, তখন তাদের পায়ের তলায় ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছি। ষাঁড়ে পেটের তলায় ছেবে ছেলেকে রক্ষা করেছে—গাইগুলো ঝাঁড়ের দুপাশ দিয়ে চলে গেছে, ছেলে মরেনি। রাত্রির অন্ধকারে যে পথ দিয়ে হাজার হাজার গরুর গাড়ী যায় সেই পথে দিনকয়েক নিক্ষেপ করেছি। গরু ছেলেকে দেখে চলতে চলতে থমকিয়েছে। গাড়োয়ান কত ঘাবলে একটাও এগুলো না। আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। গাড়োয়ান তখন ছেলেকে দেখতে পেলে, তুলে নিলে—আবার তুমি হারের মোহর দিয়ে তার ঘর থেকে কিনে আনলে। তারপর সারা দিন-রাত জাগরণে ফেলে রাখলে, হাতের বাঁটি দুধে ভিজে দুধ খাওয়ালে, ছেলে মল না, পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিলে, এক বাঁশের কঞ্চির ওপর পড়ে গেল, ছেলে মল না। ছেলেকে মারতে তোমার কত অর্থই না ব্যয় হয়েছে। তারপর ছেলে চারবছরে ছেলেকে নিয়ে গেল, তুমি আবার অর্থ দিয়ে কিনে আনলে, বাঁশবনের তলা থেকে নরকরে ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে গেল, তুমি আবার তাকে কিনে আনলে। এখন বুঝতে পারছি, সে ছেলে তোমারই সর্বস্ব নিতে জন্মগ্রহণ করেছে।

শচীন দেববর্মণ

ভাঁড়ু। ফোসাও হারামজাদী! কের বললে তোকে আমি এখনি শেষ করব।

কালী। সে ছেলে মরেনি।

ভাঁড়ু। এবারে সে জমের মুখে ঢুকেছে।

কালী। জমের দেশ ফিরে সে বেরিয়ে আসবে।

ভাঁড়ু। কের বললে, তোমাকেও তার সঙ্গে সঙ্গে জমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

কালী। জমের বাড়ী যাবে তোমার ছেলে নাড়ু, আর তুমি তার বাপ ভাঁড়ু। তার নেই ভাঁড়ু বস্তু, সে ছেলে যাবে না।

ভাঁড়ু। তবে যে বেটী তাইনি! (কালীকে ধরিতে ছুটিতে পারে) বল্ মরেছে—মরেছে, মরেছে।

কালী। মরেনি—মরেনি—মরেনি।

ভাঁড়ু। (গলাবেশ পাল্টে) এখনে বল্ মরেছে।

কালী। (অতিকষ্টে উচ্চারণ) মরে নি।

ভাঁড়ু। তবে তুমিও মর। (ছোরাখুলে মারা—মারা!) মা-মা-মা—

কালী। আহা-আহা-আহা—(মূর্ছা)

(কোমরের উত্তরীয় হস্তে ঘোষকের প্রবেশ, ভাঁড়ু গতর পালান)

ঘোষক। ভাইতো! এই যে বাবার কথা শুনলুম — মারা — মারা। (কালীকে দেখিয়া) একি! কে ও—মা! মা! তুমি! কে তোমার এমন অবস্থা করলে! মা-মা! ভাইতো! কে এখানে আছ? মারা-মারা! কে আছ? কি আশ্চর্য এখানে কেউ নেই? (উত্তরীয় দ্বারা ব্যজন করিয়া) মা-মা!

(নাড়ু হস্তে প্রবেশ)

নাড়ু। কই মা! কই মা! মামা মামা মা বললি, কই মা? কোথায় মা? ঘোষক। ভাই! এসেছ? তাহলে বড় ভাল করে আমার একটি উপকার কর।

নাড়ু। উপকার করবার আমার সময় নেই—আমার মামা বিয়ে করবে—তাকে দেখবার কেবল যোগাড় হচ্ছে—এখন আমার

কোনদিন হয়নি—বিশ হাজার টাকা অনেকদূরে উড়ে গেছে। আমি এখন তোমার উপকার করতে পারবো না। আমার টাকা চাই। টাকা—টাকা—মা-মা।

ঘোষক। একবার একটু ধর, আমি হাতে কাঁধে তুলে নিয়ে যাই।

নাড়ু। মা! মা পড়? ওমা, তুই পড়? বুড়ো ধেড়ী তোকে ফেলেছে বুঝি? ওরে হাত ছাড়। এটা কে? এটা যে কালী ঝি। ওরে, তুই কি মরা! তোর কি মর্যাদাজ্ঞান নেই? এক বৌটী বাসী—বেশ্যা—তাকে তুই মা বলছিস্?

ঘোষক। আমাদের বাবাইতো ফেলেছে, তাকে মাই-ই তো বলবো ভাই।

নাড়ু। বলবে বা—বলবে বা—তোর বুদ্ধিশুদ্ধি বড় বেশি হয়েছে—না? ছাড়া! বেশ্যাবেটীকে মা বলছে—তোর মাথাখারাপ হয়ে গেছে।

ঘোষক। একটু সাহায্য করা কোন মেয়ে হবে না ভাই, বরং পুণ্য হবে।

নাড়ু। চোপ্—আবার কথলে বাবাকে বলে তোকে ঠেলাগাড়ি খাওয়াবো। (কালীর অগ্রসর পা ঠেকাইয়া) এই হারামজাদী বৌটী—এই—

ঘোষক। হাঁ-হাঁ—কর কি ভাই, কর কি—মা—সতীসাধ্বীর চেয়ে কোনও অংশে কম মনে কর না।

নাড়ু। থাক্ হয়েছে, থাক্। ক অক্ষর গোমাংস—ও আবার আমাকে শান্ত শোনাতে এসেছে—বেশ্যা আবার মা। এই বৌটী এই।

কালী। উঁহুঁহু—আমি উঁহুঁহু।

নাড়ু। এই—ঠিক মতন না হলে কি ওটে? মা—বৌটী বাজারের বেশ্যা—তাকে মা বলে সম্বোধন হচ্ছে! যা বেটী কস্‌বি—উঠে যা। হারামজাদী, ভিটকিলিমি করবার আর জায়গা পাসনি—হুঁ!

(প্রস্থান)

ঘোষক। মা! এখনও তুমি দুর্বল—আমার কাঁধে ভর দাও।

কালী। কে তুমি—ঘোষক? তুমি আমাকে মা বলে ডাকলে!

ঘোষক। তুমিতো মাই মা, তোমাকে আর কি বলে ডাকব?

কালী। হারামজাদী বৌটী, কস্‌বি কে বললে?

ঘোষক। মা, সে ছেলেমানুষ তার ওপর রাগ কর না।

কালী। না বাপ্, বালক তুমি—বিজ্ঞ সে। সেই আমার পূর্বের সন্তান, তুমি নও। তুমি কোন বেশ্যার গর্ভে জন্মেছ। তুমি এ ঘৃণিতা বেশ্যাকে মা বলে পবিত্র 'মা' নামকে কলুষিত কর না। (উত্থান)

ঘোষক। উঠো না, দেখছি, তুমি বড় কাহিল, ছেলের কথা ভুল যাও।

কালী। না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ—খুব সবল।

(প্রস্থান)

ঘোষক। হল না—একটু সাহায্য করতে হল।

(প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য

### মাকন্দী

মাকন্দী। (হাস্য) সেই আমার খুঁজে নিতে হল, তবে কাজ হাসিল হল। ঘরে ফেরে ফেলেই হবে, না মরলে নিস্তার নেই, তাকে অত খুরপুত করে ঘাসতে গেলে চলবে কেন? আজ ভাসাচ্ছ, কাল খোঁয়াবে, পরশু পাহাড়—একজন কেবল বাদে চেলা করে রেখেছ। সেই আমি উপায় বলে দিলুম, তবে সাপের নিষ্কণ্টক হল। সে রাখীর বাঘন—বাসী রাজকুমারী সেখানে নিতে জানকোশ করে, অজানা মেয়েমানুষই সেখানে ঢুকতে পারে না—কচি ছেলে ঢুকলে তারই ধর্মান যায়, সেখানে ঢুকেছে বিশ বছরে ছোড়া। সে যেমন দেখে অমনি তার জন্মলীলা সাঙ্গ হয়েছে। বাঁচলে কি হুকে ছিল,—এই প্রকাণ্ড বিষয়ের অর্ধেক বখরা পেত। সোনারের ছেলে এতদিনে হাড়ুড়ি পিটে পিটে গাকড়াড়ি মেরে খেত। তা না হয়ে একেবারে হল কিনা ক্ষেত্রপতির সন্তান। এই যে ভোল করেছে এই তার পক্ষে যথেষ্ট। আমার নাড়ুকে হতভাগাটা যখন বাপ বলে ডাকতো, তখন গরল কেন ছিল ঢেলে দিত। যাক্, এতদিন পরে খুঁজিয়ে বাঁচবো।

(কাঁদু খড়ের প্রবেশ)

কাঁদু। দিদী — দিদী — আমাকে বাঁচাও।

মাকন্দী। কি হয়েছে—কি হয়েছে গো! অমন করছ কেন!

কাঁদু। বাঁচাও — আমাকে কাটতে আসছে।

মাকন্দী। কে গো?

কাঁদু। ওই মস্ত হল—ওই এলো।

মাকন্দী। কে গো?

কাঁদু। বাঁচাও, মাকন্দী বাঁচাও—তুমি ছিন্ন আর আমাকে কেউ রুখে রুখতে পারবে না।

মাকন্দী। ও কি—কি! কিস্‌তির আমার ঘরের দোর বন্ধ করে দিয়ে আয়। (নেপথ্যে—বাছি মা!) তারপর একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি ব্যাপারখানা কি?

কাঁদু। ওই এলো—একমাত্র তোমাকেই সে ভাঁড় করে। তুমি না বাঁচালে আমি মেলুম। ওই—ওই লাল্লা চোলায় অন্ধকারেও চলতে করছে। —কোথায় লুকুবো—কিস্‌তির ঘর কোথায় লুকুবো, নইলে মেলুম।

মাকন্দী। যাও, ওই ঘরের ভেতর—যাও। (কাঁদুর প্রস্থান) আমি এখনও কিছু হাতের খুরতে পারছি না। (ঝিন প্রবেশ) খবরা ঝিনে এলি?

ঝি। না মা, দেওয়া হল না। ঝিনে ঝিনে দেখি ছোট ঘুমার বাড়ীর ভিতরে আসছেন। খবরা ঝিনে দেবে তিনি আমাকে মারতে এলেন।

মাকন্দী। তার হতে কিছু অস্ত্র কি দেখা করলি?

ঝি। কই, তা মোদের কিছু নেই। না মা, আমি বলতে পারলুম না, আমি ভাল করে দেখিনি। তিনি টলতে টলতে আসছিলেন। তার মুখে কি একটা গন্ধ বেরুচ্ছিল।

মা। আচ্ছা, চলে যা। (ঝির প্রস্থান) আমার নাড়ু অস্ত্র নিয়ে কর্তাকে কাটতে এসেছে? কখিন ধরে সে একটু একটু সন্তাকিনী খাচ্ছে বটে। হলে সেটে কিছু ঝিমে কম হয় বলে কবিরাজে বারণ করেছে। তাতে কি সে এতই খেপেছে হবে যে, কর্তাকে খুনোবার ঝিনে ধাওয়া আসবে। (নাড়ু খড়ের প্রবেশ) কই হাতে তো কোন অস্ত্র নেই। ঘোষকের কি হল না হল তাকে তাকতে কর্তার ঘরটা খুঁজিয়ে গেছে। তাই কি খেপতে কি দেখেছে। কে ও—নাড়ু?

নাড়ু। বল্ — ঘরের আওয়াজ বেরিয়েছে। হা-হা—আপাতত নাড়ু —তারপর হতে একটি ছোড়া মোহর দিলেই হব নাড়ুগোপাল।

মা। একি নাড়ু, একি বাবা, তুই কি সন্তাকিনী আজ একটু বেশি খেয়েছিস্?

নাড়ু। বেশি না খেলে কি আজ জীবন যাচ্ছিল। শালার খুনুকুল, তাড়া দিয়ে আমাকে ছেকো করেছে। আমার হাতে কাটুর এসেও আমি হেরে গেছি। একেবারে বিশ হাজার টাকা—একটু বেশী না খেলে কি রুখে ছিল? কিস্‌তির সে—বেশি চাই না—হাজার খানেকের একটি ছোড়া।

মা। তুই জুয়ো খেলে এমনি করে টাকাগুলো বরবাদ্ করবি?

নাড়ু। বরবাদ্! বরবাদ করব আমি।

মা। এইতো কদিনে লাখটাকা নষ্ট করে ফেললি।

নাড়ু। এখনি সুদে মুদ্দে কিস্তিয়ে আনছি, কিস্‌তির সে। বেশি নয়, একটি হাজার মোহরের ছোড়া। আমি একটা কুরুসে মেরে সেই সব টাকা—যায় সুদে কিস্তিয়ে আনছি।

মা। যা বাবা! খুনে যা। আজির হয়েছে আর বাইরে বেরোয় না।

নাড়ু। কি বললি, শালা আমায় বিশ-হাজার টাকা বাপ্পা মেরে নিলে, আমি খুনে যাবনা?

মা। যাক্, ও দু-পাঁচ হাজার বাওয়ার কিছু এসে যায় না। চল তোকে তোর ঘরে দিয়ে আসি।

নাড়ু। না—না। ঘরে দিতে হবে না। তুই টাকা দে।

মা। সেয়াই বাবা, আর পাগলামী করিসনি।

নাড়ু। টাকা দিবিনি?

মা। তোর বাপা তোমায় দেয়ে বলতে পারিস্?

নাড়ু। সে তুমার দেয়ে—টাকা দে।

মা। ছি! একথা কি আর বলতে আছে।

নাড়ু। আচ্ছা আর কথন না—টাকা দে।

মা। টাকা আর এক-আনাও তোড়া কেন, আজ রাত্তিরটে তোমাকে কাটিয়ে দে। কাল তোর হাতে এক-ঘরে তর্তার সমস্ত ধনাগারের চাবি দিয়ে দেব।

নাড়ু। আর লোভ দেখাতে হবে না। বাবা তেমনি কাঁচা ছেলে কিনা।

মা। আমি বলছি, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

নাড়ু। ওসব বয়সে আমা যাদু—টাকা দে। দিবিনি?—দিবিনি?—তবে এই গলায় পাঁড় দিয়ে মরি। (খুরসা গলা-দেখে যান)

মা। করিস্ কি নাড়ু? কর্তা জানতে পারলে কি মনে করবে বল্ দেখি।

নাড়ু। এই মলুম—এই জিব বেরুচ্ছে —এই কথা এঁকিয়ে অলছে—

মা। সোহাই বাবা—সেয়াই বাবা—ওরকম করিসনি।

নাড়ু। এই উঁহুঁ—এই সোলো—এই চোখ কপালে উঠল।

মা। না। দেখছি আমি মজুর সেই করেছি — আমাকে হারুনাকে জ্বালিয়ে খেলে। দে, দাঁড়া। এই যা দেব, আর দেব না—আর তুই খুন হলেও দেব না।

(প্রস্থান)

নাড়ু। আর দিতে হবে না—এবারে একেবারে কুরুসে ধন মেরে নেব। লাখটাকা ধরে ফিরিয়ে আনব তবে ছাড়ব।

(মাকন্দীর পুনঃপ্রবেশ)

মা। এই নে—কিন্তু আর চাইলে পাবে না—(টাকার তোড়া দান)

নাড়ু। দেখা যাবে, দেখা যাবে—

(প্রস্থান)

মা। যাবি আর চলে আসবি।

(কাঁদু খড়ের প্রবেশ)

কিগো! আমার ছেলে কি তোমাকে কাটতে এসেছিল?

কাঁদু। তাইতো দিদী, আমি কি স্বপ্ন দেখলুম?

মা। খুনে হাতে, ছেলেমানুষ—আমার কত তদগার নাড়ু—তাকে দেখে কি না তুমি ভয় পেয়ে পালিয়ে এলে! ছি! তোমাকে আর কি বলব!

কাঁদু। তাইতো। এত আশ্চর্য, মনজ খারাপ হয়েছিল দেখছি।

মা। হয়েছিল কি আজ। ও বরাবর ঘরে আসে। তা না হলে, কোথা থেকে একটা নবীনের ঘা থেকে ছেলে এনে, আমার সর্বনাশটাতে আনতে লাগাতে বসেছিলে।

কাঁদু। বাক্, নাড়ু খেলা কোথায়?

মা। তোমার জন্যে তাকে চলে যেতে বললুম। যাদা আমার সমস্ত দিনের পর কোথায় একটু ঘরের আদর পেতে এল—তোমার জন্য কিনা, তাকে আমি মিষ্টি কথা কইতে পেলুম না। কড়া কথায় চলে যা বলতে হল।

কাঁদু। তাইতো, মাঁতা মাঁতাই কি আমি ভুল দেখলুম!

মা। তা দেখা আর আশ্চর্য কি। মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে কি না।

ভাঁড়ু। সত্য বলছি মাগন্দী—আমার মনে হল যেন ঘোষক—হাতে একটা ল্যাম্পা তলোয়ার—অন্ধকারেও সেটা চকচক করছে।

মা। তাও হতে পারে—অপঘাত মৃত্যুতো! হয়ত ছোঁড়াটা ভূত হয়েছে।

ভাঁড়ু। ভূত তো হল, কিন্তু তরোয়াল পেলে কোথা?

মা। কোথায় পেলে, কেমন করে পেলে, অত ভাববার দরকার কি! নাও, কাল থেকে নাড়ুকে গদীতে নিয়ে বস—একটু-আধটু কাজ শেখাও—বিয়ে দাও—আর তার টোটো করে বেড়ালে তো চলবে না।

ভাঁড়ু। কাজও শেখাব—বিয়েও দেব। কিন্তু কেমন করে বিয়ে দেব। বিয়ে দিতে হলে আগে সেই ছোঁড়াটার দিতে হ'ত। দিলে দুই-এক বৎসরের মধ্যে তার সন্তান হত। এত চেষ্টা করেও এতকাল ধরে যখন একটাকে সরাতে পারিনি, তখন তার বংশ কেমন করে সরাতুম মাগন্দী। শাস্ত্রমতে সেই বংশধরও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। ছোঁড়াটার মৃত্যু হলে, তার পুত্রে তোমার ছেলের কাছ থেকে বিষয়ের অর্ধেক বার করে নিত। সেই সর্বনেশে শত্রুটার জন্যে যে কিছু করতে পারিনি। লোকের কাছে ছেলে বলে গ্রহণ করেছিলুম, না বলবার জো ছিল না। এমন বিপদে পড়েছিলুম মাগন্দী যে, কাছে রেখে জ্বলে মরেছি, তবু চোখের আড়াল করতে সাহস করিনি। যাক্, যখন সে মরেছে, তখন সকল আপদ চুকে গেছে।

মা। দুই-একমাসের মধ্যে মেরে না ফেললে—

ভাঁড়ু। দুই-একমাস কি বলছ! দুই-একদিন। চারদিক থেকে আত্মীয় বন্ধুতে পীড়াপীড়ি করছে—আর বিয়ে না দিয়ে থাকতে পারতুম না।

মা। যাক্, এইবারে নাড়ুর বিয়ের সম্বন্ধ কর।

ভাঁড়ু। তারও কি ব্যবস্থা করিনি! আমার মামাকে রাজা জনপদের শ্রেষ্ঠী করে পাঠিয়েছেন। সে দেশে এমন একটা মেয়ে আছে যে, তার রূপের তুলনা নেই। আমি মামাকে সেই রকম একটি মেয়ের জোগাড় করে রাখতে বলেছি—বলেছি যত টাকা লাগে—লাখ, দু'লাখ, দশ লাখ, ক্রোর—যত টাকা লাগে—একটি সুন্দরীর সুন্দরী কিনে রাখতে—বল কি, আমার নাড়ুধনের বউ। আমার এক দণ্ডে দুলাখ টাকা আয়। বলেছি, 'যেমন পাবে অমনি আমাকে চুপি চুপি খবর দেবে।' এখন তোমার হাতযশ—ছোঁড়ার মরণটা পাকা হয়ে গেলেই—

মা। ছোঁড়া, ছোঁড়া আর কত না—সে একজন চিরন্তনের কথা হিসেব দিচ্ছে—তুমি কালই জোর তালাশ করে যমের কবল থেকে লোক পাঠিয়ে দাও। ছোঁড়া না মরে চায় নাড়ী আমি।

ভাঁড়ু। বাস, কালই তালাশ করে লোক পাঠাব। না-না—আমি নই—আমি নই—আমি নই।

(পলায়ন)

মা। কি হল। আবার কি হল? নাচাই তো! এলোই তো কই। ও বাবা দুহাতে মহলাচাই যে তলোয়ার। কাটবে নাকি—কাটবে নাকি?

(পলায়ন)

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। যেয়ো না মা, যেয়ো না—আমাকে বোধহয় চিনতে পারনি, আমি ঘোষক, তোমার ছেলে।

এ কি রকম হ'ল! আমাকে দেখে মা পালিয়ে গেল? আমাকে কি চিনতে পারলে না! আমার হাতে তলোয়ার দেখেই কি পালালো! (কির প্রবেশ) হাঁ দাসী, মা আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন কেন?

কি। তোমার হাতে তলোয়ার কেন বড়কুমার?

ঘো। ধিক্ আমাকে—ধিক্ আমাকে—আমার মা হাতে অস্ত্র দেখে আমাকে খুনে মনে করে পালিয়ে গেল। দাসী, এই অস্ত্র আমি রাজার কাছে উপহার পেয়েছি। এ অমূল্য অসি। আমি এ অসি নেবার যোগ্য নই বলে, বাবাকে দিতে আসছিলুম। এই তলোয়ার ছুঁলেই বাবার অসুখ সেরে যাবে। এই যে তুই হাতে করে মাকে দে। অথবা বাবা থাকে তাকে দে। (কিকে অস্ত্র দান—ঝির প্রস্থান)—তাইতো, এমনটা কেন হ'ল! মা আমাকে খুনে মনে করলে! (আয়নাতে মুখ দেখিয়া) তাইতো ভয় করবার যে যথেষ্ট কারণ দেখতে পাচ্ছি—একদিনের কয়েদে, একদিনের নিরন্ন উপবাস করে চেহারাখানা আমার কি কর্দ্দমই না হয়েছে। এ মূর্তি দেখে আমিই ভয় পাচ্ছি, স্ত্রীলোক ভয় পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

(তরবারী হাতে মাগন্দীর প্রবেশ)

মা। আমি যে বড়ই অপরাধ করেছি। তুমি যে ভয় পাবে, তাতো বুঝতে পারিনি।

মাগন্দী। কিছু অপরাধ করনি বাপ। আধা-অন্ধকার, তার ওপর সারাদিন তোমার অদর্শনে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে এতই কাতর হয়ে পড়েছিলুম যে, আমাদের বাহাজ্ঞান ছিল না, চোখের জল কোনওমতে রোধ করতে পারছিলুম না, তাইতে একরূপ অন্ধ হয়েছিলুম। শত্রু আসছে মনে করে ভয়ে পালিয়ে গেছি, কিছু মনে কর না। তোমার অপরাধ কিছু হয়নি, অপরাধ আমারই হয়েছে।

ঘো। ও কথা মুখেও এনো না মা!

মা। মরবার আগে, মি, আমি করলুম কি! যে পুত্রকে দেখবার জন্য স্বামী-স্ত্রীতে এতকাল পাগলের মতন ঘুরে বেড়ালুম, খেয়ে, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সুখ পাচ্ছিলুম না, সেই পুত্রকে দেখে শত্রু মনে করে কিনা পালিয়ে গেলুম! আমার অন্ধলের নিধি সারাদিন আমার চোখের অন্তরালে রয়েছে, আমার এই মৃত্যুবাণ! ছি ছি! পালাবার সময় আমি মুখ মুছতে মনে না ছেলে?

ঘো। সেজন্যই মা, ওকথা ছেড়ে দাও—বাবা কেমন আছে?

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। এসেছে—এসেছে? আমার নয়নমণি—আমি দেখতে পাচ্ছি না—চোখা দিয়ে জল—এসেছে?

মা। বাবা এসেছে।

ভাঁড়ু। কই-কই?

ঘো। বাবা! আমি বড়ই বিপদে পড়েছিলুম। আজ যে ফিরে এসে আপনাদের চরণ দর্শন করব, এ আশা আমার ছিল না।

ভাঁড়ু। আ! তাই তো! কি করেছিলুম?

ঘো। শুধু আপনাদের আশীর্বাদেই আমি প্রাণে বেঁচেছি। যে অস্ত্র আমাকে কাটবার জন্য আনা হয়েছিল, সেই অস্ত্র উপহার পেয়েছি।

ভাঁড়ু। কি করেছিলুম—কি করেছিলুম—আমার বাপধনকে আমিই মেরে ফেলেছিলুম!—কই অস্ত্র? এই অস্ত্র! (মাগন্দীর হস্ত হইতে গ্রহণ) দে আমার

---

*নাটকটি 'ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের সম্ভবতঃ শেষ নাটক। নির্মমতায় অসুস্থ থাকাকালে তিনি এই নাটকটি রচনায় হাত দেন। চতুর্থ দৃশ্যের যে-পর্যন্ত মুদ্রিত হলো, ততখানি তাঁর স্বহস্তে রচিত। বাকী অংশের কিছুটা মনোরমা তিনি কোন অনুলেখনকারীকে বলেন এবং তা হয়তো লিপিতও হয়েছিল। কিন্তু সে-অংশ যদি থেকেও থাকে—তা অজ্ঞাত। যতদূর জানা যায় ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকটির নামকরণ করেন 'নির্মাত'। নাটকটি পড়ে উল্লিখিত চরিত্রগুলির নিম্নরূপ পরিচয় সম্ভব:

উদয়ন—কৌশাম্বীর রাজা; ভাঁড়ু দত্ত—কৌশাম্বীর মহাশ্রেষ্ঠী; ঘোষক—ঐ পালিত পুত্র; নাড়ু দত্ত—ঐ পুত্র; শ্যামাবতী—কৌশাম্বীর রাণী; অনুরাধা—উদয়নের ভগিনী; কালী—ভাঁড়ু দত্তের রক্ষিতা; মাগন্দী—ভাঁড়ু দত্তের স্ত্রী; প্রহরী, দ্বারবান, ঝি এবং সখীবৃন্দ।

('মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে লিখিত 'ক্ষীরোদপ্রসাদের পত্র)

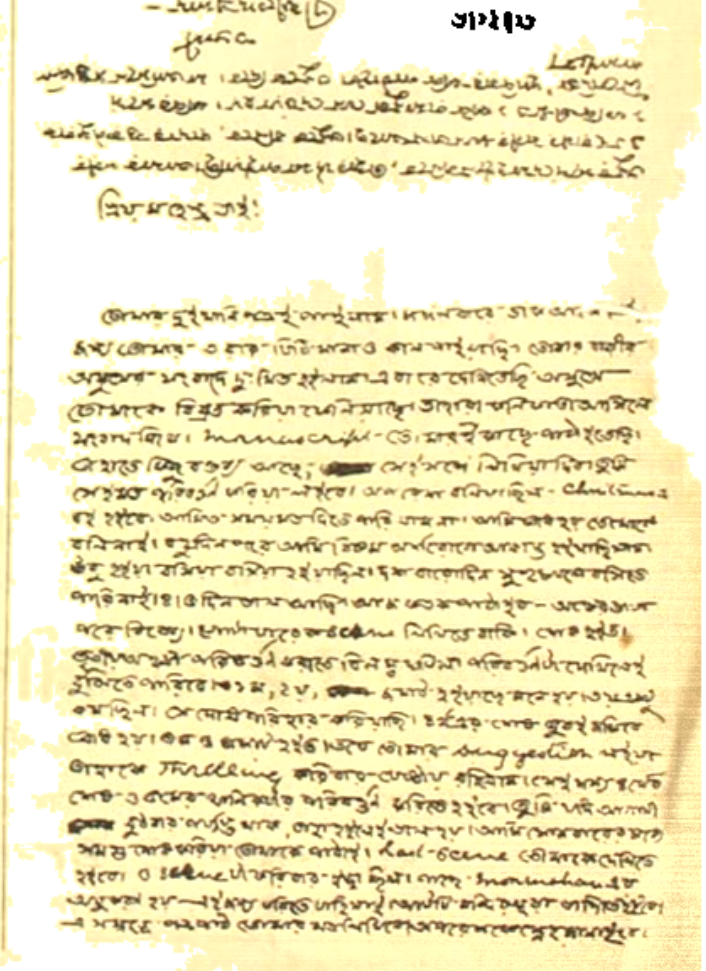

### মধ্যপ্রদেশ পাল-বৈষ্ণবের অধিষ্ঠান

(১০ পৃষ্ঠার পর)

কি চাইলেন দেবতের প্রজ্ঞা জননীর কাছে? 'জানবতা কৃহর সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।' বন্ধন নিয়তঃ শত্রু-সম্ভাবং মহিষাসুরঃ।' তা-ই তো সব করেছেন, কিছুই তো বাকি নেই। দেবতার শত্রু মহিষাসুর নিহত হয়েছে। কে এই মহিষাসুর? বুঝিতে পশু, শক্তিতে অসুর। পশুর বুদ্ধি, আসুর শক্তি। একত্র হয়েছে মহিষাসুরে ও তার অভিযানে সুরারি ঘটে। মহিষাসুরের চিত্তের মূল আকাঙ্ক্ষা-প্রীতি-ইচ্ছা। এই মহিষাসুরের জন্ম হয়েছিল, জানলে বিস্ময়ে অভিভূত হবে আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী সুদূরে। এর মূল প্রবাহে সর্বত্র দুর্নিবার, কেবলমাত্র ভিন্ন-ভিন্ন। একত্র কেন দেবতাই তার বলবীর্য শক্তিকে বিনষ্ট করতে পারলেন না। কেনোপনিষদ্ বলেছেন, বহ্নোমেঘলা দৈবতী উমার সঙ্গেও অগ্নি-দেবতা একাত্মি হতেও স্পষ্ট কহতে পারলেন না ('তত্র শশাক দগ্ধুম্'), বায়ু-দেবতা মাতরিশ্বা তুলায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না ('তত্র শশাকবায়ুম্')। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তার স্বরূপ বুঝতে না পেরে অন্তর্ধান করলেন ('তস্মান্ত তিরোদধে')। সর্বজনতো পরমার্তি-হন্ত্রী যে সর্বশক্তি-সমন্বিতে সর্বেশে, তোমার কৃপার অমরের অধিকারের পরম শত্রু মহিষাসুর নিহত হয়েছে। আমাদের চিত্তের মহিষাসুরও নির্জিত হয়েছে। অন্তরিন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার নিধন ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এ যে একেবারে অন্তরের কথা। জানবতে ও 'চণ্ডী ত্রিয়া জানব এই একই কথা বলেছেন। দাঁতা ও চণ্ডী দুই-ই চণ্ডী। বৃন্দাবনে যার নূপুর বেজেছিল, সীতা-জানবতে যে পথে গিয়েছিল। তাঁহার বাখানে নাই তাহার তুলনা।' জানবতে 'জানবান্ ও জানবতী সূত্রেরই কথা। 'জানবতঃ ইন্দ্রম্' এবং 'চণ্ডবতো ইন্দ্রম্' বৃষ্টি বৃদ্ধিশক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। বৈষ্ণব বাঙ্ময়িক শ্রীরূপ সম্বন্ধ প্রজ্ঞা দিয়ে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিয়েছেন। রামকৃষ্ণকথা-পাঁপিতা-গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বমুখনিসৃত শ্রীরূপগোস্বামীর শ্লোক উদ্ধার করেছেন, 'যা কৃষ্ণ সেবে সুখী সাধু, যা সুখী কৃষ্ণ এই রূপ।'—যিনি কৃষ্ণ তিনিই সুখী যিনি সুখী তিনিই কৃষ্ণ। এই প্রসঙ্গে শ্রীরূপ লাহা-পত্রিকায় সুচিত্রিতা-সংবাদে উদ্ধার করেছেন, 'চরিত্রচন্দনপরিচর্চিতে প্রকৃতি প্রিয়ে।' জানবতে-তাপসমূহের শেষে প্রকৃতিরূপিনী; সুলোচি পাঁচটে সর্বেশ্বরূপসেবয়িত্রী; অন্য আবরিকা পরিমহাদেবী; বিশেষরী। যত্র সুখা জগৎ সবে সর্বসেবাধিকারিণী। চণ্ডী তন্ত্রকার সম্পাদি। প্রকৃতি প্রিয়কে তন্ত্রনা করে। পরমাত্মার এই প্রকৃতি মহাদেহ দেবতার সংগে উপলব্ধি করতে হয়, এইজন্য অন্তত পূর্ব পরমেশ্বর এই রহস্যময় ত্রিয়কে সকল সুখা আত্মা দিয়ে এঁর মহিমাগান করেন। এঁরই আবরিকা শক্তি অধিকারেশ্বরীকে মহামায়া বলা হয়, যিনি বেহাতিমনী সকলকে মুগ্ধ করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মেধস মুনি সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যকে এই কথাই বলেছিলেন মহামায়ার প্রভাবেই সংসারস্থিতি-কারণম্।' মহামায়ার প্রভাবেই সংসারের স্থিতিকারণ। পূর্বোক্ত রামকৃষ্ণকথা-পাঁপিতার শ্রীরূপ বলেছেন, 'অবিদ্যা রূপ মোহিনম্, ত্রিগুণাত্মকত্বেন্ধু ও ইত্যাদিবচনে তত্ত্বসংকরের মোহ-প্রভাব অতএব তাদুশিনা ঈশ্বরেকলক্ষে সুখাং বিনারকম্' বাসনা বিষয়-ভোগ সুখের সন্ধান, সেই সেই স্থানে ঘটিয়েছেন পুরুষের শ্রেষ্ঠসাধিত্রি।' গোবিন্দের আরাধনা করে তাঁর শক্তিস্বরূপের আরাধনা করতে, এই বচনের অভিপ্রেত অন্তরের ভাবের অর্চনা না করলে যোগস্পর্শ হবে। সুতরাং তাঁদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, সুখী সদাশিব বাস বিষ্ণুকে সেন পুরু এবং দেবতাদের সকলকে স্ব স্ব স্থানে শ্রেষ্ঠসাধির দ্বারা পূজা করবে।

শারদীয় মহাপূজার আমাদের এখানি প্রতিমা যার চালচিত্রে রয়েছেন বৈকুণ্ঠবিহারের অন্তরঙ্গ সর্বত্যাগী পার্ষদ, জানবতের ভাষায়, 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।' আমার বৈকবের আরাধ্য এক অন্তরতত্ত্বের আরাধনা করি ধরতে মনো। স্তুতির 'একা সং বিদ্যা বহুধা বদন্তি।' মধুসূদনের পূর্বোক্ত চতুর্দশপদীর ধ্বনিকারে আছে, 'এক পদ্মে শত-দল। হয় রূপবতী নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্র সমানে'। একটি পদ্ম অনেক-গুলি দল মেলেছে। অথবা আমাদের চিনাকাশে অনাথা জ্যোতিষ্ক এক-সঙ্গে স্থান পেয়েছে। অপূর্ব কবি-তাময় মহাবীর উপলব্ধি পরিবর্ধিত হয়েছে। বৈষ্ণবে দেখেছি, অন্য ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশী শিশুকে কোলে নিয়ে পূজা মণ্ডপের আলিপনার পাঁকিয়ে প্রতিমা দর্শন করছেন। শিশু প্রশ্ন করছে, ইনি কে, উনি কে? সরল শিশুকে সরল পিতা চিনিয়ে দিচ্ছেন ঠাকুরদের প্রত্যেককে। আমাদের মনে হয়, ঠিক তেমনই দক্ষ প্রত্যয় নিয়ে ধর্মান্তরিত কবি পৌত্তলিকতা-বিরোধী আধুনিক সভ্যতাবিলাসী কলাসী দেখে মনে আমাদের পূজিত ঠাকুর-দেবতাকে চিনিয়ে দিচ্ছেন 'জাগিল মাস চতু-র্দশপদীর অভিধানে। আমরা সেই কবিবাবাকে আশ্রয় করে দেবতাদের স্বরূপ চিন্তা করি।

'বলে কমকাতা রমা,' কে এই অনবোদ্যা-কান্তি কমকাতা ঠাকুর-রাণীটি? কবি অনন্ত বলেছেন 'যে মুগ্ধমাধুরী মেয়ে মনমোহনে।' ইনি পরমা বৈকবী, পাপসেবন-ব্রতা বিকৃতেন্দ্রিয়ী পারিকরীদিগের অন্তরঙ্গা প্রচারিকা, আপরলীলার ইনি শ্রীকৃষ্ণকান্তাদী সত্যভামা। মধুসূদনের কাব্যে ইনি 'পদ্মাকী পুণ্ডরীকাক্ষ-কক্ষা-নিবাসিনী'। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভাষায় ইনি 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ। পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ। শ্রদ্ধা সতাং কুল-জনপ্রভবস্য লজ্জা।' সুকৃতি-জন-ভবন ইনি লক্ষ্মীস্বরূপিনী, পাপাত্মাদিগের গৃহে অলক্ষ্মী, সাধুচিত্তেষু চিত্তে বুদ্ধি, সজ্জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা এবং সংকুলজাতের অন্তরে লজ্জা।

অষ্টম বচনেশ্বরী স্বর্গবীণা করে।' বীণারঞ্জিত পুস্তকহস্তে ঐ সর্বশুক্লা ঠাকুরাণীটি কে? ইনিও পরমা বৈকবী বাগীশ্বরী মহাসরস্বতী, যিনি বাক্-পঞ্চাতীতকে বেদবলীতে প্রত্যক্ষ করান। ইনিই জানবতের 'সতং পরং পীযূষহর আত্মন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা আমাদের অন্তরে দেবতুলে বিরাজ করে অখিল শাস্ত্রের মর্ম অনুধাবন করান। ইনিই 'বিদ্যাসি সা ভগবতি পরমা হি দেবী।'—পরাবিদ্যা, ব্রহ্ম-বিদ্যা বা পরাবিদ্যা এঁরই নাম। 'পদ্মাক্ষিকা সুবিমলার্কশতপ্রকাশ নিত্যো-দ্যতাধিক-রমাসপত্নীবতাকি সাম্রাং দেবী দ্রবী।' ইনি সুবিমল জ্ঞান, ব্রহ্ম এবং রমা পরমপাঞ্চমের সাধনসঙ্গিনী নিত্যসিদ্ধা প্রকৃতিবিদ্যা।

'সিদ্ধিস্তুতে সিদ্ধিবরু যাঁর করে হতে তারক অস্ত্রশ্রেষ্ঠ।' ইনি মহা-বাহন দেবসেনাপতি পার্বতীসুত কার্তিকেয়। নানা পুরাণে এঁর অনেক-গুলি নাম পাওয়া যায়, মাতৃবৎসল, মাতৃপ্রিয়, প্রশান্তাত্মা, কার্ত্তিকেয়, মহাসেনস্তু, বাসুদেব-প্রিয় তাঁর মধ্যে ছটি। ছটি মস্তকের শতনাধারা পানে পুষ্ট এই কার্ত্তিকেয় মাতৃমন্ত্রের সাধক, ষড়রিপুবিজয়ী দেবসেনাপতি, দেব-বাহিনীর অধিনায়ক করবার যোগা-তম ব্যক্তি। ইনি প্রশান্তাত্মা, 'ব্রহ্মকৃত্ত

(শেষাংশ ৩১ পৃষ্ঠায়)

বেনারসী, সিল্ক, তাঁতের শাড়ী, জর্জেট, পিওর সিল্ক, এমব্রয়ডারী, জর্জেট প্রিন্ট শাড়ী, নাইলেক্স প্রিন্ট শাড়ী, শাল, আলোয়ান, কম্বল, যাবতীয় শীত বস্ত্র, টেরিলিন, টেরিকটন স্যুটিং, সার্টিং ও তৈয়ারী পোষাক।
বস্ত্র ও পোষাকের অনন্ত সাধারণ বিপণি
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ
২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। ফোন : ৩৩-২০০৩
ইলেকট্রিক মোটর, ব্রাইণ্ডার, ডবল-এণ্ডেড ব্রাইণ্ডার ইত্যাদি প্রস্তুতকারক
রামকানাই ইলেকট্রো ওয়ার্কস
২৬/২, গিরিশচন্দ্র মিত্র রোড, বেলঘরিয়া, কলিকাতা ৫৬। ফোন : ৬১-১৭১৫

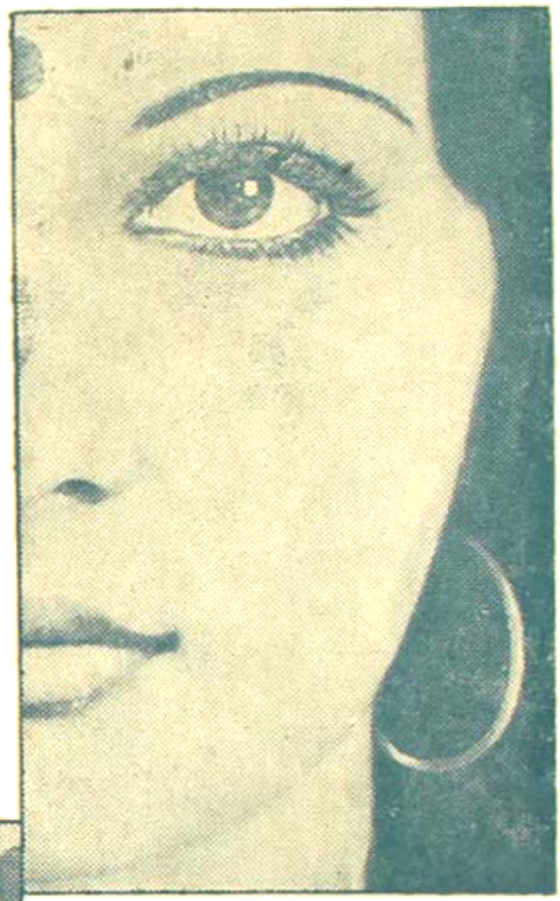

এই শুভ্রা স্নিগ্ধা
রজনীগন্ধা

## সাধ যায় দেখি সকাল সন্ধ্যা

[illegible]

# ল্যাক্মে

**ভ্যানিশিং ক্রীম**

পাউডার অনেক বেশীক্ষণ ধ'রে রাখে।

সৌন্দর্য সাহচর্যে

ল্যাক্মে

R. N. No. WBBEN/1954
LICENCE No. WB/CC/15
Copyright Reserved by All India Radio

BETAR JAGAT
Fortnightly Bengali Journal of AIR
22 September 1975 : 31 Bhadra 1897 Saka

মূল্য : প্রতি কপি ৬·০০ টাকা
বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা


# খানীচক্র

## মিউজিক এণ্ড ড্যান্স ট্রেনিং কলেজ

কলিকাতার একমাত্র নিউজিওলজি সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র

প্রথম কেন্দ্র: ১৩/১৫, রমেশমিত্র রোড, কলি-২৯। ফোন: ৪৭-৪২২১
দ্বিতীয় কেন্দ্র (১): ১৭৩, রমেশমিত্র রোড, কলি-২৯। ফোন: ৭৪-১২২৬
তৃতীয় কেন্দ্র: ১২১, মহাত্মা গান্ধীরোড, কলি-৭। ফোন: ৩৭-৩৫ ৮
পঞ্চম কেন্দ্র (২): ২৫, বেলা চাটার্জী স্ট্রীট, কলি-২১ ফোন: ৫৭-৭৯১০

[নঃ দ্রঃ প্রথম কেন্দ্র ও পঞ্চম কেন্দ্র (১) পরিচালনাধীনে]

• কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রভৃতি সকল বিষয়ে একত্রে ও স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।

### শিক্ষকমণ্ডলী

**কণ্ঠসঙ্গীত :** উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত—উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ, পণ্ডিত নিখিল ব্যানার্জী, শ্রীমতী সুচরিতা মিত্র, শ্রীমতী সাধনা বসু ও শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী। **রবীন্দ্রসঙ্গীত**—শ্রীমতী সুচরিতা মিত্র, শ্রীমতী সাধনা বসু, এস ঘোষ, কমলী সেন, ডঃ প্রফুল্ল চাটার্জী ও শ্রীমতী সুপর্ণা দেবী। **ইসলামী, আধুনিক ও পল্লী ইত্যাদি**—শ্রীমতী সাধনা বসু, শ্রীমতী সুচরিতা মিত্র, নিখিল মুখার্জী, অমল চাটার্জী, নিখিল চাটার্জী, সুনীতি দেবী, প্রবীর বন্দ্যো, শ্রীমতী দেবযানী চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী ব্যানার্জী, অমল মুখার্জী ও মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। **রাগপ্রধান, ঠুমরী, ভজন, নজরুলগীতি ও রাগপ্রধান আধুনিক সঙ্গীত**—শ্রীমতী সাধনা বসু, এস ঘোষ, কমলী সেন, ডঃ প্রফুল্ল চাটার্জী, রমলেন্দু মুখার্জী, শ্রীমতী সুপর্ণা দেবী, শ্রীমতী সাধনা বসু, প্রফুল্ল চাটার্জী, ঠাকুরদাস মুখার্জী, নিখিল চাটার্জী, ধীরেন বসু, অমল দে ও নিখিল চক্রবর্তী। **গজল, ঠাংরী ও রাগপ্রধান**—নিখিল চাটার্জী ও শ্রীমতী সাধনা বসু। **ভরত নাট্যম ও মণিপুরী**—শ্রীমতী সুপর্ণা দেবী, শ্রীমতী সুনীতি দেবী, শ্রীমতী সাধনা বসু, শ্রীমতী দেবযানী চট্টোপাধ্যায়।

**যন্ত্রসঙ্গীত :** সেতার—শ্রীযুক্ত [illegible] ও শ্রীমতী [illegible]। **সেতার ও এস্রাজ**—[illegible] **বেহালা, ভায়োলা ও সিনথেসাইজার**—[illegible] **তবলা**—[illegible] **পাখোয়াজ**—[illegible]

**নৃত্যকলা :** [illegible] **ভরত নাট্যম ও মণিপুরী**—শ্রীমতী সুপর্ণা দেবী, শ্রীমতী সুনীতি দেবী, শ্রীমতী সাধনা বসু, প্রফুল্ল চাটার্জী ও শ্রীমতী সুপর্ণা দেবী। **ওড়িশী**—শ্রীমতী সাধনা বসু, শ্রীমতী সুনীতি দেবী, শ্রীমতী দেবযানী চট্টোপাধ্যায়। **কথাকলি ও মোহিনীআট্টম**—শ্রীমতী সুনীতি দেবী।

**অন্যান্য বিষয়সমূহ :** [illegible] **ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা :** [illegible] **বার্ষিক বিশ্লেষণ :**—শিক্ষাক্রম ১৫ মাসে ১২ খণ্ডে সমাপ্ত। শিক্ষার শুরু বিভিন্ন সময়ে হতে পারে। বৎসরে সকলে পঞ্চম কেন্দ্র ও বিকাল ৩টার কেন্দ্র একই দিনে হয়, যথা, জন্মা, জন্মাষ্টমী ও শ্রাবণ এবং হয়। (যে কোন বিষয়ে) শিক্ষার্থী হতে পারে। **শিক্ষকপ্রশিক্ষণ :** যথা—নিখিল মুখার্জী, জন্মা—শ্রীমতী গুপ্তা, জন্মাষ্টমী ও শ্রাবণ—শ্রীমতী সাধনা বসু এবং ছবিতা—শ্রীমতী সরকার, মাঘ—শ্রীমতী মিত্র ও শ্রীমতী [illegible]।

**'বার্ষিক' শিক্ষণোত্তর কোর্স** (যারা ছোট্ট বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য) শিক্ষার সময়কাল: ১৮ মাসের; বিষয়: নাচ, গান ও জন্মা। (যে কোন দুটি)।

ভর্তি চলিতেছে।

শর্তাদি সত্বর জানুন।

# করভারে

[illegible]

# দেখুন, তার সমাধান...

[illegible]

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

[illegible]